অনাথবন্ধু।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যাইবে। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হইবে না।

প্রতি বিষয়ে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপন-দাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তি-মত ভাবে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপন দাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

মাসের ১০ই এর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
,, ২য় ,, ,, ,, ,, ১৫ টাকা হিঃ।
,, ৩য় ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।

শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নম্না ও ব্লক প্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কিত বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) নিতান্ত দুঃস্থ সাহিত্যিক যদি উৎকৃষ্ট সন্দর্ভ লিখিয়া পাঠান,—তাহা হইলে অন্নপূর্ণা আশ্রম হইতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করা যাইবে। এই সাহায্য অতি গোপনেই প্রদত্ত হইবে।

(৬) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	দেবদেবী বন্দনা (সচিত্র)		.
২।	নিবেদন	সম্পাদক	১
৩।	দিনপঞ্জিকা		৩
৪।	বৈশাখ মাস	শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	৬
৫।	মিথিলানাথ মহারাজ (সচিত্র)	সম্পাদক	৭
৬।	ভারতে শিল্প-ব্যবসা	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১১
৭।	কৃষি	সম্পাদক	১৫
৮।	যক্ষ্মারোগ	ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্.	১৭
৯।	বনৌষধ [ক] তুলসী (সচিত্র)	কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কবিভূষণ	২১
	[খ] বেল (সচিত্র)	কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য	২৪
	[গ] নিম (সচিত্র)	,, ,, ,,	২৬
১০।	ধর্ম্ম	সম্পাদক	২৯
১১।	যোগশাস্ত্র (সচিত্র)	শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	৩২
১২।	বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম	জনৈক অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্য	৩৫
১৩।	জ্যোতিষশাস্ত্রসম্বন্ধে দুই একটি কথা	প্রফেসার কে. পি. জ্যোতিষী	৩৬
১৪।	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ	সম্পাদক	৩৯
১৫।	সঙ্গীতশাস্ত্র	শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী	৪২
১৬।	ব্যায়াম	সম্পাদক	৪৬

সূচিপত্র সমাপ্ত।

গণেশ।

ধ্যান—খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরম্,

প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপ ব্যালোলগণ্ডস্থলম্।

দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং,

বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

প্রণাম—একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

সরস্বতী।

ধ্যান—তরুণ সকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,

কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।

নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ,

সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥

প্রণাম—সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।

বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহস্তু তে॥

ব্রহ্মা।

ধ্যান—রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরম্।

হংসবাহনস্থং ব্রহ্মাণং ধ্যায়েৎ ॥

প্রণাম—পদ্মযোনিশ্চতুর্ম্মূর্ত্তি হেমবাসাঃ পিতামহঃ।

যজ্ঞাধ্যক্ষশ্চতুর্ব্বক্ত্রস্তস্মৈনিত্যং নমো নমঃ ॥

বিষ্ণু।

ধ্যান—শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণং বনমালিনম্।

কিরীটকুণ্ডলধরং কনকাঙ্গদভূষণম্ ॥

প্রসন্নং কৌস্তুভধরং হরিণং পীতবাসসম্।

লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তং ভক্তিগম্যং পরাৎপরম্ ॥

নারায়ণং জগদ্ধেতুং ব্রহ্মাদিভিরপারগম্।

ধ্যানাতীতং গুণাতীতমীশ্বরং পরমং ভজে ॥

প্রণাম—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ,

জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

মহেশ্বর।

ধ্যান—ধ্যায়েন্নিতং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসম্

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্,

বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

প্রণাম—নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।

নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥

প্রথম বর্ষ। সন ১৩২৩। — আষাঢ়। — প্রথম খণ্ড। প্রথম সংখ্যা।

নিবেদন।

লীলাময়ের লীলায় এই বিশ্ব বিকাশ পাইয়াছে। এই বিশ্ব বৈচিত্র্যময়। সমতার মধ্যেও এই বৈচিত্র্য বিস্ময়করভাবে বিরাজ করিতেছে। কিন্তু লীলাময়ের এমনই লীলা যে, অনাথত্বের মধ্যেও বিস্ময়কর বৈচিত্র্য বর্ত্তমান।

সংসারে অনাথ অনেক ও অনেক প্রকারের। কর্ম্মজালে বদ্ধ হইয়া মানুষ নানারূপে অনাথ হয়। সকল অনাথের একমাত্র শরণ সেই অনাথশরণ। তাই তাঁহার আর একটি নাম অনাথবন্ধু। এই "অনাথবন্ধু"র উদ্দেশ্যবিবৃতির সময় আমরা সেই অনাথবন্ধুর চরণে কোটি কোটি প্রণাম করিতেছি।

সংসারে প্রথম অনাথ,—যাহার আত্মবোধ নাই। যে মোহগর্ত্তে নিপতিত হইয়া আপনাকে ভুলিয়াছে ও সেই অনাথবন্ধুকে ভুলিয়াছে, সংসারের এই মোহজনিত ধূলাখেলা ফুরাইলে তাহার গতি কি হইবে, তাহা ভাবিতেও শিখে নাই, যে কেবল দুঃখে শোকে ডুবিয়া আছে, তাহার ন্যায় অনাথ আর কে আছে? যাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলে নিদারুণ পুত্রকলত্রশোকদগ্ধহৃদয়েও নন্দনের সুষমা ফুটিয়া উঠে, ক্ষুধাতুরের জঠরজ্বালাজনিত দুঃখেরও শান্তি হয়, সেই অনাথবন্ধুকে চিনাইয়া দিবার জন্য—সেই অনাথবন্ধুকে পাইবার পন্থা নির্দ্দেশের জন্য আজ এই "অনাথবন্ধু"র লোকসমাজে আবির্ভাব। সাধকের হিতের জন্য হিন্দুশাস্ত্রে সেই দীনবন্ধুর অনেক মূর্ত্তি ও অনেক সাধনপদ্ধতি বিবৃত আছে। আমরা এই শ্রেণীর অনাথদিগের জন্য সেই সকল কথা সরলভাবে বিবৃত করিব। ইহা ভিন্ন যোগশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির সাধারণ কথাও ইহাতে সকলের বোধগম্যভাষায় লিখিত হইবে। লোক যাহাতে সংসারে থাকিয়া সাধনপথে অগ্রসর হয়, "অনাথবন্ধু"তে তাহার বিশেষ ব্যবস্থা থাকিবে। এই হিসাবে এই পত্রিকাখানি এই শ্রেণীর "অনাথবন্ধু" নাম সফল করিবার প্রয়াস পাইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনাথ—যাহারা সাংসারিক হিসাবে জ্ঞানহীন। বর্ত্তমান সময়ে চারিদিকেই পার্থিবজ্ঞান বিস্তারলাভ করিতেছে। বিদ্যা বা জ্ঞান ব্যতীত সংসারে এখন আর চলিবার উপায় নাই। কিন্তু আমরা আপনাকে যতই জ্ঞানী মনে করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আমরা দুই একটি বিষয়ে সামান্যমাত্র জ্ঞানলাভ করিলেও শত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থাকি। এমন কি আমাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারাও আমাদের নেত্রপথের নিত্যপথিক তৃণগুল্মদিগের গুণাগুণ অবগত নহেন। উহাদের গুণ জানিতে পারিলে সংসারের যে কত উপকার হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অনেক সময় সম্মুখে লতাগুল্মরূপে নানা ঔষধ থাকিতে আমরা বিনা ঔষধে প্রাণ হারাই। সুতরাং এই হিসাবে আমাদের ন্যায় অনাথ আর কে আছে? এই শ্রেণীর অনাথদিগের

শিক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞদিগের লিখিত সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভ অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে। ইহা ভিন্ন কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সমাজ-বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র (য়্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী), ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক আবশ্যক সন্দর্ভও ইহাতে প্রকাশিত হইবে। এক কথায় কেবল রাজনীতি ভিন্ন আর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ই "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশ পাইবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনাথগণ যাহাতে এই পত্রিকাখানির 'অনাথবন্ধু' নামের সার্থকতা বুঝিতে পারেন, তাহার জন্য চেষ্টার ও যত্নের ত্রুটি হইবে না।

তৃতীয় শ্রেণীর অনাথ,—যাহারা দরিদ্র—সংসারে সম্বলহীন। দারিদ্র্য নানা দোষের আকর। সেই জন্য মহাভারতকার বলিয়াছেন,—

> দুর্ভিক্ষাদেব দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশং ভয়াদ্ভয়ং,
> মৃতেভ্যঃ প্রমৃতং যান্তি দরিদ্রাঃ পাপকারিণঃ।
> উৎসবাদুৎসবং যান্তি স্বর্গাৎ স্বর্গং সুখাৎ সুখং,
> শ্রদ্দধানাশ্চ দান্তাশ্চ ধনাঢ্যাঃ শুভকারিণঃ।

পাপাচারী দরিদ্র লোক দুর্ভিক্ষ হইতেও দুর্ভিক্ষ, ক্লেশ হইতেও ক্লেশ (ক্লেশজনক), ভয় হইতেও ভয় (ভয়ানক), মৃত অপেক্ষাও অধিক মৃত, পক্ষান্তরে শ্রদ্ধাযুক্ত দাতা ধনাঢ্যেরা উৎসব হইতেও উৎসব (আনন্দজনক), সুখ হইতেও সুখ (সুখজনক), স্বর্গ হইতেও স্বর্গ (আরামদায়ক)।

বাস্তবিকই গরিবের মত অনাথ আর নাই। তাহারা অভাবের তাড়নায় সবই করিতে পারে। এই দারিদ্র্য নানা প্রকারের। আজকাল আমাদের দেশে শিল্পের লোপ হইয়াছে, সেই জন্য লোকের অর্থসংগ্রহের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। অনেকে পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত, কিন্তু পরিশ্রম করিবার ক্ষেত্র পায় না। এখন কৃষি ও চাকুরী এই দুইটিই আমাদের দেশের লোকের জীবিকার্জ্জনের কেবলমাত্র বৃত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। চাষের জমি বিভক্ত হইয়া 'চটকস্য মাংসে' পরিণত হইতেছে। কাজেই অধিকাংশ কৃষকের সামান্য যোতের জমিতে সম্বৎসরের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহিত হয় না। তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি করিতে পারিলে, অল্প জমিতে অধিক ফসল জন্মিতে পারে। সেই জন্য কৃষিসম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 'অনাথবন্ধু'তে সন্নিবিষ্ট থাকিবে। চাকুরীতে যেরূপ সংখ্যায় লোকের প্রয়োজন, উমেদারের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক। সেই জন্য চাকুরীর মজুরী কমিতেছে, ঝকমারি বাড়িতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে শিল্পোন্নতিই দেশের কল্যাণসাধনের একমাত্র উপায়। কিন্তু কেবল প্রবন্ধ লিখিলেই শিল্পোন্নতিসাধন সম্ভবে না। শিল্পোন্নতি করিতে হইলে শিল্পীদিগকে হাতে কলমে কাজ শিখাইতে হয়। সেই জন্য আমরা

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

নাম দিয়া একটি কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতেছি। এ দেশের লোকের যে সমস্ত দ্রব্য নিতান্ত আবশ্যক, সুদক্ষ শিল্পীর দ্বারা এই আশ্রমে তাহা প্রস্তুত করা হইবে এবং তাহা খরচা পোষাইয়া যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে বেচিবার বন্দোবস্ত করা হইবে। যাঁহারা শিল্পশিক্ষা করিতে আসিবেন, তাঁহারা কাজ শিখিলে আশ্রমেই কাজ পাইবেন। ইহাকে একটি আদর্শ কার্য্যালয়ে পরিণত করা যাইবে। আপাততঃ সামান্যভাবে ইহার কার্য্য আরব্ধ হইল দেখিয়া কেহ যেন নিরুৎসাহ না হন। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ সামান্য প্রারম্ভ হইতেই বড় বড় কার্য্যের উদ্ভব হইয়াছে। বিলাতের অক্সফোর্ডসায়রে মংওয়েল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বিশপ বারিংটন এই গ্রামে একটি ক্ষুদ্র কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। তথায় কেবলমাত্র খরচা লইয়া খাদ্যদ্রব্যাদি বিক্রীত করা হইত। ক্রমে শ্রমজীবীদিগের প্রস্তুত দ্রব্যও বিনালাভে বিক্রয় করা হইত, তাহাতে শ্রমজীবীরা শ্রমের মূল্য পাইত, কিন্তু কার্য্যালয় কেবল খরচা মাত্র লইয়া উহা বিক্রয় করিতেন বলিয়া ঐ সকল পণ্য অপেক্ষাকৃত সুলভে বিকাইত। ক্রমে সমস্ত ইংলণ্ডে এই কার্য্যালয়ের শাখা বিস্তৃত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৩ লক্ষ ৪৩ হাজার লোক ইহার সদস্য হয় এবং ইহার মূলধন হয় পৌনে আটাশ কোটি টাকা, এবং রিজার্ভ তহবিলে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা মজুদ থাকে। ফলে ধার্ম্মিক কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে উহা সফল হইবেই হইবে। আমরা অতদূর আশা না করি, কারবারটি যাহাতে সফল হয়, তাহার চেষ্টা করিব। 'অনাথবন্ধু' এইরূপ কার্য্যপরিচালনের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিবেন এবং অন্নপূর্ণা আশ্রমকে ইহার আদর্শরূপে পরিচালনা করিতে যত্নশীল হইবেন।

ভদ্রমহিলারা যদি ঘরে বসিয়া কোন শিল্পজ আবশ্যক পণ্য প্রস্তুত করিয়া আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করেন, আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে তাহা উচিত মূল্যে বেচিয়া দিবেন। আশ্রমেও নারীদিগের কর্ম্ম করিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

চতুর্থ অনাথ—যাহারা পীড়িত। অন্নপূর্ণা আশ্রমে দুঃস্থ পীড়িতদিগের সাহায্যকল্পে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকিবে। য়্যালোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, কবিরাজী ও হাকিমী, এই কয় প্রকারের চিকিৎসারই ব্যবস্থা থাকিবে, তবে আপাততঃ রোগীদিগের থাকিবার স্থান প্রদত্ত হইবে না। চিকিৎসা ও ঔষধ বিনামূল্যেই প্রদত্ত হইবে।

ফলে অনাথবন্ধু যাহাতে প্রকৃতপক্ষেই অনাথবন্ধুর কাজ করিতে পারে, আমরা তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এখন আমরা সেই অনাথবন্ধুর দয়া এবং সাধারণের অনুকম্পা ও সহানুভূতির প্রার্থনা করি। আশা করি, আমাদের আশা নিষ্ফলা হইবে না।

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

আষাঢ়।

[১৫ই হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।]

১৫ই আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।—চতুর্দ্দশী দিবা ঘণ্টা ২।১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ২।১ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি। অমাবস্যার নিশিপালন। দিবা ঘ ২।১ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য, মাংস অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২৫ গতে ৬।৪৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।১৪ মধ্যে, পরে ৯।৪৯ গতে ১১।৩৬ মধ্যে।

১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার।—অমাবস্যা দিবা ঘ ৩।৫২। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৫৮ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। অমাবস্যার ব্রত উপবাস। পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। দিবা ঘ ৩।৫২ মধ্যে মৎস্য, মাংস পরে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।১৯ গতে ৭।১৬ মধ্যে, পরে ৯।৫৪ গতে ১০।৪৩ মধ্যে।

১৭ই আষাঢ়, শনিবার।—প্রতিপদ বৈকাল ঘ ৫।৫৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ২।১৭ গতে ৫।৫৩ মধ্যে উত্তরে নাস্তি, পরে উত্তরে শুভ। বৈকাল ঘ ৫।৫৩ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।১২ মধ্যে, পরে ৯।৫৩ গতে ১২।৩৩ মধ্যে।

১৮ই আষাঢ়, রবিবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৭।৫২। যাত্রা-শুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৪।১৬ গতে রাত্রি ঘ ৭।৫২ মধ্যে উত্তরে নাস্তি, পরে উত্তরে শুভ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। রাত্রি ঘ ৭।৫২ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ বৈকাল ঘ ৫।১০ গতে ৫।৫৩ মধ্যে।

১৯শে আষাঢ়, সোমবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৩৯। যাত্রাশুভ। রাত্রি ঘ ৯।৩৯ মধ্যে পটোল পরে মূলা ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৪।২ গতে ৪।৪৪ মধ্যে।

২০শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ১১।৬। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।২৬ গতে রিক্তা ও নক্ষত্র-দোষ। অক্ষয়া স্নানদানাদি। রাত্রি ঘ ১১।৬ মধ্যে মূলা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।১০ গতে ৪।২ মধ্যে, পরে ৪।৫৬ গতে ৫।৫০ মধ্যে, রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।১৯ মধ্যে।

২১শে আষাঢ়, বুধবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২।৯। যাত্রা-নাস্তি। হোরাষষ্টপঞ্চমী ব্রত ও পূজা। শ্রীফল অভক্ষ্য।

২২শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১২।৪৩। যাত্রানাস্তি। কর্দ্দমষষ্ঠী পূজা। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২৫ গতে ৬।৪৫ মধ্যে। নিম্বভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।২৩ মধ্যে, পরে ৯।৫৭ গতে ১১।৪৫ মধ্যে।

২৩শে আষাঢ়, শুক্রবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ১২।৪৫। যাত্রাশুভ, উত্তরে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।৪৯ গতে যাত্রা-নাস্তি। রাত্রি ঘ ১২।৪৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।১৯ গতে ৭।১৬ মধ্যে, পরে ৯।৫৪ গতে ১০।৪৫ মধ্যে।

২৪শে আষাঢ়, শনিবার।—অষ্টমী রাত্রি ঘ ১২।১৮। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।১৮ গতে যাত্রামধ্যম, পূর্ব্বে নাস্তি। বিপত্তারিণী চণ্ডিকাদেবী পূজয়েৎ। রাত্রি ঘ ১২।১৮ মধ্যে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৬।১৮ মধ্যে, পরে ৯।৫০ গতে ১২।৩৭ মধ্যে।

২৫শে আষাঢ়, রবিবার।—নবমী রাত্রি ঘ ১১।২০। যাত্রা নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।২০ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। রাত্রি ঘ ১১।২০ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বী ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ বৈকাল ঘ ৫।১ গতে ৫।৫৩ মধ্যে।

২৬শে আষাঢ়, সোমবার।—দশমী রাত্রি ঘ ৯।৫৮। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।৫৫ গতে নক্ষত্রদোষ। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা। কলম্বী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্র-যোগ রাত্রি ঘ ৪।২ গতে ৪।৪৪ মধ্যে।

২৭শে আষাঢ়, মঙ্গলবার।—একাদশী রাত্রি ঘ ৮।১৪। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।১৪ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি। শয়নৈকাদশীর উপবাস সর্ব্বসম্মত। রাত্রি ঘ ৮।১৪ মধ্যে শিম অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।১০ গতে ৪।২ মধ্যে, পরে ৪।৫৬ গতে ৫।৫০ মধ্যে, পরে রাত্রি ৮।৫০ গ, ১০।১৯ মধ্যে।

২৮শে আষাঢ়, বুধবার।—দ্বাদশী বৈকাল ঘ ৬।১৩। যাত্রানাস্তি, বৈকাল ঘ ৬।১৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি। চাতুর্মাস্যব্রতারম্ভ, উদিচ্যাঙ্গপূজা। দিবা ঘ ৯।৫২ মধ্যে একাদশীর পারণ। বৈকাল ঘ ৬।১৩ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ।

২৯শে আষাঢ়, বৃহস্পতিবার।—ত্রয়োদশী দিবা ঘ ৩।৫৮। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।৩৭ গতে পূর্ব্বে শুভ, দিবা ঘ ১২।২২ গতে ৩।৫৮ মধ্যে পূর্ব্বে নাস্তি, পরে রিক্তা ও পাপযোগদোষ। বার্ত্তাকু, মাষকলাই অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২৫ গতে ৬।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।২৪ মধ্যে, পরে ৯।৫৫ গতে ১১।৪৫ মধ্যে।

৩০শে আষাঢ়, শুক্রবার।—চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ১।৩৪। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।৫৮ গতে ১।৩৪ মধ্যে দক্ষিণে নাস্তি, পরে পক্ষান্ত বিষ্টিদোষ। পূর্ণিমার নিশিপালন। দিবা ঘ ১।৩৪ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য, মাংস

অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৬।১৮ গতে ৭।১৪ মধ্যে, পরে ৯।৫২ গতে ১০।৪৩ মধ্যে।

৩১শে আষাঢ়, শনিবার।—পূর্ণিমা দিবা ঘ ১১।৬। যাত্রানাস্তি। পূর্ণিমার ব্রত উপবাস। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ। উদিচ্যাঙ্গপূজা। দিবা ঘ ১১।৬ মধ্যে মৎস্য, মাংস পরে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৬।১৮ মধ্যে, পরে ৯।৫০ গতে ১২।৩৭ মধ্যে।

৩২শে আষাঢ়, রবিবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ৮।৩৭। যাত্রানাস্তি। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতারম্ভ, উদিচ্যাঙ্গ পূজা। দিবা ৮।৩৭ গতে অশূন্যশয়নদ্বিতীয়া ব্রত। দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি। বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ বৈকাল ঘ ৫।১৫ গতে ৫।৪৫ মধ্যে।

সন ১৩২৩, আষাঢ় মাসের দিনপঞ্জিকা সমাপ্ত।

শ্রাবণ।

[১লা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত।]

১লা শ্রাবণ, সোমবার।—দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৬।১৫, পরে তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৪।২। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ। কেচিৎ মতে যাত্রাশুভ। পটোল ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ২।৪ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

২রা শ্রাবণ, মঙ্গলবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ২।৫। যাত্রানাস্তি, রিক্তাদোষ, রাত্রি ২।৫ গতে উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি। রাত্রি ঘ ২।৫ মধ্যে মূলা ভক্ষণ নিষেধ।

৩রা শ্রাবণ, বুধবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১২।২৫। যাত্রামধ্যম, উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৪৯ গতে ১১।৪০ মধ্যে পূর্ব্বে নাস্তি, পরে যাত্রানাস্তি। শ্রীফল অভক্ষ্য। শ্রীশ্রীনাগপঞ্চমী ও অষ্টনাগপূজা। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।১৬ গতে ৪।২ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।৩১ গতে ১১।১ মধ্যে।

৪ঠা শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ১১।৯। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ১১।৯ মধ্যে নিম্ব ভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২৫ গতে ৬।৪৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।১৮ মধ্যে, পরে ১০।৫১ গতে ১।২৫ মধ্যে।

৫ই শ্রাবণ, শুক্রবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ১০।১৮। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।৩ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। রাত্রি ঘ ১০।১৮ মধ্যে তাল পরে নারিকেল ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১১।৪ গতে ১।৪৫ ম, পরে ৪।৬ গ, ৫।৩০ মধ্যে।

৬ই শ্রাবণ, শনিবার।—অষ্টমী রাত্রি ঘ ৯।৩৬। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ৯।৩৬ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি। মন্বন্তরা স্নানদানাদি। রাত্রি ঘ ৯।৩৬ মধ্যে নারিকেল, আমিষ ভক্ষণ নিষেধ।

৭ই শ্রাবণ, রবিবার।—নবমী রাত্রি ঘ ১০।৬। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ১০।৬ মধ্যে অলাবু ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৬।২৭ মধ্যে, পরে ১।২১ গতে ২।১৬ মধ্যে, আর রাত্রি ঘ ৭।৯ গতে ৮।০ মধ্যে, পরে ১২।২৬ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

৮ই শ্রাবণ, সোমবার।—দশমী রাত্রি ঘ ১০।৪৬। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১।৪৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি। কলম্বী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৪।১ গতে ৫।৪৪ মধ্যে।

৯ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।—একাদশী রাত্রি ঘ ১১।৫৫। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।৫৫ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ৩।৩৫ গতে পশ্চিমে শুভ। একাদশীর উপবাস। রাত্রি ১১।৫৫ মধ্যে শিম ভক্ষণ নিষেধ।

১০ই শ্রাবণ, বুধবার।—দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১।২৮। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৯।৫২ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১।২৮ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে মাত্র নাস্তি। দিবা ঘ ৬।১৯ গতে একাদশীর পারণ। পূতিকা ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।১৫ গতে ৪।০ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।৩০ গতে ১১।০ মধ্যে।

১১ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৬।১৯। যাত্রানাস্তি। বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২৪ গতে ৬।৪২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৭।১ মধ্যে, পরে ১০।৬ গতে ১।২৫ মধ্যে।

১২ই শ্রাবণ, শুক্রবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৫।২০। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৮।১৯ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। মাষকলাই ও আমিষ ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৫৯ গতে ১১।৪২ মধ্যে, পরে ৪।১০ গতে ৫।৩৪ মধ্যে।

১৩ই শ্রাবণ, শনিবার।—অমাবস্যা। যাত্রানাস্তি। অমাবস্যার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন। মৎস্য, মাংস অভক্ষ্য।

১৪ই শ্রাবণ, রবিবার।—অমাবস্যা প্রাতঃ ৭।২১। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, প্রাতঃ ঘ ৭।২১ গতে পশ্চিমে মাত্র নাস্তি, দিবা ঘ ১।৩০ গতে নক্ষত্রদোষ। সূর্য্যগ্রহণ, দর্শনাভাব। কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৬।২৮ মধ্যে, পরে ১।২৩ গতে ২।১৫ মধ্যে, আর রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে ৮।১ মধ্যে, পরে ১২।২৬ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

১৫ই শ্রাবণ, সোমবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ৯।৯। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৯ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতী ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৫৬ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

১৬ই শ্রাবণ, মঙ্গলবার।—দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১০।৩৯। যাত্রানাস্তি, বৈকাল ঘ ৫।৫৪ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।৫৯ গতে পরিঘপূর্ব্বার্দ্ধযোগদোষ। দিবা ঘ ১০।৩৯ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল ভক্ষণ নিষেধ।

১৭ই শ্রাবণ, বুধবার।—তৃতীয়া দিবা ঘ ১১।৪৪। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।৪৪ মধ্যে পটোল পরে মূলা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।১৫ গতে ৩।৫৯ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।৩১ গতে ১০।৫৮ মধ্যে।

১৮ই শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।—চতুর্থী দিবা ঘ ১২।২০। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৩৩ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ১২।২০ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফল ভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২২ গতে ৬।৩৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।২৪ মধ্যে, পরে ১০।৪৫ গতে ১।১৯ মধ্যে।

১৯শে শ্রাবণ, শুক্রবার।—পঞ্চমী দিবা ঘ ১২।২৪। যাত্রাশুভ, উত্তরে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।৪৮ গতে দক্ষিণে পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।২৪ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণে শুভ, রাত্রি ঘ ৯।৯ গতে উত্তরে শুভ, পশ্চিমে মাত্র নাস্তি। ষট্‌পঞ্চমী ব্রত ও পূজা। দিবা ১২।২৪ মধ্যে শ্রীফল পরে নিম্ব ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৫৪ গতে ১১।৪৩ মধ্যে, পরে ৪।১৩ গতে ৫।৩৭ মধ্যে।

২০শে শ্রাবণ, শনিবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ১১।৫৯। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।২৩ গতে দক্ষিণে পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ৯।১৭ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি। লুণ্ঠনষষ্ঠী পূজা। দিবা ঘ ১১।৫৯ মধ্যে নিম্ব পরে তাল ভক্ষণ নিষেধ।

২১শে শ্রাবণ, রবিবার।—সপ্তমী দিবা ঘ ১১।৪। যাত্রামধ্যম, পশ্চিমে নাস্তি, প্রাতঃ ঘ ৭।২৮ গতে ১১।৪ মধ্যে বায়ুকোণে নৈঋতে নাস্তি, পরে যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।৪ মধ্যে অক্ষয়া স্নানদানাদি। দিবা ঘ ১১।৪ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষ ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৩৩ মধ্যে, পরে ১।২৭ গতে ২।২৯ মধ্যে আর রাত্রি ঘ ৭।৬ গতে ৭।৫২ মধ্যে, পরে ১২।২৬ গতে ৩।২৭ মধ্যে।

২২শে শ্রাবণ, সোমবার।—অষ্টমী দিবা ঘ ৯।৪৫। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৪৫ মধ্যে নারিকেল, আমিষ পরে অলাবু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৫০ গতে ৫।৩৩ মধ্যে।

২৩শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।—নবমী দিবা ঘ ৮।২। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৮।২ গতে কলম্বী ভক্ষণ নিষেধ।

২৪শে শ্রাবণ, বুধবার।—দশমী প্রাতঃ ঘ ৬।২, পরে একাদশী রাত্রি ঘ ৩।৪৮। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ। শিম অভক্ষ্য। প্রাতঃ ঘ ৬।২ গতে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৯ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।২৩ গতে ১০।৫৫ মধ্যে।

২৫শে শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার।—দ্বাদশী রাত্রি ঘ ১।২৬। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ১।২৬ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি। বারবেলা দিবা ঘ ৩।২০ গতে ৬।৩৪ মধ্যে। একাদশীর উপবাস সর্ব্বসম্মত। পূতিকা ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।২১ মধ্যে, পরে ১০।৪৪ গতে ১।১৫ মধ্যে।

২৬শে শ্রাবণ, শুক্রবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ১০।৫৮। যাত্রামধ্যম, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৪০ গতে যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫৬ মধ্যে একাদশীর পারণ। রাত্রি ঘ ১০।৫৮ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৫৩ গতে ১১।৪০ মধ্যে, পরে ৪।১৩ গতে ৫।৩৯ মধ্যে।

২৭শে শ্রাবণ, শনিবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৮।৩১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।১ গতে যাত্রামধ্যম, পূর্ব্বে নাস্তি, বৈকাল ঘ ৪।৫৫ গতে পশ্চিমে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৩১ গতে যাত্রানাস্তি। পূর্ণিমার নিশিপালন। রাত্রি ঘ ৮।৩১ মধ্যে মাষকলাই পরে মৎস্য, মাংস অভক্ষ্য।

২৮শে শ্রাবণ, রবিবার।—পূর্ণিমা বৈকাল ঘ ৬।৯। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১১।২৫ গতে পূর্ব্বে শুভ, দিবা ঘ ২।৩৩ গতে ৬।৯ মধ্যে বায়ুকোণে নৈঋতে নাস্তি পরে পাপযোগদোষ। পূর্ণিমার ব্রত উপবাস। রাখিপূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা সমাপন। বৈকাল ঘ ৬।৯ মধ্যে মৎস্য, মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৩৪ মধ্যে, পরে ১।১৫ গতে ২।৫ মধ্যে, রাত্রি ঘ ৭।৩ গতে ৭।৫২ মধ্যে, পরে ১২।২৪ গতে ৩।২৬ মধ্যে।

২৯শে শ্রাবণ, সোমবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ৩।৫৭। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।৫৭ গতে যাত্রামধ্যম, দিবা ঘ ১২।২১ গতে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।৫৭ গতে পাপযোগদোষ। দিবা ঘ ৩।৫৭ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৪৭ গতে ৫।২৬ মধ্যে।

৩০শে শ্রাবণ, মঙ্গলবার।—দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১।৫৮। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।৪৩ গতে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।২২ গতে ১।৫৮ মধ্যে পশ্চিমে নাস্তি, পরে পশ্চিমে শুভ, রাত্রি ঘ ১।৮ গতে বিষ্টিদোষাভাবঃ। দিবা ঘ ১।৫৮ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল ভক্ষণ নিষেধ।

৩১শে শ্রাবণ, বুধবার।—তৃতীয়া দিবা ঘ ১২।১৮। যাত্রানাস্তি। দেশভেদে অরন্ধনসংক্রান্তি ও মনসাপূজা। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। দিবা ঘ ১২।১৮ মধ্যে পটোল পরে মূলা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৯ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।২৩ গতে ১০।৫৫ মধ্যে।

সন ১৩২৩, শ্রাবণ মাসের দিনপঞ্জিকা সমাপ্ত।

বৈশাখ মাস।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

নারদ বলেন,—বৈশাখ মাসের সমান মাস নাই; কবিগণ বলিয়াছেন, যেমন সত্যযুগের সমান যুগ, বেদের সমান শাস্ত্র, গঙ্গাতুল্য তীর্থ, জলদানের সমতুল্য দান, ভার্য্যাসুখসদৃশ সুখ, কৃষিসদৃশ সম্পদ্, জীবনলাভের তুল্য লাভ, অনশনসমান ব্রত, দানসদৃশ শ্রেষ্ঠ সুখ, দয়ার তুল্য ধর্ম্ম, চক্ষুর অনুরূপ জ্যোতি, রসনাতুল্য তৃপ্তি, কৃষির তুল্য বৃত্তি, ধর্ম্মের তুল্য মিত্র, সত্যের সমান যশ, আরোগ্যের ন্যায় উন্নতি এবং কেশবসদৃশ ত্রাতা নাই, তদ্রূপ ত্রিলোকে মাসসমূহমধ্যে বৈশাখের সদৃশ পবিত্র মাস আর নাই। বৈশাখমাসই মাসমধ্যে প্রধান ও শেষশায়ী হরির সর্ব্বদা প্রিয়। যে মানব মাধবপ্রিয় বৈশাখমাস ব্রত ব্যতীত অতিবাহিত করে, সে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত হইয়া সত্বর তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়।

বৈশাখমাসে সূর্য্য মেষরাশিতে উপস্থিত হয়েন, হিন্দুশাস্ত্রে উত্তরায়ণমধ্যে এই মাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যমাস বলিয়া কথিত হয়। যাবতীয় পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য এই মাসে ঋষিরা যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মশীল মানবগণের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। উহা দৈহিক ও মানসিক বিশেষ উন্নতিসাধক। ঋষিগণ বলেন,—বৈশাখমাসে জলদান, অন্নদান, ছায়াদান, ছত্রদান, পাদুকাদান, বটবৃক্ষাদি রোপণ, অতিথিসংকার ও জলাশয়াদি খনন পুণ্যজনক।

নারদ বলেন,—তৈলাভ্যঙ্গ, দিবানিদ্রা, কাংস্যপাত্রে ভোজন, খট্বায় শয়ন, গৃহে তোলাজলে স্নান, নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ, দ্বিরশন এবং নক্ত ভোজন, বৈশাখমাসে এই আটটি পরিত্যাগ করিবে। যে মানব বৈশাখে পদ্মপত্রে ভোজন করে ও ব্রতস্থ হয়, তাহার বিষ্ণুলোকে গমন হয়।

বৈশাখমাসে কখন অস্নাত থাকিবে না। প্রতিদিবস প্রাতরুত্থান, প্রাতঃস্নান অথবা সন্ধ্যাস্নান করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে, যাহারা বৈশাখমাসে অস্নায়ী, কুৎসিত পাত্রে ভোজনকারী এবং দৃঢ়বদ্ধ রোগহীন ব্যক্তি গৃহে বসিয়া তোলাজলে স্নান করে, সে চণ্ডালও রাসভযোনি প্রাপ্ত হয়।

বৈশাখমাসে সূর্য্যের উত্তাপ প্রখর হয়, গ্রীষ্মের প্রাখর্য্যবশতঃ শরীর ঘর্ম্মাক্ত ও উত্তাপবহুল হয়, তজ্জন্য দেহমধ্যে রস ও কফের প্রকোপ দৃষ্ট হয়।

আয়ুর্ব্বেদকর্ত্তা সুশ্রুত বলেন,—এই নিদাঘকালে মধুর ও স্নিগ্ধ রস, দিবানিদ্রা, গুরুপাক, দ্রবদ্রব্য ভোজন, ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণকর ভোজন বা ক্রিয়া এবং বিবিধ পিত্তবর্দ্ধক রস পরিত্যাগ করিবে। সরোবর, নদী, মনোহর বন, চন্দন, মাল্য, পদ্ম, উৎপল, তালবৃন্তব্যজন, শীতল গৃহ, ঘর্ম্মকালে অতি লঘু বস্ত্র, শর্করাযুক্ত সুগন্ধি সরবৎ, শর্করাযুক্ত মন্থ এবং শীতল ঘৃতযুক্ত মধুর দ্রবদ্রব্য ভোজন এই কালে বিশেষ হিতকর। রাত্রিকালে শর্করাসহ দুগ্ধ ভোজন এবং চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ হইয়া, বায়ুসঞ্চারিত স্থানে, প্রস্ফুটিত কুসুমবিকীর্ণ সুশীতল শয্যায় শয়ন করিবে।

গ্রীষ্মকালে ধাতুপাত্রে ভক্ষণ নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ রোগী ও গ্রহপীড়িত ব্যক্তির পক্ষে বিষতুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। মনুষ্যের ন্যায় ধাতুপাত্রও গলিত বা ঘর্ম্মাক্ত হয়, উহা অন্নের সহিত যুক্ত হইয়া উদরস্থ হইলে দেহে বিষের ন্যায় কার্য্য করে। সুতরাং অন্নাদি যাহা কিছু ভক্ষণ বা পান করিবে, প্রস্তর, কাঁচপাত্র বা বিবিধ প্রকার মৃণ্ময়পাত্রাদি ব্যবহার করিবে। রন্ধনাদিও ধাতুপাত্রের পরিবর্ত্তে মৃণ্ময়পাত্রাদিতে হওয়া কর্ত্তব্য। যে স্বাস্থ্যকামী জ্ঞানবান্ পুরুষ এই কালে নিরামিষ আহার ও নিত্যস্বাস্থ্যকর ফলমূল সেবন করেন, তিনি নিশ্চয় দীর্ঘজীবন লাভ করেন। যিনি এই নিদাঘকালে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া কদলী বা পদ্মপত্রে ভোজন, কদলীরস সেবন বা ফল ভোজন করেন, তাহার শরীরে কখন ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে না।

বৈশাখমাসে রাত্রিমান অল্প ও দিবামান অধিক। জীবজগতে এই সময় কর্ম্মলিপ্ত ও চৈতন্যশক্তির প্রশস্ততাহেতু দেহীর পক্ষে নানাবিধ শুভকার্য্যে শুভফল লাভ হইয়া থাকে। দক্ষিণায়ন সময়ে সেই শুভফলের প্রত্যাশা করা যায় না; কারণ, সেই সময় তামসীশক্তির প্রাধান্য হইয়া উঠে, তদ্ধেতু মনুস্য অল্পায়ু ও অল্পজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিবিধ দুরারোগ্য রোগের ও শোকের অধীন হইয়া থাকে।

জ্যোতিষাচার্য্যদিগের মতে দক্ষিণায়ন অপেক্ষা উত্তরায়নে জাতকের জন্ম ও মৃত্যুর ফল অতীব প্রশস্ত। সূর্য্য মধ্যকক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণে গেলে পাপগ্রহের কারকতাই বৃদ্ধি হয়, উত্তরায়ন প্রাপ্ত হইলে আপন পূর্ণশক্তিকে শক্তির আকর্ষণে শুভগ্রহের প্রাধান্যই বৃদ্ধি করেন। বৈশাখ মাসে জাতকের জন্ম হইলে জাতক বুদ্ধিমান্, দীর্ঘায়ু, সহিষ্ণু, জীবনীশক্তিযুক্ত, বিনীত, ধার্ম্মিক, দাতা, সজ্জনপালক, যশস্বী, কফপ্রধান ধাতু ও স্থীর প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। স্ত্রীগণ পুত্রবান্, পতিব্রতা ও ধনশালিনী হয়েন। অবশ্য দুরাচার, অখাদ্যভোজী, অব্রহ্মচর্য্যশীল, মদ্যপায়ী, অগম্যাগামী প্রভৃতি মহাপাতকীর পক্ষে বৈশাখ কেন, কোন কালেই পুণ্য বা শুভফলের আশা করা যায় না। তাহারা নিজকৃত কর্ম্মফল দ্বারা কালকৃত বিবিধ শুভফলকে অতিক্রম করিয়া নানাপ্রকার দুঃখের ভাগী হয়।

কাল ঈশ্বরপরায়ণ পুণ্যাত্মাদিগেরই চিরসহায় হইয়া, বিবিধ সুখভোগ ও অযাচিত স্বাস্থ্য এবং সৌভাগ্য সকল প্রদান করিয়া থাকেন।

মিথিলানাথ মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর ;

জি, সি, আই, ই।

মিথিলার সিংহাসনে আজকাল একজন আদর্শ ভূপাল অধিষ্ঠিত। কি প্রজারঞ্জনে, কি স্বদেশের উন্নতিসাধনে, দ্বারবঙ্গের নরনাথ ভারতীয় রাজন্যগণের আদর্শস্থানীয়, এ কথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বোধ হয়, ভারতের বিপদ্ ও দৈন্য দূর করিবার জন্য ভগবান স্যার্ শ্রীত রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরকে অসাধারণ প্রতিভায় মণ্ডিত করিয়াছেন। স্যার্ রামেশ্বর কেবল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নহেন, কেবল সংযমী, চরিত্রবান্ ও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ নহেন, পরন্তু তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। অসাধারণ প্রতিভাবলেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে সনাতনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার দ্বারা ভারতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, অন্যথা ভারতের মঙ্গল নাই। তাই তিনি সনাতনধর্ম্মের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা দেখিলে ও ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের দেশের লোকের ধারণা ছিল যে, এ দেশের নরনাথ ও ভূম্যধিকারিগণ স্বয়ং কিছুই করিতে পারেন না, তাঁহারা মন্ত্রী, কর্ম্মচারী ও আমলাদিগের দ্বারা সদাই পরিচালিত হইয়া থাকেন। স্যার্ রামেশ্বর জনসাধারণের সে ধারণা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে ইদানীং আমাদের দেশের আভিজাতদিগের মধ্যে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, নলডাঙ্গার রাজা বাহাদুর প্রভৃতির ন্যায় প্রতিভাশালী মনস্বী ও কর্ম্মী জন্মগ্রহণ করিতেছেন। ইহাদের এক এক জনের মনস্বিতা এক এক দিকেই বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহাতে মনে আশা হইতেছে যে, শীঘ্রই বুঝি আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনের অবসান হইবে।

দ্বারবঙ্গেশ্বর মনস্বিতায় ও কর্ম্মশীলতায় অনন্যসাধারণ। তাই তিনি হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়রূপ বিরাট ও ভারতের বিশেষ কল্যাণসাধক প্রতিষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হইয়াছেন। ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য সনাতনধর্ম্মের প্রকৃত গৌরব সমুজ্জ্বল করিবার জন্য ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের স্থাপনা করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণোচিত কার্য্যেই তাঁহার সমধিক প্রীতি। সেই জন্য ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রতিষ্ঠায় মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। মহারাজ বাহাদুরের জীবনের কাহিনী পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দেশের কল্যাণকল্পে তাঁহার জীবন উৎসৃষ্ট। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকাহিনী বিবৃত করিলাম।

বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ্বর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। বর্ত্তমান সময়ে বল্লালী-কৌলীন্যশাসিত বঙ্গে যে শ্রেণীর শ্রোত্রিয়ের নাম শুনা যায়, মহারাজ বাহাদুর সেই শ্রেণীর শ্রোত্রিয় নহেন।

একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় নাম ধর্ম্মবিৎ॥

মহারাজ বাহাদুর যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশ এইরূপ শ্রোত্রিয়ের বংশ। এই বংশের রাজগণ কেহই স্বাধ্যায় পরিত্যাগ করেন নাই। ভারতসম্রাট্ গুণগ্রাহী আকবর বাহাদুর শ্রীমন্ মহেশ ঠাকুরের ধর্ম্মশীলতা ও পাণ্ডিত্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়াই তাঁহাকে বিশাল ত্রিহুত রাজ্যটি দান করিয়াছিলেন। তদবধি এ পর্য্যন্ত এই পবিত্র রাজবংশে অনেক সুপণ্ডিত ও আনুষ্ঠানিক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, এই বংশে মূর্খ বা কর্ত্তব্যপথভ্রষ্ট রাজা জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইহা ভিন্ন এই রাজবংশের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের দুঃখমোচনে, আতুরকে আশ্রয়দানে, অনাথদিগের পালনে সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। ইঁহাদের প্রজাবর্গ কখনই দারিদ্র্যের সহস্র বৃশ্চিক-দংশনে প্রপীড়িত হন নাই। প্রজারঞ্জনে এই রাজবংশ আদর্শস্থানীয়। তাঁহাদের সকলের জীবনকথা এই সন্দর্ভের আলোচ্যবিষয় নহে। কিন্তু যে মহারাজে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত সদ্‌গুণ সংক্রমিত ও পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার জীবনকে মহিমমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা

আজ সেই মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের জীবনকথা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব।

ইংরেজী ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে দ্বারবঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। দ্বারবঙ্গের পক্ষে সে দিন অতি শুভদিন। বাল্যকালেই মহারাজ বাহাদুরের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্যার্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অভিভাবকত্বে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। বাল্যকালেই সংস্কৃতশিক্ষায় স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের অসাধারণ অনুরাগ লক্ষিত হয়। সেই জন্য তিনি সংস্কৃতবিদ্যায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া পাশ্চাত্যবিদ্যায় মহারাজের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য সামান্য নহে। কোর্ট অব ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে মিঃ চেষ্টার ম্যাকনটেনপ্রমুখ শিক্ষকগণের উপদেশে মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর যে কেবল ইংরেজী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা নহে, পরন্তু পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানেও তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। এই চেষ্টার ম্যাকনটেন উত্তরকালে রাজকুমার কলেজের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বাল্যজীবনেই মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের অসাধারণ মনীষা প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র, তখনই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশেষ দক্ষতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন নিয়ম ছিল যে, ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম না হইলে কোন বালকই উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না। সেই নিয়মে বাধ্য হইয়াই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মহারাজ রামেশ্বর সিংহকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সনন্দ বা সার্টিফিকেট প্রদান করেন নাই। বাল্যকালেই মহারাজ বাহাদুরের নিয়মনিষ্ঠা, কার্য্যকুশলতা, উদ্যমশীলতা, ঐকান্তিকভাবে সকল কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবার সামর্থ্য ও উৎসাহ প্রকটিত হইয়াছিল। মনস্বিতার সহিত ধৈর্য্য ও তিতিক্ষা তাঁহার চরিত্রে যে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছিল, তাহা সাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। তীক্ষ্নদর্শী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর উত্তরকালে একজন অসাধারণ মনীষী হইবেন।

মহারাজ স্যার্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলে রামেশ্বর সিংহ দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তঃপাতী বাবুয়ানা পরগণা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং আপনার ষ্টেটের তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করিতে ভালবাসিতেন। রাজকর্ম্মচারীরা বেশ ভালভাবে কাজ করেন দেখিয়া তাঁহার মনে রাজপুরুষদিগের কার্য্যপদ্ধতি শিক্ষা করিবার স্পৃহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সেই জন্য তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল ষ্টাটিউটারী সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়াছিলেন এবং প্রথমে য়্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়া পরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বুঝিলেন যে, ঐ কার্য্যে তাঁহার বিলক্ষণ দক্ষতা জন্মিয়াছে, তখন তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এই রাজকার্য্যশিক্ষার ফল সুদূরগামী হইয়াছিল; এখন দ্বারবঙ্গরাজ্যের প্রজাবর্গ তাঁহার সেই শিক্ষার সুবিধা ভোগ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেছে।

স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের কার্য্যে সরকার অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ প্রদান করেন। ইহার পর হইতেই সরকার তাঁহাকে নানারূপে সম্মানিত করিতে থাকেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে রাজাবাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন তাঁহাকে কখনও কোন দেওয়ানী আদালতে হাজির হইতে হইবে না বলিয়া সরকার তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছেন এবং এই সময় তাঁহাকে পঁচিশ জন সশস্ত্র প্রহরী সঙ্গে লইবার ক্ষমতা দিয়াছেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অগ্রজ মহারাজ স্যার্ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর লোকান্তরে গমন করিলে মহারাজ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর দ্বারবঙ্গের গদী প্রাপ্ত হন। তাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞা ও মনীষা সাধারণের অজ্ঞাত বা অপরিচিত ছিল না। সকলেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বেসরকারী সদস্যগণ মহারাজ রামেশ্বরকে পাঁচবার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুরও স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকল্পে আপনার অসাধারণী মনস্বিতা প্রযুক্ত করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নাই। তিনি যে স্বদেশভক্ত ও রাজভক্ত জনসাধারণের যোগ্য প্রতিনিধি, প্রতি কার্য্যেই তিনি তাহার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যে একজন যোগ্য জননায়ক, তাহা তাঁহার শত্রু মিত্র সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। তিনি সকল বিষয়েই নির্ভীকভাবে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পুলিস কমিশনের সদস্যরূপে তিনি যেরূপ স্বাধীন ও সংযতভাবে আপনার স্বতন্ত্র মত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, বিচার ও শাসনবিভাগের পার্থক্যসাধনের জন্য তিনি যেভাবে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার প্রতিভাপ্রদীপ্ত বুদ্ধির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন অনেক সংস্কারকার্য্যে ইনি বঙ্গের উন্নতিশীল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রকৃত নেতার কার্য্য করিয়াছেন।

দেশের লোকও যেমন মহারাজ বাহাদুরের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই তাহাদের নেতা বলিয়া স্বীকার করিয়া সম্মানিত করিতেছেন, সরকার বাহাদুরও তেমনই মহারাজের মনস্বিতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ভারত-সরকার মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরকে কাইজারী হিন্দ্ সুবর্ণপদক প্রদান করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট তাঁহাকে Knight Commander of the Most Emminent Order of

the Indian Empire উপাধি দিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে দ্বারবঙ্গের রাজগণকে সরকার বংশানুক্রমে মহারাজ বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। গত বৎসর মহারাজা বাহাদুর G. C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

আজকাল ভারতে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভারতবাসীর উন্নতির প্রধান পরিপন্থী। সেই জন্য মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর সেই বিবাদের প্রশমনকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। এই মহারাজ বাহাদুরের অনুরোধক্রমেই মহামান্য আগা খাঁ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রয়াগধামে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন-সমিতির অধিবেশন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। এলাহাবাদে যে সম্মিলন-সমিতি বসিয়াছিল, মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর সেই সভায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি বিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন; ইহাতে মুসলমানসম্প্রদায় মহারাজ বাহাদুরের উপর এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহারাজ যখন আলিগড়ে গমন করেন, তখন তথাকার মুসলমান মহোদয়গণ তাঁহাকে অত্যন্ত সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। মাননীয় আগা খাঁয়ের ন্যায় মুসলমানবর্গও মহারাজ বাহাদুরকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলন-চেষ্টায় মহারাজ বাহাদুর যেরূপ ঐকান্তিকতার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ্যসংস্থাপনের জন্যও মহারাজ বাহাদুর সেইরূপ চেষ্টা করিতেছেন। অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রভাবে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সখ্য সংস্থাপিত না হইলে হিন্দুজাতির আর কল্যাণ নাই। সেই জন্য তাহা সংস্থাপন করিতে তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন। আজকাল কুশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুর জাতিভেদসম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে, মহারাজ তাহার নিরাকরণকল্পে বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দুজাতির স্বার্থরক্ষা, হিন্দু-মুসলমানে সৌভ্রাত্রপ্রতিষ্ঠা ও হিন্দুসমাজে রাজভক্তি-বর্দ্ধনের উদ্দেশ্যেই মহারাজ বাহাদুর সমস্ত ভারতবর্ষীয় হিন্দু-দিগকে লইয়া একটি বিরাট সভা গঠিত করিতে চেষ্টা পাইয়া-ছিলেন। মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক চেষ্টা নিষ্ফলা হয় নাই। উত্তর ভারতের নানা স্থানে হিন্দু মুসলমানে মিত্রতা-সংস্থাপনের জন্য অনেকগুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, নানা সম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের মধ্যেও সখ্যসংস্থাপনের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঞ্জাব-হিন্দুসভা মহারাজ বাহাদুরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুলতানে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ বাধিয়াছিল, মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক চেষ্টাতেই তাহা প্রশমিত হয়। এই বিবাদ-প্রশমনে মহারাজ বাহাদুর সরকার বাহাদুরের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন।

লোকহিতকর কার্য্য।

মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর চিরদিনই লোক-হিতকর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আসিতেছেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁহার কার্য্য অনন্যসাধারণ। তিনি প্রজার মনের ভাব রাজাকে বুঝাইয়া দিতে এবং রাজার সহানুভূতি ও উদারতার কথা প্রজার মনে গাঁথিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। মহারাজ বাহাদুর চিরদিনই প্রকৃত "স্বদেশী"র পক্ষপাতী। লর্ড রিপণের আমল হইতেই তিনি দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। কলিকাতায় যে ইণ্ডিয়ান ষ্টোর্স সংস্থাপিত হইয়াছিল, মহা-রাজ বাহাদুর তাহারও একজন উদ্যোক্তা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের ও বাণিজ্যের সহায়তাকল্পে যে বেঙ্গল ন্যাশানাল ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইয়াছে, স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর তাহারও একজন পৃষ্ঠপোষক। তবে তিনি কস্মিন্‌কালেও ভাক্ত স্বদেশী 'বয়কটে'র সমর্থন করেন নাই; তিনি তাঁহার অসামান্য প্রজ্ঞাবলে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাজনৈতিক বিক্ষোভের সহিত দেশের শিল্পসম্পর্কিত ব্যাপার বিজড়িত করিলেই উভয় ক্ষেত্রেই তাহার ফল মন্দ হইবে। তাই তিনি আমাদের দেশের তথাকথিত নেতাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদূরদর্শী জননায়কগণ সে কথা গ্রাহ্য করেন নাই। কালে মহারাজের কথাই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। বয়কটের নাটুকেপণা হইতে যে কতকগুলি গুরুতর দোষের উদ্ভব হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

মহারাজ বাহাদুর স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী। তবে একেবারে আকাশের চাঁদ ধরিবার বাসনা কখনই তাঁহার মনে বলবতী হয় নাই। দেশের লোক যাহাতে আত্মনির্ভরতা শিক্ষা করে এবং করিবার অবকাশ পায়, মহা-রাজ বাহাদুর বরাবরই তাহার জন্য চেষ্টা ও যত্ন করিয়া আসিতেছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন গ্রামপঞ্চায়েৎ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি ইহাও লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, গৃহ-বিবাদ ও বৈষয়িক বিসংবাদই বঙ্গীয় ভূস্বামীদিগের অধঃপতনের একটি প্রধান হেতু। সেই জন্য তিনি স্বয়ং উদ্যোগ করিয়া কলিকাতায় "জমীদারী পঞ্চায়েৎ" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জমীদারী পঞ্চায়েৎ দ্বারা দেশের অনেক শুভকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অনেক গৃহ-বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশের লোকের যদি কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, উদ্যোগশীলতা ও প্রকৃত স্বার্থবোধ অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই পঞ্চায়েতের দ্বারা আরও অনেক গৃহ-বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারিত।

গঙ্গা রক্ষা।

মহারাজ বাহাদুরের হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যেই দেদীপ্যমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সরকারের ক্যানাল স্কিম বা খালের ব্যবস্থা অনুসারে হরিদ্বারে একটা বাঁধ বাঁধা হয়। ঐ বাঁধের নাম নারোরা বাঁধ। বাঁধের জন্য গোমুখী হইতে গঙ্গার বারিধারা গঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইবার বাধা ঘটে। এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া মহারাজ বাহাদুর এ কথা সরকারের গোচর করেন, রাজপুরুষদিগকে অনুরোধ করিয়া এ বিষয়টির আলোচনা করিবার জন্য এক সমিতি আহ্বান করেন এবং অবশেষে লর্ড হার্ডিং বাহাদুরকে অনুরোধ করিয়া সেই বাঁধ উঠাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং এখন গোমুখী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত গঙ্গাবারি অবাধে প্রবাহিত হইতেছে। এই ব্যাপারে সমস্ত হিন্দুসমাজ মহারাজ বাহাদুরের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ হইয়াছেন। হরিদ্বারের সাধুমোহান্তগণ সেই জন্য মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরকে "দ্বিতীয় ভগীরথ" বলিয়া সাধুবাদ করিয়াছিলেন। জনসাধারণের হিতকরব্যাপারে মহারাজ বাহাদুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি আছে, তাহা আমাদের বহুদর্শী কুশাগ্রবুদ্ধি লর্ড হার্ডিং বাহাদুরও স্বীকার করিয়াছেন।

হিন্দুত্বের রক্ষা।

মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর পরম হিন্দু, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ। তিনি বুঝিয়াছেন যে, হিন্দুর আচার, অনুষ্ঠান, হিন্দুর সভ্যতা প্রভৃতি এক সময়ে হিন্দুজাতিকে মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছিল। হিন্দুর প্রকৃত ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-সম্পর্কিত অনুষ্ঠান ও হিন্দুর সভ্যতা ক্রমশঃ নানা কারণে হীন হইয়া পড়াতে আজ হিন্দুজাতির অশেষ দুর্গতি ঘটিয়াছে। এখন সেই প্রাচীন ধর্ম্ম ও সভ্যতা বিশুদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই হিন্দুজাতির গৌরবভাস্কর আবার পূর্ণ জ্যোতিঃতে ভারতগগনে সমুদিত হইবে। আজ পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে হিন্দুজাতির প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ, দর্শন ও সাহিত্য উপেক্ষিত— হিন্দুর প্রাচীন সভ্যতা অনাদৃত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি মহারাজ বাহাদুর বুঝিয়াছেন যে, হিন্দুর সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির প্রচার ও তৎসম্বন্ধে আলোচনার এবং উপদেশ প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিলে আধুনিক হীনাবস্থ হিন্দুরা তাহাদের পবিত্র ধর্ম্মের ও প্রাচীন সভ্যতার গৌরব অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং সেই মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য মহারাজ বাহাদুর অন্যান্য কতকগুলি রাজন্য ও বরেণ্য লোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ভারতের নানা স্থানে এই শ্রীভারতধর্ম্মমহামণ্ডলের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। গোবর্দ্ধন মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছেন। এক কথায় বলিতে কি, মহারাজ বাহাদুর ধর্ম্মমহামণ্ডলের একজন একনিষ্ঠ সেবক, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

শিক্ষাবিস্তার।

দ্বারবঙ্গেশ্বর শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। তাঁহার বিশাল রাজ্যের মধ্যে অনেক বিদ্যালয় আছে। অনেক বিদ্যালয়ের জন্য মহারাজ বাহাদুর বেশ সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ইহা ভিন্ন মাতাজী তপস্বিনী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার মহাকালী পাঠশালা প্রধানতঃ মহারাজ বাহাদুরের অর্থসাহায্যে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই বিদ্যালয়ে হিন্দুবালিকাদিগের সুশিক্ষাদানের সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

মহারাজ স্যার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ঐ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারনির্ম্মাণে ব্যয়িত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তিনি স্বয়ং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং ইহার উন্নতিকল্পে ভারতের সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। এ বিষয়ে সুধী ও মনস্বী পণ্ডিত শ্রীযুত মদনমোহন মালবীয় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুইজনেই এই বিষয়ে অকাতরে পরিশ্রম করিয়াছেন। আজ ইঁহাদের যত্নে হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

ইহা ভিন্ন মহারাজা বাহাদুরের দানও অসাধারণ। এ পর্য্যন্ত তিনি সৎকার্য্যে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার দানের পরিমাণ করাও কঠিন। হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি, আতুরাশ্রম, দেবায়তনপ্রতিষ্ঠা, চতুষ্পাঠী, মুক্তাব সংস্থাপন প্রভৃতি জনহিতকর কার্য্যে যে অকাতরে কত অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিলে মনে হয়, তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাঁহার ন্যায় পুণ্যাত্মা জগতে দুর্লভ।

ভারতে শিল্প-ব্যবসা।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

মানুষের চিন্তার মধ্যে অন্নচিন্তাই সর্ব্বপ্রধান। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ সহজাতসংস্কারবশে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করে। এই চেষ্টার ফলেই মানুষ ভূমি চিরিয়া শস্য উৎপাদনের কৌশল হইতে আরম্ভ করিয়া, কলকারখানা সংস্থাপন পর্য্যন্ত যত অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে এ চিন্তাকে দুশ্চিন্তা বলা যায় না। কেন না, আমরা যাহাকে "সভ্যতা" বলি এবং যে সভ্যতার গর্ব্ব করি, এই চিন্তাই প্রধানতঃ সেই সভ্যতার উৎপাদক। আবার এই সভ্যতায় মানুষের অভাব বর্দ্ধিত হয় এবং সেই সব অভাব দূর করিবার জন্য মানুষ উদ্ভাবনী শক্তির অনুশীলন করিয়া "সভ্যতা"র সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করে।

অন্নচিন্তার দংশনমুক্ত হইবার জন্যই মানুষ দ্রব্য উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করে। উৎপাদনের উপাদান তিনটি :—(১) ভূমি, (২) শ্রম, (৩) মূলধন। ভূমি হইতেই দ্রব্য উৎপন্ন হয়—সেই দ্রব্য বা সেই দ্রব্যে প্রস্তুত অন্য দ্রব্য মানুষ ব্যবহার করে। কিন্তু মানুষের শ্রম ব্যতীত ভূমি হইতে দ্রব্য উৎপন্ন করা অসম্ভব। আবার ভূমির জন্য ও শ্রমের জন্য মূলধনের প্রয়োজন। ভূমির মূল্য বা কর আছে; শ্রমজীবী যত দিন পণ্য উৎপন্ন করিবে, ততদিন তাহার আহারের ব্যবস্থা করিতে হয়। সুতরাং মূলধন ব্যতীত চলে না। তাই উৎপাদনের উপকরণ :—(১) ভূমি, (২) শ্রম, (৩) মূলধন। বর্ত্তমানকালে "ভূমি" অর্থে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগ বা অভ্যন্তর বুঝায় না; পরন্তু সমগ্র পৃথিবী, বাতাস, সাগর এবং উত্তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিও বুঝায়। ডিউক অব্ আরগাইল প্রভৃতি এই মতের প্রবর্ত্তক।

ভূমিতে শ্রম ও মূলধন প্রযুক্ত করিয়া প্রথম যে ব্যবসার সৃষ্টি হয়, তাহাই কৃষি। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় সব দেশই কৃষিপ্রাণ থাকে। প্রথমে দেশমধ্যেই দেশের লোকের খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন করা হয়, বাণিজ্য তাহার পর প্রবর্ত্তিত হয়। বাণিজ্যও প্রথমে দেশমধ্যেই বদ্ধ থাকে। অন্তর্ব্বাণিজ্য ক্রমে বহির্ব্বাণিজ্যে পরিণতিলাভ করে। সে পরিণতি সর্ব্বত্রই সময়সাপেক্ষ এবং সেই বহির্ব্বাণিজ্য আবার কালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রসার পায়।

কৃষি সমাজবদ্ধ মানুষের সর্ব্বপ্রথম ব্যবসা। যে ইংলণ্ড আজ শিল্পপ্রধান হইয়া দেশের লোকের খাদ্যের অধিকাংশের জন্য পরমুখাপেক্ষী, সে ইংলণ্ডও প্রথমে কৃষিপ্রধান ছিল। যে আমেরিকা আজ ব্যবসার বাজারে প্রাধান্যলাভের এত চেষ্টা করিতেছে, সে আমেরিকা কৃষিজাতদ্রব্যের লাভ হইতেই শিল্পব্যবসার পত্তন করিয়াছে। যে জার্ম্মাণী ব্যবসার বাজার একচেটিয়া করিবার কল্পনা করিতেছিল, সে জার্ম্মাণীও ৪০ বৎসর পূর্ব্বে কৃষিপ্রধান ছিল। এ সব দেশই ক্রমে শিল্পপ্রধান হইয়াছে। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, কৃষির ফল সকল সময়েই অনিশ্চিত। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি, পঙ্গপাল বা শুঁয়াপোকা কৃষকের সকল শ্রম ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। তাই কৃষিপ্রধান দেশে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। রুসিয়ার কথায় রুসিয়ার রাজস্বসচিব ডিউইট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, দেশ যত দিন কৃষিপ্রাণ থাকিবে, তত দিন দেশে মধ্যে মধ্যে অজন্মায় দুর্ভিক্ষ হইবেই। য়ুরোপে ও মার্কিণে যে আজকাল আর দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যায় না, তাহার কারণ তাহারা আর কৃষিপ্রাণ নহে, পরন্তু শিল্পপ্রধান। এইটুকু বুঝিয়া—অনেক স্থলে ঠেকিয়া শিখিয়া য়ুরোপে ও মার্কিণে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রাণ। তাই ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে—বিশাল দেশের কোন না কোন স্থানে দুর্ভিক্ষদানবের অত্যাচার অনুভূত হইতেছে। এই অবস্থায় দেশের লোক সর্ব্বদা সশঙ্কিত—সরকার সর্ব্বদা বিব্রত; রাজস্বব্যবস্থা স্থির রাখা কষ্টসাধ্য। সেইজন্যই দেশের লোক ও সরকার উভয়পক্ষই এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

ভারতবাসীরা সভ্য—এই ভারতে আর্য্যসভ্যতাই প্রবল—তাহার সঙ্গে সেমিটিক সভ্যতাও মিশিয়াছে। আজকাল আবার এই ভারতেই প্রাচীর ও প্রতীচীর ভাবপ্রবাহ প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গাযমুনাপ্রবাহের মত মিলিত হইয়াছে। যে দেশ সভ্যতার সোপানে আরোহণ করে, কৃষিপ্রাণতার বিপদ সে দেশের নিকট আর অজ্ঞাত থাকে না; বিশেষ, সভ্যতায় অভাবও বৃদ্ধি পায়। সেই জন্য দেশে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিস্তার হয়। ভারতেও তাহাই হইয়াছিল। রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্যের সময় ভারতীয় পণ্য সে সাম্রাজ্যে রপ্তানী হইত। প্লীনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষ পণ্য যোগাইয়া বৎসর বৎসর রোম সাম্রাজ্য হইতে যে অর্থ লইয়া যায়, আজকালকার হিসাবে তাহা ৬৮ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা।

বাইবেলেও ভারতীয় পণ্যের উল্লেখ আছে।

তিন হাজার বৎসর ধরিয়া যে দেশের পণ্য বিদেশে আদৃত হইয়াছে—দেশের সমৃদ্ধিবৃদ্ধির উপায় করিয়াছে, সে দেশের সামাজিক অবস্থা যে শিল্পপ্রতিষ্ঠার ও শিল্পের উন্নতির বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে জাতিভেদ বিদেশীদিগের বিস্ময়ের ও ঘৃণার উদ্রেক করিয়াছে ও

করিতেছে, সেই জাতিভেদ ভারতে শিল্পোন্নতির সহায় হইয়াছে। এক এক সম্প্রদায় এক এক কাযে নিযুক্ত থাকিয়া তাহাতেই অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিত। এক জাতির লোক অন্য জাতির ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারিত না। তাহাতে শিল্পিসঙ্ঘ সংগঠিত হইত—শিল্পীর অধিকার সুরক্ষিত হইত। পুত্র পিতার নিকট শিক্ষা পাইত—শিক্ষানবীশকে অর্থ দিয়া কায শিখিতে হইত না—শিক্ষাও ভাল হইত। এই জাতি অনুসারে ব্যবসানির্দ্দেশের প্রথায় যে কায হইয়াছে, য়ুরোপের ট্রেড গিল্ডেও সে কায হয় নাই। ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা আর কোন দেশে হয় নাই; গ্রীস, মিশর, রোম, কেহই এমন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। বোধ হয়, সেইজন্যই—পুরুষানুক্রমে একই কাযে রত থাকিয়া ভারতের শিল্পী যে শিল্পনৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, তাহাও আর কোন দেশের শিল্পী লাভ করিতে পারে নাই। সকল দেশেই অসাধারণ প্রতিভাশালী শিল্পীর আবির্ভাব হইয়াছে—তাহাদের কীর্ত্তি কালজয়ী হইয়াছে; কিন্তু কুত্রাপি ভারতের মত শ্রমশীল, কার্য্যরত শিল্পিসম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। ভারতীয় শিল্প যে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও আজও বিলুপ্ত হয় নাই—কলকারখানার প্রবল প্রতিযোগিতায়—সৌন্দর্য্যজ্ঞানহীন সস্তার ভক্তদিগের অনাদরেও মরিয়াও মরিতেছে না—এই জাতিভেদের সামাজিক ব্যবস্থা তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ।

ভারতের প্রজাস্বত্বে জমীতে প্রজার যে অধিকার, তাহাও যে শিল্পবিস্তারের অনুকূল, সে কথা স্যার জর্জ্জ বার্ডউড তাঁহার ভারতীয় শিল্পবিষয়ক পুস্তকে বুঝাইয়াছেন।

এ দেশে সামাজিক ব্যবস্থাও যে শিল্পবিস্তারের পক্ষে অনুকূল, তাহাতেও আর সন্দেহ নাই। স্যার জর্জ্জ বার্ডউড ভারতীয় গ্রামের বর্ণনায় এই ব্যবস্থার কথা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে পথ গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে—তাহার বাহিরে উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বসিয়া কুম্ভকার চক্র আবর্ত্তিত করিয়া পাত্র প্রস্তুত করিতেছে। গ্রামের গৃহগুলির পশ্চাতে গাছে যন্ত্র বাঁধিয়া দিয়া তন্তুবায় নীল, রক্ত, স্বর্ণ বর্ণ মিলাইয়া কাপড় বুনিতেছে; সূতার উপর গাছের ফুল পড়িতেছে। পথের পার্শ্বে কাঁশারী গৃহস্থের ব্যবহারের পাত্র নির্ম্মাণ করিতেছে। ধনীর অলিন্দে বসিয়া টাকা ও মোহর গলাইয়া স্বর্ণকার বরবর্ণিনীদিগের বরাঙ্গের শোভা অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে। সে তাহারই চারিদিকে গাছের পাতার ও ফুলের আদর্শে অলঙ্কার গড়িতেছে—আর কখন কখন গ্রামের প্রান্তে পদ্মপুকুরের পাহাড়ে মন্দিরের গাত্রে ক্ষোদিত চিত্রের অনুকরণ করিতেছে। ইহাই শিল্পীর স্বর্গ—সে সন্তুষ্টচিত্তে আপনার স্বজনগণের সাহায্যে পণ্য প্রস্তুত করে। সে কলের মজুর নহে,—শিল্পী; তাহার প্রতিভা কলের ইঞ্জিনীয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া বিকাশে বাধা পায় না—পরন্তু বিকাশের অবসরই পায়; সে তাহার পরিবারের মধ্যে বাস করে—সে গৃহস্থ; সে সমাজের এক জন। ইহাতে যে সমাজের কত কল্যাণ হয়, তাহা বিলাতের ব্যারিকবদ্ধ মন্থপ শ্রমজীবিগণের কথা স্মরণ করিলেই বুঝা যায়।

এইরূপ অনুকূল অবস্থায় পুষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই ভারতীয় শিল্প যে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাতে সে শিল্প অনায়াসে তুরাণীয়, দ্রাবিড়ীয়, গ্রীক, মোগল, সব আদর্শেরই উপযোগী ভাগ আত্মসাৎ করিয়া আত্মপুষ্টি সংসাধন করিতে পারিয়াছিল—কিছুতেই আপনার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। শিল্প যখন বৈশিষ্ট্য হারাইয়া কেবল অনুকরণে প্রবৃত্ত হয়, তখন হইতে তাহার অবনতি আরব্ধ হয়, আর তাহারই ফলে পরিণামে শিল্পের সর্ব্বনাশ হয়।

ভারতের বস্ত্রব্যবসায়ে এক দিন ভারতে প্রভূত ধনাগম হইত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে কার্পাসশিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয় নাই। ভারত হইতে এই শিল্প কবে যে মিশরে ও আসিরিয়ায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহা জানা যায় না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে য়ুরোপে তূলার চাষ হইত না—তখন তূলায় কাগজ প্রস্তুত হইত—কাপড় হইত না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই ইটালীতে ভারতীয় বস্ত্রের অনুকরণে বস্ত্রবয়ন আরব্ধ হয়; ইংলণ্ডে সে ব্যবসার পত্তন সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দেও ভারতীয় তূলার কাপড়ের অনুকরণে ম্যাঞ্চেষ্টারে যে কাপড় প্রস্তুত করা হইত, তাহা পশমী। ভারতীয় পণ্যের প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়া স্বদেশে এই শিল্পের প্রতিষ্ঠা করা যে অসম্ভব, ইংলণ্ড তাহা বুঝিয়াছিল। কারণ, সকল শিল্পেরই উন্নতিসংসাধন—প্রতিযোগিতার উপযোগী করিয়া বর্দ্ধন—সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। সেইজন্যই অবাধবাণিজ্যের অবাধ পক্ষপাতী বার্ত্তাশাস্ত্রবিদ্ মিলও দেশে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার সময় বিদেশী পণ্যের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া নূতন শিল্পের সাহায্যদানের পক্ষপাতী। ইংলণ্ডকেও আইন করিয়া দেশে ভারতের বস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে ১৭০০ খৃষ্টাব্দের কথা। ঢাকাই মসলিনের কথা সকলেই অবগত আছেন। সেরূপ বস্ত্র জগতে আর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় নাই। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেও ডাক্তার টেলার লিখিয়াছিলেন, ঢাকায় ৩৬ প্রকারের কাপড় হয়। এখন সে ইতিহাসের কথা। কিন্তু কেবল সূতী-কাপড়ে নহে, রেশমী-কাপড়েও বড় ব্যবসা চলিত। রেশমী-কাপড়ের জন্যই কাশিমবাজারে ইংরাজের কুঠীর প্রতিষ্ঠা। দেখা গিয়াছে, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে মালদহের সেখ ভীক নামক এক জন বণিক পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ায় তিন জাহাজ মালদহী কাপড় বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছিলেন। আজ বিদেশী কাপড়ে যে দেশের লোকের লজ্জারক্ষা হয়, সে দেশের লোকের কাছে এ সব কথা স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হয় বটে। কিন্তু প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ অর্থনীতিবিদ্ লিষ্ট বলিয়াছেন, যদি ভারতের সূতী ও রেশমী কাপড় বিলাতে স্বচ্ছন্দে যাইতে দেওয়া হইত,

তবে বিলাতের সুতার ও রেশমের কাপড়ের ব্যবসার সর্ব্বনাশ সংসাধিত হইতে বিলম্ব হইত না।

এ দেশে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রজাপালন, ব্যবসায়ী ইংরাজের কল্পনায় সমুদিত হইবার পূর্ব্বে ব্যবসা করিয়া ধনার্জ্জনই যখন এ দেশে ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল, তখন—ভারতবর্ষ বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইবার পূর্ব্বে—ইংলণ্ড ব্যবসাসম্বন্ধে যে নীতির অনুসরণ করিতেন, তাহা অবশ্যই ভারতের শিল্পোন্নতির পক্ষে অনুকূল ছিল না। কোন সরকার একটা নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করিলে তাহার পরিবর্ত্তন করা সহজ হয় না। কারণ সেই নীতি-পদ্ধতি অন্যান্য বিভাগেও সরকারের নীতিপদ্ধতিতে প্রভাব সঞ্চারিত করিয়া সকল বিভাগেই কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন করে। প্রমাণস্বরূপ এ দেশের রেলপথের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ দেশে রেলপথে যে মূলধন ব্যয়িত হয়, তাহাতে লাভের পরিমাণ অতি সামান্য; কিন্তু সেচের খালে শতকরা ৮ বা ৯ টাকা লাভ হয়। তথাপি রেলপথবিস্তারে সরকারের যেরূপ উৎসাহ লক্ষিত হয়, সেচের খালখননে সেরূপ উৎসাহ দেখা যায় না। আবার অন্যান্য দেশে রেলপথ অন্তর্ব্বাণিজ্যের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও ভারতে বহির্ব্বাণিজ্যের সুবিধাই তাহার লক্ষ্য। এ সব পুরাতন নীতির ফল।

সরকার এ সকলই বুঝেন। দেশে শিল্পের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা না হইলে—দেশের লোক কৃষিপ্রাণ থাকিলে—পুরাতন নীতিপদ্ধতির পরিবর্ত্তন না হইলে যে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না, সরকার তাহা বুঝেন। সেই জন্যই সরকার এ দেশের শিল্পের অবস্থা বিবেচনা করিয়া নীতিপদ্ধতি সংস্কারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন—সেই জন্যই বিলাতের ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থহানি না করিয়া এ দেশে "স্বদেশী" শিল্পের যত দূর সাহায্য করা সম্ভব, সরকার তাহা করিয়া থাকেন। সরকারী দপ্তরে সরকারের অনুসন্ধানফলে যে সব বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে, সে সকল হইতে ব্যবসায়ীদিগের বিশেষ উপকার হইতে পারে।

বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সরকার মিষ্টার কলিনকে বাঙ্গালার শিল্পের অবস্থা দেখিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার পর বাঙ্গালার নানা শিল্পসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া যে সব সচিত্র বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকল বিশেষ পরিশ্রমের ফল। প্রস্তরশিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া লৌহশিল্প পর্য্যন্ত নানা শিল্প-সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। বাঙ্গালার কৃষিবিভাগ পরীক্ষাক্ষেত্র স্থাপিত করিয়া—সরকারী গোলা হইতে ভাল বীজ দিয়া—নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া কৃষককে সাহায্য করিতে সচেষ্ট। আবার বাঙ্গালার মৎস্যের চাষ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য সরকার স্যার্ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তকে নিযুক্ত করিবার পর এই কাযের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার পর পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইলে মিষ্টার কামিং পশ্চিমবঙ্গের ও মিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত পূর্ব্ববঙ্গের শিল্পসম্বন্ধে সন্ধান করিয়া দুইখানি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। যাহাতে সেগুলির অধিক প্রচার হয়, সেই জন্য সে সব পুস্তিকা যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে বিক্রীতও হইয়াছিল।

তাহার পর দশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই মিষ্টার সোয়ান আবার বাঙ্গালার শিল্পের অবস্থার আলোচনা করিয়া বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছেন।

জার্ম্মাণযুদ্ধে এ দেশে বিদেশী মালের আমদানী কমায় দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার শুভযোগ উপস্থিত বুঝিয়া, সরকার প্রথমে এক যাযাবর প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া, বড় বড় সহরে এ দেশের পণ্য দেখাইয়া, সে সকলের বিজ্ঞাপনদানের কায করিয়াছিলেন। তাহার ফল দেখিয়া কলিকাতায় একটি স্থায়ী প্রদর্শনী স্থাপিত হইয়াছে। উৎপাদকের পণ্য যাহাতে ক্রেতার পক্ষে সহজলভ্য হয়, তাহাই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। এই প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাকালে লর্ড কার্ম্মাইকেল ইহার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, এ দেশে এমন অনেক জিনিষ প্রস্তুত হয়, যে সকলের সংবাদ পাইলেই লোক বিদেশী জিনিষ ফেলিয়া দেশী জিনিষ কিনিবে।

ইহার পর সরকার ভারতের শিল্পব্যবসার বিশেষ অনুসন্ধান জন্য একটি কমিশন বসাইয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আয়ারলণ্ডের শিল্পের দুর্দ্দশাহেতু যেমন কমিশন বসান হইয়াছিল, এবার ভারতে শিল্পের দুর্দ্দশাপনোদনকল্পে তেমনই কমিশন দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইংলণ্ড অবাধ-বাণিজ্যের ভক্ত বলিয়া এত দিন ভারতে ভারতের উপযোগী সংরক্ষণ-নীতির প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু এবার যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, যে ইংলণ্ড খাদ্যদ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষিতা-হেতু অবাধবাণিজ্যের স্রোতে খাদ্যদ্রব্যের আমদানী করিয়া সে সকলের মূল্য কম রাখিয়াছে, অবাধবাণিজ্যে সে ইংলণ্ডেরও বিপদ ঘটিতে পারে। তাই যুদ্ধের পর ইংলণ্ডের বাণিজ্যনীতিতেও পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়াছে। এই সময় ভারতে শিল্পের অবস্থার আলোচনাজন্য এই কমিশন নিয়োগে ভারতবাসী আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে। ভারতে উপকরণের অভাব নাই—ভারতবর্ষ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া বিদেশের কল-কারখানার পণ্যের উপকরণ যোগাইয়া আসিতেছে। ভারতে শ্রমজীবীর পারিশ্রমিকের হারও অপেক্ষাকৃত অল্প। ভারতে পণ্যবিক্রয়ের বাজারও আছে। আবার ভারতবাসী শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় যে সরকারের সামান্য চেষ্টাতেই—সংরক্ষণনীতি অবলম্বিত হইলেই—এ দেশের কৃষিপ্রাণতা ঘুচিয়া যাইতে পারে।

মূর্খের ধন ও যৌবন বিপদ।

কৃষি।

কৃষিই ধনোৎপাদনের প্রধান উপায়। অন্য উপায়ে ধনাগম হইতে পারে, কিন্তু কৃষির উপরই আর সকল পথ নির্ভর করে। কৃষি না থাকিলে শিল্প থাকিতে পারে না। প্রায় চৌদ্দ আনা শিল্প কৃষির মুখাপেক্ষী। থ'লে, ব্যাগ, ক্যাম্বিস প্রভৃতি শিল্পজ পণ্য। এই থ'লে, ব্যাগ, ক্যাম্বিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পাট, শণ প্রভৃতির প্রয়োজন। কৃষি বা চাষবাস না হইলে পাট জন্মে না। পাট না জন্মিলে থ'লে, ব্যাগ, ক্যাম্বিস তৈয়ার হইবে কোথা হইতে? যদি একবার একেবারেই পাট ও শণ না জন্মে, তাহা হইলে সে বৎসর পাট শণ হইতে প্রস্তুত পণ্য আর প্রস্তুত হইতে পারে না। সেইরূপ ইক্ষু হইতে চিনি, কার্পাস হইতে কাপড়, কাঠ হইতে আস্‌বাব প্রভৃতি শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত হয়। ইক্ষু, কার্পাস, কাঠ প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য। সুতরাং ধন উপার্জ্জনের হিসাবে শিল্প অধিক লাভজনক ও নিশ্চিত ফলপ্রদ হইলেও, কৃষিই উহার বনিয়াদ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কৃষিবিদ্যা কাহাকে বলে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। জমী চষিয়া বীজ ছড়াইয়া শস্য-বৃক্ষাদি উৎপাদিত করাকেই কৃষি বলে। কৃষিই মানবজাতির খাদ্যসংগ্রহের একটি প্রধান উপায়। ভারতবাসীর খাদ্য প্রধানতঃই কৃষির দ্বারাই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধান, গম, দাইল, তরকারী, শাকসব্জী, সমস্তই কৃষিজ পণ্য। য়ুরোপের মাংসাশীজাতিরা পশুপালনও কৃষির অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন, আমাদের দেশের লোকেরা তাহা মনে করেন না। যাহা হউক, আমরা পশুপালনকে স্বতন্ত্র বিষয় বলিয়াই গণ্য করিব।

য়ুরোপীয়রা বলিয়া থাকেন যে, মানুষ অসভ্য ও বন্য অবস্থায় পশুহনন করিয়াই ক্ষুধার জ্বালা জুড়াইত। ক্রমে তাহারা এক স্থানে বসবাস করিতে শিখিলে, কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত করে। প্রথম অবস্থায় কৃষিবিদ্যা অতি সামান্য ব্যাপার মাত্র ছিল। য়ুরোপীয়দিগের ধারণা যে, মিশরের নীল নদীর তীরেই মানবজাতি প্রথমে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রতি বৎসর নীল নদীর জল উদ্বেল হইয়া সমস্ত তটভূমি বহুদূর পর্য্যন্ত প্লাবিত করিয়া ফেলিত, ঐ প্লাবিতা ভূমির উপর অনেকটা পুরু পলি পড়ে, বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঐ অঞ্চলের লোকেরা, জমীর জল সরিয়া গেলে ঐ নরম পলি সামান্যমাত্র উস্কাইয়া দিত এবং সেইরূপ সামান্যভাবে কর্ষিতভূমির উপর বীজ ছড়াইয়া দিত। জমীতে আগাছা জন্মিলে সেই আগাছাগুলিও মারিয়া ফেলিত; শেষে শস্য সুপক্ক হইলে, তাহা কাস্তে দিয়া কাটিয়া আনিয়া বাড়ীতে ঝাড়িত। মিশরে কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইব্যর বহু পূর্ব্বে ভারতে কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, কয়েকজন হিন্দু ভারত হইতে মিশরে গমন করিয়া, তথাকার সভ্যতাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। সেইজন্যই মনে হয় যে, মিসর-বাসীরা ভারতবাসীর নিকট হইতে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। এখন সে ইতিহাস বিস্মৃতির তমোময় গুহায় আত্মগোপন করিয়াছে। সুতরাং কৃষির ইতিহাস আলোচনা এখন অনাবশ্যক।

কৃষির প্রারম্ভকালের ইতিহাস এখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকিলেও, বর্ত্তমান সময়ে কৃষিবিদ্যার যে যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ দিকে দিকে দেদীপ্যমান। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে এখন কৃষি একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। এই উন্নতির ফলে পূর্ব্বে ফ্রান্স বা জার্ম্মাণীতে যে ভূমিতে বিঘাকরা দশ মণ গম জন্মিত, এখন সেই ভূমিতে বিঘাকরা পঁচিশ মণ গম জন্মিতেছে। কৃষির এই উন্নতি নিতান্তই আবশ্যক। একটা কথা আছে, যেখানে একগাছি তৃণ জন্মে, সেইখানে যে দুইগাছি তৃণ জন্মাইতে পারে, সে মানবজাতির যত উপকার করে, এত উপকার আর কেহই করিতে পারে না; য়ুরোপ ও মার্কিণ কৃষির উন্নতিবিধান করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে সে উপকারসাধন করিয়াছেন। আমাদের দেশে সে উপকার বিশেষভাবে সাধিত হয় নাই। আমাদের দেশে কৃষির পুরাতন ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। সুতরাং জমীর ফসল যাহাতে বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হয় নাই। ইহাতে আমাদের যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সমগ্র ভারতে প্রায় বিশ কোটী বিঘা জমীতে ধানের চাষ হয়; যদি চাষের উন্নতিসাধন দ্বারা বিঘাপ্রতি দেড় মণ ধানের ফসল বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে এই ভারতেই ত্রিশ কোটী মণ অধিক ধান জন্মে। ইহাতে যে কত সুবিধা হয়, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধও বুঝিতে পারে। প্রায় বারো কোটী বিঘা ভূমিতে গম জন্মে,—এই বারো কোটী বিঘা জমীর উন্নতি করিলে ইহার ফলন যে দ্বিগুণ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।

সুতরাং কৃষির উন্নতির দ্বারা ভারতের যে কত দূর উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে দেশে প্রায় শতকরা আশী জন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভর করে, সে দেশের কৃষির উন্নতির জন্য জনসাধারণ ও জমীদারদিগের পক্ষ হইতে তেমন চেষ্টা হয় না। ইহাই বিস্ময়ের বিষয়।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ বলেন যে, শিল্পোৎপাদনে তিনটি বিষয় নিতান্ত আবশ্যক। ঐ তিনটি—ক্ষেত্র, শ্রম ও মূলধন।

আবার আজকাল কেহ কেহ ইহাতে দক্ষতাও যোগ দিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, কৃষিতেও এই বিষয়চতুষ্টয় একান্ত আবশ্যক। ইহা ভিন্ন কৃষি যেমন একটি বিশেষ বিভাগ, তেমনই ইহাতে আরও অতিরিক্ত চারিটি বিষয় নিতান্ত আবশ্যক। সেই চারিটি বিষয় এই—মৃত্তিকা, বীজ, সার ও জলবায়ু। পাঠক জানেন যে, মৃত্তিকার উপরই চাষবাসের ফল প্রভৃত পরিমাণে নির্ভর করে। সাহারার ন্যায় নিরচ্ছিন্ন বালুকাবিস্তারে লাঙ্গল দিয়া শস্যের বীজ ছড়াইলে ফসললাভের কোন আশাই থাকে না। আবার সকল প্রকার মাটিতে সকল রকম ফসল ফলে না। সুতরাং মাটির দোষগুণের উপর কৃষির বৈফল্য ও সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। দ্বিতীয় প্রয়োজন—বীজ। বীজ যত ভাল হয়, ফসলও তত ভাল হয়। কৃষির তৃতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় —সার। জমীতে বিবেচনাপূর্ব্বক সার দিতে পারিলে, উহাতে ফসলের যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারা যায়। জমীতে কিরূপ সার দিলে কোন্ ফসল অধিক উৎপন্ন হয়, পাশ্চাত্যখণ্ডে তাহা এখন একটা বিরাট বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলও এখন অত্যন্ত বিস্ময়কর হইয়াছে। সার দিয়া বালুকাবহুল মরুকান্তারেও নন্দনের সুষমা বিকাশ করা হইতেছে! সেইজন্য সারপ্রদান ব্যাপারটা কৃষিবিদ্যার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জলবায়ুর উপরও কৃষির সাফল্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, শীতপ্রধান দেশে যে সকল ফসল সহজে জন্মে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সে সকল ফসল উৎপন্ন করা অত্যন্ত কঠিন ও নিতান্ত ব্যয়সাধ্য। কাশ্মীরের বনে বাগানে স্বচ্ছন্দজাত বৃক্ষে যেমন আপেল জন্মে, বাঙ্গালার মাঠে তেমন আপেল উৎপাদন করা অসম্ভব। কৃষিতে জলের ও রৌদ্রের বিশেষ প্রয়োজন; জলের অভাবে মাঠে শস্য শুকাইয়া যায়, ইহা সকলেই জানেন। তবে সেচের দ্বারা অনেক সময় অনাবৃষ্টির অসুবিধা কতকটা দূরীভূত করা যায়। কিন্তু অতিবৃষ্টির প্রভাব প্রতিহত করা অনেকটা কঠিন। দেশবিশেষে কৃষির উন্নতি করিতে হইলে সেই দেশের জলবায়ুর কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হয়। ইহা ভিন্ন সকল কাজেই দক্ষতা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা কৃষকদিগকে সাধারণতঃ 'চাষা' বলিয়া উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করিয়া থাকি, কিন্তু উহা আমাদের মূর্খতারই পরিচায়ক। কৃষকরা যে কাজ করে, তাহাতে তাহাদের বিশেষ জ্ঞানের ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইয়া থাকে। য়ুরোপে কৃষাণগণ বিশেষ সম্মানিত; তথায় কৃষিবিদ্যা সামান্য বিদ্যা বলিয়া গণ্য নহে; দেশের বড় বড় মনস্বী ব্যক্তিগণ তথায় কৃষিবিদ্যার উন্নতি-সংসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। তথায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে হইলে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশের লোক ইহা বুঝেন না বলিয়া আমাদের এত দুর্গতি। অবশ্য আমরা একথা বলি না যে, য়ুরোপীয় কৃষিবিদ্যা এ দেশে হুবহু আমদানী করিতে পারিলেই আমাদের দেশের কৃষির উন্নতি হইবে। এক দেশের প্রথা অন্য দেশে অন্ধভাবে অনুকরণ করিলে, তাহাতে কখনই সুফল ফলিতে পারে না। ইংলণ্ডের জলবায়ু ও ভারতের জলবায়ু ঠিক একরূপ নহে, ইংলণ্ডের মৃত্তিকার সহিত বাঙ্গালার মৃত্তিকায় প্রভেদ অনেক। ইংলণ্ডের সামাজিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত বঙ্গদেশের সামাজিক ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ বৈসদৃশ্য আছে। এরূপ ক্ষেত্রে বাঙ্গালায় ইংলণ্ডের কৃষিপদ্ধতি হুবহু আমদানী করিলে কোন ফল হইবে না। ডাক্তার ভেল্‌কারের ন্যায় কৃষিবিদ্যাবিশারদও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, ইংরেজ, মার্কিণ, জার্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি য়ুরোপীয় জাতিরা তাহাদের দেশে কৃষিবিদ্যার উন্নতিসাধনের জন্য অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সহিত আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়োগ করিতেছেন, আমাদেরও সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা পরীক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও উপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

জমীই কৃষির প্রধান অবলম্বন। জমী না হইলে কৃষি হইতেই পারে না। জমী যত ভাল হয়, কৃষিজাত ফসল ততই ভাল হইতে থাকে। সেইজন্য ভাল জমীর খাজনা অধিক হইয়া থাকে এবং ভাল জমী পাইবার জন্য সকল চাষীই ব্যস্ত হইয়া থাকে।

জমী ভাল কি মন্দ, তাহা জমীর মৃত্তিকার উপরই নির্ভর করে। নানা রকমের মাটি আছে। এক রকমের মাটিতে কেবল বালী, সে মাটিতে ফসল হয় না। বালুকার দোষ এই যে, উহা পরস্পর মিশিতে চাহে না। শুষ্ক বালীতে প্রায় কোনপ্রকার লতাগুল্ম জন্মে না। বেলেজমীতে অর্থাৎ যে জমীতে বালীর ভাগ অধিক, সে জমীতে কোন কোন ফসল জন্মিয়া থাকে। আর এক প্রকার মাটী আছে, উহাকে আটালে (এঁটেল) মাটি বলে। অত্যন্ত অধিক আটালে মাটিতে—যে মাটির আটা এত অধিক যে, উহা শুকাইলে পাথরের মত শক্ত হয়,—কোন ফসল জন্মে না। ঐরূপ মাটিতে লাঙ্গল বিঁধে না। ইংরেজীতে যাহাকে Gaulty Clay বলে, তাহা এই শ্রেণীর কড়া আটালে মাটি। এইরূপ খাঁটি কড়া মাটিতে ফসল জন্মে না। সাধারণতঃ 'দো-আঁশ' মাটিতেই ফসল জন্মে। শুষ্ক মরুতুল্য বালুকাত্মিকা মৃত্তিকাকে চাষের উপযোগী করিয়া লওয়া আজকালকার দিনে কঠিন নহে। আমাদের দেশের চাষীরা অনেক সময় অত্যন্ত অধিক বেলেজমীতে বিঘাপ্রতি দুই তিন গাড়ি কাদা মিশাইয়া ঐ জমী চাষের উপযোগী করিয়া থাকে। ঐ কাদা বা আটালে মাটি বালীর সহিত ভালভাবে মিশাইলে বালীতে আটা জন্মে, তখন উহা 'দো-আঁশ' মাটিতে পরিণত হয়। বিলাতী চাষারাও পূর্ব্বে এই প্রকারে নিতান্ত বেলেমাটিকে দো-আঁশমাটিতে পরিণত করিত। ইংরেজীতে ঐরূপ মাটি

দেওয়াকে Claying বলিত। কিন্তু আজকাল তাহারা ঐরূপ করাকে পণ্ডশ্রম মনে করে। এখন তাহারা 'বেলে-ডাঙ্গা'য় আর কাদা ছড়ায় না; এখন তাহারা ঐরূপ জমীতে পচা উদ্ভিদ, খামারের গুঁচলা, পাতার সার, সবুজ সার (Green Manure) প্রভৃতি দিয়া উহাকে চাষোপযোগী করিয়া লয়। শক্ত আটালে মাটিতে চাষ করিতে হইলে শীতের পূর্ব্বে জমীতে ভাল করিয়া চাষ দিতে হয়। শীতের নীহারে ও তুষারে এবং গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে মাটিগুলির আটা অনেক কমিয়া যায়। এই ভাবে জমীর কারকিং করিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; তবে এই মাটির সহিত শুষ্ক ও পচা পাতা প্রভৃতি মিশাইয়া দিলে মাটির আটা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। উদ্ভিদ ও জান্তব পদার্থ সূর্য্যকিরণে পরিপক্ক করিয়া তাহা হইতে এক প্রকার ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া প্রস্তুত করা হয়; তাহাকে Humus বলে। ঐ জিনিষটা অত্যন্ত বেলেমাটির সহিত মিশাইলে ঐ মাটিরও আটা জন্মে; পক্ষান্তরে ঐ জিনিষটা আটালে মাটির সহিত মিশাইলে মাটির আটা অনেক কমিয়া যায়।

মাটিতে কিছু আটা থাকা যেমন আবশ্যক, উহাতে আবশ্যকপরিমাণ রস থাকাও সেইরূপ দরকার। যে জমীর মাটি শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সে মাটিতে চাষ ভাল হয় না। অত্যন্ত শুক্‌না খট্‌খটে মাটিতে যেমন ফসল ভাল হয় না, সেইরূপ অত্যন্ত হড়্‌হড়ে কাদায়ও সকল ফসল ভাল হয় না। যে মাটিতে হাত দিলে উহা ভিজা বোধ হয়,—সেই মাটিতে বীজ বপন করিলে সহজে ও সুন্দরভাবে অঙ্কুরিত হইয়া থাকে। এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে যে, মৃত্তিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুগুলির ভিতর যে রস অর্থাৎ জল থাকে, উদ্ভিদরা তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকে। উদ্ভিদের দেহপুষ্টির জন্য নানাবিধ ধাতবপদার্থের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড় দ্বারা মাটির রস শোষণকালে উদ্ভিদরা সেই মাটি হইতে ধাতবপদার্থ আপনাদের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট করায়। বালীতে উদ্ভিদের সার মিশাইয়া দিলে ঐ বালীর জলধারণের ক্ষমতা জন্মে। সুতরাং ঐরূপ বেলে-জমীতে ফসল উৎপন্ন হয়।

মাটির আর একটা বিশেষ গুণ আছে। মাটি জল টানিয়া লইতে পারে। মাটির কতকটা নিম্ন দিয়া জলের একটা প্রবাহ বহিয়া যায়। কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিলে যে জল পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা মাটির ভিতর দিয়া চোয়াইয়া আইসে। নিম্নের মাটি ঐ জলে ভিজা থাকে, উপরের মাটিও ঐ জল উপরের দিকে টানিয়া লয়। মাটি যদি ঐভাবে জল টানিয়া লইতে না পারিত, তাহা হইলে অত্যন্ত প্রখর গ্রীষ্মকালে মাটির উপরিস্থিত লতা গুল্ম প্রভৃতি কিছুতেই বাঁচিত না। সূর্য্যের প্রখরতাপে মাটি যখন একেবারে শুকাইয়া যায়, তখন তৃণ লতা গুল্মগুলি খাদ্যা-ভাবেই মরিয়া যাইত। কিন্তু তৃণাদি সহজে মরে না। তাহার কারণ, মাটি তাহার নিম্নস্থিত জল উপরে তুলে,—উদ্ভিদ শিকড়দ্বারা সেই জল পান করিয়া বাঁচিয়া থাকে। জমীর মাথা যদি আঁটা থাকে অর্থাৎ তাহার ভিতর যদি ছিদ্র না থাকে, তাহা হইলে জমির নিম্নস্থিত রস অত্যন্ত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। যখন জমীতে বীজ বপন করা হয়, তখন অনেক দেশের চাষীরা, বীজ মাটির ভিতর পুতিয়া উপরের ঝুরামাটি কোদালীর উল্টা পিঠ দিয়া চাপড়াইয়া দেয়। তাহার কারণ, যেখানে বীজ আছে, সেইখানে রসের প্রয়োজন। মাটির মাথাটা কতকটা আঁটা থাকিলে জমীর নিচের রস বা জলীয় অংশ উপরে উঠিয়া আইসে। দ্বিতীয়তঃ জমীর ভিতরেই উত্তাপের সঞ্চার হয়। বীজ অঙ্কুরিত হইবার পক্ষে জলের যেমন প্রয়োজন, উত্তাপেরও সেইরূপ প্রয়োজন। জমীর রস আকর্ষণ করিলে বীজের ভিতর এমন একটু পরিবর্ত্তন হয়, যাহার ফলে ঐ বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে। ফলে, সকল বীজের পক্ষে একরূপ পাইটের প্রয়োজন হয় না। ফসলভেদে ভিন্ন প্রকারের পাইট করিতে হয়। বিভিন্ন ফসলের কথায় আমরা সে সব কথা বলিব।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিকড়দ্বারা উদ্ভিদ মাটি হইতে জল টানিয়া লয়। ঐ জলের সহিত পটাস্, ফস্ফেট্স্, নাইট্রেট্স্ প্রভৃতি উদ্ভিদের আহার্য্য বা দেহপুষ্টিকর পদার্থ উদ্ভিদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। মাটির রসের মধ্যে ঐ সকল পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে থাকে সত্য,—কিন্তু উহা না হইলেও লতা গুল্ম বৃক্ষাদির প্রাণ বাঁচে না। ঐ সকল ধাতবপদার্থ ও নাইট্রেট্স্গুলি উদ্ভিদের দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া উহার কোষগুলি পুষ্ট করে এবং পাতাগুলির কাজেরও সহায়তা করে। পাতাগুলির কাজ কি? পাতার ভিতর অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে; পাতা সেই ছিদ্রগুলি দিয়া বাতাসের কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড গ্যাস শুষিয়া লয়। ছোট ছোট ফড়্কি ডালগুলির ভিতরও অনেক ছিদ্র-থাকে। তাহার ভিতর দিয়াও বৃক্ষাদি বাতাস হইতে কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড গ্যাস শুষিয়া লইয়া থাকে। বৃক্ষাদির পত্রের বাতাস হইতে কার্ব্বনিক্ য়্যাসিড গ্যাস বিশ্লিষ্ট করিয়া লইবার যে শক্তি আছে, বৃক্ষের পক্ষে তাহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই কার্ব্বনিক য়্যাসিড গ্যাস হইতে উদ্ভিদ তাহার দেহস্থিত কার্ব্বন গঠিত করিয়া লয়। শুষ্ক শস্যের অর্দ্ধেক প্রায় কার্ব্বন থাকে। উহা শস্যাদি বৃদ্ধির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক দ্রব্য। সেইজন্য সাধারণতঃ শস্যাদির পল্লবাদি বিশেষ দরকারী। শুষ্ক শস্যের মধ্যে শতকরা পাঁচভাগ মাত্র ধাতবপদার্থ থাকে,—কিন্তু তাই বলিয়া উহার প্রয়োজন নিতান্ত অল্প নহে।

উদ্ভিদের পক্ষে জলের যেমন প্রয়োজন, রৌদ্রেরও তেমনই প্রয়োজন। রৌদ্রের উত্তাপে পাতা প্রভৃতি হইতে উদ্ভিদের দেহস্থিত রস বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইতে থাকে।

সেই জলীয় অংশের শূন্যস্থান পূর্ণ করিবার জন্য শিকড় দ্বারা মৃত্তিকা হইতে যে রস টানিয়া লয়, তাহা ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে। এইরূপে ঐ রস উদ্ভিদের সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। মৃত্তিকা হইতে যে রস উদ্ভিদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহার জলীয় অংশ অবিশ্রান্ত উড়িয়া যাইতে থাকে, কিন্তু ধাতব অংশ উদ্ভিদের দেহে থাকিয়া দেহের পুষ্টিসাধন করে। পণ্ডিতরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, একটি গাছে এক সের শুষ্ক পদার্থ সঞ্চিত করিতে প্রায় আড়াই মণ জল মাটি হইতে গাছে প্রবেশ করিয়া, গাছের পাতা প্রভৃতি দিয়া বাষ্পাকারে আকাশে চলিয়া যায়। সুতরাং ফসলের জন্য জলের ও ধাতব পদার্থের যেমন প্রয়োজন, রৌদ্রের উত্তাপেরও তেমনই প্রয়োজন। সেইজন্য পর্য্যাপ্ত রৌদ্র না পাইলে অনেক শস্য নষ্ট হইয়া যায়।

জমীর আর একটা গুণ আছে। বৃষ্টির জলই কেবল মৃত্তিকায় রসসঞ্চার করে না। বাতাসে একটু না একটু জলীয় বাষ্প থাকে। মাটি সেই জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়াও আপনার রস বৃদ্ধি করে। বিশেষতঃ অত্যন্ত শুষ্ক মৃত্তিকার এই গুণটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তবে বৃষ্টির জল ও সেচের জলই মৃত্তিকায় রসসঞ্চারের বিশেষ সহায়। অনাবৃষ্টি হইলে ফসল টিকে না। [ক্রমশঃ।

যক্ষ্মারোগ।

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

বর্ত্তমান সময়ে এই রোগের অতিমাত্রায় প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, সভাজগতে এতদ্‌সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনার সূচনা হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সম্প্রতি এই ব্যাধির এত বেশী প্রসার ঘটিয়াছে যে, এই ব্যাধিকে তাঁহারা "শ্বেতকায়দিগের প্লেগ" (মহামারী) এই আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ভারতবাসীদিগের মধ্যেও ইহার প্রভূত পরিমাণে বিস্তার হইতেছে, কিন্তু আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছি।

লোকশিক্ষা ও জনসমাজে মতামতের সৃষ্টি করা সংবাদপত্রের কাজ। যাহাতে আপামর সাধারণ যক্ষ্মা কি, কেমন করিয়া হয়, কিসে উহার বিস্তৃতি ঘটে ও কি কি উপায় অবলম্বন করিলে উহাকে নিবারিত করা যায়—এতদ্‌সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারে, সংবাদপত্রের ও সাময়িকপত্রের তাহা করা উচিত। আজ আমরা সেই উদ্দেশ্যেই এই বিষয়ের অবতারণা করিলাম। যতদূর সম্ভব, ডাক্তারীভাষা বর্জ্জন করিয়া সাধারণের বোধগম্য ভাষায় এই প্রবন্ধে সকল তথ্য বিবৃত করিব। জনসাধারণে এই প্রবন্ধটি অবহিতচিত্তে পাঠ করিলে বেশ বুঝিবেন যে, কেবল অদৃষ্টকে অবলম্বন করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না; চেষ্টার ফলে সুফল ফলিবেই ফলিবে।

যক্ষ্মারোগ কি ?

যে কোনও রোগে শরীরের ত্বরিত ক্ষয় হইতে থাকে, তাহাকে যক্ষ্মারোগ বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যক্ষ্মারোগ বলিলে বক্ষোদেশের পীড়াকে বুঝায়; এই পীড়ায় বক্ষে বেদনা, স্বল্প জ্বর, প্রবল কাশি ও প্রচুর পরিমাণে কাশ ত্যাগ এবং ক্রমশঃ দেহের ক্ষয় হইয়া মৃত্যু হয়। কিন্তু জনসাধারণের জানা না থাকিলেও, ঐ ক্ষয়রোগ উদরাময় বা "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" (অজীর্ণ) বা "সূতিকা" কিম্বা রক্তপ্রস্রাব, শিবামুণ্ড (অর্থাৎ কোনও গ্রন্থিস্ফীতি) প্রভৃতি নানারূপে প্রকটিত হইয়া থাকে। আমি এমন কথা বলি না যে, সূতিকা বা অজীর্ণ হইলেই তাহা ক্ষয়রোগ; আমার বক্তব্য এই যে, কোনও কোনও অজীর্ণ ও সূতিকা ক্ষয়রোগের রূপান্তর মাত্র। জনসাধারণের মধ্যে আরও কয়েকটি ভ্রমাত্মক ধারণা আছে; তাঁহাদের ধারণা আছে যে, যক্ষ্মারোগ হইলেই মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে এবং যক্ষ্মা হইলেই জ্বর থাকিবে। কিন্তু যদিও শতকরা নব্বুই জনের পক্ষে ঐ দুটি কথা খাটে, সকলের পক্ষেই উহা প্রযোজ্য নহে। অনেকের ধারণা আছে যে, যক্ষ্মারোগে খোলা জায়গায় খুব ভ্রমণ করা ভাল; এটিও ভ্রমাত্মক ধারণা।

যক্ষ্মারোগের কারণ কি ?

যক্ষ্মারোগের কারণ একপ্রকারের জীবাণু। উহাকে ইংরাজীতে টুবার্কেল ব্যাসিলাস্ (Tubercle Bacillus) কহে। ঐ জীবাণু নাসারন্ধ্র‌পথে অথবা মুখের ভিতর দিয়া বক্ষোস্থিত ফুস্‌ফুসে নীত হয়। ফুস্‌ফুসে আসিয়া তাহারা যেখানে আটকায়, সেখানে ফোড়ার মত ব্রণ উৎপাদন করে —ঐ ব্রণকেই টুবার্কেল (Tubercle) কহে। ক্রমশঃ ঐ ব্রণ পাকিয়া যায়—উহার ভিতরে গহ্বর হইয়া যায়; পাশাপাশি কয়েকটি ব্রণ এইরূপে গহ্বর হইয়া গেলে, তাহাদের সমষ্টি গহ্বরটি আকৃতিতে সময়ে সময়ে ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মত বড় হইতে পারে।

যে টুবার্কেল ব্যাসিলাস্‌কে যক্ষ্মারোগের কারণ বলা হইল, তাহা ইতস্ততঃ বায়ুতে ভাসমান অবস্থায় উড়িয়া উড়িয়া

বেড়াইতেছে। যেস্থানে মানব ও গবাদি পশুর সমাগম বেশী—যেখানে অল্প পরিসর, নিম্ন, আর্দ্র, অন্ধকারময় আবাস সংখ্যা বেশী, সেইখানেই টুবার্কেল ব্যাসিলাসের ছড়াছড়ি। এই জন্যই সহরে, কলকারখানায়, শীতক্লিষ্ট পার্ব্বত্যদেশে—যথা নেপালে, এই জীবাণুর আধিক্য দেখা যায়। বিখ্যাত জার্ম্মাণ পণ্ডিত রবার্ট কক্ (Robert Koch) ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই জীবাণু আবিষ্কার করেন। এই জীবাণুর নাম শুনিলে রোগীর মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয় বলিয়া, চিকিৎসকরা ইঙ্গিতে ইহাকে T. B. এই সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

মানব ও গোজাতির মধ্যেই এই যক্ষ্মাব্যাধির প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী। মানবজাতির মধ্যে নিগ্রোদিগের মধ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব অধিক। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে গরুরা সর্ব্বাগ্রেই এই ব্যাধির দ্বারা সংক্রামিত হয়। কুকুর, বিড়াল, ছাগ, মেষ ও শশক সহজে ঐ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয় না। কুক্কুট, হংস, মৎস্য, পক্ষিকুল—সহজেই ঐ ব্যারামে পড়িয়া থাকে। গোজাতির মধ্যে এই ব্যারামটি দুই আকার ধারণ করে; কোনও কোনও গাভীর স্তনকে ঐ ব্যাধি আক্রমণ করে; সেই গাভীর দুগ্ধ দোহনকালে, ব্রণের অভ্যন্তরস্থ পূঁয অলক্ষ্যে দুগ্ধমধ্যে চলিয়া আসে। আবার কোনও কোনও গোজাতীয় পশুদিগের রক্তে ঐ রোগের বীজ বর্ত্তমান থাকে। এই সকল গোমাংস আহার করিলে, ঐ ব্যাধি দ্বারা মানবের আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। যে জীব যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়, তাহার কাশ, পূয, পুরীশ ও প্রস্রাবে উহার কারণভূত টুবার্কেল ব্যাসিলাস্ বর্ত্তমান থাকে।

যে ব্যক্তির বক্ষে যক্ষ্মারোগ ধরিয়াছে, সে যতবার জোরে কাশে, ততবার তাহার মুখ হইতে যে প্রশ্বাসবায়ু সজোরে বাহির হইয়া আসে, সেই প্রশ্বাসবায়ুর সহিত অলক্ষ্যে অসংখ্য টুবার্কেল ব্যাসিলাস্ বা T. B. বাহির হইয়া ঘরের বায়ুর সহিত মিশিয়া যায়। যক্ষ্মাগ্রস্ত ব্যক্তির মুখনিঃসৃত প্রশ্বাস-বায়ুর পথে যে ব্যক্তি আসিয়া পড়েন অর্থাৎ তাহার সম্মুখীন ও নিকটবর্ত্তী যিনি থাকেন, তাঁহার পক্ষে কতকগুলি যক্ষ্মা-জীবাণু নিশ্বাসের সহিত নিজ বক্ষোমধ্যে টানিয়া লওয়া অবশ্যম্ভাবী। যে ব্যক্তির বক্ষে যক্ষ্মারোগ ধরিয়াছে, তাহার কাশে ও মুখ হইতে উঠা রক্তে ঐ জীবাণু প্রচুর পরিমাণে থাকে। অতএব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তির পিক্‌দানী বা ডাবর যে পরিষ্কার করে, সে অসাবধান হইলে, অসংখ্য জীবাণু নিজ-হস্তে মাখিয়া রাখিতে পারে—পরে, সেই হাতে কিছু খাইলে জীবাণুগণকে ভোজনের সঙ্গে গলাধঃকরণ করে। সেইরূপে যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীকে চুম্বন করিলে বা তাহার উচ্ছিষ্ট খাইলে কিম্বা তৎকর্ত্তৃক ব্যবহৃত ভোজনপাত্র ব্যবহার করিলে যক্ষ্মা-রোগ হওয়া সম্ভব।

যক্ষ্মারোগী যদি কোথাও কাশ ফেলেন অথবা যক্ষ্মারোগীর মল বা পুঁযরক্ত যদি কোথাও পড়ে এবং ঐগুলি শুকাইয়া যায়, তাহা হইলে এমন কি বহু বর্ষ পরে, সেই ঘর পরিষ্কার-সময়ে ঐ সকল শুষ্ক কাশ, মল, পূয, রক্ত ধূলির আকারে ইতস্ততঃ উড়িয়া উড়িয়া নানাপথে বা ভোজ্য অথবা পেয় বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া পেটে যাইয়া ঐ রোগ সৃষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই যেখানে সেখানে থুথু ফেলা অতীব গর্হিত কাজ।

রোগ-জীবাণু কি অমর?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, যক্ষ্মাজীবাণু কি অমর যে, যত বৎসর পরে হউক না কেন, তাহারা পুনরায় জীবিত হইয়া উঠিতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, যক্ষ্মাজীবাণু এক প্রকার অমরও বটে এবং রক্তবীজের বংশও বটে। রোগ-জীবাণুমাত্রেই এত সূক্ষ্ম যে, একটা সূচের মাথায় যতটুকু স্থান, সেই স্থানে অনায়াসে পাশাপাশি তাহারা এক শতটি থাকিতে পারে। তেজস্কর অণুবীক্ষণ ব্যতীত তাহাদিগকে দেখা অসম্ভব। মানবদিগের ন্যায় রোগজীবাণুগণেরও ভ্রূণ এবং পূর্ণাবয়ব আকৃতি আছে। ভ্রূণজীবাণুকে Spore Stage কহে। এই স্পোর অবস্থাটাই সাংঘাতিক অবস্থা। নারিকেলের সহিত এই স্পোর অবস্থার তুলনা কতকটা করা যাইতে পারে। কত পুরু ছোবড়া, তাহার পরে শক্ত মালা, তবে শস্য পাওয়া যায়। নারিকেলটাকে ফেলিয়া রাখিলে, বহুকাল পর্য্যন্ত তাহার শস্য নষ্ট হয় না। জীবাণুদের পূর্ণাবয়ব অবস্থায় সহজেই তাহাদিগকে ধ্বংস করা যায়—কিন্তু স্পোর অবস্থায় জীবাণুরা একপ্রকার অমরই বটে। যে কোনও পূর্ণাবয়ব জীবাণুকে বরফের মধ্যে রাখিলে, সে মৃতপ্রায় হইয়া যায় বটে—কিন্তু পরে উষ্ণতা প্রাপ্ত হইলে, আবার সজীব এবং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠে। কিন্তু যে কোনও পূর্ণাবয়ব রোগজীবাণুকে কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে অথবা জলে দশ মিনিট কাল ফুটাইলে, সে নিশ্চয়ই মরিয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্পোর অবস্থায় রোগজীবাণুকে উপর্য্যুপরি বহুদিবস বহুক্ষণ ধরিয়া রৌদ্রে রাখিলে বা অন্ততঃ বিশ মিনিটকাল জলে ফুটাইলে তবে তাহাদিগকে ধ্বংস করা সম্ভব হয়, নতুবা নহে। ঘরে থুথু, গয়ার ফেলিলে, স্পোর অবস্থাপ্রাপ্ত যক্ষ্মাজীবাণুগুলি শত বৎসর ধরিয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারে; পরে শুষ্ক বীজ যেমন জমী ও জল প্রাপ্ত হইলে পুনরায় অঙ্কুরিত হইতে পারে, তেমনই শতবর্ষ পরে, স্পোর অবস্থাপ্রাপ্ত যক্ষ্মাজীবাণু মানবদেহে আশ্রয় পাইলেই তথায় পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠে।

জীবাণুদের জীবনলীলা।

উত্তাপ, জল ও বায়ু—জীবমাত্রেরই জীবনের অনুকূল। জীবাণুরাও উত্তাপ ও জল না পাইলে এক দণ্ড বাঁচে না। তবে উত্তাপের তারতম্যে তাহাদেরও ক্রিয়ার তারতম্য হইয়া থাকে, তাহা এইমাত্র বলিয়াছি অর্থাৎ অতি শীতে বা অতি

গ্রীষ্মে তাহারা জখম হইয়া পড়ে। মানবদেহের উত্তাপে তাহারা উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকে, তাহাদের জৈবলীলার প্রকৃষ্ট বিকাশ পায়। উত্তাপের সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জলসম্বন্ধেও সেই নিয়ম। অতি বেশী বা অতি কম আর্দ্রতায় তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হয় না। জীবদেহের তন্তুগুলিতে সাধারণতঃ যে পরিমাণে জল আছে, তাহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। বায়ুসম্বন্ধে সকল জীবাণুর এক নিয়ম নহে। কোনও কোনও জীবাণু বায়ু না পাইলে বাঁচিতে পারে না, আবার কাহারও পক্ষে বায়ুই মৃত্যুর কারণ হইয়া পড়ে। ফল কথা, মানবদেহে যে পরিমাণে উত্তাপ ও জল পায়, তাহাতে জীবাণুরা বেশ সজীব অবস্থায় থাকিতে পারে।

মানুষ যেমন কোনও এক স্থানে আবদ্ধ থাকিলে, তথায় মলমূত্র ত্যাগ করিয়া, সেই স্থানটিকে ক্রমশঃ নিজের বাসের অনুপযুক্ত করিয়া তুলে, তেমনই জীবাণুগণ যে স্থানে থাকে, তথায় তাহারা একপ্রকারের উগ্র বিষ সৃষ্টি করিতে থাকে। সেই বিষই বেশী পরিমাণে জমিলে, স্বয়ং জীবাণুগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেই বিষ মানুষের যেখানে লাগে, সেখানে ক্ষত হয়। সেই বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিলে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়।

জীবাণুগণ প্রকৃতই রক্তবীজের ঝাড়। দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে তাহারা অসংখ্য হইয়া পড়ে। কোনও প্রকারে একটি জীবাণু এক স্থানে আশ্রয় লাভ করিলে, অল্প সময়ের মধ্যেই তথায় সেই জীবাণুর মহামেলা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমে সেই জীবাণুসমুদ্রের বিষতরঙ্গে মানবদেহ জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে এবং কালে ধ্বংসপ্রাপ্তও হয়।

তবে কি মানব এতই দুর্ব্বল ?

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রোগজীবাণু যে সার্দ্ধত্রিহস্ত পরিমিত প্রবল পরাক্রান্ত মানবদেহকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, সেই মানবদেহ কি এতই ক্ষণভঙ্গুর? তবে কি মানব এতই অসহায়—এতই দুর্ব্বল? ইহার উত্তরে আমাকে বলিতে হইবে, মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুরও নহে, মানবজাতি নিঃসহায়ও নহে। পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের এই দেহগঠনের সময়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা—কি অপার করুণা—কি অসীম দয়ার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা তাহার সম্পূর্ণ ধারণা করিতেও অক্ষম। স্থূলভাবে তাহার দু' একটি আভাসমাত্র দিব। আমাদের দেহের রক্ষার জন্য—জীবাণু প্রভৃতি বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে দেহকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, আমাদের প্রথম ও প্রধান সহায়—রক্ত। দ্বিতীয় সহায়—নবদ্বার।

দেহ কুরুক্ষেত্র।

যদি একটি ভেকশাবককে (ব্যাঙাচিকে) অণুবীক্ষণের নিম্নে রক্ষা করা যায়, তবে শিরা ধমনী প্রভৃতির ভিতর দিয়া কিরূপে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা সহজেই দেখা যায়। আমাদের রক্ত গাঢ়, লালবর্ণ, তরল পদার্থ হইলেও ইহাতে তিনটি জিনিষ দেখা যায়—(১) ঈষৎ হরিদ্রাভ তরল পদার্থ, (২) লাল চাক্তী (রক্তকণিকা, Red Corpuscles) এবং (৩) শ্বেত পদার্থ (White Corpuscle); এই শ্বেত পদার্থের বা শ্বেতকণিকার কোনও বিশেষ আকৃতি নাই।

এই শ্বেতকণিকাই আমাদের পরম বন্ধু। যে মুহূর্ত্তে শরীরে কোথাও কোন বিজাতীয় জীবাণু বা বিষ কিম্বা অন্য পদার্থ প্রবিষ্ট হয়, সেই মুহূর্ত্তেই দলে দলে শ্বেতকণিকা শিরা ধমনী ত্যাগ করিয়া আক্রান্তস্থলে উপনীত হয়। প্রত্যেক শ্বেতকণিকা যতগুলি জীবাণুকে গ্রাস করিতে পারে, তাহা করে। এইরূপে গ্রাস করিতে করিতে যদি জীবাণুকুলকে নির্ম্মূল করিয়া ফেলিতে পারে, তবেই আমরা বাঁচিয়া যাই; কিন্তু যদি তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত ক্রিয়া হয়, অর্থাৎ শ্বেতকণিকাগণ রোগজীবাণুগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয়, তবেই আমাদের অমঙ্গল। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এ বিষয়টি সরল করিতেছি। মনে কর, আজ সেলাই করিতে করিতে হঠাৎ সূচের অগ্রভাগ দ্বারা আমার অঙ্গুলী বিদ্ধ হইল। কাল সে স্থানটিতে বেদনা অনুভব করিব এবং কিঞ্চিৎ স্ফীতিও লক্ষিত হইবে। আরও দুই দিন পরে হয় বেদনা ও স্ফীতির তিরোভাব হইবে, নতুবা ফোড়া ফাটিয়া পূয বাহির হইয়া যাইবে। সেই পূয যদি চিকিৎসকের চক্ষে ছিট্‌কাইয়া লাগে, তবে তাঁহার চক্ষে ঠিক ঐ জাতীয় ফোড়া হইবে। এ সব ঘটনাগুলিতে কি কি হইল? পরে পরে এই এই ঘটনা ঘটিল :—(১) সূচ্যগ্র দ্বারা অঙ্গুলী বিদ্ধ হইবার সময়ে, তৎসহিত কোনও জীবাণু অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। (২) তৎপরদিবসে রাশি রাশি শ্বেতকণিকার আগমনজন্য ও তৎসঙ্গে জীবাণুদিগের বংশবৃদ্ধির জন্য সেই স্থানটি ফুলিয়া গেল। (৩) যদি শ্বেতকণিকাগুলি সব জীবাণুগণকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, তবে ফুলা কমিয়া যায়, যেহেতু কার্য্য সমাপনান্তে শ্বেতকণিকাগুলি স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। (৪) যদি জীবাণুগণের বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং শ্বেতকণিকাগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তবে—পূয বলিয়া যে পদার্থ দেখি, তাহা মৃত শ্বেতকণিকার ও সজীব জীবাণুর স্তূপ। (৫) পূযে সজীব রোগজীবাণু থাকায়, ঐ পূয চক্ষে লাগিয়া তথায় ঠিক ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত করায়। এই শ্বেতকণিকা ও জীবাণুযুদ্ধ অহর্নিশই দেহাভ্যন্তরে চলিতেছে, এই পুণ্য কুরুক্ষেত্র লীলার ফলে আজ আমরা জীবিত। যদি এই যুদ্ধ অহর্নিশ না হইত, তবে আমাদের পক্ষে জীবিত থাকা অসম্ভব হইত। এই শ্বেতকণিকাই আমাদের জীবনদাতা—এই শ্বেতকণিকাই আমাদের প্রাণ। যাহারা সর্ব্বদাই দেহ ও মন সুস্থ রাখে, তাহাদের দেহের শ্বেতকণিকার শক্তিও প্রভূত। যাহারা নানাবিধ অত্যাচারে ও অনাচারে দেহ ও মনকে ক্ষুণ্ণ করে, তাহাদের রোগপ্রবণতাও বেশী।

যেমন খঞ্জ ব্যক্তিগণের জন্য যষ্টির প্রয়োজন, রুগ্নের জন্য ঔষধের প্রয়োজন, তেমনই যে সকল ব্যক্তির রোগপ্রবণতা বেশী অর্থাৎ যাহাদের দেহের শ্বেতকণিকার রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কম, তাহাদের জন্য "টিকা" সৃষ্ট হইয়াছে। বসন্তের টিকা, প্লেগের টিকা, কলেরার টিকা ও আজকাল প্রতি-নিয়তই ভ্যাক্‌সীন্ (Vaccine) বা ইঞ্জেক্‌সন্ (Injection) চিকিৎসা বলিয়া যেগুলি শুনিতে পাই, সে গুলি কি? এক কথায় বলিতে গেলে "টিকা-চিকিৎসা" রোগ-প্রতিষেধক-ক্ষমতাবৃদ্ধিকারী চিকিৎসা। উহা কেমন করিয়া হয়, তাহা এই সুযোগে সংক্ষেপে বলিয়া লইব।

সাধারণতঃ সুস্থদেহ অশ্বের রক্ত হইতে "টিকার বীজ" প্রস্তুত হয়। একটি সুস্থ অশ্বের দেহে খুব সামান্য মাত্রায় মনে করুন, ডিফ্‌থিরিয়া ব্যাসিলাসের বিষ সূচদ্বারা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া গেল। তাহার ফলে, ঘোড়ার সামান্য জ্বর হইল; সেই জ্বর কমিতেই পূর্ব্বাপেক্ষা সামান্য বেশী মাত্রায় আর একটু বিষ দেওয়া গেল; এইরূপে শেষকালে এত মাত্রায় বিষ দেওয়া হয়, যাহার ফলে দশটা ঘোড়া মরিতে পারে; কিন্তু এই ঘোড়াটি সে বিষে মরা দূরে থাকুক, সামান্য মাত্র পীড়িত হয়। সেই ঘোড়া মরে না কেন? তাহার কারণ, তাহার দেহের মধ্যে ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া বিষ দেওয়ায়, সেই ঘোড়ার দেহস্থ শ্বেতকণিকাগুলি ক্রমশঃ এরূপ ক্ষমতা লাভ করে যে, দশ ঘোড়ার মারাত্মক বিষ দিলেও শ্বেতকণিকারা শেষকালে সে বিষকেও হজম করিতে সমর্থ হয়। সেই ঘোড়ার রক্ত যদি ডিফ্‌থিরিয়া রোগগ্রস্ত ব্যক্তির দেহে প্রবিষ্ট করান যায়, তবে সেই ব্যক্তি রোগমুক্ত হয়। যাহার ডিফ্‌থিরিয়া ব্যাধি হইয়াছে, তাহার দেহের শ্বেত-কণিকারা পরাস্ত হইয়াছে বলিয়াই সে ব্যক্তি পীড়িত হইতে পাইয়াছে। এক্ষণে, তাহার দেহে বাহির হইতে "বীজ" প্রবিষ্ট করাইলে, তাহার দেহস্থ শ্বেতকণিকারা সকলে বল প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয়োন্মুখ সেনানীমধ্যে নূতন সৈনিকদল প্রবিষ্ট হইলে যেমন জয়ের পুনরায় সম্ভাবনা হয়, সেই রোগীর সেই রকমে রোগ সারিবার উপায় হয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবাণুজ ব্যাধির আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ দ্বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াছেন;— প্রথম, রক্তের শ্বেতকণিকার দ্বারা, দ্বিতীয় দেহের নবদ্বারের সাহায্যে। শ্বেতকণিকার কথা বলা হইয়াছে, এইবারে দেহের নবদ্বারপথে রোগজীবাণুপ্রবেশের অন্তরায় কি কি, তাহার আলোচনা করিব।

নবদ্বার।

অনেকেই জানেন যে, মুখের ভিতরে ও পিছনের দিকে দুই পার্শ্বে দুইটি "আলজিহ্বা" (?) বা টন্‌সিল্ (Tonsils) নামক গ্রন্থিদ্বয় (Glands) আছে। মুখে যে কোনও বিষ বা জীবাণু প্রবিষ্ট হইলে, ঐ টন্‌সিল্‌দ্বয় সেই বিষ ও জীবাণুকে ধ্বংস করিবার জন্য বিধিমতে প্রয়াস পায়; তাহারই ফলে সেই টন্‌সিলদ্বয় স্ফীত হয়। এতদ্ব্যতীত মুখগহ্বর, যোনি-পথ প্রভৃতি স্থলে তত্তৎস্থানীয় জীবাণুসকল সদাসর্ব্বদাই প্রহরীস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে। এই সকল স্থানীয় জীবাণুগণ রোগোৎপাদন করিতে পারে না, তাহারা প্রকৃতই প্রতিহারী স্বরূপ থাকে এবং ঐ পথে রোগজীবাণুপ্রবেশের অন্তরায় হয়। নাসারন্ধ্রদ্বয় সূক্ষ্ম লোমকণ্টকিতবিধায়ে সহজে কোনও ময়লা ধূলি ঐ পথে প্রবিষ্ট হইতে পারে না; এতদ্-ব্যতীত নাসারন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষোদেশের অভ্যা-ন্তর পর্য্যন্ত এক প্রকারের অদৃশ্য সূক্ষ্ম লোমাকৃতি পদার্থ আছে; যাহাদের উদ্দেশ্য, বক্ষাভ্যন্তর হইতে বিজাতীয় পদার্থকে বাহিরে নিষ্কাশিত করা। এ সকল ছাড়া, প্রত্যেক দেহদ্বারে এমন কৌশল করা আছে যে, উহাতে অতি সামান্য উত্তেজনায় প্রভূত পরিমাণে রসস্রাব হইতে পারে। এই সকল হইতে বেশ বুঝা যায়, ভগবান্ এমন উপায় করিয়াছেন যে, সহজে কোনও বিজাতীয় পদার্থ দেহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইতে না পারে।

তবে যক্ষ্মার এত বৃদ্ধি কেন?

যক্ষ্মারোগের কারণ আমরা অবগত আছি। ভগবান্ এ দেহকে যক্ষ্মা-জীবাণুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার বিধি-মত ব্যবস্থা করিয়াছেন; যক্ষ্মাজীবাণুগণের জীবনের লীলা-খেলা আমরা সবই জানি, তবে কেন যক্ষ্মারোগ এত বেশী বাড়িতেছে? এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া যায় না।

যক্ষ্মার বৃদ্ধির প্রথম কারণ—দৈন্য। অর্থের অভাবেই লোকে আহার রীতিমত করিতে পায় না; অর্থের অভাবে নিয়তই মানসিক দুশ্চিন্তা বর্ত্তমান থাকে; অর্থের অভাবেই আর্দ্র, অন্ধকার, নিম্নভূমিতে একত্রে বহুলোকের বাস করিতে হয়, অর্থের অভাবেই যথারীতি শীতাতপ নিবারণ না হওয়ায় সর্দ্দি কাশির প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহা হইতেই যক্ষ্মার সূচনা হয়।

যক্ষ্মার বৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণ—অজ্ঞতা। কত জনে যক্ষ্মার প্রকৃত কারণ জানেন? কত জনে যেখানে সেখানে থুথু ফেলার বিষম ফল অবগত আছেন? কত জনে যক্ষ্মা-রোগীর সেবা করিবার সময়ে যথারীতি সাবধান হন?

যক্ষ্মাবৃদ্ধির তৃতীয় কারণ—কার্য্যানুরোধ। কার্য্যানু-রোধে লোককে বাধ্য হইয়া জনাকীর্ণ সহরে, হোটেলে, বাসাবাড়ীতে, মেস্ প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে হয়; কার্য্যা-নুরোধে পাটকলে, লোহার কারখানায়, চূণের আড়তে, কাগজের কলে কায করিতে হয়; কার্য্যানুরোধে রাস্তা ঝাঁট দিতে হয়, রোগী পরিচর্য্যা করিতে হয়, ইত্যাদি।

যক্ষ্মাবৃদ্ধির চতুর্থ কারণ—অঙ্গসৌষ্ঠবে অমনোযোগিতা। বাল্যে যথাযোগ্য মুক্তবায়ুর অভাব, যৌবনে ব্যায়ামের অভাব ও অযথা ইন্দ্রিয় সেবা, প্রৌঢ়ে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের

বৃদ্ধি—এই সকল কারণে দেহের যথারীতি গঠন হওয়া দূরে থাকুক, দেহের ক্রমশঃই ক্ষয় হইতে থাকে।

যক্ষ্মা নিবারণের উপায়।

(সুস্থব্যক্তির পক্ষে)

যক্ষ্মা নিবারণ করিতে হইলে কি কি করা উচিত, তাহা নিম্নে বিশদভাবে বিবৃত হইল :—

বাস।—যে ঘরে রৌদ্র ও বায়ু ভালরূপ খেলে না, এমন ঘরে থাকিবে না। ঘরে যত বেশী রৌদ্র আসিতে পারে, আসিতে দেওয়া উচিত এবং বায়ুকেও যথাসম্ভব চলাচল করিতে দেওয়া উচিত। অনেকের অভ্যাস আছে যে, শয়নকক্ষ শয়নকাল ব্যতীত সকল সময়েই বন্ধ থাকে। এটি মারাত্মক অভ্যাস। শয্যাদ্রব্যগুলিকেও প্রত্যহ রৌদ্রে রাখা কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীদের বহির্ব্বাটী প্রশস্ত হয় এবং অন্দর অন্ধকূপ হয়; ইহার ঠিক বিপরীতই হওয়া উচিত। রান্না-ঘর সাধারণতঃ অন্ধকার ও আর্দ্র থাকে এবং অহর্নিশ ধূমাকুল থাকে এবং সেই ঘরেই বঙ্গনারীগণ অন্যূন বারো ঘণ্টাকাল থাকেন। ইহার সুব্যবস্থা হওয়া উচিত। যাঁহাদের পক্ষে অবস্থাবৈগুণ্য বা অপর কারণবশতঃ স্বাস্থ্যকর আবাস পাওয়া অসম্ভব, তাঁহারা রীতিমত ছুই বেলা উন্মুক্ত বায়ু-সেবনের অপর ব্যবস্থা করিবেন। রমণী বলিয়া তাঁহারা ভগবানের নিয়মের বহির্ভূত নহেন—অতএব এই বায়ুসেবন-বিধি তাঁহাদেরও পক্ষে বিশিষ্টরূপে প্রযোজ্য। অকারণ লজ্জা করিয়া ভবিষ্যতে গৃহসুখে বঞ্চিত হওয়ার ন্যায় মূর্খতা আর নাই। গৃহাদি বা তৈজসাদি মার্জ্জনাকালে কখনও ধূলি উড়াইতে নাই; মেঝেতে জলছিটা দিয়া এবং তৈজসাদিতে জল বা তৈলসিক্ত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মার্জ্জনা করাই বিধেয়।

ভোজন।—কখনও কাহারও ভুক্তাবশেষ খাইতে নাই। কাঁচা দুধ কখনও খাইবে না। মাংসের মধ্যে ছাগমাংসই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ইচ্ছা করিয়া গুরুপাক ভোজন করিবে না।

ব্যায়াম।—ছোট ছোট বালকেরা চীৎকার করিলে অনেক পিতামাতা বিরক্ত হন। কিন্তু চীৎকার না করিলে ফুসফুসের পূর্ণ প্রসারণ হয় না। অতএব বালকদিগকে প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিতে দেওয়া উচিত। সন্তরণ, বৃক্ষারোহণ, দৌড়াদৌড়ি, উচ্চ স্থানে আরোহণ প্রভৃতি দ্বারা এবং গীত-বাদ্য চর্চ্চার দ্বারা বক্ষঃপ্রসারণ সংঘটিত হয়। যাহাদের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত, তাহাদিগের সচরাচর বক্ষঃপীড়া হয় না—এই জন্যই বক্ষঃপ্রসারণের দিকে বেশী ঝোঁক দিয়া বলিলাম। পরন্তু যে কোনও ব্যায়াম রীতিমত করিলে শরীরের সাধারণ উন্নতি হয় এবং সেই উন্নতির ফলেই শরীরের স্বাভাবিক রোগপ্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়—শরীরের রোগ-প্রবণতা জন্মাইতে পারে না। বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীলোক-দিগকে যেরূপভাবে জীবনযাপন করিতে হয়, যেরূপ ধূলি, ধূম সেবন করিতে হয়, যেরূপ আর্দ্রস্থানে ও অধিকাংশ সময়ে আর্দ্রবস্ত্রে থাকিতে হয় এবং তাঁহাদিগের মধ্যে যেরূপ অশন-বসন ও বাসসম্বন্ধীয় ঔদাসীন্য দেখা যায়, তাহাতে আমার ধারণা এই যে, বঙ্গরমণীগণের পক্ষে দু' বেলা রীতি-মত নির্ম্মল বায়ু সেবন করা উচিত। পল্লীগ্রামবাসিনী-দিগের পক্ষে এটি নিতান্ত কষ্টকর নহে—যেহেতু দুবেলা পুষ্করিণীতে গমনাগমন করিলে ঐ অভাব অনেক পরিমাণে দূরীকৃত হয়; কিন্তু সহরবাসিনীদিগের পক্ষে ঘনবসতির মধ্যে ছাদে উঠিয়া বায়ুসেবন করা অনেক সময়ে বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠে। মধ্যে মধ্যে গঙ্গাস্নানে যাওয়া বা এখানে ওখানে যাওয়াতে কতক পরিমাণে বায়ুসেবনের কায হইতে পারে বটে, যদি এক গাড়ীতে লোকসংখ্যা অধিক না হয়। যাঁহাদের সে অবস্থা ও সুযোগ আছে, তাঁহারা অন্দরমহল খুব প্রশস্ত করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করাইবেন, অন্দরের পশ্চাদ্দিকে কতকটা প্রাচীরবেষ্টিত উন্মুক্ত স্থান রাখিবেন, পাকশালা বাটীর সর্ব্বোচ্চস্থানে নির্ম্মাণ করাইবেন এবং অন্ততঃ সায়ং-কালে রমণীদিগের গাড়ী করিয়া হাওয়া খাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কি ধনী, কি নির্ধন, সকল সংসারেই সাধারণ গৃহস্থালীর কাজ করা ব্যতীত প্রত্যহই রমণীদিগের কতক পরিমাণে ব্যায়ামের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এ সম্বন্ধে অন্যায় লজ্জা করিয়া শরীর মাটী করিবার হেতু নাই; ভগবান্ রমণীদিগকে তাঁহার মুক্তদান জীবনের জীবন বায়ু হইতে বঞ্চিত করিয়া জন্ম দেন নাই। পুত্রগতপ্রাণা রমণীদিগের স্বাস্থ্যের উপরে ভাবী সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করায়, রমণীদিগকে চেষ্টা করিয়া—ব্যায়াম করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধান করা উচিত। যেহেতু পুরুষদিগের অপেক্ষা রমণীগণেরই পক্ষে "কুড়ি হইলেই বুড়ী" এই প্রবাদবচনটি বিশিষ্টরূপে প্রযোজ্য। আশা করি, প্রত্যেক পাঠক-পাঠিকা এতদ্সম্বন্ধে সৎসাহসের পরিচয় দিবেন এবং ঘরে ঘরে রমণীগণ ব্যায়ামে মনোযোগিনী হইবেন।

বদভ্যাস।—যেখানে সেখানে থুতু ফেলা, এঁটো খাওয়া, ছেলেদের নাকে সর্দ্দি পড়িতেছে ও তাহারা সেই সর্দ্দি চাটিয়া খাইতেছে, তাহা দেখিয়াও না দেখা, ভাল করিয়া না ঝাড়িয়া শুধু মাটিতে শয়ন করা, কাপড়ে নাক ঝাড়িয়া মোছা, যাহার তাহার গামছা ব্যবহার করা, শয়নকালে বিশেষতঃ শীত ও বর্ষাকালে চতুর্দ্দিক্ বন্ধ করিয়া শয়ন করা, অনর্থক বেলা করিয়া ভোজন করা, শীতকালে মস্তক পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া শোয়া, গৃহপালিত গাভীকে যথাসম্ভব রৌদ্র ও বায়ু সেবন করিতে না দেওয়া, গাভীকে অন্ধকারময় আর্দ্রগৃহে অধিকাংশ সময়ে বাঁধিয়া রাখা, প্রত্যহ অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টার জন্য গাভীকে চরিতে না দেওয়া, গোগৃহ অপরি-ষ্কার রাখা, গো দোহনকালে গোস্তন ও নিজহস্ত রীতিমত না

ধুইয়া গো দোহন করা, এক ঘরে বহু ব্যক্তি শয়ন করা, এ সকল কদভ্যাস সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

রোগীপরিচর্য্যা।—যাঁহারা যক্ষ্মারোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের বিশিষ্টরূপে জানা আবশ্যক যে, যক্ষ্মারোগের বিষ বা বীজ যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তির কাশে পাওয়া যায়। অতএব রোগীর মুখের লালা বা থুথু ভোজন-পাত্রে লাগিবারই কথা। সেই সকল পাত্র যথারীতি পরিষ্কৃত করা ত উচিতই, পরন্তু যিনি সেই পাত্রাদি মার্জ্জন করিবেন, তাঁহার স্বীয় হস্তাদিও যথাযোগ্য বিধি অনুসারে পরিষ্কৃত হওয়া কর্ত্তব্য। যে সকল দ্রব্য স্ফুটিত জলে ফুটাইলে নষ্ট না হয়, সে সকল পাত্রকে ফুটাইতে হইবে এবং যথাবিধি লোসনদ্রবে হস্তাদি মার্জ্জন করিতে হইবে। রোগীর কাশি হইলে কখনও তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে না। নির্দ্দিষ্ট পাত্র ব্যতিরেকে কোথাও নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে দিবে না।

যক্ষ্মারোগীর প্রতি কর্ত্তব্য।

যখন কোনও ব্যক্তি যক্ষ্মারোগ দ্বারা মাত্র আক্রান্ত হইয়াছে—যখন সে ব্যক্তি শয্যাশায়ী নহে, সম্পূর্ণ কার্য্যক্ষম অথচ দারুণ অর্থাভাবে ক্লিষ্ট, তখন কি কর্ত্তব্য? রোগীর পক্ষে দারিদ্র্যতাড়নাই প্রবলতর তাড়না, দারিদ্র্যই হয় ত তাহার রোগের মূল ও ক্রমশঃ বৃদ্ধির কারণ; দারিদ্র্যই তাহার রোগ-চিকিৎসার ও আরোগ্যের প্রধান অন্তরায়। এমন স্থলে স্বভাবতঃই সেই রোগী কার্য্যস্থলে রীতিমত যাতায়াত করিতে থাকে; লোকসাধারণকে নিজ ব্যাধির কথা জানিতে দেয় না এবং কেহ তাহার রোগ ধরিয়া দিলেও সে রোগ মানিতে চাহে না। সমাজে এমন রোগী অবাধে বিচরণ করিলে ঐ রোগের বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত বহ্নিকণায় যেরূপ অলক্ষিতে শত শত গৃহ দগ্ধ করিতে পারে, লুক্কায়িত বিষ যেরূপে অলক্ষ্যে শত শত কূপাদির জল বিষাক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ এই যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি অলক্ষ্যে প্রতি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ যক্ষ্মা-জীবাণু ইতস্ততঃ বায়ুতে, গৃহমধ্যে, কর্ম্মস্থানে, শকট প্রভৃতি যানে, সাধারণ পানভোজন পাত্রে, কূপাদি জলাশয়ে—নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া থাকে। দয়াপরবশ হইয়া সেই পীড়িত দরিদ্রব্যক্তির ব্যবহারে কেহ বাধা দিতে সাহসী হন না।

একদিকে যেমন স্বল্পরোগাক্রান্ত কিন্তু কর্ম্মক্ষম রোগী-দ্বারা যক্ষ্মা বিস্তৃত হইতে পারে, পক্ষান্তরে তেমনই আরোগ্যোন্মুখ বা স্বল্পারোগ্যপ্রাপ্ত রোগীর দ্বারাও ঐ বিষ ইতস্ততঃ বিস্তারলাভ করিতে পারে। যক্ষ্মা সাধারণতঃ গরীবদিগেরই হইয়া থাকে; গরীবেরা নিতান্ত অক্ষম না হইলে শয্যার আশ্রয় লয় না এবং আরোগ্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কর্ম্মস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে অথচ হয় ত আর্দ্র, অন্ধকারময়, রুদ্ধবায়ুগতি, ধূলিধূমাকীর্ণ, জনাকীর্ণ স্থানে থাকিয়াই তাহার ব্যারাম হইয়াছিল। এমত স্থলে রোগী সম্পূর্ণ সারিতে না সারিতে অথবা সারিয়াও সেই যায়গায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অচিরে তাহার ঐ রোগ পুনরায় হইবার সম্ভাবনা। এমন স্থলে কর্ত্তব্য কি?

যে দেশ হইতে মুষ্টিভিক্ষা ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে, যে দেশে Poor Law নাই অথচ ভ্রাতৃভাবপোষক, সহানুভূতি-সহায়ক সকল প্রথাই লোপ পাইতেছে, যে দেশে কেবল মুখের বক্তৃতায় ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে বিশ্বজনীন প্রেমের মন্ত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে অথচ অন্তরে "বাঙ্গাল," "নেড়ে," "মেড়ো" প্রভৃতির ফল্গু নদী অন্তঃসলিলা হইয়া আছে, সে দেশে সরাসরি বিলাতী প্রথার প্রবর্ত্তনা ব্যতীত এই প্রশ্নের যথার্থ সমাধান হওয়া দুরূহ।

ঐ বিপদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের চারিটি কর্ত্তব্য আছে। সকলগুলিই ব্যয়সাধ্য। স্বাস্থ্যকর প্রদেশে বহু সংখ্যায় যক্ষ্মাবাস স্বতন্ত্রভাবে নির্ম্মাণ করাইয়া—যাবতীয় যক্ষ্মারোগীকে ঐ ঐ আবাসে থাকিতে বাধ্য করা আবশ্যক। রোগীদিগকে ২।৪ বৎসরকাল হয় ত ঐ সকল আবাসে থাকিতে হইতে পারে, ইহার মধ্যে তাহাদের সংসারের যথারীতি ভরণপোষণের জন্য যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা হওয়া চাই। রোগীরা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিলে, যথারীতি পরীক্ষিত হইয়া তবে কর্ম্মস্থলে আসিতে আদেশ পাইতে পারে। যাহাতে যক্ষ্মারোগীরা পুনরায় অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহে বা কর্ম্মস্থলে পুনরায় না আসিতে পারে এবং যাহাতে প্রত্যেক যক্ষ্মারোগীর মাসিক বা ত্রৈমাসিক রীতিমত পরীক্ষা—আরোগ্য হইবার অন্যূন তিন বৎসর পর পর্য্যন্ত হইতে পারে, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

এত কঠোর নিয়মকে কতকটা কোমল করা যায়। যদি প্রত্যেক গ্রামে স্বাস্থ্যসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় এবং চিকিৎসাগার স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে, সেবক ও চিকিৎসকসম্প্রদায় দর্শনী না লইয়া, বাটী বাটী যাইয়া ব্যবস্থা দিতে পারেন এবং রোগী ও তাহার আত্মীয়বর্গকে রোগের বিস্তারসম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করাইতে পারেন এবং ঔষধ, পথ্য, নিষ্ঠীবনত্যাগপাত্র প্রভৃতি বিনাব্যয়ে যোগাইতে পারেন, তবেই কতকটা সুবিধা হয়—তবেই রোগী স্বজনবর্গের মধ্যে থাকিয়া মনের উদ্বেগশূন্য হইয়া চিকিৎসিত হইতে পারেন। কিন্তু এ সকল প্রভূত অর্থের খেলা। যে ধনীর অর্থ আছে, তিনি কি তাহা অকাতরে দান করিতে পারেন? আমার মতে এই শেষোক্ত বিধিই স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ, সমাজানুমোদিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট বিধি।

ক্ষয়রোগীর চিকিৎসা।

উপসংহারে দু' এক কথায় যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসার মূল-তত্ত্ব বিবৃত করিব। পূর্ব্বে "দেহ কুরুক্ষেত্র" এই আখ্যা দিয়া দেহের রোগপ্রতিষেধক শক্তির কথা বলিয়াছি।

টুবাকুলীন্ (Tuberculin) নামক ঔষধের প্রয়োগে যক্ষ্মারোগীর ঐ রোগপ্রতিষেধকশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে; সেইজন্য—সর্ব্বথা, কিন্তু অতি সাবধানে ও বিচক্ষণ চিকিৎসক দ্বারা ঐ ঔষধ ব্যবহৃত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়তঃ—যক্ষ্মা-রোগীকে যত দিন তাহার জ্বর হয়, প্রায়শঃই শায়িত রাখা কর্ত্তব্য। তৃতীয়তঃ—কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, রৌদ্রালোক, রৌদ্র ও উন্মুক্ত বায়ু প্রচুর পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য। চতুর্থতঃ ঘৃত, মাংস, সুরাসার প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহাতে ক্ষুধার বৃদ্ধি হয় এবং ঐ সকল খাদ্য সহজে পরিপাক হয়, এমত ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। পঞ্চমতঃ রোগীর গাত্রমার্জ্জন, স্নান প্রভৃতিও হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাহুল্যভয়ে এইখানেই প্রবন্ধের শেষ করিলাম। আশা করি, পাঠকগণ ধৈর্য্যসহকারে অবহিতচিত্তে কথাগুলি পড়িবেন ও ভাবিয়া দেখিবেন।

বনৌষধ।

আমাদের দেশের বৃক্ষ লতা গুল্ম প্রভৃতির যে কত উপকারিতা, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ঐ সকল বৃক্ষাদির গুণ জানিতে পারিলে মানব-সমাজের যথেষ্ট উপকার হয়। পূর্ব্বকালে বাড়ীর গৃহিণীরা পর্য্যন্ত বৃক্ষাদির গুণ যথেষ্ট জানিতেন; তাঁহারা স্বচ্ছন্দবনজাত পাতা লতা দিয়া অনেক রোগ আরাম করিতেন। এখন আমরা সেই সমস্ত ভুলিতে বসিয়াছি। তাহাতে সাংসারিকহিসাবে আমাদের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছি, আমরা 'অনাথবন্ধু'তে ক্রমে ক্রমে আমাদের দেশের লতাগুল্ম প্রভৃতির গুণাগুণ প্রকাশ করিব এবং উহার বর্ণাদি সম্বলিত যথাযথ চিত্র (Coloured Photo) প্রকাশিত করিব। সাধারণের কাছে আমাদের নিবেদন,—তাঁহারা যদি কোন বৃক্ষের, লতার বা গুল্মের কোন বিশেষ গুণ জানেন, তাহা আমাদিগকে যেন জানান, তাহা হইলে আমরা সাদরে তাহা প্রকাশ করিব। এইরূপ করিলে কেবল আমাদের উপকার হইবে না, সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। আশা করি, সহৃদয় ব্যক্তিরা আমাদিগকে ঐরূপ বৃক্ষাদির গুণাগুণ ও টোট্কার কথা জানাইয়া বাধিত করিবেন।

তুলসী।

[কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত কবিভূষণ লিখিত।]

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে শরীররক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। শরীর স্বাস্থ্যশূন্য হইলে, ধর্ম্মাচরণাদি কোন কার্য্যই মানবগণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে না, সুতরাং শরীররক্ষায় যত্নবান্ হওয়া মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তাহার উপায় জ্ঞাত হওয়াও আবশ্যক। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্।" শরীররক্ষার নানাবিধ উপায়ের মধ্যে দ্রব্যপরিজ্ঞান অন্যতম। দ্রব্যের গুণ জ্ঞাত থাকিলে, শারীরিক অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া পানীয় ও আহার্য্যাদি গ্রহণ করিতে পারা যায় এবং তদ্দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু আমরা বর্ত্তমান সময়ে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়সম্বন্ধে দিন দিন বড়ই উদাসীন হইয়া পড়িতেছি। সুতরাং আশা করি, এ সময়ে অন্ন, পানীয়, ঔষধ, ঋতু ও দেশাদির গুণসম্পর্কিত দুই একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া সমাজসমক্ষে উপস্থাপিত করা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আজকার বর্ণনীয় দ্রব্য 'তুলসী'। যদি কেহ বলেন, ঔষধান্নপানীয়ের মধ্যে এত দ্রব্য থাকিতে তুলসীই প্রথম বর্ণনীয় বিষয় হইল কেন? তদুত্তরে বক্তব্য,—তুলসী দেবী-বৃক্ষ। হিন্দুশাস্ত্রকারগণ ইহাকে বিষ্ণুবল্লভা, গৌরী, পাপঘ্না প্রভৃতি আখ্যা দিয়া পূজার্হ ও মাঙ্গলিক বলিয়াছেন। আমরাও ইহার প্রাথমিক বর্ণনায় ভাবীমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

ব্রহ্মোবাচ :—

তুলস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং সর্ব্বকামদম্।
যৎ পুরা বিষ্ণুনা প্রোক্তং তত্তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

তুলসী প্রধানতঃ শ্বেত ও কৃষ্ণ এবং সুরসা, মরুবক, দমনক, বর্ব্বরী, নামভেদে চারি প্রকার।

মরুবক—ক্ষুদ্র পত্র ও সুগন্ধক, এই দুই প্রকার।

বর্ব্বরী—কুঠেরক, অর্জ্জক, বটপত্র নামে তিন প্রকার।

সকল তুলসীই সাধারণতঃ কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য ও সুগন্ধি; কফ, বায়ু, জন্তুজ কৃমি ও বমননাশক, হৃদয়গ্রাহী, রুচিপ্রদ, অগ্নিদীপক, কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদুষ্টি, শূল, পার্শ্বশূল-নাশক এবং পিত্ত ও দাহজনক।

কটুত্বং তিক্তত্বং উষ্ণত্বং সুরভিত্বং শ্লেষ্মবাতজন্তুভূতকৃমি-বান্তিহারিত্বং রুচিকারিত্বঞ্চ। ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ।

তুলসী কটুকাতিক্তা হৃদ্যোষ্ণা দাহপিত্তকৃৎ।
দীপনী কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্রপার্শ্বরুক্ কফবাতজিৎ॥

(ভাবমিশ্রঃ।)

শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় তুলসীই সমগুণবিশিষ্ট।

শুক্লাকৃষ্ণাচ তুলস্যাঃ গুণৈস্তুল্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা।
(ভাবমিশ্রঃ।)

সুরসাদি তুলসীসমূহ সমগুণবিশিষ্ট হইলেও মরুবক, দমনক ও অর্জ্জক, তুলসীত্রয়ের একটু একটু গুণবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়।

মরুবক—তীক্ষ্ণবীর্য্য, লঘুপাকী ও ইহার রস বা চূর্ণ বৃশ্চিক, বোল্‌তা, ভীমরুলাদির দষ্টবিষ ও বেদনানাশক।

মরুদগ্নিপ্রদো হৃদ্যস্তীক্ষোষ্ণঃ পিত্তলো লঘুঃ।
বৃশ্চিকাদিবিষ শ্লেষ্মবাতকুষ্ঠ কৃমি প্রণুৎ॥
(ভাবমিশ্রঃ।)

দমনক—কষায়তিক্তরস, শুক্রজনক, গ্রহণীদোষ, কণ্ডু, ক্লেদ ও ত্রিদোষনাশক।

দমনস্তুবরস্তিক্তো হৃদ্যোবৃষ্যঃ সুগন্ধিকঃ।
গ্রহন্নুদ্ বিষকুষ্ঠাস্র ক্লেদকণ্ডু ত্রিদোষজিৎ॥
(ভাবমিশ্রঃ।)

অর্জ্জক—নেত্ররোগহর, সুখপ্রসবকারক, রুক্ষ ও শীত-বীর্য্য।

নেত্রামযাহরা রুচ্যাঃ সুখপ্রসবকারকাঃ।
(রাজনির্ঘণ্টঃ।)
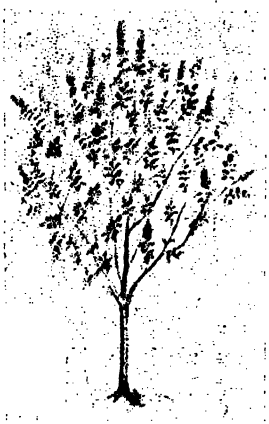
সুরসা তুলসী।

সুরসা।—সাধারণতঃ ঔষধার্থে ও দেবার্চ্চনাদি কার্য্যে আমরা যে গ্রাম্য-সুলভ শ্বেত তুলসী ব্যবহার করি, তাহাই সুরসা তুলসী। ইহার পত্রের আকার মধ্যম ও ইহা বহুপত্র-বিশিষ্ট।

মরুবক।—বড় বড় পত্রবিশিষ্ট সুগন্ধি তুলসী। অনেক স্থানে ইহা 'রাম-তুলসী' নামে আখ্যাত হইয়া থাকে।

দমনক—পশ্চিমে এই তুলসীকে দোনা বা দবা তুলসী বলে; বাঙ্গালা দেশের অনেক স্থানে ইহা 'ভুলাল তুলসী' নামে প্রখ্যাত।

বর্ব্বরী।—সাধারণতঃ কৃষ্ণপত্রবিশিষ্ট। ইহার পত্রাকার ক্ষুদ্র না হইলেও খুব বড় নহে। ইহা শ্বেতবর্ণও দেখা যায়। ইহাকে বাঙ্গালায় প্রায় 'বাবুই তুলসী' বলিয়া থাকে।

সুরসা তুলসীর কফ, কাস ও শ্বাসনাশক গুণ এমন সুন্দর যে, ইহা সদ্যোজাত শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধেরও শ্লেষ্মবিকৃতিবিনাশে ব্যবহৃত হয়। মাত্রা—সদ্যোজাত শিশু হইতে ১ বৎসর বয়স্ক শিশুর প্রতি ৫ ফোঁটা হইতে ১০ বা ১২ ফোঁটা, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে সিকি ভরি হইতে আধ ভরি।

শিশুদের পক্ষে মধু, কখনও বা সৈন্ধবলবণসহ ব্যবহার করা বিধেয়।

সুরসা তুলসীর পত্র সৈন্ধবলবণযোগে দদ্রুস্থানে রগ্‌ড়াইলে ৩।৪ দিবসে দদ্রু আরাম হইতে দেখা যায়।

তুলসী নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ বায়ুকে স্বীয় সুগন্ধাদিগুণ দ্বারা সংশোধিত করে। কেহ কেহ বলেন, তুলসীবৃক্ষ গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপিত থাকিলে, ম্যালেরিয়া জ্বর ও ভূতগ্রামাদির সংক্রামতা অনেকটা প্রশমিত হইয়া থাকে।

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশোদশঃ পুনাত্যাশু ভূতগ্রামাংশ্চতুর্বিধান্॥
(ইতি পদ্মোত্তরখণ্ডম্।)

সুরসা তুলসীর চিত্র প্রবন্ধপার্শ্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সুতরাং উহারই দেশভেদে নাম লিখিত হইল :—হিন্দুস্থানে, গুজরাটে, বঙ্গদেশে, তামিলে, দাক্ষিণাত্যে—তুলসী, তুল্‌সী। তৈলঙ্গে—গগমচেট্টু, তুলসী। মহারাষ্ট্রে—তুলস, তুলসী চেঝাড়। কর্ণাটে—রেড্ তুলসী। ফারসীতে—রেহান্। আরবীতে—উল্‌সী বদ্‌রুত্। ইংরেজীতে—হোয়াইট্ ব্যাসিল।

বেল।

[কবিরাজ শ্রীযুত আশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

আমাদের দেশে বেল অতি প্রসিদ্ধ দ্রব্য। বেল চেনেন না, এমন লোক এ দেশে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; সুতরাং ইহার পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। বেলগাছের জন্য বিশেষভাবে চাষ আবাদ করিতে হয় না, জঙ্গলেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ইহার ফল, পাতা, শাখা প্রভৃতি আমাদের দেশে বহুপ্রয়োজনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অতএব ইহা যে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। পাকা বেল অতি সুস্বাদু, সুগন্ধি ও মুখরোচক; কচি বেলপোড়া উদরাময়ে বিশেষ হিতকর; বেলপাতা দেব-পূজায় অবশ্য প্রদেয়। ইহার শাখায় মানবকের দণ্ড, গুঁড়িতে বৃষোৎসর্গের যূপকাষ্ঠ ও শুষ্ককাষ্ঠে হোমকাষ্ঠ প্রস্তুত হয় এবং বেলের আটা চিত্রকরগণ প্রতিমার "বার্ণিশ"-রূপে বহুল ব্যবহার করিয়া থাকে। সুতরাং লৌকিককার্য্য সম্পাদনার্থে সর্ব্বদাই বেল আমাদিগের সমধিক উপকারী।

ইহা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানে—বেল, মহারাষ্ট্রে—বেলবৃক্ষ ও বেল্লফল, গুজরাটে—বিলোবিলু, কর্ণাটে—বেললু, তৈলঙ্গে—মারেডীপন্দুবিল্ব, তামিলে—বিল্বপাঝাম ও ল্যাটিনে—Aragle Marmelos।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ ঔষধার্থ ইহার মূল, পত্র ও ফলের উল্লেখ যথেষ্ট করিয়াছেন। ক্রমশঃ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"বিল্বমূলং ত্রিদোষঘ্নং ছর্দ্দিঘ্নং মধুরং লঘু।"
(ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।)

বেলের মূল বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মানাশক, বমননিবারক, মধুর রস ও লঘুগুণযুক্ত।

"বিল্বমূলং ত্রিদোষঘ্নং মধুরং লঘু বাতনুৎ।"
(রাজনিঘণ্টুঃ।)

বেলের মূল ত্রিদোষনাশক, মধুররসবিশিষ্ট ও লঘু, বিশেষতঃ ইহা বায়ুনাশক।

মহর্ষি অগ্নিবেশও চরকসংহিতায় শোথনাশকবর্গের মধ্যে বেলের মূলের উল্লেখ করিয়াছেন, "পাটলাগ্নিমন্থশ্যোণাক বিল্বকাশ্মর্য্যকণ্টকারিকাবৃহতীশালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণীগোক্ষুরকা ইতি দশেমানি শ্বয়থুহরাণি ভবন্তি।"
(চ, সূ, ৪র্থ অঃ।)

পারুল, গণিয়ারী, শ্যোণা, বেল, গাম্ভারী, কণ্টকারী, বৃহতী, শালপর্ণী, চাকুলে ও গোক্ষুর, এই দশটি (যাহা সচরাচর দশমূল নামে অভিহিত) শোথনাশক।

বেলের অপক্ক ফলই সমধিক উপকারী এবং পাকা বেল অপকারী বলিয়া আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে এবং আমরাও চিকিৎসাক্ষেত্রে ইহা বহুশঃ উপলব্ধি করিয়াছি।

"বিল্বস্য চ ফলং চাম্লং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনম্।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং তীক্ষ্ণং বাতকফাপহম্॥
বিদ্যাত্তদেব সম্পক্বং মধুরানুরসং গুরু।
বিদাহি বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতম্॥"
(ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।)

বেলের ফল অম্লরসযুক্ত, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী (মলসংগ্রাহক), অগ্নিদীপক, কটু, তিক্ত ও কষায় রসবিশিষ্ট, তীক্ষ্ণ এবং বায়ু ও কফনাশক।

পাকা বেল মধুরানুরস, গুরু, বিদাহজনক, বিষ্টম্ভ- (উদরের স্তব্ধতা) কারক, দোষজনক ও দুর্গন্ধি বায়ু-নিঃসারক।

"গ্রাহিণী কফবাতামশূলঘ্নী বিল্বপেশিকা।
বালং বিল্বফলং গ্রাহি দীপনং পাচনং কটু॥
কষায়োষ্ণং লঘু স্নিগ্ধং তিক্তং বাতকফাপহম্।
পক্বং গুরু ত্রিদোষং স্যাদ্দুর্জ্জরং পূতিমারুতম্॥
বিদাহী বিষ্টম্ভকরং মধুরং বহ্নিমান্দ্যকৃৎ।
ফলেষু পরিপক্বং যদ্‌গুণবত্তদুদাহৃতম্॥

বিল্বাদন্যত্র বিজ্ঞেয়মামং তদ্ধি গুণাধিকম্।
দ্রাক্ষাবিল্বশিবাদীনাং ফলং শুষ্কং গুণাধিকম্॥
(ভা, পূ, খ।)

বেলশুঁঠ গ্রাহী, কফ, বায়ু, আম ও শূলনাশক। কচি বেল গ্রাহী, অগ্নিদীপক, পাচক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, স্নিগ্ধ, কটু, কষায় ও তিক্তরসবিশিষ্ট এবং কফ ও বায়ুনাশক।

পাকা বেল গুরু, ত্রিদোষজনক, দুর্জ্জর (সহজে পরিপাক হয় না), দুর্গন্ধি বায়ু-নিঃসারক, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারী, মধুর রস-যুক্ত এবং অগ্নিমান্দ্য-জনক।

বিল্ববৃক্ষ।

ফলের মধ্যে পাকা ফলই যে সমধিক গুণ-যুক্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা বেল ভিন্ন অন্যত্র বুঝিতে হইবে। কচি বেলই অধিক গুণযুক্ত। অধিকন্তু দ্রাক্ষা, বেল, হরীতকী প্রভৃতি ফল শুষ্কই প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। শাস্ত্রকার আরও বলেন :—

"বিল্বং দুর্জ্জরং সিদ্ধন্তু দোষলং পূতিমারুতম্।
স্নিগ্ধোষ্ণতীক্ষ্ণন্তদ্ বালং দীপনং কফবাতজিৎ॥"
(চ, সূ, ২৭ অঃ।)

পাকা বেল দুর্জ্জর, দোষযুক্ত ও দুর্গন্ধি বায়ুনিঃসারক। কচি বেল স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, অগ্নিদীপক, কফ ও বায়ুনাশক।

"কফানিলহরং তীক্ষ্ণং স্নিগ্ধং সংগ্রাহি দীপনম্।
কটুতিক্তকষায়োষ্ণং বালবিল্বমুদাহৃতম্॥
তদেব বিদ্যাৎ সম্পক্বং মধুরানুরসং গুরু।
বিদাহী বিষ্টম্ভকরং দোষকৃৎ পূতিমারুতম্॥
(চক্র-দ্রব্যগুণ-সংগ্রহ।)

কচি বেল তীক্ষ্ণ, স্নিগ্ধ, সংগ্রাহী, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত শ্লেষ্মা ও বায়ুনাশক।

পাকা বেল মধুরানুরস, গুরু, বিদাহী, বিষ্টম্ভকারী, দোষ-বর্দ্ধক ও দুর্গন্ধি বায়ুনিঃসারক।

"পক্বং সুদুর্জ্জরং বিল্বং দোষলং পূতিমারুতম্।
দীপনং কফবাতঘ্নং বালং গ্রাহ্যুভয়ং হি তৎ॥"
(অষ্টাঙ্গ, সং সূত্রস্থান।)

পাকা বেল অত্যন্ত দুর্জ্জর, দোষযুক্ত এবং দুর্গন্ধি বায়ু-নিঃসারক। কচি বেল অগ্নিবর্দ্ধক, কফ ও বায়ুনাশক এবং এই উভয়বিধ বেলই মলসংগ্রাহক।

মহর্ষি অগ্নিবেশ বেলশুঁঠ অর্শোনাশক বলিয়াছেন,—
কূটজবিল্বচিত্রক.........দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।"
(চ, সূ, ৪, অঃ।)

মহামতি সুশ্রুতও বেলশুঁঠ পক্কাতিসারনাশক, সন্ধানীয়, পিত্তে হিতকর এবং ব্রণপূরক বলিয়াছেন।—অম্বষ্ঠাধাতকী-সমঙ্গাকট্বঙ্গমধুকবিল্বপেশিকা.........

গণৌ প্রিয়ঙ্গ্বম্বষ্ঠাদী পক্কাতিসার নাশনৌ।
সন্ধানীয়ৌ হিতৌ পিত্তে ব্রণানাঞ্চাপি রোপণৌ॥

ইদানীং পাশ্চাত্যচিকিৎসকগণও এক্স্ট্রাক্ট্ বেল -পাল্ভ বেল প্রভৃতি রূপে কচি বেল ঔষধার্থ যথেষ্ট ব্যবহার করিতেছেন।

এতাবৎ পর্য্যালোচনায় দেখা গেল যে, কচি বেলই ঔষধার্থ উপযোগী এবং বিশেষ হিতকর। অনেকে বলেন, পাকা বেল কোষ্ঠপরিষ্কারক। এস্থলে এইটুকু বলা যায় যে, পাকা বেল অত্যন্ত গুরু ও দুর্জ্জর, সুতরাং উহা নিজের গুরুত্ব-নিবন্ধন সম্যক্ পরিপাক না হইয়াই মলরূপে বহির্গত হয়। ইহাও নিশ্চিত যে, পাকা বেল খাইলে যে বাহে হয়, তাহার পর পেটের লঘুত্ব ও কোষ্ঠপরিষ্কারজনিত স্ফূর্ত্তি বোধ হয় না। সুতরাং এ বিষয়ে শাস্ত্রের সহিত মতভেদের কোনই কারণ নাই।

যদিও চিকিৎসাশাস্ত্রে বেলপাতার পৃথক্ গুণবর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি ঔষধার্থ ব্যবহৃত যোগা-বলীতে উহার প্রয়োগ দেখিয়া কার্য্যকরী শক্তি অনুমান করিয়া লইতে হইবে।

"বৃষার্কৈরন্তবিল্বানাং পত্রক্কাথৈশ্চ সেচয়েৎ।"
(চ, চি, ৯ম অঃ।)

বাসক, এরণ্ড ও বিল্ব, ইহাদের পত্রের ক্বাথে সেক দিবে।

বিল্বপত্ররসং পূতং সোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্সঙ্গে চৈব দুর্ণাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাস্বপি॥
(চক্রদত্ত, শোথ, চি।)

ত্রিদোষজ শোথ, কোষ্ঠবদ্ধ, অর্শঃ এবং কামলাব্যাধিতে বেলপাতা রস করিয়া ছাঁকিয়া মরিচচূর্ণসহ প্রয়োগ করিবে।

মাত্র বেলপাতার রসের এতগুলি ব্যাধিনাশের ক্ষমতা আছে, সুতরাং ইহার শক্তি সহজেই অনুমেয়।

প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে আমি একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী দেখিতে পাই। লোকটি দুই বৎসর যাবৎ জ্বরে ভুগিতেছিল; প্লীহা ও যকৃৎ খুবই বড়, শরীরে রক্ত আদৌ ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেক চিকিৎসার পর হতাশ হইয়া চিকিৎসা ত্যাগ করিয়াছিল। যখন আমাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন জনৈক প্রাচীন ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৴০ এক ছটাক বেলপাতার রস পান কর এবং একাদশীর দিনে উপবাস কর।" প্রায় চারি মাস পরে পুনরায় তাহার সহিত দেখা হইলে, প্রথমতঃ তাহাকে চিনিতেই পারি নাই। পরিচয়ের পর শুনিলাম, উক্ত নিয়মপালনে তিনমাস মধ্যেই সে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছে। শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়াছে।

আর একটি বন্ধুর মুখে গল্প শুনিয়াছি, "একটি লোক পাগলের মত ছিল, কিছুই খায় না, মাত্র প্রত্যহ ৴০ পোয়া আন্দাজ বেলপাতার রস খাইয়া থাকিত, এই অবস্থায় সে প্রায় ৩।৪ বৎসর জীবিত আছে।"

অতএব বেলপাতার যে কেবল ব্যাধিনাশিকা শক্তি আছে, তাহা নহে; ইহার জীবনরক্ষিণী শক্তিও যথেষ্ট।

আমরা বাল্যকাল হইতেই শুনিতে পাই যে, তপস্বিগণ নির্জ্জনকাননে মাত্র বেলপাতা খাইয়া জীবনধারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীভগবানের ধ্যানে নিরত থাকেন। তাহার উপর এই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া বেলপাতার ব্যাধিনাশিনী ও প্রাণ-রক্ষিণী শক্তির কথা অবিশ্বাস করিতে পারি না।

সুতরাং সর্ব্বদা প্রয়োজনীয়, সুলভ অথচ মহোপকারী এই দ্রব্যের ব্যবহার-প্রণালী যাহাতে সকলেই অবগত হইতে পারেন, সেইজন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা। ইহা দ্বারা কাহারও অণুমাত্র উপকার সাধিত হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

নিম।

[কবিরাজ শ্রীযুত আশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

নিমগাছ।

বেলের ন্যায় নিমও আমাদের নিতান্ত অপরিচিত বৃক্ষ নহে; ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জন্যও যত্ন করিতে হয় না, এই অযত্নোৎ-পন্নবৃক্ষ জঙ্গলেও প্রচুর জন্মে। বোধ হয়, আমাদের দেশের প্রত্যেকেই নিমগাছ বিশেষরূপে চেনেন; কিন্তু ইহার মূল হইতে ফল পর্য্যন্ত প্রতি অবয়বই যে আমাদের কত

প্রয়োজনীয়, তাহা সকলে অবগত নহেন। যাহাতে প্রত্যেকেই এই অনায়াসলব্ধ দ্রব্যের গুণাবলী ও উপকারিতা কিয়ৎপরিমাণে অবগত হইতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

ইহাকে বঙ্গদেশে—নিম, মহারাষ্ট্রে—কড়ুনিম্ব ও লিম্ব, কর্ণাটে—বেড়্, তৈলঙ্গে—টিয়্যচট্টুবেবা, তামিলে—বেপ্পম-মরম, পারসীভাষায়—নেনব্ নিম দরখ্‌ত হবগয়্রমতব ও সরগরম, ইংরেজীতে—Neem Tree এবং ল্যাটিনে Melio Azadirechta বলে।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহা পিচুমর্দ্দ, পিচুমন্দ, তিক্তক, অরিষ্ট, পারিভদ্র, হিঙ্গুনির্য্যাস ও নিম্ব প্রভৃতি নামে অভিহিত। ইহা তিক্তরস, লঘু, মলসংগ্রাহক, পাকে কটু ও বায়ুবর্দ্ধক। তৃষ্ণা, কাস, অরুচি, জ্বর, ক্রিমি, পিত্ত ও শ্লেষ্মনাশক। ব্রণ, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও বমিবিনাশার্থ ইহা সমধিক উপযোগী। অক্ষিরোগ, ক্রিমি, পিত্ত, বিষদুষ্টি, অরুচি ও কুষ্ঠরোগে নিমপাতার উপকারিতা বহুশঃ উপলব্ধি হয়।

"নিম্বো নিয়মনো নেতা পিচুমন্দঃ সুতিক্তকঃ।
অরিষ্টঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ প্রভদ্রঃ পারিভদ্রকঃ॥
নিম্বস্তিক্তরসঃ শীতো লঘুঃ শ্লেষ্মাস্রপিত্তনুৎ।
কুষ্ঠকণ্ডুব্রণান্ হন্তি লেপাহারাদিশীতলঃ।
অপক্বং পাচয়েৎ শোফং ব্রণং পক্বং বিশোধয়েৎ॥"
(ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।)

নিম্ব, নিয়মন, নেতা, পিচুমন্দ, সুতিক্তক, অরিষ্ট, সর্ব্বতোভদ্র, প্রভদ্র ও পারিভদ্রক, এইগুলি নিমের নামান্তর। নিম তিক্তরস, শীতবীর্য্য ও লঘু। ইহা শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডু, এবং ব্রণনাশক; প্রলেপ ও আহারাদিবিষয়ে শীতল এবং ইহাতে অপক্ব শোথ (ফোড়া প্রভৃতি) পাকে, পক্ব শোথ ও ব্রণ শোধিত হয়।

"প্রভদ্রকঃ প্রভবতি শীততিক্তকঃ
কফব্রণ-ক্রিমিশোফশান্তয়ে।
বলাসভিদ্বহুবিধপিত্তদোষজিৎ
বিশেষতো হৃদয়বিদাহশান্তিকৃৎ॥"
(রাজনিঘণ্টুঃ।)

প্রভদ্রক অর্থাৎ নিম—শীতবীর্য্য ও তিক্তরসবিশিষ্ট; কফ, ব্রণ, ক্রিমি, বমি ও শোথ বিনাশ করিতে সমর্থ। ইহা শ্লেষ্মার ভেদক ও পিত্তের বহুবিধ দোষবিনাশক, বিশেষতঃ হৃদয়বিদাহ (বুকজ্বালা) নিবারক।

"নিম্বঃ শীতো লঘুর্গ্রাহী কটুপাকোঽগ্নিবাতনুৎ।
অহৃদ্যঃ শ্রমতৃট্‌কাসজ্বরারুচিক্রিমিপ্রণুৎ।
ব্রণপিত্তকফচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসমেহনুৎ।"
(ভাবপ্রকাশঃ।)

নিম—শীতবীর্য্য, লঘু, ধারক, কটুবিপাক, অগ্নি ও বায়ু-নাশক এবং অহৃদ্য। ইহা শ্রান্তি, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি, ক্রিমি, ব্রণ, পিত্ত, কফ, বমি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস (বিবমীষা) ও প্রমেহনাশক।

"নিম্বপত্রং স্মৃতং নেত্র্যং ক্রিমিপিত্তবিষপ্রণুৎ।
বাতলং কটুপাকঞ্চ সর্ব্বারোচককুষ্ঠনুৎ॥"
(ভাবপ্রকাশঃ।)

নিমের পাতা চক্ষুর হিতকারক, বায়ুবর্দ্ধক ও পাকে কটু। ইহা ক্রিমি, পিত্ত, বিষ, সর্ব্ববিধ অরুচি ও কুষ্ঠব্যাধি নাশ করে।

"নিম্বফলং রসে তিক্তং পাকেতু কটু ভেদনম্।
স্নিগ্ধং লঘূষ্ণং কুষ্ঠঘ্নং গুল্মার্শঃক্রিমিমেহনুৎ।"
(ভাবপ্রকাশঃ।)

নিমের ফল তিক্তরস, পাকে কটু, ভেদক, স্নিগ্ধ, লঘু ও উষ্ণবীর্য্য। ইহা কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, ক্রিমি ও প্রমেহবিনাশক।

"চন্দননলদকৃতমালনক্তমালনিম্বকুটজসর্ষপমধুকদারুহরিদ্রা-মুস্তানীতি দশেমানি কণ্ডুঘ্নানি ভবন্তি॥"
(চ, সূ, ৪র্থ অঃ।)

চন্দন, উশীর, সোঁদালু, করঞ্জ, নিম, কুড়্চি, সর্ষপ, যষ্টিমধু, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দশটি কণ্ডুবিনাশক॥

"করঞ্জকিংশুকারিষ্টফলং জন্তুপ্রমেহনুৎ॥"
(সু, সূ, ৪৬শৎ অঃ।)

করঞ্জ, পলাশ ও নিমের ফল ক্রিমি ও প্রমেহনাশক।

"আরগ্বধমদন সপ্তপর্ণনিম্ব সুষবী চেতি—
আরগ্বধাদিরিত্যেষ গণঃ শ্লেষ্মবিষাপহঃ।
মেহকুষ্ঠজ্বরবমী কণ্ডুঘ্নো ব্রণশোধনঃ॥"
(সু, সূ, ৩৮শৎ অঃ।)

এই আরগ্বধাদিগণ শ্লেষ্মা, বিষ, মেহ, কুষ্ঠ, জ্বর, বমি ও কণ্ডুবিনাশক এবং ব্রণশোধক।

"গুড়ূচী নিম্ব… ….
এষ সর্ব্বজ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকবমীপিপাসাদাহনাশনঃ॥"
(সু, সূ, ৩৮শৎ অঃ।)

এই গুড়ূচ্যাদিবর্গ সর্ব্বপ্রকার জ্বর, হৃল্লাস (বিবমীষা), অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহনাশক এবং অগ্নিবর্দ্ধক।

আমাদের দেশেও একটি প্রবাদ আছে,—"বাটীর দক্ষিণে নিমগাছ থাকিলে সেই বাটীতে কোনই ব্যাধি হয় না।" এই প্রবাদটি সম্পূর্ণ অলীক বলিতে পারা যায় না, কারণ—হাম, বসন্ত, বিসর্প, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, জ্বর, মেহ প্রভৃতি অশেষবিধ

রোগে নিমের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব নিমের বাতাস যে বহুব্যাধিপ্রতিষেধক, তাহা সহজেই অনুমেয়।

পরীক্ষিত কয়েকটি প্রয়োগ।

১। নিমের মূল, ছাল বা পাতার রস ২ তোলা আন্দাজ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৮।১০ ফোঁটা মধু মিশাইয়া সেবন করিলে, ক্রিমি, কামলা (ন্যাবা), হাত পা জ্বালা, চক্ষুজ্বালা, ঘুসঘুসে ও পিত্তপ্রধান জ্বর প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয়।

২। চক্ষুর ভিতর চুলকাইলে নিমের পাতা ছেঁচিয়া যে ফেনবৎ রস নির্গত হয়, তাহাই চক্ষুর বাহিরে চারি পাশে প্রলেপ দিবে এবং ঐ রসের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ মধু মিশ্রিত করিয়া চক্ষুর ভিতরে অঞ্জন দিবে।

৩। বসন্তকালে নিমপাতা ভাজিয়া অথবা তবকাবীর সহিত ঝোল করিয়া খাইলে, বসন্তের আক্রমণ-আশঙ্কা খুবই কম থাকে।

৪। প্রত্যহ দুই বেলা নিমের ডাল চিবাইয়া তদ্দ্বারা দাঁতন করিলে, ক্রিমিদন্ত (দাঁতে পোকা লাগা) রোগে বিশেষ উপকার হয়।

৫। নিমপাতা বাটিয়া সাবানের মত গায়ে মাখিয়া প্রত্যহ স্নান করিলে, শরীরের চুলকণা নষ্ট হয় এবং হাম হইয়া সারিয়া যাওয়ার পর নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ একত্র বাটিয়া ৫।৭ দিন পর্য্যন্ত গায়ে মাখিলে চুলকণা, পাঁচড়া প্রভৃতি হইবার আশঙ্কা থাকে না।

৬। জ্বরে দাহ অধিক থাকিলে বিছানায় নিমপাতা ছড়াইয়া তদুপরি রোগীকে শয়ন করাইলে এবং কতকগুলি পত্রবহুল নিমের ছোট ছোট ডাল একত্র গোছা করিয়া তদ্দ্বারা ব্যজন করিলে দাহ অনেক কম হয়।

৭। নিমের পাকা ফল (যাহা তলায় ঝরিয়া পড়ে) কুড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া বীজগুলি লইয়া শুকাইয়া লইবে। পরে সেই শুষ্কবীজ ঘানিতে অথবা অন্য কোনও উপায়ে পেষণ করিলে যে তৈল বাহির হয়, সেই তৈল চুলকণা, পাঁচড়া, দুষ্টক্ষত প্রভৃতি রোগে সমধিক উপকারী।

* * * *

আর এক প্রকার নিম আছে, তাহাকে চলিত ভাষায় মহানিম বা ঘোড়ানিম বলে। তাহার শাস্ত্রীয় নাম —মহানিম্ব, দ্রেকা, রম্যক, বিষমুষ্টিক, কেশমুষ্টি, নিম্বক, কার্ম্মুক ও অক্ষীব। ইহাকে হিন্দুস্থানে—বকাইন্ ও বকায়ন, মহারাষ্ট্রে—ডোঁবাচা, নিম্বাচাঝাড় ও কটুনিম্ব, তৈলঙ্গে—গাঙ্গারাবিচেট্টু, পোদ্দবেপচেট্টু ও কাণ্ডবেয়, দাক্ষিণাত্য হিন্দীতে —গৌরীনিম্, তামিলে—মলাইবেম্বু, গুজরাটে—বকাণ্ড, কর্ণাটে—মহারেউ, পারসীতে—আজাদ্দরখ্ত, আরবীতে—বান ও ল্যাটীনে Melia Azendarach বলে।

"মহানিম্বো রসেতিক্তঃ শীতপিত্তকফাপহঃ।
কুষ্ঠরক্তবিনাশী চ বিসূচীং হন্তি শীতলঃ॥"

(ধন্বন্তরীয় নিঘণ্টুঃ।)

মহানিম তিক্তরস ও শীতবীর্য্য। ইহাতে শীতপিত্ত, কফ, কুষ্ঠ, দূষিতরক্ত এবং বিসূচিকা নষ্ট হয়।

"মহানিম্বস্তু শিশিরঃ কষায়ঃ কটুতিক্তকঃ।
অস্রদাহবলাসঘ্নো বিষমজ্বরনাশকঃ॥"

(রাজনিঘণ্টুঃ।)

মহানিম শীতবীর্য্য, কষায়, কটু এবং তিক্তরসবিশিষ্ট; দূষিতরক্ত, দাহ, শ্লেষ্মা ও বিষমজ্বরনাশক।

"মহানিম্বো হিমো রুক্ষস্তিক্তোগ্রাহী কষায়কঃ।
কফপিত্তভ্রমচ্ছর্দ্দিকুষ্ঠহৃল্লাসরক্তজিৎ॥
প্রমেহশ্বাসগুল্মার্শো মূষিকবিষনাশনঃ॥"

(ভাবপ্রকাশঃ।)

মহানিম শীতবীর্য্য, রুক্ষ, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত এবং মলসংগ্রাহক। ইহা কফ, পিত্ত, ভ্রমরোগ, বমি, কুষ্ঠ, বিবমীষা, রক্তদোষ, প্রমেহ, শ্বাস, গুল্ম, অর্শঃ ও মূষিকবিষ নাশক।

"পিপ্পলীপিপ্পলীমূলচবাচিত্রকশৃঙ্গবেরমরিচহস্তিপিপ্পলীহরেণু কৈলাজমোদেন্দ্রযবপাঠাজীরকসর্ষপ-মহানিম্বফলহিঙ্গুভার্গীমধুরসাতিবিষাবচাবিড়ঙ্গানি কটুরোহিণী চেতি—"

"পিপ্পল্যাদিঃ কফহরঃ প্রতিশ্যায়ারোচকজ্বরান্।
নিহন্ত্যগ্নিদীপনো গুল্মশূলঘ্নস্ত্বামপাচনঃ॥"

(সু, সূ, ৩৮শং অঃ।)

এই পিপ্পল্যাদিগণ কফনাশক এবং প্রতিশ্যায়, অরুচি, জ্বর, গুল্ম ও শূল নষ্ট করে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক ও পাচক।

প্রসঙ্গক্রমে এই পিপ্পল্যাদিগণের একটি পরীক্ষিত প্রয়োগ সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে লিখিত হইল :—

পিপুল, পিপুলমূল, চই, রক্তচিতার মূল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপুল, রেণুক, বড়এলাচ, যমানী (যোয়ান,) ইন্দ্রযব আকনাদিমূল, জীরা, শ্বেতসর্ষপ, মহানিমের ফল, ঘৃতে ভাজা হিং, বামুনহাটীমূল, সুচমুখীমূল, আতইস, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটুকী, প্রত্যেক ।/১০ দেড় আনা বা ৯ রতি ওজনে লইয়া একত্র ছেঁচিয়া, ৷৷॰ সের জলে মৃৎপাত্রে কাঠের মৃদুজ্বালে সিদ্ধ করিয়া ।৴॰ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া সেই কাথ ঈষদুষ্ণ সেবন করিলে, প্রসবান্তে অতিরিক্ত স্রাব, অধঃস্রাবজন্য কোমরে ও তলপেটে বেদনা, জ্বর, কাস প্রভৃতি উপদ্রব অচিরে নষ্ট হয়।

ধর্ম্ম।

আজকাল ধর্ম্মের নামে অনেকে শিহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের ধারণা, ধর্ম্মটা চতুর বামুনদিগের লোককে ঠকাইবার একটা চাতুরীমাত্র। ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে হইলেই পুরোহিত মহাশয়কে চাউলকলাপূর্ণ নৈবেদ্য আর রজতমুদ্রা রূপ দক্ষিণা দিতে হয়। ইহা ভিন্ন নানা নিয়ম-কানুনের বজ্র-আঁটুনীতে আপনাকে বদ্ধ করিতে হয়। সকল ধর্ম্মই মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কতকটা লুপ্ত করিয়া দেয়,—হিন্দুধর্ম্ম মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কোনমতেই স্ফূর্ত্তি পাইতে দেয় না; আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে, সকল কাজেই হিন্দুরা বিধি-নিষেধের বজ্রবন্ধনে বদ্ধ,—তাহারা যেন সকল কাজেই একরূপ আড়ষ্টভাবে জীবন কাটায়,—কোন দিকেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে বিকাশ পাইতে দেয় না। সেইজন্যই আজকালকার শিক্ষিতসম্প্রদায় ধর্ম্মের নামে ভীত হইয়া পড়েন।

বাস্তবিকই ধর্ম্ম কি বড় ভয়ের জিনিষ? যদি উহা ভয়ের জিনিষ হইত, তাহা হইলে হিন্দুদিগের ন্যায় প্রাচীন জাতি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এত ব্যগ্র ও ব্যস্ত হইতেন না। হিন্দুদিগের চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ধর্ম্মই প্রধান। মানুষ সংসারে চারিটি জিনিষ চায়। এই চারিটি জিনিষকে চতুর্ব্বর্গ বলে। উহার প্রথম—ধর্ম্ম, দ্বিতীয়—অর্থ, তৃতীয়—কাম ও শেষ—মোক্ষ। মানুষের প্রথম ও প্রধান কাম্য—ধর্ম্ম; দ্বিতীয় কাম্য—অর্থ অর্থাৎ ঐহিক ধনজনিত সৌভাগ্য; তৃতীয় কাম্য—কাম অর্থাৎ বিষয়াদির ভোগ; চতুর্থ—মোক্ষ অর্থাৎ মৃত্যুর পর নিত্যসুখ-প্রাপ্তি বা ভববন্ধন হইতে মুক্তি। পাঠক দেখিবেন যে, চারিটি জিনিষ মানুষ চায়,—তাহার মধ্যে ধর্ম্মই প্রধান। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে,—ধর্ম্ম কি? আমরা দেখিতে পাই, শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে এই কথার উত্তর দিতে পারেন না। তাহারা কেহ কেহ ইহার উত্তর দিয়া থাকেন,—শাস্ত্রসম্মত আচার-ব্যবহারকেই ধর্ম্ম বলে। কেহ বলেন,—সৎকর্ম্মই ধর্ম্ম। কেহ বা বলেন,—ভগবানের উপাসনা বা নামকীর্ত্তনই ধর্ম্ম; ইহা ধর্ম্মের অন্তর্গত কার্য্য বটে,—কিন্তু ধর্ম্ম বলিলে কেবল ঐরূপ অনুষ্ঠান বুঝায় না,—উহা ভিন্ন আরও অনেক ব্যাপার ধর্ম্মের অন্তর্গত। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা ধর্ম্মশব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Religion কথাটা আগে জানিয়া লই। ঐ ইংরেজী শব্দটির অর্থ ভগবানে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রীতিজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান। ইংরেজী Religion শব্দের সহিত ধর্ম্মশব্দের সাদৃশ্য আছে সত্য, কিন্তু ঐ দুইটি শব্দ ঠিক একার্থবোধক নহে। ঐ দুইটি শব্দের মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে। কাজেই Religion কথাটার অর্থ বুঝিলেই ধর্ম্ম কথার অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। অধিকন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমরা Religion কথাটার অর্থও ভাল করিয়া বুঝি না। কেবল ধর্ম্ম অর্থে Religion আর Religion অর্থে ধর্ম্ম, এইরূপ কথার পাল্টাপাল্টি করিয়া কোন শব্দটারই অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করি না। তাই ধর্ম্ম লইয়া এত গোল ঘটে।

ধর্ম্ম কি,—তাহা বুঝিতে হইলে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানিতে হয়। ধৃ ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে মন্ প্রত্যয় করিয়া ধর্ম্মশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ অবস্থান করা বা থাকা। সুতরাং ধর্ম্মশব্দের মৌলিক অর্থ—যাহার দ্বারা থাকা যায়, যাহার অভাবে থাকা যায় না। যথা:—অগ্নির ধর্ম্ম তাপ। উত্তাপের দ্বারাই অগ্নির অস্তিত্ব বুঝা যায়। উত্তাপ না থাকিলে অগ্নি নাই, ইহা বুঝা যায়। মানুষের সেইরূপ কতকগুলি ব্যাপার আছে,—তাহাকে মানুষের ধর্ম্ম বলা যায়। মানুষের যে সকল ধর্ম্ম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্ম পশুতেও আছে; যথা:—আহার, নিদ্রা প্রভৃতি। সুতরাং এ ধর্ম্মগুলিকে পশুধর্ম্ম বা পাশবধর্ম্ম বলিলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। কিন্তু মানুষের কতকগুলি বিশেষত্বও আছে। সেগুলি অন্য কোন পশুতে নাই। উহাই মানুষের মনুষ্যত্ব। যাহার দ্বারা সেই মনুষ্যত্ব বজায় থাকে,—তাহাই মানুষের ধর্ম্ম। ইহাই সংক্ষেপে ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মের অনুশীলন করিলে মানুষের মনুষ্যত্ব বজায় থাকে,—অধিকন্তু মানুষ ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করে। হিন্দুর দর্শনশাস্ত্রে অর্থাৎ বিচারশাস্ত্রে ধর্ম্মের ঠিক ঐরূপ লক্ষণই উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"যত অভ্যুদয় নিঃশ্রেয়স সিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।"

বৈশেষিকদর্শন।

যাহা হইতে জীবের সকল প্রকার উন্নতি ও মুক্তি ঘটে, তাহাই ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্ম ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। উপনিষদও ঠিক কথাই বলিয়াছেন। যথা:—

"ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা, ধর্ম্মেণ পাপংনুদতি, ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। তস্মাদ্ ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।

ধর্ম্মই এই নশ্বর বিশ্বের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতিশক্তি। ধর্ম্মের দ্বারা পাপ বা অমঙ্গল প্রতিহত হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তু ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেইজন্য ধর্ম্মকেই পরমবস্তু বলা হয়। যাঁহারা বেদকে আদিম কবির গান বা গাথা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহারা হয় ত ইহা কবির অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু কোনকালেই বেদকে প্রকৃতির গৌরবস্তম্ভিত সরলস্বভাব অসভ্য কবির গান মনে করেন নাই। পরন্তু প্রাচীন ঋষি, দার্শনিক প্রভৃতি মনস্বীরা বেদকে অপৌরুষেয় সত্যের প্রকাশক বলিয়া উহার উক্তি অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। সেই বেদই যখন বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মই এই

গমনশীল (অর্থাৎ যাহা স্থায়ী নহে) বিশ্বের সত্তা রক্ষা করিতেছে; ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে বলিয়াই সকল বস্তুর সত্তা আছে;—তখন ধর্ম্মশব্দের মৌলিক অর্থই হিন্দুর গ্রাহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে কালবশে সেই ধর্ম্মের অর্থ একটু সঙ্কীর্ণ হইয়াও গিয়াছে। মানুষে পশুত্ব ও দেবত্ব (আধ্যাত্মিকতা), এই দুইই আছে। যদি বলা যায় যে, অপকারীর প্রতি ক্রোধ করাই মানুষের ধর্ম্ম,—তাহা হইলে তাহা মানুষের মনুষ্যত্বের ধর্ম্ম—এ কথা কেহ বুঝে না, তাহা মানুষের ভিতর যে পশুত্ব আছে, তাহারই ধর্ম্ম—ইহা বলা হয়। পশুতেও ঐ ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। কিন্তু যদি বলা যায়, ক্ষমাই মানুষের ধর্ম্ম, তখন উহা মানুষের মধ্যে যে দেবভাবে আছে—তাহারই ধর্ম্ম, ইহা বুঝিতে হইবে। পশুর ক্ষমাগুণ নাই। সেইরূপ দমগুণ বা প্রবৃত্তি প্রভৃতি দমন করিবার শক্তি পশুর নাই। মানুষের আছে,—সুতরাং উহাও মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। আসল কথা, মনুষ্যত্ব থাকিলে ঐ সকল গুণ সহজেই ব্যক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য মনু বলিয়াছেন:—

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥"

ধৃতি বা ধৈর্য্য, ক্ষমা, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য, ক্রোধহীনতা বা শান্তভাব, এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ অর্থাৎ ঐ দশটি গুণ যাহার আছে, সে ধার্ম্মিক, একথা বলা যায়। এক কথায় এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অন্তঃকরণে যে ভাব বিকশিত হইলে এইরূপ গুণগুলি স্ফূর্ত্তি পায়, তাহাই ধর্ম্মভাব। এই ধর্ম্মভাবকে প্রবল করিতে হইলে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহাই ধর্ম্মকার্য্য।

এখন ধর্ম্মভাব কাহাকে বলে, তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বাহ্যব্যাপার দেখিয়া অনেক সময় ভিতরের ধর্ম্মভাব বুঝা যায় না। মনে করুন, অস্তেয় ধর্ম্মের একটা লক্ষণ। যেন তেন প্রকারেণ পরকে ফাঁকি দিয়া তাহার জিনিষটি লইবার প্রবৃত্তির নাম স্তেয়। এই প্রবৃত্তিশূন্যতার নাম অস্তেয়। কিন্তু মনে করুন, রাম কাহারও দ্রব্য ফাঁকি দেয় না বা চুরি করে না, কিন্তু তাহার মনের ভিতর অন্যকে ফাঁকি দিবার বা অন্যের অগোচরে তাহার প্রতিবেশীর দ্রব্য লইবার লোভটি বিলক্ষণ আছে, তবে জেলের বা লোকলজ্জার ভয়ে সে তাহা পারে না। এরূপ স্থলে রামকে ধার্ম্মিক বলা যায় না। তবে সে যতক্ষণ চুরি না করিতেছে, ততক্ষণ সামাজিক হিসাবে আমরা তাহাকে ভাল লোক বলিতে বাধ্য হইলেও, তাহাকে কখনই ধার্ম্মিক লোক বলিতে পারি না। এমন কি, শ্যামের কোন জিনিষ দেখিয়া যদি রামের মনে হয়, "আহা ঐ জিনিষটা যদি শ্যাম আমাকে দিত, তাহা হইলে ভাল হইত," তাহা হইলেও রামকে আমরা ধার্ম্মিক লোক বলিতে পারি না। তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, রামের মনে লোভ আছে,—চুরি করিবার প্রবৃত্তিও একটু একটু আছে। তবে রামের যদি ঐ দ্রব্য একান্ত আবশ্যক হয়, কিন্তু উহা কিনিবার ক্ষমতা তাহার না থাকে, তাহা হইলে সে যদি সরলভাবে উহা শ্যামের নিকট চাহে বা তাহার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হয় যে, আমিও পরিশ্রম দ্বারা অর্থার্জ্জন করিয়া ঐরূপ দ্রব্য ক্রয় করিব, তাহা হইলে রামের কোন দোষ হয় না। লোভই দোষের, প্রয়োজনানুভূতি বা অভাবমোচনচেষ্টা দোষের নহে। ঐরূপ ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যের অভাবই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, উহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য পূর্ণমাত্রায় থাকিলে কেবল ভয়ে বা সুযোগ ও পাত্রের অভাবে উহা চরিতার্থ না করাই ধর্ম্মের লক্ষণ নহে। এক কথায় কুবিষয়ে বা পাপে রতিও যেমন দোষের, মতিও তেমনই দোষের, নিবৃত্তিই ধর্ম্মের লক্ষণ। ধার্ম্মিক হইতে হইলে কুপ্রবৃত্তিগুলির দমন করা আবশ্যক।

সেইজন্য শাস্ত্র ধর্ম্মের মূলসম্বন্ধে বলিয়াছেন:—

"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমোভূতদয়া তপঃ।
ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমাধৃতিঃ॥
সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্।"

পরের অনিষ্টচিন্তার অভাব, লোভশূন্যতা, সংযম, জীবে দয়া, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, পরদুঃখে দুঃখবোধ (Sympathy), ক্ষমা ও ধৈর্য্য, এই দশটি সনাতন ধর্ম্মের মূল।

ধার্ম্মিকের এই দশটিই নিতান্ত আবশ্যক গুণ। কারণ, এই দশটি গুণ না থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে না, মানুষ প্রায় পশুতে পরিণত হয়। আজকাল আমাদের দেশে, সেই সনাতন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে এই গুণগুলি হ্রাস পাইয়াছে, তাই ধর্ম্মের অবনতি ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইতেছে। হিন্দুসমাজ শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে এবং হিন্দুজাতির সমৃদ্ধিও ক্ষয় পাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হইয়াই মানুষ বাস করে। সমাজই মানুষের জ্ঞানের উন্নতির কারণ। সমাজ আছে বলিয়াই এক জন মানুষ অন্য মানুষের লব্ধজ্ঞান দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। সমাজ আছে বলিয়াই মানুষ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু মানুষের কোন্ কোন্ গুণকে আশ্রয় করিয়া সমাজ অবস্থিতি করিতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? অদ্রোহ, অলোভ, দয়া, অনুক্রোশ ও ক্ষমা, এই পাঁচটি গুণই সামাজিক দিক্ হইতে নিতান্ত আবশ্যক। সামাজিকরা যদি পরস্পর পরস্পরের অনিষ্টচিন্তা করে, তাহা হইলে সে সমাজ কখনই টিকিতে পারে না। সে সমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। অলোভ বা লোভশূন্যতাও একটি সামাজিক গুণ। সমাজে যদি সকলে পরস্পর পরস্পরের ধনজনের উপর লোভ করে, তাহা হইলে সমাজে চুরী, ডাকাতী, বিশ্বাসঘাতকতা,

লাম্পট্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়,—লোক সমাজ ছাড়িয়া বনে বাস করিতে চায়। দয়া ও অনুক্রোশ, এই দুইটি ধর্ম্মও সামাজিক হিসাবে নিতান্তই আবশ্যক। লোককে বিপদাপদ্ হইতে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে দয়া বলে, আর পরদুঃখে দুঃখবোধ করাকে অনুক্রোশ বলে। এই দুইটি গুণই আমাদের সমাজে অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। দুর্ব্বলকে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই বলিলেও চলে। আমরা দয়া শব্দের অর্থটাও ভাল করিয়া বুঝি না। আজকাল একপ্রকার চিত্তদৌর্ব্বল্যই দয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ধরণের ভাক্ত-দয়ার প্রভাবে কোকেনখোর ভিক্ষা পায়, বদমায়েস্ সামাজিক শাস্তির হস্ত হইতে নিস্তার পায়। কিন্তু উহা প্রকৃত দয়া নহে। যে ব্যক্তি সত্য সত্যই বিপন্ন, তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহাই দয়া নামে অভিহিত। দয়্ ধাতুর অর্থ রক্ষা করা। পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছার নাম দয়া। গরীবের মেয়ে সুশীলা ও শান্তা। অর্থাভাবে পিতা তাহাকে সৎপাত্রে দিতে পারিতেছেন না, তিনি বাধ্য হইয়া উহাকে অত্যন্ত কুপাত্রে অর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন; সরলা বালিকা আমরণ দুঃখে নিমজ্জিতা হইতে বসিয়াছে। এরূপ স্থলে যদি কোন সমর্থ ব্যক্তি নিজের পুত্রের সহিত উহার বিবাহ দেন অথবা অর্থসাহায্য করিয়া উহাকে সৎপাত্রে ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহাতে তাঁহার দয়াপ্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পায়। এইরূপ বন্যাপীড়িত ও দুর্ভিক্ষপীড়িত এবং ব্যাধিপীড়িত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করাও দয়ার কার্য্য। সমাজের অবস্থাবিশেষ মুষ্টিভিক্ষা দেওয়াও দয়ার কার্য্য। অনুক্রোশ শব্দটির অর্থও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। অনুজন্যে অর্থাৎ পরের জন্য ক্রুশ্ = দুঃখ করা + অ ভাববাচ্যে অর্থাৎ অন্যের দুঃখে দুঃখানুভব। এই শব্দটি অনেকটা ইংরেজী Sympathy কথার অনুরূপ। যে সময় হইতে আমাদের সমাজের দুর্দ্দশা আরব্ধ হইয়াছে, সেই সময় হইতে আমাদের এই ধর্ম্মপ্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। শেষে আমাদের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, ঐ প্রবৃত্তির অনুভূতি ত লোপ পাইয়াছেই, পরন্তু উহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। এখন শব্দটা পর্য্যন্ত আমাদের কর্ণপটহবিদারী হইয়া পড়িয়াছে, জিহ্বা আর উহা উচ্চারণ করিতে চাহে না। কাজেই যখন আমরা ইংরেজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন ইংরেজী Sympathy কথাটা বুঝা বড় কষ্ট হইল। উহা যে কি, তাহা আমাদের অনুভূতির বাহিরে পড়িল। তখন উহার প্রতিশব্দ সৃষ্ট হইল,—"সহানুভূতি।" অপূর্ব্ব শব্দ বটে। বিষয়ের সহিত পরিচয় না থাকিলেই এইরূপ ঘটে। কিন্তু এই বৃত্তিটি অতি উচ্চবৃত্তি। ইহা সমাজের একটা প্রধান বন্ধন, আধ্যাত্মিকতার উন্নতিসাধনের প্রকৃষ্ট সহায়। আমরা যদি কন্যাভারপীড়িত পিতার ব্যাকুলতা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পারিতাম, যদি অসহায়া বিধবার মর্ম্মব্যথা বুঝিতে জানিতাম, যদি নিপীড়িতা বধূর অশ্রুর উষ্ণতা অনুভব করিতে শিখিতাম, যদি পীড়িতের কাতর ক্রন্দনের গভীরতা বুঝিতাম, যদি বিপন্নের ব্যাকুলতার অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতাম, —তাহা হইলে আজ হিন্দুসমাজের এ দশা হইত না। সকল সমাজের দিকে তাকাইয়া দেখ, সমস্ত সভ্যদেশে ও সভ্যসমাজে আর্ত্তের ও দুঃখীর দুঃখকষ্টমোচনের ব্যবস্থা আছে,—নাই কেবল এই হতভাগ্য হিন্দুসমাজে। দয়া ও অনুক্রোশের অভাবই হিন্দুসমাজের এই দুর্গতির কারণ। এই দুই প্রবৃত্তি হইতে দান করিবার ইচ্ছা জন্মে। দানই মানবের পরম ধর্ম্ম। সেইজন্য শাস্ত্রকার বলিয়াছেন,—

"দানধর্ম্মাৎ পরোধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে।"

ইহজগতে দানধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম আর নাই। সকল দানমধ্যে সাত্ত্বিকদানই শ্রেষ্ঠ। সাত্ত্বিকদান কাহাকে বলে?

"দাতব্যং ইতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।"

দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় যাহার নিকট কোন উপকার পাওয়া যায় নাই, উপকার পাইবার আশাও নাই, অপিতু যাহাকে দেওয়া উচিৎ, তাহাকে দান করাই সাত্ত্বিকদান অর্থাৎ প্রকৃত যাহাতে সমাজের উপকার হয়, এইরূপ দানই দান। সেইজন্য বর্ত্তমান সময়ে সমাজের অবস্থা বুঝিয়া যাহাতে কর্ম্মহীন কর্ম্ম পায়, আশ্রয়হীন আশ্রয় পায়, পীড়িত ব্যক্তিরা চিকিৎসিত হইতে পায়, এইরূপ প্রতিষ্ঠান (Institution) স্থাপনের জন্য দান করা কর্ত্তব্য। *

ইহা ভিন্ন অদ্রোহ, অলোভ, দম, তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ক্ষমা, ধৃতি, ইহাও সমাজের ও আধ্যাত্মিকতাবর্দ্ধনের সোপান। বারান্তরে আমরা তাহার আলোচনা করিব।

---

* কোন কোন শাস্ত্রে শাস্ত্রকার দানকেই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়াছেন, যথা :—

পাত্রে দানং মতিঃ কৃষ্ণে মাতাপিত্রোশ্চ পূজনম্।
শ্রদ্ধাবলির্গবাং গ্রাসঃ ষড়্বিধং ধর্ম্মলক্ষণম্।

যোগ্যপাত্রে দান, শ্রীকৃষ্ণে মতি, পিতামাতার সেবা, শ্রদ্ধা বলি, ও গোসেবা ধর্ম্মের এই ছয়টি লক্ষণ।

যোগশাস্ত্র।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

যোগশাস্ত্র অতি কঠিন শাস্ত্র। ইহা আলোচনা ও অধ্যয়নের দ্বারা আয়ত্ত হয় না, এই শাস্ত্র স্কুল কলেজে গিয়া শিখিবার শাস্ত্র নহে, ইহা মানুষের ভোগে ও সুখস্বচ্ছন্দে থাকিয়া শিখিবার শাস্ত্র নহে, এই শাস্ত্র শিখিতে হইলে প্রকৃত যোগীর ও সদ্গুরুর আবশ্যক এবং আপনার দেহ ও মনকে বাল্যকাল হইতেই যোগসাধনোপযোগী প্রস্তুত করা আবশ্যক। বাল্যাবস্থা হইতেই ব্রহ্মচর্য্য অভ্যাস ও গুরুভক্তি শিক্ষা করিতে হয়, তারপর ক্রমশঃই বিষয়ত্যাগাভ্যাস দ্বারা মন ও শরীরকে পবিত্র করিতে হয়। যেমন মৃত্তিকায় বীজবপন করিয়া তাহার ফলপ্রত্যাশী হইতে হইলে পূর্ব্বেই সেই মৃত্তিকা চাষবাসাদি দ্বারা খনন, পরিষ্কার ও কোমল করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা মনুষ্যের মন পবিত্র ও কোমলভাবে প্রস্তুত হইলে, তৎপর উহাতে যোগ-বীজ বপন করিয়া মোক্ষফল লাভ করা যায়। যোগ ভিন্ন শরীর নির্ম্মল ও দৃঢ় হয় না। যোগ প্রধানতঃ দুই প্রকার, হঠযোগ ও রাজযোগ। শরীর দৃঢ় করিবার জন্য হঠযোগাভ্যাস করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। হঠযোগ অভ্যাসে কৃতকার্য্য হইলে অনায়াসেই রাজযোগের সোপানে উপস্থিত হইয়া মনের নিবৃত্তি করা যায়। দেহ যেমন ক্ষণভঙ্গুর, মনও তেমনই চঞ্চল। ভগ্নপাত্রে যেমন জল ঢালিলে উহা পড়িয়া যায়, ক্ষণভঙ্গুর দেহকে অগ্রে হঠসাধন দ্বারা দৃঢ়তর না করিলে, উহাতে চঞ্চল মনকে স্থিরতর করা যায় না, সুতরাং মন স্থিরতর না হইলে উহাকে কখন বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। সুতরাং বিষয় হইতে নিবৃত্ত না হইলে সেই মন দ্বারা রাজযোগ কি উপায়ে সাধন হইতে পারে? মনুষ্য দেহ ষড়রিপুর আঘাতে সর্ব্বদা কাতর, মন সেই রিপুকণ্টক লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া আপনার কর্ম্মসূত্রে আপনি ব্যথিত হইতেছে। যে পর্য্যন্ত দেহের সংশোধন ও মনের সংযমন দ্বারা ঐ সকল কণ্টক তিরোহিত হইয়া বেদনার শান্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত যোগাভ্যাসকার্য্যে রত হইয়া প্রাণায়ামাদি কার্য্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। যেমন ঘটনির্ম্মাণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কোমল আমমৃত্তিকা হইতে ইচ্ছানুসারে কুম্ভকারচক্রে স্থাপন করিয়া বিবিধ প্রকার ঘটনির্ম্মিত হয়, শেষে অগ্নিসংযোগে দৃঢ়তর করা যাইতে পারে, সেইরূপ আমাদের মাংসপূর্ণ কোমল দেহকেও ইচ্ছানুরূপ গুরুর উপদেশচক্র দ্বারা প্রকৃত সাধক-আকারে পরিণত করাইয়া যোগরূপ অগ্নিসন্তাপে দৃঢ়তর করা যাইতে পারে। দেহ ও মনের দৃঢ়তাসাধন না হইলে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া অতীব অজ্ঞানতার কার্য্য। যাঁহারা পূর্ব্বযোগী অর্থাৎ যোগসাধন করিতে করিতে প্রাণবায়ু দেহ হইতে চ্যুত হইয়াছে অথবা যোগভ্রষ্ট হইয়া কিয়দ্দিন পরে পরলোকগমন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে ইহজন্মে যোগাভ্যাসের ইচ্ছা স্বভাবতঃই জন্মিয়া থাকে। যদি তাঁহারা ভাগ্যবলে সদ্গুরু লাভ করেন, অথবা সংসঙ্গের অধীন হইয়া উৎকৃষ্ট স্থানে যোগসাধনে যত্নবান্ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহারা স্বল্পকালমধ্যে অভীষ্ট ফললাভ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, হঠযোগ ভিন্ন রাজযোগের কর্ম্ম বৃথা হয়, সেইরূপ হঠযোগ সাধন করিয়া রাজযোগে অভ্যস্ত না হইলে সেই হঠযোগও বাজীকরের ভোজবাজীর ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। অতএব হঠযোগ ও রাজযোগ উভয়ই পরস্পরের সাহায্যের জন্য শিক্ষা করিয়া ক্রমশঃ ধ্যান, ধারণা ও সমাধির পথে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি সমাধিগত হইয়া যোগবলে পরব্রহ্মে চিত্ত সমাহিতপূর্ব্বক তন্ময় হইতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই যোগসাধন সফল হইয়া থাকে। যোগসাধনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শিবসংহিতা বলেন,—

"প্রাণাপাননাদবিন্দুঃ জীবাত্মাপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥"

অর্থাৎ প্রাণ, অপান, নাদ, বিন্দু, জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্র সম্মিলন যাহা হইতে সংঘটিত হয়, তাহাকে ঘট অর্থাৎ দেহ কহে।

এই দেহের শোধনের জন্য আবার সপ্তপ্রকার সাধনের আবশ্যক করে; কারণ দেহ স্বভাবতঃ তমোগুণ হইতে তামসিকশক্তির বশে উৎপন্ন হয়। ইহা বায়ু, পিত্ত, কফাদি দ্বারা সর্ব্বদাই সন্ত্রস্ত ও বিকারপ্রাপ্ত এবং তদ্ধেতু বিবিধপ্রকার ক্লেদযুক্ত। মলমূত্র, ঘর্ম্ম ও শোণিতাদি সেই সকল ক্লেদের প্রবাহস্বরূপ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপুসকল উক্ত দেহদ্বারের বিবিধ বিঘ্ন ও বাধাস্বরূপ; আর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি উক্ত দেহের আগন্তুক মনশ্চাঞ্চল্যের হেতুস্বরূপ; সুতরাং উক্ত দেহকে শোধন না করিলে কোন প্রকারেই যোগমার্গে উপস্থিত হওয়া যায় না। তজ্জন্য শিবসংহিতায় পুনরুক্ত হইয়াছে :—

"শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনম্॥"

শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত, ইত্যাদিগকে শরীরের সপ্তসাধন বলে। যোগাভ্যাস করিতে হইলে প্রথমতঃ এই সপ্তসাধন দ্বারা শরীরকে সংশুদ্ধ করিতে হইবে।

মহাযোগী অত্রিপুত্র দত্তাত্রেয় কহিয়াছেন, দেহের শোধন-জন্য যেমন সপ্ত সাধন আবশ্যক, সেইরূপ অষ্ট প্রকার যোগাঙ্গেরও আবশ্যক হইয়া থাকে। যথা :—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈবং আসনঞ্চ ততঃপরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারঞ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠিতু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥
এবমষ্টাঙ্গ যোগঞ্চ যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো বিদুঃ॥"

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই আট প্রকার অঙ্গ ; ইহাতে সর্ব্বপুণ্য-ফলপ্রাপ্তি হয়।

আবার কোন কোন তন্ত্রের মতে যোগাঙ্গ ছয় প্রকার। যথা :—

"আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥"

অর্থাৎ আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই ছয়টি অঙ্গ। এই সমস্ত অষ্টাঙ্গ বা ষড়াঙ্গ যোগসাধনদ্বারা দেহের কি কি ফল লাভ হয়, মহাযোগিগণ তাহাও ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; যথা :—

"ষট্কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ম্।
মুদ্রায়াং স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ ষট্কর্ম্মদ্বারা শরীরের শোধন, আসনদ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রাদ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহারদ্বারা শরীরের ধীরতা ও প্রাণায়ামদ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মিয়া থাকে, আর ধ্যানদ্বারা ধ্যেয়ের আত্মাতে প্রত্যক্ষতা ও সমাধিদ্বারা সকল প্রকার বাসনা হইতে নির্লিপ্ততা লাভ হয়, অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষফলপ্রাপ্তি হয়।

নিরুত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে,—

"প্রাণায়াম দ্বিষট্কেন, প্রত্যাহার প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহার দ্বিষট্কেন জায়তে ধারণা শুভা॥
ধারণা দ্বাদশ প্রোক্তং ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ।
ধ্যান দ্বাদশকৈরেব সমাধিরভিধীয়তে॥
যৎসমাধৌ পরং জ্যোতিরনন্তরং বিশ্বতোমুখম্।"

অর্থাৎ দ্বাদশবার প্রাণায়াম করিলে একবার প্রত্যাহার হয়, দ্বাদশবার প্রত্যাহারে একবার ধারণা, দ্বাদশবার ধারণায় একবার ধ্যান এবং দ্বাদশবার ধ্যানে একবার সমাধি হইয়া থাকে। এই সমাধি সাধিত হইলে অন্তরমধ্যে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপী পরমজ্যোতির আবির্ভাব হইয়া থাকে।

প্রকারান্তরে :—

"শান্তিঃ সন্তোষ আহার নিদ্রাল্পং মানসদমঃ।
শূন্যান্তঃকরণঞ্চেতি যমা ইতি প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ শান্তি, সন্তোষ, আহার ও নিদ্রার অল্পতা, মনের দমন এবং অন্তঃকরণের শূন্যতা, এই সকলের নাম যম।

"চাপল্যন্তু দূরেত্যক্ত্বা মনস্থৈর্য্যং বিধায় চ।
একত্র মেলনং নিত্যং প্রাণমাত্রেণ সামতিঃ॥
সদোদাসীন ভাবস্তু সর্ব্বত্রেচ্ছা বিবর্জ্জনম্।
যথালাভেন সন্তুষ্টঃ পরমেশ্বর মানসঃ॥
মানদানপরিত্যাগ এতত্তুঃ নিয়মা ইতি॥"

অর্থাৎ চাপল্যাদিবিহীনতা, মনের স্থিরতা, সকল বিষয়েই সর্ব্বদা ঔদাসীন্য, সর্ব্বত্র অভিলাষশূন্যতা, যথালাভেই সন্তুষ্ট, পরব্রহ্মে মতি, মানদানাদি পরিত্যাগ, এই সকল কার্য্যকে নিয়ম বলে।

"আসনানি চ তাবন্তি জাবন্তোজীব জন্তবঃ॥"

অর্থাৎ বহুবিধ আসন আছে, জীবজন্তু আদির সংখ্যা যত প্রকার, আসনের সংখ্যাও তত প্রকার।

তারপর প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান, এই পঞ্চবিধ প্রাণ এবং নাগকূর্ম্মাদি আরও পঞ্চপ্রকার উপপ্রাণ, এই দেহস্থ দশবিধ প্রাণের হংসাচার-কার্য্যকে প্রাণায়াম কহে। এই দশপ্রকার প্রাণ শরীরের এক এক স্থানে অবস্থিতি করিয়া, এক এক রূপ কার্য্যদ্বারা মূল হৃদয়স্থ প্রাণের সহায়তা করিতেছে অর্থাৎ হৃদয়ে মূল প্রাণ, অপান গুহ্যদেশে, সমান নাভিদেশে, উদান কণ্ঠমধ্যে, ব্যান সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ ক্রিয়াদ্বারা একই মূল প্রাণের রক্ষা ও শক্তিবিষয়ে সহায়তা করিয়া থাকে. আর নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত, ধনঞ্জয়, এই পঞ্চ উপপ্রাণ উক্ত পঞ্চ প্রাণেরই অধীন ক্রিয়া করিয়া উহাদিগের পুষ্টতা-সাধন করে, সুতরাং উক্ত দশবিধ প্রাণাংশ সমষ্টিপ্রাণরূপে হৃদয়ে নিশ্বাসপ্রশ্বাসদ্বারা নীত, নির্গত ও কুম্ভকরূপে পুষ্টতা লাভ করিয়া থাকে ; সেই নীত, নির্গত এবং স্থিতি রাখিবার প্রণালীকে প্রাণায়াম যোগ কহিয়া থাকে। এই প্রাণায়াম-ক্রিয়াই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক যোগশক্তির মূল, এতদ্বিষয় পরে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তারপর প্রত্যাহারবিষয়ে যোগশাস্ত্রে যাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে, যথা :—

"কৃত্বা কলেবরং শুদ্ধং কুর্য্যাদ্‌যত্নৈর্ম্মহাত্মনা।
মনোনির্ব্বার্য্য সংসারে বিষয়কার্য্যা তথৈবচ॥
মনোবিকারভাবঞ্চ ত্যক্ত্বা শূন্যময়ো ভবেৎ।
প্রত্যাহারো ভবত্যেব সর্ব্বনিন্দা চমৎকৃতঃ॥"

অর্থাৎ যত্নের সহিত শরীরকে পরিশুদ্ধ, সংসার ও বিষয়কার্য্য হইতে মনকে নিবৃত্ত ও মনের বিকারভাব ত্যাগ করিয়া সর্ব্ব মায়া ও বাসনা পরিশূন্য হওয়ার নাম প্রত্যাহার। এই প্রত্যাহার ব্রহ্মচর্য্যাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও মনের বিষয়া-সক্তির উপরে বিকারভাব না হইলে কদাচই হইতে পারে না। আবার সাধুসঙ্গব্যতীত ইন্দ্রিয় বা মনের নিগ্রহ অসম্ভব। সাধুসঙ্গে সংযম ও নিত্য ব্রহ্মচর্য্যপালনে যত্ন হয়, আহার-

বিহারাদির সতর্কতা উপস্থিত হয়, বৈরাগ্যে মনোনিবেশ হয়। সুতরাং বিষয়বর্জ্জনবাসনায় একাগ্রতা, সাধুসঙ্গ, যোগসাধন শিক্ষার অগ্রে কর্ত্তব্য। কারণ, জিতেন্দ্রিয় না হইলে যোগসাধনের কোন কার্য্যেই অগ্রসর হওয়া যায় না।

অতঃপর ধ্যানের বিষয় কথিত হইতেছে। যথা :—

"ধ্যানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং স্থূলসূক্ষ্মবিভেদতঃ।
স্থূলং মন্ত্রময়ং সিদ্ধি সূক্ষ্মন্তু মন্ত্রবর্জ্জিতম্।"

অর্থাৎ ধ্যান দুই প্রকার—স্থূল ও সূক্ষ্ম। মন্ত্রময় ধ্যানকে স্থূল, আর মন্ত্রশূন্য ধ্যানকে সূক্ষ্মধ্যান বলা যায়।

তৎপর সমাধি ; যথা—

"সমাধির্নিশ্চলাবুদ্ধিঃ শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিবর্জ্জিতা।"

অর্থাৎ যে যোগদ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস ইত্যাদি বিহীন স্থিরবুদ্ধি হয়, তাহার নাম সমাধি। এই কতিপয় সাধনকে অষ্টাঙ্গ-যোগ কহে।

এক্ষণে আমি মূল আসনের বিষয় বলিব ; কারণ যোগীর পক্ষে প্রথমেই এই আসন অভ্যাস করিয়া শরীরকে সুদৃঢ় ও রোগাদি বিবিধ প্রাকৃতিক বিকার হইতে মুক্ত করা যায়। আসন অভ্যাসদ্বারা বায়ু-পিত্তের সমতা, দেহের উৎকৃষ্ট ব্যায়াম, দেহ ও মনের বিশেষ স্থৈর্য্যতা লাভ হয়, শীতোষ্ণাদি ঋতুবিকার হইতেও নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এমন এমন অনেক আসন আছে, যাহা অভ্যাস করিলে বিশেষ কঠিন রোগের সদ্যঃবিনাশ এবং অন্যান্য কঠিন যান্ত্রিক রোগভয় হইতে অব্যাহতি লাভ হয়।

ঘেরণ্ডসংহিতা বলেন,—জীবজন্তুর সংখ্যা যত, আসনের সংখ্যাও তত। পূর্ব্বে মহাদেবকর্ত্তৃক চতুরশীতি লক্ষ প্রকার আসন উক্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসন প্রধান, তন্মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে বত্রিশ প্রকার আসন শুভদায়ক ও রোগনাশক। যথাঃ—

"সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষম্॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্॥"

অর্থাৎ—১ সিদ্ধ, ২ পদ্ম, ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, ৫ বজ্র, ৬ স্বস্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, ৯ বীর, ১০ ধনুঃ, ১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মৎস্য, ১৪ মৎস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ, ১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎকট, ১৮ সঙ্কট, ১৯ ময়ূর, ২০ কুক্কুট, ২১ কূর্ম্ম, ২২ উত্তানকূর্ম্ম, ২৩ উত্তানমণ্ডুক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ মণ্ডুক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ, ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট্র, ৩১ ভুজঙ্গ এবং ৩২ যোগাসন।—এই বত্রিশ প্রকার আসন মর্ত্ত্যলোকে সিদ্ধিদায়ক।

সিদ্ধাসন।

"যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিদ্ সদা॥
ঊর্দ্ধে নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষোঽবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনজ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্॥"

শিবসংহিতা।

অর্থাৎ যোগজ্ঞ সাধক যত্নপূর্ব্বক একপাদমূলদ্বারা যোনি-দেশ পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপর সংস্থাপিত করিবে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টিদ্বারা উভয় ভ্রূর মধ্যভাগে নিরীক্ষণ করিবে, ইহার নাম সিদ্ধাসন। এই আসন নির্জ্জনস্থানে নিরুদ্বিগ্ন, স্থিরচিত্ত ও অবক্র শরীর হইয়া এবং ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করিয়া অনুষ্ঠান করিবে। এই আসনদ্বারা যোগীদিগের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

এই আসন অধোদিক্‌সম্বন্ধীয় অর্শঃ, ভগন্দর, মেহ, বহু-মূত্রাদি বিবিধ রোগদমনে সমর্থ এবং অপরিসীম কামবেগকে এই আসন অভ্যাসদ্বারা অনায়াসে জয় করা যায়।

[ক্রমশঃ।

বুদ্ধদেবের ধর্ম্ম।

[জনৈক অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্যের লিখিত।]

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুকুলে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে যুবরাজ সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণপূর্ব্বক পরমপ্রজ্ঞাসম্পন্ন বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন আর্য্যাবর্ত্তে যে চারি জাতি বাস করিতেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি শ্রীসদ্ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মকে আর্য্যধর্ম্ম—এই আখ্যা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি জনসাধারণকে ধর্ম্মযান শিক্ষা দিয়া যান; ঐ ধর্ম্ম লোককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ঐ জন্য উহা ব্রহ্মযান নামেও অভিহিত হইয়া থাকে।

জাতি, ধর্ম্ম ও স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকেই নির্ব্বাণের পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লোককে এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা নির্ব্বাণলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগকে পূর্ণ ও বিমল ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে, উন্নত সত্যপথে চলিতে হইবে এবং একদিকে যেমন বিলাস ও ইন্দ্রিয়সেবা পরিহার করিতে হইবে, অন্যদিকে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য সন্ন্যাসধর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে। তিনি এই তথ্য আবিষ্কৃত করিয়া যান যে, মধ্যপথই প্রকৃষ্ট পন্থা। তদনুসারে তিনি নির্ব্বাণকামীদিগের জন্য আবশ্যক নিয়মাদি প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, আর্য্য শ্রাবকগণ যদি প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক জীবনযাপন করেন, তাহা হইলে এই জন্মেই তাঁহারা নির্ব্বাণলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা গৃহধর্ম্ম অর্থাৎ মনুষ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদিগকে এই দশটিনিয়ম পালন করিতে হইবে।

সেই দশটি নিয়ম এই,—

(১) প্রাণিনাশ করিও না বা কাহাকেও প্রাণনাশ করিতে দিও না।

(২) চুরী করিও না।

(৩) ব্যাভিচার করিও না।

(৪) মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিও না।

(৫) মিথ্যাকথা বলিও না বা কাহাকেও কুবাক্য, কটুবাক্য, কঠোরবাক্য বলিও না।

(৬) বৃথা গল্প করিয়া কালহরণ করিও না।

(৭) অন্যের দ্রব্যে বা সম্পত্তিতে লোভ করিও না।

(৮) অন্যকে অবজ্ঞা বা ঈর্ষ্যা করিও না।

(৯) ঠিক কর্ম্মপথে চলিবে।

(১০) কার্য্য-কারণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিও না।

তিনি আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, নরক, প্রেতলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক এবং উচ্চতর ব্রহ্মলোক আছে। ব্রহ্মলোকে আয়ু ৮৪ কল্প।

তিনি আরও এই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন যে, যাঁহারা মনুষ্যধর্ম্মও প্রতিপালন না করে, তাহারা পরজন্মে নিম্নতর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে অর্থাৎ তাহারা তির্য্যগ্‌প্রাণী হইয়া জন্মে অথবা প্রেত হয় বা নরকে যায়। পক্ষান্তরে যাহারা উল্লিখিত দশবিধ নিয়ম যথাযথভাবে পালন করে, যাহারা দান করে এবং ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র নিয়ম পালন করে, প্রতিদিন নৈতিক নিয়ম অনুসারে চলে, তাহারা মৃত্যুর পর ছয় স্বর্গের যে কোন স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। আর যাহারা ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রতিপালন করে, ধ্যান ও যোগ অনুষ্ঠান করে, সর্ব্বজীবে দয়া (ভূতদয়া) করিতে শিক্ষা করে, কাহকেও ঘৃণা করে না, তাহারা মরণান্তে ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে, আর যাঁহারা মোক্ষযোগ প্রতিপালন করেন, তাঁহারা অরূপ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থদিগকে তিনি এই শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক গৃহস্থ তাহাদের প্রয়োজনীয় শিল্প, কলাবিদ্যা ও উচ্চতর শিল্পাদি শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যুবকদিগকে কৃষিবিদ্যা, গোপালন, দুগ্ধ ব্যবসায় ও উটজশিল্প শিক্ষা দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক। ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে উচ্চতর শিল্পাদিবিদ্যা, হিসাবরক্ষা, চিত্রবিদ্যা, রাজনীতি, সমরবিদ্যা প্রভৃতিও শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রাচীন ভারতে বাষট্টি প্রকারের কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল; তক্ষঃশীলা, নলন্দা, মিথিলা, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে উহার অধ্যাপনা হইত।

বুদ্ধদেব মানুষকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, মানবের চরিত্র, কার্য্যাবলী, কর্ম্ম প্রভৃতিই তাহাকে ভাল বা মন্দ করে; জাতিবিশেষে—কুলবিশেষে জন্ম, তাহাকে ভাল বা মন্দ করে না। নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহাতে যেমন আম্রফলপ্রাপ্তির আশা করা যায় না, সেইরূপ মন্দ কর্ম্ম করিয়া ভাল ফললাভের আশা করা যায় না। ভাল কর্ম্ম করিলে ভাল ফল পাওয়া যায়, মন্দ কর্ম্ম মন্দ ফলই প্রসব করে। ইহাই বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাদ। তিনি হেতু ও প্রত্যয়বাদও শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধদেব বলেন, যোগাবলম্বন ও ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালনদ্বারাই মানুষ অভিজ্ঞা নামক দিব্যজ্ঞানলাভে সমর্থ হয়। এই অভিজ্ঞা লাভ হইলে মানুষ দিব্যশ্রুতি, দিব্যদৃষ্টি লাভকরতঃ অন্যের অতীত জীবনের কথা, তাহার চিন্তা ও মৃত্যুর পর সে কোথায় জন্মিবে, তাহা জানিতে পারে। তিনি এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, এই কোটী কোটী সৌরজগৎসম্বলিত বিশ্ব

নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কোথাও ক্ষণেকের মধ্যে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়, আবার কোথাও কোটী কোটী বৎসরে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্বর্গ, ব্রহ্মলোক, পৃথিবীও পরিবর্ত্তনশীল; অগ্নিতে, জলে বা প্রবল পবনে ইহাদের ধ্বংস হইবেই হইবে। দশ লক্ষ বৎসরে এই পরিবর্ত্তন ঘটে। কল্প-হিসাবে সময়ের পরিমাপ হয়।

বুদ্ধদেবের মত এই যে, মানুষ মহাভূতের সমষ্টি; তবে তাহার একটা আধ্যাত্মিক শরীর আছে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান ঐ শরীরের লক্ষণ। মানবের আদিও নাই, অন্তও নাই। মানব যত দিন সংসারে থাকে, তত দিন তাহার কর্ম্ম-অনুসারে নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে। দেবলোক, ব্রহ্মলোক, প্রেতলোক, তিরশ্চীনলোক, সমস্তই একই সংসারের ক্ষেত্র। যত দিন মানবের অজ্ঞানতা থাকিবে, তত দিন সে এই সংসারের যূপকাষ্ঠে অর্থাৎ জোয়ালে বদ্ধ থাকিবে—তত দিন সে কখন সুখে, কখন দুঃখে, কখনও সমৃদ্ধিতে, কখন দারিদ্র্যে, কখনও লাভে, কখনও ক্ষতিতে, কখন প্রশংসায়, কখনও নিন্দায় কাল কাটাইবে। ইহাই সংসার।

সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের জন্য বুদ্ধদেব অর্হতের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্হৎ হইতে হইলে সম্পূর্ণমাত্রায় আত্মবলি দিতে হয়, আপনার ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে হয়, নিজের বৈশিষ্ট্য চিন্তা করিতে নাই, অন্য হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বা অন্য জীব হইতে আপনাকে উন্নত বা অবনত ভাবিতে নাই। তিনি আপনাকে পাসরিয়া সকল কাজ করিবেন। বুদ্ধদেব শিক্ষা দিয়াছেন,—আপনার ব্যক্তিত্ব-বোধই মায়ার কার্য্য; মানুষ লক্ষ লক্ষ জন্মের অভ্যাস-বশতঃই এই জ্ঞান বা বোধ অর্জ্জন করিয়াছে। মানুষ যদি সুখ চাহে, তাহা হইলে তাহার অহঙ্কারকে পূর্ণমাত্রায় বর্জ্জন করিয়া সকল কাজ করিতে হইবে এবং মাতা যেমন সন্তানকে ভালবাসে, সকল জীবকে তেমনই ভাবে ভালবাসিতে হইবে।

বুদ্ধদেব সমস্ত মানবসমাজের শিক্ষক, তিনি সকলকেই দয়া, ক্ষমা এবং ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহাকে ভালবাসিতে হয়, তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার 'ধম্ম' বা ধর্ম্ম জানা নিতান্তই আবশ্যক।

জ্যোতিষশাস্ত্র-সম্বন্ধে দুই একটি কথা।

[প্রফেসার কে. পি. জ্যোতিষী লিখিত।]

শাস্ত্রকারেরা বেদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্থানে জ্যোতিষশাস্ত্রকে বেদের চক্ষু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই শাস্ত্র চক্ষুর কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ-নক্ষত্রের গতির বিষয় প্রত্যক্ষ অবগত হওয়া যায়—বৎসর, মাস, তিথি, বার ইত্যাদির সংক্রমণ ঠিক বুঝিতে পারা যায়। যাহারা এই শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের অনেক বিষয়ে অন্ধের ন্যায় থাকিতে হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বিবিধ;—গণিত-জ্যোতিষ ও ফলিত-জ্যোতিষ। গণিত-জ্যোতিষ হইতে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও গ্রহণাদির সূক্ষ্ম গণনা হয়; আর তাহাদিগের আকর্ষণ, বিকর্ষণ ও আধিপত্যে জাতকাল হইতে মানব-শরীরে যে যে শুভাশুভ ঘটনার সংঘটন হয়, তাহাকে ফলিত-জ্যোতিষ বলে। এই শাস্ত্র অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই দেশ হইতে এই শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি ও প্রত্যক্ষতাদৃষ্টে অন্যান্য দেশেও ইহা সমাদরে গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন সভ্যদেশমাত্রেই জ্যোতিষের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে ব্যাস, নারদ, ভৃগু, গর্গ, বশিষ্ঠ, জৈমিনি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ফলিত ও গণিত জ্যোতিষের প্রধান আচার্য্য ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণীত সংহিতাসকল এখনও এ দেশে দেখিতে ও পড়িতে পাওয়া যায়। উঁহাদিগের পর বরাহ, মিহির প্রভৃতি অদ্বিতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সময়ে এ দেশে জ্যোতিষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছিল। অধুনা আচার্য্য ও শিষ্যের অভাবে এই শাস্ত্র মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষে যে সকল মহাত্মারা এই শাস্ত্রের উন্নতি-কল্পে মনোযোগী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কৃত মানমন্দিরের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি স্থানবিশেষে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল আর কোথাও এ শাস্ত্রের প্রকৃত চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া

যায় না। মান্ধাতার আমলে জ্যোতিষশাস্ত্র যেরূপ চলিয়া আসিতেছিল, অধুনা তাহারই চর্ব্বিতচর্ব্বণ লইয়া ইহার আলোচনা হইতেছে। তারপর এই শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে রাজার উৎসাহ বা রাজকীয় সহায়তা একেবারেই পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের শাস্ত্র, বেদ, বেদাঙ্গ এক করিয়া তাহা যথানিয়মে শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন, তাহার উন্নতি-কল্পে অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন, কিন্তু এই শাস্ত্রের জন্য কেহ কিছুই গ্রাহ্য করেন না। এই শাস্ত্র বিলাতী অভিধানে প্রতা-রকদিগের শাস্ত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দেশের ইংরেজী-নবীশগণও ইহাকে সেইজন্য বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কাজেই এই শাস্ত্রটি অত বড় উন্নতশিখরে উঠিলেও এখনই উহার একেবারে পতন হইবার মত হইয়াছে। দুই চারি জন টোলের সেকেলে পাকা পণ্ডিত ব্যতীত ইহাকে আর কেহ তত আদর করেন না, অথচ আবশ্যক হইলে সকলেই দিনক্ষণ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত; পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার আবশ্যক হইলে তাহাদিগের মেলক ও গণাগণ দেখাইবার জন্য সমুৎসুক হয়েন; পঞ্জিকাও প্রতি বৎসর এক একখানি ক্রয় করিয়া ঘরে রাখা চাই। কিন্তু ইহার উন্নতিকল্পে কেহই যত্নবান্ হয়েন না। এই শাস্ত্রটি শিক্ষা দিবার জন্য কোথাও চতুষ্পাঠী বা পাঠশালা নাই, ইহার গুরু বা শিষ্য প্রায় কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা-দিগের পরিচয় দিতেও শিক্ষিতসমাজে দারুণ লজ্জাবোধ হয়। অনেক শিক্ষিত লোকই এই শাস্ত্র পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত, কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং কেহ উহা শিক্ষা করেন না বা শিক্ষার জন্য ব্যস্তও নহেন; কেবল নিজ নিজ ভাগ্যগণনা করাইতে নব নব অজ্ঞাতকুশীল জ্যোতিষশাস্ত্রের দোকানদারদিগের নিকট গিয়া বসিয়া থাকেন। তাহারা তাঁহাদিগের হস্তপদ বা কোষ্ঠীবিচার করিয়া যাহা বলে, তাঁহারা তাহাকেই ব্রহ্মার বেদ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া গৃহে চলিয়া যান। তারপর যখন ভবিষ্যদ্বর্ণনা কিছুই ঠিক হয় না, তখন শাস্ত্র ও শাস্ত্র-গুরুকে ছাইভস্ম, মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর বলিয়া গালাগালি দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা বিচার করিয়া দেখেন না যে, ঋষি-দিগের প্রণীত শাস্ত্র এখন অযোগ্যপাত্রে পড়াতে উহার জ্যোতিঃ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ব্যবসায়িগণ কেবল অর্থলোভে উহার মস্তকচর্ব্বণ করিতে বসিয়াছে। রাজ-দৃষ্টি বা শাসনের অভাবে শাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষা নষ্ট হয়। আজকাল জ্যোতিষসম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে।

যে পঞ্জিকা লইয়া ভারতবর্ষের কৃতবিদ্যগণ দিবারাত্রি আলোচনা করেন, সে পঞ্জিকার সংস্কারকল্পে কেহই যত্ন করেন না। পঞ্জিকার ভুল হইলে আর্য্যগণের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম-কাণ্ড ও দেহকাণ্ড যে সকলই ভুল হয়, ইহা কেহই বিচার করেন না। যে কোষ্ঠী দেখাইয়া নিজ নিজ ভবিষ্যৎ নিরূপণ করিবার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এত ব্যস্ত, তাহাও যে পঞ্জিকার বিশুদ্ধির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, পঞ্জিকায় সামান্য ভুল থাকিলে গণনায় প্রকাণ্ড ভুল হয়,—তাহাও তাঁহাদের বুঝিবার শক্তি নাই। আমরা যে উদয়াস্ত নিরূপণ করিয়া সূক্ষ্ম লগ্নমান নিরূপণ করি, যে মান্ধাতার আমলের সাময়িক খণ্ডা লইয়া গ্রহস্ফুটের সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ ঠিক করি, উহা বর্ত্তমান দেশকালানুসারে ঠিক কি না, তাহা একবারও চিন্তা করি না বা চিন্তা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হই না।

যে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি অস্থির বা দেশকালের অধীন পরিবর্ত্তনশীল, যে সৌরজগত নিয়তই সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া বহু যোজন দূরে ভ্রমণ করিতেছে, যে নিরক্ষ বৃত্তের সীমা নাই, বিশুদ্ধ বিন্দুপাতজনিত সায়ন-নিরয়ণের মুহূর্ত্তকেও সন্দেহ করা যায়, তাহার পরিবর্ত্তনজনিত ফল না ধরিয়া কেবল স্থায়িত্বের স্ফুট মীমাংসা করিয়া পঞ্জিকাবদ্ধ করিলে, তাহা কোন্ বিধিমতে সম্মত বা শুদ্ধ বোধ করিব? কাজেই তাহা লইয়া গ্রহস্ফুট ও লগ্নাদির বিশুদ্ধতা বা নির্ভুলতা নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইতে পারি না। গণিতে য়ুরোপীয় গণিতাচার্য্যদিগের গণনাই আজকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। যদি তাঁহাদিগের দৃষ্ট গণিতাংশ লইয়া কোন প্রকার পঞ্জিকা করা হয়, তাহা হইলে অনেকটা পঞ্জিকা-শুদ্ধির আশা করা যায়। কিন্তু সেরূপভাবে যন্ত্রবল স্থাপন করিয়া আমাদের দেশে অত অর্থব্যয় করিতে কে সাহসী হই-বেন? সুতরাং আমরা জ্যোতিষের বিশুদ্ধতাসম্বন্ধে যে আঁধারে, সেই আঁধারেই থাকিব—যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারই সাধারণকে বুঝাইয়া দিব। ফলের সহিত ঐক্য না হইলেই সাধারণ আমাদিগকে গালি দিবেন এবং শাস্ত্রটিকেও গাঁজা-খুরী (রাবিস্) বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন। দোষ কাহারও নহে, দোষ এ দেশের ভাগ্যের।

আবার দেখুন,—জ্যোতিষশাস্ত্রটা অন্যান্য শাস্ত্রের মত নহে। কেবল পঠনাদি শ্লোক মুখস্থ করিলেই যে ফলদায়ক হয়, তাহা নহে। পূর্ব্বকালের মুনিঋষিগণের কুটীরে বৃহদাকার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না, সুতরাং গ্রহদিগের নূতন আবিষ্কার বা তাহাদিগের স্থূল সূক্ষ্ম গতিবিধির বিষয়ে তাঁহারা কোনপ্রকার যন্ত্রবল প্রত্যাশা করিতেন না। তাঁহারা একমাত্র আধ্যাত্মিক যোগবলে ত্রিকালদর্শী হইয়াছিলেন। চক্ষু মুদিত করিলেই ধ্যানদৃষ্টিতে বিশাল জগতের যাবতীয় স্থূল সূক্ষ্ম বিষয় ইচ্ছামাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। তাঁহারা সেই মহান্ বলেই সৌরজগতের সকল বিষয় প্রত্যক্ষ ও সংশোধিত করিয়া লইতেন; যাহা বলিতেন বা লিখিতেন, তাহা অভ্রান্ত। এখন সেরূপ সাধনবল কোন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডি-তের বা জ্যোতির্ব্বিদের দেখিতে পাওয়া যায় কি? চক্ষু মুদিত করিয়া কয় জন কি দেখিতে পায়? কত দূর তাহাদের দৃষ্টি যায়? আজকাল গ্রন্থের অক্ষর পাঠ করিতে যাহাদিগের চস্মার আবশ্যক হয়, তাহাদিগের দ্বারা দূরদর্শন বা দূর-জ্ঞান কি হইতে পারে? আর প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তির বোধ না থাকিলে, ফলিতাদির দ্বারা ত্রিকালসম্বন্ধীয় ফল ব্যক্ত

করাও সুকঠিন। সুতরাং সাধারণের তৃপ্তিলাভ করিবার কিছুই দেখিতে পাই না। মূর্খের নিকট পাণ্ডিত্য করিতে অধিক বেগ পাইতে হয় না, কিন্তু জ্ঞানীর নিকট মুখ ফুটান বড় সহজ নহে। যদি অন্ধকারে জ্যোতিষশাস্ত্রের ভবিষ্যৎ ফল পড়িয়া না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, জোতিষশাস্ত্রের ব্যবসা সহজে কেহ করিতে পারিত না। আজ মূর্খবহুল বঙ্গদেশ যোগীদিগের যোগসাধনোপার্জ্জিত জোতিষশাস্ত্র যাহার তাহার নিকট রাস্তায় বসিয়া আলোচনা করিয়া বিশ্বাসের হেতু ফলে প্রতারিত হইতেছেন।

জ্যোতির্ব্বেত্তা নিজে শাস্ত্রজ্ঞ, সাধক ও বহুদর্শী না হইলে কখন ফলবক্তা হইতে পারেন না। যাহাদিগের দেশ কাল পাত্র জ্ঞান নাই, শাস্ত্রের চর্ব্বিতচর্ব্বণ লইয়া আড়ম্বর করে, যাহারা কেবল ঠিকুজীকোষ্ঠী লিখিতে শিখিয়াছে, যাহারা দশা অন্তর্দ্দশাফল পঞ্জিকা হইতেই লিপিবদ্ধ করে, তাহাদিগের লেখায় বা কথায় কিছুতে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। যাহারা হস্তের কতকগুলি রেখা দেখিয়া কেবল ভাগ্য বলিতে সমর্থ হয়, তাহারা লক্ষণশাস্ত্রের বর্ণমালাও অবগত নহে। যাঁহাদিগের হস্ততালু নাই, যাঁহাদিগের জাতসময় স্থির নাই, তাঁহাদিগের গণনায় বড় কেহ অগ্রসর হয় না;—কারণ, সেস্থলে নষ্টকোষ্ঠীর জ্ঞান আবশ্যক। নষ্টকোষ্ঠী বঙ্গদেশে কয় জন লোক বিচার বা প্রকাশ করিতে সমর্থ?

যাঁহারা উৎকৃষ্ট কোষ্ঠীলেখক, তাঁহারা কখন শাস্ত্রকল্পিত ফলের ধার ধারেন না, শাস্ত্রের বাঁধাগৎ তুলিয়া দিয়া ভবিষ্যৎ ফলের প্রত্যক্ষতার প্রমাণ করিতে চাহেন না। কিন্তু আজকাল সেরূপ কোষ্ঠী অতি বিরল। প্রচলিত কোষ্ঠীর ফলগুলি বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে শাঁখের করাতের মত বোধ হয়; উহা এদিকেও চলে, ওদিকেও চলে। দ্বিত্ব ও ত্রিত্বভাবে উহা চালান হয়। উহা দেখিয়া একটি প্রত্যক্ষ কথার বিচার হয় না; কাজেই উহা শিক্ষিত লোকের মনোমত হয় না।

কোষ্ঠী লেখা যত সহজ, উহা বিচার করা তত সহজবুদ্ধির আয়ত্ত নহে; উহাতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি ও মস্তিষ্কচালনার আবশ্যক। গ্রহের ভাব ও প্রকৃতিবিচার করিয়া তাহাদিগের পরস্পর সূক্ষ্মসম্বন্ধে বিচার দ্বারা যে উপস্থিত ফলটুকু জাতকের পক্ষে প্রশস্ত হইবে, অকপটে তাহা লেখা আবশ্যক। শাস্ত্রফলের অপেক্ষা না করিয়া সাহসপূর্ব্বক তাহা কোষ্ঠীতে লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য। যদি সময়ের স্ফুট সংশুদ্ধ না থাকে, যদি গ্রহগণের সঞ্চার ফল ও তাহাদিগের স্ফুট শুদ্ধ না থাকে, তবে মূলগত ভুল পূর্ব্বেই সংশোধন করিয়া লইতে হইবে, তাহা হইলেই নিজকৃত বিচার মীমাংসা স্থির হইবে। নিজের প্রকৃতির ন্যায় গ্রহগণের প্রকৃতি ও ভাবজ্ঞান গ্রহবিচারসময়ে বিশেষ আবশ্যক, উহাতে অভিজ্ঞ না হইলে শুভাশুভ ফল ব্যক্ত করা যায় না। ভৃগুসংহিতায় লগ্ন ও গ্রহবিচার দ্বারা পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের ফল লিখিত আছে। পূর্ব্ব ও পরজন্মের কর্ম্মফল দ্বারা আবার ইহজন্মের লগ্ন ও তৎসম্বন্ধীয় ফল নির্ণয় করা যায়। জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে লগ্নের নির্ণয় ও দ্বাদশস্থানীয় কর্ম্মভাবের নির্ণয় হয়। কর্ম্মফল ভ্রূণদেহকে সঙ্গে করিয়া মাতৃগর্ভে উপস্থিত হয়, অনেকের মতে ভ্রূণলগ্নই প্রশস্ত বলিয়া বোধ আছে। সাধারণ ফলিতজ্ঞানীরা জাতলগ্নকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন।

বাস্তবিক কর্ম্মফলই মনুষ্যের শুভাশুভ ও সুখ-দুঃখের হেতু। স্থূলজাতলগ্ন দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। একই লগ্নে, একই সময়ে দুই জনের জন্ম হইলে, এক জন রাজা এবং এক জন দীন দরিদ্র হয়, এক জনের স্বল্পায়ু বা অপমৃত্যু, অপর দীর্ঘায়ু হয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, পরস্পর ভ্রূণলগ্নের অসমতা ও অসমান কার্য্যফলই উহার কারণ। মনুষ্যগণ সমান গ্রহফলের অধীন জন্মগ্রহণ করিলেও, তাহাদিগের পুরুষপরম্পরাগত স্বভাব-প্রকৃতির দ্বারা তাহারা স্বতন্ত্রভাবে ও স্বতন্ত্র লক্ষণালক্ষণসম্পন্ন হইয়া গঠিত হয়, লক্ষণাদি আকারপ্রকারে কাহারও সহিত কাহারও ঐক্য হয় না। এই নৈসর্গিক বৈচিত্র্যের ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে, তাহাদিগের শুভাশুভ ফলও যে কত প্রকার হইতে পারে— উচ্চ নীচ হইতে পারে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই তাহা বিচার করিতে সমর্থ হয়েন।

কোষ্ঠীগত কুণ্ডলীর বিচারে গ্রহগত সূক্ষ্মফল, জাতকের লক্ষণাদির বিচারে তাহাদিগের কর্ম্মফল, আবার কর্ম্মফলবিচারে তাহাদিগের সুখ-দুঃখের অবস্থান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

'গ্রহের পরিবর্ত্তনের সহিত যেমন মনুষ্যের দেহ ও মনের পরিবর্ত্তন হয়, কর্ম্মজনিত চিন্তাশক্তির পরিবর্ত্তনের সহিতও আবার সেইরূপ দেহ ও মনে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। চিন্তাশক্তি ও যোগবলে মনুষ্য গ্রহ ও কর্ম্মফলকে অতিক্রম করিতেও সমর্থ হয়। কারণ, মনুষ্য পশুর ন্যায় একমাত্র মনের চালনায় চালিত হয় না, ইহারা জ্ঞানের চালনায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানবলে জড়শক্তির প্রভাবকে অতিক্রম করা যায়, গণনার নির্ণয়বিন্দুকে অতিক্রম করা যায়, ফলিত-জ্যোতিষের প্রত্যক্ষতার ব্যতিক্রম করা যায়, কিন্তু উহা অদৃষ্টবাদী জড়সেবকদিগের পক্ষে নহে; উহা চৈতন্যবাদী পুরুষকারসেবকদিগের পক্ষেই ঠিক হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র সাংসারিক লোকের পক্ষে গণনার নির্ণয়বিন্দুর অতিক্রম করিবার সাধ্য নাই; ক্ষুদ্র শিশ্নোদরপরায়ণ বিষয়ী ব্যক্তি নিত্য বিষয়ের তাড়নাতেই ব্যতিব্যস্ত, উহারা চেষ্টা করিয়াও গণনার নির্ণয়বিন্দু অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা ত্যাগী, বিষয়সম্পর্কশূন্য, তাঁহারাই পুরুষকারবলে বলী হইয়া স্কন্ধস্থিত কর্ম্মভারকে নামাইয়া যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন, অদৃষ্ট তাঁহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারে না বা যে সে শুভাশুভ ফলের বশীভূত করিতে পারে না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে আবির্ভূত হন। সে আজ ৮১ বৎসরের কথা। তাঁহার পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়, জননীর নাম চন্দ্রমণি দেবী। বাল্যকালে রামকৃষ্ণদেবের নাম ছিল—গদাধর। তিনি পাঠশালায় অতি সামান্য রকম লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। ছোটবেলা তিনি কথকতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যেখানে কথা হইত, সেইখানে যাইয়া কথা শুনিতেন। ১১ বৎসর বয়সে তিনি ভাবসমাধি প্রাপ্ত হন। ১৭।১৮ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতায় আসেন। রাণী রাসমণি কলিকাতার আড়াই ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী স্থাপন করিলে, রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই তথায় যাইতেন। পরে সেখানে তিনি পূজারী নিযুক্ত হন। শেষে তিনি পূজা ছাড়িয়া কেবল প্রতিমার নিকট বসিয়া থাকিতেন এবং মা মা করিয়া ডাকিতেন। ঠাকুরের বয়স যখন ২১।২২ বৎসর; তখন তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলে তাঁহার বিবাহ দেন। জয়রামবাটীনিবাসী ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীশ্রীসারদামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মায়ের বয়স তখন ছয় বৎসর মাত্র। কিন্তু তাহার পর হইতেই রামকৃষ্ণদেবের অবস্থা সম্পূর্ণ ফিরিয়া গেল। পূজা করিবার সময় তিনি দেবীর দিব্যরূপ দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সমাধি হইতে লাগিল। সকলে তাঁহাকে মহাপুরুষবোধে যত্ন ও সন্ধান করিতে লাগিল। নানা দেশ বিদেশ হইতে লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলের মনে ভগবদ্ভাব উছলিয়া উঠিত। কেহ বলিতেন, তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ,—কেহ বলিতেন, তিনি স্বয়ং ভগবান। একই কথা। কেননা, ভক্তে ও ভগবানে ভেদ নাই। জগন্মাতা ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি ও আমি এক। তুমি ভক্তি নিয়ে থাক,—ভক্তিধর্ম্ম দেখাও, জীব মুক্তি পাবে।" তিনি কামিনীকাঞ্চনে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। তিনি বরাবরই বালকের ন্যায় সরল ও শুদ্ধ ছিলেন। স্ত্রীজাতিকে জগদম্বাবোধে পূজা করিতেন। তিনি ৫২ বৎসর দেহধারণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর অতি সরল কথায় ও সরল ভাষায় লোককে উপদেশ দিতেন। তাঁহার উপদেশ লোকের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিত। শাস্ত্রের অতি জটিল তত্ত্ব তিনি অত্যন্ত সরলভাবে বুঝাইতেন, তাহা শুনিলে সব কথা অতি সহজে বুঝা যাইত। অমন সরল উপদেশ আর কেহ কখনও দিতে পারেন নাই। আমরা ক্রমে তাঁহার কতকগুলি উপদেশ প্রকাশিত করিব।—

দেহী ও দেহ।

(১) ভগবান রামকৃষ্ণদেব বল্‌তেন,—"দেহী ও দেহ—বালিস ও তাহার খোল।" খোলের মধ্যে যখন বালিস থাকে, তখনই বালিসের শোভা। বালিস না থাকিলে তাহার খোলটা কিছুই নয়। বালিস ছাড়িয়া কেহ কেবল খোলের আদর করে না। সেই শূন্যদেহটা কিছুই নয়,—তাহার বেশী আদর নিষ্প্রয়োজন। তবে বালিসের খোলটাকেও যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখা উচিত, দেহটাকেও তেমনই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ভাল। দেহটাতে বেশী মমত্ববুদ্ধি ভাল নয়। দেহের ভিতর যিনি আছেন, তিনিই অবিনশ্বর,—তাঁহারই পূজা করা উচিত; কারণ, জীবের ভিতর শিব থাকেন।

জীব ও সংসার।

(২) সংসারে থেকে সংসারের সব কাজ কর্‌বে; কিন্তু মন সর্ব্বদাই ঈশ্বরে রাখ্‌বে। সকলের নীচে থাক্‌বে ও সকলকে সেবা কর্‌বে,—কিন্তু মনে রাখ্‌বে, তা'রা তোমার কেউ নয়।

যেমন নষ্টা নারী। সে গৃহকর্ম্ম সবই করে, ঘর নিকায়, পুছে, সব করে,—কিন্তু সেই কাজের মধ্যে থাক্‌লেও তার মনটা উপপতির দিকে পড়ে থাকে। সে কখন আস্‌বে, সেই ভাবনাই সে ভাবে। সেইরূপ সংসারে কাজকর্ম্ম কর্‌বে, কিন্তু মন ভগবানে রাখ্‌বে।

যেমন বড়মানুষের বাড়ীর ঝি,—সে পরের সংসারের সকল কাজ করে, কিন্তু তাঁহার মনটা আপনার ঘরকন্নার দিকে পড়ে থাকে। সে মনিবের ছেলেমেয়েদের আপনার ছেলেমেয়ের মত ক'রে মানুষ করে, কিন্তু মনে জানে, এরা তার কেউ নয়। সংসারটাও সেইরূপে করা চাই, সব কাজ কর্‌তে হবে, কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখ্‌বে।

বিষয়চিন্তা ও আসক্তি।

(৩) ঈশ্বরে মন না রেখে যদি সংসার কর্‌তে যাও, তা হ'লে সংসারে অত্যন্ত বেশী জড়িয়ে পড়্‌বে—সংসারে মমতা বেশী হবে। বিপদে, শোকে, তাপে অধীর হয়ে পড়্‌বে। যত বিষয় চিন্তা কর্‌বে, ততই বিষয়ে আসক্তি বাড়্‌বে।

কাঁঠাল ভাঙ্‌তে হ'লে হাতে তেল মাখ্‌তে হয়; তা' না হ'লে হাত আটায় জড়িয়ে যাবে। ঈশ্বরে মতিটা সেইরূপ তেল,—উহা লাভ ক'রে যদি সংসার করা যায়, তা হ'লে আর রোগে, শোকে, তাপে কষ্ট পে'তে হয় না।

ভক্তিলাভের উপায়।

(৪) ঈশ্বরে ভক্তি করিতে হইলে নির্জ্জনে থাকা চাই। সংসারের কোলাহলে কেবল প'ড়ে থাক্‌লে ভক্তি জন্মে না।

দুধ হ'তে মাখন তুল্‌তে হ'লে নির্জ্জন স্থানে দই পাত্‌তে হয়। বার বার নাড়ানাড়ি কর্‌লে দই বসে না। দই বস্‌লে সব কাজ ফেলে রেখে নির্জ্জনে দই মন্থন ক'রে মাখন তুল্‌তে হয়। নির্জ্জনে বসে মনে মনে ঈশ্বরচিন্তা কর্‌লে জ্ঞান, বৈরাগ্য, ভক্তি লাভ হয়। মনকে কেবল সংসারে বদ্ধ রাখ্‌লে মন বড় নীচু হ'য়ে যায়। কামিনীকাঞ্চনচিন্তায় মন ভরপুর হয়, ঈশ্বরচিন্তা মনে স্থান পায় না।

মনটা দুধ আর সংসারটা জল। যদি জলে দুধ ফেলে দেও, তা হ'লে দুধে জলে মিশে এক হ'য়ে যাবে, খাঁটি দুধ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। জলো দুধে দই হয় না। খাঁটি দুধে দই পেতে তাহা হইতে মাখন তুল্‌তে হবে। সেই মাখন জলে রাখ, উহা আর জলের সঙ্গে মিশিয়া যাইবে না। তাই নির্জ্জনে ভগবৎচিন্তারূপ মন্থনদণ্ড দিয়া মন-দই মন্থন করে, তাহা হইতে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তুলিয়া লও। তখন উহা সংসার-জলে ফেলে দিলে আর উহা সংসারে জড়িয়ে যাবে না, ভেসে থাক্‌বে। তখন সংসারের সুখ-দুঃখ কিছুতেই চঞ্চল কর্‌তে পার্‌বে না।

ভাবিতে হইবে সংসার অনিত্য, আজ আছে,কাল নাই। সংসারে কেবল কামিনী-কাঞ্চনের চিন্তা—কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। সুন্দর দেহেতে কি আছে বিচার করিয়া দেখ, আছে কেবল—হাড়, মাংস, চর্ব্বি, এই সব। ঈশ্বরকে ছেড়ে এ সব বস্তুতে মানুষ কেন মন দেয়? টাকাতেই বা কি হয়? ডাল ভাত, কাপড় হয়, বাসাও হয়, এই মাত্র। ইহাতে ভগবানকে লাভ করা যায় না। সুতরাং টাকা কখনই মানুষকে সুখী কর্‌তে পারে না। টাকা যত বাড়ে, অভাবও তত বাড়ে,—কাজেই টাকায় কেবল অশান্তি। ইহাকেই বিচার বলে। এইরূপ বিচার কর্‌লে ঈশ্বরে মন যাবে। পরমহংসদেব বলেছেন, এইরূপ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ করা যায়।

তিনি আরও বলিয়াছেন,—"ঈশ্বরকে ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে, আর কোণে অর্থাৎ একান্তে নির্জ্জনে ব'সে ঈশ্বর-বিষয়ে চিন্তা কর্‌তে হয়। কোন্‌টা সৎ, আর কোন্‌টা অসৎ, তার বিচার কর্‌তে হয়। ঈশ্বর সৎ, সুতরাং তাঁতে মন দিতে হবে, সংসার অসৎ অর্থাৎ নিত্যবস্তু নয়, সুতরাং তাহা ত্যাগ কর্‌তে হবে। এইরূপ বিচার কর্‌লে সংসারের উপর আসক্তি কমিয়া যাইবে। ভক্তিলাভ হইবে।

পরমহংসদেব বলিয়াছেন,—সংসারধর্ম্ম কর, তাতে দোষ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের চরণে মতি রেখে সংসারে কামনা-শূন্য হয়ে কাজ কর্‌বে।

সাধুসঙ্গ।

(৫) ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ভাল লোকেও আছেন, মন্দ লোকেও আছেন। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মাখা-মাখি কর্‌তে হয়, মন্দ লোকের নিকট হইতে দূরে থাক্‌তে হয়। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ কর্‌তে হয়।

সংসারী লোকেরা কত কি বলে,—কিন্তু যাহারা সৎ, তা'দের কথাই শুন্‌তে হয়। বাঘ-ভালুকের ভিতরও নারায়ণ আছেন, কিন্তু তাই ব'লে বাঘ-ভালুকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আলাপ করা ভাল নয়।

এক বনে এক সাধু থাকেন। তিনি তার শিষ্যদিগকে এই উপদেশ দিলেন যে, দেখ বাপুসকল, সকল জীবেই নারায়ণ আছেন, এই জেনে সকলকে নমস্কার কর্‌বে। এক দিন এক জন শিষ্য এক বোঝা কাঠ লইয়া পথ দিয়া আসিতেছিল। এমন সময় একটা শব্দ শুনা গেল, হাতী ক্ষেপিয়া ছুটিয়াছে,—সবাই পালাও। অমনই দূরে দেখা গেল,—একটা ক্ষ্যাপা হাতী ঐ দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। হাতীর পিঠে মাহুত বসিয়া চীৎকার করিতেছে,—"পালাও পালাও।" সবাই রাস্তা ছাড়িয়া পলাইল। শিষ্যটি পলাইল না। সে ঠিক পথের উপর দাঁড়িয়ে হাতীটিকে নারায়ণ ব'লে নমস্কার ক'রে তাকে স্তবস্তুতি কর্‌তে লাগ্‌লো। হাতীটি তখন নক্ষত্রবেগে শিষ্যটির উপর পড়্‌লো ও তাহাকে শুঁড়ে ক'রে তুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। শিষ্যটির সর্ব্বাঙ্গ কাটিয়া গেল, সে রাস্তার ধারে অচৈতন্য হয়ে প'ড়ে রইল।

গুরুর নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিল। তখন গুরু ও অন্যান্য শিষ্যরা তাহাকে ধরাধরি ক'রে আশ্রমে নিয়ে গেল। সেখানে ঔষধ দিতে লাগ্‌ল। খানিক পরে, তার চৈতন্য হ'লে তাকে আর এক জন শিষ্য জিজ্ঞাসা কর্‌লে,—"তুমি পালালে না কেন?" শিষ্য বল্লে,—"গুরু বলে দিয়েছেন, 'জীব জানোয়ার—সবাই নারায়ণ', তাই আমি হাতী-নারায়ণ আস্‌চে দেখে পালাই নাই।" গুরু তখন বল্লেন,—"হাতী-নারায়ণ আস্‌ছিলেন বটে, কিন্তু মাহুত-নারায়ণও তোমায় পলাতে ব'লেছিলেন। মাহুত-নারায়ণের কথা ত শুন্‌তে হয়।"

দুষ্টলোকের ভিতর নারায়ণ থাকিলেও তাহারা যে পথ চলে, সে পথ ছাড়িয়া পলাইতে হয়। মাহুত-নারায়ণের মত সাধুলোক সে পথ ছাড়িয়া পলাইবারই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীতশাস্ত্র।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

ইতিহাস ও জনশ্রুতি।

সঙ্গীত স্বর্গ হইতে আনীত অতি পবিত্র সুধাস্বরূপ। ইহা মর্ত্ত্যধামের বস্তু নহে। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যত শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তন্মধ্যে সঙ্গীতের সহিত কোন শাস্ত্রেরই তুলনা হয় না। এই শাস্ত্র অব্যক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ দেখাইতে সমর্থ হয়। কোন্ সময় কোন্ মহাত্মা বা কোন্ দেবতা যে সর্ব্বজনমনোমোহিনী এই বিদ্যা পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, পৃথিবীর আদিকাল হইতেই এই শাস্ত্র সভ্য, অসভ্য, সকল সমাজেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। যখন মানবজাতির মধ্যে অক্ষর বোধ হয় নাই, তাহার পূর্ব্ব হইতেই এই শাস্ত্র প্রচলিত। মানবের জাতীয় ভাষার সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রহ্মার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রণবের সহিত সঙ্গীত বেদমাতার কণ্ঠ হইতে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছিল; তখন ইতিহাসের জন্ম হয় নাই। দেবাদিদেব মহাদেব বলিয়াছেন, আমি সঙ্গীত বা নাদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। সেই মহান্ সঙ্গীত যে কত বড় বস্তু, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। একদা মহর্ষি নারদ মনে মনে অভিমান করিয়াছিলেন, "সঙ্গীতশাস্ত্রের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় আমি শিক্ষা করিয়াছি; আমার মত সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রাজ্ঞ, দেবতা বা ঋষিদিগের মধ্যে আর কেহই নাই।" অন্তর্য্যামী ভগবান্ বিষ্ণু নারদের অহঙ্কার মনে মনে জানিতে পারিয়া, উঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণচ্ছলে দেবলোকে গমন করিলেন এবং তথায় একটি বিস্তৃত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, বহুসংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক হস্তপদাদি ভগ্ন অবস্থায় গতিশক্তি রহিত হইয়া রোদন করিতেছে। তখন বিষ্ণুকর্ত্তৃক তাহাদিগের দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে তাহারা বলিল, "আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকর্ত্তৃক সৃষ্ট রাগরাগিণী। সঙ্গীতবিদ্যায় অনভিজ্ঞ নারদ নামক একজন মুনি অসময়ে ও অশাস্ত্রমতে আমাদিগের লইয়া আলাপ করাতে, আমাদিগের এই প্রকার অঙ্গভগ্ন ও দুর্দ্দশার কারণ হইয়াছে এবং সেইজন্যই আমরা রোদন করিতেছি; পুনরায় মহাদেব স্বয়ং বা অন্য মহাপুরুষ যথাশাস্ত্রমত রাগরাগিণীর আলাপ না করিলে আর আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ পুষ্ট ও আমরা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিব না কিম্বা স্বইচ্ছায় কোথাও গমনাগমন করিতে পারিব না।" মহাত্মা নারদঋষি জ্ঞানী, সুতরাং জ্ঞানবলে আপনার অপরাধ ও ভগবানের করুণা বুঝিতে পারিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু ও মহেশের স্তবস্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পূর্ব্বকালের ইতিহাস অতি দুর্জ্ঞেয়, কল্পনায় ব্যাঘাতে পদে পদে আসল কথা প্রকাশ পায় না। অস্মদ্দেশে সঙ্গীতশাস্ত্র যে অতি প্রাচীন, তাহা অনেক স্থলেই জানিতে পারা যায়। পূর্ব্বকালে শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ ও রামরাবণের যুদ্ধ বর্ণনাকালেও গীতবাদ্যের বর্ণনা আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালেও সম্ভ্রান্তবংশের কুলকন্যাগণ নৃত্য ও গীতবাদ্যাদি শিক্ষা করিয়া সমাজে প্রশংসালাভ করিতেন। বিরাটের গৃহে অর্জ্জুন বৃহন্নলারূপে তদীয় কন্যার সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন। য়ুরোপের সর্ব্বপ্রাচীন ট্রয়ের যুদ্ধেও সঙ্গীতবাদ্যাদি প্রচলিত ছিল। পুরাতন গ্রীকজাতির মধ্যে ও আর্য্যদিগের মধ্যে সংস্কার ছিল যে, দেবতারা এই সঙ্গীতবিদ্যার সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্যাপি গ্রীকদিগের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে,—একবার নীলনদ প্লাবিত হইয়া যায়, তাহাতে অনেক কচ্ছপ,মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতি তটে নিক্ষিপ্ত হয়, তৎপর একটি কচ্ছপের মাংস ক্রমশঃ গলিত ও স্খলিত হইয়া যাইলে কেবল তাহার খোলের মধ্যে তাহার শিরাগুলি শুষ্কিত হইয়া পতিত থাকে; এক দিন দেবী মারকিউরি নদতটে ভ্রমণ করিতেছিলেন, হঠাৎ সেই খোলের উপরে তাঁহার পদ পতিত হয়; তৎক্ষণাৎ সেই কচ্ছপের শিরা হইতে সুস্বর নির্গত হওয়ায়, তিনি তাহা বাজাইতে লাগিলেন। তাহাতেই প্রথমে 'লায়র' নামক বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। লায়র আদর্শ করিয়াই প্রাচীনকালের হার্প ও ইদানীং নানাবিধ তারযুক্ত যন্ত্রাদির সৃষ্টি হইয়াছে।

রামশিঙ্গা বহুকালাবধিই আমাদিগের দেশে বা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। মহিষ অথবা গরুর শৃঙ্গ শূন্যগর্ভ করিয়া বাজাইবার রীতি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। মহাদেব শিঙ্গা, তানপুরা ও ডম্বুর বাজাইতেন, ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন যন্ত্র নাই, গণেশ মৃদঙ্গ বাজাইতেন, শ্রীকৃষ্ণ বেণুবাদ্যে বিশারদ ছিলেন, জননী বীণাপাণির হাতে একমাত্র বীণাই দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং সকল দেবদেবীই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করিতেন। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্র যে সাধনের সামগ্রী, ইহার পরিচয় ইহাতেই সাধারণে বুঝিতে পারিবেন। মনোমুগ্ধ ও আয়ত্ত করিবার জন্য এমন সামগ্রী আর কিছুই হইতে পারে না, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত।

প্রাচীনকালে মিশরদেশে এক প্রকার ঢাক ব্যবহৃত হইত; মিশরের লোকেরা লায়র ও এক প্রকার বাঁশী বাজাইত। সুন্দরী ক্লিওপেট্রার সময়ে গীতবাদ্যাদি বিশেষ বিস্তার হইয়াছিল। ব্যাবিলনেও এই গীতবাদ্যের বিশেষ উন্নতি হয়। প্রাচীন ইহুদিগণ যখন মুশার সময়ে মিশর হইতে

পলায়ন করে, তখন তাহারা সঙ্গীতবিদ্যায় অত্যন্ত ছিল। প্রাচীন পারস্যদেশে বিলাসিতার সহিত গীতবাদ্যের আলোচনাও উন্নত হয়। তবে প্রাচীনকালের নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র তত সুস্বরবিশিষ্ট ও সুপ্রণালীর ভাবে সৃষ্ট হয় নাই, সমাজ তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না, নানাপ্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহাদি প্রায় লাগিয়াই থাকিত। তৎকালীন যুদ্ধ-বিদ্যার ইতিহাসে সংগ্রামিক সঙ্গীতপ্রথারই অধিক প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বীররসের সঙ্গীত যেমন সকল সময়ে বীরদিগের পক্ষে বিশেষ উত্তেজক, বাদ্যযন্ত্রও তেমনই ভয়ঙ্কর শব্দকারক ছিল। যখন পুরাকালে বীরবর হানিকা ৮০টি হস্তী লইয়া রোমকদিগকে আক্রমণ করিতে যান, তখন রোমকেরা এমন ভীষণ শব্দে ভেরী বাজাইয়াছিল যে, হস্তীগুলি ভয়ে রণভূমি হইতে পলাইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। আলেক্জেণ্ডারের সময়েও গ্রীসে সঙ্গীতবিদ্যার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল। যখন আলেক্জেণ্ডার পারস্য জয় করিয়া পার্সিপোলিসে সস্ত্রীক সিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন গায়কগণ তাঁহাকে নানাপ্রকার গীতবাদ্য শ্রবণ করাইয়া মোহিত করিয়া দেয়।

মুসলমানদিগের আমলে প্রথমতঃ সঙ্গীতশাস্ত্র নষ্ট হইতে থাকে; তখন ধর্ম্মশাস্ত্রাদি হিন্দুদিগের ব্যবহার-প্রণালীর বিপরীতেই মুসলমানেরা কার্য্য করিতেন; সুতরাং সাধন-সম্বন্ধে সঙ্গীতবিদ্যারও সেইরূপ হয়। কালিফ হারুণ-অল্‌রসিদ নামে একজন অতি বিদ্যানুরাগী নৃপতি হন; তাঁহার সময়ে সঙ্গীতের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার নিকট নানা দেশ হইতে কবিগণ আসিতেন এবং কালিফ নৃপতি প্রতিদিন সায়ংকালে অন্তঃপুরে গিয়া সঙ্গীতের আলোচনা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর কালিফেরা যত বিলাসপ্রিয় হইতে লাগিলেন, তত সঙ্গীতের উন্নতি করিতে লাগিলেন। মহাত্মা আকবর বাদশাহ যুদ্ধ, রাজ্যশাসন, ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও বিবিধ রাজনীতিক গুরুতর বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও সঙ্গীতের অনুশীলন ও উহার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন।

বর্ত্তমান য়ুরোপে সঙ্গীতশাস্ত্রের উন্নতিসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষার সম্পূর্ণতাসাধন করিতে গেলে সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা এবং দেশভ্রমণজনিত বহুদর্শিতা, এই দুইটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন। যথাসাময়িক পান-ভোজনের মজ্‌লিসে ও বৃহৎ বৃহৎ পার্টিতে নৃত্যগীতাদিতে সুদক্ষ না হইলে সে ব্যক্তি সভ্যসমাজে সম্মান লাভ করিতে পারে না। য়ুরোপীয়গণ স্বীকার করেন, ভারতবর্ষই সঙ্গীত-গৌরবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। য়ুরোপীয় ও আমাদিগের স্বর প্রায় একপ্রকার। আমাদিগের যেরূপ ষড়জাদি সপ্তস্বর, যথা—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাতটি স্বর আছে, তাঁহাদিগের মধ্যেও সেইপ্রকার ডো, রি, বি, ফা, সল্, লা, সি, এই সাতটি স্বর আছে। আজকাল যন্ত্র-সঙ্গীতে য়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষ অপেক্ষাও উন্নত, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু কাণ্ঠ্য-সঙ্গীতে তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট, তাহাও বিশেষ দ্রষ্টব্য। এষ্ট্রনমী ও এষ্ট্রলজী-সম্বন্ধে অস্মদ্দেশ ও য়ুরোপে যেমন পার্থক্য, কাণ্ঠ্য ও যন্ত্র-সঙ্গীতের তুলনায়ও সেইরূপ বলা যাইতে পারে। এষ্ট্রলজীতে এখনও য়ুরোপীয়ান্‌দিগের সূক্ষ্ম বিচারশক্তি জন্মে নাই, কিন্তু এষ্ট্রনমী অর্থাৎ গণিতশাস্ত্রে উহারা এক্ষণে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় বলিয়াই পরিচিত। যে সকল য়ুরোপীয় আমাদিগের সূক্ষ্ম তানলয়সংযুক্ত রাগ-রাগিণী শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা এই উভয় দেশের সঙ্গীত-বিদ্যার কত দূর তারতম্য, উহা উপলব্ধি করিতে পারেন। আমাদের দেশের চতুরঙ্গ শ্রবণ করিয়া এ পর্য্যন্ত অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মোহিত হইয়াছেন, ইহা অনেকেই বিদিত আছেন।

সঙ্গীতের লীলাভূমি প্রাচীন ভারতবর্ষের পবিত্র তপোবন এবং সেই তপোবনপ্রবাসী সংসারবিরাগী ঋষিবৃন্দের নিকট এই পবিত্র সঙ্গীতশাস্ত্রের বিশেষ আদর যত্ন ছিল। নারদ, ব্যাস, বাল্মীকি, ভরদ্বাজ, জৈমিনি, মাতঙ্গ, হনুমন্ত প্রভৃতি মহাত্মগণ এই মহান্ সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। এখন তাঁহাদিগের কৃত সঙ্গীতসংহিতাসকল অনুসন্ধান করিলে হিন্দুরাজন্যগণের বৃহৎ বৃহৎ পুস্তকালয়ে পাওয়া যাইতে পারে।

এ দেশের সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রাচীনতাসম্বন্ধে স্থির করা দুঃসাধ্য। ব্রহ্মার সামবেদ সঙ্গীতে পরিপুষ্ট, বিরাটপুরুষদিগের স্তবস্তুতিসকল সুরসাল সঙ্গীতময়, ভক্তসাধকমাত্রেই উহার সুরসাল পীযূষ পান করিয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমাদের আর্য্যসঙ্গীত সাধনার ন্যায় সেবিত হয়, উহার বিমল তরঙ্গের আঘাতে মুক্তির তটে লইয়া সাধককে পৌঁছাইয়া দেয়। আর্য্যসঙ্গীত অন্য দেশের ন্যায় বিশাল বিলাসিতার হাটে বিক্রয় হয় না, নৃত্যগীতের হাবভাবে ভুলাইয়া ভীষণ বিষয়মোহেতে পতিত হওয়ায় না, উহার তরঙ্গ গায়ককে স্বর্গে লইয়া গিয়া সুবাসিত কুসুমবাসে বিধৌত করিয়া দেয়, উহার সেবনে সঙ্গীত-সাধকের শতকোটী গঙ্গা-স্নানের তুল্য ফললাভ হয়। তাই জন্য ঋষিগণ একবাক্যে সকলেই কহিয়াছেন,—"গানাৎপরতরং নহি।"

আমাদের সঙ্গীতের সাতটি স্বরের সাতটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে। যথা:=ষড়জ—অগ্নির, ঋষভ—ব্রহ্মার, গান্ধার—সরস্বতীর, মধ্যম—মহাদেবের, পঞ্চম—লক্ষ্মীর, ধৈবত—গণেশের, নিখাদ—সূর্য্যের অধিকৃত। ঐ সকল দেবতাদিগের আকৃতি-প্রকৃতিমহত্ত্ব দ্বারা আর্য্য সুরসকল দেবভাবে বিভক্তিকৃত হইয়া সাধনের মহত্ত্ব প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত সপ্ত সুরের সপ্ত প্রকার শক্তি অনুভব করিয়া কণ্ঠে ধারণা করা সহজ সাধকের কর্ম্ম নহে।

নারদপুরাণে চতুঃপঞ্চাশৎ কোটী রাগরাগিণীর প্রসঙ্গ আছে। শাস্ত্রে কথিত আছে, এই সঙ্গীতবিদ্যাটি গন্ধর্ব্বদিগের

আলোচ্য, এই জন্য ইহাকে গন্ধর্ব্ববিদ্যা বলে। কিন্তু কোন্ জাতি গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ ছিল, এক্ষণে তাহাদিগের বংশধর কেহ আছে কি না, তাহার নির্দ্দেশ করা সুকঠিন। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সঙ্গীতগ্রন্থ এ দেশে প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা পাঠে জানা যায় যে, অত প্রাচীনকালেও এ দেশে সঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হইয়াছিল।

আমাদিগের অতি প্রাচীন সময়ের বর্ণনা এইরূপ; যথা—পৃথিবীসৃষ্টির সমকালে দেবাদিদেব মহাদেবের পঞ্চ মুখ হইতে পাঁচ, পার্ব্বতীর মুখ হইতে এক, এই ছয় রাগের সৃষ্টি হইয়াছিল। মহাদেবই সঙ্গীতবিদ্যা প্রথম সৃষ্টি করিয়া বিশ্বপতি পরমাত্মা গোলোকপতির প্রীতি সম্পাদন করেন, তখন জগন্নিবাস বিষ্ণু, আদিদেব মহাদেবের সঙ্গীতে দ্রব হইয়া গঙ্গারূপে মহাদেবকে প্রেমালিঙ্গন করেন; অতঃপর ব্রহ্মা সেই কয়েকটি রাগ প্রথম শিক্ষা করিয়া ইহাদিগকে ধ্যান করিবার জন্য ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন ঋতুর নির্দ্দেশ করেন; যথা—শরতে ভৈরব; হেমন্তে মালব বা মালকোষ; শিশিরে নটনারায়ণ, শ্রী; বসন্তে হিন্দোল বা বসন্ত; গ্রীষ্মে দীপক, পঞ্চম এবং বর্ষায় মেঘ। এই ছয়টি রাগ ব্রহ্মা ছয় ঋতুতে গান করিবার জন্য ঋতু অনুসারে প্রত্যেক রাগের অনুগত আর ছয়টি রাগিণীর সৃষ্টি করেন। ঐ রাগিণীগুলি যে যে রাগের অনুগত, সেই সেই রাগের ভার্য্যাস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ব্রহ্মা এই কয়েকটি রাগরাগিণী ক্রমশঃ নারদ, রম্ভা, তুম্বুরু, হুহু এবং ভরত এই পাঁচটি শিষ্যকে শিক্ষা দিলেন। কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থের মতে সোমেশ্বর সঙ্গীতবিদ্যা সৃষ্টি করিয়া অষ্টাদশ শিষ্যকে শিক্ষা দেন; যথা, দেবতাদিগের মধ্যে দুর্গা ও সরস্বতী, নাগলোকের মধ্যে শেষ, ঋষিদিগের মধ্যে নারদ, ভরত, কশ্যপ, শাখামৃগ ও হনুমান্ এবং গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে কলানাথ, সাবুদল, তুম্বুরু, আসোয়, দেশা, হোহাই, কোহল, হাহা, হুহু, রাবণ, অর্জ্জুন, নারদ ও ভরত ঋষিদ্বয় সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। হুহু ও তুম্বুরু গন্ধর্ব্বদ্বয় কণ্ঠে ও যন্ত্রে ক্রিয়াসিদ্ধাংশ শিক্ষা দিতেন, রম্ভা নৃত্যবিদ্যার শিক্ষা দিতেন, ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভরতপ্রণীত গ্রন্থই প্রথম প্রচারিত হয় এবং ভদ্রনামক জৈনক নট এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র অধ্যাপনা করাইতেন। মহর্ষি ভরত আবার উক্ত ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী হইতে আটচল্লিশটি উপরাগিণীর সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করেন। এইরূপ কথিত আছে, দিবারাত্রি অষ্ট প্রহরে বিভক্ত থাকাপ্রযুক্ত, প্রত্যেক প্রহরে গান করিবার জন্য এক এক রাগের আট আটটি করিয়া পুত্র নির্দ্দিষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, সঙ্গীতে আটটি মাত্র রস পরিগৃহীত হয় বলিয়া, ঐ আট রসের অনুগত এক একটি গান করিতে হইবে ভাবিয়া এক এক রাগের আট আটটি পুত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মহর্ষি ভরতের মত ক্রমশঃ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ায়, ঋষি ও গন্ধর্ব্বেরা ঐ মতে সঙ্গীতশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তারপর গন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীতশিক্ষায় এত পারদর্শী হইলেন যে, এখনও সঙ্গীতবিদ্যাকে গন্ধর্ব্ববিদ্যা বলিয়া লোকসমাজে বলিয়া থাকে।

প্রাচীনমতে চৌরাশীটি রাগিণীর প্রসঙ্গ আছে। উক্ত সঙ্গীতগ্রন্থাদির মতে দিবা পাঁচ ভাগে বিভক্ত; যথা,—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, পূর্ব্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ, সন্ধ্যা; এই পাঁচটি সময়ের শোভাসন্নিবেশস্থলে ছয় রাগের পাঁচ পাঁচটি রাগিণী সৃষ্টি হয় এবং পুনর্ব্বার দিবারাত্রিকে আট প্রহরে ভাগ করিয়া এক এক রাগিণীর আট আটটি পুত্র বলিয়া আটচল্লিশটি উপরাগের উৎপত্তি হয়।

এই সকল রাগরাগিণী অষ্টপ্রকার সাত্বিক রসযুক্ত হইয়া জীবদেহে এক অভূতপূর্ব্ব ঐন্দ্রজালিক কার্য্য করিয়া থাকে। রসে, গুণে, সময় ও ঋতুর সহিত প্রযুক্ত হইয়া দেহের বায়ু, পিত্ত, কফের সমতা জন্মায় ও রোগবিশেষের আরোগ্যকারী ক্ষমতা বিধান করিয়া থাকে; সুস্থাবস্থায় মনের গতি অন্যদিকে প্রবর্ত্তিত করায়, মনুষ্যমন রসবিশেষে মোহিত, স্তম্ভিত ও আকর্ষিত করায়; সঙ্গীতপ্রবৃত্তিনিচয়কে উত্তেজিত করায় এবং রিপুকুলকে বশীভূত করায়। কোনপ্রকার সুস্বর শ্রবণ করিলে এমন জীব নাই যে, তদ্দিকে তাহার মন ধাবিত না হয়। কর্ণের সহিত স্বরের এমনই স্বভাবসম্বন্ধ, যে উহা দ্বারা জগতে অলৌকিক ক্রিয়াসকল সম্পন্ন হইতে পারে। লোকে প্রবাদ আছে যে, এক ব্যক্তি সমুদ্রপোত হইতে বংশীধ্বনি করিয়া তাহার সুমধুর স্বর দ্বারা নানাপ্রকার জলজন্তুকে মুগ্ধ করিত। অদ্যাপি য়ুরোপখণ্ডে সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার সময় ধীবরেরা বংশীধ্বনি করিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কোন সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তি স্বীয় কণ্ঠস্বর দ্বারা মনুষ্যকে উন্মত্ত করিতে পারে। সঙ্গীতের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে পাষাণ দ্রবীভূত হয়, মৃতের জীবনলাভ, অকস্মাৎ প্রচণ্ড অগ্নির উৎপত্তি এবং বৃষ্টির আবির্ভাব হওয়া প্রভৃতি অলৌকিক ব্যাপারের কথা অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ গায়ক—গোয়ালিয়ার প্রদেশের নিকটবর্ত্তী মিঞা তানসেনের কথা ও তাঁহার সঙ্গীতের প্রভাব সকলেই অবগত আছেন। তিনি দীপক রাগ আলাপ করিয়া অগ্নির উৎপত্তি ও মল্লার রাগের আলাপ দ্বারা বৃষ্টির আবির্ভাব করাইতে সমর্থ ছিলেন। যদিও এই সকল কথা শুনিলে রূপকথার মত অনুমান হয়, তথাপি ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে। সঙ্গীত যে সময়ে সময়ে ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিয়া লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। অনেকেই জানেন, প্রান্তরমধ্যে বেণুস্বর শ্রবণ করিয়া গো অশ্ব প্রভৃতি স্বরাভিমুখে ধাবিত হয়; কুরঙ্গজাতি সুমধুর বংশীস্বরে আকৃষ্ট হইয়া ব্যাধকর্ত্তৃক ধৃত হয়; হস্তিগণ বাদ্যভাণ্ড ও সঙ্গীতে এমনই মোহিত হয় যে, তাহারা যেন তাহার প্রভাবে মৃদু পা ফেলিতে ফেলিতে নৃত্য করিতে থাকে; অতি বড় হিংস্র বিষধরও সঙ্গীতমন্ত্রে মুগ্ধ ও

সাপুড়িয়াদিগের বংশীধ্বনিতে মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করে। অনেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন, গোদোহনকালে যদি কেহ সুমধুর সঙ্গীত বা বেণুবাদ্য করে, তাহা হইলে গোজাতি এমন মোহিত হয় যে, দোহনকারী অধিক দুগ্ধ লাভ করিয়া থাকেন।

সঙ্গীত স্বভাবযুক্তকারী বস্তু। জড়পদার্থও সঙ্গীতরসে প্রফুল্ল ও কম্পিত বা লোমহর্ষণযুক্ত হয়। মরুভূমিতে একপ্রকার বালুকা দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদিগের মধ্যে দূর হইতে সুমধুর ধ্বনি শ্রুত হওয়া যায়; পরিশ্রান্ত উষ্ট্রগণ উহা শ্রবণ করিয়া আনন্দে পদক্ষেপ করিতে করিতে গমন করে। পক্ষিগণের সঙ্গীতপ্রতিভা এত অধিক যে, তাহারা মানুষের সঙ্গীতে যোগ দিয়া থাকে; মনুষ্য যেখানে গানবাদ্য করে, তাহারাও সেই স্থলে গান করিতে করিতে উড়িয়া বেড়ায়। লোকালয় ভিন্ন নিবিড় অরণ্যে তাহারা গান করে না বা একত্রে সমাবেশ হয় না। অনেক ভ্রমণকারী কেবল পক্ষীদিগের মধুরস্বর শুনিয়া নিকটে লোকালয় বা জলাশয় আছে, ইহা বুঝিতে পারেন। ডেনমার্কের নৃপতি চতুর্থ হেন্‌রী একদা সঙ্গীতের শক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য এক সুগায়ককে আহ্বান করিয়াছিলেন; গায়ক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "তুমি যে সঙ্গীত শুনাইয়া লোককে মোহিত করিবার গর্ব্ব কর, আজ তাহা আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিতে চাই।" গায়ক রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত আরম্ভ করিল। রাজা সেই সঙ্গীত শুনিয়া এতদূর উত্তেজিত হইলেন যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থিত ৫।৬টি ব্যক্তিকে প্রাণে নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। কালিফ ওমার একদা এক বিদ্রোহদমন করিতে গিয়া বহু লোকের প্রাণসংহার করিতে উদ্যত হয়েন; সেই সময় এক পার্শী গায়ক বন্দীদিগের মধ্যে ছিল; সে রাজাকে একবার একটি গান শুনিবার জন্য অনুরোধ করিল; রাজা তাহা শুনিতে ইচ্ছা করায়, উক্ত গায়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিল; রাজা তাহার সঙ্গীত শুনিয়া এমনই মুগ্ধ হইলেন যে, তৎক্ষণাৎ সমস্ত বন্দীদিগকে মৃত্যুর দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। নির্দ্দয় তৈমুরেরও পাষাণহৃদয় সঙ্গীতরসে এক দিন দ্রবীভূত হইয়াছিল; তিনি যখন মনুষ্যমস্তক ছেদন করিয়া পর্ব্বতাকার করিতে থাকেন, সেই সময় দৌলত নামে এক জন ভিক্ষুক অন্ধগায়ক সঙ্গীতচ্ছলে বাদশাহের সহিত আমোদপ্রমোদ আরম্ভ করিয়াছিল; তৈমুর নিজে খঞ্জ ছিলেন, ভিক্ষুক তাঁহাকে 'খোঁড়া' বলিয়া সম্বোধন করিয়া গান আরম্ভ করে; বাদশাহ তাহার সৎসাহসে ও সঙ্গীতশ্রবণে এত দূর মোহিত হয়েন যে, তাহার শিরোরক্ষার সহিত অপর অনেকেরই শিরোরক্ষিত হইয়া যায়।

ফ্রান্স দেশে একদা একটি দীর্ঘদিনস্থায়ী উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রতিদিন বীণার স্বর শ্রবণ করিয়া উন্মাদরোগ হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন। আমাদের বঙ্গের ভোগবিলাসপরায়ণ নবাব সিরাজদৌলা এক দিবস গঙ্গাবক্ষে নৌকাবিহার করিতে করিতে ভক্ত রামপ্রসাদের মালসী শুনিয়া, তাঁহাকে নিজ বোটের উপরে ডাকিয়া আনিয়া, সঙ্গীত শুনাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন বাদ দিয়া অন্যান্য সুমধুর সঙ্গীতে নবাবকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন; নবাব উহাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি ও সকল গীত শুনিতে চাহি না, তুমি যে 'কালী' 'কালী' বলিয়া কি গাহিতেছিলে, ঐ সকল গীত আমাকে শুনাও।" ভক্ত রামপ্রসাদ তখন শ্যামাসঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। নবাব কবিবরের সঙ্গীতে এত দূর মোহিত হইলেন যে, সেই হইতে তিনি তাঁহাকে প্রায়ই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বিগত ফরাসিবিপ্লবের সময় 'মার্সেলিস্ হিমন্' নামক গীত বাঁধা হয়; সেই গান যেখানে যেখানে গীত হইতেছিল, উহা শুনিয়া তত্রত্য অধিবাসিবর্গ দলে দলে নিজ নিজ ব্যবসা ফেলিয়া তরবারি ধারণপূর্ব্বক অষ্ট্রীয়া ও প্রুসিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল।

সঙ্গীতের এইরূপ অপার মহিমার বিষয় যতদূর সম্ভব লিখিত হইল। এই বিদ্যা এত দূর দুরূহ যে, ভগবানের কৃপা ভিন্ন ইহা কেহ সহজে আয়ত্ত করিতে পারে না। সঙ্গীতে স্বাভাবিকশক্তি ও জন্মার্জ্জিত চেষ্টা থাকা চাই, নতুবা ইহা সাধন করা কঠিন। বিশেষ হিন্দু-সঙ্গীতবিদ্যা কেবল অভ্যাস করিলে হয় না; ইহার স্বরসাধনপ্রণালীর অভ্যাস সময়ে যোগসাধনের ন্যায় ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও বিবিধ প্রকার ইন্দ্রিয় সংযমন না করিলে এই মহান্ স্বর্গীয় রত্ন সহজে আয়ত্ত হয় না।

সঙ্গীত বলিতে হইলেই গীত, বাদ্য, নৃত্য—এই তিনটি বিষয় বুঝায়। এক্ষণে আমাদিগের দেশে ইহার কত দূর উন্নতি হইয়াছে, তাহাই এস্থলে লিখিত হইতেছে। ১ম :—গীত বা কাণ্ঠ্য-সঙ্গীত অর্থাৎ কণ্ঠনির্গত স্বর নানা রসসংযুক্ত হইয়া ছন্দোবন্দে বিন্যস্ত কবিতাসকল—যাহা বিবিধ রাগ রাগিণীতে উপস্থিত হয়, তাহাকেই গান অথবা কাণ্ঠ্য-সঙ্গীত কহে।

২য় :—বাদ্য। নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র—যাহা অঙ্গুলির অভিঘাতে বা ফুৎকারে বায়ুসংযোগে সঞ্চালিত হইয়া মনোহর শব্দ উৎপাদন করে, গীত ও তানের সহায়তাবিধান করে, তাহাকে বাদ্য কহে।

৩য় :—নৃত্য। বাদ্যকর্ত্তৃক যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সময় বিভাগ করা হয়, সেই সময়ে সময়ে অর্থাৎ তানের লয় অনুসারে পদবিক্ষেপ ও সর্ব্বাঙ্গ লতার ন্যায় চালনা করিয়া, সঙ্গীতের সুমধুর হাবভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য কহে।

এই ত্রিবিধ তরঙ্গের একত্র সমাবেশই সঙ্গীতের পূর্ণকলেবর। ইহা দৃশ্য ও শ্রাব্য, দুই ভাগে বিভক্ত। যাহা শ্রবণ করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায়, তাহা শ্রাব্য; আর নৃত্যাদি—যাহা দর্শন করিয়া তৃপ্ত হওয়া যায়, তাহা দৃশ্য। দৃশ্য-সঙ্গীত থিয়েটার,

যাত্রা, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে বুঝিয়া লইতে হইবে, আর শ্রাব্য-সঙ্গীত ব্যক্তিবিশেষের কণ্ঠ বা যন্ত্রাদি হইতে স্বর-লয়ে নির্গত হইয়া শ্রবণকে পরিতৃপ্ত করে।

শ্রাব্য-সঙ্গীত স্বরযোগে নানাপ্রকার রাগরাগিণীতে প্রকাশ পায়। রাগশব্দে মনের ভাব এবং প্রকৃতির শোভা বা যে ধ্বনি দ্বারা চিত্তের প্রফুল্লতা উপস্থিত হয়, তাহাকে রাগ বলে। রাগবিবোধের গ্রন্থকর্ত্তা প্রসিদ্ধ সোমেশ্বর বলেন,—"যেমন গভীর সমুদ্রজল বায়ুসহযোগে অনন্ত তরঙ্গ-রাশির উৎপাদন পরে, সেইরূপ সা, রে, গা, মা প্রভৃতি সপ্ত স্বর এবং তাহাদিগের পরস্পরের অন্তর্গত দ্বাবিংশতি শ্রুতি অর্থাৎ খণ্ডস্বর বা স্বরকামিনীসকল পর্য্যায়ক্রমে উদারা, মুদারা, তারা প্রভৃতি তিন গ্রামে বিস্তৃত হইয়া বিশেষ বিশেষ স্বরের পরস্পর মিশ্রণে ও বিয়োগে ক্রমশঃ যে অসংখ্য রাগতরঙ্গের উদ্ভব করিতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে। তবে যন্ত্র বা কণ্ঠস্বর উপলক্ষে পূর্ব্বোক্ত চৌরাশীটির অতিরিক্ত রাগ-রাগিণীর আলোচনা করা সুকঠিন ও বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ বিবেচনায় সচরাচর সঙ্গীতগ্রন্থে তদতিরিক্ত রাগরাগিণীর উল্লেখ নাই। প্রথম সপ্ত স্বরের মধ্যে যে ২২টি শ্রুতি আছে, তাহাদিগের ৪টি ষড়জ ও ঋষবের মধ্যে, ৩টি ঋষব ও গান্ধারের মধ্যে, ২টি গান্ধার ও মধ্যমের মধ্যে, ৪টি মধ্যম ও পঞ্চমের মধ্যে, ৪টি পঞ্চম ও ধৈবতের মধ্যে, ৩টি ধৈবত ও নিখাদের মধ্যে এবং ২টি নিখাদ ও ষড়জের মধ্যে আছে; তাহা-দিগের কোমলতর ও কোমলতম এবং তীব্রতর ও তীব্রতম বলিয়া উল্লেখ করা হয়। হিন্দু-সঙ্গীতকর্ত্তা ঋষিরা সকলেই সুকবি ছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেক শাস্ত্রেই কল্পনার মনোহর ফুল ফুটাইতে পারিতেন এবং তদ্দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ সাধনার সাধকদিগকে তৃপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন। তাই তাঁহারা সঙ্গীতশাস্ত্রমধ্যেও কল্পনার ছবি আঁকিয়া গিয়াছেন—স্বর-পরিবারদিগকে নায়ক-নায়িকা ও স্ত্রীপুত্রাদিরূপে বর্ণন করিয়াছেন। উক্ত ২২টি খণ্ডস্বর বা সূক্ষ্ম শ্রুতিকে স্বর-রমণীরূপে বর্ণন করিয়া, তাহাদিগের এক একটি মনোহর নাম দিয়াছেন। শব্দ সকলের তিন গ্রামে যখন কোন এক স্বরনায়ক বিশেষ কোন নায়িকাসহযোগে ক্রীড়া করে এবং আর আর স্বর-পরিবারগণ তাহার অনুচর বা বৈরিদলভুক্ত হয়, তখন এক বিশেষ রাগ বা রাগিণীর মূর্ত্তি প্রকাশ পায় এবং তান, উপজ প্রভৃতি আরোহী অবরোহী দ্বারা তাহাকে অলঙ্কৃত করে। যে কোন রাগরাগিণীবিশেষে যে কয়েকটি স্বরের ব্যবহার হয়, তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রয়োগের স্থান ও পরিমাণ-বিবেচনায় তাহারা ভিন্ন ভিন্ন উপাধিলাভ করে। যথা :—বাদী, সম্বাদী, ন্যাস ইত্যাদি।

গীত রাগের প্রথমে যে সুর ধরা হয়, তাহার নাম গ্রহ। রাগের বিশ্রামসময়ে যে সুর, তাহার নাম ন্যাস। আর যে সুর বহুল প্রয়োগ হয়, তাহার নাম অংশ। রাগ বা রাগিণীর বাদী স্বরকে রাজা, সম্বাদীকে মন্ত্রী এবং অপর স্বরদের অনুচর বলা যায়। যে বিশেষ স্বরকে রাগবিশেষে ত্যাগ করিতে হয়, তাহাকে বিবাদী কহে। স্বরবিশেষ স্বামী হইলে, আর অপর তাহার গ্রহ, অমাত্য, অনুচর পদ-বিশেষে নিযুক্ত হইলে অথবা কেহ শত্রুরূপে পরিত্যক্ত হইলে, রাগ বা রাগিণীবিশেষের মূর্ত্তির উদয় হয়।

আমাদিগের দেশে এমন শক্তিমান্ ঋষিগণ ছিলেন যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমান্ রাগরাগিণীদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন করাইতেন, অসম্ভবকে সম্ভব করিতেন, এক ঋতুর সময় অপর ঋতুর আবির্ভাব করাইতেন। একদা কোন ক্ষুৎপিপাসাকাতর রাজা মৃগয়া করিতে করিতে এক নিবিড় অরণ্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া বিষম ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন কোনপ্রকার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইতস্ততঃ অতি কষ্টে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সহসা এক মুনির আশ্রম তাঁহার নয়নপথে পতিত হইল। তখন তিনি সেই আশ্রমের দিকে ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন; গিয়া দেখিলেন, তথায় এক প্রশান্তমূর্ত্তি ঋষি ধ্যানযোগে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি মুনিবরের পদযুগলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। মুনিবর তাঁহার মনের ভাব এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতরের কথা বুঝিতে পারিয়া, একটি বীণা লইয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। রাজা দেখিলেন, আমি পিপাসায় মৃতপ্রায় হইতেছি, কতক্ষণে ইঁহার উপাসনা ও বীণাবাদন শেষ হইবে, আমি জল প্রার্থনা করিব। এইরূপ ভাবিতেছেন, ইত্যবসরে সঙ্গীতের প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে দুইটি অপূর্ব্ব সুন্দরীমূর্ত্তি জলপাত্র ও ফলপুষ্পাদিহস্তে তথায় উপস্থিত হইয়া, রাজার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক সহসা অন্তর্হিতা হইলেন এবং মুনিদেবের বীণাও নীরব হইল। রাজা মুহূর্ত্ত-মধ্যে পিপাসা ও ক্ষুধার শান্তি করিলেন। সঙ্গীতের অসা-ধারণ প্রভাবেই যে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।

আকবরের সভায় তানসেন যখন দীপক রাগ আলাপ করিয়া অগ্নির আবির্ভাবে ভস্মীভূত হইতে বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার দুই কন্যা সেই বিষমবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাড়াতাড়ি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া, মেঘ রাগ গাইতে আরম্ভ করিলেন। তখন তানসেন দগ্ধপ্রায়দেহে সহসা জীবন-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ প্রবাদ এখনও সে দেশের লোকে বিস্মৃত হয় নাই।

[ক্রমশঃ।

ব্যায়াম।

মানুষের তিনটি দিক্ আছে ;—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। তন্মধ্যে শরীর সকলের প্রধান। শরীর ভাল না থাকিলে মন ভাল থাকে না, মন ভাল না হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতি করা যায় না। কাজেই শরীরকে সকলের আগে সুস্থ ও সবল রাখিতে হয়। সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার নানারূপ পদ্ধতি আবিষ্কৃত ও অবলম্বিত হইতেছে। অসভ্য অবস্থায় মানুষকে আহার্য্য আহরণের জন্য বন্যপশুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে সংহার করিতে হইত। তাহাতে অসভ্যদের অঙ্গচালনা ঘটিত। তাহার পর যখন মানুষের সভ্যতা প্রথম ধাপে উঠিল অর্থাৎ মানুষ কৃষিকৌশল উদ্ভাবিত করিল, তখনও তাহাকে চাষবাসের জন্য ও আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইত। সভ্যতার উন্মেষের এই প্রথম যুগে মানুষের পক্ষে দৈহিক পরিশ্রম অনিবার্য্য ছিল। তাহার পর মানুষ সভ্যতার ও কৃত্রিমতার যত উচ্চতর ধাপে উঠিতে লাগিল, ততই তাহাদের আলস্যে ও নিশ্চেষ্টতায় কালহরণ করিবার সুবিধা ঘটিতে লাগিল। কেহ কেহ আবার বসিয়া বসিয়া মানসিক চিন্তা করিতে আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহাতে মানবসমাজে নানারূপ ব্যাধি আবির্ভূত হইল। কারণ, ভগবান্ মানুষের দেহকে এমনভাবে নির্ম্মিত করিয়াছেন যে, পরিশ্রম না করিলে শরীর টিকে না। যাহাদিগকে কাজে বাধ্য হইয়া পরিশ্রম না করিতে হয়, তাহাদিগের পক্ষে অঙ্গচালনার অন্যবিধ উপায় অবলম্বন আবশ্যক। শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য এই প্রকার অঙ্গচালনাকে ব্যায়াম বলে।

শরীরের স্বাভাবিক নীরোগ অবস্থার নাম স্বাস্থ্য, তাহার ব্যতিক্রমের নাম অস্বাস্থ্য। রোগী স্বাস্থ্যলাভ করিবার নানাপ্রকার প্রণালী আছে। যাহাদের কাজের জন্য বাধ্য হইয়া উৎকট দৈহিক পরিশ্রম না করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে ব্যায়ামই শরীরকে সুস্থ রাখিবার একটি প্রধান উপায়। একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। শরীর দুর্ব্বল হইলে মানসিক শক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। শরীর ও মনের এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সর্ব্বসুধীজনস্বীকৃত। শরীর সুস্থ থাকিলে মন শান্ত হয়। মনের শান্তি থাকিলে তবে পূজা, পাঠ, ধর্ম্মালোচনা, আমোদ আহ্লাদ, জনহিতৈষণা, পরোপকার প্রভৃতি করিতে ভাল লাগে।

আজকাল কেহ কেহ ব্যায়ামকে ঘৃণা করেন এবং উহা গুণ্ডামী শিখিবার বিদ্যা বলিয়া ভাবেন। ইহার মত ভুল ও অনিষ্টকর ধারণা আর কিছুই নাই। এই ধারণাটা অজ্ঞানতা সূচিত করে। অশিক্ষিত ও কুসংসর্গে পতিত লোকই গুণ্ডামী করে। ব্যায়াম করিলেও করে, না করিলেও করে। সৌভাগ্যের বিষয়, আজকাল অনেকে ব্যায়াম করিতে মন দিয়াছেন। ইহা সমাজের পক্ষে আশার কথা।

ব্যায়াম করা ভাল, কিন্তু অত্যন্ত উৎকট ব্যায়াম করা ভাল নহে। একেবারে পরিশ্রম না করিলে শরীর যেমন ভাঙ্গিয়া যায়, উৎকট ব্যায়াম বা উৎকট পরিশ্রম করিলেও শরীরে সেইরূপ নানা রোগ জন্মে। সুতরাং ব্যায়ামকারীদিগের এই কথাটা বেশ মনে রাখিতে হইবে।

আজকাল বাঙ্গালীর ছেলেরা নানারূপ ব্যায়াম করিয়া থাকে। ফুটবল, টেনিস, ব্যাড্‌মিণ্টন্, জিম্‌নাষ্টিক্, গাদি কপাটী, চুরাংতাং প্রভৃতি খেলাও বটে, ব্যায়ামও বটে,—ইহাতে আমোদও হয়, আবার শরীরও সুস্থ থাকে। সাঁতার, কুস্তী, দৌড়াদৌড়ি মন্দ ব্যায়াম নহে। ইহা খেলাও বটে, ব্যায়ামও বটে। ডন্, বৈঠক, মুগুরভাঁজা, ডাম্বেলভাঁজাও খুব ভাল ব্যায়াম।

যে ব্যায়ামই আরম্ভ কর না কেন, প্রথমে সকল ব্যায়ামই সামান্য মাত্রায় আরম্ভ করিতে হয়। কোনকালেই উৎকট ব্যায়াম করা উচিত নয়।

প্রত্যেক বালকের পক্ষে সকালবেলা বিছানা হইতে উঠিয়া ৫টি ডন, ১০টি বৈঠক ও ২৫ বার ছোট ডাম্বেল ভাঁজা উচিত। ইহাতে শরীরের পেশীগুলি দৃঢ় হয়। এক সপ্তাহ অন্তর ১টি করিয়া ডন্, ২টি বৈঠক ও ৪টি বার ডাম্বেলভাঁজার সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে অল্পদিনের মধ্যে বালকদিগের শরীর দৃঢ় হইয়া থাকে।

ডাম্বেল।

আজকাল এ দেশে ডাম্বেলভাঁজা যেন বেশ প্রচলিত হইয়াছে। ডাম্বেল ভাঁজিবার কতকগুলি বিশেষ সঙ্কেত ও নিয়ম আছে। সেই নিয়মগুলি বেশ ভাল করিয়া প্রতিপালন করা আবশ্যক। নতুবা উহা ভাঁজিয়া কোন ফল হইবে না,—সময় সময় হিতে বিপরীত হইতে পারে। সেইজন্য প্রথমেই আমরা ডাম্বেল ভাঁজিবার মোটামুটি নিয়ম কয়েকটি বিবৃত করিলাম।

(১) ডাম্বেলটি খুব শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিবে। এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য মাঝখানে স্প্রীং দেওয়া ডাম্বেল ব্যবহার করা ভাল।

(২) ডাম্বেল ভাঁজিবার সময় দেহের যে যে অংশের মাংসপেশীর উপর চাপ পড়িতেছে, সে দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবে। কদাচ অন্যমনস্ক হইবে না। দেহের পেশীগুলি ফুলিয়া উঠিলে স্ফূর্ত্তিবোধ করিবে।

(৩) অত্যন্ত দৈহিক অবসাদ হইলে বা ক্লান্তিবোধ করিলে, ডাম্বেলভাঁজা বন্ধ করিয়া দিবে। শরীর অধিক

অসুস্থ হইলে ডাম্বেল ভাঁজিবে না। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ডাম্বেল ভাঁজিবে। কোন দিন কম, কোন দিন বেশী, এমন করিবে না। ইহা একটা নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভ্যাস করিবে।

ইহা হইল, ব্যায়ামের সাধারণ নিয়ম। সকল ব্যায়ামেই এ নিয়মগুলি পালন করিতে হয়। ডন্, বৈঠক, মুগুর প্রভৃতিরও ঐ নিয়ম।

যাহারা বাড়ীতে ডাম্বেল ভাঁজিবে, তাহাদের প্রথম ঠিক সোজা হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। ১নং চিত্র দেখ। পায়ের গোড়ালী দুইটি ঠিক পাশাপাশি রাখিবে অর্থাৎ গোড়ালী এক যায়গায় রাখিবে, কিন্তু আঙ্গুলের দিক্‌টা অর্থাৎ পায়ের পাতার অগ্রভাগ পরস্পর বিপরীত দিকে রাখিবে।

(১)

হাত দুইখানি ঠিক উরুতের উপরে টান টান সোজা করিয়া রাখিবে, হাতের মুষ্টিতে ডাম্বেল দুইটি খুব শক্ত করিয়া ধরিবে। পাঁজরার পাশেই কনুই বেশ শক্ত অবস্থায় থাকিবে ; পাঁজরা ও হাতের মধ্যে ফাঁক না থাকে অর্থাৎ হাত দুইখানি যেন ঠিক দেহের পাশে আঁট হইয়া লাগিয়া থাকে ; মুষ্টিটি উরুতের উপর চিৎ অবস্থায় থাকিবে অর্থাৎ হাতের পিঠটা ঠিক উরুতের উপর থাকিবে। এই অবস্থার ডাম্বেল দুইটি দুই হাতে খুব জোর করিয়া ধরিবে। ঠিক চিত্রের মত দাঁড়াইবে। সর্ব্বশরীর শক্ত করিবে। হাতের কব্জী যেন ঠিক সোজা থাকে,—না বাঁকে।
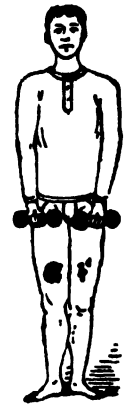
১নং চিত্র।

তাহার পর ডাইন হাতের নিম্ন অংশ অর্থাৎ কনুই হইতে মুষ্টি পর্য্যন্ত অংশ আস্তে আস্তে উপরদিকে তুলিতে হইবে, দেখিও, যেন মুট ঢিলা বা আল্‌গা না হয়, কব্জী একটুও না বাঁকে, ঠিক সোজা থাকে ; কনুই ঠিক যেমন পাশে ছিল, তেমনই থাকে, না সরিয়া যায়। কব্জী ঠিক সোজা রাখিয়া হাত তুলিতে হইবে। হাত কাধের যত দূর নিকট লইয়া যাওয়া যায়, তাহা করিবে। কিন্তু কনুই ঠিক যেখানে ছিল, সেইখানে থাকিবে আর কব্জী ঠিক সোজা রাখিবে। ২নং চিত্র দেখ।

২নং চিত্র।

এইরূপ করিয়া একটু স্থির থাকিয়া বামহস্তখানিও ঐরূপভাবে উপরে তুলিতে থাকিবে, ডাইন হাতখানি ধীরে ধীরে নামাইতে থাকিবে। কোন হাতের আঁটুনি যেন শ্লথ বা ঢিলা না হয়। মুষ্টি সমান শক্ত থাকিবে। প্রথমে প্রত্যেক হাতে এইরূপ পাঁচ বার করিয়া করিবে। ক্রমশঃ এক সপ্তাহ বা দশ দিন অন্তর একটি করিয়া বাড়াইবে। ক্রমে ইহা বার গুণ বা ষোল গুণ অথবা বিশ গুণ বাড়ান যাইতে পারে।

(২)

আর এক প্রকারের ডাম্বেলভাঁজা এইরূপ। প্রথমটি করিয়া পরে এইরূপ করিতে হইবে।

৩নং চিত্রের মত ঠিক কাঁধের কাছে ডাম্বেল দুইটি শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিবে। কনুই যেন ঠিক পাশে সোজা থাকে।

৩নং চিত্র।

হাতের পিছন দিক্ বাহিরের দিকে থাকিবে। মাথাটা একটু পিছন দিকে হেলাইতে হইবে। দৃঢ়মুষ্টিতে ডাম্বেল দুইটি ধরিবে, প্রথমে ডাইন হাতখানি উপরের দিকে তুলিতে থাকিবে। হাত যেন খুব শক্ত থাকে, শক্ত মুষ্টিতে ধীরে ধীরে হাত তুলিতে হইবে। তৎ-পরে ডাইন হাতটি নামাইয়া বামহাতখানি তুলিতে হইবে। ৪নং চিত্র দেখ।

৪নং চিত্র।

এইরূপ প্রত্যেক হাতে পাঁচ সাত বার করিবে। ক্রমে এক সপ্তাহ বা দশ দিন পরে উহার সংখ্যা প্রত্যেক হাতে একটি করিয়া বৃদ্ধি করা যাইতে পারিবে।

ইহার পর দুই হাত এক সঙ্গেও উপরে তোলা যাইতে পারে। ৬নং চিত্র দেখ। কেবল মাথাটি পিছনদিকে হেলিবে না।

(৩)

দৃঢ়মুষ্টিতে ডাম্বেল ধরিয়া দুই হাত ঠিক কাঁধের সহিত সমতল করিয়া ধরিবে। হাত খুব শক্ত করিয়া ডাম্বেল ধরিবে। হাত চিৎ থাকিবে। ৫নং চিত্র দেখ।

৫নং চিত্র।

মুখ দিয়া গভীর নিশ্বাস টানিয়া লইবে। ক্রমে মাথাটি পিছন দিকে লইয়া যাইবে ও হাত দুইখানি উপরের দিকে ধীরে ধীরে তুলিবে। ৬নং চিত্র দেখ।
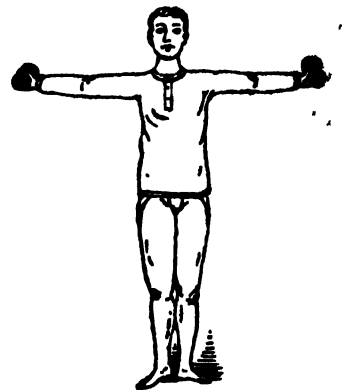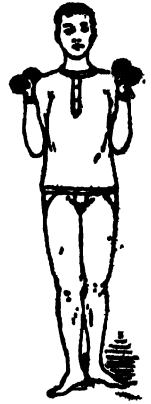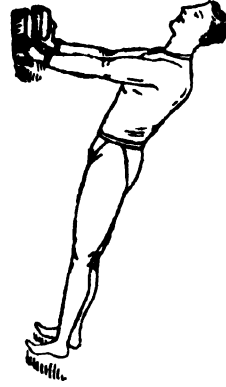
৬নং চিত্র।

এইরূপ করিবার সময় নাসিকার দ্বারা গভীর নিশ্বাস ফেলিবে। আবার ৫নং চিত্রের ন্যায় হাত সোজা করিবে।

(৪)

দুই হাতে ডাম্বেল দুইটি খুব শক্ত করিয়া ধরিবে। হাত দুইখানি সম্মুখে ৭নং চিত্রের ন্যায় বিস্তৃত করিয়া দিবে। দেহটি একটু পিছনদিকে হেলাইয়া দাঁড়াইবে।

৭নং চিত্র।

৮নং চিত্র।

পরে হাত দুইখানি জোরে পিছনদিকে টানিয়া বুকটি খুব ফুলাইয়া আগুইয়া দিবে।

ইহাতে বক্ষস্থল খুব শক্ত হয়। ৮নং চিত্র দেখ।

[ক্রমশঃ।

অনাথবন্ধু

ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষিতত্ত্ব, চিকিৎসা, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, ইতিহাস, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিসশাস্ত্র, শিল্প, ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদি সম্বলিত - -

সচিত্র মাসিক পত্র।

অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থে প্রকাশিত

প্রথম বর্ষ

শ্রাবণ—১৩২৩

প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

तुलसी यव् जग् आयो
जग् हासि तुम् रोय।
अव् एयसा करनि कर् चलो कि
तुम् हासे जग् रोय॥

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, বিশেষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিলাম। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতিবৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আনন্দিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়। যাহা হউক, প্রথম সংখ্যা "অনাথবন্ধু" বাহির হওয়ার পর আমি বুঝিলাম :—

১। কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবেন ; বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া ও রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবেন। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিলাম।

২। ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চক কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

আমার প্রায় সত্তর বৎসর বয়স হইয়াছে। আমি এই বিগত পঞ্চাশ বৎসর ব্যবসাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছি এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য্যবলে এখনও বৃহৎ ব্যবসা চালাইতেছি। ঈশ্বর-ইচ্ছায় ভারতবর্ষে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় সমস্ত মহৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমার কাজকর্ম্মে বাধ্য-বাধকতা আছে এবং এ পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পাইয়া আসিয়াছি। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন।

৩। অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি উদ্যোগ করিব। আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হইলেই আমি একপ্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্যদাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

৪। "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে।

উপস্থিত প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিয়া যে ভাবে উৎসাহিত হইয়াছি, তাহাতে ক্রমে যে আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকৃপায় সফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহাতে আমার নিজের স্বার্থ "আনন্দ।" যত দূর সাধ্য, আমি "অনাথবন্ধু"প্রকাশে খরচ করিতেছি এবং "অনাথবন্ধু"কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অন্নপূর্ণা-আশ্রমের সেবার উপযোগী করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না। আমি সর্ব্বত্র হইতে বিশেষ উৎসাহও পাইতেছি।

বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই—প্রথম সংখ্যা কাগজ পাইবামাত্রই—গ্রাহক হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাহারও নাম প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

বঙ্গেশ্বর হিজ্ একসেলেন্সি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর।

মহামান্য মহারাজা শোনপুর।

মহামান্য রাজাসাহেব বামড়া।

অনরেবল স্যর্ মহারাজা দ্বারভঙ্গ।

অনরেবল স্যর্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাশিমবাজার।

অনরেবল মহারাজা বাহাদুর নশীপুর।

মহামান্য জেনারেল তেজ সাম্সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপাল।

রাজা বিজয়সিংহ ধুধুরিয়া।

স্যর্ মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর।

লালা জ্যোতিপ্রকাশ নন্দী সাহেব—বর্দ্ধমান।

মহামান্য রাজা সাহেব—লন্জিগড়।

মহামাননীয়া মহারাণী সাহেবা—আয়োয়াগড়।

রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী ; রঙ্গপুর।

অনরেবল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ; গৌরীপুর।

কুমার এ পি. লাহিড়ী ; রাজসাহী।

শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গিরি ; তারকেশ্বর।

যাঁহারা "অনাথবন্ধু"র গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উপরি-উক্ত মাননীয় মহোদয়গণের নাম প্রকাশ করিলাম। ইঁহারা সকলেই যে অন্নপূর্ণা-আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

এবার দ্বিতীয় সংখ্যা "অনাথবন্ধু" আরও বৃহৎ করিয়া ও আবশ্যক প্রবন্ধাদি দিয়া প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পাঠান্তে সুখী হইবেন।

দেশীয় হাতের শিল্প ও নিতান্ত আবশ্যক নবাবিষ্কৃত ফলপ্রদ ঔষধাদিসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। প্রাচীন গ্রাম্য-ইতিহাস ও মন্দিরাদির বিবরণ এবং চিত্রাদি পাঠাইলে প্রকাশ করিব। কাহারও নিন্দা বা গালাগালিসম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। রাজার বিরুদ্ধকর অথবা কোন প্রকার রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধও আমরা গ্রহণ করিব না।

কোন রমণী যদি প্রবন্ধ পাঠাইতে চাহেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব এবং ধর্ম্মবিষয়, কাব্য বা গীতিও প্রকাশ করিতে পারি।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎ-ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না।

অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি—ভারতের
রাজন্যবর্গ ও মহদ্ব্যক্তিগণের - - - -
- - - - ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্তের

"এল্‌বাম"

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি, তাহা "অনাথবন্ধু"র জন্য প্রস্তুত হইল। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

অন্নপূর্ণা আশ্রম

যে প্রণালীতে আরম্ভ ও পরিচালিত হইবে, তাহা অন্যত্র দেওয়া হইল। আশা করি, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আশ্রমের সাহায্যে আন্তরিক মনোযোগী হইবেন।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া "অনাথবন্ধু"র প্রথম সংখ্যা রাখিয়াছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া সাহায্যার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা এই দ্বিতীয় সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র অনুগ্রহ করিয়া বার্ষিকমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা-আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জন-সাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

পুঃ।—ক্রমাগত কয়দিন ভালরূপ রৌদ্রের অভাবে রঙের ছবিগুলি প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইয়াছে, সেজন্য "অনাথবন্ধু" প্রকাশ হইতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল।

OPINIONS

From the Private Secretary to
H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP,
BENGAL.

22nd July, 1916.

"Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine "Anath Bandhu." I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10.

The object is a laudable one. * * * *"

Yours sincerely,

(Sd.) **W. R. Gourlay.**

PRESS OPINIONS.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K. P. Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of a useful career.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion, Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu.* The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram,* where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi, Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor or lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era,

9th August, 1916.

A NEW JOURNAL by an oversight which we regret the name of the paper recentlv started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called. "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মুল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হইবে। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যাইবে। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হইবে না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তিমত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপনদাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
" ২য় " " " " ১৫৲ টাকা হিঃ।
" ৩য় " " " " " " " "
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
" শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লকপ্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অৰ্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং
বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্ত-
মুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং
সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকার-
পীনোন্নত পয়োধরাম্॥

শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা।

গোক্ষীরধামধবলং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং
নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ সর্প-
ভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং
দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্।

সানন্দমুখং লোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম।

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে। তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী মাহেশ্বরী নমোঽস্তুতে॥

প্রার্থনা।

সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী। দক্ষাক্রন্দনকরী রিপুক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী॥
সাক্ষান্মোক্ষকরীনিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী। ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে। জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতী॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকি, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজানায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথা :—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রনদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রন, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কার্য্যে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রন ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রন, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

'মা'

দেবী-সূক্ত।

ধ্যান।

ওঁ মধ্যে সুধাব্ধিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাং কনকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥

ন্যাসাদি।

অহং রুদ্রেভিরিত্যস্য ব্রহ্মাত্মা ঋষয়ো গায়ত্র্যাদীনিচ্ছন্দাংসি আদ্যাদেবী দেবতা দেবীসূক্তজপে বিনিয়োগঃ॥

সূক্ত।

ওঁ অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমা- দিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।

অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ অহং সোমমাহনসং বিভ-

র্ম্যহন্ত্বষ্টারমুতপূষণং ভগম্। অহন্দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে। অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাঞ্চি- কিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাংমা দেবা

ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাম্পূর্য্যা বেশয়ন্তীম্। ময়া সোহন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি যঃ ঈং শৃণোত্যুক্তম্।

অবমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভি। যং যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি। ত্বং ব্রহ্মাণং ত্বমৃষিং ত্বং সুমেধাম্ ॥ ১

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহঞ্জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ চ। অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বা উতামুন্দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি। অহমেব বাতইব প্রবাম্যা ভবমানা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পরোএনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিমা সম্বভূব ॥ ২

ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল, ১২৫ সূক্ত।

নমো বিমলবদনায়ৈঃ ভূর্ভুবঃ স্বঃ পরমকলায়ৈ কেবল পরমানন্দচ্ছন্দোহকপালৈ ইতি। সিদ্ধিকরে স্ফেং স্ফোং হ্রাং হ্রীং স্বাহা স্বরূপিণী। ক্রীড়াস্থানে স্বাগতং ত্বং স্বাহা, ত্বং স্বধা, ত্বঞ্চ বৌষট, ত্বঞ্চোঙ্কারঃ। ত্বঞ্চ লজ্জাদিবীজং হবাং ভোক্তা, ত্বং বৈ স্বয়ং দেবী, ত্বং বৈ দেবাঃ। শুক্লপক্ষে পূষাস্ত্বং পিত্রাস্ত্যাং কৃষ্ণপক্ষে প্রপূজ্যাস্ত্বং বৈ সত্যং নিষ্পা-প্রথতস্বরূপম্। ত্বং নত্বাহং বোধয়ে নঃ প্রসীদ। ত্বং বৈ শক্তো রাবণে রাঘবে বা রুদ্র। দ্বৌবামপি হাস্তি সা ত্বম্। শুদ্ধবামমেকং প্রবর্দ্ধন্তাং দেবী বোধায়ে নঃ।

ইতি দেবী-সূক্ত সম্পূর্ণম্ ॥

॥ ওঁ ॥

॥ ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ॥

যাহারা প্রত্যহ সূর্য্যোদয়সময়ে স্নানান্তর মন স্থির করিয়া এই দেবী-সূক্ত জপ করিবেন, মায়ের কৃপায় তাঁহাদের দুঃখ দৈন্য দূর হইবেই। শিশুর ন্যায় সম্পূর্ণরূপে সরলভাবে মায়ের আশ্রয় গ্রহণ করাই মহাজনগণের উপদেশ।

প্রথম বর্ষ। সন ১৩২৩। শ্রাবণ। প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংখ্যা।

পায়ের জবা।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

দু' পায়ে দিয়েছি জবা,
বড় সাজ সেজেছ মা !
দুই চোখ ভ'রে দেখে
তবু আশা মিটে না মা।

কতক্ষণ রবে মা গো !
কতক্ষণ রব আমি !
সব তো ক্ষণেক তরে
যায়—আসে—ভাঙ্গে জানি।

দু' পায়ে জবার রাশি,
দু' দিনে হয় মা বাসি ;
নিত্য ফুল কোথা পাব,
চোখ্ বুজে থাকি বসি।

মনেতে গড়ায়ে জবা,
দিই যদি পায় নিতি।
চোখের বাহিরে আর
এস না লইয়ে মূর্ত্তি।

শূন্যময়ি ! শূন্যে থাক, আমায় রাখ মা শূন্যে।
জবায় কি কাজ তবে, চাহিব না কোন জন্মে।

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

ভাদ্র।

১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—চতুর্থী দিবা ঘণ্টা ১১।১, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।৬। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।১ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফল অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।১৬ গতে ৬।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।৫৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৫ গতে ১।১৬ মধ্যে।

২রা ভাদ্র, শুক্রবার।—পঞ্চমী দিবা ঘ ১০।১০, রেবতী-নক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৩। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১০।১০ মধ্যে শ্রীফল পরে নিম্বভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে ১১।৫২ মধ্যে, পরে ৪।১৪ গতে ৫।৪০ মধ্যে।

৩রা ভাদ্র, শনিবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ৯।৪২, অশ্বিনীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।১১। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৭।১১ গতে নক্ষত্রদোষ। দিবা ঘ ৯।৪২ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ।

৪ঠা ভাদ্র, রবিবার।—সপ্তমী দিবা ঘ ৯।৫৫, ভরণী-নক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।৫৭। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৬।৩৭ মধ্যে, পরে ১।৪৫ গতে ২।৭ মধ্যে, আর রাত্রি ঘ ৭।৫ গতে ৭।৫৪ মধ্যে, পরে ১২।২৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

৫ই ভাদ্র, সোমবার।—অষ্টমী দিবা ঘ ১০।৩৪, কৃত্তিকা-নক্ষত্র দিবা ঘ ৯।১৩। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৯।১৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।৩৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণে শুভ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত সর্ব্বসম্মত। দিবা ঘ ১০।৩৪ মধ্যে নারি-কেল, আমিষ পরে অলাবুভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে ৫।২৩ মধ্যে।

৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার।—নবমী দিবা ঘ ১১।৪৩, রোহিণী-নক্ষত্র দিবা ঘ ১০।৫৭। যাত্রানাস্তি। নন্দোৎসব, দিবা ঘ ১০।৫৭ গতে জন্মাষ্টমীর পারণ। দিবা ঘ ১১।৪৩ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ।

৭ই ভাদ্র, বুধবার।—দশমী দিবা ঘ ১।১৬, মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৪৯। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১।১৬ মধ্যে কলম্বী পরে সিম্বীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৬ গতে ৩।৫০ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৫ গতে ১০।৪৯ মধ্যে।

৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—একাদশী দিবা ঘ ৩।৭, আর্দ্রা-নক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি। একাদশীর উপবাস। দিবা ঘ ৩।৭ মধ্যে সিম্বী পরে পূতিকাভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৩১ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৮।২৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৩ গতে ১।৫৩ মধ্যে।

৯ই ভাদ্র, শুক্রবার।—দ্বাদশী বৈকাল ঘ ৫।৯, পুনর্ব্বসু-নক্ষত্র বৈকাল ঘ ৬।৮। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৩৩ গতে ৫।৯ মধ্যে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, পরে শুভ, বৈকাল ঘ ৬।৮ গতে ব্যতীপাতযোগদোষ, রাত্রি ঘ ২।১৬ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫৪ মধ্যে একা দশীর পারণ। বৈকাল ঘ ৫।৯ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪৮ গতে ১১।৫৩ মধ্যে, পরে ৪।১৬ গতে ৫।৪৪ মধ্যে।

১০ই ভাদ্র, শনিবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৭।১১, পুষ্যা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩৫ গতে রাত্রি ঘ ৭।১১ মধ্যে দক্ষিণে নাস্তি, পরে বিষ্টিদোষ, রাত্রি ঘ ৮।৪৩ গতে নক্ষত্রদোষ। দ্বাপরযুগাদ্যা স্নানদানাদি, অত্র মাসত্রয়াবচ্ছিন্ন গঙ্গাস্নানজন্য ফলম্! রাত্রি ঘ ৭।১১ গতে পুণ্যতরা স্নানম্। রাত্রি ঘ ৭।১১ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য।

১১ই ভাদ্র, রবিবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।১১, অশ্লেষা নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৭। যাত্রানাস্তি। অঘোরচতুর্দ্দশী ব্রত। অমাবস্যার নিশিপালন। রাত্রি ঘ ৯।১১ গতে ১১।১৭ মধ্যে ব্যতীপাতযোগ গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটী কুলমুদ্ধরেৎ। রাত্রি ঘ ৯।১১ মধ্যে মাষকলাই পরে মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।২১ মধ্যে, পরে ১।১৩ গতে ২।০ মধ্যে, সন্ধ্যা ঘ ৬।৫২ গতে ৭।৩৮ মধ্যে, পরে ১২।২০ গতে ৩।২২ মধ্যে।

১২ই ভাদ্র, সোমবার।—অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১০।৩৪, মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৪। যাত্রানাস্তি। কৌশীয় কুশোত্তোলনীয় আলোক অমাবস্যা ব্রত। অমাবস্যার ব্রত উপবাস। রাত্রি ঘ ১০।৩৪ মধ্যে মৎস্য, মাংস ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৫৭ গতে ৫।১৫ মধ্যে।

১৩ই ভাদ্র, মঙ্গলবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১১।৪২, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৩। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।৪২

গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।৫৩ গতে নক্ষত্র-দোষ। কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ।

১৪ই ভাদ্র, বুধবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।২১, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৬। যাত্রানাস্তি। বৃহতীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৭ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৩ গতে ১০।১৬ মধ্যে।

১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১২।২৮, হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৯। যাত্রাশুভ, উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৫২ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।২৮ গতে রিক্তা ও পাপযোগদোষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মন্বন্তরা স্নানদানাদি। পটোলভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৮ গতে ৬।১৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।২৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৩ গতে ১।৫৩ মধ্যে।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ১২।৬, চিত্রা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৫।৪। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৩০ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৬ গতে যাত্রামধ্যম, পশ্চিমে মাত্র নাস্তি। সৌভাগ্যচতুর্থী ব্রত। সৌর ভাদ্র শুক্লচতুর্থ্যাং হরিতালিকা চন্দ্রদর্শন নিষেধ। মূলাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪৫ গতে ১১।৩২ মধ্যে, পরে ৪।১৪ গতে ৫।৪৬ মধ্যে।

১৭ই ভাদ্র, শনিবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১১।১৪, স্বাতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৮। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।৩৮ গতে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।১৪ গতে পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি, রাত্রি ঘ ৪।৪৮ গতে নক্ষত্রদোষ। রক্ষাপঞ্চমী ও ষট্‌পঞ্চমীর ব্রত এবং পূজা। শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ।

১৮ই ভাদ্র, রবিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৫৬, বিশাখা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৯। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ৯।৫৬ গতে অক্ষয়া স্নানদানাদি। চাপেয় ষষ্ঠী ও মন্থানষষ্ঠীপূজা। রাত্রি ঘ ৯।৫৬ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪২ মধ্যে, পরে ১।২৩ গতে ২।০ মধ্যে, রাত্রি ঘ ৬।৪৯ গতে ৭।৩৭ মধ্যে, পরে ১২।১৯ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

১৯শে ভাদ্র, সোমবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।১৫, অনু-রাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৭। যাত্রানাস্তি। ললিতাসপ্তমী কুক্কুটী ব্রত। রাত্রি ঘ ৮।১৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

২০শে ভাদ্র, মঙ্গলবার।—অষ্টমী সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫২। যাত্রানাস্তি, প্রাতঃ ঘ ৭।১৬ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৪১ গতে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ গতে রিক্তাদোষ। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত। গোস্বামীমতে রাধাষ্টমী ব্রত এবং ভগবতীপূজা। সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ মধ্যে নারিকেল পরে অলাবু অভক্ষ্য।

২১শে ভাদ্র, বুধবার।—নবমী দিবা ঘ ৪।৪, মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২৩। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৪।৪ মধ্যে তাল-নবমী ও দুর্গানবমী ব্রত। দিবা ঘ ৪।৪ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৭ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৩ গতে ১০।৬ মধ্যে।

২২শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—দশমী দিবা ঘ ১।৪৩, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৬। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।৪৩ গতে রাত্রি ঘ ১০।৪৬ মধ্যে যাত্রামধ্যম, অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, পরে নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ১২।৩০ গতে বিষ্টি-দোষ। দিবা ঘ ১।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। কলম্বী অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৪ গতে ৬।১০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৭।২৯ মধ্যে, পরে ১০।৩৪ গতে ১।১১ মধ্যে।

২৩শে ভাদ্র, শুক্রবার।—একাদশী দিবা ঘ ১১।১৭, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৭। যাত্রানাস্তি। পার্শ্বৈ-কাদশীর উপবাস। দিবা ঘ ১১।১৭ মধ্যে সিম্বী পরে পূতিকা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪২ গতে ১১।৩০ মধ্যে, পরে ৪।১২ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

২৪শে ভাদ্র, শনিবার।—দ্বাদশী দিবা ঘ ৮।৫১, শ্রবণা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৯। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৮।৫১ গতে যাত্রামধ্যম, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।৫৪ গতে দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ১২।১২৪ মধ্যে শ্রীহরেঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন। দিবা ঘ ৮।৫১ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ। শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস। শক্রোত্থানং ইন্দ্রলোকাভিপূজা। দিবা ঘ ৮।৫১ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু অভক্ষ্য।

২৫শে ভাদ্র, রবিবার।—ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৪।১৯, ধনিষ্ঠানক্ষত্র বৈকাল ঘ ৫।৫৯। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদিশুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ মধ্যে শ্রবণদ্বাদশীর পারণ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ গতে অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত। গৌণ ব্রত প্রতিষ্ঠা আরম্ভ নাস্তি অকাল-দোষ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ গতে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪২ মধ্যে, পরে ১।১৩ গতে ২।০ মধ্যে, আর সন্ধ্যা ৬।৪৯ গতে ৭।৩৭ মধ্যে, পরে ১২।১৯ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

২৬শে ভাদ্র, সোমবার।—পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ২।২১, শত-ভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ৪।৪২। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৪।৪২ গতে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৪৫ গতে বায়ুকোণে নৈঋতে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।২১ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণে মাত্র নাস্তি। ভাদ্রীয়ং স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন। মৎস্য,মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্র দিবা ঘ ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

২৭শে ভাদ্র, মঙ্গলবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।৪২, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩৮। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩৮

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

ভাদ্র।

১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—চতুর্থী দিবা ঘণ্টা ১১।১, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।৬। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।১ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফল অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।১৬ গতে ৬।২৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।৫৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৫ গতে ১।১৬ মধ্যে।

২রা ভাদ্র, শুক্রবার।—পঞ্চমী দিবা ঘ ১০।১০, রেবতী-নক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৫৩। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১০।১০ মধ্যে শ্রীফল পরে নিম্বভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে ১১।৫২ মধ্যে, পরে ৪।১৪ গতে ৫।৪০ মধ্যে।

৩রা ভাদ্র, শনিবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ৯।৪২, অশ্বিনীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।১১। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৭।১১ গতে নক্ষত্রদোষ। দিবা ঘ ৯।৪২ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ।

৪ঠা ভাদ্র, রবিবার।—সপ্তমী দিবা ঘ ৯।৫৫, ভরণী-নক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।৫৭। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৬।৩৭ মধ্যে, পরে ১।৪৫ গতে ২।৭ মধ্যে, আর রাত্রি ঘ ৭।৫ গতে ৭।৫৪ মধ্যে, পরে ১২।২৬ গতে ৩।২৮ মধ্যে।

৫ই ভাদ্র, সোমবার।—অষ্টমী দিবা ঘ ১০।৩৪, কৃত্তিকা-নক্ষত্র দিবা ঘ ৯।১৩। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৯।১৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।৩৪ গতে ঈশানে বায়ুকোণে শুভ। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রত সর্ব্বসম্মত। দিবা ঘ ১০।৩৪ মধ্যে নারি-কেল, আমিষ পরে অলাবুভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে ৫।২৩ মধ্যে।

৬ই ভাদ্র, মঙ্গলবার।—নবমী দিবা ঘ ১১।৪৩, রোহিণী-নক্ষত্র দিবা ঘ ১০।৫৭। যাত্রানাস্তি। নন্দোৎসব, দিবা ঘ ১০।৫৭ গতে জন্মাষ্টমীর পারণ। দিবা ঘ ১১।৪৩ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ।

৭ই ভাদ্র, বুধবার।—দশমী দিবা ঘ ১।১৬, মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৪৯। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১।১৬ মধ্যে কলম্বী পরে সিম্বীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৬ গতে ৩।৫০ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৫ গতে ১০।৪৯ মধ্যে।

৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—একাদশী দিবা ঘ ৩।৭, আর্দ্রা নক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি। একাদশীর উপবাস। দিবা ঘ ৩।৭ মধ্যে সিম্বী পরে পূতিকাভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৩১ গতে ৬।২৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৮।২৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৩ গতে ১।৫৩ মধ্যে।

৯ই ভাদ্র, শুক্রবার।—দ্বাদশী বৈকাল ঘ ৫।৯, পুনর্ব্বসু নক্ষত্র বৈকাল ঘ ৬।৮। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৩৩ গতে ৫।৯ মধ্যে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, পরে শুভ, বৈকাল ঘ ৬।৮ গতে ব্যতীপাতযোগদোষ, রাত্রি ঘ ২।১ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫৪ মধ্যে একা দশীর পারণ। বৈকাল ঘ ৫।৯ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪৮ গতে ১১।৫ মধ্যে, পরে ৪।১৬ গতে ৫।৪৪ মধ্যে।

১০ই ভাদ্র, শনিবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ৭।১১, পুষ্যা নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৪৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি দিবা ঘ ৩।৩৫ গতে রাত্রি ঘ ৭।১১ মধ্যে দক্ষিণে নাস্তি, পরে বিষ্টিদোষ, রাত্রি ঘ ৮।৪৩ গতে নক্ষত্রদোষ। দ্বাপরযুগাদ্য স্নানদানাদি, অত্র মাসত্রয়াবচ্ছিন্ন গঙ্গাস্নানজন্য ফলম্! রাত্রি ঘ ৭।১১ গতে পুণ্যতরা স্নানম্। রাত্রি ঘ ৭।১১ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য।

১১ই ভাদ্র, রবিবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৯।১১, অশ্লেষা নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।১৭। যাত্রানাস্তি। অঘোরচতুর্দ্দশী ব্রত। অমাবস্যার নিশিপালন। রাত্রি ঘ ৯।১১ গতে ১১।১৭ মধ্যে ব্যতীপাতযোগ গঙ্গাস্নানে ত্রিকোটী কুলমুদ্ধরেৎ। রাত্রি ঘ ৯।১১ মধ্যে মাষকলাই পরে মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।২১ মধ্যে, পরে ১।১৩ গতে ২।… মধ্যে, সন্ধ্যা ঘ ৬।৫২ গতে ৭।৩৮ মধ্যে, পরে ১২।২০ গতে ৩।২২ মধ্যে।

১২ই ভাদ্র, সোমবার।—অমাবস্যা রাত্রি ঘ ১০।৩৪ মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৪। যাত্রানাস্তি। কৌশীয় কুশোত্তোলনীয় আলোক অমাবস্যা ব্রত। অমাবস্যা ব্রত উপবাস। রাত্রি ঘ ১০।৩৪ মধ্যে মৎস্য, মাংস ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৫৭ গতে ৫।১… মধ্যে।

১৩ই ভাদ্র, মঙ্গলবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১১।৪… পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৫৩। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।৪…

গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।৫৩ গতে নক্ষত্র-দোষ। কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ।

১৪ই ভাদ্র, বুধবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।২১, উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১৬। যাত্রানাস্তি। বৃহতীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৭ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৩ গতে ১০।১৬ মধ্যে।

১৫ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১২।২৮, হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৯। যাত্রাশুভ, উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৫২ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।২৮ গতে রিক্তা ও পাপযোগদোষ। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। মন্বন্তরা স্নানদানাদি। পটোলভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৮ গতে ৬।১৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।২৮ মধ্যে, পরে ১০।৪৩ গতে ১।৫৩ মধ্যে।

১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ১২।৬, চিত্রা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৫।৪। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৩০ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৬ গতে যাত্রামধ্যম, পশ্চিমে মাত্র নাস্তি। সৌভাগ্যচতুর্থী ব্রত। সৌর ভাদ্র শুক্লচতুর্থ্যাং হরিতালিকা চন্দ্রদর্শন নিষেধ। মূলাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪৫ গতে ১১।৩২ মধ্যে, পরে ৪।১৪ গতে ৫।৪৬ মধ্যে।

১৭ই ভাদ্র, শনিবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১১।১৪, স্বাতী-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৪৮। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।৩৮ গতে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।১৪ গতে পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি, রাত্রি ঘ ৪।৪৮ গতে নক্ষত্রদোষ। রক্ষাপঞ্চমী ও ষট্‌পঞ্চমীর ব্রত এবং পূজা। শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ।

১৮ই ভাদ্র, রবিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ৯।৫৬, বিশাখা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।৯। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ৯।৫৬ গতে অক্ষয়া স্নানদানাদি। চাপেয় ষষ্ঠী ও মন্থানষষ্ঠীপূজা। রাত্রি ঘ ৯।৫৬ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪২ মধ্যে, পরে ১।২৩ গতে ২।০ মধ্যে, রাত্রি ঘ ৬।৪৯ গতে ৭।৩৭ মধ্যে, পরে ১২।১৯ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

১৯শে ভাদ্র, সোমবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ৮।১৫, অনু-রাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৭। যাত্রানাস্তি। ললিতাসপ্তমী কুক্কুটী ব্রত। রাত্রি ঘ ৮।১৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

২০শে ভাদ্র, মঙ্গলবার।—অষ্টমী সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭, জ্যেষ্ঠা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫২। যাত্রানাস্তি, প্রাতঃ ঘ ৭।১৬ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৪১ গতে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ গতে রিক্তাদোষ। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত। গোস্বামীমতে রাধাষ্টমী ব্রত এবং ভগবতীপূজা। সন্ধ্যা ঘ ৬।১৭ মধ্যে নারিকেল পরে অলাবু অভক্ষ্য।

২১শে ভাদ্র, বুধবার।—নবমী দিবা ঘ ৪।৪, মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।২৩। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৪।৪ মধ্যে তাল-নবমী ও দুর্গানবমী ব্রত। দিবা ঘ ৪।৪ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।৪ গতে ৩।৪৭ মধ্যে, পরে রাত্রি ঘ ৯।১৩ গতে ১০।৬ মধ্যে।

২২শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—দশমী দিবা ঘ ১।৪৩, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৬। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।৪৩ গতে রাত্রি ঘ ১০।৪৬ মধ্যে যাত্রামধ্যম, অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, পরে নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ১২।৩০ গতে বিষ্টি-দোষ। দিবা ঘ ১।৪৩ মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। কলম্বী অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ৩।৪ গতে ৬।১০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৭।২৯ মধ্যে, পরে ১০।৩৪ গতে ১।১১ মধ্যে।

২৩শে ভাদ্র, শুক্রবার।—একাদশী দিবা ঘ ১১।১৭, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।৭। যাত্রানাস্তি। পার্শ্বৈ-কাদশীর উপবাস। দিবা ঘ ১১।১৭ মধ্যে সিম্বী পরে পূতিকা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪২ গতে ১১।৩০ মধ্যে, পরে ৪।১২ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

২৪শে ভাদ্র, শনিবার।—দ্বাদশী দিবা ঘ ৮।৫১, শ্রবণা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।২৯। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৮।৫১ গতে যাত্রামধ্যম, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।৫৪ গতে দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ১২।১।২৪ মধ্যে শ্রীহরেঃ পার্শ্বপরিবর্ত্তন। দিবা ঘ ৮।৫১ মধ্যে পার্শ্বৈকাদশীর পারণ। শ্রবণদ্বাদশীর উপবাস। শক্রোত্থানং ইন্দ্রলোকাভিপূজা। দিবা ঘ ৮।৫১ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু অভক্ষ্য।

২৫শে ভাদ্র, রবিবার।—ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ পরে চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ৪।১৯, ধনিষ্ঠানক্ষত্র বৈকাল ঘ ৫।৫৯। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদিশুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ মধ্যে শ্রবণদ্বাদশীর পারণ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ গতে অনন্তচতুর্দ্দশী ব্রত। গৌণ ব্রত প্রতিষ্ঠা আরম্ভ নাস্তি অকাল-দোষ। প্রাতঃ ঘ ৬।৩০ গতে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪২ মধ্যে, পরে ১।১৩ গতে ২।০ মধ্যে, আর সন্ধ্যা ৬।৪৯ গতে ৭।৩৭ মধ্যে, পরে ১২।১৯ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

২৬শে ভাদ্র, সোমবার।—পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ২।২১, শত-ভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ৪।৪২। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৪।৪২ গতে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৪৫ গতে বায়ুকোণে নৈঋতে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।২১ গতে পূর্ব্বে দক্ষিণে মাত্র নাস্তি। ভাদ্রীয়ং স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন। মৎস্য,মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্র দিবা ঘ ৩।৩৪ গতে ৫।১২ মধ্যে।

২৭শে ভাদ্র, মঙ্গলবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১২।৪২, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩৮। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩৮

গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৯।৬ গতে পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি। প্রেতপক্ষ শ্রাদ্ধ তিলতর্পণারম্ভ। কুষ্মাণ্ড অভক্ষ্য।

২৮শে ভাদ্র, বুধবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১১।২৫, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৫৭। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ১১।২৫ মধ্যে বৃহতীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ২।২ গতে ৩।৪৫ মধ্যে, রাত্রি ঘ ৯।১০ গতে ১০।২ মধ্যে।

২৯শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার।—তৃতীয়া রাত্রি ১০।৩৫, রেবতীনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৩৮। যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৩৫ গতে রিক্তা ও পাপযোগদোষ। রাত্রি ঘ ৭।১৪ গতে পরদিবসীয় রাত্রি ঘ ১০।১৩ পর্য্যন্ত সৌর ভাদ্র কৃষ্ণচতুর্থ্যাং নষ্টচন্দ্রদর্শন নিষেধ। অগস্ত্যার্ঘ্যদান। পটোলভক্ষণ নিষেধ।

বারবেলা দিবা ঘ ৩।০ গতে ৬।৩ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৭।২৫ মধ্যে, পরে ১০।৪০ গতে ১।৮ মধ্যে।

৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ১০।১৩, অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৪৯। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৪৯ গতে নক্ষত্রদোষ। তিলতর্পণে নবারদোষ। মূলাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ১০।৪২ গতে ১১।৩০ মধ্যে, ৪।১২ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

৩১শে ভাদ্র, শনিবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ১০।২২, ভরণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।২৮। যাত্রানাস্তি। ষড়শীতি সংক্রান্তি। সংক্রান্তিকৃত্যং স্নানদানাদি। শ্রীশ্রীবিশ্বকর্ম্মাপূজা। অরন্ধন সংক্রান্তি। শ্রীফল অভক্ষ্য।

সন ১৩২৩, ভাদ্র মাসের দিনপঞ্জিকা সমাপ্ত।

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাস।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্য বৃষরাশিতে গমন করেন;—"জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী জ্যৈষ্ঠী সা যত্র মাসে ভবতি সঃ।" এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে

"বিদেশবৃত্তিঃ পুরুষঃ সুতীব্রঃ
ক্ষমান্বিতঃ স্যাৎ ক্ষুণ্ন দীর্ঘসূত্রঃ।
বিচিত্রবুদ্ধির্বিদুষাং বরিষ্ঠো
জ্যেষ্ঠাভিধানে জননং হি যস্য।"
ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপ।

অর্থাৎ এই মাসে জন্মিলে জাতক বিদেশবৃত্তিধারী, অত্যুগ্রপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী ও বুদ্ধিমান্ এবং সুপণ্ডিত হয়।

আমাদিগের দেশে জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের মধ্যাবস্থা। সূর্য্যের তেজ এই সময়ে অত্যন্ত প্রখর হইয়া থাকে, দেশের চতুর্দ্দিকে জলাশয়সকল শুষ্ক হইয়া যায়, দেশময় জলকষ্ট উপস্থিত হয়। ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে এই মাস অত্যন্ত কষ্টজনক। চতুর্দ্দিকে ভীষণ উত্তপ্ত বায়ু প্রবাহিত হয়; উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বায়ুর সহিত 'লু' চলিয়া থাকে, উহা মানবদেহ স্পর্শ করিলে অগ্নিদগ্ধের ন্যায় পুড়িয়া যায়। রাজকর্ম্মচারিগণ ও দেশের অবস্থাপন্ন লোকসকল এই সময় হিমালয়ের উচ্চশিখরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় বদরিকাশ্রম, পশুপতিনাথ, হৃষীকেশ, সপ্তস্রোতা, গঙ্গোত্তরী, মানসসরোবর, পরশুরাম প্রভৃতি উত্তরাখণ্ডসম্বন্ধীয় তীর্থযাত্রিগণের পক্ষে বিশেষ সুগম ও সুবিধা হয়।

দেশের কৃষকগণ এই সময়ে নূতন নূতন চাষ-আবাদের বন্দোবস্ত করিয়া ভাবীবর্ষণের অপেক্ষায় থাকে। এই সময় আমাদিগের দেশে নানাজাতীয় সুপক্ক ফলের আমদানী হয়; আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, তালশাঁস, গোলাপজাম, লিচু, ফুটি, তরমুজ, খরমুজা, শসা, খিরা প্রভৃতি এই সময়ের সাময়িক ঋতুফল বলিয়া কথিত হয়; এই সকল ফল এই সময় মনুষ্যের শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় গৃহীত হইলে বিশেষ উপকার হয়; এই সকল ফল শ্রমনাশক, পিত্ত ও বমননিবারক, পুষ্টিবর্দ্ধক, মলশোধক এবং কোষ্ঠপরিষ্কারক ও আয়ুর্বর্দ্ধক।

যাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে সুশীতল ফলমূল ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবানের নামে উৎসর্গ করিয়া, পিপাসিত ও পরিশ্রান্ত অতিথিদিগকে দান করেন এবং উক্ত ফলমূল পিতৃগণের নামে উৎসর্গ করিয়া আপনারা পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাঁহারা পরকালে উৎকৃষ্ট লোকে গমন করেন।

সুশ্রুত বলেন,—এই দারুণ নিদাঘকালে মধুর ও স্নিগ্ধরস, দিবানিদ্রা, গুরুপাক ও দ্রবদ্রব্যভোজন, উষ্ণ আহার, ব্যায়াম, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণকর ভোজন বা ক্রিয়া ও পিত্তকর রস পরিত্যাগ করিবে। সরোবর, নদী, মনোহর

বন, চন্দন, মাল্য, পদ্ম, উৎপল, তালবৃন্ত ব্যজন, শীতল গৃহ, গ্রীষ্মকালে অতি লঘু বস্ত্র, শর্করাখণ্ডের সুগন্ধি হিমপানক (সরবত), শর্করাযুক্ত মন্থ এবং শীতল ঘৃতযুক্ত মধুর দ্রবদ্রব্য-ভোজন এই কালে হিতকর। রাত্রিকালে শর্করাসহযোগে মধুর দুগ্ধসহ ভোজন করিবে, চন্দনলেপনপূর্ব্বক মন্দ-বায়ুসঞ্চারিত স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমবিকীর্ণশয্যায় শয়ন করিবে।

প্রতিদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নভোমণ্ডলগত উজ্জ্বল তারকাসকল দর্শন করিতে করিতে উষার আগমন অপেক্ষা করিয়া, উদ্যানজাত অর্দ্ধবিকশিত পুষ্পসকল স্বহস্তে চয়ন করিবে। যে মানব স্বহস্তে নিত্য পুষ্পচয়ন করে, নিত্য শিশিরস্নাত দূর্ব্বাদল ও বিল্বপত্র সংগ্রহ করে, যাহার পদতল ও মস্তক প্রত্যূষে আবরণহীন থাকে, সে নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। যে বুদ্ধিমান্ স্বাস্থ্যকামী ব্যক্তি প্রতি-দিবস সকাল ও সন্ধ্যাকালে খোলা গায়ে এবং খোলা পায়ে মৃত্তিকা বা দূর্ব্বাঘাসের উপর ভ্রমণ করে, প্রভাত ও সন্ধ্যায় তারকাদর্শন করে, অতি উজ্জ্বল আলোক (ইলেক্‌ট্রিক্) গৃহে রাখে না, চন্দ্রালোকে শরীর সুশীতল করে, শুক্ল অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতে চন্দ্রের পীযূষ পান করে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্রোতস্বতীতে স্নান অভ্যাস করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই দীর্ঘায়ু হয়। যাহারা জ্যৈষ্ঠ মাসে ধাতুপাত্র ত্যাগ করিয়া কদলীপত্রে ভোজন, স্ফটিকপাত্রে জলপান, মৃণ্ময়পাত্রে রন্ধন করে, তাহাদিগের শরীরে কখন ব্যাধি জন্মে না।

এই জ্যৈষ্ঠ মাসেই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে ফলব্রতপরায়ণা আর্য্যনারীগণ বিবিধ ফলদ্বারা সাবিত্রীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে দেবী সাবিত্রী যমলোক হইতে নিজ পাতি-ব্রত্যবলে স্বামী সত্যবান্‌কে সশরীরে উদ্ধার করিয়া জগতের মধ্যে আদর্শ নারীরূপে ধন্যজন্মা হইয়াছিলেন। আজও আমা-দের দেশের আর্য্যনারীগণ সেই সাবিত্রীর নাম অনুসরণ করিয়া,প্রতি জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার নামে ফলমূলের ব্রত করিয়া, ধর্ম্মরাজ যমকে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। বাস্তবিক এই ভীষণ নিদাঘসময়ে মার্ত্তণ্ডপুত্র কৃতান্তদেব প্রসন্ন হইলে যে কতই শুভফল ফলে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

এই সময়ই—বিশেষ সূর্য্যোত্তাপে ফলমূলের পক্বতা ও পতনের সময়; মনুষ্যের সম্বন্ধেও তাহাই। ঘর্ম্মে ঘর্ম্মে দেহের পক্বতা ও ক্ষয় উপস্থিত হয়, ঘর্ম্মবারি রোধ হইয়া নানাপ্রকার সংক্রামক রোগের সূত্রপাত হয়। বিষধরগণ উগ্র-বল ও উগ্রতেজ হইয়া যেখানে সেখানে বিষ উদ্গীরণ করে। মনুষ্য সেই সকল বিষসংস্রবে সহসা কালমুখে পতিত হয়।

এই মাসে জামাইষষ্ঠী অর্থাৎ জামাতার্চ্চনা একটি প্রধান নৈমিত্তিক কার্য্য বলিয়া হিন্দুসমাজে বহুকাল প্রচলিত আছে। জামাতার আয়ুষ্কামনা করিয়া এই তিথিতে ষষ্ঠীপূজা করা হয়। আমাদের দেশের সতীলক্ষ্মীরা তিথি ও মাস-বিশেষে যে যে ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহার অভ্যন্তরে ঐহিক ও পারত্রিক বিবিধপ্রকার মঙ্গল উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আছে; সেগুলি মানিয়া চলা ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানগর্ব্বিতদিগের পক্ষে নিতান্ত দৃষ্টিকটু হইলেও ভাবার্থ-মূলক, সন্দেহ নাই।

* * * * *

আষাঢ় মাস বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত তৃতীয় মাস। এই মাসে রবি মিথুনরাশিতে গমন করেন। পূর্ব্বাষাঢ়া-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণমাসী যে মাসে, সেই মাসে এই আষাঢ় মাস কথিত হইয়াছে। তত্র জাতফলং যথা :—

"অনল্পজল্পী প্রমদাভিলাষী প্রমাদশীলো গুরুবৎসলশ।
বহুব্যয়ো মন্দহুতাশনঃ স্যাদাষাঢ়মাস প্রভবো মনুষ্যঃ॥"
ইতি কোষ্ঠীপ্রদীপ।

অর্থাৎ বহুভাষী, প্রমদাপ্রিয়, প্রমাদশীল, গুরুবৎসল, বহুব্যয়ী, মন্দাগ্নিপীড়িত ইত্যাদি ফলসকল এই আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করিলে লাভ হইয়া থাকে।

এই মাসে বর্ষার প্রথম আরম্ভ হয়, আকাশ সর্ব্বদা মেঘাচ্ছন্ন থাকে, মেঘ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর খুব নিকটে বিচরণ করে, বায়ু পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বচালিত বায়ু দেহের পক্ষে অত্যন্ত হানি-কর। এই সময়ে সর্ব্বদা বৃষ্টিপাত হওয়াতে খাল, বিল, পুষ্ক-রিণী ও ডোবাসকল জলে পরিপূর্ণ হইতে থাকে; মাঠসকল কৃষকদিগের শস্যবপনের উপযোগী হয়; চতুর্দ্দিকের জঙ্গল ও পত্রসকল পচিতে আরম্ভ করে; কোন কোন স্থলে জল-নির্গমনের সুবিধা না থাকিলে সেই সকল গলিতপত্রের বাষ্পযোগে জনপদসকল বিষাক্ত হইয়া ভীষণ ম্যালেরিয়া-রোগের সূত্রপাত করায়। ভীষণ কলেরা ও মন্দাগ্নি এই সময়ে সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীবাসীর ঋতুপরিবর্ত্তন-জনিত ব্যাধির যন্ত্রণায় ঘরে ঘরে কাতরকণ্ঠ,—কুইনাইনের অতিসেবনজনিত বঙ্গদেশের বিষমাবস্থা সর্ব্বত্রই নয়নগোচর হয়, পল্লীর সর্ব্বত্রই কর্দ্দম ও জলপরিপূর্ণ, পথঘাটে গমনা-গমনের উপায় থাকে না;—তাহার উপর হিংস্রজন্তু, সর্প, জোঁক, পোকাদির বিশেষ উৎপাত! অনেক সময়ে জীবনে হতাশ হইয়া পল্লীগ্রামে বাস করিতে হয়, তথাকার কর্দ্দম-পূর্ণ জল খাইয়া শমনদেবের অতিথি হইবার আশা থাকে। নদী, নালা, কোথাও নির্দ্দোষ জল ও পানীয় পাইবার আশা নাই। কলিকাতার কলের জলও আষাঢ় মাসে রাঙ্গামুখ হইতে থাকে। গলি-ঘুঁজির নর্দ্দমার আকার দেখিলে একরূপ প্রকাণ্ড নরক বলিয়াই বোধ হয়। সহরের অধোদিক্‌চালিত ধাপাপ্রবাহী নর্দ্দমাসকলের দৃশ্য খুলিলে আর নিকটে গঙ্গা-ভক্তি মনে আসে না।

সহরের বাহিরে গেলে রাত্রিদিন আষাঢ়ে-ভেকের কর্ণ-ভেদীশব্দে কর্ণ বধির করে। কোথাও শস্যের গোছানি দেখিয়া

কাঁদিতে হয়, কোথাও বা হাসিতে হয়; সর্ব্বত্রই প্রকৃতির আর্দ্রতার বিড়ম্বনা, প্লাবনের ভয়! যাঁহারা পদ্মার ন্যায় বড় বড় ভাঙ্গনী নদীর কূলে বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষে তো জীবনে মরণস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কখন্ ভাঙ্গিল—কখন্ ভাসিয়া গেল, এই ভয়ে তাঁহাদিগের আহার-নিদ্রা নাই!

আষাঢ় মাসে ভাল ভাল ফলের শেষ হইতে থাকে, কেবল মূল ও শাকসব্জীর আবাদটা বঙ্গদেশে খুব প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। এই মাসে কৃষকদিগের বাটীতে লতায় বিছান ঝিঙ্গার হলদে হলদে ফুলগুলি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় বড়ই প্রাণমন হরণ করিয়া ফুটিয়া থাকে। ঝিংয়ে, মূলা, ঢেঁরস, কাঁকরোল, ডেঙ্গোর ডাঁটা, ডুমুর, কচি কুমড়ো, ধোন্দল প্রভৃতি এই সময়ের ঋতু তরকারী; খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, ভূতের দৃষ্টি ছাড়ে। ফলের মধ্যে আনারস, পেয়ারা, শসা, কাঁঠাল, মর্ত্তমান কলা, এইগুলি ঋতুফল। বর্ষাকালে মৃত্তিকা-গর্ভে কেঁচো আর মৎস্যমাংসপ্রিয় বড় বড় বাবুদিগের পেটে কৃমির সঞ্চার হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহারা যদি যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদাই ঐ ঋতুফলগুলি অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবে নিশ্চয়ই পাকস্থলীর কেঁচো-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন।

এই সময়ে কচুশাক, আমুলিশাক, কচুর পাতা, হিঞ্চা, সুষুণীশাক, ব্রাহ্মীশাক, জয়ন্তীশাক, গীমাশাক প্রভৃতি পরম উপকারী বলিয়া খ্যাত।

কচুশাকে লৌহগুণাত্মক পদার্থ আছে; উহা রক্ত-পরিষ্কারক, বলবর্দ্ধক,চক্ষুর হিতকর ও বিষনাশক; এই শাক প্রতিদিন খাইলেও অপকার নাই। আমুলিশাক আমরোগের মহৌষধ, হিঞ্চাশাকের মত পিত্তনাশক দ্বিতীয় নাই, সুষুণী-শাক বাত ও শোথরোগের পক্ষে মহৌষধ, ব্রাহ্মীশাকের মত শ্লেষ্মদমনকারী আর দেখিতে পাওয়া যায় না, জয়ন্তীশাক পিত্ত, শ্লেষ্ম ও কৃমিনাশক, গীমাশাক একমাত্র কৃমির মহৌষধ। দয়াময় ভগবান্ বুঝিয়া-সুঝিয়াই বর্ষাঋতুর উপযোগী করিয়া মনুষ্যের হিতের জন্য এই শাকগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশের বড়লোকের পক্ষে ইহারা ঘৃণার বা তুচ্ছ-তাচ্ছল্যের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু গরীবদিগের পক্ষে ইহারাই একমাত্র অমোঘ ঔষধের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

আষাঢ় মাসে আমাদিগের পুরীর পুরুষোত্তম ঠাকুরের রথযাত্রা হয়, তদুপলক্ষে বঙ্গদেশময় অনেক নকল রথযাত্রা স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে ঠাকুরের টানা শেষ হইলে, তিনি আবার শয়নএকাদশী তিথিতে দীর্ঘ-স্থায়ীশয়নে গিয়া পড়েন, আবার রাসের সময় না আসিলে নিদ্রা হইতে উঠেন না। এ কয়েকটি মাস কেন যে তিনি দিনরাত শুইয়া থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে তৎসম্বন্ধে কেহ কিছু বলিতে পারেন কি? আমার বোধ হয়, আষাঢ় মাসের শেষ হইতেই জগতে শক্তির লীলা-খেলা আরম্ভ হয়, ছোটদিনের সঞ্চার হইতে অর্থাৎ সূর্য্য দক্ষিণায়নপথে যাইতে আরম্ভ করিলেই পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়, যক্ষরক্ষাদির জাগ্রতাবস্থা উপস্থিত হয়, দক্ষিণায়নে ভূত-প্রেত-দানবের বিচরণ আসিয়া পড়ে, তীর্য্যগ্‌যোনি কীটপতঙ্গাদির বহুল জন্ম আরম্ভ হইতে থাকে, কাজেই আদ্যাশক্তি মহামায়া শরতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই শক্তিরূপে জনার্দ্দনের সৃষ্টির সমতা-সাধনের জন্য দশহস্তে দশরূপ প্রহরণ লইয়া অসুরকুলদমনের জন্য আসিয়া পড়েন। তিনি কালীপূজা পর্য্যন্ত মহাশক্তিভাবে মহা-মূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ডের দশদিক্ রক্ষা করিয়া যান, আবার শেষে জগদ্ধাত্রীর মূর্ত্তি দেখাইয়া মধুসূদনকে হরিশয়ন হইতে আহ্বান করেন; কার্ত্তিকী সংক্রান্তি পর্য্যন্ত তাঁহার দৈত্যদানব-সংহারকার্য্য শেষ হইয়া যায়। অতঃপর বৎসরের প্রথম অগ্রহায়ণ আসিয়া জীবের সকল দুঃখ ঘুচাইয়া দেয়। সূর্য্যদেব স্বীয় রথে আরোহণ করিয়া উত্তরায়নপথে যাইবার মানস করেন, ঠাকুর উঠিয়া বিশ্বপ্রকৃতির শোভায় গা ঢালিয়া দিয়া বিশ্ব-রাস-রসে নিমগ্ন হয়েন। তারপর ঝুলনদোল, ফুলদোল প্রভৃতি কত কি প্রাকৃতিক খেলা ও আনন্দের সময় আসিয়া পড়ে। আর্য্যদিগের এই বার মাসের বৈজ্ঞানিক প্রবাহ-দেব-দেবীকুলের ভাবুকতা ভাবিলেও হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

নশীপুরের মহারাজ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ।

ইদানীং বঙ্গদেশে—কেবল বঙ্গদেশে কেন—সমগ্র ভারতে প্রাচীন অভিজাতবংশে যে সকল প্রতিভাশালী মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নশীপুরের বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ মহাশয় অন্যতম। আমাদের দেশের প্রধান দুর্ভাগ্য এই যে, যাঁহাদের প্রচুর ভূমিসম্পত্তি আছে—যাঁহারা ভূম্যধিকারী নামে বিখ্যাত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিলাস ও আত্মতৃপ্তি লইয়াই ব্যস্ত, দেশের কথা—সমাজের কথা তাঁহারা একেবারেই ভাবিয়া দেখেন না। মহারাজ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ মহোদয় সে প্রকৃতির লোক নহেন। দেশের ও সমাজের চিন্তা তাঁহার মনে বিশেষভাবে স্থান পাইয়াছে। তাই তিনি আমাদের সম্মানভাজন ও গৌরবাস্পদ। সেই জন্যই আমরা অদ্য তাঁহার চরিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বংশ-পরিচয়।

নশীপুরের রাজবংশ প্রাচীন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যে মহারাজ তারাওয়া নামে জনৈক জননায়ক রাজ্যপালন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা মহারাজজী এক বিশাল জমীদারীর অধিকারী হইয়াছিলেন। এই বংশেরই রায় শম্ভুনাথ দিল্লীর সম্রাটকর্ত্তৃক সাহারাণপুর হইতে মিরাট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডের নিজাম নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনিই বর্ত্তমান নশীপুর-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ। ইঁহার ভ্রাতা রায় বদ্রীনাথ কর্ণেল বার্ণের নেতৃত্বাধীনে শাম্লীর রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শম্ভুনাথের বংশধর রায় দেওয়ালী সিংহ পাণিপথ হইতে মুর্শিদাবাদে আগমন করেন। মুর্শিদাবাদ তখন বাঙ্গালার রাজধানী। রায় দেওয়ালী সিংহের পুত্র দেবী সিংহই নশীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। স্বর্গীয় দেবী সিংহ মহোদয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব-বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি পূর্ণিয়ায় রাজস্ব-আদায়-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন; ইহা ভিন্ন রংপুর, দিনাজপুর, এদ্রাকপুর জেলার রাজস্ব বন্দোবস্তও তাঁহার হাতে হইয়াছিল। বাঙ্গালার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকার্য্যে তিনি অনেকটা সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদের প্রাদেশিক-পরিষদের সেক্রেটারী হইয়াছিলেন। পলাসীর যুদ্ধে তিনি লর্ড ক্লাইভের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের রাজা উদমন্ত সিংহ বাহাদুর বদান্যতায় ও জনহিতৈষণায় বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারই আমলে নশীপুরের সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছে।

বাল্যজীবন।

এই বংশে বিশ্রুতকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। কীর্ত্তিচন্দ্রের কথা এখনও তাঁহার প্রজাবর্গ বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া থাকে। নশীপুরের বর্ত্তমান মহারাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ সেই কীর্ত্তিমান্ রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রেরই পুত্র। ইংরেজী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তারিখে ইনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন। রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র সিংহ বাহাদুর অল্পবয়সেই ইহলোক হইতে মহাপ্রয়াণ করেন। যে সময় নশীপুরের কীর্ত্তিচন্দ্র অস্তমিত হয়, সেই সময় কুমার রণজিৎ সিংহের বয়স অত্যন্ত অল্প ছিল। সুতরাং তাঁহার নাবালক অবস্থায় জমীদারীর পরিদর্শনভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। শৈশবে ও কৈশরে মহারাজ রণজিৎ সিংহ বহরমপুর কলেজেই অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালেই ইঁহার শিক্ষক ও সহাধ্যায়িবর্গ ইঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি ইঁহার বিশেষ আনুরক্তি

ছিল। বাল্যকাল হইতেই ইনি বিশেষভাবে নিয়মনিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপালক ও সময়নিষ্ঠ ছিলেন।

আদর্শ জমীদার।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ সাবালক হইয়া, তাঁহার বিশাল জমীদারীর তত্বাবধানভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিসে প্রজাদিগের কল্যাণ সাধিত হয়—কিসে তাহাদের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়, রণজিৎ সিংহ সেই দিকেই বিশেষ লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার যশঃ প্রজাদিগের মধ্যে বিশেষভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তিনি অন্যান্য জমীদারদিগের ন্যায় নায়েব, গোমস্তাদিগের হস্তে জমীদারীর তত্বাবধানভার ন্যস্ত করিয়া নিজে নিশ্চিন্ত থাকেন না। অল্পদিনমধ্যে তিনি একজন আদর্শ জমীদার বলিয়া গণ্য হইলেন। তিনি আপনার জমীদারীপরিচালনার জন্য কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। ঐ নিয়মগুলি এতই প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হয় যে, বাঙ্গালার অনেক গণ্যমান্য ভূম্যধিকারী আপন আপন অধিকারে উহা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তিনি এই সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন; ঐ পুস্তকের নাম,—The Rules for the Management of the Nashipur Raj Estate. উহা তাঁহার আপনার জমীদারী-কার্য্যপরিচালনের উদ্দেশে নায়েব, গোমস্তাদিগের নিমিত্ত প্রণীত হইয়াছিল; কিন্তু জমীদারী-পুস্তকের মধ্যে ইহা আদর্শস্থানীয়। ইহাতে জমীদারীসংক্রান্ত-বিষয়ে মহারাজের অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহারাজের কর্ম্মচারীরা ঐ পুস্তকে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারেই চালিত এবং কার্য্যকালে নিয়মমত ছুটী ও কার্য্য হইতে অবসরগ্রহণে পেন্সন পাইয়া থাকেন।

মহারাজ শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহের প্রতিভা নানা দিকেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তিনি যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, সেই কার্য্যেই যেন কিছু নূতনত্ব প্রদান করিয়াছেন। তিনি নিয়মিতভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়া থাকেন এবং যে সময়ে যে কার্য্য করা উচিত ও আবশ্যক, সেই সময়ে সেই কার্য্য করিয়া থাকেন। তিনি প্রত্যহ বেলা এগারটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কাছারী করেন। শীতকালে তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদিগের ন্যায় সফরে বাহির হয়েন। ইহাতে জমীদারী-কার্য্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে।

সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মহারাজা রণজিৎ সিংহ মহোদয় 'লালবাগ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চে'র ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ হইয়াছিলেন। এই মিউনিসিপালিটীর কার্য্যে তিনি স্বাস্থ্য-রক্ষাকর অনেক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করাতে, জনসাধারণ তাঁহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারীরাও তাঁহার কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে প্রবল বন্যায় মুর্শিদাবাদ জেলা প্লাবিত হইয়া যায়; সেই প্লাবনপীড়নে অনেক পরিবার একেবারে নিরন্ন ও গৃহশূন্য হইয়া পড়ে। রণজিৎ সিংহ তখন মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্। তখন তাঁহার বয়সও অধিক হয় নাই। সেই সময় তিনি আপনার জীবন তুচ্ছ করিয়া, অন্যের জীবন ও গৃহাদি রক্ষার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্যে পরে কা কথা, বঙ্গের তদানীন্তন ছোটলাট স্যর্ ষ্টুয়ার্ট বেলী পর্য্যন্ত বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

উপাধি ও রাজসম্মানলাভ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ মহাশয় 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্গের ছোটলাট স্যর্ চার্লস্ ইলিয়ট্ তাঁহাকে সনন্দ দিবার সময় বিশেষভাবে প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের অনেকেই সসম্মানে এই উপাধি লাভ করিয়াছেন। এখন আপনিও নিষ্কলঙ্ক হইয়া এই উপাধি ভোগ করিবেন বলিয়া আপনাকে ইহা প্রদত্ত হইল। পলাসীর রণক্ষেত্রে আপনারই একজন পূর্ব্বপুরুষ ক্লাইভকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন; সুতরাং আপনার বংশ সরকারের যে অনুগ্রহ লাভ করিয়া আসিতেছেন এবং আপনাকে অদ্য যে সম্মান প্রদান করা হইল, তাহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, এই দেশের যে সকল বংশ হইতে সরকার উপকার পাইয়াছেন, তাহা ভারত গবর্ণমেণ্ট কদাচ বিস্মৃত হন না। সম্প্রতি আপনি সাবালক হইয়া আপনার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার বিশ্বাস, আপনি আপনার বংশের অন্যান্য ব্যক্তিদিগের ন্যায় যোগ্যতার সহিত আপনার ষ্টেটের কার্য্য পরিচালনা করিবেন এবং অন্যান্য জমীদারের তুলনায় আপনার কার্য্যাবলী যাহাতে প্রশংসনীয় হয়, তাহাই করিবেন। তাহা হইলে আপনি আপনার কার্য্যগুণেই ও প্রতিভা-অনুসারে আরও উচ্চতর উপাধি ও সম্মান প্রাপ্ত হইবেন।" *

---

* স্যর্ ষ্টুয়ার্ট বেলীর কথা এই স্থানে যথাযথভাবে উদ্ধৃত হইল:—

" It is a very great pleasure to me to convey to you the Sanad of the title of *Raja* which the Viceroy has been pleased to confer upon you. The title is one which had *been honorably borne by your family for many generations* and it is now committed to you to hold untarnished. *One of your ancestors*, Raja Davi Sinha, rendered very *valuable services to Clive at Plassey* and *the continued favor in which your family has been held and the honour which is to-day entrusted to you*, is a proof that the Government of India is never slow to recognise and never forget services rendered to it by the houses in this country. You have lately attained your majority and succeeded to your property. I trust you will manage your estate in a manner worthy of your ancestry and that your career may compare favourably with

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। এই সময় তিনি একাকী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্যে সরকার এতই প্রীত হইয়াছিলেন যে, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতেই তাঁহাকে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময় লালবাগ বেঞ্চের সম্পূর্ণ ভারই মহারাজের হস্তে ন্যস্ত হয়। লালবাগ সবডিবিসন উঠিয়া গেলে তিনি প্রকৃতপক্ষে সবডিবিসনাল অফিসার বা মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তিনি সরাসরি (Summary trial) বিচারের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯, ১৯০৩ ও ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মুর্শিবাবাদ মিউনিসিপালিটীর কমিশনারগণ তাঁহাকেই পুনর্ব্বার মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান্ নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। এই উপাধির সনন্দ-প্রদানকালে স্যর্ চার্লস্ ষ্টিভেন্স মহারাজের প্রজাহিতৈষণার ও সাধারণের উন্নতিকর কার্য্যে আত্মনিয়োগের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। *

১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজা শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর ভারত-গবর্নমেণ্টের নিকট হইতে 'মহারাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মহারাজ-উপাধির সনন্দপ্রদানকালে তদানীন্তন বঙ্গীয় লাট স্যর্ এডোয়ার্ড নর্ম্মান্ বেকার্ তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, "১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে আমরা উভয়েই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-পরিষদে কার্য্য করিয়া আসিতেছি; সেই সময় হইতেই আপনার সহিত আমার বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে। সেই সময় হইতেই আপনার কার্য্যে ন্যায়নিষ্ঠা, অকপটতা ও সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। আপনার ঐ সকল গুণ আপনাকে আমার নিকট অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছে।" †

ব্যবস্থাপক-সভায়।

সরকার বাহাদুর মহারাজ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহ মহোদয়কে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রতি সরকারের বিশেষ সম্মান সূচিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যকার্য্যে মহারাজ বাহাদুর অনেক সময় বিশেষ কার্য্য-তৎপরতার ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মিউনিসিপাল-আইনের সংশোধন-পাণ্ডুলিপি যখন আইনে পরিণত করিবার জন্য লাটসভায় পেশ করা হয়, তখন তিনি ঐ সম্বন্ধে যে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার রাজনীতিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্যক্‌ভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সেই বক্তৃতাতেই দেশের লোক তাঁহার অসাধারণ মনস্বিতার পরিচয় পাইয়াছিল এবং বাঙ্গালার প্রত্যেক লোক তাঁহাকে এক জন প্রকৃত জননায়ক বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। ব্যবস্থাপক-পরিষদে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া প্রেসিডেন্সী-বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট ও লোকালবোর্ড তাঁহাকে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে আবার তাঁহাকেই ব্যবস্থাপক-সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-পরিষদ হইতে তিনি ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক-পরিষদের অতিরিক্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া এককালে উভয় পরিষদের কার্য্য করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক-পরিষদে তাঁহার কার্য্যে সরকার ও জনসাধারণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার সংযত মত ও দেশের অবস্থার সহিত সম্যক্ পরিচয় তাঁহাকে দেশবাসীর সম্মানভাজন করিয়াছে। যে ম্যালেরিয়ার প্রভাবে বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত হইতে বসিয়াছে, সেই ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বিষয় লইয়া তিনি ব্যবস্থাপক-সভায় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এই দুইটির অতিপ্রয়োজনীয়তাহেতু তিনি উহা লইয়াই বিশেষ আন্দোলন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার ফলে অনেক জটিল রাজনীতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধান করিয়া আপনার অসাধারণত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সরকারও সেই জন্য তাঁহাকে এক জন যোগ্য পরামর্শদাতা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তিনি যেরূপ সংযত-ভাবে রাজনীতিক সমস্যার সমাধান করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাকে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল বা স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ন্যায় প্রতিভাশালী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার বক্তৃতায়

---

that of other Zemindars in the province; and that it will be so distinguished *that further honors will be conferred upon you* not on account of the good work of those who have gone before you, but as a reward for your own merit and exertions."

* "Raja, you are a scion of a very ancient and respectable family and the proprietor to extensive Zemindaries, have conducted yourself in a manner worthy of your origin and of your rank and responsibilities; you have the reputation of being a good and liberal Landlord to your own Rayyets; but your desire to do good service to the public, has led you to enter a more extended sphere of usefulness. As a Municipal Commissioner and an Honorary Magistrate, you have rendered great assistance to the Local Authorities. It has been deemed just and proper that you should be raised to the dignity which your father enjoyed. You have therefore been created a "*Raja Bahadur*" and it gives me great satisfaction to hand you the *Sanad* and the *Khilat* which mark your elevation to that rank."

† স্যর্ নর্ম্মান্ বেকার্ এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আমরা তাহার কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

"It is always a matter of gratification to me to be the instrument for conveying marks of public recognition to those who have deserved well of the state. That pleasure is much enhanced when the recipient of the honor is an old and valued friend of my own. In your case, *our friendship dates back to the year 1898, when we both were serving on the Bengal Council, and when I first learn to appreciate in you those qualities of rectitude, sincerity, straightforwardness and moderation* which have given you so high a place in my regard."

উগ্রভাব বা বাক্যের আড়ম্বর থাকে না ; ধীর, স্থির ও যুক্তি-যুক্ত কথাতেই তিনি সকলেরই চিত্তহরণ করিয়া থাকেন।

মহারাজ ও রাজকুমার।

নশীপুরের অধিবাসীরা মহারাজকে অত্যন্ত ভক্তি করিয়া থাকে। তাঁহার প্রাসাদ কলিকাতায় "গবর্ণমেণ্ট হাউসে"র আদর্শে রচিত। নশীপুরে সাধারণের সুবিধার জন্য মহারাজা অনেকগুলি ইঁদেরা খনিত করিয়া দিয়াছেন, দাতব্য ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন তিনি অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করিয়া থাকেন। বিপ্লব-বাদের দমনকল্পে ইনি দেশবাসীদিগকে অনেক সৎপরামর্শ দিয়াছেন।

পুত্রদিগের শিক্ষাদানকল্পে মহারাজ বাহাদুর বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠ মহারাজকুমার শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এম. এ. ও আইন পড়িয়া ষ্টেটের কার্য্য করিতেছেন। দ্বিতীয় রাজকুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবার বি. এ. পরীক্ষা দিবেন। তৃতীয় রাজকুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ সিংহ এবার আই. এ. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

মহারাজের চরিতালোচনা করিলে এই তথ্যই স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, কেবল কাজমাত্র দেখিয়াই মানবের চরিত্রগৌরব উপলব্ধি করা যায় না। স্যর্ ফিলিপ সিড্‌নী, স্যর্ ওয়াল্টার র‍্যালে প্রভৃতির জীবনঘটনায় এমন কিছুই নাই, যাহাতে তাঁহাদিগের নাম জগৎজোড়া হইতে পারে। গ্রাকাই, এগিস, ক্লিওমেনস্ প্রভৃতির কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে যেন মনে হয়, তাঁহারা যেরূপ যশস্বী, তাঁহাদের কার্য্য তদনুরূপ নহে। তাঁহাদের যশঃ তাঁহাদের কার্য্যাবলীকে অতিক্রান্ত করিয়া উচ্ছ্রিত হইয়াছে। তবে তাঁহারা এরূপ যশের অধিকারী হন কেন? ইহার কারণ, তাঁহাদের চরিত্র-বল। চুম্বকের যেমন একটা অদৃষ্ট শক্তি আছে, চরিত্র-বলেও তেমনই একটা অদৃষ্ট শক্তি আছে। সেই অমূর্ত্ত শক্তি কার্য্যদ্বারাই আপনার অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এই চারিত্রিক চৌম্বকশক্তিই মানুষকে বড় করে। যাহার সেই শক্তি আছে, সেই লোক যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, সেই কার্য্যকেই যেন একটা নূতন জীবনীশক্তি ও নূতন মূর্ত্তি দেয়। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সেই শক্তি আছে। তাই কেবল তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার গৌরবের পরিমাণ করা যায় না। তিনি যে সকল কাজ করিয়াছেন, সে সকল কাজ হয় ত আরও অনেকে করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি যে ভাবে সেই কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহার প্রতিভা সপ্রকাশ। তাঁহাকে জানিতে হইলে তাঁহার কার্য্যপদ্ধতিকে জানিতে হয়; সেইখানেই তাঁহার বিশেষত্ব।

বর্ষা।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

মেদুর মেঘের মালা দগ্ধতাম্র নভ 'পরে,
নিবারি অনলজ্বালা নিদাঘের রবিকরে।
বারিদ বরষে স্নেহ বিগলিত বারিছলে,
রঞ্জিয়া ধূসর ধরা ঘনশ্যাম দূর্ব্বাদলে।
কদম্বে বিকশি' উঠে ধরার পুলকভার,
কোমল কূটজ-ফুলে সুমধুর হাসি তা'র।
বেলাবালুমাঝে নদী ছিল শীর্ণা—ক্ষীণগতি,
নবীন জীবনে এবে পুলকপ্রফুল্ল অতি।
মাঠে মাঠে নবোদ্গত হরিৎ ধান্যের শিরে,
শীকরশীতল বায়ু আনন্দে মাতিয়া ফিরে।
বারিপূর্ণ সরোবর—কাণায় কাণায় জল;
জলের সঙ্গীত শুধু—ঝরঝর কলকল।
অভাব যেতেছে দূরে, প্রাচুর্য্য দিতেছে দেখা—
শ্যামশোভা—শুধু যেন সে শুভ বারতালেখা।

সনাতন ধর্ম্ম।

২

সনাতনধর্ম্মের মূল কি, গতবারে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, অদ্রোহ, অলোভ, দয়া, অনুক্রোশ, ক্ষমা, তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৃতি, ও দম, এই দশটিই সনাতন ধর্ম্মের মূল। তন্মধ্যে সমাজ-রক্ষার্থ—সমাজের উন্নতিসাধনার্থ প্রথম পাঁচটি ধর্ম্ম প্রতিপালন করা নিতান্তই কর্ত্তব্য। এই প্রথম পাঁচটি গুণ বা ধর্ম্ম না থাকিলে সমাজই চলে না। সকল দেশের ও সকল জাতির মধ্যেই সাধু ও সজ্জনগণে এই পাঁচটি গুণ অল্পাধিক পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। তপঃ, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ধৃতি ও দম, এই পাঁচটি ধর্ম্ম সমাজের পক্ষেও যেমন আবশ্যক, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের পক্ষেও তেমনই আবশ্যক। সমাজ একটু উন্নত না হইলে সামাজিকদিগের চরিত্রে এই সকল গুণ আত্মপ্রকাশ করে না। সামাজিকদিগের মধ্যে যখন আত্মবোধ হয়, আধ্যাত্মিকতার দিকে একটু দৃষ্টি পড়ে, তখনই একে একে এই সকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা সমাজে আবির্ভূত হইয়া সমাজকে অধিকতর উন্নতির দিকে অগ্রসর করিয়া দেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষে পশুত্ব ও দেবত্ব এই দুইই আছে। মানুষের দেহসম্বন্ধীয় যাবতীয় ধর্ম্মই পশুর সঙ্গে সমান। মানবের একাদশ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্ম ও ধর্ম্ম পশুর একাদশ ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মের ও ধর্ম্মের সহিত বিশেষ পৃথক্ নহে। আহার, নিদ্রা, শ্রান্তি, ক্লান্তি মানুষেরও আছে, পশুরও আছে। হিন্দুরা বলেন,—জীব পশ্বাদিযোনিতে বিরাশী লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে বিংশতি লক্ষ বার স্থাবর, নয় লক্ষ বার জলজ প্রাণী, নয় লক্ষ বার সরীসৃপ, দশ লক্ষ বার পক্ষী, ত্রিশ লক্ষ বার পশু ও চারি লক্ষ বার বানর হইয়া জন্মে। * পরে তাহারা মানুষ হয়। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মতে জনন ও মরণের মধ্য দিয়া জীবাত্মার ক্রমোন্নতি হইয়া থাকে। গোপাল আজ মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ঐ গোপালকে অন্ততঃ ৮২ লক্ষ বার উদ্ভিদ হইতে বানর পর্য্যন্ত হইয়া জন্মিতে ও মরিতে হইয়াছে। হিন্দুদিগের বিশ্বাস, পূর্ব্বজন্মের অর্জ্জিত ভাবগুলি জীবাত্মায় সংস্কারাবস্থায় থাকিয়া যায়। ক্রমে শরীরের বৃদ্ধির সহিত সেই বৃত্তি প্রভৃতি প্রকট হইতে থাকে। মানুষ পূর্ব্বে বহুজন্ম ধরিয়া পশুযোনিতে বিচরণ করে, সেই জন্য তাহার পাশব গুণগুলা স্বতঃই স্ফূর্ত্তি পায়। পশুদিগের মধ্যে নিদ্রা, তন্দ্রা, রিপুগণের অধীনতা, হিতাহিতজ্ঞানশূন্যতা, ক্রোধান্ধতা,চাঞ্চল্য, মূঢ়তা প্রভৃতি অনেকগুলি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। মানুষ জন্মজন্মান্তরের অভ্যাসবশতঃ এই দোষগুলি সহজে পরিহার করিতে পারে না। কাজেই মানুষের এই দোষগুলি সহজেই স্ফূর্ত্তি পায়। সেই জন্য মানুষে অনেকগুলি পশুপ্রবৃত্তি প্রবল।

এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা কিন্তু অন্যরূপ বলেন। তাঁহাদের মতে এই পৃথিবী কালসহকারে—অবস্থার বিপর্য্যয়ে—ক্রমশঃ বিবর্ত্তিত হইতেছে। পৃথিবীতে জীবেরও সেইরূপ বিবর্ত্তন ঘটিতেছে। প্রথমে ধরাপৃষ্ঠে য়্যামিবা নামক এককোষ জীবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ক্রমে ধরিত্রীর দশা-বিপর্য্যয়ে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, জীবনসংগ্রামের ফলে, প্রাকৃতিক ও যৌন-নির্ব্বাচনে, বংশানুক্রমে অলক্ষ্যে জীবদেহের তিল তিল পরিবর্ত্তন ঘটিতে থাকে। এই পরিবর্ত্তন যত সামান্য ও অলক্ষিত হউক না কেন, ইহা ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া বহু কোটী পুরুষে এক জাতীয় জীব হইতে অন্য জাতীয় জীবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। এইরূপে কোটী কোটী বৎসরে য়্যামিবারই বংশে বানর—ক্রমে মানব জন্মিয়াছে। এই মতে কীট, পতঙ্গ, পশু প্রভৃতির বংশেই মানুষ জন্মিয়াছে। বংশপ্রবাহ এক—অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু কালসহকারে একই বংশে প্রথম জলচর, পরে উভচর, ক্রমে স্থলচর—বরাহ হইতে বানর, বনমানুষ পর্য্যন্ত জন্মিয়া পরে মানুষ জন্মিয়াছে। এই বংশস্রোতস্বতীতে বীজের প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন আছে, কেবল জীবের গঠনভেদ হইয়াছে। বীজে পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার বা বৃত্তি প্রভৃতি অদৃষ্ট অবস্থায় থাকে। বংশধরের শরীরবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বপুরুষের বীজে সঞ্চিত সেই সংস্কার, গুণ, এমন কি, সুপ্ত ব্যাধি পর্য্যন্ত প্রকট হয়। বৈজ্ঞানিক ভাষায় ইহাকে বৈজী শক্তি, কৌলিকী শক্তি বা Heredity বলে। যে সকল বৃত্তি এ বংশে বহু লক্ষ পুরুষ ধরিয়া বিকাশলাভ করিয়া বলবতী হইয়াছে, সেই বৃত্তি সেই বংশ-সম্ভূত সন্তানে স্বতঃই প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে। সেই জন্য মানুষে পশুভাব স্বতঃস্ফূর্ত্ত। মানুষ বিনা চেষ্টাতেই পশুধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেক তথ্যানুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বনমানুষ হইতে যখন আদিম মানুষ সর্ব্বপ্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তখন তাঁহাদের

---

* স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষঞ্চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥
বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

পশুধর্ম্মই প্রবল ছিল। তখন মানুষে ও বানরে বিশেষ পার্থক্য বুঝা যাইত না। উচ্চতর পশুতে যথা বানরে ও বনমানুষে বিচারবুদ্ধির অঙ্কুরমাত্র দেখা যায়। আদিম মানুষে সেই বিচারবুদ্ধির অতি সামান্যমাত্র বিকাশ লক্ষিত হইয়াছিল। ক্রমে মানুষ যতই সভ্যতার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাঁহার বিচারবুদ্ধি বিকাশপ্রাপ্ত হয় এবং সেই বিচারবুদ্ধি কতকটা বিকশিত হইলে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি দেখা দেয়। ইহাই হইল—পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মত।

সুতরাং বুঝা গেল যে, প্রাচীন আর্য মতে ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে মানুষের পশুভাবটা আপনা আপনিই স্ফূর্ত্তি পায়। উভয়মতের পার্থক্য এই যে, ঋষিরা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন—জীবাত্মা অবিনশ্বর। সে বার বার তীর্য্যক্‌-যোনিতে জন্মিয়া যখন মনুষ্যদেহ ধারণ করে, তখন তাহার সূক্ষ্মভূতসম্বলিত আত্মায় অদৃষ্টরূপে পশুভাবটা সংস্কার অবস্থায় আসিয়া যায়। মানবদেহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে সেই পশুভাব পূর্ণভাবেই প্রকট হয়। আর্য মতে মানবভাগ্যের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয় সত্য,—কিন্তু ইহার প্রধান অসুবিধা এই যে, প্রত্যক্ষ তথ্যের দ্বারা এই মত সপ্রমাণ করা সম্ভবে না। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, বীজ-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছিন্ন বংশপ্রবাহে জীব জন্মিতেছে ও মরিতেছে,—কিন্তু বংশধররূপে তাহার বীজ রাখিয়া যাইতেছে। বৈজী শক্তি, পারিপার্শ্বিক প্রভাব, জীবনসংগ্রাম ও প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন—এই কয়টি মিলিয়া জীবের জাত্যন্তর ঘটায়; কিন্তু প্রত্যেক পূর্ব্বপুরুষ তাহার বীজে তাহার নিজের কতকটা ভাব অন্তর্নিহিত রাখিয়া যায়। অতএব ঊর্দ্ধতন পুরুষ পশুতে যে বৃত্তি প্রবল ছিল, অধস্তন-পুরুষ মানুষেও সেই বৃত্তিগুলি প্রবলভাবে সংক্রমিত হইয়া থাকে। উহা মানুষের মনে আপনা আপনিই স্ফূর্ত্তি পায়। সেই জন্য স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহাদিগকে "স্বতঃ-স্ফূর্ত্ত"বৃত্তি বলিয়া গিয়াছেন। ইহা অবশ্য পাশ্চাত্যসিদ্ধান্ত। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য উভয়মতেই পশুবৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

মানবের বিচারবুদ্ধির ও ধর্ম্মবুদ্ধির উন্মেষ হইলে সে বুঝিতে পারে, পশুবৃত্তিগুলি তাহার উচ্চতর বৃত্তির অন্তরায়। পশুবৃত্তিগুলি প্রবল হইলে উচ্চতর বৃত্তিগুলি স্তব্ধ ও কলুষিত হইয়া পড়ে। অনেকেই দেখিয়াছেন যে, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি বৃত্তিগুলি অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিলে মানুষের বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়া থাকে। সুতরাং সুধীগণ এই সকল বৃত্তির দমন করিতেই উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। দমন অর্থে অবশ্য উচ্ছেদ নহে। আহারপ্রবৃত্তি পশুধর্ম্ম; কারণ পশুরও আহার করিবার প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু সেই হেতুবাদে কাহারও প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্র এই আহারপ্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধনে উপদেশ দেন না। সকলেরই প্রয়োজনমত আহার করা কর্ত্তব্য। প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার-স্পৃহাকে লোভ বলে। সকল বিষয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত ইচ্ছাকে লোভ বলে। পশুরাও অভাবমোচনের চেষ্টা করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর প্রাপ্তিচেষ্টা বা ইচ্ছা আপনার গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, সে পর্য্যন্ত উহা দোষের হয় না; উহা লোভ নামে অভিহিতও হয় না। প্রয়োজনীয় বস্তুপ্রাপ্তির ইচ্ছা অতিভূমিগতা হইলেই উহা লোভে পরিণত হয়। সকল পশু লোভী নহে; কোন কোন পশু লোভী। বৃক, ব্যাঘ্র, বানর প্রভৃতি উচ্চতর স্তরের পশুদিগের মধ্যে লোভ দেখা যায়। এই লোভের উচ্ছেদই ধর্ম্ম। আততায়ীকে বাধা দিবার জন্য ইচ্ছা পশুরও আছে, আবার দেবতারও আছে। বিশ্বামিত্র মারীচ ও তাড়কাকে বধ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি কর্ত্তব্যের অনুরোধেই হিংসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্রুদ্ধ হন নাই। বিচারবুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত আত্ম-রক্ষার ইচ্ছা বা লোকরক্ষার ইচ্ছাকে ক্রোধ বলা যায় না। এই হিসাবে সেনাপতি ফ্রেঞ্চ বা জোফ্রে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন না। কিন্তু যখন ঐরূপ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বিচার-বুদ্ধিকে বিলুপ্ত করিয়া দাবাগ্নির মত জ্বলিয়া উঠে,—তখন উহা ক্রোধ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই জন্য অক্রোধই ধর্ম্ম—ক্রোধের উচ্ছেদই ধর্ম্ম।

পশুদিগের তাদৃশ বিচারবুদ্ধি নাই, সেই জন্য তাহাদের ইচ্ছা কামে, লোভে, ক্রোধে সহজেই পরিণত হয়। মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে বলিয়াই মানুষের পক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি নিন্দিত। ঐ বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফূর্ত্ত। একটু অসাবধান হইলেই উহা প্রকট হইয়া পড়ে। তাই উহার দমনই নিতান্ত দরকার। ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে ইন্দ্রিয়জ শক্তির বিলোপ নহে। ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্যকে বিচারবুদ্ধির ও ধর্ম্মবুদ্ধির অধীন করাই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। সংস্কৃত ভাষায় জিতেন্দ্রিয় ও বশী কথার ইহাই অর্থ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত কোন কার্য্যই করা যায় না। সেই জন্য শাস্ত্র কাহাকেও নিরিন্দ্রিয় হইতে উপদেশ দেন নাই। ঋষিরা কখনই ইন্দ্রিয়জ শক্তিকে বিলুপ্ত করিতেন না। সুতরাং পশুবৃত্তিগুলিকে জোর করিয়া বিলুপ্ত করা সঙ্গত নহে,—উহাদিগকে নিগ্রহ বা উপেক্ষা করাই শাস্ত্রের আদেশ। পশুবৃত্তিগুলি মানুষের অধর্ম্মবৃত্তি নহে, অপকৃষ্ট ধর্ম্মবৃত্তি। উহা নিগৃহীত অবস্থাতেই রাখিতে হয়, কারণ উহার বাড়াবাড়ি হইলেই অধর্ম্ম জন্মে। সেই জন্য মহাতপা মহর্ষি বেদব্যাস জননীর আদেশে ও কর্ত্তব্যের অনুরোধে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্যের বিধবা পত্নী অম্বিকার ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মহানি বা তপস্যার বিঘ্ন ঘটে নাই। কারণ তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় ঐ কার্য্য করেন নাই, কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রণোদনে উহাতে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদি পশুধর্ম্মকে একেবারে পরিবর্জ্জন করিতেন, যদি বৃত্তি-বিশেষকে একেবারে উচ্ছিন্ন করিয়া ক্লীবত্বপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই ঐ ধর্ম্মপালন করিতে সমর্থ

হইতেন না। মহর্ষি রুচি অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দার-পরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পিতৃগণ তাঁহাকে বলেন, "তুমি পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা না করিয়া যে বিষয়-ত্যাগাদির দ্বারা প্রাণের কর্ষণ করিতেছ, তাহাতে তোমার ভাল না হইয়া মন্দই হইবে।" যথা :—

বিহিতাকরণাৎ পুত্রিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽস্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ॥

বিহিতকর্ম্ম না করিয়া যে সকল মূর্খ কেবল সংযম-সাধন করে, তাহার সেই সংযম মুক্তির হেতু হয় না, পরন্তু অধোগতির কারণ হয়। তাই মহর্ষি রুচিকে অতি বৃদ্ধকালেও দারপরিগ্রহ করিতে হইয়াছিল। সুতরাং পশুধর্ম্মের উচ্ছেদই সনাতনধর্ম্মের উপদেশ, তাহা মনে করাই ভুল। আসল কথা, বৈধভাবেই সকল বৃত্তির পরিচালনা করাই ধর্ম্ম—অন্যথা অধর্ম্ম। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু তাঁহার "ধর্ম্মতত্ত্বে" এই কয়টি কথা যথার্থই বলিয়াছেন :—

"পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে। প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি,—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণ-শালিনী; কিন্তু সেগুলির অধিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্ত্তির বিঘ্ন হয়, সুতরাং সেগুলি যত দূর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তত দূর পাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য। সেগুলি তেঁতুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মরিয়া যাইতে পারে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া দিবে; তাহা অকর্ত্তব্য। কেননা, অম্লে প্রয়োজন আছে,—নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও প্রয়োজন আছে। * * *। তেঁতুলগাছ বাগান হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্তু তাহার স্থান বাগানের এক কোণে। বড় বাড়িতে না পায়,—বাড়িলেই ছাঁটিয়া দিবে। দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল, তার বেশী আর না বাড়িতে পারে। নিকৃষ্টবৃত্তির সাংসারিকপ্রয়োজনসিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্ত্তি হইলেই হইল। তার বেশী আর বৃদ্ধি যেন না পায়।" (ধর্ম্মতত্ত্ব—ষষ্ঠ অধ্যায়—সামঞ্জস্য।)

মানুষে পশুভাব প্রবল আছে বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র উহার দমন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রকার কথাটা খুব জোর করিয়া চড়া ভাষায় সেই মত ব্যক্ত করিয়াছেন। যিনি যেরূপ অধিকারী, তাঁহার জন্য ঋষিরা সেইরূপই নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রভাবে হিন্দুধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অগৎ কোঁৎ (Auguste Comte)এর মত অনুসরণ করিয়া তিনি সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য-বিধানই ধর্ম্ম বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক হিন্দুর কথা নহে। পজিটিভিজ্‌ম্-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক কোঁৎ বা কোম্‌ত যে দিক্ হইতে যে মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া জাগতিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, হিন্দুরা কেবল সেই দিক্ হইতে—সেই মঞ্চের উপর হইতে এই বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করেন নাই। কোঁৎপ্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রত্যক্ষবাদের উপরই তাঁহাদের দার্শনিক সৌধ রচিয়াছেন। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্তই তাঁহাদের প্রত্যক্ষের বিষয়। তাঁহারা অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইলেও জন্ম-মৃত্যু-গণ্ডীর বাহিরে তাঁহাদের দৃষ্টি যায় নাই। কিন্তু ঋষিগণের দৃষ্টি স্বতন্ত্র। তাঁহারা আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করিয়া সমস্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীব চতুরশীতি জন্মের পর ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অধিকারী হয়। * কর্ম্মবিপাকে পড়িয়া অনেক জীবের ইহা অপেক্ষা আরও অধিকবার তীর্য্যক্ ও নীচ মনুষ্যযোনিতে জন্মিতে হয়। জীবাত্মা যতই জৈবস্তরের উচ্চতর সোপানে উঠিতে থাকে, ততই সে উচ্চতর বৃত্তি লাভ করে। সেই উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন করিলে সে ক্রমশঃ আরও উচ্চে উঠিতে থাকে। ঐ সকল উচ্চতর বৃত্তির অনুশীলন ও তাহার প্রণোদনে কার্য্য করাই ধর্ম্ম। ক্রমে যখন জীব মনুষ্য জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার বিচারবুদ্ধি কতকটা উন্মেষিত হয়। তখন তাহার রজোগুণ জন্মে। শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, যত্ন, সুখভোগেচ্ছা, দম্ভ, অহঙ্কার, অভিমান, কার্য্যদক্ষতা, চাতুর্য্য, চাঞ্চল্য, প্রভুত্বস্পৃহা, ইন্দ্রিয়সুখেচ্ছা প্রভৃতি রজোগুণোদ্ভূত বৃত্তি। ক্রমে যখন বিচারবুদ্ধির অধিকতর স্ফুরণ হয়, তখন ধর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধি আবির্ভূত হইলে ক্রমশঃ বিশ্বাস, ভক্তি, দয়া, করুণা, ক্ষমা, বিনয়, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, প্রেম, সন্তোষ, শান্তি, দাক্ষিণ্য, আর্জ্জব, উপচিকীর্ষা, শৌচ, অহিংসা, বিদ্যা প্রভৃতি গুণের আবির্ভাব হয়। ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রণোদিত এই গুণগুলি সত্ত্বগুণ নামে অভিহিত। জীবাত্মার গতি জড়ত্ব হইতে দেবত্বের দিকে। অতি নিম্নস্তরের জীব তমোগুণোপহত হইয়া প্রায় জড়বৎ থাকে, ক্রমে সে জড়ত্ব কাটাইয়া অধৈর্য্য, চাঞ্চল্য প্রভৃতি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রমশঃ জন্মজন্মান্তরে উন্নতি লাভ করিতে থাকে; শেষে মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া বহু বার জৈবচক্রে ভ্রমণ করে, পরে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুশীলনদ্বারা সত্ত্ব-গুণের আধিক্য হইলে দেবলোকে গমন করিয়া থাকে। সেই জন্য আর্য্যগণ মনুষ্যলোককে মধ্যলোক বলিয়াছেন। মানুষ যদি তমোগুণ ও রজোগুণ পরিহারপূর্ব্বক সত্ত্ব-গুণের অনুশীলন করে, তাহা হইলে সে দৈবীপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সত্বর দেবলোকে পরে ব্রহ্মলোকে গমন করে। ইহাই ঋষিদিগের শিক্ষা। হিন্দুদিগের সাধনাপ্রণালী এই নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঠিক এই ভাবে বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করেন না। তাঁহারা ধর্ম্মাদিকে কেবল

* এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥
বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ।

সামাজিক স্থিতির হেতু বলিয়া মনে করেন। আত্মার অবিনশ্বরত্বসম্বন্ধে তাঁহাদের অনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস নাই। তাঁহারা রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করেন; বিষয়ভোগকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন। সেই জন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সহিত আর্ষসিদ্ধান্তের মিল হয় না। মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সেই জন্য কোঁতের মতানুসরণ করিয়া হিন্দুত্বের যে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহা ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে। তিনি তাঁহার ধর্ম্মতত্বে লিখিয়াছেন;—

"বৃত্তি নিকৃষ্টই হউক বা উৎকৃষ্টই হউক, উচ্ছেদমাত্রই অধর্ম্ম। লম্পট বা পেটুক অধার্ম্মিক; কেননা, তাহারা আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলনে নিযুক্ত। যোগীরাও অধার্ম্মিক; কেননা, তাঁহারাও আর সকল বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া দুই একটির সমধিক অনুশীলন করেন। নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় লম্পট বা উদরম্ভরিকে নীচ-শ্রেণীর অধার্ম্মিক এবং যোগীদিগকে উচ্চশ্রেণীর অধার্ম্মিক বলিলাম; কিন্তু উভয়কেই অধার্ম্মিক বলিব। আর আমি কোন বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বা অনিষ্টকর বলিতে সম্মত নহি। আমাদের দোষে অনিষ্ট ঘটে বলিয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব? জগদীশ্বর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই। তাঁহার কাছে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভেদ নাই। তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা স্ব স্ব কার্য্যোপযোগী করিয়াছেন। কার্য্যোপযোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল। সত্য বটে, জগতে অমঙ্গল আছে। কিন্তু সে অমঙ্গল মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট যে, তাহাকে মঙ্গলের অংশ বিবেচনা করাই কর্ত্তব্য। আমাদের সকল বৃত্তিগুলিই মঙ্গলময়। যখন যাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদের দোষে। জগত্তত্ব যতই আলোচনা করা যাইবে, ততই বুঝিব যে, আমাদের মঙ্গলের সঙ্গেই জগৎ সংবদ্ধ। নিখিল বিশ্বের সর্ব্বাংশই মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলিরই অনুকূল। প্রকৃতি আমাদের সকল বৃত্তিগুলিরই সহায়।" (ধর্ম্মতত্ব—ষষ্ঠ অধ্যায়।)

আমি এই স্থলে পজিটিভিজ্‌মের বা পাশ্চাত্য অনুশীলন-বাদের আলোচনা করিব না। কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য অনুশীলনবাদীর দল প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন, তাহা হিন্দুদিগের—সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগের সিদ্ধান্ত হইতে অনেক পৃথক্। হিন্দুদিগের মতে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে করিতে—ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন করিতে করিতে যখন জন্মজন্মান্তরে মানুষের স্বতঃই বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন সে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। * যোগী সন্ন্যাসী। তমোগুণের ও রজোগুণের উচ্ছেদই তখন তাহার ধর্ম্ম। যখন কোন ধার্ম্মিকের মন কোনরূপ বিষয়বাসনায় বিচলিত না হয়, তখন সে সন্ন্যাসধর্ম্ম ও যোগাবলম্বন করিবে। কারণ তখন কামাদি পশুপ্রকৃতির পরিহার না করিতে পারিলে সে দেবলোকের উচ্চস্তরে উঠিতে পারিবে না। যোগী বৃত্তিবিশেষের উচ্ছেদ করেন না,—তাহার মন সত্বগুণজনিত বিমলানন্দে এমনই মাতো-য়ারা হয় যে, কামাদি পশুবৃত্তি তাহার মানসকন্দরে স্থান পায় না। তাঁহাদের মনে যদি ঐ সকল প্রবৃত্তির উদয় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সাধনা পণ্ড হইয়া যায়। যোগীরা অধার্ম্মিক নহেন, দেবত্বের দ্বারে উপনীত মানব। তাঁহারা নরদেবতা। সর্ব্ববস্তুতে বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বে যাঁহারা সন্ন্যাস-গ্রহণ করিয়া যোগমার্গাবলম্বন করেন, তাঁহাদের যোগভ্রষ্ট হইতেই হয়। সেই জন্য মহাতপা বিশ্বামিত্রকেও যোগভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। † রাজর্ষি ভরতকেও তীর্য্যক্‌যোনিতে মৃগরূপে জন্মিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যশিক্ষাবিহ্বল বঙ্কিমবাবু এই তথ্যটি সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস। সত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণের পরিভবই হিন্দুর সাধনার ক্রম।

---

* সর্ব্বেষামেব বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সন্ন্যাসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
ইত্যাদি।

† শকুন্তলার জন্মকথা স্মরণ কর।

ভারতে শিল্প-ব্যবসা।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

(২)

সকল দেশেই শিল্প দুই ভাগে বিভাজ্য ;—শ্রমশিল্প ও চারু-শিল্প বা কলা। স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সঙ্গীতাদির মত শেষোক্ত-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোন দেশের শিল্প অধ্যয়ন করিতে হইলে সে দেশের স্থাপত্য বুঝিতে হয়। কারণ, যে দেশের শিল্প শিল্পনামের যোগ্য, সে দেশের স্থাপত্যেই সকল শিল্পের স্বরূপ ব্যক্ত হয়। ভারতীয় স্থাপত্যে এ দেশের সকল বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান—সে শিল্প কোনমতেই অনুকরণমাত্র নহে, বরং তাহা সজীবতা ও শক্তিবশতঃই বিদেশী আদর্শ পাইলে তাহা আত্মসাৎ করিয়া "আপনার" করিয়া লইয়াছে। শিল্প যখন সেইরূপে অন্য উপকরণ আপনার উপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিপাক করিয়া লইতে না পারে, তখনই তাহার শক্তিহীনতা ব্যক্ত হয়। ভারতীয় স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতা বুঝিতে হইলে প্রাচীন মন্দিরাদি দেখিতে হয়। কারণ, সকল দেশেই প্রথমে দেবমন্দিরে নৃপতির অর্থ ব্যয়িত হইত—শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য বিকশিত হইত। বিধর্ম্মীর বিজয়বাত্যায় বহু দার্ঢ্য দেবালয়ের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—রাজবংশের পরিবর্ত্তনপ্রবাহে রাজধানী-পরিবর্ত্তনে অনেক মন্দির অরণ্যমধ্যগত হইয়া সংস্কারাভাবে নষ্ট হইয়াছে—অনেক মন্দিরের উপকরণে মস্জেদ ও সেতু প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে ইংরাজশাসনেও গৌড়ের প্রলেপাস্তৃত ইষ্টক বিক্রীত হইয়াছে—জাজপুরের মন্দিরের উপকরণে পাব্‌লিক ওয়ার্কসের কায হইয়াছে। তবুও এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে যে সব মন্দির আজও বিদ্যমান, সে সকল হইতেই ভারতীয় স্থাপত্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্য চারুশিল্পের মত শ্রমশিল্পেও সপ্রকাশ; সেই বৈশিষ্ট্যই ভারতীয় শিল্পকে সৌন্দর্য্যময় ও সমাদৃত করিয়াছিল। কোন সভ্যতাই সত্য সত্যই বায়ু-হিল্লোলের মত চিহ্নমাত্র না রাখিয়া বিলীন হয় না; দেশের শিল্পে ও সাহিত্যে তাহা আত্মপরিচয় অঙ্কিত করিয়া যায়। কোন দেশে সৌন্দর্য্যপ্রিয় জাতির শিল্পনৈপুণ্য ব্যবহারে বিকশিত হইলে তাহা কেবল যে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যেই আত্মপ্রকাশ করে তাহা নহে, পরন্তু নিত্যব্যবহার্য্য অতি সাধারণ বস্তুতেও সৌন্দর্য্যসঞ্চার করে। এমন কি, মৃৎপাত্রাদিতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়—অতি সাধারণ দ্রব্যেও উপযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সজ্জার চেষ্টা থাকে; জাঁতি, বঁটিতেও রেখা বিন্দু নক্সা অঙ্কিত করিয়া দেওয়া হয়। এ দেশের শিল্পী রেশমী ও পশমী কাপড়ে যে জটিল নক্সা অনায়াসে বয়ন করে, তাহাতে তাহারা পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত—তাহাদের সে নৈপুণ্য তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু পুরাতন ঝাঁপে ও তাঁতে এ দেশের লোক কেমন করিয়া দ্রুত সেই সব নক্সা বয়ন করে, তাহা দেখিয়া বিদেশের—কলের জিনিষে অভ্যস্ত দর্শকরা বিস্মিত হয়েন। এই কলের পণ্যের সহিত প্রতি-যোগিতায় ভারতের বহু শ্রমশিল্প বিনষ্ট হইয়াছে। যাহারা কলে কায করে, তাহারা পণ্যে শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ পায় না—তাহারা কলেরই মত কায করে; শিল্পী শেষে মজুর হয়। বিদেশী সস্তা কলের জিনিষের বহুল প্রচলনে এ দেশে শ্রমশিল্পের যেমন সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দেশের লোকের রুচিরও তেমনই বিকার হইয়াছে। শিল্পের সমজদার সমালোচকগণ একবাক্যে এ কথা বলিয়া এই রুচিবিকারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিয়াছেন। কেবল শিল্পসমালোচকগণ নহেন, পরন্তু যাঁহারাই ভারতীয় শ্রমশিল্পের অবনতির কারণ সন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই এই কথা বলিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উতকামন্দে শিল্প-সম্মিলনের উদ্বোধন করিতে যাইয়া স্যর্ আর্থার ললী বলিয়াছিলেন, "মাদ্রাজে স্বদেশীশিল্পের অবনতির দ্রুত গতি লক্ষ্য করিলে হৃদয় বিষাদে অভিভূত হয়। স্বল্পমূল্য য়ুরোপীয় পণ্য, নিকৃষ্ট য়ুরোপীয় নক্সার আদর্শ, হীন য়ুরোপীয় রুচি—এই সকলে এ দেশের শিল্পের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছে!" তিনি মাদ্রাজের শিল্পসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সমগ্র ভারতের শিল্পসম্বন্ধেই সেই কথা বলা যায়।

স্যর্ আর্থার ললীর এই উক্তির বহুপূর্ব্বে স্যর্ জর্জ্জ বার্ডউড ভারতীয় বস্ত্রের, বর্ণের ও নক্সার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন,—ভারতীয় পুরুষ ও মহিলারা যেন স্বদেশী বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যতীত অন্য কোন বস্ত্র ও অলঙ্কার ব্যবহার না করেন। তাঁহাদের অলঙ্কারের নক্সাও যেন স্বদেশী হয়। বাস্তবিক বস্ত্রবয়নে এককালে যে বাঙ্গালার বিশেষ খ্যাতি ছিল—আজ সেই বাঙ্গালার অধিবাসীরাই বিদেশী বস্ত্রে লজ্জানিবারণ করিতেছে। ঢাকাই বস্ত্র এককালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত ছিল। যে মোগল বাদশাহদিগের বিস্ময়কর বিলাসের বিবরণ কবিকল্পনাপ্রসূত বলিয়া সন্দেহ হয়, তাঁহারাও ঢাকার বিখ্যাত মস্‌লিনবস্ত্র পরিধান করিতেন। সে মস্‌লিন ঘাসের উপর বিস্তৃত করিয়া দিলে সন্ধ্যার শিশির বলিয়া ভ্রম হইত, তাই তাহার নাম ছিল—"সবনাম" (সন্ধ্যার শিশির)। সে মস্‌লিন নদীর স্রোতে মিলাইয়া

যাইত, তাই তাহার নাম ছিল—"আবরয়ান" (প্রবাহিত জলধারা)। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দেও ঢাকা হইতে ১ কোটী ৫২ লক্ষ টাকার মস্‌লিন রপ্তানী হইয়াছিল। এই সব মস্‌লিনের তুলনা ছিল না অথচ এ সব কাপড়ের সূতা এ দেশের তুলা হইতে চরকায় প্রস্তুত হইত। আর আজকাল শুনিতে পাই, বিদেশ হইতে বীজ না আনিলে লম্বা আঁচড়া তুলা জন্মে না—এ দেশের তুলায় যে সূতা হয়, তাহাতে মিহি কাপড় হয় না! কি উপায়ে যে এ দেশের তুলা হইতে সরু সূতা প্রস্তুত হইত, তাহা জানিবার উপায়ও নাই। মস্‌লিনের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে—বাঙ্গালায় আর তুলার চাষ নাই; বাঙ্গালী স্ত্রীপুরুষ বিলাতী ধুতি, চাদর, শাটী ব্যবহার করিতেছে; বাঙ্গালার তন্তুবায়—ঢাকায়, শান্তিপুরে, ফরাসডাঙ্গায়, পাবনায়—বিলাতী সূতায় "দেশী কাপড়" বয়ন করিয়া দিন গুজরাণ করিতেছে।

কেবল ঢাকায় নহে, পরন্তু আরও অনেক স্থানে ভাল কাপড় হইত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দেও মালদহের সেখ ভিক পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ার বিক্রয়জন্য তিন জাহাজ মালদহী কাপড় পাঠাইয়াছিলেন। আর বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে—ভারতের সর্ব্বত্র যে উটজশিল্পের উন্নতিতেই গ্রামের অভাব গ্রামেই পূর্ণ হইত, গ্রামের তন্তুবায় গ্রামের লোকের কাপড় যোগাইত, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দেও টমাস্ মন্‌রো (উত্তরকালে ইনিই মাদ্রাজের গভর্ণর হইয়াছিলেন) বিলাতে সাক্ষ্য দিবার সময় বিলাতী শালের কাটতিতে ভারতের শালের ব্যবসার অনিষ্টসম্ভাবনার কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ভারতে বিলাতী সূতার আমদানী হয় নাই। পূর্ব্বে ভারতে যে বস্ত্র উৎপন্ন হইত, তাহাতে ভারতবাসীর ব্যবহারের পরও যাহা থাকিত, তাহা বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতের ব্যবসায়ীরা লাভবান্ হইত। ১৮১৬-১৭ খৃষ্টাব্দেও ভারতের যে কাপড় বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, তাহার মূল্য—২ কোটী ৪৮ লক্ষ ৯১ হাজার ৫ শত ৭০ টাকা! ৩০ বৎসরে এই ব্যবসার সর্ব্বনাশ হয় আর আজ আমরা ইহা স্বপ্নবৎ মনে করি। এই কাপড়ের সূতার অধিকাংশই স্ত্রীলোকরা গৃহকর্ম্মের অবসরকালে চরকায় প্রস্তুত করিতেন। সুতরাং এই ব্যবসায়ে কত লোক নিযুক্ত থাকিত, আর ইহার লাভ কেমন শত পথে শত পরিবারে বিভক্ত হইয়া—বর্ষার বর্ষণ যেমন ধরিত্রীকে স্নিগ্ধশ্যামশোভাময় করে, তেমনই ভাবে সমগ্র সমাজের সমৃদ্ধিবৃদ্ধি করিত, তাহা সহজেই অনুমেয়।

রেশমের ব্যবসা—পাটের ব্যবসার মত বাঙ্গালারই নিজস্ব ছিল। উত্তরভারতে তুঁতগাছ জন্মে না—কাযেই রেশমকীট থাকিতে পারে না। বাঙ্গালার নানাস্থানে রেশমের চাষ ছিল। রেশমের ব্যবসার দুরবস্থা অল্পদিন-পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে। বিদেশী রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়াও ভারতের রেশমের ব্যবসা বহুদিন আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল। বিদেশী ব্যবসায়ীরা মুর্শিদাবাদে আসিয়া কুঠী স্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল সিল্ক কোম্পানী কায তুলিয়া দিতে বাধ্য হয়েন। সরকারী গেজেটিয়ারে প্রকাশ, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফরাসী সরকার বিদেশী রেশমের উপর যে আমদানী শুল্ক সংস্থাপিত করেন, তাহাতেই বহরমপুরের (মুর্শিদাবাদ) রেশমের ব্যবসার বিশেষ ক্ষতি হয়। এখন সরকার আবার বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়া রেশমের ব্যবসার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিতেছেন। বিদেশী বিশেষজ্ঞনিয়োগের সর্ব্বপ্রধান অসুবিধা—অত্যধিক অর্থব্যয়; আবার এ দেশের রীতিপ্রকৃতিসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাহেতু তাঁহাকে কিছুদিন পদে পদে ভ্রান্ত হইতে হয়। এ বিষয়ে একটা অতি সাধারণ দৃষ্টান্ত দিব। আমাদের পরিচিত কোন ইংরাজ ভদ্রলোক একদিন কথায় কথায় আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এ দেশে নাকি বাছুর না পাইলে গরু দুধ দেয় না?" আমরা তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। বৎস না পাইলেও যে গরু দুগ্ধ দেয়, ইহা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। কিন্তু প্রশ্নের ফলে আমরা অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি এবং অনুসন্ধানফলে জানিতে পারি, বিলাতে বৎসকে গবীর নিকট রাখা হয় না—পুরুষানুক্রমে এইরূপ হওয়ায় তথায় গবীর দোহনকালে বৎসের প্রয়োজন হয় না। এ দেশে যে লাঙ্গল ব্যবহৃত হয়, তাহা এ দেশে চাষের পক্ষে অনুপযোগী নহে; কিন্তু বিলাতের গভীরভেদী লাঙ্গল দেখিতে অভ্যস্ত ব্যক্তিরা এ দেশের লাঙ্গল দেখিয়া মনে করেন, যে লাঙ্গলে চড়াইপাখীর আঁচড়ের মত আঁচড়কাটা হয়, তাহাতে কি চাষের সুবিধা হয়?

যে দেশে এমন বস্ত্র উৎপন্ন হইত, সে দেশে সে সব বস্ত্ররঞ্জনের জন্য বর্ণেরও অভাব হইত না। যে বর্ণের নাম আজকাল বিলাতে—ক্রিমজন, তাহা ভারতেই উৎপন্ন হইত। লাক্ষা কৃমিজ—"কৃমিজ" ক্রমে য়ুরোপে "ক্রিমজনে" পরিণতি লাভ করিয়াছে। নীল এ দেশেই উৎপন্ন হইত—ভারত (ইণ্ডিয়া) যে তাহার জন্মভূমি, তাহার "ইণ্ডিগো" নামেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। বহুকাল ভারতবর্ষই বিদেশে এই নীল যোগাইয়াছে। এই নীলের ব্যবসার জন্য বহু য়ুরোপীয় এ দেশে বাস করিতেন—নীলের ইতিহাসে বাঙ্গালার ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা পূর্ণ, তাহার পর বিদেশী—রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত কৃত্রিম বর্ণের ব্যবহারে এ দেশে বর্ণের ব্যবসা বিনষ্ট হয়।

যে লাক্ষাবর্ণের কথা বলিয়াছি, তাহা বিদেশে রপ্তানী হইত। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশ হইতে বিদেশে গালার অপেক্ষা লাক্ষাবর্ণই অধিক রপ্তানী হইত। ১৮২৪—২৫ খৃষ্টাব্দে এক কলিকাতা বন্দর হইতে ৭ লক্ষ টাকার লাক্ষা রং য়ুরোপে রপ্তানী হইয়াছিল; ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ

হইতে মোট ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬ শত টাকার রং রপ্তানী হয়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে সে ব্যবসা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে—এখন মীরজাপুরে এই রং ৪৲ টাকা মণ দরে বিকায়—তাই গালার কারবারীরা সে রং গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়। এখন অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, মহিলাদিগের প্রসাধনেও আর লাক্ষারস ব্যবহৃত হয় না—জার্ম্মাণ কৃত্রিম রং "আল্‌তা" রূপে ব্যবহৃত হইয়া বস্ত্র ও শয্যা বিকৃত করে।

এবার যুদ্ধের জন্য সরকার বর্ণের অভাবে এ দেশের বর্ণের ব্যবসার উদ্ধারসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। ডাক্তার মার্সডেন পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,—সে বিলুপ্ত ব্যবসার পুনরুদ্ধারসংসাধন সাধ্যাতীত। যে গাছগাছড়া হইতে রং হইত, সে সকলের চাষ বন্ধ হইয়াছে। আর বিদেশী সস্তা—ঘন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কাঁচা রং দেশের লোকের রুচি এমনই বিকৃত করিয়া দিয়াছে যে, তাহারা আর দেশী ফিকা—কিন্তু পাকা রং ব্যবহার করিতে চাহে না।

কাশ্মীর-দরবার বহুদিন কৃত্রিম রাসায়নিক বর্ণব্যবহার বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কাশ্মীরী শাল বহুমূল্য—সেরূপ মূল্যবান্ জিনিষ যদি অল্প দিনে বিবর্ণ হইয়া যায়, তবে লোকে আর তাহা কিনিবে না। তাহা হইলে কাশ্মীরের প্রাচীন লাভজনক ব্যবসার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া কাশ্মীর-দরবার সীমান্তে কৃত্রিম বর্ণের উপর কর আদায় করিতেন—রাজ্যমধ্যে সে রং নষ্ট করিয়া ফেলা হইত। কিন্তু যখন সর্ব্বত্র কৃত্রিম বর্ণই ব্যবহৃত, তখন দরবার আর কত দিন তাহার ব্যবহারপথ রুদ্ধ রাখিতে পারিবেন? তাই এখন কাশ্মীরেও এই কৃত্রিম রং ব্যবহৃত হইতেছে। এখন লোক সস্তা জিনিষ চাহে—প্রকৃত সৌন্দর্য্যগ্রাহিতা আদর্শের দোষে হারাইয়াছে। এ অবস্থায় যে বিদেশী কৃত্রিম বর্ণের আদর হইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কারণ কোথায়?

অধিকাংশ স্থলেই এক ব্যবসার প্রয়োজনে অন্য ব্যবসার উৎপত্তি—দেশের সব ব্যবসা শৃঙ্খলের ভিন্ন ভিন্ন অংশের মত পরস্পর সম্বদ্ধ—একের উন্নতি অপরের উন্নতির কারণ। ভারতে এক একটি ব্যবসার বিনাশে আনুসঙ্গিক কত ব্যবসাও যে বিনষ্টপ্রায়, তাহার হিসাব নিকাশের সময় সমুপস্থিত।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সরকারকর্ত্তৃক যখন ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চার্টার (সনন্দ) পুনরায় প্রদত্ত হয়, তখন সর্ত্ত হয়, কোম্পানী ভারতে শাসনকার্য্য করিবেন—ব্যবসা করিতে পারিবেন না। এই ব্যবস্থার ফলে—কোম্পানী প্রতিদ্বন্দী ব্যবসায়ী না থাকায়—এ দেশের শিল্প-ব্যবসার দিকে মন দিয়াছিলেন। তখন কোম্পানী (১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে) ভারতের শিল্পের উন্নতির প্রতিরোধী শুল্কগুলির বিলোপ প্রার্থনা করিয়া পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। পার্লামেণ্ট এ বিষয়ে যে অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত করেন. লর্ড সেমোর তাহার সভাপতি ও মিষ্টার গ্লাডষ্টোন অন্যতম সদস্য ছিলেন। সে সমিতির সংগৃহীত সাক্ষ্য পাঠ করিলে তখন পর্য্যন্ত ভারতের অবস্থা বুঝা যায়। মণ্টগমরী মার্টিন এই সমিতিতে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, "ভারতবর্ষ কৃষিপ্রাণ নহে—ভারতবর্ষ যে পরিমাণে শিল্পপ্রধান, সেই পরিমাণেই কৃষিপ্রধান; সে দেশ কৃষিপ্রাণ করিলে তাহাকে সভ্যতার হিসাবেও অবনত করা হইবে। ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করা হইবে—এ বিশ্বাস আমার নাই। ভারতবর্ষে বহুবিধ শিল্প বিদ্যমান—সে সব বহুদিনের—কোন জাতি অন্যায় না করিয়া সে সব শিল্প প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিতে পারে নাই।" তিনি বলিয়াছিলেন, অনেক শিল্পে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ভারতের প্রাধান্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই জন্যই দীর্ঘ তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া—সভ্যতার অরুণোদয়কাল হইতে পৃথিবীর সকল দেশ ভারতের সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য ব্যাকুলতা জানাইয়াছে—ভারতীয় পণ্যের জন্য অবাধে দেশের ধনব্যয় করিয়াছে। আর তাহারা যে পণ্য প্রস্তুত করিয়া বাণিজ্যের স্রোতে শতপথে দেশে ধন আনিয়াছে, সে পণ্য প্রস্তুত করিবার জন্য তাহারা গলিত উপকরণে স্রোতস্বতীর স্ফটিকপ্রবাহ আবিল ও কলুষিত করে নাই—স্নিগ্ধশ্যাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করে নাই—ধূলিতে ও ধূমে বায়ুমণ্ডলে ব্যাধিবীজ বিস্তার করে নাই। তাহারা বড় বড় কলকারখানায় কলেরই মত কলের কায করে নাই; পরিবারমধ্যে থাকিয়া—সমাজের সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়া—আপনি আপনার প্রভু হইয়া শিল্পজ পণ্য প্রস্তুত করিয়াছে; আপনাদের কার্য্যে অসাধারণ নৈপুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে। এখনই পাশ্চাত্যপ্রথায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ফলে তাহাদিগকে গ্রাম হইতে—গৃহ হইতে—সমাজ হইতে—পরিবার হইতে বিচ্যুত হইয়া, সহরে অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় জীবনযাপন করিতে হইতেছে। ইহাতে সমাজের যে ক্ষতি হইতেছে, অর্থে কি তাহা পূর্ণ হইবে? আমরা দেশের অবস্থা বিবেচনা না করিয়া—প্রতীচ্য ব্যবসাব্যাপারের (Industrialism) স্বরূপ না বুঝিয়া—এ দেশে প্রতীচ্যপ্রথায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করি, কিন্তু তাহাতে প্রতীচীতে যে অনর্থোদয় হইয়াছে, তাহা দেখি না। তাহাতে সমাজে দুর্নীতি বৃদ্ধি হইয়াছে—সমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে—মানুষ পশুতে পরিণত হইতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের সঙ্গে শ্রমজীবীর মনোমালিন্যে ধর্ম্মঘট হইতেছে—রক্তারক্তি হইতেছে। এ দেশের শিল্পব্যবস্থায় অশান্তি জন্মিতে পারে না, সমাজ শান্তি সম্ভোগ করে। এ দেশে প্রতীচীর ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না হইয়া, প্রতীচীতে এ দেশের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলেই জগতের উপকার হয়। বিশেষ আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রতীচ্যপ্রথায় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার উপযোগী নহে। এ দেশে সহরের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যক্ষাদি বিষম ব্যাধির বিস্তার ইহার মধ্যেই

দেশে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। সুতরাং সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। আবশ্যক উন্নতি করিতে পারিলে উটজ-শিল্পও যে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তাহা দেখা গিয়াছে। বিশেষ উটজ-শিল্পের উন্নতি ব্যতীত দেশের দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান সম্ভব হয় না—হইতে পারে না। আয়ার্লণ্ড আমাদের দেশেরই মত কারণে শিল্প হারাইয়া কৃষিপ্রাণ হইয়াছে। তাহার শিল্পের অবস্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য যে কমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কমিটীর সদস্যগণও তথায় বহুবিধ উটজ-শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকের রক্ষণশীলতা এ দেশে জাতিভেদেরই মত স্বদেশী-শিল্পসংরক্ষণে সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প চেষ্টাতেই এ দেশে পুরাতন উটজ-শিল্পসকলের পুনরুন্নতি সংসাধিত হইতে পারে।

আমরা বলিয়াছি—ভারতে বহুবিধ শিল্প ছিল, শিল্পজ পণ্যে দেশের লোকের অভাব ত পূর্ণ হইতই, অধিকন্তু সেই সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া তাহারা বিশেষ লাভবান্ হইত। বাঙ্গালার কথাই ধরা যাউক। ইতিহাসে দেখা যায়, মুর্শিদকুলী খাঁ পুণ্যাহের পর বাঙ্গালা হইতে যে রাজস্ব পাঠাইয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ ১ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। জায়গীরের ও খাসনবীশীর টাকা স্বতন্ত্র প্রেরিত হইয়াছিল। টাকা দুইখানি গোযানে প্রেরিত হয়—রক্ষার্থ সঙ্গে খাজাঞ্চীখানার দারোগা এবং ৩ শত অশ্বারোহী ও ৫ শত পদাতিক সৈনিক পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আর তিনি হাতী, অশ্ব (টাঙ্গন ও টাট্টু), মহিষ, হরিণ, বাজ, এবং ঢাকাই কাপড়, গণ্ডারচর্ম্মের ঢাল, শ্রীহট্টের পাটী, আসামের কাপড়, তরবারফলক প্রভৃতি দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন। এই সব দ্রব্য তখন দিল্লীতে—বাদশাহের প্রাসাদে সাদরে ব্যবহৃত হইত। আওরঙ্গীজেবের সমসাময়িক ইতিহাসে মেদিনীপুরের মাদুরের উল্লেখও দেখা যায়।

এ সব শিল্প যে বিনষ্ট হইতেছে—শত শত শিল্পী যে নিরন্ন হইয়া কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কৃষিকার্য্যে লাভের মাত্রা কমাইয়া দিতেছে বা কলকারখানায় সাধারণ শ্রমজীবীর কার্য্য করিতেছে—ইহাতে দেশের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখি? আমরা অবাধে সরকারের দোষ দিয়া নিশ্চিন্ত হই—যেন এ বিষয়ে আমাদের কোনরূপ কর্ত্তব্যই নাই! আমাদের রুচি যদি নিতান্তই বিকৃত না হইত, তাহা হইলে দেশের অনেক প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত শিল্প উপেক্ষায় ও অনাদরে নষ্ট হইত না—জীবিত থাকিলেও জীবন্মৃত হইত না। আমাদের দারিদ্র্য প্রবর্দ্ধমান হইলেও আমরা যে রেশম ব্যবহার করি না—এমন নহে, বিশেষ আমাদের মধ্যে নবীনপ্রথায় যে সঙ্কীর্ণ সম্প্রদায়ের ধনবৃদ্ধি হইতেছে, সে সম্প্রদায়ে মহিলাদিগের ব্যবহারার্থ বহুমূল্য রেশম ও মস্‌লিন বহুলপরিমাণেই ব্যবহৃত হয়—অথচ সে সবই বিদেশী। তাঁহারা যদি বিদেশী সবই ভাল—এই ভ্রান্তবিশ্বাসবশে কেবল বিদেশী জিনিষই ব্যবহার করিতে হইবে, এমন মনে না করিতেন, তবে যে এ দেশের অনেক পুরাতন শিল্প বিনষ্ট না হইয়া উন্নতিপ্রাপ্ত হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কাপড়ের কথায় যাহা বলিয়াছি, অনেক জিনিষের কথায় তাহা বলা যায়। কৃষ্ণনগরের পুতুল ফেলিয়া জার্ম্মাণ চিনামাটীর পুতুল এবং কাশীর পিত্তলের ও আমেদাবাদের বিদরীর জিনিষ ফেলিয়া বিদেশী জিনিষে ঘর সাজান—খাগড়ার বাসন ফেলিয়া এনামেলের বা অ্যালুমিনিয়মের বাসন ব্যবহার—এ সবই বিকৃত রুচির ও হীন অনুকরণ-প্রবৃত্তির পরিচায়ক। এ বিষয়ে সরকারকে দোষ দিলে কি হইবে? আমাদের পুরাতন জিনিষ দেখিয়া—শিল্প-সৌন্দর্য্যের বোদ্ধা হইয়া আমাদিগকেই বিকৃত রুচির সংস্কার করিতে হইবে।

কৃষি।

২

জমী শুষ্ক হইলে অর্থাৎ একেবারে নীরস হইলে তাহাতে ফসল জন্মে না। তবে কোন মাটিই একেবারে রসহীন হয় না। জমীতে যে পরিমাণ রস থাকিলে শস্য ভালভাবে জন্মিতে পারে, সেই পরিমাণ রস যদি উহাতে না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। সেই জন্য অনাবৃষ্টি হইলে ফসল জন্মে না। সকল অঞ্চলে সমান বারিপাত হয় না; কোন কোন অঞ্চলে স্বভাবতঃই বৃষ্টি অল্প হইয়া থাকে; ঐ সকল দেশের জমীও সেই জন্য নীরস হয়, তাহাতে প্রচুর ফসল জন্মে না; হয় ত শেষকালে বারির অভাবে শস্য মরিয়া যায়। মৃত্তিকাতে যথেষ্ট রস থাকিলে শস্য সহসা মরে না। সেই জন্য যে সকল অঞ্চলে অল্প বারি বর্ষিত হয়, সে সকল দেশের কৃষকরা জমী সিক্ত রাখিবার জন্য কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। কানেডায় ও মার্কিণ মুলুকের কোন কোন স্থলে বৎসরে দশ এগার ইঞ্চির অধিক বারি বর্ষে না; সুতরাং সেখানকার জমীতে যে রস থাকে, তাহা গম উৎপাদনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে; সেই জন্য তাহারা জমীতে এক বৎসর অন্তর এক বৎসর চাষ করে, প্রতি বৎসর জমীতে ফসল উৎপন্ন করে না। পক্ষান্তরে জমীর এক বৎসরের রস যাহাতে পরবৎসর পর্য্যন্ত সঞ্চিত থাকে, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া থাকে। জমীর মাথা বা উপরিভাগ যদি আঁটা বা কঠিন থাকে, তাহা হইলে জমীর রস বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, জমী শুষ্ক হইয়া পড়ে; কিন্তু জমীর উপরে যদি ঝুরঝুরে ধূলা থাকে, তাহা হইলে নীচের রস বা জলীয় অংশ উপরে উঠিয়া বাষ্পে পরিণত হইতে পারে না। সেই জন্য যে বৎসর তাহারা জমী ফেলিয়া রাখে, উহাতে চাষ দেয় না, সে বৎসরও বার বার জমীতে লাঙ্গল ও মই দেয়। এই লাঙ্গল ও মই-দ্বারা তাহারা তিন চারি ইঞ্চি মাটি উস্কাইয়া একেবারে অতি সূক্ষ্ম ধূলিতে পরিণত করিয়া রাখে; জমীর উপরিভাগ শক্ত বা কঠিন হইতে দেয় না। তাহাতে ধূলির নিম্নস্থিত মৃত্তিকায় রস সঞ্চিত থাকে। তাহার পরে পরবৎসর যখন বৃষ্টি হয়, তখন সেই জমীতে যথেষ্ট রস সঞ্চিত হয়, তখন তাহাতে স্বচ্ছন্দে গম প্রভৃতি জন্মে। আমাদের দেশে বীরভূম, বাঁকুড়া প্রভৃতি জেলার কয়েক স্থানে বারিপাত অল্প হয়। তথাকার কোন কোন জমী অত্যন্ত শুষ্ক বলিয়া তথায় সকল ফসল ভাল হয় না। আমার মনে হয়, ঐ সকল জেলায় ঐরূপ জমীতে যদি উল্লিখিত উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা হইলে সুফল ফলিতে পারে।

কিন্তু একটা বিশেষ কথা আছে। পাশাপাশি সকলে যদি সকলের জমীতে এই ভাবে কারকিৎ করে, তাহা হইলে উহার ফল অনেক ভাল হয়। এক জন যদি তাহার এক খণ্ড অতি ক্ষুদ্র জমীতে ঐরূপ করে, তাহা হইলে উহার ফল আশানুরূপ হয় না, তবে কিছু ভাল হইতে পারে। ইহার কারণ এইখানে বলা যাইতে পারে। মৃত্তিকার জল টানিবার শক্তি আছে, এ কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মাটি যে কেবল নিম্নদেশ হইতে উপরের দিকে বা উপরের দিক্ হইতে নীচের দিকে জল টানে, তাহা নহে, পাশাপাশিও বিলক্ষণ জল টানিয়া থাকে। সেই জন্য একখানি জমীর মাটি যদি সিক্ত থাকে, তাহা হইলে পাশের ক্ষেত্রের মাটিও সেই রস শুষিয়া লইতে পারে। প্রকৃতি সকলকে তাঁহার আশীর্ব্বাদ সমানভাবে বাঁটিয়া দিতে চাহেন,—তাঁহার পক্ষপাত নাই; এক জনের কৃতকর্ম্মের সুফল বা কুফল সকলে ভোগ করে, ইহাই তাঁহার ব্যবস্থা। মানুষে আপনাদের সঙ্কীর্ণতার ও অদূরদর্শিতার প্রভাবেই আত্মম্ভরী হইয়া উঠে। সেই জন্যই মানুষ কষ্ট পায়। একটু বিস্তীর্ণ জমীতে উল্লিখিত ব্যবস্থা করিলে ফল ভালই হইয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এক এক যোতের পরিমাণ অতি অল্প, সেই জন্য একাকী বিচ্ছিন্নভাবে কোন কাজ করিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

জমীতে কখনই কোনরূপ আগাছা বা তৃণগুল্মাদি জন্মিতে দেওয়া উচিত নহে। তৃণগুল্মাদি যে কেবল মৃত্তিকার রস-শোষণ করে, তাহা নহে; শস্যাদির যাহা আহার্য্য অর্থাৎ যাহা খাইয়া শস্যাদি পুষ্টিলাভ করে, আগাছা তাহাই খাইয়া ফেলে; কাজেই ক্ষেত্রে যখন চাষ দিয়া শস্য বুনা হয়, তখন সেই শস্য প্রচুর আহার্য্য অভাবে শীর্ণ হইয়া যায়; উহার সেরূপ তেজ হয় না, ফসলও অধিক জন্মে না। সেই জন্য ক্ষেত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখাই কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের অনেক স্থানে কৃষকরা ক্ষেত বেশ পরিষ্কৃত করিয়া রাখে; কিন্তু নিম্ন ও মধ্যম বঙ্গের স্থানে স্থানে কৃষকরা এ বিষয়ে কতকটা উদাসীন বলিয়াই বোধ হয়। গৃহস্থের মধ্যে যাঁহারা বাড়ীর সংলগ্ন জমীতে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, করলা, শশা, শিম, ডাঁটা, উচ্ছে, ঢেঁড়স, বেগুন প্রভৃতি তরকারী রোপণ করিয়া সংসারের খরচ লঘু করিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগেরও বারো মাস জমী পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত; গাছগাছালি লাগাইবার সময় জমী পরিষ্কৃত করিব, এরূপ মনে করা উচিত নহে।

জমীতে রসের বা জলের যেমন প্রয়োজন, উত্তাপেরও তেমনই প্রয়োজন। জলের সহিত উত্তাপের সংযোগ না

হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয় না। মৃত্তিকার মধ্যে রসের ও উত্তাপের সংযোগে বীজের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন ঘটে; সেই পরিবর্ত্তনের ফলে বীজ অঙ্কুরিত হয়। ভগবান্ জমীতে জল দিবার যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, উত্তাপ দিবারও সেইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। সূর্য্যের কিরণই সাধারণতঃ এই উত্তাপ প্রদান করে। ইহা ভিন্ন মৃত্তিকাকে উত্তপ্ত করিবার আরও কতকগুলি কারণ আছে। আমরা একে একে তাহার কথা আলোচনা করিব।

এই উত্তাপসম্বন্ধে কতকগুলি কথা জানিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। একই পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে সকল জিনিস সমানভাবে উত্তপ্ত হয় না। একই ওজনের একই ভাবে গঠিত লোহার, তামার ও সীসার তিনটি জিনিস যদি রৌদ্রে ফেলিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঐ তিনটি জিনিস সমান গরম হয় নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, উহারা সমানভাবে উত্তাপ গ্রহণ করে নাই অথবা সমানভাবে উত্তাপ টানিয়া লইলেও একই পরিমাণ উত্তাপে তাহারা সমানভাবে উত্তাপের লক্ষণ প্রকটিত করে নাই। এইখানে তাহাদের পরস্পরের উত্তপ্ত হইবার শক্তির তারতম্য সূচিত হয়। দ্রব্যভেদে এই উত্তপ্ত হইবার শক্তিকে "উত্তাপশক্তি" বলা যাইতে পারে। দ্রব্যবিশেষের এই উত্তাপশক্তির তুলনা করিবার উপায় আছে। পণ্ডিতেরা এই উত্তাপশক্তি বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রত্যেক জিনিসের "আপেক্ষিক উত্তাপ" (Specific Heat) ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের দ্রব্যকে এক ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন, আপেক্ষিক উত্তাপের অঙ্ক দেখিলে তাহা বুঝা যায়। দশমিক ভগ্নাংশে তুলনার ভাষায় সেই অঙ্কপাত করা হয়। মৃত্তিকায় যে সমস্ত জিনিস আছে, তাহার মধ্যে জলকে উত্তপ্ত করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপের প্রয়োজন হয়। এই জলের উত্তাপশক্তিকেই "আপেক্ষিক উত্তাপ" মাপিবার মানদণ্ড ধরা হইয়া থাকে। একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জলকে এক ডিগ্রী অধিক উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন, তাহাকেই উত্তাপ মাপিবার গজকাঠীস্বরূপ "এক" ধরা হয়। তাহার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ উত্তাপ প্রয়োগ করিলে হিউমাস (Humus) নামক মৃত্তিকাস্থিত জিনিসের উত্তাপ এক ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়; পণ্ডিতেরা অমনই স্থির করিলেন,—উহার অপেক্ষিক উত্তাপ 'আধ' (·5); জলকে এক ডিগ্রী অধিক উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন, কাদাকে (Clay) এক ডিগ্রী অধিক উত্তপ্ত করিতে তাহার সিকিপরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য কাদার আপেক্ষিক উত্তাপ সিকি (·25)। আবার পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে, জলকে এক ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে যে পরিমাণ উত্তাপের প্রয়োজন, বালীকে এক ডিগ্রী উত্তপ্ত করিতে হইলে তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ উত্তাপের প্রয়োজন। সেই জন্য সাব্যস্ত হইল যে, বালুকার আপেক্ষিক উত্তাপ এক পঞ্চমাংশ (·02)। সোজা কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যে পরিমাণ উত্তাপে এক সের জলকে এক ডিগ্রী নরম করা যায়, সেই পরিমাণ উত্তাপে দুই সের হিউমাসের, চারি সের কাদার বা পাঁচ সের বালীর এক ডিগ্রী উত্তাপ বৃদ্ধি করা যায়। এই জন্যই বালুকাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব বুঝা গেল যে, জমীর উত্তাপটা মৃত্তিকার উপাদানীভূত পদার্থের উপর নির্ভর করে। সকল জমীর উপাদান যখন সমান নহে, তখন একই প্রকার উত্তাপ-প্রাপ্তিতে সকল জমী সমানভাবে উত্তপ্ত হয় না। যে জমীতে বালুকার ভাগ অধিক, সে জমী যত শীঘ্র গরম হইয়া উঠে, যে জমীতে হিউমাসের ভাগ যত অধিক, সে জমী তত শীঘ্র তত উত্তপ্ত হয় না। আবার যে মৃত্তিকা অত্যন্ত সিক্ত, সে মৃত্তিকা সহজে গরম হয় না। ফসল জন্মিবার পক্ষে জমীতে উত্তাপ থাকা নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু সে উত্তাপেরও একটা পরিমাণ আছে; সেই উত্তাপ অতিক্রান্ত হইলে জমীতে ফসল ভাল হয় না। যে মাটিতে বালুকার ভাগ অধিক, সে মাটি শীঘ্র উত্তপ্ত হয়, তাহার ফসল অকালে পাকিয়া যায় এবং ফলন কম হয়; বেলেজমীতে অনেক ফসল ভাল হয় না। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই যে, কয়েকখানি জমীতে এক সঙ্গে চাষ দেওয়া হইল, এক সঙ্গে বীজ বপন করা হইল, এক সঙ্গে বিদা নিড়ান দেওয়া হইল,—কিন্তু কোন ক্ষেতের ধান বিশেষ বৃদ্ধি পাইল না, আগে পাকিয়া গেল, ফলন কম হইল। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, ঐ জমীতে আবশ্যকের অধিক পরিমাণে বালী আছে, উহাতে পাতা-লতার সার বা হিউমাস যোগ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। গোবরের সার দিলেও সুবিধা হয়। সারের কথা বিশেষভাবে পরে বলা যাইবে।

জমীর বর্ণের উপরও মৃত্তিকার উত্তাপ কতক পরিমাণে নির্ভর করে। কৃষ্ণবর্ণ মাটি অধিক উত্তাপ আকর্ষণ করিয়া লয়, শুক্লবর্ণের মৃত্তিকা তত উত্তাপ গ্রহণ করিতে পারে না। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে এই কথার সত্যতা সহজে উপলব্ধ হইবে। দুইটি মৃণ্ময়পাত্রে একই প্রকারের মাটিতে পূর্ণ করিয়া রাখ, একটি পাত্রের মুখে ধূমের ঝুল ছড়াইয়া দাও, আর একটি পাত্রের মুখে চুণের গুঁড়া ছড়াইয়া দাও। পাত্র দুইটি নাদা প্রভৃতির ন্যায় বিস্তৃতমুখ হইলেই ভাল হয়। দুইটি পাত্রই কিছুক্ষণ সূর্য্যকিরণে ফেলিয়া রাখ, তাহা হইলে কিছুক্ষণ পরে তাপমানযন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাইবে যে, যাহার মুখে ঝুল বা কালি দেওয়া—তাহার ভিতরের মাটি অধিক উত্তপ্ত হইয়াছে আর যাহার মুখে চুণ দেওয়া—তাহার মাটির উত্তাপ অপেক্ষাকৃত অল্প। দুই পাত্রে একই প্রকারের মাটি রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, মাটির

উপাদান বিভিন্ন হইলে অন্য কারণেও মৃত্তিকার উত্তাপ বৃদ্ধি পাইতে পারে। যথা—যে মাটিতে অধিক বালী, সে মাটি সহজে উত্তপ্ত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, মৃত্তিকার বর্ণের উপরও উহার উত্তাপ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।

সূর্য্যকিরণই ভূমির উত্তাপপ্রদানের প্রধান কারণ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভূমির উত্তাপবৃদ্ধির অন্য কতকগুলি বিশেষ কারণ আছে। ক্ষেত্রে পূর্ব্বফসলের শিকড় ও গোড়া থাকে; উহা মৃত্তিকার মধ্যে যখন পচিতে থাকে, তখন উহা হইতে তাপ উৎপন্ন হয়। যে কারণে এই উত্তাপের আবির্ভাব হয়, সেই কারণকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অক্সাইডেশন (Oxidation) কহে। যে সকল পদার্থে অক্সিজেন (Oxygen) নাই অথবা অক্সিজেনের ভাগ অতি অল্পই আছে, সেই সকল পদার্থের সহিত বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আসিয়া মিলিত হইয়া ঐ উত্তাপের উদ্ভব করে। এই অক্সিজেন বা অম্লজানবাষ্প-সম্মিলন-ব্যাপারকে অক্সাইডেশন বলে। বাঙ্গালায় উহাকে অম্লজানমিলন বলিলে কোন দোষ হয় না। ধানের যে সমস্ত গোড়া জমীতে থাকে, তাহা যখন মাটির সহিত মিলিত হইয়া পচিতে থাকে, তখন উহা হইতে উত্তাপ জন্মে। আমাদের দেশের কৃষকরা ধান কাটিয়া লইবার কিছুদিন পরে যদি জমীতে লাঙ্গল দিয়া ঐ গোড়া ও ধানের শিকড় মাটির সহিত ভাল করিয়া মিশাইয়া দেয়, তাহা হইলে ভূমির উর্ব্বরতা আরও একটু বৃদ্ধি পায়; কিন্তু উহারা ঐ কাজটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় অতীত হইলে পরে করে। তাহার ফলে কখন কখন ঐ গোড়াকাটায় উর্ব্বরাশক্তিবৃদ্ধির শক্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং সময় সময় জমীতেও অনেক আগাছা জন্মে। তবে শীতপ্রধান দেশে ভূমির উত্তাপবৃদ্ধির জন্য যতটা চেষ্টা করা আবশ্যক, এ দেশে তত আবশ্যক হয় না।

জমীর উত্তাপের আর একটা কারণ আছে; সেই কারণ—ভূগর্ভস্থ অগ্নি। পৃথিবীর মধ্যে ভীষণ উত্তাপ বা অগ্নি আছে, উহা উষ্ণপ্রস্রবণ ও আগ্নেয়গিরির উত্তাপে প্রকাশ পায়। খনির ভিতর প্রবেশ করিলে এই অগ্নির অস্তিত্ব বেশ বুঝা যায়; কারণ ভূগর্ভের যতই নিম্নে প্রবেশ করা যায়, ততই উত্তাপ অধিক অনুভূত হইয়া থাকে। তবে ভূস্তর বিশেষভাবে উত্তাপ বহন করে না। মাটির একদিক্ উত্তপ্ত হইলে অন্যদিকে সহজে উত্তপ্ত হইতে চাহে না। সেই জন্য সেই ভূগর্ভস্থিত অগ্নির তেজে ভূপৃষ্ঠ অগ্নিসম উত্তপ্ত হয় না,—কিন্তু উহার জন্য মৃত্তিকা অনেক স্থলে আবশ্যক উত্তাপ হইতে বঞ্চিত হয় না।

চাষের সম্পর্কে মাটির গুণাগুণের কথা যতই আলোচনা করা যায়, ততই ভগবানের প্রতি মানুষের ভক্তি বৃদ্ধি পায়। মাটিতে ভগবান্ চাষের উপযোগী ও আবশ্যক কতকগুলি বিশেষ গুণ দিয়াছেন, সে গুণ অন্য কোন দ্রব্যে দেখা যায় না। যে সকল ধাতবপদার্থ খাইয়া উদ্ভিদরা জীবনধারণ করে, সেই সকল জিনিস ধরিয়া রাখিবার গুণ মাটিতে অসাধারণভাবে লক্ষিত হয়। অন্যান্য জিনিসের ভিতর দিয়া যদি দ্রব্যবিশেষমিশ্রিত জল পরিশ্রুত করা যায়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য ঐ জিনিসের ভিতর আট্‌কাইয়া থাকে। মাটির ভিতর দিয়াও ঐরূপ জলে দ্রবীভূত কোন দ্রব্য ক্ষরিত করিলে উহা মাটিতে থাকিয়া যায়। অন্যান্য জিনিসের সহিত মাটির এই গুণ সাধারণভাবে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মাটির আর একটা অতি বিস্ময়কর গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল দ্রব্য উদ্ভিদরা আহার করে, মাটি তাহাই অতি বিস্ময়করভাবে টানিয়া লইতে পারে। যে সমস্ত ধাতবপদার্থ জলের সহিত এমনভাবে মিশাইয়া থাকে যে, অন্য কোন চূর্ণদ্রব্যের ভিতর দিয়া ঐ জল পরিশ্রুত করিলে অর্থাৎ ছাঁকিয়া লইলে তাহা জল হইতে পৃথক্ হয় না, যেমন জলের ভিতর ছিল, তেমনই জলের ভিতর থাকিয়া যায়; তাহা যদি মাটির ভিতর দিয়া ছাঁকিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা কেমন বিস্ময়করভাবে মাটিতেই থাকিয়া যায়। যে সকল ধাতবপদার্থ উদ্ভিদের আহার্য্য অর্থাৎ কার্ব্বন্ বা ক্ষার, হাইড্রোজেন্ বা উদজান, অক্সিজেন বা অম্লজান, নাইট্রোজেন, ফস্‌ফরাস্, সাল্‌ফার বা গন্ধক, পোটেসিয়াম্ ম্যাগ্‌নেসিয়াম্, লৌহ ও কলসিয়াম্—তাহা মাটি অতি বিস্ময়করভাবে শুষিয়া লইতে পারে। গাভী যেমন দোহনকারী গোয়ালার হস্ত হইতে দুধ চুরি করিয়া উহা আপনার বাছুরের জন্য রাখিয়া দেয়, ধরিত্রীও তেমনই জলের সহিত অতি গূঢ়ভাবে মিশ্রিত দ্রব্য কাড়িয়া আপনার অঙ্কে রাখিয়া দেন।

আবার আরও একটা বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মাটির ভিতর বা উপর দিয়া জল গড়াইয়া দিলে ঐ সকল ধাতবপদার্থ মৃত্তিকা হইতে ধৌত হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে আশঙ্কা অতি অল্প। কোন কোন জিনিস জলে কতক পরিমাণে ধৌত হইবার শঙ্কা আছে সত্য, কিন্তু মোটের উপর যে সকল পদার্থ উদ্ভিদের জন্য নিতান্তই আবশ্যক, জল তাহা মাটির নিকট হইতে বড় একটা কাড়িয়া লইতে পারে না। তবে কোন দ্রব্য কোন মৃত্তিকায় বেশী পরিমাণে থাকিলে মৃত্তিকা উহার কিছু জলকে দান করেন, জল যেখানের মাটিতে ঐ সকল দ্রব্য অল্প আছে, সেইখানের মাটিকে উহা দিয়া থাকেন। জল এইভাবে মৃত্তিকার সম্পদ্‌বণ্টনকার্য্য সমাধা করেন। ধরিত্রী প্রকৃতিরই রূপ—অপ্ বা জল নারায়ণ। প্রকৃতির বক্ষে নারায়ণের বা পুরুষের এই লীলায় বিশ্বের বৈচিত্র্য বিকশিত হইতেছে, ধরা ধন-ধান্য-পুষ্পভরা হইতেছে; প্রাকৃতিক চারুশোভায় ধরণীর অঙ্গ সুশোভিত হইতেছে, শ্যামল চেলাঞ্চলে মেদিনী মণ্ডিতা হইতেছেন,—লীলাময়ী প্রকৃতির ইহাই লীলা, কে বলে প্রকৃতি-অন্ধা—জড়া?

মৃত্তিকার মধ্যে কোন কোন প্রকারের মাটিই ঐ সকল উদ্ভিদের আহার্য্যপদার্থ আকর্ষণ করিয়া লইতে পারে। বালী ঐ সকল দ্রব্য এত অল্প পরিমাণে টানিয়া লইতে পারে যে, তাহা গণনার মধ্যেই আসে না। পক্ষান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রকমের কাদা, গলিত উদ্ভিদ ও জান্তবপদার্থমিশ্রিত মাটি উহা সহজেই টানিয়া শুষিয়া লইতে পারে।

মাটির যে সমস্ত গুণ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলা হইল। কথাগুলি জানিয়া রাখিলে কৃষিতত্ত্বের অনেক তথ্যই সহজে বুঝা যাইবে। মাটি নানাপ্রকারের আছে। অনেক সময় বাঙ্গালাভাষায় তাহার নাম করা বড় কঠিন। সেই জন্য বিভিন্ন প্রকারের মাটির কথা বুঝান বড় কঠিন হইবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের মাটির কথা জানা বড়ই দরকার। আগামীবারে সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। [ক্রমশঃ।

বঙ্গীয় কৃষক ও ধানের চাষ।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

বঙ্গদেশ ধান্যের চাষ ও আবাদের জন্য জগদ্বিখ্যাত। লক্ষ্মীর এমন উর্ব্বরক্ষেত্র আর কোন দেশে নাই। বঙ্গদেশে ধান্য সহস্র নামে ও সহস্র রূপে দৃশ্য হইয়া থাকে। চাষার আশার ধন-ভাণ্ডার—অন্নপূর্ণার রাজত্ব আর কোন দেশের কোন সংসারে এরূপ অক্ষয় অমরভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গভূমি যে সকল শস্যরত্ন প্রসব করেন, উহা পৃথিবীর সকল দেশের প্রাণস্বরূপ নীত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বরিশালের বালাম, বাঁশমতি, দিনাজপুরের কাটারি-ভোগ, দাদ্‌খানি, গোপালভোগ, ময়মনসিংহ শম্ভুগঞ্জের কালজিরা, ২৪ পরগণার বাঁকতুলসী, বর্দ্ধমান—বীরভূম—বাঁকুড়ার রামশাল, লঘু, আঁজাশাল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত।

(জমীতে লাঙ্গল দেওন)

বঙ্গদেশে প্রতিবৎসর এই সকল ধান্যের চাষ-আবাদ হইতেছে, প্রতিবৎসর দেশদেশান্তরে নীত হইতেছে। যাঁহারা একবার টেবলে রাখিয়া উহার সুধাময় অন্নের স্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা এ জন্মেও উহার নাম ভুলিতে পারেন নাই।

আমাদের দেশের স্থানবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ নিয়মের অধীন চাষ-আবাদের প্রথা প্রচলিত আছে। বড়োধান নয়া দুম্‌কা অঞ্চলে মাঘ মাসে চাষ হয়, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষকরা উহা গৃহজাত করে। নবীনাধান বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বুনিয়া তদ্দ্বারা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণে আমাদের দেশে নবান্ন করা হয়।

(জমীতে মই দেওন)

পূর্ব্ববঙ্গের মৃত্তিকায় যেরূপ প্রণালীতে চাষ আবাদ হয়, পশ্চিমবঙ্গের মৃত্তিকায় সেরূপ হয় না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী কৃষকরা বৃষ্টির জলের তত আশা করে না বা শস্যরক্ষার জন্য কোন জলাশয় হইতে বারিসেচন করিয়া ধান্যরক্ষা করিতে চেষ্টা করে না। পশ্চিমবঙ্গে ধান্যবৃক্ষ আনিয়া মৃত্তিকায় রোপণ করিতে হয়। রোপিত ধান্যকে রোয়া ধান্য কহে। ঐ ধান্য যথানিয়মে পাট করিয়া বপন করিলে পর বা বীজবপনের পর বৃষ্টি বা জলের আশায় ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া থাকিতে হয়; যদি ভগবানের ইচ্ছায় যথানিয়মে উপর্য্যুপরি বারিবর্ষণ হয়, তাহা হইলে আর কোন ভয় নাই, ক্রমশঃ ধান্যসকল বৃদ্ধি

পাইয়া সফল হইতে সমর্থ হইবে, আর যদি অনাবৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রের ধান্য ক্ষেত্রেই শুকাইয়া যাইবে কিম্বা অতিবৃষ্টি হইলেও সকল আশা-ভরসা ডুবিয়া যাইবে—কৃষকগণ কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িবে। কৃষ্ণনগর, খুলনা, ২৪ পরগণা, সুন্দরবন, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মানভূম, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ হইতে ক্রমশঃ এই ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

(মই দেওন—প্রকারান্তর)

কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে অর্থাৎ রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, বগুড়া, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ঢাকা প্রভৃতি স্থান সেরূপ প্রণালীর চাষের অধীন নহে, ঐ সকল স্থান অত্যন্ত উর্ব্বর, ঐ সকল স্থানীয় ক্ষেত্রসকলে চাষের দ্বারা মৃত্তিকা প্রস্তুত করিয়া ধান্যবীজ হস্তে করিয়া ছড়াইয়া দিলেই ধান্যসকল মাটীর গুণে উৎপন্ন হইয়া কৃষকের আশা পূর্ণ করিয়া থাকে।

(উর্ব্বরক্ষেত্রে বীজ ছড়ানো)

জলময় নোয়াখালি, বরিশাল, বাখরগঞ্জেও জলের অগ্রে অগ্রে ধান্য বৃদ্ধি পায়, বর্ষার জল যত বৃদ্ধি পায়, ধান্যও তৎসঙ্গে সঙ্গে তত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; তৎস্থানীয় এক একটি ধান্যবৃক্ষ ৩০।৪০ হস্তপরিমিত লম্বা হইতেও দেখা গিয়াছে। এই সকল স্থানীয় কৃষকেরা নৌকা বা ভেলায় উঠিয়া ধান্যচ্ছেদনপূর্ব্বক গৃহে আনিয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় পূর্ব্ববঙ্গেও আউস ও আমন দুই প্রকার ধান্যের চাষ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের মধুপুর প্রভৃতি গড়ের নিকট অতি *সুন্দর* আমন বা হৈমন্তিক ধান্যের উৎপত্তি হয়। ঢাকা হইতে জামালপুর পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত বনভূমি রহিয়াছে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম আউস ও আমন ধান্যের চাষ হইয়া থাকে; করটিয়ার জমীদারদিগের আটিয়া পরগণায়, নবাব গণি-মিঞা সাহেবের জামুর্কী পরগণায়, সন্তোষের কাকমারী পরগণায়, পুঁটিয়ার পুখরিয়া পরগণায়, নাটোরের বাজে তালুকে, ময়মনসিংহে বাজিৎপুর, হোসেনপুর ও জব্বরসাহি পর-

(ধান্যবীজ রোপণ)

গণায় যে সকল ধান্য ও পাট জন্মিয়া থাকে, তাহার তুলনা কোন দেশের সহিত করা যাইতে পারে না। এই সকল স্থানের কৃষকসম্প্রদায় ধন ও কৃষিসম্পদে সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারগণের যে এত ধনদৌলত, এই সকল পরিশ্রমী কৃষকরাই তাহার একমাত্র কারণ।

এতদ্ব্যতীত যমুনা, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদনদীসকলের বিস্তৃত চরাভূমিতে যে সকল রবিশস্যের ফলন হয়, তাহার

(পাটে পাটে নিড়ানা দেওন ও বাজে ঘাসাদি উন্মূলিতকরণ)

আর বিশেষ চাষ-আবাদ করিতে হয় না, ভূমিতে বীজের সংযোগমাত্রেই কলাই, মসুর প্রভৃতি ফসলসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমি কেবলমাত্র দূর্ব্বাঘাসের উপরে বিনা-চাষে মাঠময় মাষকলাই বুনিতে দেখিয়াছি। বিনালাঙ্গলে যমুনানদীর কোমল চরে কত শত পাটের আবাদ প্রস্তুত হইতে দেখা গিয়াছে; তথাকার কৃষকেরা নদীর চরাভূমি স্বল্পনিরিখে পাইলে আর কোথাও গিয়া বাস করিতে চাহে

না। তেওতার বাবুদিগের নদীগর্ভসম্ভূত উর্ব্বরাভূমিতে যে সকল শস্য উৎপত্তি হয়, এরূপ শস্যের সুন্দর বেশ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পূর্ব্ববঙ্গের পাহাড়পুর পরগণায় যেরূপ আমন ও আউস ধান্য জন্মে, আর কোথাও সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। দেলদুয়ারের মুসলমান জমীদার মহাশয়গণ ময়মনসিংহ জমীদারবর্গের মধ্যে অতিশয় পুরাতন বংশ। তাঁহাদিগের বংশেই

(ধান্যের আঁটি নিষ্পেষণে ধান্য পসান)

বগুড়ার ভূতপূর্ব্ব নবাব আবদুল সোকানের জন্ম হইয়াছিল; তিনি কৃষি ও কৃষক-প্রজাদিগের সম্বন্ধে অত্যন্ত বহুদর্শী ছিলেন। তিনি এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহোদয়, ইঁহারা দুই জনে যখন একত্র হইয়া মধুপুরের পাহাড়ে শীকারে বহির্গত হইতেন, তখন শীকারের স্থলে স্থানীয় কৃষকদিগকে ডাকিয়া তাহাদিগের নিকট কৃষির উন্নতিবিষয়ে বিবিধ মতামত সংগ্রহ করিতেন।

(গাদাজাতকরণ)

তাঁহাদিগের জমিদারীতে এ পর্য্যন্ত কখন দুর্ভিক্ষ হয় নাই। তাঁহারা বলিতেন, প্রজার অন্নাভাবে মৃত্যু রাজার পাপ না হইলে কখন হয় না।

কলিকাতার রাণী রাসমণীর বাতাসন পরগণায় এ পর্য্যন্ত সোণা ফলিয়া আসিয়াছে। রাজসাহীবিভাগে চলনবিল এখন চাষ আবাদে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গে আজকাল চাষের জমী সংগ্রহ করা সহজ নহে। ভূতপূর্ব্ব মহাত্মা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর এবং মহারাজ স্যর জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঙ্গদেশে সুবর্ণ ও সঞ্চিত কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষাও জমীদারীর আদর করিতেন। তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে শ্রীহট্ট ইত্যাদি বহু স্থানে বহু জমীদারী ক্রয় করিয়া গিয়াছেন।

উভয় বঙ্গের চাষীরাই বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমভাগে আউস ও আমন দুই প্রকার চাষের আবাদ করে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে আউস ধান্য কাটিয়া লয়, তৎপর অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে হৈমন্তিক আমন ধান্য সংগ্রহ করে। পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকেরা প্রথমতঃ লাঙ্গল দিয়া জমী প্রস্তুত করে, লাঙ্গলের কার্য্য শেষ হইলে সেই সকল কঠিন ডেলামৃত্তিকাগুলি ইটা মুগুর দিয়া ভাঙ্গিতে থাকে, ইটা মুগুরের কার্য্য শেষ হইলে এক বার কি দুই বার মই দিয়া মৃত্তিকা সমান করিয়া থাকে, তার পর জমীর আবর্জ্জনা ফেলিবার জন্য আর একপ্রকার চিকণ মই ব্যবহার করে। এইরূপে জমী প্রস্তুত করা শেষ হইলে শুভদিন দেখিয়া ধান্য বপন করে। কোথাও বা সঞ্চিত

(ঝাকণীযন্ত্রে ধানগুলি একত্রীকরণ)

ধান্যবৃক্ষ কাদামাটী হইতে উত্তোলন করিয়া জমীতে রোপণ করিতে থাকে। এ আখ্যায়িকায় ধান্য রোপণের ও বপনের এবং মৃত্তিকাচাষের কয়েকপ্রকার চিত্র যথাক্রমে পাঠকদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রকাশিত হইল।

অতঃপর ধান্যবৃক্ষসকল আট অঙ্গুলি বা অর্দ্ধহস্তপরিমিত বর্দ্ধিত হইলে উহাদিগকে সরল ও পাত্‌লা পাট করিবার জন্য চিরুণী-মই ব্যবহৃত হয়, তৎপর ধান্যবৃক্ষ একহস্ত পরিমিত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে পাটে পাটে নিড়াইয়া দিতে হয় অর্থাৎ ধান বিলি করিয়া বাজে ঘাস ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলিতে হয়, পুনর্ব্বার এক মাস অন্তে আর এক বার নিড়ানী দিতে হয়, তারপর ধান্যবৃক্ষসকল বৃদ্ধির সহিত বীজ গর্ভধারণ করিয়া ক্রমশঃ শীস্ উৎপাদন করিতে থাকে। উক্ত শীস্ উৎপাদনের সময় কৃষকদিগকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়, এই সময়ে ধান্যক্ষেত্রে অনেক প্রাকৃতিক শত্রুর আমদানী হয়, কোথাও বা ইন্দুরে বাঁদরে শত্রুতা করে, কোথাও বা কীটপতঙ্গাদিতে ধান্য খাইয়া ফেলে, আবার কোথাও বা বন্য পঙ্গপাল আসিয়া সকল আশার ধন ও

পরিশ্রমের ফল একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু জগদীশ্বরের কৃপায় এবং কৃষকদিগের পুণ্যবলে সচরাচর তাহা ঘটিতে পারে না, কৃষকেরা এই শুভফলপ্রাপ্তির সময় মাঠের গর্ভেই ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া নিত্য নিয়মিত ক্ষেত্ররক্ষার জন্য তন্মধ্যে বাস করিতে থাকে।

যখন ধান্যসকল সুপক্ক হইয়া পীতবর্ণমুখে পৃথিবীর দিকে নত হয়, তখন তাহাদিগকে ছেদনের উপযোগী মনে করিয়া কৃষকেরা কাস্তেদ্বারা আস্তে আস্তে ছেদন করিয়া গুছাইয়া ধান্যের আঁটি বাঁধিতে থাকে এবং তাহাদিগকে

(ধান্যসিদ্ধকরণ)

বহন করিয়া নিজ নিজ কুটীরে লইয়া যায়। সমস্ত ক্ষেত্রের ধান্য ছেদন করা শেষ হইলে ঐ সকল ধান্যবৃক্ষ যথানিয়মে গৃহের প্রাঙ্গণে উপর্য্যুপরি ফেলিয়া তদুপরি, ৩।৪টি বলদ আনিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ধান্য মলাইতে থাকে, যখন ধান্যসকল নিঃশেষ হইয়া খড়ের নিম্নদেশে পড়িয়া যায়, তখন খড়গুলি স্বতন্ত্র করিয়া তুলিয়া রাখে এবং ধান্যসকল ঝাকুনীযন্ত্রদ্বারা একত্র করিতে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গে ধান্যের আঁটি নিষ্পেষণ করিয়া ধান্য খসাইয়া লয় এবং খড়ের আঁটি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বাঁধিয়া রাখে। এই প্রকারে ধান্যবৃক্ষ হইতে ধান্য পৃথক্ করা হইলে ঐ সকল ধান্য সিদ্ধ করিতে দেওয়া হয়। কৃষকপত্নীগণ একমনে বসিয়া ধান্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন এবং তৎপর উহাদিগকে বিস্তৃত শুষ্কভূমিতে ফেলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে দেওয়া হয়, ধান্য শুষ্ক হইবার পর উহাদিগকে যথানিয়মে গোলাজাত করা হয় কিংবা চাউলপ্রস্তুতের জন্য ঢেঁকীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ঢেঁকী যন্ত্র হইতে ধান্যসকল কুলাদ্বারা ঝাঁটিয়া তুঁষবিহীন হইলে চাল প্রস্তুত হয়, সেই সকল চাল বাজারে বিক্রয় হয় এবং আমরা গৃহস্থমাত্রেই ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা প্রাণরক্ষা করিয়া থাকি।

(ঢেঁকীযন্ত্রে চাউল প্রস্তুত)

কলিকাতার বাজারে যে সকল চাউল বিক্রয় হয়, উহার অধিকাংশই ভালমন্দে মিশ্রিত। আমরা আসল নিখুঁত চাউল সহজে পাইতে বা খাইতে পাই না, সুচতুর ব্যবসায়িগণ লাভের জন্য উহাতে নানাপ্রকার বৈদেশিক স্বল্পমূল্যের চাউল মিশাইয়া দিয়া বিকৃত বস্তু করিয়া থাকে।

ধান্যবৃক্ষসকল ছেদন করিয়া গৃহে আনার পর কৃষকদিগের যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের বিষয় লিখিত হইল, তৎসম্বন্ধে এক একখানি চিত্র এতৎসহ প্রকাশিত হইল, পাঠকগণ ইহা দ্বারা কৃষিবিষয়ক ধান্যচাষের ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝিয়া লইতে পারিবেন। [ক্রমশঃ।

ম্যালেরিয়া।

[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

লোকক্ষয়।

সকল ব্যক্তিই নিজ নিজ আয়-ব্যয়ের হিসাবনিকাশ করিয়া থাকেন; আমরা যদি সমস্ত বাঙ্গালাদেশটাকে একটা বিরাট পরিবার মনে করিয়া একবার হিসাব লই যে, এই পরিবারের মধ্যে বৎসরে বৎসরে কত লোক জন্মাইতেছে ও কত লোক মৃত্যুমুখে পড়িতেছে, আর এই জমা (জন্ম) ও খরচের (মৃত্যু) নিকাশ করি, তবে স্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে যে, আমরা উৎসন্নের পথে যাইতেছি। বিলাতের তুলনায় হিসাবটা একবার খতাইয়া দেখুন :—

(১) ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ বাৎসরিক—

জন্মসংখ্যা	...	২৮.৬
মৃত্যুসংখ্যা	...	১৫ ৪
লোকবৃদ্ধির হার	...	১৩ ২

(২) পশ্চিমবঙ্গে (বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর, হুগলী, হাবড়া)।

জন্মসংখ্যা	...	৩৫.২
মৃত্যুসংখ্যা	...	৩২.৭
লোকবৃদ্ধির হার	...	২.৫

(৩) পূর্ব্ববঙ্গে (ঢাকা, ময়মনসিং, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, নোয়াখালি)।

জন্মসংখ্যা	...	৪০.৫
মৃত্যুসংখ্যা	...	৩০.৫
লোকবৃদ্ধির হার	...	১০.০

আমরা শুধু ইংলণ্ডের সহিত বাঙ্গালাদেশের জন্ম-মৃত্যুর তালিকার তুলনা করিলাম; কিন্তু অপরাপর পাশ্চাত্যদেশেরও যা অবস্থা, এ সম্বন্ধে ইংলণ্ডেরও প্রায় সেই অবস্থা ; যথা—

			হাজারকরা লোকবৃদ্ধি।
প্রুসিয়া	...	...	... ১৩
নিউজীলণ্ড	...	...	... ২১ ৮
অষ্ট্রেলিয়া	...	...	... ১৮.৬
মার্কিণ যুক্তরাজ্য	...	...	... ২১

আদমসুমারির তালিকা দেখিলে সর্ব্বপ্রথমেই এই ভীষণ সত্যটি আমাদের উপলব্ধি হয় যে, আমরা ধ্বংসোন্মুখ জাতি। বাঙ্গালীদের মধ্যে জন্ম-মৃত্যুর জমাখরচ করিলে লোকক্ষয়েরই বেশী প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহার পরে যদি কি কি ব্যারামে লোক মরিতেছে, আমরা তাহা অনুসন্ধান করি, তবে দ্বিতীয় সত্যটি এই দাঁড়ায় যে, সমস্ত বাঙ্গালাদেশে যত লোক ব্যারামে মরে, তাহার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ শুধু ম্যালেরিয়ারোগেই মরে।

আমরা কোথাও প্লেগ হইয়াছে শুনিলে শিহরিয়া উঠি এবং দলে দলে সেই গ্রাম পরিত্যাগ করি; ওলাউঠা হইয়াছে শুনিলে, খাদ্যপেয় নির্ব্বাচনের ও জল ফুটাইবার ধূম পড়িয়া যায়; ইচ্ছা-বসন্ত হইয়াছে শুনিবামাত্র টীকায় দেহ স্বেচ্ছায় ক্ষতবিক্ষত করি, সর্পদংশনের কথা শুনিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ি, কিন্তু কোথাও ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া ধরিতেছে শুনিলে—এমন কি, স্বপরিবারের মধ্যে প্রত্যেক জনে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইলেও, আমরা কোনও রকম ভয় পাই না,—আমরা কেবল অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই এবং একটা অবশ্যম্ভাবী ক্ষণিক অশান্তি মনে করিয়া, সে সমগ্র ব্যাপারটাকেই একপ্রকার উপেক্ষা করি! অথচ, সমস্ত বাঙ্গালাদেশে প্লেগ, কলেরা, ইচ্ছা-বসন্ত ও সর্পদংশনে যত লোকক্ষয় হয়, একা ম্যালেরিয়ায় তদপেক্ষা বেশী লোকক্ষয় হইয়া থাকে। আমরা বিপদের সঙ্গে বহুকাল একত্র বাস করায়, বিপদ্‌কে আর বিপদ্ বলিয়াই মনে করি না,—বরং তাহাকে অবশ্যম্ভাবী নিত্য-সহচর মনে করিয়া থাকি। এই অদৃষ্টবাদিতাই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল—এই বিপদ্‌কে তুচ্ছজ্ঞান করাই আমাদের ধ্বংসের কারণ। এই ধ্বংসকার্য্য কোন সুদূর অতীত-কালে আরব্ধ হইয়াছে—এখনও সম্মুখে অনন্ত ভবিষ্যৎকাল পড়িয়া রহিয়াছে! সুতরাং আমরা পরে সাম্‌লাইয়া উঠিতে পারিব—এ আশাও দুরাশা। যেহেতু, চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে যে স্থান স্বাস্থ্যকর ছিল, এখন সেগুলি ভীষণ ম্যালেরিয়াকবলিত। পূর্ব্বে হাওয়া বদ্‌লাইবার জন্য লোক ব্যাণ্ডেল্, হুগলী, চুঁচুড়া, বর্দ্ধমান সহরে, কৃষ্ণনগর সহরে, বারাসত সহরে যাইত, এখন ঐ সকল সহর ভীষণ ম্যালেরিয়ার লীলাক্ষেত্র! কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশকে পরমস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া জ্ঞান করিতাম, এখন ঐ প্রদেশও ক্রমশঃ সে মর্য্যাদা হারাইতে বসিতেছে অর্থাৎ একদিকে যেমন ম্যালেরিয়ার অতি বিস্তৃতি ঘটিতেছে, অন্যদিকে তেমনই শনৈঃ শনৈঃ স্বাস্থ্যকর স্থানগুলিব্যারামের কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে;—ভবিষ্যতে যে কোথায় পীড়িত ব্যক্তিরা আশ্রয় লইবে, তাহা বলা কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। যুদ্ধের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, ম্যালেরিয়া-শত্রু একদিকে যেমন আমাদের লোকক্ষয় করিতেছে, অপরদিকে সেই সঙ্গে আমাদের দখলের গ্রাম-গুলি একে একে কাড়িয়া লইতেছে! এখন "বল মা তারা,

দাঁড়াই কোথা!"—এই অবস্থা আসিয়া পড়িতেছে। যে ব্যাধির ক্ষমতা এতই দুর্দ্ধর্ষ, যাহার প্রভাবে আজ বাঙ্গালার পল্লীভবন নীরব, বাঙ্গালার শিল্পবাণিজ্য ম্লান, বাঙ্গালার মাঠ, ঘাট ও দেবালয়—জঙ্গল ও বন্যজন্তুর আশ্রয়স্থান, আমরা কোন্ সাহসে ভর করিয়া, কোন্ সুদূর সুখরশ্মি উন্মেষের প্রতীক্ষায় আজ শান্তভাবে বসিয়া আছি?

বাঙ্গালাদেশে ম্যালেরিয়া।

ইংরাজরাজত্বের প্রথম আমলে মধ্যবাঙ্গালা ব্যতীত তাবৎ বাঙ্গালাদেশই স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। তবে পুরাতন ইতিবৃত্ত হইতে যত দূর সংগ্রহ করা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, স্থানবিশেষ অস্বাস্থ্যকর ছিল; যথা—গৌড়, দিনাজপুর, কাশিমবাজার, কলিকাতা প্রভৃতি। স্থানবিশেষে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ থাকিলেও, কখনও উহা মহামারীরূপ ধারণ করিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে দ্রুতবিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই। অকস্মাৎ খৃষ্টাব্দ ১৮২৪ হইতে একটি ভীষণ ম্যালেরিয়ার স্রোত বন্যার স্রোতের ন্যায় সমস্ত বাঙ্গালাদেশের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছিল; সেটিকে তৎকালে লোকে বর্দ্ধমানের জ্বর বলিত। সেটির বিস্তৃতির কথঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত এই:—

১৮২৪ খৃষ্টাব্দে—যশোহরে (সহরে) ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হয় এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বরাবর যশোহর জেলায় উহা বিস্তৃতিলাভ করে।

১৮৩৩—৪০—গদখালি।

১৮৪৫—বনগ্রাম ও চক্রদহ (চাকদা।)

১৮৫৪—৫৫ খৃষ্টাব্দে—নদীয়া জেলায়। এই সময়েই উলা (বর্দ্ধমান বীরনগর) গ্রামটিতে মহামারীর আকারে উহা দেখা দেওয়ায় ঐ গ্রামটি একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে।

১৮৫৭—৬৪ খৃষ্টাব্দে—চব্বিশ পরগণায় ও কলিকাতার উপকণ্ঠে।

১৮৬২—৬৩ খৃষ্টাব্দে—বর্দ্ধমান জেলায়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান সহরে।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে—মেদিনীপুর জেলায়।

১৮৭১—৭৩ খৃষ্টাব্দে—পূর্ণিয়া, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলায়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে—উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে, পাঞ্জাবপ্রদেশে ও বোম্বাই সহরে।

একদিকে যেমন ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত দেওয়া হইল, সেই সঙ্গে বাঙ্গালাদেশের দুই তিনটি প্রধান ভৌতিক-পরিবর্ত্তনের তারিখটাও লেখা আবশ্যক।

বাঙ্গালাদেশে সর্ব্বপ্রথমে রেলবিস্তৃতি হয়—খৃষ্টীয় ১৮৫১ সালে।

পথ ঘাট ভাল করিয়া করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশে পূর্ত্ত-বিভাগ (P. W. D.) স্থাপিত হয় খৃষ্টীয় ১৮৫১ সালে।

নদীমাতৃক বঙ্গদেশে ষোড়শ শতাব্দীতে "ভাগীরথী"ই গঙ্গার প্রধান অঙ্গ ছিল, ক্রমশঃ গঙ্গা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া পদ্মার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। ইহার ফলে ভাগীরথী ক্ষীণস্রোতা—ভৈরবনদের বারো আনা গত—কটকী, নবগঙ্গা, পাঙ্গাশ, কালীগঙ্গা প্রভৃতি শুষ্ক! গঙ্গা ও পদ্মা একত্রে মিলিত হওয়ার ফলে, গড়াই নদীর বিবৃদ্ধি হইয়াছে এবং মধুমতী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে। ভূমিকম্পকে লোক গঙ্গার ঈদৃশ গতিপরিবর্ত্তনের কারণ নির্দ্দেশ করেন।

বাঙ্গালাদেশের বিখ্যাত ভূমিকম্প খৃষ্টীয় এই এই বৎসরে হইয়াছিল:—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ও ১৮৯৭। দুর্ভিক্ষের বৎসর—১৮৩৮ (উঃ পঃ), ১৮৬০—৬১ (উঃ পঃ), ১৮৬৬ (উড়িষ্যা ও বাঙ্গালা), ১৮৭৪ (বেহার), ১৮৭৭ (মান্দ্রাজ), ১৮৯৭ (মধ্যপ্রদেশ)।

এগুলির সহিত ম্যালেরিয়ার সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা পরে বিবেচ্য।

ম্যালেরিয়া ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে নিবার্য্য।

ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়ার অতিবিস্তৃতি ঘটিলেও, আজ সভ্যজগতের অনেক স্থান হইতেই ম্যালেরিয়া বিতাড়িত। বহুবর্ষ পূর্ব্বে ইংলণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত কেমন করিয়া হইয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই; তবে বর্ত্তমানকালে সভ্যজগতের কোন্ কোন্ অংশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। নিম্নে তন্মধ্যে প্রধান প্রধান স্থানগুলির তালিকা দিলাম:—

য়ুরোপে—গ্রীস (Greece)।
ক্যাম্পানা (Roman Campagna)।
আফ্রিকায়—ইস্‌মেলিয়া (Ismalia) ১৯০১-২ অব্দে।
ট্যাঙ্গা (Tanga)।
দার-এস্‌-সালেম (Dar-as-Saleum)।
স্বাধীন কঙ্গোরাজ্য (Congo Free State)।
এসিয়ায়—হংকং (Hong-Kong)।
ক্ল্যাং (Klang) ১৯০২ অব্দে।
সোয়েটেন্‌হ্যামবন্দর (Port Swettenham) ১৯০২।
আমেরিকায়—হাভানা (Havana)।
প্যানামা খাল (Panama Canal) ১৯০৭।
আটলান্টিক সহর (Atlantic City)।
নিউ অর্লিন্স (New Orleans)।
ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ (Phillipines)।

এই তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর কোনও স্থানবিশেষ হইতে নহে, সর্ব্বত্র হইতেই ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে—কেবল সেদিন অর্থাৎ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের

পর হইতে। এই তালিকা দেখিলে আরও বুঝা যায় যে, একটি সুবিধাজনক স্থান হইতে অনুকূল অবস্থায়—অকস্মাৎ অদৃষ্টবলে নহে—বিজ্ঞানের ধ্রুব সত্যের উপরে নির্ভর করিয়া—আজ ম্যালেরিয়া অনেক স্থান হইতেই বিতাড়িত হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম—দুইটি সার সত্যকথা প্রত্যেক বাঙ্গালীরই মনে ধারণা করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যথা—

(১) ম্যালেরিয়াতে কাহারও ভুগিবার কথা নহে—আকস্মিক দুর্ঘটনার ন্যায় উহা সম্পূর্ণরূপে নিবার্য্য ব্যাধি।

(২) ম্যালেরিয়া দমন ও নিবারণের উপায়গুলি বিজ্ঞানের সত্যের উপরে স্থাপিত; উহাতে অনিশ্চিত কিছুই নাই।

এ সম্বন্ধে ইতালীর দৃষ্টান্ত জগতের পক্ষে অনুকরণীয়। ইতালীর একটি অংশবিশেষের নাম ক্যাম্পানা। ইহা বঙ্গদেশের ন্যায় নিম্ন আর্দ্রভূমি এবং এখানে ধানের চাষও বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় সেখানে ম্যালেরিয়া যথা তথা। ইতালী-নরেশ উপর্য্যুপরি কয়েকটি আইন খৃষ্টীয় ১৯০০ হইতে ১৯০৪ অব্দের মধ্যে পাশ করেন। তাহার ফলে কুইনিন সুলভ সহজপ্রাপ্য হয় এবং ম্যালেরিয়াপীড়ার অজুহাতে কর্ম্ম হইতে অনুপস্থিতির জন্য বেতন বন্ধ করা হয়। তাহার ফলে এবং আনুসঙ্গিক অপরাপর ব্যাপারের ফলে আজ ঐ প্রদেশ একপ্রকার ম্যালেরিয়ামুক্ত, এ কথা স্বীকার করা যায়।

ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য কি করা হইয়াছে ?

এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট এই এই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যথা—প্রথমতঃ তথ্যানুসন্ধান।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ডেভিড্ উইস্কি বর্দ্ধমানের জ্বরে তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

১৮৯৬—১৯০৬ স্যর্ লিওনার্ড রজার্স ম্যালেরিয়া ও তথ্যানুসন্ধানে রত থাকেন।

১৯০৬ বাঙ্গালা পয়ঃপ্রণালীর কমিসন (Drainage commission) বসে, ডাক্তার ষ্টুয়ার্ট ও প্রক্টর ম্যালেরিয়া-তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

১৯০৮—০৯ মেজর ফষ্টরের ম্যালেরিয়া তথ্যানুসন্ধান। ডাক্তার ফ্রাই ঐ করেন।

দ্বিতীয়তঃ।—সস্তায় ও সহজে লোকের মধ্যে কুইনিন-বিক্রয়। ১৮৯২ অব্দে ইহার প্রবর্ত্তনা হয় এবং এখনও উহা চলিতেছে। তৃতীয়তঃ—জঙ্গল কাটান। ১৮৬২ অব্দে বারাসতে, ১৮৬৮ অব্দে যশোহরে, ১৮৭৩ অব্দে উলা, নদীয়া, হুগলী, বনগ্রাম ও দমদমাতে এবং ১৯০৯-১২ অব্দে দিনাজপুরে এই কার্য্য করান হয়। কিন্তু কোনও সুফল ফলে নাই। এই সঙ্গে ১৮৭৩ অব্দে কপোতাক্ষের বাঁধ বাঁধান হয়,উদ্দেশ্য উহার জল যাহাতে বারিসম্পদ্‌হীন ভৈরব-নদের গর্ভে পুনঃপ্রবাহিত হইতে পারে এবং উলা, নদীয়া, দমদমা, হুগলী ও বনগ্রামে জঙ্গল কাটানর সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ লইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ডাক্তার পাঠান হয় (Travelling Dispensary)। মণিরামপুর, মুর্শিদাবাদ ও মহেশপুরেও এই জঙ্গল কাটান হইয়াছিল। চতুর্থতঃ জল-নিকাশের পথ করিয়া ১৯০১ অব্দে মিয়ানমিরে, ১৯০৯-১২ অব্দে দিনাজপুরে, ১৯০৮ অব্দে কাশীপুর—চিৎপুরে।

ফলকথা, ভারতবর্ষে বা ভারতবর্ষের কোনও অংশ-বিশেষে ধারাবাহিকরূপে ম্যালেরিয়া-বিতাড়নের কল্পনাও করা হয় নাই—কাজেই ম্যালেরিয়া নিয়তই বাড়িতেছে।

ম্যালেরিয়া কি ?

এ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিলাম যে, ম্যালেরিয়ায় আমরা উৎসন্নে যাইতেছি এবং ম্যালেরিয়া সম্পূর্ণরূপে নিবার্য্য ব্যাধি। এক্ষণে বিবেচনা করা যাউক, ম্যালেরিয়া কি? জনসাধারণের দিক্ হইতে বলিতে হইলে, যে জ্বর কম্প দিয়া হঠাৎ আইসে ও ঘাম দিয়া ছাড়ে এবং যাহার ফলে শরীরে রক্তাল্পতা ও প্লীহার বিবৃদ্ধি হয়, তাহাই ম্যালেরিয়া। ডাক্তারীর দিক্ হইতে দেখিতে হইলে প্রথমে মনে রাখিতে হইবে যে,প্লাজমোডিয়াম (Plasmodium or Hæmatozoon Malariæ) নামক এক প্রকারের জীবাণুর বিষক্রিয়ার ফলই ম্যালেরিয়া। দ্বিতীয়তঃ, ম্যালেরিয়া-জীবাণু দেহস্থ হইলেই যে জ্বর হইবে বা প্লীহার বৃদ্ধি হইবে, এমন কথা নাই। তৃতীয়তঃ, কম্পজ্বর ও প্লীহার বিবৃদ্ধি হইলেই যে ম্যালেরিয়া হইল, তাহাও সত্য নহে এবং চতুর্থতঃ, এ দেশে কালাজ্বর (Kala Azar) বহুল পরিমাণে হইয়া থাকে। অনেকের ধারণা আছে যে, আসামে ভিন্ন কালাজ্বর দেখা যায় না। কিন্তু সেটি ভ্রান্তিমূলক ধারণা। বাঙ্গালার বহুস্থানে, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ উপকূলে এবং তরাই প্রদেশে কালাজ্বর প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রক্তপরীক্ষা ব্যতীত অনেক সময়ে ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রভেদ করা দুরূহ। শুধু চেহারা দেখিয়া বা লক্ষণ দেখিয়া অনেক সময়ে ম্যালেরিয়া কি কালাজ্বর বলা সম্ভবপর নহে। সময়ে সময়ে এই উভয় ব্যাধির প্রথমাবস্থা একই আকার ও লক্ষণ ধারণ করে; শুধু তাহাই নহে, কালাজ্বরে প্লীহা-যকৃতের বৃদ্ধি আদৌ ঘটে না।

বর্দ্ধমান, যশোহর, উলা, গৌড় প্রভৃতি যেখানে সেখানে ভীষণ ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইয়াছিল; অনেকের ধারণা, সেগুলি প্রকৃত ম্যালেরিয়া নহে—সেগুলি আসল কালাজ্বরই হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে রজার্স সাহেবের এই মত এবং এই-মতের উপরে নির্ভর করিয়া তিনি যশোহর হইতে

নদীয়া, তথা হইতে বর্দ্ধমান, তথা হইতে ১৮৭৫—৮৩ সালে গ্যারো প্রদেশে, ১৮৮৮ অব্দে খাসিয়া পর্ব্বতে, ১৮৮৯—৯৬ অব্দে কামরূপে, ১৮৯১—৯২ অব্দে নওগাঁয়ে এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মপুত্রের উভয় উপকূলবাহী পথ ধরিয়া ১৮৯১—৯৮ অব্দে আসামের দারাং (Darrang) পর্য্যন্ত লোকচলাচলের বা বাণিজ্যের পথ বাহিয়া কালাজ্বরকে আসামে উপনীত করিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে, ১৮৬০—৭৬ এই ষোড়শবর্ষ ব্যাপী তথাকথিত ম্যালেরিয়া মহামারী—প্রকৃতপক্ষে ম্যালেরিয়া মহামারী নহে—কালাজ্বরের তাণ্ডব নৃত্য। যদি তাঁহার যুক্তি যথার্থ হয়, তবে এইটি বেশ বুঝা যায় যে, ম্যালেরিয়া (বা কালাজ্বর) লোকচলাচলের পথ ধরিয়া ক্রমশঃই অগ্রসর হইয়াছে। তবে যেখানে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ শুষ্ক বা উচ্চ হইয়াছে (যথা—ছোটনাগপুর অঞ্চলে) বা যেখানে বিস্তৃত নদীর ব্যবধান মিলিয়াছে (যথা—পদ্মায়) কেবল সেই সেই স্থানেই ম্যালেরিয়ার গতি প্রতিহত হইয়াছে—উহার প্রকোপ মৃদু হইয়াছে। কিন্তু আমার ধারণা এই যে, কোনও দেশে নূতন কোনও কঠিন ব্যাধির আগমন হইলেই, প্রথমে বহু লোকক্ষয় অবশ্যম্ভাবী; সে দেশে সে ব্যাধি কিছুকাল স্থায়ী হইলে তখন আর তাদৃশ লোকক্ষয় হয় না। এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে এ যাবৎ যে জ্বরের স্রোত সমস্ত বাঙ্গালাদেশকে ১৮৬০—৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিয়াছে, তাহা ম্যালেরিয়া হওয়া অসম্ভব নহে—তাহাকে এতকাল পরে কালাজ্বর কল্পনা করিবার হেতু নাই। আমার যুক্তির অনুকূলে দুইটি নিত্যদৃষ্ট ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি; প্রথম—যে দেশে ম্যালেরিয়া বহুকাল হইতে আছে, সে দেশের লোকের রক্তপরীক্ষা করিলে ম্যালেরিয়া-জীবাণু তাহাদের দেহে বর্ত্তমান আছে, প্রমাণ করা সহজ—অথচ ঐ সকল নিত্য-ম্যালেরিয়া-জীবাণুবাহী লোকেরা একদিনের জন্যও অসুস্থ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যে দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ চলিতেছে, সে দেশে হঠাৎ সুস্থ ব্যক্তি কেহ যাইলে সেই আগন্তুকই সর্ব্বাগ্রে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভুগিয়া থাকে।

যাহাই হউক, স্থূলতঃ কম্পজ্বরবিশিষ্ট ও বর্দ্ধিত প্লীহাসংযুক্ত ব্যাধিকেই আমরা ম্যালেরিয়া বলি। কালাজ্বরকে ডাক্তারেরা **Leishman-Donovan Infection** (সংক্ষেপতঃ **L. D.**) বলিয়া থাকেন।

ম্যালেরিয়ার স্বরূপ।

প্লীহাসংযুক্ত কম্পজ্বর ম্যালেরিয়ার সাধারণ মূর্ত্তি হইলেও, ম্যালেরিয়ার অপর কয়েকটি প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি আছে। অকস্মাৎ জ্বর হইয়া চৈতন্যলোপ হইয়া সত্বর মৃত্যু—ম্যালেরিয়াতেও ঘটিয়া থাকে। এ রোগগুলিকে দেখিলে প্লেগগ্রস্ত বা সান্নিপাতিক (Apoplexy) বা মস্তিকাবরক প্রদাহযুক্ত (Meningitis) ব্যাধি বলিয়া ভ্রম হয়—কিন্তু ফলে উহা ম্যালেরিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। সময়ে সময়ে রক্ত-মল, প্রত্যহ ঠিক একই সময়ে মাথাধরা বা স্নায়ুশূল হওয়া (যথা (Sciatica) প্রভৃতিও ম্যালেরিয়া—খাঁটি ম্যালেরিয়া, তাহার ফল বা উপসর্গ নহে। আমরা যক্ষ্মারোগকে ভয় পাই—কিন্তু যক্ষ্মার ন্যায় ম্যালেরিয়াতেও আমরা দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হই। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী জীবন্তে মৃত্যুভোগ করে,—তাহার ক্ষুধা, কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও ক্ষমতা, দেহের বল, শারীরিক পুষ্টি, মানসিক স্ফূর্ত্তি—একে একে এবং বহুকাল ধরিয়া, ক্রমে ক্রমে সকলই যায়—সে যক্ষ্মারোগীর ন্যায় ক্রমশঃই গলিয়া যাইতে থাকে।

ঐতিহাসিক কথা।

Mala (মন্দ), **Aria** (বায়ু), এতদুভয় ইতালীয় বাক্যের সংযোগে ম্যালেরিয়া কথার উৎপত্তি হইয়াছে অর্থাৎ দূষিত বায়ু সেবন করিলে ম্যালেরিয়া হয়, এই ভ্রান্ত-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধির ম্যালেরিয়া নামকরণ করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-সৈনিক-বিভাগের চিকিৎসক ল্যাভেরান্ (Laveran) ইহার প্রকৃত কারণভূত জীবাণুটির আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই মহামতি স্যর্ প্যাট্রিক ম্যান্‌সন্ (Manson) বলেন যে, মশকই যে উক্ত জীবাণুর বাহন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ নাই; তিনি যুক্তি ও অনুমানের বলেই হউক বা মনীষার কিংবা কবি-কল্পনার বলেই হউক, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ডাক্তার রোণাল্ড রস্ (Ronald Ross) মহোদয় ম্যান্‌সন্ সাহেবের কথার যথার্থতা প্রমাণ করিয়া নিজেও ধন্য হইলেন এবং সমগ্র ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জগৎকে কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিলেন। ম্যালেরিয়ার জীবাণু যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর দেহ হইতে মশককর্ত্তৃক সুস্থ ব্যক্তির দেহে নীত হয়, ডাক্তার রস্‌ই তাহার প্রমাণকর্ত্তা।

ম্যালেরিয়ার কারণ।

বাল্যে যে কুসংস্কার একবার মাথায় ধারণা হইয়া গিয়াছে, বহু বৎসরের শিক্ষার ফলে সে কুসংস্কার বিদূরিত হয় না। তেমনই আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে ম্যালেরিয়া-সম্বন্ধে যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে, সেইটাকে দূর করা এক রকম অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সকল ব্যক্তিই মনে করেন যে, দূষিত বায়ুসেবন ও জলপান করিলেই ম্যালেরিয়া হয়—মশকের ব্যাপারটা ষোল আনাই ধাপ্পাবাজী। অথচ, উপরে যে সকল দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিতাড়িত হইয়াছে বলিয়া তালিকা দিয়াছি, প্রত্যেক যায়গাতেই মশককুল নির্ম্মূল করিয়াই তবে ম্যালেরিয়াকে ধ্বংস করিতে পারা গিয়াছে। এই জন্য পাঠক মহাশয়দিগের প্রতি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এই,—যেন তাঁহারা স্ব স্ব পূর্ব্বসংস্কারের অভিমানের ভরা লইয়া অতল

ম্যালেরিয়াসাগরে নিমগ্ন না হন, নিরপেক্ষভাবে আমার কথাগুলির সত্যাসত্যসম্বন্ধে যত্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন। কারণ, পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অপরাপর ব্যাধিসম্বন্ধে যত দূর সন্দিহান থাকুক না কেন, ম্যালেরিয়ার কারণসম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ম্যালেরিয়া-নিবারণসম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত থাকিতে পারে—কিন্তু ম্যালেরিয়া কেন ও কেমন করিয়া হয়, এ সম্বন্ধে সভ্যজগৎ একমত।

ম্যালেরিয়ার কারণ—একটি আনুবিক্ষণিক জীবাণু। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার ল্যাভেরান্ (Laveran) কর্ত্তৃক উহা প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু তৎকালে কেহ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করেন নাই। পরে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের ডাক্তার রোণাল্ড রস্ (Ronald Ross) ঐ জীবাণুর জীবনেতিহাসের লুপ্ত অধ্যায়টি উদ্ধার করায়, এক্ষণে সমস্ত সভ্যজগৎ নির্ব্বিবাদে ঐ জীবাণুকে (Plasmodium Malariæ) ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ঐ জীবাণু মশককর্ত্তৃক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী হইতে সুস্থদেহে নীত হয়।

এই কয়েকটি কথা বিশেষ যত্ন করিয়া মনে মনে ধারণা করা চাই :—

(১) ম্যালেরিয়ার জীবাণুই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ।

(২) তিনটি জিনিষ একত্র হইলে তবেই (নতুবা নহে) ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটিতে পায়। সে তিনটি জিনিষ যথা :—

(ক) ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে—এমন লোক।

(খ) মশক ঐ লোককে দংশন করিয়া, কিছুকাল পরে দংশন করিবে—

(গ) সুস্থ ব্যক্তিকে।

মশক-বাহন উপহাস্য নহে।

হিন্দুদিগের কোনও পুরাণে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে—"যে জনপদে মশকের বাহুল্য ঘটে ও ইন্দুরকুল সহসা মৃত্যু-মুখে পড়িতে থাকে, সে জনপদ অচিরে ধ্বংস হইয়া যায়।" এই বাক্যটির প্রতি মনোযোগ দিলেই বেশ বুঝা যাইবে যে, মশক যে মারাত্মক রোগবীজ বহন করিতে সমর্থ হয়, তাহা দূরদর্শী ও সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ হিন্দুরাও জানিতেন। ফলতঃ উত্তর-কালে আমরাও বেশ জানি যে, ম্যালেরিয়া জ্বর, বাতশিরার জ্বর (Filariasis), পীতজ্বর (Yellow Fever) মশককর্ত্তৃক এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে নীত হয়; কালাজ্বর ও কুষ্ঠ—মৎকুণকর্ত্তৃক নীত হয়; নিদ্রালুতাব্যাধি (Sleeping Sickness) এক প্রকারের মক্ষিকাকর্ত্তৃক নীত হয়। এই সকল বিষয়ে কাহারও কোন সন্দেহ নাই বা হয় নাই। তবে কেন আমাদের দেশের লোকেরা মশক-বৃত্তান্ত শুনিয়াই উপহাস করেন, তাহা বুঝিতে পারি না। উপহাস করায় পাণ্ডিত্য নাই, মনুষ্যত্বলাভও হয় না, পরন্তু এই পৃথিবীতে যে সকল জাতিরা মশক-বৃত্তান্তকে উপহাস না করিয়া ধ্রুব সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে—আজ তাহারা দম্ভভরে ম্যালেরিয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেছে; আর আজ আমরা কোটরে বসিয়া আত্মম্ভরিতার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া ধ্বংসের পথে প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছি! তাই বলিতেছি, "আর ঘুমায়ো না, দেখ চক্ষু মেলি।" আমার মনে হয়, আজ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে দুন্দুভিনিনাদে এই সত্য প্রচার করা উচিত এবং যেমন দলে দলে ইংরাজবীরগণ পরলোকগত কিচেনারের আহ্বানে আহবে যোগদান দিয়াছেন, তেমনই উৎসাহের সহিত প্রত্যেক যুবকেরই আজ ম্যালেরিয়া-আহবে সম্মিলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জৈনধর্ম্ম।*

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

দোহা।

জন্ম-মরণ দুখ্ নষ্ট কর, শিব সুখদায়ক হোই।
কর্ম্মবিনাশক ধর্ম্ম সো, কঁহু শুনহু সব্‌কোই॥

১। জন্ম-মরণ দুঃখ নষ্ট করিয়া মঙ্গল ও সুখদায়ক কর্ম্মবিনাশক ধর্ম্ম যাহা, সকলকে তাহা কহিতেছি।

প্রাণিমাত্রই সংসারদুঃখ (ভবযন্ত্রণা) অতিক্রম করিয়া প্রকৃত সুখ যাহাতে লাভ করিতে পারে, যে ধর্ম্ম মুক্তিপ্রদায়ক, সকলের মঙ্গলের জন্য (অবগতি) সেই ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

প্রাণিমাত্রই যে মুক্তিপ্রদায়ক ধর্ম্মদ্বারা স্বীয় মঙ্গল সাধন করে, সেই ধর্ম্ম আত্মার খাসস্বভাব।

২। আত্মার প্রধানতঃ তিন প্রকার স্বভাব। যথা—সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান, সম্যক্ চরিত্র। এই তিনকে রত্নত্রয়ধর্ম্ম কহে। জৈনধর্ম্মবিজ্ঞানের ইহাই মূল—রত্নত্রয়-ধর্ম্মে সম্যক্ দর্শন।

৩। সত্যদেব, সত্যশাস্ত্র, আর সত্যগুরুকে শ্রদ্ধা করাকে সম্যক্ দর্শন বলে। সচ্চিদানন্দস্বরূপ যিনি—যিনি সত্যস্বরূপ, চিন্ময় ও আনন্দস্বরূপ তিনিই সত্যদেব।

৪। তিনিই সত্যদেব—যিনি বীতরাগ, সর্ব্বজ্ঞ আর সর্ব্বভূতহিতকারী (প্রাণিমাত্রের হিত করেন)।

৫। যে দেবতার ক্ষুধা ১, তৃষ্ণা ২, নিদ্রা ৩, জন্ম ৪, মরণ ৫, জরা ৬, রোগ ৭, ভয় ৮, গর্ব্ব ৯, রাগ ১০, দ্বেষ ১১, মোহ ১২, চিন্তা ১৩, রতি ১৪, অরতি ১৫, খেদ ১৬, স্বেদ ১৭, আশ্চর্য্য ১৮—এই অষ্টাদশ প্রকার দোষের মধ্যে একটি দোষও বর্ত্তমান নাই, তিনিই বীতরাগী বা বীতরাগ দেবতা। আর যে দেবতার একটি মাত্রও দোষ বর্ত্তমান আছে, তিনি বীতরাগী নহেন। দোষক্ষালনের জন্য দোষের আশ্রয়ভূত যিনি, তাঁহাকে পূজার্চ্চনা, শ্রদ্ধা করিলে কোন কল্যাণই সাধিত হইতে পারে না। যিনি আপনিই ঐ অষ্টাদশ প্রকার দোষে দোষী, যাঁহাতে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, ক্রোধাদি বর্ত্তমান আছে, তিনি কি প্রকারে আমাকে (জীবকে) ঐ সকল দোষমুক্ত করিয়া সুখী করিতে পারেন? যিনি ক্ষুধাতুর, তিনি অপরের ক্ষুধা নিবারণ করিতে পারেন না। মোহগ্রস্ত অপরের মোহ কি করিয়া দূর করিবে? বদ্ধ কি বন্দীর মুক্তি দিতে পারে?

৬। সংসারে যিনি—জীব, পুদ্‌গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ ও কাল, এই ছয় পদার্থের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানকালসম্বন্ধে সমস্ত অবস্থাকে জানেন, কোন বিষয়ই যাঁহার অজ্ঞাত নাই, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহাকেই সর্ব্বজ্ঞ কহে, যিনি ছয় মূলপদার্থ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। যিনি সকল বিষয়সম্বন্ধে অজ্ঞ, সংসারাবদ্ধ, জীবের সুখদুঃখরূপ অবস্থানভিজ্ঞ, তিনি কদাপি সত্যদেব নহেন; কারণ, তিনি আমার সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহেন। তিনি কি করিয়া আমার কল্যাণসাধন করিবেন? অবগতি শব্দের অর্থ কি? প্রতীকার-উপায়-নির্ণয়-হেতু যে জ্ঞান, তাহাকে অবগতি বলে। জ্ঞান শব্দের অর্থ কি? নিত্যানিত্য বিবেকপুষ্ট চিত্তে পূর্ণতার বিকাশই জ্ঞান। বিকাশ শব্দের অর্থ কি? মলিনতাদোষশূন্য বা রাহিত্য।

৭। সর্ব্বভূতহিতকারী কাহাকে বলে? যাঁহার উপদেশ দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি কোন জীবেরই অহিতকারী নহে, উঁহাকেই সর্ব্বভূতহিতকারী কহে। যিনি সর্ব্বভূতহিতকারী, তিনিই দেব এবং তাঁহাকে পূজা করাই কর্ত্তব্য।

৮। বিজ্ঞব্যক্তিমাত্রেরই অবগত হওয়া উচিত যে, সর্ব্বজ্ঞতা, বীতরাগতা, হিতোপদেশকতা—এই তিন গুণ যাঁহাতে বর্ত্তমান আছে, তাঁহাকেই সেবা-পূজা করা উচিত; কিন্তু যে দেবতার এই তিন গুণের একটি গুণও নাই, সেই দেবতাকে কদাপি মান্য করিতে নাই।

৯। সত্যার্থপ্রকাশক শাস্ত্র (কল্যাণকারী ধর্ম্মগ্রন্থ)—যাহাতে উপরের লিখিত তিনটি গুণের ব্যাখ্যা আছে, যে গ্রন্থ মিথ্যামত খণ্ডন করে, পূর্ব্বাপরবর্ত্তী বিরোধীয় তত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশ আছে, আর যে গ্রন্থের (বাক্যাবলী) উপদেশাবলী-দ্বারা জীবের (হিত) মঙ্গল হয়; যে গ্রন্থ রাগদ্বেষসম্পন্ন পণ্ডিতদ্বারা প্রণীত, যাহাতে আপন মতই ব্যক্ত ও প্রাধান্য-স্থাপন উদ্দেশ্যে লিখিত, যাহাতে পদার্থের স্বরূপ (বস্তুর স্বাভাবিক রূপ) অজ্ঞের, যাহাতে মিথ্যাবাক্য সকল, যজ্ঞাদিতে পশুহননাদি ঘোড়া, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পশুর মারণাদি হিংসাপূর্ণ মহাপাপকর উপদেশ আছে এবং হিংসাদিকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়াছে, ঐ সকল গ্রন্থ কদাপি সত্যশাস্ত্র নহে (যথার্থ জীবজাতির মঙ্গলকর উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ নহে)। অব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্য্যার ব্যাখ্যা, রোগীর মুখে ঔষধের

---

* জৈনধর্ম্মও ভারতীয় প্রাচীন ধর্ম্ম। "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম"—জৈনদর্শনের প্রধান বাক্য ও আচরণীয়। জৈনেরা জীবহিংসাকে অতিশয় পাপ ও অধর্ম্মকর বিবেচনা করেন। বঙ্গদেশে জৈনধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনা অতি বিরল—জৈনধর্ম্মের তত্ত্ব আলোচনা করিয়া তাহার সবিশেষ পরিচয় দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য।

উপদেশ যেমন হাস্যকর,—তেমনই যিনি স্বয়ং সংসাররূপ মহাকূপে নিমজ্জিত, দুঃখপীড়িত, তাঁহার মোক্ষশাস্ত্রসম্বন্ধে উপদেশও তদ্রূপ অকিঞ্চিৎকর ও হাস্যোদ্দীপক। জীবের হননরূপ হিংসাদ্বারা জীবের মঙ্গলদাতা পরমাত্মার নিকট আপন মুক্তি বা মঙ্গল ইচ্ছা করা বাতুলতা নয় কি? যে গ্রন্থ অধ্যয়নদ্বারা স্বকীয় মঙ্গলই সাধিত হয় না, তাহা পড়িলে বা পাঠ করিলে কাহারই মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না। ছিদ্রবিশিষ্ট তরণী যেমন আরোহীসহ আপনি নিমজ্জিত হয়, তেমনই অষ্টাদশ দোষদুষ্ট শাস্ত্রপ্রণেতা আপনাকে সহ অনুবর্ত্তিগণকে লইয়া নিরয়গামী করে।

১০। যে গুরু পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয়ভোগবাসনা পরিহার করিয়াছেন, কোন প্রকার কার্য্যের সূচনা (আরম্ভ) অর্থাৎ যে কার্য্যের দ্বারা জীবাদির হিংসা করা হয়, তদ্রূপ কার্য্য করেন না, ধনধান্যাদি দশ প্রকার বাহ্য পরিগ্রহ ও রাগদ্বেষাদি চৌদ্দ প্রকার অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ করেন না, এমন কি, দোষাদির একটিও যাহাতে নাই, যিনি সতত জ্ঞান, ধ্যান, তপশ্চরণ করেন, উনিই মুক্তির সত্যপথপ্রদর্শক গুরু। ঐরূপ গুরুকেই সৎগুরু বলা হয়। আর যে পুরুষ সাংসারিক ভোগলালসামগ্ন, হিংসা, চৌর্য্য, অনৃত (অসত্যভাষণ), কুশীল, পরিগ্রহ, এই পঞ্চবিধ দোষ যাহাকে পরিত্যাগ করে নাই, অট্টালিকাতে বাস, হাজার হাজার লোকের সম্পত্তি গ্রহণ করেন, ঐরূপ ব্যক্তি কখনও সৎগুরু নহে। ঐরূপ গুরুকে পূজা করাতে—মান্য করাতে, কোন জীবেরই মঙ্গল হইতে পারে না। ঐ গুরু কিরূপ? না—যেমন পাথরের জাহাজ; আপনিও ডুবেন, শিষ্যকেও ডুবাইয়া দেন।

১১। ধন, ধান্য (অন্ন), দ্বিপদ (দাস-দাসী আদি), চৌপদ (ঘোড়া, হাতী আদি), ঘর, বাসন, পাল্কী, কূপ, শয্যাসন আর ভূমি, এই দশ প্রকার বাহ্য পরিগ্রহ।

১২। মিথ্যাত্ব, ভেদ, রাগ (স্ত্রীপুত্রাদিতে অনুরাগ), দ্বেষ, হাস্য, রতি, অরতি, শোক, ভয়, জুগুপ্সা (গ্লানি), ক্রোধ, মান, মায়া ও লোভ, এই চতুর্দ্দশ প্রকার অন্তরঙ্গ পরিগ্রহ।

১৩। জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জরা ও মোক্ষ, এই সাত পদার্থে শ্রদ্ধার নামও সম্যক্ দর্শন।

১৪। ঐ সপ্ততত্ত্ব জৈনদর্শনের মুখ্যকথা। ঐ সপ্ততত্ত্ব জ্ঞানই সম্যক্ জ্ঞান।

জৈনদর্শন যে সত্য প্রচার করিবার জন্য আজ ভারতের ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছে, সেই দর্শনের সহিত সনাতন হিন্দু-দর্শনের খুব কমই পার্থক্য দেখা যায়। জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইল। জৈনধর্ম্মপ্রচারক তীর্থংকর মহাবীর স্বামী চব্বিশ তীর্থংকর। এখন ২৪৪৩ বৎসর বোধ হয় চলিতেছে, তিনি গৌতমবুদ্ধের পরবর্ত্তীকালের লোক। বুদ্ধের বিহারক্ষেত্রই যেমন বর্ত্তমান বেহারে পরিণত হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক পর্ব্বত রাজগিরিও তেমনই এখন জৈনদিগের প্রধান তীর্থ। রাজগিরিতে অথবা সমস্ত বেহারেই প্রাচীন আর্য্যকালের অনেক কীর্ত্তি পাওয়া যায়। জরাসন্ধের প্রাচীন রাজধানী বর্ত্তমান রাজগিরিতে। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ মধুবনও বেহারেই। পরেশনাথ পর্ব্বতে জৈনদিগের প্রসিদ্ধ জৈনমন্দির রহিয়াছে। ঐ সকল মন্দির যখন জৈনভক্তগণে পূর্ণ হয়, তখন বস্তুতঃই প্রাণে এত আনন্দ উপস্থিত হয় যে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

ভারতে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম এক সময় অর্দ্ধেক পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্ম এখন মৃত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু জৈনধর্ম্ম এখনও বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে।

[ক্রমশঃ।

ভগবান গৌতমবুদ্ধ।

বৌদ্ধশাস্ত্রে বুদ্ধচরিত।

[জনৈক অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।]

এক সময় যাঁহার চরণকমলে সমগ্র প্রাচী আত্মনিবেদন করিয়াছিল, জম্বুদ্বীপের সেই পাপমোচনকর্ত্তার চরিত-সম্বন্ধে কিছু জানা সকলেরই প্রয়োজন। খ্রীষ্টজন্মের পঞ্চ শত বৎসর এবং মহম্মদের জন্মের এক সহস্র দুই শত বৎসর পূর্ব্বে যুবরাজ সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মানবের পক্ষে নির্ব্বাণলাভের তিনটি পন্থা বর্ত্তমান, ইহাই বুদ্ধদেবের শিক্ষা। প্রথম পন্থার নাম—অনুত্তর সম্যসম্বোধি; দ্বিতীয়—প্রত্যেকবোধি; তৃতীয় শ্রাবকপারমি-বোধি। বুদ্ধত্বপ্রাপ্ত হইতে হইলে মানবকে চারি অসংখ্যেয় কল্প ধরিয়া দশ পারমিতা অভ্যাস করিতে হয়। প্রত্যেক-বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে দুই অসংখ্যেয় কল্প ধরিয়া পার-মিতাসাধনা আবশ্যক। শ্রাবকপারমি হইতে হইলে এক অসংখ্যেয় কল্পব্যাপিনী সাধনার প্রয়োজন। দশ পারমিতার সাধকদিগকে বোধিসত্ব বলা হয়। অনুত্তর সম্যসম্বোধি-সত্ব ধরাকে পাপমুক্ত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন।

প্রত্যেকবুদ্ধ পূর্ণজ্ঞান লাভ করেন সত্য, কিন্তু তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, সে যুগ লোকশিক্ষার উপযোগী নহে ; সেই জন্য তিনি নিষ্পাপ জীবন যাপন করিয়া অন্তে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন। যে সময় বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন,সে সময় কোন প্রত্যেক-বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন না। যে যুগে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন, সেই যুগের নাম বুদ্ধোৎপাদ, আর যে সময় বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন না, সেই যুগের নাম অবুদ্ধোৎপাদ। কোন কোন যুগে কোন বুদ্ধ জন্মেন না, কোন কোন যুগে বুদ্ধগণ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান কল্পের নাম মহাভদ্রকল্প, কারণ এই কল্পে পাঁচ জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিবেন। ঐ পাঁচ জনের মধ্যে ককুসন্দ, কোনগমন, কশ্যপ ও গৌতম, এই চারি জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বুদ্ধ মৈত্রেয় এখনও জন্ম-গ্রহণ করিবেন। বুদ্ধগণ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই বৈশ্যের বা শূদ্রের কূলে জন্ম-গ্রহণ করেন না। কশ্যপবুদ্ধ ব্রাহ্মণবংশে এবং গৌতমবুদ্ধ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কশ্যপ যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্মণদিগেরই প্রাধান্য ছিল, গৌতমবুদ্ধ যে সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময় ক্ষত্রিয়গণই প্রধান ছিলেন।

দশ পারমিতা কি কি :—দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য (নৈষ্কর্ম্ম্য ?), বীর্য্য, প্রজ্ঞা, সত্য, ক্ষান্তি, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা। প্রার্থীকে আপনার সন্তানদান, এমন কি, স্ত্রী ও আত্মজীবন-দানই দানের পরাকাষ্ঠা। ব্রাহ্মণযাজক যখন বোধিসত্ত্বের নিকট যাচ্ঞা করেন, তখন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে তাঁহার দুইটি সন্তান দান করিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে যখন বেশন্তর বোধিসত্ত্ব তপশ্চরণ করিতেছিলেন, তখন ইন্দ্র ব্রাহ্মণের বেশ-ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করেন। তখন সেই সন্ন্যাসী যুবরাজ জিজ্ঞাসা করেন,—আপনি কি চাহেন ? ইন্দ্র সন্ন্যাসী-যুবরাজের পত্নীকে প্রার্থনা করেন। বেশন্তর বোধিসত্ত্ব ইন্দ্রের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। বোধিসত্ত্বের নিকট কেহ কিছুর প্রার্থী হইলে তিনি কিছুতেই "না" বলিবেন না। ধরার উদ্ধারসাধনের জন্য বোধিসত্ত্বকে এইরূপ আত্মত্যাগ করিতে হয়। সন্তানদানেই মেদিনীর মঙ্গলের জন্য প্রীতির পরাকাষ্ঠা সূচিত হয়। আজ খৃষ্টানরা বলেন শুনিতে পাই, ঈশ্বর পৃথিবীকে এত ভালবাসেন যে, তিনি ধরাবাসীর ত্রাণের জন্য তাঁহার একমাত্র পুত্রকে দান করিয়াছেন। ইহা দানপারমিতার প্রতিধ্বনিমাত্র। বোধিসত্ত্বকে নৈতিকজীবন চরমোন্নত করিতে হয়। তাঁহাকে সর্ব্বভূতে দয়াপ্রদর্শন করিতে হয়, সর্ব্বথা অসাধুত্ব পরিহার করিতে হয় এবং লোকের নিন্দনীয় সর্ব্বকার্য্য বর্জ্জন করিতে হয়। তিনি কোনরূপ নিন্দনীয় বা গৌরবের হানিকর কার্য্য গোপনেও করেন না। তিন কারণে বোধিসত্ত্ব কুক্রিয়া হইতে বিরত হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ—তিনি মনে করেন যে, এমন অনেক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ আছেন, যাঁহারা অন্যের মনের ভাব জানিতে পারেন এবং দৈবদৃষ্টিপ্রভাবে সকল বিষয় সন্দর্শন করিতে সমর্থ হন ; তাঁহারা তাঁহার কুকার্য্য দেখিতে পাইবেন। দ্বিতীয়তঃ—দেবতারা তাঁহার কার্য্য দেখিতে পাইবেন, সুতরাং তিনি কুকর্ম্ম হইতে বিরত হন। তৃতীয়তঃ—তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ তাঁহার কার্য্যাবলী দেখুন আর নাই দেখুন, তাঁহার বিবেকবুদ্ধি যখন তাঁহাকে কুক্রিয়ায় লিপ্ত হইতে নিষেধ করিতেছে, তখন তাঁহার আপনার বুদ্ধি অনুসারে তিনি গোপনেও কুকার্য্য করেন না। নৈষ্ক্রম্য (নৈষ্কর্ম্ম্য ?) অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়জভোগের বাসনা পরিত্যাগ। বীর্য্য অর্থে অভীপ্সিত উদ্দেশ্যসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। অবিলম্বে সৎকার্য্য করিতে তিনি কিছুতে পশ্চাদ্‌পদ হন না। তিনি আপনার জীবন বিপন্ন হইলে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অন্যের জীবনরক্ষার্থ বিপদ্‌সাগরে ঝম্প-প্রদান করেন। অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা তিনি জ্ঞান অর্জ্জন করেন। তিনি সত্যকথা বলেন, সত্য আচরণ করেন, প্রাণান্তেও মিথ্যাকথা বলেন না। তিনি ক্ষমাপূর্ণ ধৈর্য্যের সাধনা করেন ; যদি কেহ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে, তাহা হইলেও তিনি আততায়ীর উপর ক্রুদ্ধ হন না। যে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া বারাণসীর সন্নিহিত মৃগদাবে তপস্যা করিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে ঐরূপই হইয়াছিল। যত দিন তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ না হয়, তত দিন তিনি কিছুতেই তাঁহার কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত বা পরিভ্রষ্ট হন না। যন্ত্রণা, কষ্ট, নির্য্যাতন, উৎপীড়ন, এমন কি, অবিলম্বে শিরশ্ছেদের আজ্ঞাও তাঁহাকে তাঁহার সাধনমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট করিতে পারে না। জননী যেমন পুত্রকে স্নেহ করেন, তিনি তেমনই সকলকে স্নেহ করেন ; যে আততায়ী তাঁহার প্রাণনাশের জন্য সম্মুখে উপস্থিত, তাহাকেও তিনি ক্রোধ বা কোনপ্রকার বিদ্বেষ প্রদর্শন করেন না। তিনি শত্রু, মিত্র, সকলকেই সমান ভালবাসেন। বোধিসত্ত্বগণ জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ঐ দশটি ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, এই প্রকারে ক্রমে তাঁহাদিগের সিদ্ধিলাভ হয়।

জাতকের গল্পে বোধিসত্ত্বদিগের কঠোর পরীক্ষার কথা বিবৃত আছে। রায়সাহেব শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র ঘোষ "জাতক" বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিতেছেন। বোধিসত্ত্বগণ পৃথিবীর লোককে কত ভালবাসেন, জাতক পাঠ করিলে তাহা উপলব্ধি করা যায়। কথিত আছে যে, স্বর্গে যদি কোন বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি দিব্য অবস্থায় কত দিন অবস্থান করিবেন, তাহা দেখেন। যদি তিনি দেখেন যে, তাঁহাকে দীর্ঘকাল স্বর্গভোগ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি স্বেচ্ছায় স্বর্গসুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক মর্ত্ত্যে মনুষ্যদিগের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে আসেন। জননী যেমন তাঁহার সহায়হীন শিশুসন্তানকে ভালবাসেন, বোধিসত্ত্ব সেইরূপ সমস্ত পৃথিবীর জীবকুলকে ভালবাসেন। পৃথিবীর

উদ্ধারের জন্য বোধিসত্ত্ব অনন্ত কোটী জন্ম দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া থাকেন। বোধিসত্ত্বের আর একটি নাম মহাসত্ত্ব। তিনি জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের ত্রাণকর্ত্তা নহেন, সমস্ত বিশ্ববাসীর ত্রাণকর্ত্তা। তিনি সর্ব্বভূতে দয়া করিতে শিক্ষা দেন এবং আনন্দের ও আহারের জন্য জীবহিংসা পছন্দ করেন না। তিনি সাধুতা, পবিত্রতা, বুদ্ধিমত্তা, দয়াশীলতা এবং পৃথিবীতে যাহা পরম ও চরম সদ্গুণ বলিয়া বিবেচিত, তাহারই মূর্ত্তিস্বরূপ। তিনি লোকে সাধুতার সহিত ও বিজ্ঞানবুদ্ধির সহকারে চিন্তা করিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন। কি করিয়া নির্ভীক হইতে হয়, তিনি তাহা প্রদর্শন করেন এবং অন্যকে নির্ভীক করিয়া তুলেন। তিনি নির্ভীকতার শিক্ষাদাতা। প্রেম ভয়কে জয় করে, পুণ্য ভয়কে জয় করে, সত্য ভয়কে জয় করে। তাঁহাদের মত লোকই সত্যের জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিতে পারেন।

জাতকের গল্পগুলি পাঠ করিলে বিশেষ উপকার হয়, কারণ উহা এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষ কোন স্বেচ্ছাচারী দেবতার ক্রীতদাস নহে। নিরীহ জীবের বলিদান কোন দেবতারই প্রয়োজনীয় নহে। স্রষ্টা এই বিশ্ব এইবারই প্রথম সৃষ্ট করেন নাই, এই বিশ্ব ধ্বংস ও প্রলয়ের অধীন, স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকসম্বলিত এই ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কোটীকল্প পরে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্বব্যাপারের নিয়ম অনুসারে চলিয়া যাইতেছে। ইহাই ধর্ম্ম-নিয়ম, ইহাই ঋতু-নিয়ম, ইহাই বীজ নিয়ম, ইহাই কর্ম্ম নিয়ম। পৃথিবী ধর্ম্মতঃ থাকিবে, বীজ-নিয়ম অনুসারে বৃক্ষ থাকিবে, বীজ হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইবে, ঋতু নিয়ম অনুসারে যথাযোগ্য ঋতু পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভূত হইবে এবং কর্ম্ম নিয়ম অনুসারে মানুষ সুখ-দুঃখ ভোগ করিবে। মানুষ জন্মিলেই সে যথাক্রমে বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, শেষে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইবে। দেবতার নিকট যতই প্রার্থনা কর, দেবোদ্দেশে লক্ষ লক্ষ জীব বলি দাও, এ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে না। মানুষ মরিবেই—মরণের হস্ত হইতে নিস্তার নাই। মরিবার পর মানুষ হয় তীর্য্যক্‌যোনিতে, না হয় প্রেতযোনিতে, না হয় দেবযোনিতে, না হয় ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিবে অথবা নরকভোগ করিবে। তাহার কর্ম্মই মৃত্যুর পর তাহার অনুগমন করিবে, মৃত্যুর পর—সে যে সকল কার্য্য করিয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই তাহার সঙ্গে যাইবে না। কর্ম্ম অনুসারে তাহার আবার "জন্ম" হইবে। সৎকথাদ্বারা, সচ্চিন্তার দ্বারা এবং সাধু অনুষ্ঠানদ্বারা মানুষ কর্ম্ম অর্জ্জন করে। বিজ্ঞানসম্মত নিশ্বাসপ্রশ্বাসদ্বারা মানুষ তাহার চিন্তাকে শান্ত করিতে পারে,—শান্তচিন্তা সৎকর্ম্মেরই উদ্ভব করে। বাস্তানির্ম্মাণ, অন্ধকারময় স্থানে আলোক দিবার ব্যবস্থা, সেতুনির্ম্মাণ, ভিক্ষুকদিগের জন্য আশ্রয়-নির্ম্মাণ, সাধারণের জন্য স্নানাগারপ্রতিষ্ঠা, মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয়প্রতিষ্ঠা, সাধারণের জন্য আমোদোদ্যান-নির্ম্মাণ, ফলের বাগানপ্রতিষ্ঠা, পরিত্যক্ত শিশুদিগের আশ্রয়-প্রতিষ্ঠা, দরিদ্রদিগের জন্য আবাসনির্ম্মাণ, সরাই, ধর্ম্মশালাদি-স্থাপন, দরিদ্রদিগকে যান, বস্ত্র, চাকর প্রভৃতি দান প্রভৃতি সৎকর্ম্মের অন্তর্গত। যে সৎকর্ম্ম করে, সে সপ্ত স্বর্গের যে কোন স্বর্গে অথবা কোন ধনীর গৃহে সুখভোগ করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি দয়াবৃত্তির অনুশীলন করে, যোগ করে, সে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে যাইয়া তথায় সপ্তকল্প আনন্দ উপভোগ করে, কর্ম্মক্ষয় হইলে আবার সে মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে।

যোগশাস্ত্র।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]
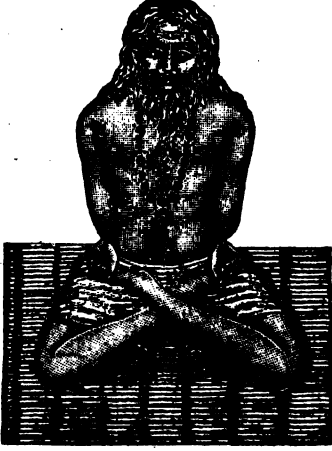
(২) পদ্মাসন।

পূর্ব্বে সিদ্ধাসনের বিষয় লিখিত হইয়াছে,এক্ষণে পদ্মাসনের বিষয় বিস্তারিত বলিব। পদ্মাসন দুই প্রকার :—বদ্ধপদ্মাসন ও মুক্তপদ্মাসন। বদ্ধপদ্মাসন মুক্তপদ্মাসন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন। বদ্ধপদ্মাসনে দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবার নিয়ম আছে, আর মুক্তপদ্মাসনে কেবল বাম ও দক্ষিণ হস্ত সম্মুখের দিকে আনিয়া এক হস্তের উপর আর এক হস্ত রাখিতে হইবে। যাহাদিগের কটি ও উদর বৃহৎ, তাহাদিগের পক্ষে বদ্ধপদ্মাসন অসম্ভব; যাহারা ক্ষীণদেহ, যাহাদিগের উদর ও কটিদেশ সরু, তাহাদিগের পক্ষেই বদ্ধপদ্মাসন ও সকল প্রকার আসন অভ্যাস সহজে হইতে পারে। অপক্ক অস্থি ও শরীর কোমল এবং বয়ঃক্রম ৩০ বৎসরের ন্যূন সংখ্যা না হইলে আসন অভ্যাস করা অতিশয় কঠিন হয়; ১২ বৎসর বয়স্ক বালক যাহা সহজে অভ্যাস করিতে পারিবে, ৩০ বৎসর হইলে সে আর সেরূপভাবে সহজে পারিবে না। ক্ষীণ, নীরোগ ও নধর শরীর হইলে ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা সকল আসন শিক্ষা হইতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে হস্তপদাদি ভগ্ন হইবার আশঙ্কা থাকে। স্থূল শরীর বা ডাগর উদর লইয়া কখন আসন শিক্ষা করিতে যাইবে না; চলিত কথায় বলে—

"চওড়ে চুতর্ লম্বে পেট্।
কভু না ভেয় সদ্‌গুরুসে ভেট্॥"

অর্থাৎ যাহার পাছা বিস্তৃত, পেট লম্বা, সে ব্যক্তি কখন সদ্‌গুরুর দর্শন পায় না অর্থাৎ তাহার দেহ কখন যোগাভ্যাসের উপযুক্ত হয় না।

বদ্ধপদ্মাসনসম্বন্ধে শাস্ত্রে আছে,—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা।
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্॥
অঙ্গুষ্ঠ হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রামবলোকয়েৎ।
এতদ্ব্যাধিবিনাশনাশনকরং পদ্মাসনং চোচ্যতে॥"

অর্থাৎ বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বাম চরণ সংস্থাপিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুই পদের বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে। ইহাকে বদ্ধপদ্মাসন বলে।

প্রকারান্তরং যথা—

"উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরু সংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণিকৃত্বা তু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পূরয়েদুদরং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য ধারয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্তৈব পশ্চাত্তু রেচয়েদবিরোধতঃ॥
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাদ্রেচয়েদুদরং শনৈঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥"

ইতি শিবসংহিতায়াম্।

অর্থাৎ বাম উরুর উপরে দক্ষিণ পাদ ও বাম হস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরে বাম পাদ ও দক্ষিণ হস্ত উত্তান (চিৎ) করিয়া রাখিয়া, নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিসংস্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপিত করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ক্রমে বায়ু যথাশক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে এবং পশ্চাৎ যথাসাধ্য অবিরোধে রেচন করিবে,—ইহার নাম পদ্মাসন। ইহা দ্বারা দেহস্থিত সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়।

প্রকারান্তরে গ্রহচামলের ত্রয়োদশ পটলে লিখিত হইয়াছে। যথা :—

"উর্দ্ধোরুপরি মেঢ্রান্তে উভে পাদতলে তথা।
পদ্মাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।

উক্ত দ্বিবিধ পদ্মাসনের ফলসম্বন্ধে শিবসংহিতা পুনরায় বলিয়াছেন। যথা :—

"দুর্ল্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে পরম্।
অনুষ্ঠানে কৃতে প্রাণঃ সমশ্চলতি তৎক্ষণাৎ॥

ভবেদভ্যাসেন সম্যক্ সাধকস্থ ন সংশয়ঃ।
পদ্মাসনে স্থিতো যোগী প্রাণাপানবিধানতঃ।
পূরয়েৎ স বিমুক্তঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥"

অর্থাৎ এই পদ্মাসন যে কোন ব্যক্তিই অনুষ্ঠান করিতে পারে না; কেবল বুদ্ধিমান্ যোগী ব্যক্তিই ইহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। পদ্মাসনের অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু সমানরূপে নাড়ীছিদ্রে চলিতে থাকে। পদ্মাসনের অভ্যাসক্রমে নিঃসন্দেহ সাধকের প্রাণায়াম-কালে বায়ুর সম্যগ্‌রূপে সরল গতি হয়। যে যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ-রেচন প্রভৃতি করে, সেই ব্যক্তি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়,—ইহা আমি সত্য সত্যই বলিলাম।

ইহার তাৎপর্য্য উপদেশ এই:—প্রথমতঃ সমদেহ ঋজুকায় ব্যক্তি মুক্তপদ্মাসন অভ্যাস করিতে থাকিবে। প্রতিদিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া আসন-অভ্যাস আরম্ভ করিবে, কৃষ্ণাজিন বা কুশাসনে উত্তর বা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিবে। আসন ও দিক্‌বিশেষে উপবিষ্ট হইবারও বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। মেষরোমজাত কম্বল ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাদির গুণ এত উষ্ণ যে, উহা সহজসাধকদিগের পক্ষে কোনক্রমেই সহ্য হইতে পারে না, উহা ব্যবহার করিলে অর্শ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগের সূত্রপাত হইতে পারে। বিশেষতঃ যাহাদিগের শরীরে মঙ্গলের কারকতা অধিক, তাহারা কখন উক্ত আসনে উপবিষ্ট হইবে না। ব্যাঘ্র ও মেষ মঙ্গলের অংশাধিক্য পশু,—সুতরাং পিত্তপ্রধান ও মঙ্গলগ্রহপ্রাধান্যের যুবক-সাধক উক্ত আসনে কখন উপবিষ্ট হইবেন না। উত্তর ও পূর্ব্বদিক্ হইয়া যোগাভ্যাস করিলে সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়; পৃথিবীর উত্তর কেন্দ্রের আকর্ষণ মনুষ্যের মস্তিষ্ক ও মনের পক্ষে প্রসারক ও দেবভাব উত্তেজক, এই জন্যই আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ পূজা-আহ্নিকসম্বন্ধীয় যাবতীয় সাত্ত্বিকক্রিয়া উক্ত দিকাভিমুখ হইয়া করিবার উপদেশ দিয়াছেন। দক্ষিণদিক্ মঙ্গলের বা মৃত্যুর, পূর্ব্বদিক্ সূর্য্যের বা শক্তির, পশ্চিমদিক্ শনির বা বায়ুর, উত্তরদিক্ দেবগণ বা ঋষিগণের। দক্ষিণদিকে কেবল পিতৃকার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য করিবে না। পূর্ব্বদিকে আরোগ্য ও দৈহিক শক্তিসাধনের জন্য যাবতীয় কার্য্য করিবে, আহার, নিদ্রা, আসন, ব্যবসাদি কার্য্য পূর্ব্বদিক্ হইয়া উত্তম। পশ্চিমদিকে যে কোন শারীরিক বা মানসিক কার্য্য করিবে, উহাতে দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিবে; উক্ত দিক্ সাত্ত্বিককার্য্যের বিরোধী। যুদ্ধাদি মন্ত্রণাকুশল ব্যক্তিদিগের জন্য কিংবা ব্যভিচারাদি অসৎ ও অপ্রাসঙ্গিক কার্য্যের উত্তেজনার জন্য এই পশ্চিমদিক্ প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়; আর্য্যগণ কখন এই দিক্‌কে প্রশস্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করেন না।

যেদিকে ও যেরূপ আসনে বসিলে দেহ ও মনের উন্নতি হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উত্তেজনা ও পাপপ্রবৃত্তির নিস্তেজ হয়, সহজে আসন ও প্রাণায়াম অভ্যস্ত হয়, দেহমধ্যে কোন প্রকার রোগের আক্রমণ হয় না, বায়ু সরল হইয়া নিজ নিজ পথে প্রাণবায়ুকে সাহায্য করে, উত্তম সাধকের পক্ষে তাহাই অগ্রে করা কর্ত্তব্য। বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে বিবিধ কর্ম্মসংস্রবদ্বারা দেহ ও মন যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার তেমনই দেহ-মনের প্রবল বল ও শক্তির উপচয়ও ঘটিয়া থাকে।

পদ্মাসনে মেরুদণ্ডকে সরলভাবে রাখিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বক্ষের ক্লেদ অর্থাৎ শ্লেষ্ম নষ্ট হয়, হৃৎপিণ্ড বলবান্ হয় ও তাহার যাবতীয় দুর্ব্বলতা নষ্ট হয়, বায়ু শ্লেষ্মকে ফুস্‌ফুসে গিয়া যথেচ্ছ আক্রমণ বা পীড়ন করিতে পারে না, সুতরাং হাঁপানি-কাসি প্রভৃতি কঠিন রোগ কখন উপস্থিত হয় না। বদ্ধ-পদ্মাসনে মেদরোগ ও মন্দাগ্নি একবারে নষ্ট হয়; অন্ত্র-বৃদ্ধি, কৃমি, এবং আমাশয়স্থ যাবতীয় রোগ এককালীন বিনষ্ট হয়; পাকস্থলীতে অগ্নিবৃদ্ধি ও অপানবায়ুর অবরোধ-ক্রিয়ার সম্যতা ও মলমূত্রাদির শুদ্ধি এবং সরলতাবিস্তারে দেহকে সর্ব্বদা সুস্থ ও সবল রাখে। এই দ্বিবিধ প্রকার পদ্মাসন যোগীদিগের পক্ষে নিতাই আবশ্যক। এই আসনে আসীন হইয়া ধ্যান-ধারণাদি যত সহজ ও সুখে নির্ব্বাহ হয়, এরূপ আর কোন আসনেই হয় না।
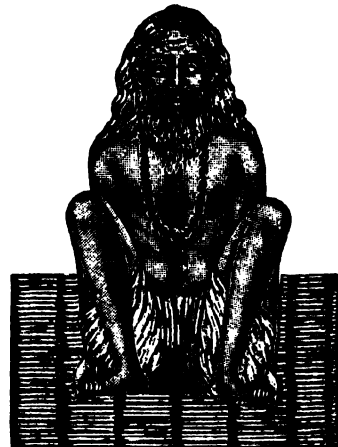
(৩) ভদ্রাসন।

"গুল্‌ফৌ চ বৃষণ স্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ॥
জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশকম্॥"

. শিবসংহিতা।

অর্থাৎ অণ্ডকোষের নিম্নভাগে উভয় গুল্‌ফ বিপরীতভাবে সংস্থাপিত করিয়া, উভয় পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণপূর্ব্বক, জালন্ধর বন্ধ করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে, ইহাকে ভদ্রাসন কহে। ইহা দ্বারা সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

জালন্ধরবন্ধসম্বন্ধে শিবসংহিতায় লিখিত আছে। যথা :—

"বদ্ধা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্ল্লভঃ॥
নাভিস্থো বহ্নির্জ্জন্তূনাং সহস্রকমলচ্যুতম্।
পিবেৎ পীযূষং বিসরং তদর্থং বন্ধয়েদিমম্॥"

অর্থাৎ গলদেশের শিরাসমূহকে বন্ধন করিয়া হৃদয়ে চিবুক রাখিবে,—ইহার নাম জালন্ধরবন্ধ। জন্তুসমূহের নাভিদেশস্থ অগ্নি সহস্রদলকমল হইতে নিঃসৃত অমৃত পান করিয়া থাকে, এই জন্য জালন্ধরবন্ধদ্বারা ঐ অমৃতকে অধোদেশে পাতিত হইতে না দিয়া ঊর্দ্ধে উঠাইয়া রসনাদ্বারা পান করিবে, তাহা হইলেই অমরত্ব লাভ হয়।

আসন অভ্যস্ত না হইলে স্থানবিশেষে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া মন স্থির করা ও জালন্ধরবন্ধ করা সহজ কার্য্য নহে। দুর্জ্জয় চঞ্চলমনের দেহমধ্যে তিনটি আসন নিরূপিত আছে; যথা :— একটি নাসাগ্রভাগ, দ্বিতীয় ভ্রূমধ্যভাগ, তৃতীয় হস্তাঙ্গুলির অগ্রভাগসকল। যোগী উক্ত দেহস্থ তিনটি স্থানে মনকে লইয়া স্থির করিতে পারেন; তন্মধ্যে হঠসাধনকারী ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া মনকে তথায় লইয়া স্থির করা অভ্যাস করিতে পারেন, রাজযোগী নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিয়া তথায় মনকে লইয়া স্থিরতর করিতে পারেন, জাপকগণ করাঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা মালাবিশেষ জপ করিয়া মনকে তথায় লইয়া স্থির করিতে পারেন। প্রত্যেক স্থানে দৃষ্টি বা জপের সহিত কোন সাকার বিশেষ স্থূল বা সূক্ষ্ম ধ্যানের প্রয়োজন, শিক্ষার পক্ষে প্রথমে স্থূল ও পরে সূক্ষ্ম ধ্যানই শাস্ত্রসম্মত। এইরূপ দৃষ্টিস্থাপন, ধ্যান ও জালন্ধরবন্ধ, এই তিনটি একত্রিত বা একযোগে হইলেই সাধক তন্ময় হইয়া সহস্রদলকমলনিঃসৃত অমৃতপান করিয়া অমরত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়েন। নচেৎ কিছুতেই মন-পক্ষীকে নিশ্চল দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিয়া প্রকৃত যোগসাধন অভ্যাস করা যাইতে পারে না। সহস্র সুখাসনে অভ্যস্ত হইলেও চঞ্চল মন নিজবশে আসে না। তখন আসনে কেবল দেহেরই উন্নতি হয়, মন ও জীবাত্মা-সম্বন্ধে কোন কার্য্যকারী হয় না।

ভদ্রাসনে দেহের রোগসকল বিলীন হয়; কাম, ক্রোধাদি মানসিক বিকারের সমতাপ্রাপ্ত হয়; অধোদিক্‌সম্বন্ধে যাবতীয় রোগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; মূত্র-কৃচ্ছ্র, পাথুরি, মেহ, বাত, অর্শ, ভগন্দর, প্লীহা, যকৃৎ, উদরী ইত্যাদি রোগ আদৌ জন্মিতে পারে না; ক্রমশঃ পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি হইয়া দেহকে বলবান্ করে।

(৪) মুক্তাসন।

অতঃপর সিদ্ধিপ্রদ মুক্তাসনের বিষয় লিখিত হইতেছে :—

"পায়ুমূলে বামগুল্‌ফং দক্ষগুল্‌ফং তথোপরি।
শিরোগ্রীবাসমং কায়ং মুক্তাসনন্তু সিদ্ধিদম্॥"

গুহ্যমূলে বাম পাদমূল ও তাহার উপরে দক্ষিণ পাদমূল সংস্থাপিত করিবে এবং মস্তক, গ্রীবা (ঘাড়) সমান করিয়া অবক্র শরীরে অর্থাৎ ঠিক সোজা হইয়া বসিবে, ইহাকে মুক্তাসন কহে। ইহা সিদ্ধিপ্রদ।

এই আসনে অপানক্রিয়ার উৎকর্ষতা ও প্রাণের পুষ্টি-লাভ হয়, বীর্য্য ঊর্দ্ধগামী হইয়া সাধকের অভীষ্টসিদ্ধি করে। পূরকের সময়ে গুহ্যদেশ আর আকুঞ্চন করিতে হয় না, সাধকের প্রাণ সহস্রদলাভিমুখেই নীত হয়, শিরা ও স্নায়ু-সম্বন্ধীয় যত প্রকার রোগ সহসা আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হইতে থাকে, দেহের জড়তা নষ্ট হয়। [ক্রমশঃ।

সৎকর্ম্ম।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্ব্বজীবের মঙ্গলোদ্দেশে যে কর্ম্ম আচরণ করা যায়, তাহাই সৎকর্ম্ম। যাহাতে স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই সৎ। নাশ-প্রবণ অর্থাৎ যাহা ক্ষণস্থায়ী ও জীবের মঙ্গলসাধনে অনিশ্চিত, তাহাই অসৎকর্ম্ম।

পাপ ও পুণ্যের হিসাবেও তাহাই। যদ্দ্বারা জীবের অমঙ্গল হয়, তাহাই পাপ এবং যদ্দ্বারা জীবের হিত হয়, তাহাই পুণ্য।

কর্ম্মে স্বয়ং ভগবান্ অবস্থিতি করেন। মানুষ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি লাভ করেন। শাস্ত্রে বলে, যে নিয়ত কর্ম্মতৎপর, তাহার স্বর্গে প্রয়োজন কি? তাহার হৃদয়ই স্বর্গস্বরূপ এবং সে স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবেই ত্রিলোক জয় করিতে পারে।

বাপী-কূপ-তড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
অন্নপ্রদানমারামাঃ পূর্ত্তং ধর্ম্মঞ্চ মুক্তিদম্॥

অগ্নিপুরাণম্।

বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবায়তন, অন্নপ্রদান ও আরাম, ইহারা পূর্ত্তধর্ম্ম। এই পূর্ত্তধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিলাভ হয়।

জলরূপেণ হি হরিঃ সামোবরুণ উত্তমঃ।

জল সাক্ষাৎ হরি, সোম ও বরুণ হইতে অভিন্ন। বাপী, কূপ, তড়াগপ্রতিষ্ঠায় নারায়ণপ্রতিষ্ঠাই হইয়া থাকে।

জীবমঙ্গলোদ্দেশে যাহারা জলাশয়াদি খনন করাইয়া সর্ব্বজীবের পানীয় জল সংস্থান করিয়া দেয়, ঐ জলাশয়-খননরূপ সৎকর্ম্ম তাহাদিগের স্বর্গলোক প্রাপ্ত করিয়া দেয়।

আজ আমাদের পল্লীভবন লোকবসতিহীন শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের পিতৃপুরুষগণ ঐ পল্লীগৃহে বাস করিয়া পল্লীর, পল্লীবাসীর, প্রতিবাসীর এবং গ্রামান্তরবাসীরও যাহাতে মঙ্গল হইতে পারে, এইরূপ শত শত কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন সত্য, কিন্তু আজও তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

দুইতিনপুরুষ পূর্ব্বের লোক যে ভাবে কর্ম্ম করিতেন, যে ভাবে আপনাদের গৃহদরজা সর্ব্বজীবের জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রাখিতেন, আজ সেই সকল গৃহদরজায় গিয়া দেখ—আপনার প্রতিবেশীর জন্য দরজা অবরুদ্ধ হইয়াছে! যেখানে অসহায়া বিধবা আপনার অপোগণ্ড শিশু লইয়া নিরাশ্রয় অবস্থায় এক মুষ্টি অন্নের জন্য ধনীর দ্বারে গলাধাক্কা খাইয়া আসিতেছে, সেই ধনীর গৃহের অভ্যন্তরেই গিয়া দেখ—তাহার অর্থ কত কুৎসিতকর্ম্মে ব্যয়িত হইতেছে! কিন্তু প্রাচীনকালের লোকেরা এমন করিয়া আপনাদের অর্থের ব্যবহার করিতেন না; তাঁহারা প্রথমতঃ অভুক্তকে অন্ন দিয়া, তাহার পরিতৃপ্তি করিয়া পরে আপনি অন্ন গ্রহণ করিতেন। শাকান্ন যাহাই সংগৃহীত হইত, তাহাই সকলকে বাটিয়া দিয়া আপনি অবশিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া পরমপ্রীতি উপভোগ করিতেন।

সমগ্র বঙ্গদেশ ঘুরিয়া আসিলে দেখিতে পাইবে, কত জমীদার, কত সম্ভ্রান্ত, ধনী, কত বাঙ্গালী, হিন্দু, মুসলমান বহু দিন হইল মরিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বিশ্ববাসী আজিও তাঁহাদিগের কীর্ত্তি ঘোষিত করিতেছে। লোককে সভা করিয়া—সমিতি করিয়া—বক্তৃতা দিয়া তাঁহাদের স্মৃতি ঘোষণা করিতে হয় না; তাঁহাদের কীর্ত্তি তাঁহাদিগকে অমর করিয়াছে, তাঁহারা স্মৃতিচিহ্ন প্রকৃতির বুকে আঁকিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ বর্দ্ধমানের জনৈক পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা জনাইয়ের মিত্রপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক মিত্রমহাশয়কে এত অধিক পরিমাণে জমী দান করিয়া যান যে, তিনি তদ্দ্বারাই বহু পুষ্করিণী, দীঘী খনন করাইয়া ও দেবালয় স্থাপন করিয়া আপন বংশকে স্থাপন করিয়া যান।

বাঙ্গালাদেশে এমন অনেক অনেক রাস্তা আছে, যাহা কোন না কোন হিন্দু কি মুসলমান, ঐ সকল রাস্তা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া পথিকলোকের মহৎ উপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন।

রেল, ষ্টীমার প্রভৃতি দ্বারা ধনী ও অর্থবান লোকেরই উপকার সাধিত হইয়াছে, গরীবের পক্ষে কি উপকার সাধিত হইয়াছে? কিন্তু সর্ব্বসাধারণের চলিবার জন্য যদি কোন বৃহত্তর রাজপথনির্ম্মাণ করান হয় এবং পথপার্শ্বে জলাশয়খনন ও আশ্রয়বাটিকা নির্ম্মিত হয়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত বা দরিদ্রকুলের যতটা হিতসাধিত হয়, রেলওয়ে বিস্তারের দ্বারা ততটা উপকার হয় না।

যে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড নামক রাস্তাটি এখনও বঙ্গবক্ষ ভেদ করিয়া রাঢ়, বেহার ও মধ্যদেশ বাহিয়া পেশোয়ার পর্য্যন্ত গিয়াছে, জানি না, সেই মহাপুরুষের হৃদয় কত উচ্চ ছিল, যিনি এই মহৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বজীবের কত উপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন।

দিনাজপুরের মহীপালদীঘী প্রাচীন পালরাজাগণের অতুলকীর্ত্তি। একমাত্র কুমিল্লা সহরে উৎকৃষ্ট জলপূর্ণ অসংখ্য

দীঘী বর্ত্তমান রহিয়াছে, আজিও লক্ষ লক্ষ লোক ঐ সকল দীঘীর সুপেয় জল পান করিয়া খননকর্ত্তার ভূয়সী প্রশংসা করে।

একটি দীঘী খনন করিতে যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন। সেই অর্থে আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য মানুষ অনেক কাজ করিতে পারে, কিন্তু যদি আপনার বিলাস-বাসনা ত্যাগ করিয়া কোন মহাত্মা জীবের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিয়া যান, তাহা হইলে তিনি যে সর্ব্বজীবের শ্রদ্ধার পাত্র,তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আমরা এমন অনেক মহাত্মার কীর্ত্তি দেখিয়াছি যে, তাঁহারা অবিচারিতচিত্তে আপনাদিগের সংসারের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কতই উৎকৃষ্ট কাজ করিয়া গিয়াছেন।

ভুলুয়ার ৺চন্দ্রনারায়ণ রায় আপনার তালুকদারীর ভিতর লোকের জলাভাব দূর করিবার জন্য বাইশটি গ্রামে বাইশটি সুবৃহৎ দীঘী খনন করাইয়াছিলেন। ঐ বাইশটি দীঘী খনন করাইতে যে পরিমাণে অর্থব্যয় হইয়াছে, তদ্দ্বারা তিনি অনায়াসে রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া, হাতীশালে হাতী ও ঘোড়াশালে ঘোড়া রাখিয়া যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি আজন্মই খড়ের ঘরে বাস করিয়া অতি সুখে দিনাতিপাত করিয়াছিলেন।

এই রকম অনেক মহাপুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী আমরা জানি। সামান্য পত্রে তাহার বিবরণ লেখা দুঃসাধ্য।

ত্রিপুরাজেলার রূপসার গ্রামের মুসলমান জমীদার স্বর্গগত মামুদ গাজী চৌধুরী সাহেব তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া আনিয়া বলেন, "আপনার বাড়ী ঘর সমস্তই আমার নিকট বন্ধক রহিয়াছে। সর্ব্বসমেত মোট প্রায় পাঁচ সহস্র টাকা আপনার দেনা আছে। অতএব টাকার কি করিব?" ব্রাহ্মণ সজলনয়নে বলিলেন, "আর কি করিব—টাকা পরিশোধ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম, আপনি আমার সম্পত্তি গ্রহণ করুন।" মুসলমান জমীদার তখনই সেই ব্রাহ্মণের বন্ধকী-খৎ আনিয়া বিসর্জ্জন দিয়া বলিলেন, "আজ হইতে আপনি ঋণমুক্ত। খোদার নিকট প্রার্থনা, আপনি সন্তানাদি লইয়া সুখে বাস করুন।"

এইরূপ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কত শত শত কর্ম্মবীর আমাদের বাঙ্গালায় রহিয়াছেন, যাঁহারা ঢাক, ঢোল বাজাইয়া বাক্‌বিভূতির আড়ম্বরে স্বীয় কর্ম্মের জয়ঘোষণা করিয়া সংবাদপত্রে স্তম্ভপূর্ণ প্রশংসা লিখেন না অথচ নীরবসাধনে নীরবে সমাজের হিতসাধন করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতেছেন।

অধুনা যাঁহারা সমাজে শিক্ষিত, তাঁহারাই পল্লীবাস ত্যাগ করিয়া সহরে আসিয়া বাস করিতেছেন। বঙ্গের পল্লীগুলি শ্মশান আকার ধারণ করিতেছে; পঙ্কোদ্ধার হইতেছে না বলিয়া বাপীকূপগুলি জলশূন্য হইতেছে; সংস্কার অভাবে পিতৃপুরুষের দেবমন্দির, পান্থশালাগুলি ভগ্ন হইতেছে অথচ সহরে বসিয়া ধনী ও শিক্ষিতলোক জলের মতন আপনাদিগের উপার্জ্জিত অর্থ বিলাসে ও মামলা-মোকদ্দমায় ব্যয় করিতেছেন। এই নিয়ত—নিত্য নিত্য অন্ন-দুর্ভিক্ষ ও জল-দুর্ভিক্ষের বিবরণ সংবাদপত্রিকার স্তম্ভে স্তম্ভে প্রকাশিত হয়, কিন্তু কয়টি ধনীর প্রাণ তাহাতে কাঁদিয়া উঠে? অথচ বলিতে লজ্জা হয়, এমন অনেক ধনীকেই আমরা জানি, গৃহে সতীলক্ষ্মী পত্নী, কিন্তু তিনি বারবনিতার পায়ে অজস্র টাকা ঢালিয়া দিতে কুণ্ঠিত নহেন। বুভুক্ষু বা আশ্রয়হীন কেহ গৃহদরজায় আসিয়া দাঁড়াইলে তখনই দরোয়ান দিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেন।

আপনাদের প্রাচীন শাস্ত্রের কথা এই যে, মাতা পুত্রকে বলিতেছেন,—অতিথি সুন্দর বা কুৎসিত হউক, যে প্রকারই হউক না কেন, তাহাকে মূর্ত্তিমান্ প্রজাপতি-স্বরূপ বিবেচনা করিবে। যে ব্যক্তি অতিথিকে না দিয়া স্বয়ং ভোজন করে, সে কিল্বিষভোজী ও পাপভাগী হয় এবং পরজন্মে সে বিষ্ঠাভোজন করিয়া থাকে। অতিথি যাহার গৃহ হইতে ভগ্নাশ হইয়া প্রতিগমন করে, তাহার পুণ্যরাশি লইয়া স্বীয় পাপ প্রদান করিয়া থাকে। অতিথিকে শাকান্ন কিংবা যাহা নিজে ভোজন করা যায়, তাহা সমর্পণ করিয়া শক্ত্যনুসারে সাদরে তাঁহার পূজা করিবে। হিন্দুর গৃহে হিন্দুমাতার পুত্রের প্রতি এই উপদেশ।

আমরা কালবশে ধর্ম্মকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া আসুরিক ভাবাপন্ন অর্থাৎ মমতাহীন হইয়া সংসারকে দুঃখময় করিয়া তুলিয়াছি।

মাংসমন্নং তথাশাকং গৃহে যচ্চোপসাধিতম্।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াদ্বিধিবদ্ যন্ন নির্ব্বপেৎ॥

মাংস, অন্ন, শাক অথবা গৃহে যে কিছু বস্তু বিদ্যমান থাকে, তাহা যথানিয়মে নির্ব্বপণ না করিয়া স্বয়ং আহার করিতে নাই।

রূপ, যৌবন, ধন, কিছুই জীবকে আশ্রয় করে না, কেবল কর্ম্মই জীবের আশ্রয়ভূত হয়। কর্ম্মাশ্রয় জীব এই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

আমরা প্রথমেই বলিয়াছি, বাপীকূপতড়াগ প্রভৃতি খননদ্বারা সর্ব্বজীবের মঙ্গল সাধিত হয়। এই সকল সৎকর্ম্ম করিয়া জীব কর্ম্মসাধন করিতে পায়। অন্নদানের তুল্য দান নাই, আমরা অন্নদানের কথা বলিবার পূর্ব্বে জলাশয়ের কথাই বলিলাম। জলে জলচর জীবগুলি সুখে বাস করিতে থাকে, পশুপক্ষিগণ সুখে সে জল পান করিতে পারে, মনুষ্যাদি সে জল পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে।

সুন্দরবনের গভীর অরণ্যের মধ্যে একদা ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একটি বৃহত্তর জলাশয় স্ফটিকবৎ জল বক্ষে করিয়া নীরবে অরণ্যে বিরাজিত আছেন। তাহার

নাম রাঘব দত্তের পুকুর। কিন্তু কেহ তাহাকে দেখেন নাই, জানেন না, অথচ সেই মহাপুরুষ কোন্ অতীতকালে কোন্ মহাবংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু এখনও পশু-পক্ষী ও মনুষ্যাদি তাহার জল পান করিয়া রাঘব দত্তের জয়-ঘোষণা করে।

বাঙ্গালায় আবার কবে সেই পূর্ব্বশ্রী ফিরিয়া আসিবে—যখন বাঙ্গালী এইরূপ অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া জগদ্বাসীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে। যে কীর্ত্তি স্থাপন করিলে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবেরও মঙ্গলসাধিত হয়, সেই কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করিয়া রাখে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ।

ভগবানের বৈঠকখানা।

(১) পরমহংসদেব বলিতেন,—"ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।"

মনে করুন, কোন জমীদার। তাঁহার নানা স্থানে অনেক কাছারী আছে। তিনি সকল যায়গায়ই যান, সকল স্থানেই থাকেন; কিন্তু অনেক সময়ই তিনি তাঁহার বাড়ীর বৈঠকখানায় থাকেন। এরূপ স্থলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া থাকে যে, বাবু বৈঠকখানাতে থাকেন। ভগবানের সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ। তিনি সব যায়গাতেই থাকেন,—কিন্তু ভক্তের হৃদয়ে বিশেষভাবে অবস্থিতি করেন। ভক্তের হৃদয়ই তাঁহার বৈঠকখানা।

সবই এক।

(২) ভগবান্, আত্মা, ব্রহ্ম—সবই এক, কেবল নাম ভিন্ন।

পরমহংসদেব বলিতেন,—জ্ঞানীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া থাকে, আবার ভক্তরা তাঁহাকেই ভগবান বলিয়া থাকেন। একটা লোক; তাহার মা তা'কে ছেলে বলে, তা'র স্ত্রী তা'কে স্বামী বলে, তা'র ছেলে তা'কে বাবা বলে, নাতি তা'কে ঠাকুরদাদা বলে—কিন্তু লোকটা সেই এক। একই ব্রাহ্মণ যখন রাঁধে, তখন রাঁধুনী বামুন, আবার যখন পূজা করে, তখন পূজারী বামুন। ঈশ্বর একই বস্তু—তবে নানা লোকে তাঁহাকে নানা নামে ও নানা ভাবে ডাকে। যাঁহারা জ্ঞানযোগ ধ'রেছেন, তাঁ'রা কেবল নেতি বিচার করেন। এ ব্রহ্ম নয়, ও ব্রহ্ম নয়, সে ব্রহ্ম নয়, জীব ব্রহ্ম নয়, জগৎ ব্রহ্ম নয়,—এইরূপ করতে করতে যখন তাঁদের মনস্থির হয়, মনের লয় হয়, তখন তাঁদের সমাধিলাভ হয়—তখন আপনার ভিতর তাঁহারা ব্রহ্মকে খুঁজিয়া পান। সেই সময় তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। তখন তাঁহাদের ঠিক উপলব্ধি হয় যে, ব্রহ্মই সত্য—জগৎ মিথ্যা। সংসারের ব্যাপার সবই স্বপ্নের মত, ইহার কিছুই ঠিক নহে। নামরূপ সবই মিথ্যা। তিনি যে কি, তা কথায় প্রকাশ করা যায় না; তিনি যে এক জন ব্যক্তি, তা'ও বলবার যো নাই। তিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত। ইহাই ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্ম। বেদান্তবাদীরা জ্ঞানী, তাঁহারা ব্রহ্ম নিয়েই বিচার করেন।

ভক্তরা ঠিক সেরূপ ভাবেন না। তাঁহারা জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা জগৎটা সত্য—ইহা ভগবানের ঐশ্বর্য্য;—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, পশুপক্ষী, পাহাড়, বন, সবই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, আমরা সব তাঁহার তৈয়ারী জিনিস। সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। তাঁহার তৈয়ারী জিনিস—সবই তাঁর ঐশ্বর্য্য। ভক্ত ভাবেন,—তিনি প্রভু, আমি দাস। তিনি পিতা, মাতা, আমি সন্তান। তিনি পূর্ণ, আর আমি অংশ। ভগবানের দাস হ'য়েই আমার সুখ। ভক্ত বলতে চান না যে, আমিই ব্রহ্ম। ভক্ত "চিনি হতে চান না, চিনি খেতে চান"।

যোগী আর একভাবে ভগবানকে চান। ভগবানের সাক্ষাৎ করিতেই যোগীরা চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিষয়ে মন দেন না। মনটাকে বিষয় থেকে কুড়িয়ে নিয়ে পরমাত্মার সহিত যোগ করিতে চান। সেই জন্য তাঁহারা প্রথমে নির্জ্জনস্থানে স্থির আসনে ব'সে সকল বিষয়চিন্তা ছেড়ে পরমাত্মায় মন দেন। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যোগই যোগীদের উদ্দেশ্য। যোগিগণ ভগবানকেই পরমাত্মা বলেন।

নামের তফাৎ।

(৩) পরমহংসদেব বলতেন,—"সব এক, দুর্গা, কালী, ব্রহ্ম—সবই এক, কেবল নামের তফাৎ।"

কথাটা তিনি এইভাবে বুঝাইয়া দিতেন। একটি পুকুরে তিনটি ঘাট আছে। একটা ঘাটের জল হিন্দুরা খায়, তাহারা বলে জল; আর একটা ঘাটের জল মুসলমানরা খায়, তাহারা সেই জলকে বলে পানি; আবার ইংরেজরা আর এক ঘাটের জল খায়, তাহারা বলে ওয়াটার্। ফলে

যে যাই বলুক, বিষয় একই—কেবল নামের বিভিন্নতা। যিনি God, তিনিই কালী, তিনিই শিব, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পরমাত্মা।

যখন আমরা তাঁকে ভাবি যে, তিনি নিষ্ক্রিয়, কোন কিছুই করিতেছেন না, তখন আমরা তাঁকে ব্রহ্ম বলি; আবার যখন আমরা ভাবি যে, তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব কাজই করেন, তখন আমরা তাঁকে শক্তি বলি, কালী বলি, দুর্গা বলি। ফলে কালী, ব্রহ্ম, শিব, সব এক বস্তু।

ভাবের দিক্।

(৪) বেদান্তবাদীরা সংসার ভাবময় দেখেন, তাঁহারা সংসারটাকে স্বপ্নময় দেখেন। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম স্বাক্ষীস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে তিনি একটা গল্প বলিতেন। গল্পটি এই;—

"কোন দেশে একটা চাষা বাস করিত। চাষাটা মস্ত জ্ঞানী। চাষাটার অনেক দিন ছেলে হয় নি। অনেক দিন ছেলে ছেলে ক'রে তার একটা ছেলে হ'লো। ছেলের নাম রাখ্‌লে—হারু। চাষা মনের আনন্দে চাষ বাস করে; কোন দুঃখ-কষ্টের ব্যাপার হ'লে সেটা বড় গায়ে মাখে না। হারুকে সবাই ভালবাসে। মাও ভালবাসে, বাবাও ভালবাসে। গাঁয়ের লোক সবাই ভালবাসে। এক দিন চাষা মাঠে কাজ ক'র্‌চে, এমন সময় একটা লোক এসে চাষাকে বল্লে, "তোমার হারুর কলেরা হয়েছে!" সংবাদ শুনে চাষা তাড়াতাড়ি বাড়ী এল। ছেলেটিকে অনেক চিকিৎসা করা'লে। কিন্তু ছেলেটি বাঁচিল না, মরে গেল। বাড়ীর সবাই ছেলেটির জন্য শোকে কাতর হ'য়ে পড়্‌লো,—কিন্তু হারুর বাপ সেই জ্ঞানী-চাষার কিছুই হ'লো না। সেই আবার সকলকে বুঝাতে লাগ্‌লো,—শোক ক'রে কি হবে, শোক ক'রে কোন ফল নাই। সকলকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে সে আবার মাঠে কাজ কর্‌তে গেল। তাহার মনে কোন বিকার নাই। কিন্তু বাড়ী ফিরে এসে দেখ্‌লে যে, তা'র স্ত্রী খুব কাঁদ্‌চে। সে তখন তা'র স্ত্রীকে আবার বুঝাতে গেল। স্ত্রী বল্লে "তুমি বড় নিষ্ঠুর; তোমার শরীরে মোটে মায়া নেই; ছেলেটার জন্য একবারও কাঁদ্‌লে না? কেমন লোক গা তুমি?" জ্ঞানী-চাষা তখন তাহাকে বুঝাইয়া বলিল,—দেখ, কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখেছি। আমি যেন রাজা হয়েচি, আমার অনেক পাত্র মিত্র জুটেচে, আটটা ছেলে হয়েচে, কত ধন দৌলত ঐশ্বর্য্য হয়েচে। আমি খুব সুখেস্বচ্ছন্দে আছি। তাহার পর ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। এখন মহা মুস্কিলে পড়েছি,—হারুর জন্য শোক করি কি সেই স্বপ্নেদেখা আট আটটা ছেলের জন্য শোক করি!"

চাষাটা জ্ঞানী কি না, তাই সে সিদ্ধান্ত করেছিল যে, ঘুমাইয়া যে স্বপ্ন দেখা যায়, তাহা যেমন মিথ্যা, জাগিয়া এই সংসারটা যেরূপ দেখা যায়, তাহাও তেমনই মিথ্যা। সংসার সবই মিথ্যা।

তিন গুণ।

(৫) সংসারে নানারকমের মানুষ আছে। যা'র যেমন গুণ, সে তেমনই মানুষ হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ। এই তিন গুণেরই ভিন্ন স্বভাব। তমোগুণী লোকের স্বভাব, অহঙ্কার, নিদ্রা, বেশী খাওয়া, কাম, ক্রোধ, এই সব। রজোগুণী লোক আপনাদিগকে সাংসারিক কাজে বড় বেশী জড়ায়। তাহাদের সব ফিট্‌ফাট্; কাপড়-চোপড় ঘর-বাড়ী সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; বৈঠকখানায় ছবি। যখন সন্ধ্যা আহ্নিক বা ঈশ্বরচিন্তা করে, তখন খুব আড়ম্বর করে। তসর গরদ পরে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা দেয়, আবার সেই মালার ভিতর সোণার রুদ্রাক্ষও দুই একটা রাখে; তাহারা খুব জাঁকাল ক'রে ঠাকুরবাড়ী করে। যদি কেউ দেখিতে আসে ত খুব স্ফূর্ত্তির সহিত উহা দেখায় আর বলে, এ দিকে আসুন, দেখুন শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, মার্ব্বেলপাথরের মেজ, ষোল ফোঁকর নাটমন্দির। ভিখারীকে দুমুটো ভিক্ষে দিয়ে খবরের কাগজে তাহা নিজে ঢাক্ পিটায়। লোক জানিয়ে দান করে এবং যা কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করে, সব যশের জন্য—লোকের নিকট বাহাদুরী কর্‌বার জন্য।

সত্ত্বগুণী লোকেরা খুব শিষ্টশান্ত। ইহাদের যেমন তেমন পোষাক হ'লেই হলো, রোজগারে পেট চলে গেলেই হ'লো, টাকার জন্য লোকের মোসাহেবী করে না। কোন বিষয়ের জন্য খুব ব্যস্ত হয় না; মানসম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য করে না। ইহারা গোপনেই ঈশ্বরচিন্তা করে—দানধ্যান ক্রিয়াকর্ম্ম করে। ইহারা যেভাবে কাজ করে, তাহাতে লোকে ইহাদের কাজ টের পায় না।

ব্যায়ামচর্চ্চা।
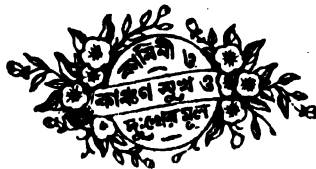
[শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

দেহের পক্ষে ব্যায়ামের (পরিশ্রমের) প্রয়োজন।

মোটা কথায় বলিতে গেলে, আমাদের দেহে চারি প্রকারের জিনিষ আছে; যথা—

১। অস্থি ও তাহার মজ্জা।—অস্থির সাহায্যে আমাদের চলাফেরা ও বসা দাঁড়ান হয় এবং অস্থির মজ্জার দ্বারা রক্তের ক্ষয় পরিপূরিত হয় অর্থাৎ রক্তস্রাবের পর আবার যে শরীরে রক্ত হয়, তাহাও মজ্জার সাহায্যেই হইয়া থাকে।

২। মাংসপেশী।—ইহারই সাহায্যে প্রকৃত চলাফেরার কার্য্য সংসাধিত হয়।

৩। পাকাদিযন্ত্রের গ্রন্থিসমূহ (Glands)।

৪। বসা বা চর্ব্বি।

অপরাপর যে যে অমূল্য যন্ত্রাদি আছে (মস্তিষ্ক ইত্যাদি), তাহাদের সঙ্গে এ প্রবন্ধে আমাদের প্রয়োজন না থাকায়, আমরা তাহাদিগের উল্লেখ করিলাম না। দেহ সুস্থ রাখিতে হইলে, অবশ্য দেহের সকল অংশই সুস্থ রাখা আবশ্যক; নতুবা একটা ব্রণ হইলেও দেহ সুস্থ থাকিতে পারে না। সেরূপভাবে সূক্ষ্ম বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; স্থূলবিচারে ও সাধারণভাবে আলোচনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং আমাদের প্রয়োজনমতই মাত্র চারিটি উপাদানের মধ্যে বসাকে বাদ দিব এবং মাংসপেশীর কথাই প্রত্যক্ষে আলোচনা করিব।

ইতরপ্রাণীদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, প্রত্যেক প্রাণীকেই পরিশ্রম করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে হয়। আর যে যে প্রাণীকে তাহা না করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষা করিবার জন্য বহু আয়াস স্বীকার করা প্রাণিকুলের সাধারণ ধর্ম্ম। সিংহ, ব্যাঘ্র, শৃগালকে বহু দূর হইতে যাতায়াত করিয়া ও বহু আয়াসে শীকারকে হত করিয়া, ততোধিক আয়াস-সহকারে শীকারের মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া গিয়া ও প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত কলহ করিয়া, তবে উদরপূরণ করিতে হয়। খেচরপ্রাণীদের পক্ষে আহার্য্য সহজলব্ধ বটে, কিন্তু আহার করিতে করিতে দণ্ডে দণ্ডে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে হয়। গবাদি নিরীহ পশুদিগের পক্ষে আহার্য্য সুলভ হইলেও, বনে থাকিবার কালে তাহাদিগকে সততই ইতস্ততঃ পলায়নপর হইতে হয় এবং লোকালয়ে মানুষের সেবা করিতে হয়। মানুষকেও এক মুঠা অন্নের জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করিতে হয়। কেবল অল্পসংখ্যক ধনীর সন্তানকেই আরামে বসিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় ভোগ করিতে দেখা যায়। অতএব ইহা বেশ বুঝা গেল যে, পরিশ্রম করাই প্রাণিজীবনের মুখ্যধর্ম্ম। পরিশ্রমের ফলে পরিপাকাদি দৈহিকক্রিয়া নিয়মিতরূপে হইতে থাকায় দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। অতএব স্থূলতঃ বলা যাইতে পারে যে, পরিশ্রম করিলেই সুস্থ থাকা সম্ভব, নতুবা সুস্থ থাকা অসম্ভব।

ব্যায়ামের প্রয়োজন।

হস্তের যে যে পেশীগুলিদ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করা যায়, একবার সেগুলির কথা স্মরণ করুন। শিশুর জন্মকাল হইতে মুষ্টিবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যে পেশীগুলির দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিতে হয়, সেই সেই পেশীগুলি প্রতিনিয়তই সঙ্কুচিতভাবে থাকে। তাহার পরে যতই দিন যায়, ততই বেশী সংখ্যায় আমাদিগকে মুষ্টিবদ্ধ করিতে হয়। যদি ত্রিশ বৎসরবয়স্ক কোনও ব্যক্তি হিসাব করেন, গড়ে কত বার করিয়া তিনি মুষ্টিবদ্ধ করেন, তবে জন্মকাল হইতে অদ্যাবধি কত লক্ষ বার যে তাঁহার মুষ্টিবদ্ধকারী পেশীগুলিকে সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছে, তাহার হিসাব করিলে তিনি বিস্মিত হইবেন। অথচ যদি সঙ্কুচনের সংখ্যার অনুপাতে ঐ সকল মাংসপেশীর উন্নতির কথা ভাবি, তবে স্তম্ভিত হইয়া যাই যে, লক্ষ লক্ষ বার একটি মাংসপেশীকে পরিশ্রম করাইয়াও উহার যথারীতি উন্নতি করিতে পারি নাই। ইহার মূল কারণ কি? কারণ,—অমনোযোগিতা। যে ব্যক্তি মনোযোগের সহিত পাঠাভ্যাস করে, তাহার সহজেই ঐ পাঠ আয়ত্ত হয়; কিন্তু অমনোযোগিতার সহিত সহস্র বার আবৃত্তি করিলেও কস্মিন্‌কালে সামান্য পাঠও ধারণাভুক্ত হয় না! ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধ হইতেছে যে, অমনোযোগের সহিত কেবল কর্ম্মবুদ্ধি-প্রেরণায় কলের মত মাংসপেশীকে পরিশ্রম করাইলে কস্মিন্‌কালে উহার উন্নতি হয় না। মাংসপেশীর উন্নতি করাইতে হইলে প্রত্যেক মাংসপেশীর উপরে ষোল আনা মন ন্যস্ত করিলে তবে তাহার উন্নতি সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির মাংসপেশী সবল, তাহার কার্য্য করিবার ক্ষমতা, আত্মরক্ষার ক্ষমতা ও সমস্ত দেহের উন্নতি বেশী; যাহার মাংসপেশী সবল নহে, সে দুর্ব্বল—পরমুখাপেক্ষী। অতএব এই কর্ম্মকোলাহল-মুখরিত, "বলং বলং বাহুবলং"এর দিনে, "জোর যার, মুল্লুক তার"-যুগে, তীব্র প্রতিযোগিতার কালে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার—ঘাত-প্রতিঘাতের সন্ধিস্থলে মাংসপেশীর প্রাধান্য সহজেই বোধগম্য হওয়া উচিত। মাংসপেশীকে সবল করিতে হইলে, মনোযোগের সহিত মাংসপেশীর সঞ্চালনা একমাত্র উপায়।

কিরূপে ব্যায়াম করা উচিত ?

"ডন", "বৈঠক", কুস্তী, সন্তরণ প্রভৃতি সহস্র উপায়ে ব্যায়ামচর্চ্চা করা যায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, ধনীদিগের মধ্যে মদ্য ও বেশ্যার যত না প্রভাব ছিল, কুস্তী প্রভৃতি করার তদপেক্ষা বেশী প্রচলন ছিল। তখনকারকালের ধনী, জমীদার প্রভৃতি মোটরে করিয়া বাগানে যাইয়া "পার্টি" দেওয়া অপেক্ষা বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া কুস্তী, সন্তরণ, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলা প্রভৃতি করিতে ভালবাসিতেন। এক্ষণে অঙ্গচালনা করা, অসভ্য বর্ব্বরোচিত কায বলিয়া বিবেচিত হয়! এখন "গোলদীঘীতে দু' পাক দেওয়া" যথেষ্ট পরিশ্রমের কাযের মধ্যে পরিগণিত। এমত স্থলে কোন্ রকমের ব্যায়াম সর্ব্বকাল, সর্ব্বব্যক্তি ও সর্ব্বসময়ের উপযোগী, তাহা নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

(১) বেড়ান।—নিতান্ত বালক, বৃদ্ধ ও রুগ্নব্যক্তির পক্ষেই বেড়ানকে পরিশ্রম বলিয়া ধর্ত্তব্য। দ্রুত বেড়াইলে সহজে ক্লান্তি আসে ও হৃৎপিণ্ড অনর্থক উত্তেজিত হয়, অতএব তাহাতে লাভ বিশেষ কিছুই নাই। যুবকের পক্ষে অন্ততঃ ২।৪ ক্রোশের কম বেড়ান পরিশ্রমই নহে।

(২) মুগুরভাঁজা।—ইহাতে বুকের ও হাতের এবং কতক পরিমাণে পেটের পেশীর উপকার হয়, শরীরের অধোভাগের কিছুই হয় না।

(৩) সন্তরণ, দৌড়ান, কুস্তী—এগুলিতে "দম্" বাড়ে ও সর্ব্বশরীরেরই কিছু কিছু উপকার হয়। যাহাদের উদরের পীড়া সহজেই হয়, তাহাদের পক্ষে সন্তরণ করা উচিত নহে।

(৪) "গ্রাউণ্ড এক্সারসাইজ্" অর্থাৎ "জিম্ন্যাষ্টিক" করা।—"ডন্" করা, ফুটবল্ খেলা, কুস্তী করা—প্রবল পরাক্রান্ত বা খুব সবল লোকেরই করা উচিত। আমার মতে বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীদের যে রকম স্বাস্থ্য হইয়াছে, তাহাতে হাল্কা "ডাম্বেল" (Dumbell) লইয়া ব্যায়াম করাই শ্রেয়ঃ। ভারী ডাম্বেল ব্যবহার করা সকলের পক্ষে উচিত নহে। স্যাণ্ডোপ্রবর্ত্তিত স্প্রীংযুক্ত হাল্কা ডাম্বেলের তুলনা নাই। সাধারণতঃ প্রত্যেক ডাম্বেলটা অর্দ্ধ হইতে দেড় সেরের চেয়ে ভারী হওয়া উচিত নহে এবং তের চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতেই উহার ব্যবহার করা উচিত। স্যাণ্ডোপ্রবর্ত্তিত ছবি ও কোমকমতে ব্যায়াম করা খুব ভাল। তবে স্যাণ্ডোর দুইটি কথায় আমার আপত্তি আছে। তিনি প্রত্যেক কস্রতের নিম্নে, কতবার উহা করিতে হইবে, তাহা লিখিয়া দিয়াছেন ; অন্ধবিশ্বাসে তাহার অনুসরণ করা অযৌক্তিক। নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে সংখ্যার পরিমাণ করিয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয় কথা, ব্যায়ামানুশীলনের অব্যবহিতপরেই শীতল জলে ঝম্পপ্রদান বা অবগাহন করা স্যাণ্ডোর মতে উচিত ; আমার তাহাতেও আপত্তি আছে। বেশ করিয়া বিশ্রাম না করিয়া তাহা করা অনুচিত।

ডাম্বেল না হইলে যে ব্যায়ামচর্চ্চা হয় না, এমন কথা আমি বলি না। পূর্ণমনোযোগের সহিত দেহের প্রত্যেক অংশকে কার্য্যে লাগাইলে অর্থাৎ ইচ্ছামত মাংসপেশীগুলির ধীরে অথচ সজোরে সঙ্কোচন-প্রসারণ বারংবার করিলেও সুন্দররূপে ব্যায়াম করা যায়। অপরের দ্বারা বিশিষ্টরূপে তৈলাভ্যঙ্গ করিলেও বেশ ব্যায়াম করা হয়। মাটি কাটা, বৃক্ষচ্ছেদন করা, কূপ হইতে জলোত্তোলন করা—রীতিমত-ভাবে এগুলি করিলেও বেশ ব্যায়াম করার কায হয়। বস্তুত যে কোনও কায করিবার কালীন তত্তৎ কাযের জন্য শরীরের যে যে অংশের পরিশ্রম হইতেছে বা হইতে পারে, সেই সেই অংশের ও কাযের দিকে মনোযোগ করিয়া পরিশ্রম করিলেই ব্যায়ামের সুফল ফলিবে।

কাহার পক্ষে ব্যায়াম সহ্য হয় ?

নিতান্ত ব্যাধি ও জরাগ্রস্ত ব্যক্তি এবং শিশু ব্যতীত ব্যায়াম করিলে সকলেরই সহ্য হয় এবং উপকার হয়। আমার মতে প্রত্যেক প্রকাশ্য পরীক্ষার সঙ্গে ব্যায়ামপরীক্ষা অবশ্যগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। যেমন মাইনর, ছাত্রবৃত্তি, ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট প্রভৃতি পরীক্ষার "টেষ্ট" পরীক্ষা আছে, যাহাতে সফল না হইলে, প্রকাশ্য সাধারণপরীক্ষায় ছাত্রদিগকে উপস্থিত হইতে দেওয়া হয় না, তেমনই ব্যায়ামের সম্বন্ধেও একটা বাঁধাবাঁধি এমন নিয়ম হওয়া উচিত যে, ছাত্রদিগের মানসিক উন্নতির পরীক্ষার অনুপাতে, শারীরিক উন্নতির পরীক্ষাদানও অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া চাই। এ দিকে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

আর এক কথা। আমাদের দেশে আজকাল লাইব্রেরী বা পাঠাগারের বাহুল্য হইতেছে। তাহার ফলে প্রকৃত জ্ঞান বাড়িতেছে কি না, তাহা জানি না, তবে রাশি রাশি উপন্যাস ও কবিতার বন্যা আসিয়াছে এবং যেটুকু সময় ছাত্রগণ বিশুদ্ধ বায়ুসেবনে বা অঙ্গচালনায় ব্যয় করিত, সেটুকু অলস, খোসগল্প ও উপন্যাস বা কবিতাপাঠে ব্যয়িত হইতেছে!

পুরুষেরা স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, নানা উপলক্ষে নানা রকমে অঙ্গচালনা করিতে ও নির্ম্মল বায়ু-সেবন করিতে অবসরও পান—বাধ্যও হন। কিন্তু রমণী-দিগের পক্ষে কদাচিৎ বিশুদ্ধ বায়ুসেবন করা সম্ভবপর হইলেও গৃহকার্য্যে যেটুকু অঙ্গচালনা হয়, তদ্ব্যতীত ব্যায়ামের সুযোগ কখনও হয় না। ধনিগৃহে রমণীর পক্ষে ব্যায়ামের কথা মুখে আনাও ধৃষ্টতা এবং আমার মনে হয়, রমণীদিগের পক্ষে ব্যায়ামের কথা উত্থাপন করাটাই বর্ব্বরতা বলিয়া উপেক্ষিত হইবে! হউক, তাহাতে দুঃখিত নহি। তাহা সত্ত্বেও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছি যে, প্রত্যেক স্বামীর কর্ত্তব্য—স্ত্রীর ব্যায়ামচর্চ্চা করান, প্রত্যেক পিতার

কর্ত্তব্য—কন্যার ব্যায়ামচর্চ্চা করান। অনেক রমণীর ব্যায়াম করিবার ইচ্ছা বা সুযোগ থাকিলেও পাছে ব্যায়াম করার ফলে স্ত্রীলোকসুলভ লাবণ্যের বা অঙ্গসৌষ্ঠবের সৌন্দর্য্যের হানি হয়, এই ভয়ে তাঁহারা ব্যায়াম করিতে অনিচ্ছুক। তদুত্তরে আমি অতিশয় দৃঢ়তাসহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, রমণীর কমনীয়তার হ্রাস হওয়া দূরের কথা, ব্যায়াম-চর্চ্চার ফলে রমণীর শ্রী-সম্পদ্ শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে। ব্যায়াম করিলেই পৌরুষভাব—কঠোরভাব আসে না। এটি যাঁহার ধারণা, তিনি ভ্রমে পতিতা। আজ তাই করযোড়ে ভারতের মা-লক্ষ্মীদের প্রতি নিবেদন করিতেছি, তাঁহারা ঘরে ঘরে ব্যায়ামচর্চ্চায় রত হউন। আমাদেরই দেবী—মা দুর্গা, মা চণ্ডী, মা কালী। আর আজ আমরা রেলে যাতায়াতকালীন নরপশুর কুৎসিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারি না!

ব্যায়াম-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

(১) প্রাতে শয্যাত্যাগের সময়—শরীরের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল সময়। অতএব নিদ্রাত্যাগের পরে, কিছু সামান্য না খাইয়া কখনও ব্যায়াম করিতে নাই।

(২) সমস্ত দিন পাঠের বা অপর কোনও শ্রমজনক কাযের পর ব্যায়াম করিতে নাই।

(৩) পেট ভরিয়া ভোজনান্তে অন্ততঃ ৩।৪ ঘণ্টা ব্যায়াম করিতে নাই। কারণ, ভোজনের পরে উদরে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী রক্ত যাওয়া উচিত।

(৪) খোলা যায়গায় ব্যায়াম করিতে হয়; গৃহের মধ্যে ব্যায়াম করা অনুচিত।

(৫) ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিলেই উপকার পাওয়া যায় না; দু'এক মাস রীতিমত ব্যায়াম করার পরে তবে সুফল পাওয়া যায়। প্রত্যহই ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করিলে, ক্ষণিক পরে ব্যায়াম করিতে করিতে দেহ বেশ হাল্কা বোধ হইতে থাকে; ঠিক্ সেই সময়েই ব্যায়াম করা বন্ধ করা উচিত। কিন্তু ঐ অবস্থায় মনে হয়, আরও একটু ব্যায়াম করিলে আরও শারীরিক উন্নতি হইবে এবং এই ভ্রান্তবিশ্বাসের বশে বেশী ব্যায়াম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। ব্যায়ামান্তে ক্লান্তি থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, অতিরিক্ত ব্যায়াম করা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে শরীরের অপকার বৈ উপকার হয় না।

(৬) ব্যায়ামের পর অন্ততঃ ১৫।২০ মিনিট ঠিক্ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বা বেড়াইয়া বেড়ান উচিত। তৎক্ষণাৎ বসিলে শরীরের পক্ষে অপকার সংসাধিত হয়।

(৭) রীতিমত ও ধারাবাহিকরূপে শরীরের প্রত্যেক অংশকেই সঞ্চালিত করা কর্ত্তব্য।

(৮) শীঘ্র শীঘ্র বা অমনোযোগের সহিত ব্যায়াম করিলে লাভ নাই। [ক্রমশঃ।

সন্তরণবিদ্যা।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

কথায় বলে,—"যা'কে রাখো, সেই রাখে।" এই সংসারে থাকিতে হইলে সর্ব্বাবস্থায় মানুষকে সুখী হইবার মতন উপযুক্ত করিয়া লইতে হয়। কোন একটা জায়গায় যদি ভুলচুক্ থাকিয়া যায়, হয় ত বা ঐ ভুলের জন্যই মানুষকে কত দুঃখ কষ্ট পাইতে হয়।

অর্থ মানুষকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দিতে পারে না; আবার কেবল বলও মানুষের সুখের নিদান হয় না; যদি জ্ঞানই মানুষের সুখের সর্ব্বস্ব হইত, তবে নেতি নেতি করিয়া মানুষ আরও 'কিছু'র অনুসন্ধান করিত না; কিন্তু সর্ব্বদিক্ আলোচনা করিয়া—সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞানবিদ্যালাভ করিয়াও যদি সুখী হইতে না পারে, তাহা হইলে উহাকে দৈবের স্কন্ধে চাপিয়া আপাততঃ মানুষকে শান্ত হইতে হয়।

আমরা পূর্ব্ববারে ব্যায়ামের কথা বলিয়াছি। সর্ব্বাঙ্গঃসুন্দর হইতে হইলে কোন কোন পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলেন,—"ডাম্বেল" ব্যায়ামই যথেষ্ট। স্যাণ্ডো প্রভৃতি সেই মতের পোষক। আমাদের ভারতভূমিতে অনেক বলবান্ ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা দৈহিকবলের জন্য সর্ব্বত্র সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

স্থলে আমাদের ভয় বড় বেশী নহে। দৈহিক-বল ও কল-কৌশলদ্বারা অনায়াসে অনেক সময়ে স্থলজ বিপদ্গুলি নিবারিত করা যায়, কিন্তু জলজ বিপদ্ নিবারণের জন্য নিজস্ববিদ্যা জানা না থাকিলে জীবকে বিশেষ বিপদেই পতিত হইতে হয়।

আমরা মনে করি, যাহাতে জলকেও আয়ত্তাধীন করিয়া মানুষ জল হইতে নির্ভয় হইতে পারে, তাহা সকলেরই করা উচিত। আপাততঃ আমরা সেই জন্যই সন্তরণবিদ্যার কথা উল্লেখ করিতেছি।

মানুষ যাহা কিছু করে, তাহার মধ্য হইতেই একটা

কিছু সুখ বোধ করে বলিয়াই সকল কার্য্য আগ্রহের সহিত করে। পদতাড়নায় বল্ খেলা অর্থাৎ ফুটবল্ খেলা, হস্তদ্বারা বল্ খেলা, ঘোড়ায় চড়া, এই সকল ব্যায়ামদ্বারা আমোদ পায়, কিন্তু নৌকায় চড়া ও নৌকাচালনা এবং সন্তরণবিদ্যাদ্বারাও প্রচুর আমোদ উপভোগ করা যায়। সন্তরণবিদ্যাদ্বারা সময় সময় জলে কোন বিপদ্ উপস্থিত হইলে আত্মরক্ষা ও পররক্ষা দুই কার্য্যই সমাধা হয়।

সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করাটা যে আজকালকার কথা, তাহা নহে। বলরাম পত্নীগণসহ প্রভাসতীরে সমুদ্র-বেলায় নিত্য:নিত্য জলক্রীড়া করিতেন। যমুনায় গোপবধূগণ নানাপ্রকার জলক্রীড়া করিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। আমাদের আধুনিক কালেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চন্দ্রশেখর গ্রন্থে শৈবলিনীর সন্তরণপটুতার বিবরণ আঁকিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বেও আমাদের দেশের কুলকন্যা ও কুলবধূরাও বিশেষ-ভাবে সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। অবসরমতন খিড়কীর পুকুরে সমসহচরীগণসঙ্গে মেয়েরা যথেচ্ছ জলকেলি করিয়া নির্দ্দোষ আমোদ উপভোগ করিতেন। আমাদের দেশে প্রায় সম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-মাত্রেরই সদরে ও অন্দরে পুষ্করিণী বা দীঘী থাকিত। অন্দরের পুকুরে মেয়েরা স্নানাদি কার্য্য সমাপন করিতেন এবং পুরুষেরা সদর পুকুরেতে স্নানাদি কার্য্য করিতেন। বধূমাতারা ও দুহিতারা, এমন কি, প্রাপ্তবয়স্কা মাতারাও আমোদ আহ্লাদ করত খিড়কীর বা অন্দরের পুকুরে সাঁতার দিতেন, জলকেলি করিতেন এবং তাঁহাদের নির্দ্দোষ আমোদে নির্জ্জন সরসী ফুল্ল হইয়া উঠিত। দেশ হইতে কাল-সহকারে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ উঠিয়া গিয়াছে; নিজ-গৃহে স্বজনসঙ্গে পারিবারিক বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদ লুপ্ত হইয়াছে। কালধর্ম্মসহকারে গৃহ-সংসার এখন দুঃখের আগার হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের দিনগুলি নিরর্থক চিন্তায়, ঝগড়া-বিবাদে, ক্রন্দন-কোলাহলে অতিবাহিত হই-তেছে। ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়া সুখের সংসার পাতিয়া, বধূতে বধূতে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া শান্তির ঘরকন্না করিয়া আর কেহ সুখী হইতে চাহে না। বড়লোকবাবুরা বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া বিদেশে বিভূমে 'বাসাড়ে' হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহের পল্লীভবনের জলাশয়গুলি এখন সলিলশূন্য সরসী, গৃহগুলি মানবশূন্য গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে।

সন্তরণে হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি জন্মে; বাহুতে ও পদযুগলে যথেষ্ট বল বৃদ্ধি হয়। কেবল যে পুরুষেরাই শারীরিক শক্তিলাভের চেষ্টা করিবেন তাহা নহে, মেয়েদিগকেও শরীরের বলাধানের রীতিমত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ব্যায়ামদ্বারা যেমন শরীরের মাংসপেশীগুলি সুসংন্যস্ত হয়, তেমনই শরীর নীরোগ হইয়া জীবনেও যথেষ্ট আরাম দেয়। কিন্তু আধুনিক কালে প্রায় ব্যায়াম-চর্চ্চাদি পুরুষমহল হইতেই উঠিয়া গিয়াছে, মেয়েদের কথা ত দূরে! ফলে গৃহে গৃহে রোগযন্ত্রণা এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, কচিৎ কোন গৃহস্থঘরে একখানি হাসিমুখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যাহা হউক, আমরা এখন সন্তরণবিদ্যাসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাঁতার শিক্ষা করিলে জল হইতে যেমন ভয় থাকে না—আত্মরক্ষাদ্বারা নিজেও যেমন রক্ষা পাওয়া যায়, সময়ে সময়ে অপর নিমজ্জিত ব্যক্তিকেও উদ্ধার করিয়া মহাধর্ম্ম লাভ করা যায়। ধনী, দরিদ্র, যুবক, বৃদ্ধ, সকলেরই সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করা উচিত এবং প্রত্যেক গৃহস্থেরও পুত্রের ন্যায় কন্যাগুলিকেও সমভাবে আপনাদের পুকুরে সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা সাঁতার কাটিলে দেহ যেমন জলময় হয়, তেমনই স্বাস্থ্যেরও আশ্চর্য্য প্রকারের উন্নতি হইয়া থাকে। সন্তরণে বুকের শক্তি বাড়ে এবং সর্ব্বদা জলে ক্রীড়া করিলে আর ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইবার ভয় থাকে না।

প্রথম চিত্র।

ঐ যে উপরে চিত্রটি দেখিতেছেন, উহা সাঁতার শিখিবার প্রথম অবস্থা। যাহারা সাঁতার জানেন না, তাঁহারা প্রথমে একটি কলসী লইয়া পুকুরাদিতে সাঁতার শিক্ষা করিতে পারেন। ঐ দেখুন, কলসীকে দুই পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া প্রথম শিক্ষার্থী জলের উপর ভাসিতেছেন। অনেকে জল দেখিলেই ভয় পান, পাছে ডুবিয়া যান; কিন্তু ক্রমে অভ্যাস করিতে করিতে জলে ডুবিয়া মরিবার ভয় দূর হইয়া যায়। প্রথম-শিক্ষার্থিগণ একটি কলসী কিম্বা অপর কোন ভাসমান দ্রব্যের সাহায্যে সাঁতারশিক্ষা করিতে পারেন। জলে নামিয়া গা ভাসাইয়া প্রথমে জলে হস্তচালনা ও পদচালনা অভ্যাস করিতে হয়। কলসীদ্বারা সে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া যায়। পরপৃষ্ঠায় দ্বিতীয় চিত্র দেখুন। কলসীকে দুই হাতে ঠিক্ সোজাভাবে শক্ত করিয়া ধরিয়া পা দুইখানি ছড়াইয়া দিয়া প্রথমশিক্ষার্থী কেমন সাঁতার অভ্যাস করিতেছে।

দ্বিতীয় চিত্র।

তার পর দেখুন,—সাঁতার কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত হইয়া গেলে এবং জলের ভীতি ভাঙ্গিলে কলসী ছাড়িয়া তখন কি প্রকারে সাঁতার দেওয়া যায়, তাহা তৃতীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় চিত্র।

মুখখানিকে জলের উপর ভাসাইয়া রাখিয়া পদদ্বয় সোজা করিয়া জলের উপর দুই হাতে জল আকর্ষণ করিয়া কেমন সাঁতার দিতেছে। সাঁতার দস্তুরমত অভ্যস্ত হইলে চতুর্থ ও

চতুর্থ চিত্র।

পঞ্চম চিত্র অনুযায়ী সাঁতার দেওয়া যায়। কখনও কাত্ হইয়া, কখনও ডাইনে ঘুরিয়া, কখনও বামে বেঁকিয়া হাত পা ছড়াইয়া বেশ সহজ অবস্থায় সাঁতার দিতেছে।

সাঁতার দিবার সময়ে বিশেষভাবে দেখিবে যেন কাপড় না জড়াইয়া যায়। চিত্রে যেমন পোষাকের নমুনা রহিয়াছে ঐরূপ পোষাক অথবা লুঙ্গি কি ছোট কাপড় শক্ত করিয়া আঁটিয়া পরিয়া তবে সাঁতার দেওয়া উচিত। প্রথমেই বহুদূরে যাওয়া উচিত নহে এবং একাকী নদীতে বা পুকুরে অপদ্ম সঙ্গী না থাকিলে সাঁতার দেওয়া কখনও কর্ত্তব্য নহে।

পঞ্চম চিত্র।

নিম্নে ষষ্ঠ চিত্র দেওয়া গেল। উহা চিৎ হইয়া সাঁতার দেওয়ার নিয়ম। প্রকৃতির উপাসক বা যাঁহারা সুমিষ্ট সঙ্গীত করিতে পারেন, তাহারা চিৎ হইয়া প্রকাণ্ড সরসীবক্ষে কিম্বা নদীবক্ষে সাঁতার কাটিতে কাটিতে সঙ্গীত করিতে করিতে গভীর রজনীতে অনন্ত আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ দেখিতে দেখিতে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

ষষ্ঠ চিত্র।

এই ষষ্ঠ চিত্রে চিৎ হইয়া সাঁতার দিবার যে নমুনা দেখাইলাম, উহা বড় আরামপ্রদ। যাঁহারা ভাবরসে ডগমগ, নির্জ্জন নিরালা প্রাণ, যাঁহারা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে চাহেন, অথচ জলকেলিদ্বারাও প্রাণে আনন্দভোগ করিতে চাহেন, তাহারা সন্ধ্যার আঁধারে নির্জ্জন নদীবক্ষে সাঁতার কাটিয়া বিভুগুণ গাহিতে গাহিতে প্রাণারাম আনন্দ-ভোগ করিতে পারেন। তার পর দাঁড়াইয়া সাঁতারকাটা।
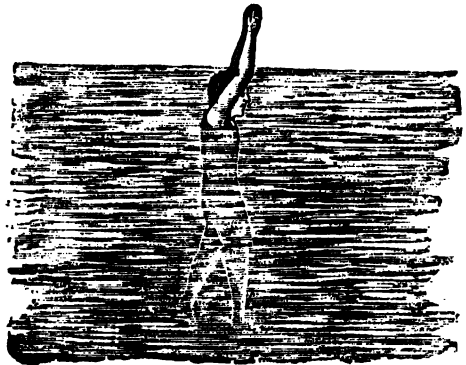
সপ্তম চিত্র।

সপ্তম চিত্রে তাহাই দেখাইতেছি। কেমন করিয়া দাঁড়াইয়া

সাঁতার কাটিতেছে। স্থলভূমে যেমন এক পা এক পা করিয়া পথ অতিক্রম করা যায়, জলেতেও একবার অভ্যস্ত হইলে ঐ জলে দাঁড়াইয়া এক পা এক পা করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া যায়। দাঁড়াইয়া সাঁতার কাটিতে ভারী আমোদ।

দাঁড়াইয়া সাঁতার কাটিতে হইলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইতে হইবে। কখনও বা হাত দুইখানি উপরে তুলিয়াও রাখা যায়, কখনও জলের নিম্নে রাখিয়া শুধু মাথাটি জাগাইয়া সাঁতার দেওয়া যায়। আকণ্ঠজলে নিমজ্জিত হইয়া যাঁহারা সঙ্গীত করেন, সহজে তাঁহাদিগের সুর সমাধান হইয়া থাকে। উহাতে গলার স্বর সুন্দর ও সুমিষ্ট হয় এবং রাগরাগিণী আলাপন করিতে বড়ই সুবিধা হয়।

অষ্টম চিত্র।

অষ্টম চিত্র :— ডুবিয়া ডুবিয়া সাঁতারকাটা। অপরের অলক্ষ্যে জলের ভিতর দিয়া মাছের মতন সাঁতার কাটিয়া চলিয়া যাওয়া কম বীরত্বের কথা নহে। উহাতে বহু বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। যদি খুব ভাল স্বাস্থ্য হয় এবং দস্তুরমত জলসাধন করা যায়, তাহা হইলে শত্রু আক্রমণ করিলে জলের ভিতর দিয়া ডুবিয়া সাঁতার কাটিয়া শত্রুর অলক্ষ্যে বহু দূর চলিয়া যাওয়া যায়।

আমরা এমন অনেক লোক দেখিয়াছি, যিনি বিশেষ সন্তরণপটু অথচ শরীরে যথেষ্ট শক্তি রাখেন এবং অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জলের ভিতর থাকিতে পারেন, এক ডুবে ৬০।৭০ হাত দূর পর্য্যন্তও যাইতে পারেন।

খরস্রোতা নদীতে স্রোতের বিপরীতদিকে সাঁতার কাটিয়া অনেকে অনেক বীরত্ব দেখাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক এক সময়ে কাশীর একটানা একস্রোতা গঙ্গায় বর্ষার সময়ে বিপরীত স্রোতে কাশী নগরীর দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে রামনগরের রাজবাটীর ঘাট পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিয়া গিয়াছিলেন! ভাবিয়া দেখুন, সে কিরূপ বীরত্বের কার্য্য। গঙ্গাস্রোত মত্তমাতঙ্গকে পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যায়; তাহাতে বৃদ্ধবীর তিলক অনায়াসে অতটা নদীপথ সন্তরণে অতিক্রম করেন। বর্ষার কাশীর গঙ্গা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, উহা কিরূপ অসমসাহসিক কার্য্য।

সাঁতার শিক্ষা দিবার যত রকম চিত্র দেখাইতে হয়, আমরা তাহা দেখাইলাম। উহা ব্যতীতও জলে নানাপ্রকার কসরৎ বা ব্যায়াম করা যায়।
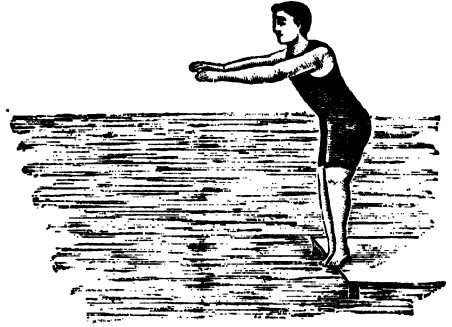
নবম চিত্র।

নবম চিত্রে দেখুন,—তীরভূমি হইতে কেমন অকুতো-ভয়ে জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া পড়িতেছে। যাঁর যেমন শক্তি, তিনি তেমন করিয়া ঝম্প দিতে পারেন।
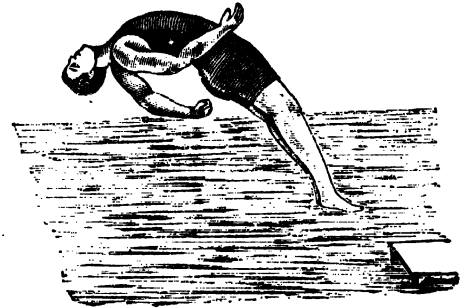
দশম চিত্র।

দশম চিত্রে দেখুন,—পিছন ফিরিয়া কেমন করিয়া জলে পড়িতেছে।
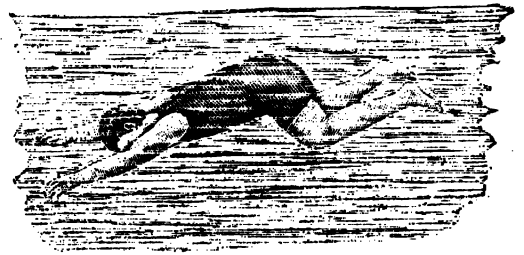
একাদশ চিত্র।

একাদশ ও দ্বাদশ চিত্রেও দেখুন,—সুদক্ষ সন্তরণপটু

যুবক নির্ভয়ে জলে ঝম্পপ্রদান করিয়া একেবারে অতল জলের ভিতর দিয়া যাইতেছে।

দ্বাদশ চিত্র।

দ্বাদশ চিত্রে যদৃচ্ছাক্রমে সাঁতার দিবার নমুনা।—একবার মুখখানি দেখুন,—কেমন নির্ভয়!

এই বারোখানি চিত্রে সাঁতারসম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিলাম। সাঁতারবিদ্যার আলোচনা যে কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত, তাহা নহে; পাশ্চাত্যভূখণ্ডেও সচরাচর সকলে সাঁতারবিদ্যা অভ্যাস করেন; এমন কি, মেয়েরাও সমুদ্রে গিয়া বা হ্রদে নামিয়া সাঁতার অভ্যাস করেন। বালক-বালিকাদিগকে শিশুবেলা হইতেই সন্তরণ-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাঁতারশিক্ষা করিলে বহু উপকার সাধিত হয়। পাশ্চাত্যদেশে প্রথম সাঁতারশিক্ষার্থীরা চামড়ার থলে, রবাবের থলে এবং অন্য প্রকারের ভাসমান দ্রব্যেরও সাহায্য লইয়া সাঁতার অভ্যাস করে। আমাদের দেশের পাড়াগাঁয়ের ছেলেরা কলাগাছ বা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড ধরিয়া ভাসিয়া সাঁতার অভ্যাস করে।

সংসারে বাস করিতে হইলে আপনাকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করাই উচিত।

আমরা বাঙ্গালার ধনী,দরিদ্র, যুবক, যুবতী, বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ, সকলকেই এই সন্তরণবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করি। উহাতে যেমন জলে ব্যায়ামদ্বারা দৈহিক উন্নতি হইয়া থাকে, তেমনই মনেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়।
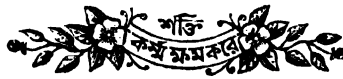
সঙ্গীতশাস্ত্র।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

২

স্বর-বিজ্ঞান।

যদি একটি জলপূর্ণ পাত্রে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহা কাঁপিতে থাকে এবং তদীয় কম্পন জলমধ্যেও সঞ্চারিত হয়। যদি সেই জলপূর্ণ পাত্রের তিন চারি হাত অন্তরে এক খণ্ড কাগজ ধরিয়া ঐ পাত্রটিকে বিলক্ষণ আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ পাত্রের কম্পন বায়ুতে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ প্রসার হইতে হইতে সেই কাগজে আসিয়া আঘাত করে। কাগজ অচেতন বলিয়া তাহার ধমনীসংযোগগত কোন অনুভব শক্তি নাই; যদি চেতনা-সংযুক্ত হইত, তাহা হইলে ধমনীযোগে অবশ্যই উক্ত বায়বীয় কম্পন অনুভব করিতে পারিত। আমাদিগের সজীব ধমনীযোগে কর্ণপটহদ্বারা উক্ত সূক্ষ্ম বায়বীয় কম্পন অনুভব করা যায়। উক্ত কম্পনজনিত ঘাতপ্রতিঘাতের স্থূল সূক্ষ্মতা আমাদিগের নিজ নিজ চৈতন্যশক্তি জাগাইয়া দেয়; আমরা যত দূর পারি, উহার গতির পশ্চাদ্‌গামী হইয়া জ্ঞানার্থ সংযোগী হই।

ধ্বনি দুই প্রকার:—আকৃতি ও সুকৃতি। কোন বস্তুতে অন্য বস্তুর অভিঘাতে যে অপরিস্ফুট ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া শ্রবণগোচর হয়, তাহার নাম আকৃতি। যে ধ্বনিদ্বারা কোন বস্তু নির্দ্দেশিত কিম্বা কোন মানসিক ভাবাদি ব্যক্ত হয়, তাহাকে সুকৃতি কহে।

আকৃতি-ধ্বনি দুই প্রকার:—কর্কশ ও সুশ্রাব্য। যে ধ্বনি এরূপ কম্পনসমূহদ্বারা উৎপাদিত হয়, যাহারা অসমান ও অনিয়মিতকালে পরস্পরের অনুগামী হইয়া থাকে, সেই ধ্বনি শ্রবণের অসুখ জন্মায় বলিয়া তাহাকে কর্কশ বলে। আর যে ধ্বনি সমকালস্থায়ী কম্পনদ্বারা উৎপন্ন হয় এবং শ্রবণে তৃপ্তি জন্মায়, তাহাকে সুশ্রাব্য বলে। এই সুশ্রাব্য-ধ্বনিই সঙ্গীতের স্বর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে এবং এই ধ্বনিই স্বর ও কালের বিশেষ নিয়মে ধ্বনিত হইলে গীত-বাদ্যাদিরূপে পরিণত হইয়া সঙ্গীত উৎপন্ন করে, এই নিমিত্ত সঙ্গীতশাস্ত্রে এই ধ্বনিকে 'সার্থ' কহা যায়।

সঙ্গীতশাস্ত্রে ধ্বনি সপ্তখণ্ডে বিভক্ত ও স্বর নামে নির্ণীত হইয়াছে; যথা—

"ষড়জঋষভগান্ধারা মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরাঃ সপ্ত প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থাৎ ষড়জ বা খরজ, ঋষভ বা ঋখব, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ বা নিখাদ—এই সপ্ত প্রকার স্বর। ইহার প্রত্যেককে এক একটি ধাতু বলে। যন্ত্রে গলার সহিত ঐক্য করিয়া ঐ সপ্ত স্বরের আগ্যক্ষরগুলি পৃথক্ পৃথক্ ব্যঞ্জক-স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; যথা—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি।

সঙ্গীতশাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, উক্ত ষড়জ প্রভৃতি সপ্ত স্বর সাত প্রকার পশুর স্বাভাবিক নিখুঁত ধ্বনি হইতে গৃহীত হইয়াছে। যথা—

"ময়ূরঃ ষড়জমাখ্যাতি ঋষভং ব্যক্ত চাতকম্।
ছাগোগান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্॥
কোকিলঃ পঞ্চমঃ ক্রূতে ভেখো বদতি ধৈবতম্।
নিষদং ভাষতে হস্তীস্বোতদ্ ব্রহ্মাদি সংমতম্॥"

অন্য প্রকার যথা :—

"ময়ূরা বৃষভমেষঃ কাককোকিল বাজীনো।
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণার্হ স্বরানেতান্ সুদুর্গমাৎ॥"

ময়ূর অথবা খররব হইতে খরজ, বৃষভ অথবা ভেক বা চাতক হইতে ঋষভ, ছাগ অথবা গাভী হইতে গান্ধার, শৃগাল অথবা বক হইতে মধ্যম, কোকিল হইতে পঞ্চম, অশ্ব হইতে ধৈবত এবং হস্তী হইতে নিখাদ।

সুরের আবার সাময়িক কম্পনদ্বারা ওজন বা পরিমাণ নির্ণয় করা গিয়া থাকে। যেমন এক সেকেণ্ডে যত সংখ্যক কম্পনে মধ্যসুর উৎপন্ন হয়, তাহার ন্যূন হইলে সেই সুর খাদ হয় এবং তাহার অধিক কম্পন হইলে উচ্চ হয়। সুরের উচ্চতা ও মৃদুতা অনুসারে তাহাদিগের মধ্যে যে পরস্পর ভিন্নতা, তাহাকেই সুরের পরিমাণ বা ওজন বলে। আবার সুর সমান ওজনবিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ কম্পনে উচ্চ বা নীচ না হইলে তাহাকে সম-সুর কহে। এই ত্রিবিধ প্রকার সুর গানের সময় চিনিয়া লওয়া বিশেষ কঠিন নয়। কম্পনক্ষম বস্তুর গুণভেদেই স্বরের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। যে সকল স্থিতিস্থাপক পদার্থের কম্পনে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই শব্দ কিঞ্চিৎকাল স্থায়ী হইলেই সেই পদার্থ হইতে সাঙ্গীতিক সুর নির্গত করা যাইতে পারে। সংকর্ষিত চর্ম্ম, তন্ত্র অথবা একটি-মাত্র দ্বারযুক্ত শূন্যগর্ভপাত্র হইতে সাঙ্গীতিক কম্পন উৎপন্ন হয়।

একটি সুরের ওজন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ চড়িয়া গেলে তারপর এমন একটি উচ্চ সুর উৎপন্ন হয়, যাহার কম্পনসংখ্যা প্রথম নির্দ্দিষ্ট সুরের কম্পনসংখ্যার ঠিক দ্বিগুন। সুতরাং দ্বিগুণতর কম্পনে তাহার দ্বিগুণতঃ উচ্চ হইয়া থাকে, অতএব ঐ দ্বিতীয় সুরটি প্রথম নির্দ্দিষ্ট সুরের দ্বিগুণ উচ্চ। এই প্রকার সুর যতই উচ্চ হইবে, ততই নিম্নের প্রত্যেক সুরের সহিত মিলিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে সাতটিই উৎপন্ন হয়, কিন্তু সাত সুরের অধিক কখন হয় না। সুরের এইরূপ স্বাভাবিক ধর্ম্ম থাকাতে অস্মদ্দেশীয় সূক্ষ্মদর্শী আর্য্য-সঙ্গীতবেত্তারা শব্দসমুদ্র মন্থন করিয়া এই অপূর্ব্ব স্বররত্ন উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেইকালে তাঁহারা সাতটির অধিক স্বর পান নাই। কেননা, সাতটির অধিক করিতে গিয়া পুনরায় সেই নীচের ষড়জাদির সহিতই ক্রমে মিলিত হইয়া যায়। এইরূপ স্বাভাবিক স্বর-বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ তাহার অনন্তবিস্তারে সমর্থ হইয়া অনন্তসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

এক সুর হইতে অপর সুরের মৃদুতা ও উচ্চতার দূরতাকে সাঙ্গীতিক অন্তর বলে। সা সুর হইতে ক্রমে সপ্তম সুর অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধে গমন করাকে অনুলোম আর ঐ প্রণালীতে নিম্নে আগমন করিলে বিলোম বা অবরোহী বলিয়া থাকে; হিন্দীতে আরোহী অবরোহীকে আরো ও অব্রো বলে। সুরের পরম্পরাগত অনুলোমিক বা ঠেলো-মিকক্রিয়াকে স্বরগ্রাম—সার্ গাম্ কহে। যথা—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, কিম্বা নি, ধা, পা, মা, গা, ঋ, সা। সুরের ক্রমশঃ উচ্চগতিতে সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি ব্যবহৃত হয় এবং নিম্নগতিতে উহাদেরই বিপরীত অর্থাৎ নি, ধা, পা, মা, গা, ঋ, সা, এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ঐ সাতটি সুরকে একত্রে সপ্তক কহে এবং কোন সুর হইতে তাহার সপ্তম সুর পর্য্যন্ত সুরের যে উচ্চতা বা গম্ভীরতা, তাহাকেও সপ্তক কহে। এই সপ্তকে সঙ্গীতের সম্বন্ধে সকল কার্য্যের সমাধা হয় না। ইহাপেক্ষা আরও চড়া বা গম্ভীর সুরের আবশ্যক হয়। সাতটি সুরের অধিক নাই, সুতরাং সে স্থলে আবশ্যকমত গম্ভীরতর ও উচ্চতর স্বরগ্রাম অর্থাৎ দ্বিতীয়, তৃতীয় সপ্তক পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হিন্দু-সঙ্গীতে তিনটি সপ্তকের অধিক কখনই ব্যবহার চলে না। এই তিনটির প্রথম অর্থাৎ খাদ-সপ্তককে উদারা (অনুদাত্ত) কহে। দ্বিতীয় অর্থাৎ মধ্যম-সপ্তককে মুদারা (সরিৎ) এবং তৃতীয় অর্থাৎ উচ্চ-সপ্তককে তারা (উদাত্ত) স্বর কহে। এই তিন সপ্তক স্বরকে হিন্দীতে নাভি, বুকি ও কপালি স্বর বলিয়া থাকে।

স্বরগ্রামের মধ্যে আবার পূর্ণ ও অর্দ্ধস্বর, এই দুই প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্বরসপ্তকের পরস্পর কোন দুইটি সুরের মধ্যগত ব্যবধানকে গ্রামিক অন্তর কহে। যথা সা হইতে ঋ; ঋ হইতে গা ইত্যাদি। নিম্ন সা হইতে উচ্চ সা পর্য্যন্ত আটটি সুরের মধ্যস্থিত যে সাতটি অন্তর, তাহারা পরস্পর সমান নহে; কারণ সা হইতে ঋ, ঋ হইতে গা যে পরিমাণে উচ্চ, গা হইতে মা কিম্বা নি হইতে সা তাহার অর্দ্ধেক উচ্চ। সুতরাং ১ম, ২য়, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই পাঁচটি গ্রামিক অন্তর পূর্ণস্বর, আর ৪র্থ ও ৭ম এই দুইটি অর্দ্ধস্বর। বীণা কিম্বা সেতারের পর্দ্দাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, গা ও মা এবং নি ও সার পর্দ্দার মধ্যগত অঙ্ক অপরাপর সুরের পর্দ্দার অন্তর্গত স্থানের অর্দ্ধেক। স্বরগ্রামের অন্তরের নিয়মও এই যে, সা হইতে ঋ পূর্ণস্বর, ঋ হইতে গা পূর্ণস্বর, গা

হইতে মা অর্দ্ধস্বর, মা হইতে পা পূর্ণস্বর, পা হইতে ধা পূর্ণস্বর, ধা হইতে নি পূর্ণস্বর, এবং নি হইতে সা অর্দ্ধস্বর।

উক্ত প্রকার নিয়মের অধীন পাঁচটি পূর্ণ ও দুইটি অর্দ্ধস্বরের যোগে যে স্বরসপ্তক প্রস্তুত হয়, তাহাকে শুদ্ধ স্বরগ্রাম বা সচলঠাট বলে। মা ও নি এই দুইটি একমাত্র স্বাভাবিক গ্রাম। উক্ত পাঁচটি পূর্ণ অন্তরের প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি করিয়া আর পাঁচটি পর্দ্দা বসাইলে তাহা হইতে যে পাঁচটি স্বরের উৎপত্তি হয়, তাহাদিগকে বিকৃত, কড়ি অথবা কোমল স্বর কহে।

যেমন কোমল ঋ, কোমল গা, কড়ি মা, কোমল ধা ও কোমল নি; অথবা কড়ি সা, কড়ি ঋ, কোমল ঋ, কড়ি পা, কড়ি ধা, ও কড়ি নি কহা যায়। ৪র্থ ও সপ্তম অন্তর অর্দ্ধ বলিয়া গা ও নি'র কড়িত্ব নাই এবং সা ও মা'র কোমলত্ব নাই। গা ও নি'র কড়ি সহজেই মা ও উচ্চ সা, এবং মা ও উচ্চ সা'র কোমল গা ও নি। কারণ সম্পূর্ণ স্বর হইতে কড়ি ও কোমল স্বর অর্দ্ধেক উচ্চ বা খাদ।

একটি সপ্তকের মধ্যে পাঁচটি বিকৃত স্বর বসাইলে সর্ব্বশুদ্ধ বারোটি অর্দ্ধস্বর উৎপন্ন হয়। যে গ্রামে এই ১২টি অর্দ্ধস্বর প্রস্তুত হয়, তাহাকে বিকৃত স্বরগ্রাম কহে।

গানের সময় উদারাগ্রামে গভীরসুর আবশ্যক, মুদারাগ্রামে সরিৎ অর্থাৎ মধ্যসুর ধরিতে হইবে এবং তারাগ্রামে তার অর্থাৎ উচ্চধ্বনি অবলম্বন করিতে হয়।

কোন কোন সঙ্গীতগ্রন্থে উদারা, মুদারা, তারাগ্রামকে খরজ, মধ্যম ও গান্ধারগ্রাম কহিয়া থাকে। আবার কোন গ্রন্থে তিন সপ্তকের তিনটি খরজকে অর্থাৎ যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঋখবাদি ছয় সুরের উপলব্ধি হয়, তাহাকে তত্তৎ সপ্তকের গ্রাম কহে। এই তিনটি গ্রামের প্রত্যেকের সাতটি করিয়া তিন গ্রামে সর্ব্বশুদ্ধ ২১ একুশটি মুর্চ্ছনা নির্দ্দিষ্ট হয়। সেগুলি যথাকালে পরে প্রকাশ করিব।

স্বর-সাধন।

এক্ষণে স্বর-সাধনসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই প্রস্তাব শেষ করা যাইতেছে।

স্বর-সাধন অভ্যাস করিতে হইলে একটি তানপুরার অতিশয় প্রয়োজন। তানপুরা ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্রে স্বরসাধন সুপ্রণালীতে হয় না। তারে আঘাত করিলে বায়ুতরঙ্গ যেরূপ সুললিতপ্রবাহে সপ্ত স্বর লইয়া কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, অন্য কোন প্রকার বায়ুযন্ত্র (হারমোনিয়া) প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ হইতে পারে না। তানপুরার সহিত স্বর সাধিত হইলে কিরূপে তানপুরা বাঁধিতে হয়, তাহা অগ্রে জানা উচিত। তানপুরার লাবু বাদকের দক্ষিণদিকে ও কাণ বামদিকে পড়ে—এইরূপে তাহাকে সম্মুখে রাখিলে সর্ব্বোপরি প্রথমেই যে একটি পিতলের তার দৃষ্ট হয়, তাহাকে পঞ্চম কহে। পঞ্চমের বামদিকে দুইটি ইস্পাতের পাকা তার থাকে, তাহার প্রথমটির নাম সুর ও দ্বিতীয়টির নাম জুড়ি; জুড়ির বামদিকে খরজ নামে আর একগাছি পিতলের তার থাকে। তানপুরার সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চম, সুর, জুড়ি ও খরজ—এই চারিটি সুর বাঁধা থাকে, চারিটি তারই সমান করিয়া বাঁধা হয় না। সুর ও জুড়ি প্রথমে যথেচ্ছাক্রমে অনায়াসসাধ্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের সহিত ঐক্য করিয়া বাঁধিতে হয়, খরজসুর জুড়ি অপেক্ষা এক গ্রাম অথবা সাত ঘাট নরম করিয়া বাঁধা হয়, আর পঞ্চমসুর জুড়ি অপেক্ষা তিন ঘাট নরম করিয়া বাঁধা হয়। এইরূপে চারিটি তার চড়াইয়া প্রত্যেক তারের নিম্ন দিয়া সোয়ারী নামক কাষ্ঠখণ্ডের উপর কিঞ্চিৎ সূতার গুচ্ছ বসাইলে যে প্রবল সুর হয়, তাহাকে জোয়াড়ি মিল কহে। তানপুরার সুর ও জুড়ি বাঁধিবার নিয়ম অতি সহজ; খরজ, পঞ্চম বাঁধা ও জোয়ারি মিল করা কিঞ্চিৎ কঠিন।

যিনি তানপুরার সুর বাঁধিতে না জানেন, তিনি যথেচ্ছাক্রমে তার চড়াইতে চড়াইতে হয় ত তারটি ছিঁড়িয়া ফেলেন। আমার মতে তিনি যেন "আ" বলিয়া গলার সুর দিয়া তারপর স্বর হ্রস্ব ও দীর্ঘ করেন; উহা করিলে বুঝিবেন, কোন না কোন স্থলে তানপুরার সুরের সহিত তাঁহার গলার সুর একমিল হইয়া গিয়াছে। যে সুরটি মিল হইয়া গিয়াছে, তাহার নাম সা,—এই সা সুরটি নির্দ্দেশ করিয়া পরে এক সুর, দুই সুর, তিন সুর—এইরূপে ক্রমে গলা চড়াইলে এমন একটি উচ্চস্বর উৎপন্ন হইবে, যাহার সহিত আবার তানপুরার তারের সুরে সম্পূর্ণ মিল হইবে। যাহার গলা হইতে আরও উচ্চধ্বনি নির্গত হয়, তিনি আবার তাহার পরে ক্রমশঃ চড়িয়া গেলে পুনর্ব্বার তারের সুরে ও গলার সুরে ঐক্য হইবে। উহার অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, সা হইতে ক্রমশঃ সপ্তম সুর চড়িয়া গেলে ঐরূপ ঐক্য হয়। সা সুর দিয়া পরে সাতটি সুর চড়াইলে যে সুর নির্গত হয়, সে সুর আর প্রথম সার সুর ঠিক তুল্য হয়, তবে একটি খাদ ও একটি চড়া হয়, এই মাত্র প্রভেদ। স্ত্রী-পুরুষে একত্রে গাইলে এক জন উচ্চ এক জন সরু সুর ব্যবহার করে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের সুর অমিল হয় না, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতেই জ্ঞান হয় যে, সুর সর্ব্বসমেত সাতটি মাত্র, যেহেতু সপ্তম সুর হইতে ক্রমশঃ চড়াইলে আবার সেই প্রথম সুরই পাওয়া যায়।

তানপুরার সহিত সুর অনুলোম-বিলোমক্রমে উত্তমরূপে সাধিত হওয়া আবশ্যক। যথা—সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সাতটি সুর ক্রমান্বয়ে সমান ওজনে অনুলোমিকক্রমে উচ্চ করিতে শিখিলে, বিলোমক্রমে সুর উল্টা করিয়া আবার উহাদিগকে নীচুমুখে আনা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য; যথা—নি, ধা, পা, মা, গা, ঋ, সা। স্বরগ্রাম অভ্যস্ত করিতে হইলে সুরগুলি সমান অন্তর ক্রমে উচ্চ-নীচ না করিয়া একেবারে এক সুর হইতে তাহার তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম পর্য্যন্ত উঠিতে

হইবে অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে সা, মা, গা, কয়েকটি সুর লাগাইতে হইবে। এ স্থলে সা'র অব্যবহিত পরের সুরে না উঠিয়া একেবারে সা হইতে মা পর্য্যন্ত উঠিতে হইবে, আবার মা হইতে গা'তে নামিতে হইবে।

সা, ঋ, গা, মা, পা, ধা, নি, এই সপ্ত স্বরের প্রত্যেক সুরটি এক, দুই, তিন, চারি মাত্রিক সময়ের মধ্যে অর্থাৎ এক, এক-দুই, এক-দুই-তিন, এক-দুই-তিন-চারি, এই কয়েকটি সংখ্যা বলিতে যে সময় লাগে, এইরূপ তুল্য সময় অন্তর সুর ভাঁজ। তৎপর প্রত্যেক দুইটি কি তিনটি সুরের প্রতি এক বা ততোধিক সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, তত সময় অন্তর উচ্চারণ কর।

এই স্বরগ্রাম অভ্যাস হইলে কড়ি ও কোমল স্বরগুলি দিতে শিক্ষা করিবে। ইতিপূর্ব্বে বলা গিয়াছে, দুই সুরের মধ্যের সুরকে কড়ি সুর বলে। যেমন মা হইতে পা সুর না দিয়া উহাদের মধ্যের সুর দিলে কড়িগধাম সুর নির্গত হইবে। সা আর ঋর মধ্যের সুর দিলে কড়িখরজ। এইরূপে কড়ি সুরগুলি দিতে শিখিলে কণ্ঠের জড়তা অনেকাংশে দূরীভূত হইতে পারিবে। গীতের সুরই প্রধান। কণ্ঠে সুরগুলি পরিষ্কার এবং নিয়মিতরূপে যথাক্রমে তানপুরার সহিত প্রকাশ করিতে পারিলে সকলপ্রকার গানই কণ্ঠদ্বারা সুসম্পন্ন হয়। এ স্থলে তানপুরার চিত্রটি পাঠকগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য প্রকাশিত হইল, ইহাদৃষ্টে তানপুরা রাখিয়া অভ্যাস করা সহজ হইবে।

স্বরসাধকদিগের কতকগুলি অতি আবশ্যক নিয়মের অধীন থাকিতে হয়; তাহা না হইলে স্বরসাধনে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। স্বরসাধন যোগসাধনের একটি অঙ্গ। যোগশাস্ত্র যেমন সৎগুরুর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া সাধন করিতে হয়, সঙ্গীতশাস্ত্রও সেইরূপ সৎগুরুর নিকট নিত্য নিয়মিত শিক্ষা করিয়া স্বরসাধন করিতে হয়। যোগসাধন করিতে হইলে যেমন ইন্দ্রিয়সকলকে জয় করিয়া সুস্থ শরীর ও সুস্থ মন হওয়ার আবশ্যক, সঙ্গীতশাস্ত্রের শিক্ষা আরম্ভ করিতে গেলেও ঠিক সেইরূপ আবশ্যক করে।

সঙ্গীতসাধক, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ভগবানের নাম স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তরাস্য হইয়া যোগীর ন্যায় সিদ্ধ বা স্বস্তিকাসনে তানপুরাহস্তে উপবেশন করিবে এবং সুরগুরু মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলিদ্বারা তন্ত্রচতুষ্টয়কে প্রতিহত করিবে। সেই তন্ত্রচতুষ্টয় হইতে যথাক্রমে যে সুর নির্গত হইবে, তাহাতে নিজ কণ্ঠস্বর যোগ করিয়া প্রথম বহু দিন পর্য্যন্ত সা, ঋ, গা, মা সাধন করিতে থাকিবে।

কণ্ঠের প্রধান শত্রু শ্লেষ্মা। এই শ্লেষ্মাকে প্রতিনিয়ত দমনে রাখা সঙ্গীতসাধকের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ইহার নিমিত্ত নিত্য-নৈমিত্তিক আয়ুর্ব্বেদনীতির অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। আয়ুর্ব্বেদে যে সকল ঋতুচর্য্যা লিখিত আছে, শীতগ্রীষ্মাদি যে ঋতুতে যেরূপভাবে চলিতে হয়, যে যে বস্তু আহার করিলে ঋতুর সমতা ও শ্লেষ্মার দমন হয় এবং ঋতুবিকার দেহকে স্পর্শ করিতে পারে না, সেইরূপভাবে আহারবিহারাদিতে চালিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সঙ্গীতে দেহস্থ সকল স্থানের ও সকল যন্ত্রের ক্রিয়া সাধিত হয়, সুতরাং দেহ নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সঙ্গীত আনন্দ ও আরোগ্যের জিনিস, পাপদেহ ও ব্যাধিপীড়িতদেহে সঙ্গীতসাধন কিছুতেই হইতে পারে না।

সঙ্গীতসাধনে বক্ষঃস্থল বিস্তৃত হয়, কণ্ঠনালী শ্লেষ্মাশূন্য ও সরল হয়, ফুস্‌ফুস্ ও হৃদ্‌পিণ্ড বলবান্ ও নির্দ্দোষ হয়, দেহে কফ ও মলবিকার আদৌ থাকে না, ঘর্ম্মদ্বারা লোমকূপসকল পরিষ্কার হয়, ধমনী সকলের রক্তচলাচলকার্য্য বৃদ্ধি হয়, শরীরের জড়তা নষ্ট করে, পাকস্থলীর অগ্নি বৃদ্ধি হয়, ক্ষুধা হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হয়, ঋতুবিশেষে সঙ্গীত গীত হইলে যাবতীয় ঋতুজাত রোগের শান্তি হয়, দেহস্থ পাপ, শোক ও কুচিন্তা সকল দমন হয়।

সঙ্গীত আসন্নমৃত্যু ও আসন্নবিপদ্ হইতেও মনুষ্যকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। মুমূর্ষাবস্থায় সঙ্গীত-সুধাদ্বারা জীবাত্মায় জীবনীশক্তি প্রবাহ খেলে, জীবকে ব্রহ্মশক্তিতে তন্ময় করিয়া মুক্তিপথের পথিক করে।

সঙ্গীতসাধক নিত্যনিয়মিত সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান অভ্যাস করিবেন, কদাচ রুক্ষ ব্যবহার করিবেন না, নিত্য নিরামিষ আহার করিবেন, মিষ্টদ্রব্য অধিক সেবন করিবেন না, ঋতু-হরিতকী সেবন করিবেন। ঘন দুগ্ধ, ক্ষীর, দধি পরিত্যাগ করিবেন। বকনা দুগ্ধ, মিশ্রি, উষ্ণ আতপ অন্ন নিত্য ঘৃতসংযোগে ব্যবহার করিবেন। মরিচ, পিপুল, বচ, নিম ব্যবহার করিবেন। কাংসপাত্র ব্যবহার করিবেন না, কদলী

বা পদ্মপাত্রে অন্নভোজন করিবেন। অতিরিক্ত তাম্বুলভোজন করিবেন না। অখণ্ডভাবে রেতঃধারণ করিতে সক্ষম হইলে সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষাধিকার অবশ্যম্ভাবী। রাত্রিজাগরণ বা অতিনিদ্রা, অতিভোজন পরিত্যাগ করিবেন। রাত্রি-কালে দধি, শক্তু ও শাকভোজন করিবেন না। লবণ অতি স্বল্পপরিমাণে ব্যবহার করিবেন। দেহের পঞ্চস্থানে তৈলদ্বারা স্নেহসংযুক্ত করিবেন; কিন্তু তৈলভক্ষণ পরিত্যাগ করিবেন। তিথিনক্ষত্রবিশেষে আহার-বিহার করিবেন। যাহাতে জিহ্বার জড়তা দূর হয়, এরূপ বস্তু সেবন করিবেন, ঋতুফলমূলাদি সর্ব্বদা ব্যবহার করিবেন। মলমূত্রাদির বেগধারণ করিবেন না অথবা বিনাবেগে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ করিতে যাইবেন না।

অভিজ্ঞ সঙ্গীতসাধক কখন বায়ু, পিত্ত বা কফ উত্তেজক বস্তু সেবন করিবেন না। কাম, ক্রোধ ও লোভাদির তাড়না হইতে সুরক্ষিত হইবেন। ধ্যানধারণায় মনোনিবেশ করিবেন, সাধুসঙ্গে বাস করিবেন। বারবনিতা বা মগ্যাদির সেবা করিবেন না। অসময়ে, অকালে বা নিষিদ্ধ তিথিনক্ষত্রে রাগরাগিণীর আলোচনা পরিত্যাগ করিবেন।

সঙ্গীতসাধক উপবিষ্টকালীন মেরুদণ্ড সরল রাখিবেন, শয়নাবস্থায় চরণদ্বয় লম্বমান রাখিবেন, জিহ্বামূল সর্ব্বদা ধৌত পরিষ্কার রাখিবেন। দিবাভাগে ইড়ানাড়ীতে শ্বাস প্রবাহিত রাখিবেন, রাত্রিকালে দক্ষিণ নাসিকায় বা পিঙ্গলা-নাড়ীতে শ্বাসপ্রবাহ রাখিবেন। নিদ্রা, ধাবন, বচন, মৈথুন ও ভোজনে অতি শ্বাসব্যয় করিবেন না। সুষুম্নানাড়ীতে বায়ুপ্রবাহ বুঝিলে সঙ্গীত-বাদ্য ইত্যাদি কার্য্য হইতে স্থগিত থাকিবেন।

[ক্রমশঃ।

বিষ-চিকিৎসা।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

সর্প-বিষ।

"আস্তিকস্য মুনের্মাতা বাসুকী-ভগিনীস্তথা।
জরৎকারু মুনের্পত্নী মনসাদেবী নমোঽস্তুতে॥"

রাত্রিতে শয়নের সময়, পথে চলিবার বেলায় এবং সর্পদংশনমাত্রই উক্ত মনসা-প্রণামটি জপ করিলে সর্প হইতে কোন ভয় থাকে না।

সরকার বাহাদুরের বাৎসরিক মৃত্যু-তালিকা দেখিলে আমরা অতিমাত্র বিস্মিত হই যে, কত লোক অকালে সর্প-দষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, অথচ তাহাদের চিকিৎসা সর্ব্বত্র সমভাবে ফলদায়ক হইয়া উঠিতেছে না। আজ আমরা সর্পবিষ-চিকিৎসাসম্বন্ধে কিছু লিখিব। পাঠকগণ, আশা করি, ঐ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহা পাঠ করিবেন।

বিষ নানা প্রকারের। কোন কোন বিষ মানুষের দেহে প্রবিষ্ট হইবামাত্রই তাহার প্রাণত্যাগ করায়। আবার কোন কোন বিষ উদরে প্রবেশ করিলেও অনেকে মরে না, তবে কঠিন রোগগ্রস্ত হয়। মানুষ যেমন জীবহিংসা করে, জীবগুলিও তাহার প্রতিশোধের জন্য মানুষকে হিংসা করিতে ছাড়ে না। তন্মধ্যে সর্প, কুক্কুর প্রভৃতিই মারাত্মক।

বিষ-চিকিৎসায় আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিষভোজন-কারীকে যে কোন সাধক "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রনাশয় বিষ স্থাবরজঙ্গম" এই মন্ত্র জপাদিদ্বারা আয়ত্ত করিয়া সর্পগণসহ তাহাদের বিষ নাশ করিবেন।

বিষের উগ্রতেজে প্রাণ-বায়ুর নিরোধ করিয়া দেয়; কিন্তু ঐ বিষের উগ্রতা দূর করিতে পারিলেই বিষের হস্ত হইতে মানুষকে রক্ষা যায়।

সর্প দংশন করামাত্রই, দংশন-স্থানের প্রায় এক বিগস্তি অথবা পোণে এক হাতের উপর খুব শক্ত করিয়া একটি বন্ধনী দিতে হইবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিদ্বারা দংশন-স্থান পুড়াইয়া দিলে বিষের শান্তি হয়। শিরীষের বীজ ও পুষ্প এবং আকন্দের ক্ষীর ও বীজ এবং কটুত্রয়, এই সকলের যে কোন একটা দ্বারা বিষ-চিকিৎসা করা যায়। আকন্দের ক্ষীর ও বীজ পান করাইলে এবং দংশনস্থানে লেপিয়া দিলে ও চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিষে জর্জ্জরিত ব্যক্তির উপকার হয়।

শিরীষপুষ্পের রসযুক্ত মরিচ ও শর্করাম্বু পান ও নস্য এবং অঞ্জনাদিদ্বারাও বিষ-সংহার হয়। কোষাতকী, বচা, হিঙ্গু, শিরীষ, অর্কদুগ্ধ (আকন্দের ক্ষীর), এই সকল একত্র করিয়া ও বৃষ্টির জলের সঙ্গে ত্রিকটু মিশাইয়া নস্যাদি প্রদান করিলেও সর্প-বিষ হরণ করে।

রামঠ, ইক্ষু, আখু ও সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণের নস্য প্রদান করিলে বিষ নষ্ট হয়। ইন্দ্র, বলা, অগ্নিক, দ্রোণ, তুলসী, দেবিকা

ও মধু, ইহাদিগের রসযুক্ত ত্রিকটু সেবন করিলেও সর্পবিষ নষ্ট হয়।

তুলসী সর্পবিষনাশপক্ষে একটি প্রধান ঔষধ। তুলসী-রস কেবল সর্পবিষে কেন, যাবতীয় বিষ-রোগে প্রযোজ্য ও আশুফলপ্রদ। তুলসীর গুণপর্য্যায় পূর্ব্ববারে অনেক কথা আলোচিত হইয়াছে। এবার তুলসী যে সর্পবিষনাশক, তাহাই বলিব।

সর্পে কোন ব্যক্তিকে দংশন করিবামাত্রই, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দংশনস্থানের উর্দ্ধদেশে বিশেষ করিয়া তাগা বন্ধন করিবে। পরে জ্বলন্ত লৌহ বা কাষ্ঠাগ্নিদ্বারা দংশনস্থানে সেঁক দিবে। এইরূপ সেঁক দিবার পর তুলসীর রস করিয়া সর্পদষ্ট ব্যক্তির দংশনস্থানে পত্রাদি সহ লাগাইয়া রাখিবে ও প্রচুর পরিমাণে তুলসীর রস রোগীর নাভিগর্ভে স্থাপন করিবে। রোগীর সর্ব্বাঙ্গে এবং তালুমূলে ও পদতলে বিশেষ করিয়া তুলসীর রস মাখাইয়া দিবে। পরিশেষে রোগীকে প্রচুর পরিমাণে তুলসীর রস পান করাইবে। এইরূপ করিলে দেখিতে পাইবে, রোগীর শরীরস্থ বিষ ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। তুলসীপত্রের রস লইয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া রোগীর চক্ষুতে প্রদান করিবে। বেশ করিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গে তুলসীরস মাখাইয়া রাখিবে, যতক্ষণ না রোগীর বিষদোষ নষ্ট হইয়াছে, ততক্ষণ রোগীকে তুলসীর রসে ভিজাইয়া রাখিবে।

তুলসীকে সর্ব্বরোগনাশক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বয়ং বিশ্বপিতা নারায়ণ পৃথিবীতে এত পদার্থ থাকিতে, সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র তুলসীকেই যে শিরে ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই তুলসীর সর্ব্বগুণের প্রশংসা করা হইয়াছে।

অন্য কোন বিষরোগেও তুলসী এবম্প্রকারে সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হয়। আমরা আশা করি, প্রত্যেক গৃহস্থই বাড়ীর শোবার ঘরের নিকটে বা চারি ধারে বেশ করিয়া তুলসীকুঞ্জ রাখিতে পারেন। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, যেখানে তুলসী-বন রহিয়াছে—সর্পগণ সেস্থানে ভয়েও যায় না।

নিমও সর্পভয় হইতে রক্ষা পাইবার আশ্চর্য্য ঔষধ। নিম্ববৃক্ষতলায় বা আশে পাশে সর্প থাকে না। সর্পে দংশন করিবামাত্রই প্রচুর পরিমাণে নিমপাতা খাইতে দিবে এবং নিমপাতা পাথরে থেঁতো করিয়া ক্ষতস্থানে বাঁধিয়া রাখিবে।

এখন কথা হইতেছে এই যে, সর্প ত একজাতীয় নহে; বহুজাতীয় সর্প আছে। কোন কোন সর্পের বিষ এত তীব্র যে, সেই সকল সর্প কাহাকেও দংশনমাত্রই সে ব্যক্তি ধরাশায়ী হইবে। দষ্টস্থানে তাগা বাঁধিবার সুযোগটি পর্য্যন্তও দিবে না। এমতাবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সর্পে কামড় দেওয়ামাত্রই মানুষ মরে না, অজ্ঞান হইয়া যায়। কিন্তু একজাতীয় কাল বৃহৎ ফণাধারী সর্প আছে, তাহারা দংশন করিবামাত্র যে কোন জীবই মরিয়া যায়। প্রথম দংশনেই যে জীব অজ্ঞান হয়, সে আর কখনও চৈতন্যলাভ করে না। উহাদিগকে কালসাপ বলে। অতএব তাহাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় কি?

সর্পরা শূন্যপ্রদেশ দিয়া কখনও বিচরণ করে না। ভূপৃষ্ঠেই তাহারা বুকে হাঁটিয়া চলে। কিন্তু এমন এক জাতীয় সাপ আছে যে, তাহারা বৃক্ষের ডালে ও ঝোঁপে ঝাঁপে লুকাইয়া থাকে। সকল জাতীয় সাপের এক প্রকার বিষ নহে।

সাপের মুখ হাঁ করাইলে দেখিতে পাইবেন, তাহার মুখের ভিতর উপরের দিক্‌টায় একটা থলে আছে। ঐ থলে ঠিক ছোট মৎস্যের পিত্তাধারের মতন। যখন দংশন করে, তখন ঐ বিষথলে হইতে বিষ নিঃসৃত হইয়া দষ্টস্থানে প্রবেশ করে। সাপুড়িয়ারা জীবন্ত সর্পকে ধরিয়া সাঁড়াশী দিয়া ঐ বিষের থলি খুলিয়া ফেলে এবং সর্পকে বিষদন্তহীন করিয়া তবে তাহার সঙ্গে খেলা করে।

মূহীক্ষীর অর্থাৎ সিজ্‌গাছের আটা, গব্যঘৃত ও পঙ্ক পান করিলে সর্ব্বপ্রকার সর্পবিষ নষ্ট করা যায়। কিন্তু কালসাপজাতীয় সর্পের দংশনমাত্রই যদি মৃত্যু হয়, তখন তুলসীপত্র বা মূহীক্ষীর কোথায় মিলিবে? সেই জন্য ভয় করিবার কিছুমাত্র কারণ নাই। কেননা, আয়ুহীনকে কেহ আয়ু দিতে পারে না। আর যাহার আয়ু আছে, তাহাকেও কেহ মারিতে পারিবে না। চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে,—বাঁচানো যায় কি না।

সর্পে দংশন করিবামাত্রই, দষ্ট ব্যক্তিকে খুব হাওয়াপূর্ণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে লইয়া আসিবে। প্রথমেই তাগা-বন্ধন করিতে ভুলিবে না। তার পর তুলসীপত্র অথবা নিম্বপত্র কিম্বা সিদ্ধগাছ, যাহা নিকটে পাইবে, তখনই তাহা সংগ্রহ করিয়া রোগীর গায়ে প্রলেপ দিবে, খাইতে দিবে এবং দষ্টস্থানে উহার যে কোন একটি দ্রব্য বাঁধিয়া দিবে। সর্পদষ্ট ব্যক্তিকেও দংশনকরণমাত্রই আধপোয়া হইতে এক পোয়া পরিমাণ রশুনরস সেবন করাইবে।

৺চন্দ্রবদন বসু নামক একটি ভদ্রলোক সর্পবিষসম্বন্ধে একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ রাখিয়া মারা গিয়াছেন। গ্রন্থখানি সেকেলে ধরণে বাঙ্গালায় লিখিত ও নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ভাষায় লিপিবদ্ধ। আমরা সম্প্রতি সেই পুঁথিখানি হস্তগত করিয়াছি। তিনি অনেকদিন অনেক স্থানে অনেক লোকের নিকটে সর্প-বিষ-চিকিৎসাসম্বন্ধে অনেক ঔষধ শিক্ষা করেন এবং সে সকল গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যখন ১৩।১৪ বৎসর বয়স, তখন তিনি বিষ-চিকিৎসা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন ও নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া বহু বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট নানাজাতীয় সর্পের নানাজাতীয় বিষের চিকিৎসাসম্বন্ধে

অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আমরা তাঁহার লিখিত গ্রন্থে প্রথমেই দেখিতে পাই, জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির নিকট তিনি প্রথম বিষ চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তারপর জয় নারায়ণ ঘোষ নামক একটি ভদ্রলোকের নিকটও তিনি বিষ চিকিৎসাসম্বন্ধে উপদেশ পান। এই সময় তিনি শুনিতে পান, বরিশালের আমড়াজুড়িগ্রামের বাজারে পদ্ম নাম্নী জনৈক বারবনিতা বিষ চিকিৎসাসম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিনী। তিনি পদ্মের নিকটও যান। পদ্ম যে শুধু সর্পাঘাতের চিকিৎসা জানিত, তাহা নহে, ভৌতিক বিদ্যাও তাহার জানা ছিল। তৎপরে তিনি এক জন বিশেষ বিখ্যাত সাপু উয়ার নিকট সর্পধরাবিদ্যা ও বিষ চিকিৎসাসম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করেন।

যে দেশে সাপ বেশী, সে দেশে রোজাও বেশী। ত্রিপুরা পর্ব্বতে ও বঙ্গসাগরের চরসিদ্ধি নামক স্থানে অত্যন্ত সর্পভয়, ঐ সকল স্থানের লোকে সাপের ঔষধ বেশী জানে। বঙ্গের উপকূলবর্ত্তী বঙ্গসাগরে অত্যন্ত সাপ। সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী স্থানেও অধিক সাপ আছে। ৺চন্দ্রবদন বসুর গ্রন্থে আমরা নানাজাতীয় সর্পের বিবরণ পাইয়াছি। ক্রমশঃ তাহা প্রকাশ করিতে আশা রহিল।

[ক্রমশঃ।

নির্ষিন্দা।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

নির্ষিন্দা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ দ্রব্য নহে, তবে নামে সর্ব্ব পরিচিত হইলেও অনেকে বোধ হয়, ইহা ভালরূপ চেনেন না, চিনিলেও সম্যক্‌রূপে ইহার গুণাবলী অবগত নহেন।

ইহা গুল্মজাতীয় বৃক্ষবিশেষ এবং সচরাচর ঝোড় জঙ্গলেই প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থানে কোনওরূপে ইহার দুই একটি গাছ জন্মে, নষ্ট না করিলে কিছুকাল মধ্যে তথায় ইহারই জঙ্গল হইয়া পড়ে। ইহার পাতা দেখিতে কতকটা অড়হরের পাতার ন্যায় দেখায় এবং প্রত্যেক শীষে সাধারণতঃ তিনটি হইতে পাঁচটি পর্য্যন্ত পাতা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহার দুই প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এক প্রকার নির্ষিন্দার পুষ্প শ্বেতবর্ণ, অপরের পুষ্প নীলবর্ণ। তবে এই ভেদ, পুষ্প না দেখিলে জানিতে পারা যায় না, যেহেতু একমাত্র পুষ্প ভিন্ন এই উভয়প্রকার নির্ষিন্দার অন্য কোনও প্রকার আকৃতি-বৈষম্য নাই। এই জাতিভেদে গুণেরও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে, তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। দেশভেদে এই দুই প্রকার নির্ষিন্দা বিভিন্ন নামে অভিহিত। কেবল আমাদের বাঙ্গালাদেশে ও অন্য কয়েকটি দেশে জাতিভেদে নামভেদ দৃষ্টিগোচর হয় না।

নির্ষিন্দার পাতা।

শ্বেতপুষ্প নির্ষিন্দাকে হিন্দুস্থানে—শম্ভালু, সিহরু, মহারাষ্ট্রে—লিঙ্গুর, নির্গুণ্ডী, তৈলঙ্গে—বর্বিল্লি, বোম্বাই-প্রদেশে—নির্গুণ্ডী কল অড্‌লুসা; তামিলে—নিনোচি, গুজরাটে—নাগড়া, নাগড়ানাচি, কর্ণাটে—করি-য়াল্লাক্কিমেডউী, বিলিয়লোকে; দ্রাবিড়ে—কালিমুষ্কাক্কি, পাঞ্জাবে—বণা, মহরি, ফারসীতে—পবংগুষ্ট; আরবীতে—অসলুক, উড়িষ্যায়—গৈঙ্গ; ইংরেজীতে—Five-leaved chaste tree; ল্যাটিনে—Vitex trifolia এবং

[illegible]—সিন্দুবার, সিন্দুক ও সিন্দুবারক প্রভৃতি [illegible]।

নীলপুষ্প-নিষিন্দাকে হিন্দুস্থানে—মেউড়ী, সম্ভালু ও [illegible]ণ্ডী; মহারাষ্ট্রে—লিঙ্গুর, তৈলঙ্গে—নাবিলিচেট্টু ও [illegible]; বোম্বায়ে—কটুরী; তামিলে—নোকচি, দাক্ষিণাত্যে [illegible]নিবালি; ফারসীতে—সিস্বাণ, গুর্জ্জরে—নগোড, [illegible]—পৈছ্ এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে নির্গুণ্ডী, শেফালী, [illegible] প্রভৃতি বলে। এই উভয়বিধ নিষিন্দার সাধারণ [illegible] নাম "নির্গুণ্ডী"।

"সিন্দুবারঃ শ্বেতপুষ্পঃ সিন্দুকঃ সিন্দুবারকঃ।
নীলপুষ্পঃ শীতসহো নির্গুণ্ডী নীলসিন্দুকা।

(ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।)

শ্বেতপুষ্প-নিষিন্দাকে সিন্দুবার, সিন্দুক ও সিন্দুবারক [illegible] নীলপুষ্প-নিষিন্দাকে শীতসহ, নির্গুণ্ডী ও নীলসিন্দুকা বলে।

"নির্গুণ্ডী কটুতিক্তোষ্ণা ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরাপহা।
বাতশ্লেষ্মপ্রশমনী প্লীহগুল্মারুচিজয়েৎ।"

(ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুঃ।)

নির্গুণ্ডী কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য্যা, ক্রিমি, কুষ্ঠ, বেদনা, বায়ু, শ্লেষ্মা, প্লীহা, গুল্ম ও অরুচিনাশক।

"সিন্দুবারঃ কটুস্তিক্তঃ কফবাতক্ষয়াপহঃ।
কুষ্ঠকণ্ডূতিশমনঃ শূলঘ্নঃ কাসসিদ্ধিদঃ।

(রাজনিঘণ্টুঃ।)

নিষিন্দা কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট। ইহা শ্লেষ্মা, বায়ু, ক্ষয়রোগ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, শূল এবং কাসরোগ বিনষ্ট করে।

শ্বেতপুষ্প-নির্গুণ্ডী কটু, তিক্ত ও কষায়রসযুক্ত, উষ্ণবীর্য্যা, স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক, চক্ষু ও কেশের হিতকর, লঘু, অগ্নিদীপক, মেধাবর্দ্ধক ও বর্ণকারক। ইহা [illegible] অপানবায়ু, ক্ষয়রোগ, সন্ধিগতবাত, বাত, শোথ, আমদোষ, ক্রিমি, কুষ্ঠ, শ্লেষ্মা, ব্রণ (ক্ষত), প্লীহা, গুল্ম, কণ্ঠরোগ, বিষদোষ, শূল, অরুচি, জ্বর, মেদোরোগ, গৃধ্রসী (বাতব্যাধি বিশেষ) প্রতিশ্যায়, কাস ও শ্বাসরোগ বিনাশ করে।

নীলপুষ্প-নিষিন্দা তিক্ত ও কটুরসযুক্ত, রূক্ষ এবং উষ্ণবীর্য্যা। ইহাতে আধ্মানবাত, প্রদর, কাস, শোথ ও কফ বিনষ্ট হয়।

এখন দেখা গেল, এই উভয়বিধ নিসিন্দাই প্রায় সমগুণবিশিষ্ট; কেবল ভাবপ্রকাশের মতে শ্বেতপুষ্প নিষিন্দার কতকগুলি গুণ অধিক দেখা যায়। রাজনিঘণ্টুমতে এই জাতিভেদ দেখা যায় না। ধন্বন্তরীয়নিঘণ্টুকার জাতিভেদ উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু গুণের কোন পার্থক্যই দেখান নাই এবং কার্য্যক্ষেত্রেও জাতিভেদে ব্যবহারভেদ বড় একটা দেখা যায় না। নির্গুণ্ডীশব্দে উভয় প্রকার নিষিন্দাই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। নির্গুণ্ডী ইহার সাধারণ নাম; একথা ভাবপ্রকাশের মতেও স্বীকৃত। ভাবপ্রকাশকার আরও দুই প্রকার নির্গুণ্ডী উল্লেখ করিয়াছেন,—আরণ্য নির্গুণ্ডী ও কর্ব্বুরী নির্গুণ্ডী। যদিও তিনি এই দুই প্রকারের পৃথক্ পরিচয় ও লক্ষণ কিছুই উল্লেখ করেন নাই, অধিকন্তু যে গুণবর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বোধ হয়, এই ভেদ অতি সামান্য, কারণ গুণ প্রায়ই সমান।

এতাবৎ পর্য্যালোচনায় দেখা গেল, নিসিন্দা সাধারণ দৃষ্টিতে তুচ্ছ পদার্থ হইলেও আমাদের মহোপকারী দ্রব্য। চিকিৎসাশাস্ত্রে যক্ষ্মায় নির্গুণ্ডীঘৃত, নাড়ীব্রণে নির্গুণ্ডীতৈল, জ্বরে ও রসায়নে নিসিন্দার বহুপ্রয়োগ ও উপকারিতা দেখিলে বাস্তবিকই মুগ্ধ হইতে হয়।

মুষ্টিযোগ।

১। নিসিন্দার পাতা বাটিয়া তদ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে অথবা তৈল সিদ্ধ করিয়া সেই তৈল দ্বারা ধৌত করিলে [illegible] ও [illegible] বিশেষ [illegible] দেখা যায়।

২। তৃতীয়ক বা একদিন অন্তর পালাজ্বরে, পালার দিন প্রাতঃকালে কতকগুলি নিসিন্দার পাতা হাতে রগড়াইয়া একখণ্ড পরিষ্কার কাপড়ে পুটুলী বাঁধিবে, পরে জ্বরের সময় পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সেই পুটুলীটি নাকে রাখিবে এবং মধ্যে মধ্যে আঘ্রাণ করিবে। আঘ্রাণ করিবার সময় একটু টিপিয়া যেন রস নস্যের মত নাকে টানিয়া লইবে। এই উপায়ে আশ্চর্য্যপ্রভাবে তৃতীয়ক বা পালাজ্বর বন্ধ হয়।

৩। নিসিন্দাপাতা ১ তোলা, শুঁঠ অর্দ্ধ তোলা, পিপুল অর্দ্ধ তোলা, একত্রে লইয়া একটু ছেঁচিয়া /॥০ সের জলে কাঠের মৃদু অগ্নিতে মৃৎপাত্রে সিদ্ধ করিবে এবং /৵ অর্থাৎ পোয়া শেষ থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ ঈষদুষ্ণ সেবন করিলে শ্লেষ্মপ্রধান জ্বরে বিশেষ উপকার হয়।

৪। নিসিন্দার পাতার রস গরম করিয়া তাহাতে সামান্য একটু আফিং গুলিয়া ঈষদুষ্ণ অবস্থায় কর্ণে পূরণ করিলে সত্বর কর্ণশূল প্রশমিত হয়।

LOOK at the ☞

World-famed Ayurvedic Medicines !

বিশ্ববিশ্রুত ঔষধির সমন্বয় !

আমাশয়, বাতব্যাধি ও যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ (Specialist) ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কবিভূষণ মহাশয়

আয়ুর্ব্বেদীয় ও স্বকৃত পরীক্ষিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত রোগ-কয়টিরও চিকিৎসা করিতেছেন ঃ—

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ (Dyspepsia), গ্রহণী, মেহ, বহুমূত্র ও সূতিকা প্রদরাদি স্ত্রীরোগ।

জ্বরাশনি রস।

বাঙ্গালার পল্লীবাস জ্বরপীড়নে একপ্রকার শূন্য হইয়া পড়িতেছে ; আর কিছুকাল এ ভাবে জ্বরের প্রকোপ দেশময় ব্যাপ্ত থাকিলে, বাঙ্গালা দেশ একেবারেই জনশূন্য হইয়া পড়িবে। প্রতিদিন জ্বররোগে কত পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকা যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অকালমৃত্যুর হাত হইতে দেশের জনগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জ্বরাশনি রস সাধারণে প্রচার করিতেছি। জ্বরাশনি রস আবিষ্কারের পর হইতে সহস্র সহস্র জীবনকে অকালমৃত্যুর করালকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। জ্বরাশনি রসপ্রয়োগে নব জ্বর, পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, জীর্ণ জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, কম্প জ্বর, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর অত্যল্পকালমধ্যে নিবারণ করিতেছে। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া, শীত করিয়া, কম্প দিয়া, চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর আসিতেছে, এমন অবস্থায় জ্বরাশনি রস ব্যবহার করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে যে কেহ জ্বরাশনি রস প্রয়োগে জ্বরের প্রকোপ হইতে নিস্তার পাইতে পারিবেন। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অমৃতাষ্টক।

আমাশয় ও রক্তামাশয় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। এই রোগাবস্থে অরুচি, অক্ষুধা, বার বার মলত্যাগ, পেটে বেদনা হইতে ক্রমে কোঁথপাড়া, পক্কাশয়ে ক্ষত, রক্তস্রাব, হাত পা জ্বালা, জ্বর, রক্তাল্পতা, শোথ প্রভৃতি নিদারুণ কষ্ট-দায়ক প্রাণনাশক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাদের এই দৃষ্টফল 'অমৃতাষ্টক' অল্পদিনে উল্লিখিত দুরারোগ্য উপসর্গ সমূহ দূর করিয়া রোগীকে নিরাময় করে। মূল্য প্রতি কৌটা ১৪ বটী ১৲ এক টাকা।

হিঙ্গুচতুঃসম।

আজকাল অজীর্ণরোগে (Dyspepsia) দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বুক বা গলা জ্বালা, টক্ উদ্গার (চোঁয়াঢেকুর), পেটফাঁপা, হঠাৎ দমকা দাস্ত, অরুচি, বদহজম প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিতে হিঙ্গুচতুঃসমের শক্তি অতুলনীয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া একটি হিঙ্গুচতুঃসম সেবন করিলে এক ঘণ্টা পরেই আবার ক্ষুধা হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ৭ বটী ৷৹ আট আনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

হরিশ্চন্দ্র ঔষধালয়—৩২নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by Kally Prosonno Mookerjee at K. P. Mookerjee & Co.'s Press, 7, Waterloo Street, CALCUTTA.

অনাথবন্ধু

[অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত]

ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষিতত্ত্ব, শিল্প, চিকিৎসা, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, ইতিহাস, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদি সম্বলিত

সচিত্র মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—তৃতীয় সংখ্যা।
ভাদ্র—১৩২৩।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বর্ষা গেল, শরৎ আসিল ;—পুষ্পধান্যপূর্ণা বসুন্ধরা ;—প্রাতে বালক-বালিকারা পুষ্পচয়ন করিতেছে।
৺মহাপূজা আগতা—ধরণী আনন্দময়ী।

ীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা।
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য মাত্র।

অনাথবন্ধু।
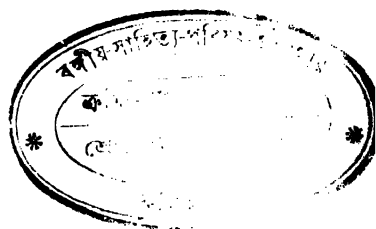
"अङ्गार शतधौतेन
मलिनत्व न जायते ।
अतीत्यहि गुणान् सर्व्वान्
स्वभावो मूर्द्धि वर्त्तते ॥"

* * *

"सद्‌गुरु पावे, भेद बतावे
ज्ञान करे उपदेश ।
कयला का मयला छुटे
जब आग करे प्रवेश ॥"

My submission regarding Anathbandu, Annapurna Asram and the Album of the Noblemen of India.

DEAR SIR,

With my best wishes for the Bijaya-Dusera season I forward per Book Post the 3rd number (Bhadra) of the "Anathbandhu" and hope on perusal, you will find the subjects dealt in it are useful and interesting. And I shall be glad to have your suggestions and opinion.

My object in starting this Bengali Monthly Journal "Anathbandhu" is to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, where local industries will be encouraged and various works will be executed by the inmates of the home who will be kept, fed, clothed and given medical aid in times of need.

The subscription of the "Anathbandhu" is only Rs. 10 for a year, not even a Rupee a month; but it serves a great object.

It is not binding on the subscribers of the Journal to a pay donation or monthly subscription to the Annapurna Asram fund. Only such noblemen whose portraits and sketches of life appear in the Journal are expected to help the Asram Fund, I mean the noblemen of India.

All the publications which printed likenesses and life-sketches of the noblemen of India, charged very heavily, and printed the portraits in plain Black Ink. But we have been printing the portraits in true colours and it costs very much more than plain printing, and therefore I crave fair consideration from my patrons and friends

All donations and monthly subscriptions will be gratefully acknowledged in the columns of the "Anathbandhu" and those noblemen who will materially help the Asram will have their names engraved on a marble slab and fixed at the gate of the Asram as a permanent memorial.

There will be an annual Exhibition in the Asram of the goods manufactured in the Asram by its inmates, and arrangements will be made for collection of Indian products and art works at the same time for exhibition; and suitable prizes will be given to encourage local products and arts.

I shall fix a moderate price for the Album of the Noblemen of India, at its starting, as the blocks appearing in the columns of the "Anathbandhu" will be utilized.

I thankfully acknowledge receipt of some photographs and sketches but regret some of my important patrons and friends are neglecting this rather important matter, and hope to be favoured by them early.

In sending photographs kindly note complexion and colours of the dress and ornaments and let the portrait preferably be in oriental dress.

A laborious and expensive venture like this should be encouraged by the nobility and gentry of all India. Some of my patrons and friends do not know Bengali, but I believe Bengali-reading gentlemen are all over India to explain the benefits of the subjects dealt in the Journal. I wish and hope all our patrons and friends will realize my scheme and co-operate with me in my labours and thus bring my three schemes into success, viz;

I.—The Journal "Anathbandhu" which will produce articles in its pages for the benefit of mankind.

II.—The "Annapurna Asram" a religious and industrious home for the poor, which once settled will be a self-supporting institution.

III.—The "Album of the Noblemen of India" in English, which will be a book of peerage of India, a most useful, desireable and glorious work for India.

I have practical knowledge in the lines I have undertaken and this fact is known to my numerous patrons and friends.

7, WATERLOO ST.,
CALCUTTA.

Yours obediently,
K. P. MOOKERJEE.

প্রকাশকের নিবেদন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, বিশেষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিলাম। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতিবৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়। যাহা হউক, প্রথম সংখ্যা "অনাথবন্ধু" বাহির হওয়ার পর আমি বুঝিলাম ;—

১। কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবেন, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া ও রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবেন। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিলাম।

২। ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

আমার প্রায় সত্তর বৎসর বয়স হইয়াছে। আমি এই বিগত পঞ্চাশ বৎসর ব্যবসাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছি এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য্যবলে এখনও বৃহৎ ব্যবসা চালাইতেছি। ঈশ্বর ইচ্ছায় ভারতবর্ষে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় সমস্ত মহৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমার কাজকর্ম্মে বাধ্যবাধকতা আছে এবং এ পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পাইয়া আসিয়াছি। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন।

৩। অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি উদ্যোগ করিব। আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্যদাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

৪। "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে।

উপস্থিত প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করিয়া যে ভাবে উৎসাহিত হইয়াছি, তাহাতে ক্রমে যে আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকৃপায় সফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহাতে আমার নিজের স্বার্থ "আনন্দ।" যত দূর সাধ্য, আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশে খরচ করিতেছি এবং "অনাথবন্ধু"কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের সেবার উপযোগী করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করিব না। আমি সর্ব্বত্র হইতে বিশেষ উৎসাহও পাইতেছি।

বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই—প্রথম সংখ্যা কাগজ পাইবামাত্রই—গ্রাহক হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাহারও নাম প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

বঙ্গেশ্বর হিজ্ এক্‌সেলেন্সি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর।

মহামান্য মহারাজা শোনপুর।

মহামান্য রাজাসাহেব বামড়া।

অনরেবল স্যর্ মহারাজা দ্বারভঙ্গ।

অনরেবল স্যর্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাশিমবাজার।

অনরেবল মহারাজা বাহাদুর নদীপুর।

মহামান্য জেনারেল তেজ সাম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপাল।

রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া।

স্যর মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর।

লালা জ্যোতিপ্রকাশ নন্দী সাহেব—বৰ্দ্ধমান।

মহামান্য রাজা সাহেব—লন্‌জিগড়।

মহামাননীয়া মহারাণী সাহেবা—আয়োয়াগড়।

রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী; রঙ্গপুর।

অনরেবল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী; গৌরীপুর।

কুমার এ. পি. লাহিড়ী; রাজসাহী।

শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গিরি; তারকেশ্বর।

অনরেবল স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীযুত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা।

শ্রীযুত বাবু ফণীন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর।

পণ্ডিত এন্. বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুত বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জি—কলিকাতা।

শ্রীযুত বাবু আশুতোষ মজুমদার—কলিকাতা।

শ্রীযুত বাবু এন্. চাটার্জ্জি।

শ্রীমতী এস্. বি, দেবী—কলিকাতা।

শ্রীযুত লালা এস্. পি. নন্দীসাহেব—বৰ্দ্ধমান।

শ্রীযুত রাজা প্রমথভূষণ দেব বাহাদুর—নলডাঙ্গা।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সংখ্যায় স্থানাভাবে অধিক নাম প্রকাশ করা গেল না, যাঁহারা অনাথবন্ধুর গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল উপরি-উক্ত মাননীয় মহোদয়গণের নাম প্রকাশ করিলাম। ইঁহারা সকলেই যে অন্নপূর্ণা-আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রেই আমাকে অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

এবার দ্বিতীয় সংখ্যা "অনাথবন্ধু" আরও বৃহৎ করিয়া ও আবশ্যক প্রবন্ধাদি দিয়া প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পাঠান্তে সুখী হইবেন।

দেশীয় হাতের শিল্প ও নিতান্ত আবশ্যক নবাবিষ্কৃত ফলপ্রদ ঔষধাদিসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। প্রাচীন গ্রাম্য-ইতিহাস ও মন্দিরাদির বিবরণ এবং চিত্রাদি পাঠাইলে প্রকাশ করিব। কাহারও নিন্দা বা গালাগালিসম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। রাজার বিরুদ্ধকর অথবা কোন প্রকার রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধও আমরা গ্রহণ করিব না।

কোন রমণী যদি প্রবন্ধ পাঠাইতে চাহেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব এবং ধর্ম্মবিষয়, কাব্য বা গীতিও প্রকাশ করিতে পারি।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎ-ব্যক্তিগণ তাঁহাদের ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠাইতে বিলম্ব করিবেন না।

অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্য-বর্গ ও মহৎব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

"এল্‌বাম"

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি, তাহা "অনাথবন্ধু"র জন্য প্রস্তুত হইল। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

অন্নপূর্ণা আশ্রম

যে প্রণালীতে আরম্ভ ও পরিচালিত হইবে, তাহা অন্যত্র দেওয়া হইল। আশা করি, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আশ্রমের সাহায্যে আন্তরিক মনোযোগী হইবেন।

আমি কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, যাঁহারা "অনাথবন্ধু"র প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা রাখিয়াছেন এবং ইহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া সাহায্যার্থে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহারা এই তৃতীয় সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্র অনুগ্রহ করিয়া বার্ষিকমূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা-আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

"অনাথবন্ধুর" তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। ঝড়জলের প্রাবল্যবশতঃ ও রৌদ্রাভাবে ব্লকগুলি প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হওয়ায় এবারও অনাথবন্ধুপ্রকাশে অত্যন্ত বিলম্ব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই কেহ কেহ অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য দশ টাকা অধিক বলিয়া আমায় অনুযোগ পত্র লিখিয়াছেন। তাঁহাদের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, কাগজের দাম অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে, কালিও উচ্চদরে বিক্রয় হইতেছে, ব্লক করিবার তামা ও অন্যান্য কেমিকেলগুলি সমস্তই মহার্ঘ। এই সমস্ত কারণে অনাথবন্ধুর দাম সাহিত্যিক পত্রিকাগুলির হিসাবে একটু বেশী ধার্য্য করা হইয়াছে। একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে হইলে কিরূপ অর্থব্যয়ের আবশ্যক, ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন। কত কাগজ উপযুক্ত অর্থাভাবপ্রযুক্ত উঠিয়া যাইতেছে! কিন্তু খরচানুযায়ী কাগজের মূল্যের হার নির্দ্দেশ করিলে পরিণামে অর্থাভাবে কাগজের স্থায়ীত্বে কোন সন্দেহ থাকে না। ঐ দশ টাকা হারে 'অনাথবন্ধু'র মূল্য নির্দ্দেশ করিয়া আমি যে কাগজ-প্রচারে সফল হইব, তাহাতে বিশ্বাস করি। বিশেষতঃ অনাথবন্ধু কাগজ অন্নপূর্ণা আশ্রমের মুখপত্রস্বরূপ, অনাথ-বন্ধুর আয় অন্নপূর্ণা আশ্রমেই ব্যয়িত হইবে। অনাথবন্ধু হিন্দুর আদর্শেই প্রচার করিবে এবং যাহাতে হিন্দুসমাজ সহজ ও সরলভাবে জীবনযাপন করিবার উপযুক্ত পন্থা গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই সতত চর্চ্চা হইবে।

দেশের বর্ত্তমান অভাব—চরিত্রগঠন। এই চরিত্র-গঠনই আমাদের লক্ষ্য। যাহাতে হিন্দুসাধারণ চরিত্রবলে আপন আপন জীবনের উন্নতি করিতে পারেন এবং সংসারের মঙ্গল করিতে পারেন, তাহাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এবার অনাথবন্ধুতে হিন্দীভাষায় একটি নিবেদন ও একটি সন্দর্ভ দিয়াছি। উত্তরপশ্চিম বা মধ্য ভারতের গ্রাহকবর্গ—যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, তাঁহাদের উহা মনোনীত হইলে আমি প্রত্যেক মাসে দুই তিনটি করিয়া হিন্দী সন্দর্ভ অনাথবন্ধুতে প্রকাশ করিব।

শ্রীযুক্ত কুমার বিচিত্র সা; টিহরি, গাড়োয়াল, হিমালয়; আমাদিগের একজন মুরুব্বি (পেট্রণ) হইলেন এবং অনুগ্রহ করিয়া অনাথবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক হইয়াছেন।

বিনীত—

প্রকাশক।

निवेदन।

विजया दशमी के उपलक्ष में हम अपने पाठकों को बधाई देते हुए जगत्जननी से अपने सम्राट सहित सर्व्वसाधारण की मंगल कामना करते हैं एवं देवनागरी भाषा में कुछ निवेदन ले उपस्थित होने का साहस करते हैं यदि रुचिकर हुआ तो थोड़ी सेवा किया करेंगे।

जिस अनाथबन्धु के कर्म्मकला कुतूहल से इस स्वप्नवत संसार का चर्खा एक समान चल रहा है। जिसने हम लोगों को कर्म्मयोगी होने की शिक्षा दी है, जिसने हमें यह उपदेश दिया है कि सदा कर्म्म करते रहो बिना कर्म्म किये शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती उसी देवादिदेव कमलापति को "अनाथबन्धु" उभय कर जोड़ प्रणाम करता है। जो पृथ्वी का भार हरण करने के निमित्त युग २ में अवतार धारण करते हैं, जो अनादि अनन्त और अद्वितीय है, जो सब जीवों में विराजमान हैं। तथा जिनके रूपकी तुलना नहीं। अहा नवदुर्वादल श्यामकान्ति पीतवसन पद्मपलाशलोचन, प्रफुल्ल मुख, कोटि २ चन्द्रमा सूर्य्य जिनके पादपद्म में सुप्रकाशित हैं, वही पादपद्म हम भवार्णव पार होने की अभय तरणी है; इस तरणी का खेवैया अनाथबन्धु ही है इसलिये इसकी शरण लेना परमावश्यक है।

यह संसार उसी लीलामय की लीला का नमूना है। संसार की जिस वस्तु पर विचार कियाजाय वही उस लीलामयकी आश्चर्यजनक लीलासे खिन्न दीख पड़ती है यहां तक कि उसकीलीला अनाथत्व में भी वर्त्तमान रहती है।

इस विश्वमण्डल के गर्भ में अनाथ अनेक तरह के हैं। कर्म्मजाल में बंध कर मनुष्य कई प्रकार से अनाथ होजाते हैं परन्तु सब अनाथों का एकमात्र शरण वही अनाथशरण है उसी का दूसरा नाम अनाथबन्धुभी है। यह अनाथबन्धु उस अनाथबन्धु से अभीष्ट सिद्धि के लिये प्रार्थना करता हुआ अनेक प्रणाम करता है।

संसार में प्रथम श्रेणीके अनाथ :—जिसको आत्म बोध नहीं है। जो ममता के चंगुल में फंस कर अपने को तथा उस अनाथबन्धु को भी भूल गया है, वह जिस समय मोह निद्रा से निवृत्त हो जाग्रतावस्थामें आता है तब उसकी क्या गति होती है। जिसने विवेक शक्ति से भी काम लेना नहीं सीखा जो सदा दुःख शोक समुद्र में ही गोते लगाया करता है उसके समान अनाथ और कौन है? जिस सत्यलोकेश्वर को मुक्तकण्ठ से पुकारने पर, पुत्रकलत्रशोकदग्धहृदय में भी नन्दन कानन के पारिजात सौरभ का आविर्भाव हो उठता है, सुधाग्नि से जलते हुए मनुष्य का दुःख नाश हो शान्ति होती है उसी 'अनाथबन्धु" को आपलोगों से परिचित कराने के लिये एवं उसी अनाथबन्धु को पानेका उपाय बताने के लिये इस "अनाथबन्धु" का आविर्भाव आज लोकसमाज में होना सङ्गत है। साधकों के हितार्थ हिन्दूशास्त्र में उस दीनबन्धु के अनेकरूप तथा अनेक साधन प्रणाली लिखी हुई हैं। हम इस श्रेणीके अनाथों के लिये उन सब कथाओं का वर्णन सरल भावसे लिखा करेंगे। इसके अतिरिक्त योगशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्म्मशास्त्र इत्यादि की साधारण बातें भी सर्वसाधारण के समझने योग्य भाषामें लिखी जायंगी। मनुष्य जिससे संसार में रह कर साधन पथ में अग्रसर हो, "अनाथबन्धु" में उसके विशेष उपाय बताये जायंगे इस प्रकार यह पत्रिका अपने "अनाथबन्धु" नाम को सार्थक करने की चेष्टा करेगी।

दूसरी श्रेणी के अनाथ :—जो लोग सांसारिक रीति से ज्ञानहीन हैं। वर्त्तमान समयमें चारोंतरफ जड़वस्तुओं का ज्ञान अच्छी तरह फैल रहा है। इस समय बिना ज्ञान या विद्या के संसार में काम नहीं चल सका। हमलोग चाहे जितने विद्वान या ज्ञानी अपने को क्यों न मानलें, किन्तु हमारा ज्ञान वास्तव में अत्यन्त संकीर्ण एवं सीमाबद्ध है। हमलोग दो एक विषयों का सामान्य ज्ञान प्राप्त भले ही करलें पर सैकड़ों विषयों में अनभिज्ञ रहते हैं। यहां तक कि हमलोगों में जो शिक्षित हैं, वे वृक्ष इत्यादि काष्टादिक जो उनकी आंखों के सामने नित्य पड़ते हैं उनके भी वे गुण नहीं जानते। इनका गुण जानने पर संसार का कितना उपकार हो सकता है, यह लेखनी द्वारा नहीं कहा जा सका। कैसे दुःखका विषय है कि लता, वृक्ष रूप में औषधि रहते हुए भी बहुधा औषधियों का ज्ञान न रहने के कारण प्राण हरण हो जाता है इस अवस्था में हमलोगों से बढ़ कर अनाथ और कौन है? इस श्रेणी के अनाथों की शिक्षा के लिये "अनाथबन्धु" में इस विषय के जानकारों के सुन्दर २ लेख प्रकाशित हुआ करेंगे। इसके सिवाय कृषि, शिल्प, वाणिज्य, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, (एलोपेथिक एवं वैद्यक) इतिहास, विज्ञान, दर्शन मनस्तत्व, इत्यादि के सम्बन्ध में इसमें अनेक आवश्यक निबन्ध भी प्रकाशित हुआ करेंगे। सारांशयह कि राजनीति के अतिरिक्त सभी जानने योग्य विषय अनाथबन्धु में प्रकाशित हुआ करेंगे। द्वितीय श्रेणी के अनाथों को इस "अनाथबन्धु" नामी पत्रिका को

सार्थकता समझाने में किसी प्रकारकी यथासाध्य त्रुटि न की जायगी। तृतीय श्रेणी के अनाथ :—जो दरिद्र हैं संसार में जो धनहीन हैं। दरिद्रता नाना प्रकार के दोषों का भाण्डार है। वास्तव में दरिद्र के समान अनाथ इस भूमण्डल पर दूसरा नहीं मिल सकता। वे अभाव की पूर्ति के निमित्त क्या नहीं कर बैठते "दरिद्रता भी कई प्रकार की होती हैं। आजकल हमारे देशसे शिल्पविद्या का लोप ही गया है इस से अर्थ संग्रह का पथ संकीर्ण हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिश्रम करने की तयार हैं परन्तु उनको कार्य्यक्षेत्र नहीं दीखता यदि यह कहा जाय कि कृषि और नौकरी ये ही दो द्वार जीवन निर्वाह के खुले हैं तो अत्युक्ति न होगी। चास की जमीन भी बंट जाने के कारण ऐसी हो गई है जैसे एक मांस के टुकड़े पर कई एक मांसाहारी पक्षियों की दृष्टि हो और एक दूसरे से छीन लेने की चेष्टा करता हो। अन्त में परिणाम यह होता है कि जो कुछ पृथ्वी जिसके हाथ लगी भी तो उससे उसके साल भरके भोजन का निर्वाह भी उचित रूप से नहीं हो सकता। परन्तु वैज्ञानिक रीति से यदि खेती की जाय तो थोड़ी जमीन में अधिक फसल उपज सकती है। इसकार्य्य के भी उपाय इस पत्रिका में लिखे जायंगे। नौकरी का भी यह हाल है कि जनसंख्या तो अधिक है पर काम उतना नहीं परिणाम मजूरी कम मिलती है इसलिये यदि नौकरी को झखमारी कहा जाय तो असम्भव वर्णन नहोगा। इससे ज्ञात होता है कि शिल्पोन्नति ही से देशका कल्याण हो सकता है किन्तु केवल इस विषय पर लेख लिखने ही से कार्य्य सिद्धि नहीं हो सकती अस्तु शिल्पियों की हाथ से कलम से काम करना सिखाना होगा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमलोग "अन्नपूर्णा आश्रम" नाम का एक कार्य्यालय स्थापित कर रहे हैं। इस देशके समस्त आवश्यकीय पदार्थ, निपुण शिल्पी द्वारा इस आश्रम (कार्य्यालय) में बनाकरेंगे एवं उसका खर्च पोसा कर सस्ते दाम में बेचने का बन्दोबस्त किया जायगा। जो लोग शिल्प-विद्या सीखने आवेंगे वे काम अच्छी तरह जानलेने पर इसी आश्रम में कार्य्य पाया करेंगे।

इसको एक आदर्श कार्य्यालय बनाया जायगा। अभी इसका कार्य्य सामान्य रूप में होता देख किसी को निरुत्साह नहीं होना चाहिये। अनेक कार्य्यक्षेत्र में इसी तरह सामान्य रूप में कार्य्य प्रारम्भ हो कर बड़े रूप में परिणत होते देखा गया है। विलायत के आक्सफोर्डशायर में मैंगवेल नामका एक छोटा सा ग्राम है। १७९४ ई० में बिशप वारिंगटन ने इसी ग्राम में एक छोटासा कार्य्यालय स्थापित किया था। उसमें, केवल खर्च भरलेकर बिना मुनाफे खानेकी चीजें बिका करती थीं। यहीं धीरे धीरे श्रम-जीवी लोगों की बनाई वस्तु बिना लाभ के बेची जाती, इसीसे श्रमजीवियों को उनके परिश्रम का मूल्य दिया जाताथा, किन्तु कार्य्यालय केवल खर्चभर लेकर ही उन वस्तुओं को बेचा करते इस कारण और व्यवसाइयों की अपेक्षा इसे दामों में इस कार्य्यालय की द्रव्य बिका करतेथे। इस तरह सारे इंगलैंड में इस कार्य्यालय की शाखा फैल गई। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में १३ लाख ४२ हजार मनुष्य इसके कार्य्यकर्त्ता हो गए एवं इसका मूलधन पौने अठाइस करोड़ रुपया, और रिजर्व तहवील एक करोड़ बीस लाख रुपया उपस्थित रहने लगा।

फलतः यदि धार्म्मिक कर्त्तव्यनिष्ठ लोग इसतरह कार्य्य में हस्तक्षेप करें तो सफलता अवश्यमेव प्राप्त होगी। हमलोग इतनी उच्चाभिलाष नकर, जिसमें कारवार में सफलता हो वैसीही चेष्टा करेंगे। "अनाथबन्धु" इसतरह कार्य्य चलाने की प्रणाली नियत कर "अन्नपूर्णा आश्रम" को आदर्श रूप में लाने की चेष्टा में तत्पर होंगे।

उच्च घराने की स्त्रियां यदि घरमें बैठकर किसी प्रकार की शिल्पकला भूषित वस्तु तैयार कर आश्रम के कार्य्य संरक्षकों को प्रदान करें तो वे उन्हें, वस्तुको उचित मूल्यपर बेचकर दाम देदेंगे। आश्रम में भी स्त्रियों के कार्य्य करने की व्यवस्था रहेगी।

चतुर्थ श्रेणीके अनाथ :—जो रोग ग्रसित हैं उनकी पीड़ा हरण के भी आयोजन इस आश्रम में रहेंगे। एलोपैथिक, होमियोपैथिक, कविराजी और हकीमी एलाज बिना मूल्य किये जायंगे किन्तु दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि रोगियों के रहने का स्थान अभी आश्रम न दे सकेगा। अनाथबन्धु जिसमें प्रकृतपक्ष में अनाथबन्धु का काम कर सके ऐसी चेष्टा तन मन धन् से की जायगी। उस अनाथबन्धु जगदीश्वर से तथा आप महानुभावों से इस आश्रम से सहानुभूति एवं कृपा रखने की प्रार्थना करता हुआ आशा करता हूं कि आप लोग इस निवेदन को पढ़कर ही न रह जायं वरन इस पर विचार करें कि जिस विषय को हम ने हाथ में लिया है उसका महत्त्व कितना है। यह कार्य्य अति गम्भीर है और बिना आपलोगों की सहायता के पूरा नहीं हो सकता। आजकल ऐसी हमलोगों की अवस्था हो रही है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोच कर कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, बैठ रहता है इसी से हमने पूर्व ही कहा है कि हम अपने को भूलगये। हम सब कर सकते हैं। आज हमारे कितने भाई एक समय भी उदर पूर्ति नहीं कर सकते इसका मुख्य कारण यही है। कि एक दूसरे की सहायता देने में कभी अग्रसर नहीं होता।

हमारा केवल विनीत निवेदन करने ही तक का अधिकार है इसके बाद सहाय प्रदान करना आप ही लोगों के हाथ है। आशा है हमारी प्रार्थना निष्फल नहीगी।

(२)

मैंने बहुत विचार कर कई वर्षों तक अनुभव करके और किसी बड़े उद्देश्य को लक्ष कर यह "अनाथबन्धु" प्रकाशित किया है। इस में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं क्यों कि व्यवसाय द्वारा अबतक जो कुछ मैंने उपार्जन किया है और ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसीसे मैं सन्तुष्ट हूं। निर्मल निष्कलङ्क आनन्द उपभोग करने की इच्छासे—इतना वृद्ध हो जाने परभी "अनाथबन्धु" प्रकाशित कर उसके पीछे पीछे अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने की अभिलाषा की है। मुझे सदा पूरी आशा रहती है कि ईश्वर मेरे कर्म का सहायक है। जोंही इस अनाथ-बन्धु की प्रथम संख्या निकल जाने पर मुझे मालूम हुआ कि :—

१। बहुत से लोग बङ्गभाषा नहीं जानते—समझते भी नहीं इसी से "अनाथबन्धु" उन्हों ने लौटा दिया। परन्तु जिनलोगों के पास यह पत्रिका भेजी गई वे सभी गण्यमान्य सज्जन हैं अस्तु यदि वे किसी बङ्गभाषा जानने वाले सज्जन से पढ़वाकर इस में लिखे लेख सुनते तो वे लेखों के लाभ मालूम कर सकते और अन्नपूर्णा अश्रम के उद्देश्य भी समझ सकते। आश्रम की प्रतिष्ठा एक महत् कार्य्य है यदि सर्वत्र इसी प्रकार आश्रम स्थापित होजाय तो जगत् के सभी लोग इस से लाभ उठा सकें। बहुत लोग इस आश्रम द्वारा भोजन वस्त्रादि लाभ कर एवं रोग शोक में औषधि और सान्त्वना पाकर आनन्दमय जीवन बिता सकेंगे। थोड़े खर्च में यह सब कार्य्य कैसे हो सकते हैं इसकी शिक्षा देना भी परमावश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त आश्रम के सहायक रूप में "अनाथबन्धु" का प्रचार मैंने किया है।

२। यह सत्य है कि धर्मनिष्ठपुरुष प्राय: प्रपंच द्वारा ठगे जा चुके हैं इसी कारण से अब सब का एसे कार्य्यों की ओर अविश्वास हो गया है और सत् कार्य्य की ओर अश्रद्धा भी हो गई है। मेरा तो कहना केवल यह है कि यदि आप किसी एसे सहायता के काम में ठगा हो चुके हैं तो उसपर विचार करिये कि क्यों ? देश काल पात्र इन तीनों पर विचार कर कार्य्य करने से किसी विषय में धोखा नहीं उठा सकते और न सत्कर्म की ओर अभक्ति ही होती है।

मेरी उम्र प्राय: ७० वर्ष की हो गई। मैं विगत ५० वर्षों में व्यवसाय कर रहाहूं और अपने अनुभव तथा धैर्यबल से अबभी एक बड़ा व्यवसाय चला रहाहूं। ईश्वरेच्छा से, भारतवर्ष, योरोप एवं एमेरिका के सभी महत् व्यक्तियों से मेरा व्यवसाई सम्बन्ध है परन्तु आज तक मेरे ऊपर उन महानुभावों का स्थायी विश्वास एवं श्रद्धा ज्यों की त्यों चली आरही है। मेरे द्वारा किसी प्रकार के प्रपंच की सम्भावना है या नहीं यह बात मेरे बहुत से पूज्य तथाबन्धुगण जानते हैं।

३। अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने का मैं उद्योग करूंगा। आश्रम स्थापना में प्राय: एक लाख रुपये की आवश्यकता है। कम से कम तीस पैंतीस हजार रुपये हो जाने परभी मैं किसी तरह इस को आरम्भ कर सकताहूं इसके पश्चात् सहायकवृन्द के अभिप्रायानुसार आश्रम के कार्य्य की वृद्धि हो सकती है।

४। "अनाथबन्धु" से जो कुछ आय होगी वह आश्रम के कार्य्यों में व्यय हुआ करेगी। यदि इस पत्रिका के पांच हजार ग्राहक हो जायं तो मैं समझताहूं कि फिर आश्रम के लिये अधिक सहायता की आवश्यकता नभी हो।

इस पत्रिका की प्रथम संख्या प्रकाशित कर जैसा मैं उत्साहित किया गया हूं उससे तो मेरे अभीष्ट सिद्धि में तनिक भी संदेह नहीं दीखता।

मैं पहिले ही लिख चुका हूं कि मेरा स्वार्थ केवल "आनन्द" मात्रही है। जहां तक सम्भव है मैं "अनाथबन्धु" को सर्वाङ्ग-सुन्दर बना आश्रम की सेवा से उपयोगी स्थान देने में कदापि त्रुटि न करूंगा। तिसपर मैं अपने सहायकों द्वारा भी खूब उत्साहित किया जा रहा हूं।

बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत से महानुभावों ने पत्रिका पाते ही अपना नाम ग्राहकों की श्रेणी में उदारता पूर्वक लिखवा मुझको अत्यंत उत्साहित तथा बाधित किया है। उन लोगों का नाम यहां प्रकाश करना मेरी समझ में अनुचित न होगा।

बंगेश्वर हिज एक्सेलेन्सी लोर्ड कारमाइकल बहादुर।

महामान्य महाराजा सोनपुर।

महामान्य राजासाहब बामड़ा।

अनरेबल सर महाराजा दरभङ्गा।

अनरेबल सर महाराजा मनीन्द्रचन्द्र नन्दी बहादुर—कासिमबाजार।

अनरेबल महाराज बहादुर—नसीपुर।

महामान्य जेनेरल तेज शमसेर जङ्ग बहादुर राणा—नेपाल।

राजा विजयसिंह धुधुरिया।
सर महाराजा प्रद्योत कुमार ठाकुर बहादुर।
लाला ज्योतिप्रकाश नन्दी साहब—वर्द्धमान।
महामान्य राजासाहब—लनजोगड़।
महामाननीया महारानी साहबा,
—पायोयागढ़।
रायबहादुर मृत्युंजय राय चौधरी—गौरीपुर।
कुमार ए, पी, लाहिरी—राजसाही।
श्रीयुत प्रभातचन्द्र गिरि—नाड़केश्वर।

जिन जिन मान्यवर महाशयों ने "अनाथबन्धु" का ग्राहक बन मुझे उत्साहित किया है उनमें से उपरोक्त सभी सज्जन इसके पृष्टपोषक तथा अभिभावक होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। आशा है सर्व्वसाधारण अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में मुझे सहायता देने में कदापि पीछे न हटेंगे एवं ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि, सब स्वस्थ और स्वच्छन्दता पूर्व्वक दिन बितावें तथा मंगलमय जगदीश्वर के आशीर्व्वाद से इस महत् कार्य्य में सम्मिलित हो जीवन सफल करें।

देशी हाथ का शिल्प तथा अत्यंतावश्यक नवाविष्कृत फलदायक औषधादि पर प्रबन्ध लिख भेजने से हमलोग उसे सादर ग्रहण करेंगे। प्राचीन समयका ग्राम्य-इतिहास, मन्दिरों के विवरण एवं चित्रादि भेजने पर प्रकाशित किये जायंगे। किसी की निन्दा, अश्लील शब्द पूर्ण निबन्ध अथवा राजनीति सम्बन्धीय लेख इस पत्रिका में प्रकाशित न होंगे।

यदि कोई रसवी धार्म्मिक विषयपर लेख, काव्य अथवा गीत लिख कर भेजें तो छापी जा सकती है। "अनाथबन्धु" में छापने के लिये बहुतसी तसवीरें जीवन चरित्र के साथ मिली हैं। आशा है अन्य सज्जन भी अपना २ जीवनवृत्तान्त एवं चित्र भेजने में देर न करेंगे।

कुछ दिन बाद ही और एक भारतके राजाओंगों के जीवन-चरित एवं फोटो का एलबम प्रकाशित करूंगा। इसका छापना अत्यंत सहज होगा, कारण प्रधान खर्च है ब्लौक बनवाई सो "अनाथबन्धु" के लिये बनेही हैं। इस विषय में सब राजाओं से सहानुभूति रखने की प्रार्थना है।

"अन्नपूर्णा आश्रम"

का कार्य्य जिस तरह चलेगा उसका ब्यौरा हम लिख ही चुके हैं आशा है आपलोग इसको उन्नतिशील बनाने में कुछ उठा न रक्खेंगे मैं कृतज्ञता पूर्व्वक निवेदन करता हूं कि जिन महाशयोंने "अनाथबन्धु" की प्रथम एवं द्वितीय संख्या रक्खी है और इसके उद्देश्य को समझ ग्राहक हो गए हैं वे अबकी संख्या पातेही वार्षिक मूल्य भेजकर मुझे बाधित करें।

पहिले ही कह चुका हूं कि "अनाथबन्धु" की आय आश्रम सम्बन्ध में ही व्यय होगी अस्तु जिनलोगों की इच्छा इस आश्रम को सहायता पहुंचाना है वे इस अवसर पर देर न करें। वे जितनी जल्दी सहायता प्रदान करेंगे उतनीही जल्दी कार्य्य होगा।

विशेष सुविधा।

विद्यालय के छात्र, धर्म्मसभा, एवं जन-साधारण के उपकारार्थ जो लाईब्रेरी हैं यहसब इस "अनाथबन्धु" को आधे दाम में पावेंगे।

इसमें हिन्दीके लेख भी निकला करेंगे।

विनीत :—
श्रीकालीप्रसन्न मुखोपाध्याय
प्रकाशक।

OPINIONS

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP,
BENGAL.

22nd July, 1916.

"Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine "Anath Bandhu." I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10.

The object is a laudable one. * * * *"

Yours sincerely,

(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From

The Hon'ble Sir Gooroo Dass Banerjee.

Narikeldanga, Calcutta.

14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive. * *

Yours truly,

Gooroo Dass Banerjee.

PRESS OPINIONS.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such ("Anathbandhu") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being published by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called "Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe it.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K. P. Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of a useful career.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion, Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religious, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. The subscription, we fear, is a little too high for people of moderate means and the fact that the public can subscribe to a similar journal for half the price, should induce the publishers to reduce the rate of subscription. For it must not be forgotten that the return they get for their money will appeal far more to many than the ascrifice required of them towards the laudable cause which the conductors of the Magazine have in view.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A New Journal by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপন-দাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তি-মত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপন-দাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
" ২য় " " " " ১৫৲ টাকা হিঃ।
" ৩য় " " " " " " "
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
" শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লকপ্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং
বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্ত-
মুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরিধানাং
সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকার-
পীনোন্নত পয়োধরাম্॥

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

গোক্ষীরধামধবলং
পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং
নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ সর্প-
ভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং
দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥

সানন্দমুখং লোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম।

অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে। তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ী।
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী মাহেশ্বরী নমোঽস্তুতে॥

প্রার্থনা।

সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী। দক্ষাক্রন্দনকরী রিপুক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী॥
সাক্ষান্মোক্ষকরীনিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী। ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে। জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতী॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজানায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথা ঃ—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষা, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রনদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রন, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কাযে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রন ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রন, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীলক্ষ্মী।

ধ্যান।

পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণিভির্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্॥
গৌরবর্ণাং স্বরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

প্রণাম।

ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং নিত্যং মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

স্তোত্র।

নমস্তে সর্ব্বলোকানাং জননীমব্ধিসম্ভবাম্।
শ্রিয়মুন্নিদ্রপদ্মাক্ষীং বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলস্থিতাম্॥ ১
ত্বং সিদ্ধিস্ত্বং স্বধা স্বাহা সুধা ত্বং লোকপাবনি।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূতির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী॥ ২
যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী॥ ৩

আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিস্ত্বমেব চ।
সৌম্যাসৌম্যৈর্জগদ্রূপৈস্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতম্॥ ৪
কা ত্বন্যা ত্বামৃতে দেবি সর্ব্বযজ্ঞময়ং বপুঃ।
অধ্যাস্তে দেবদেবস্য যোগিচিন্ত্যং গদাভৃতঃ॥ ৫
ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ম্।
বিনষ্টপ্রায়মভবৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতম্॥ ৬
দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যধনাদিকম্।
ভবত্যেতন্মহাভাগে নিত্যং ত্বদীক্ষণান্নৃণাম্॥ ৭
শরীরারোগ্যমৈশ্বর্য্যমরিপক্ষক্ষয়ঃ সুখম্।
দেবি ত্বদ্দৃষ্টিদৃষ্টানাং পুরুষাণাং ন দুর্লভম্॥ ৮
ত্বমাম্বা সর্ব্বভূতানাং দেবদেবো হরিঃ পিতা।
ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনা চাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং চরাচরম্॥ ৯
মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মা গৃহং মা পরিচ্ছদম্।
মা শরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্বপাবনি॥ ১০
মা পুত্রান্ মা সুহৃদ্বর্গাং মা পশূন্ মা বিভূষণম্।
ত্যজেথা মম দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃস্থলালয়ে॥ ১১
সত্ত্বেন সত্যশৌচাভ্যাং তথা শীলাদিভির্গুণৈঃ।
ত্যজন্তে তে নরাঃ সদ্যঃ সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে॥ ১২
ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শীলাদ্যৈরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষা নির্গুণা অপি॥ ১৩
স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ স বুদ্ধিমান্।
স শূরঃ স চ বিক্রান্তোঃ যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ॥ ১৪
সদ্যো বৈগুণ্যমায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাঙ্মুখী জগদ্ধাত্রি যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে॥ ১৫
ন তে বর্ণয়িতুং শক্তা গুণান্ জিহ্বাপি বেধসঃ।
প্রসীদ দেবি পদ্মাক্ষি নাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন॥ ১৬

প্রথম বর্ষ। | ভাদ্র। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | তৃতীয় সংখ্যা।

অনাথবন্ধু।

তারা।

তুমি হে অনাথ বন্ধু পতিতজনের মিত্র।
তুমি হে দীনের বন্ধু পিতা—পরম পবিত্র॥
তুমি করুণা-সাগর ভব-সাগরের তরী।
তুমিই ভক্তজনের বন্ধু—দয়াময় হরি॥

যাহার জগতে নেই আপন বলিতে কেহ।
যাহার হৃদয় পূত (তুমি) তাহারে কর হে স্নেহ॥
যাহার নাহিকো বিশ্বে আপনার কোন ঠাঁই।
যাহার আশ্রয় তুমি সুখে দুঃখে (মোরা) তোমায় চাই॥

অনাথের গতি তুমি অনাথজন আশ্রয়।
অনাথের পিতা তুমি সর্ব্বজীবে দয়াময়॥
অনাথের নাথ তুমি সম্পদে বিপদে প্রভু।
অনাথে আশীষ দেব তব পদ (নাহি) ভুলি কভু॥

তোমারে করিতে পূজা বাসনা করেছি হৃদে।
তোমার অভয় নামে আশ্রয় লয়েছি পদে॥
তোমাতে আমাতে নাথ চিরবাঁধা রাখিয়া গো।
তোমার চরণে পিতঃ রাখিও মিনতি ওগো॥

তুমি বিশ্বপিতা দেব হে অভয়দাতা।
অনাথের নাথ তুমি অনাথের পিতা॥
আশীষ কর হে দেব এ অনাথজনে।
মতি রহে চিরদিন তোমার চরণে॥

সত্য, সরল, চরিত্র দয়া
মানের পথ।

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

আশ্বিন।

১লা আশ্বিন, রবিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘণ্টা ১১।২, কৃত্তিকা-নক্ষত্র দিবা ঘণ্টা ৪।৩৭। যাত্রানাস্তি। তিলতর্পণেন বারদোষ। রাত্রি ঘ ১১।২ মধ্যে নিম্ব পরে তাল অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৪।৫ গতে ৪।৫২ মধ্যে।

২রা আশ্বিন, সোমবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ১১।১২, রোহিণীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।১২। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি, সন্ধ্যা ৬।১২ গতে পশ্চিমে শুভ, রাত্রি ঘ ৭।৩৬ গতে বায়ু-কোণে নৈর্ঋতে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।১২ গতে পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি। রাত্রি ঘ ১১।১২ মধ্যে তাল পরে নারিকেল অভক্ষ্য।

৩রা আশ্বিন, মঙ্গলবার।— অষ্টমী রাত্রি ঘ ১।৪৫, মৃগ-শিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১৬। যাত্রানাস্তি। পুণ্যতরা স্নানম্। শ্রীশ্রীজীমূতবাহনপূজা। জীতাষ্টমী ব্রত সর্ব্বসম্মত। নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৮।৭ মধ্যে।

৪ঠা আশ্বিন, বুধবার।—নবমী রাত্রি ঘ ৩।৩৭, আর্দ্রা-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৩৯। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ৩।৩৭ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫২।৪২ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে বারবেলা বিহায় নবম্যাদি কল্পারম্ভো দেব্যা বোধনঞ্চ। অলাবু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪২ গতে ৭।২৯ মধ্যে, পরে ১।৪৪ গতে ৪।৪৪ মধ্যে।

৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।—দশমী রাত্রি ঘ ৫।৪০, পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৩। যাত্রানাস্তি। কলম্বী অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ২।৫৫ গতে ৫।৫৬ মধ্যে।

৬ই আশ্বিন, শুক্রবার।—একাদশী, পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪৯। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৩।৪৯ গতে নক্ষত্রদোষ। তিলতর্পণেন বারদোষ। শিম অভক্ষ্য।

৭ই আশ্বিন, শনিবার।—একাদশী দিবা ঘ ৭।৪৫, অশ্লেষানক্ষত্র। যাত্রানাস্তি। একাদশীর উপবাস। গোস্বামী-মতে উন্মিলনী মহাদ্বাদশী ব্রত। পূতিকাভক্ষণ নিষেধ।

৮ই আশ্বিন, রবিবার।—দ্বাদশী দিবা ঘ ৯।৩৮, অশ্লেষা-নক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।১৭। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৩৮ মধ্যে একাদশীর পারণ। মঘাত্রয়োদশীর শ্রাদ্ধ। তিলতর্পণেন বারদোষ। দিবা ঘ ৯।৩৮ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৪।১৬ গতে ৫।৪ মধ্যে।

৯ই আশ্বিন, সোমবার।—ত্রয়োদশী দিবা ঘ ১১।১৩, মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৮।২৮। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৮।২৮ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ১১।১৩ গতে দক্ষিণে শুভ। দিবা ঘ ১১।১৩ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ ভক্ষণ নিষেধ।

১০ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।—চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ১২।২৩, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১০।১৬। যাত্রানাস্তি। অমাবস্যার নিশিপালন। মৃতাহ পার্ব্বণ ও মহালয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ। দিবা ঘ ১২।২৩ মধ্যে পুণ্যতরা স্নান পরে গঙ্গাস্নানে গোসহস্রদান জন্য ফলম্। দিবা ঘ ১২।২৩ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য, মাংস অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৮।৪ মধ্যে।

১১ই আশ্বিন, বুধবার।—অমাবস্যা দিবা ঘ ১।৪, উত্তর-ফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৩৫। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।৪ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি। অমাবস্যার ব্রত উপবাস। দিবা ঘ ১।৪ মধ্যে মৎস্য, মাংস পরে কুষ্মাণ্ড অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৬।৪২ গতে ৭।৩২ মধ্যে, পরে ১।৪০ গতে ৪।০ মধ্যে।

১২ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ১।১৪, হস্তানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।২৪। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।১৪ গতে যাত্রামধ্যম, দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫১।২৯ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে প্রতিপদাদি কল্পারম্ভ। দিবা ঘ ১।১৪ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতী অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ২।৫০ গতে ৫।৪৯ মধ্যে।

১৩ই আশ্বিন, শুক্রবার।—দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১২।৫৪, চিত্রানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৪৬। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১২।৫৪ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল অভক্ষ্য।

১৪ই আশ্বিন, শনিবার।—তৃতীয়া দিবা ঘ ১২।৫, স্বাতী-নক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৩৬। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।২৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।৫ গতে পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি, দিবা ঘ ১২।৩৬ গতে নক্ষত্রদোষ. রাত্রি ঘ ১১।২৭ গতে বিষ্টিদোষ। দিবা ঘ ১২।৫ মধ্যে পটোল পরে মূলাভক্ষণ নিষেধ।

১৫ই আশ্বিন, রবিবার।—চতুর্থী দিবা ঘ ১০।৪৮, বিশাখানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১২।১ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ভোর ৫।৩৪ গতে পূর্ব্বে নাস্তি। দিবা ঘ ১০।৪৮ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফল অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৪।১ গতে ৪।৫৩ মধ্যে।

১৬ই আশ্বিন, সোমবার।—পঞ্চমী দিবা ৯।১০, অনু-রাধানক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৪। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।১০ গতে তিথিদোষ। দিবা ঘ ৯।১০ মধ্যে ষট্-পঞ্চমী ব্রত ও পূজা। সায়ং ষষ্ঠ্যাং দেব্যা বোধনং এবং আমন্ত্রণাধিবাস। দিবা ঘ ৯।১০ গতে নিম্ব অভক্ষ্য।

১৭ই আশ্বিন, মঙ্গলবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ৭।১৪ পরে সপ্তমী রাত্রি ভোর ৫।২, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘ ৯।৫১। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা। প্রাতঃ ঘ ৭।১৪ মধ্যে দুর্গাষষ্ঠী-পূজা। দিবা ঘ ৭।১৪ মধ্যে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। দিবা ঘ ৭।১৪ গতে ৯।৫১ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে বারবেলা বিহায় তুলাবৃশ্চিকলগ্নে নবপত্রিকা প্রবেশ ও দেবীস্থাপ্য এবং বিহিত সপ্তমী পূজারম্ভ। দেবীর ঘোটকে আগমন, ফলং ছত্রভঙ্গ। দিবা ঘ ৭।১৪ গতে তালভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৮।২ মধ্যে।

১৮ই আশ্বিন, বুধবার।—অষ্টমী রাত্রি ঘ ২।৪৪, মূলা-নক্ষত্র দিবা ঘ ৮।২৪। যাত্রানাস্তি। বুধাষ্টমী ব্রতং নাস্তি, পঞ্চাতিথি ও অকালদোষ। দিবা ঘ ৯।৫১।৩৬ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে বারবেলা বিহায় মহাষ্টমী পূজা সমাপ্য, তৎপরে রাত্রি ঘ ২।১৯।৩০ গতে সন্ধিপূজারম্ভ, রাত্রি ঘ ২।৪৩।৩০ গতে সন্ধি-বলিদান। বীরাষ্টমী ব্রত। মহাষ্টমীর উপবাস। রাত্রি ঘ ২।৪৪ মধ্যে নারিকেল আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ প্রাতঃ ঘ ৬।৪৩ গতে ৭।২৯ মধ্যে, পরে ১।৩৯ গতে ৪।২ মধ্যে।

১৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।—নবমী রাত্রি ঘ ১২।১৯, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৪৯, পরে উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ভোর ঘ ৫।৯। যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।৪৩ গতে পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।১৯ গতে যাত্রানাস্তি, রাত্রি ভোর ঘ ৫।৯ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫১।৪৩ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে মহানবমী পূজা হোমদক্ষিণাদি সমাপ্ত। মন্বন্তরা স্নানদানাদি। অলাবু অভক্ষ্য। বার-বেলা দিবা ঘ ২।৪৬ গতে ৫।৪৩ মধ্যে।

২০শে আশ্বিন, শুক্রবার।—দশমী রাত্রি ঘ ৯।৫৪, শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২৯। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫১।৫১ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে বারবেলা বিহায় চরস্থির দ্ব্যাত্মকলগ্নে দেবী বিসর্জ্জনং এবং অপরাজিতা পূজনঞ্চ। গোস্বামীমতে শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়াদশমী কৃত্যম্। দেবীর দোলায় গমন, ফলং মড়কং ভবেৎ। কলম্বীভক্ষণ নিষেধ।

২১শে আশ্বিন, শনিবার।—একাদশী রাত্রি ঘ ৭।৩৫, ধনিষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৮। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, বৈকাল ঘ ৩।৫৯ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।৩৫ গতে তিথিদোষ। একাদশীর উপবাস সর্ব্বসম্মত। শিম অভক্ষ্য।

২২শে আশ্বিন, রবিবার।—দ্বাদশী বৈকাল ঘ ৫।২৬, শতভিষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৭। যাত্রানাস্তি, বৈকাল ঘ ৫।২৬ গতে যাত্রামধ্যম, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৩৭ গতে দক্ষিণে নাস্তি। দিবা ঘ ৯।৫২ মধ্যে একাদশীর পারণ। দিবা ঘ ৫।২৬ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকুভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্র-যোগ দিবা ঘ ৩।৪৯ গতে ৪।৩৬ মধ্যে।

২৩শে আশ্বিন, সোমবার।—ত্রয়োদশী দিবা ঘ ৩।৩০, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।২৯। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।২৯ গতে দক্ষিণে শুভ। দিবা ঘ ৩।৩০ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য।

২৪শে আশ্বিন, মঙ্গলবার।—চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ১।৫৩, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৩। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।১৭ গতে দক্ষিণে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৫৩ গতে উত্তরে মাত্র নাস্তি। দিবা ঘ ১।৫৩ গতে কোজাগরী কৃত্যং প্রদোষে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা। রাত্রে চিপিটক ভক্ষণ ও নারিকেলোদক পান, জাগরণ ও অক্ষক্রীড়া কর্ত্তব্য। পূর্ণিমার নিশিপালন। দিবা ঘ ১।৫৩ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৭।৫৫ মধ্যে।

২৫শে আশ্বিন, বুধবার।—পূর্ণিমা দিবা ঘ ১২।৩৮, রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।১৯। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১২।৩৮ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।১৯ গতে দক্ষিণে নাস্তি। পূর্ণিমার ব্রত উপবাস। দিবা ঘ ১২।৩৮ মধ্যে আশ্বিনেয় স্নানদানাদি ও আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৬।৫১ গতে ৭।৫২ মধ্যে, পরে ১।৩১ গতে ৩।৫০ মধ্যে।

২৬শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ১১।৫০, অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪৬। যাত্রামধ্যম, দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।১৪ গতে পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১১।৫০ গতে দক্ষিণে মাত্র নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৪৬ গতে নক্ষত্রদোষ। প্রাতঃ ঘ ১১।৫০ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতীভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৪২ গতে ৫।৩৬ মধ্যে।

২৭শে আশ্বিন, শুক্রবার।—দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১১।৩১, ভরণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৫৫। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।৩১ মধ্যে বৃহতী পরে পটোলভক্ষণ নিষেধ।

২৮শে আশ্বিন, শনিবার।—তৃতীয়া দিবা ঘ ১১।৪২, কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫৮। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।৪২ মধ্যে পটোল পরে মূলাভক্ষণ নিষেধ।

২৯শে আশ্বিন, রবিবার।—চতুর্থী দিবা ঘ ১২।২৫, রোহিণীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।২৬। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।৪৯ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।২৫ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে মাত্র নাস্তি। দিবা ঘ ১২।২৫ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফল অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ দিবা ঘ ৩।৪৯ গতে ৪।৩৬ মধ্যে।

৩০শে আশ্বিন, সোমবার।—পঞ্চমী দিবা ঘ ১।৩৭, মৃগ-শিরানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২৫। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।১ গতে দক্ষিণে পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৩৭ গতে পূর্ব্বে

মাত্র নাস্তি, রাত্রি ঘ ৩।২৫ গতে নিরংশ ও নক্ষত্রদোষ। দিবা ঘ ১।৩৭ মধ্যে শ্রীফল পরে নিম্ব অভক্ষ্য।

৩১শে আশ্বিন, মঙ্গলবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ৩।১৩, আর্দ্রা-নক্ষত্র রাত্রি ভোর ৫।৪৪। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১১।৩৭ গতে পশ্চিমে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।১৩ গতে তিথ্যমৃতযোগ কিন্তু সংক্রান্তিদোষ। জলবিষুব সংক্রান্তি। সংক্রান্তিকৃতাং স্নানদানাদি। সারসী ষষ্ঠী পূজা। আকাশে প্রদীপদানম্। মঙ্গলসংক্রান্তি মঙ্গলচণ্ডীপূজা। দিবা ঘ ৩।১৩ মধ্যে নিম্ব পরে তাল অভক্ষ্য। সংক্রান্তি পর্ব্বজন্য আমিষ, তৈল ও ক্ষৌরকর্ম্মাদি নিষিদ্ধ। মাহেন্দ্রযোগ রাত্রি ঘ ৭।৫২ মধ্যে।

সন ১৩২৩, আশ্বিন মাসের দিনপঞ্জিকা সমাপ্ত।

শ্রাবণ মাস।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

শ্রাবণ মাস বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্তর্গত চতুর্থ মাস। শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী বলিয়া শ্রাবণ নামে অভিহিত হইয়াছে। এই মাসে দিবাকর কর্কটরাশি অবলম্বন করিয়া উদয় হয়েন এবং মকররাশিতে অস্তগমন করেন।

এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে মনুষ্য লোকপ্রসিদ্ধ, ধনবান্ ও বদান্য হয়; সুহৃৎ, কলত্র, আত্মজ, দাসদাসীযুক্ত এবং সকলেই আজ্ঞাকারী হয়। কন্যার প্রথম ঋতুদর্শন এই মাসে শুভ নহে।

এই মাস বর্ষাঋতুর দ্বিতীয় মাস। বঙ্গদেশে এই মাসে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে, চতুর্দ্দিকই জলপ্লাবনে ভাসিয়া যায়। কোন কোন স্থানে অতিবৃষ্টি হইয়া শস্যাদি ডুবিয়া যায়। কৃষকেরা পাট, ভুট্টা ও আশুধান্য সকল কাটিতে আরম্ভ করে।

পূর্ব্ববঙ্গে পাট পচাইবার এই সময়। তারপর কৃষকেরা জলহ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পাট ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া গৃহজাত করিয়া থাকে। পাট উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গী বা নৌকাযোগে বড় বড় মোকামে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়।

এই শ্রাবণ মাসে পথঘাট কর্দ্দম ও জলময় হয়, পল্লীগ্রামের লোকগণের দুরবস্থার একশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নানাস্থানীয় বৃক্ষলতাদি পচিয়া মৃত্তিকা ও বদ্ধজল হইতে নানাপ্রকার দূষিত বাষ্পসকল উত্থিত হইয়া থাকে। সেই সকল বাষ্প হইতে নানাপ্রকার সংক্রামক রোগ ও ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়, মশক ও জোঁক পোকাদি জলকীটাণুদিগের অতিবৃদ্ধি হয়, পল্লীগ্রামের লোকেরা উক্ত জল পান করিয়া ভীষণ কলেরারোগে প্রাণবিসর্জ্জন করে।

এই শ্রাবণ মাসে বঙ্গদেশে সর্পদংশনে মৃত্যুর সংখ্যাও খুব অধিক; জোঁক, পোকা, মশকাদির বিষেও মনুষ্যগণ জর্জ্জরিত হয়। মফঃস্বলের মৃত্তিকা, খড় ও চালপচা হইতে কেন্নো-কেঁচোর ছড়াছড়ি দেখিলে সাধারণের একরূপ নরকযন্ত্রণা বলিয়াই ভ্রম হয়।

এই সময়ে পানীয় জল, খাদ্য, উপবেশন, শয়নাদির সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। আবর্জ্জনাবর্জ্জিত, শুষ্ক ও উচ্চস্থানে বাস এবং খাদ্য ও পানীয় দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সহরের দুগ্ধ, গাছের ফল, শাকসব্জী বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কখনই গ্রহণ করা উচিত নহে।

এই সময়ে ফলাদি একরূপ পক্ক হইয়া নিঃশেষ হইয়া যায়; কেবল শশা, আনারস, পেয়ারা, আতা, নেবু, বাতাবিলেবু প্রভৃতি প্রচুর পাওয়া যায়। ঐ সকল ভোজনে এই সময়ের ঋতু-ব্যাধি, ক্রিমি, বাত, পিত্ত, অক্ষুধা, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগসকলের পক্ষে বিশেষ উপকার হয়। এই সময় কটু, তিক্ত, কষায় বস্তুসকল নিত্য সেবন করিবে। লঙ্কা অপকারী হইলেও এ সময় উহা ব্যবহার মন্দ নহে। হরিতকী, সৈন্ধবলবণ এই মাসে নিত্য ব্যবহার বিশেষ উপকারজনক। জৈন্তী, ব্রাহ্মী, মূলা, গিমা, প্রভৃতি শাকসব্জী এ সময় বিশেষ উপকারী। তরকারীর মধ্যে ঝিংয়ে, করলা, উচ্ছে, ধুন্দুল, বরবটি ইত্যাদি স্বাস্থ্যের পক্ষে মন্দ নহে।

চাল্‌তা, বাতাবিলেবু সকলের পক্ষে সহজপাচ্য না হইলেও বাতঘ্ন ও মাংসাশীর পক্ষে বিশেষ উপকারী; নিরামিষাশীর পক্ষে কাঁচকলা, ডুমুর, নিম, ওল, কন্দমূল উপকারী খাদ্য। শশা, কলা, মাংস সেবনের পূর্ব্বে ও পরে ভক্ষণ করা উত্তম। এই সময়ে মধ্যে মধ্যে কাঁচা বেল পোড়াইয়া ভক্ষণ করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিবস প্রত্যূষে কিঞ্চিৎ কাঁচা হলুদ ও আদ্রক, সৈন্ধবলবণ ও আখের গুড় দিয়া সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ক্ষয় হয় এবং রক্ত পরিষ্কার ও মলশোধন হয়। খনা বলিয়াছেন :—

"কাণে কচু চোখে তেল।
মধ্যে মধ্যে খাবে বেল॥"

অর্থাৎ কাণ চুল্‌কাইবার আবশ্যক হইলে কচুর সরু ডাঁটা দিয়া চুল্‌কাইলে কখন কর্ণরোগ হয় না, আর প্রতি দিবস স্নানের পূর্ব্বে এক বিন্দু করিয়া খাঁটি সর্ষপতৈল চক্ষুর্দ্বয়ে দিলে কখন চক্ষুতে ময়লা পড়ে না বা কোনপ্রকার চক্ষুর অসুখ হয় না, আর মধ্যে মধ্যে বেলভক্ষণ পাকস্থলীর সম্বন্ধে বিশেষ উপকারী বলিয়াই সকলে অবগত আছেন।

শ্রাবণ মাসে অতি স্বল্পপরিমাণ মৎস্য ও মাংস ব্যবহার করাই উচিত। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এ তিন মাস মৎস্য ও মাংস পরিত্যাগ করাই বিশেষ যুক্তিসঙ্গত।

যাঁহারা মৎস্য ও মাংসাহারী, তেঁতুল, শশা, লেবু ও কদলী তাঁহাদিগের পরম ঔষধস্বরূপ।

রাত্রিকালে কখন শশা খাইবে না, আহারান্তে দ্বিপ্রহরেও শশা তত উপকারী নহে, খালি পেটে অর্থাৎ সকালবেলা শ্রাবণ মাসজাত শশা অমৃততুল্য ফল প্রদান করিয়া থাকে। প্রবাদ আছে,—"শশা প্রত্যূষে হীরা, মধ্যাহ্নে খিড়া, অপরাহ্ণে পীড়া।"

শ্রাবণ মাসে আমাদিগের দেশে মনসাপূজার বিধি আছে। পূর্ব্ববঙ্গে ইহার সমারোহটা অধিক হয়, গোটা মাসটাই মনসার পাঁচালী, মনসার কীর্ত্তন হইতে দেখা যায়; প্রতিগৃহে বিশেষ ঘটা করিয়া মনসার পূজা ও ভাসান হয়। যাঁহারা এই সময়ে সর্ব্বদা ভক্ষণে ও অভ্যঙ্গে হলুদ ও গোময় কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগের গৃহে কখন সর্পভয় থাকে না। হলুদচর্চ্চিত অঙ্গের নিকট ভীষণ প্রাণসংহারকারী কুম্ভীরও অগ্রসর হইতে ভয় পায়। এ জন্য কুম্ভীরপ্রধান উড়িষ্যা ও নানাস্থানের লোকেরা সর্ব্বদা হলুদ মাখিয়া বড় বড় নদীতে গিয়া নির্ভয়ে স্নান করে।

এই সময়ে নিত্য সর্ষপতৈল অভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করিবে। উক্ত তৈলাভ্যঙ্গে কোনপ্রকার জল বা বায়ুজনিত বিষদোষ বা বিষবাষ্প শরীরকে স্পর্শ করিতে পারে না। তৈল, ঘৃত প্রভৃতি স্নেহদ্রব্যে জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায়।

শরতে।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ. লিখিত।]

(১)

শরতে প্রান্তরে তব, হে বঙ্গ-জননি,
পুষ্ট স্বর্ণশস্যশিরে সমীর চঞ্চল—
চিরদীন দেশে তাই আনন্দের ধ্বনি,
চিরদুঃখী মুছিয়াছে নয়নের জল।
ছিন্ন আশা, ক্লিষ্ট হৃদি, সুখ মরীচিকা,
পদে পদে যাতনার নিষ্ঠুর দংশন,
ললাটে অনন্ত দুঃখ সমুজ্জ্বল টীকা,
সীমাবদ্ধ অভিলাষ—লাঞ্ছিত জীবন।
তবু, মা, মানব-হৃদি অমর মানবে;
তবু, মা, আশার আলো নিবে না জীবনে।
লাঞ্ছনা বহিয়া তাই এ বিপুল ভবে
আসি' দাঁড়ায়েছে আজি তোমারি চরণে
তোমার সন্তান মাতঃ! আজি সম্মিলনে
দুর্লভ আনন্দ জাগে ব্যথিত জীবনে।

(২)

শরতে তোমারি পূজা, হে বঙ্গ-জননি,
বঙ্গগৃহে। নিদাঘের তপ্ত ধরা'পরে—
বর্ষার বর্ষণে স্নিগ্ধ ব্যথিতা ধরণী;
তাই শ্যামশোভা তব প্রান্তরে প্রান্তরে।
মেঘালোকে সুখক্রীড়া অনন্ত অম্বরে;
হরিৎ ক্ষেত্রের শিরে কম্পিত-কাঞ্চন।
শ্রমশেষে আশা আজি জাগায় অন্তরে
সাধনার সফলতা, সুখের স্বপন।
আজি উঠিয়াছে ভরি' তোমারো অন্তর
অমোঘ আশীষে। মাতঃ, আনিয়াছ সুধা
জাগাইতে নব বলে ব্যথিত কাতর;
চিরক্ষুধাতুরে আজি ঘুচাইতে ক্ষুধা।
শরতে তোমারি পূজা;—অবসন্ন-প্রাণ
লভে নব শক্তি, মাতঃ, তোমারি সন্তান।

অন্নপূর্ণা।

[শ্রীনটবর বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্. টি. লিখিত।]

অন্নপূর্ণে!

কি ভিক্ষা দিতেছ তাঁরে,—কুবের ভাণ্ডারী যাঁর।
ব্রহ্মাণ্ডের কাম্যবস্তু যে করেছে পরিহার॥
সমুদ্র-মন্থনকালে যত রত্ন উঠেছিল।
যে ভিক্ষুক অনাদরে—অশ্রদ্ধায় উপেক্ষিল॥
জগৎ-রক্ষার তরে ভক্ষিয়া বিষের রাশি।
সদানন্দে নিমগন যেই ঋষি অহর্নিশি॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রার্থী যাঁর করুণাকটাক্ষকণা।
ভস্মীভূত মনমথ অহমিকায় আপনা॥
জানি তুমি—হিমালয় নগরাজকন্যা।
ধন-ধান্যের অধীশ্বরী, রূপে গুণে ধন্যা॥
মুক্তহস্তে ক্ষুধিতকে অন্ন কর দান।
পাষাণ-দুহিতা তবু কোমল পরাণ॥
(কিন্তু) এ ভিক্ষুক বীতরাগ নির্লোভ নিষ্কাম।
পারিবে কি পূরাইতে তাঁর মনস্কাম॥
অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ি! তুমিও তো এক দিন।
ভিক্ষুক-সকাশে ভিক্ষা চেয়েছিলে যথা দীন॥
হ'য়ে কত পদানত, যোগালে পূজার ফুল।
(হ'ল) মন্মথসহায়ে পূর্ণ, ছিল যাহা অপ্রতুল॥
মনে মনে ছিল তব কিন্তু এই অহঙ্কার।
মোহিবে রূপের মোহে, মহাযোগী নির্ব্বিকার॥
কিন্তু যবে উপেক্ষিয়া এ হেন রূপের রাশি।
অন্তর্হিত মহাদেব, অস্তমিত পূর্ণশশী॥
বুঝিয়া স্বকীয় ভ্রম, করিলে কঠোর তপ।
নাহি অন্য ধ্যান জ্ঞান, বিনা সেই নাম জপ॥
তখনি তো সে ভিক্ষুক হ'ল তব সন্নিধান।
নিমীলিত নেত্রত্রয় প্রফুল্লিত স্মেরানন॥
ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ পাত্রহস্তে ভিক্ষাপ্রার্থী আজি।
গিরিজায়া! ভিক্ষা দাও, ভার আন সাজি॥
ইচ্ছায় সৃজেন বিশ্ব, ইঙ্গিতে প্রলয়।
সর্ব্বশক্তিমান্ ভিক্ষু, কোন্ ভিক্ষা লয়॥
ত্রিগুণ অতীত যিনি, হীনে কৃপাবান।
লাঞ্ছিতা গঙ্গায় শিরে যত্নে দেন স্থান॥
চন্দন অগুরু ত্যজি চিতাভস্মে প্রীতি।
দেবতা গন্ধর্ব্ব ছেড়ে পিশাচ-সঙ্গতি॥
ভেদাভেদ নাহি যাঁর সেই মহাজনে।
কি ভিক্ষা দিবে গো গৌরি! ভাব মনে মনে॥
অন্য দেবকণ্ঠে দোলে পারিজাত-হার।
নীলকণ্ঠ-কণ্ঠোপরি সরীসৃপ ভার॥
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা অমৃত ফেলিয়া।
বৃষভবাহনে ফিরে শ্মশানে ভ্রমিয়া॥
হিমগিরিনিভ কান্তি কণ্ঠে ফণিহার।
ললাটস্থ অর্দ্ধ-ইন্দু ঢালে সুধাধার॥
জ্যোতির্ম্ময়রূপে যাঁর দিগন্ত উজ্জ্বল।
জটাজুটে মন্দাকিনী করে কলকল॥
দ্বীপিচর্ম্মাবৃত কটি, নীবিবদ্ধ ফণি,
হুঙ্কারে যাঁহার—স্তব্ধ নিখিল অবনী॥
লোভ-ক্রোধ-মোহাতীত জ্ঞানের আধার।
পুরুষপুরাণ ধন্য গণ্য সারাৎসার॥
নিরোধি মরুৎ, হ'লে সমাধি নিরত।
কত ইন্দ্র, কত ব্রহ্মা, হ'ল অস্তগত॥
অনিত্য সংসারমাঝে, ধ্রুব বস্তু যিনি।
আদি-অন্ত-মধ্য-শূন্য—দেব শূলপাণি॥
রাজকন্যে অন্নপূর্ণে! দাও ভিক্ষা তাঁরে।
"শ্রেষ্ঠ দান" চান তিনি, জীব শিব তরে॥

শ্রীশ্রীদুর্গা।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

"সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥
শরণাগতদীনার্ত্ত পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে ॥"

প্রথমেই মাতৃ-বন্দনায় সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গলকারিণী শিবে অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী সর্ব্বার্থ- (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) সাধিকা সাধনকারিণী গৌরী নারায়ণীর স্মরণ লইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতেছি। শরণাগত দীন ও আর্ত্তজনের পরিত্রাণকারিণী সর্ব্বাপদ্‌নাশিনী নারায়ণীকে নমস্কার করিতেছি।

রাজ্যভ্রষ্ট সুরথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কা হি সা দেবী ?" ভগবান্! কে সেই দেবী, যাঁহাকে আপনি মহামায়া বলিতেছেন ? তাঁহার রূপ কি এবং কর্ম্ম কি ? তিনি কি প্রকারেই বা উদ্ভবা হইলেন, যাঁহার আরাধনা করিলে আমার ও এই মিত্রের সর্ব্বদুঃখ দূর হইবে ?

সাধক প্রথমেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করেন। কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং কে তিনি, যিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া জীবকে অভয়দান করিয়া থাকেন ?

কবে—কোন্ পুণ্যদিনে রাজর্ষি সুরথ রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া দুঃখবিমোচনের জন্য বনে ঋষির আশ্রমে ঋষির চরণ-তলে বসিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং সেই প্রশ্নের ফলে আজ আমরা "বরাভয়াকরা, ভক্তমনোহরা" জগজ্জননী আদ্যাশক্তির অনুপম ইতিবৃত্ত পাইয়াছি।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর শেষে আছে যে, দেবীর এই জন্মবিবরণ যিনি অধ্যয়ন বা স্মরণ করেন, ভগবতী দুর্গা তাঁহার সকল আপদ্ দূর করিয়া থাকেন।

ভক্ত-রসনায় ভক্তাভীষ্টদায়িনী ত্রিভুবনত্রাণকারিণী জননী জীবের দুর্গতিহরণ করিবার জন্য 'দুর্গা'নাম দিয়াছেন। যে নাম স্মরণমাত্র জীবের ভবদুঃখ দূর হইয়া যায় !

আমাদের প্রাত্যহিকজীবনে আমরা এমনই করিয়া প্রভাত-সন্ধ্যা মায়ের শ্রীচরণতলে হৃদয়ের পূজা দিয়া মাতৃ-শক্তি লাভ করিবার জন্য মায়ের পূজা করিয়া থাকি। প্রভাতে যখন রজনীর নিদ্রালসদেহে শয্যাত্যাগ করিয়া সংসারের কর্ম্মসাগরে প্রবেশ করি, তখন আমরা 'দুর্গা' এই দ্ব্যক্ষরসংযুক্ত সর্ব্বভয়হারী নাম গ্রহণ করিয়া তবে শয্যাত্যাগ করি। কিরূপ ? না—

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমো সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

সূর্য্য উদয় হইলে প্রকৃতির সমস্ত অন্ধকাররাশি যেমন বিদূরিত হয়, তেমনি প্রভাতে যে নিত্য 'দুর্গা' এই দ্বি-অক্ষর-যুক্ত নাম স্মরণ করেন, তাহারও সমস্ত আপদ্ নষ্ট হয়।

এইক্ষণে আমাদিগকে দেখিতে হইবে, যাঁহার নামের বলে সর্ব্বদুরিতরাশি দূর হইয়া জীবের সমস্ত দুঃখ বিপদ্ দূর হয়, সেই দুর্গাদেবী কে ? যাঁহাকে উপাসনা করিলে আর কাহারও উপাসনার প্রয়োজন হয় না, যাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে সর্ব্ব আশ্রয় পাওয়া যায়, যিনি জীবের গতি ও মুক্তি-দায়িনী, সেই জননী ভগবতী গৌরী কে ?

বিজ্ঞান যাঁহাকে মহাপ্রকৃতি বলে, ইনিই সেই মহা-প্রকৃতি—সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপিণী মহাকালী। প্রথম যখন বিষ্ণুর নাভিকমলস্থিত সৃষ্টির প্রকাশ-কামেচ্ছুক ব্রহ্মাকে নষ্ট করি-বার জন্য বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ দৈত্যের উদ্ভব হয়, তখন প্রথমে ব্রহ্মা যোগনিদ্রামগ্ন বিষ্ণুর জাগরণের জন্য সঙ্কল্প করিলেন। বিষ্ণুর আবার জাগরণ কি ? যিনি চিরজাগ্রত, তাঁহাকে আবার জাগাইতে হইবে, ইহা কীদৃশী কথা ?

বিষ্ণু সর্ব্বদা যোগমায়ায় আচ্ছন্ন থাকেন। এই যোগ-মায়াই তাঁহার সৃষ্টিকারিণী মহাশক্তি। ব্রহ্মা তখন ঐ যোগ-মায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন ; তিনি বলিলেন, "তুমি স্বাহা, স্বধা, তুমি হ্রী, লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, তুমিই জগৎকারণ, তুমিই ঈশ্বরী" ইত্যাদি। ব্রহ্মার স্তবে তুষ্ট হইয়া যোগমায়া হরিকে পরিত্যাগ করেন এবং বিষ্ণু জাগ্রত হইয়া দৈত্যনাশ করেন।

আমরা দেবীর প্রথমজন্ম এই ভাবে পাইয়াছি। দ্বিতীয়-জন্মে তিনি দুষ্ট দৈত্য স্বর্গাপহারী মহিষাসুরকে নাশ করি-বার জন্য দেহধারণ করেন। তিনিই একমাত্র ত্রিলোকের আধারভূতা, সেই মহাপ্রকৃতি আবার কিরূপ দেহ ধারণ করেন ? না—তিনিই আপনার স্বরূপকে আপনি বহি-র্জগতের অর্থাৎ সৃষ্টির রক্ষার জন্য মাতৃরূপে আগমন করেন। পুনশ্চ শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যকে বধ করিবার জন্য দেবী তৃতীয়বার অবয়ব ধারণ করিয়া হিমালয়ে প্রাদুর্ভূতা হন।

দৈত্যকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট দেবতাদিগকে তিনি অভয় দিয়া বলিয়াছিলেন, "যখনই দুষ্ট দানবগণকর্ত্তৃক তোমরা উৎপীড়িত হইবে এবং অধর্ম্মে জগৎ পূর্ণ হইবে, আমি তখনই ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য জগতে আগমন করিব।"

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে ঠিক্ ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ভগবতী সীতা বৎস্য হনুমান্‌কেও রামহৃদি শোনাইবার সময় বলিয়াছিলেন, "বৎস! রাম অক্ষয়, অব্যয়, নির্ব্বিকার, সদাপুরুষ; আর আমিই সর্ব্বভূতাশ্রয়া মহাশক্তি। যুগে যুগে রামকে আশ্রয় করিয়া এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিয়া জগৎ স্বজন করি। আমি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি। আমাকে আশ্রয় করিয়াই রামের স্বত্বা; নতুবা আমি ব্যতীত রামের স্বত্বা নাই।

এই ত গেল ভগবতীর স্বরূপের কথা। তিনি দীন, আর্ত্ত, ভীত দেবগণকে বলিয়াছিলেন,—"আমিই দানবের বধের জন্য সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইব এবং দুর্গনামা অসুরকে বধ করিয়া জগতে দুর্গা নামধারণ করিব। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে ও স্কন্দপুরাণে দুর্গানামের এইরূপই পরিচয় পাই।

সম্মুখে শরৎ আসিতেছে, আজ বাঙ্গালার দীন-আর্ত্ত-হৃদয় মায়ের শুভ আগমনের প্রতীক্ষায় উৎফুল্ল হইয়াছে। ঐ যে দশভুজা জননীর অভয়ারূপ দেখিতেছ, যিনি দশ হস্তে দশ প্রহরণ ধারণ করিয়া সর্ব্বজীবকে রক্ষা করিতেছেন, যিনি সিংহবাহিনী এবং পদতলে দুষ্ট নিহত অসুর, যাঁহার হস্তে ক্রূর সর্প এবং যিনি লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্ত্তিক সমাশ্রয়ে জগতের দুঃখ নিবারণ করিবার জন্য এই অনুপম রূপধারণ করিয়াছেন, কি সাধ্য মানবের—কি সাধ্য এ অধমের, তাঁহার রূপের ব্যাখ্যা করি?

আমরা সেই মাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। যিনি জীবহৃদয়ে দয়া, ক্ষমা, মায়া, স্নেহ, লজ্জা, ধৃতি, স্মৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, বুদ্ধি ও সাধনাকারিণী, আমরা সেই ভগবতী জগজ্জননী মহামায়াকে প্রণাম করিতেছি, যিনি

"আধারভূতা জগতস্তমেকা, মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া তয়ৈতদাপ্যায়তে কৃৎস্ন মলঙ্ঘবীর্য্যে॥"

"মহীস্বরূপেণ" অর্থাৎ এই বসুন্ধরারূপিণী যিনি, তিনি জগদ্ব্যাপিনী—বিশ্বরূপিণী—অনন্তব্রহ্মস্বরূপিণী।

আর্য্যগণ প্রথমেই এই মূলপ্রকৃতির অর্চ্চনা আরম্ভ করেন এবং সৃষ্টির মূল যে এই মহাপ্রকৃতি, তাঁহারা ইহাই উপলব্ধি করিয়া মহাশক্তির পূজা প্রচলন করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদিও যাঁহার নিয়ত অর্চ্চনা করেন, সেই দেবী কাহাকর্ত্তৃক না অর্চ্চিত হইবে? তিনি পূর্ণ, সেই সত্যস্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু কাহার ধ্যান করেন এবং তিনি বা কাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? মহাপ্রকৃতিই সকলের জননী। তিনি স্বশক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই সেই সৃষ্টি রক্ষা করিতেছেন এবং আপনিই আবার আপনার সৃষ্টি লয় করিতেছেন।

"লক্ষ্মী লজ্জে মহাবিদ্যে শ্রদ্ধে পুষ্টি স্বধে ধ্রুবে।
মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

"কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনী।" শাস্ত্রে এই প্রকৃতিকে কলাকাষ্ঠাদিরূপে উক্ত হইয়াছে।

এখন কথা এই যে, এই জগজ্জননী ভগবতী দুর্গার পূজাপদ্ধতি নরলোকে কি করিয়া প্রচারিত হইল? আমরা যে তিনবার দেবীর জন্ম-কারণ পাইয়াছি, তাহা দেবলোকে বা নরলোকে এমন কে ভাগ্যবান্ জন্মিয়াছিলেন, যিনি আদ্যাশক্তির পূজা প্রচলন করিয়া নরলোকের ভুক্তি-মুক্তির পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন?

প্রথমেই রাজর্ষি সুরথ মুনির আদেশে মায়ের মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া তিন বৎসরকাল দেবীসূক্ত জপ করিয়া মায়ের পূজা করেন এবং অভীষ্ট নষ্টরাজ্য ও রাজ্যসম্পদ্‌রূপ বরলাভ করিয়া জগতে দেবীপূজা প্রচলন করেন।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রও ত্রেতাযুগে লঙ্কেশ্বর রাবণকে নিধন করিবার জন্য সমুদ্রতীরে মায়ের মৃণ্ময়ীপ্রতিমা গড়িয়া ১০৮টি নীলপদ্মে মায়ের পূজা করেন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য অকালে বোধন করিয়া শরৎকালে ভগবতীর পূজা করেন। নরলোকে রাজর্ষি সুরথের দৃষ্টান্তানুসরণ এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসবস্বরূপ বসন্ত ও শরৎকালে অর্থাৎ চৈত্র ও আশ্বিন মাসে মহাশক্তির পূজা করিয়া থাকেন। নরলোকে এইরূপেই দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংসারে আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই—বিদ্যা, ধন, বল ও সিদ্ধি, এই চারিটিই মানুষের কামনার বস্তু এবং এই চারিটি বস্তু লাভ করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বদা লালায়িত। এই চারিটি বস্তু লাভ করিতে হইলে মানুষকে বহু দুঃখ-কষ্টের ভিতর দিয়া যাইতে হয় এবং সকলই সাধনসাধ্য। কিন্তু এই প্রত্যেক বিষয়ের সাধন না করিয়া একেবারে মহাশক্তি মহাবিদ্যার আরাধনা করিয়াই ত মানুষ ঐ চারি বস্তু লাভ করিতে পারে।

ঐ চারি বস্তুই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অর্থাৎ বিদ্যা, লক্ষ্মী, বল ও সিদ্ধি। এখন বিচার্য্য এই যে, কোন্ বস্তুর সাধনা করিলে একেবারেই এই চারি বস্তুকে লাভ করা যায় অর্থাৎ কোন্ বস্তুর লাভ হইলে এই চারি বস্তুর লাভের কোন আবশ্যক থাকে না?

আমাদের মানবজীবন রহস্যময় এবং এই মহারহস্য-পরিপূর্ণ সৃষ্টিও তেমনই রহস্যজালে আবৃত। কিন্তু আমরা সৃষ্টির মূলপ্রকৃতিকে সাধনা করিলে এই রহস্য অনায়াসে উদ্ঘাটন করিয়া সৃষ্টি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি।

জীবনের শেষ লক্ষ্য—শান্তি। আমরা নেতি নেতি করিয়া বিশাল সৃষ্টিকে বিশ্লেষণ করিয়া সেই শান্তি অন্বেষণ করি এবং যিনি উৎকৃষ্ট সাধক, তিনি সেই অপরা শান্তি লাভ করিতে পারেন; যিনি নিকৃষ্ট সাধক, তিনি চারি বস্তুর কোন না কোনটা লাভ করিয়া পুনঃ পুনঃ ভোগবাসনা পরিতৃপ্তির জন্য জগতে আসা-যাওয়া করিয়া থাকেন।

মানুষ কি তবে এই জন্ম-মরণ দুঃখ-নিবৃত্তির কোন উপায় করিতে পারে না? পারে বৈ কি। যাঁহাকে লাভ করিতে পারিলে আর জীবের জন্ম হয় না এবং জীবের বাসনাও শেষ হয়, সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সাধনাই জীবের মুক্তিদায়ক এবং একমাত্র তাঁহাকে সাধনা করিয়া লাভ করিতে পারিলেই জীবের সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে।

আমরা ভক্ত, মুক্তি চাহি না। আমরা চাহি, ঐ মায়ের চরণে বসিয়া জবা-বিম্বে মায়ের শ্রীচরণ পূজা করিয়া, মা মা বলিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বনিত করিয়া মা বলিয়া ডাকিতে। ধন্য হিন্দু, তুমি ভাগ্যবান্; তুমি মূলপ্রকৃতির মূলাধারে স্থিত মহাশক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়া আজ তাঁহার পূজার জন্য লালায়িত হইয়াছ এবং যুক্তকরে বলিতেছ—

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্য্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া—

তুমিই বৈষ্ণবীশক্তি, অনন্তবীর্য্যধারিণী, বিশ্বের বীজ, জগন্মায়া, তুমি মূলপ্রকৃতি, তুমি দীনহীন অনাথ-জনের একমাত্র আশ্রয়—গতিদায়িনী।

তুমি আদ্যাশক্তি ভগবতী, তুমি কাশীধামে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিতা, তুমিই বিশ্বব্যাপিনী নারীশক্তি, তুমিই চরাচর জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী মহাশক্তি, তুমি জীবের দুঃখ-দৈন্য-নাশকারিণী জননী স্নেহময়ী মহামায়া মা।

মা গো! ঐ যে সাধনপথে কত বিঘ্ন, কত জ্বালা। তুমি কৃপা না করিলে এই বিঘ্নরাশি দূর করিয়া তোমায় ত পাওয়া যায় না মা! তুমি যাহাকে কৃপা কর, সেই তোমাকে লাভ করিতে পারে অর্থাৎ তুমি কৃপা না করিলে কেহ তোমার কৃপা লাভ করিতে পারে না।

জীবলোক নিয়ত দুঃখনাশের জন্য এই প্রকার আকুল-ক্রন্দনে মা মা বলিয়া ডাকিয়া তবে বিশ্বজননীর চরণে আশ্রয় লইয়া থাকে। আজ আমরাও দীনহীন, আর্ত্ত। দুঃখার্ত্ত দেবতাগণের ন্যায় এসো—যুক্তকরে হৃদয়ের সমস্ত দুঃখভাব একীভূত করিয়া এসো—মায়ের চরণতলে দাঁড়াইয়া বলি :—

মা! আমরা আর্ত্ত, দীন, ভীত, আমাদিগকে রক্ষা কর এবং এসো ভাই, মায়ের নামে আরতি করি; বলি :—

জয়ন্তী মঙ্গলাকালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বহা স্বধা নমোঽস্তুতে॥

মনুষ্য! তুমি নয়ন মেলিয়া নিরীক্ষণ কর, এই অনন্ত জগতের অনন্ত সৌন্দর্য্য সেই অনন্তরূপিণীরই অনুপম রূপের আভা ও প্রতিভামাত্র। কারণ,—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" পক্ষান্তরে তুমি নয়ন মুদিয়া ধ্যান কর, তোমার আত্মার অভ্যন্তরেও তাঁহারই অগাধ—অপার জ্ঞানের প্রভা। কালের কোনপ্রকার কল্পিত ব্যবচ্ছেদেও এমন কাল ছিল না, যে কালে কালভয়বারিণী তিনি কালময়ীরূপে মহাকালী না ছিলেন। আর এই চরাচর পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন নির্জ্জন স্থানও নাই, যে স্থানে মা আমার জগদাধাররূপা সর্ব্বময়ী মহাশক্তি, তিনি জগজ্জননী স্থিতিরূপে অবস্থিত নহেন। তিনিই চক্ষুতে জ্যোতিঃ, কর্ণে শ্রুতি এবং হৃদ্-যন্ত্রে অবিরাম গতি। তিনিই সর্ব্বভূতে চৈতন্যরূপিণী—বুদ্ধির বোধনী, স্মরণে স্মৃতি, সামর্থ্যে শক্তি, সন্তোষে তুষ্টি এবং সর্ব্বপ্রকার বৃদ্ধিতে পুষ্টি। এই নিখিল জগৎ সুখের জন্য লালায়িত, তিনিই সুখ ও শান্তি। জগতের সকলেই দয়ার ভিখারী, তিনিই সর্ব্বভূতে দয়ারূপে সর্ব্বদা অবস্থিতা। তিনি অবোধ শিশুর সহিতও শিশুবুদ্ধির উপযোগিনী অনুভূতিরূপিণীভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। শিশুর যখন খাদ্যের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি তাহার দেহে ক্ষুধারূপে অনুভূত হন; শিশুর যখন জলপানের প্রয়োজন, তখন তিনি তৃষ্ণারূপে অনুভূত হইয়া তাহাকে সঙ্কুচিত করিতে রহেন এবং সে যখন পরিশ্রমে ক্লান্ত, তখন তিনি তাহার সুকুমার দেহ-প্রাণে নিদ্রারূপে আবির্ভূতা হইয়া তাহাকে ক্রোড়ে টানিয়া লন।

পৃথিবীর নিরাশ্রয় মানব! তুমি কি মনুষ্যের স্নেহে বঞ্চিত হইয়া অথবা স্নেহ-বিশ্বাসরূপ পয়ঃপুষ্ট মনুষ্যসর্পের দংশনে অকস্মাৎ অন্তরের অন্তরতম স্থানে দুর্ব্বিষহ আঘাত পাইয়া আপনাকে আপনি অসহায়জ্ঞানে নয়নে অন্ধকার দেখিতেছ? যাহারা মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও মনুষ্যোচিত জ্ঞানের অভাবে মুহূর্ত্তস্থায়ী ধনমদে মত্ত অথবা বাহুবলে দৃপ্ত, তাহারা তোমায় প্রীতির সহিত সম্ভাষণ করে না বলিয়াই কি তুমি এ কাতরতা অনুভব করিতেছ? তুমি ক্ষণকালের তরেও হৃদয়ে এরূপ বিষাদ কিংবা অবসাদের ভাব পোষণ করিও না। কেন না, যিনি এই সীমাশূন্য শত কোটী সৌরসাম্রাজ্যসম্পন্ন বিশ্বরাজ্যের অধীশ্বরী, তিনি প্রকৃতই সুখে ও দুঃখে, স্বাস্থ্যে ও রোগে, সম্পদে ও বিপদে, শয়নে ও জাগরণে, তোমার প্রাণের প্রাণরূপে তোমাতে রহিয়াছেন এবং তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আবরিয়া রাখিয়া, তোমার তৃষিত প্রাণে ভালবাসার অমৃত সমুদ্র ঢালিয়া দিবার জন্য সত্যই সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তুমি যত চাহিবে, তত পাইবে এবং প্রাপ্তধন যত বিলাইবে—তোমার পূর্ণ ভাণ্ডার, পুরোবর্ত্তী অনন্তকাল ব্যাপিয়া তত বেশী পূর্ণ রহিবে। বস্তুতঃ তাঁহাতেই তুমি প্রাণিত ও অনুপ্রাণিত এবং বায়ুবিহারী বিহঙ্গ ও জলবিহারী মৎস্যের ন্যায় তাঁহাতেই তুমি—অন্তরে ও বাহিরে—ইহকাল ও পরকাল লইয়া ইয়ত্তারহিত চিরকালের তরে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ও পরিবেষ্টিত। তুমি যখন সদ্যোজাত শিশুজীবনে জননীর স্নেহের ক্রোড়ে ছিলে, তখনও সময়ে সময়ে সেই মায়ের সহিত তোমার বিচ্ছেদ ঘটিত; তুমি যখন জঠর-শয্যায় অবস্থিত, তখন অধিকতর নিকটস্থ হইলেও তাঁহার নয়নপথ হইতে দূরে রহিতে। কিন্তু জগজ্জননী মায়ের সহিত কোন সময়েও

তোমার বিচ্ছেদ নাই এবং তুমি নিমেষকালের জন্যও তাঁহার নিদ্রাশূন্য নয়নপথের বহির্ভূত নও। তুমি তাঁহাকে তোমার সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভক্তি কর, আর ভালবাস এবং মায়ের সন্তানজ্ঞানে—আত্মপরনির্ব্বিশেষে—মনুষ্যমাত্রেরই মঙ্গলসাধনে নিয়ত ব্রতী হও। ইহাতেই তোমার প্রাণে পরমা শান্তি, আর এই সুদুর্লভ মানবজন্মের চরম সুখ-সম্পদ্ ও পরমাতৃপ্তি।

তবে এস মনুষ্য, যেখানে যে থাক, এস তুমি ভক্তি-বৈভব আর্য্য-তাপসের উত্তরাধিকারী ভারতসন্তান, আর এস বিশেষতঃ তুমি বাঙ্গালী, বঙ্গের হৃদয়িক কবি রাম-প্রসাদের পদ-ভাব-মকরন্দ বিলাসী, মাতৃতত্ত্বপ্রয়াসী, এস—এস তুমি সাধকের জ্ঞান ও ভক্তির আস্পদ, এসো দুঃখী বাঙ্গালি, তুমি মৃণ্ময়ী মায়ের পূজা কর না—তুমি যে চিন্ময়ী জগজ্জননীর সন্তান, একবার প্রাণ ভরিয়া এসো—আজ মা মা বলিয়া ডাকিয়া প্রাণের কথা মাকে জানাই এবং অচিন্ত্যময়ী করুণাময়ী জননী যাহাতে আপনার শান্তিময়ী নামের সার্থকতা করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন করেন, তাহার জন্য প্রার্থনা করি এবং সকলে সমস্বরে বলি :—

প্রণতানাং প্রসীদ ত্বং দেবি বিশ্বার্ত্তিহারিণি।
ত্রৈলোক্যবাসিনামীড্যে লোকানাং বরদা ভব।

হে বিশ্বার্ত্তিহারিণি দেবি! প্রণত ব্যক্তিগণের প্রতি প্রসন্ন হও। হে ত্রৈলোক্যবাসীর পূজনীয়া! লোকসমূহের বরদা হও।

ভিক্ষা।
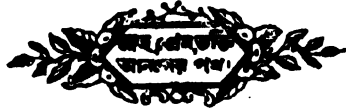
কি চাহিব ?
নাহি জানি—কি চাহিব তব কাছে।
চাহিতে কি জানি, তোমা রুষ্ট করি পাছে॥
না চাহিতে দিয়াছিলে, তোমার করুণা।
অবোধ অজ্ঞান আমি তাও ত বুঝি না॥
এ সুন্দর ধরামাঝে, মানব করিয়া।
পাঠায়ে দিয়েছ মোরে করুণা করিয়া॥
ভুলিয়া গিয়াছি তাহা অজ্ঞানের ফেরে।
সাধি নাই তব কোন কাজ মোহ-ঘোরে॥
তন্ন তন্ন করি খুঁজি সুখ দিবানিশি।
হারায়ে ফেলেছি তোমা তাই কাঁদি বসি॥
আজি আমি আত্মহারা ভ্রান্ত দিশাহারা।
চারিদিকে চাহি দেখি শ্মশানেতে ভরা॥
আপন বলিয়া যাঁ'রা আছিল হেথায়।
আঁধারে ফেলিয়া মোরে গিয়াছে কোথায়॥
একা আমি দিশাহারা ঘুরি' পথে পথে।
আজি আমি তব প্রেম পাইয়াছি চিতে॥
যখন আছিল সবে ছিনু গর্ব্বে ডুবি।
খুঁজি নাই কভু তোমা, ভাবিয়াছি (এই) সবি'॥
মোহ-গর্ব্বে ভুলিয়া গিয়াছি তোমা প্রভু!
জানিয়াছি তোমা বিনা শান্তি নাই কভু॥
খুঁজিতে খুঁজিতে স্বার্থ করিয়াছি শিক্ষা—
সর্ব্বহারা হ'য়ে আজি,
তব নামে দীক্ষা—
দাও মোরে করুণা করিয়া;
হে প্রভু করুণাময়, তারার ইহাই ভিক্ষা॥

জয়পুরের মহারাজ স্যর্ সয়াই মাধোসিংহ বাহাদুর।

[শ্রীতারা।]

ভগবান্ রামচন্দ্র রাজকুমার কুশকে নবরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য আদেশপ্রদান করেন। কুশের প্রতিষ্ঠিত নগর কুশ-স্থলী। তাঁহার বংশধরগণ বর্ত্তমান রাজপুতানার বহু স্থানে কালক্রমে ছড়াইয়া পড়েন। রাজপুতানার কচ্ছবাহ-রাজপুতগণ মহারাজ কুশের বংশ বলিয়াই খ্যাত। বর্ত্তমান সময়ে রাজপুতানার জয়পুরের অধীশ্বর মেজর জেনেরেল মহামান্য সরমদ ই-রাজা ই-হিন্দুস্থান রাজরাজেন্দ্র শ্রীমহারাজাধিরাজ স্যর্ সয়াই মাধোসিংহ বাহাদুর, কে জি. সি. এস্. আই., জি. সি. আই. ই., জি. সি. ভি. ও., এল্. এল্. ডি. (এডিনবরা) সেই বংশেরই বংশধর। ইনি এবং অন্যান্য অনেক রাজপুতও ভগবান্ রামচন্দ্রের বংশধর।

ভগবান্ রামচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার পুত্রদ্বয় নানাস্থানে রাজ্যপ্রতিষ্ঠিত করিলেও বরাবর অযোধ্যাতেই রাজত্ব করিতেন। সূর্য্যবংশীয় রাজা বলিয়া উঁহারা খ্যাত।

মহারাজাধিরাজ স্যর্ সয়াই মাধোরাওয়ের পূর্ব্ব পুরুষগণ পরে অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া সাড়ে আট শত বৎসরকাল নারওয়ার ও গোয়ালিয়রে রাজত্ব করেন। ইহার পরে অম্বরেও তাঁহারা রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে অম্বরের মিনারে এই কচ্ছবাহ-রাজগণ একটি দুর্গ স্থাপিত ও রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

জয়পুর-রাজষ্টেটের পূর্ব্বনাম ধুন্ধররাজ্য। ১৭২৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত অম্বরেই ধুন্ধরদিগের রাজধানী ছিল। ঐ অব্দেই মহারাজ জয়সিংহ বর্ত্তমান জয়পুর নগর স্থাপন করেন। মহারাজ জয়সিংহের নামানুসারেই নগরের নাম "জয়পুর" রাখা হয়। তদবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জয়পুর নামেই ধুন্ধর রাজধানী পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজপুতজাতির ইতিহাসের প্রারম্ভ হইতেই দেখা যায়, জয়পুররাজগণ রাজ্যশাসনে ও সমরদক্ষতায় বিখ্যাত। তাঁহারা যে কেবল রাজ্যশাসনেই সুদক্ষ ছিলেন, তাহা নহে; সূর্য্যবংশীয় রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা ঔদার্য্য, সৎসাহস, মিতব্যয়িতা ও পুত্রবৎ প্রজাপালনে চিরদিন বিখ্যাত ছিলেন। মহারাজ সয়াই জয়সিংহ এক জন বিখ্যাত রণনীতিবিশারদ, পণ্ডিত, বিক্রমশালী যোদ্ধা ও জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। মহারাজ জয়সিংহই কাশীধামে একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও জয়পুরে মহারাজ জয়সিংহপ্রতিষ্ঠিত মানমন্দির এবং গ্রহগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার যন্ত্রাদি বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করা হইতেছে। প্রাচীন ভারতের যে স্থানে বিদ্যানুশীলনের জন্য বিখ্যাত ছিল, মহারাজ সেই স্থানেই মানমন্দির স্থাপিত করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান ভারতের নরপতিগণের মধ্যে জয়পুরের রাজগণ অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন। উঁহারা হিন্দুজাতির গৌরব স্থল। বর্ত্তমান মহারাজ ইসরদার ঠাকুরের সন্তান। এই ঠাকুরবংশ কচ্ছবাহ-রাজপুতবংশের একটি শাখা। মহারাজ রামসিংহ মৃত্যুশয্যায় বর্ত্তমান মহারাজকেই জয়পুরের ভাবী রাজা মনোনীত করেন। মহারাজ রামসিংহের মৃত্যুর পর স্যর্ সয়াই মাধোসিংহ বাহাদুর জয়পুরের সিংহাসনে উপবেশন করেন।

জয়পুররাজ্য।

রাজপুতানার ইতিহাস খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, ভারতের এই প্রাচীন স্থানটুকু বীরত্বে, ধর্মে ও পাণ্ডিত্যে চিরগৌরবান্বিত থাকিয়া আজিও ভারতবর্ষকে গৌরবান্বিত করিতেছে। জয়পুররাজ্যের পরিমাণ ১৫৫৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ। চারিদিকে পর্ব্বতবেষ্টিত জয়পুররাজ্য নৈসর্গিক শোভায় দেখিতে মনোরম। রাজধানী ও রাজপ্রাসাদাদি সমতলভূমির উপরে স্থাপিত। দেশের সর্ব্বত্র ছোট ছোট পাহাড়ও বর্ত্তমান। তথায় বৎসরে ২৫ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি পতিত হয় না। সমগ্র রাজ্যেই কৃষি-কার্য্যের সুবিধার জন্য কৃত্রিম খাল কাটাইয়া তবে দেশের জলসংস্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান মহারাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যমধ্যে তিনি অপ্রতিহতভাবে আপনার শাসন-ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারেন। এমন কি, তাঁহার দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাদিরও বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। প্রজাগণের অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডব্যবস্থাও মহারাজ নিজেই করিতে পারেন।

জয়পুররাজ্যের শাসনব্যাপার লইয়া একটি মন্ত্রিসভা আছে। উহার সদস্যসংখ্যা দশ জন। ঐ মন্ত্রিগণ শাসনাদি-কার্য্যে মহারাজকে সুপরামর্শ দিয়া থাকেন। এই ছত্রিশ বৎসরকাল বর্ত্তমান মহারাজ রাজ্যপালন করিতেছেন। মহা-রাজের বয়স যখন উনিশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। এখন মহারাজের বয়স পঞ্চান্ন। তিনি এক জন সুদক্ষ শাসনকর্ত্তা ও প্রজারঞ্জক রাজা। ইঁহার রাজ্যশাসনব্যবস্থায় সমগ্র জয়পুররাজ্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। মহারাজের রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও কার্য্য-দক্ষতা দেখিয়া আমাদের মাননীয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতের দেশীয় নরপতিগণের শাসনাধীন রাজ্যের মধ্যে জয়পুর সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত। একমাত্র মহারাজের দক্ষতাগুণেই জয়পুররাজ্যের এত উন্নতি। মহারাজের সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট জয়পুররাজকে যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

জয়পুর-সৈন্য।

ভারতের দেশীয় নৃপতিগণের রাজ্যমধ্যে জয়পুর একটি প্রথম শ্রেণীর রাজ্য। জয়পুররাজ্যে আটটি দলে বিভক্ত ৫০০০ পদাতিক, ৫০০০ নাগা পদাতিক, ৭০০ অশ্বারোহী, ৮৬০ জন গোলন্দাজ, ১০০ উষ্ট্রারোহী সৈনিক ও ১১০টি কামান রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত জয়পুরের মহারাজের অধীন জায়গীরদারগণ ৫৭৮২ জন অশ্বারোহী সৈন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রাখেন। যখন জয়পুর দরবার তাহাদিগকে আহ্বান করিবেন, তখনই তাহারা দরবারে হাজির হইতে বাধ্য।

বর্ত্তমান মহারাজ ব্রিটিশরাজের বড় ভক্ত; যাহাতে ব্রিটিশসাম্রাজ্যের মঙ্গল হয়, সর্ব্বদা তাহাই কামনা করেন। বিগত বুয়রযুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য মহারাজ সৈন্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং যুদ্ধভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকা দান করেন।

মহামান্য ভারত সরকারের শাসনকার্য্যে সহায়তার জন্য জয়পুরের মহারাজ এক দল সৈন্য প্রস্তুত করেন। ঐ সৈন্যদলে ১২০০ ঘোড়া, ৫৫৮টি লৌহ-গাড়ী, ১৬টি অ্যাম্বুলেন্স্ টোঙ্গা এবং ৭৭৫ জন কর্ম্মচারী আছে। গত চিত্রলযুদ্ধে ও টিরা-অভিযানে মহারাজের এই সৈন্যদল বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া জয়পুরের গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমান সময়েও মহারাজের এক দল সৈন্য বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমরে সম্রাটের পতাকা নিয়ে দাঁড়াইয়া শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিতেছে।

জয়পুরের দুর্ভিক্ষ ও মহারাজের বদান্যতা।

গত ১৮৯৯।১৯০০ অব্দে জয়পুরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মহারাজ প্রজাগণের দুঃখ দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়েন। মহারাজের হৃদয় যেমন উদার, তেমনই তিনি দানবীর ও ধার্ম্মিক। তিনি ষোল লক্ষ টাকা দিয়া তৎক্ষণাৎ একটি দুর্ভিক্ষফণ্ড খুলেন। শুধু তাহাই নহে, মহারাজের বদান্যতা দেখিলে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়। তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-ফণ্ডে পঁচিশ লক্ষ, বিলাতের ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউটে তিন লক্ষ, সম্রাট্ এডোয়ার্ড-হাস্পাতালফণ্ডে পঁচাত্তর হাজার, আজমীঢ় মেও কলেজে ত্রিশ হাজার, সম্রাট্ এডোয়ার্ডের স্মৃতিচিহ্নফণ্ডের ভারতবর্ষীয় শাখায় পাঁচ হাজার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ দুর্ভিক্ষফণ্ডে আরও চারি লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯০৫ অব্দে আমাদের মহামান্য বর্ত্তমান ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন; সেই সময় সম্রাট্ বাহাদুর জয়পুররাজ্য দর্শন করিতে যান। সেই উপলক্ষে মহারাজ পুনরায় দুর্ভিক্ষফণ্ডে তিন লক্ষ টাকা দান করেন। এইরূপে কত দিক্ দিয়া কত ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যাপারে মহারাজ যে কত টাকা দান করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ইহা ব্যতীত জয়পুরের মহারাণীও (পাটরাণী) স্বামী অপেক্ষাও অধিক দানশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনিও দুর্ভিক্ষফণ্ডে দুই লক্ষ, লণ্ডনে মহারাণী আলেক্জান্দ্রাফণ্ডে এক লক্ষ, মেও কলেজে বিশ হাজার, লেডী মিণ্টো সেবাসমিতিতে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

১৯১২ সালে ভারতেশ্বরী—ইংলণ্ডের মহামহিমান্বিতা মহারাণী মেরী মহামহিমময় সম্রাট্ বাহাদুরের সঙ্গে ভারত-বর্ষে আগমন করেন। সেই শুভ ব্যাপারের স্মরণচিহ্নস্বরূপ

মহারাজ বাহাদুর আপনার প্রজাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা রাজস্ব ছাড়িয়া দেন! মহামান্য রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুর লর্ড হার্ডিঞ্জের জন্মোৎসব উপলক্ষে মহারাজ পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেন। দিল্লীতে নারী-মেডিক্যাল-বিদ্যালয়ে ও সেবা-স্কুলে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

য়ুরোপের বর্ত্তমান যুদ্ধে দুরন্ত জার্ম্মাণীর সহিত আমাদের মহামান্য সম্রাট্ ন্যায় ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে লিপ্ত আছেন। এই যুদ্ধেও জয়পুরের মহারাজ মুক্তহস্ত হইয়া দান করিয়াছেন। বিলাতে যুবরাজের যুদ্ধফণ্ডে এক লক্ষ, রাজকীয় যুদ্ধফণ্ডে এক লক্ষ, বিলাতে মহারাণী মেরীর নিড্‌ল্ ওয়ার্ক গিল্ডে পনের শত, যুদ্ধে লিপ্ত সৈন্যগণের পারিবারিক ফণ্ডে এক হাজার, সেণ্টজন অ্যাম্বুলেন্স্ যুদ্ধ-ফণ্ডে এক হাজার, উক্ত সম্প্রদায়ের নারী-বিভাগে এক হাজার টাকা দিয়াছেন; ১৯১৫ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় জয়পুর-মহারাজ নববর্ষোৎসবে যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিক ও নাবিকগণের পারিবারিক ফণ্ডে পনের হাজার টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের খরচস্বরূপও পাঁচ লক্ষ টাকা হস্তে দিয়াছেন।

সেণ্টজন অ্যাম্বুলেন্স্ রেডক্রশ সোসাইটীতেও পাঁচ হাজার টাকা দান করিয়া মহারাজ নিজের বদান্যতা দেখাইয়াছেন। এই রেডক্রশ সোসাইটী ডেরাডুনে স্থাপিত। কেবল যে যুদ্ধফণ্ডে টাকা দিয়াই তিনি নিরস্ত হইয়াছেন, তাহা নহে; হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা ও নূতন দিল্লীর সংস্কার-কার্য্যে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ভারতের অপরাপর রাজন্যবর্গের সহিত একযোগে অর্থসংগ্রহ করিয়া "লয়েলটী" নামক একখানি হাসপাতাল-জাহাজও প্রদান করিয়া মহারাজ আপনার রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

স্বরাজ্যে সৌজন্য।

জয়পুররাজ্যের উন্নতিবিধানের জন্যও মহারাজ বাহাদুর কোটি কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। সমগ্র রাজ্যে রেলওয়েবিস্তার, বড় বড় রাস্তা-নির্ম্মাণ, খালখনন, সাধারণ কার্য্যের জন্য বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-নির্ম্মাণ, গ্যাসের ও জলের কলস্থাপন, বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা মহারাজ রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য মহারাজের যত্ন ও চেষ্টাই বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। তিনি সমস্ত রাজ্যেই অবৈতনিক শিক্ষাপ্রচার করিয়াছেন। সমগ্র রাজ্যে বত্রিশ হাজার ছাত্র বিনাব্যয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে। রাজ্যমধ্যে ১১৩৫টি বিদ্যালয় রহিয়াছে। শিক্ষার জন্য তিনি বৎসরে রাজকোষ হইতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন। জয়পুরের প্রধান প্রধান কয়েকটি বিদ্যালয়ের মধ্যে মহারাজের কলেজ, সংস্কৃত কলেজ, জয়পুর নারী-বিদ্যালয় এবং শিল্প-বিদ্যালয়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মহারাজের ধর্ম্ম।

মহারাজ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। দেব-দ্বিজে ভক্তি, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতে সম্মান জয়পুররাজগণের বংশপরম্পরাগত ধর্ম্ম। কাশীধামে জয়পুরের ধর্ম্মশালা বিখ্যাত। কাশীযাত্রিগণ ঐ ধর্ম্মশালায় মহারাজের খরচায় তিন দিন থাকিতে পারেন। মুসলমান-বিপ্লবের সময় দিল্লীর মোগল-বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের অত্যাচারে মথুরানগরী ধ্বস্ত হইলে, মথুরা হইতে গোবিন্দজী ঠাকুর জয়পুরে নীত হন। সেই অবধি অদ্য পর্য্যন্ত জয়পুরের মহারাজগণ অতি সমাদরে গোবিন্দজীর সেবা করিতেছেন।

১৯০২ সালে স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের সিংহাসন-আরোহণ উপলক্ষে মহারাজ বাহাদুর বিলাতে নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু সাধারণভাবে বিলাতে গেলে জাতি যায় অথচ সম্রাটের আহ্বানে বিলাতে না গেলেও নয়, তাই মহারাজ বাহাদুর আপনার জাহাজে বিলাতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তদনুযায়ী বিলাতে দরবারের সময়ে মহারাজ ১২৫ জন রাজকীয় কর্ম্মচারিসহ বিলাতে যাত্রা করেন। তিনি ভারতবর্ষ হইতে পানীয় জল ও খাদ্য-দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় ভক্তি দেখিলে প্রকৃতই বিস্মিত হইতে হয়। তিনি ভারতে সকল জাতিকেই সমান স্নেহচক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ ভারতসম্রাট্ কর্ত্তৃক কে. জি. সি. এস্. আই. উপাধি ও ১৯০১ অব্দে জি. সি. আই. ই. এবং ১৯১৩ অব্দে জি. সি. ভি. ও. উপাধিলাভ করেন। ১৯১৪ অব্দে ১৩০০ রাজপুতসৈন্যদলের অনারেরী কর্ণেল নিযুক্ত হন। ১৯০৮ অব্দে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় মহারাজকে এল্. এল্. ডি. এই অনারেরী ডিগ্রী এবং ১৯১১ অব্দে দরবারের সময় মেজর জেনারেল পদবীলাভ করেন। ১৯১২ অব্দে মহারাজ বাহাদুর সেণ্টজন হাসপাতাল জেরুজেলামের ডোনাট হন।

ভারত-সম্রাট্ বর্ত্তমান মহারাজের সম্মানার্থ ২১টি তোপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতের রাজন্যবর্গ ইহা হইতে অধিক সম্মান পান না। যে ইক্ষ্বাকুবংশের রাজগণ ভারতের ইতিহাসে চিরদিন বিখ্যাত, যে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রভাব কীর্ত্তিমালায় বিভূষিত, যে ভগবান্ রামচন্দ্রের নামে আজিও হিন্দুহৃদয় উল্লাসিত হইয়া উঠে, সেই অতি পবিত্রতম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া জয়পুরের মহারাজ স্যর্ মাধোসিংহ বাহাদুর যে এখনও ভারতকে অলঙ্কৃত করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার মঙ্গল কামনাই করি এবং তিনি যে সদ্‌গুণে ও বদান্যতায় আপনার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া যাইতেছেন, সেই কীর্ত্তিই তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিবে।

জয়পুররাজ্যের সীমা :—উত্তরে বিকানীর, লোহারু, ঝাজর এবং পাতিয়ালা ; দক্ষিণে গোয়ালিয়র, বুন্দি, টঙ্ক এবং উদয়পুর ; পূর্ব্বদিকে আলোয়ার, ভরতপুর এবং কেরোলী ; পশ্চিমে কিষণগড়, যোধপুর এবং বিকানীর।

জয়পুররাজ্যের প্রধান নগর জয়পুর। উহার লোক-সংখ্যা ১৩৭০৯৮। বর্ত্তমান সময়ে লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল এস্. এফ্. বেইলি জয়পুরের রেসিডেণ্ট বা পলিটিক্যাল অফিসার। মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত অবিনাশ-চন্দ্র সেন।

মহারাজের বাঙ্গালীর প্রতিও যথেষ্ট অনুগ্রহ। স্বর্গীয় কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় সংসারচন্দ্র সেন বহুদিন জয়পুর-রাজসংসারে উচ্চরাজপদে সমাসীন থাকিয়া বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন।

জয়পুরে যে শিল্প-বিদ্যালয় আছে, সেই বিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত বাবু মতিলাল সেন প্রধান অধ্যক্ষ। বহুতর বাঙ্গালী এখনও কর্ম্মব্যপদেশে জয়পুরে বসবাস করিতেছেন। মন্দিরাদিতেও গৌড়ীয় গোস্বামিগণ পুরোহিতের কার্য্য করিতেছেন।

ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য জয়পুর চিরদিনই বিখ্যাত। হস্তিদন্তনির্ম্মিত বিচিত্র কারুকার্য্যময় শিল্পসম্ভার ও শ্বেত-প্রস্তরবিনির্ম্মিত নানাপ্রকার বাসনাদির জন্য জয়পুর বিশেষ বিখ্যাত। জয়পুররাজ্যের নানা স্থানে যে সকল শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত বাসন ও খেলানাদি নির্ম্মিত হয়, উহাই কাশী প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে অতি উচ্চদরে বিক্রীত হইয়া থাকে। শিল্প-কৌশলের জন্য জয়পুর সমস্ত ভারতবর্ষকেই যে পরাজিত করিয়াছে, তাহা জয়পুরের বর্ত্তমান শিল্প দেখিলেই প্রতীত হইবে। বৈষ্ণব-সাধু শ্রীরূপ-সনাতন শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের যে মন্দির স্থাপন করেন, ঐ মন্দির জয়পুরী শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। সেরূপ স্থাপত্য-শিল্পের অপূর্ব্বনিদর্শন আর কুত্রাপিও দেখা যায় না। এমন কি, অনেক য়ুরোপীয়ের বিশ্বাস, ঐ মন্দির য়ুরোপের জেসুইট-সম্প্রদায়ের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল! ঐ মন্দির অম্বরপতি মানসিংহ ৩৪ আকবরাব্দে নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুদ্বেষী মোগল ঔরঙ্গজেব ঐ মন্দির ভঙ্গ করিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। মন্দিরের পুরোহিত গোবিন্দজীকে লইয়া অম্বরে পলায়ন করেন, সেই অবধি গোবিন্দদেব জয়পুরে রহিয়াছেন। ঔরঙ্গজেব এতটা হিন্দু-দ্বেষী ছিলেন যে, দেব-মন্দিরের উপর মসজিদ নির্ম্মিত হইলে সেই মসজিদে গিয়া নমাজ করিয়া আসেন। সনাতন গোস্বামীর কৃপালাভ করিয়া মুলতানবাসী কৃষ্ণদাস বা ভক্ত রামদাস বৃন্দাবনে মদনমোহনদেবের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরও ঔরঙ্গজেব নষ্ট করিয়াছিলেন। মদনমোহনের মন্দির হইতেও ঔরঙ্গজেবের দৌরাত্ম্যে শ্রীমূর্ত্তি জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, পরিশেষে জয়পুর মহারাজ আপনার শ্যালক কেরোলীরাজ গোপালসিংহকে সেই মূর্ত্তি প্রদান করেন। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা গোপালসিংহ মদনমোহনের জন্য কেরোলীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

কচ্ছবাহ-ঠাকুরগণ চিরদিনই ভক্ত। ভারতের প্রায় প্রসিদ্ধ সকল তীর্থেই—কোথাও না কোথাও—ইঁহারা মন্দিরস্থাপন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান মাননীয় মহারাজ মাধোসিংহ বাহাদুরও সেই কচ্ছবাহ-ঠাকুরবংশীয় রাজপুত। বর্ত্তমান সময়েও বৃন্দাবনে জয়পুর মহারাজের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর যেরূপ উদারতার সহিত রাজ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন এবং সুনিয়মে শাসনপ্রতিষ্ঠাদ্বারা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন, তাহাতে মাননীয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট মহারাজের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

পৃথিবীর ভার অপনোদনের জন্য ভগবান্ রামচন্দ্র জগতে অবতীর্ণ হন, তাঁহারই বংশধররূপে সেই পবিত্র রক্ত আজিও মহারাজাধিরাজ অম্বরাধিপতি জয়সিংহ জয়পুররাজ স্যর্ মাধোসিংহ বাহাদুরের ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে।

য়ুরোপে যে কালসমরের সূচনা হইয়াছে, ভারতেশ্বর পঞ্চম জর্জ্জ যে ধীরতা ও বিজ্ঞতার সহিত দুর্দ্দান্ত হূনজাতির বিরুদ্ধে ধর্ম্ম ও শান্তিস্থাপনের জন্য দাঁড়াইয়াছেন, আজ হিন্দুপ্রজামাত্রেরই সম্রাটের পতাকানিম্নে দাঁড়াইয়া স্ব স্ব ক্ষমতানুযায়ী সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জের ধর্ম্মসংস্থাপনের সাহায্য করা উচিত এবং জয়পুরাধিপতি ভারতীয় হিন্দুপ্রজাগণের মুখপাত্রস্বরূপ, তিনিই এই অধর্ম্মকর যুদ্ধে সাহায্যাদিদ্বারা হিন্দুজাতিরই মানরক্ষা করিয়াছেন।

জয়পুররাজ্য ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে সমৃদ্ধিশালী ও গৌরবান্বিত। রাজ্যের মিউনিসিপালব্যবস্থা অতি সন্তোষজনক। মহারাজ বাহাদুর নিজে যেমন ধার্ম্মিক, সমগ্র প্রজাকুলও সেইরূপ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। সৌজন্যে, সহৃদয়তায়, বিজ্ঞতায় ও সর্ব্বোপরি দানশীলতায় মহারাজ মাধোসিংহ বাহাদুর সমগ্র ভারতের বরেণ্য।
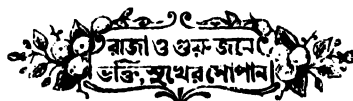
রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া।

বংশ-পরিচয়।

আজিমগঞ্জের দুধোরিয়া রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন। ঐতিহাসিক ঊষার আলোক যখন প্রাচীন ভারতে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই সেই আলোকে এই রাজবংশ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তদবধি এ কাল পর্য্যন্ত এই রাজবংশ অবদান-গরিমায় গৌরবমণ্ডিত। সে গৌরবভাতি প্রচণ্ড সূর্য্যকরপ্রতপ্ত মরুস্থলীর ন্যায় প্রখর নহে, কৌমুদী-প্লাবিত নিদাঘরজনীর ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল। দুধোরিয়াগণ ক্ষত্রিয়বংশীয় চৌহানবংশসম্ভূত। রাজপুতানার ভাটচারণগণ এই রাজবংশের যে কীর্ত্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, কালের কালিমায় সেই কীর্ত্তি-ভাতি মলিন হইবার নহে। এই চারণগণের লিখিত বিবরণপাঠে জানা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে আজমীঢে রাজা চবন নামে জনৈক নরপতি রাজ্যশাসন করিতেন। এই মহারাজই দুধোরিয়া বংশের আদিপুরুষ। ইঁহার পর রাজা লাওশুক পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া রাজ্যপালন করেন। তৎপরে রাজা বিরামদেব গড় চন্দোরীর নরপাল হইয়াছিলেন। আজমীঢ় পরিত্যাগ করিয়া ইনি কি কারণে গড় চন্দোরীর শাসনকর্ত্তা হইয়াছিলেন, সে তথ্য বিস্মৃতির অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়াছে; প্রত্নবিদ্যাচর্চ্চার প্রদীপ যদি কখনও সেই তমোময় কন্দরকে সমুজ্জ্বল করিতে পারে, তাহা হইলে সেই তথ্য প্রকাশ পাইবে। বিরামদেবের পুত্র রাজা ভূপাল এবং ভূপালদেবের পুত্র রাজা বীরপাল যথাক্রমে চন্দোরীর প্রজাবর্গকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বীরপালের পর রাজা মাণিকরাও উক্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই মাণিকরাওয়ের দুই পুত্র। প্রথম পুত্রের নাম—রাজা বিশাল, দ্বিতীয় পুত্রের নাম—রাজা অনিরাও। রাজা বিশালই গড় চন্দোরীর সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার ভ্রাতা রাজা অনিরাও আজমীঢের ভিটালী পরগণার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অনিরাওয়ের পুত্র রাজা সোমেশ্বর, সোমেশ্বরের পুত্র রাজা পৃথ্বীরাজ। প্রকাশ, এই পৃথ্বীরাজের দেহে শত মাতঙ্গের বল ছিল। ইঁহার প্রপৌত্র রাজা দুধোররাও পৈতৃক শৈবধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ২২২ সংবতে অর্থাৎ ১৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা দুধোর বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই রাজা দুধোরের নাম অনুসারে দুধোরিয়া (অর্থাৎ দুধোরীয়) বংশের নামকরণ হইয়াছে। এই সময় যোধপুরের উপকেশ বা ওসিয়া নগরের সমস্ত লোকই—রাজা প্রজা সকলেই—জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই ওসিয়া নগরের নাম হইতে জৈনদিগের ওসোয়াল-সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে।

তদানীন্তন ভারত।

১৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা দুধোররাও জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হিন্দুধর্ম্মের গোপ্তা অন্ধ্রুরাজগণের প্রভাব ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয় এবং বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিতে থাকে। এই সময় ভারতে শক-নৃপতিদিগের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। খৃষ্টীয় ১৬৩ অব্দে অন্ধ্রুবংশীয় দ্বিতীয় পুলুমেয়ীর মৃত্যু হয়। কিন্তু ১৭৩ অব্দে তাঁহার পুত্র যজ্ঞশ্রী সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দশ বৎসর কাল অন্ধ্রুরাজ্যে বিশেষ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, ইহা সহজেই বুঝা যায়। শকগণ বিদেশী ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুদিগের বর্ণাশ্রম-বিভাগ বা শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিতেন না। বৌদ্ধ ও জৈনগণও বর্ণাশ্রম বা বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিতেন না। কাজেই শক নৃপতিরা বৌদ্ধ ও জৈন

ধর্ম্মের বিশেষ আনুকূল্য করিতেন। অনেক শক-নৃপতি জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। অনেকে বৌদ্ধ ও জৈন-প্রচারক নিযুক্ত করিয়া জনসমাজে ঐ দুই ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছিলেন। এই সময় অনেক স্থানের হিন্দুরা দলে দলে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকেন। এই সময়েই ভিটালীর দুধোররাও এবং ওসিয়ার রাজা প্রজা সকলেই জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

দুধোরিয়া-বংশের অবস্থান্তরপ্রাপ্তি।

রাজা দুধোররাও জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এই বংশীয় ব্যক্তিগণের যশোভাতি যেন কতকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহার বংশধর কোন ব্যক্তিই আর রাজ্যশাসন করেন নাই। ইহার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ—জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা হিন্দুপ্রজাবর্গের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ—রাজ্যশাসন করিতে হইলে সময় সময় জীবহত্যাকর সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হইত। জীবহত্যা জৈনধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া তাঁহারা স্বেচ্ছায় রাজ্যশাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যে কারণেই হউক, রাজা দুধোররাওয়ের পর হইতে রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়ার মধ্যবর্ত্তীপুরুষগণের মধ্যে আর কোন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাজা দুধোররাওয়ের পুত্র মোহনপাল গড় চন্দোরীতে গিয়া বাস করেন। সম্ভবতঃ রাজা বিশালের বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন বলিয়া তিনি তথায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দুধোরিয়াগণ জৈনধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাদিগের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। অগত্যা মোহনপালের পুত্র বাণীকোটে গিয়া বাস করেন। ইহার পর এই পরিবার ক্রমে গড় রাটলামে ও কয়েকপুরুষ পরে মেড়তায় যাইয়া বসবাস করিয়াছিলেন; তথা হইতে তাঁহারা বিকানীরের অন্তঃপাতী রাজলদেশর নামক স্থানে বহুপুরুষ ধরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে ও সমৃদ্ধিতে বাস করিয়াছিলেন। বাণিজ্যই তখন এই বংশের বংশধরদিগের বৃত্তি ছিল। রাজলদেশর এই বংশের বহুলোক বাণিজ্যদ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন, ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় দুধোরিয়া-বংশ।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে দুধোরিয়া-বংশের হরজিমল দুধোরিয়া-প্রমুখ কয়েকজন মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জ সহরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। হরজিমলের দুই পুত্র,—সবাই সিংহ ও মৌজিরাম। আজিমগঞ্জে ইঁহারা দুই ভ্রাতাই ব্যবসায়কার্য্যে লিপ্ত হন এবং অসাধারণ সহিষ্ণুতা, কর্ম্মশীলতা ও কার্য্যনিষ্ঠার প্রভাবে অল্পকালের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। এই বংশের হরেকচাঁদ দুধোরিয়াই ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং কলিকাতায়, সিরাজগঞ্জে, আজিমগঞ্জে, ময়মনসিংহে ও জঙ্গীপুরে ঋণদানের ব্যবসায় খুলিয়াছিলেন। হরেকচাঁদের দুই পুত্র,—বুধসিংহ ও বিষণচাঁদ। ইঁহাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। ইঁহারা ক্রমশঃ জমিদারী ক্রয় করিতে লাগিলেন। ইঁহারা কেবল অর্থসঞ্চয়ের দিকে মনোযোগী ছিলেন না, সদ্ব্যয়ের দিকেও ইঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। জৈনসমাজের অনেক অভাবপীড়িত ব্যক্তিই ইঁহাদের নিকট অর্থসাহায্য পাইতেন। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে বিরাট অন্নসত্র খুলিয়া ইঁহারা ক্ষুধিত ও দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে অন্ন বিলাইতেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় ইঁহারাও ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা, দেবায়তন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া কীর্ত্তি-অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। সেই জন্য সরকার বাহাদুর শ্রীযুত বুধসিংহ ও বিষণচাঁদ—উভয় ভ্রাতাকেই 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করিয়াছিলেন। রায় বুধসিংহ বাহাদুর ও রায় বিষণচাঁদ বাহাদুর উভয়েই মুর্শিদাবাদের লালবাগ বেঞ্চে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিষণচাঁদের প্রথমা পত্নীর গর্ভে অষ্টাদশ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন, তন্মধ্যে পুত্র বিজয়সিংহ জীবিত আছেন। স্বর্গীয় রায় বিষণচাঁদ বাহাদুরের পুত্রকন্যাগণ অতি অল্প বয়সেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি দীর্ঘজীবী পুত্রলাভের জন্য পুত্রেষ্টি-যাগ করিয়াছিলেন। মেহারের সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরবংশীয় পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই পুত্রেষ্টি-যাগ সম্পাদন করেন। এই পুত্রেষ্টি যাগের এক বৎসর পরে রাজা বিজয়সিংহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

বাল্যজীবন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে রাজা বিজয়সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত মধুসূদন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন,—বিজয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, এই বালক দীর্ঘজীবী, সম্পত্তিশালী ও যশস্বী হইবে। বিজয়সিংহের পর তাঁহার একটি ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন। ঐ ভগিনীর নাম লছমীকুমারী। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিজয়সিংহের মাতৃবিয়োগ হয়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রায় বিষণচাঁদও দেহরক্ষা করেন। পিতৃ-মাতৃবিয়োগে বিজয়সিংহ অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। এই সময় রায় বুধসিংহ বাহাদুর ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভারগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বেই বিজয়সিংহ বালুচরের খ্যাতনামা ধনী রায় ধনপৎসিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন।

বাল্যশিক্ষা।

রায় বুধসিংহ বাহাদুর তাঁহার ভ্রাতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে ভ্রাতুষ্পুত্রকে শিক্ষাদান করিবেন, এই বিষয় লইয়া মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন কালেক্টর মিঃ জে. কেনেডির ও জেলাজজ মিঃ এফ্. বি. টেলরের সহিত

পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরামর্শে সাব্যস্ত হইল যে, বিজয়সিংহকে গৃহে শিক্ষাদান করাই কর্ত্তব্য। তদনুসারে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম. এ., বি. এল. তাঁহার শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অবিনাশবাবুর শিক্ষাগুণে বিজয়সিংহের বেশ মানসিক বিকাশ হইয়াছিল।

সাবালকত্বপ্রাপ্তি।

১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিজয়সিংহ সাবালক হন। সেই সময় তিনি স্বহস্তে তাঁহার বিষয়ের তত্ত্বাবধান-ভার গ্রহণ করেন। সাবালক হইয়া তিনি তাঁহার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক বাবু অবিনাশচন্দ্র দাসকেই তাঁহার জমীদারীর ম্যানেজার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিষয়কার্য্যে বিজয়সিংহের স্বাভাবিক প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছিল। অল্পদিন পরেই তিনি শ্রীমতী ম্যাট্‌কিন্সনের নিকট হইতে গোয়ামাল্টী জমীদারী কিনিয়া লইয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বরোদা সহরে ভারতবর্ষীয় জৈন-মহাসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল। জৈনগণ রায় বুধসিংহ দুধোরিয়া বাহাদুরকে তাহার সভাপতি ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়সিংহকে সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আপনাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় জৈনসম্প্রদায়ের দুই জন কর্ম্মকুশল প্রতিনিধিকে সভাপরিচালনের কর্ত্তৃত্বপ্রদানে যে কেবল তাঁহারা গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাহারা এতদ্বারা বাঙ্গালা দেশকেও সম্মানিত করিয়াছিলেন। এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন প্রধান প্রধান সংবাদপত্রেও বিলক্ষণ সন্তোষ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জনহিতকরকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা স্বতঃই বলবতী হয়। তদনুসারে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে তিনি সরকারকর্ত্তৃক আজিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার মনোনীত হন। কমিশনারের পদ পাইয়া তিনি মিউনিসিপালিটীর কার্য্যপরিচালনে ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করেন। সাধারণ জনহিতকরকার্য্যে তাঁহার নিষ্ঠা দেখিয়া সকলেই তাঁহার গুণেমুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং যখন ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত মিউনিসিপালিটীর নির্ব্বাচন উপস্থিত হয়, তখন তিনি উক্ত মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধারণ করদাতৃগণের বিজয়সিংহের উপর এরূপ প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সপ্তবিংশতিবর্ষীয় যুবক বিজয়সিংহই জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প গৌরবের কথা হয় নাই। উত্তরকালে তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, সাধারণের সে বিশ্বাস সৎপাত্রেই ন্যস্ত হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যদর্শনে রাজপুরুষগণও বিশেষ সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যপরিচালনের নৈপুণ্যদর্শনে সরকার বাহাদুর ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহাকে লালবাগ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নির্ব্বাচিত করেন। তিনি এই কার্য্য এরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, সরকার শীঘ্রই তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি একাকী বিচার করিবার ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর নার্সিং য়্যাসোসিয়েসনের সাহায্যকল্পে যে লেডী মিণ্টোর ফেট হয়, বিজয়সিংহ তাহার জেনারাল কমিটীর এক জন সদস্য হইয়াছিলেন এবং যাহাতে ঐ কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহিত হয়, তাহার জন্য ঐকান্তিক ভাবে যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রাজা-উপাধিলাভ।

শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহের কার্য্যদক্ষতা, জনহিতৈষণা, ঐকান্তিকভাবে সাধারণের কার্য্যে আত্মনিয়োগ, দান, চরিত্রবল ও বংশমর্য্যাদা দেখিয়া সরকার তাঁহার উপর বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন। সেই জন্য ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে স্বর্গীয় সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের জন্মোৎসব উপলক্ষে তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো বাহাদুর শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহকে রাজা-উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় ওসোয়ালসম্প্রদায়ভুক্ত জৈনদিগের মধ্যে ইনি ভিন্ন আর কেহই রাজা-উপাধি প্রাপ্ত হন নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নবেম্বর তারিখে বেলভেডিয়ারের দরবারে তদানীন্তন বঙ্গের ছোটলাট স্যর য়্যাণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর রাজা বিজয়সিংহকে সনন্দ প্রদান করেন। এই উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজা বিজয়সিংহের গুণগ্রামের বিশেষ প্রশংসা ছিল। রাজা যে জনহিতকর অনুষ্ঠানে মুক্তহস্তে দান করিয়া থাকেন, স্যর য়্যাণ্ড্রু ফ্রেজার তাহা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহের রাজসম্মানলাভে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, সকল সম্প্রদায়ের বঙ্গবাসীই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে সর্ব্বশ্রেণীর লোকই তাঁহাকে সাদরে ও সাড়ম্বরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

পুনর্নির্ব্বাচন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে আজিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নির্ব্বাচনের পরই রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়সিংহ পুনরায় মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসরই ১৮ই আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট স্যর্ এডোয়ার্ড নর্ম্মাণ বেকার্ বাহাদুর রাজা বিজয়সিংহের আজিমগঞ্জস্থিত প্রাসাদে গমন করেন। ঐ দিনই ছোটলাট বাহাদুর জিয়াগঞ্জস্থিত স্কুল খুলিয়াছিলেন। রাজা বিজয়সিংহ মহাশয় বিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া এই স্কুলগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়সিংহ তাঁহার ময়মনসিংহস্থ কারবার পরিদর্শন করিতে গমন করেন। এই স্থানে তিনপুরুষ ধরিয়া ঋণদানের কারবার চলিতেছিল এবং এই

অঞ্চলে তাঁহার বিশাল জমিদারীও ছিল। রাজা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে নগরবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলের বিখ্যাত জমীদারগণও তাঁহার নিকট আসিতেন, রাজাও তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে রাজা তাঁহার জঙ্গীপুরস্থ গদীতে গমন করেন। জঙ্গীপুর ও রঘুনাথগঞ্জের জনসাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানের সহিত অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। রাজা বিজয়সিংহও তথাকার ছাত্রাবাসনির্ম্মাণের জন্য পাঁচ শত টাকা, জঙ্গীপুরের ভিক্টোরিয়া বালিকা-বিদ্যালয়ের গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য এক শত টাকা এবং অন্যান্য অনেক লোকহিতকর-ব্যাপারে বিস্তর অর্থদান করিয়াছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই সহরে ভারতবর্ষীয় জৈন সম্মিলনের অধিবেশন হয়। সম্মিলনের পরিচালকবর্গ রাজা বিজয়সিংহকেই সেই সম্মিলনের সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সেই সময় রাণী অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন বলিয়া রাজা সেই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে রাজা তৃতীয়বার সর্ব্বসম্মতিক্রমে আজিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর সভাপতি হইয়াছিলেন।

রাজার কর্ম্মনিষ্ঠা।

রাজা বিজয়সিংহ কেবল মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন না, তিনি মুর্শিদাবাদ জেলা-বোর্ডের সদস্য, ইম্পিরিয়াল লীগের, কিং এডোয়ার্ড মেমোরিয়াল ফণ্ডের, লর্ড মিণ্টোর স্মৃতি-ভাণ্ডারের পরিচালক-সমিতিরও সদস্য ছিলেন। সম্রাটের অভ্যর্থনা-সভার পরিচালক-সমিতিরও তিনি সভ্য ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বৃটিশ ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েসনের এক জন ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। দিল্লীতে সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের সময়ও তিনি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকর্তৃক এই প্রদেশের ভূস্বামীদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ দিল্লীতে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

সকল বিভাগেই বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী থাকিলেও রাজা বিজয়সিংহ স্বয়ং তাঁহার সমস্ত কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় সময়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বঙ্গে অত্যন্ত বিরল। তাঁহার কর্ত্তব্যপালন দেখিলে সাধারণে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে না। স্নান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া তিনি অশ্বারোহণে বাহির হন এবং মিউনিসিপালিটীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি স্বধর্ম্মের রীত্যনুসারে নিরামিষাশী, তাঁহার অভ্যাস ও বেশভূষা আড়ম্বরশূন্য এবং নিয়মিত। তাঁহার সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শন করিবার শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অত্যন্ত প্রবল।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা বিজয়সিংহ প্রেসিডেন্সী-বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহের পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার সদস্য হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েকটি ভোটের জন্য তিনি সাফল্যলাভে সমর্থ হন নাই। ঐ সময় নদীয়ার ও মুর্শিদাবাদের জেলাবোর্ড তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিয়াছিল। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি চতুর্থবার আজিমগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আজিমগঞ্জ সহরের উন্নতিসাধনকল্পে তিনি অনেক যত্ন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সকৌন্সিল বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর তাঁহার কার্য্যদক্ষতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

দান।

আজিমগঞ্জের দুধোরিয়াগণ প্রকৃতই দানশৌণ্ড। রায় বুধসিংহ বাহাদুর ও রায় বিষণচাঁদ বাহাদুরের দান ভারতের সর্ব্বত্রই পরিজ্ঞাত। রাজা বিজয়সিংহও তাঁহার পিতা ও পিতৃব্যের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লোকহিতকর কার্য্যে মুক্তহস্ত। গত ষোল বৎসরে তিনি দুই লক্ষ টাকার অধিক দান করিয়াছেন। ধাত্রী-সমিতির সাহায্যকল্পে লেডী মিণ্টোর ফেটেই তিনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। জিয়াগঞ্জের এডোয়ার্ড করোনেশন ইনিষ্টিটিউশনে বিশ হাজার, কৃষ্ণনগর কলেজ ভাণ্ডারে চারি হাজার টাকা, ইম্পিরিয়াল ওয়ার্ রিলিফ ফণ্ডে দশ হাজার টাকা প্রভৃতি দান উল্লেখযোগ্য। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে যখন দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং টাকায় ছয় সাত সের চাউল বিকাইতে থাকে, তখন রাজা সাহেব তাঁহার উদারচরিত পিতৃব্যের সহিত একযোগে উচ্চদরে চাউল কিনিয়া, গরীবদিগকে টাকায় দশ সের দরে ঐ চাউল বেচিয়াছিলেন। যত দিন দুর্ভিক্ষ ছিল, তত দিনই তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন। গরীবদিগকে সাহায্য করিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হইয়াছিলেন। রাজাসাহেব জাতিধর্ম্ম ও বর্ণনির্ব্বিশেষে দান করিয়া থাকেন।

রাজাসাহেবের পুত্র নাই। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটি পুত্র শৈশবেই মরিয়া যায়। তাঁহার একমাত্র কন্যা সোহাগকুমারী বালুচরের বাবু হরেকচাঁদ নহাটার পুত্রবধূ—বাবু শ্রীচাঁদ নহাটার পত্নী। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে রাজাসাহেবের প্রথম দৌহিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তৎপরে আর একটী দৌহিত্র হইয়াছে। রাজমহিষী গুণবতী ও পতিব্রতা। তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিণী। রাজাসাহেবের বয়স অধিক হয় নাই; এই অল্প বয়সেই তিনি বিশেষ যশস্বী হইয়াছেন। তিনি পুত্রপৌত্রাদি লাভ করিয়া আরও যশস্বী হউন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

(৩)

ত্রিগুণ।

হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ বুঝিতে হইলে আর্য্যঋষিগণের চিন্তার ধারা ও সিদ্ধান্তের মর্ম্ম বুঝিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জীবাত্মার গতি জড়ত্ব হইতে দেবত্বের দিকে। এই বিশ্বের এক দিকে জড়, আর এক দিকে নির্ম্মল চৈতন্য; মধ্যে জড়োপহত চৈতন্যের প্রবাহ চলিয়াছে। জড় হইতে প্রবাহিত জীবপ্রবাহ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই তাহার চৈতন্যশক্তি যেন পরিস্ফুট হইতেছে। জড়োপহত চৈতন্যই জীব। জীবের মধ্যে যে চৈতন্য আছে, তাহা মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত জড়ের দ্বারা আচ্ছন্ন। যে জীব জড়ের অত্যন্ত সন্নিহিত, তাহা জড়বৎ। বিশেষ লক্ষ্য না করিলে তাহার চৈতন্যশক্তি উপলব্ধি করা যায় না। অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদ ও জীব লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিলে তাহাদের যে চৈতন্য আছে, তাহা বুঝা যায় না, বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু তাহাদের চৈতন্য আছে। বাহিরের প্রভাবপ্রয়োগে তাহাদের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের একটু সাড়া পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু তাহা বৈজ্ঞানিকসমাজে সপ্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিরা বলিয়া গিয়াছেন,—

> তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতাঃ কর্ম্মহেতুনা।
> অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ॥

কর্ম্মহেতু বহুরূপ তমোগুণদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া ইহারা আছে; ইহাদের ভিতরে ভিতরে জ্ঞান আছে এবং সুখ-দুঃখও বোধ করে। মনু বলিতেছেন যে, ইহাদের ভিতর জীবাত্মা আছেন, কিন্তু সেই জীবাত্মা কর্ম্মবিপাকহেতু এতই তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা জড়বৎ হইয়া গিয়াছে। জাড্যই তমোগুণের প্রধান লক্ষণ। নিম্নস্তরের যামিবা প্রভৃতি জীবেরও ঐরূপ জড়ত্ব প্রকটিত। প্রভাতে অত্যন্ত ঘন কৃষ্ণ জলদজালে আকাশ যখন একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তখন ধরাপৃষ্ঠে যেমন নিশার অন্ধকার প্রকট হইয়া পড়ে, মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া যে বালভানু গগনে আছেন, তাহা বুঝা যায় না, তেমনই এই সকল নিম্নস্তরের জীবের ভিতর যে চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা নিবিড় তমোগুণে এতই সমাচ্ছন্ন যে, তাহার ভিতর যে চৈতন্যের উন্মেষ হইয়াছে অর্থাৎ জীবাত্মার অধিষ্ঠান হইয়াছে, তাহা বুঝা যায় না। আচ্ছন্ন করা বা আবরণ দেওয়াই তমোগুণের একটা কার্য্য। সেই জন্য ঋষিরা তমোগুণকে অবিদ্যার আবরণশক্তি বলিয়াছেন। তাহার পর জীবপ্রবাহ যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই তাহার সেই জাড্য—সেই নিদ্রা-লস্যজড়িত ভাব যেন কাটিয়া যাইতে থাকে। তাহার যেন অতি অল্প জ্ঞানের এবং কার্য্য করিবার জন্য চাঞ্চল্যের লক্ষণ লক্ষিত হয়। ক্রমশঃ তাহার অস্থিরতা, চাঞ্চল্য, কাম, ক্রোধ, রাগ, দ্বেষ, অধীরতা, সুখলিপ্সা, চেষ্টা, যত্ন প্রভৃতি গুণ প্রকাশ পায়। তখন বুঝিতে হইবে যে, তাহার তমোগুণ কিছু কমিয়া গিয়াছে, রজোগুণ বাড়িয়াছে। সত্ত্বগুণও যেন একটু বাড়িয়াছে। ক্রমে জীব যখন মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে এবং ক্রমে তাহার ধর্ম্মজ্ঞানের আবির্ভাব হয়, যখন তাহার মানসক্ষেত্রে জ্ঞান, আস্তিক্যবুদ্ধি, ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, বৈরাগ্য, জিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থশূন্যতা, উপচিকীর্ষা প্রভৃতি গুণ দেখা দেয়, তখনই তাহার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রজস্তমোগুণ কমিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। প্রকাশই সত্ত্বগুণের কার্য্য; উহা শান্তভাব প্রদান করে। এই তিনটি গুণই জীবের বন্ধনের কারণ। জীবকে বদ্ধ রাখাই গুণের কার্য্য। গুণাতীত না হইলে মানুষ মুক্তিলাভ করিতে পারে না। ব্যাপারটা বুঝিতে হইলে গোড়ার কথা একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

গোড়ার কথা—সৃষ্টির কথা। এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্ট হইল কেন, কোথা হইতে ইহা আসিল, জীব কেন ধর্ম্মবন্ধনে পড়িল, সেই কথা। যাঁহাদের এই সকল কথায় রুচি নাই, তাঁহারা ইহাকে বাজে কচ্‌কচি মনে করিতে পারেন, কিন্তু উহা মনে করাও ভুল। হিন্দুর সাধনার ক্রম বুঝিতে হইলে এই কথা কয়টা বুঝা বড়ই আবশ্যক। নতুবা কোন কথাই বুঝা যাইবে না।

দৃশ্যমান্ জগৎকে স্থূলকথায় 'প্রকৃতি' বা Nature বলা যায়। সাংখ্যমতে ইহা ব্যক্তপ্রকৃতি। এই ব্যক্ত-প্রকৃতির মূলে অব্যক্তপ্রকৃতি আছেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই অব্যক্তপ্রকৃতি; অর্থাৎ যখন সৃষ্টি হয় নাই,—কিন্তু সৃষ্টির আয়োজনমাত্র হইয়াছে, তখনই অব্যক্তপ্রকৃতি বা মূলাপ্রকৃতির উদ্ভব হইয়াছে। সৃষ্টির পূর্ব্বেই ত্রিগুণ আবির্ভূত হয়। কিন্তু তখন কোন গুণেরই ইতরবিশেষ বা বৈষম্য থাকে না; তখন প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা যোগমায়া। গুণসাম্যহেতু যোগমায়া যোগনিদ্রাগতা। তখন সৃষ্টি নাই, সিসৃক্ষাও নাই। গীতায় সেই অব্যক্ত

প্রকৃতিকে মহদ্‌ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। এই অব্যক্তপ্রকৃতির সহিত পুরুষের বা ঈশ্বরের সান্নিধ্য হইলেই প্রকৃতির গুণ-বৈষম্য ঘটে। তখন সৃষ্টি হয়। সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন,—

মমযোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

গীতা, ১৪।৩-৪।

ইহার অর্থ এই যে, সেই মহদ্‌ব্রহ্মে আমি গর্ভাধান করি। সেই জন্য সেই মহদ্‌ব্রহ্ম বা ব্যক্তপ্রকৃতি হইতেই সমস্ত জীবের উদ্ভব হয়। হে কুন্তীনন্দন! সমস্ত যোনি হইতে যে সমস্ত মূর্ত্তির উদ্ভব হয়, প্রকৃতিই তাহাদের মাতা আর আমি (ঈশ্বর) তাহাদের বীজপ্রদ পিতা।

সুতরাং বুঝা গেল যে, গুণবৈষম্য হইতেই এ বিশ্বের উদ্ভব হইয়াছে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, এই তিনটি গুণের তারতম্য হওয়াতেই অব্যক্ত হইতে এই ব্যক্তজগৎ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই বিশ্বে যত জীব আছে, তাহার কোন জীবেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ সমানভাবে নাই। কেহ সত্ত্বগুণপ্রধান, কেহ রজোগুণপ্রধান, কেহ বা তমোগুণ প্রধান। এই তিনটি গুণ আবার পরস্পর বিরোধী। একটি গুণ কমিয়া গেলে আর একটি গুণ বৃদ্ধি পায়। তমোগুণ বাড়িলে সত্ত্ব ও রজোগুণ কমিয়া যাইবে, রজোগুণ বৃদ্ধি পাইলে তমোগুণ কমিবে, আবার সত্ত্বগুণ অধিক হইলে তমঃ ও রজোগুণ ক্ষয় পাইবে। এখন এই তিনটি গুণ কিরূপ, তাহা বলা আবশ্যক। গীতা বলিয়াছেন,—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥

হে মহাবাহু অর্জ্জুন! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হয়। উহারা অব্যয়দেহীকে দেহের ভিতর বদ্ধ করে অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত হয়। প্রকৃতিতে যখন উহা অক্ষুব্ধ ভাবে থাকে,—তখন প্রকৃতির সেই অবস্থাকে অব্যক্ত প্রকৃতি বলা যায়। তখন এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব উদ্ভূত হয় নাই। তাহার পর পরমেশ্বরের সান্নিধ্যবশতঃ গুণের বৈষম্য ঘটিলেই সেই গুণদ্বারা আত্মা দেহের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ইহাই সৃষ্টিরহস্য।

এই সৃষ্টিতত্ত্ব কিরূপ? পরমেশ্বর শবরূপে পতিত। তিনি ক্রিয়াশূন্য, নির্ব্বিকার, কিন্তু সগুণ। তাঁহারই উপরে বসিয়া মহামায়া “মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরা।” সেই ক্রিয়াশীলা প্রকৃতির গর্ভাধান নিষ্ক্রিয় পুরুষকর্ত্তৃক এইরূপে সম্পাদিত হইতেছে। তাঁহার বর ও অভয়হস্ত সৃষ্টি-স্থিতির দ্যোতন করিতেছে, সদ্যশ্ছিন্ন নরশির সংহার-কার্য্য-সংসাধনের চিত্র দেখাইতেছে; উদ্যত অসি ভবিষ্যৎসংহারকার্য্যের বিভীষিকা জন্মাইতেছে; আর নরশিরমুণ্ডমালা কল্পকল্পান্তরের সংহারকার্য্যের সাক্ষ্য দিতেছে। এই মহাকালী মহামায়ামূর্ত্তিতে সৃষ্টিরহস্য প্রকটিত। ইহাই ব্যক্তপ্রকৃতির এক মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তিতে ত্রিগুণধারিণী প্রকৃতির সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারলীলা প্রকটিত হইতেছে। আবার রজোগুণের আধিক্য না হইলে সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির ইচ্ছা হয় না। সেইজন্য পুরুষ ও প্রকৃতিকে সমস্ত ভাবে ধরিলে ব্রহ্মার মূর্ত্তি কল্পিত হয়। তাই সৃষ্টিকর্ত্তা রজোগুণপ্রধান রক্তবর্ণ। সৃষ্টিকালে প্রকৃতি পরমেশ্বরকে সমষ্টিভাবে ধরিলে প্রবৃত্তিপ্রধান রক্তবর্ণ ব্রহ্মার মূর্ত্তি লক্ষিত হয়। যাহা হউক, এখন এই তিনটি গুণ কি কি, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। গীতা বলিতেছেন,—

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥

হে অনঘ! সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, তাহার সেই নির্ম্মলত্ব-হেতু উহা প্রকাশক, জ্ঞানের বিকাশকারী এবং অনাময় অর্থাৎ উপদ্রবশূন্য, উহা মানুষকে সুখাসক্তিতে ও জ্ঞানা-সক্তিতে বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ স্ফটিকতুল্য, সেই জন্য উহা তমোগুণের ন্যায় জ্ঞানকে বাধা দেয় না, জ্ঞানের প্রকাশ হইতে দেয় এবং উহা উপদ্রবশূন্য শান্তিপ্রদান করে; মানুষের মনকে বিক্ষুব্ধ করে না। কিন্তু উহাতে মানুষকে জ্ঞানাসক্ত ও সুখাসক্ত করিয়া থাকে। আসক্তি-মাত্রই বন্ধনের কারণ। সেই জন্য সত্ত্বগুণও মানুষের বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ খুবই ভাল এবং সাত্ত্বিক বা সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তিরাই প্রশংসার্হ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঋষিদিগের শিক্ষা এই যে, গুণাতীত না হইলে মুক্তি হয় না। সত্ত্বগুণ যতই প্রশংসনীয় হউক না কেন, উহাতে “আমি” “আমার” এইরূপ বুদ্ধি সজাগ রাখে। সুতরাং যতক্ষণ সত্ত্বগুণ আছে, ততক্ষণ জীব মায়াডোরে বদ্ধ আছে, ইহা বুঝিতে হইবে। য়ুরোপীয়েরা অবশ্য এ কথা বুঝেন না। তাঁহারা সত্ত্বগুণকেই ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা মনে করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষিতব্যক্তিদিগেরও মনে সেই ধারণা বলবতী। সেই জন্য তাঁহারা হিন্দুর কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। তাহার পর রজোগুণের কথা গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয়! কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনাম্॥

হে কৌন্তেয়! রজোগুণকে অনুরাগাত্মক জানিও। উহা তৃষ্ণা (বিষয়বাসনা) ও আসক্তিরই উৎপাদক; উহা জীবকে কর্ম্মে আসক্ত করিয়া বদ্ধ করে। বিষয়তৃষ্ণা অর্থাৎ যাহা আমার নাই, তাহা পাইবার বাসনাকে বিষয়তৃষ্ণা বলে; আর যাহা আমার আছে, তাহা যেন আমারই

থাকে,—ক্ষুণ্ণ, নষ্ট বা হস্তান্তরিত না হয়, তাহাই আসক্তি। বিষয়তৃষ্ণা ও বিষয়াসক্তিই রজোগুণের ফল। এই বিষয়-তৃষ্ণায় ও বিষয়াসক্তির ফলে মানুষ বিষয়কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শৌর্য্য, বীর্য্য, অহঙ্কার, চাঞ্চল্য, যত্ন, কার্য্যদক্ষতা, প্রভুত্ব, তাড়নশীলতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি রজোগুণ হইতে উদ্ভূত। ইহা সংসারে আসক্তি জন্মাইয়া মানুষকে বদ্ধ করে।

তমোগুণ কাহাকে বলে?—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞান হইতে জন্মে; ইহা সকল জীবকে ভ্রান্ত করিয়া ফেলে। ইহা প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-দ্বারা জীবকে বদ্ধ করে। এই গুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ইহা সর্ব্বজীবকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তমোগুণগ্রস্ত লোকের জ্ঞানবৃদ্ধি কিছুই থাকে না; ইহারা কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না; একনিষ্ঠ হইয়া কোন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারে না; কেবল শবের ন্যায় পড়িয়া নিদ্রা যায়, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে পারে না। তমোগুণগ্রস্ত লোকেরা আপনাদের দেহের ভিতর যেন ডুবিয়া থাকে। ইহারা জ্ঞানহীন, উদ্যমশূন্য, অকর্ম্মণ্য জীব হইয়া পড়ে। বিষণ্ণতা, অবসাদ, উৎসাহ-শূন্যতা, মূঢ়তা, সঙ্কীর্ণতা প্রভৃতিই তমোগুণের কার্য্য। এই ত্রিগুণেই জীব বদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতি বা মহামায়া তিন-গাছা দড়া দিয়া জীবাত্মাকে বদ্ধ রাখিয়াছেন। কোন জীবেই কেবলমাত্র একটি বা দুইটি গুণ নাই,—থাকিতে পারে না। প্রদীপে যেমন তৈল, সলিতা ও অগ্নি এই তিনটি সংযোগে আলোক হয়, একটার অভাবেই আলো নিবিয়া যায়, সেইরূপ এই তিনটি গুণেরই কিছু-না-কিছু না থাকিলে জীব থাকে না। অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর কীট-পতঙ্গেরও এই তিনটি গুণই কিছু-না-কিছু আছেই আছে। সাংখ্য-দর্শন বলেন যে,—

প্রীত্যপ্রীতিবিষাদাত্মকাঃ প্রকাশপ্রবৃত্তি নিয়মার্থাঃ।
অন্যোন্যাভিভবাশ্রয়জনন-মিথুন বৃত্তয়শ্চ গুণাঃ॥

সত্ত্বগুণ প্রীতিস্বরূপ, রজোগুণ অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখস্বরূপ আর তমোগুণ মোহস্বরূপ। সত্ত্বগুণের প্রয়োজন প্রকাশ, রজোগুণের প্রয়োজন কর্ম্মে প্রবৃত্তি, আর তমোগুণের প্রয়োজন কর্ম্মে প্রবৃত্তির প্রতিকূলাচরণ। এই তিন গুণের বৃত্তি এই যে, ইহারা পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করে। পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করে, পরস্পর পরস্পরকে উৎপাদন করে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হয়।

গীতাতেও ঠিক ঐ কথাই বলা হইয়াছে। এই ত্রিগুণের কথা গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। দেহী অর্থাৎ জীবমাত্রেরই এই তিনগুণ কিছু-না-কিছু পরিমাণে বর্ত্তমান আছে। তবে তন্মধ্যে কেহ সত্ত্বগুণপ্রধান, কেহ রজোগুণপ্রধান, কেহ বা তমোগুণপ্রধান। নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে তমোগুণ অধিক; জীব যত উচ্চস্তরে উঠিতে থাকে, ততই তাহার রজোগুণ অল্পে অল্পে বৃদ্ধি পাইতে থাকে; রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তমোগুণকে অভিভূত করে। মানুষের মধ্যেও অধিকাংশই রজোগুণ প্রধান। য়ুরোপে রজোগুণেরই আদর অধিক। যাহারা কর্ম্মী, তাহাদের রজোগুণই প্রবল হয়। কিন্তু মুক্তি পাইতে হইলে এই গুণ তিনটিকেই ছেদন করিতে হয়। প্রত্যেক গুণ বর্দ্ধিত করিতে হইলে তাহার অনুকূল সাধনা করা আবশ্যক। রজোগুণের বৃদ্ধি করিতে হইলে রাজসিক আহার ও রাজসিক আচার গ্রহণ করিতে হয়; রাজসিক দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয়। সত্ত্বগুণকে বৃদ্ধি করিতে হইলে সাত্ত্বিক আহার ও সাত্ত্বিক আচার গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাই হিন্দুর সাধনরহস্য।

ভারতে উটজ শিল্প।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বি. এ. লিখিত।]

আরম্ভে সকল দেশেই শিল্প উটজ। শিল্পী আপনার গৃহে বা গৃহপ্রাঙ্গণে শিল্পপণ্য প্রস্তুত করে, প্রয়োজনে তাহার স্বজনগণ তাহার কার্য্যে সাহায্য করে। শিল্পীর নৈপুণ্যের তারতম্যে পণ্যের উৎকর্ষের তারতম্য হয়। তাহার পর যখন একাধিক শিল্পী একই শিল্পে আত্মনিয়োগ করে, তখন তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেমন প্রতিযোগিতার প্রাদুর্ভাব হয়, তেমনই আবার সমস্বার্থসঞ্জাত বন্ধনও সৃষ্ট হয়। হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থায় বর্ণবিভাগে ব্যবসাবিভাগে সেই বন্ধন দৃঢ় হয়; য়ুরোপে বর্ণবিভাগ নাই, তথায় ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘ (Guild) স্থাপিত করিয়া—শিক্ষানবীশ লইয়া তাহাকে শিল্পের শিক্ষাদানের নিয়ম করিয়া আপনাদের স্বার্থরক্ষার উপায় উদ্ভাবিত করে। সুধী মোনিয়র উইলিয়মস্ বলিয়াছেন, সামাজিক ব্যবস্থাহিসাবে (as a social institution) "জাতিভেদ" সব দেশেই লক্ষিত হয়। য়ুরোপের মত যে সব দেশে এই জাতিভেদের সহিত ধর্ম্মের কোনই সম্বন্ধ নাই, সে সব দেশে এক ব্যবসায়ীর অধিকারলাভে অন্যের চেষ্টা হয়, আর ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধ হইয়া সে চেষ্টা ব্যর্থ করিতে প্রয়াস পায়। এমন কি, ভারতে ব্যবসার জন্য প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এই নিয়মের কঠোরতা হ্রাস করেন নাই। উটজ শিল্প ছাড়িয়া যখন বড় বড় কারবারের প্রতিষ্ঠা হয়, তখনও এইরূপ নিয়ম—এইরূপ চেষ্টা লক্ষিত হইত, আজও হইতেছে।

য়ুরোপাদি মহাদেশে উটজ শিল্প ক্রমে অবজ্ঞাত হইয়াছে ও বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাহাতে অল্প সময়ে অধিক পণ্য উৎপন্ন হয়—বাষ্প ও বিদ্যুৎ শক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া দেখিতে দেখিতে প্রচুর পণ্য প্রস্তুত হইতেছে; রেলে ও ষ্টীমারে সেই পণ্য বাহিত হইতেছে; বাণিজ্যের স্রোত অবিরাম বহিতেছে। কর্ম্মের ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য—অবিরাম আন্দোলন চলিতেছে—সমাজে কাহারও যেন নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। রেলপথে দেশ ছাইয়া গিয়াছে—ষ্টীমারে নদীবক্ষ পূর্ণ—কারখানার ধূমে আকাশ মলিন—কর্ম্মকোলাহলে দেশ মুখরিত; তাহার উপর ব্যবসার জন্য ব্যাঙ্ক আছে, জেটী আছে, ডক্ আছে, গুদাম আছে। বিলাতের কথায় কোন পর্টুগীজ লেখক বলিয়াছেন, দেশটি যেন পৃথিবীর টাকা টানিবার জন্য একটা বিরাট পণ্যশালা—বিশাল কারবার। এই যে অবিশ্রান্ত কর্ম্মকোলাহল—এই যে বিরাট আয়োজন—বিষম প্রতিযোগিতা, ইহাই এখন অনেক স্থলে রাজনীতিক বিক্ষোভের—আন্তর্জাতিক বিরোধের কারণ। ইহা ভাল না মন্দ? বিখ্যাত লেখক ও কলাসমালোচক রাস্‌কিন্ যে প্রতীচ্য সভ্যতার উজ্জ্বল আলোকের নিম্নেই ঘন অন্ধকারের কথা বলিয়াছেন, সে প্রতীচ্য শিল্পব্যবস্থার ফল। তাহাতে এক পক্ষে যেমন অগাধ অর্থ সঞ্চিত হয়, ব্যবসার মালিকের বিলাসের উপায় হয়—অপর পক্ষে তেমনই শিল্পী দরিদ্র শ্রমজীবীতে পরিণত হইয়া—কলের মত হইয়া কলকারখানায় কায করিয়া অন্নার্জ্জন করে। বড় বড় কল বিরাট মূলধন—তাহাকে চালাইয়া তবে লাভ করিতে হয়। সে জন্য অনেক দরিদ্র দুঃখপীড়িত হয়। শ্রমজীবীরাও যে ইহা বুঝে না, এমন নহে। কার্ল মার্কস্ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছেন, পণ্যের লাভের অতি সামান্য অংশ শ্রমজীবীর ভাগে পড়ে—সে অংশ তাহার বেতন বা পারিশ্রমিক। কিন্তু কেন এমন হয়? কল উৎপাদনের যন্ত্র; সে যন্ত্র ব্যবসার মালিকের বা মহাজনের। তাহার যন্ত্র ব্যতীত পণ্যোৎপাদন অসম্ভব, তাই সে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে বলিয়াই স্বার্থসন্ধানে লাভের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। শ্রমজীবীরা ইহার প্রতিবাদ করে; এখন পদ্ধতিবদ্ধভাবে—দলবদ্ধ হইয়াই প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তাহারই ফল—ধর্ম্মঘট। সাধারণ শ্রমজীবী বুদ্ধির দ্বারা ভাবাবেশ সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাই সে যখন ধর্ম্মঘট করে, তখন সে কেবল কায বন্ধ করিয়াই নিরস্ত হইতে পারে না; পরন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধায়—রক্তারক্তি করে। ইংলণ্ডে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়ারের শ্রমজীবীদিগের ধর্ম্মঘটই তথায় প্রথম বড় ধর্ম্মঘট। জার্ম্মাণী সামরিক পদ্ধতিতে সমগ্র সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া—লোকের স্বাতন্ত্র্য বিনষ্ট করিয়া দেশে কৃত্রিম শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। কিন্তু আগ্নেয়গিরির অন্তরস্থ বহ্নি যেমন তাহার প্রস্তররুদ্ধ মুখ মুক্ত করিয়া বাহির হয়, তেমনই জার্ম্মাণীতেও শ্রমজীবীদিগের এই অসন্তোষ—মহাজনের সহিত শ্রমজীবীর এই বিরোধ প্রবলভাবেই আত্মবিকাশ করিয়াছে। জার্ম্মাণীর সামরিক শাসন তাহার বিকাশ রুদ্ধ করিতে পারে নাই। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মাণীর নানা স্থানে ২ হাজার ৫ শত ৬৬টি ধর্ম্মঘট হয়; সেই সব ধর্ম্মঘট ১০ হাজার কারবারের মজুররা করিয়াছিল—আর সেই সব ধর্ম্মঘটে যে সব শ্রমজীবী যোগ দিয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা ৬০ হাজার। এই সংখ্যা হইতেই ধর্ম্মঘটের ও ধর্ম্মঘটের কারণ অসন্তোষের পরিমাণ অনুমিত হইতে পারে।

য়ুরোপে বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার ফলে

শ্রমজীবীদিগের অবস্থাও শোচনীয় হইয়াছে। তথায় শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য আর বুদ্ধির পরিচায়ক নহে; কারণ বুদ্ধির কার্য্য কলেই সম্পন্ন হয়; শ্রমজীবী কেবল শিক্ষিত পদ্ধতি-অনুসারে কলের কার্য্য করে; সেও যেন একটি কল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যুরোপে ইহাকেই Skilled Labour বলে। এই যে নৈপুণ্য, ইহা সামান্য শিক্ষাসাপেক্ষ; সুতরাং শিল্পীর আদরও কম। আবার শ্রমজীবীর সংখ্যাসম্বন্ধে বিলাতের প্রথায় ও আমেরিকার প্রথায় প্রভেদ বিদ্যমান। আমেরিকান্‌রা কলে কায বাড়াইয়া শ্রমজীবীর সংখ্যা কমাইবার চেষ্টা করে; তাহাদের কথা—We work hard finding out how to avoid work, আর বিলাতে যত অধিক লোক কায পায়, তাহাই লোকের অভিপ্রেত—Make the work go round and let as many men as possible have a share of it. অর্থাৎ বিলাতে যেমন অধিক লোককে কায দেওয়া হয়, আমেরিকায় তেমনই লোক কমাইবার চেষ্টা করা হয়। অল্পই হউক আর অধিকই হউক, সে সব দেশে শ্রমজীবীর স্বাধীনতা নাই—অবস্থা শোচনীয়। তাই ফরাসী দার্শনিক টেন বলিয়াছেন, এই শ্রম-ব্যবস্থায় জাতির অবনতি হয়—মানুষের পশুপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। তিনি বিলাতের কারখানার বর্ণনায় বলিয়াছেন, বড় বড় গুদামঘরে কলের শব্দে কলের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া শ্রমজীবীরাও যেন কলের মত কায করে। তাহাদের জীবন মানুষের অরুচিকর—প্রকৃতিবিরুদ্ধ; যেন মানুষকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া কায করান হইতেছে। ইহাদের ঘর নাই, পরিবারের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ নাই—আছে কেবল মদ্যপান-স্পৃহা। বৎসরে ৩০ হাজার লোক (স্ত্রী-পুরুষ) মদ্যপান করিয়া মাতলামী করায় আদালতে অভিযুক্ত হয়। এক জন বলিয়াছিল, মদ না খাইয়া কি করিব—তদপেক্ষা মৃত্যু ভাল! তিনি লণ্ডনের শ্রমজীবিগণের বাসপল্লীর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে ঘৃণাবোধ হয়। মানুষ যে এমনভাবে পশুবৎ জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

মিষ্টার সেরার্ড বিলাতের নানা ব্যবসায় শ্রমজীবীদিগের দুরবস্থাসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। পুস্তকখানিতে তিনি বিলাতের শ্রমজীবীদিগকে ক্রীতদাস বলিয়াছেন,—White Slaves of England. তাহাতে বেডফোর্ডের পশমের কারখানার শ্রমজীবীদিগের দুরবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ, মুখ বিবর্ণ, দেহ শীর্ণ। সুস্থ লোকের দেহের যে ওজন হয়, এই সকল শ্রমজীবীর মধ্যে এক জনেরও দেহের ওজন সেরূপ নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, অন্য কাযে ইহাদেরই এক জন ১০ সপ্তাহে ওজনে সাড়ে ১০ সের বাড়িয়াছিল, কিন্তু পুনরায় এই কাযে প্রবৃত্ত হইয়া ১৫ দিনেই আবার সাড়ে ৪ সের ওজনে কমিয়াছিল! কারখানা-ঘরের জানালা দিয়া যে গরম দুর্গন্ধ হাওয়া বাহির হয়, রাস্তায় তাহাতেই লেখকের মূর্চ্ছার উপক্রম হইয়াছিল; আর সেই কারখানা-ঘরে শ্রমজীবীরা সপ্তাহে ৬৪ ঘণ্টা শ্রম করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করে। কলের কম্পনে সে ঘর সর্ব্বদা কম্পিত; কলের শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়; বাতাস এতই উষ্ণ যে, সময় সময় স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই অর্দ্ধনগ্ন হইয়া কাজ করিতে হয়, আর তাহাতে হরিদ্রাবর্ণ ধূলিকণা ভাসমান। দিবাভাগে রমণীরা ও রাত্রিকালে পুরুষরা কারখানায় কায করে। অনেক পরিবারে স্ত্রী দিবাভাগে ও স্বামী রাত্রিকালে কারখানায় কাজ করে। ইহাতে স্ত্রী-পুরুষে সাক্ষাৎ বিরল হয়—সংসারের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। দিবালোকে দেখা যায়, প্রতি কলে এক জন করিয়া স্ত্রীলোক কায করিতেছে—তাহাদের মধ্যে বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা, সবই আছে। ২০ বৎসর বয়স্কা যুবতীকে দেখিলে ৪০ বৎসরের প্রৌঢ়া বলিয়া ভ্রম জন্মে। অন্যান্য ব্যবসায়ে শ্রমজীবীদিগের দুর্দ্দশার কথা বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিবার স্থান আমাদের নাই। তবে বিলাতেও যাহারা কাচের কারখানায় ও দেশলাইয়ের কারখানায় কায করে, তাহাদের কথা পাঠ করিলে প্রতীচ্য ব্যবসা-ব্যবস্থার প্রতি বীতরাগ না হইয়া থাকা যায় না। আর আমাদের দেশের ব্যবসার ব্যবস্থার সঙ্গে তাহার তুলনা করিলে আমাদের ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই ত শ্রমজীবীদিগের অবস্থা। আর যে সব ধনী ব্যবসায়ী মূলধন যোগাইয়া বড় বড় কারবারের প্রতিষ্ঠা করিয়া জগৎ জুড়িয়া ব্যবসার শাখাপ্রশাখা বিস্তারিত করিয়া অর্থার্জ্জন করেন, যাঁহাদের ব্যবসায়ে প্রতি দিন কোটি কোটি টাকা ঘুরিয়া আইসে, তাঁহারাই কি সুখ ও শান্তি সম্ভোগ করিয়া থাকেন? তাহাও নহে। তাঁহারা যে বিরাট কারবারের সৃষ্টি করেন, তাহাতেই তাঁহারাও আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলেন—তাহারই অবিচ্ছিন্ন অংশ হইয়া পড়েন; ইচ্ছা করিলেও তাঁহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারেন না। সেই কারবারের কথাই তাঁহাদের ইষ্টমন্ত্র হইয়া পড়ে। কেহ কেহ অতিরিক্ত শ্রমে স্বাস্থ্য হারাইয়া কায ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন।

সুতরাং সুখ যে কোন দিকেই অধিক আছে, এমন বোধ হয় না। তথাপি বড় বড় কলকারখানায় অভ্যস্ত যুরোপীয়দিগের দৃঢ়বিশ্বাস, ছোট ছোট উটজ শিল্প আর চলিতে পারে না—তাহার স্থানে বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হইবেই। দিল্লীতে শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে লর্ড কার্জ্জন ভারতবাসীকে বলিয়াছিলেন, ভারতে যাহা ঘটিতেছে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তাহা ঘটিয়াছে। বিলাতের শ্রমশিল্প নির্ব্বাপিত হইয়াছে, চীনের ও জাপানের পুরাতন শ্রমশিল্পও নির্ব্বাপিত হইতেছে। ইহার প্রতীকার হইতে

পারে না। ঘোড়ার গাড়ীর পরিবর্ত্তে বাষ্পীয় যানের ও টানাপাথার পরিবর্ত্তে বৈদ্যুতিক পাথার প্রবর্ত্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী, হাতের তাঁতের পরিবর্ত্তে কলের তাঁতের ও কারীকরের কারখানা-ঘরের পরিবর্ত্তে বড় বড় কল-কারখানার প্রবর্ত্তন তেমনই অবশ্যম্ভাবী। ইহা হইবেই—কেন না, বর্ত্তমান সময়ে লোক সস্তা জিনিষ চাহে—তাহার সৌন্দর্য্যবিচার করে না, আরাম চাহে—শ্রী চাহে না, কেবল নূতন চাহে। এ অবস্থায় পুরাতন শ্রমশিল্পের নির্ব্বাণ হইবেই;

এইরূপ মত ইংরাজী সংবাদপত্রে সর্ব্বদাই ব্যক্ত হয় এবং আমাদের দেশেও অনেকে অনায়াসে সেই মত গ্রহণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে দেশের শ্রমশিল্পের অবনতি অনিবার্য্য মনে করেন। ঢাকাই মস্‌লিনের ও মুর্শিদাবাদী রেশমের কাপড়ের কথা হইলেই বলা হয়—সে দিন আর নাই, তথন তন্তুবায় যে সময়ে এক গজ মস্‌লিন বুনিত, এখন তদপেক্ষা কম সময়ে কলে দশ মাইল লম্বা মস্‌লিন বুনা যায়। আমাদিগকে শুনান হয়, বিলাতের মধ্যযুগের গির্জ্জায় যে সব রঙ্গীন কাচের গবাক্ষ আছে, সে সব রঙ্গীন কাচের ব্যবসা গিয়াছে—অষ্টাদশ শতাব্দীতেও শিল্পী আপনার গৃহে বসিয়া যে সব কাষ্ঠের ক্ষোদাই কায করিত, সে সব আর হয় না। সে সময় শ্রমজীবী শিল্পী ছিল, এখন সে মজুর! কিন্তু এ পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য।

যাঁহারা অনায়াসে এই মত ব্যক্ত করেন, তাঁহারা বুঝেন না যে, কলে যে মস্‌লিন হয়, তাহা ঢাকাই মস্‌লিনের সমকক্ষ নহে—তেমন মস্‌লিন কলে হয় না, হইতে পারে না। কলে যে রঙ্গীন কাচ প্রস্তুত হয়, তাহা বর্ণের কোমলতায় ও বৈচিত্র্যে হাতে গড়া কাচের কাছে দাঁড়াইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে; বড় বড় কলকারখানার সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় যে আজও জাপানে ও ভারতে উটজ শিল্প বিলুপ্ত হয় নাই, সে দিকে কি কেহ লক্ষ্য করিয়াছেন? একে ত দেশী হাতের তাঁতে যেরূপ কাপড় উৎপন্ন হয়, কলে সেরূপ কাপড় উৎপন্নই হয় না, তাহাতে আবার নানা কারণে হাতের তাঁতে অনেক সুবিধা আছে। ভারত সরকার এই তাঁতের সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রচারিত করিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত কারণগুলির উল্লেখ আছে।

(১) হাতের তাঁতের মূল্য অতি অল্প এবং একটি তাঁত অনেক দিন চলে।

(২) উৎকৃষ্ট কাপড়ে নানা নক্সায় যেরূপ নৈপুণ্য প্রয়োজন, তাহা কলে হইতে পারে না।

(৩) দেশী মোটা কাপড় অধিক টেকসহি বলিয়া কৃষকাদি তাহারই অধিক আদর করে।

(৪) দেশী তাঁতীর জীবনযাপনপ্রণালী অল্পব্যয়সাধ্য এবং মিহি কাপড় বুনিতে তাহার পুরুষপরম্পরাগত নৈপুণ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যুক্তপ্রদেশের শিল্পবিবরণে দেখা যায়, তথায় যে কাপড়ের ব্যবহার হয়, তাহার এক-তৃতীয়াংশ হাতের তাঁতে বুনা হয়। সুতরাং সে প্রদেশে এই শিল্প কোন মতেই নগণ্য নহে; কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাহার প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হইলেও অস্তিত্ব বিপন্ন হয় নাই। আর কেবল যুক্তপ্রদেশেই প্রায় ৫ লক্ষ লোক তন্তুবায়ের কার্য্যে জীবিকার্জ্জন করে এবং আরও ৫ লক্ষ লোক তাহাদের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ হাতের তাঁতে ভারতের একটিমাত্র প্রদেশে ১০ লক্ষ লোকের অন্নসংস্থান হয়।

হাতের তাঁতের কাযে আরও সুবিধা এই যে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্যবসা করা চলে। অনেক তন্তুবায় কৃষি-কার্য্যও করে, প্রয়োজনের সময় ও অবসরকালে বস্ত্রবয়ন করে; আর আপনার গৃহে পরিবারমধ্যে কায করে বলিয়া এ দেশে তন্তুবায় কারখানার অপেক্ষা অধিক সময় কায করিতে কাতর হয় না। অনেক সময় নিশীথে তাহার যন্ত্রের শব্দ পল্লীগ্রামে শ্রুত হইয়া থাকে। আবার পরি-বারস্থ স্ত্রীলোকরা গৃহকর্ম্মের অবসরকালে সেই কার্য্যে আবশ্যক সাহায্য করিতে পারে। সেই জন্যই হাতের তাঁতের বস্ত্রের পড়তা কম পড়ে; কারণ, তন্তুবায়কে শ্রমজীবীর পারিশ্রমিক দিতে হয় না, সে একরূপ বিনামূল্যেই শ্রম পায়। এ সব সুবিধা উটজ শিল্প ব্যতীত অন্য শিল্পে পাওয়া যাইতে পারে না।

বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় যে এ দেশের শ্রমশিল্প আজও বিনষ্ট হয় নাই, তাহাতেই বুঝা যায়, সেগুলির জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হইয়া যায় নাই। মান্দ্রাজের মিষ্টার চ্যাটার্টন এ দেশের শিল্পসম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মাদ্রাজে "সাউথ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে" তিনি এ দেশের বয়ন-শিল্পসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া-ছিলেন। প্রবন্ধটি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে কি ঘটিবে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না; কিন্তু অবস্থা দেখিয়া মনে হয়, ভারতে হাতের তাঁতে ও কাপড়ের কলে যে প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহাতে কলের অধিকার যত দূর বিস্তৃত হইবার হইয়াছে অর্থাৎ কলের কাপড়ে তাঁতের কাপড়ের কাট্‌তী যত দূর কমিবার কমিয়াছে। হাতের তাঁতের কাপড়ের কাট্‌তী আর কমিবে না, বরং বাড়িতেও পারে। কোন কোন প্রকার কাপড় হাতের তাঁত ছাড়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি দেশের লোকের রুচি পরিবর্ত্তিত না হয় অর্থাৎ দেশের লোক যদি বর্ত্তমানে যে সব কাপড়ের আদর করে, ভবিষ্যতে সে সকলের অনাদর না করে, তবে হাতের তাঁতের কায অচল হইবে না।

উটজ শিল্প ব্যতীত কোন দেশের দারিদ্র্যসমস্যার সমাধান হইতে পারে না। প্রতীচ্য ব্যবসাব্যবস্থায় দেশের

জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইতেছে। শ্রমজীবীরা পারিবারিক-জীবনের সুখাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছে—সমাজের অশেষ অপকার হইতেছে। এ সব কথা য়ুরোপের লোকও যে বুঝিতেছেন না, এমন নহে।

ভারতের মত আয়ার্লণ্ডেও শিল্পের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। সে অবনতির কারণও অনেকাংশে ভারতীয় শিল্পের অবনতির কারণের সহিত অভিন্ন। মিষ্টার ব্যালফোর স্বীকার করিয়াছেন, আয়ার্লণ্ডের দারিদ্র্যসঞ্জাত বহু অনাচারের মূল কারণ—বিলাতের বাণিজ্যনীতি। আয়ার্লণ্ডের শিল্পের অবনতিকারণসন্ধানের জন্য ২০ বৎসরেরও অধিক পূর্ব্বে এক সমিতিনিয়োগ হয়। সে সমিতি Rocess Committee নামে পরিচিত। সে সমিতি এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, শিল্পনাশে কৃষিকার্য্যে নির্ভরশীলতাই আয়ার্লণ্ডের দুর্দ্দশার কারণ। সে সমিতি আয়ার্লণ্ডের কৃষকদিগের জন্য বিবিধ উটজ শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতেই সে দেশের দারিদ্র্যসমস্যার সমাধানসম্ভাবনা দেখিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান যুদ্ধে উটজ শিল্পের উপযোগিতা ও উপকারিতা লোক আরও বুঝিতে পারিয়াছে ও পারিতেছে। এই বিষম লোকক্ষয়কর যুদ্ধের পর বর্ত্তমান ব্যবস্থায় য়ুরোপের পল্লীর অবস্থা কিরূপ হইবে? অথচ এবার সকলেই বুঝিয়াছেন, পরিত্যক্ত পল্লীতে আবার জনপ্রবাহ ফিরাইয়া কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধন করিতে না পারিলে দেশকে যদি খাদ্যশস্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় তবে ভবিষ্যতে আবার বিপদ্ ঘটিতেও পারে। সে জন্য পল্লীর উপযোগী উটজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

আর এই যুদ্ধে যে ধনক্ষয় হইতেছে, তাহার ফলে বড় বড় কলকারখানার জন্য অর্থেরও অভাব হইবার সম্ভাবনা। দিন দিন কলকারখানার বহর যেরূপ বাড়িতেছে, তাহাতে অগাধ মূলধন নহিলে আজকাল আর কলকারখানা চালান যায় না। যুদ্ধের পর অনেক দেশেই সেরূপ টাকা আর স্বচ্ছল থাকিবে না। ইহাও য়ুরোপের লোকের উটজ শিল্পের আদরের অন্যতম কারণ।

আবার এই যুদ্ধে দেখা গিয়াছে, একটি গোলায় বা বোমায়—গগন বা প্রান্তর হইতে নিক্ষিপ্ত একটি মাত্র অস্ত্রে বড় বড় কারখানায় কেন্দ্রীভূত কোটি কোটি টাকার পণ্যোৎপাদক উপাদান দেখিতে দেখিতে চূর্ণবিচূর্ণ—বিনষ্ট হইয়া যায়! কিন্তু এক একটি পল্লীর সর্ব্বনাশসংসাধন ব্যতীত কোন দেশের একটি উটজ শিল্পের উচ্ছেদ সাধিত হইতে পারে না।

এ সব কথা য়ুরোপ এত দিন ভাবে নাই—কিন্তু এবার ভাবিতেছে। কারণ, এই যে যুদ্ধ—ইহাতে য়ুরোপে অচিন্ত্যপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইবে। তাই মিষ্টার লয়েড্ জর্জ্জ বলিয়াছেন, এ যুদ্ধ অল্পকালস্থায়ী মেঘদুর্দ্দিন নহে—ইহা ঘূর্ণাবর্ত্তের মত য়ুরোপীয় সমাজের ও অর্থনীতিক অবস্থার অনেক আলঙ্কারিক অংশ বিনষ্ট করিবে; ইহা ভূমিকম্পের মত য়ুরোপীয় সমাজের ভিত্তি পর্য্যন্ত বিচলিত করিবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এইবার য়ুরোপ ভারতের অনেক ব্যবস্থার স্বরূপ—সে সকলের উপকারিতা ও উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারিবে; এবার আবার য়ুরোপে অবজ্ঞাত উটজ শিল্পের আদর হইবে।

কৃষি।

(৩)

মাটি।

গতবারে আমি নানাপ্রকারের মাটির কথা বলিব বলিয়াছিলাম। বৈজ্ঞানিক—বিশেষতঃ পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় সোজা কথায় বলা বড় কঠিন, চলিতভাষায় উহার প্রতিশব্দ পাওয়া যায় না। আবার স্থানবিশেষে চাষীরা বিভিন্নপ্রকার মাটির এক একটা নাম করে; কিন্তু ঐ শব্দগুলি নিতান্ত গ্রাম্য ও সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ বলিয়া অন্য স্থানের লোক উহা বুঝিতে পারে না। আমরাও চাষীদিগের সকল শব্দের সহিত পরিচিত নহি। যাহা হউক, সেই জন্য আমি মোটামুটিভাবে মাটির কথা আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে চাষীদের মুখে সচরাচর তিন রকমের মাটির কথাই শুনা যায়; যথা—(১) বেলে-মাটি, (২) আঁটালে-মাটি, (৩) দো-আঁশ-মাটি। ইহা ভিন্ন আরও দুই প্রকারের মাটি আছে; যথা—খড়েল-মাটি; (২) পচাল-মাটি। খড়েল-মাটিতে খড়ির (Carbonate of Lime) ভাগ বেশী থাকে। পচাল-মাটিতে উদ্ভিজ্জের পচানীর ভাগই অধিক। খাস বাঙ্গালায় খড়েল-মাটি অতি অল্পই আছে। নিম্নবঙ্গে পচাল-মাটির অভাব নাই, কিন্তু চাষীরা উহাকে সচরাচর দো-আঁশ-মাটিই বলে।

বেলে-মাটি।

আমরা প্রথমে বেলে-মাটির কথাই বলিব। যে মৃত্তিকায় বালী বা বালুকার ভাগ অধিক, তাহাকেই বেলে-মাটি বলে। অবশ্য ইহার সবই বালী নহে। বালী ভিন্ন এই রকমের জমীতে আরও কিছু থাকে। বেলে-মাটি চেনা খুব সহজ। রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রভাব ইহার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন সাধিত করিতে পারে না। রৌদ্রের তেজে বেলে-জমী ফুটিফাটা হয় না, এমন কি, উহার উপর একটু দাগও পড়ে না। কারণ, বালী কিছুতেই পচে না বা পরিবর্ত্তিত হয় না। এ জমীতে চাষ দেওয়া বড়ই সুবিধাজনক। বেলে-জমী খুব আল্‌গা; উহাতে সহজেই লাঙ্গল ও কোদালী বসিয়া যায়, সুতরাং চাষীদিগের এই জমীতে চাষ দিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এই জমী সহজে উত্তপ্ত হয়, কারণ বালীর আপেক্ষিক উত্তাপ একপঞ্চমাংশ (·২) মাত্র। বেলে-জমীর উপর দিয়া খালি পায়ে হাঁটিতে গেলে বিশেষ কষ্টকর হয় না, কেবল রৌদ্রের সময় এই জমী অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া পা সহজেই উত্তপ্ত হয়। বেলে-জমী সর্ব্বদাই শুষ্ক থাকে, উহাতে কাদা হয় না। বেলে-মাটি জল ধরিয়া রাখিতে পারে না; উহাতে জল পড়িলে সেই জল মাটির ভিতর দিয়া গড়াইয়া চলিয়া যায়। উত্তাপের আধিক্যবশতঃ বেলে-জমীর জল বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়, জল বাষ্পাকারে উড়িতে থাকে বলিয়া সিক্ত বেলে-মাটি খুব ঠাণ্ডা হয়। বেলে-জমীতে যে চাষ হয় না, এ কথা সত্য নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সূর্য্যতাপে বালুকা সহজে উত্তপ্ত হয় বলিয়া বেলে-জমীর ফসল শীঘ্র পাকিয়া যায় এবং ফসল অল্প হয়। ইহা অবশ্য সাধারণ নিয়ম। কিন্তু একটা বিশেষ কথা আছে। যে অঞ্চলে অত্যন্ত অধিক বৃষ্টি হয়, জমী শুকাইবার অবকাশ পায় না, সে অঞ্চলে বেলে-জমীতে ফসল বেশ ভাল হয়। আবার বালুকার সহিত যদি উর্ব্বরাশক্তিপ্রদ জিনিস থাকে, তাহা হইলে বেলে-জমীর ফসল ভালই হয়। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, দামোদর প্রভৃতি নদীর তীরস্থ ভূমির মৃত্তিকা বালুকাবহুল। কিন্তু ঐ সব নদীচরে সোণা ফলে। তাহার কারণ, নদীর পলির সহিত ঐ বালী এমনভাবে মিশ্রিত যে, উহার উর্ব্বরাশক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বালীর সহিত উদ্ভিদের খাদ্য অত্যন্ত আল্‌গাভাবে মিশ্রিত থাকে। বালুকাপ্রধান মৃত্তিকা সহজে জলও শুষিয়া লয়। ঐ সকল চরভূমিতে উদ্ভিদরা সহজে শিকড় নামাইতে পারে, কারণ, বেলে-জমী কখনও কঠিন হয় না। উদ্ভিদ সুদীর্ঘ শিকড়দ্বারা সেই জমীতে আল্‌গাভাবে জড়িত আহার্য্যপদার্থ শুষিয়া লইতে সমর্থ হইয়া থাকে। সেই জন্য বর্ষাবহুল বা বিস্তীর্ণ নদীর সন্নিহিত বেলে-মাটিতে ভাল ফসল হইয়া থাকে। কিন্তু যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম হয় ও যে অঞ্চলে জলাভাব অধিক, সে অঞ্চলে বালুকাবহুল ভূমি প্রায় মরুতুল্য হইয়া পড়ে। বেলে-জমীর একটা বিশেষ গুণ এই যে, ইহাতে জলসেচন করিলে বেশ সুফল ফলিয়া থাকে। সেচের জল যদি জমীর সকল স্তরে গড়াইয়া যায় এবং জমীতলবাহী জলের বা পয়ঃনালীর জলের সহিত মিশে, তাহা হইলেই সুফল ফলিবার কথা। বেলে-জমীতে ঠিক তাহাই হয়। সেচের জল যখন জমীর ভিতর দিয়া যায়, তখন উদ্ভিদের শিকড়ের সহিত ঐ জলের মিলন হয়। ফলে, জলে যে সমস্ত উদ্ভিদের খাদ্য ভাসমান বা মিশ্রিত থাকে, তাহা জমীতেই থাকিয়া যায়। আমার মনে হয়, অনেক সময় নর্দ্দামা প্রভৃতির পচানী জল বেলে-জমীতে সেচন করিলে সেই জমীর শস্য খুব ভাল হইয়া থাকে। আর একটা কথা মনে রাখিতে

হইবে; কোন কোন ফসল বেলে-জমীতেই ভাল হয়। বেলে-জমীতে ভাল কারকিৎ করা যায়।

বালুকাবহুল মৃত্তিকায় উদ্ভিদের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে থাকে না সত্য, কিন্তু অন্য দিকে উহার উপকারিতা সামান্য নহে। ঐরূপ বেলে-মাটিতে "আশুতি ফসল" উৎপাদন করা সহজ এবং উচ্চ অঙ্গের কৃষি অবলম্বন করা সুবিধাজনক, কারণ বালুকাবহুল মৃত্তিকায় শস্যাদি সহজে শিকড় প্রবিষ্ট করিয়া দিতে পারে। ঐ মাটি নরম। আশুতি ফসল উৎপন্ন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কৃত্রিম উপায়ে ঐ মাটির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিয়া লইতে হয়। সুতরাং বালুকাবহুল মৃত্তিকায় humusএর ভাগ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। Humus উদ্ভিদের পচানী। যে প্রকার উদ্ভিদের পচানী মাটিতে মিশাইয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর জমীর উৎপাদিকাশক্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। বেহারের কোন কোন অঞ্চলে কৃষকরা বাগান হইতে পাতা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া উহা মাটির মধ্যে পচাইবার জন্য পুঁতিয়া রাখে। উহা মাটির মধ্যে পচিয়া গেলে তবে তাহা তুলিয়া জমীতে দেওয়া হয়। প্রায় বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গা, কোটচাঁদপুর, বাদুড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষকরা জমীতে "ঢাল" মিশাইয়া দিত। পূর্ব্বে ঐ সকল অঞ্চলে চিনির কারখানা ছিল। চিনি প্রস্তুত করিবার সময় যে ঝুড়িতে বা নাদায় গুড় রাখিয়া তাহা হইতে মাত্ ঝরাণ হইত। ঐ মাত্ ভাল করিয়া ঝরাইবার জন্য ঝুড়ীর ও নাদার উপর 'পাটা শেওলা' দেওয়া হইত। ঐ পাটা শেওলা ঝুড়ী ও নাদার উপর শুকাইয়া গোলাকার ঢালের মত হইত বলিয়া উহাকে লোকে 'ঢাল' বলিত। ঐ ঢাল মাটির সহিত মিশ্রিত হইলে জমীর উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি পাইত। উহা জমীতে দিলে humus দেওয়ায় কাজ হইত। সুতরাং এ দেশের কৃষকরা যে জমীতে সার দিতে জানে না, তাহা নহে। পূর্ব্ববঙ্গে যে সকল স্থান ডুবিয়া যায়, সে সকল স্থানের জমীতে উৎপন্ন ঘাস ও অন্যান্য আগাছা জলে পচিয়া জমীর মাটির সহিত কতক মিশিয়া যায়, কতক জলে ধুইয়া যায়। মাটির সহিত যাহা মিশে, তাহা জমীর উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। ইহা ভিন্ন ঐ সকল জমীতে পলি পড়িয়াও জমীর উৎপাদিকাশক্তি বাড়ায়। যাহা হউক, বেলে-জমীতে এই প্রকার উদ্ভিদের পচানী সার দিলে ভাল হয়। জমীদারদিগের কৃষকদিগকে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া উচিত।

আর এক উপায়ে বেলে-জমীতে উদ্ভিদসার, humus মিশান হইয়া থাকে। ইংরেজীভাষায় উহাকে Green Manure বা সবুজ সার বলা হয়। বালুকাবহুল জমীতে শ্বেতসর্ষপ, সোরগোঁজা, শ্যামাঘাস প্রভৃতি বপন করা হয়। দুই তিন মাস ঐ গাছ বর্দ্ধিত হইলে তখন উহা জমীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহা মাটির ভিতর সামান্য গর্ত্ত করিয়া তাহাতে উহা চাপা দিয়া রাখে। আবার কেহ জমীতে লাঙ্গল দিয়া মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলে। প্রথমোক্ত উপায়টিই ভাল; কারণ, তাহা হইলে উহার সারাংশ বৃষ্টির জলে ধুইয়া যাইতে পারে না। যে সকল গাছের ফল সিমের ন্যায় হয় (যথা—অড়হর, মটর, কালকাসিন্দা প্রভৃতি), তাহা বেলে-জমীতে উৎপন্ন করিয়া কতকটা বর্দ্ধিত হইলে মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া উচিত। উহাতে দুইপ্রকার সুফল ফলে। প্রথমতঃ উহাতে মৃত্তিকার সহিত উদ্ভিদের আবশ্যক অনেক জিনিষ মিশে; দ্বিতীয়তঃ উহাতে ভূমিতে নাইট্রোজেন মিশ্রিত হয়। ঐ জাতীয় উদ্ভিদের বায়ুমণ্ডল হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিবার বিশেষ শক্তি আছে। ঐ জাতীয় গাছ যদি জমীর মাটির সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে জমীতে নাইট্রোজেনের ভাগ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কালকাসিন্দা প্রভৃতি কতকগুলি আগাছাকে আমরা যত অকর্ম্মণ্য মনে করি, উহা বাস্তবিক তত বেদরকারী আগাছা নহে। কিন্তু এই সিম্বীজাতীয় উদ্ভিদ লাগাইতে এবং আবশ্যকমত বর্দ্ধিত করিতে বিলম্ব ঘটে, সেই জন্য কৃষকরা সর্ষপের গাছ লাগাইয়া তাহার চারা এক ফুট বড় হইলেই জমীর মাটির সহিত উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। আমাদের দেশের জমীদারদিগের ও কৃষকদিগের দৃষ্টি এই দিকে একটু আকৃষ্ট করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহারা অধিকতর লাভবান্ হইবে, আশা করা যায়। ইহা ভিন্ন গোময় ও গোশালার আবর্জ্জনা সাররূপে ব্যবহার করিলে বিশেষ সুফলের আশা করা যায়। আমাদের দেশের অনেক সার কৃষকদিগের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যনিবন্ধন নষ্ট হইয়া যায়। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

বিলাতের রয়েল এগ্রিক্যাল্চারাল্ সোসাইটীও ওবার্ণ এবং বেডফোর্ডশায়ারের বালুকাবহুল ভূমিতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শ্বেতসর্ষপ সোরগোঁজাজাতীয় উদ্ভিদক্ষেত্রে উৎপাদন করিয়া তাহা মাটির সহিত মিশাইয়া দিলে ফসল ভাল হয়। তাহার কারণ, ঐ সকল উদ্ভিদ জমীতে পচিলে বালুকাবহুল জমীতে জলীয় ভাগ অধিক থাকে। ফসলের পক্ষে ভূমিতে রস থাকা আবশ্যক, নাইট্রোজেন থাকাও আবশ্যক। তবে স্থানবিশেষে ও ক্ষেত্রবিশেষে রসের প্রয়োজনীয়তা অধিক বোধ হয়। আবার ফসলবিশেষেও সারের তারতম্য করা আবশ্যক। সে সকল কথার আলোচনা পরে করা যাইবে।

আমাদের এই দরিদ্র দেশে কেবলমাত্র সারের জন্যই জমীতে শ্যামাঘাস, সোরগোঁজা, শ্বেতসর্ষপ প্রভৃতির চাষ করিয়া উহাতে গো-মেষ-মহিষাদি চরিতে দিলে সুবিধা হয়। পশুচারণে যদিও সবুজ সারের কিছু হানি হয় সত্য, কিন্তু পশুদিগের মলমূত্রাদি সেই ক্ষতি অংশতঃ পূর্ণ করিয়া দেয়। কৃষির ন্যায় পশুপালনও নিতান্ত আবশ্যক। পশুরা উপরের গাছগুলি খাইয়া ফেলিলেও উহার যে সমস্ত শিকড় মাটির মধ্যে থাকে, তাহাও জমীর উৎপাদিকাশক্তি অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে। জমীতে ঘাস জন্মাইবার ব্যবস্থা

করিলেও অনেক সুবিধা হয়। যে জমীতে বালুকার ভাগ অত্যন্ত অধিক, সেই জমীতে কোন প্রকারে দুই চারি বৎসর ঘাস জন্মাইয়া দিতে পারিলে সে জমী চাষের যোগ্য হয়; ইহা এ দেশের চাষীরাও জানে।

আসল কথা,—উদ্ভিদের পচানীই বেলে-জমীর উন্নতি-সাধনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। আমরা অনেকের মুখে শুনিতে পাই যে, তাহাদের ভিটায় জমীতে বড় বালী। সেই জন্য তাহাতে কোন তরীতরকারী কিছুই জন্মে না। আমাদের মনে হয় যে, তাঁহারা যদি একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ জমীতে বেশ ভাল ফসল উৎপন্ন করিতে পারেন। বিনা চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কখনই কিছু লাভ করা যায় না।

বেলে-জমীর একটি বিশেষ গুণ এই যে, বৃষ্টি হইলে এই জমী চষিয়া তাহাতে ফসল বপন করা যায়। বালুকা-বহুল জমীর স্বাভাবিক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক, সেই জন্য ইহাতে ফসল শীঘ্রই উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই জমীর একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, ইহাতে উদ্ভিদের খাদ্য বিশেষভাবে শুষিয়া লয় না। সেই জন্য ইহাতে অধিক সার একেবারে দেওয়া উচিত নহে, মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প করিয়া সার দেওয়াই কর্ত্তব্য।

আঁটালে-মাটি।

আঁটালে-মাটি বেলে-মাটির বিপরীত গুণবিশিষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত আঁটালে-মাটি দেখা যায়, তাহা খাঁটি আঁটালে-মাটি নহে, অনেক স্থলে তাহাতে কিছু কিছু বালীও থাকে; ইহা ভিন্ন কোথাও কিঞ্চিৎ উদ্ভিদের পচানী, কোথাও কিছু ক্ষারও মিশান থাকে। রাসায়নিক ভাষায় খাঁটি আঁটালে-মাটিকে Hydrated Silicate of Aluminium বলা যায়। Hydrated শব্দের অর্থ সজল বা জলযুক্ত। আঁটালে-মাটি পুড়াইয়া যদি একেবারে ইট করা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে জলীয় অংশ একেবারে উড়িয়া যায়; তখন উহা Silicate of Aluminium থাকে। আঁটালে-মাটি হইতে যদি একবার জলীয় অংশ একেবারে নির্ব্বাসিত করা যায়, তাহা হইলে পুনরায় আর উহাকে কাদায় পরিণত করা যায় না। ইটকে চূর্ণ করিয়া ১লা নম্বর সুরকী করিলেও আর উহা ঠিক কাদায় পরিণত হয় না।

কাদা বা আঁটালে-মাটিতে উদ্ভিদের খাদ্য অত্যন্ত অধিক পরিমাণে থাকে। বলা বাহুল্য, আমরা খাঁটি আঁটালে-মাটি বা Hydrated Silicate of Aluminiumএর কথা বলিতেছি না। ক্ষেতে খামারে যে আঁটালে-মাটি দেখা যায়, তাহারই কথা বলিতেছি। আঁটালে-মাটিতে অনেক পরিমাণে পটাশ পাওয়া যায়। উহা উদ্ভিদের একটি প্রধান আবশ্যক পদার্থ। জল কম হইলে আঁটালে-মাটি বড় কঠিন হয়, উহাতে সহজে লাঙ্গল বিধে না,—কোদালীর কোপ বসে না। রৌদ্রে এই মাটি অত্যন্ত ফাটিয়া যায়। খুব বৃষ্টির পরও দুই তিন দিন অতীত না হইলে কঠিন আঁটালে-মাটিতে চাষ দেওয়া যায় না। তবে যে ক্ষেতে বৎসর বৎসর চাষ দেওয়া হয়, সে ক্ষেতে শস্যের পাতালতা পড়িয়া পচিয়া মাটি একটু নরম হইয়া যায়। আঁটালে-মাটির ক্ষেতে কতকগুলি শস্য বড় ভাল ও সারবান হয়। তবে আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একেবারে শক্ত আঁটালে-মাটি শস্যোৎপাদনের অনুকূল নহে। আঁটালে-মাটিতে উদ্ভিদের পচানীসার (humus) মিশাইয়া মাটিকে নরম করিয়া লইতে হয়।

দো-আঁশ-মাটি।

দো-আঁশ-মাটিই কৃষির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। দো-আঁশ-মাটিতে (loam) বালী ও আঁটালে-মাটি বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে মিশাইয়া থাকে। তবে উভয় প্রকার মাটির ভাগ সকল স্থানে সমান থাকে না, কোথাও বালীর ভাগ অধিক থাকে, আবার কোথাও বা আঁটালে-মাটির ভাগ অধিক থাকে। যে জমীতে আঁটালে-মাটির ভাগ অধিক থাকে, সেই মাটিকে আঁটালে-দো-আঁশ বলা যাইতে পারে; আর যে মাটিতে বালির ভাগ অধিক থাকে, সেই মাটিতে বেলে-দো-আঁশ নাম দেওয়া যাইতে পারে। পদ্মা, মেঘনা, রূপনারায়ণ, দামোদর প্রভৃতি নদীর তীরস্থ ভূমি প্রায়ই বেলে-দো-আঁশ। আসল কথা, যত জমীতে চাষ হয়, তাহা সবই এক হিসাবে দো-আঁশ। কারণ, খাঁটি বালুকাবিস্তারে বা আঁটালে-মাটিতে ফসলই জন্মে না। তবে যাহাতে বালীর ভাগ অত্যন্ত অধিক, তাহাকেই আমরা বেলে-জমী বলি। যাহাতে আঁটালে-মাটির ভাগ অন্ততঃ বার আনা বা তাহারও অধিক, তাহাকেই আঁটালে-মাটির জমী বলি। আর উভয় মাটির ভাগ এগার আনা, পাঁচ আনা বা দশ আনা, ছয় আনা, তাহাকেই দো-আঁশ মাটি বলি। নদীতীরস্থ দো-আঁশ-মাটিতে পলিমিশ্রিত থাকে বলিয়া উহাতে জান্তবপদার্থ থাকে। নদীর ঘোয়াট জলে উদ্ভিদের পচানী, মৎস্যাদি জলজন্তুর গলিত দেহাবশিষ্ট পলির সহিত মিশিয়া যায় বলিয়া পলির উর্ব্বরাশক্তি এত অধিক। দো-আঁশ-মাটিতে সার দিলে শস্যের তেজ খুব বৃদ্ধি পায়। উহাতে প্রযুক্ত সার প্রায় নষ্ট হয় না; আর যে জমীতে পলি পড়ে, তাহাতে সার না দিলেও ক্ষতি হয় না। নদীর চরভূমিই তাহার প্রমাণ।

[ক্রমশঃ।

বৈষ্ণবধৰ্ম্ম।

। শ্রীতারা।।

গৌর-নিতাই।

নারদাদি ভক্তবৃন্দের চরণ স্মরিয়া।
শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম আমি কহি প্রকাশিয়া॥
শ্রীগুরুআশীর্ব্বাদে পূর্ণ হব কাম।
জগন্নাথ মোর পূরাবেন মনস্কাম॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় গৌরভক্তগণ।
জয় শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ জয় শ্রীশচীনন্দন॥

ব্রাহ্মণের আদেশে আমি শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমি প্রথমেই ভূদেব ব্রাহ্মণগণকে ও বৈষ্ণবগণকে প্রণাম করিতেছি।

কৃষ্ণ বিনা কৃষ্ণভক্তি কাহার শকতি
বুঝায়? দেয় কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি অমেয়।
বিনা কৃষ্ণকৃপা বুঝিবারে কৃষ্ণপ্রেম
নাহিকো শকতি কারো। গুরুকৃপাবলে
যদি পায় কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ করে কৃপা
তারে।

প্রণবস্বরূপ ব্রহ্মণ্যদেবকে প্রণাম করিতেছি এবং মোক্ষপ্রদ জীবের পাপতাপহর শ্রীবৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়া শ্রীহরির চরণে কৃপা প্রার্থনা করিতেছি। সংসারী বদ্ধজীব নিয়ত কামরাগে অনুক্ষণ মোহগ্রস্ত,—এ হেন জীব কি করিয়া শ্রীভগবানের অতুল চরিত্র ও ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিবে? তবে যদি ব্রাহ্মণের ও শ্রীগুরুকৃপায় এই দুস্তর ভবসাগরে শ্রীকৃষ্ণচরণতরী অবলম্বন করিতে পারি, তাহা হইলে সেই চরণকৃপায় শ্রীধর্ম্মের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতে পারিব। আজ আমিই ধন্য, কেন না, আজ পত্রে পত্রে অক্ষরে অক্ষরে—প্রত্যেক কালির রেখায় রেখায় আমি শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করিয়া অদ্য মোক্ষধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব।

বৈষ্ণবধর্ম্মকে কেন মোক্ষধর্ম্ম বলিলাম?—কারণ, যোগমায়া শ্রীবিষ্ণুকেও আচ্ছন্ন করেন। কিন্তু বিষ্ণুর ভক্ত সেই যোগমায়াকেও পরাভব করিয়া অনায়াসে মোক্ষলাভ করে। "অনায়াসে জীব পায় শ্রীহরিচরণ।"

সনাতনকাল হইতে যে ধর্ম্ম ও যে উপাসনা আমাদের দেশে চলিয়া আসিয়াছে, যে উপাস্যদেবতার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া আর্য্যেরা জীবন ধন্য করিয়াছেন, সে ধর্ম্ম কি, সে উপাসনা কি এবং সেই উপাস্য কি?

চম্পক-সোণ-কু- সুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনমোহন ভাঙনী রে॥
জয় শচীনন্দন রে।
ত্রিভুবনমণ্ডন কলিযুগকাল-
ভুজগ-ভয়খণ্ডন রে।
"জয় শচীনন্দন ত্রিভুবনবন্দন
কলিযুগকাল-ভুজগভয়খণ্ডন॥"

কবি শচীনন্দন শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন, কলিযুগ-কালভুজগের ভয় হইতে একমাত্র উদ্ধারকারী জয় জয় শ্রীশচীনন্দনকে বন্দনা করি।

ইহাতেও বুঝাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বা নিমাই পণ্ডিত এমন কি জিনিষ জগৎকে দিয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কলিযুগে ক্রুরসর্পবৎ যখন জীবাদি হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ হইবে, তখন মহাপ্রভুদত্ত ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীব সর্ব্বভয় দূর করিবে। সেই ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম।

শ্রীমদ্ভাগবতেই আমরা প্রথম এই বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যা পাই। দ্বাপরে মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীমন্ ভগবান্ শুকদেব এই বিষ্ণুকথামৃত ভাগবতগ্রন্থ শ্রবণ করান এবং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণদ্বারাই তিনি অচিরে বিষ্ণুলোক বা মোক্ষত্বপ্রাপ্ত হন।

আদিকালে নারদাদি ঋষিগণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং বিষ্ণুনামকীর্ত্তন, বিষ্ণুনামগান করিয়া জগৎ ভ্রমণ করিতেন।

মধ্যযুগে অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির সময়ে ভগবান্ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ আপনার সৃষ্টিকে রক্ষা করিবার জন্য এবং ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য জগতে শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। কারণ

তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে, যখন ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হয় এবং দুষ্কৃতেরা যখন জগতে অত্যাচার করিতে থাকে, সেই সময়ে ধর্ম্মসংস্কার ও প্রজার মঙ্গলের জন্য ভগবান্ জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ভগবান্ বিষ্ণুই সৃষ্টির আদি। শাস্ত্রে ইঁহাকে মহাবিষ্ণু বলে। ইনিই জগতে "ত্রিরূপে" প্রকাশিত হন। তাঁহার সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মারূপে, তাঁহার লয়শক্তি শিবরূপে এবং স্থিতি-শক্তি বিষ্ণুরূপে জগতে কার্য্য করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, আমরা তিন ভেদ দেখিতে পাই। অথচ তিন এক। সে কিরূপ? যেমন রাম যখন পুত্রোৎপাদন করেন, তখন ব্রহ্মা; যখন পুত্রকে লালনপালন ও রক্ষা করেন, তখন বিষ্ণু এবং যখন ঐ পুত্রকে নাশ করেন, তখন শিব।

এখন কথা এই যে, প্রভু জন্ম দিয়া ও লালনপালন এবং রক্ষা করিয়া কেন আবার তাঁহাকে নিধন করিয়া থাকেন? এই নাশকার্য্য দেখিলে মনে হয় না যে, একই বিষ্ণু ত্রিধারা হইয়া আপনার শিবশক্তিপ্রভাবে জগতের জীবকে নিধন করেন।

তিনি ভাগবতে পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, "আমি শিব হইতে অভিন্ন। হর ও হরি এক, যে মূঢ় আমাকে ও হরকে বিভিন্ন দেখে, সে মূঢ় ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অধর্ম্মকেই গ্রহণ করে।"

তবে আপনার সৃষ্টিকে আপনি নাশ করেন কেন? হিন্দুদর্শনে কোন বস্তুর নাশ হয় না। রূপান্তর মাত্র হয়। জীব বিষ্ণুমায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া অনবরত জগতে বিচরণ করিতেছে। এই বিচরণ করাই সৃষ্টিরহস্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিষ্ণুই জগতের মূল। বিষ্ণুর ধ্যানেও এই কথা রহিয়াছে। তিনি সহস্রশীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাদ অর্থাৎ তিনি বিশ্বে ওতঃপ্রোতভাবে রহিয়াছেন। তিনি সবিতৃমণ্ডলী মধ্যবর্ত্তী। প্রণামে আমরা দেখিতে পাই, তিনি ব্রহ্মণ্যদেব—জীবের একমাত্র উপাস্য; গোরূপা পৃথিবী এবং ব্রাহ্মণরূপ জীবের নিয়ত হিত করেন। বেদাদিতে ও উপনিষদেও এই বিষ্ণুকেই প্রধান উপাস্য বলা হইয়াছে। ঋক্‌বেদের বহুস্থানে এবং সামবেদে, অথর্ব্ব-বেদে সর্ব্বত্র বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিষ্ণু হইতেই বৈষ্ণবশব্দের উৎপত্তি। শতপথ ব্রাহ্মণেও রহিয়াছে,—

তৎ বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ স দেবতানাং শ্রেষ্ঠোঽভবেৎ।
তস্মাদাহুঃ বিষ্ণুর্দেবতানাং শ্রেষ্ঠঃ ইতি॥

পদ্মপুরাণাদিতে এই বিষ্ণু-উপাসনার কথা রহিয়াছে। উপাসনাভেদ বিচার করিতে বসিয়া ঐ কথা ভাল করিয়া বলিব।

বিষ্ণুই আমাদিগের প্রধান উপাস্যদেবতা এবং তিনিই সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কারণাতীত ব্রহ্ম। তাঁহা হইতেই এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি মহাভক্তগণও বিষ্ণুনামমাহাত্ম্যের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করিয়াছেন।

যখন ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতবর্ষ নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভারতবর্ষ নির্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সমগ্র দেশে ধর্ম্মের মহাগ্লানি উপস্থিত হয়। বুদ্ধের আগমনে সেই গ্লানিগ্রস্ত ধর্ম্মও লুপ্ত হইয়া যায়। পরিশেষে শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য আবার আর্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মবিপ্লবে ভারতের ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়া কতকগুলি সামাজিকধর্ম্মে পরিণত হয়। উহার ফলে আর্য্যদিগের মধ্যে বহুতর সমাজের উদ্ভব হয়। সেই সময়ে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, শ্রীমৎ অদ্বৈত মহাপ্রভু গঙ্গাগর্ভে আকণ্ঠনিমজ্জিত হইয়া প্রার্থনা করেন, "হে বিষ্ণু! হে কৃষ্ণ! তোমার নিজবাক্যানুযায়ী জগতে ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য অবতীর্ণ হও, নতুবা জগৎ নীচধর্ম্মে প্রকৃত উপাস্য ভুলিয়া ক্রমেই নিরয়গামী হইতেছে।" তাঁহার আহ্বানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে জগতে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য অবতীর্ণ হন।

জীবের মঙ্গলের জন্য—মহাপাপ হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য ভগবান্ আপনার ভবভয়হারীনামে প্রচার করিবার জন্য জগতে শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। তিনি

আপনি হইয়া বিষ্ণু, বিষ্ণুনাম
করেন প্রচার।
নিজ নাম নামস্বাদে, ভক্তিধর্ম্ম
দেয় জনে জনে।
আচণ্ডালে দেন ভক্তি, নাহি তাহে
বাদ ও বিচার।
আপনি উপাস্যদেব, আপনার
করে উপাসনা।
নাম-মন্ত্রে দিয়ে দীক্ষা, জীবে দেয় মোক্ষ-শিক্ষা,
নাম-ভক্তি বিলায় জনে জনে, নাহি
করি বিচারণা।

শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত :—

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণ বলরাম।
কোটি সূর্য্য চন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর শ্রীনিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমঃ নাশ করি করে বস্তু তত্ত্বজ্ঞান॥

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা-আদি এই সব॥

এই কৃষ্ণ কে?—

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে দশম অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিতেছেন:—

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্ম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ।

কৃষ্ণ এই বস্তু। পূর্ব্বে যাঁহাকে মহাবিষ্ণু বলিয়াছি, এই কৃষ্ণও তিনি এবং নবদ্বীপে যিনি—

আরে মোর গোরা দ্বিজমণি।
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধরণী॥
রাধানাম জপে গোরা পরম যতনে।
সুরধুনী-ধারা বহে অরুণ নয়নে॥

পূর্ব্বে 'জয় শচীনন্দন রে' বলিয়া যাঁহাকে স্তব করিয়াছি, যিনি কলির জীবকে হরিনাম প্রদান করিবার জন্য নরদেহ ধরিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দনই দেবকীনন্দন—যশোদা-দুলাল।

বিষ্ণু-উপাসনা।

বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্বজীব রহিয়াছে এবং সর্ব্বজীবই বিষ্ণুময়। তিনিই দেবাদিদেব ও সারাৎসার, জগতের অব্যক্তকারণ ব্রহ্ম।

যঃ ষড়ৈশ্বর্য্যঃ পূর্ণঃ স ইহ ব্রহ্ম নিরূপণে ভগবানেব। ভগমৈশ্বর্য্যমস্তীতি ভগবান্। ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ যিনি, তিনিই ভগবান্। ভগং ঐশ্বর্য্যং অস্তি ইতি ভগবান্। ঐশ্বর্য্য কি?

উৎপত্তিপ্রলয়ভূত ভূতের গতাগতিসম্বন্ধে জ্ঞানই ঐশ্বর্য্য। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে বিদিত আছেন যিনি, তিনি ভগবান্। সৃষ্টিস্থিতি ও লয়ের কারণ বা উহার অতীত যিনি, তিনিই জগতের আদিকারণ।

প্রথমে সৃষ্টি অব্যক্ত ছিল, পরে ব্যক্ত হইল। আদিতে সৃষ্টিতে কিছুই ছিল না, জগৎ ঘন কুজ্ঝটিকাপূর্ণ, ঈষৎ আলোকময় ছিল। হঠাৎ জগতকারণের স্ব-ইচ্ছায় সে আলোক দ্বিধা বিভক্ত হইল। এই আলোকই বিভক্ত হইয়া এক দিকে সূর্য্যের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও বায়ু সৃজিত হইল। তেজ, বায়ু ও ব্যোম, পরস্পর ঐ ঘন কুজ্ঝটিকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তরল জলের সৃষ্টি করিল। ঐ জলরাশি তেজদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কিয়দংশ ক্লেদাকার ভূমিতে পরিণত হইল এবং অপর ভাগ জলই রহিল। ঐ জলরাশিতে সৃষ্টির আদিকারণ বা বিষ্ণু শয়ন রহিলেন। তাঁহার নাভিপদ্ম হইতে সৃষ্টিশক্তি ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল। ব্রহ্মা তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কে আমায় সৃষ্টি করিল এবং আমার কর্ত্তব্য কি? তখন তিনি ঐ নিদ্রাগত বিষ্ণুর উপাসনা করেন।

যে মূলকারণ সৃষ্টির কারণ, তিনিই বিষ্ণু। প্রথমেই তাঁহার উপাসনার আরম্ভ। প্রতি যুগেই তিনি এমনই করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। পূর্ব্বেও এই কথা বলিয়াছি।

ব্রহ্মা নিয়ত চক্ষু মুদিত করিয়া কাহাকে ধ্যান্ করেন? আর চিরযোগী শিবই বা কাহার উপাসনা করেন? ব্রহ্মা মানসপদ্মে শ্রীবিষ্ণুর আসন করিয়া তাঁহাকেই পূজা করেন এবং শিবও হরি ধ্যান, হরি জ্ঞান, হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া নিয়ত যোগে রত হন।

এক দিন বৈকুণ্ঠে বিশ্বপতি নারদকে বলিয়াছিলেন, নারদ আমাকে সঙ্গীত শুনাও। নারদ আপনার বীণা লইয়া সুমধুর হরিনাম কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কিন্তু তাললয়-মানাদি অভাবযুক্ত সঙ্গীতশ্রবণে বিষ্ণুর কিছুমাত্র প্রীতি উৎপন্ন হইল না; তিনি নারদকে বলিলেন, 'বৎস! এখনও তোমার সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা হয় নাই।' নারদ বিস্মিত হইলেন। ভগবান্ স্মরণ করামাত্র মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে রাগরাগিণীগণও উপস্থিত হইলেন। শিব সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সেই সঙ্গীতে বিশ্বচরাচর মুগ্ধ হইল, বসুন্ধরা তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল। পশুপক্ষী, তরুলতা সে নৃত্যে যোগদান করিল। স্বয়ং বিশ্বপতি শিবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "হর, তুমি ও আমি অভিন্ন। তুমি আজ আমায় আনন্দ দিয়াছ। যিনি জগতকারণের রহস্যপূর্ণ সৃষ্টিলীলা কীর্ত্তন করেন, তিনিই আমার অতি প্রিয়। আমি ও লক্ষ্মী সতত তাঁহার হৃদয়ে বাস করি।"

এ কোন্ সঙ্গীত? এ কি মহিম্ন-স্তব নহে? যাঁহাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তিনিই মহাবিষ্ণু এবং আদি-অন্তহীন মহা প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া এ দৃশ্যমান জগৎ রচনা করেন। ঐ যোগমায়া বা মহাপ্রকৃতিই শ্রীশ্রীভগবতী দুর্গা। বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, তখন যোগমায়াই একমাত্র জাগ্রত থাকেন। যে যোগমায়ার মায়ায় এই বিশ্বচরাচর মোহিত, তিনিই বিষ্ণুর আদ্যাপ্রকৃতি এবং সৃষ্টির আদি-কারণভূতা সনাতনী।

এখন দেখিতে চেষ্টা করিব, এই মহাবিষ্ণু কি করিয়া জগতে আগমন করেন আর যোগমায়াই বা তাঁহার সহিত কি লীলা করেন?

আদিতে আমরা বহু বার দেখিয়াছি, যোগমায়া বহু বার যোগদেহ ধারণ করিয়া সৃষ্টির প্রতিকূল সৃষ্টিকারিণীশক্তির ক্রিয়ার বাধা অপসারিত করিয়াছিলেন। এ যোগমায়া যতক্ষণ বিষ্ণুকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, ততক্ষণ বিষ্ণু নিদ্রাগত থাকেন। তিনি কি সত্য নিদ্রা যান? না—বিষ্ণু মহাপ্রকৃতিতে লীন হইয়া আপনার সৃষ্টি-মাহাত্ম্য অনুভব করেন।

যখন জগতের পাপভার অপনোদনের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জগতে অবতীর্ণ হন, তখন যোগমায়াও জগতে ক্ষণিকের

জন্য অবতীর্ণা হইলেন এবং পরাপ্রকৃতি বিষ্ণুর হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধারূপে জগতে অবতীর্ণা হন। এই শ্রীকৃষ্ণই জগতকারণ মহাবিষ্ণু। যিনি জন্মরহিত ও আদি-অন্তহীন, তিনি জন্মগ্রহণ করেন কি করিয়া ?

"পূর্ব্বে যেন পৃথিবীর ভার হরিবারে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হৈলা শাস্ত্রেতে প্রচারে॥
স্বয়ং ভগবানের কর্ম্ম নহে ভারহরণ।
স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু করে জগতপালন॥
কিন্তু কৃষ্ণের সেই হয় অবতারকাল।
ভারহরণকাল তাতে হইলে মিশাল॥
পূর্ণ ভগবান্ অবতার যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাগুবতার।
যুগ মন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ সঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতার কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ॥
অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীর।
বিষ্ণুদ্বারে কৃষ্ণ করে অসুর সংহার॥
আনুসঙ্গ কর্ম্ম এই অসুর মারণ।
যে লাগি অবতার কহি সে মূলকারণ॥"
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

পৃথিবীর ভারহরণ করিবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর ভার কি? না—ভগবানের মাধুর্য্যভাব হইতে সৃষ্টির বিকাশ; সৃষ্টির মধ্যে এই মাধুর্য্যভাবের অভাব হইলেই সৃষ্টিতে পাপবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবজাতি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্বকীয় প্রভাবই ব্যক্ত করে। সৃষ্টি-কর্ত্তাকে ভুলিয়া যায়। এই অহংমত্ত জীবকুলের নাশের জন্য ভগবান্ মাঝে মাঝে নানারূপে অবতীর্ণ হন। এই অহংমত্ত যাহারা হয়, তাহারাই অসুর। ব্রহ্ম বা বিষ্ণু ত্রয়ী-রূপে জগতে ক্রিয়া করেন, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। সেই তিন রূপ—ব্রহ্মাশক্তি, বিষ্ণুশক্তি ও শিবশক্তি। ব্রহ্মাশক্তি উৎপাদন করেন, শিবশক্তি লয় করেন এবং বিষ্ণুশক্তি সৃষ্টিপালন করেন।

এখন মন দিয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন—জীব বা সৃষ্টি চাহে কাহাকে? যিনি জগৎ প্রসব করেন, সেই শক্তিকে? কারণ, প্রসবের পর আর সেই শক্তির সহিত সৃষ্টির কোন সম্বন্ধ থাকে না। শিবও লয়ের আধার। অতএব যিনি পালন করেন এবং সৃষ্টির স্থিতিশক্তি সেই বিষ্ণুশক্তিকেই জীব উপাসনা করেন। সনাতনকাল হইতেই তাই আদিতে পালনকর্ত্তার উপাসনা। এইরূপেই বিষ্ণুর উপাসনার সৃষ্টি হইল। তারপর তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।"
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।"
শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা চতুর্থ অধ্যায়—১১শ শ্লোক।

ভগবান্ আপনার বাক্য অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আহ্বানে জগতে শ্রীশচীনন্দনরূপে অবতীর্ণ হন। [ক্রমশঃ।

ম্যালেরিয়া।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

(২)

জীবাণুতত্ত্ব।

আমরা জড়জগতের কোনও জিনিষের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশকে অণু, পরমাণু প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ইষ্টককে একটা পাকা (ইষ্টকনির্ম্মিত) বাড়ীর সূক্ষ্মাংশ বলা যাইতে পারে। জীবজগতে যে কোনও জীবের সূক্ষ্মতম অংশকে কোষ (cell) বলে অর্থাৎ যেমন একটা বাটীর অস্তিত্ব তাহার প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডের উপর নির্ভর করে—প্রত্যেক ইষ্টকখণ্ডই বাটীর সূক্ষ্মতম অংশ, তেমনই জীবের সত্তার পক্ষে স্তূপীকৃত কোষই একমাত্র অবলম্বন—প্রত্যেক কোষের জীবনের উপরে জীবের সত্তা নির্ভর করে। কিন্তু একখানি ইষ্টকখণ্ড বা একটি পরমাণু অপর ইষ্টক বা পরমাণু নিরপেক্ষ হইয়া নিজ ক্ষমতার বা অস্তিত্বের অপর কোনও প্রমাণ দিতে পারে না, জীবজগতের ব্যাপার তাদৃশ নহে। জীবজগতে এককোষ (one-celled) বহুসংখ্যক জীব আছে। ইহাদিগকে ইংরাজীতে প্রটোজোয়া (Protozoa) বলে। ইহারা অতি সূক্ষ্ম জীবাণু। ইহাদের আয়তন ক্ষুদ্র ও গঠন অতি সরল বা সামান্য হইলেও ইহারা মানুষের তথা অতিকায়েরও প্রবল শত্রুতাচরণ সহজেই করিতে পারে।

এককোষ—প্রটোজোয়াশ্রেণিভুক্ত জীবগণের জীবনব্যাপার আলোচনা করিলে এই এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়; যথা—(১) ইহারা পরাঙ্গপুষ্ট জীব (parasite) অর্থাৎ আপনা হইতে ইতস্ততঃ সঞ্চলন করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা ইহাদের নাই; পরগাছার ন্যায় এই জীবাণুরা অপর প্রাণীর দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তদ্দেহজাত পুষ্টি ইহারা আহরণ করিয়া থাকে। (২) ইহারা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনও এক জীবের দেহে আশ্রয় করিয়া থাকে না; জীবনের বিভিন্নকাল বিভিন্নশ্রেণীর জীবদেহে অতিবাহিত করে। তন্মধ্যে সাধারণতঃ একাংশ মেরুদণ্ডী (vertebrate) জীবের দেহে অপরাংশ মেরুদণ্ডহীন জীবের দেহে (invertebrate) এবং একাশ্রয় হইতে ইহারা সহজেই আশ্রয়ান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্তও আছে। এ বন্দোবস্ত না থাকিলে এই এককোষ জীবকুল নির্ম্মূল হইয়া পড়িত। (৩) ইহাদের বংশবৃদ্ধি দুই রকমে হইয়া থাকে। ক্লীবজন্ম (A-sexual Generation) ও দাম্পত্যজন্ম (Sexual Generation)। যে স্থলে একটি পূর্ণায়বপ্রাপ্ত জীবাণু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া একটি বৃদ্ধ-জীবাণু হইতে দুইটি তরুণ-জীবাণুতে পরিণত হয়, সেটিই ক্লীবজন্ম বলিতে হইবে। যে হেতু সে স্থলে পুরুষ ও স্ত্রী-জীবাণুদ্বয়ের সঙ্গম ঘটে নাই। দাম্পত্যজন্মের সময়ে একটি পুরুষ-জীবাণুর সহিত একটি স্ত্রী-জীবাণুর সঙ্গম হওয়ার ফলে একটি ডিম্ব সৃষ্টি হয় এবং সেই এক ডিম্ব একাধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া একাধিক শিশুজীবাণুর সৃষ্টি করে। এই জাতীয় এককোষ জীবাণুরা প্রথম কয়েক পুরুষ ক্লীবজন্মই দিয়া থাকে, পরে বহু পুরুষ গত হইলে ক্রমশঃ ইহাদের দাম্পত্যজন্মের ক্ষমতা জন্মায়। এক বার দাম্পত্যজন্মের ক্ষমতা জন্মাইলে, উত্তরকালের বংশধরেরা দাম্পত্যজন্মের অধিকার লাভ করে। (৪) ইহারা যে জীবের দেহে আশ্রয় গ্রহন করিয়া যখন থাকে, তখন সেই জীবের দেহের একাংশ হইতে অপরাংশে যাইতে সমর্থ হয়। ইহারা আশ্রয়দেহের সারাংশ নিজদেহে গ্রহণ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকে এবং আশ্রয়ে থাকিয়া তথায় নানারূপ বিষ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়। (৫) ইহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় জীবাণুদের দুইটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে; প্রথমতঃ, পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত স্ত্রীজাতীয় এককোষ জীবাণুগণ পুরুষজাতীয় জীবাণুতে অপগত না হইয়া গর্ভধারণ করিতে পারে; এরূপ গর্ভসঞ্চারকে ইংরাজীতে (Parthens Genesis) বলে; ইহার অর্থ কুমারীর স্বতঃ গর্ভোৎপাদন। এরূপে যে গর্ভ হয়, তাহাতে "বাওয়া ডিম" থাকে না, সজীব সচেতন শিশু-জীবাণুই থাকে। দ্বিতীয়তঃ, স্ত্রীজাতীয় এককোষ জীবাণুগণ সহজে মরে না; ইহারা বহুবর্ষব্যাপী দীর্ঘায়ুঃ। এই জন্য বহুবর্ষ পরে অকস্মাৎ ম্যালেরিয়া জাগিয়া উঠে !!!

ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবনেতিহাস।

এককোষ জীবাণুগণের সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে যে কথা বলা হইল, তাহার প্রত্যেক কথাটিই ম্যালেরিয়া-জীবাণুর পক্ষে খাটে; যে হেতু সমষ্টি এককোষ জীবাণুর মধ্যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুটি ব্যষ্টি মাত্র। ম্যালেরিয়া-জীবাণুটি পরাঙ্গপুষ্ট জীব। ইহার জীবনের একাংশ নরশোণিতের রক্তকণিকার মধ্যে অপরাংশ এক শ্রেণীর মশকের পাকস্থলীতে ও লালাগ্রন্থির মধ্যে (Salivary Glands) অতিবাহিত হয়। যে মশকের দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবনের কিয়দংশ অতিবাহিত হয়, তাহার নাম এনোফিলিস্ (Anopheles Maculipenis)।

নরশোণিতের রক্তকণিকার মধ্যে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর যে জীবনাংশ অতিবাহিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে ক্লীবজনন সংসাধিত হইয়া থাকে। একটি রক্তকণিকার মধ্যে যখন শিশু-জীবাণু থাকে, তখন সেটি অতীব ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। ঐ ক্ষুদ্র ম্যালেরিয়া-জীবাণুটি ক্রমশঃ আশ্রয়স্থল রক্তকণিকার ভিতরে যাহা কিছু সারপদার্থ থাকে, তাহা খাইয়া নিজদেহ পুষ্ট করিতে থাকে। ক্রমশঃ জীবাণুটি রক্তকণিকাটি অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহদায়তন হয় এবং অকস্মাৎ ক্লীবজনন রীত্যনুসারে নিজদেহকে বহুসংখ্যায় বিভক্ত করিয়া রক্তের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। যে সময়ে ঐ এক জীবাণু হইতে বহুসংখ্যক শিশু-জীবাণু সৃষ্ট হইয়া রক্তের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, সেই সময়েই আমাদের দেহে কম্প উপস্থিত হয়। যে সকল নবশিশু-জীবাণু জন্মগ্রহণ করিল, তাহারা প্রত্যেকে একটি একটি সুস্থ রক্তকণিকাকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজদেহ পুষ্ট করিয়া পরে বিভক্ত হইয়া আর এক দল শিশু-জীবাণুকে রক্তমধ্যে ছাড়িয়া দেয়। বারো, চব্বিশ, আটচল্লিশ বা বাহাত্তর ঘণ্টা অন্তর এই ভাবে ক্লীব-জন্ম ঘটায়, মানুষেরও প্রত্যহ একই সময়ে (২৪ ঘণ্টার মাথায়) অথবা এক দিন অন্তর (৪৮ ঘণ্টার মাথায়) অথবা প্রত্যেক চতুর্থ দিবসে (৭২ ঘণ্টা পরে) কম্প দিয়া জ্বর আসে। মানুষের রক্তের মধ্যে আশ্রয়লাভ করিয়া ম্যালেরিয়া-জীবাণু ক্লীবজননের রীত্যনুসারে বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে ও ম্যালেরিয়া-জীবাণুর বংশবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের রক্তের ধ্বংস হইতে থাকে।

মনুষ্যদেহে কিছুকাল ক্লীবজননপ্রক্রিয়ার পরে কয়েকটি ম্যালেরিয়া-জীবাণু ক্লীবত্ব ত্যাগ করিয়া কেহ কেহ পুরুষ-জীবাণু ও কেহ বা স্ত্রী-জীবাণুর আকারপ্রাপ্ত হয়। যখন জীবাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষভেদ সৃষ্ট হয়, তখন মানুষের দেহে তাহাদের জীবনের অপর বিকাশ হওয়া আর সম্ভব নয়। সেই অবস্থায় মশকদেহে যাইতে পারিলে তখন দাম্পত্যজনন রীত্যনুসারে তাহারা বেশ বাড়িবার অবসর পায়। কিন্তু, যদি কোনও কারণবশতঃ মানবদেহ ত্যাগ করিবার তাহাদের সুযোগ না হয়, তবে ক্রমশঃ ঐ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় জীবাণুই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই কারণেই ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া বিনা চিকিৎসাতেও লোক সময়ে সময়ে আরোগ্যপ্রাপ্ত হয়। আবার কোনও কোনও স্থলে জীবাণুদের ঐরূপে স্বতঃ-ধ্বংসপ্রাপ্তি না ঘটিয়া, স্ত্রীজাতীয় জীবাণুগণের স্বতঃ গর্ভোৎপাদন ঘটে ও তদ্দ্বারা তাহাদের বংশবৃদ্ধিও হইয়া থাকে।

যদি এনোফিলিস্‌জাতীয় কোনও মশকী ঐ ম্যালেরিয়া-জীবাণুবাহী মানুষকে দংশন করে, তবে শোষিত রক্তের সঙ্গে বহুসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় ম্যালেরিয়া-জীবাণু মশকীর পাকস্থলীতে যাইয়া পড়ে। এই পাকস্থলীর অভ্যন্তরে স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গম ঘটে এবং তাহার ফলে স্ত্রীজাতীয় জীবাণুটির গর্ভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীজাতীয় জীবাণুটি মশকের পাকস্থলীর গাত্র-বিদারণ পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। পাকস্থলীর গাত্রমধ্যে থাকিয়া তন্মধ্যেই স্ত্রীজাতীয় জীবাণুটি বহুসংখ্যক শিশু-জীবাণু প্রসব করে। শিশু-জীবাণুগুলি তথা হইতে শনৈঃ শনৈঃ মশকীর লালাগ্রন্থিতে (Salivary Glands) যাইয়া পৌছায়। নররক্তের সঙ্গে মশকের দেহে স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় জীবাণুগণের প্রবেশকাল হইতে মশকদেহে জাত শিশু-জীবাণুগণের মশকের লালাগ্রন্থিতে উপস্থিত হওয়ার কাল—দশ হইতে বারো দিন। যখন মশকের লালাগ্রন্থিতে শিশু-জীবাণুগণ যাইয়া উপস্থিত হয়, সেই সময়ে ঐ জীবাণুবাহী মশকটি যত লোককে দংশন করিতে থাকে, তত লোকেরই দেহে দলে দলে ঐ শিশু-জীবাণুগণকে ছাড়িয়া দিতে থাকে। এক বার নররক্তে উপস্থিত হইতে পারিলে শিশু-জীবাণুরা প্রত্যেকেই এক একটা রক্ত-কণিকাকে আশ্রয় করিয়া বসে এবং মানুষের দেহে অব-স্থিতিকালীন পুনরায় ক্লীবজননপ্রথায় বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে; ক্রমশঃ ঐরূপ জননের পরে পুনরায় পুং ও স্ত্রীজাতীয় জীবাণুর সৃষ্টি হয়; পুনরায় মশককর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জীবাণুর দাম্পত্যজননক্রিয়া সংঘটিত হয়।

এইরূপে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর—

নরদেহে—(১) প্রথম দফা বহুবার ক্লীবজনন (A-sexual Cycle)

(২) তৎপরে স্ত্রী ও পুংজাতির সৃষ্টি (Crescent Formation)

- যদি এই সময়ে মানুষকে মশকী দংশন করে—
- যদি মশকী দংশন না করে, তবে—
  - স্বতঃ গর্ভসঞ্চার দ্বারা নরদেহে বংশ বৃদ্ধি (Parthens Genesis)।
  - অথবা ক্রমশঃ নর-দেহের মধ্যে স্বতঃই বংশলোপ।

মশকীদেহে—দাম্পত্যজনন প্রণানুসারে (Sexual Cycle) বংশবৃদ্ধি।

- যদি মশকী মানুষকে দংশন করে, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রথমে ক্লীব-জনন পরে পুং ও স্ত্রী সৃষ্টি পুনরায় ঘটে।
- যদি মশকী মরিয়া যায়, তবে সেই সঙ্গে তাহার দেহে আশ্রিত জীবাণু-মাতা ও সন্ততি সকলেই মরিয়া থাকে।
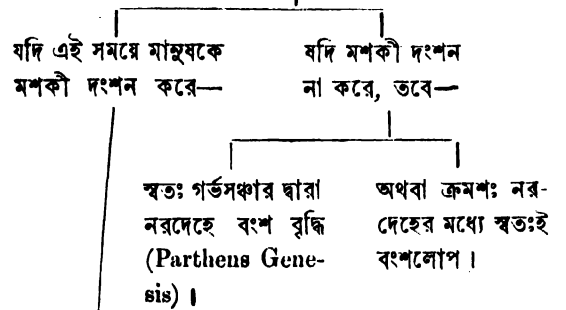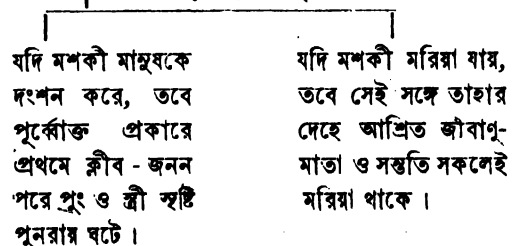
ম্যালেরিয়া কেমন করিয়া হয় ?

উপরে যে সকল বৃত্তান্ত দেওয়া গেল, ইহাদের মধ্যে একটিও অনুমানমূলক বা কল্পনাপ্রসূত নহে। ইহার প্রত্যেক ঘটনাই চক্ষুর গোচরীভূত এবং যে কেহ ইচ্ছা করিলে উহার বর্ণ ও ছত্র স্বচক্ষে দেখিয়া প্রমাণ করিয়া লইতে পারেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের আবিষ্কৃত ঘটনাগুলির মধ্যে ম্যালেরিয়াসংক্রান্ত তথ্যগুলির মত ধ্রুব সত্য অল্পই আছে। আর আজ তথাকথিত শিক্ষার গরিমা লইয়া ঘোর কুসংস্কারাপন্ন—আত্মম্ভরিতাপূর্ণ বঙ্গবাসী সেই সত্যকে উপহাস করিয়া জগতের মধ্যে নিজেই সর্ব্বাপেক্ষা উপহসিত ও স্বখাতসলিলে নিমজ্জিত ! ম্যালেরিয়া-তথ্যে বিশ্বাস না করিলে বিশেষ ক্ষতি কাহার? আমরা এই ধ্রুব সত্য একবারে আজিও গ্রহণ করি নাই বলিয়া আমাদের দেশে ম্যালেরিয়ার "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ;" আর যে সকল সভ্য জাতি ঐ সত্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা আজ ম্যালেরিয়ামুক্ত। আজ তাই করযোড়ে বলি,—"হে বাঙ্গালী, ভুলিয়া যাও যে, দূষিত বায়ু সেবন করিলে ম্যালেরিয়া হয়, ভুলিয়া যাও যে, দূষিত জল পান করিলে ম্যালেরিয়া হয় ; ভুলিয়া যাও যে, কোনও স্থানবিশেষের জল পান না করিলে ম্যালেরিয়ার হাত এড়াইতে পারা যায়। ধ্রুব সত্য জানিও যে, মশক ব্যতীত ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি অসম্ভব !!!"

এই স্থলে অনেকে হয় ত গম্ভীরভাবে সস্তার পাণ্ডিত্যের লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া বলিবেন,—"অমুক গ্রামে আদৌ মশক নাই, অথচ ম্যালেরিয়া ঘরে ঘরে।" এই কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালীর জাতীয়স্বভাব এই—আমরা বিশেষ আয়াস স্বীকার না করিয়াই অনেক মতপ্রচার করিয়া বলিয়া থাকি—যেন সে সব আমাদের নিত্য প্রমাণিত ধ্রুব সত্য, অথচ সে সম্বন্ধে আমাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোনও জ্ঞান হয় ত নাই ! এইরূপ কাণ্ডজ্ঞানহীন দম্ভোক্তি বাদ দিলেও আমাদের স্পষ্টই বলিতে হইবে যে, যদিও মশক ব্যতীত ম্যালেরিয়া অপর কাহারও দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করে না, তথাপি সেই সঙ্গে আমাদের আরও কতকগুলি সর্ত্ত বলিয়া দেওয়া উচিত অর্থাৎ মশক ও মানুষ এক যায়গায় হইলেই যে ম্যালেরিয়া হইবে, এমন কথা নাই। এই এই সর্ত্তগুলি সেই সঙ্গে বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। যথা :—

(১) ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে মশক দংশন করা চাই।

(২) সে মশক এনোফিলিস্‌শ্রেণীর ও তৎশ্রেণীর স্ত্রী-জাতীয় হওয়া চাই।

(৩) এনোফিলিস্ স্ত্রী-মশক যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ জীবাণুকে নিজদেহমধ্যে গ্রহণ করিবে, সেগুলি পরিণত-বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ হওয়া চাই অর্থাৎ শিশু স্ত্রী জীবাণু ও শিশু পুং-জীবাণু সঙ্গত হইলেও গর্ভসঞ্চার হয় না—উভয়েরই যৌবনপ্রাপ্তি হওয়া চাই।

(৪) যে স্ত্রীজাতীয় এনোফিলিসের দেহে জীবাণুর প্রাপ্তযৌবন স্ত্রী ও পুরুষের সঙ্গম ঘটিয়াছে, সেই সঙ্গমের ফলে সেই মশকের লালাগ্রন্থিতে জীবাণু-শিশু বহুলসংখ্যায় উপস্থিত থাকা চাই ; নতুবা, মশক যখন মানুষকে দংশন করিবে, তখন লালার সঙ্গে শিশু-জীবাণু নরদেহে প্রবিষ্ট না হইলে ম্যালেরিয়া হইবে কেন ?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হইতে হইলে—

(১) যে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণুর প্রাপ্তযৌবন স্ত্রী ও পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে—

(২) স্ত্রীজাতীয় এনোফিলিস্ মশক দংশন করিবে এবং ঐ দংশনের অন্ততঃ সাত দিন পরে, বিশেষতঃ দশম কি দ্বাদশ দিবসে—

(৩) সুস্থদেহ ব্যক্তিকে কামড়ান চাই।

এতগুলি সর্ত্ত সকল সময়ে পালিত হওয়া সুকঠিন। এই জন্য গ্রামবিশেষে লক্ষ লক্ষ মশক নিত্য সকলকে দংশন করিলেও ম্যালেরিয়া না হইতে পারে ; যে হেতু, প্রথমতঃ তাহার মধ্যে একটিও এনোফিলিস্‌জাতীয় মশক না থাকিতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ এনোফিলিস্‌জাতীয় মশক বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতীয় এনোফিলিস্ মশকের অভাব হইতে পারে ; তৃতীয়তঃ, প্রাপ্তযৌবন স্ত্রী-পুরুষ-জীবাণুবাহী একটিও ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী সেখানে না থাকিতে পারে ; যেগুলি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে, হয় ত তাহাদের দেহে ক্লীবজননের ফলস্বরূপ ক্লীবজীবাণুই আছে ; চতুর্থতঃ, যে এনোফিলিস্ মশকীর দেহে জীবাণু-গণের দাম্পত্যজনন সংসাধিত হইতেছে, তাহার দেহে হয় ত তখনও জীবাণু-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় নাই !

পক্ষান্তরে এমন দেখা গিয়াছে যে, কোনও সুস্থ ব্যক্তি হয় ত গোণা পাঁচ মিনিটের জন্য কোনও ম্যালেরিয়া-বহুল স্থানে গিয়াছিল বলিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াছে। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—কেবল এই যে, যে দণ্ডে সে ব্যক্তি গিয়া পৌঁছাইয়াছে, সেই দণ্ডেই যে এনোফিলিস্-মশকী সদ্যঃপ্রসূত জীবাণু-শিশু স্বীয় লালাগ্রন্থিতে লইয়া প্রস্তুত ছিল, সে দংশন করিয়াছিল ! লীলাময়ের কি বিচিত্র লীলা !

ম্যালেরিয়া-নিবারণের উপায়।

ম্যালেরিয়ার কারণ কি এবং কি কি অবস্থায় ম্যালেরিয়া হয়, উপরে তাহার আলোচনা করা গিয়াছে। সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, ম্যালেরিয়া-নিবারণ করিতে হইলে চারিটি জিনিষ একত্র করিতে হয়। সেই চারিটি কায এই :—

(১) মশকই যখন ম্যালেরিয়ার বাহন, তখন ম্যালেরিয়া-বাহী মশককুল ধ্বংস করা চাই।

(২) ম্যালেরিয়াগ্রস্তরোগী যখন ম্যালেরিয়া-বিস্তারের পরোক্ষ হেতু, তখন যত লোকের ম্যালেরিয়া হইয়াছে, তাহাদিগকে সারাইয়া দেওয়া চাই।

(৩) যদি সমস্ত মশক ধ্বংস করা অসম্ভব হয়, তবে যাহাতে মশক দংশন করিতে না পারে, সে উপায় অবলম্বন করা চাই।

(৪) যদি সমস্ত ম্যালেরিয়াগ্রস্তরোগীকে সারান অসম্ভব হয়, তবে সুস্থদেহীর নিজে এমন ঔষধ সেবন করা উচিত, যাহার ফলে দেহে ম্যালেরিয়া-জীবাণু প্রবেশ করিলেও জীবন্ত থাকা তাহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

মশককুল ধ্বংস করা।

ইহা খুব সহজ ব্যাপার নহে। কোথায় কোন্ মশা কখন্ থাকে, তাহা জানা দুষ্কর। তবে মোটামুটি জানাইতেছি যে—

"ধাড়ী" মশাগুলি (১) অন্ধকার ভালবাসে, যেমন অন্ধকার ঘর, আলমারীর পিছন, ঘরের চালের নীচে, গাছের ঝোপে। (২) চামড়ার গন্ধ, গীতবাদ্য এবং নীল ও কালো রং ভালবাসে; যেখানে গান-বাজনা হয় অথবা যেখানে পাঁচ জনের মধ্যে এক জনই কথাবার্ত্তা বলিতে থাকে বা যেখানে জুতা বা ময়লা জামা-কাপড় টাঙ্গান বাজড় করা থাকে বা যেখানে নীল ও কালো রঙ্গের জিনিষ থাকে, মশা সেই সেই যায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। (৩) যে যায়গায় প্রবল বায়ু বহে না, মশক গুলি সেই যায়গাতেই দলে দলে বাস করে; এই জন্য বাড়ীর পিছনের দিকে যদি বড় গাছের ঝোপ থাকে, তবে মশকরা সেই যায়গাতেই দলে দলে থাকে। (৪) যে যায়গায় গলিত লতাপাতা বা "পানা"পড়া পুষ্করিণী আছে, মশারা তাহারই নিকট থাকে এবং যেখানেই মশকেরা থাকুক না কেন, খাদ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহারা প্রায়শঃ এক মাইলের মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়ায়—সে গণ্ডী ছাড়ান বিরল। অতএব ধাড়ী মশকগুলিকে তাড়াইতে হইলে বা ধ্বংস করিতে হইলে ঘরের অন্ধকার যায়গাগুলি—যেখানে জুতা-ছাড়া বা জামা-কাপড় থাকে, সে যায়গাগুলি রীতিমত খুলিয়া দেওয়া উচিত বা ধূনা গন্ধক প্রভৃতি উগ্রধূমসাহায্যে মশক বিরল করা প্রয়োজন। বাড়ীর নিকটে আগাছা বা বড় গাছের ঝোপ রাখিবে না অথবা সেই দিকের জানালাগুলি খুব সরু লৌহজালে ঘিরিয়া লইবে। বাড়ীর ভিতরে বা আশেপাশে গলিত উদ্ভিদ রাখিবে না বা এমন স্থানও হইতে দিবে না, যেখানে উদ্ভিদ দৈবাৎ পড়িয়া পচিতে পারে। ফল কথা, বাড়ীর উঠান ও বাহিরের চতুর্দ্দিকের জমী সমতল করিয়া শুষ্ক রাখিবে।

মশকরা নির্ব্বাত স্থানে স্রোতহীন জলে ডিম পাড়ে। তাহাদিগের ডিম ফুটিয়া "জলের পোকা" সৃষ্ট হয়। ঐ পোকাগুলিকে ধ্বংস করা অনেকটা সহজ। জলের যে সকল পোকা জলের সমান্তর রেখায় ভাসে এবং তাড়া দিলে সুধু পশ্চাৎপদ হইয়া সরিয়া যায় মাত্র, সেই গুলিই ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহী মশকের শাবক। এই কয়টি স্থূল তথ্য জানা থাকিলে তাহাদিগকে নষ্ট করা সহজ কাজ বলিয়া বোধ হয়। প্রথমতঃ, এমন যায়গা বা পাত্র রাখিতে নাই, যাহাতে জল জমিতে পারে; যথা—ভাঙ্গা টিনের ক্যানেস্তারা, হাঁড়ি, মালা, খোলা, জালা ইত্যাদি। এগুলি যদি কোথাও রাখিতে হয়, তবে উপুড় করিয়া রাখাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ, নিজের বাড়ীর জমীতে বা বাড়ীর সংলগ্ন আশ-পাশের জমীতে খানা, ডোবা, খোঁদল হইতে দিবে না। যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমনই ভরাট করিয়া লইবে। বাড়ীর সম্পর্কিত যত নর্দ্দমা আছে, তাহা যদি পাকা করিয়া লওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে প্রত্যহ তাহাতে স্রোত বহে, এমন পরিমাণে জল ঢালা কর্ত্তব্য। যেখানে রেল বসান হয় বা বাড়ী তৈয়ারি করা বা মেরামত করা হয়, সেখানে খানা খোঁদল যথেচ্ছভাবে খনন করা আইনবিগর্হিত কায বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। যে যে পুকুরে পানা হয় বা জলের ভিতরে পদ্ম, পানফল বা অপর গাছ বা তৃণ জন্মায়, সে সব পুকুর রীতিমত পরিষ্কার করান প্রয়োজন। শরিকানী পুকুর বলিয়া ফেলিয়া রাখা আইনানুসারে দণ্ডনীয় হওয়া প্রয়োজন। ফল কথা, বাড়ী ও বাড়ীর চতুঃপার্শ্ব যথাসম্ভব শুষ্ক বা বৃথা জলাধারবর্জ্জিত রাখা চাই। এই সকল বিধিগুলি পালন করিলে ম্যালেরিয়াবাহী মশককুল অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। কোন একটি দেশে সম্প্রতি অপর জাতীয় মশক ধ্বংস করিবার জন্য বেতনভুক্ কয়েক-জন ভৃত্যের গাত্রে "অয়েলক্লথের" আবরণের উপরে শিরীষ বা তদ্রূপ আঠা লাগাইয়া কয়েক ঘণ্টাকাল মশকবহুল স্থানে বসাইয়া রাখিয়া সহজেই বহুসংখ্যক মশককে নষ্ট করা সম্ভব-পর হইয়াছিল। এ দেশে এরূপ করা কি অসম্ভব?

দ্বিতীয় বিধি—

ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর সংস্পর্শ ত্যাগ করা।

যাহার ম্যালেরিয়া হইয়াছে, তাহার সঙ্গে বসা দাঁড়ানও নিরাপদ্ নহে। এই জন্য যাহার ঐ ব্যাধি হইয়াছে, তাহাকে স্বতন্ত্র ঘরে বা বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসা করান নিতান্তই আবশ্যক। শিশুরাই অতি সহজে ম্যালেরিয়া-প্রবণ বলিয়া সুস্থ ও অসুস্থ শিশুদিগকে একত্র শুইতে, খেলিতে বা বিদ্যালয়ে পড়িতে দিতে নাই। যাহার রীতি-মত জ্বর হয় না অথচ পেটে বেশ প্লীহা আছে, সে লোকেরও সঙ্গ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তবে কথা হইতেছে—সর্ব্বাঙ্গে ঘা, ঔষধ দিব কোথা? যেখানে বাড়ী বাড়ী ম্যালেরিয়া, সেখানে কত লোককে স্বতন্ত্র করা যায়? যদি ম্যালেরিয়ার

সময়ে প্রত্যেক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদ্বারা ঘরে ঘরে ঔষধ-বিতরণ ও তাহার যথারীতি পর্য্যবেক্ষণ করানর ব্যবস্থা হয়, যদি প্লেগের সময়ে যেমন প্লেগগ্রস্ত রোগীকে স্বতন্ত্র করা হইত, সেই ভাবে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গ্রামখানিকে গণ্ডীর ভিতরে রাখিয়া তাহার শাসন করা সম্ভবপর হয় এবং সেই সকল বিধি এবং পূর্ব্ব ও পশ্চাদ্‌বর্ণিত বিধিব্যবস্থার ফলে ম্যালেরিয়াকে দূর করা সম্ভব হয়, তবে কার্য্যতঃ ঐরূপ করায় প্রত্যবায় কি ?

তৃতীয় বিধি—মশকদংশন নিবারণ।

সন্ধ্যার পরে অনাবৃত দেহে না থাকা, মশারি টাঙ্গাইয়া শয়ন করা, ঘরের জানালা দরজায় সূক্ষ্ম জালবন্ধ করা ও রীতিমত তৈল ব্যবহার করাই মশকদংশন নিবারণের সমীচীন ব্যবস্থা।

চতুর্থ ব্যবস্থা—রীতিমত কুইনিন সেবন।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু কখন অলক্ষিতে দেহে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। ম্যালেরিয়ার মধ্যে বাস করিয়া ঐ সম্ভাবনার হাত এড়ানও অসম্ভব। তাই বলিতেছিলাম যে, মাত্র সন্দেহকে উপলক্ষ করিয়া মধ্যে মধ্যে অল্পমাত্রায় কুইনিন সেবন করিলে ও উপযুক্ত বিধিগুলি মানিয়া চলিলে ম্যালেরিয়া হয় না। কুইনিন ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ ; পৃথিবীর অপর কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রে ইহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। কুইনিন অমৃত ও বিষ। সদ্ব্যবহারে ইহা অমৃত, অসদ্ব্যবহারে ইহা বিষ। সে কথা প্রাণময় অন্নের পক্ষেও ব্যবহার্য্য। কিন্তু তাই বলিয়া লোক অন্নকে ত্যাগ করে না, অথচ কুইনিনকে করে কেন? কোনও কোনও স্বার্থান্ধ ও বিদ্বেষবুদ্ধি কবিরাজ এবং হীনচেতা হোমিওপ্যাথই কেবল নিজ অসারতার আবরণস্বরূপ কুইনিনের নিন্দাপ্রচার করে। আজকাল স্বাদবিহীন কুইনিনের অনুগ্রহে কোন কোন হোমিওপ্যাথ মুখে কুইনিনের শত নিন্দার সঙ্গে স্বহস্তে কুইনিনই দিয়া প্রতারকপ্রবর সাজেন! এ শঠতা আমাদিগের অবিদিত নাই। কবিরাজরাও ঝুড়ি ঝুড়ি কুইনিন ব্যবহার করেন এবং অম্লানবদনে লোককে কুইনিনের নিন্দা শুনাইয়া বেহায়াপনার চরম দৃষ্টান্ত দেখান। বাজারে যতপ্রকারের ম্যালেরিয়ানাশক ফলপ্রদ ঔষধ আছে, তাহাদের সকলেরই মধ্যে কুইনিন থাকিবার কথা—এবং কবিরাজী নামে বহুসংখ্যক কুইনিন-মিশ্র নির্দ্দোষ পল্লীবাসী কবিরাজী-ঔষধজ্ঞানে সেবন করিয়া আত্মবঞ্চনা করিয়া থাকেন। এই হীন প্রতারণার ফলে আমাদের দেশে আপামরসাধারণ সকলেরই ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, কুইনিন একটা বিষ! ইহা সেবনে সর্ব্বনাশ হয়, ইহাতে ম্যালেরিয়া সারে না, সুধু আট্‌কাইয়া যায় এবং সুধু তাহাই নহে—কুইনিনসেবনের ফলে এক প্রকারের জ্বরও হইয়া থাকে! এ কথা যাহারা প্রচার করিয়াছে, তাহারা শঠশিরোমণি। এ কথার একটিও সত্য নহে। বরং ইহাদের বিপরীত সকল কথাই সত্য। কুইনিনই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ঔষধ। কুইনিন যথারীতি ব্যবহার না করিলে অথবা সামান্যভাবে অল্পদিন ব্যবহার করিলে ইহার ফল আংশিকরূপে দৃষ্ট হয় অর্থাৎ জ্বরটিকে সামান্য কয়েক-দিনেরই জন্য নষ্ট করিতে সমর্থ হয়; তাহার পরে আর কুইনিন না খাওয়ার ফলে ইহার ক্ষমতা যেমন এক দিকে কমিয়া আসে, তেমনই অপর দিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী হওয়ায় জ্বর পুনরায় দেখা দেয়। জ্বর আট্‌কান কুইনিনের একটা অগুণ নহে।

উপরে সংক্ষেপে যে সকল নিবারণবিধি দেওয়া গেল, সে সবগুলিই বিশেষরূপে পরীক্ষিত—একটিও স্বল্পদিনের অভিজ্ঞতার ফল নহে। যদি এ কথায় অবিশ্বাস করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ কর, তবে—

"চেয়ে দেখ—ঐ আছে রসাতল!"
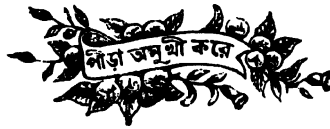
পল্লীবাসীর পত্র।

[শ্রীনটবর বন্দ্যোপাধ্যায়, এল্. টি. লিখিত।]

ম্যালেরিয়া ও আলোচনা।

শ্রাবণ সংখ্যার "অনাথবন্ধু" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায় মহাশয় ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধে ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত, স্বরূপ, বিশেষতঃ কারণনির্ণয়সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা বলিবার আছে। আশা করি, এ বিষয়ে পল্লীগ্রামবাসী ভুক্তভোগীর ধারণা কতটা যুক্তিযুক্ত, সহৃদয় পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন। রায় মহাশয় বলেন,—"কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত—সকল ব্যক্তিই মনে করেন যে, দূষিত বায়ুসেবন ও জলপান করিলেই ম্যালেরিয়া হয়, মশকের ব্যাপারটা ষোল আনাই ধাপ্পাবাজী ইত্যাদি।" মশককুল নির্ম্মূল করিলেই যদি দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইত, তবে বোধ হয়, একটা কথা সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—ম্যালেরিয়া বিস্তৃতির পূর্ব্বে দেশে কি মশককুল ছিল না? যদি মশক না থাকিত, তবে "মশারি" কথাটি অভিধানে স্থান পাইত না। উর্দ্ধতন দুই তিন পুরুষ যাবৎ ব্যবহৃত মশারি এখনও কাহারও কাহারও গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। রায় মহাশয়ের বিবৃতি-অনুসারে দেখিতে পাই যে, ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সুতরাং বলিতে হয় যে, মশক থাকিলেই যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে, এমন কোন কথা নাই। আসাম অঞ্চলে মশকের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এমন কি, স্থলবিশেষে ঐ অঞ্চলে দিবাভাগেও মশারি ব্যবহার করিতে হয়, অথচ তথায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কালাজ্বর ত আজকাল কেবল নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। কালাজ্বর অপেক্ষা বরং আসাম অঞ্চলে বসন্ত ও রক্তামাশয় রোগের অতিবিস্তৃতি দেখা যায়। এই সকল দেখিয়া ম্যালেরিয়ার বিস্তৃতি যে মশকের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এ কথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমাদের মনে হয়, পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া-বিস্তৃতির অন্যান্য কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। সহরের উপর কোথাও বেশী ম্যালেরিয়া দেখা যায় না। পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়াবিস্তৃতির প্রধান কারণ—শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তিগণের পল্লীগ্রামের বসবাস পরিত্যাগ। গ্রামে ধনিগণ বসবাস না করাতে গ্রাম্য রাস্তাগুলির অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৎসরের মধ্যে ৫।৬ মাসকাল গ্রাম্য রাস্তাগুলি জলে নিমজ্জিত থাকে অথবা কর্দ্দমবহুল হইয়া চলাচলের অযোগ্য হইয়া উঠে। ঈদৃশ রাস্তায় চলাচল করিয়া লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং শরীর অবসন্ন হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, রেল কোম্পানী নিজ স্বার্থরক্ষার জন্য দামোদরের ন্যায় বৃহৎ নদের এক তীরের বাঁধ কাটাইয়া দিয়াছেন। বর্ষাকালে জলপ্লাবনে এই সকল দেশ সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত হয়। বিগত ১৯১৪ সালের দামোদরের বন্যার কথা যাঁহাদের স্মরণ আছে, তাঁহারা এই উক্তির যাথার্থ্য অবশ্যই উপলব্ধি করিবেন। প্রতি বৎসর এই ভাবে বন্যা হওয়ায় বাঁধহীন গ্রামগুলির চতুঃপার্শ্বের মাঠ, গ্রামের মধ্যস্থল অপেক্ষা ক্রমশঃ অনেক উচ্চ হইতেছে; সুতরাং প্লাবনের সময় গ্রামের মধ্যস্থলে যে বন্যার জল প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহা আর গ্রাম হইতে বহির্গত হইতেছে না; গ্রামের ভিতরেই ঐ জল বৎসর ব্যাপিয়া পচিতেছে, মজিতেছে এবং বিষাক্ত বাষ্পের কেন্দ্রস্থল হইতেছে! অশিক্ষিত নির্ধন পল্লীবাসিগণ জলনিষ্কাশনের কোনই উপায় করিতে পারিতেছে না। গ্রামগুলি ক্রমেই সেঁতা হইতেছে এবং অচিরাৎ বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া উঠিতেছে। পুনরায় গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই সংস্কারাভাবে গ্রামের দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীগুলি শুষ্ক হয় এবং দরিদ্র গ্রামবাসিগণ দুর্গন্ধযুক্ত—বিষাক্ত—পচা জল স্নানপানার্থ ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণ বর্ত্তমান থাকিতে গ্রামগুলি যে রোগের "কুঠী" হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য হইবার কারণ কি? আবার কালপ্রভাবে লোকের মতিগতি অন্য প্রকার হইয়াছে। ধর্ম্মে লোকের তাদৃশ আস্থা নাই—অথবা আস্থা থাকিলেও কোন্ কার্য্য করিলে ধর্ম্মও হয়, দেশের উন্নতিও হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিয়া কেহ কোন কার্য্য করেন না। তখনকার ধনিগণ পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠা, কূপ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সৎকার্য্যে বহু অর্থব্যয় করিতেন। কিন্তু আজকালকার ধনিগণ পল্লীগ্রাম ত্যাগ করিয়া সহরেই বসবাস করেন—কলের জল পান করেন। যতদিন পর্য্যন্ত ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পল্লীগ্রামে বসবাস না করিবেন, ততদিন পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতির কোন আশাই নাই। অন্যপক্ষে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ৩০।৪০ টাকা বেতন পাইলেই সহরাঞ্চলে একখানা বাড়ী কিনিবার চেষ্টায় থাকেন। তাঁহারাও পাড়াগাঁয়ের নামে শিহরিয়া উঠেন। নিজেদের সমবেত চেষ্টায় যে পল্লীস্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে, এ কথা একবার শিক্ষিত ও ধনিসম্প্রদায় ভাবিয়া দেখেন না। ফলতঃ শিক্ষিত ও ধনিসম্প্রদায় পল্লীগ্রাম পরিত্যাগ করাতে গ্রামগুলির যে দুরবস্থা হইতেছে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

ডাক্তার রায় মহাশয় বলেন, "ভারতবর্ষে ধারাবাহিক-

রূপে ম্যালেরিয়া-বিতাড়নের কল্পনা করা হয় নাই।” অবশ্য রায় মহাশয় গবর্ণমেণ্টের অনুষ্ঠানের প্রতিই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, দেশের লোক পল্লীগ্রামের জন্য কতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন বা করিতেছেন? পল্লী-মাতার স্নেহময় ক্রোড়ে যাঁহারা লালিত-পালিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয় জন পল্লীগ্রামের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছেন? পল্লীগ্রামগুলিতে আজকাল কেবলমাত্র কতকগুলি অশিক্ষিত, স্বার্থসন্ধ “মোকদ্দমাবাজ” লোকের বসবাস হইয়াছে। ইহাদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি নাই; কেহ কাহারও আনুকূল্য করিতে চাহে না। বরং ইহারা পরস্পরের সর্ব্বনাশসাধনে তৎপর। শিক্ষিত ভদ্র-ব্যক্তিগণ যদি পল্লীগ্রামে বাস করেন, সমবায় ঋণদান-সমিতি স্থাপন করিয়া দরিদ্র কৃষকগণকে কুসীদজীবিগণের করাল কবল হইতে রক্ষা করেন, সান্ধ্য-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গ্রাম্য লোকদিগকে শিক্ষাদান করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতির আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন, তবে অচিরাৎ পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইবে।

ম্যালেরিয়াপ্রসঙ্গে আমাদের আরও বক্তব্য এই যে, মশককুলই যদি এই ব্যাধিসঞ্চারের প্রকৃত কারণ হয়, তবে তাহাদিগকে নির্ম্মূল করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা যাহাতে মশককুল অধিক পরিমাণে জন্মিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করাই সমধিক পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত। মশককুলের জন্মস্থান পচা জল, এঁদো পুকুর প্রভৃতি; সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যাউক, পুষ্করিণীগুলির সংস্কার ও জলনিষ্কাশনের প্রকৃষ্ট উপায় না করিলে ইহাদের ধ্বংসের উপায় হইবে না। অপিচ, আমাদের বঙ্গদেশ ‘সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা’ হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অপেক্ষা অনুচ্চ, তাহাতে আবার লৌহ-বর্ত্মদ্বারা শৃঙ্খলিত; কাজেই জলনিকাশনের পথ সর্ব্বতোভাবে না হইলেও অনেকাংশ রুদ্ধ। পূর্ব্বকালের ন্যায় বঙ্গদেশের মাঠগুলি অধুনা প্রকৃষ্টরূপে বর্ষার জলে বিধৌত হইয়া যায় না; স্থলে স্থলে অধিক জল সঞ্চিত হইয়া দেশটিকে উত্তরোত্তর সেঁতা করিয়া থাকে; অবসর বুঝিয়া ম্যালেরিয়াও আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়া থাকে। লৌহবর্ত্মদ্বারা যে জলনিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়াছে, তাহার ত অন্যথা হইবার বড় সুবিধা দেখা যায় না। রেল কোম্পানী নিজ স্বার্থের ক্ষতি করিয়া দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য রেলপথ কাটিয়া যে জলনির্গমের প্রকৃষ্ট পথ করিয়া দিবেন, সে আশা দুরাশা মাত্র। এ বিষয়ে আবেদন করার অর্থ জানিয়া শুনিয়া পাথরে “মাথামুড় খোঁড়া”! লাভের মধ্যে মাথা ফাটিবে—পাথর ভাঙ্গিবে না। এই প্রকার পারিপার্শ্বিক দুরবস্থার মধ্যেও শিক্ষিত ও ধনীব্যক্তিগণ যদি পল্লীগ্রামের প্রকৃত হিতচিন্তা করেন এবং কিঞ্চিৎ অর্থব্যয় ও স্বার্থত্যাগ করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে অনেক সুফল ফলিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গে লৌহবর্ত্মের স্বল্পতাবশতঃ ম্যালেরিয়াপ্রকোপ অপেক্ষাকৃত কম। আমাদের শেষ কথা এই যে, পল্লীগ্রামে অত্যন্ত খাদ্যাভাব হইয়াছে এবং উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাব ঘটিয়াছে। আজকালকার কৃষকদিগের কেমন একটা “নেশা” হইয়াছে যে, ভাল জিনিষটি হইলেই তাহারা সহরে চালান দিবে। সেখানে আনিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় করিবে সেও ভাল, তবু তাহারা পল্লীগ্রামে কোন ভাল তরীতরকারী বা “ফলমূল” বিক্রয় করিবে না!

বঙ্গে ম্যালেরিয়ার অন্যতম কারণ—পাটের চাষ। যে বিষাক্ত বায়ু নিঃসারিত হইয়া দেশের আবহাওয়াকে বিষাক্ত করিয়া দেয়, সে বিষাক্ত বায়ু পাটভিজান পচা জল হইতে উৎপন্ন হয়। ঐ বিষাক্ত দুর্গন্ধযুক্ত জলরাশি সমগ্র দেশের জলবায়ুকে দূষিত করিয়া এক প্রকার বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করে এবং ঐ গ্যাসপ্রভাবে মানুষের নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। পাড়াগাঁয়ে অজ্ঞ কৃষকরা অর্থের লোভে ধান ফেলিয়া পাটের চাষ করে এবং ঐ পাট পুষ্করিণী, খাল, বিল প্রভৃতিতে ভিজাইয়া রাখে। পাট অবশ্য আমাদিগের খুব আবশ্যকীয়; কিন্তু যতটা দরকার, তাহা হইতে অধিক পরিমাণ পাট বপন করা হয়। ফলে, এই বর্ষার সময়ে পাটের দোষেও পাড়াগাঁয়ের আবহাওয়া নিতান্ত দূষিত হইয়া উঠে।

উপসংহারে পল্লীগ্রামবাসিগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যেন বৃথা আমোদ-প্রমোদে বহু অর্থ অনর্থক ব্যয় না করেন। বারোয়ারি পূজোপলক্ষে যাত্রা, নাচ প্রভৃতি দিয়া অনর্থক কতকগুলি টাকার শ্রাদ্ধ না করিয়া ঐ অর্থের দ্বারা যদি গ্রামের একটি পুষ্করিণীরও পঙ্কোদ্ধার হয়, তবে বহু লোক সুপেয় জলপান করিতে পাইয়া কৃতার্থ হইবে। শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে আমাদের দেশে ভূরিভোজন ও অন্যান্য ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয়িত হয়, যদি ঐ অর্থের অর্দ্ধেকও পল্লীস্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হয়, তবে শনৈঃ শনৈঃ দেশ হইতে ম্যালেরিয়া বিদূরিত হইবে। পুনশ্চ, আমাদের দেশের লোক পূর্ব্বপুরুষগণের অধ্যুষিত “বাস্তু-ভিটা” সহসা পরিত্যাগ করিতে চাহেন না। কাজেই শত-বৎসরের মধ্যে “বাস্তুভিটা” নিতান্ত ঘনসন্নিবিষ্ট হইয়া উঠে। এ অবস্থায় বাস্তুভিটা হইতে একটু সরিয়া গিয়া ফাঁকা জায়গায় নূতন বসতি স্থাপন করিলে পল্লীস্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইবে বলিয়া মনে করি। অনেক স্থলে গ্রাম্য পুষ্করিণীগুলির বহু অংশীদার থাকাতে পঙ্কোদ্ধার অসম্ভব হইয়া উঠে; দেশে এমন একটি আইন হওয়া দরকার, যাহাতে অংশীদারগণের মধ্যে যে কেহ ইচ্ছা করিলে, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাইয়া খরচের টাকা পুকুরের আয় হইতে উঠাইয়া লইতে পারেন। নচেৎ এজমালি সম্পত্তির উন্নতি হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। আইনের বলে এক জনের উপর পঙ্কোদ্ধারের ভার দেওয়া উচিত এবং ব্যয়িত অর্থের জন্য সমস্ত অংশীদারগণকে সমভাবে দায়ী করা সঙ্গত; নচেৎ “ভাগের মা গঙ্গা পায় না।” এ অবস্থায় গ্রাম্য

পুকুরগুলি ধীরে ধীরে অব্যবহার্য্য হইয়া উঠিবে। উপরে যে সকল বিষয় আলোচিত হইল, সেগুলি ছাড়া আরও অনেকগুলি সূক্ষ্ম কারণ পল্লীস্বাস্থ্যের উপর প্রভাববিস্তার করিতেছে। যথা—(১) গবাক্ষবিহীন গৃহে বাস। পল্লীগ্রামের লোক চোরের ভয়ে গৃহের গবাক্ষ রাখিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। (২) বসতবাটীর চতুঃপার্শ্বে বৃহৎ বৃক্ষাদিরোপণ—বিশেষতঃ তেঁতুল, শিশু প্রভৃতি। (৩) অনিয়মিত সময়ে আহার। (৪) অতিভোজন। (৫) অনশন। (৬) গুরুপাক দ্রব্য আহার ইত্যাদি। (৭) অধিক রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, কলহ, মানসিক উদ্বেগ, যথেচ্ছাচার প্রভৃতি। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পল্লীবাসিগণ যদি তাঁহাদের এই প্রকারের শৈথিল্য ও অনিয়মগুলি পরিত্যাগ করেন, তবে অচিরাৎ পল্লীগ্রাম হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শ্রীযুত নটবর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র আমরা উপরে প্রকাশিত করিলাম। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার রায় মহাশয়ের প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ডাক্তার রায় মহাশয় মশক-দংশনই ম্যালেরিয়ার কারণ, এ কথা তাঁহার প্রবন্ধের কোনই স্থানেই বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ম্যালেরিয়ার কারণ—একটি আণুবিক্ষণিক জীবাণু। * * * * সমস্ত সভাজগৎ ঐ জীবাণুকে (Plasmodium Malariæ) ম্যালেরিয়ার কারণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ঐ জীবাণু মশককর্ত্তৃক ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী হইতে সুস্থদেহে নীত হয়।"

তাহার পর ডাক্তার রায় মহাশয় স্পষ্ট করিয়াই লিখিয়াছেন, "এই কয়টি কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা চাই ;—

(১) ম্যালেরিয়া-জীবাণুই ম্যালেরিয়ার একমাত্র কারণ।

(২) তিনটি জিনিষ একত্র হইলে তবেই (নতুবা নহে) ম্যালেরিয়ার বিস্তার ঘটিতে পারে। সে তিনটি জিনিষ এই ;—

(ক) ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছে এমন লোক।

(খ) মশক ঐ সকল লোককে দংশন করিয়া কিছুকাল পরে দংশন করিবে—

(গ) সুস্থ ব্যক্তিকে।"

অনাথবন্ধু—দ্বিতীয় সংখ্যা, ৮২ পৃষ্ঠা।

ডাক্তার রায় মহাশয় এ কথা বলেন নাই যে, মশা থাকিলেই ম্যালেরিয়া হইবে। ম্যালেরিয়ার মূল কারণ যে জীবাণু, তাহা না থাকিলে কেবল মশা থাকিলেই ম্যালেরিয়া হয় না। ঐ জীবাণু ও মশা দুইই থাকা চাই। কেবল তাহাই নহে; ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত লোককে দংশনান্তে সেই মশা যদি তৎক্ষণাৎ অন্য সুস্থ লোককে দংশন করে, তাহা হইলে সেই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হয় না। দংশনান্তে, কিছুকাল পরে অন্য সুস্থ ব্যক্তিকে দংশন করিলে তবে সেই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া হইবে, নতুবা নহে।

পূর্ব্বে মশা ছিল, মশারি ছিল, কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছিল না, তাই পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া হইত না। ডাক্তার রায় মহাশয় বলিয়াছেন, "তিনটি জিনিষ একত্র হইলে তবেই ম্যালেরিয়া-বিস্তার ঘটিতে পারে, নতুবা নহে।" এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলিতে পারি, মশকমাত্রই ম্যালেরিয়ার বাহন নহে। য়্যানোফিলিস্ নামক মশকই ম্যালেরিয়ার বাহন। ডাক্তার রায় সে সব কথা পরে বলিবেন। তাঁহার প্রবন্ধ এখনও অসম্পূর্ণ। ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে যে সকল কথা জানা গিয়াছে, তাহা একটি, দুইটি বা চারিটি প্রবন্ধে প্রকাশ করা যায় না। কয়েকটি প্রবন্ধে ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে রায় মহাশয় আলোচনা করিবেন বলিয়াছেন। প্রবন্ধ সমস্ত মনোযোগসহকারে পাঠ না করিলে সে সম্বন্ধে আলোচনা নিষ্ফল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ম্যালেরিয়াসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, সেজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তবে তিনি তাঁহার প্রবন্ধে অনেক অবান্তর প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন ; আমরা তাঁহার অনেক অংশ বাদ দিয়াছি। "চক্ষু বুজিয়া স্বাধীন অনুসন্ধান না করিয়া কেবলমাত্র Medical authority বুক্নি ঝাড়িলে কোন সুফলের আশা নাই"—এরূপ ভাষাপ্রয়োগ শিষ্টাচারসঙ্গত নহে। প্রতিপক্ষের যুক্তি সম্মানের সহিত খণ্ডন করাই কর্ত্তব্য। যাঁহারা Medical authority বা স্বাধীন অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা কিরূপ অনুসন্ধান করেন, তাহা তাঁহাদের গ্রন্থে ও রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। সে অনুসন্ধান যে স্বাধীন নহে ভ্রান্ত বা তাঁহাদের স্বাধীন অনুসন্ধানের যোগ্য শিক্ষা বা যোগ্যতা নাই, বহুদেশ হইতে সতর্কভাবে সংগৃহীত তথ্যদ্বারা তাহা সপ্রমাণ করা আবশ্যক। নতুবা কেবল খেয়ালবশে কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে।

এঁদো পুকুর—শরিকীবিবাদে ও মনোবাদে পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার না হওয়া বাঙ্গালায় নূতন নহে। উহা চিরকালই আছে। তবে পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া ছিল না কেন? ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার দ্বারবাসিনী হইতে ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গার সন্নিহিত ইচ্ছাপুর পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়ায় একেবারে উজাড় হইয়া যায়। জিজ্ঞাস্য,—ঐ বৎসরেই কি অত বড় বিস্তীর্ণ জনপদের সমস্ত পুষ্করিণী এঁদো ডোবায় পরিণত হয়? আমরা সেই সময়কার বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে গ্রামে এঁদো পুকুর, পচা দুর্গন্ধ জলপূর্ণ রাস্তার নয়ানজুলি ছিল, তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই বন্যা আসিত, পূর্ব্বে বরং রাস্তার অবস্থা আরও খারাপ ছিল, তবে তখন ম্যালেরিয়া ছিল না কেন? আজ প্রায় পঁচিশ

ছাব্বিশ বৎসর হইল গোবরডাঙ্গায় ম্যালেরিয়া অধিক হইয়াছে। কিন্তু আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গোবরডাঙ্গায় যত এঁদো পুকুর, রাস্তার পগারে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দুর্গন্ধ জল ছিল, এখন তত নাই। উহা অনেক কমিয়াছে, কিন্তু ম্যালেরিয়া অনেক বাড়িয়াছে! তখন ঐ অঞ্চলে দুই এক বৎসর অন্তর বন্যা আসিত, এখন বন্যা বন্ধ হইয়াছে। গত বিশ বৎসরে ঐ গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় সাত হাজার হইতে সাড়ে তিন হাজারে নামিয়াছে। তাহার মধ্যে চারি পাঁচ শত উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আছে। যশোহর চৌগাছায় তের বৎসর পূর্ব্বে ম্যালেরিয়া অজ্ঞাত ছিল, এখন উহা ম্যালেরিয়ার আড্ডা হইয়াছে। অথচ গ্রামে পুকুর নাই বলিলেই হয়। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় বিলক্ষণ ম্যালেরিয়া আছে। মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অনেক স্থানে একেবারেই নাই। যে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া একেবারে নাই, সে অঞ্চলে পচা পুকুরের অভাব নাই। যে অঞ্চল বৎসর বৎসর বন্যায় ভাসে, সে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া নাই, পচানী যথেষ্ট আছে। উদাহরণ—শ্রীনগর থানার এলাকাধীন গ্রামসমূহ; ঐ অঞ্চলে মশাও যথেষ্ট, কিন্তু উহা অ্যানোফিলিস্ জাতীয় নহে, কিউলেক্স্ জাতীয়। আমরা নিজে উহা দেখিয়াছি।

আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বলি,—তথ্যের সহিত না মিলাইয়া থিওরী রচনা করা উচিত নহে। সত্যের সন্ধান বা স্বাধীন অনুসন্ধান করিতে হইলে পূর্ব্বের অর্জ্জিত ধারণা ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা হউক, তিনি এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, সেই জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহার প্রবন্ধে অনেক দরকারী কথা ছিল। কিন্তু ম্যালেরিয়া-সন্দর্ভে তাহা অপ্রাসঙ্গিক বোধে সে সকল পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে সকলের আলোচনা স্বতন্ত্র সন্দর্ভে করা উচিত।

অনাথবন্ধু-সম্পাদক।

বনৌষধ।

সুষুণীশাক।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায়, "শাক"শব্দে সমগ্র তরকারী অভিহিত। কারণ, শাস্ত্রকারগণ শাকশব্দে ফল, পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদের সমস্ত অঙ্গই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন বেগুনের ফল, ন'টের পাতা, মূলার কন্দ, বেতের ডগা, বকের ফুল ইত্যাদি। ইহার মধ্যে ব্যবহারক্ষেত্রে কাহারও একটি, কাহারও দুইটি, কাহারও বা ততোঽধিক অবয়ব ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"পত্রং পুষ্পং ফলং নালং কন্দং সংস্বেদজন্তথা।
শাকং ষড়্‌বিধমুদ্দিষ্টং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরম্॥"

পত্র, পুষ্প, ফল, নাল, কন্দ ও সংস্বেদজ (ছত্রাদি), এই ছয় প্রকারই শাক নামে অভিহিত। ইহাদের মধ্যে যথাক্রমে পরপরগুলি পূর্ব্বপূর্ব্বগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত গুরু। যেমন পত্র হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে ফল গুরু।

শাকমাত্রই সাধারণতঃ গুরু, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ, মলবৃদ্ধিকারক এবং বায়ু ও পুরীষনিঃসারক। তবে ইহার মধ্যে কতকগুলি এমন আছে, যাহা জীব-শরীরের বিশেষ হিতকর। সেই জন্যই—বিশেষতঃ শাকান্নভোজী ভারতবাসীর পক্ষে শাকের গুণ জানা নিতান্ত প্রয়োজন।

আমাদের এবারকার আলোচ্য বিষয়—সুষুণীশাক। এই শাক দেখিতে কতকটা আমরুলশাকের ন্যায়। ইহার পাতা চারি খণ্ডে বিভক্ত এবং ইহা সজল প্রদেশেই জন্মে। পুরাতন পুকুর, ডোবা প্রভৃতি জলাশয়—যাহা নানাপ্রকার জঙ্গলে ব্যাপ্ত, সেই সমস্ত স্থানেই ইহার প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

"শাকো জলান্বিতে দেশে চতুষ্পত্রীতি চোচ্যতে।"

এই শাক জলযুক্ত প্রদেশে জন্মে এবং ইহাকে চতুষ্পত্রীও বলে। ইহার প্রত্যেক পাতায় চারিটি দল আছে বলিয়াই এই নামকরণ হইয়াছে।

ইহাকে হিন্দীতে—চৌপতিয়া; মহারাষ্ট্রে—কুরড়ু; কর্ণাটে—থড়কতিরা; তৈলঙ্গে—সুনিষণ্ণনেশাকম্; উড়িষ্যাপ্রদেশে—ছুনছুনিয়া; গুজরাটে—ওটীগণ; ফারসীতে—অংজরা; আরবীতে—বজহুল অংজরা; লাটিনে—Blepharis Edulis এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শিতিবার, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, শ্রীবারক প্রভৃতি বলে।

"...........বাস্তুকং সুনিষণ্ণকম্।
বিদ্যাদ্ গ্রাহি ত্রিদোষঘ্নং ভিন্নবর্চ্চস্তু বাস্তুকম্।"
(চ, সূ, ২৭ অ।)

......বোথো ও সুষণীশাক গ্রাহী, ত্রিদোষনাশক। বোথোশাক মলভেদক।

সুষুণীশাক।

"সুনিষণ্ণস্ত সংগ্রাহী অবিদাহী ত্রিদোষনুৎ॥"

(চক্রপাণি দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।)

সুষুণীশাক গ্রাহী, অবিদাহী এবং ত্রিদোষনাশক।

"সুনিষণ্ণো হিমোগ্রাহী মেদোদোষত্রয়াপহঃ।
অবিদাহী লঘুঃ স্বাদুঃ কষায়ো রুক্ষদীপনঃ॥
বৃষ্যো রুচ্যো জ্বরশ্বাসমেহকুষ্ঠভ্রমপ্রণুৎ।
মেধ্যোরসায়নো নিদ্রাকরো দাহবিনাশনঃ॥"

(ভাবপ্রকাশঃ।)

সুষুণীশাক শীতবীর্য্য, মলসংগ্রাহক, অবিদাহী, লঘু, মধুর ও কষায়রসযুক্ত, রুক্ষ, অগ্নিদীপক, বৃষ্য, রুচিকারক, মেধাবৰ্দ্ধক, রসায়ন, নিদ্রাকারক ও দাহনিবারক এবং ইহাতে মেদোরোগ, ত্রিদোষ, জ্বর, শ্বাস, মেহ, কুষ্ঠ ও ভ্রম-রোগ বিনষ্ট হয়।

পূৰ্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, শাকমাত্রই গুরু, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ প্রভৃতি দোষযুক্ত হইলেও কতকগুলি শাক আছে, যাহা আমাদের অত্যন্ত উপকারী। আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য সুষুণীশাক তাহাদের অন্যতম। এই শাক বেশ মুখরোচক এবং সুনিদ্রাকারক, এ কথা সকলেই জানেন। তবে ইহার অন্যান্য গুণগুলি হয় ত চিকিৎসক বা দ্রব্যগুণপর্য্যালোচক ব্যতীত অন্যের অবিদিত থাকিতে পারে। সেই জন্যই নাতিবিস্তৃতভাবে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সাধারণের নিকট উপস্থিত করা হইল।

উচ্ছে।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

উচ্ছে আমাদের দেশে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত দ্রব্য। ইহা সাধারণতঃ দুই প্রকার:—বড় ও ছোট। চলিত কথায় বড় উচ্ছেকে "করলা" এবং ছোট উচ্ছেকে "উচ্ছে" বলা হয়; সুতরাং আমরাও ইহাকে ঐ দুই নামেই অভিহিত করিব। এই (ছোট) উচ্ছেই আবার আকৃতিভেদে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক-জাতীয়ের আকার অতিশয় ক্ষুদ্র ও কিয়ৎপরিমাণে গোল। ইহাই এই জাতীয়ের মধ্যে ক্ষুদ্রতম। কোন কোন স্থানে ইহাকে "বন উচ্ছে" বলা হয়। আর এক প্রকারের আকার পটোলের ন্যায় কিঞ্চিৎ লম্বা। অন্যপ্রকার তদপেক্ষাও কিঞ্চিৎ

বৃহৎ। এই তিনপ্রকারই "উচ্ছে" নামে অভিহিত এবং জঙ্গলেও অযত্নে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আর যাহা ইহা অপেক্ষাও বড় অর্থাৎ যেটি ইহার মধ্যে বৃহত্তম, তাহাই "করলা"; এবং ইহাই সাধারণতঃ যত্নোৎপাদিত হয়।

এই করলা আমাদের দেশে সচরাচর ৯।১০ ইঞ্চির অধিক লম্বা হইতে দেখা যায় না; কিন্তু ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ১৫।১৬ ইঞ্চি লম্বা এবং আধ সের ওজনের এক একটি করলা দেখিতে পাওয়া যায়!

আবার ফলের তারতম্যানুসারে পাতারও আকৃতিগত তারতম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ এইটুকু সহজেই দৃষ্টিগোচর হয় যে, যে জাতীয়ের ফল যত বৃহৎ, সেই জাতীয়ের পাতাও অপেক্ষাকৃত তত বড়।

করলা ও উচ্ছেকে যথাক্রমে হিন্দীতে—করেলা, করেলী; তৈলঙ্গে—করিলা, কাকরকায়া; মহারাষ্ট্রে—কারলেং, ক্ষুদ্র কারলী; গুজরাটে—কারেলা, কড়বাবেলা; কর্ণাটে—হাগল; আরবীতে—কিস্‌সা, উল্‌হিমার; ফারসীতে—কারেলাহ; উৎকলে—শলরা ও কলরা; ইংরেজীতে—Hairy Mordica এবং ল্যাটিনে Momardica Charantia বলে। ইহার শাস্ত্রীয় নাম—কারবেল্ল ও কঠিল্ল (করলা) এবং কারবেল্লী (উচ্ছে)।

যদিও ইহার চারি প্রকার ভেদ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশানুসারে আমরাও ইহাকে দুই-প্রকার (করলা ও উচ্ছে) নামেই অভিহিত করিতেছি, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহার এই আকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও গুণ প্রায়ই সমান, সুতরাং এই দুই প্রকার ভেদেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির যথেষ্ট আনুকূল্য হইতে পারে।

"কারবেল্লমবৃষ্যঞ্চ রোচনং কফপিত্তজিৎ।"
(রাজনিঘণ্টুঃ।)

করলা অবৃষ্য, রুচিজনক, কফ ও পিত্তনাশক।

"কারুবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহক্রিমীন্ হরেৎ॥
তদ্‌গুণা কারবেল্লী স্যাৎ বিশেষাদ্দীপনী লঘু।"
(ভাবপ্রকাশঃ।)

করলা শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু ও তিক্তরসবিশিষ্ট। ইহা জ্বর, পিত্ত, কফ, রক্তদোষ, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমি বিনাশ করে এবং ইহা বায়ুবর্দ্ধক নহে। কারবেল্লী অর্থাৎ উচ্ছে করলার সদৃশ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ ইহা অগ্নিদীপক ও লঘু।

"কারবেল্লঃ সকর্কোটঃ রোচনঃ কফপিত্তনুৎ॥"
(চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।)

করলা ও কাঁকরোল রুচিজনক, কফ ও পিত্তনাশক।

উদ্ধৃত প্রামাণ্য বচনগুলি দৃষ্টে দেখা যায় যে, একমাত্র ভাবপ্রকাশকার মহামতি ভাবমিশ্র ব্যতীত অন্য কেহই ইহার কোনও ভেদ কল্পনা করেন নাই। ভাবমিশ্রের মতে আকৃতিগত জাতিভেদ থাকিলেও গুণবৈশেষ্য অতি সামান্য; সুতরাং করলা ও উচ্ছে যে প্রায় সমগুণবিশিষ্ট, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

উচ্ছে ও করলা যে বিশেষ রুচিকারক, ইহা সকলেই অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন ইহার বসন্তপ্রতিষেধক গুণ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বসন্তের প্রকোপসময়ে যাঁহারা প্রত্যহ ভোজ্যের সহিত এই মহোপকারী দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহাদিগের বসন্তের আক্রমণ জন্য শঙ্কিত থাকিতে হয় না।

বসন্তরোগে উচ্ছের পাতার রসও বিশেষ হিতকর। উক্তরোগে ঔষধের সহপানরূপে ইহার যথেষ্ট ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়।

অতএব জ্বরে পথ্য, পিত্তনাশক, রুচিজনক, বসন্ত-প্রতিষেধক এই মহোপকারী দ্রব্যটি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টিতে উপেক্ষিত হইয়াও আমাদের কত উপকার সাধন করিতেছে, তাহা বর্ণনাতীত।

জৈনধর্ম্ম।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি-স্থান মধ্যভারত। মধ্যভারতীয় হিন্দুগণই প্রথম জৈনধর্ম্মের উপাসনাপদ্ধতি গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথম সাধকগণ বর্ত্তমান বিহারের অন্তর্গত পরেশনাথ পর্ব্বতেই যে সাধন করিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। জৈনধর্ম্মগ্রন্থানুযায়ী জানা যায় যে, এ পর্য্যন্ত জৈনদিগের চব্বিশ জন অবতার হইয়াছেন। তন্মধ্যে মহাবীর স্বামীই শেষ অবতার। জৈনিক ধর্ম্মভাষায় অবতারকে তীর্থংকর বলা হয়। মহাবীর স্বামী এই চব্বিশ তীর্থংকর। ২৪৪৩ বৎসর পূর্ব্বে তিনি ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময় হইতে যে সাল এ দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তাহাকে বীরসংবত বলা হয়। বর্ত্তমান বর্ষে বীরসংবত চলিতেছে—২৪৪৩। খৃষ্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে মহাবীর স্বামী ভারতবর্ষ অলঙ্কৃত করিয়া "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই ধর্ম্মমত জগতে প্রচারিত করিয়া যান। এই ধর্ম্মের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা ঋষভ দেবজী। অযোধ্যাতেই তাঁহার জন্ম এবং সেই স্থানেই প্রথম তিনি ধর্ম্মপ্রচার করেন। জিনের বা মহেশ্বরের উপাসক বলিয়াই উঁহাদিগকে জৈন বলা হয়।

পূর্ব্ববারের প্রবন্ধে জৈনদর্শনের সামান্য কথা ব্যাখ্যা করিয়াছি। জৈনধর্ম্ম আলোচনাকালীন কয়টি কথাই আমাদিগের বিশেষরূপে মনে পড়ে। যে সময় ভগবান বুদ্ধ শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় বা তাহারা কিছু পরেই অথবা সমসাময়িক সময়েই মহাবীর স্বামীর অভ্যুদয়।

ভারতে চিরদিন ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলময় ধর্ম্মশাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করতঃ এক একটি সমাজ গড়িয়া গিয়াছেন। কিন্তু সকলই আদি সনাতনধর্ম্মের মূল হইতে উদ্ধৃত। বেদের প্রথমেই আছে "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।" তাহাই যুগে যুগে মহাজনগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া জগতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে বহু ধর্ম্মসম্প্রদায় দেখিতে পাই এবং পরপর সেগুলির নামও যথাসম্ভব লিপিবদ্ধ করিব।

প্রথমতঃ শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, শৈব, সৌর, ইঁহারাই প্রধান। তাহার পর রামায়ত বৈষ্ণব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়, উদাসী সম্প্রদায়, রামানুজের দল, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পন্থী, ব্রাহ্ম সমাজ, আর্য্য সমাজ, জৈন সমাজ।

শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর, ইঁহারা ভারতের আদি সনাতনধর্ম্মের প্রথম উদ্দেশে গঠিত। শাক্তগণ শক্তির উপাসক। বিষ্ণুর উপাসক বৈষ্ণব। গণপতি বা গণেশের উপাসক গাণপত্য, শিবের উপাসক শৈব, সূর্য্যদেবের উপাসকগণ সৌর।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বাঙ্গালায় আবির্ভূত হইয়া আসমুদ্রহিমাচলকে ভগবানের সর্ব্বপাপতাপহারী নাম প্রদান করেন। তিনি আচণ্ডালে ভাগবৎ নাম বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহা হইতেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের উদ্ভব। শিবোপাসক বিশিষ্টশৈব বাঙ্গালায় অতি বিরল। কিন্তু আধুনিক সময়ে মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি, বৃন্দাবনের স্বর্গীয় কাটিয়া বাবা, ধনিয়াপাহাড়ের বাবা ঠাকুরদাস প্রভৃতি মহাত্মগণও এক একটি ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র শিষ্য করিতেছেন। উঁহারা সকলকেই প্রাচীন সনাতনধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সনাতনধর্ম্মকে বজায় রাখিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন এবং করিয়াছেন। জৈন গুরুগণও সেই হিসাবে বৈদিক অহিংসাধর্ম্মের প্রচারের জন্য জৈনধর্ম্মের প্রচার করেন। মহাত্মা দয়ানন্দ স্বামী আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করেন। আর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়া তিনি আর্য্যসমাজের অভ্যুত্থানে সাহায্য করেন। বেদামার্গানুযায়ী ধর্ম্মাচরণ করাই উঁহার উদ্দেশ্য। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ও উপনিষদাংশ গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে আজ আমরা ব্রাহ্মসমাজকে জীবন্ত দেখিতে পাইতেছি।

এখন কথা হইতেছে এই যে, এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় কি এক একটা বিভিন্ন ধর্ম্ম লইয়াই গঠিত হইয়াছে? না; এক সনাতনধর্ম্মই নানাপ্রকারে সাধককর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়া এক একটা সম্প্রদায় গঠিত করিয়াছে; বস্তুতঃ সকলেই সনাতনধর্ম্মের গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত।

মূল ধর্ম্মকে আপনার সাধনানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া উঁহারা প্রচার করিয়াছেন মাত্র। আমরা নানা সম্প্রদায় ও নানা মত দেখিয়া সময়ে সময়ে মনে করি, এই ভারতে অসংখ্য ধর্ম্ম, অসংখ্য সমাজ, অতএব ভারতীয় ধর্ম্ম বুঝিয়া চলা বড়ই বিপদ! প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এই সকল ধর্ম্ম—উপধর্ম্ম বা শাখা, সনাতনধর্ম্মের অঙ্গ মাত্র।

জৈনধর্ম্মও সেই হিসাবে সনাতনধর্ম্মের অংশ। * যিনি

* বর্ত্তমান জৈনীরা বেদকে অস্বীকার করেন। আমরা জৈনধর্ম্মের দর্শনাংশ ও উপনিষদাদি আলোচনা করিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিব।

এই ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনিও সনাতন মূলধর্ম্ম হইতে অংশাংশ গ্রহণ করিয়া সময় ও কালোচিতভাবে লোকসমাজে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। আমরা অনেক দিন হইতেই এই জৈনধর্ম্মসমাজ ও জৈনধর্ম্মদর্শনসম্বন্ধে বাঙ্গালায় আলোচনা করিব মনে করিয়াছিলাম এবং উহার তথ্য সাধারণে প্রকাশ করিয়া জৈনদর্শনের সত্য গ্রহণ করিব আশা করিয়াছিলাম। সেই উদ্দেশ্যেই জৈনধর্ম্মের আলোচনা করিতেছি।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক লোকগণনার হিসাবে দেখা যায়, সমগ্র ভারতে তখন চৌদ্দ লক্ষ জৈন ছিল। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জৈনদিগের শ্বেতাম্বরী কন্‌ফারেন্স হেরল্ড অনুযায়ী জানা যায়, জৈনসংখ্যা কমিয়া বারো লক্ষে আসিয়াছে। ভারতে লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, সেই হিসাবে জৈনসংখ্যা কমিতেছে। জৈনগণের মধ্যেও ধর্ম্মমত ও সমাজ লইয়া যথেষ্ট মতভেদ হইতেছে। প্রথমতঃ দুইটি জৈনসম্প্রদায় রহিয়াছে—

১ম। শ্বেতাম্বরী।

২য়। দিগম্বর।

শ্বেতাম্বরসমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

প্রথম ভাগ—মন্দিরমার্গী; দ্বিতীয় ভাগ—স্থানকবাসী। আবার দিগম্বর জৈনসমাজও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বিশ্ব ও তারণপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে। পুনরায় জৈনশ্বেতাম্বর তেরাপন্থী নামকও অন্য একটি সমাজ গঠিত হইয়াছে।

ফলে এখন দেখা যায়, এই জৈনগণও আপনাদের সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ধর্ম্মমতও খণ্ড খণ্ড করিয়া পৃথক্ ধর্ম্মসম্প্রদায়গঠন করিতেছে।

সম্যক্ দর্শন।

প্রথমবারের প্রবন্ধে সম্যক্ দর্শনসম্বন্ধে ব্যাখ্যা যথাসম্ভব দিয়াছি, এবার তাহাই আরও বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিব।

দর্শন শব্দের অর্থ কি? চক্ষুদ্বারা দেখা। চক্ষুদ্বারা কি দেখা? না—যাহা সম্মুখে, তাহাই দর্শন করা। যে দেখায় চিত্তে কলুষভাব না আসে, তাহাই দর্শন। দোষশূন্যভাবে কিছু অবলোকন করাই দর্শন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জরা ও মোক্ষ, এই সাত পদার্থে শ্রদ্ধা করাকেই সম্যক্ দর্শন বলে। কোন কোন গ্রন্থে নয়টি তত্ত্ব পাওয়া যায়। যেমন জীব ১, অজীব ২, পুণ্য ৩, পাপ ৪, আস্রব ৫, সংবর ৬, নির্জ্জরা ৭, বন্ধ ৮, মোক্ষ ৯, এই নব তত্ত্ব।

উপযুক্ত সংদেব, সংশাস্ত্র, সদ্‌গুরুকে মান্য করাও যাহা, বস্তু সংগ্রন্থ, সংদেব, সদ্‌গুরুর উপাসনা করাও এক। আমরা এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত নব পদার্থের সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়া সম্যক্ দর্শনের যে জ্ঞান, তাহাই বিচার করিব। এখন দেখিব, সম্যক্ জ্ঞান কি?

সম্যক্ জ্ঞান কি, তাহা বুঝাইবার পূর্ব্বে জ্ঞানের অর্থ কি, তাহা দেখিব। সত্যের উপলব্ধিই জ্ঞান। উহা ব্যতীত আর সকলই অজ্ঞান। সত্যের উপলব্ধি শব্দের অর্থ কি? সত্যস্বরূপ বা সত্যের মূল যিনি, সেই ভগবানে চিত্তের স্ফূর্ত্তিই জ্ঞান। আরও বিশদ করিয়া বলিতে গেলে যেন উহা সহজ হয় বলিয়াই মনে হয়। যে প্রকার চিত্ত লাভ করিলে ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায় এবং তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করা যায়, তাহাই জ্ঞান। চিত্তের ঐ অবস্থার নামই জ্ঞান। এখন দেখিব, জৈনদর্শনে সম্যক্ জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা হইয়াছে।

সম্যক্ জ্ঞান।

জীব, অজীব, আস্রব, বন্ধ, সংবর, নির্জ্জরা ও মোক্ষ, এই সাত প্রকার তত্ত্বসম্বন্ধে যাঁহার সম্যক্ জ্ঞান অর্থাৎ পরিষ্কাররূপে জ্ঞান হইয়াছে,সে কিরূপ? না—সংশয়,বিপর্য্যয় ও অনধ্যবসায়, যিনি এই সকল দোষরহিত হইয়াছেন, ন্যূনাধিকতারহিত হইয়া যিনি বস্তুতঃ স্বরূপ—"স্ব-রূপ" অবগত হইয়াছেন, তাঁহারই সম্যক্ জ্ঞান হইয়াছে। সনাতন জৈনদর্শনে সংক্ষেপতঃ সম্যক্ জ্ঞানের ইহাই ব্যাখ্যা। স্ব-রূপ কি? স্ব-আত্ম। আত্মচৈতন্যের অধিষ্ঠাতা। পূর্ণ চৈতন্য। সেই পূর্ণ চৈতন্যের বিদ্যমানতা অবগত হওয়াই স্বরূপ অবগত হওয়া। অবগত হওয়া কি? দোষশূন্যভাবে সম্পূর্ণরূপে জানা। এখন বুঝিতে হইবে, পূর্ব্বোক্ত সাত পদার্থে সংশয় জন্মিলে বা সাত পদার্থসম্বন্ধে চিত্তে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে কিংবা উক্ত বিষয়ে অবগত হওয়ার জন্য অলসতা আসিলে বা নিশ্চেষ্ট হইলে উক্ত তত্ত্বসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ অসম্ভব। ঐ তিন দোষে যিনি দোষী হন নাই, তাঁহারই সম্যক্ জ্ঞান হইতে পারে। এখন সংশয় কি? নিশ্চয়তার অভাববোধই সংশয়। বিপর্য্যয় কি? বোধের অসামঞ্জস্যই বিপর্য্যয় এবং অনধ্যবসায় অর্থাৎ বোধ্যবিষয়ে চিত্তের অলসতাই অনধ্যবসায়।

যাহা হউক, এখন আমরা প্রথম জীবসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়া জীব কি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

জীব কি?

যে পদার্থের দর্শনচেতনা ও জ্ঞানচেতনা এই দুই প্রকার চেতনা আছে, তাহাকেই জীব বলে। তাহা হইলে প্রথম বুঝিতে হইবে,—দর্শনচেতনা কি? বস্তুর বিশেষত্বরহিত অস্তিত্বমাত্র জানাকেই দর্শনচেতনা কহে। যাহাতে বস্তুর বিশেষ প্রকার অর্থাৎ বস্তুতত্ত্ব সর্ব্বসংশয়রহিত হইয়া অবগত হওয়া যায়, তাহাই জ্ঞানচেতনা। এই দর্শনচেতনা ও জ্ঞানচেতনার অপর নাম দর্শনোপযোগ ও জ্ঞানোপযোগ।

জীবেও নানা বিভাগ রহিয়াছে, সেগুলি ক্রমে ক্রমে ব্যাখ্যা করিতেছি। এখন জীবসম্বন্ধে আরও একটু স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিব। চৈতন্যশীল বস্তু বা পদার্থ জীব। যাহার

চেতনা আছে অর্থাৎ জীবন চৈতন্যপূর্ণ জ্ঞানময়, সেই জীব। সে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে পারে, সর্ব্বেন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তিযুক্ত অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয় সমভাবে ক্রিয়াবান্।

জীব পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট। তন্মধ্যে কেহ বা একেন্দ্রিয়, কেহ দ্বীন্দ্রিয়, কেহ ত্রীন্দ্রিয়, কেহ বা চতুরিন্দ্রিয় ও অপর কেহ পঞ্চেন্দ্রিয়। মনুষ্যই একমাত্র পঞ্চেন্দ্রিয় জীব অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয় সমভাবে মানুষের উপর ক্রিয়া করে।

পঞ্চেন্দ্রিয়—স্পর্শন (ত্বক্), রসনা (জিহ্বা), ঘ্রাণ (নাসিকা), দর্শন (চক্ষু), শ্রোত্র বা শ্রবণ (কাণ)।

যে জীবের একমাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, তাহাকে একেন্দ্রিয় জীব কহে। পৃথিবীকায়, অপ্‌কায়, তেজকায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায়, এই পাঁচপ্রকার একেন্দ্রিয় জীব। এই পঞ্চকেই স্থাবরজীব কহে।

যে জীবের স্পর্শেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয় আছে, তাহাকে দ্বীন্দ্রিয় জীব কহে।

যে জীবের স্পর্শেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়—এই তিন ইন্দ্রিয় আছে, তাহাকে ত্রৈন্দ্রিয় জীব কহে।

যে জীবের স্পর্শন, রসনা, ঘ্রাণ ও শ্রবণ—এই চারি ইন্দ্রিয় আছে, তাহাকে চতুরিন্দ্রিয় জীব কহে। এই চতুরিন্দ্রিয় জীব—যেমন ভ্রমর, মাছি ইত্যাদি।

যে জীবের পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে, তাহাকে পঞ্চেন্দ্রিয় জীব কহে। যেমন গাভী, বলদ, ঘোড়া, ছাগল ইত্যাদি।

ত্রস জীব:—দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয় জীবকে ত্রস জীব বা জঙ্গমজীব বলে।

জীবপর্য্যায়সম্বন্ধে জৈনদর্শনে উপরি-উক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

সর্ব্বজীবের গঠনপ্রণালীর মধ্যে যে তারতম্য পাওয়া যায়, তাহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, সকল জীব সকল ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়া জন্মগ্রহণ করে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইতেছি। মনুষ্য দ্বিপদ; সর্ব্ব ইন্দ্রিয় সমভাবে মানুষেই স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। গরু প্রভৃতি চতুষ্পদ, তাহাদের সর্ব্ব ইন্দ্রিয় স্ফূর্ত্তি পায় নাই। পক্ষীর ডানা ও পা দুই-ই আছে এবং ভূপৃষ্ঠ ছাড়িয়া শূন্যে বিচরণ বা উড়িতে পারে। মৎস্যাদি পদশূন্য, কিন্তু ক্ষুদ্র ডানা আছে। বানরের যেমন চারি পা রহিয়াছে, তেমন লেজও আছে; বানর চতুষ্পদ, গরু প্রভৃতি চতুষ্পদ হইতে ভিন্ন। চতুষ্পদ সকল পশুরই এবং দ্বিপদ সকল পক্ষীরই লেজ রহিয়াছে। বানর পশু এবং চতুষ্পদ পশুমাত্র।

প্রত্যেক জীবের কর্ম্ম, আশয়-বিষয় স্বতন্ত্র। মানুষগুলি দুই পায়ে হাঁটিয়া যথেচ্ছা গমন করিতে পারে, চতুষ্পদ পশুরাও সেইরূপ পদচতুষ্টয়ের সাহায্যে গমনাগমন করিতে পারে, কিন্তু মানুষের ন্যায় তাহাদের হস্ত নাই। পশুগণ হস্তের কার্য্য অনেক সময়ে মুখের দ্বারাই সম্পন্ন করে। আবার হস্তী অপর চতুষ্পদ জন্তুর তুলনায় সম্পূর্ণ পৃথক্; কারণ, তাহার যেমন লেজ ও চারি পা আছে, তেমনই আবার প্রকাণ্ড শুণ্ডও রহিয়াছে। ঐ শুণ্ডদ্বারা সে হাতের কাজ করে। বিহঙ্গমরা আকাশে অনায়াসে উড়িয়া বেড়াইতে পারে এবং অনেক পাখী আছে, শিক্ষা পাইলে তাহারা মানুষের ন্যায় কথাও কহিতে পারে। অবশ্য মানবের ন্যায় স্পষ্টভাষায় কথা কহিতে পারে না, কিন্তু অস্পষ্ট হইলেও কথা কহিতে পারে। অপর চতুষ্পদ জন্তুরা মানুষ বা পক্ষীর ন্যায় শব্দ করিতে পারে না, তাহারা অব্যক্ত শব্দ করে। কিন্তু পশুর যেমন ধারাবাহিক শব্দ করিবার ক্ষমতা আছে, বানরের তাহা নাই; বানর অব্যক্তভাবে সময়ে সময়ে "হুপ্" এই শব্দ মাত্র করে।

সমগ্র জীবজগৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াও এইরূপভাবে "তর-তম" হইয়াছে। এই জীবকুলসম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান হইয়াছে, এই জীবকুলের সম্বন্ধে যাঁহার অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদের কর্ম্ম, ধর্ম্ম, আশয়-বিষয়সম্বন্ধে যিনি জানেন, তাঁহাকেই প্রকৃত জ্ঞানী বলা হয় এবং ঐ জানাই সম্যক্ জ্ঞান।

জৈনদর্শন বলে, তাঁহাদের যিনি উপাস্য, তিনি সকলের উপর এবং সর্ব্বদ্রষ্টা। তিনি এই জীবচরিত্র ও জীবধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাভাবিক জ্ঞানী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই জীবের আশ্রয়ভূত সংসার ও সংসারের ভাবাদি যিনি গ্রহণ না করিয়া উহার অতীত হইয়াছেন অথচ জীবের ন্যায় সংসারদোষদুষ্ট নহেন, তিনি জৈনগণের উপাস্য। জৈনীরা আপনার দেবতাকে সর্ব্বদোষশূন্য (যে অষ্টাদশ প্রকার দোষের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি) জানিয়া সেই সত্যদেবের উপাসক।

জৈনগণের অলোকস্তোত্র নামক শ্লোকনিচয়ের অর্থ উদ্ধার করিতে গিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহাও ব্যাখ্যা করিলে বুঝিতে পারিবেন, জৈনীরা প্রকৃতপক্ষে কাহার উপাসনা করেন।

শ্লোক।

সহ অলোকজো তিন লোককে,
তিন কালবর্ত্তী সব জ্ঞেয়।
নিরখত নিজ করকো রেখা সম,
অঙ্গুলীযুত প্রত্যক্ষ অমেয়॥
এসেহী ভয় রাগ রোষ রুজ,
জরা ঔর লোভাদি অশেষ।
দোষ পলেশ জিস্ পদ নাহি পরশত,
বন্দিমে মহামহেশ॥

অর্থ।—স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতালসম্বন্ধে এবং ত্রিকালসম্বন্ধে যিনি সকল বিষয় জানেন। সে জানা কিরূপ? না—আপনার হস্তস্থিত করাঙ্গুলি ও হস্তস্থিত রেখা সমান, তাহা চাক্ষুষ দর্শন করেন, এই ব্রহ্মাণ্ডরহস্যসম্বন্ধে যিনি বিশেষরূপ জ্ঞাত আছেন। ভয়, রাগ, রোষ, রুজ (রোগ), জরা, আর

লোভাদি এই দোষ সকল যাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না, সেই যে মহামহেশ, তাঁহাকে বন্দনা করি।

এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডবিষয়ে অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিসম্বন্ধে যাঁহার জ্ঞান আছে এবং যিনি সংসারীর ন্যায় দোষাদির স্থল নহেন, সেই যে সর্ব্ববিকাররহিত, সর্ব্বজ্ঞ ভগবানই জৈনদিগের উপাস্য।

শ্লোক।

প্রেতভূমিমে মত্ত হুয়া জো,
নিত্য কিয়া করতা হৈ নৃত্য।
বাণানলসে নগর জলায়ে ঔ,
জিস্‌কা গুহ এক অপত্য॥
উহ ন কভী শঙ্কর হো শকতা,
করনেওয়ালা জগকল্যাণ।
কিন্তু ভয়াদিরহিত জো কোই,
"উহ" শঙ্কর সর্ব্বজ্ঞ প্রমাণ॥

অর্থ।—শ্মশানভূমিতে যিনি মত্ত হইয়া নিত্য নৃত্য করেন এবং যিনি বাণানলে অর্থাৎ বাণের অগ্নিদ্বারা নগর জ্বালাইয়া দেন, আর গুহ নামক যাঁহার অপত্য বা সন্তান, তিনি জগতকল্যাণকারী শঙ্কর হইতে পারেন না। কেন না, চিত্তে বিকার না হইলে কেহ শ্মশানে উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করিতে পারে না, আর হৃদয়ে রোষাদি দোষজনক বৃত্তি না থাকিলে তিনি নগর গ্রাম অস্ত্রানলে পুড়াইতে পারেন না। গুহ নামক অপত্য বা সন্তান যাঁহার রহিয়াছে, এই সন্তান জন্ম দিতে তাঁহাকে কামাদির বশবর্ত্তী হইতে হইয়াছে। যিনি এই কামের বশবর্ত্তী হইয়া নারীসঙ্গদ্বারা পুত্রোৎপাদনও করিয়াছেন, তিনি জগৎকল্যাণকারী শঙ্কর হইতে পারেন না। কেন না, সংসারী জীবের ন্যায় যাঁহার আশয়, তিনি আপনার সংসার-স্বার্থ দেখিতেই ব্যস্ত, তিনি কি করিয়া জগতের কল্যাণ করিবেন!! পরন্তু ভীত না হইলে তিনি অস্ত্রসাহায্য লইয়া জীববসতিপূর্ণ নগর ধ্বংস করিতে পারেন না। তাহা হইলেই তিনি ভয়াদিদ্বারা অভিভূত! এখন যিনি ভয়, রোষ, রাগাদিদোষে দুষ্ট, তিনি কি করিয়া জগতের কল্যাণ করিবেন? যিনি নিজেই ভীত হন, তিনি অপরের ভীতি কি করিয়া নষ্ট করিবেন? যিনি নিজেই রোষান্বিত হন, তিনি অপরের রোষ কি করিয়া নিবারণ করিবেন? যিনি নিজেই অনুরাগী, তিনি অপরকে কি করিয়া বিকারহীন করিবেন? তবে এই সকল দোষশূন্য যিনি, তিনিই আমার শঙ্কর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, মহামহেশ। যিনি নির্ব্বিকার ও দ্বন্দ্বরহিত, আমি সেই সনাতন, আদি মহেশ্বরকে প্রণাম করি।

হিন্দুদর্শনেও ঈশ্বর বা ব্রহ্মকে তাহাই বলা হইয়াছে। তিনি অনাদি, অনন্ত, অব্যয়, বিকারহীন স্থাণুবৎ, সেই সনাতন পুরুষ। তিনি রাগ, রোষ প্রভৃতি দোষশূন্য। দর্শনের মূলতত্ত্বে জৈনদর্শনের সহিত হিন্দুদর্শনের কোন তফাৎ নাই।

তারপর জৈনগণের ধর্ম্মের প্রধান জিনিষ হইতেছে যে, "বিশ্বপ্রেম।" বিশ্বপ্রেম, সুধু যে মানবের ভেতরে আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে, সমগ্র জীবজন্তুও তাহাদের প্রেমের অধীন। "অহিংসাই পরম ধর্ম্ম।" অহিংসা যে শুধু প্রাণ গ্রহণ না করা, তাহা নহে, জীবকুলকে কোন প্রকার বিরক্ত না করাও তাহার মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

যাহা হউক, এবার উপর্য্যুক্ত নবতত্ত্বের সম্যক্ ব্যাখ্যা দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

১। জীব—জীব কাহাকে বলে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে জীবের সম্বন্ধে আরও একটু বলিব। জীব চারিভাগে বিভক্ত।—১ নরক, ২ তির্য্যক্, ৩ মনুষ্য, ৪ দেব।

২। অজীব—চৈতন্যলক্ষণহীন যাহা বা যে বস্তু, সেই অজীব। অজীবও চারি প্রকার; যথা—১। ধর্ম্মাস্তিকায়, ২। অধর্ম্মাস্তিকায়, ৩। আকাশাস্তিকায়, ৪। পুদ্‌গল (পরমাণুসমষ্টিতে যে যে বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও শব্দ।) এই উপরিলিখিত পঞ্চ দ্রব্যই অজীব।

৩। পুণ্য—যাহার উদয়ে জীবের হৃদয়ে সুখ হয়, তাহাই পুণ্য; জীবের মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহাই পুণ্য।

৪। পাপ—যাহার উদয়ে জীবের দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাই পাপ।

৫। আস্রব মিথ্যাত্ব, অবিরতি, প্রমাদ, কষায় ও যোগ, ইত্যাদিগকে আস্রব বলে।

৬। সংবর—পূর্ব্বে যে আস্রব বলা হইল, উহাকে নিরোধ করার নামই সংবর।

৭। নির্জরা—স্পৃষ্ট, বদ্ধস্পৃষ্ট, নিদ্ধত্ত ও নিকাচিত করাই অর্থাৎ জীব কর্ম্মপ্রবাহকে নিবারিত করিবার জন্য যে তপ, চারিত্র, ধ্যান ও জপের আবশ্যক, উহাকেই বলে নির্জরা।

৮। বন্ধ—জীব এবং কর্ম্ম, এই দুইয়ের পরস্পর মিলন অর্থাৎ ক্ষীর ও নীরকে যেমন একত্র করা, এই ভাবকে বন্ধ বলে।

৯। মোক্ষ—ঔদরিক স্থূলশরীর ও তেজোময় সূক্ষ্ম-শরীর, কর্ম্মদ্বারা যিনি এই দুইকেই আত্মার সঙ্গে পৃথক্ করেন, আর কখনও জীবের সহিত উহার বন্ধদশা না হয়, উহাকেই মোক্ষ বলে।

মোটের উপর নবতত্ত্বের এই মোটামুটি ব্যাখ্যা জৈন-গ্রন্থে পাওয়া যায়। সংক্ষেপতঃ যাহা দেখাইলাম, জৈনগণের মধ্যে এই তত্ত্বই সর্ব্বদা আলোচিত হইয়া থাকে।

জৈনেরা একেশ্বরবাদী। তাহারা এক বই দুইয়ের অস্তিত্ব মানে না। হিন্দুদর্শনের যিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্," জৈনদর্শনের তিনিই মহামহেশ্বরম্। সর্ব্বভাবাতীত ও সর্ব্বগুণাতীত—মহান্। দোষলেশশূন্য—পরিপূর্ণ "সত্যম্"।

[ক্রমশঃ।

বৌদ্ধধর্ম্ম।

[জনৈক অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।]

প্রায় সাত কিম্বা আট শতাব্দী পূর্ব্বে বঙ্গবিজেতা বক্তিয়ার খিলিজিকর্ত্তৃক বাঙ্গালায় ও মগধের বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধস্তূপ-সমূহ বিধ্বস্ত হয়। একাদশ শতাব্দীতে তিব্বত দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সংস্কারকল্পে তিব্বতের রাজার আমন্ত্রণে বিক্রমশিলার বিহার হইতে স্থবির দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বতে গমন করেন। অযোধ্যার শ্রাবস্তিতে এবং বেহারের বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত তাম্রলিপি ও শিলালিপি প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও বঙ্গীয় বৌদ্ধনৃপতিগণ বিহারনির্ম্মাণের শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপরে এই দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে আর বৌদ্ধমন্দিরগঠনের সম্ভাবনা ছিল না। আক্রমণকারী মুসলমানগণ বৌদ্ধদিগের সমস্ত তীর্থগুলি বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছিল। কনোজ, শ্রাবস্তি, পাটলিপুত্র, বারানসী, কোশম্বি, মিথিলা, রাজগৃহ প্রভৃতি কোথায় তাহারা বৌদ্ধমন্দির গঠিত করিবে? আক্রমণকারী মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক তিন সহস্র বৎসরের সঞ্চিত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইয়া ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপারে নীত হইয়াছিল। বিজেতৃ-গণের মশালের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় নালন্দা, মিথিলা, বারাণসী, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বৌদ্ধতীর্থের বিহার ও পুস্তকাগার ভস্মীভূত হইয়াছিল। দয়া ও ক্ষমামূলক ধর্ম্ম উৎসাদিত হইল, ধ্বংসমূলক ধর্ম্মই ভারতে প্রবেশ করিল। প্রাচীন ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়,—দয়া ও জ্ঞানমূলক প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা লোকের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাচীন আর্য্য বৌদ্ধগণের অনুসন্ধানের ও গবেষণার ফল ভারতের বাহিরে অন্য দেশে এখনও লক্ষিত হইয়া থাকে। সমস্ত এসিয়াখণ্ড ভগবান্ বুদ্ধদেবের দয়াপূর্ণ বিধানবনস্পতির শান্তচ্ছায়ায় অবস্থিতি করিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রচারকগণ পশ্চিমে সিরিয়া পর্য্যন্ত সদ্ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিল, পূর্ব্ব-এসিয়ায় জাপান, কোরিয়া, চীন, মাঞ্চুরিয়া, শ্যাম, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারকদিগের কীর্ত্তিকেতন আজিও উড্ডীন রহিয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যবদ্বীপ বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল। আফগানিস্থানে, কাশ্মীরে, সোয়াটে, পার্থিয়ায় ও মধ্য-এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল, শেষে সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরব আক্রমণকারীরা ঐ সকল দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম নির্ব্বাসিত করিয়া দেয়।

হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিমস্থিত দেশসমূহ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হওয়াতে পৃথিবীর কি বিষম ক্ষতিই হইয়াছে! সুদূর প্রতীচ্য এসিয়ায় বৌদ্ধযুগে সংস্কৃত ও পালি ভাষাই পঠিত হইত। এখনও ব্রহ্মদেশে, শ্যামদেশে, কাম্বোডিয়ায়, চীনে, তিব্বতে, জাপানে এবং কোরিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্ম সজীব রহিয়াছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারত হইতে যদি বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাদিত না হইত, * তাহা হইলে আমরা এখনও সুদূর প্রাচীর সহিত প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ একটি জনসমাজ দেখিতে পাইতাম।

সপ্তম শতাব্দীতে সমস্ত এসিয়াখণ্ডেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ছিল। প্রায় দেড় হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতের অধিকাংশ লোকই ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রচারিত সদ্ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তী ছিল। তাঁহার ধর্ম্মশিক্ষা কেবল আভিজাতদিগের জন্য পরিকল্পিত নহে। বৌদ্ধসঙ্ঘে অতি নিম্নস্তরের চণ্ডালেরও স্থান আছে। বৌদ্ধসঙ্ঘ মহাবারিধির ন্যায় উদার এবং যে কোন সুস্থকায় ব্যক্তি,—যদি সে কাণা-বধির বা মূক না হয়, উহাতে অবাধে প্রবেশলাভ করিতে পারিত।

বর্ত্তমানকালের ভারতবাসীরা বৌদ্ধধর্ম্ম কি, তাহা বুঝে না; পাশ্চাত্যখণ্ডের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্ম কি, তাহা জানেন না। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের শত্রু এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে যাঁহাদের দৃষ্টি স্বার্থপরতাজনিত পক্ষপাতদোষে দুষ্ট, তাঁহারাই এই ধর্ম্ম-মতকে বিকৃত করিয়াছেন এবং সেই বিকৃত চিত্র লোক-লোচনের সম্মুখে ধরিয়া উহা দুঃখবাদপূর্ণ নাস্তিক্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে যেমন যাঁহারা বৈদ্যুতিক ব্যাপার-সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যেমন তৈলপ্রদীপ লইয়া মাথা ঘামান না অথবা যাঁহারা 'মোটরকার'-সম্বন্ধীয় ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত থাকেন, তাঁহারা যেমন গোরুর গাড়ির কথা চিন্তাই করেন না, সেইরূপ ভগবান্ বুদ্ধদেব তদানীন্তন যুগের জড়বাদমূলক শিক্ষাসম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। বুদ্ধদেব নিজের জ্ঞানধর্ম্মের আলোচনায় নাস্তিক্য মত, লোকায়ত মত, যজ্ঞকাণ্ড, রুদ্রসাধ্য যোগ প্রভৃতি মিথ্যা বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই। অনুত্তর-সম্বোধিমতে ধর্ম্মই সম্মানের বস্তু,—ভগবান্ বুদ্ধদেব ইহাই লোককে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বুদ্ধদিগের দর্শনে আরম্ভবাদ বা পরিণামবাদের স্থান নাই। বৌদ্ধত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে শাক্য-

---

* যে সময় ভারতে প্রথমে মুসলমানাধিকার প্রবর্ত্তিত হয়, সে সময় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিশেষ প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয় না। মুসলমান অধিকারের বহুপূর্ব্বেই ভারতে হিন্দুধর্ম্ম মস্তক উত্তোলন করিয়া ছিল। মুসলমানেরা যদি ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎসাদিত করিত, তাহা হইলে সমস্ত ভারত মুসলমান হইত, হিন্দু হইত না।

সম্পাদক।

সিংহ সূর্য্যবংশে ইক্ষ্বাকুকুলের এক জন রাজপুত্র ছিলেন। তিনি শাক্যবংশের নৃপতিপুত্র ছিলেন এবং সত্য আবিষ্কারের পর ধরাবাসীদিগের সুখপ্রদানের জন্য তিনটি রাজপ্রাসাদ, একমাত্র পুত্র ও সুন্দরী ভার্য্যা যশোধারাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর ধরিয়া তিনি নিবিড় অরণ্যে গভীর তপশ্চরণ করিয়াছিলেন, শরীরকে নানারূপ কষ্ট দিয়াছিলেন, একেবারে অনাহারে ছিলেন, নিদাঘে প্রচণ্ড ভানুতাপে ও প্রখর শীতে তপস্যা করিয়া, কৃচ্ছ্রসাধ্য হঠযোগ ও প্রাণায়াম করিয়া কষ্ট কি, তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সুখ কি, তাহাও উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা রাজা শুদ্ধোদন তাঁহাকে যেমন সুখে রাখিয়াছিলেন, কোন লোক তেমন সুখের আস্বাদ পায় না।

বুদ্ধদেব ছয় বৎসর বনবাসকালে সর্ব্বপ্রকার যোগসাধন করিয়াছিলেন এবং উচ্চতম মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। "আমি কি"—এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য তিনি সর্ব্বপ্রকার দার্শনিকতত্ত্ব পাঠ করিয়াছিলেন এবং এই সত্যে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ যেমন মিথ্যা, শরীরকে কষ্ট দেওয়াও তেমনই নিষ্ফল। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ও কৃচ্ছ্রসাধ্য তপশ্চরণের মধ্যপন্থা অবলম্বনই তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কারণ, ইন্দ্রিয়জ সুখভোগ ও তপশ্চরণ—উভয়েই অহঙ্কার ও মমকার বৃদ্ধি করে।

কোন কোন ধর্ম্মমতে ঈশ্বর অতীত যুগে এক সময়ে মানবের আত্মাকে সৃষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পর দেহের নাশ হয়, আত্মা ঈশ্বরের নিকট যায়। সুতরাং মানুষের আদি আছে, ঈশ্বরের আদি নাই। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্ট করিয়া তাহাকে এত কষ্টভোগ করিতে দিলেন কেন? তাহার উত্তরে এইমাত্র বলা হয়,—ইহা তাঁহার ইচ্ছা। এইখানে ঈশ্বরকে যথেচ্ছাচারী রাজার মত—যে রাজা আপনার খুসীর জন্য প্রজাদিগকে বিনষ্ট করিবার আদেশ দেন, সেই রাজার মত—কল্পনা করা হইয়াছে। যে সকল লোক অত্যাচারী রাজার শাসনে অভ্যস্ত, তাহারা ঐ মত অবনতমস্তকে গ্রহণ করে। কোনও রূপ আইন ব্যতীত স্বেচ্ছাচারী শাসনতন্ত্র পরিচালিত করা যায় না; সুতরাং অল্প লোকের সুবিধামত আইন রচিত হইল। এই প্রকারে স্বেচ্ছাচারমূলক শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইল এবং কয়েক পুরুষ ধরিয়া সেই শাসনপদ্ধতি চলিল। তৎপরে মানুষের মনে একটা পরিবর্ত্তন ঘটিল। কষ্টের জন্য মানুষ চিন্তিত হইয়া পড়িল। তাহারা কি প্রকারে অত্যাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। তখন নানাধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইল, দেবগণের সৃষ্টি হইল, ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত হইল, মনুষ্য ও দেবতার মধ্যস্থ করিবার জন্য ধর্ম্মযাজক নিযুক্ত হইল, যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড প্রবর্ত্তিত হইল। যজ্ঞে পশুবলিপ্রদান আরব্ধ হইল। দেশে বিধিবলে ধর্ম্মের শাসন প্রবর্ত্তিত হইল। এই প্রকার শাসনব্যবস্থাকে স্বেচ্ছাচারমূলক একেশ্বরবাদ বলা যায়। কোন কোন দেশে এইরূপ ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হইল। আবার কোন কোন দেশে বহুদেবতাবাদমূলক স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত হইল।

বুদ্ধদেব দুইটি ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তিত করেন। একটি গৃহস্থের ও আর একটি ব্রহ্মচারীর পক্ষে। গৃহস্থের পক্ষে তিনি দয়া-মূলক নীতিধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। উহাকে মনুষ্যধর্ম্ম কহে। ব্রহ্মচারীদিগের পক্ষে তিনি যে ধর্ম্মের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা উত্তরী মনুষ্যধর্ম্ম নামে পরিজ্ঞাত। গৃহস্থের পক্ষে প্রতি দিন পাঁচটি বিধান ও ওপোসথ দিনে অর্থাৎ সপ্তাহে এক দিনে আটটি বিধান পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যের মৌলিক নীতি কি, তাহা উপলব্ধির জন্যই ঐ আটটি বিধান পরিকল্পিত। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাই প্রধান; তিনি মূর্ত্তিমান্ প্রেম, দয়া, আনন্দ ও ন্যায়স্বরূপ। সাধারণ বিধানগুলি ব্রহ্মচর্য্যপালনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। সেই জন্য ভগবান্ বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছেন যে, যে গৃহস্থ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহাকে আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। যে সকল গৃহস্থ সংসারে থাকিয়াও কামিনীসংসর্গ-ত্যাগী, তাঁহারা গৃহস্থ ব্রহ্মচারী বলিয়া অভিহিত। মরণান্তে ইঁহারা ব্রহ্মলোকে বসতি করে। যাঁহারা গৃহস্থ ব্রহ্মচারীর ন্যায় অষ্ট বিধান প্রতিপালন করেন না, কেবল পঞ্চ বিধান পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা মৃতদেহত্যাগের পর ছয় দেবলোকের মধ্যে যে কোন লোকে যাইতে পারেন।

ব্রহ্মলোক, দেবলোক, মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেত-লোক, তীরশ্চিন্‌লোক ও নরক লইয়াই সংসারচক্র।

যোগশাস্ত্র।

[শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী লিখিত।]

(৫) বজ্রাসন।

জঙ্ঘাভ্যাং বজ্রবৎ কৃত্বা গুদপার্শ্বে পদাবুভৌ।
বজ্রাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্॥

উভয় জঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া চরণযুগল গুহ্যদেশের দুই পার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে, ইহাকে বজ্রাসন বলে। ইহা যোগীদিগের সিদ্ধিদায়ক।

এই আসন অভ্যাসদ্বারা অধোস্থিত অপানক্রিয়া সরল হয়, মলমূত্রাদিজনিত কোন ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না, জানুর অস্থি বজ্রের ন্যায় কঠিন হয়।

উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয় পাদতল সংস্থাপিত করিয়া ত্রিকোণাকৃতি আসন বন্ধনপূর্ব্বক সরল শরীরে সুখে উপবিষ্ট হইবে, ইহার নাম স্বস্তিক বা মাঙ্গল্য আসন।

এই আসন দেহের পক্ষে অতীব মঙ্গলপ্রদ ও সুখজনক। এই আসন অন্যান্য আসনের ন্যায় আয়াসসাধ্য নহে। অনভ্যস্ত ব্যক্তিও বহুক্ষণ বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে সক্ষম হয়। এই আসনের গুণে শরীরের পাপতাপ নষ্ট হয়, কাম-ক্রোধাদির বিকার তিরোহিত হয়, মেরুদণ্ড সরল হইয়া সাধককে দীর্ঘজীবী করে। ইহা বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীজাতি, সকলেই অভ্যাস করিতে পারেন।

প্রকারান্তরে শিবসংহিতা বলেন :—

জানুর্ব্বোরন্তরে সম্যগ্ধৃত্বা পাদতলে উভে।
সমকায়ঃ সুখাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥

অস্য ফলং যথা—

অনেন বিধিনা যোগী মারুতং সাধয়েৎ সুধীঃ।
দেহেন ক্রমতে ব্যাধিস্তস্য বায়ুশ্চ সিদ্ধতি॥
সুখাসনমিদং প্রোক্তং সর্ব্বদুঃখপ্রনাশনম্।
স্বস্তিকং যোগিভির্গোপ্যং স্বস্থীকরণমুত্তমম্॥

অর্থাৎ যোগী এই বিধানদ্বারা বায়ুসাধন করিবে। স্বস্তিকাসন সাধন করিলে কোন ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না; অনায়াসে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়, ইহার অন্য নাম সুখাসন। এই আসনপ্রভাবে সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। ইহা যোগিগণের অতি গোপনীয়।

(৬) স্বস্তিকাসন।

জানুর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষ্যতে॥

(৭) সিংহাসন।

গুল্ফৌ চ বৃষণ স্যাধো ব্যুৎক্রমেণোর্দ্ধতাং গতঃ।
চিতিমূলো ভূমি সংস্থঃ কৃত্বা চ জানুনোপরি॥

ব্যক্তবক্তো জালন্ধঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশকম্॥

উভয় গুলফ অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে উদ্ধভাগে বহিস্থত করিবে এবং উভয় জানু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিত রূপে উন্নত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক জালন্ধরবন্ধ অবলম্বন করিয়া নাসার অগ্রভাগে অবলোকন করিবে, ইহার নাম সিংহাসন। ইহা দ্বারা সকল রোগ নষ্ট হয়।

এই আসন অভ্যাসদ্বারা প্রধানতঃ পাকস্থলীর অগ্নি বৃদ্ধি হয়, অগ্নিমান্দ্য, আমাশয়, অম্লশূল ইত্যাদি কোন প্রকার ব্যাধি শরীরকে আক্রমণ করিতে পারে না। দেহস্থিত বায়ু সবল হয়, বাতাদি বিবিধ বায়ুজনিত ব্যাধি শরীরে উপস্থিত হয় না। যে ব্যক্তি আহারের পরক্ষণেই আচমনান্তে এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া মস্তকোপরি আদহস্ত সংস্থাপন করে এবং সেই হস্ত বক্ষঃস্থলে লইয়া কিয়ৎকাল সমদৃষ্টিতে থাকে, তাহাকে কখন কোন প্রকার দুর্জ্জয় ব্যাধি আক্রমণ করিতে সাহস পায় না। সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হয়।

পূর্ব্বকালে রাজা প্রজা সকলেই এই আসন অভ্যাস করিয়া স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যকার্য্য সাধন করিতেন। অতি প্রাচীন রাজগণ এই আসনকে আপনাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন।

(৮) গোমুখাসন।

পাদৌ চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্ঠপার্শ্বে নিবেশয়েৎ।
স্থিরকায়ং সমাসাদ্য গোমুখং গোমুখাকৃতিঃ॥

পাদযুগল ভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া স্থির (অবক্র) শরীরে গোমুখের ন্যায় উদ্ধে মুখ করিয়া বসিবে, ইহার নাম গোমুখাসন। এই গোমুখাসন অভ্যাস করিলে কণ্ঠ, পৃষ্ঠ ও বক্ষঃসম্বন্ধে যাবতীয় রোগ নষ্ট হয়, চক্ষুর জ্যোতি বর্দ্ধিত হয়, পৃথিবীর বিবিধ বিষয়বিকারে মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে না। গোমুখাসনাভ্যস্ত ব্যক্তি অনায়াসে নিদ্রাকে জয় করিতে সমর্থ হয়।

(৯) বীরাসন।

একপাদমথৈকস্মিন বিন্যসেদরু সংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতীরিতম॥

এক চরণ এক উরুদেশে সংস্থাপিত করিবে এবং অন্য চরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিবে, ইহাকে বীরাসন বলে।

এই আসন অভ্যাস করিলে মনুষ্য বীরের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন হয়। ইহা দ্বারা হস্তপদের অসাধারণ বল রক্ষিত হয়। এই আসন শত্রুর ভয়প্রদ এবং সাধকের অভীষ্ট বর প্রদানের মত। শক্তি নারায়ণী জ্ঞানবান যোগসাধক এই আসন অভ্যাসদ্বারা দেবার্চ্চন ধ্যান, আহ্বান ও সর্ব্বসিদ্ধি করিবেন। ইহাতে শক্তি প্রসন্না হন।

[ক্রমশঃ।]

গান।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস লিখিত।]

বাকৃশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি-মাত্রেই গান করিতে পারেন।
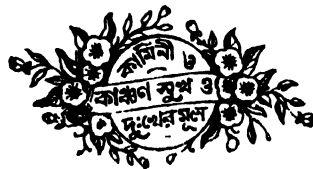
শব্দ বা সুর সংযুক্ত না হইলে কোন প্রকার বাক্য প্রকাশিত হইতে পারে না; অতএব বাকৃশক্তিসম্পন্ন মানবমাত্রেরই কিছু না কিছু গান গাহিবার ক্ষমতা আছে। অতি শৈশব অবস্থা হইতে কোন প্রকার ব্যাকরণ-কলাপাদির জ্ঞান না থাকিলেও যেমন স্বভাবতঃই মনের ভাব প্রকাশ করিবার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সঙ্গীত-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ বা সঙ্গীত-বিদ্যার ব্যাকরণাদি আলোচনা না করিয়াও অল্প-বিস্তর শুদ্ধ বা অশুদ্ধভাবে প্রায় সকলেই গান করিতে পারেন। স্বভাবতঃ গান করিবার ক্ষমতা একেবারে নাই, এরূপ দুর্ভাগ্য মানব অতি বিরল।

ভাষা, কবিতা ও গান।

মনের ভাবপ্রকাশিকা বাক্য-বিন্যাসের নাম ভাষা। অধিকতর ভাব ঘনীভূত হইয়া ভাষা ছন্দোবন্দ-সমন্বিত হইলে কবিতারূপ ধারণ করে। কবিতায় রসানুযায়ী সুরলয় সংযুক্ত হইলে তাহার ভাবসমূহ জীবন্ত হইয়া সম্পূর্ণ ও সম্যক্‌রূপে অনুভবযোগ্য হইলেই গানে পরিণত হয়।

প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্র।

অতি প্রাচীনকাল হইতে আমাদের দেশে গানের চর্চ্চা হইয়া আসিতেছে এবং নানাবিধ মতানুযায়ী সঙ্গীতের প্রাচীন শাস্ত্রও দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা যে সকল প্রাচীন শাস্ত্র আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে বহুবিধ রাগ রাগিণীর নাম, রূপ, লক্ষণা প্রভৃতির উল্লেখ ব্যতীত আধুনিক য়ুরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রাদির ন্যায় স্বরলিপি বা সুর লিপিবদ্ধ করিবার উপায়, কণ্ঠমার্জ্জনা, স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর উৎকর্ষ করিবার প্রণালী এবং নানাবিধ যন্ত্র ও কণ্ঠস্বরের একতানে সংযোগ করিবার ব্যাকরণ (Harmony) প্রভৃতি এবং কোন প্রকার অভ্যাস করিবার (Practical) শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না।

রাগ রাগিণীর প্রথম বাঙ্গালা স্বরলিপি ও আধুনিক সঙ্গীত-পুস্তকাদি।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের ঐ সকল অভাব দূর ও উৎকর্ষসাধনকল্পে কিছুকাল পূর্ব্বে পরলোকগত মহানুভব রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বহু অর্থব্যয় ও যাবজ্জীবন চেষ্টা করিয়া রাগ রাগিণীর প্রথম বাঙ্গালা স্বরলিপিপ্রণয়ন ও নানাবিধ সঙ্গীত-পুস্তকাদি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও সঙ্গীত-সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করিয়া ভারত-সঙ্গীতের বহু উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় যন্ত্র ও কণ্ঠসঙ্গীতবিষয়ক কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কণ্ঠসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব।

সঙ্গীত দুই প্রকার; প্রথম—কণ্ঠ সঙ্গীত বা গান, দ্বিতীয়—যন্ত্রসঙ্গীত। শেষোক্ত যন্ত্রসঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীতের অনুকরণ মাত্র। যন্ত্রসঙ্গীত যতই উন্নত হউক না কেন, উহা কোন প্রকারে কণ্ঠসঙ্গীতের সমকক্ষ হইতে পারে না। কারণ, কণ্ঠসঙ্গীতের বাণী বা কথা এবং তাহার উচ্চারণের সঙ্গে মনোভাবব্যক্তকারী স্বরভঙ্গী (expression) যত সহজে ও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা যায়, যন্ত্রে তাহা অপেক্ষা অসম্পূর্ণভাবেও প্রকাশ করা দুরূহ। সেই জন্য গান যন্ত্রাদি বাদ্য হইতে অধিকতর সম্পূর্ণ ও মনোরঞ্জনকারী।

স্বাভাবিক ও বাজ-খাঁই স্বর।

গান গাহিতে হইলে সুললিত কণ্ঠ স্বর ও সুস্পষ্ট বাক্যোচ্চারণের ক্ষমতা থাকা বিশেষ আবশ্যক। স্বভাবতঃ মনোহর কণ্ঠস্বর আছে, এরূপ সৌভাগ্যবান্ মানব অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মার্জ্জনা ও অভ্যাস করিলে সাধারণের মধ্যেও অনেকের কণ্ঠস্বর সুশ্রাব্য হইতে পারে। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষসাধন কি উপায়ে সম্ভব হয়, সে বিষয়ে ভারতবর্ষীয় কালাবত বা ওস্তাদী গায়কগণ সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর সাধনপ্রণালীর দোষে বিকৃত বা বাজখাঁইরূপ ধারণ করে। বাজখাঁই স্বর স্বাভাবিক স্বর অপেক্ষা নিকটে অত্যন্ত তীব্র কোলাহলকারী বা জমাট বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দূরে যাইলে যেখানে ইহা একেবারে শ্রুতিগোচর হয় না, স্বাভাবিক স্বর সেখানেও স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ওস্তাদী গায়কদিগের স্বর কিরূপে বাজখাঁই হইয়া যায়, তাহার কারণ তাঁহারা জ্ঞাত নহেন। তাঁহাদিগের কণ্ঠস্বর বাজখাঁই হইবার

স্বর বাজখাঁই হইবার কারণ।

কারণ, তানপুরাযন্ত্রের সহযোগে স্বর-সাধন এবং বিশ্রাম না লইয়া একেবারে অধিকক্ষণ ধরিয়া গান অভ্যাস করা। কণ্ঠ অতীব কোমল যন্ত্র। যেরূপ যন্ত্র বা কণ্ঠস্বরের সহযোগে সর্ব্বদা গান করা যায়, সেই প্রকারের ধ্বনি অনুকরণ করাই ইহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তানপুরাযন্ত্রের স্বাভাবিক ধ্বনি অতি ক্ষীণ। এ জন্য তাহার সোয়ারীর উপর তারের নিম্নে স্থানবিশেষে পরিমাণমত সূত্রখণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিলে তাহাতে সুরের জোয়ারী উৎপন্ন হয়। নিয়ত

তানপুরার সঙ্গে কণ্ঠসাধন করিলে কণ্ঠও অজ্ঞাতসারে (involuntarily) ঐ প্রকার ধ্বনির অনুকরণের জন্য কণ্ঠে জোয়ারী বসাইয়া লয়। অধুনা যাঁহারা হারমোনিয়ামের সঙ্গে সর্ব্বদা গান করেন, তাঁহাদের স্বর রিডের শব্দের ন্যায় চেরা হইয়া যায়। বাইজীরা সারিঙ্গীর সঙ্গে সর্ব্বদা গান করে বলিয়া তাহাদের কণ্ঠস্বর ঐ যন্ত্রের ন্যায় অনুনাসিক ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, এ দিকে বৈষ্ণব কীর্ত্তনীয়াগণ তাঁহাদের ওস্তাদ গায়কদিগের কণ্ঠস্বরের সহিত সর্ব্বদা গান করিয়া শিক্ষা লাভ করেন বলিয়া তাঁহাদের কণ্ঠস্বর বাজখাঁই হয় না।

সুকণ্ঠ গায়কের স্বরের সহিত কণ্ঠসাধনই শ্রেষ্ঠ উপায়।

উপরোক্ত কারণগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্বাভাবিক সুকণ্ঠ গায়কের সহিত কণ্ঠস্বর মিলাইয়া সাধনা করিলে অতি সহজে ও সত্বর স্বরের উৎকর্ষ লাভ হয়। কিন্তু তাহাতে অধ্যাপকের অত্যন্ত কষ্টসাধন ও অধিক সময় নষ্ট করিতে হয় এবং ছাত্রকেও সাধনসময়ে সর্ব্বদা অধ্যাপকের নিকট অবস্থান করিতে হয়। এই অসুবিধা নিবারণ ও সাধনকার্য্যের সুবিধার জন্য এরূপ একটি যন্ত্র নির্ব্বাচন করিয়া কণ্ঠসাধন করা কর্ত্তব্য, যাহাতে স্বাভাবিক স্বরের কোন প্রকার বিপর্য্যয় না ঘটে।

কণ্ঠসাধনার যন্ত্র নির্ব্বাচন।

আমাদের দেশে এখন যত প্রকার যন্ত্র প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে পিয়ানো অথবা ভাল বিলাতী বেহালা স্বরসাধনের সম্যক্ উপযোগী। স্বর্গীয় কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গীতসূত্রসারগ্রন্থে তানপুরায় জোয়ারী না দিয়া স্বরসাধন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে তানপুরার ধ্বনি এরূপ ক্ষীণ হইয়া যায় যে, সতেজ কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাহা প্রায় শ্রুতিগোচর হয় না। সুতরাং জোয়ারীশূন্য তানপুরার সহিত কণ্ঠসাধনা করিলে কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া পড়ে। পিয়ানোযন্ত্র দেশীয় কণ্ঠসঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিবার সম্যক্ উপযোগী নহে। কারণ দেশীয় গায়কগণ স্বাভাবিক স্বরগ্রামে সর্ব্বদা এক সুরে (solo) গান করিয়া থাকেন। এ জন্য তাঁহারা যে স্বরগ্রামের উপর গান করেন, তাহার পর্দ্দার ব্যবধান স্বাভাবিক অনুপাতে সাধিত হয়। য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ কম্পনপরিমাপক যন্ত্রাদির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, স্বাভাবিক স্বরগ্রামে নিম্নে সা হইতে তাহার অষ্টম পর্দ্দা উচ্চ সা পর্য্যন্ত কম্পনের সংখ্যা লইয়া তন্মধ্যস্থিত পর্দ্দা কয়েকটির আনুপাতিক ব্যবধান স্থির করিয়াছেন; যথা—সা হইতে ঋ ৯, ঋ হইতে গ ৮, গ হইতে ম ৫, ম হইতে প ৯, প হইতে ধ ৮, ধ হইতে নি ৯, এবং নি হইতে সা ৫। এইরূপ স্বাভাবিক অনুপাতে যন্ত্রাদির সুর বাঁধিলে য়ুরোপীয় প্রণালীর বহুমিল সুরের (Harmonized) সঙ্গত করিবার ও স্বরগ্রাম পরিবর্ত্তন করিলে, স্বাভাবিক স্বরগ্রামস্থ সুরের ব্যবধান তারতম্যপ্রযুক্ত সুর বেসুর হইয়া যায়। সেই জন্য তাঁহারা সা হইতে উপরের সা পর্য্যন্ত সমান ১২টি (semitor) অর্দ্ধসুরে বিভাগ করিয়া লইয়াছেন, এবং সেইরূপ বিভাগমত বিলাতী সমস্ত যন্ত্রগুলিই বাঁধা হইয়া থাকে। এ জন্য স্বাভাবিক স্বরগ্রাম অনুসারে (solo) গান করিবার সময় পিয়ানোযন্ত্রে সম্পূর্ণ সঙ্গত করা ভাল হয় না। তদ্ব্যতীত দেশীয় গানের কোন কোন রাগে অতি কোমল সুর ব্যবহৃত হয়। পিয়ানোতে অতি কোমল পর্দ্দা নাই। সে জন্য ঐ সকল রাগের গান পিয়ানোর সহিত সম্পূর্ণ সঙ্গত হওয়া অসম্ভব। পিয়ানোর সহিত দেশীয় গানের সম্পূর্ণ সঙ্গত না হইলেও তানপুরার ন্যায় কয়েকটি মাত্র পর্দ্দা অবলম্বন করিয়া কণ্ঠসাধনা করা অনায়াসে চলিতে পারে। কণ্ঠের সঙ্গে সঙ্গতের বিশেষ উপযোগী যন্ত্র বেহালা। যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে বেহালা কণ্ঠস্বরের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর নিকটবর্ত্তী। ইহার পর্দ্দা বাঁধা নাই বলিয়া স্বাভাবিক স্বরগ্রামসম্মত গানের সহিত সঙ্গত সম্যক্‌রূপে হইতে পারে। পুরুষকণ্ঠের জন্য (Violoncello) ও স্ত্রীকণ্ঠের জন্য সাধারণ ছোট বেহালা ব্যবহার করা উচিত।

দেশীয় গানে পিয়ানোর সঙ্গত অনুপযোগী হইবার কারণ।

স্বরগ্রামের স্বাভাবিক আনুপাতিক ব্যবধান।

বিলাতী স্বরগ্রামের পার্থক্য।

পিয়ানো-সাহায্যে কণ্ঠসাধনা চলিতে পারে।

কণ্ঠের উপযোগী যন্ত্র বেহালা।

ওস্তাদগণের অনভিজ্ঞতা।

ভারতবর্ষীয় গান শিক্ষা করিতে হইলে সাধারণতঃ কালাবত ওস্তাদদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। কালাবত ওস্তাদগণ সকলেই অশিক্ষিত এবং বৈজ্ঞানিকপ্রথায় শিক্ষাপ্রদানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এ জন্য তাঁহারা ছাত্রের অধিকাংশ সময় অনর্থক পরিশ্রম করাইয়া নষ্ট করেন। বৈজ্ঞানিকপ্রণালীতে কণ্ঠসাধনা করিলে এক বৎসরে যাহা সাধিত হয়, ওস্তাদগণের নিকট যাবজ্জীবন পরিশ্রম করিলেও তাহা কখনও হইতে পারে না। অধিকন্তু দূষিতপ্রণালী অনুসরণের ফলে চিরকালের জন্য স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া যায়। অতএব শিক্ষার্থিগণ যদি প্রথমে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকপ্রথা অবলম্বনে কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষ সাধন করিয়া পরে ওস্তাদগণের রাগরাগিণী ও গান শিক্ষা করেন, তাহা হইলে অতি সহজে ও সত্বর মনোহর স্বরে গান গাহিতে পারেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ" পত্রে সুবিখ্যাত কবিবর শ্রুযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর য়ুরোপীয় সঙ্গীত নামক একটি প্রবন্ধমধ্যে তথাকার গায়কদিগের কণ্ঠস্বরের ক্ষমতাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"* * * * Never before I had beheld

য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষার উৎকর্ষতা।

such an extraordinary command over the voice * * * *" অর্থাৎ কণ্ঠস্বরের উপর এরূপ অসাধারণ আধিপত্য আমি কদাপি দৃষ্টিগোচর করি নাই।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম।

বৈজ্ঞানিকপ্রথানুসারে কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম সাধন করিতে হয়। এই ব্যায়াম সাধন করিলে ফুসফুস্‌ ও বক্ষের আয়তন বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে বায়ুধারণার ক্ষমতা হইলে কণ্ঠস্বরের তেজ বৃদ্ধি করে ও গান করিবার সময় শ্বাসকষ্ট হ্রাস হইয়া যায়। এই শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম আমাদের প্রাণায়াম প্রক্রিয়ার অনুরূপ। ইহা অভ্যাস করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও তৎসঙ্গে দৈহিক ও মানসিক স্ফূর্ত্তি এবং বলসঞ্চার হইয়া থাকে।

শ্বাসপ্রক্রিয়ার প্রাচীনত্ব।

প্রাচীনকালে দেশীয় গায়কগণ প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। ইটালী-দেশের গায়কেরা এই প্রক্রিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাপিও অভ্যাস করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের কণ্ঠসাধনপ্রণালী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইটালীয়দিগের প্রথানুসারে যাঁহারা কণ্ঠসাধন করেন, তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর গায়কগণের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন।

গানশিক্ষার্থীর লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনীয় বিষয়।

কণ্ঠস্বরের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আরও কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। গায়কগণের সর্ব্বদা পরিমিত ও লঘুপাক দ্রব্য আহার করা উচিত। আহারের অব্যবহিত পরে গান করা উচিত নহে। অতিশয় অম্ল, তিক্ত, কটু (ঝাল) অথবা পর্য্যুষিত দ্রব্য ব্যবহার করা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য। কোন প্রকার মাদকদ্রব্য ব্যবহার করা উচিত নহে। রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিক উত্তেজনা এবং যাহাতে স্বাস্থ্যের হানি না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

[ক্রমশঃ]
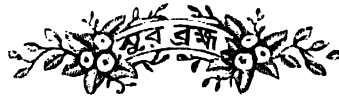
হিন্দু নারী।

[শ্রীতারা।]

নারী—জননী।
নারী—প্রজাবতী।
নারী—মাতা।
নারী—গৃহশ্রী।
নারী—অন্নদা অন্নপূর্ণা।
নারী—অভয়া।
নারীর স্বরূপ—মাতৃত্ব, স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া।

শাস্ত্র বলেন,—"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।" যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, সেই দেবী মহামায়া ভগবতী।

নারীর স্থান আর্য্যেরা এমনই করিয়া সর্ব্বোচ্চস্থানে দিয়াছেন। তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। নারী বিনা-বিচারেই সর্ব্বোচ্চস্থানাধিকারিণী; কারণ, তিনি যে জীব-প্রসবকারিণী মহাশক্তি। জগদ্‌জীবকে গর্ভে ধারণ করিয়া নারী আপনার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখিয়াছেন।

নারীর মহিমা পুত্র হইতে স্ফূর্ত্তি পায়। নারী—নর-লোকের সর্ব্বোত্তমাপূজ্যা মহামহিমময়ী মহাশক্তির আধার-স্বরূপিণী মহাপ্রকৃতি।

যে দিন জীব প্রথমে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে আসে, সে প্রথমেই সেই নারী দর্শন করে এবং নারীর স্তন্য পান করিয়া নারীকে মা বলিয়া ডাকিয়া আপনার মানবজন্ম—আপনার জীবজন্ম সার্থক করে।

জীবের জনয়িত্রী যিনি, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রসার, সর্ব্বাগ্রগণ্যা, পূজনীয়া, তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে? স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপিণী আনন্দ-প্রেমদায়িনী নারী জীব-জীবনের সর্ব্বসুখসম্পদের একমাত্র আধার।

চন্দনের "গন্ধপ্রবাহ" বলিলে যেমন অযথা উক্তি হয়, তেমনই নারীর বিশেষণ দিতে গেলে অযথা উক্তি হয়। মা-ই তাঁহার বিশেষণ। মাতৃত্বের দাবী লইয়া যখন মহিম-মণ্ডিতা জননী সন্তানের সম্মুখে দাঁড়ান, তখন ত্রিদিবের সমস্ত ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান্ হইয়া নারীর সৌভাগ্য দর্শন করে। সেই ভাগ্যবান্, যে একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়াছে; তাহার রসনাই ভাগ্যবতী, যে রসনা একবার মা বলিয়া ডাকিয়াছে।

জীবের চরিত্রের মহিমা—জীবের জীবত্বের স্ফূর্ত্তি ঐখানে, যেখানে জীব বাহুপ্রসারিত মাতার ভুজলতাবদ্ধ হইয়া নারীর বক্ষে স্থান পাইয়াছে। জীব ধন্য, স্বয়ং বিশ্বপ্রকৃতি নারীমূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে বক্ষে করিয়াছেন।

হিন্দুর নারীর আদর্শ এই। সমস্ত সাধনার মূলে যখন মা আসিয়া দাঁড়ান, সর্ব্বগুরুশ্রেষ্ঠ জননী যখন সন্তানশিরে

আপনার অভয় হস্ত দিয়া বরাভয়দায়িনী হইয়া দাঁড়ান তখন সেই মহীয়সী মূর্ত্তি যে দেখে নাই, তার জীবন বৃথা—তাহার নরজন্ম ব্যর্থ।

নারীকে এমনই করিয়া চিনিতে পারিলে তবে নারীর স্বরূপ ও মহিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এ নারীচরিত্র ও নারীমহিমা বুঝিবার জন্য যে সাধনা—যে আকাঙ্ক্ষা লইয়া জগতে আসিয়াছি, জননীর উপাসক—সাধক—ব্রহ্মচারী—আজ হে দুঃখার্ত্ত দীনহীন জীব! তোমাকে লালসাহীনকণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিতে শিখাইবার জন্য দীনপুত্রের আকাঙ্ক্ষা।

আমরা হিন্দু। নারীকে এইরূপে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করিয়া নারীর পূজার মহিমা ঘোষণা করিয়াছি এবং নারীর ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীর গভীর তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। নারী আমাদের ভোগ-লালসার ভোগ্যা নহে। নারী আমাদের পূজা-যজ্ঞের আরাধ্যা দেবী।

গণেশ জগজ্জননী ভগবতীকে বলিয়াছিলেন,"সে কি! তুমি আমায় বিবাহ করিতে বলিতেছ? ও যে লজ্জার কথা! আমি যখনই কোন নারীর মুখপানে চাহিয়াছি, তখনই সেই নারীতে তোমায় দেখিয়াছি। তুমি পূর্ণমহিমা লইয়া সেই নারীতে বিরাজিত রহিয়াছ। অয়ি সর্ব্বভূতজননী জগদ্ধাত্রি, তুমিই যে এই বিশ্বপ্রকৃতি। আপনি মাতা হইয়া গর্ভে ধারণ করিয়াছ এবং আপনি ধাত্রী হইয়াছ। মা, আমি যে নারীতে নারীতে তোমায় দেখিতে পাইয়াছি মা, সেই নারী তুমি—যেই নারী জীবের জননী। আজ কোন্ ধর্ম্মানুসারে তুমি আমাকে সেই জননী নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে উপদেশ দিতেছ?"

মায়ের সাধক যে হইবে, সেই এমনই করিয়া দেখিবে। দেখিবে, তাহার গর্ভধারিণীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি অপর নারীর মুখচ্ছবিতে প্রতিফলিত রহিয়াছে এবং সমগ্র জগতবাসিনী নারীকে সে মা বলিয়া ডাকিতে শিখিয়াছে।

জগতের মূলে আমরা দেখিতে পাই—প্রকৃতি। এই মহাপ্রকৃতি হইতে বিশ্বজগৎ প্রকটিত হইয়াছে। অনন্ত প্রকৃতি যেমন জননী হইয়া এই অনন্ত জগৎ প্রসব করিয়াছেন, তেমনি এই নারীও প্রকৃতির সেই অংশ ও গুণ গ্রহণ করিয়া আপনি যে মহাপ্রকৃতির অংশভাগিনী, তাহা প্রজা গর্ভে ধারণ করিয়া সার্থক হইয়াছেন।

এই প্রকারে হিন্দু, হিন্দুনারীকে বুঝিতে পারিলে তবে নারীর প্রকৃত মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিবে। আর যে পর্য্যন্ত না এই নারীর ভিতরে বিশ্বপ্রকৃতি মায়ের পূজা করিতে শিক্ষা না করিবে এবং সংযমসাধনার ভিতরে বিশ্বব্যাপী মাতৃত্ব স্থাপন করিয়া পুত্র হইতে না পারিবে, সেই পর্য্যন্ত জীব অধোগতি লাভ করিবে।

আমরা হিন্দুসাহিত্যে বহু সুভাগা ও সর্ব্বোত্তমা নারীর আদর্শ পাইয়াছি। সেই সকল চিরপূজনীয়া জননীগণের আদর্শে আমাদের সমাজের নারীজাতিকে গঠন করিয়া আমরা সংসারের শ্রী বাড়াইব, ইহাই যুগধর্ম্মের উপদেশ।

আমরা যে সত্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি এবং যে সত্যে আমাদের স্থিতি, আমরা সত্যময় শ্রীভগবানের শ্রীচরণতলে দাঁড়াইয়া পবিত্র কুসুমের ন্যায় পবিত্র হইয়া যখন ভগবানের পূজার উপযুক্ত হৃদয় গঠন করিতে পারিব, তখনই প্রকৃত-পক্ষে আমরা মনুষ্যজন্ম সার্থক করিতে পারিব।

আর নারীকে সমাজের সর্ব্বোচ্চশিখরে বসাইয়া, তাহার দেবীত্ব যাহাতে ম্লান না হয় এবং সেই দেবীত্ব যাহাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তাহার জন্য আমাদিগকে নারীর সাধনা করিয়া নারীর দেবীত্ব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।

আমাদের নারীর আদর্শ সীতা—জনক-দুহিতা। ভগবতীর আর কি বাসনা ছিল? রামধ্যান, রামজ্ঞান, জগন্ময় রামমূর্ত্তি ব্যতীত তিনি কিছু দেখিতেন না। বনে, জঙ্গলে, সর্ব্বত্র স্বামিসহচারিণী হইয়া নারীর হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ পূজা দিয়া স্বামীর পূজারই জীবন দিয়াছিলেন। মৃতস্বামী বক্ষে করিয়া সাবিত্রী স্বামিসাধনা করিতে করিতে মৃতদেহে পুনর্জীবন আনয়ন করিয়াছিলেন, পতিব্রতা অনসূয়া এক-মাত্র স্বামিভক্তিপ্রভাবেই ত্রিলোকজয় করিয়াছিলেন।

আমরা সমাজে হীন হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের হীনত্বের কারণ কি, তাহা অনেকেই বুঝিতে পারিতে-ছেন না। চিরসংযমসাধনার হৃদয় লইয়া যে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব, আমরা সেই সংযমসাধনাকে দূরে পরিহার করিয়া ভোগবাসনায় ডুবিয়া গিয়াছি, সর্ব্ব অনর্থের মূল অর্থকে এবং সর্ব্বাপদের মূল কামকে একমাত্র সুখের ও শান্তির আধার করিয়া জগতে তাহাই পাইবার জন্য ছুটিয়া চলি-য়াছি। যে দেবত্বের মহিমা লইয়া আমরা জগতে আসিয়া-ছিলাম, সেই দেবত্ব পরিহার করিয়া কি মোহে লুব্ধ হইয়া জীবন ব্যর্থ করিতেছি জানি না, কিন্তু সংসারের মূলাধার শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া—আমরা পবিত্রতাকে অবহেলা করিয়া শ্রেয়ঃকে নাশ করিয়া অনবরতই প্রেয়ঃকে পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছি। হিন্দুসমাজ আজ কোথায়? শত শত ক্ষতগ্রস্ত হৃদয়ের বেদনায় তুমি উৎপীড়িত হইয়াছ, তোমার শান্তিময় গৃহের সর্ব্বশান্তি পাপকামনায় লুপ্ত হই-য়াছে, তুমি গৃহে গৃহে যে শান্তিজননীর অপাপবিদ্ধা মূর্ত্তি গড়িয়া রাখিয়াছ, পূজার অভাবে সে যে লুকাইয়াছে, আজ তোমায় ডাকিতেছি, মায়ের আদেশে তোমার প্রকটনের দিন আসিয়াছে, তুমি জাগ্রত হইয়া তোমার মনুষ্যত্বপ্রাপ্তির আধার পাইয়াছ, তাহা সংগ্রহ করিয়া আপনার দেবত্ব অটুট রাখ। ইহাই ব্যক্ত করিবার জন্য প্রথমেই তোমাকে তোমার গৃহের শ্রী, সংসারের শ্রী, শান্তির আধার তোমার নর-জন্মের মূলীভূতা কারণ, যাহা, তাহা দেখাইতেছি। বুঝ এবং সমাহিত হইয়া তোমার সাধনার পথে দাঁড়াইয়া তোমার মানবজন্ম সার্থক কর।

মুষ্টিযোগ—টোট্‌কা ঔষধ।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ টোট্‌কা ঔষধ জানা থাকিলে অনেক সময়েই ডাক্তার কবিরাজ ডাকিতে হয় না এবং স্বচেষ্টায়ই আরোগ্যলাভ করা যায়। আহারে-বিহারে সংযত হইতে পারিলে এবং বাক্য ও মন সংযত হইলেও মানুষ অনেকটা নীরোগ হইতে পারে। আমাদের দেহ একটি যন্ত্র-বিশেষ। এই দেহযন্ত্রটিকে সর্ব্বদাই পরিষ্কৃত, পরিচ্ছন্ন ও নির্দ্দোষ রাখিতে হয়, নতুবা মলিন বস্ত্র যেমন ত্বরায় ছিন্ন হইয়া যায়, তদ্রূপ এই ময়লাপূর্ণ দেহও দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়।

আমাদের বাঙ্গালার গৃহস্থের ঘরে নিত্যই কোন না কোন একটি রোগ লাগিয়াই আছে। বিশেষতঃ শিশুগণ ত আজকাল মায়ের পেট হইতে পড়িয়াই দেহভরা রোগ লইয়া জগতে আসে। ঐ সকল শিশুর পীড়ায় ডাক্তারী কবিরাজী তীক্ষ্ণ ঔষধগুলি ব্যবহৃত হইয়া শিশুদের দেহকে অকালেই নষ্ট করিয়া দেয়। আমরা বঙ্গ-গৃহিণীগণের এবং বঙ্গ-বধূমাতা ও কন্যাগণের সুবিধার জন্য সরল চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগসম্বন্ধে কিছু লিখিতেছি। আশা করি, জননীগণ সর্ব্বদা সে সকল ব্যবহার করিয়া শিশুদিগের দেহ নীরোগ করিবেন এবং আপনারাও নীরোগ হইয়া শান্তিতে জীবন-যাপন করিবেন। বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি যে, তাঁহার কৃপায় গৃহস্থগণের সুবুদ্ধি হউক। দেহ মনকে সুস্থ রাখিবার জন্য গৃহস্থগণ যেন বিলাস-ব্যসনে কখন মন না দিয়া সর্ব্বদা ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরধ্যান করেন।

এই দেহকে সর্ব্বদা সুস্থ ও নীরোগ রাখিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান মুষ্টিযোগ। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই আহার-বিহার-বাক্যে মনে সংযত হইলেই নীরোগ হইতে পারিবেন।

সর্ব্বদা কোষ্ঠশুদ্ধি যাহাতে থাকে, তাহাই করিতে হইবে। দাস্ত সাফ্ থাকিলে কোন রোগই আসিতে পারে না।

পেট ঠাণ্ডা থাকিলেই অর্থাৎ বায়ু-পিত্ত-কফ কুপিত না হইলেই পেট ঠাণ্ডা থাকিবে, পেট ঠাণ্ডা থাকিলেই মাথাও শীতল থাকিবে, মাথা ঠাণ্ডা থাকিলে মনও শান্ত থাকিবে, মন সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিলে দেহ নিশ্চয়ই সুস্থ থাকিবে।

আমরা অনাবশ্যক কতকগুলি অভাব সৃষ্ট করি এবং সেই অভাব পূর্ণ না হইলেই মাথা খারাপ করিয়া ফেলি। অভাবজ্ঞান যত কম হইবে অর্থাৎ প্রাপ্ত দ্রব্য অল্পই হউক আর বেশীই হউক, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিলেই দেখিবে, প্রাণে কেমন নির্ম্মল আনন্দভোগ করিতেছ। অতএব অভাববোধ কমাইবে।

শিশুদিগের জন্মের পরই তাহাদের আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে এবং প্রসূতিকে আহারে সংযত হইতে হইবে, নতুবা প্রসূতির দেহের রোগ অনায়াসে শিশুর শরীরে আসিতে পারে।

শিশুদিগের সর্দ্দিজ্বরে তুলসীপাতার রস ও মধু। বেশী সর্দ্দি থাকিলে আদার রস ও মধু সকাল বেলা সেবন করাইবেন। দুগ্ধে পিপুল সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ সেবন করাইবেন। তাহাতে হজমশক্তিও যেমন বাড়িবে, ভবিষ্যতে যকৃৎ ও প্লীহারও কোন দোষ ঘটিতে পারিবে না।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ঔষধ।

ক্ষেতপাপ্‌ড়া—।৶০। নিমগুলঞ্চ—।৶০। জাঙ্গি-হরিতকী—।৶০। আমলকী—।৶০। শতমূলী—।৶০।

প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া অর্দ্ধ সের জলে মৃদুসন্তাপে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইবে। প্রাতে ও সায়াহ্নে এক ছটাক করিয়া সেবন।

২১ দিন সেবন করিলে যদি পেট নরম হয়, তাহা হইলে জাঙ্গিহরিতকী ।০ মাত্রা দিবে।

পথ্য—পুরাতন চাউলের অন্ন, শলকপূর্ণ ছোট মাছের ঝোল, পল্‌তার ঝোল, মোচা, পেঁপের ডাল্‌না, কাঁচকলা, থোড় ও ডুমুর, ঘৃত (বিশুদ্ধ হওয়া চাই), অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারেন। অল্প পরিমাণে গরম দুগ্ধও সেবন করিতে পারেন। ঘৃতপক্ক দ্রব্য ভক্ষণ নিষেধ। পুরাতন তেঁতুল, দধি, ঘোল, পাতিলেবু, পেঁপে, ইক্ষু, কলা, কমলালেবু, ডালিম, আঙ্গুর, পেয়ারা খাইতে পারেন। দিবানিদ্রা ও লঙ্কার ঝাল নিষিদ্ধ।

হরিতকীযোগ।

কোষ্ঠকাঠিন্য, অনিয়মিত কোষ্ঠ, বিবমিষা প্রভৃতি অবস্থায় হরিতকীযোগ সেবন করিবে। প্রস্তুত করিবার নিয়ম :—জাঙ্গিহরিতকী আধ সের পরিমিত দধিতে সাত দিন ভিজাইয়া রাখিবে। পরে গরুর চোনায় সাত দিন রাখিবে। তারপর তুলিয়া বেশ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। বেশ শুকাইয়া গেলে গব্যঘৃতে ভাজিবে এবং চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ সিকিমাত্রায় আহারের পর মিছরিচূর্ণসহ সেবন করিয়া কিঞ্চিৎ শীতল জল পান করিবে। উহাতে শরীরের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি দূর হইবে এবং দাস্ত নিয়মিতরূপে হইবে। এই হরিতকীযোগের দ্বারা অম্লপিত্তেও যথেষ্ট উপকার দর্শিবে।

ত্রিফলাযোগ।

আমলকী ২, হরিতকী ১, বয়েড়া ৩, এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং আধ তোলা পরিমাণে বিশুদ্ধ প্রস্তর-চূর্ণ ঐ জলে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতঃকালে ঐ জল আধ ছটাক পরিমাণে সেবন করিলে পাকস্থলীর অজীর্ণাদি দোষ, ক্রিমি প্রভৃতি দূর হইয়া ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে।

রসরাজ চাট্‌নী।

ইহা নিয়মমত তৈয়ারী করিতে পারিলে অতি উপাদেয় চাট্‌নী হয় এবং যিনি একবার খাইবেন, তিনিই ইহার উপকারিতা ও আস্বাদ পাইয়া ইহার রসরাজ নাম সার্থক মনে করিবেন।

যবক্ষার—১ মাষা। কালানিমক—২ মাষা। সৈন্ধব-লবণ—২ মাষা। পুদিনাপাতা—১ তোলা। সাদাজীরা—৬ মাষা। জিরিষা—১ তোলা। হিং—২ রতি। লেবুররস।

বেনের দোকানে সমস্ত মশলাগুলি পাওয়া যাইবে। ঐ সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবে। সকল দ্রব্যগুলি বেশ মিশিয়া গেলে তাহাতে হিং মিশ্রিত করিবে।

আহারান্তে নিত্য এই চাট্‌নী এক মাত্রা ব্যবহার করিলে পেট্ ফাঁপা, পেটে ব্যথা, অম্লশূল, উদ্গার, অরুচি, অজীর্ণ, পিত্তশূল, কোষ্ঠবদ্ধতা নিরাময় হইবে।

আহারান্তে ডাবের জল সেবন করিলেও উদরঘটিত নানারোগ আরোগ্য হয়।

অর্শনাশনযোগ।

হরিতকী ১, সচল লবণ ১, কেলেজীরে ১, গোল-মরিচ ১, এই চারি দ্রব্যচূর্ণ সমভাগে ৵০ আনা লইয়া গরম জলসহ সেবন করিবে। উহাতে অর্শ, গ্রন্থিশূল নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

অপাংবীজ চাউল ধোয়াজলে বাটিয়া সেবন করিলে অর্শের রক্তপড়া বন্ধ হইবে।

ইক্ষুগুড় ও কচি বেগুণের রস সেবন করিলেও অর্শের বলী নষ্ট হয়।

শিশুদিগকে বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ সেবন করাইবে। দেখিবে, যেন গরুর কোন পীড়া না থাকে। রোগগ্রস্ত গরুর দুগ্ধ সেবন করাইবে না। সকলেরই ইচ্ছা যে, আপন শিশুটি খুব হৃষ্টপুষ্ট ও সুস্থসবল এবং দেখিতে খুব সুন্দর হয়। কিন্তু অনেক "মা"ই অজ্ঞানতাবশতঃ শিশুর শরীর নষ্ট করিয়া দেন। মায়েরা সাবধান হইলেই শিশু সুস্থ ও সবল এবং কুৎসিত ছেলেও সুন্দর হইতে পারে। শিশুদিগের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ব্যবস্থা করিতেছি।

শিশুকে খুব হাওয়াপূর্ণ স্থানে রাখিবে। যদৃচ্ছামত খেলা করিতে দিবে। পরিষ্কার মাটিতে খেলা করিতে দিবে। দৌড়াদৌড়ি করিতে, যথেচ্ছা হামাগুড়ি দিতে ও হাত-পা নাড়িতে দিবে। মশা মাছিতে যাহাতে বিরক্ত না করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

দুগ্ধের সহিত বচ কিম্বা যষ্টিমধু বা শঙ্খশৃঙ্গী (বেনের দোকানে মিলিবে) সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইবে। উহাতে শিশুগণের বাক্য, রূপসম্পত্তি ও আয়ু, মেধা এবং শ্রী বর্দ্ধিত হয়।

প্রত্যহ সকালে বেলা করিয়া তৈল মাখাইবে। প্রথম কর্ণে, তারপরে নাসিকায়, পরে পদতলে ও তারপর নাভি-মুখে তৈল দিবে। সর্ব্বাঙ্গে সুন্দররূপে তৈল মর্দ্দিত হইলে পরিশেষে মস্তকে তৈল দিবে।

একটি গামলা বা বাল্‌তিতে একটি বাল্‌তি জল রৌদ্রে রাখিবে এবং তাহাতে একটি লেবুর রস নিংড়াইয়া দিবে। ঐ জল দিয়া ছেলেকে স্নান করাইবে। তাহাতে ছেলের দেহের বর্ণ অতি সুন্দর হইবে। সাবান মাখাইবার কোন প্রয়োজন নাই। জলে ও লেবুর রসে একত্র করিয়া মুখে যে কেহ মাখিতে পারেন, তাহাতে মুখশ্রী পদ্মফুলের মতন হইবে।

ডাবের জলেও মুখ ধৌত করিলে মুখশ্রী অতি সুন্দর হয়।

শিশু অবস্থায় মাছ, মাংস, ডিম খাইতে দেওয়া উচিত নহে, বরং ঘৃত অভ্যাস করান ভাল। প্রত্যহ কিছু না কিছু তিক্ত শিশুদিগকে খাওয়াইবে।

দুগ্ধের সঙ্গে পিপুল সিদ্ধ করিবে এবং ঐ দুগ্ধ খাওয়াইবে। পরিশেষ অপরাহ্নে ঐ পিপুলবাটা মধুসহ খাইতে দিবে। উহাতে প্লীহা নষ্ট হইবে।

কালমেঘের পাতা—১ ভরি। যোয়ান—১ ভরি। মৌরি—১ ভরি। বড়এলাচের খোসা—আধ ভরি। সৈন্ধব-লবণ—১ ভরি। কালজীরে—১ ভরি।

এই সকল দ্রব্য বাটিয়া ছোট ছোট বড়ি করিবে। ঐ বড়ি শুকাইয়া রাখিবে। শিশুদিগকে মাঝে মাঝে প্রাতে শীতলজলে গুলিয়া একটি বড়ি সেবন করাইবে, উহাতে পিত্তদোষ দূর হইয়া প্লীহার উপকার করিবে।

[ক্রমশঃ।
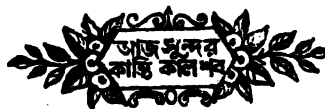
প্রার্থনা।

[শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

হে প্রভু দয়াময়! হে বিভু করুণাময়! হে ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছাতেই জগতে সমস্ত ঘটিতেছে। সাগর, পর্ব্বত, নদনদী, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ ও মানব তোমারই মহিমা গান করে। তুমি সর্ব্বজীবের হৃদয়ে রহিয়াছ। তুমিই জীবের আশা—ভরসা—আকাঙ্ক্ষা। তুমিই জীবকে তুষ্টি ও পুষ্টি দিয়াছ। এই সসীম জীবনে মানবের আশারও সীমা আছে। কিন্তু কই ইচ্ছাময়, তুমি যে খেলার পুতুলের ন্যায় আপন ইচ্ছায় এই জগতবাসীকে নাচাইতেছ, কই, তাহারা ত তাহা বুঝে না। তোমায় বুঝিতে পারে না বলিয়াই তোমার মহিমাও বুঝিতে পারে না, তাই জীবের মনে যাহা আসে, তাহাই করে। কিন্তু হে দয়াময়! আমি অধম, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীব, সামান্য কীটেও যে শক্তি আছে, সে শক্তি আমার নাই। তোমার এমন সুন্দর সৃষ্টির আমি কেন, সমগ্র মানবসমাজও কোন বিপর্য্যয় করিতে পারে না। এ জগতে জীব অতি ক্ষুদ্র, তুমি মহান্, তবুও ক্ষণস্থায়ী এই ধ্বংসশীল জগৎ দেখিয়াও জীবগণ অতি উল্লাসের সহিত জীবন কাটাইতে চাহে এবং ভোগলালসায় অন্ধ হইয়া তোমার মহিমা ভুলিয়া যায়।

হে কর্ম্মীন্, তুমিই কর্ম্মরূপী ভগবান্। তুমিই জীবের হৃদয়ে থাকিয়া জীবকে কর্ম্মে উৎসাহ দিয়া থাক। তোমারই প্রেরিত কর্ম্মদ্বারা জীব মঙ্গললাভ করে। সৎকর্ম্মাদি করিয়া জীব মঙ্গলময় জীবনলাভ করে এবং অসৎকর্ম্মাদিদ্বারা আয়ু ক্ষীণ করে। তুমি বিশ্বপ্রাণ, তোমার উদ্দিষ্ট কর্ম্ম কখনও ক্ষয় পায় না; তোমার প্রেরণায় এবং তোমার নামের মাহাত্ম্যগুণে চিরদিন উজ্জ্বল থাকে এবং সেই কর্ম্মই তোমার মহিমাই ঘোষণা করে। তুমিই জীবের হৃদয়ে সংরূপে অবস্থান কর। আর তোমার নাম ও প্রেরণা ব্যতীত যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। সেই অসৎকর্ম্ম জীবকে শান্তি না দিয়া বরং দুঃখই দিয়া থাকে।

হে পিতঃ—আমি তোমার নিকট সৎবস্তুই প্রার্থনা করিতেছি। তোমার অপার মহিমা যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারি, এমন জ্ঞান ও ভক্তি আমায় দাও। তোমার কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভ করা অসম্ভব।

এই যে জীবসকল নিয়ত ভোগলালসায় মোহগ্রস্ত হইয়া জীবহিংসাদি পাপকর্ম্ম করিয়া, পরনারীতে আসক্ত হইয়া, নানাপ্রকার নেশাদি সেবনদ্বারা অস্থির হইয়া কত দুঃখ পাইতেছে, হে কৃপানিদান! তুমি সেই সকল জীবকে সদ্‌বুদ্ধি ও সদ্‌গুণ দাও। যে জ্ঞান লাভ করিয়া এই বিমূঢ় চিত্ত জীবগণ সুস্থ মন ও সুস্থ দেহ লাভ করিয়া তোমায় পূজা করিতে পারে এবং তোমার এই মহিমমণ্ডিত সৃষ্টির মঙ্গল করিতে পারে, হে নাথ, তাহাই কর।

হে অনন্তকৃপানিদান! হে পরাৎপর ব্রহ্ম! জীবকে গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি দান কর। তুমিই যোগমার্গে জীবকে লইয়া না যাইলে জীব কি করিয়া তোমার মহিমা বুঝিবে?

জীব যাহাতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, ব্রহ্মচর্য্য, দেবদ্বিজে সেবা, গুরুজনে ভক্তি লাভ করিয়া তোমার স্নেহ পাইতে পারে, তাহা কর। তুমি কৃপা না করিলে, জীব কখনও শ্রেয়ঃ কি, তাহা বুঝিতে পারিবে না এবং তোমার মহিমা বুঝিতে পারিবে না।

সন্তোষই পরম সুখের আকর। কিন্তু হে ভক্তের জীবন! তোমায় ভক্তি না করিলে এবং তুমি ভক্তি না দিলে কোন জীবই সন্তোষলাভ করিতে পারে না এবং অশোচ্য বিষয়ের জন্য শোক করিয়া দুঃখভোগ করিবে। জীব জানে না,—জীব নিয়ত কি করিতেছে। তুমিই দয়াময়—দয়া করিয়া জীবকে তোমার প্রেমদান কর এবং যাহাতে জীব তোমার মহিমা উপলব্ধি করিয়া সুখী হইতে ও শান্তিলাভ করিতে পারে, তাহা কর।

হায়! কবে তুমি জীবকে এমন কৃপা করিবে, যখন জীব ধর্ম্মবুদ্ধিলাভ করিয়া জগতে হিংসা-দ্বেষহীন হইবে ও সর্ব্বদা তোমার প্রেমে আকুল হইয়া বিশ্ববাসীর প্রতি প্রেমসম্পন্ন হইবে। এ বিলাসমগ্ন অহংমত্ত জীবকুলকে রক্ষা কর। সদ্‌জ্ঞান প্রদানদ্বারা এই নিরয়গামী জীবসকলকে উদ্ধার কর।

হে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিন্! আমি তোমাকে নমস্কার করি। প্রকৃতি ও পুরুষ যাঁহার কার্য্যের অংশমাত্র, সেই প্রধানপুরুষ হইতেও অব্যক্ত গোবিন্দকে আমি নমস্কার করি। হে জগন্নাথ! তোমাকে নমস্কার করি। হে তপোময়! তোমাকে নমস্কার।

হে দয়াময়! হে দেব! হে জগৎপতে! হে ইচ্ছাময়! সমগ্র মানবকুল যাহাতে পরস্পর প্রেমের বন্ধনে মাত্র তোমার উপাসনা করিয়া সকলে নির্ম্মলচিত্তে জগতে বাস করিতে পারে, তাহা কর। আর এই অধম দীনহীন সন্তানকে বিকারহীন চিত্ত দাও, দ্বন্দ্বহীন বাসনা দাও। তোমার সেবার ভোগরাগবর্জ্জিত দেহ ও মন দাও এবং সর্ব্বোপরি সর্ব্বজীবে দয়া দাও, যেন কোন জীব হইতেই আমার ভয় না থাকে, আর আমিও তোমার কৃপাবান্ কোন জীবের ভয়ের কারণ না হই। সত্য দাও, ধর্ম্ম দাও, তৃপ্তি দাও, আনন্দ দাও এবং সর্ব্বদা তোমার করুণায় আমায় পূর্ণ রাখ—হে দেবেশ! হে মহেশ! এই প্রার্থনা।

सत्कर्म्म।

(लेखक :—बदरीप्रसाद खन्ना)

जिसकर्म्म के करने से सर्व साधारण का भला हो उसी को सत्कर्म्म कहते हैं। ऐसे कर्म्म को करते समय यह ध्यान अवश्य रहे कि इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं हमें इसके फल की आकांक्षा नहीं यह केवल हमारा कर्त्तव्यमात्र है। हम केवल कर्म्मकर्त्ता ही हैं फलाफल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। जो स्थायी है वही सत् है और जो क्षणिक है अथवा नाशवान है वही असत् है। इसी तरह पाप पुण्य का भी लेखा है। जिस से जीव का अनिष्ट हो वही पाप है और जिस से जीव का मङ्गल हो वही पुण्य है। मनुष्य तीन बातों में अधिकतर लिप्त रहता है:—संगति, कामना और कर्म्म इसलिये उसे उचित है कि वह सत्संगति सत्कामना और सत्कर्म्म करता रहे। कारण स्वाभाविक रीती से ही जीव बिना संगति, कामना और कर्म्म के नहीं रह सकता। कर्म्म से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है कर्म्म से ही स्वर्ग मिलता है कर्म्म से ही यश प्राप्त होता है। महात्मा तुलसी दास ने भी कहा है कि "कर्म्म प्रधान विश्वकरि राखा, जो जस करै सो तस फल चाखा" कर्म्म से मनुष्य क्या नहीं पा सकता यदि तीनों लोकपर विजय की इच्छा रखता हो तो उसके लिये वह भी सम्भव है किन्तु इन वस्तुओं की प्राप्ति के लिये जो कर्म्म बने हुए हैं उन्हीं के करने पर इच्छित फल मिलता है।

संसार में जिसकी कीर्त्ति है वही अमर है। मनुष्य देहत्याग कर चला जाता है और अपने पीछे जो कुछ छोड़ जाता है वह सब नाश हो जाता है परन्तु कीर्त्ति और अकीर्त्ति रह जाती है इसका नाश जब तक संसार रहता है तब तक नहीं होता। जीव के मङ्गलोद्देश्य से जिन्हों ने कुआं, तलाव इत्यादि खुदवा दिया है क्या उनका नाम कभी मिट सकता है? जिस समय कोई पथिक हारा थका चला आ रहा है और थकावट के कारण उसे प्यास लग आई हो ऐसे समय कोई कुआं या तालाव दिखाई देजाय तो उसे उस समय कितना आनन्द होता है इसका अनुभव हमारे पाठक स्वयं कर सकते है। जल पीने के अनंतर उसकी आत्मा आशीर्व्वाद देने लगती है कि जिसने इस जलाशयको खुदवाया हो वह सुखी रहे। कम से कम यदि और कुछ नहीं तो वह पथिक ईश्वरको तो धन्यवाद अवश्य देता है। सोचना चाहिये कि जिस सत्कर्म्म ने उस मनुष्य को ईश्वर की याद दिलादी वह कितना महत्व पूर्ण है।

आजकल यदि लोग कुछ करेंगे भी तो क्या कि एक मन्दिर बनवाया उसमें टाइल जड़वा दी इलेकट्रिक लाइट लगवा दी, सीढ़ी पर संग मरमर तथा रूपये जड़वा दिये परन्तु वे यह नहीं सोचते कि इन ऊपरी आड़म्बरों से सर्व्व-साधारण को क्या लाभ, केवल नयनतृप्ति? अच्छा यदि उसी द्रव्य से अनाथबालकों को अन्न वस्त्रादि दे शिक्षा दी जाय, शिक्षा से हमारा यह मन्तव्य नहीं है कि उन्हे एम०ए, बी०ए की डिगरी से भूषित किया जाय वरन् उन्हें शिल्प, विज्ञान आदि कलाओं से सम्पन्न किया जाय जिससे वे अपना एवं अपने बन्धुगणों का हितसाधन कर

सकें। अथवा उसी धन से अनाथ विधवाओं का पालन हो तो उनका सतीत्व क्यों नष्ट हो और क्यों हम इस पतित अवस्था में पड़े रहें। यदि हमारे दूरदर्शी पाठक इन दोनों कर्म्मों को सामने रखकर विचारें तो उन्हें मालूम हो जायगा कि पिछली प्रणाली से ही हमारा वास्तविक कल्याण हो सकता है। यदि दृष्टि खोल कर देखा याय तो जानपड़ेगा कि हमारे पूर्व्वज फूस की झोपड़ी में रहकर कैसे कैसे परोपकार पूर्ण कर्म्म किया करतेथे। उनके फूस के घरका दर्वाजा सदा दूसरों के लिये खुला रहताथा परन्तु आज हमारी उच्च अट्टालिका का नक्काशी दार द्वार सदा आगन्तुक के लिये बन्द रहता है। आजकल यदि कोई अतिथि अथवा भिक्षुक किसी धनी के यहां जाय तो उसको सत्कार अथवा भिक्षा मिलनी तो दूर रही ऊपर से धक्के और गालियां मिलती हैं। हमारे जिन पूर्व्वजों की कीर्त्ति हमें यह बतला रही है कि यदि कोई अतिथिभोजन के समय आ पड़ता तो वे पहिले उस अतिथि का सत्कार कर तब यदि कुछ बचा तो आप खाते थे उन्ही पूर्व्वजों की हम सन्तान हैं। धिक है एसे धन को जो अपने देव तुल्य पूर्व्वजों के यश को कलुषित करे, धिक है एसे संकीर्ण हृदय मनुष्य को जो अपने कर्त्तव्य को न करता हो। धन की शोभा तभी है जब उसका सदव्यवहार होता हो धन केवल संदूक में बन्द कर व्याज खाने के लिये नहीं है वरन उससे मानव जाति को कुछलाभ पहुंचना चाहिये। धन का सुव्यवहार होने से कभी नहीं घटता। यह प्रतेयक मनुष्य जानता है कि हमारे साथ कुछ नहीं जाता धन, परिवार घर इत्यादि सांसारिक जितनी वस्तु है, सब यहीं छूट जाती हैं कारण यह संसार एक महा श्मशान है! अविराम कालस्रोत प्रति दिन प्रति दण्ड में प्रति मुहूर्त्त में पल पल में सब बहाकर विस्मृति के गर्भ में फेंक देता है। क्षणभर पहिले जिस वस्तुको देखचुके हैं, वह अब नहीं। प्राण देने परभी अब वह नहीं मिल सकती। इस समय जो वर्त्तमान है, क्षण भरमें वह नहीं रहेगा—समस्त संसार में ढूंढ़ने पर भी नहीं मिलेगा। कहां चला जायगा, कहां चलाजाता है, इस विषय में आप जितना जानते हैं, मै भी उतना ही जानता हूं उस से अधिक और कोई भी नहीं जानता।

सब चला जाता है—कुछ भी नहीं रहता—रहती है केवल कीर्त्ति और अकीर्त्ति। कीर्त्ति अक्षय है। कालिदास चले गये, शकुन्तला है; शेक्सपियर चलागया, हेमलेट है; वाशिङ्गटन चला गया, अमेरिका के स्वाधीनता की धुजा आज भी फहरा रही है। रूसा चला गया, साम्यका दुन्दुभि-नाद आज भी समस्त संसार में गूंज रहा है। मनुष्य की भलाइ बुराई उसके साथ चली जाती है किन्तु कीर्त्ति और अकीर्त्ति का विनाश नहीं होता। वाशिङ्गटन का देशानुराग उसके साथ चला गया। शेक्सपीयर का चरित्रदोष भी उसके साथ ही चला गया। किन्तु उनलोगों ने मनुष्यजातिका जो उपकार किया है, उसका सौरभ निशिदिन बढ़ रहा है। इसीसे कवि कह गया है :—

कहेंगे सबै नीर भरि भरि,
पाछे प्यारे हरिचंद की कहानी रह जायगी।

राजा अशोक ने रास्तों में कुएं बनवा दिये थे रास्तों के दोनों तरफ वृक्ष लगवा दिये थे जिस में जाने आने वाले धूपसे दुखी न हों। एसे सज्जनों की स्मृति के लिये सभा समिति कर वक्तृता दे यश गान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनके कर्म्म ही उनकी किर्त्ति सहित उन्हे अमर कर गये हैं।

बर्द्धमान के वर्त्तमान राजा के पूर्व्व जो राजा थे उन्हीं ने जनाई निवासी मित्रवंशके पूर्व्वपुरुष को इतनी जमीन दीथी कि वे इतने अधिक जलाशय देवालय इत्यादि बनावा गये जिससे आज तक मित्रवंश का नाम जीवित है।

बङ्गाल में भी एसे बहुत से रास्ते हैं कि जिन्हें किसी मुसलमान अथवा हिन्दू ने बनवा पथिकों का उपकार किया है। रेल, ष्टीमर इत्यादि द्वारा केवल धनीलोगों का ही उपकार हुआ है, गरीबों को इस से क्या लाभ? यदि एसा पथ बनवा दिया जाता जिस पर पथिक चलकर किसी प्रकार का कष्ट न पाते, जलाशय एवं विश्रामाश्रम थोड़ी थोड़ी दूर पर होते उनकी रक्षार्थ राज्य की ओर से पहरेदार होते, तो इस से जितना मध्य-श्रेणी के मनुष्यों का एवं दरिद्रों का उपकार हो सकता उतना क्या रेल से होता है?

न जाने शेर शाह का हृदय कितना उच्च था जिसने ग्रेंडट्रङ्क रोड, जो पेशावर तक चली गई है, बनवाया था। इसके द्वारा गरीबों का कितना उपकार हुआ यह स्वयं अनुभव कीजीये सत्कर्म्म इसे कहते हैं।

दिनाजपुर की महीपालडिग्गी प्राचीन पाल-राजाओं की अतुलकीर्त्ति है। एक कुमिल्ला शहर मे ही असंख्य डिग्गी वर्त्तमान हैं आज लाखों आदमी उनका जल पीकर बनवाने वाले की प्रशंसा करते हैं।

इसी तरह यदि हम दृष्टान्तो से पन्नें रंगा चाहें तो अभी बहुत से उदाहरण मिलेंगे परन्तु केवल उदाहरण से कुछ लाभ नहीं होने का जितने हम लिख चुके हैं हमारी समझ में वे यथेष्ट हैं। अस्तु एक सत्कर्म्म एसा बताना बाकी रह गया है जिसकी तुलना नहीं। कभी कभी एसा देखा गया है कि किसी समय कोई मनुष्य धनी था किन्तु कराल समय के परिवर्त्तनशील चक्र में पड़कर दरिद्र हो गया है। अब उसपर सबसे बड़ा दुःख तो यह है कि वह लज्जा के वश छोटा काम कर नहीं सकता, किसी से मांगने में भी सकुचाता है दूसरे यदि मांगने पर कोई न दे तो और भी लज्जित होना होगा, इससे मांग भी नहीं सकता, एसी अवस्था में एसे घोर शंकट में पड़े हुए मनुष्य को कुछ गुप्त दान, जिसमें दहने हाथ की बाएं हाथ को भी खबर नहो, देना प्रतेयक उदारचित्त सत्कर्म्मी पुरुष को अपना परम कर्त्तव्य समझना चाहिये परन्तु एसा उन्हे कदापि न सोचना चाहिये कि इसके द्वारा हमारा यश फैलेगा अथवा हमारा इसपर एहसान होगा या हमें इससे कुछ लाभ होगा अर्थात् इस कार्य्य के फलाफल की आशा इसके कर्त्ता को न रखनी चाहिये।

एसे एसे परोपकारी जीव झोपड़ों में रहते देखे गये हैं यदि वे चाहें तो, जिस तरह आपलोग रहते हैं, उसी तरह वे भी रह सकते हाथी घोड़े भी रख सकते परन्तु नहीं, वे सोचते थे जितना धन हम इन ऊपरी, नाशवान आडम्बरों में खो दें उतना हम किसी सत्कर्म्म में क्यों न लगा दें जिसमें हमारे धन का वास्तविक उचित व्यवहार हो। एक बात और है, वे ग्राम में रहा करते जहां इन आडम्बरों से कुछ प्रयोजन ही नहीं न तो वहां थियेटर न बाइस्कोप न ट्रैम न कोई नशा न कुचरित्र स्त्री इत्यादि कुछ भी नहीं रहता इस लिये वे शान्तिमय जीवन बिताते एवं ईश्वर ध्यान में मग्न रहते किन्तु नगर में रहकर इन हृदयाकर्षक वस्तुओं से बचना कठिन हो जाता है। यदि मेरे निवेदन से पाठक कुछभी लाभ उठावें तो मै अपना परिश्रम सफल समझूंगा।

শ্রীমাধব ভৈষজ্য-মন্দির

২৯নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

ব্যবস্থাপক ও পরিচালক :—

কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী।

এই স্থানে আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঘৃত, তৈল, আসব, অরিষ্ট, মোদক, চূর্ণ, বটিকা ও অবলেহ প্রভৃতি সকল ঔষধই উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত ও নিজের রোগীদিগের চিকিৎসার্থ ব্যবহৃত হয়; সুতরাং ইহার বিশুদ্ধতা স্বতঃসিদ্ধ।

মফঃস্বলের রোগিগণ অর্দ্ধ আনার ডাকটিকিটসহ রোগ বিবরণ লিখিয়া জানাইলে বিনামূল্যে সুচিন্তিত ব্যবস্থা ও সুলভে অব্যর্থ ঔষধসমূহ লইয়া ঘরে বসিয়া সুচিকিৎসা করাইতে পারেন। শিক্ষক, ছাত্র ও নিতান্ত দরিদ্রদিগের ঔষধের মূল্য-সম্বন্ধেও যথেষ্ট বিবেচনা করা হয়। নোটিব উপর "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্" ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র।

বিনীত—কার্য্যাধ্যক্ষ।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!! যুদ্ধ!!! যুদ্ধ!!!!

শক্তিমঙ্গল।

শ্রীযুত তারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী প্রণীত।

বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় মহাসমরের বই। ডাঃ মাঃ সহ ।১০। ৩য় বিজয়ের টাক। যুদ্ধ খুব বাহার।

তত্ত্বসঙ্গীত।

শ্যামা বিষয়ক, বিরাট সংগ্রহ, মূল্য ৸০, বাঁধাই ১৲, ডাঃ মাঃ ৴১০। হরিনামামৃত রস ৸০।

আর্য্যনারীবিধান ৸০। করোনেশন দিল্লীদরবার ১৲। স্বর্গারোহণ (ছবি) ১৲। রুস জাপান যুদ্ধ ৵০।

গণেশতত্ত্ব ও জীবনী ১৲। ... পান চিবান বইগুলি সিকিমূল্যে বিক্রয় হইতেছে।

জি, পি, রায়; কলিকাতা, ৯২।৪, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট।

কবিরাজ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন রায়; এল্, এম্, এস্, কবিভূষণের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

৯৬।১নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ের সকল ঔষধই অকৃত্রিম এবং কবিরাজ মহাশয়ের নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত।
আয়ুর্ব্বেদোক্ত যাবতীয় দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

কয়েকটি আশুফলপ্রদ মহৌষধ।

১। জীবনী রসায়ন উপদংশ, পারদ, বাত প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার রক্তদুষ্টির অব্যর্থ মহৌষধ। অল্পদিনমধ্যে শরীরকে বীর্য্যবান্ করিতে ইহা আয়ুর্ব্বেদের চিহ্নিত সুধা। মূল্য একশিশি ১।০ টাকা।

প্রমেহ, গণোরিয়া এবং মেহরোগের অমোঘ অস্ত্র। 'চন্দনাসব' পরীক্ষা করুন। **২। চন্দনাসব** কেবল ৭ দিন ব্যবহারে নির্দ্দোষ আরোগ্য! মূল্য এক শিশি ১৲ এক টাকা।

অতিরিক্ত চিন্তা বা অধ্যয়নাদি দ্বারা মানসিক দৌর্ব্বল্য, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা বা স্নায়বিক উত্তেজনা দূরীকরণে "সুধামৃত ঘৃত" ব্যবহার করুন। ১৫ দিনের সেবনোপযোগী ২৲ টাকা। **৩। সুধামৃত ঘৃত।**

World-famed Ayurvedic Medicines !

বিশ্ববিশ্রুত ঔষধির সমন্বয় !

আমাশয়, বাতব্যাধি ও যক্ষ্মারোগের বিশেষজ্ঞ (Specialist) ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক

কবিরাজ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

কবিভূষণ মহাশয়

আয়ুর্ব্বেদীয় ও স্বকৃত পরীক্ষিত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া নিম্নলিখিত রোগ-কয়টিরও চিকিৎসা করিতেছেন ঃ—

জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অম্লপিত্ত, শূল, অজীর্ণ (Dyspepsia), গ্রহণী, মেহ, বহুমূত্র ও সূতিকা প্রদরাদি স্ত্রীরোগ।

জ্বরাশনি রস।

বাঙ্গালার পল্লীবাস জ্বরপীড়নে একপ্রকার শূন্য হইয়া পড়িতেছে ; আর কিছুকাল এ ভাবে জ্বরের প্রকোপ দেশময় ব্যাপ্ত থাকিলে, বাঙ্গালা দেশ একেবারেই জনশূন্য হইয়া পড়িবে। প্রতিদিন জ্বররোগে কত পুরুষ, স্ত্রী, বালক-বালিকা যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। অকালমৃত্যুর হাত হইতে দেশের জনগণকে রক্ষা করিবার জন্যই জ্বরাশনি রস সাধারণে প্রচার করিতেছি। জ্বরাশনি রস আবিষ্কারের পর হইতে সহস্র সহস্র জীবনকে অকালমৃত্যুর করালকবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। জ্বরাশনি রসপ্রয়োগে নব জ্বর, পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, পালা জ্বর, জীর্ণ জ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, কম্প জ্বর, প্লীহা যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর অত্যল্পকালমধ্যে নিবারণ করিতেছে। হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া, শীত করিয়া, কম্প দিয়া, চক্ষু জ্বালা করিয়া জ্বর আসিতেছে, এমন অবস্থায় জ্বরাশনি রস ব্যবহার করিলে আর জ্বর আসিতে পারে না। চিকিৎসকের বিনা সাহায্যে যে কেহ জ্বরাশনি রস প্রয়োগে জ্বরের প্রকোপ হইতে নিস্তার পাইতে পারিবেন। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ এক টাকা মাত্র।

অমৃতাষ্টক।

আমাশয় ও রক্তামাশয় অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক পীড়া। এই রোগারম্ভে অরুচি, অক্ষুধা, বার বার মলত্যাগ, পেটে বেদনা হইতে ক্রমে কোঁথপাড়া, পক্কাশয়ে ক্ষত, রক্তস্রাব, হাত পা জ্বালা, জ্বর, রক্তাল্পতা, শোথ প্রভৃতি নিদারুণ কষ্টদায়ক প্রাণনাশক লক্ষণ প্রকাশিত হয়। আমাদের এই দৃষ্টফল 'অমৃতাষ্টক' অল্পদিনে উল্লিখিত দুরারোগ্য উপসর্গ সমূহ দূর করিয়া রোগীকে নিরাময় করে। মূল্য প্রতি কৌটা ১৪ বটী ১৲ এক টাকা।

হিঙ্গুচতুঃসম।

আজকাল অজীর্ণরোগে (Dyspepsia) দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বুক বা গলা জ্বালা, টক্ উদ্গার (চোঁয়াঢেকুর), পেটফাঁপা, হঠাৎ দমকা দাস্ত, অরুচি, বদহজম প্রভৃতি উপসর্গ নিবারণ করিতে হিঙ্গুচতুঃসমের শক্তি অতুলনীয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া একটি হিঙ্গুচতুঃসম সেবন করিলে এক ঘণ্টা পরেই আবার ক্ষুধা হইবে। মূল্য প্রতি কৌটা ৭ বটী ।৷০ আট আনা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

হরিশচন্দ্র ঔষধালয়—৩২নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনন্তাদি রসায়ন।

অপরিপক্কবুদ্ধি মানবগণ অল্পবয়সে কুসংসর্গে পড়িয়া যে সকল রোগে আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে উপদংশ বা গর্ম্মী অতি ভীষণ কষ্টদায়ক ও লজ্জাজনক ব্যাধি। এই রোগ একবার শরীরে প্রবেশ করিলে অল্পকালমধ্যে রক্ত দূষিত করিয়া শরীরকে নানা রোগের আকর করিয়া মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। কেহ কেহ আবার গোপনে এই দারুণ রোগ হইতে মুক্তিলাভের আশায় পারদাদিঘটিত ঔষধ সেবন করিয়া জীবনকে আরও বিষময় করিয়া তুলে। এই রোগের সূচনামাত্রেই দমন না করিলে, ক্রমে তবারোগ্য বাতরক্ত ও কুষ্ঠাদিতে পরিণত হয়। সুতরাং শরীরে গর্ম্মী ও পারদবিকারের বিন্দুমাত্র সূত্রপাত জানিতে পারিলেই অনন্তাদি রসায়ন সেবন করা কর্ত্তব্য, আমাদের বহুপরীক্ষিত অনন্তাদি রসায়ন গর্ম্মী, পারদবিকৃত ও রক্তপরিষ্কারের একমাত্র অমৃতোপম মহৌষধ। ইহা সেবনে যখন ভড়িৎগতিতে নূতন রক্তবিন্দু সঞ্চয় করিয়া দূষিত রক্ত পরিষ্কার করিবে ও শরীরে নববলের সঞ্চার করিয়া, এই সকল ঘৃণিত জঘন্য রোগ হইতে নিরাময় করিবে, তখন মনে হইবে, ভগবানের দয়ায় এমন মহৌষধ অনন্তাদি রসায়ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। হায়! এত দিন কেন বাজারের নানা ঔষধ সেবন করিয়া সময় নষ্ট করিলাম? মূল্য প্রতি শিশি ১।০ দেড় টাকা।

শান্তিসুধা।

সর্ব্বপ্রকার মেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, ও শুক্রতারল্যের মহৌষধ। শান্তিসুধা এরূপ সুন্দর উপাদানে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত যে, মেহের (গণোরিয়ার) প্রস্রাবকালীন দারুণ জ্বালা, পূযস্রাব, খড়িজলবৎ প্রস্রাব, ফোটা ফোটা প্রস্রাব, প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে শুক্রপাত, স্বপ্নদোষ হইতে আরম্ভ করিয়া শুক্রতারল্য এবং অস্বাভাবিক শুক্রক্ষরণ জন্য ক্ষোভ নিবারণ করিয়া ক্রমে উৎসাহ ও শারীরিক মানসিক স্ফূর্ত্তি সম্পাদন করে। মূল্য ১৫ দিনের ঔষধ ।০ পাঁচ সিকা।

কাঞ্চনামৃত।

শ্বাসকাশ (হাঁপানি) রোগের অমোঘ ঔষধ।

নূতন ও পুরাতন হাঁপানীকাশের এরূপ ফলদায়ী ঔষধ আর নাই। যদি হাঁপানীর দারুণ টান হইতে মুক্তি পাইতে চান, তবে কাঞ্চনামৃত সেবন করুন। ইহা স্বর্ণ ও মৃগনাভি প্রভৃতি ধাতবপদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণে প্রস্তুত বলিয়াই সকলের কল্যাণদায়ক। মূল্য প্রতি কৌটা ১৲ এক টাকা।

স্মৃতিরত্নাকর।

স্মরণশক্তিবর্দ্ধক ও বলকারক।

স্কুল কলেজের ছাত্রগণের পক্ষে 'স্মৃতিরত্নাকর' দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ। স্মৃতি ও ধারণাশক্তির অল্পতাবশতঃ যে সকল ছাত্র অধিক পরিশ্রম করিয়াও সুফললাভে বঞ্চিত হয়, তাহারা ১৫ দিন মাত্র স্মৃতিরত্নাকর সেবন করিলে আশাতিরিক্ত ফললাভ করিতে পারিবেন। ১৫ দিনের ঔষধের মূল্য ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

বাতরাজ তৈল।

মনুষ্যশরীরে বাতাশ্রয় করিয়া দারুণ আমবাত, গ্রীবাস্তম্ভ, গৃধ্রসী, অববাহুক, পক্ষাঘাতাদি ব্যাধি উৎপাদন করে। বাতরোগাক্রান্ত রোগিগণের গাঁটে গাঁটে বেদনা, উঠিতে বসিতে কোমরে বেদনা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, কন্‌কনানি প্রভৃতি পীড়নে পীড়িত, আবার কাহারও বা এক পা কাহারও বা এক হাত অচল, কেহ বা পা টানিয়া টানিয়া অতি কষ্টে হাঁটেন, কাহারও বা এক অঙ্গই অসাড় হইয়া গিয়াছে। এই সকল অবস্থার বহু রোগীতে পরীক্ষিত অশেষ কল্যাণকর বাতরাজ তৈল মালিসে ২৪ ঘণ্টায় উৎকট বেদনা, কন্‌কনানি নিবারণ করিয়া, বিকৃত অঙ্গগুলিকে ক্রমে স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ এক টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় সর্ব্বপ্রকার তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, বটিকা ও জারিত ঔষধ, পুরাতন ঘৃত ও গুড় প্রভৃতি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

কার্য্যাধ্যক্ষ—শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত।

হরিশ্চন্দ্র ঔষধালয়—৩২নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

Printed and Published by Kally Prosonno Mookerjee at K. P. Mookerjee & Co.'s Press,
7, Waterloo Street, Calcutta.

প্রথম বর্ষ—প্রথম খণ্ড—চতুর্থ সংখ্যা ; আশ্বিন—১৩২৩।

অনাথবন্ধু

[অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত।]

ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষিতত্ত্ব, শিল্প, চিকিৎসা, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, ইতিহাস, যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গার্হস্থ্য-বিধান, ব্যায়াম এবং সঙ্গীতাদি সম্বলিত

সচিত্র মাসিক পত্র।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রকাশক
[illegible]

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা মাত্র। প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা।
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির—
পুরীধাম ;
রথযাত্রা।

विद्या ददाति विनयं
विनयाद्याति पात्रतां ।
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति
धनाद्धर्म्मं ततः सुखं ॥

ॐ

यौवनं धनसम्पत्तिः
प्रभुत्वमविवेकता ।
एकैकमप्यनर्थाय
किमु तत्र चतुष्टयं ॥

My submission regarding Anathbandu, Annapurna Asram and the Album of the Noblemen of India.

DEAR SIR,

I have pleasure in forwarding the *4th* (*Ashin*) number of *Anathbandhu* per book post prepaid and hope it will reach safe and on perusal you will be pleased with its contents. Your suggestion for its improvement and opinion will be thankfully received.

I am negotiating for a plot of land near Baidyanathdham for Annapurna Asram and I hope the place will be liked by my patrons and friends being a sacred and sanitary place.

My object in starting this Bengali Monthly Journal "Anathbandhu" is to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, where local industries will be encouraged and various works will be executed by the inmates of the home who will be kept, fed, clothed and given medical aid in times of need.

The subscription of the "Anathbandhu" is only Rs. 10 for a year, not even a Rupee a month; but it serves a great object.

It is not binding on the subscribers of the Journal to a pay donation or monthly subscription to the Annapurna Asram fund. Only such noblemen whose portraits and sketches of life appear in the Journal are expected to help the Asram Fund, I mean the noblemen of India.

All the publications which printed likenesses and life-sketches of the noblemen of India, charged very heavily, and printed the portraits in plain Black Ink, but we have been printing the portraits in true colours which costs very much more than plain printing, and therefore I crave fair consideration from my patrons and friends.

All donations and monthly subscriptions will be gratefully acknowledged in the columns of the "Anathbandhu" and those noblemen who will materially help the Asram will have their names engraved on a marble slab and fixed at the gate of the Asram as a permanent memorial.

There will be an annual Exhibition in the Asram of the goods manufactured in the Asram by its inmates, and arrangements will be made for collection of Indian products and art works at the same time for exhibition; and suitable prizes will be given to encourage local products & arts.

I shall fix a moderate price for the Album of the Noblemen of India, at its starting, as the blocks appearing in the columns of the "Anathbandhu" will be utilized.

I thankfully acknowledge receipt of some photographs and sketches but regret some of my important patrons and friends are neglecting this rather important matter, and hope to be favoured by them early.

In sending photographs kindly note complexion and colours of the dress and ornaments and let the portrait preferably be in oriental dress.

A laborious and expensive venture like this should be encouraged by the nobility and gentry of all India. Some of my patrons and friends do not know Bengali, but I believe Bengali-reading gentlemen are all over India to explain the benefits of the subjects dealt in the Journal. I wish and hope all our patrons and friends will realize my scheme and co-operate with me in my labours and thus bring my three schemes into success, viz:

I.—The Journal "Anathbandhu" which will produce articles in its pages for the benefit of mankind.

II.—The "Annapurna Asram" a religious and industrious home for the poor, which once settled will be a self-supporting institution.

III.—The "Album of the Noblemen of India" in English, which will be a book of peerage of India, a most useful, desireable and glorious work for India.

I have practical knowledge in the lines I have undertaken and this fact is known to my numerous patrons and friends.

7, WATERLOO ST.,
CALCUTTA.

Yours obediently,
K. P. MOOKERJEE.

প্রকাশকের নিবেদন।

চতুর্থ সংখ্যা—আশ্বিন মাসের "অনাথবন্ধু" ডাকযোগে পাঠান হইল, পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলে আমার যত্ন সার্থক হইবে।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, বিশেষ কোন মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিলাম। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়। যাহা হউক, প্রথম সংখ্যা "অনাথবন্ধু" বাহির হওয়ার পর আমি বুঝিলাম :—

১। কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম-প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবেন, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবেন। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিলাম।

২। ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

আমার প্রায় সত্তর বৎসর বয়স হইয়াছে। আমি এই বিগত পঞ্চাশ বৎসর ব্যবসাক্ষেত্রে কর্ম্ম করিতেছি এবং স্বীয় অভিজ্ঞতা ও ধৈর্য্যবলে এখনও বৃহৎ ব্যবসা চালাইতেছি। ঈশ্বর ইচ্ছায় ভারতবর্ষে, য়ুরোপে ও আমেরিকায় সমস্ত মহৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত আমার কাজকর্ম্মে বাধ্যবাধকতা আছে এবং এ পর্য্যন্ত সকলের নিকটেই অবিচলিত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পাইয়া আসিয়াছি। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন।

৩। অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি উদ্যোগ করিব। আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্যদাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

৪। "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে।

উপস্থিত তিন সংখ্যা প্রকাশ করিয়া যে ভাবে উৎসাহিত হইয়াছি, তাহাতে ক্রমে যে আমার উদ্দেশ্য ঈশ্বরকৃপায় সফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

৫। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উহাতে আমার নিজের স্বার্থ "আনন্দ।" যত দূর সাধ্য, আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশে খরচ করিতেছি এবং "অনাথবন্ধু"কে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের সেবার উপযোগী করিতে সাধ্যানুসারে ক্রটি করিব না। আমি সর্ব্বত্র হইতে বিশেষ উৎসাহও পাইতেছি।

বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই গ্রাহক হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাহারও নাম প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

বঙ্গেশ্বর হিজ্ এক্‌সেলেন্সি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর।

মহামান্য মহারাজা শোনপুর।

মহামান্য রাজাসাহেব বামড়া।

অনরেবল স্যর মহারাজা দ্বারভঙ্গ।

অনরেবল স্যর্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাশিমবাজার।

অনরেবল মহারাজা বাহাদুর নশীপুর।

মহামান্য জেনারেল তেজ সাম্‌সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপাল।

রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া।

স্যর মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর।

লালা জ্যোতিপ্রকাশ নন্দী সাহেব—বর্দ্ধমান।

মহামান্য রাজা সাহেব—লন্‌জিগড়।

মহামাননীয়া মহারাণী সাহেবা—আয়োয়াগড়।

রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী ; রঙ্গপুর।

অনরেবল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ; গৌরীপুর।

কুমার এ. পি. লাহিড়ী ; রাজসাহী।

শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গিরি ; তারকেশ্বর।
অনরেবল স্যর্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা।
শ্রীযুত বাবু ফণীন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর।
পণ্ডিত এন্. বিদ্যারত্ন।
শ্রীযুত বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জি—কলিকাতা।
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ মজুমদার—কলিকাতা।
শ্রীযুত বাবু এন্. চাটার্জ্জি।
শ্রীমতী এস্. বি. দেবী—কলিকাতা।
শ্রীযুত লালা এস্. পি. নন্দীসাহেব—বর্দ্ধমান।
শ্রীযুত রাজা প্রমথভূষণ দেব বাহাদুর — নলডাঙ্গা।
শ্রীযুত কুমার বিচিত্র সা ; টিহরি, গাড়োয়াল।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্থানাভাবে অধিক নাম প্রকাশ করা গেল না. যাঁহারা অনাথবন্ধুর গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল উপরি-উক্ত মাননীয় মহোদয়গণের নাম প্রকাশ করিলাম। ইঁহারা সকলেই যে অন্নপূর্ণা-আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা-আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

এবার চতুর্থ সংখ্যা "অনাথবন্ধু" আবশ্যক প্রবন্ধাদি দিয়া প্রকাশ করিলাম। আশা করি, পাঠান্তে সুখী হইবেন।

দেশীয় হাতের শিল্প ও নিতান্ত আবশ্যক নবাবিষ্কৃত ফলপ্রদ ঔষধাদিসম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিলে আমরা সাদরে গ্রহণ করিব। প্রাচীন গ্রাম্য-ইতিহাস ও মন্দিরাদির বিবরণ এবং চিত্রাদি পাঠাইলে প্রকাশ করিব। কাহারও নিন্দা বা গালাগালিসম্বলিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে না। রাজার বিরুদ্ধকর অথবা কোন প্রকার রাজনীতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধও আমরা গ্রহণ করিব না।

কোন রমণী যদি প্রবন্ধ পাঠাইতে চাহেন, তাহা সাদরে গ্রহণ করিব এবং ধর্ম্মবিষয়, কাব্য বা গীতিও প্রকাশ করিতে পারি।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎ-ব্যক্তিগণ যাঁহারা এখনও ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত না পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন।

অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্য-বর্গ ও মহৎব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

"এল্‌বাম"

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ ব্লকগুলি, তাহা "অনাথবন্ধু"র জন্য প্রস্তুত হইল। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

যে সকল মহদাশয় ব্যক্তি প্রথম সংখ্যা হইতে "অনাথবন্ধু" রাখিয়া সহৃদয় অনুকম্পাপ্রদর্শনে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে আমার বিনীত নিবেদন,—এই চতুর্থ সংখ্যা তাঁহাদের হস্তগত হইলে অনুগ্রহ করিয়া বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া সুখী করিবেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা-আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য

আমি ৺বৈদ্যনাথধামের নিকট একখণ্ড জমীর চেষ্টা করিয়াছি। পঞ্চম সংখ্যায় বিস্তারিত সংবাদ দেওয়া যাইবে। বোধ হয়, এই স্থান আমার মুরুব্বি ও বন্ধুদিগের অপছন্দ হইবে না. এইটি পবিত্র ও স্বাস্থ্যজনক স্থান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জন-সাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন। ইতি—

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

পুনশ্চ।—পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও অনাথবন্ধুতে হিন্দী-ভাষায় একটি নিবেদন ও একটি সন্দর্ভ দিয়াছি। উত্তর-পশ্চিম বা মধ্যভারতের গ্রাহকবর্গ—যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষা জানেন না, তাঁহাদের উহা মনোনীত হইলে আমি প্রত্যেক মাসে দুই একটি করিয়া হিন্দী সন্দর্ভ অনাথবন্ধুতে প্রকাশ করিব।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তিমত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপনদাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
,, ২য় ,, ,, ,, ,, ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, ৩য় ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।

শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লকপ্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন ঃ—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

निवेदन।

जिस अनाथबन्धु के कर्म्मकला कुतूहल से इस स्वप्नवत संसार का चर्खा एक समान चल रहा है। जिसने हम लोगों को कर्म्मयोगी होने की शिक्षा दी है, जिसने हमें यह उपदेश दिया है कि सदा कर्म्म करते रहो बिना कर्म्म किये शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती उसी देवादिदेव कमलापति को "अनाथबन्धु" उभय कर जोड़ प्रणाम करता है। जो पृथ्वी का भार हरण करने के निमित्त युग २ मे अवतार धारण करते हैं, जो अनादि अनन्त और अद्वितीय हैं, जो सब जीवों में विराजमान हैं। तथा जिनके रूपकी तुलना नहीं। अहा! नवदूर्वादल श्यामकान्ति पीतवसन पद्मपलासलोचन, प्रफुल्ल मुख, कोटि २ चन्द्रमा सूर्य्य जिनके पादपद्म में सुप्रकाशित हैं, वही पादपद्म इस भवार्णव पार होने की अभय तरणी है; इस तरणी का खिवैया अनाथबन्धु ही है इसलिये इसकी शरण लेनी परमावश्यक है।

यह संसार उसी लीलामय की लीला का नमूना है। संसार की जिस वस्तु पर विचार कियाजाय वही उस लीलामयकी आश्चर्यजनक लीलामें लिप्त दीख पड़ती है यहां तक कि उसकीलीला अनाथत्व में भी वर्त्तमान रहती है।

इस विश्वमण्डल के गर्भ में अनाथ अनेक तरह के हैं। कर्म्मजाल में बंध कर मनुष्य कई प्रकार से अनाथ होजाते हैं परन्तु सब अनाथों का एकमात्र शरण वही अनाथशरण है उसी का दूसरा नाम अनाथबन्धुभी है। यह अनाथबन्धु उस अनाथबन्धु से अभीष्ट सिद्धि के लिये प्रार्थना करता हुआ अनेक प्रणाम करता है।

संसार में प्रथम श्रेणीके अनाथ :—जिसको आत्म बोध नहीं है। जो ममता के चंगुल में फंस कर अपने को तथा उस अनाथबन्धु को भी भूल गया है, वह जिस समय मोह निद्रा से निवृत्त हो जाग्रतावस्थामें आता है तब उसकी क्या गति होती है। जिसने विवेक शक्ति से भी काम लेना नहीं सीखा जो सदा दुःख शोक समुद्र में ही गोते लगाया करता है उसके समान अनाथ और कौन है? जिस सकललोकेश्वर को मुक्तकण्ठ से पुकारने पर, पुत्रकलत्रशोकदग्धहृदय में भी नन्दन कानन के पारिजात सौरभ का आविर्भाव हो उठता है, क्षुधाग्नि से जलते हुए मनुष्य का दुःख नाश हो शान्ति होती है उसी 'अनाथबन्धु" को आपलोगों से परिचित कराने के लिये एवं उसी अनाथबन्धु को पानेका उपाय बताने के लिये इस "अनाथबन्धु" का आविर्भाव आज लोकसमाज में होना समुचित है। साधकों के हितार्थ हिन्दूशास्त्र में उस दीनबन्धु के अनेकरूप तथा अनेक साधन प्रणाली लिखी हुई हैं। हम इस श्रेणीके अनाथों के लिये उन सब कथाओं का वर्णन सरल भावसे लिखा करेंगे। इसके अतिरिक्त योगशास्त्र, नीतिशास्त्र, धर्म्मशास्त्र इत्यादि की साधारण बातें भी सर्वसाधारण के समझने योग्य भाषामें लिखी जायगीं। मनुष्य जिससे संसार में रह कर साधन पथ में अग्रसर हो, "अनाथबन्धु" में उसके विशेष उपाय बतलाये जायंगे इस प्रकार यह पत्रिका अपने "अनाथबन्धु" नाम को सार्थक करने की चेष्टा करेगी।

दूसरी श्रेणी के अनाथ :—जो लोग सांसारिक रीति से ज्ञानहीन हैं। वर्त्तमान समयमें चारोंतरफ जड़वस्तुओं का ज्ञान अच्छी तरह फैल रहा है। इस समय बिना ज्ञान या विद्या के संसार में काम नहीं चल सका। हमलोग चाहे जितने विद्वान या ज्ञानी अपने को क्यों न मानलें, किन्तु हमारा ज्ञान वास्तव में अत्यन्त संकीर्ण एवं सीमाबद्ध है। हमलोग दो एक विषयों का सामान्य ज्ञान प्राप्त भले ही करलें पर सैकड़ों विषयों में अनभिज्ञ रहते हैं यहां तक कि हमलोगों में जो शिक्षित हैं, वे वृक्ष इत्यादि काष्टादिक जो उनकी आखों के सामने नित्य पड़ते हैं उनके भी वे गुण नहीं जानते। इनका गुण जानने पर संसार का कितना उपकार हो सकता है, यह लेखनी द्वारा नहीं कहा जा सका। कैसे दुःखका विषय है कि लता, वृक्ष रूप में औषधि रहते हुए भी बहुधा औषधियों का ज्ञान न रहने के कारण प्राण हरण हो जाता है इस अवस्था में हमलोगों से बढ़ कर अनाथ और कौन है? इस श्रेणी के अनाथों की शिक्षा के लिये "अनाथबन्धु" में इस विषय के जानकारों के सुन्दर २ लेख प्रकाशित हुआ करेंगे। इसके सिवाय कृषि, शिल्प, वाणिज्य, समाज-विज्ञान, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, (एलोपैथिक एवं वैद्यक) इतिहास, विज्ञान, दर्शन मनस्तत्व, इत्यादि के सम्बन्ध में इसमें अनेक आवश्यक निबन्ध भी प्रकाशित हुआ करेंगे। सारांशयह कि राजनीति के अतिरिक्त सभी जानने योग्य विषय अनाथबन्धु में प्रकाशित हुआ करेंगे। द्वितीय श्रेणी के अनाथों को इस "अनाथबन्धु नाम्नी पत्रिका"की सार्थकता समझाने में किसी प्रकारकी यथासाध्य त्रुटि न की जायगी। तृतीय श्रेणी के अनाथ :—जो दरिद्र हैं संसार में जो धनहीन हैं। दरिद्रता नाना प्रकार के दोषों का भाण्डार है। वास्तव में दरिद्र के समान अनाथ इस भूमण्डल में दूसरा नहीं मिल सकता। वे अभाव की पूर्ति के निमित्त क्या नहीं कर बैठते दरिद्रता भी कई प्रकार की होती है। आजकल हमारे देशसे शिल्पविद्या का लोप हो गया है इस से अर्थ संग्रह का पथ संकीर्ण हो गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परिश्रम करने को तयार हैं परन्तु उनको कार्य्यक्षेत्र नहीं दीखता। यदि यह कहा जाय कि कृषि और नौकरी ये ही दो द्वार जीवन निर्वाह के खुले हैं तो अत्युक्ति न होगी। खेती की जमीन भी बंट जाने के कारण ऐसी हो गई है जैसे एक मांस के टुकड़े पर कई एक मांसाहारी पक्षियों की दृष्टि हो और एक दूसरे से छीन लेने की चेष्टा करता हो। अन्तमें परिणाम यह होता है कि जो कुछ पृथ्वी जिसके हाथ लगी भी तो उससे उसके साल भरके भोजन का निर्वाह भी उचित रूप से नहीं हो सकता। परन्तु वैज्ञानिक रीति से यदि खेती की जाय तो थोड़ी जमीन में अधिक फसल उपज सकती है। इसकार्य्य के भी उपाय इस पत्रिका में लिखे जायंगे। नौकरी का भी यह हाल है कि जनसंख्या तो अधिक है पर काम उतना नहीं परिणाम मजूरी कम मिलती है इसलिये यदि नौकरी को झखमारी कहा जाय तो असम्भव वर्णन नहोगा।

इससे ज्ञात होता है कि शिल्पोन्नति ही से देशका कल्याण हो सकता है किन्तु केवल इस विषय पर लेख लिखने ही से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती अस्तु शिल्पियों को हाथ से कलम से काम करना सिखाना होगा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमलोग "अन्नपूर्णा आश्रम" नाम का एक कार्य्यालय स्थापित कर रहे हैं। इस देशकी समस्त आवश्यकीय पदार्थ, निपुण शिल्पी द्वारा इस आश्रम (कार्य्यालय) में बनाकरेंगे एवं उसका खर्च पोसा कर सस्ते दाम में बेचने का बन्दोबस्त किया जावगा। जो लोग शिल्प-विद्या सीखने आवेंगे वे काम अच्छी तरह जानलेने पर इसी आश्रम में कार्य पाया करेंगे।

इसको एक आदर्श कार्य्यालय बनाया जायगा। अभी इसका कार्य सामान्य रूप में होता देख किसी को निरुत्साह नहीं होना चाहिये। अनेक कार्यक्षेत्र में इसी तरह सामान्य रूप में कार्य प्रारम्भ हो कर बड़े रूप में परिणत होते देखा गया है। विलायत के औक्सफोर्डशायर में मैंगवेल नामका एक छोटा सा ग्राम है। १७९४ ई० में विशप वारिंगटन ने इसी ग्राम में एक छोटासा कार्य्यालय स्थापित किया था। उसमें, केवल खर्च भरलेकर बिना मुनाफे खानेकी चीजें बिका करती थीं। यहीं धीरे धीरे श्रम जीवी लोगों की बनाई वस्तु बिना लाभ के बेची जाती, इसीसे श्रमजीवियों को उनके परिश्रम का मूल्य दिया जाताथा, किन्तु कार्य्यालय केवल खर्चभर लेकर ही उन वस्तुओं को बेचा करते इस कारण और व्यवसाइयों की अपेक्षा सस्ते दामों में इस कार्य्यालय के द्रव्य बिका करतेथे। इस तरह सारे इंगलैंड में इस कार्य्यालय की शाखा फैल गई। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में १३ लाख ४२ हजार मनुष्य इसके कार्य्यकर्त्ता हो गए एवं इसका मूलधन पौने अठाइस करोड़ रुपया, और रिजर्व तहवील एक करोड़ बीस लाख रुपया उपस्थित रहने लगा।

फलत: यदि धार्मिक कर्त्तव्यनिष्ठ लोग इसतरह कार्य में हस्तक्षेप करें तो सफलता अवश्यमेव प्राप्त होगी। हमलोग इतनी उच्चाभिलाष नकर, जिसमें कारबार में सफलता हो वैसीही चेष्टा करेंगे। "अनाथबन्धु" इसतरह कार्य्य चलाने की प्रणाली नियत कर "अन्नपूर्णा आश्रम" को आदर्श रूप में लाने की चेष्टा में तत्पर होंगे।

उच्च घराने की स्त्रियां यदि घरमें बैठकर किसी प्रकार की शिल्पकला भूषित वस्तु तैयार कर आश्रम के कार्य संरक्षकों को प्रदान करें तो वे उन्हें, वस्तुको उचित मूल्यपर बेचकर दाम देदेंगे। आश्रम में भी स्त्रियों के कार्य करने की व्यवस्था रहेगी।

चतुर्थ श्रेणीके अनाथ :—जो रोग ग्रसित हैं उनकी पीड़ा हरण के भी आयोजन इस आश्रम में रहेंगे। एलोपैथिक, होमियोपैथिक, कविराजी और हकीमी एलाज बिना मूल्य किये जायंगे किन्तु दु:ख के साथ लिखना पड़ता है कि रोगियों के रहने का स्थान अभी आश्रम न दे सकेगा। अनाथबन्धु जिसमें प्रकृतपक्ष में अनाथबन्धु का काम कर सके एसी चेष्टा तन मन धन से की जायगी। उस अनाथबन्धु जगदीश्वर से तथा आप महानुभावों से इस आश्रम से सहानुभूति एवं कृपा रखने की प्रार्थना करता हुआ आशा करता हूं कि आप लोग इस निवेदन को पढ़कर ही न रह जायं वरन इस पर विचार करें कि जिस विषय को हम ने हाथ में लिया है उसका महत्त्व कितना है। यह कार्य अति गम्भीर है और बिना आपलोगों की सहायता के पूरा नहीं हो सकता। आजकल ऐसी हमलोगों की अवस्था हो रही है कि प्रत्येक मनुष्य यह सोच कर कि हम अकेले क्या कर सकते हैं, बैठ रहता है इसी से हमने पूर्व्व ही कहा है कि हम अपने को भूलगये। हम सब कर सकते हैं। आज हमारे कितने भाई एक समय भी उदर पूर्ति नहीं कर सकते इसका मुख्य कारण यही है। कि एक दूसरे की सहायता देने में कभी अग्रसर नहीं होता। हमारा केवल विनीत निवेदन करने ही तक का अधिकार है इसके बाद सहाय प्रदान करना आप ही लोगों के हाथ है। आशा है हमारी प्रार्थना निष्फल नहोगी।

(२)

मैंने बहुत विचार कर कई वर्षों तक अनुभव करके और किसी बड़े उद्देश्य को लक्ष कर यह "अनाथबन्धु" प्रकाशित किया है। इस में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं क्यों कि व्यवसाय द्वारा अबतक जो कुछ मैंने उपार्जन किया है और ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसीसे मैं सन्तुष्ट हूं। निर्मल निष्कलङ्क आनन्द उपभोग करने की इच्छासे—इतना वृद्ध हो जाने परभी "अनाथबन्धु" प्रकाशित कर उसके पीछे पीछे अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने की अभिलाषा की है। मुझे सदा पूरी आशा रहती है कि ईश्वर मेरे कर्म का सहायक है। जोही इस अनाथबन्धु की प्रथम संख्या निकल जाने पर मुझे मालूम हुआ कि :—

१। बहुत से लोग वङ्गभाषा नहीं जानते—समझते भी नहीं इसी से "अनाथबन्धु" उन्हीं ने लौटा दिया। परन्तु जिनलोगों के पास यह पत्रिका भेजी गई वे सभी गण्यमान्य सज्जन हैं अस्तु यदि वे किसी वङ्गभाषा जानने वाले सज्जन से पढ़वाकर इस में लिखे लेख सुनते तो वे लेखों के लाभ मालूम कर सकते और अन्नपूर्णा आश्रम के उद्देश्य भी समझ सकते। आश्रम की प्रतिष्ठा एक महत् कार्य्य है यदि सर्व्वत्र इसी प्रकार आश्रम स्थापित होजाय तो जगत् के सभी लोग इस से लाभ उठा सकें। बहुत लोग इस आश्रम द्वारा भोजन वस्त्रादि लाभ कर एवं रोग शोक में औषधि और सान्त्वना पाकर आनन्दमय जीवन बिता सकेंगे। थोड़े खर्च में यह सब कार्य्य कैसे हो सकते हैं इसको शिक्षा देना भी परमावश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के निमित्त आश्रम के सहायक रूप में "अनाथबन्धु" का प्रचार मैंने किया है।

२। यह सत्य है कि धर्म्मनिष्ठपुरुष प्राय: प्रपंच द्वारा ठगे जा चुके हैं इसी कारण से अब सब का एसे कार्य्यों की ओर अविश्वास हो गया है और सत्कार्य्य की ओर अश्रद्धा भी हो गई है। मेरा तो कहना केवल यह है कि यदि आप किसी ऐसे सहायता के काम में ठगा हो चुके हैं तो उसपर विचार करिये कि क्यों ? देश काल पात्र इन तीनों पर विचार कर कार्य्य करने से किसी विषय में धोखा नहीं उठा सकते और न सत्कर्म की ओर अभक्ति ही होती है।

मेरी उम्र प्राय: ७० वर्ष की हो गई। मैं विगत ५० वर्षों से व्यवसाय कर रहा हूं और अपने अनुभव तथा धैर्यबल से अबभी एक बड़ा व्यवसाय चला रहा हूं। ईश्वरेच्छा से, भारतवर्ष, यौरोप एवं एमेरिका के सभी महत् व्यक्तियों से मेरा व्यवसाई सम्बन्ध है परन्तु आज तक मेरे ऊपर उन महानुभावों का स्थायी विश्वास एवं श्रद्धा ज्यों की त्यों चली आरही है। मेरे द्वारा किसी प्रकार के प्रपंच की सम्भावना है या नहीं यह बात मेरे बहुत से पूज्य तथा बन्धुगण जानते हैं।

३। अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने का मैं उद्योग करूंगा। आश्रम स्थापना में प्राय: एक लाख रूपये की आवश्यकता है। कम से कम तीस पैंतीस हजार रूपये हो जाने परभी मैं किसी तरह इस को आरम्भ कर सकता हूं इसके पश्चात् सहायकवृन्द के अभिप्रायानुसार आश्रम के कार्य्य की वृद्धि हो सकती है।

४। "अनाथबन्धु" से जो कुछ आय होगी वह आश्रम के कार्य्यों में व्यय हुआ करेगी। यदि इस पत्रिका के पांच हजार ग्राहक हो जायं तो मैं समझता हूं कि फिर आश्रम के लिये अधिक सहायता की आवश्यकता नभी हो।

इस पत्रिका की प्रथम संख्या प्रकाशित कर जैसा मैं उत्साहित किया गया हूं उससे तो मेरे अभीष्ट सिद्धि में तनिक भी संदेह नहीं दीखता।

मैं पहिले ही लिख चुका हूं कि मेरा स्वार्थ केवल "आनन्द" मात्र ही है। जहां तक सम्भव है मैं "अनाथबन्धु" को सर्व्वाङ्ग-सुन्दर बना आश्रम की सेवा में उपयोगी स्थान देने में कदापि त्रुटि न करूंगा। तिसपर मैं अपने सहायकों द्वारा भ खूब उत्साहित किया जा रहा हूं।

बड़े हर्षका विषय है कि बहुत से महानुभावों ने पत्रिका पाते ही अपना नाम ग्राहकों की श्रेणी में उदारता पूर्व्वक लिखवा मुझको अत्यंत उत्साहित तथा बाधित किया है। उन लोगों का नाम यहां प्रकाश करना मेरी समझ में अनुचित न होगा।

वंगेश्वर हिज एक्सेलेन्सी लौर्ड कारमाइकल बहादुर।
महामान्य महाराजा सोनपुर।
महामान्य राजासाहब बामड़ा।
अनरेबल सर महाराजा दरभङ्गा।
अनरेबल सर महाराजा मनोन्द्रचन्द्र नन्दी बहादुर—कासिमबाजार।
अनरेबल महाराज बहादुर—नसीपुर।
महामान्य जेनेरल तेज शमसेर जङ्ग बहादुर राणा—नेपाल।
राजा विजयसिंह धुधुरिया।
सर महाराजा प्रद्योत कुमार ठाकुर बहादुर।
लाला ज्योतिप्रकाश नन्दी साहब—वर्द्धमान।
महामान्य राजासाहब—ललजीगड़।
महामाननीया महारानी साहबा,—आयोधागढ़।
रायबहादुर मृतुञ्जय रायचौधुरी—गौरीपुर।
कुमार ए, पी, लाहिरी—राजसाही।
श्रीयुत प्रभातचन्द्र गिरि—ताड़केश्वर।
अनरेबल स्यर गुरुदास वन्द्योपाध्याय।
श्रयुत कुमार जितेन्द्रकिशोर आचार्य्य चौधुरी—मुक्तागाछा।
श्रीयुत वावु फणीन्द्रनाथ मित्र—भवानीपुर।
पण्डित एन, विद्यारत्न।
श्रीयुत वावु ज्योतिषचन्द्र चाटार्ज्जि—कलकत्ता।
श्रीयुत वावु आशुतोष मजुमदार—कलकत्ता।
श्रीयुत वावु एन चाटार्ज्जि।
श्रीमती एस, वि, देवी—कलकत्ता।
श्रीयुत लाला एस, पि, नन्दीसाहेब—वर्द्धमान।
श्रीयुत राजा प्रमथभूषण देव वाहादुर—नलडाङ्गा।
श्रीयुत कुमार विचित्र सा; टिहरि, गाड़ोयाल।
इत्यादि इत्यादि।

जिन जिन मान्यवर महाशयों ने "अनाथबन्धु" का ग्राहक बन मुझे उत्साहित किया है उनमें से उपरोक्त सभी सज्जन इसके पृष्टपोषक तथा अभिभावक होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। आशा है सर्व्वसाधारण अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में मुझे सहायता देने में कदापि पीछे न हटेंगे एवं ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि, सब स्वस्थ और स्वच्छन्दता पूर्व्वक दिन बितावें तथा मंगलमय जगदीश्वर के आशीर्व्वाद से इस महत् कार्य्य में सम्मिलित हो जीवन सफल करें।

देशी हाथ का शिल्प तथा अत्यंतावश्यक नवाविष्कृत फलदायक औषधादि पर प्रबन्ध लिख भेजने से हमलोग उसे सादर ग्रहण करेंगे। प्राचीन समयका ग्राम्य-इतिहास, मन्दिरों के विवरण एवं चित्रादि भेजने पर प्रकाशित किये जायेंगे। किसी की निन्दा, अश्लील शब्द पूर्ण निबन्ध अथवा राजनीति सम्बन्धीय लेख इसी पत्रिका में प्रकाशित न होंगे।

यदि कोई रमणी धार्मिक विषयपर लेख, काव्य अथवा गीत लिख कर भेजें तो छापी जा सकती है। "अनाथबन्धु" में छापने के लिये बहुतसी तसवीरें जीवन चरित्र के साथ मिली हैं। आशा है अन्य सज्जन भी अपना २ जीवनवृत्तान्त एवं चित्र भेजने में देर न करेंगे।

कुछ दिन बाद ही और एक भारतके राजालोगों के जीवन-चरित्र एवं फोटो का एलबम प्रकाशित करूंगा। इसका छापना

फेत में सहज होगा, कारण प्रधान खर्च है ठीक बनवाई सो "अनाथबन्धु" के लिये बनेही हैं। इस विषय में सब राजाओं से सहानुभूति रखने की प्रार्थना है। जिन जिन माननीय महाशयों ने अपना अपना फोटो और जीवन-चरित अब तक नहीं भेजा है, उन महाशयलोगों से अपना अपना फोटो और जीवन-चरित भेजने के लिये प्रार्थना की जाती है।

"अन्नपूर्णा आश्रम"

का कार्य्य जिस तरह चलेगा उसका व्यौरा हम लिख ही चुकेहैं आशा है आपलोग इसको उन्नतिशील बनाने में कुछ उठा न रखेंगे मैं कृतज्ञता पूर्व्वक निवेदन करता हूं कि जिन महाशयोंने "अनाथबन्धु" की प्रथम एवं द्वितीय संख्या रक्खी है और इसके उद्देश्य को समझ ग्राहक हो गए हैं वे अबकी संख्या पातेही वार्षिक मूल्य भेजकर मुझे वाधित करें।

पहिले ही कह चुका हूं कि "अनाथबन्धु" की आय आश्रम सम्बन्ध में ही व्यय होगी अन्य जिनलोगों की इच्छा इस आश्रम को सहायता पहुंचाना है वे इस अवसर पर देर नकरें। वे जितनी जल्दी सहायता प्रदान करेंगे उतनीही जल्दी कार्य्य होगा।

"अन्नपूर्णा आश्रम"

के लिये हमने श्रीवैद्यनाथ धाम के पास एक स्थान निश्चित किया है और उसके लिये बातचीत हो रही है। हमको आशा है कि हमारे सहायक बन्धुगण उसको पसन्द करेंगे। अब विलम्ब न करें इस सुअवसर को अपने हाथ से जाने न देकर कार्य्यक्षेत्र में अवतीर्ण हो मुक्तकण्ठ से अनाथबन्धु को पुकारते हुए अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने में सहायता दें।

विशेष सुविधा।

विद्यालय के छात्र, धर्म्मसभा, एवं जन-साधारण के उपकारार्थ जो लाईब्रेरी हैं यहसब इस "अनाथबन्धु" को आधे दाम में पावेंगे।

इसमें हिस्टोरीकेलेख भी निकला करेंगे।

विनीत :—

श्रीकालीप्रसन्न मुखोपाध्याय

प्रकाशक।

OPINIONS

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP,
BENGAL.

22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine "Anath Bandhu." I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10.

The object is a laudable one. * * * *"

Yours sincerely,

(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

Senate House,
Calcutta.

8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the " Anathbandhu, " which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga,* if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,

(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.

ZEMINDAR OF KOONDI.

Shyampur P. O.
Rangpur.

The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,

(Sd.) **D. Chatterjee.**

P. A. to Rai Bahadur.

From

The

Hon'ble

Sir

Gooroo Dass

Banerjee.

Narikeldanga, Calcutta.
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive. * *

Yours truly,
(Sd.) Gooroo Dass Banerjee.

From Gokulananda Prosad Varma of "Beharee."

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,
(Sd.) Gokulananda Prosad Varma.

PRESS OPINIONS.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such ("Anathbandhu") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being published by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called "Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subs-

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion, Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K. P. Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of a useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases: Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era,

9th August, 1916

A New Journal by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday,, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukhopadhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and nobleman throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articleson Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The assocociation of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religious, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with

which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. The subscription, we fear, is a little too high for people of moderate means and the fact that the public can subscribe to a similar journal for half the price, should induce the publishers to reduce the rate of subscription. For it must not be forgotten that the return they get for their money will appeal far more to many than the sacrifice required of them towards the laudable cause which the conductors of the Magazine have in view.

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

'অনাথবন্ধু' মাসিকপত্র

শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণা।

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥

চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্॥

গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥

কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥

সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী মাহেশ্বরী নমোঽস্তুতে॥

প্রার্থনা—সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী।
দক্ষানন্দকরী বিপৎক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী॥

সাক্ষান্মোক্ষকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী।

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোক-দিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথা:— মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেন্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কাযে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টার-দিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভার-প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

श्रीश्रीकालीमाता।

ध्यान।

करालवदनां घोरां मुक्तकेशीं चतुर्भुजाम्।
कालिकां दक्षिणां दिव्यां मुण्डमालाविभूषिताम्॥
सद्यश्छिन्नशिरः खड्ग वामाधोर्द्धकराम्बुजाम्।
अभयं वरदञ्चैव दक्षिणाधोर्द्धपाणिकाम्॥
महामेघप्रभां श्यामां तथाचैव दिगम्बरीं।
कण्ठावसक्तमुण्डालीगलद्रुधिरचर्च्चिताम्॥
कर्णावतंसतानीत शवयुग्मभयानकाम्।
घोरदंष्ट्रां करालास्यां पीनोन्नतपयोधरां॥
शवानां करसंघातैः कृतकाञ्चीं हसन्मुखीं।
सृक्कद्वयगलद्रक्तधाराविस्फुरिताननां॥
घोररावां महारौद्रीं श्मशानालयवासिनीं।
बालार्कमण्डलाकारलोचनत्रितयान्वितां॥
दन्तुरां दक्षिणव्यापि मुक्तालम्बिकचोच्चयां।
शवरूप महादेव हृदयोपरि संस्थितां॥
शिवाभिर्घोररावाभिश्चतुर्द्दिक्षु समन्वितां।
महाकालेन च समं विपरीतरतातुरां॥
सुखप्रसन्नवदनां स्मेराननसरोरुहां।
एवं संचिन्तयेत् कालीं सर्व्वकामसमृद्धिदाम्॥

प्रणाम।

सर्व्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

स्तव।

देवि प्रपन्नार्त्तिहरे प्रसीद
प्रसीद मातर्ज्जगतोऽखिलस्य।
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं
त्वमीश्वरी देवि चराचरस्य॥
आधारभूता जगतस्त्वमेका
महीस्वरूपेण यतः स्थितासि।
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत
दाप्यायते कृत्स्नमलङ्घ्यवीर्य्ये॥
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्य्या
विश्वस्य बीजं परमासि माया।
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्
त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः॥
विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः
स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु।
त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्
का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः॥
सर्व्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते।
स्वर्गापवर्गदे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥
सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि।
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तु ते॥
शरणागतदीनार्त्तपरित्राणपरायणे।
सर्व्वस्यार्त्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते॥

শ্রীশ্রীকালীমাতার ধ্যান, প্রণাম ও স্তোত্র।

ধ্যান।

করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃ খড়্গ বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণাধোর্দ্ধপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালী গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্॥
কর্ণবতংসতানীতশবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥
শিবাভির্ঘোররাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষুসমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীত রতাতুরাম্॥
সুখ সুপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সংচিন্তয়েৎ কালীং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্॥

প্রণাম।

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

স্তব।

দেবি প্রপন্নার্ত্তি হরে প্রসীদ
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত
দাপায়্যতে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্ত বীর্য্যা
বিশ্বস্যবীজং পরমাসি মায়া।
সংমোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যা সমস্তা তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥
সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
সর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

প্রথম বর্ষ। | আশ্বিন। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | চতুর্থ সংখ্যা।

জগদ্ধাত্রী।

[শ্রীবরদাচরণ চক্রবর্ত্তী লিখিত।]

এস মা শঙ্করি শিবে বসুধাপালিনি।
বর্ষান্তে কৈলাস হ'তে এস গো জননি॥
তব সমাগমে মাতঃ আনন্দ-সাগরে।
ভাসিবে সমগ্র বঙ্গ ভাবিছে অন্তরে॥
বর্ষের অতুল শোভা হেরি জলে স্থলে।
এ হেন শরতে মাতঃ এস কুতূহলে॥
স্বহস্তে বিতরি অন্ন সমগ্র জগতে।
অন্নপূর্ণা-নামে খ্যাতা হইলে মহীতে॥
সে নাম ধরিতে মাতঃ বল বা কেমনে।
অন্ন বিনা তব পুত্র মরে প্রতিদিনে॥

দুই দিন ভক্তগৃহে আমোদ-হিল্লোলে।
থাকিয়া চলিয়া যাও অতি কুতূহলে॥
মনে রেখো পুত্র-কন্যা তব পরিজন।
তব মুখাপেক্ষী সবে করিও চিন্তন॥
গাও সবে সমকণ্ঠে কাঁপাইয়া ধরা।
আসিবেন তারিণী তারা সর্ব্বদুঃখহরা॥
ভুলিয়া কলত্র-পুত্র ভুলি পরিজন।
জগদ্ধাত্রীপদে কর আত্মসমর্পণ॥
বরদা ভাবে তব পদে নাহিক মতি।
কি দিয়ে পূজিব তোমা বল ভগবতি॥

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

১লা কার্ত্তিক, ইং ১৮ই অক্টোবর, বুধবার।—সপ্তমী বৈকাল ঘণ্টা ৫।৮, পুনর্ব্বসুনক্ষত্র। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৩২ গতে বায়ুকোণে নৈর্ঋতে নাস্তি, বৈকাল ঘ ৫।৮ গতে পাপযোগ ও অগস্ত্যাদোষ। বৈকাল ঘ ৫।৮ মধ্যে তাল পরে নারিকেল আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৫৪ গতে ৭।৩৯ মধ্যে, পরে ১।৩৩ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

২রা কার্ত্তিক, ইং ১৯শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।—অষ্টমী রাত্রি ঘণ্টা ৭।১৩, পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ঘ ৮।১৬। যাত্রাশুভ, দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।১৬ গতে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩৭ গতে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।১৩ গতে পাপযোগদোষ। রাত্রি ঘ ৭।১৩ মধ্যে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩৭ গতে ৫।২৯ মধ্যে।

৩রা কার্ত্তিক, ইং ২০শে অক্টোবর, শুক্রবার।—নবমী রাত্রি ঘ ৯।১৮, পুষ্যানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।৫৪। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।৫৪ গতে নক্ষত্রদোষ। রাত্রি ঘ ৯।১৮ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ।

৪ঠা কার্ত্তিক, ইং ২১শে অক্টোবর, শনিবার।—দশমী রাত্রি ঘ ১১।১২, অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ঘ ১১।২৩। যাত্রানাস্তি, পাপযোগ ও নক্ষত্রদোষ। কলম্বীভক্ষণ নিষেধ।

৫ই কার্ত্তিক, ইং ২২শে অক্টোবর, রবিবার।—একাদশী রাত্রি ঘ ১২।৪৫, মঘানক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৪০। যাত্রানাস্তি, পাপযোগ ও নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ১২।৪৫ গতে তিথি ও দিনদগ্ধাদোষ। একাদশীর উপবাস। রাত্রি ঘ ১২।৪৫ মধ্যে সিম্বী পরে পূতিকাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৪৪ গতে ৪।৩১ মধ্যে।

৬ই কার্ত্তিক, ইং ২৩শে অক্টোবর, সোমবার।—দ্বাদশী রাত্রি ঘ ২।১, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৩ গতে পূর্ব্বে উত্তরে মাত্র নাস্তি। প্রাতঃ ঘ ৭।৪ গতে একাদশীর পারণ। পূতিকা অভক্ষ্য।

৭ই কার্ত্তিক, ইং ২৪শে অক্টোবর, মঙ্গলবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৪৪, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।৫৬। যাত্রানাস্তি, নক্ষত্রদোষ, বৈকাল ঘ ৪।৫৩ গতে বৈধৃতিযোগদোষ, রাত্রি ঘ ২।৪৪ গতে রিক্তাদোষ। রাত্রি ঘ ২।৪৪ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই ও আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ৭।৫০ মধ্যে।

৮ই কার্ত্তিক, ইং ২৫শে অক্টোবর, বুধবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ২।৫৫, হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫৩। যাত্রানাস্তি, রিক্তাদোষ ও বিষ্টিদোষ, রাত্রি ঘ ২।৫৫ গতে পক্ষান্তদোষ। ভূতচতুর্দ্দশীকৃত্যং চতুর্দ্দশশাকভোজনং প্রদোষে চতুর্দ্দশদীপদানং শিবার্চ্চনং শিবপুরগমনঞ্চ। মাষকলাই ও আমিষ অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৫৪ গতে ৭।২৯ মধ্যে, পরে ১।৩৩ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

৯ই কার্ত্তিক, ইং ২৬শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।—অমাবস্যা রাত্রি ঘ ২।৩৬, চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।২১। যাত্রানাস্তি, বিষযোগদোষ, রাত্রি ঘ ২।৩৬ গতে তিথিদোষ। দীপান্বিতাকৃত্যং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং উল্কাদানং প্রদোষে দীপদানং সুখরাত্রি লক্ষ্মী ও অলক্ষ্মীপূজা অমাবস্যার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন। রাত্রি ঘ ২।৩৬ মধ্যে আমিষভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩৪ গতে ৫।২৩ মধ্যে।

শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা।

১০ই কার্ত্তিক, ইং ২৭শে অক্টোবর, শুক্রবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১।৪৮, স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১৮। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।১৮ গতে নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ১।১৮ গতে দিনদগ্ধা ও পাপযোগদোষ। দ্যূতপ্রতিপদ স্নানদানে দশগুণ ফলম্। অন্নকূটযাত্রা। কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ।

১১ই কার্ত্তিক, ইং ২৮শে অক্টোবর, শনিবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ১২।৩৪, বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৫১। যাত্রানাস্তি, যমদ্বিতীয়াদোষ। ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃত্যম্। আচরণীয় তিলকদান নাস্তি। ভ্রাতে ভগিন্যৌ নিরামিষভোজ্য অন্নদানঞ্চ। যমদ্বিতীয়া, যাত্রা অধ্যয়ন নাস্তি। বৃহতীভক্ষণ নিষেধ।

১২ই কার্ত্তিক, ইং ২৯শে অক্টোবর, রবিবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১০।৫৭, অনুরাধানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৯। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৯ গতে পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।২১ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৫৭ গতে রিক্তাদোষ। পটোলভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৪৪ গতে ৪।৩১ মধ্যে।

১৩ই কার্ত্তিক, ইং ৩০শে অক্টোবর, সোমবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ৯।২, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র বৈকাল ঘ ৫।৪৮। যাত্রানাস্তি, রিক্তাদোষ, রাত্রি ঘ ৯।২ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি। গণেশার্চ্চনচতুর্থী ব্রতম্। রাত্রি ঘ ৯।২ মধ্যে মূলা পরে শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ।

১৪ই কার্ত্তিক, ইং ৩১শে অক্টোবর, মঙ্গলবার।—পঞ্চমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৪, মূলানক্ষত্র দিবা ঘ ৪।২৫। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।১৮ গতে দক্ষিণে পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৪।২৫ গতে যাত্রামধ্যম, সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৪ গতে পাপযোগদোষ। ষট্পঞ্চমী ব্রত ও পূজা। সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৪ মধ্যে

শ্রীফল পরে নিম্বভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ৭।৪৭ মধ্যে।

১৫ই কার্ত্তিক, ইং ১লা নভেম্বর, বুধবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘ ৪।৩৫, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘ ২।৫২। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১২।২৯ গতে পশ্চিমে দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৫২ গতে নক্ষত্রদোষ, দিবা ঘ ৪।৩৫ গতে সিদ্ধিযোগ। স্কন্দার্চ্চনষষ্ঠী ও নাড়ীষষ্ঠী পূজা। দিবা ঘ ৪।৩৫ মধ্যে নিম্ব পরে তালভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৫৪ গতে ৭।৪২ মধ্যে, পরে ১।৩২ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

১৬ই কার্ত্তিক, ইং ২রা নভেম্বর, বৃহস্পতিবার।—সপ্তমী দিবা ঘ ২।১২, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ঘ ৪।১২। যাত্রানাস্তি, নক্ষত্রদোষ, দিবা ঘ ১।১২ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে পূর্ব্বে নাস্তি। দিবা ঘ ২।১২ মধ্যে তাল পরে নারিকেল ও আমিষ-ভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৪২ গতে ৫।১৯ মধ্যে।

১৭ই কার্ত্তিক, ইং ৩রা নবেম্বর, শুক্রবার।—অষ্টমী দিবা ঘ ১১।৪৯, শ্রবণানক্ষত্র দিবা ঘ ১১।৩২। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ৮।১৩ গতে ঈশানে বায়ুকোণে নাস্তি, দিবা ঘ ১১।৩২ গতে তিথিদোষ, দিবা ঘ ১১।৪৯ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ভোর ৫।৫৬ গতে পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি। দিবা ঘ ১১।৪৯ মধ্যে গোষ্ঠাষ্টমী গবাং পূজা গোগ্রাস দান প্রদক্ষিণঞ্চ। দিবা ঘ ১১।৪৯ মধ্যে নারিকেল, আমিষ পরে অলাবু অভক্ষ্য।

১৮ই কার্ত্তিক, ইং ৪ঠা নবেম্বর, শনিবার।—নবমী দিবা ঘ ৯।৩২, ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ঘ ৯।৫৮। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।৩২ গতে উত্তরে শুভ, দিবা ঘ ৯।৫৮ গতে পাপযোগদোষ। দিবা ঘ ৯।৩২ মধ্যে ত্রেতাযুগাদ্যা স্নানদানাদি নিরন্তর সম্বৎসরাবচ্ছিন্ন গঙ্গাস্নান জন্য ফলম্।

শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা। গৌরী ব্রত। দিবা ঘ ৯।৩২ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বীভক্ষণ নিষেধ। গোস্বামীমতে অক্ষয়নবমী ব্রত।

১৯শে কার্ত্তিক, ইং ৫ই নবেম্বর, রবিবার।—দশমী দিবা ঘ ৭।২৪ পরে একাদশী রাত্রি ভোর ঘ ৫।৩১, শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ৮।৩৫। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নান-দানে শুভ, প্রাতঃ ঘ ৭।২৪ গতে ৮।৩৫ মধ্যে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি ইতি কেচিৎ। শিম অভক্ষ্য। মাহেন্দ্র-যোগ—দিবা ঘ ৩।৪৩ গতে ৪।২৯ মধ্যে।

২০শে কার্ত্তিক, ইং ৬ই নবেম্বর, সোমবার।—দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৩।৫৭, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।২৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি, প্রাতঃ ঘ ৭।২৩ গতে দক্ষিণে শুভ, রাত্রি ঘ ১২।২১ গতে নৈঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৩।৫৭ গতে পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি। মন্বন্তরা স্নানদানাদি। উত্থান একাদশীর উপবাস সর্ব্বসম্মত। পূতিকা অভক্ষ্য।

২১শে কার্ত্তিক, ইং ৭ই নবেম্বর, মঙ্গলবার।—ত্রয়োদশী রাত্রি ঘ ২।৪৬, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।৩২ পরে রেবতীনক্ষত্র রাত্রি ভোর ঘ ৬।২। যাত্রানাস্তি, বিষযোগ-দোষ। দিবা ঘ ৯।৫৪ মধ্যে পূর্ব্বাহ্ণে একাদশীর পারণ। বার্ত্তাকু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৪৫ মধ্যে।

২২শে কার্ত্তিক, ইং ৮ই নবেম্বর, বুধবার।—চতুর্দ্দশী রাত্রি ঘ ২।০, অশ্বিনীনক্ষত্র রাত্রি ভোর ৫।৫৯। যাত্রানাস্তি, রিক্তা ও তিথিদোষ, রাত্রি ঘ ১২।২৩ গতে ব্যতীপাতযোগ-দোষ, রাত্রি ঘ ২।০ গতে বিষ্টি ও পক্ষান্তদোষ। মাষকলাই ও আমিষভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৫৪ গতে ৭।৪১ মধ্যে, পরে ১।২৮ গতে ৩।৪১ মধ্যে।

২৩শে কার্ত্তিক, ইং ৯ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার।—পূর্ণিমা রাত্রি ঘ ১।৪৫, ভরণীনক্ষত্র। যাত্রানাস্তি, বিষ্টি ও নক্ষত্র এবং ব্যতীপাতযোগদোষ। পূর্ণিমার ব্রত, উপবাস ও নিশিপালন।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা সর্ব্বসম্মত। কার্ত্তিকেয়ং মন্বন্তরা স্নানদানাদি। রাত্রি ঘ ১।৪৫ মধ্যে মৎস্য ও মাংসভক্ষণ নিষেধ। বার-বেলা দিবা ঘ ২।৩০ গতে ৫।১৬ মধ্যে।

২৪শে কার্ত্তিক, ইং ১০ই নবেম্বর, শুক্রবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ১।৫৯, ভরণীনক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৬।২৭। যাত্রানাস্তি, নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ৯।৫৬ গতে পরিঘপূর্ব্বার্দ্ধযোগদোষ, রাত্রি ১।৫৯ গতে পাপযোগদোষ। কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ।

২৫শে কার্ত্তিক, ইং ১১ই নবেম্বর, শনিবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ২।২৬, কৃত্তিকানক্ষত্র প্রাতঃ ঘ ৭।২৩। যাত্রানাস্তি, পরিঘপূর্ব্বার্দ্ধযোগদোষ, প্রাতঃ ঘ ৭।২৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৫০ গতে উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ২।২৬ গতে উত্তরে শুভ। বৃহতীভক্ষণ নিষেধ।

২৬শে কার্ত্তিক, ইং ১২ই নবেম্বর, রবিবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ৪।১, রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৮।৪৬। যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ৩।২৪ গতে বিষ্টিদোষ, রাত্রি ঘ ৪।১ গতে রিক্তা ও তিথিদোষ। পটোলভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্র-যোগ—দিবা ঘ ৩।৪০ গতে ৪।২৭ মধ্যে।

২৭শে কার্ত্তিক, ইং ১৩ই নবেম্বর, সোমবার।—চতুর্থী রাত্রি ভোর ঘ ৫।৪১, মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ঘ ১০।৫৯। যাত্রা-শুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ১০।৩৯ গতে রিক্তা ও নক্ষত্রদোষ। মূলাভক্ষণ নিষেধ।

২৮শে কার্ত্তিক, ইং ১৪ই নবেম্বর, মঙ্গলবার।—পঞ্চমী, আর্দ্রানক্ষত্র দিবা ঘ ১২।৫৪। যাত্রানাস্তি, নক্ষত্রদোষ, দিবা

ঘ ১২।৫৪ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৩।২৭ গতে দক্ষিণে পূর্ব্বে নাস্তি। শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৪২ মধ্যে।

২৯শে কার্ত্তিক, ইং ১৫ই নবেম্বর, বুধবার।—পঞ্চমী প্রাতঃ ঘ ৭।৩, পুনর্ব্বসুনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।২৫। যাত্রানাস্তি, সংক্রান্তি-দোষ। বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। সংক্রান্তিকৃত্যং স্নানদানাদি। শ্রীশ্রীকার্ত্তিকেয় ব্রত। **শ্রীশ্রীকার্ত্তিকপূজা।** প্রাতঃ ঘ ৭।৩ গতে নিম্ব ও মৎস্য, মাংস ভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৬।৫৩ গতে ৭।৪০ মধ্যে পরে ১।২৯ গতে ৩।৪০ মধ্যে।

কার্ত্তিক মাস।
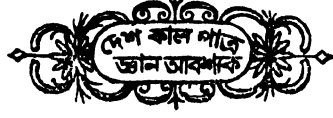
[শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত।]

সম্বৎসরান্তর্গত দ্বাদশ মাসের মধ্যে কার্ত্তিকমাস সপ্তম পর্য্যায়-ভুক্ত। কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমার জন্য এই মাসের নাম কার্ত্তিক মাস। এই মাসে অংশুমালী তুলারাশি অবলম্বন করিয়া উদয় হন, তজ্জন্য সৌর কার্ত্তিক নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কার্ত্তিক মাসে জন্মিলে জাতক বিক্রয়দক্ষ, ধনাঢ্য, বহুভাষী, কূটবুদ্ধি, যুদ্ধবিশারদ হয় এবং কন্যার প্রথম ঋতুদর্শন হানিজনক হয়।

এই মাস ঋতুপরিবর্ত্তনের সময়। শরৎঋতুর তিরোধান এবং হেমন্তের আবির্ভাব এই মাসে বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে। এই সময়ে সকলেরই বিশেষ সাবধানে থাকা উচিত। কার্ত্তিকের হিম বড় অনিষ্টকর। রাত্রিকালে শরীরে হিম লাগাইলে পীড়া হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। সেই জন্য শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এই হিমপাতের পূর্ব্ব হইতেই গরম কাপড় চোপড় ব্যবহার করার ব্যবস্থা আছে। কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যার পর বহির্গমন হইতে হইলে, বক্ষঃস্থল, মস্তক, কর্ণযুগল ও পদদ্বয় বেশ করিয়া গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া বাহির হওয়া অত্যন্ত সদ্যুক্তি।

কার্ত্তিক মাস শীতল ও রুক্ষ। এই মাসে লবণ, ক্ষার, তিক্ত, অম্লরস এবং কটুরসবিশিষ্ট ঘৃত (অর্থাৎ ঝালপদার্থ-মিশ্রিত ঘৃত) ও হৈমন্তিক ধান্যের অন্ন হিতকর। উষ্ণ জলপান, অগুরুচন্দনলেপন, উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন ও স্নান, শাক, দধি, ইক্ষুরসজাত দ্রব্যাদি ও শালি (আমন) চাউলের সুগন্ধ অন্ন, স্নেহপূর্ণ উষ্ণবীর্য্য (Heat producing) দ্রব্য যথা—ঘৃত, তৈল, গোধূমের পিষ্টকাদি, ক্ষীর এবং বলকর ও পুষ্টিকর খাদ্যভোজন বিধেয়।

এই মাসে নদী, খাল প্রভৃতির জল শুকাইতে থাকে। কার্ত্তিক মাসে যব, মটর, খেসারী, কলাই, মসুর, ছোলা ও ধানের বীজ বপন করিতে হয়। করলা, উচ্ছে, গাজর, পটোল, তরমুজ ও রাই-সরিষা এই মাসে বুনিতে হয়। এই মাসে ফলকপি, নূতন আলু, মূলা, বড় বড় বেগুণ, ধনেশাক প্রভৃতি 'সুজলা' 'সুফলা' এই বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক স্থানে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসে গোলাপ, গাঁদা প্রভৃতি চারা রোপণ করিবার সময়। শীতঋতুর অনেক ফলগাছও এই সময়ে রোপণ করার বিধি আছে।

কার্ত্তিকীপূর্ণিমার দিন জৈনদিগের মহাধুম। ঐ দিবস কলিকাতায় জৈনদিগের বিরাট শোভাযাত্রার মিছিলে ভগবান্ পরেশনাথ বাহির হন। বহুল রত্নরাজিমণ্ডিত বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শিল্পসম্ভার এই শোভাযাত্রায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে। নানাজাতীয় বাদকদলের বিচিত্র বাদন, বহুমূল্য রত্নমণ্ডিত অশ্বরাজি, কত রকম রকম গাড়ী, রং-বেরংয়ের নিশানাদি এই শোভাযাত্রায় দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে এ দৃশ্য বাস্তবিকই দর্শনীয়।

কার্ত্তিক মাসে হিন্দুদিগের নিয়মসেবার ব্যবস্থা আছে। এই মাসে কায়মনোবাক্যে সংযমী হইয়া নিত্য প্রত্যুষে উঠিয়া স্নানাহ্নিক, ইষ্টদেবের পূজা, পাঠ, ভক্তিসহকারে দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি সৎকর্ম্মের দ্বারা গৃহস্থগণের ধর্ম্মার্জ্জনের পন্থা সুনির্দ্দিষ্ট আছে। বৃন্দাবনের ন্যায় বঙ্গদেশের সকল স্থানেই এই মাসে বৈষ্ণবগণ নিত্য প্রাতঃকালে টহল দিয়া থাকেন।

মহারাজ শ্রীবীর মিত্রোদয় সিংহ দেব ধর্ম্মনিধি বাহাদুর ;

শোণপুরের সামন্তরাজ।

উড়িষ্যার সম্বলপুর অঞ্চলের পূর্ব্বদক্ষিণপ্রান্তে শোণপুর নামক সামন্তরাজ্য অবস্থিত। এই রাজ্যের ভূমিপরিমাণ প্রায় সহস্র বর্গমাইল। জনসংখ্যা ২ লক্ষ ১৫ হাজার ৭ শত ১৬। এই রাজ্যের ভূমি নৈসর্গিকশোভায় সুন্দর ও বন্ধুর; মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি ইহার বৈচিত্র্য-সম্পাদন করিতেছে। মহানদী, তাহার করদ নদী ও বহুসংখ্যক তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে এই রাজ্যে কৃষিক্ষেত্রে জলসেচন করা হইয়া থাকে। রাজ্যের সমস্ত ভূমিই শস্য-উৎপাদনের জন্য কর্ষিত হয়। প্রতি বর্ষে এই রাজ্যে পর্জ্জন্যদেব ৬০ ইঞ্চি বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন। ধান, মুগ, কুলথি, তিল ও ইক্ষুই এই রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। রাজ্যের সীমান্তে রাজার বিস্তীর্ণ বনভূমি অবস্থিত। রাজ্যমধ্যেই রাজ্যের বনজ পণ্য বিক্রীত হইয়া যায়, কেবল কৃষিজ পণ্যই বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এই রাজ্যের শ্রমশিল্পজ পণ্যের মধ্যে মোটা কার্পাসবস্ত্র, তসর ও রেশমই উল্লেখযোগ্য। যে স্থানে মহানদীর সহিত তেলনদ সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সঙ্গমস্থানের সান্নিধ্যেই এই রাজ্যের রাজধানী শোণপুর অবস্থিত। নদী হইতে এই রাজধানীর দৃশ্য নয়নাভিরাম। স্থানীয় কারিকরগণ পিত্তলমূর্তি, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতি ধাতুর কারুকার্য্য ও লৌহার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। এই রাজ্যমধ্যে মহানদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে আরও সতেরো মাইল দূরে বিঙ্কানাম্নী নগরী অবস্থিত। তথায় নদীপথে বাণিজ্য হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক আনুকূল্যহেতু এই রাজ্যটি আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও সন্নিহিত বিস্তীর্ণতর রাজ্য অপেক্ষা অধিকতর রাজস্বদান করে। প্রজাগণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য এই রাজ্যে দেড় শতের অধিক বিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়, একটি মধ্যশ্রেণীর বিদ্যালয়, একটি মধ্যশ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয়, ছয়টি বালিকা-বিদ্যালয়, একটি সংস্কৃত বিদ্যালয়, তিনটি নিম্নজাতীয়দিগের বিদ্যালয় ও অনেক উচ্চ প্রাথমিক, নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পাঠশালা আছে। রাজবাড়ীর ঔষধালয় ব্যতীত প্রজাদিগকে ঔষধবিতরণের ও চিকিৎসার জন্য দুইটি ঔষধালয় ও হাসপাতাল আছে। বসন্তের টীকাপ্রদানের প্রথা এই রাজ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। প্রজাগণের গৃহপালিত পশ্বাদির তত্ত্বাবধানকার্য্যে রাজসরকার হইতে এক জন বিচক্ষণ পশু-চিকিৎসক নিযুক্ত আছেন। এক জন কৃতবিদ্য সার্জ্জনের হস্তে এই রাজ্যের চিকিৎসা-বিভাগের ভার অর্পিত আছে।

রাজবংশ।

শোণপুরের সামন্তরাজগণ চৌহান রাজপুতবংশীয়। রাজপুতদিগের এই বংশশাখায় দিল্লীর শেষ হিন্দুনরপতি পৃথ্বীরাজ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই বংশাবতংস রাম দেব নামক নরপাল সম্বলপুরের সন্নিহিত পাটনা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং আগড়জাত নামক রাজ্যসমূহ আপনার আয়ত্ত করিয়া লন। এই

রাজ্যগুলি ছোটনাগপুরের উত্তরে ও বিলাসপুরের পূর্ব্বে অবস্থিত। রাম দেব হইতে নবমপুরুষ রাজা নরসিংহ দেব তাঁহার ভ্রাতা বলরাম সিংহ দেবকে বলরামপুর রাজ্যটি দান করেন। এই বলরাম সিংহ দেব হইতে অধস্তন ত্রয়োদশপুরুষ রাজা মদনগোপাল সিংহ দেব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শোণপুরে বর্ত্তমান রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের আদিম অধিবাসীদিগের নিকট হইতে ঐ রাজ্যটি জয় করিয়া লইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত বীর মিত্রোদয় সিংহ দেব ধর্ম্মনিধি বাহাদুর উক্ত রাজা মদনগোপাল সিংহ দেব বাহাদুর হইতে অধস্তন দ্বাদশপুরুষ মাত্র। নিম্নে তাহাদের সকলের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা প্রদত্ত হইল।

	রাজগণের নাম		রাজত্বকাল
১।	রাজা মদনগোপাল সিংহ দেব		১৫৫৬-১৬০৬
২।	" শ্রীলাল	"	১৬০৬-১৬৬৫
৩।	" পুরুষোত্তম	"	১৬৬৫-১৬৭৫
৪।	" শ্রীরাজ	"	১৬৭৫-১৭০৯
৫।	" অচল	"	১৭০৯-১৭২৫
৬।	" দিব্য	"	১৭২৫-১৭৬৬
৭।	" জরোয়ার	"	১৭৬৬-১৭৬৭
৮।	" শোভা	"	১৭৬৭-১৭৮১
৯।	" পৃথ্বীসিংহ দেব বাহাদুর		১৭৮১-১৮৪১
১০।	" নীলধর	"	১৮৪১-১৮৯১
১১।	" প্রতাপরুদ্র	"	১৮৯১-১৯০১
১২।	" শ্রীবীর মিত্রোদয় সিংহ দেব ধর্ম্মনিধি		১৯০১-

শোণপুরের বর্ত্তমান নরপাল শ্রীবীর মিত্রোদয় সিংহ দেব বাহাদুরের পিতামহ রাজা নীলধর সিংহ দেব বাহাদুরের সহিত বৃটিশরাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তৎকালে রাজা নীলধর সম্পূর্ণ স্বাধীন নৃপতি ছিলেন। ইংরেজ সরকার শোণপুরের রাজগণকে করদরাজা বলিয়া স্বীকার করেন। সরকার বাহাদুর শোণপুররাজকে যে সনন্দ দান করিয়াছেন, তাহাতে রাজাকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনে কয়েকটি বিষয় ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। স্বর্গীয় রাজা নীলধর সিংহ প্রজাবর্গের ভক্তিভাজন ও বৃটিশরাজের অনুরক্ত সামন্তরাজ বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন। পলিটিক্যাল-বিভাগে এই কথা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে, যে সময় ভারতসাম্রাজ্যে শান্তি পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সেই সময় রাজা নীলধর সিংহ দেব বাহাদুর ইংরেজ সরকারকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্বলপুর অঞ্চলে বিদ্রোহদমনের সময় স্বর্গীয় রাজা নীলধর সিংহ দেব বাহাদুর সরকারকে সেই বিদ্রোহের দমনকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন। এখন সে সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রাজা নীলধর সিংহ বাহাদুরের আমলে আঙ্গুল ও খোন্দমল অঞ্চলে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তিনি সেই সময় ঐ অঞ্চলের বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করিয়া সুশৃঙ্খলা সংস্থাপনে বৃটিশরাজের প্রতিনিধিকে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই শোণপুরের সামন্তরাজগণ ইংরেজ সরকারের অনুরক্ত বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রতাপরুদ্র সিংহ দেব বাহাদুর তাঁহার পৈতৃক-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেন এবং রাজ্যশাসনসম্পর্কিত অনেক ব্যাপারে উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সরকারের বিশেষ প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর।

রাজা প্রতাপরুদ্র সিংহ দেব বাহাদুরের লোকান্তরপ্রাপ্তির পর শোণপুররাজ্যের বর্ত্তমান সামন্ত মহারাজ শ্রীবীর মিত্রোদয় সিংহ দেব ধর্ম্মনিধি বাহাদুর শোণপুরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজের জন্ম হয়, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বাহাদুরের উপনয়ন হইয়াছে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা কলাহাণ্ডির অন্তর্ভুক্ত কাশীপুরের বিদুষী রাজনন্দিনীর সহিত ইঁহার বিবাহ প্রদান করেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৮ই আগষ্ট ইনি গদী প্রাপ্ত হন। বাল্যকালেই মহারাজের ভবিষ্যৎ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শৈশবেই মহারাজ বীর মিত্রোদয় উড়িয়া, ইংরেজী, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং শকুন্তলা, বিক্রমোর্ব্বশী ও রত্নাবলী নাটক উড়িয়াভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ অনুবাদ উড়িয়াভাষায় পাঠ্যপুস্তক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বর্ত্তমান শোণপুররাজ অন্যান্য রাজগণের ন্যায় দুর্ব্বল নহেন। তিনি ব্যায়ামাদিতে মনোযোগী এবং অশ্বারোহণে ও শিকার খেলায় বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

মহারাজ শ্রীবীর মিত্রোদয় বাহাদুর যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি রাজ্যের বিচার ও শাসনবিভাগে কার্য্য করিতেন। সেই সময় শোণপুররাজ্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উক্ত প্রদেশের পলিটিক্যাল অফিসারগণ শিক্ষানবিশীর সময় মহারাজ বাহাদুরের কার্য্যদক্ষতার ও শিক্ষার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার এক সময় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—"রাজা বাহাদুর প্রতাপরুদ্র সিংহ দেব! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র যে উৎকৃষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাহার জন্য আমি আপনার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। তিনি শাসনব্যাপারের সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করেন, এই অভিপ্রায় আপনি সর্ব্বদাই প্রকাশ

করিতেন; আপনার সেই চিন্তাপূর্ণ ইচ্ছা সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিয়াছে। আমি আপনার রাজ্যে আসিবার পর যুবরাজের সহিত অনেক সময় অতিবাহিত করিয়াছি। যুবরাজের বুদ্ধিমত্তা, কার্য্যকরীশক্তি, উৎসাহ ও চরিত্রবলদর্শনে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।"

আটাশ বৎসর বয়সে মহারাজ বীর মিত্রোদয় শোণপুরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তদবধি তিনি রাজ্যশাসনের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার প্রজাবর্গের—বিশেষতঃ শিল্প ও কৃষিবলের উন্নতিসাধনে তিনি অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সকল বিষয়ে তাঁহার দূরদর্শিতা অনন্যসাধারণ।

মহারাজ ভারতের প্রায় সর্ব্বস্থানে পর্যটন করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এবং ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে দরবার হইয়াছিল, তাহাতে তিনি ভারত গবর্মেণ্টকর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন এবং দুই দরবারেই সরকারের নিকট হইতে সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সম্রাট্ যখন কলিকাতায় প্রিন্সেপ্ ঘাটে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন, তখন মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত বীর মিত্রোদয় সিংহ দেব বাহাদুরই তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

মহারাজের কার্য্যদক্ষতা ও খ্যাতি।

শাসনদক্ষতায় ও শাসনকার্য্যের কৃতিত্বসাধনে মহারাজ বাহাদুর বড় বড় রাজপুরুষের খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান সময়োচিত শাসনপ্রণালীদর্শনে সকলেই প্রীত হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজপুরুষের মন্তব্যের কিয়দংশমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল —

মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার বাহাদুর বলিয়াছেন,—যুবরাজের বুদ্ধির প্রখরতা, কার্য্য করিবার ক্ষমতা, উৎসাহ এবং চরিত্রবলদর্শনে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর্ য়্যাণ্ড্রু ফ্রেজার বাহাদুর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের দরবারে মহারাজ বীর মিত্রোদয় সিংহ বাহাদুরের শাসনসম্বন্ধে প্রশংসা করিতে করিতে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে এই কয়টি কথাও বলিয়াছিলেন।—"প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি সর্ব্বপ্রথমে শোণপুরে গমন করি এবং সেই সময় হইতে আপনার বংশের সহিত আমার বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। উড়িষ্যায় সমস্ত রাজন্যবর্গকে আপনি যে সুন্দর উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা দর্শনে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। সুশাসক, বিচক্ষণ, মিতব্যয়ী, ন্যায়নিষ্ঠ এবং বিবেচনাপূর্ব্বক উন্নতিশীল বলিয়া আপনার খ্যাতি আছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজ্য বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হওয়া অবধি আপনি বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের অধীনে আছেন এবং আমি বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের কর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে কেবল আপনাকে আপনার সাধারণ ষ্টেটের সুশাসনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, তাহা নহে, পরন্তু আপনি উড়িষ্যা অঞ্চলের নূতন বন্দোবস্তে আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, সে জন্যও আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।"

ইহার পূর্ব্বেই বড়লাট বাহাদুর কটকে যে দরবার করিয়াছিলেন, সেই দরবারে যে সমস্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শোণপুরের মহারাজ বাহাদুরকেই প্রাধান্য প্রদত্ত হইয়াছিল।

মহারাজের প্রজাবাৎসল্য।

গত কয়েক বৎসরে শোণপুররাজ্যে শিক্ষাপ্রদানব্যাপারের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রাজ্যের বহুগ্রামে ও নগরে বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুর সদাই তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন-চিন্তা করিয়া থাকেন। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রতি প্রতিষ্ঠানে—প্রতি অনুষ্ঠানে এই রাজ্যের নৃপতির প্রজাপ্রীতির পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রজাবর্গও তাঁহাদের রাজাকে একান্তচিত্তে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকে। এই রাজ্যের প্রজাদিগের রাজভক্তি অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রবলা; কাল সেই রাজভক্তি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই। শোণপুররাজ্যের প্রজাবর্গের হিতসাধন-চিন্তা মহারাজের মনে অহরহ জাগিয়া আছে। সেই জন্য তিনি ন্যায়নিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত নৃপতি বলিয়া সম্মানিত। মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং সাহিত্যানুরাগী, বিদ্যোৎসাহী ও বিদ্বজ্জনপ্রতিপালক। যদিও তিনি ইংরেজীশিক্ষার অনুরাগী, কিন্তু তিনি বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ অনুরক্ত। তাঁহার ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্তি দেখিয়া উড়িষ্যার "মুক্তিমণ্ডপ" নাম্নী প্রধান ব্রাহ্মণসভা তাঁহাকে "ধর্ম্মনিধি" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং কয়েকখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন এবং এক জন সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌কে তাঁহার রাজ্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস রচনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন। মহারাজ বেহার ও উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধান সমিতির ভাইস্ পেট্রণ। ইনি উন্নতির এবং হিতজনক সংস্কারের পক্ষপাতী।

মহারাজের রাজভক্তি।

ইংরেজরাজের প্রতি মহারাজ বাহাদুরের ঐকান্তিক ভক্তির কথা উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের উক্তিতে সর্ব্বদাই সপ্রকাশ। ইংলণ্ডের সহিত জার্ম্মাণীর যুদ্ধ বাধিলে মহারাজ বাহাদুর সামন্তরাজগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহার রাজ্যের সমস্তই সরকারের হস্তে সমর্পণ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই জন্য বেহার ও উড়িষ্যার ছোটলাট বাহাদুর মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন। ভারতীয় War Relief Fundএ

মহারাজ বাহাদুর ৩৬ হাজার টাকা দান করিয়া যাঁহারা ইংরেজ বাহাদুরের পক্ষভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত কার্য্যতঃ আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন এই রাজভক্ত নরপাল রণক্ষেত্রে যুদ্ধে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যদিগের জন্য ১ হাজার ১ শত ১১ মণ চাউল দিয়াছেন। স্বয়ং মহারাণী সাহেবাও সেণ্ট জন য়্যাম্বুলেন্স ফণ্ডে তিন হাজার টাকা দান করিয়াছেন। শোণপুরের মহারাজ এবং যুবরাজ সাহেব প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ ফণ্ডে নয় হাজার টাকা দিয়াছেন। এই রাজ্যের প্রজাবর্গও যুদ্ধের জন্য অনেক টাকা চাঁদা তুলিয়া দিয়াছে। "ভক্তিসহকারে এই প্রকার অর্থদানদ্বারা রাজভক্তির সমর্থন শোণপুর-রাজবংশের কৌলিক ব্যাপার।"—এই কথা লিখিয়াই সরকার মহারাজকে ধন্যবাদ করিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর যুদ্ধ উপলক্ষে কয়েকটি মেসিন-কামান ক্রয় করিবার জন্য টাকা দিয়াছিলেন, সেই জন্য ভারত সরকার তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। মেসোপোটেমিয়ার জন্য ঝাড়ুদার সংগ্রহ করিয়া তিনি বৃটিশ সরকারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। মেসোপোটেমিয়ায় বৃটিশবাহিনীর জন্য তিনি তাঁহার রাজ্যে নায়েক ও পাইক সংগ্রহ করিতেছেন। মহারাজ ধর্ম্মনিধি বাহাদুর স্বয়ং তাঁহার রাজ্যের সিপাহীদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে চাহিয়াছিলেন, সেই জন্য বৃটিশ গবমেণ্ট তাঁহাকে ঐকান্তিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুরের বার জন অশ্বারোহী সৈন্য, দেড় হাজার পাইক বা পদাতিক সৈন্য, আঠার জন গড়তিয়ার অধীনে আছে। ইহারা সেকেলে বন্দুক ও কামানে সুসজ্জিত। ইহা ভিন্ন নয় জন কর্ম্মচারীর অধীনে নয় শত কনেষ্টবল ও আট শত চৌকীদার আছে। ইহারা সকলেই উক্ত রাজ্যের পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন।

মহারাজ বাহাদুরের দুই পুত্র। যুবরাজ সাহেব শ্রীসোমভূষণ সিংহ দেব এবং পোতেতলাল সাহেব শ্রীসুধাংশুশেখর সিংহ দেব। মহারাজ বাহাদুর ইঁহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন করিয়াছেন। ইঁহারা যেরূপ উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত আশাপ্রদ। যুবরাজ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগে কার্য্যশিক্ষা করিতেছেন, ইহা ভিন্ন পিতার ও তাঁহার সেক্রেটারী শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ সরকার ও প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ., বি. এল. মহোদয়ের নিকট সাহিত্য ও আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। ছোট কুমারসাহেব আগামীবারে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

হেমন্ত।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

শরতের অবসান, শীত আসে আসে—
পবনপরশে মৃদুহিমাভাস ভাসে ;
প্রভাতের দূর্ব্বাদলে শিশিরে মুকুতা ঝলে ;
বায়ুভরে শুভ্র অভ্র ভাসে না আকাশে ;
পূর্ণ বায়ু শেফালীর—কমলের বাসে।

শুকাইছে সরসীর সলিল-সম্ভার ;
নদীকূলে ফেনসম বালুকা-বিস্তার ;
শুভ্র বেলাবালু 'পরে বক বিচরণ করে ;
মরালের শ্বেত অঙ্গে শুভ্রতা-সঞ্চার ;
নিশায় তারকাদীপ্তি হরে অন্ধকার।

এখনো উত্তর হ'তে আসেনি পবন ;
রুদ্ধগীত বিহগের গীত সমাপন ;
হরিৎ ধান্যের শিরে স্বর্ণকান্তি ফুটে ধীরে ;
শালিগন্ধে মুগ্ধ অলি করে গুঞ্জরণ ;
নীলাম্বরে তপ্ত-স্বর্ণ সূর্য্যের কিরণ।

এখনো খুলেনি শীত উত্তর-তোরণ ;
ঊষা মুখে নাহি টানে কুহেলি-গুণ্ঠন ;
সৌরভ-শোণিমা মাখি' গোলাপ খুলেনি আঁখি ;
তরুপত্রে থাকি' থাকি' শঙ্কা-শিহরণ—
আসে শীত ম্লান করি রবির কিরণ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

(৪)

আচার।

ত্রিগুণসম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, জীব গুণদ্বারাই আবদ্ধ। এই গুণের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে জীব শিব হইতে পারে। এই ত্রিগুণের বন্ধন-ছেদনের নামই মুক্তি। বাঁধন খোলা পাইলেই জীব খালাস পায়,—মায়ার অধিকার ছাড়িয়া ব্রহ্মে যাইয়া লীন হয়। তাই গীতায় গুণাতীতের এত প্রশংসা। কিন্তু 'মুক্তকেশীর শক্ত-বাঁধন' ছিন্ন করা সহজ নয়। মুখে বড় বড় কথা বলিলে বা কলমের ডগায় বড় বড় দার্শনিকদিগের মত 'মক্স' করিলে গুণের বাঁধন ছিন্ন করা যায় না। সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ কয়েদী যদি লৌহ গলাইবার পদ্ধতিসম্বন্ধে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বক্তৃতা দেয়, তাহা হইলে তাহার বাঁধনও খসে না, সে মুক্তিও পায় না। যদি তাহাকে মুক্তি পাইতে হয়, তাহা হইলে শৃঙ্খলমোচন করিবার পদ্ধতি জানিতে হয়, জানিয়া তদনু-সারে কাজ করিতে হয়। কাজ না করিলে বন্ধনমোচন সম্ভবে না। তোমাকে কাজ করিতেই হইবে। মহামায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক তিন গাছা খুব শক্ত দড়ায় জীবকে বাঁধিয়াছেন। কিন্তু তিনি জীবের কার্য্যকরী শক্তি একেবারে লুপ্ত করিয়া দেন নাই। তবে তমোগুণের বাঁধনটা বড়ই শক্ত। এই গুণের বজ্রবন্ধনে জীবকে একেবারে আড়ষ্ট করিয়া ফেলে। সেই জন্য অতি নিম্নস্তরের জীব, যথা—প্রোটোজোয়া বা নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ্ একেবারে জড়ভাবাপন্ন। কিন্তু মহামায়ার দয়াপ্রভাবে—জন্মজন্মান্তরীণ ক্রমবিকাশের ফলে জীব অতি ধীরে ধীরে সেই তমোগুণের প্রভাব ক্ষয় করিতে পারে। জীব কালের স্রোতে ভাসিয়া ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে থাকে। শাস্ত্র বলেন,—পরমাত্মা জীবাত্মাকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছেন, তাই জীব ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু মনুষ্যজন্মপ্রাপ্তির পর যখন জীবের হিতাহিত জ্ঞানের উদয় হয়, তখন মহামায়া আবার পাকাঘুঁটি কাঁচাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। ইহাই মহামায়ার লীলা। খেলায় যদি পাকাঘুঁটি না কাঁচে, তাহা হইলে খেলার খেলাত্ব থাকে না। জীবকে হিতাহিত জ্ঞান দিয়া—কর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া আবার তাহাকে মনুষ্যযোনি হইতে তীর্য্যগ্‌যোনিতে নিক্ষিপ্ত করেন। ইহাই মহামায়ার মায়াচক্র। এই মায়াচক্রে পতিত জীব বিভ্রান্ত হইয়া আপনার কর্ম্মজালে আপনি জড়াইয়া অবনতির পথে ধাবিত হয়। কর্ম্মবিপাকহেতু মানুষ তীর্য্যক্ ও পশুযোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকে।

আমি জীব, অবিদ্যায় বা মায়ায় আচ্ছন্ন। মায়াঘোরে আমি আমার হিতাহিত বুঝিতে পারি না। তবে আমরা সকলেই বুঝি যে, এই জগতের কতকগুলি আমাদের হেয়, আর কতকগুলি আমাদের উপাদেয়। যাহা পরিণামে আমাদের দুঃখ বৃদ্ধি করে, তাহাই হেয়; আর যাহা সুখদান করে, তাহা উপাদেয়। আমরা ভোগ করি—সুখ আর দুঃখ। জীবমাত্রই সুখ-দুঃখের ভোক্তা। কর্ম্মের দ্বারায় জীবের সুখ-দুঃখের ভোগ হয়। ভাল কাজ করিলে সুখ হয়, মন্দ কাজ করিলে দুঃখ জন্মে;—এই কথাটা আমরা সকলেই বেশ বুঝি। কিন্তু আমরা বিজ্ঞানান্ধ; অবিদ্যার প্রভাবে বা ভ্রান্তির ঘোরে কোন্ কাজটা সু অর্থাৎ সুখজনক এবং কোন্ কাজটা কু অর্থাৎ দুঃখজনক, তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। বিশেষতঃ অনেক কাজ পৌষ মাসে প্রাতঃস্নানের মত আপাততঃ দুঃখদায়ক হইলেও পরিণামে সুখজনক। পৌষ মাসে স্নান করিবার সময় কষ্ট হয় সত্য, কিন্তু একবার যো-যা করিয়া স্নানটা করিয়া ফেলিলে দিনটা বেশ সুখে কাটে। আবার দিনকতক প্রাতঃস্নান করিলে স্নানকালীন কষ্টটা অনেকটা লঘু হইয়া পড়ে। তখন পরিণামের সুখটাই বড় হইয়া দাঁড়ায়। তখন পৌষে প্রাতঃস্নানকে আমরা সুখদ বলিয়াই মনে করি।

যে কাজটা আপাততঃ ক্ষণেকের জন্য কষ্টকর, কিন্তু পরিণামে বহুদিনের জন্য সুখজনক, সেই কাজটাকেই আমরা সুকর্ম্ম বলি; আর যে কাজটা আপাততঃ তৃপ্তিসাধক হইলেও পরিণামে বিরস, তাহাকেই আমরা কুকর্ম্ম বলি। অতিভোজন কুকর্ম্ম, উহা আপাততঃ রসনার তৃপ্তিসাধক না হইলেও পরিণামে পীড়াদায়ক। সংযম সুকর্ম্ম, কেননা, উহা আপাততঃ কষ্টকর হইলেও পরিণামে সুখজনক। সুতরাং অতিভোজন হেয়, সংযম উপাদেয়। কিন্তু তাই বলিয়া যদি কেহ অতিভোজনের উপর বিরক্ত হইয়া ও সংযমের অর্থ না বুঝিয়া একেবারেই ভোজন ত্যাগ করে অথবা কদন্ন বা বিস্বাদ খাদ্য খায়, তাহা হইলে তাহার সেই কর্ম্ম সুকর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্ম জীবকে আপনার দিকে টানিতেছেন, আর মহামায়া তাহাকে ত্রিগুণে বন্ধন করিয়া ভ্রান্তির চরকী-কলে চড়াইয়া পাক দিতেছেন। সেই পাক খাইয়া জীব ঠিক্‌রাইয়া অন্যদিকে গিয়া পড়িতেছে। তিন-গুণে বদ্ধ মায়াচক্রে ঘূর্ণিত বলিয়া আমাদের যত দুঃখ। যদি

আমাদের ব্রহ্মের দিকে গতি অপ্রতিহত থাকে, তাহা হইলে আর কোন দুঃখ থাকে না। সুতরাং দুঃখের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তিনটি গুণের বাঁধন ছিঁড়িতে হইবে, মায়াচক্র ভাঙ্গিতে হইবে। তখন আমাদের বিজ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, মায়ার ঘোর কাটিয়া যাইবে, তখন আমরা বুঝিব—আমিই সব, আমার আবার দুঃখ কিসের? এই অবস্থাসম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন,—

যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব মনুপশ্যতঃ॥
ঈশোপনিষৎ। ৭

যখন (অবিদ্যানাশের ফলে) সর্ব্বভূতই জ্ঞানীর আত্মা হইয়া যায় অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই একত্বদর্শীর শোক-মোহ কিছুই থাকে না অর্থাৎ দুঃখ তখন তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

যে কাজ জীবকে সেই আনন্দময় অবস্থায় লইয়া যায়, সেই কাজই সুকাজ, আর সব কুকাজ বা অকাজ। ইহাই হইল—কর্ম্মসম্বন্ধে মোটা কথা। কিন্তু জগতে এমন কোন কাজ নাই, যে কাজের দ্বারা সরাসরি আমাদের সেই বাঞ্ছিত ফললাভ হইতে পারে। কর্ম্মেরও একটা পারম্পর্য্য আছে। সেই পারম্পর্য্যহিসাবে কাজ করিয়া যাইতে হয়, তবে ঈপ্সিত ফললাভ হইতে পারে। যেমন সুলেখক হইতে হইলে প্রথমে হাঁড়ি-মাল্‌সা, পরে অক্ষর, তৎপরে ফলা-বানান প্রভৃতি লিখিতে হয়, কস্‌রত শিখিতে হইলে প্রথমে ডন্, বৈঠক, পরে নানাবিধ প্যাঁচ পর পর শিখিয়া যাইতে হয়, মুক্তিলাভ করিতে হইলেও সেইরূপ ছোট ছোট কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে বড় বড় কাজ করিতে হয়। এই কর্ম্ম-পারম্পর্য্যের নাম আচার। এই আচারে মানবের সকল কার্য্যের পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট থাকে। সামান্য দাঁতনকাঠীর ব্যবহার হইতে একেবারে যোগাভ্যাস পর্য্যন্ত কোন কাজই বাদ পড়ে না।

আচারতত্ত্ব বুঝিতে হইলে গোটাকতক কথা বেশ মনে করিয়া রাখিতে হইবে। আমরা বিজ্ঞানান্ধ জীব, আমাদের বুদ্ধির দৌড় বেশী দূর নহে। আজ একটা কাজ করিলে কাল তাহার ফল কি হইবে, আমরা তাহা অনেক সময়ই ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারি না। অনেক সময় আমরা যাহা ভাবিয়া কাজ করি, তাহা হয় না। আমাদের ভবিষ্যদৃষ্টি বড় জোর দুই দশ বৎসর পর্য্যন্ত চলে, কিন্তু এই অনাদি অনন্তকালের তুলনায় তাহা কিছুই নহে,—একেবারেই নগণ্য। বিশেষতঃ আমাদের যখন জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া এই অপরিমেয় কাল-প্রবাহে ভাসিয়া যাইতে হইবে, তখন আমাদের এই অজ্ঞানান্ধ দৃষ্টির বড়াই করা একেবারেই বিড়ম্বনা। এই বিশ্বব্যাপিনী তমস্ততির মধ্যে আমরা এক একটি মানব অতি ধূমমলিন লণ্ঠনের মধ্যে ক্ষীণদ্যুতি বর্ত্তিকা লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি; আমাদের এই দীপে যে আলোক বিকীর্ণ হইতেছে, তাহা অতি সামান্য—ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর, তাহাতে দুই পদমাত্র ভূমি আলোকিত হয় কি না সন্দেহ। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ মনীষাসম্পন্ন, তাঁহাদের আলোকাধার অপেক্ষাকৃত অল্পধূমাচ্ছন্ন, দীপটিও অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বলতর। তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞানালোকে বড় জোর চারি পদ বা ছয় পদ ভূমি দেখিতে পান। এই সামান্য জ্ঞানে উদ্দীপ্ত হইয়া ইহকাল পরকাল ভাসাইয়া দেওয়া উচিত নহে। সেই জন্য শাস্ত্র সাধারণ মানুষকে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিতে বলিয়াছেন। এরূপ গুরুতর বিষয়ে আপনার ক্ষুদ্র—অতি সামান্য—জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে নাই। জ্ঞান সকল জীবেরই আছে। তপস্বী মেধস জ্ঞানগর্ব্বিত সুরথ রাজাকে বলিয়াছিলেন,—

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে।
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈব পৃথক্ পৃথক্॥

হে মহাভাগ! কেবল তোমরাই জ্ঞানের অধিকারী নহ, সমস্ত প্রাণীরই বিষয়জ্ঞান আছে। তবে জীবভেদে বিষয়ের ভেদ ও বিষয়সম্বন্ধীয় জ্ঞানের পার্থক্য হইয়া থাকে। একটু ভাবিয়া দেখিলে কথাটা সত্য বলিয়াই উপলব্ধ হইবে। আমাদের সকলেরই জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান আমাদের নিজের নিজের নিকট যতই অভ্রান্ত বলিয়া মনে হউক না কেন, তাহাতে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা নিশ্চিত। এই জন্য আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করা আবশ্যক।

আপ্তবাক্য মানিতে হইলে তমোগুণের বন্ধন সর্ব্বাগ্রে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিতে হইলে সদাচার সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। সদাচার কাহাকে বলে?

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং বস্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

যাহাদের দোষ প্রায় নাই, তাহাদিগকে সাধু বলে। সৎ শব্দের অর্থ—সাধু। সাধুদিগের যে আচার, তাহাকেই সদাচার বলে।

আর একজন ঋষি বলিয়াছেন, সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, শাখা অর্থ, পুষ্প অভিলাষ এবং ফল মোক্ষ। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।
এতচ্চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং যে কাজ করিতে মনের কোনরূপ দ্বিধা না জন্মে, সেই কাজের অনুষ্ঠান ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লক্ষণ। বেদোক্ত ও স্মৃত্যুক্ত আচারের ন্যায় সদাচার সর্ব্বথা পালনীয়। আর যে কাজ করিলে মন প্রসন্ন হয়, সেই কাজই করা উচিত। ভগবান মনু আবার বলিয়াছেন,—

বেদোঽখিলোধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধুনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥

সমস্ত বেদ, বেদজ্ঞ ঋষিগণের প্রণীত স্মৃতি, তাঁহাদের চরিত্র, সাধুগণের আচার এবং আত্মপ্রসাদ, এইগুলিই

ধর্ম্মের মূল প্রমাণ। হিন্দুর ধর্ম্ম বেদমূলক, স্মৃতি বেদজ্ঞ ঋষিগণকর্ত্তৃক রচিত, সেই জন্য স্মৃত্যুক্ত অনুষ্ঠানও ধর্ম্মকার্য্য। বেদজ্ঞ ঋষিগণের ক্রোধদ্বেষশূন্য নির্ম্মল চরিত্র, সাধু-সজ্জনের আচার অনুযায়ী কার্য্য করিলে এবং যে কাজ করিলে মন প্রসন্ন হয়, সেই কাজ করিলে ধর্ম্ম বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ তমঃ ও রজোগুণ ক্ষুন্ন হইয়া সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায়। বেদ ও স্মৃতিতে যে সকল ধর্ম্মকার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা এবং জানিয়া যথাযোগ্যভাবে তাহার অনুষ্ঠান করা কঠিন হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা যথার্থ সাধু-সজ্জন, তাঁহারা যাহা করেন, সেইরূপ আচরণ করিতে চেষ্টা করা বিশেষ কঠিন নহে। সেই জন্য যাঁহারা ধর্ম্মানুরাগী, তাঁহাদের পক্ষে সদাচার অর্থাৎ সাধু-সজ্জনের আচার অবলম্বন করাই বিধেয়। অবশ্য সাধু-সজ্জন বলিতে কেহ সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী না বুঝেন। গৃহস্থের পক্ষে সজ্জন গৃহস্থের আচরণই অনুকরণীয়; তাহাই গৃহস্থের পক্ষে সদাচার। সন্ন্যাসীরই সন্ন্যাসীর আচার অনুকরণীয়। সদাচারের অনুষ্ঠান সহজ, সেই জন্য ঋষিরা—সাধুরা সদাচারকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন। স্বয়ং মনুই বলিয়াছেন,—

সর্ব্বলক্ষণহীনোপি যঃ সদাচারবান্নরঃ।
শ্রদ্ধধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥

সর্ব্বপ্রকার শুভলক্ষণবর্জ্জিত ব্যক্তি যদি সদাচারনিরত, শ্রদ্ধাবান্ ও অন্যের দোষপ্রকাশক না হন, তাহা হইলে তিনি শত বৎসর পরমায়ু লাভ করেন। মহর্ষি বিষ্ণু ও বশিষ্ঠও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য সদাচারই সর্ব্বথা পালনীয়। সদাচারপালনই পরম ধর্ম্ম, সদাচারপালনই পরম তপস্যা, সদাচারপালনে আয়ুর্বৃদ্ধি পায় ও পাপ নষ্ট হয়। * এ কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য অধিক দূর অগ্রসর হইতে হইবে না। পল্লীগ্রামে একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, যাঁহারা সদাচারী, তাঁহারাই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। আমাদের দেশের বিধবারা সাধারণতঃ সদাচারপরায়ণা। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঘোর ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত অঞ্চলেও বিধবারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকেন। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও অনেকে দীর্ঘজীবী হন। প্রত্যক্ষের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং আমরা যদি একটা বিষয়ের যুক্তি না বুঝি, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ তথ্যের উপর বিশ্বাস করিতে হইবেই হইবে। বিজ্ঞানও প্রত্যক্ষ তথ্যের সুদৃঢ় বনিয়াদে দণ্ডায়মান। সুতরাং যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, সদাচারী লোক অপেক্ষাকৃত সুখী, নীরোগ ও দীর্ঘজীবী হয়, তখন তাহা আর অস্বীকার করা চলে না।

মহাভারতে লিখিত আছে,—"কেবলমাত্র সদাচারবলেই মানব দীর্ঘজীবী, ধনবান্ এবং ইহলোক ও পরলোকে যশস্বী হইয়া থাকে। দুরাচার ব্যক্তিরা কখনই দীর্ঘায়ু হইতে পারে না। যাহারা আপনার মঙ্গলকামনা করে, তাহাদের সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে সদাচারী হওয়া কর্ত্তব্য। সদাচারপ্রভাবে পাপীও পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করে। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ,—সদাচার; সাধুর প্রধান লক্ষণ,—সচ্চরিত্রতা। সাধুদিগের আচারই সদাচার নামে কথিত হইয়া থাকে। যে মানুষ ধর্ম্মের ও নানাবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অন্য মানবমাত্রই তাঁহাকে না দেখিলেও তাঁহার নাম শুনিয়াই তাঁহার হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। যাহারা নাস্তিক, ক্রিয়াবর্জ্জিত, বেদপরাঙ্মুখ, শাস্ত্রবিরোধী, অধার্ম্মিক, দুরাচার, নিয়মশূন্য, পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাহারা ইহলোকে অল্পায়ু ও পরলোকে নিরয়গামী হইয়া থাকে। মানুষের কোন সুলক্ষণ না থাকিলেও যদি সে কেবল সদাচারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, ঈর্ষ্যাশূন্য, সত্যবাদী, ক্রোধশূন্য ও সরল হয়, তাহা হইলেই সে শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারে।"

সদাচারদ্বারা তমোগুণের নাশ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রকৃতি গুণদ্বারা মানুষের দেহ বন্ধন করেন না, মনই বন্ধন করেন। মানুষের যেমন মন, সেইরূপ কাজ করে। সদাচারী হইলে মন প্রসন্ন হয়, তমোগুণের বাঁধন ক্রমশঃ ঢিলা হইয়া যায়। মনের উন্নতি সাধিত হইলে ধর্ম্মের উন্নতি হয়, জ্ঞানের উন্নতি হয়, কাজের উন্নতি হয়। মানুষ সৎচিন্তা করিতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সকলের পক্ষে একই আচার সদাচার নহে। গৃহস্থের পক্ষে অর্থ-উপার্জ্জন সদাচার, সন্ন্যাসীর পক্ষে তাহা নহে। গৃহস্থের পক্ষে দ্বিরদরদনির্ম্মিত বা অভাবে কাষ্ঠনির্ম্মিত পালঙ্কে নিদ্রা যাওয়া সদাচার, যতীর পক্ষে আবার তাহাই কদাচার। চণ্ডালাদি জাতিও যদি সম্বলহীন হইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে আসে, গৃহস্থ তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্ন দিবে, এ সদাচার বা শিষ্টাচার গৃহীর,—সন্ন্যাসীর বা দণ্ডীর নহে। ক্ষৌরকার্য্যাদি করা গৃহস্থের সদাচার, বনীর সদাচার নহে। তবে কতকগুলি সদাচার সকলেরই প্রতিপাল্য। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য আচারাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দানং দমো দয়া ক্ষান্তি সর্ব্বেষাং ধর্ম্মসাধনম্॥

কাহাকেও হিংসা না করা, সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করা, সংযত হওয়া, পরকে বঞ্চনা না করা, শৌচ, দান, দম, দয়া ও শান্তি সকলেরই ধর্ম্ম। উহা সদাচারী ব্যক্তিমাত্রেই কর্ত্তব্য।

* আচারঃ পরমোধর্ম্ম আচারঃ পরমং তপঃ।
আচারাদ্বর্দ্ধতে হ্যায়ুরাচারাৎ পাপসংক্ষয়ঃ॥

মহামারী।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

প্লেগ।

এক গ্রামে বা এক দেশে যে ব্যারামে খুব বেশী লোক মরিতে থাকে, তাহাকে মড়ক বা মহামারী ও ইংরাজীতে প্লেগ কহে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে লণ্ডনে ভয়ঙ্কর প্লেগ হয়। পরে প্রায় সমস্ত লণ্ডন অগ্নিসাৎ হইলে সে মহামারী থামিয়া যায়। ঐ মহামারীর আরম্ভের ইতিহাস বড়ই শিক্ষাপ্রদ। লণ্ডন সহরের কোনও ব্যক্তি অপর প্লেগগ্রস্ত স্থানের কোনও লোকের নিকট হইতে এক বাক্স কাপড় আনায়। সেই কাপড়ের বাক্স যতদিন না আসিয়াছিল, ততদিন লণ্ডনে প্লেগ ছিল না। ঐ কাপড়ের বাক্স খোলা হইবার অল্প দিন পরেই যে ব্যক্তি কাপড় আনাইয়াছিল, তাহার প্লেগ হয় এবং ক্রমশঃ সেই হইতে সমস্ত লণ্ডন নগরে ঐ ব্যাধি সংক্রামিত হয়। বাঙ্গালাদেশে গৌড়, উলা প্রভৃতি সহরে প্লেগ হইয়াছিল বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। কিন্তু লণ্ডনের প্লেগ আর বাঙ্গালার প্লেগ স্বতন্ত্র ব্যাধি। হিমালয়স্থ কুমায়ুন-প্রদেশে প্রায়ই অল্প-বিস্তর প্লেগ হইয়া থাকে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বোম্বাই সহর দিয়া যে প্লেগ প্রবেশ করে, সেইটিই প্রকৃত প্লেগ অর্থাৎ একটি জনপদবিধ্বংসী ব্যাধি-বিশেষ। যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, চীন মহারাজ্য হইতে এই প্লেগ বোম্বাই সহরে আইসে এবং বোম্বাই হইতে কলিকাতায় আসে; কলিকাতায় আসিয়া উহা ক্রমশঃ বঙ্গদেশে ও প্রধানতঃ বিহার ও উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

প্লেগের স্বরূপ।

বর্ত্তমান সময়ে এ দেশে যে প্লেগ-ব্যাধির বিস্তার হইয়াছে, তাহার প্রধান লক্ষণ—গাল বা কুঁচ্‌কী ফুলিয়া জ্বর। কুঁচ্‌কী-স্ফীতিকে ইংরাজীতে "বিউবো" (Bubo) কহে। এই জন্য এই জাতীয় প্লেগ-ব্যাধির নাম হয়—বিউবনিক প্লেগ (Bubonic Plague)। বস্তুতঃ চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে প্লেগ তিন জাতীয়:—বিউবনিক্, নিউমনিক্ সেপ্টিসিমিক্। শেষোক্ত দুই জাতীয় প্লেগ সাধারণের পক্ষে বুঝা কঠিন, সুতরাং কেবল বিউবনিক্ প্লেগেরই কথা আমরা আলোচনা করিব। যে ব্যক্তির প্লেগ হয়, তাহার ব্যারামের সময়ে তিনটি জিনিষ বড়ই সুস্পষ্ট দেখা যায়। সেগুলি এই:—

(১) রোগীর চেহারা প্রথম দিন হইতেই খুব খারাপ হইয়া যায়। ভয়ঙ্কর ব্যারামগ্রস্ত বা নেশাভিভূত লোকের চেহারায় যেমন একটা শ্লথ-ম্লানভাব থাকে, তাহা প্লেগে বড়ই প্রকট।

(২) বিউবো বা কুঁচ্‌কী যতই ছোট থাকুক না কেন, তাহাতে যে বেদনা হয়, সে বেদনা রোগীর পক্ষে অসহ্য। টেপা দূরের কথা, বীচির উপরে হাত দেওয়ামাত্র রোগী চম্‌কাইয়া উঠে।

(৩) হঠাৎ হৃদপিণ্ডের এত দুর্ব্বলতা জন্মে যে, রোগী অতি সামান্য উত্তেজনায় বা বিনা উত্তেজনাতেও মরিয়া যাইতে পারে।

প্লেগের কারণ।

জাপানী ডাক্তার কিটাসেটো (Kitasato) প্লেগরোগীর স্ফীতগ্রন্থির রস হইতে একটি জীবাণু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সেইটিই প্লেগের কারণ। ঐ জীবাণু সাধারণতঃ মক্ষিকাদংশনদ্বারা বা ভূমি হইতে পদের ক্ষত দিয়া মনুষ্য-দেহে প্রবেশ লাভ করে। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ প্লেগ-ব্যাধি মূষিকেরই ব্যাধি। ইন্দুরেরাই অতি সহজে ও প্রথমে প্লেগাক্রান্ত হয়। ইন্দুরের গায়ে এক রকমের মাছি বসে, তাহারা সদাসর্ব্বদাই ইন্দুরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যত দিন ইন্দুর জীবিত থাকে, তত দিন তাহারা ইন্দুরের রক্ত শোষণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইন্দুর মরিয়া গেলে, ঐ মক্ষিকা মৃত ইন্দুরগাত্র ত্যাগ করিয়া মানুষের গায়ে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করে। যখন মানুষের গায়ে উহারা বসে, তখন মানুষকে দংশনও করে এবং দংশনকালে মৃত মূষিক-গাত্রলব্ধ অসংখ্য প্লেগ-জীবাণু নরশোণিতে ছাড়িয়া দেয়। অতএব মূষিককেই প্লেগরোগের আধার ও মূষিক-গাত্রলগ্ন মক্ষিকাই প্লেগবিস্তারের প্রধান সহায়। জমীতে যেখানে যেখানে মূষিক চলাচল করে, সেই জায়গায় ফাটা পায়ে বেড়াইলে, জমীতে যে সকল প্লেগ-জীবাণু প্লেগগ্রস্ত মূষিক ছড়াইয়া গিয়াছে, সেই সকল জীবাণু পায়ের ক্ষত বা ফাটার মধ্য দিয়া মনুষ্যদেহে প্রবিষ্ট হয়। এই কারণেই দোকানী পশারীরা ও পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্ররাই অধিকাংশরূপে প্লেগ-গ্রস্ত হইত। কারণ, খাদ্যদ্রব্যের দোকানে ও খোলার ঘরে ইন্দুরেরা যত অধিক সংখ্যায় ও যত সহজে বাস করিতে পায়, তত সহজে পাকাবাড়ীতে বা যে যে ঘরে খাদ্যদ্রব্য থাকে না, সেখানে ইন্দুর থাকিতে পারে না।

প্লেগ-নিবারণের উপায়।

(১) যে যায়গায় বেশ রৌদ্র লাগে ও আলো আসে, সেখানে কোনও রকমের সংক্রামক রোগের বিস্তার সম্ভাবনা নাই। এই জন্য যে বাড়ীতে জানালা দরজা খুব কম, সে

বাড়ী ত্যাগ করা ভাল অথবা তাহার ছাদ খুলিয়া ফেলা উচিত, তাহাতে বড় বড় দরজা জানালা বসান আবশ্যক। বোম্বাইসহরে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া হাতে হাতে সুফল পাওয়া গিয়াছিল। (২) বাড়ীতে ইন্দুর থাকিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এই জন্য ইন্দুর মারা প্রয়োজন এবং খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে রক্ষা করিতে হয়, যেন ইন্দুর তাহার সন্ধান না পায়। (৩) বিনা পাদুকায় গৃহের মধ্যে চলাফেরা করা নিরাপদ নহে। যদি পাদুকা ব্যবহার করা অসম্ভব হয়, তবে পায়ে ক্ষত বা ফাটাগুলিকে রীতিমত চিকিৎসাদ্বারা আরাম করা উচিত। (৪) যে বাটীতে প্লেগ হইয়াছে, সে বাটীতে বাস করিতে নাই। তবে বাটীর সম্পূর্ণ সংস্কার হইয়া গেলে তথায় থাকা নিরাপদ্। যে দেশে—যে পল্লীতে প্লেগ হইতেছে, তথায় বাস করাও বিপজ্জনক। (৫) প্লেগ-নিবারণে এক প্রকারের টীকা বাহির হইয়াছে। উহা বেশ ফলপ্রদ। প্লেগসঙ্কুল দেশে যাইতে হইলে বা প্লেগরোগীর চিকিৎসা করিতে হইলে ঐ টীকা লওয়া সমীচীন। ৬) বাড়ীতে যদি ইন্দুর মরে, তবে কখনও তাহাকে হাতে করিয়া রাস্তায় ফেলিও না। ইন্দুরটি যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে তাহার গায়ে যথেষ্ট কেরোসিন ঢালিয়া আগুন জ্বালাইয়া দিবে। তাহা হইলে ঐ মৃত ইন্দুরগাত্রসংলগ্ন মক্ষিকাগুলি ধ্বংস হইবে। ইন্দুর ভস্মীভূত হইয়া গেলে বা অন্ততঃ অর্দ্ধদগ্ধ হইলে, তখন একটা চিমটার সাহায্যে তাহার শবটি রাস্তায় ফেলিয়া দিবে। ঐ প্লেগের সময়ে বাড়ীতে বিড়াল পোষা মন্দ ব্যবস্থা নহে।

চিকিৎসা।

St. Ignatius' Bean ধারণ করিলে প্লেগ হয় না—ইত্যাকার অনেক কথা শোনা যায়। সেই সকল দিদিমার রচা কথার উপরে নির্ভর করিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে নাই। প্লেগ হইয়াছে সন্দেহ হইলেই রীতিমত চিকিৎসা করাইবে। চিকিৎসা যেমনই হউক, দুইটি কথা খুব যত্ন করিয়া মনে রাখা আবশ্যক। রোগীকে একেবারে শয্যাশায়ী রাখিবে। কোনও অজুহাতে উঠাইয়া বসাইবে না এবং রোগীকে ভয় পাইতে দিবে না। প্লেগের সময়ে সামান্য কুঁচকী হইয়াছে সন্দেহ করিবামাত্র রোগীকে শয্যাশায়ী করাইতে দ্বিধা করিও না।

রোগীকে বাড়ীর এমন যায়গায় রাখিবে, যেখানে অপরের সঙ্গে তাঁহার সংস্পর্শ না ঘটে। রোগী সারিয়া গেলে বা তাঁহার দেহান্ত ঘটিলে, তাঁহার ব্যবহৃত জিনিষপত্র পোড়াইয়া দেওয়াই ভাল; যদি পোড়ান অসঙ্গত বিবেচনা করা যায়, তবে Equifex Disinfector যন্ত্রে বস্ত্রাদি বাষ্পসিক্ত করান প্রয়োজন এবং তৈজসপত্র বিষাক্ত লোসনদ্বারা বা অগ্নিস্পর্শদ্বারা শোধন করান আবশ্যক। বিছানা কাপড় রাস্তায় ফেলিয়া দিলে মেথরেরা অগ্নি নিভাইয়া সেগুলি লইয়া পলায়ন করে এবং শীঘ্রই সেই বিছানার তুলা আবার বাজারে বিক্রীত হয়!

বিসূচিকা, কলেরা, ওলাউঠা।

এই রোগ ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে বহু শত বর্ষ ধরিয়া বাস করিতেছে। পুষ্করিণী ও তীর্থস্থানের বাহুল্যই কলেরার চিরস্থিতির হেতু। বহুকাল পূর্ব্বে কলিকাতাতেও পুষ্করিণীর সংখ্যা অল্প ছিল না এবং কলেরাও কম হইত না। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতায় পুষ্করিণী-হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই কলেরাও কমিয়াছে। পূর্ব্বে গ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্য দীঘিকা খনন করা একটা পুণ্য-কর্ম্ম ছিল এবং তখন জলকে লোকে নারায়ণ জ্ঞান করিত। বর্ত্তমান সময়ে "ভাই ভাই—ঠাঁই ঠাঁই" হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে ভদ্রলোকের বাস এক প্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। তাহার ফলে স্বল্পবেতন চাকুরিয়াগণ সহরে পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিতেছেন এবং অবস্থাপন্ন ব্যক্তিরা গ্রামে একখানি করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সম্মুখে ও পশ্চাতে দুদিকে পুষ্করিণী খনন করাইতেছেন। এই প্রথার প্রভাবে গ্রামে পল্বলের সংখ্যা বেশী হইতেছে ও দীর্ঘিকার সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। পুরাতন যে দু' একটি দীর্ঘিকা আছে, তাহাও মজিয়া যাইতেছে। বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দু পল্লীবাসী যখন জলের বিশুদ্ধতার মর্য্যাদা বুঝিত, তখন গ্রামে একটি বড় দীর্ঘিকা সুধু পানীয় জলেরই জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখিত এবং ডোবা জমীতে বস্ত্রাদি ধৌত করিত। এখন হাতের নিকটে পুকুর হওয়ায় লোকে একই পুষ্করিণীতে শৌচাদি ত্যাগও করে, আর পানীয় জলও সংগ্রহ করে। এই বিসদৃশ ব্যাপারের ফল—বিসূচিকার প্রাদুর্ভাব! বড় আশ্চর্য্য ও পরিতাপের বিষয় এই যে, ধর্ম্মপ্রাণা—বিশুদ্ধাচার অভিমানিনী—দেশাচারমুগ্ধা হিন্দু রমণী একই স্থানে দণ্ডায়মানা হইয়া মূত্রত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করিণীতে চাউল ধৌত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না! ঘোর অজ্ঞতাই এই বীভৎস ব্যাপারের মূল।

কলেরার কারণ।

'কমা' এই ছেদ-চিহ্নের (,) মত আকারবিশিষ্ট একটি অতীব সূক্ষ্ম জীবাণুই কলেরার কারণ। খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের সহিত ঐ জীবাণু দেহে প্রবেশ করে। শূন্যোদরে উহারা মানুষকে যত সহজে পর্য্যুদস্ত করিতে পারে, পূর্ণোদরে তাহা তত শীঘ্র পারে না। পেটের কোনও ব্যারাম পূর্ব্ব হইতে থাকিলে বা বর্ত্তমান সময়ে উদরাময়ের সূচনা হইলে ঐ জীবাণু সহজেই পাড়িয়া ফেলে। এই জন্য আম কাঁঠালের সময়েই এই রোগের বেশী প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

কলেরার ব্যাপ্তি।

যে লোকের কলেরা হয়, তাহার মলে ও বমনে ঐ কমাজীবাণু বহুল সংখ্যায় নিঃসৃত হইতে থাকে। এই জন্য কলেরারোগীর মল বা বমিত পদার্থ যে যে বাসনে বা কাপড়ে-চোপড়ে লাগে, সেই সকল বাসন বা কাপড়-চোপড় যে পুষ্করিণীতে ডুবাইয়া কিম্বা যে পুষ্করিণী ও কূপের পার্শ্বে ধৌত করা যায়, সেই সেই জলাশয়ে ঐ রোগের জীবাণু ছাড়িয়া দেওয়া হয়! পরে সেই জলাশয়ের জল যে যে রন্ধনপাত্রে বা পানপাত্রে লাগে কিম্বা যে যে ব্যক্তি ঐ জলাশয়ের জল পান করে, তাহাদিগের সকলেরই ঐ ব্যাধি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা জন্মে। ঐ জলাশয়ের জল দুধে মিশ্রিত করিয়া গোপগণ এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে কলেরাবিস্তার করে। কলেরারোগীর মলে বা বমিতে যে মাছি বসে কিম্বা পিপীলিকা স্পর্শ করে, সেই মাছি বা পিপীলিকা যে যে খাবারে বসিবে, সেই সেই খাবারেই কলেরা-জীবাণু ছাড়িয়া যায়, পরে ঐ খাবার যত জনে খায়, তত জনেরই কলেরা হয়। যে পুকুরের জলে কোনও রকমে কলেরার জীবাণু আসিয়াছে, সেই পুকুরের জলে কুলপী বরফ করায় সেই কুলপীভোজীদিগের কলেরা হয়।

কলেরা নিবারণের উপায়।

(১) গ্রামের মধ্যে একটি পুষ্করিণী বা কূপ শুধু পানীয় জলের জন্য স্বতন্ত্র রাখা উচিত। ঐ কূপের বা পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে বেড়া বা প্রাচীর দেওয়া আবশ্যক। গ্রামের সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া সেখানে প্রহরী নিযুক্ত রাখিলে আরও ভাল। গবাদি কোনও পশুকে পুষ্করিণীর ধারে চরিতে দিতে নাই এবং পুষ্করিণীতে তৃণগুল্ম, দাম, শৈবাল, পানা, পদ্ম প্রভৃতি কিছুই জন্মাইতে দিতে নাই। পুষ্করিণীতে মাছ ছাড়িবে না। পুষ্করিণীর পাড় খুব উঁচু হওয়া আবশ্যক, যাহাতে গ্রামের ময়লা জল সে পুষ্করিণীতে না পড়িতে পায়। পুষ্করিণীর পার্শ্বে দূরের কথা, পুষ্করিণীর নিকটেও কাপড়-কাচা, বাসনমাজা, স্নান করা অবিধেয়। গোয়াল, আস্তাবল, পাইখানা, বাজার, হাট, গোবরের গাদা, শব প্রোথিত করিবার কবর, এ সকল কিছুই ঐ পুষ্করিণীর ত্রিসীমানায় থাকিবে না। জল তুলিবার জন্য বাঁধান ঘাট থাকিবে এবং জল তুলিবার পাত্র ঐ পুষ্করিণীর নিকটের ঘাটেই থাকিবে। জলের মধ্যে কাহাকেও নামিতে দিতে নাই, যে ব্যক্তি জল তুলিবে, সে একটা মাচার উপরে দাঁড়াইয়া সরকারী জলোত্তোলনপাত্রে করিয়া জল উঠাইয়া নিজ-পাত্রে ঢালিয়া লইবে। পুষ্করিণীসম্বন্ধেও যে নিয়ম, কূপ-সম্বন্ধেও সে নিয়ম। (২) কোনও খাদ্যদ্রব্যে মাছি, আরসুলা, পিঁপড়া বসিতে দেওয়া উচিত নহে। মাছি যদি দুধে বা জলে পড়ে, তবে আমরা সেটিকে ফেলিয়া দিই, কিন্তু ভাতে, চিনিতে, লবণে, কাটা ফলে মাছি বসিলে আমরা অম্লানবদনে তাহা ভক্ষণ করি। এ বিসদৃশ আচরণের হেতু বুঝিলাম না। শুধু মাছি কেন, পিপীলিকা, আরসুলা প্রভৃতি যে কোনও খাদ্যদ্রব্যে বসে, তাহা তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করা বিধেয়। খাদ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখা অত্যন্ত বিপজ্জনক। (৩) যখন কোনও গ্রামে ওলাউঠা হইতে থাকে, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই এইগুলি করা আবশ্যক। দুধ, মাছ ও মাংস, দোকানের মিষ্টান্ন ও দোকানের কাটা ফল (যেমন তরমুজ, ফুটি ইত্যাদি) ত্যাগ করিবে। যদি দুধ খাইতে হয়, তবে তাহাতে জল মিশাইয়া অন্ততঃ আধঘণ্টা ফুটাইয়া তবে পান করিবে। পানীর জল ফিল্টার করিয়া অন্ততঃ আধঘণ্টাকাল ফুটাইয়া কর্পূর দিয়া পান করিবে। খালি পেটে থাকিবে না, ভয় পাইবে না, বাসী বা কাঁচা কিম্বা অত্যন্ত পাকা কোনও জিনিষ খাইবে না। যাহাতে পেটের অসুখ না হয়, এমন খাবার খাইবে। সামান্য পেটের অসুখ হইলেও চিকিৎসা করাইবে। যে পুকুরের জল ব্যবহার করিয়া কলেরা ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সে পুকুরের জল আদৌ ব্যবহার করিবে না, তাহাতে রীতিমত পার্ম্যাঙ্গানেট্ অব্ পটাশ দিয়া জলকে শোধন করিয়া লইবে।

কলেরার চিকিৎসা।

(১) কলেরার হোমিওপ্যাথিকমতেই যে চিকিৎসা হয়, আর অপর কোনও প্রকারের চিকিৎসা নাই, এইটি বিদ্বেষ-পূর্ণ রচনাবাক্য—ইহা মিথ্যা। কলেরার চিকিৎসা যাঁহার যেমন অভিরুচি, তিনি করুন; কিন্তু এইটি স্মরণ রাখিবেন যে, কলেরারোগীর দেহ হইতে বহু জল নিঃসৃত হওয়ায় তাহার নিদারুণ পিপাসা বোধ হয়। এই জন্য কলেরারোগীকে যত জল চাহে, তত জল দেওয়া উচিত। জলেই প্রাণ; শরীর হইতে জল বাহির হওয়ার জন্যই কলেরারোগী মারা পড়ে। এমন স্থলে জল দিলে রোগী বাঁচিয়া যায়; না দিলে, রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এলোপ্যাথিকমতে কলেরার ইদানীন্তন চিকিৎসা বড়ই সুন্দর-বিধায়ে সুফলপ্রদ। পূর্ব্বে কলেরার এলোপ্যাথিকমতে যে চিকিৎসা প্রচলিত ছিল, তাহা যেমন হুঙ্কারজনক, তেমনই প্রাণসংহারী ছিল। এই জন্যই সাধারণের মনে এখনও একটা বদ্ধমূল সংস্কার আছে যে, এলোপ্যাথিকমতে কলেরার সুচিকিৎসা নাই। পূর্ব্বে কলেরারোগীকে ঝুড়ি ঝুড়ি ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়ান হইত; তাহার কিছুদিন পরে ক্যাষ্টর অয়েল ছাড়িয়া ক্লোরোডাইন বা অপরাপর অহিফেন-ঘটিত ঔষধের ব্যবহার প্রচলিত হয়। এ উভয় প্রথাই গো-চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। তাহার পরে ক্যালমেল্ খাওয়াইবার প্রথা প্রচলিত হয়। সে প্রথা বর্ত্তমান ক্যালমেল্ (Calomel) সেবনবিধি হইতে বিভিন্ন। পূর্ব্বে এক রকম মুঠা মুঠা ক্যালমেল্ খাওয়ানই রীতি ছিল; বর্ত্তমান কালে ক্যালমেল্ প্রায় অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

যেখানে যেখানে উহা ব্যবহৃত হয়, সেখানে প্রথম একটা ৫।১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রযুক্ত হইয়া পরে ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় উপর্য্যুপরি ব্যবহৃত হইতে থাকে। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক স্যর্ লিওনার্ড রজার্স মহামতি আবিষ্কৃত জলচিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞানসম্মত ও সাধুবিবেচনাসঙ্গত। রোগীর যে কোনও শিরা ভেদ করিয়া একটি নল সাহায্যে দেড় হইতে তিন চার সের লবণাক্ত পরিশ্রুত জল রোগীর দেহের মধ্যে দেওয়া হয়; পূর্ব্বে অধস্ত্বাতিকপ্রকরণে রোগীর অন্তিম সময়ে উক্ত জল দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার ফলে বেশী রোগীকে বাঁচান যাইত না। সময় থাকিতে শিরাভ্যন্তরে ঐরূপ প্রকারে জল দেওয়ায় বহু ব্যক্তির প্রাণরক্ষা করা সম্ভব হইয়াছে। (২) কলেরারোগীকে পথ্য দিবার জন্য ব্যস্ত হইলে অনিষ্ট করা হয়। জল বা নারিকেলোদক এবং আরোগ্য হইবার সময়ে সদ্যঃপ্রস্তুত ঘোল, পার্ল বার্লির জল, এতদ্ব্যতীত অপর কিছুই দিতে নাই; দিলে অনিষ্ট হয়।

মাতা ও পুত্র।

মদালসা ও অলর্ক।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

১

উল্লাপন।

পুত্র বর্দ্ধস্ব মদ্ভর্ত্তুর্মনোনন্দয় কর্ম্মভিঃ।
মিত্রাণামুপকারায় দুর্হৃদাং নাশনায় চ॥

হে পুত্র! সংবর্দ্ধিত হও, মিত্রগণের উপকারার্থ এবং শত্রুকুলের বিনাশার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আমার পতির অন্তর আনন্দিত কর।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২৬ অধ্যায়।

মদালসা পূর্ব্বরীত্যানুসারে আপন পুত্রদিগকে বৈরাগ্যধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলে রাজা ঋতধ্বজ মহিষীর এবম্বিধ কার্য্যে অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্পষ্টাক্ষরেই বলিলেন, অয়ি বিমূঢ়ে! এই প্রকার দূষণীয় আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব তনয়দিগকে যেমন সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী করিয়াছ, তুমি এই কনিষ্ঠ পুত্রকেও তাহাই করিবে? আমি তোমার স্বামী; আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে এই পুত্রকে প্রবৃত্তিমার্গে নিয়োজিত কর। হে দেবি! পুত্রকে কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিলে কর্ম্মমার্গ সমুচ্ছেদপ্রাপ্ত হইবে না; হে সাধ্বি! তাহা হইলে পিতৃপিণ্ডও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পুত্র হইতেই পিতৃগণ পিণ্ডলাভ করিয়া থাকেন। দেবতা, মনুষ্য, পিতৃগণ, কি প্রেত, ভূত, গুহ্যক, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, কৃমি, সকলেই মানুষকে আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। অতএব হে তন্বঙ্গি! ক্ষত্রিয়গণের যাহা কর্ত্তব্য এবং যাহা ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলজনক, এমন শিক্ষা পুত্রকে প্রদান কর।

মদালসা স্বামীর সানুগ্রহ অনুরোধে তাই পুত্র অলর্ককে কর্ম্মমার্গে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রথমেই উল্লাপনছলে উপদেশ দিতেছেন;—"হে পুত্র! সংবর্দ্ধিত হও, মিত্রগণের উপকারার্থ এবং শত্রুকুলের বিনাশার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা আমার পতির অন্তর আনন্দিত কর।"

কোন এক স্মরণাতীত কালে অযোধ্যার সিংহাসনে মহারাজা ঋতধ্বজ অধিরূঢ় ছিলেন এবং অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া সমগ্র জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা মদালসা একে একে অনেকগুলি সন্তানলাভ করেন, কিন্তু পুণ্যবতী আত্মজ্ঞান উপদেশ দিয়া সকল পুত্রকেই সংসারবিরাগী তপস্বী করিয়া দেন। এই জরামরণ-দুঃখনিরত ক্লেশময় সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার জন্য মদালসা স্বীয় সন্তানগণকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করেন। পুত্রেরাও মায়ের পুণ্যবলে সংসার-মায়া ছিন্ন করিয়া সকলেই পরম তপস্বী হন। কেবল রাজর্ষি অলর্ক রাজ্যশাসন করিয়া স্বীয় ধর্ম্মবলে জগতে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। অলর্ক মদালসার কনিষ্ঠ পুত্র; বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নামক আরও তিনটি পুত্র ছিল। কিন্তু ঐ তিন পুত্রই যোগধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

এই সংসারে কচিৎ দুই এক জন লোকই আত্মজ্ঞান লাভ করে এবং সহস্র সহস্র আত্মজ্ঞানীর মধ্যে কচিৎ দুই এক জন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। জন্মাচরিত ধর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় না হইলে আত্মজ্ঞান লাভ করা দুরূহ। কারণ, অহঙ্কারই

আত্মজ্ঞানের বিরোধী। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভেদজ্ঞানদ্বারা আত্মা ধর্ম্মসাধনে প্রতিহত হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুতেই আত্মজ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে না। মেঘাবৃত দিবায় আকাশের মেঘ কাটিয়া গেলে যেমন ঘোর নীলাকাশে সূর্য্য উদিত হইয়া প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য হয়, তেমনই মানবের চিত্তের মোহঘোর অর্থাৎ সংসার-মোহ কাটিয়া গেলে যখন মানুষ প্রকৃতই আপনার সত্তা বুঝিতে পারে, তখন সূর্য্য-প্রকাশে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানে চিত্ত সুন্দর হয়। ভেদরূপ ময়লা নিমেষমধ্যে অপসারিত হইয়া চিত্তকে সুনির্ম্মল করিয়া দেয়। এই অবস্থালাভই মানবের চরম আকাঙ্ক্ষা। জন্ম-মরণ-দুঃখনাশের জন্য জীব নিয়ত এই চেষ্টাই করে। তবে যাহারা অজ্ঞান, সংসার-চক্রে পড়িয়া ভোগবাসনাকেই জীবনের সার মনে করে, তাহারা কখনও এই নির্ম্মল প্রকৃতি লাভ করিতে পারে না।

সংসার দ্বন্দ্বময়। কেন সংসারকে দ্বন্দ্বময় বলা হইল? না—এখানে মানুষ স্বীয় আকাঙ্ক্ষিত স্বার্থের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্ব করিয়া ঠিক মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায়। মদালসা স্বীয় সুকৃতিবশে এই সংসাররহস্য বুঝিতেন এবং আপনার সন্তানগণ যাহাতে এ মায়া ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মপদে মিশিয়া যাইতে পারেন, তাহারই উদ্যোগ করিতেছিলেন। এ জগতে প্রকৃত হিতৈষী কে? দুঃখনাশের হেতু যাহা, তাহা নাশ করিবার উপদেশ কিম্বা পন্থা যিনি দেখাইয়া দেন, তিনিই প্রকৃত হিতৈষী। পিতা ও মাতা হইতে পুত্রের হিতৈষী আর কে আছেন? মাতার যাহা কর্ত্তব্য, মদালসা তাহাই পুত্র অলর্ককে শিক্ষা দিতেছেন।

ঋতধ্বজের বাক্যানুসারে বুঝা যায়, আমাদের সংসার চাহি। পূর্ণমাত্রায় অর্থাৎ ষোড়শাঙ্গে কর্ম্মকাণ্ডকে নিখুঁত করিয়া সম্পন্ন করিয়া সংসারী হইতে তিনি বলেন। কারণ, কর্ম্মকাণ্ড আশ্রয় না করিলে সৃষ্টজীবগুলি মনুষ্যকে আশ্রয় করিবে কি করিয়া?

মদালসার হিসাবে মানুষ কি? তিনি উল্লাপনছলে আপনার পুত্রকে বলিতেছেন;—

"রে বৎস! তুমি শুদ্ধ, তুমি নামহীন, অধুনা কল্পনা-মাত্র সহায়েই তোমার নামকরণ হইয়াছে। তোমার এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক জানিও, অতএব এই দেহ যেরূপ তোমার নহে, তুমিও সেইরূপ ইহার নহ; সুতরাং তুমি কি কারণে ক্রন্দন করিতেছ? অথবা তুমি ক্রন্দন করিতেছ না, ঐ শব্দ এই রাজকুমারকে আশ্রয় করিয়া স্বয়ংই আবির্ভূত হইতেছে। নানাপ্রকার ভৌতিক গুণ ও অগুণসকল তদীয় ইন্দ্রিয়সমূহে বিকল্পিত হইয়াছে। অতীব দুর্ব্বল ভূত-সমূহ যেমন ভূতসহায়ে অন্ন ও বারিদানাদি দ্বারা সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তোমার সে প্রকার বৃদ্ধি বা ক্ষয় কিছুই নাই। তোমার এই দেহ আচ্ছাদন মাত্র; ইহাও শীর্ণ হইয়া যাইবে, সে জন্য তুমি মোহে অভিভূত হইও না। শুভাশুভ কর্ম্ম-বশেই তোমার শরীরে এই আচ্ছাদন নিবদ্ধ হইয়াছে জানিও। কি পিতা, কি পুত্র, কি মাতা, কি দয়িতা, কি আত্মীয়, কি অনাত্মীয়, কেহই কিছুই নহে। তুমি ইহা-দিগকে বহুমাননা করিও না। যে সকল ব্যক্তি বিমূঢ় চিত্ত, তাহারাই দুঃখকে দুঃখোপশমের হেতু এবং ভোগ-সমূহকে সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে। যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যান্ধ ও সেই হেতু মোহাচ্ছন্ন চিত্ত, তাহারা তত্ত্বৎ দুঃখকেই সুখ বলিয়া জানে। রমণী হাস্য করিলে অস্থি দেখা গিয়া থাকে, তাহার সমুজ্জ্বল নেত্রদ্বয়ও মূর্ত্তিমান্ তর্জ্জন-স্বরূপ; তাহার পীনোন্নত স্তনাদিও ঘন মাংসপিণ্ডমাত্র; সুতরাং রমণী কি সাক্ষাৎ নরকস্বরূপ নহে? ভূমিতে যান, যানে দেহ এবং সেই দেহে অন্য পুরুষ নিবিষ্ট রহিয়াছেন। স্ব স্ব দেহে যেরূপ "আমার" এই জ্ঞান আছে, সেই পুরুষে তাদৃশ নাই। অহো, কি মূর্খতা!"

ইহাই মদালসার পুত্রের প্রতি উল্লাপন। ছেলের প্রতি মায়ের উপদেশ।

মদালসা নারীত্বে মহীয়সী হইয়া মাতৃত্বের যে দেবত্বটুকু এই উল্লাপনছলে দেখাইয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। এই দেহ পঞ্চভূতাত্মক। পঞ্চপদার্থে যেমন এই দেহের সৃষ্টি, তেমনই ঐ পঞ্চপদার্থেই দেহের নাশ। তবে মানুষ মমতা করে কিসের? এই দেহ পূর্ব্বে ছিল না এবং পরেও থাকিবে না, কেবল মধ্যসময়ে ক্ষণিকের তরে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু যে প্রাণশক্তি ঐ দেহে আসিয়া আবদ্ধ হইয়াছে, উহা পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। ঐ প্রাণশক্তিই আত্মা। উহার ক্ষয় নাই। তাই মদালসা বলিতেছেন, তুমি শুদ্ধ, দেহাশ্রিত, তুমি পবিত্র। এই দেহ শীর্ণ হইলেও তুমি শীর্ণ হইবে না। তবে যে সকল মানুষ উহা বুঝিতে পারে না, মদালসা আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা কি মূর্খ!

২

আত্মবোধ।

মানুষের বা জীবের স্বরূপবোধই আত্মবোধ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব এই আত্মস্বরূপ বুঝিতে না পারিবে, ততক্ষণ দুঃখ অনিবার্য্য। অতএব আত্মবোধসাধনই জীবের প্রথম কর্ত্তব্য।

যতক্ষণ ভোগবাসনা থাকিবে, ততক্ষণ আত্মজ্ঞান আসে না। প্রত্যেক ভোগ্য জিনিষের মিথ্যাত্ব নেতি নেতি করিয়া বিশ্লেষণ করিলে যখন উহার অসারত্ব প্রতিপাদন হইবে, তখনই ভোগবাসনা দূর হইয়া যাইবে। জীবনকে সুখময় করাই সকলের উদ্দেশ্য। সে কিসে সফল হইতে পারে? দুঃখের নাশ যে পর্য্যন্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত সুখের উৎপত্তি অসম্ভব। দুঃখের হেতু কি? দুঃখের হেতু অজ্ঞান। পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞান না থাকিলেই পদার্থের জন্য দুঃখ উপস্থিত হয়।

এই পদার্থ-তত্ত্বে প্রথমেই দেহের বিচার। যত কিছু দুঃখ আমাদের এই দেহ লইয়া। ইহার ক্ষয়-বৃদ্ধি, রোগজ্বালা, জন্ম-নাশ, এই সকল অনাগত দুঃখ জীবগণকে নিয়ত দুঃখ দিতেছে। কিন্তু যদি এই দেহের প্রকৃততত্ত্ব বুঝা যায়, তাহা হইলে দেহের জন্য আর কোন দুঃখ থাকে না। কারণ, বিনাশী দ্রব্য হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিনাশপ্রাপ্তই হইবে। পঞ্চভূতাশ্রয়ে গঠিত দেহ নাশপ্রবণ হইবে, উহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ভ্রান্ত রাজা ঋতধ্বজ আপন ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মদালসার কার্য্যে খুঁৎ ধরিয়া বলিলেন,—সে কি রাজ্ঞি! আমি যখনই পুত্রের নামকরণ করিয়াছি, তখনই তুমি আমার বাক্য উচ্চারণমাত্র হাসিয়াছ; কিন্তু আমি তোমার এই হাস্যের কারণ বুঝিতে পারি নাই। আমি পুত্রগণের যে বিক্রান্ত, সুবাহু ও শত্রুমর্দ্দন নাম রাখিয়াছি, আমার বিবেচনায় উহা সর্ব্বপ্রকারেই অর্থযুক্ত হইয়াছে, কেন না, ক্ষত্রিয়গণ সর্ব্বদাই শৌর্য্য, বীর্য্য ও দর্পযুক্ত এবং তদনুরূপ নামকরণ করাই উচিত। যাহা হউক, তুমি এই চতুর্থ পুত্রের নামকরণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ কর। মদালসা স্বামীর আদেশে বলিলেন, মহারাজ! আপনার এই পুত্র অলর্ক নামে জগতে খ্যাতলাভ করিবে।

মহারাজ ঋতধ্বজ এই অর্থহীন নামশ্রবণে হাস্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, হে কল্যাণি! এমন অসম্বদ্ধ নাম রাখিলে যে, তাহা শুনিয়াই আমি হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। মদালসা স্বামীকে উচ্চহাস্য করিতে দেখিয়া বলিলেন, হে মহারাজ! নামকরণ লোকাচার ও কল্পনা মাত্র। নাম রাখিতে হয় বলিয়াই লোকে নাম রাখে। নামের অর্থ করিয়া কে কোথায় নামকরণ করিয়া থাকে? আপনি অলর্ক নাম যেমন অর্থশূন্য বলিতেছেন, তেমনই বিক্রান্ত, সুবাহু প্রভৃতি নামও যে মহারাজ অর্থশূন্য! কেন না, প্রথমতঃ বিক্রান্ত শব্দের অর্থ করুন।

যে সকল পুরুষ প্রাজ্ঞ, তাঁহারা আত্মাকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এক দেশ হইতে অন্য দেশে গতিকেই ক্রান্তি বলে; আত্মা সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী ও দেহের ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার গতি নাই বা গতি সম্ভবে না। অতএব আমার বিবেচনায় বিক্রান্ত নামেরও কোন অর্থ নাই। তার-পর মহারাজ দ্বিতীয় পুত্রের নাম রাখিয়াছেন,—সুবাহু। এই নামেরও কোন অর্থ হইতে পারে না, কারণ, আত্মা সর্ব্ব-প্রকার মূর্ত্তিহীন। তৎপরে শত্রুমর্দ্দন, ঐ নামও যে বৃথা এবং অর্থহীন, তাহাও বলিতেছি, আত্মা সর্ব্বজীবে ও সকল শরীরেই বিরাজিত আছেন, আত্মা দ্বন্দ্বহীন, তাঁহার আবার শত্রুই বা কে আর মিত্রই বা কে? ভূতদ্বারাই ভূতগণ মর্দ্দিত হইয়া থাকে। যিনি বা যে আত্মা নিজে মূর্ত্তিহীন, তাঁহাকে আবার মর্দ্দন করিবে কে? ক্রোধ প্রভৃতির পৃথক্‌ভাবহেতু এই প্রকার কল্পনাও অর্থশূন্য হয়, কারণ, আত্মা সর্ব্বপ্রকার দোষশূন্য। কেবল লোকাচারহেতু এই প্রকার অর্থহীন নামের কল্পনা করা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রমাত্রই এই আত্মাকে অবিনশ্বর বলিয়াছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব এই দেহকেই সর্ব্বস্ব মনে করে, ততক্ষণ তাহাকে দুঃখভোগ করিতে হয়। কারণ,কালসহকারে দেহ পচিবে—গলিবে—নষ্ট হইবে—লুপ্ত হইবে। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী দেহের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইতে পারিলে অর্থাৎ কি উপাদানে দেহ গঠিত হইয়াছে জানিতে পারিলে এই দেহের প্রতি আর মায়া বসে না। যেমন মানুষ গৃহনির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। গৃহ ও মানুষ এক নহে। নবদ্বারসম্পন্ন দেহ-গৃহ আত্মার বাসগৃহমাত্র।

তবে কি এ দেহকে অনাস্থা করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে? না। এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্ম। কর্ম্মক্ষয় না হইলে পুনঃ পুনঃ এই দেহ আশ্রয় করিতে—গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, অতএব কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মক্ষয় না করিলে যখন জন্মের অতীত হওয়া যাইবে না, তখন কর্ম্মই প্রধান। কিন্তু অনাসক্ত অর্থাৎ পদ্মপত্রের জলের ন্যায় কর্ম্মে আসক্ত না হইয়া কর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে। জীবাত্মা পুনঃ পুনঃ ভোগাদিদ্বারা কর্ম্মক্ষয় করিয়া পরমাত্মায় মিশিয়া যায় অর্থাৎ জন্ম-রহিত হয়।

৩

অলর্ক জননীকে প্রণামপূর্ব্বক প্রণত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! ইহলৌকিক ও পারলৌকিক, উভয় লৌকিক সুখের জন্য আমার যে প্রকার কার্য্যানুষ্ঠান করা সমুচিত, আপনি তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণন করুন।

এ জগতে মানুষের প্রধান গুরু—মাতা। অলর্ক যে কেবল তাহার জীবনের সমস্যাই মাতা মদালসাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, সমস্ত মানবকুলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলকর কার্য্যের কথাই অলর্ক আপনার মায়ের নিকট উপদেশ পাইয়াছিলেন। মাতা মদালসা বলিলেন, বৎস! রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া স্বধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করাই নরপতির প্রধান কর্ত্তব্য। সপ্তমূলবিনাশক ব্যসন পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে কৃতমন্ত্রণার বহির্গমনবশতঃ অরাতিরা অভিভব করিতে না পারে, সেইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হওয়াই নরপতির অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সপ্তমূল ব্যসন যথা—দ্যূতক্রীড়া, নারীসমাগম, প্রজার অবিশ্বাস ও নীচ লোকগণকে রাজকার্য্যে নিয়োজিত করা, বহু মন্ত্রিনিয়োগ ও বাচাল এবং স্বার্থপরের উপদেশ শ্রবণ, এই সকলই সপ্তমূল ব্যসন। রাজা অতিশয় অভিজ্ঞ, বহুদর্শী, এক জন প্রাচীন মন্ত্রীর সহিত রাজ্যশাসনের গুপ্তপরামর্শাদি করিবেন। বহু মন্ত্রী বহু দোষের আকর। সুচক্রসমন্বিত স্যন্দন হইতে পতিত হইলে যেরূপ বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়, তদ্রূপ মন্ত্রণা বহির্গত হইয়া পড়িলে রাজা নিঃসংশয়ই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। অরাতিগণের দোষে অমাত্যগণ দূষিত হইয়াছে কি না অর্থাৎ উৎকোচাদিদ্বারা অমাত্যদিগকে শত্রু বশীভূত করিয়াছে কি না, বিশেষ যত্নসহকারে এবং অতি সংগোপনে তাহা অবগত হওয়াই রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য।

তিনি চরদ্বারা অরাতিগণেরও বিশেষ গতিবিধি লক্ষ্য ও অনুসন্ধান করিবেন। কি মিত্র, কি আপ্ত, কি বন্ধু, কাহাকেও বিশ্বাস করা রাজার কর্ত্তব্য নহে ; কিন্তু কার্য্যবশতঃ সময়ান্তরে শত্রুকেও বিশ্বাস করিতে হয়। নরপতিকে সর্ব্বদা কামবশবর্ত্তীহীন হইতে হইবে। স্থান বৃদ্ধি ও ক্ষয় অবগত হইবেন এবং সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্‌গুণে গুণবান্ হইতে হইবে। প্রথমতঃ আপনাকে, তৎপরে অমাত্যগণকে, তদনন্তর ভৃত্যসমূহকে, পরে পৌরবর্গকে বশীভূত করিয়া অবশেষে শত্রুসহ বিরোধ করিবেন। যিনি প্রথমে আপন রাজ্যস্থ অমাত্য, প্রজা প্রভৃতিকে বশীভূত না করিয়া শত্রুগণকে পরাভূত করিতে বাসনা করেন, সেই অজিতাত্ম মহীপতি অমাত্যকর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অরাতিকুলের বশীভূত হইয়া থাকেন। হে পুত্র অলর্ক! এই হেতুই প্রথমতঃ কামাদি রিপুগণকে জয় করিতে হইবে। তাহাদিগকে জয় করিলে অবশ্য জয় করা যায়। কিন্তু কামাদিকর্ত্তৃক পরাভূত হইলে রাজার বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান ও হর্ষ, ইহারাই মানুষের শত্রু। ইহারা রাজারও শত্রু, ইহাদিগকে বশীভূত না করিলে ইহারাই রাজাদিগের বিনাশের কারণ হয়। পাণ্ডু নরপতি কামবশতঃই নিপাতিত হইয়াছিল, ক্রোধবশতঃই অনুহ্লাদকে পুত্রধনে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, লোভবশতঃ ঐল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, মদবশে বেণ রাজাকে বিপ্রগণকর্ত্তৃক নিহত হইতে হইয়াছে, অনায়ুষাপুত্র বলি অভিমানহেতু নিপতিত হইয়াছে এবং পুরঞ্জয়কে হর্ষবশেই নিধনপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে, কিন্তু রাজর্ষি মরুত্ত ঐ সমস্ত রিপুকে পরাজয় করিয়া সংসার জয় করিয়াছিলেন। নরপতি এই সকল স্মরণ করিয়া সমস্ত দোষ পরিত্যাগ করিবেন।

কাক, কোকিল, ভ্রমর, মৃগ, ব্যাল, ময়ূর, হংস, কুক্কুট ও লৌহ, নরপতি ইহাদিগের নিকট চরিত্র শিক্ষা করিবেন। নরপতি শত্রুর প্রতি কীটের ন্যায় ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ কীট যেরূপ কোনরূপ আড়ম্বর না করিয়া দ্রব্যাদি কর্ত্তনপূর্ব্বক জর্জ্জরিত করিয়া থাকে, শত্রুর প্রতিও সেরূপ ব্যবহার করা নরপতির কর্ত্তব্য। তিনি পিপীলিকার ন্যায় যথাকালে সঞ্চয়ী হইবেন। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও শাল্মলীবীজের ন্যায় ব্যাপনশীল হওয়া রাজাদিগের কর্ত্তব্য। তিনি চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় রাজনীতি প্রয়োগপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন সকলেরই গৃহে কিরণ বিতরণ করেন এবং কখনও তীক্ষ্ণ—কখনও মৃদু হন, সেইরূপ রাজনীতি প্রয়োগ করিয়া উদয়শীল হওয়াই রাজার সমুচিত।

কাক সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ চিত্ত, কোকিল মধুরভাষী, ভ্রমর মধু আহরণকারী, মৃগ চঞ্চল ও সর্ব্বদা বিশ্বাসহীন, সর্প বক্রগতিসম্পন্ন বা ক্রূর, ময়ূর স্বীয় রূপগর্ব্বে আমোদিত, হংস জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে দুগ্ধগ্রহণশীল, কুক্কুট সর্ব্বদা মলিনতাতেই আগ্রহশীল, লৌহ সর্ব্বকার্য্যেই প্রয়োগশীল। রাজা কাকাদির নিকটেই তাহাদিগের চরিত্রানুযায়ী চরিত্র—ধর্ম্মশিক্ষা করিয়া রাজ্যশাসন করিবেন। বন্ধকী, পদ্ম, শরভ, শূলিকা, গুর্ব্বিণীস্তন, গোপাঙ্গনা, রাজা ইহাদিগের নিকট হইতে প্রজ্ঞাশিক্ষা করিবেন অর্থাৎ বন্ধকী যেরূপ পরপুরুষের চিত্তবিনোদন করে, নরপতিকে সেইরূপ প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করিতে হইবে। তিনি পদ্মের ন্যায় সকলের চিত্তহারী হইবেন। শরভের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করাই রাজার কর্ত্তব্য। তিনি শূলিকার ন্যায় শত্রুকে একেবারে ধ্বংস করিবেন। গুর্ব্বিণীস্তন যেরূপ ভাবী সন্তানের প্রতিপালনার্থ দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া রাখে, নরপতিও সেইরূপ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ী হইতে যত্নশীল হইবেন এবং গোপাঙ্গনা যেরূপ একমাত্র দুগ্ধদ্বারা নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে, রাজাকেও সেইরূপ এক কল্পনাদ্বারা নানাবিষয় ছকিয়া লইতে হইবে।

বসুন্ধরা পালন করিতে হইলে ইন্দ্র, সূর্য্য, যম, চন্দ্র ও বায়ু, এই পঞ্চ দেবতার অনুরূপ আচরণ করিতে হইবে অর্থাৎ ইন্দ্র যেরূপ চারি মাস বারিবর্ষণদ্বারা পৃথিবীবাসিগণকে আপ্যায়িত করিয়া থাকেন, নরপতিও সেইরূপ অর্থাদিদানে সকলের প্রীতিসাধন করিবেন। সূর্য্য যেরূপ রশ্মিযোগে আট মাস জল শোষণ করেন, সেইরূপ সূক্ষ্ম উপায়ে শুল্কাদিগ্রহণ করাই মহাপতির কর্ত্তব্য। কালপ্রাপ্ত হইলে যম যেরূপ কি প্রিয়, কি দ্বেষ্য সকলকেই নিগৃহীত করিয়া থাকেন, রাজাও সেইরূপ কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি তুষ্ট, কি অতুষ্ট, সর্ব্বত্র সমদর্শী হইবেন। পূর্ণচন্দ্রসন্দর্শনে যেমন সকলেরই প্রীতিলাভ হয়, যাঁহার শাসনে প্রজাপুঞ্জও সেইরূপ সুখানুভব করে, সেই নরপতির আচরণই প্রকৃত শশধরের অনুরূপ। বায়ু যেমন গুপ্তভাবে সর্ব্বভূতেই বিচরণ করিয়া থাকে, নরপতিও সেইরূপ চরদ্বারা পৌর, অমাত্য ও বান্ধব প্রভৃতির চরিত্রাদি অন্বেষণ করিবেন। কামলোভে কিম্বা অর্থবশে অথবা অন্য কোন কারণে যাহার মন সমাকৃষ্ট না হয়, সেই নরপতিই স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। হে বৎস! যে রাজার রাজ্যে বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম কোন প্রকার অবসাদপ্রাপ্ত না হয়, তিনি কি ইহ-পর উভয় লোকেই শাশ্বতসুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শে নিরন্তর কার্য্য করা ও সকলকে স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপন করাই রাজার একমাত্র কার্য্য এবং ইহাই তাঁহার সিদ্ধিলাভের কারণ। নরপতি প্রজাপুঞ্জকে সম্যক্‌বিধানে পালন করিলে যেরূপ কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ তাহাদিগের ধর্ম্মেরও অংশপ্রাপ্ত হন।

ভারতে উটজ শিল্প।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

(২)

য়ুরোপে ব্যবসাবাণিজ্য বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে—লোকের আশার অন্ত নাই, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই। মহাজন শ্রমজীবীকে লাভের যথাসম্ভব অল্পভাগ দিয়া আপনি আর সব গ্রাস করিতে চাহেন; শ্রমজীবী তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠে না; কারণ, সে নিরন্ন—সহায়সম্বলহীন। সময় সময় তাহার রোষ বহ্নির মত জ্বলিয়া উঠে, কিন্তু ইন্ধনের অভাবে অচিরে নির্ব্বাপিত হয়। সে রক্তারক্তি করে—কিন্তু ক্ষুধার তাড়নায় আবার মহাজনের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। তাই আজকাল শ্রমজীবীরা সঙ্ঘ গঠিত করিতেছে। য়ুরোপের লোক এই সব বড় বড় ব্যাপারে অভ্যস্ত বলিয়াই মনে করে, কোন দেশেই আর উটজ শিল্প চলিবে না। ভারতে বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠার বহু অন্তরায় বিদ্যমান—অথচ উটজ শিল্প আর চলিবে না; অতএব য়ুরোপের কলকারখানায় পণ্যের জন্য উপকরণ যোগানই ভারতের নিয়তি—এই যুক্তি যে একান্তই অসার, তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই। এইরূপ অসার যুক্তি গ্রহণ করিয়াই গমের চাষে ও ময়দার ব্যবসায় ইংলণ্ড আমেরিকার নিকট পরাভূত হইয়াছে—বিনা বাধায় আমেরিকাকে স্বাধিকার ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ড এখন পরমুখাপেক্ষী হইয়াছে। আমেরিকায় গমের চাষের সুবিধা দেখিয়াই বিলাতের অর্থনৈতিক ও রাজনীতিকগণ ইংলণ্ডের কৃষকদিগকে বুঝাইতে আরম্ভ করেন যে, আমেরিকার কৃষকই ইংলণ্ডকে গম ও ময়দা সরবরাহ করিবে—"The American farmer had a mission to supply Europe with wheat and flour because he could do it cheapest." তখন ইংলণ্ডের কৃষক তাহাই বুঝিয়াছিল। কিন্তু এখন লসন-প্রমুখ লেখকগণ বুঝাইয়াছেন, সে ভুল বুঝিয়াছিল। তখন যদি সে ভুল না বুঝিত—যদি সে আপনার ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য প্রতিযোগিতা করিতে বদ্ধপরিকর হইত, তবে জমীর ও আবহাওয়ার সুবিধা পাইয়াও আমেরিকা আজ এ বিষয়ে ইংলণ্ডের ব্যবসা নির্ম্মূল করিতে পারিত না। আমাদিগকেও বুঝিতে হইবে, বিদেশের কলকারখানায় পণ্যের জন্য উপকরণ উৎপাদন করিয়া অপূর্ণ আহারের সংস্থান করাই আমাদের নিয়তি নহে; আমরা পূর্ব্বে যেমন পণ্যই প্রস্তুত করিয়াছি, এখনও তেমনই পণ্যই প্রস্তুত করিতে পারি—আমাদিগকে সেই দিকেই মন দিতে হইবে।

দেশে বড় বড় কলকারখানা সংস্থাপিত হইলে যে সঙ্গে সঙ্গে উটজ শিল্পের তিরোভাব স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এমনও নহে। জাপানের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। জাপান প্রতীচ্যপ্রথায় দেশমধ্যে বড় বড় কলকারখানা সংস্থাপিত করিতে ত্রুটি করে নাই; বরং নূতন নূতন কল আমদানী বাবদে জাপানের ব্যয়বাহুল্য বিদেশী লেখকদিগের বিদ্রূপের বিকাশ করিয়াছে। এবার কিন্তু দেখা গিয়াছে, জাপানের অর্থব্যয় নিরর্থক হয় নাই। য়ুরোপে মহাসমরের অনলশিখা জ্বলিয়া উঠিয়া ব্যবসার ক্ষতি করিতে না করিতে জাপান য়ুরোপের ক্ষতিকে আপনার লাভে পরিণত করিয়াছে—দেশলাই হইতে কাচের শিশি, খেলানা হইতে কাপড় পর্য্যন্ত সবই জাপান চালান দিতেছে—বাণিজ্যের স্রোতে অনিবার অর্থ আহরণ করিতেছে। অথচ জাপানে উটজ শিল্প নির্ব্বাপিত হয় নাই—বড় বড় কলকারখানার পার্শ্বেই উটজ শিল্প চলিতেছে। ভারতে তাহা না হইবার কোনই কারণ নাই। বিশেষ ভারতে আমরা উটজ শিল্পেই অভ্যস্ত—ভারতের শিল্পী উটজ শিল্পী—পণ্য-উৎপাদন-কৌশল তাহার পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিদ্যা। সামান্য চেষ্টায় সেই কৌশলের—সেই বিদ্যার সদ্ব্যবহার-ফলে ভারতীয় উটজ শিল্প বড় বড় কলকারখানার প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে।

আমরা বলিয়াছি, ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠার অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্ শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত প্রমথনাথ বসু মহাশয় তাঁহার নবপ্রকাশিত 'নবভারতের ভ্রান্তি' (Illusions of New India) নামক উপাদেয় পুস্তকে সেই সব অন্তরায়ের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রথম অন্তরায়—মূলধনের অভাব। বর্ত্তমানে মূলধনের স্বচ্ছলতা ব্যতীত বড় বড় ব্যবসার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। এখন কলে কাজ হয়—সে সব কল বহুমূল্য। যে কারখানায় যত অধিক ও যত বড় কল খাটান হয়, সে কারখানায় পণ্যের খরচের পড়্তা তত কম হয়। প্রতিযোগিতা এত প্রবল—লাভের পরিমাণ এত অল্প যে, ব্যবসা বিরাটভাবে চালাইতে না পারিলে পোষাইতে পারে না। এ কথাটা আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে পণ্যোৎপাদক ব্যবসার মূলধন ৩০০০ কোটি টাকা ছিল! এরূপ মূলধন দিয়া ব্যবসা-প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও আমরা দেখিতে পারি না। এই মূলধন

বাদে আবার ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসার সাহায্যার্থ টাকা যোগাইয়া থাকে। ঐ সময়ে (১৯০১ খৃষ্টাব্দে) আমেরিকায় ১২ হাজার ৯ শত ৭২টি ব্যাঙ্ক ছিল। সুতরাং আমেরিকার ব্যবসায়ে কত টাকা খাটে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এ দেশে শতকরা ২০ জন লোক অনাহারের সন্নিহিত হইয়াই বাস করে। এ হিসাব স্যর্ উইলিয়ম উইলসন হাণ্টারের অর্থাৎ সরকারী হিসাব। যে দেশে লোকের এইরূপ অবস্থা, সে দেশে আমেরিকা বা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী বা জাপান—এ সব দেশের ব্যবসার মত ব্যয়সাধ্য ব্যবসার প্রতিষ্ঠার আশা কি একান্তই দুরাশা নহে? স্যর্ রবার্ট গিফেন দেখাইয়াছেন, ভারতের ৩০ কোটি লোকের যাহা আয়, বিলাতে ৪ কোটি ২০ লক্ষ লোক খাদ্যে ও পানীয়ে তাহা খরচ করে। বিলাতে এক জন মানুষের বার্ষিক আয়—৬ শত ৩০ টাকা, ভারতে ৩০ টাকা। সুতরাং আমাদের পক্ষে অর্থের অভাবেই বিদেশের মত বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠা অসম্ভব।

দ্বিতীয় অন্তরায়—প্রভেদের পরিসরবৃদ্ধি। আমরা উপরে ভারতের সঙ্গে অন্যান্য দেশের আর্থিক অবস্থার যে প্রভেদের উল্লেখ করিয়াছি, সে প্রভেদ কমা ত দূরের কথা, গত শতাব্দীতে বর্দ্ধিতই হইয়াছে—আরও হইতেছে। স্যর্ জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ড যে ভারতে শাসন ও ব্যবসাব্যপদেশে লোক পাঠায় আর ব্যবসার মূলধন যোগায়, সে বিনালাভে নহে—সরকারী হিসাবে বৎসর বৎসর ভারতবর্ষ হইতে ২৪ কোটি টাকা বিলাতে যায়—ব্যবসাব্যাপারেও প্রায় সেই পরিমাণ টাকার রপ্তানী হয়। ইহার উপর আবার শিল্পের দুর্দ্দশাহেতু ভারতে বিদেশ হইতে অর্থাগমের উপায় হয় না। কাযেই প্রভেদ বাড়িতেছে—কমিতেছে না; এ দেশে বড় বড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দিন দিনই সুদূরপরাহত হইতেছে।

তৃতীয় অন্তরায়—প্রকৃতি। অন্যান্য দেশ যে ভাবে বাণিজ্যবিস্তার করিয়াছে—অর্থার্জ্জনের জন্য যেরূপে অনাচারও করিয়াছে—জাপান ও জার্ম্মাণী যে নীতি অবলম্বন করিয়াছে, ভারতবর্ষ ক্ষমতা থাকিতেও সে ভাবে বাণিজ্যবিস্তার করে নাই, সে নীতি অবলম্বন করে নাই। সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তির অভাব। ভারতবর্ষ কখন ইহকালসর্ব্বস্ব দেশের অর্থার্জ্জননীতি অবলম্বন করিতে পারিবে না। তাহা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ।

চতুর্থ অন্তরায়—রাজনীতিক অবস্থা। ভারতের বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থায় তাহার পক্ষে শিল্পপ্রতিষ্ঠা বিশেষ অসুবিধাজনক। ভারত সরকার যে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; এবার শিল্পকমিশননিয়োগও তাহার অন্যতম প্রমাণ। কিন্তু এ বিষয়ে ভারত সরকার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না, সমগ্র সাম্রাজ্য হইতে ভারতকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। স্যর্ হেন্‌রী কটন এমন কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডকে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের সঙ্গে যে প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইতেছে, তাহাতে আত্মরক্ষা ও আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে ভারতের সব সুযোগ আত্মসাৎ করিতেই হইবে অর্থাৎ ভারতের লোকের দিকে না চাহিয়া আপনাদের দিকেই চাহিতে হইবে। এই জন্যই ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌গণের ও বিদেশী ব্যক্তিদিগের ভারতে সংরক্ষণনীতিপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই—হইতেছে না; ভারতের শিল্প সরকারী সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইতেছে। এ কথা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে, শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রারম্ভে সংরক্ষণনীতি ব্যতীত প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়া শিল্প সবল করা অসম্ভব। যে অর্থনীতিক মিল্ অবাধবাণিজ্যনীতির অবাধ সমর্থক, তিনিও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন—অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু ভারতে শিল্প কোন দিন সংরক্ষণনীতির সাহায্য পায় নাই। বরং বিলাতী ব্যবসার স্বার্থহানির আশঙ্কায় ভারতে ব্যবসার ক্ষতিজনক বিধিও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। শিল্পের জন্য সংরক্ষণনীতির প্রয়োজন এবার বিলাতের লোকও বুঝিতেছেন; বিলাতেও সরকারী অর্থসাহায্যে কৃত্রিমবর্ণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তথাপি এ দেশে মিষ্টার বিট্‌সন্ বেল-প্রমুখ শাসকগণ বলিতেছেন, ভারতে শিল্পের জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করা আর আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিবার প্রার্থনা একই রকমের! সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতি পরিবর্ত্তিত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই। সে নীতি যেমন আছে, তেমনই থাকিবে। আবার সে নীতি পরিবর্ত্তিত হইবামাত্র যে আমাদের উপকার হইবে, এমন নহে। অধিক উপকার হইবে, এ দেশে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের। তাঁহাদিগের লাভের টাকা বিদেশেই চলিয়া যাইবে। আমাদের "দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে।"

পঞ্চম অন্তরায়—আদর্শ। হিন্দুর দৃষ্টি পরকালে নিবদ্ধ বলিয়া হিন্দু চিরদিনই বাণিজ্যব্যাপার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী বিবেচনা করিয়াছে। সমাজে ব্রাহ্মণের পর ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়ের পর বৈশ্যের স্থান। সত্য বটে, প্রতীচ্য শিক্ষার ও সভ্যতার প্রভাবে সে পুরাতন আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু এখনও তাহা তিরোহিত হয় নাই।

ষষ্ঠ অন্তরায়—ব্যবসাবুদ্ধির ক্ষীণতা। আর্য্যদিগের যে শাখা উত্তর ও পশ্চিম য়ুরোপে গমন করিয়াছিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর দেশে প্রতিকূল প্রাকৃতিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সে যুদ্ধে জয়ী না হইলে জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কাযেই তাহারা শ্রমশীল—সাহসী—নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপে উৎসাহী হইয়াছিল। আর যে শাখা ভারতে আসিয়া পঞ্চনদপ্রদেশ হইতে উর্ব্বর গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা জীবিকার্জ্জন সহজসাধ্য দেখিয়া

শ্রমকাতর ও স্বল্পে সন্তুষ্ট হইয়াছিল। ফল, মূল, শস্য, পানীয়, সবই যে দেশে সুলভ, সেই উষ্ণপ্রধান দেশে মানুষ স্বভাবতঃ শ্রমকাতর হয়। এ দেশের জলবায়ুও কঠোর শ্রমের পক্ষে অনুকূল নহে। তাই এ দেশের লোক—বিশেষ বাঙ্গালীরা—সর্ব্ববিষয়ে নবোদ্যমবিরত averse to adventure হইয়াছে। তাহার পর তাহাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থাও সেরূপ উদ্যমবিকাশের উপযোগী নহে। সুশাসিত বৃটিশসাম্রাজ্যে নিরস্ত্র ভারতবাসী সুখে ও শান্তিতে বাস করিয়া আরও উদ্যমহীন হইয়াছে। আত্মরক্ষার ভারও সে রাজার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে—কাযেই তাহার পক্ষে সাহসের অভাব অসঙ্গত নহে। মেজর এভান্স বেল এ কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিয়াছেন,—"Too much constraint, too much assistance, however benevolently intended, will but distort the phenomena of progress, disturb its steady course, and drive the streams into dangerous channels."

সপ্তম অন্তরায়—এ দেশে কারিগরীশিক্ষাপ্রবর্ত্তনে বিলম্ব। যদি ৩০ বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশে কারিগরীশিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলেও সাফল্য-সম্ভাবনা অধিক হইত। এই সময়ের মধ্যে য়ুরোপ, মার্কিণ, জাপান শিল্পব্যাপারে এত অধিক অগ্রসর হইয়াছে—তাহাদের শিল্প এত সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—তাহাদের মাল ভারতের বাজারে এত চলিয়াছে যে, আজ আর আমাদের পক্ষে বড় বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। আজকাল এ দেশ হইতে যে সব যুবক বিদেশে যাইয়া কারিগরীশিক্ষালাভ করিয়া আইসে, তাহারা আবার কারখানার অভাবে অধীত বিদ্যা কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার সুযোগ পায় না। বিদ্যা ভার হইয়া থাকে।

অষ্টম অন্তরায়—ভারতে, বিশেষ বঙ্গদেশে, ব্যবসা-শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। ইংরাজীশিক্ষার ফলে এত দিন এ দেশের লোক চিকিৎসা ও আইনব্যবসা, চাকরী প্রভৃতিতেই অর্থ সুলভ মনে করিয়া সেই সব দিকেই আকৃষ্ট হইত। এমন কি, ব্যবসায়ী জাতিরাও "জাত ব্যবসা" ছাড়িয়া এই সব দিকেই আকৃষ্ট হইতেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত যে বলিয়াছিলেন,—

"যত গোপ গোয়ালা সদরওয়ালা
কে দেবে গো ঘোল ?"

তাহার মধ্যে বিদ্রূপের সঙ্গে ভবিষ্যতের দুর্ভাবনার বিকাশও কম ছিল না। আজ আমাদের সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। আদালতে আর উকীল ধরে না; চাকরীর উমেদারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে চাকরীর পারিশ্রমিক দিন দিন কমিতেছে—খানসামার অপেক্ষা কেরাণী সুলভ হইয়াছে। এখন ভ্রম ঘুচিয়াছে বটে, কিন্তু উপায় কি? ব্যবসার ক্ষেত্রে আর আমাদের স্থান নাই।

উপরে যে আটটি অন্তরায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের যে কোনটিতে দেশের ব্যবসাবিস্তারে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আর আমাদের পক্ষে সব কয়টিই সশরীরে বিদ্যমান! কাযেই আমরা কৃষির উপর নির্ভর করি। যে কৃষিজ পণ্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া বস্ত্রাদি ক্রয় করি, তাহাও পেটে না খাইয়া! সরকারী হিসাবেই দেখা যায়, এ দেশের সব লোক যদি দুই বেলা পেট পূরিয়া খাইতে পাইত, তবে আর দেশ হইতে খাদ্যশস্য রপ্তানী করা সম্ভব হইত না; কারণ, খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থাকিত না। অথচ আমরা পেটে না খাইয়া যে টাকা বাঁচাই, সেও কম নহে—বৎসরে আমরা ৩৫ কোটি টাকার বিদেশী মাল ক্রয় করি!

এই অবস্থায়—যেরূপেই হউক, অর্থসংগ্রহ করিতে না পারিলে দারিদ্র্যদুঃখকাতর ভারতবাসীর পক্ষে প্রতীচ্য-প্রথায় বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার আশা আকাশকুসুম ব্যতীত আর কিছুই নহে। সে দিকে আমাদের উদ্যম অচিরে মেঘের প্রাসাদেরই মত বিলীন হইয়া যাইবে। অথচ শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত আমাদের উপায় নাই। সুতরাং আমাদিগকে দেশের উটজ শিল্পের উন্নতির দিকেই মন দিতে হইবে।

এ দেশের উটজ শিল্প যে উন্নতিসহ ও প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষাক্ষম, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। বিশেষ অধিকাংশ উটজ শিল্প কৃষিকার্য্যের সঙ্গে চলিতে পারে—অবসরকালে, পরিবারের সকলের সাহায্যে শিল্পী কায করিয়া থাকে। সে সুবিধাও সামান্য নহে। এ দেশে হাতের তাঁতের শিল্প যে আজও আত্মরক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র তন্তুবায়-পরিবারের ভরণপোষণের উপায় করিতেছে, তাহাই এ দেশে শ্রমশিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচায়ক। এ দেশে রেশম-শিল্পে এককালে বহু লোকের দিনপাতোপায় হইত—এ দেশের রেশমী কাপড় বিদেশে সাদরে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমানে তাহার অত্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছে; এমন কি, লর্ড কার্মাইকেল বিলাতে যে বহরমপুরী রুমাল ব্যবহার করিতেন, এ দেশে তাঁহাকে তাহার উৎপত্তিস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতেই বিষম কষ্ট পাইতে হইয়াছে—সরকারী শিল্পবিভাগও তাহার সন্ধান দিতে পারে নাই। এই রেশম শিল্পের উন্নতির উপায় করিতে সরকার এক জন বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছেন। তিনি সে দিন ত্রিবাঙ্কুরে বলিয়াছেন, এ দেশে রেশম শিল্পে উন্নত উটজ শিল্পে পরিণত করিবার সব সুবিধাই বিদ্যমান। সমৃদ্ধির সময় এ দেশে রেশম শিল্প উটজ শিল্পই ছিল। এখনও অনেক গৃহে রেশমের চাষ আছে। সরকারী বিশেষজ্ঞ যদি অন্যরূপ প্রাকৃতিক অবস্থায় পালিত কীটের সম্বন্ধে লব্ধ অভিজ্ঞতার উপরই অন্ধভাবে নির্ভর না করিয়া, এই সব ব্যবসায়ীর পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, তবে বোধ হয় সুফললাভ-সম্ভাবনা অদূরবর্ত্তী হয়। যুক্তপ্রদেশে সরকার কাচের ব্যবসার উন্নতিসাধন জন্য বিদেশ হইতে এক জন বিশেষজ্ঞ আনাইয়াছেন। তিনি সে প্রদেশে কাচের

শিল্পীদিগের পুরাতন চুলা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। তাহাতে সেই সব চুলাতেই ভাল কায হইবে এবং কাচশিল্প যুক্তপ্রদেশে লাভজনক উটজ শিল্পে পরিণতিলাভ করিবে।

এখন দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়, বাহুল্যবোধে সে কার্য্যে বিরত হইলাম। সরকার এ দেশের শিল্পসম্বন্ধে যে সব বিবরণপুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন, সে সকলে কৌতূহলী পাঠক অনেক সন্ধান পাইবেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সকল দেশেই আরম্ভে সকল শিল্প উটজ শিল্প। সমাজ যখন অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক লোক লইয়া সংগঠিত থাকে, অভাবের পরিমাণ যখন অল্প থাকে, বহির্বাণিজ্য যখন থাকে না বলিলেই হয়, তখন উটজ শিল্পেই সমাজের অভাব দূর হয়। ক্রমে সে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ভারতে সেই উটজ শিল্পেরই এত উন্নতি হইয়াছিল যে, অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা স্বীকার করিয়াছেন, বিদেশী সরকারগুলি যদি কঠোর বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়া ভারতীয় পণ্য আমদানী বন্ধ না করিতেন, তবে সে সব দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা হইত না—ভারতীয় পণ্যই প্রতিযোগিতায় জয়ী হইত। যে শিল্প-কৌশলে ভারতীয় শিল্পীর পণ্য জগতে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছিল, এ দেশের শিল্প আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলেও শিল্পী সে কৌশল বিস্মৃত হয় নাই—তাহা তাহার প্রকৃতিগত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সার জর্জ্জ বার্ডউডও তাহাই বলিয়াছেন, মিষ্টার হ্যাভেলও তাহাই বুঝাইয়াছেন। আজও কি কাপড়ের নক্সায়—কি প্রস্তরে ক্ষোদাই কাযে যে সব জটিল আদর্শের অনুকরণ বিদেশী শিল্পীর পক্ষে দুঃসাধ্য—এ দেশের শিল্পীরা অনায়াসে সে সকলের অনুকরণ করে—আসল ও নকল চিনা যায় না। আজকাল শিক্ষিত শিল্পীর শিল্পকৌশল—Skilled Labour পণ্যোৎপাদক উপকরণের মধ্যে অন্যতম,—তাহার মূল্যও অধিক। ভারতে উটজ শিল্পে তাহা শিল্পীর সাধারণ সম্পত্তি। তাহাও এ দেশে আমাদের একটা বিশেষ সুবিধা। তদ্ভিন্ন শিল্পীর পরিবারস্থ সকলের শ্রমসাহায্য—মূলধনের অল্পতা—শিল্পীর গৃহেই কারখানাস্থাপন—এ সবও সামান্য সুবিধা নহে। এ সকলের সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে—যন্ত্রাদির সংস্কার করিয়া লইলে এবং বিক্রয়ের কেন্দ্রে পণ্য পৌঁছাইয়া দিবার সুব্যবস্থা করিলে এ দেশে উটজ শিল্পেই যে আমাদের দারিদ্র্যসমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কৃষি।

(৪)

মাটি।

খড়িয়াল-মাটি।

যে জমীতে খড়ি-মাটি বা চূর্ণের ভাগ অধিক, তাহাকে খড়েল-মাটি বলে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে খড়েল-মাটি নাই বলিলেও বেশী বলা হয় না। সব খড়েল-মাটিতেই যে খড়ি থাকে, তাহা নহে; কোন কোন জমীতে Carbonate of Magnesia নামক পদার্থ থাকে, কোন কোন জমীতে খড়ি এবং কার্ব্বনেট্ অব ম্যাগ্নেসিয়া দুইই মিশ্রভাবে থাকে। এক প্রকার কাঁকরের ভিতরও চূণ থাকে। যে মাটিতে ঐ ধরণের কাঁকর থাকে, তাহাকেও খড়েল-মাটি বলা যায়; কিন্তু কাঁকরের ভিতর যে চূণ থাকে, তাহা উদ্ভিদ্‌রা সহজে আপনাদের দেহের ভিতর টানিয়া লইতে পারে না। জমীতে যে হাড়-সার দেওয়া হয়, তাহাতে কিছু চূণ থাকে। ইমারতের রাবিশে অনেক সময় চূণ থাকে, উহা অত্যন্ত গুঁড়া করিয়া জমীতে কিছু কিছু দিলে কোন কোন ফসলের ফলন বেশী হয়। খড়েল-মাটিতে আবশ্যক সার না দিলে ফলন ভাল হয় না। সাজি-মাটিবহুল মৃত্তিকা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পচাল-মাটি।

পচাল-মাটির আর একটা নাম 'বোদ-মাটি'। উদ্ভিদ্ পচিয়া এই মাটি প্রস্তুত হয়। যে রকম উদ্ভিদ্ পচিয়া এই মাটি প্রস্তুত হয়, সেই উদ্ভিদের ইতরবিশেষ অনুসারে বোদ-মাটির মূল উপাদানের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। তবে মোটামুটি সকল বোদ-মাটিতেই নিম্নলিখিত জিনিষগুলি থাকে; যথা—কার্ব্বন্, হাইড্রোজেন্, অক্সিজেন্, নাইট্রোজেন্ ও আরও কয়েকটি ধাতব পদার্থ থাকে। বোদ-মাটিতে যে নাইট্রোজেন্ থাকে, তাহা অনেক উদ্ভিদ্ সরাসরি আপনাদের দেহের মধ্যে টানিয়া লইতে পারে না। উহা নাইট্রিক্ য়্যাসিডে পরিণত হইলে তবে উদ্ভিদ্ উহা টানিয়া লইতে পারে। নানারূপ দৃশ্য ও অদৃশ্য পোকামাকড় ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে বোদ-মাটিতে এঁটেল-মাটি বা আটালে মিশাল দিলে ভাল হয়। বোদ-মাটিতে চূণ দিলে ভাল হয়। অনেকস্থলে বোদ-মাটিতে ক্ষার বা চূণ দেওয়া নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়ে।

উপরে মোটামুটি কয়েকপ্রকার মাটির উল্লেখ করা হইল। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক এই যে, যাঁহারা সব্জী চাষ করিতে চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে দো-আঁশ-মাটিই ভাল। বাগানের বা গৃহপ্রাঙ্গণের জমী যদি ঠিক দো-আঁশ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে মাটির যথেষ্ট উন্নতি হইবে। পরিশ্রম না করিলে কোন বিষয়েই ফললাভ করা সম্ভবে না। কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের ঘরে আবশ্যক তরি তরকারী খরিদ করিতে যে অর্থব্যয় হয়, তাহা যদি বাঁচিয়া যায় ত সংসারের কম আয় হয় না। আজকাল অনেকে আলু প্রভৃতি দুই একটি তরকারী খাইয়া থাকেন, অন্য তরকারী খাইতে চাহেন না। ইহা বড় দোষের। প্রত্যেক তরকারীর এক একটা স্বতন্ত্র গুণ আছে। যাঁহাদের ডিস্পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণরোগ আছে, তাঁহাদের পক্ষে গোল-আলু অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত; যাঁহাদের আমাশয়ের ধাতু অর্থাৎ যাঁহারা প্রায়ই সামান্য আমাশয়রোগে ভোগেন, তাঁহাদের পক্ষে ঢেঁড়স, লাউ, কাঁচকলা প্রভৃতি অত্যন্ত উপকারী; পিত্ত-প্রধান লোকের পক্ষে উচ্ছে, করলা, পটল, গিমেশাক প্রভৃতি তরকারী কেবল খাদ্য নহে—ঔষধও বটে। এইরূপ পেঁপে, শসা, মিঠে কুমড়া, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গা, মান-কচু, ওল প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ আছে। সুতরাং সকল প্রকার তরকারীই খাওয়া উচিত। বাড়ীতে তরকারীর চাষ করিলে খাইবার যেরূপ সুবিধা হয়—জিনিষের যেরূপ স্বচ্ছল হয়, কিনিয়া খাইলে সেরূপ হয় না। সেই জন্য আমি সাধারণ গৃহস্থকে বাড়ীতে অন্ততঃ কতকগুলি আবশ্যক জিনিষের চাষ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বীজ।

চাষের কথা বলিতে হইলে বীজের সম্বন্ধে সাধারণভাবে কতকগুলি কথা বলা নিতান্তই আবশ্যক। বীজ ভাল না হইলে ফল ভাল হয় না, এ কথা সকলেই জানেন। সেই জন্য বীজ বাছাই করা বড় দরকার। বীজগুলি খুব সাবধানে সযত্নে রাখিতে হয়। প্রথমতঃ সুপক্ব ফলের সার বীজই গাছ তৈয়ারী করিবার জন্য রাখিতে হয়। বীজ রাখিবার সময় উহা বেশ পরিষ্কৃত করিয়া ভাল যায়গায় রাখিতে হয়। যেখানে অত্যন্ত উত্তাপ লাগে, সেখানে বীজ রাখিতে নাই; পোকা, মাকড়, পিঁপড়া প্রভৃতি যাহাতে বীজ নষ্ট করিয়া না ফেলে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এক যায়গায় অধিক বীজ গাদা করিয়া রাখা উচিত নয়, তাহাতে গাদার ভিতর

উত্তাপ জন্মে, ফলে অনেক বীজ নষ্ট হইয়া যায়। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে কাঁচের ছিপিওয়ালা বড় শিশিতে বা কোন শিশিতে ভাল করিয়া ছিপি আঁটিয়া তাহাতে বীজরক্ষা করাই উচিত। কদাচ এক শিশি ভর্ত্তি করিয়া বীজ রাখিবে না। আধ শিশির অধিক বীজ রাখা উচিত নয়। বীজগুলি রৌদ্রে বেশ শুকাইয়া তবে তাহা ঠাণ্ডা করিয়া শিশিতে পুরিবে। মেঘের সময় বা বর্ষার দিনে বীজ খুলিয়া দেখিবে না। বীজে ঠাণ্ডা লাগিলে উহার উৎপাদিকাশক্তি কমিয়া যায় বা সময় সময় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেও পারে।

অনেকে নার্শারী প্রভৃতি হইতে বীজ খরিদ করিয়া থাকেন। বিশেষ বিশ্বাসী ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বীজ খরিদ করাই কর্ত্তব্য। যে সকল বীজ তৎক্ষণাৎ রোপণ করা না হইবে, সেই সকল বীজ কখনও ঠাণ্ডা দিনে খুলিবে না, গরমের দিনে খুলিয়া অবশিষ্ট বীজ ভাল করিয়া শিশির ভিতর সাবধানে রাখিবে। সভ্য দেশে মেণ্ডেলের পদ্ধতি অনুসারে গাছের নানারূপ পরীক্ষা করা হইতেছে—কতরূপ উন্নতি সাধিত হইতেছে, আমাদের দেশে সে সকল বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

আপাততঃ আমি গৃহস্থের ঘরে কি কি আবশ্যক তরকারী এই সময় রোপণ করা যাইতে পারে, তাহার কথা বলিব এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু সারের কথাও বলিব। একটা কথা এইখানেই বলিয়া রাখি,—যাঁহারা কোন জমীতে প্রথম চাষ দিবেন, সেই জমী কোদ্‌লাইলে বা লাঙ্গল দিলে যদি তাহাতে আগাছার শিকড় অধিক আছে দেখিতে পান, তাহা হইলে তাহার উপর কিছু চুণ ছড়াইয়া দিবেন; তাহা হইলে জমীর উৎপাদিকাশক্তি বেশ বৃদ্ধি পাইবে। পচালমাটি বা বোদ-মাটিতে চুণ ছড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক; তাহা হইলে ফসল ভাল হয়। একটু বিস্তীর্ণ জমীতে চাষ করিলে তাহাতে খইলের সার, পাতা-সার, গোময়ের সার প্রভৃতি দেওয়া আবশ্যক। পল্লীগ্রামে অনেকস্থলে উইয়ের ঢিবি থাকে, সেই ঢিবির মাটি বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া জমীতে দিলে বীজের শীঘ্র শীঘ্র অঙ্কুর জন্মে।

গার্হস্থ্য তরকারী।

গিমি-কুমড়া।

গিমি-কুমড়া খাইতে ঠিক চাল-কুমড়ারই মত। ইহার গুণও ঠিক ঐরূপ। ইহা ফলেও বেশ। ইহা উপকারী তরকারী।

বেলে-জমীতে এই কুমড়ার আবাদ করিতে হয়। নদীর চরে পলি-মাটিতে ইহা বেশ ভাল হয়। কিন্তু যদি কাহারও বাড়ীতে আটালে-মাটি থাকে, আর তাঁহার যদি এই কুমড়া-রোপণ করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি প্রশস্ত গর্ত্ত খনন করিতে হইবে। আর সেই গর্ত্তটি অর্দ্ধেক বালী আর অর্দ্ধেক গোবর-সার, গোয়ালঘরের ওঁচলা আবর্জ্জনা প্রভৃতি দিয়া পূর্ণ করিবে। বালীর সহিত ঐগুলি বেশ ভাল করিয়া মিশাইয়া দিবে। এইরূপ করিয়া কিছুদিন ফেলিয়া রাখিবে।

পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে সেই মাটিতে গিমি-কুমড়ার বীজ পুঁতিবে। বীজ পুঁতিবার পূর্ব্বে জমীর মাটি বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া দিবে এবং সমতল করিয়া লইবে। জমীর কারকিৎ ভাল করিয়া করা চাই। তিন চারি হাত অন্তর চারিটি করিয়া বীজ পুঁতিবে। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে দুই তিনটি গাছই যথেষ্ট। বীজরোপণ করিবার পর কয়েক দিন উহাতে জলসেচন করিতে হয়। কয়েক দিন পরে ইহার চারা বাহির হয়। দেখিবে, ক্ষেতে বা গাছের গোড়ায় যেন জল না জমে। চারাগুলি একটু বড় হইলে উহার চারি পাশের জমীর ঘাসগুলি উপ্‌ড়াইয়া ফেলা উচিত। ইহার গাছ মাটিতেই লতাইয়া বেড়ায়। এক একটা গাছে অনেক কুমড়া ফলে। এই কুমড়া বেশ পরিপুষ্ট হইলে ইহা অনেক দিন রাখা যায়। ইহার গুণ অনেক, খাইতেও সুস্বাদু। দীর্ঘকাল রাখা যায় বলিয়া ইহাতে অনেক দিনের জন্য গৃহস্থের ঘরে তরকারীর অভাব দূর করে।

সাবধানতা:—জমীতে যেন জল না জমে। জমীর জল বাহির করিয়া দিবার জন্য ছোট ছোট নালা কাটিয়া দিবে। ঘাসগুলি মারিয়া দিবে। গেঁড়ী, শামুক ইহার বড় শত্রু। গাছের দিকে একটু নজর রাখা চাই।

এই গাছ ও তরকারী করিতে খরচ কিছুই নাই; কেবল গৃহস্থের সামান্য একটু পরিশ্রম। কিন্তু আজকাল তরি তরকারীর যেরূপ দর, তাহাতে এক একটা ভাল গাছে গড়ে চারি টাকা পাঁচ টাকা লাভ হয়। চাষীর ক্ষেতে অধিক গাছ জন্মে বলিয়া আয় কিছু কম হইয়া থাকে।

বিলাতী কুমড়া বা মিঠে কুমড়া

বড় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর তরকারী। সকল রকম মাটিতেই ইহা জন্মে। কেবল যে স্থানে জল জমে, সে স্থানে ইহা জন্মে না। দো-আঁশ-মাটিতে ইহা অধিক ফলে, কিন্তু আটালে-মাটিতে ইহার ফল বড় মিষ্ট হয়। সকল সময়ই এই বীজ রোপণ করা যায়, তবে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসেই বিলাতী কুমড়ারোপণের বিশেষ অনুকূল সময়। একটু যত্ন করিয়া গাছ পুঁতিলে—কিছু সার দিলে এই কুমড়াগাছে যথেষ্ট ফল হয়। আমি একটি কুমড়াগাছে ৭২টি কুমড়া ফলিতে দেখিয়াছি। তন্মধ্যে ১৮টি কুমড়া খুব বড়। পাইট করিলে সাধারণতঃ এক একটা গাছে ১৫টি হইতে ২৫টি

পর্য্যন্ত কুমড়া জন্মে। বিনা পাইটে ১০টি ১৫টির অধিক কুমড়া জন্মে না।

যদি মাটি অত্যন্ত আটালে বা কঠিন হয়, তাহা হইলে যে স্থানে এই কুমড়ার বীজ বপন করা হইবে, সেই স্থানে একটি গর্ত্ত করিয়া তাহাতে মাটিগুলি বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে হয় এবং সেই মাটির সহিত পাতা-সার, গোময়ের সার, গোয়াল ঘরের জঞ্জাল প্রভৃতি বেশ করিয়া মিশাইতে হয়। রেড়ী বা সর্ষপের খইল কিছু ছড়াইয়া দিলেও মন্দ হয় না। পাতা-সার দিতে হইলে নানারূপ গাছের পাতা, কচি ডাল একটা গর্ত্তের মধ্যে পুঁতিয়া রাখিতে হয়। বর্ষার জলে তাহা পচিয়া গেলে আশ্বিন মাসে তাহা তুলিয়া বেশ করিয়া গুঁড়াইয়া তাহা ঐ মাটির সহিত মিশাল দিতে হয়। গোরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির নাদও ঐ প্রকারে পচাইয়া লইলে ভাল হয়।

আর এক প্রকারের পাতা-সার শীঘ্র প্রস্তুত করা যায়। নানারূপ গাছের পাতা সংগ্রহ করিয়া তাহা রৌদ্রে ভাল করিয়া শুকাইয়া লইবে। পরে উহা বেশ করিয়া গুঁড়া করিয়া অতি সূক্ষ্ম চালুনির দ্বারা চালিয়া লইবে। শেষে সেই চূর্ণ একটি বাক্সের ভিতর ভরিয়া তাহাতে জল দিয়া বাক্সটি খুব চাপিয়া রাখিবে। পত্রাদিচূর্ণ ঐ জলসংযোগে ও চাপে উত্তপ্ত হইবে। সাত আট দিন বাক্সটি আর খুলিবে না। শেষে বাক্স খুলিয়া দেখিবে, উহা শীতল হইয়াছে কি না। যদি শীতল হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহা ব্যবহারের উপযোগী সার হইয়াছে জানিবে। আর যদি তখনও শীতল না হয়, তাহা হইলে উহা তৎক্ষণাৎ বন্ধ করিয়া আরও কয়েক দিন বন্ধ করিয়া রাখিবে; পরে শীতল হইলে উহা ব্যবহার করিবে। কুমড়াগাছের পক্ষে কুমড়ার পাতার সার দিতে পারিলে উত্তমই হয়। পূর্ব্ব বৎসরের কুমড়ার গাছ মরিয়া গেলে, তাহার শুষ্কপত্রাদি চূর্ণ করিয়া ভাঁড়ে ভরিয়া জল দিয়া মুখে মালা দিয়া আটকাইয়া এইরূপ সার প্রস্তুত করিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। কাজ কঠিন নয়, কেবল একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া করিতে পারিলেই সাফল্যলাভ সম্ভবে।

কুমড়ার বীজ পুঁতিবার সময় তাহাতে বোদ-মাটি বা পচাল-মাটি দিলেও ফল মন্দ হয় না। মাটি প্রস্তুত করিবার সময় তাহার সহিত সামান্য একটু চূণ দিবে। চূণ দিবার অন্যূন এক সপ্তাহ পরে তাহাতে বীজ পুঁতিবে। বীজ পুঁতিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে বৃষ্টি হয় ভালই, নতুবা ঐ গর্ত্তের প্রস্তুত মাটিতে একটু জল দিবে।

মাটির অল্প নিম্নেই বীজ পুঁতিবে। বীজরোপণের পর উহাতে প্রত্যহ জল দিবে। চারা বাহির হইলে আর জল দিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। কুমড়ার গাছ মাটিতেও লতায়, মাচায়ও উঠে। গৃহস্থের বাড়ী মাচা করিয়া দেওয়াই ভাল।

যে স্থানে জল বাধে, সে স্থানে ইহা জন্মে না। দেখিবে, গাছের তলায় যেন ঘাস না জন্মে। ইহাতে খরচ নাই, বিশেষ পরিশ্রম নাই, কিন্তু বিলক্ষণ লাভ আছে।

গূঢ় সাধনা।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্তৃক লিখিত।]

"Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you."—*(Sermon in the mount, Lord Jesus, Bible St. Mathew Ch. VII. 6 Para.)*

"যাহা পবিত্র—তাহা কুকুরকে দিও না, শূকরীর সম্মুখে মুক্তা ছড়াইও না, পাছে তাহারা তাহা পদদলিত করিয়া তোমাকেও দীর্ণ বিদীর্ণ করে।"—যীশুখ্রীষ্ট এই পবিত্র কথাটি উপদেশপ্রদানকালীন বলিয়াছিলেন।

হিন্দুধর্ম্মপুস্তকের অনেক মন্ত্র ও ধর্ম্মশিক্ষা যা'কে তা'কে যাহাতে না দেওয়া হয়, তজ্জন্য কঠোর নিষেধ আছে। অনেকে সেই বিধিনিষেধের উপর কটাক্ষ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে স্বার্থপর ও নীচ মনে করিয়া বহু গালাগালি দিয়া থাকেন এবং ঐ সকল গূঢ় ধর্ম্মরহস্যের এক-বর্ণও উদ্ধার করিতে না পারিয়া ধর্ম্মব্যাখ্যার উপরও কটাক্ষ করিতে লজ্জাবোধ করেন না। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে এমন অনেক ইংরেজীশিক্ষিত ও বিদেশীভাবপুষ্ট দুর্ব্বিনীতচিত্ত হিন্দু আছেন, যাঁহারা হিন্দু-সাধনার উপর বিদ্রূপ-বাণী নিক্ষিপ্ত করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না; তাই তাঁহাদের অবগতির জন্য যীশুখ্রীষ্টের ঐ কথাটি উদ্ধৃত করিলাম। "পবিত্র যাহা, তাহা কুকুরকে দিও না, মুক্তার মালা শূকরীর সম্মুখে ছড়াইও না, সে শুধু পদদলিত করিবে না—তোমাকেও আঘাত করিতে আসিবে।" তিনি যদি আর কোন উপদেশ না দিয়া শুধু এই উপদেশবাক্যটি বলিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলেও তিনি পূজা পাইবার যোগ্যই থাকিতেন।

ঋষিরা শূদ্রকে বেদের অধিকার দেন নাই। প্রণব উচ্চারণ করিবার অধিকার শূদ্রেরা লাভ করিতে পারে নাই। ঋষিরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ধর্ম্মের "থাক্" নির্দ্দেশ করিয়া ধর্ম্মসাধনে লোককে ব্রতী হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বৈদিকমন্ত্রের গভীর তাৎপর্য্য লোকগোচর না রাখিয়া ঋষিরা তাহা গোপনেই শিষ্যকে দিয়া গিয়াছেন, শিষ্য ব্যতীত, গুরুর কৃপা ব্যতীত, অপরে তাহা সাধন করিলে গুণ না হইয়া তাহাতে দোষই উৎপন্ন হইবে। যাহাতে লোকস্থিতির কোন ব্যাঘাত না ঘটে এবং সামাজিক জীবনে সাংসারিক লোকেরা স্বেচ্ছাচারী ও অবুঝ হইয়া না উঠে, তজ্জন্য ঋষিগণ কতমতে যে সাবধান হইয়াছিলেন, তাহা সামান্য ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

সৃষ্টি যেমন অনন্ত, জীব তেমন অনন্ত; সৃষ্টি যেমন বিচিত্র, জীবচরিত্রও তেমনই বিচিত্র; সৃষ্টি যেমন অদ্ভুত, জীব-স্বভাবও তেমনই অদ্ভুত। সৃষ্টির মধ্যে যেমন ত্রিগুণবৈষম্য রহিয়াছে, জীবচরিত্রেও তেমনই ত্রিগুণবৈষম্য রহিয়াছে। সৃষ্টির সকল পদার্থ এক বর্ণ ও এক ধর্ম্মবিশিষ্ট যেমন হয় নাই, সেইরূপ সকল মানুষ কোন প্রকারেই এক বর্ণ ও এক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। ঋষিগণ এই গূঢ়রহস্য বুঝিতেন এবং বুঝিয়াই চারি বর্ণের স্বাভাবিক সৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছেন।

জীবপ্রকৃতি উত্তম, উত্তম-মধ্যম, মধ্যম, মধ্যম-অধম ও অধম, এই পাঁচ প্রকারের। উত্তম শ্রেষ্ঠ, উত্তম-মধ্যমাদি পর্য্যায়ক্রমে তেমন নিকৃষ্ট।

সৃষ্টি এক ধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে পারে না। নিত্য সৃষ্টি দর্শন করিয়াও যদি এই জ্ঞান কাহারও না হইয়া থাকে, তাহাকে বুঝাইতে গেলেও যীশুর ঐ পূর্ব্বোক্ত উপদেশ মনে করিতে হয়।

ঈশ্বর এক। বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, সর্ব্বত্র—সর্ব্বকালে—সর্ব্বজাতীয় ঋষিগণ এক ঈশ্বর মানিয়াছেন। কিন্তু ঐ এক ঈশ্বর হইতে—ঐ সান্ত হইতে অনন্ত সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে। ঈশ্বর সান্ত ও অনন্ত, দুই। কেন না, অন্তের ভিতরে বলিয়া সান্ত। ঈশ্বর নিজের ভিতরে নিজে, এই জন্য সান্ত বলিলাম, আর ঈশ্বরের ঐ নিজত্বটুকুর সীমা পাই না বলিয়া তাঁহাকে অনন্ত বলিলাম। গূঢ় অর্থ—সান্ত ও অনন্তে বিশেষ তফাৎ হয় না। অন্তসহিত সান্ত, অন্তরহিত অনন্ত। ঈশ্বর আপনাতে আপনি আবদ্ধ, সেই আবদ্ধের হিসাব আমরা জানি না সত্য, কিন্তু ঈশ্বরকে যদি আপনার হইতে আলাহিদা করি, তাহা হইলে সেই এক ঈশ্বরই বহু হইয়া দাঁড়ান। ঈশ্বর বহু নহেন, এক। অনন্তের অপর অর্থ বহু, কিন্তু বহুও একের খানিক সমষ্টি মাত্র। অতএব বহুও এক। ঈশ্বরের বহু সৃষ্টি, আর সৃষ্টির এক ঈশ্বর। অতএব বহু ও এক—পরিশেষে বিচারে একই দাঁড়ায়। এই এক ঈশ্বর—সকলের। সকল বহুর সমষ্টিযোগে এক ঈশ্বর। সকল বহু এক ঈশ্বরকেই আপনার বলিয়া জানে;—যেমন আকাশজাত চন্দ্র-সূর্য্য প্রত্যেকের নিকটই আপন বলিয়া জ্ঞাত। যত জীব, তত চন্দ্র-সূর্য্য নহে; অথচ সহস্র যোজন ব্যবধানের চন্দ্রও যেমন তোমার, সহস্র যোজন ব্যবধানের চন্দ্রও তেমন আমার। কিন্তু ঐ চন্দ্ররশ্মি সকল স্থানে বহু হইয়া বিকীর্ণ আছে। ঈশ্বর সর্ব্বময় অথবা সর্ব্বময় ঈশ্বর। চন্দ্রকিরণের ন্যায় ঈশ্বর সর্ব্বত্র। চন্দ্র উদিত হয়, পূর্ণচন্দ্রের শোভায় প্রকৃতি উজ্জ্বল হয়, জগৎ হাসে, কিন্তু সেই পূর্ণচন্দ্র

দর্শন করেন কয় জন ? সকলের চোখের সাম্‌নে থাকিলেও ক্বচিৎ লোকই সেই পূর্ণচন্দ্র দর্শন করে। কারণ,মানুষ আপনার সংসার লইয়া এত ব্যস্ত থাকে যে, উর্দ্ধাকাশের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসরও পায় না। বৎসরে মাত্র ১২ দিন পূর্ণচন্দ্র উদিত হয়, আর অনন্ত কোটি জীবের ভিতরে কচিৎ দুই এক জন সেই পূর্ণচন্দ্রের শোভায় আনন্দিত হইয়া "রজনী ভরিয়া করে সুধাপান।" একবার যে ঐ চন্দ্রের বিমল সুধারাশি একমনে বসিয়া ভোগ করিয়াছে, জগতের অপর কোন ভোগ্য তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না ; কেন না, বিমল চন্দ্রকিরণের ন্যায় বিমল সুধা আর যে জগতে নাই। তেমনই অনন্ত কোটি মানবের বা জীবের ভিতরে ক্বচিৎ দুই এক জনই কোটি বিমল চন্দ্রের আকার ভগবানের দিব্যজ্যোতিঃ— দিব্যরূপ দর্শন করেন, আর দর্শন করিয়া আত্মারাম হইয়া আপনি বিভোর হইয়া নাচিয়া কুদিয়া অথবা স্থির হইয়া জীবনযাপন করেন। কেহ বা সেই বিমল জ্যোতিঃ দর্শন করাইবার জন্য আকুল হইয়া আকুল জগদ্‌জীবকে আহ্বান করিয়া সেই বিমল জ্যোতিঃ দেখান। যাঁহারা জ্যোতিঃর মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও আত্মানন্দে বিভোর হইয়া আত্মা- রামের সাক্ষাৎলাভে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠেন। আর সংসারী জীব সংসারের মোহে সতত চিন্তাশীল ও অন্ধ থাকিয়া সেই জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারে না। পারে না বলিয়াই এবং পাছে তাহার সংসারের কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটে, এই আশঙ্কায় জ্যোতিঃর অযাথার্থ্য নিরূপিত করিতে চেষ্টা করে। জ্যোতিঃদর্শনকারী যিশু সংসারীর হাতে ক্রমে জীবন দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার প্রিয়গণকে বলিয়া গিয়াছেন,—"Give not that which is holy unto dogs." ঋষিরা মন্ত্রদ্রষ্টা—জ্যোতির্দ্রষ্টা। ঋষিগণও গূঢ় সাধনাতেই সকল জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছেন এবং যে সকল মন্ত্রদ্বারা বা উপায়ের দ্বারা ঐ জ্যোতিঃ দর্শন হইয়াছে, তাহা জগতের নিকট "হাটুরে পণ্যের" ন্যায় ছড়াইয়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন। শব্দার্থ বুঝিবার যাহার ক্ষমতা নাই, তাহার নিকট শব্দপ্রয়োগ আর বধিরের নিকট সঙ্গীত একই কথা।

জীব যখন ঈশ্বরের বহিরভিব্যক্তি বা স্ফুরণমাত্র, তখন জীবের ঈশ্বরকে দর্শন করিবার নিতান্ত অধিকার আছে। জীব ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারে এবং ঈশ্বরের তাহা অনভিপ্রেত নহে। যে সকল ঋষি বা ব্রাহ্মণগণ ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা উপযুক্ত ব্যক্তিকে অর্থাৎ সংসার- ভোগবাসনাহীন ব্যক্তিকে সেই জ্যোতিঃ দর্শনের পন্থাও বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাও নিষেধ করিয়া গিয়াছেন যে, "যা'কে-তা'কে"ঐ পন্থা দেখাইও না। ঐ পন্থাই মন্ত্র, এই জন্য মন্ত্র সর্ব্বদা গোপ্য। অনেকেই দুই বেলা আহার করেন, কিন্তু কি প্রকারে যে ঐ আহার্য্য প্রস্তুত হয়, তাহা জানেন না। অন্ন বা রুটি পাচকে প্রস্তুত করিয়া দেয়, ভোগী তাহা আহার করে ; কিন্তু ঐ ভোগীর নিকট চাউল, ডাইল, আটা, ময়দা, ঘৃতাদি সমস্ত উপকরণ আনিয়া দিলেও সে যেমন অন্ন প্রস্তুত করিতে পারে না, তেমনই যে অজ্ঞ— ভোগবাসনায় মুগ্ধ, সেও গুরু ব্যতীত বা গুরুকৃপা ব্যতীত কখনও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

মন্ত্র পাইলেই তাহা মুখে বার বার উচ্চারণ করিলেই মন্ত্রের ইষ্টদেবতাকে লাভ করা যায় না, ইষ্টদেবতার কৃপা ও গুরুর কৃপা চাহি। গুরু পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে তবে মন্ত্র উচ্চারণ করিবার ক্ষমতা জন্মে। এই সকল কারণে হিন্দুর মন্ত্রাদির এত গোপনীয় ব্যবস্থা।

তন্ত্রশাস্ত্র আরও জটিল। তন্ত্রের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। খুব সামান্য সহজ সরল কথায় তাহা বুঝাইয়া দিতেছি।

প্রেমময়ী পত্নীলাভ করিবার বাসনা সকলেরই হয় এবং সতী সাধ্বীর পতি হইব, উহাও সকলে চাহে ; রমণীও বাসনা করে—অতি প্রেমিক, অতিশয় সুশীল স্বামীর পত্নী হইব। কিন্তু যদি পত্নীলাভ করিবার আশায় কোন পুরুষ একাধিক- বংশীয় সতীত্ব নষ্ট করে এবং কোন রমণী একাধিক পুরুষের সঙ্গ করে, তাহা হইলে উভয়ের কেহই সুপতি ও সুপত্নী হইতে পারে না। কেননা, একাধিকসহবাসে চরিত্র দুষ্ট হইলে কেহই তাহাকে সৎ বা সতী বলিবে না। আর একা- ধিকের প্রতি সহকর্ম্মে সকলের নিকটই আপনার চরিত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং সকলেই অবিশ্বাস করে।

কামিনীকে সম্মুখে পাইয়া যে কামজয়ী হয়, সেই জিতে- ন্দ্রিয়—সেই বিশ্বাসভাজন হয়। ঐরূপ সাধনাদ্বারা সর্ব্বেন্দ্রিয় জয় করিয়া যদি কেহ ঈশ্বরকে পাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে সে অচিরাৎ ঈশ্বরদর্শন করিতে পারে। হিন্দু- সাধনায় তাই ব্রহ্মচর্য্যার জন্য পীড়াপীড়ি। আর ব্রহ্মচারী না হইলে কোন মন্ত্রসাধন করিতে কাহারও অধিকার হয় না।

ব্রহ্মচারী হইতে হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়কে সংযত বা বাধ্য করিয়া আপনার বশে আনিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত যেন ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াই এই ভাবনা করিয়া সাধনা করিতে হইবে। যখন দেখিবে, ঈশ্বরের কৃপা বা দর্শন পাইয়াছ, তখন কৃতার্থ হইয়া নিদ্রিত ইন্দ্রিয়গুলিকে ন্যায়োচিত কর্ম্মে নিযুক্ত কর, তাহাতে দোষ অর্শিবে না। কুমারী একমনে চিত্তশুদ্ধি করিয়া যদি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন এবং সময়ে সৎ স্বামী লাভ করেন, তাহাতে তাঁহার সতীত্ব বর্দ্ধিত হয়।

হিন্দু-সাধনায় এই গূঢ়-রহস্য নিতান্ত গূঢ়ভাবে ঋষিরা লুকাইয়া রাখিয়াছেন। অজ্ঞেরা উহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৃথা চীৎকার করিয়া থাকেন। "ভেক মক্‌মকায়তে যথা !" ভেকের শব্দে কাহারও কিছুই হয় না।

মন্ত্র সর্ব্বদা গোপনীয়। অধিকারীভেদে মন্ত্র দিবার এই জন্য ব্যবস্থা এবং যাহাকে যতটা সাধনের উপযুক্ত বিবেচনা

হইবে, ততটা সাধনমাত্র দিয়া ঋষিরা তাহার চিত্তক্ষেত্রকে প্রস্তুত করিতেন।

এঁদো পুকুরের পচাজলের ন্যায় আমাদের চিত্তক্ষেত্র এখন মলিন হইয়াছে, তাই ঋষিদিগের দোষদর্শন করাইয়া আপনাদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হই না।

সতী যে চিত্ত লইয়া পতিদেবতার সেবা করে, পুত্র যে চিত্ত লইয়া মাতৃদেবীর সেবা করে, সাধক সেই চিত্ত লইয়া ভগবানের অর্চ্চনা করে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেইরূপ চিত্ত পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পতির পূজা হয় না, মায়ের সেবা হয় না, ভগবানের অর্চ্চনা হয় না। স্বামিভক্তি যেমন সতীর হৃদয়েই ফুটিয়া উঠে, মাতৃভক্তি যেমন সুপুত্রের হৃদয়েই জাগে, ঈশ্বরভক্তিও তেমন সাধকের হৃদয়ে জাগ্রত হয়। ঐ পতিভক্তি লাভ করিয়া গূঢ়ভাবটুকু—বাক্যটুকু সতী যেমন গোপনে রাখে, আপনার মতন সতী পাইলে তাহা কদাচিৎ ব্যক্ত করে, তেমন ঈশ্বরভক্তিলাভের গূঢ়ভাবটুকু—সাধনটুকু সাধক অতি গোপনে রাখে। যদি কখন আপনার হৃদয়ের মতন হৃদয় পায়, তাহাকে যত্ন করিয়া সেই সাধনাটুকু দেয়।

অসতীর নিকটে পতিভক্তির ব্যাখ্যা—দুর্বিনীত সন্তানের নিকট মাতৃভক্তির ব্যাখ্যা যেমন নিষ্ফল, তেমন অসংস্কৃতচিত্তে ঈশ্বরভক্তির বীজ অঙ্কুর করাও বৃথা। মন্ত্রাদিই ঈশ্বর ভক্তির বীজ অঙ্কুর করিবার মূল উপাদান, অতি যত্নের, তাই উহা গোপনে রাখে।

আমি গুরুর কৃপায় গূঢ় সাধনরহস্যের "মন্ত্রগুপ্তির" ব্যাখ্যা করিলাম। অতঃপর মন্ত্র গোপনীয় রাখিয়াছে বলিয়া ঋষি বা ব্রাহ্মণদিগকে কেহই দোষ দিবেন না। কারণ, অপবিত্রতা পবিত্রতাকে অভিসম্পাত করিলে অপবিত্রতার অপবিত্রতাই বাড়ে, পবিত্রতায় কিছুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শে না।

দাড়িম।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

দাড়িম একটি প্রসিদ্ধ ফল, ইহা সকলেরই বিশেষ পরিচিত। সাধারণতঃ ইহাতে তিন প্রকার রস অনুভূত হয়। কতকগুলি মধুর অর্থাৎ মিষ্ট, কতকগুলি বা অম্ল, আবার কতকগুলি অম্লমধুররসযুক্ত। কিন্তু সকল দাড়িমই কষায়ানুরসবিশিষ্ট অর্থাৎ খাইবার পর জিহ্বায় ঈষৎ কষায়রস অনুভূত হয়। এই ত্রিবিধ রস ও কষায়ানুরস ভিন্ন অন্য কোনও রস দাড়িমে নাই। সুতরাং এই ভেদই আমাদের উদ্দেশ্যসাধনের যথেষ্ট উপযোগী।

মহর্ষি সুশ্রুত ও মহামতি চক্রপাণি ইহাতে দুইটি মাত্র রস স্বীকার করিয়া দুই প্রকার ভেদ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা মধুর ও অম্ল ভিন্ন মিশ্রিত অম্লমধুররস স্বীকার করেন নাই। তবে চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণসংগ্রহপাঠে বেশ বুঝা যায় যে, তিনি মহর্ষি সুশ্রুতস্বীকৃত দ্বিবিধ রসানুযায়ী ভেদদ্বয়েরই অনুমোদন করিয়াছেন মাত্র। যে হেতু তিনি সুশ্রুত-সংহিতার পাঠই স্বকীয় সংগ্রহগ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। মহামতি ভাবমিশ্র তিন প্রকার রস স্বীকার করিয়া ত্রিবিধ ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, সুশ্রুতের সহিত তাঁহার বিশেষ অসামঞ্জস্য নাই; যে হেতু অম্ল ও মধুর—এই দুইটি রস উভয়েরই স্বীকৃত। কেবল মিশ্রিত অম্লমধুররসটি মহর্ষি সুশ্রুত কল্পনা করেন নাই বটে, কিন্তু এই মিশ্রিত রসে মূলরসদ্বয়ের অতিরিক্ত রসান্তরের সংমিশ্রণ নাই, সুতরাং এই সংমিশ্রণকে পৃথক্ ভেদরূপে কল্পনা করায় বা না করায় বিশেষ কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। দাড়িমমাত্রেই কষায়ানুরস আছে।

ইহাকে হিন্দুস্থানে—আনার, অনারা; মহারাষ্ট্রে—দাড়িম, ডালিম্ব; কর্ণাটে—দালিম্ব; তামিলে—মাদলাই চেদেডিড; গুর্জ্জরে—ডালম্; গুজরাটে—দাড়য়ম্; ফারসীতে—আনারতুরস্; আরবীতে—রুমানহামীজ; তৈলঙ্গে—ডানিম্মচেট্টু; উৎকলে—দালিম্ব; ল্যাটীনে—Punicagramatum; ইংরাজীতে—Pomegranate এবং আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে—দাড়িম, দন্তবীজ, লোহিতপুষ্পক প্রভৃতি বলে।

বাঙ্গালাদেশে কোন কোনও স্থানে ইহাকে ডালিমও বলে। এই "ডালিম" নাম বোধ হয়, দাড়িম শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। আয়ুর্ব্বেদোক্ত দন্তবীজ ও লোহিতপুষ্পক, এই দুইটি নামের সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয়। ইহার ভিতরে বীজগুলি সংশ্লিষ্ট দন্তপংক্তির ন্যায় শোভমান থাকে

বলিয়া "দন্তবীজ" এবং পুষ্প রক্তবর্ণ বলিয়া "লোহিতপুষ্পক" নামকরণ হইয়াছে।

"অম্লং কষায়মধুরং বাতঘ্নং গ্রাহি দীপনম্।
স্নিগ্ধোষ্ণং দাড়িমং হৃদ্যং কফপিত্তাবিরোধি চ॥
রুক্ষাম্লং দাড়িমং যত্তু তৎপিত্তানিলকোপনম্।
মধুরং পিত্তনুত্তেষাং তদ্ধি দাড়িমমুত্তমম্॥"
(চ, সূ, ২৭শ অঃ।)

দাড়িম—অম্ল, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট; বায়ুনাশক, গ্রাহি, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য, হৃদয়ের হিতকর, পিত্ত ও শ্লেষ্মার অবিরোধী। যে দাড়িম রুক্ষ ও কেবল অম্লরসযুক্ত, সেই দাড়িম পিত্ত ও বায়ুবর্দ্ধক; আর দাড়িমের মধ্যে যাহা কেবল মধুররসবিশিষ্ট, তাহাই পিত্তনাশক এবং সেই দাড়িমই উৎকৃষ্ট।

"কষায়ানুরসং তেষাং দাড়িমং নাতিপিত্তলম্।
দীপনীয়ং রুচিকরং হৃদ্যং বর্চ্চোবিবন্ধনম্॥
দ্বিবিধং তত্তু বিজ্ঞেয়ং মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
ত্রিদোষঘ্নন্তু মধুরমম্লং বাত কফাপহম্॥"
(সু, সূ, ৪৬ অঃ।)

দাড়িম কষায়ানুরসবিশিষ্ট এবং ইহা অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক নহে। ইহা অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, হৃদ্য ও মলসংগ্রাহক। দাড়িম দুই প্রকার—অম্ল ও মধুর। ইহার মধ্যে অম্ল-দাড়িম বাত ও কফনাশক এবং মধুর-দাড়িম ত্রিদোষনাশক।

"তৎফলং ত্রিবিধং স্বাদু স্বাদম্লং কেবলাম্লকম্।
তত্তু স্বাদু ত্রিদোষঘ্নং তৃট্‌দাহজ্বরনাশনম্॥
হৃৎকণ্ঠমুখরোগঘ্নং তর্পণং শুক্রলং লঘু।
কষায়ানুরসং গ্রাহি স্নিগ্ধং মেধাবলাবহম্॥
স্বাদম্লং দীপনং রুচ্যং কিঞ্চিৎ পিত্তকরং লঘু।
অম্লন্তু পিত্তজনকমম্লং বাতকফাপহম্॥"
(ভাবপ্রকাশঃ।)

দাড়িমের ফল তিনপ্রকার;—মধুর, অম্লমধুর ও অম্ল। ইহার মধ্যে মধুর-দাড়িম—ত্রিদোষ, তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ ও মুখরোগনাশক, তৃপ্তিজনক, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, কষায়ানুরসযুক্ত, মলসংগ্রাহক, স্নিগ্ধ, মেধা ও বলবর্দ্ধক। অম্লমধুর-দাড়িম অগ্নিদীপক, রুচিকারক ও কিঞ্চিৎ পিত্তকর এবং অম্ল-দাড়িম পিত্তবর্দ্ধক, অম্লরসযুক্ত, বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক।

"কষায়ানুরসং নাতিপিত্তলং দাড়িমং স্মৃতম্।
দীপনীয়ং রুচিকরং হৃদ্যং বর্চ্চোবিবন্ধনম্॥
দ্বিবিধং তত্তু বিজ্ঞেয়ং মধুরঞ্চাম্লমেব চ।
ত্রিদোষঘ্নন্তু মধুরমম্লং বাতকফাপহম্॥"
(চক্র, দ্রব্যগুণসংগ্রহঃ।)

দাড়িম কষায়ানুরসযুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক, হৃদয়ের হিতকর ও মলসংগ্রাহক। ইহা অত্যন্ত পিত্তবর্দ্ধক নহে। ইহা দুইপ্রকার,—মধুর ও অম্ল। তন্মধ্যে মধুর-দাড়িম ত্রিদোষনাশক ও অম্ল-দাড়িম বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক।

দাড়িম।

"পরূষকদ্রাক্ষাকট্‌ফল দাড়িম........................"
"পরূষকাদিরিত্যেষ গণোঽনিলবিনাশনঃ।
মূত্রদোষহরো হৃদ্যঃ পিপাসাঘ্নো রুচিপ্রদঃ॥"
(সু, সূ, ২৮ অঃ।)

পরূষকাদি অর্থাৎ পরূষক, দ্রাক্ষা, কট্‌ফল, দাড়িম প্রভৃতি বায়ুনাশক, মূত্রের বিবিধ দোষবিনাশক, হৃদয়ের হিতকর, পিপাসানাশক ও রুচিজনক।

"মধুরাম্লকষায়ং কাস বাতকফপিত্তঘ্নং গ্রাহি দীপনং, লঘূষ্ণং শ্রমঘ্নং রুচিকরম্॥" (রা, নি।)

দাড়িমের ফল মধুর, অম্ল ও কষায়রসযুক্ত; কাস, বাত, শ্লেষ্মা ও পিত্তনাশক; গ্রাহি, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, শ্রমঘ্ন ও রুচিজনক।

"অম্লমধুর ভেদেন দাড়িমং দ্বিবিধম্।"

(রা, নি।)

অম্ল ও মধুরভেদে দাড়িম দুই প্রকার

এখন দেখা গেল যে, কেবল ভাবমিশ্র ব্যতীত অন্য কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রকার দাড়িমে তৃতীয় রসের উল্লেখ করেন নাই। তবে কি ভাবমিশ্রের এই তৃতীয় রসের কল্পনা অন্যান্য শাস্ত্রকারগণের সহিত অনৈক্যব্যঞ্জক ?

ইহার উত্তরে এইটুকুই বলা যথেষ্ট যে, এই তৃতীয় রস কোথা হইতে আসিল ? ইহা মধুর ও অম্ল, এই রসদ্বয়ের সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং মূলরসদ্বয় যখন সকল মতেরই অবিসংবাদিত, তখন এই দুইয়ের সংমিশ্রণকে একটি পৃথক্ আখ্যা দেওয়া বা না দেওয়ায় ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই; তবে যদি এই দুইয়ের অতিরিক্ত কোনও রস ইহাতে থাকিত অথবা ইহার অন্যতরের সহিত সংমিশ্রিত হইত, তাহা হইলে বরং তাহাকে পৃথক্ আখ্যায় অভিহিত না করিলে দোষ হইতে পারিত; যখন তাহা নয়, তখন আর এইরূপ উল্লেখ করা বা না করা কিছুই দোষাবহ নহে, একথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রকারগণ জ্বর, রক্তপিত্ত, কাস, যক্ষ্মা, অতীসার প্রভৃতি বহুরোগে পথ্যরূপে দাড়িমের ফলের প্রয়োগ উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—

"দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জুরপিয়ালৈঃ সপরুষকৈঃ।
তর্পণার্হেষু কর্ত্তব্যং তর্পণং জ্বরশান্তয়ে॥"

(চ, জ্বরচিকিৎসা।)

"মন্দাগ্নেরম্লসাত্ম্যায় তৎ সাম্লমপি কল্পয়েৎ।
দাড়িমামলকৈঃ............ ॥"

(চ, রক্তপিত্তচিকিৎসা।)

"সপিপ্পলীকং সযবং সকুলত্থং সনাগরম্।
দাড়িমামলকোপেতং স্নিগ্ধমাজরসং পিবেৎ॥"

(চ, যক্ষ্মাচিকিৎসা।)

"বৃক্ষাম্লং দাড়িমাম্লঞ্চ সহিঙ্গুবিড়সৈন্ধবম্।
প্রয়োজয়েদন্নপানে বিধিনা সুপকল্পিতম্॥"

(চ, অতীসারচিকিৎসা।)

"বীজপূরকবৃক্ষাম্লকোলদাড়িমসংযুতম্।
.................................দদ্যাৎ॥"

(চ, মদাত্যয়চিকিৎসা।)

............ইত্যাদি—

প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে এ স্থলে অধিক উল্লেখ করা হইল না। জানি না, কি জন্য এই মহোপকারী দ্রব্য আমাদের বাঙ্গালাদেশে ভালরূপ উৎপন্ন হয় না; বোধ হয়, মৃত্তিকা, জল বা বায়ুর দোষেই এইরূপ হয়। বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, গাছ ভাল হইলেও এ দেশে তেমন ফলে না, যাহা হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত আকারে ছোট ও অন্যরূপ হইয়া যায়। অধিকাংশই অম্লরস হয়; আর যাহা মধুর হয়, তাহাতেও কষায়রসের প্রাচুর্য্য থাকে। এই সমস্ত কারণেই বোধ হয়, ইহা আমাদের দেশের জল, বায়ু ও মৃত্তিকায় ভাল হয় না। পেশোয়ার অঞ্চলে দাড়িম প্রচুর পরিমাণে জন্মে। যাহা বাজারে "বেদানা" নামে বিক্রীত হয়, উহাই পেশোয়ারজাত মধুর-দাড়িম। বোধ হয়, উহাই শাস্ত্রকারগণকথিত মধুর-দাড়িম।

ঐ সমস্ত পেশোয়ারানীত দাড়িমের মধ্যে অম্ল-দাড়িমও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আবার উহার ভিতর এমন অম্ল-দাড়িমও আছে, যাহা চরকোক্ত "রুক্ষাম্ল-দাড়িম"এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

এই ত গেল, দাড়িমের ফলের কথা। এখন দেখা যাউক, ইহার আর কোন্ কোন্ অংশ আমাদের প্রয়োজনীয়।

বীজ।—প্রমেহরোগে দাড়িমাদ্যঘৃতে ইহার বীজ আবশ্যক। "দাড়িমস্য তু বীজানি" ইত্যাদি।

ফলত্বক্।—অতীসার, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগে ইহার ফলত্বক্ যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। অতীসারে কুটজ-দাড়িমকষায়, গ্রহণীতে দাড়িমাষ্টক, অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর-লবণ প্রভৃতি ঔষধে দাড়িমের ফলত্বক্ নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

পুষ্প।—দাড়িমের পুষ্প বিশেষ স্তম্ভক। নাক দিয়া রক্ত পড়িলে ইহার পুষ্পের রস নস্যরূপে আকর্ষণে বিশেষ উপকার হয়।

"নস্যং তথা দাড়িমপুষ্পতোয়ম্।"

(চ, রক্তপিত্তচিকিৎসা।)

"নস্যং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্ব্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ।"

(চক্রদত্তঃ।)

মূল।—দাড়িমের মূলের ছাল ক্রিমিনাশক।

নব্যমত।—পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন, কেবলমাত্র দাড়িমের মূলের ত্বক্ই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য। ইহাতে শতকরা ২ ভাগ Pelletierine ও শতকরা ২২ ভাগ Punicotanic Acid এবং অন্যান্য সারাংশ আছে। দাড়িমমূল ক্রিমি-নাশক। ইহার কষায়ের মাত্রা এক ছটাক, অধিকমাত্রায় বমন ও বিরেচন হয়; মাত্রা অত্যধিক হইলে বিষক্রিয়া হয়। এই কষায় গলার ক্ষতে বিশেষ উপকারী।
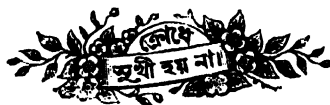
বৈষ্ণবধর্ম্ম।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

গতবারে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মকারণ আলোচনা করিয়াছি। ভক্তিধর্ম্মপ্রচারের জন্য অদ্বৈত মহাপ্রভুর ঐকান্তিক আহ্বানে ভগবান্ মানবশরীর ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদর্শনে তাহাই বলে। আমরাও সেই বৈষ্ণবদর্শনের নিগূঢ়তত্ত্ব মহাপ্রভুর শ্রীমুখবাণী হইতেই প্রথমে গ্রহণ করিতে পারিয়াছি। হরিনামের যে কি মাধুর্য্য এবং ঐ নামের যে কি প্রভাব, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; মহাপ্রভুই প্রথমে ঐ নামপ্রভাব বাঙ্গলায় প্রদান করিয়াছিলেন।

বিষ্ণু-আরাধনা হিন্দুর নূতন নহে। হিন্দু যখন বিষ্ণুর নিকট যোড়হস্তে আপনার কল্পনা জানায়, তখন মুক্তকণ্ঠে বলে,—

"গতাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘসংসারবর্ত্মসু।
যেন ভূয়ো নাগচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন॥"

জন্মভয়ে ভীত জীব বিষ্ণুর নিকটে জন্ম-দুঃখনিবারণের জন্য কামনা করিয়া থাকে। হিন্দু-সাধনায় আমরা ইহাই দেখিতে পাই,—জীবমাত্রেই বৈষ্ণব। চিত্তে তাহারা প্রকৃতির সাধক, দৃশ্যে তাহারাই শৈব, কিন্তু সাধনায় তাহারা বৈষ্ণব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের ভোগবাসনা থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব সম্পূর্ণরূপে বাসনানুযায়ী ভোগের পরিতৃপ্তি না করিবে, ততক্ষণই জীব উপাস্যদেবতার নিকটে "দেহি দেহি" রব করিয়া থাকে। ভগবতীর সাধনায় আমরা লক্ষ্মী ও সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশ, ধন ও বিদ্যা, বল ও সিদ্ধি, এই চারি বস্তু দেখিতে পাই। এই চারি বস্তুর যাঁহারা আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারাই ভগবতীর সাধনা করিয়া থাকেন। ভোগের পরিসমাপ্তি হইলে তখন সাধক যোড়হস্তে "বিষ্ণুভক্তি প্রদান কর" উহাই যোগমায়ার নিকট প্রার্থনা করে। যে পর্য্যন্ত ভগবতী সাধককে বিষ্ণুভক্তি প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত কোন জীবই বিষ্ণুর সাধনা করিতে পারে না। তন্ত্রমন্ত্রের কত ক্ষণ দরকার, না যত ক্ষণ ভোগের দরকার। ভোগের অতীত হইলে ভগবতীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া জীব বলে,—

"বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।"

শ্রীরাধা মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার অধিকার তো পান নাই। তাই সহচরিগণসঙ্গে কাত্যায়নী-মন্দিরে গিয়া "আমায় কৃষ্ণ দাও, কৃষ্ণ দাও" বলিয়া ভগবতীর নিকটে প্রার্থনা করেন। কাত্যায়নীর কৃপা হইলে তবে গোপিকাগণ জগৎপতি শ্রীপতিকে পতি পাইয়াছিলেন। যতক্ষণ সংসারবাসনা, আমার স্বামী, আমার পুত্র, আমার দেহ, আমার রূপ, আমার যৌবন, আমার ধন, এই আমার আমার রব থাকিবে, ততক্ষণ ভগবান্‌কে পাওয়া যায় না। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ বলিয়া থাকেন,—"যে করে আমার আশ, করি তার সর্ব্বনাশ।" এই সর্ব্বনাশের ভয়ে সেই ভবভয়হারী শ্রীভগবানের চরণ পরিত্যাগ করিবার পথেই অগ্রসর হন। সর্ব্বনাশ শব্দের অর্থ—সকল বাসনার নাশ। সংসার-মোহে মুগ্ধ জীব তাহা না বুঝিয়া "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, ভার্য্যাং মনোরমাং দেহি"-রবে আপনার বাসনার তৃপ্তি করে।

সহস্র বৎসর পূর্ব্বেতে অথবা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের তিরোভাবের কিছুকাল পরে বাঙ্গালায় কর্ম্মকাণ্ডের প্রাদুর্ভাব হয়। তান্ত্রিক কাপালিকগণ ভক্তিমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মমার্গই গ্রহণ করেন। তাহার ফলে গৃহে গৃহে তন্ত্রোক্ত পঞ্চ মকারের এতটা প্রাবল্য হইয়া উঠে যে, উহাকে রোধ করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাহা হউক, জীবের মঙ্গলের জন্যই

"অসংখ্য ভক্তেরে করাইয়া অবতার।
শেষে অবতীর্ণা হইলা ব্রজেন্দ্রকুমার॥
প্রভুর আবির্ভাবপূর্ব্বে যত বৈষ্ণবগণ।
অদ্বৈতাচার্য্যের স্থানে করেন গমন॥
গীতা ভাগবত কহে আচার্য্য গোসাই।
জ্ঞান কর্ম্মের নিন্দা করে ভক্তির বড়াই॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-ভক্তির ব্যাখ্যান।
জ্ঞানযোগে তপোধর্ম্মে নাহি মানে আন॥
তাঁর সঙ্গে আনন্দ করেন বৈষ্ণবগণ।
কৃষ্ণ-কথা, কৃষ্ণ-পূজা, নাম সংকীর্ত্তন॥
কিন্তু সর্ব্বলোক দেখি কৃষ্ণ বহির্ম্মুখ।
বিষয়নিমগ্ন লোক দেখি পাইল দুখ॥
লোকের নিস্তারহেতু করেন চিন্তন।
কেমনে সর্ব্বলোকের হইবে তারণ॥
কৃষ্ণ অবতরী করেন ভক্তির বিস্তার।
তবে ত সকল লোকের হইবে নিস্তার॥
কৃষ্ণ অবতরীতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিয়া।
কৃষ্ণপূজা করে তুলসী গঙ্গাজল দিয়া॥

কৃষ্ণের আহ্বান করে, সঘন হুঙ্কার।
হুঙ্কারে আকৃষ্ট হইলা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
জগন্নাথ মিশ্রপত্নী শচীর উদরে।
অষ্ট কন্যা ক্রমে হ'ল জন্মি জন্মি মরে ॥
অপত্যবিরহে মিশ্রের দুঃখী হ'ল মন।
পুত্র লাগি আরাধিলা বিষ্ণুর চরণ ॥
তবে পুত্র জন্মিলা বিশ্বরূপ নাম।
মহাগুণজন নাম বলদেব ধাম ॥
বলদেব প্রকাশ পর ব্যোম সঙ্কর্ষণ।
তিঁহো বিশ্বের হয় নিমিত্ত উপাদান ॥

* * * *

চৌদ্দ শত ছয় শকে শেষ মাঘ মাসে।
জগন্নাথ শরীর দেহে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশে ॥"

এই তো মহাপ্রভুর জন্ম হইল। চারিশত বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় মোক্ষধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভগবান্ স্বয়ং জীব-দুঃখে দুঃখী হইয়া ধরায় আগমন করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের দুঃখবিমোচনের জন্য অর্থাৎ সংসার-বাসনা দূর করিয়া জীবকে পরমার্থ প্রদান করিবার জন্য ভগবানের কৃপার দরকার। এই কৃপা তিনি দান না করিলে জীব জগতে কৃপালাভ করিতে পারে না। তিনি নিজেই বলেন :—

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকে মামজমব্যয়ম্ ॥"
গীতা।

আমি লোক সকলের নিকট প্রকাশ হই না। যে হেতু আমি যোগমায়ার দ্বারা সর্ব্বদা আচ্ছন্ন হইয়া থাকি। মূঢ়-গণ আমার স্বরূপ জানিতে না পারিয়াই আমাকে জানিতে পারে না। ভগবান্ কৃপা না করিলে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না।

এই যে সৃষ্টি, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীব অতিমাত্র আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকে, উহার রহস্য না বুঝিতে পারিয়া জীবের যত কিছু দুঃখ উপস্থিত হয়। কারণ, জন্ম—অতি কঠোর দুঃখ ;—মূত্রক্লেদপূরিষপূর্ণ জননী-জঠর, পাক-স্থলীর কঠোর তাপ, কৃমিকীটের মুহুর্মুহু দংশন, এই সকল তাপে ক্লিষ্ট হইয়াও জীব যখন ভূমিষ্ট হয়, তখন এই নূতন জগতে আবার দুঃখভোগের আরম্ভ হয়। আবার মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ত দুঃখ, বাল্য যৌবন জরা জীবকে অনন্ত দুঃখ-রাশির ভিতরে ফেলিয়া পিষিয়া পিষিয়া মারে। জীব এই অনিবার্য্য দুঃখ দূর করিতে না পারিয়া "ত্রাহি মাং পুণ্ডরী-কাক্ষ" বলিয়া অনবরত চীৎকার দেয়। কর্ম্মে জীবের জন্ম। এই কর্ম্ম-বাসনার লোপ না হইলে জন্মেরও রোধ হয় না।

হরি—হরতি যঃ সঃ হরেঃ। হরতি, কি হরণ করেন? এই জন্ম-জরা-দুঃখ—এই মৃত্যু-দুঃখ নাশ করেন, এই বাসনার ক্ষয় করেন, এই জন্যই বিষ্ণুর অপর নাম হরি। যিনি জীবের দুঃখ হরণ করেন, জীব সাধারণ যে তাঁহাকেই প্রাণ ভরিয়া ডাকে, সংসারতাপে আকুল হইয়া জীব যখন যুক্তকরে "তনুমন করি সমর্পণ" হরি হরি বলিয়া ডাকে, তখন তাহার যে সর্ব্বদুঃখ দূর হয়, সেই হরিনাম দুঃখসন্তপ্ত জীবের জন্য প্রচারিত না হইলে তাহাদিগের দুঃখ দূর হইবে না। মহৎপ্রাণ, মহাপুরুষ শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই আকুল হইয়া নিয়ত ডাকিতেন। সেই ডাকে—যেমন প্রহ্লাদের ডাকে—নর-সিংহদেব স্ফটিকস্তম্ভ হইতেও আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেইরূপে শচীগর্ভরূপ জ্যোতির্ম্ময় আগার হইতে জগৎ-উদ্ধারকর্ত্তা—জগদস্রষ্টা মানবরূপে মানবের ন্যায় লীলাময় দেহধারণ করিয়া মানবের দুঃখ দূর করিতে জগতে আগমন করিলেন।

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

রামের বনগমনের ইতিহাস পড়িয়া আমরা প্রবাসের দুঃখ ভুলি, পাণ্ডবের নির্য্যাতনের ইতিহাস পড়িয়া আমরা সামান্য অভাবাদির দুঃখ ভুলি, যিশুর শোচনীয় আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করিয়া আমরা শোক ভুলি। এমনই করিয়া মহাপুরুষেরা জগদ্বাসীর কল্যাণের জন্য "আপনি আচরি ধর্ম্ম" জীব-গণকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। এই জগতে আমরা সুখী হইতে চাহি। যে কয়টা দিন এই স্থানে থাকিতে হইবে, সেই কয়টা দিন যাহাতে সুখে যায়, শান্তিতে কাটে, উহাই জীব চায়। কিন্তু নিত্য দ্বন্দ্ব, নিত্য কোলাহল, নিত্য বাসনার তাড়না, এই সকলের অত্যাচারে জীব শান্তি পায় না। জীবকে শান্তি দিবার জন্য, জীবের দ্বন্দময় জীবনকে শান্ত করিবার জন্য, জীবের বাসনাপহত লুব্ধচিত্তের বীভৎস সূচনা-গুলিকে নষ্ট করিবার জন্য এবং জীবের 'স্বীয় শক্তি বলিয়া কিছুই নাই', তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ বা সৃষ্টিকর্ত্তা আপনি আপনার সৃষ্টি জীবের ন্যায় দেহধারণ করিয়া জগতে আগমন করেন। ইহাকেই আমরা অবতার বলি।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু অবতার কি না, তাহা লইয়া ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটা বাদ-বিসম্বাদ চলে, অনেকেই তাঁহাকে অবতার বলিয়া মান্য করিতে চাহে না। "ন চ পূর্ণ ন চাংশক" ইহাই অনেকের ধারণা। সাধকের ভাষায় বলিতে গেলে এ কথা বলা চলে কি না, সে কথা সাধক বলিতে পারেন। গৃহস্থের পক্ষে—সংসারীর পক্ষে সে কথা খাটে না। সংসারী আপনার স্বরূপ অনুযায়ী অন্যের রূপ গড়ে। আপনার কাল ছেলেটির "সোণার চাঁদ" নাম রাখিয়া সুন্দর ছেলের আকাঙ্ক্ষা মিটায়। সংসারীর বিচার-বিবেচনা আপনার সংসারের স্বার্থের ভিতরে আবদ্ধ। সীমাবদ্ধ জ্ঞানের সাধনা যে করে, সে কখন অসীমের জ্ঞানের কোন অন্ত পায় না। ক্ষুদ্র সংসারের ভিতরে তাঁহার চিন্তাশক্তি আপনার বাসনার

বস্তুগুলিকে খুঁজিয়া বেড়ায়,সে কখনও অনন্ত সংসারের অণু-পরমাণুর তত্ত্ব খুঁজিয়া বেড়াইতে পারে না। অতএব বিরাটের সম্বন্ধে তাহার ধারণা সর্ব্বদাই ভুলভ্রান্তিতে পূর্ণ হওয়াই স্বাভাবিক।

আমি নিজে তান্ত্রিক। মাতৃশক্তির উপাসক। যাঁহার গর্ভে জন্ম লইয়াছি, যাঁহার স্তন্যপান করিয়াছি, তাঁহাকেই আমি প্রথম দেবী বা উপাস্য বলিয়া জানি এবং যিনি এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গর্ভে ধারণ করিয়া নিয়ত প্রসব করিতেছেন, যিনি স্বীয় শক্তিদ্বারা দশদিক্ উজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি সর্ব্বভোগৈশ্বর্য্যের আধার জননী, যতক্ষণ আমি সংসারী, ততক্ষণ সেই মারই উপাসনা করিব। তাই বলিতেছিলাম, তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে আমি নিজেও বিচার করিয়া কেন আজ শচীনন্দনের ঈশ্বরত্ব প্রচার করিতেছি, তাহাই প্রথম বলিব।

ঐশ্বর্য্যভোগই যদি সুখ হইত, তাহা হইলে কোন জীবই দুঃখী হইত না। এই ঐশ্বর্য্যভোগের ভিতরে দেখিলাম কত জন্ম চলিয়া গিয়াছে, ভোগের পর ভোগ করিয়াও ভোগ নিবৃত্তি হয় নাই, বরং ভোগ কেবল দুঃখই ভোগ হইতেছে। মায়ের কৃপায় জগতের সকল ভোগ করিলাম,কিন্তু এই ভোগের পরিসমাপ্তি না হইলে বাত্যাতাড়িত পত্রের ন্যায় যে আবহমানকাল কেবল এই সংসারচক্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাতর হইব, তাই মায়ের নিকট ভোগের সমস্ত পাইবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া ভোগবিনাশের জন্য লালায়িত হইয়াছি এবং এই বাসনার অন্তে যিনি স্থান দিতে পারেন, অনন্তকাল যেখানে বসিয়া শান্তিভোগ করিতে পারিব, সেই পরম পদার্থের অন্বেষণেই আকাঙ্ক্ষিত হইয়া পড়িয়াছি।

এমনই করিয়া জীব আপনার অপরাশান্তির জন্য পন্থা খোঁজে। তখন শান্তিদাতার তত্ত্বই সে জানিতে চাহে। পরমতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে জীবের তত্ত্বজ্ঞান হয়।
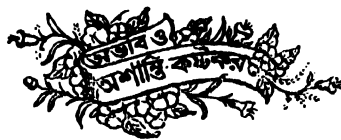
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উক্তি।

দুর্গা ও ব্রহ্ম।

(১) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—"ব্রহ্মও যিনি, শক্তিও তিনি; দুই এক, একই দুই। দুর্গা, কালী সবই শক্তির নাম। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনি লীলা কর্‌চেন, তাই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্চে। ব্রহ্মই বল আর দুর্গাই বল, কেবল নামের তফাৎ, বস্তু সেই এক।"

ব্রহ্মে শক্তিতে ভেদ নাই। শক্তিকে ছাড়িয়া ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। একটা মান্‌লেই আর একটাকে মান্‌তে হয়। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। মনে কর,—দুধ। দুধের কথা ভাব্‌তে গেলে তাহার সেই ধবো-ধবো রঙ্গের কথা মনে আস্‌বেই আস্‌বে। দুধের রংটা ছেড়ে দুধের কথা ভাবা যায় না,—আবার দুধকে বাদ দিয়ে দুধের রংটাকেই কেবল ভাবা যায় না। আগুনের দাহিকা-শক্তিকে ছেড়ে আগুনের কথা ভাবা যায় না,—আবার আগুনকে বাদ দিয়ে আগুনের দাহিকাশক্তি মনে ভাবা যায় না। সূর্য্যকে ছাড়িয়া কেবল সূর্য্যের কিরণকে ভাবা যায় না,—কিরণকে ছেড়ে সূর্য্যকে চিন্তা করা যায় না। তেমনই আদ্যাশক্তিকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না,—আবার ব্রহ্মকে ছেড়ে দিয়ে আদ্যাশক্তিকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা চিন্তা করা যায় না,—আবার লীলাকে ছেড়ে নিত্যকে মনে ধরা যায় না। তবে যখন আমরা দার্শনিক হ'য়ে ভাবি যে, তিনি কোন কাজ কচ্চেন না,—তখনই তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি; আর যখন ভাবি যে, তিনি সবই কচ্চেন,—তখন তাঁহাকে কালী বলি। কেবল নামরূপের ভেদ বৈ আর কিছুই নয়। সবই এক।

আদ্যাশক্তির লীলাই সব।

(২) আমরা যাঁহাকে মা বলি, কালী বলি, দুর্গা বলি, শিবা বলি, সবই সেই মা। মা নানাভাবে লীলা করেন। যখন সৃষ্টি ছিল না, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্র ছিল না, দিন-রাত্রি ছিল না, পৃথিবী ছিল না, চারিদিকে নিবিড় ঘুটঘুটে আঁধার ছিল, তখন মা মহাকালী—নিরাকারা মহাকালী মহাকালের অঙ্কে বিরাজ কর্‌ছিলেন। তখন সব নিরাকার বা একাকার ছিল। মায়ের সেই সময়ের নাম মহাকালী। শ্যামাকালীর ভাবটা অনেকটা কোমল। তিনি বরাভয়-দায়িনী। গৃহস্থের বাড়ীতে এই শ্যামাকালীরই পূজা হয়। আবার গৃহস্থরা রক্ষাকালীর পূজা করিয়া থাকে। যখন দেশে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি উৎপাত ঘটে, তখন রক্ষাকালীর পূজা দিতে হয়।

ছেলেপুলের ব্যারাম হ'লে লোক, রক্ষাকালীর পূজা মানস করে। আবার যখন মা সংহার করেন, তখন তিনি শ্মশান-কালী হন। তখন তাঁর সংহারমূর্ত্তি। তাঁহার চারিদিকে কেবল শব শিবা ডাকিনী যোগিনী থাকে। তখন তিনি মহাশ্মশানে থাকেন। তখন তাঁহার মুখে রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে নরহস্তের কোমরবন্ধ, হাতে রক্তমাখা খাঁড়া। ফলে এই জগতের সবই শক্তির লীলা।

জগতে একবার সৃষ্টি হচ্চে, আবার একবার প্রলয় হচ্চে ও প্রলয়ের পর আবার তিনি সৃষ্টি ক'চ্চেন। কেমন ক'রে আবার সৃষ্টি করেন, জান? যখন মহাপ্রলয় হয়, মা যখন সৃষ্টি-সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলেন, তখন তিনি সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রেখে দেন। গিন্নীদের যেমন এক একটা ন্যাতাক্যাঁতার হাঁড়ি থাকে, আর হাঁড়িতে গিন্নী যেমন পাঁচ রকম দরকারী জিনিষ কুড়িয়ে রাখেন, সেই রকম মা'ও সকল সৃষ্টপদার্থের বীজ কুড়িয়ে রাখেন। যা'রা পাকা গিন্নী, তারা ন্যাতাকাঁতার হাঁড়িতে নীলবড়ি, সমুদ্রের ফেনা, কালমেঘ, লাউবিচি, শশাবিচি, কুমড়োর বিচি, মুথো প্রভৃতি সব দরকারী জিনিষ ছোট ছোট পুঁট্‌লি করে তুলে রাখে। যখন সে জিনিষটির দরকার পড়ে, তখন ঠিক সেই জিনিষটিই বা'র করে দেন। মা'ও প্রলয়ের পর আবার সৃষ্টির ঠিক তাহাই করেন।

সৃষ্টির পর মা এই সৃষ্ট সংসারটা আগুলিয়া থাকেন। তিনি এই জগৎটা প্রসব করেন, আবার জগতের ভিতরেই থাকেন। বেদে উর্ণনাভির কথা আছে। উর্ণনাভি মাকড়সা। মাকড়সা তার ভিতর থেকে জাল বা'র করে। জাল রচনা হ'লে নিজেই সেই জালের ভিতর থাকে। মা-ও সেইরূপ জগতের ভিতর থাকেন, আবার জগৎও মায়ের ভিতর থাকে। মা জগতের আধারও বটেন, আধেয়ও বটেন, মা-ই সব।

মা কি কালো?

(৩) দূরে তাই কালো, জান্‌তে পার্লে জগৎ আলো।

মা কালো নয়, তবে দূরে হ'তে কালো বোধ হয়। মায়ের নিকটে আসলে আর কালো বোধ হয় না, তখন মায়ের রূপে হৃদ্‌পদ্ম আলো হয়—জগৎ আলো হয়। দূর হ'তে আকাশ দেখ্‌তে নীলবর্ণ বোধ হয়, কাছে গেলে কোন বর্ণই নাই। সাগরের জল দূর হতে নীলবর্ণ বোধ হয়, নিকটে যাইয়া হাতে তুলিয়া সেই জল দেখ, তাহার কোন রংই নাই। সেইরূপ দূর থেকে মা'কে কালো বোধ হয়, নিকটে গেলে মা'কে কালো মনে হয় না।

গান।

(৪) ভগবান্ রামকৃষ্ণদেব প্রায়ই রামপ্রসাদ প্রভৃতি সাধকগণের গান গাহিতে গাহিতে ভাবে বিভোর হইয়া সমাধিপ্রাপ্ত হইতেন। কতকগুলি গান তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল। নিম্নে কয়টি গান প্রদত্ত হইল:—

প্রসাদী সুর—একতালা।

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালী-কল্পতরুতলে গিয়ে, চা'র ফল কুড়ায়ে খাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
(ও মন) বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্ত্বকথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিবাঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতা মাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় মন, ধৈর্য্য খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ খোঁটায় বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞান-খড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূর হ'তে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥
প্রসাদ বলে এমন হ'লে কালের কাছে জবাব দিবি।
তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মত মনরে হবি॥

তিনি বলিতেন,—আমি মায়ের কাছে কেবল ভক্তি চেয়েছিলাম; মাকে ব'লেছিলাম,—আমি পাপ চাই না, পুণ্য চাই না, জ্ঞান চাই না, বুদ্ধি চাই না, অজ্ঞান চাই না, শুচি অশুচি কিছুই চাই না, চাই কেবল ভক্তি। তুমি ধর্ম্ম অধর্ম্ম সবই লও, দাও কেবল ভক্তি। তিনি আরও বলিতেন, ভগবানের নাম করিলে দেহ মন পবিত্র হয়, ভক্তির উদয় হয়।

আর একটি গান গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেন। সে গানটি এই—

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়?
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়।
দান যজ্ঞ ব্রত আদি আর কিছু না মনে লয়।
মদনেরই যাগ যজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গাপায়॥
কালী নামের এত গুণ কেবা জান্‌তে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥
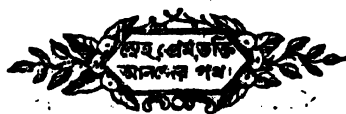
যোগশাস্ত্র।

Mental and Physical Exercise—মানসিক ও দৈহিক ব্যায়াম।

[শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী লিখিত।]
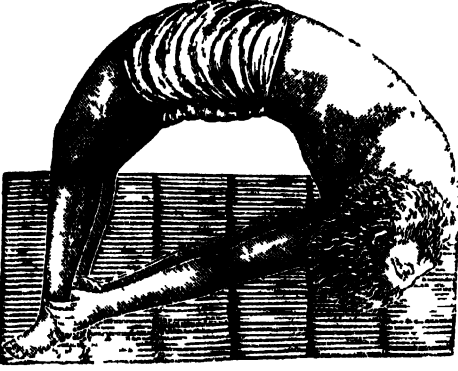
(১০) ধনুরাসন।

প্রসার্য্য পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ,
করৌ চ পৃষ্ঠে ধৃত পাদযুগ্মম।
কৃত্বা ধনুস্তুল্যপরিবর্ত্তিতাঙ্গং,
নিগদ্য যোগী ধনুরাসনং তৎ॥

ভূমিতে দণ্ডসদৃশ সমানভাবে পাদদ্বয় প্রসারিত করত পৃষ্ঠভাগ দিয়া উভয় হস্তদ্বারা ঐ চরণদ্বয় ধারণ করিয়া এবং শরীর ধনুর তুল্য বক্র করিয়া রাখিলে, তাহাকেই যোগীরা ধনুরাসন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই আসন অভ্যাসদ্বারা শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি বৃদ্ধি পায়।
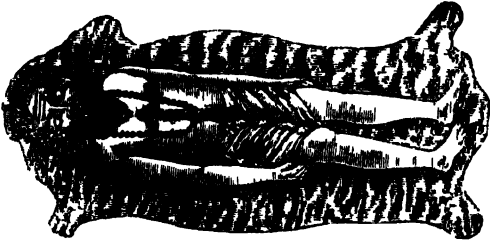
(১১) মৃতাসন বা শবাসন।

উত্তানশববদ্ভূমৌ শয়ানান্তু শবাসনম।
শবাসনং শ্রমহরং চিত্ত বিশ্রান্তিকারকম্॥

শবতুল্য ভূতলে শয়ন করিলেই মৃতাসন বা শবাসন সাধিত হইয়া থাকে। এই আসন অভ্যাসদ্বারা হঠযোগ সাধনে যে পরিশ্রম হয়, তাহা বিদূরিত হইয়া যায়; বিশেষতঃ ইহা দ্বারা চিত্তও শ্রান্তিসুখ বোধ করে।

(১২) গুপ্তাসন।

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃত্বা পাদৌ চ গোপয়েৎ।
পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুহ্যং গুপ্তাসনং বিদুঃ॥

জানুযুগলের মধ্যস্থলে পদদ্বয় গুপ্তভাবে রাখিয়া ঐ পদদ্বয়ের উপর গুহ্য রাখিলেই গুপ্তাসন হয়। এই আসন অভ্যাসদ্বারা মনের চঞ্চলতা নষ্ট হয়।

(১৩) মৎস্যাসন।

মুক্তপদ্মাসন কৃত্বা উত্তানশয়নং চরেৎ।
কূর্পরাভ্যাং শিরোবেষ্ট্য মৎস্যাসনন্তু রোগহা॥

মুক্তপদ্মাসন করিয়া কনুইদ্বারা মস্তক পরিবেষ্টন করতঃ উত্তানভাবে শয়ান হইলেই মৎস্যাসন হয়। ইহা সর্ব্বরোগ দূর করে।

(১৪) মৎস্যেন্দ্রাসন।

উদরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্নতঃ।
নম্রাঙ্গ বামপাদং হি দক্ষজানূপরি ন্যসেৎ॥
তত্র যাম্যং কূর্পরঞ্চ যাম্যং করে চ বক্ত্রকম্।
ভ্রুবোর্মধ্যে গতাং দৃষ্টিং পীঠং মৎস্যেন্দ্রমুচ্যতে॥

উদরদেশ সরলভাবে রাখিয়া যত্নপূর্ব্বক অবস্থান করিয়া বামচরণ নত করতঃ দক্ষিণ জানুর উপর রাখিবে ও তদুপরি দক্ষিণ কনুই স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের উপর মুখ রাখিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে দর্শন করিবে। ইহাই মৎস্যেন্দ্রাসন বলিয়া কথিত। যোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ এই আসনপ্রভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই আসনবিশেষ সিদ্ধাসন বলিয়া প্রচার করেন। ইহা যোগীদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য আসন বলিয়া খ্যাত।

মৎস্যেন্দ্রাসনে বসিবার প্রতিকৃতি।

জৈনমতের স্বরূপ।

[ব্রহ্মচারী শ্রীযুত দুর্গাদাস কর্ত্তৃক লিখিত।]

অনাদিকাল হইতে সংসারে দুইপ্রকার কাল নির্দ্দেশ আছে। এক অবসর্পিণী ও দ্বিতীয় উৎসর্পিণী। প্রতিদিন আয়ু, বল, অবগাহনা-প্রমুখ সর্ব্ববস্তু যাহাতে ঘটে, তাহাকেই অবসর্পিণী কহে; আর যাহাতে সর্ব্ববস্তুর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে উৎসর্পিণীকাল কহে।

এই পূর্ব্বোক্ত দুই কালই ছয় ছয় ভাগে বিভক্ত। যেমন অবসর্পিণী—প্রথম সুখম্ সুখম্ ১, সুখম্ ২, সুখম্ দুঃখম্ ৩, দুঃখম্ সুখম্ ৪, দুঃখম্ ৫, দুঃখম্ দুঃখম্ ৬। আর ঠিক উহার উল্টা যাহা, তাহাই উৎসর্পিণী। এই প্রকারে অনাদি অনন্তকাল হইতে কালের এই প্রবৃত্তি চলিয়া আসিতেছে।

এইরূপে প্রত্যেক অবসর্পিণী ও উৎসর্পিণীকাল দুই তিন চারি প্রভৃতিক্রমে চব্বিশ পর্য্যন্ত আগত হইয়াছে। আর ঐ এক এক কালে এক জন অর্হন তীর্থঙ্কর অর্থাৎ সত্যধর্ম্মপ্রকাশকারী মহাত্মা উৎপন্ন হইয়াছেন। (ঠিক হিন্দুমতে প্রতিকল্প ও মনুবিভাগ যেমন)

যিনি ধর্ম্মজগতে বিশ প্রকার কৃত্যাকর্ত্তা, তিনিই ভবসংসার হইতে মুক্তি দিবার এক জন তীর্থঙ্কর। ঐ তীর্থঙ্কর যাঁহারা বা যিনি ধর্ম্মে কৃত্যাকর্ম্মা।

এখন দেখিব, বিশ কৃত্যাকর্ত্তা কি?—যাহা সাধ্য বা আয়ত্ত করিলে যিনি তীর্থঙ্কর হইতে পারেন, এবার তাহার ব্যাখ্যা করিব।

১। অরিহংত, ২। সিদ্ধ, ৩। প্রবচন অর্থাৎ শ্রুতবান্ সংঘ, ৪। গুরু—ধর্ম্মোপদেশক, ৫। স্থবির, ৬। বহুশ্রুত, ৭। অনশনাদি বিচিত্র তপকারী অর্থাৎ সামান্য সাধু, ৮। এই যে উপরে সাত অবস্থা ব্যক্ত করিলাম এই সাতকে যিনি স্নেহ করেন এবং যথাবস্থিত গুণকীর্ত্তন করেন, যথাযোগ্য পূজাভক্তি করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর উপাধিলাভ করিতে পারেন। ঐ পূর্ব্বোক্ত সাত প্রকার পদের বারংবার জ্ঞানোপযোগ করেন, তিনিই তীর্থঙ্কর পদলাভ করিতে পারেন। ৯। দর্শন সম্যকত্ব, ১০। জ্ঞানাদি বিষয় বিনয়, ১১। দর্শন সম্যকত্ব ও জ্ঞানাদি বিষয় বিনয়ে যিনি অতিচার করেন না, অবশ্যকর যোগ্য সংযমব্যাপারাদি কার্য্যেও যিনি অতিচার করেন না, ১২। মূল গুণ উভয় গুণের সহিত অতিচার করেন না, ১৩। ক্ষণলবাদি কালের সংবেগ ভাবনা এবং ধ্যান সেবন করেন, ১৪। তপ করেন ও সাধুদিগকে উচিত দান করেন, ১৫। দশ প্রকার বৈয়াবৃত্ত করেন, ১৬। গুরু আদির কার্য্যদ্বারা চিত্তে সমাধি অবস্থা আনয়ন করেন, ১৭। অপূর্ব্ব জ্ঞান গ্রহণ করেন, ১৮। শ্রুত ভক্তিযুক্ত

প্রবচন সকলের প্রভাবনা করেন, ১৯। শ্রুত বিষয়ের বহুমান্য করেন, ২০। যথাশক্তি দেশপর্য্যটন, তীর্থযাত্রাদিদ্বারা প্রবচন সকলের প্রভাবনা করেন।

এই যে বিংশতি প্রকার বিষয়ের কথা লেখা হইল, এই সকল পদের উপযুক্ত সেবক যিনি, তিনিই তীর্থঙ্কর উপাধি পাইয়া থাকেন। এই সকল তত্ত্ব শ্রীজ্ঞাতাসূত্রে রহিয়াছে।

যিনি তীর্থঙ্কর, তিনি নির্ব্বাণ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হন, পুনরায় তাঁহাকে সংসারে আসিতে হয় না। যাঁহারা এই সকল ধর্ম্মকৃত্যগুলি সমাপন করিয়া পূর্ব্বে তীর্থঙ্কর হইয়াছেন ও ভবিষ্যতে তীর্থঙ্কর হইবেন, সকলেই এক প্রকার জ্ঞানের কথাই বলিবেন।

তীর্থঙ্করেরা দুই প্রকারের ধর্ম্মবাক্য বলেন। এক—শ্রুতধর্ম্ম, দ্বিতীয়—চরিত্রধর্ম্ম।

শ্রুতধর্ম্ম দ্বাদশাঙ্গবিশিষ্ট ও চরিত্রধর্ম্ম সাধুলোক ও গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম।

শ্রুতধর্ম্মে নয়টি তত্ত্ব, ষড়দ্রব্য, ষড়কায়, চারি গতি রহিয়াছে।

নব তত্ত্ব।

জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রব, সংবর, নির্জ্জরা, বন্ধ, মোক্ষ, এই নয়টি তত্ত্ব।

এই নব তত্ত্বের সম্যক্ ব্যাখ্যা জৈন্যধর্ম্মপ্রবন্ধে গত বারে প্রকাশ করিয়াছি।

ষড়দ্রব্য।

ধর্ম্মাস্তিকায়—জীব ও পুদ্গল প্রভৃতির চলিবার সাহায্যকারী যাহা, তাহাই ধর্ম্মাস্তিকায়, যেমন মৎস্যের চলিবার জন্য জল।

অধর্ম্মাস্তিকায়—জীব ও পুদ্গলের স্থিতিতে সহায়কারী, যেমন রাস্তাতে পথিকদিগের আশ্রয়স্থল বৃষ।

আকাশাস্তিকায়—সর্ব্বপদার্থগুলি থাকিবার অবকাশ দেয়, যেমন মাটির জালা।

জীবাস্তিকায়—চৈতন্যাদিলক্ষণযুক্ত প্রথমবস্তুসম্বন্ধে জীবতত্ত্বে উল্লেখ করিয়াছি।

পুদ্গলাস্তিকায়—কারণরূপ পরমাণু হইতে লইয়া সর্ব্বকার্য্য—রূপ, বর্ণ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, শব্দ, ছায়া, আতপ, খদ্যোৎ, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা, নরক, স্বর্গাদি যে স্থানে তথা পৃথিবীকায় শরীর এবং জল, অগ্নি, পবন, বনস্পতি, শরীর, ঐ সকলই যাহা পূর্ব্বে বলা হইল, পুদ্গলাস্তিকায়ের কার্য্য। এই পুদ্গলাস্তিকায় হইতেই এই দৃশ্যমান্ জগতের বস্তু সকলের পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হয় এবং বিচিত্র প্রকার বস্তু সকলও উৎপন্ন হয়। এই নব দ্রব্য হইতে যাহা পুরাতন, জগতে ব্যবস্থা করিয়াছে, সে সকল কালদ্রব্য।

জৈনমতে ছয় বস্তুর জীবের সহিত এক সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। উহাকে ষট্কায় বলে। এখন তাহার ব্যাখ্যা করিব।

পৃথিবীকায়, আপ্কায়, তেজস্কায়, বায়ুকায়, বনস্পতিকায়, ত্রসকায়,—এই ষট্দ্রব্য।

ইহার মধ্যে যাহা পৃথিবী, তাহা একেন্দ্রিয় অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয়সম্পন্ন অসংখ্য জীবদ্বারা এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর যে ভাগের উপর অগ্নি, ক্ষার, তাপ ও শীতোষ্ণাদি একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই ভাগের জীবেরই মৃত্যু হইয়া থাকে। আর তিন ভাগের জীবের শরীর ক্ষয় হয় না। ঐ তিন ভাগকে অচিত্ত পৃথিবী কহে। এই পৃথিবী—যাহাতে আমরা বাস করিতেছি, এ স্থানে সময়ে সময়ে অসংখ্য জীব উৎপন্ন হয় এবং অসংখ্য জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এই পৃথিবী অনাদি অনন্তকাল এই ভাবেই রহিবে। চন্দ্র, সূর্য্য, তারকাদিও অনন্তকাল এইভাবে জগতে রহিবে।

এখন আপ্কায়িক কাহাকে বলে, তাহা দেখিব। জলদ্বারা যে সকল জীবের শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে আপ্কায়িক জীব কহে। জগতে যত জল আছে, উহা আর কিছু নহে, অসংখ্য জীবপিণ্ড বা শরীর মাত্র। তাহারা অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। অগ্নিদ্বারা জল সংশোধিত বা জলে অগ্নিসংস্পর্শ হইলে উহাকে অচিত্ত আপ্কায় কহে। নতুবা সর্ব্বজলই সজীব।

তেজস্কায়—অগ্নিই তেজস্কায়। ঐ অগ্নিও অসংখ্য জীবপিণ্ড বা শরীর মাত্র। অগ্নির মধ্যস্থ জীবের মৃত্যু হইলে ঐ সকল জীবদেহের ভস্মাদি রহিয়া যায়।

পবন বা বাতাসও অসংখ্য জীবপিণ্ড বা শরীর। এই চাক্ষুষ নেত্রাদিদ্বারা পবনস্থ জীবমণ্ডলীকে দেখা যায় না। আর পাখা-আদি হইতে উৎপন্ন যে পবন, তাহাতে কোন জীব থাকে না। কারণ, উহা আসল বা প্রকৃতি পবন নহে। কিন্তু পাখা-আদি অর্থাৎ পাখার চালনাদ্বারা যে পবন উৎপন্ন হয়, উহাতে পুদ্গল হইতে পবনসদৃশ পরিণামের সত্তা পাওয়া যায় বলিয়াই উহা হইতে পবনের বা বাতাসের সত্তা অনুভব করা যায়।

বনস্পতিকায়—কন্দমূলাদি-প্রমুখ যে সকল বনস্পতি, উহাতে অনন্ত জীব রহিয়াছে; আর যাহা বৃক্ষাদি বনস্পতি, তাহাতেও অসংখ্য জীব রহিয়াছে; যে বনস্পতিতে অগ্নি-আদি সংযোগ করা যায় অথবা শুকাইয়া যায়, ঐ বনস্পতিও জীবের শরীর। কিন্তু তিন পদার্থে বা বনস্পতিতে জীব থাকে না।

পূর্ব্বোক্ত পৃথিবী, আপ্, তেজ, বায়ু, বনস্পতি,—এই পাঁচটি মাত্র স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। এই পঞ্চকায়ে বসতিবশতঃ জীবগণকে একেন্দ্রিয় জীব কহে। জৈনপ্রজ্ঞাপনাসূত্রে উহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। আচারাঙ্গসূত্রে এই পাঁচ প্রকার জীবের সিদ্ধিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। এই

পাঁচ প্রকার জীব সময়ে অসময়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হয় এবং পুনরায় উৎপন্নও হইয়া থাকে।

জৈনগ্রন্থমতে এই যে একেন্দ্রিয় জীব, উহারা পৃথিবীর অণুপরমাণুতে, জলের অণুতে পরমাণুতে, তেজের অণুপরমাণুতে, বায়ুর অণুপরমাণুতে এবং বনস্পতির অণুপরমাণুতে সর্ব্বদা লিপ্ত রহিয়াছে।

পৃথিবী বা ভূমির প্রতি অণুপরমাণু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, মাটি আর কিছুই নহে, কতকগুলি জীবসমষ্টি মাত্র। সেইরূপ জল, তেজ, বায়ু ও বনস্পতিসকলও কেবল জীবসমষ্টি মাত্র। জৈনমতে জল ও অগ্নি জীবপিণ্ড মাত্র। অসংখ্য জীবদেহের সমষ্টিই আপ্ বা জল। কিন্তু অগ্নিসহযোগে জলের ঐ সকল জীব নষ্ট হইয়া গেলে উহাকে অচিত্ত আপ্ বলে। অগ্নিও অসংখ্য জীবদেহ মাত্র।

এখন ত্রস্‌কায় জীবসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিব। জৈনমতে দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয়, পঞ্চেন্দ্রিয়, এই জাতি জীবকে ত্রস্‌কায় জীব কহে।

পৃথিবী, জল, অগ্নি, পবন, এই চারি তত্ত্বকে চারি ভূত বলিয়া অন্যে মান্য করে, কিন্তু জৈনমতে—জৈনদর্শনে তাহা মানে না। জৈনমতে পাওয়া যায় যে, এই ভূতসমষ্টিই উপরে যাহা ব্যক্ত করিয়াছি—তাহাই; ঐ পঞ্চকায় হইতে অসংখ্য জীবশরীর রচনা করিতেছে।

এই স্থানে বলিয়া রাখা ভাল যে, হিন্দুদর্শনেও পঞ্চভূতের অস্তিত্বই মান্য করে। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। জৈনদর্শনে উহাকেই পৃথিবীকায়, আপ্‌কায়, তেজকায়, বায়ুকায় ও বনস্পতিকায় বলা হয়।

সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে এই পঞ্চ পদার্থদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে এবং জীবসকল ঐ প্রবাহমুখে পড়িয়াই মরে আর ঐ পঞ্চ হইতেই আবার নূতন দেহ ধারণ করিয়া—কেবল পর্য্যায় বদল করিয়া—নূতন জীব উৎপন্ন হয়। কর্ম্মদ্বারাই উহারা বিচিত্র প্রকারের রঙ্গ ও রূপ ধারণ করে। উহাদের শরীরে যে পরমাণুসকল রহিয়াছে, উহাই অনন্ত প্রকারের অনন্ত শক্তি।

জৈনদর্শন বনস্পতিকায় ও পৃথিবীকায়কে দুইটি পৃথক্ পদার্থ বলে। ঐ পৃথক্ পদার্থে যে অসংখ্য জীবপিণ্ড রহিয়াছে, উহারাই মরিয়া আবার নানা জীবশরীর ধারণ করে, উহাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পদার্থ বা তত্ত্ব পরস্পর মিলনের দ্বারা জগতে অনেক প্রকার কার্য্য উৎপন্ন করে।

কাল ১, স্বভাব ২, নিয়তি ৩, কর্ম্ম ৪, উদ্যমপূর্ণ পরস্পরের প্রেরণা ৫,—এই যে পাঁচ শক্তি, উহারা পূর্ব্বোক্ত পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া জগতে অনাদিকাল হইতে অনন্ত প্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছে। (এই স্থানে জৈনতত্ত্ব কতকগুলি জটিল কথায় পূর্ণ রহিয়াছে; উহারা সৃষ্টিপ্রবাহকে মান্য করে। কিন্তু বৈদিকগ্রন্থে সৃষ্টিপ্রবাহসম্বন্ধে যে তথ্য পাওয়া যায়, তাহার সহিত কেবল শব্দের মারপ্যাঁচ রাখিয়াই আপনাদের মত ব্যক্ত করিয়াছে বুঝা যায়।) ঐ যে পাঁচ শক্তির কথা উপরে বলিলাম, উহারা জড়-চৈতন্যের অন্তর্ভূত ও পৃথক্ নহে। এই জন্যই এই জগতের নিয়মাদি-নিয়ন্তা অর্থাৎ কর্ত্তা কোন ঈশ্বর জৈনেরা মান্য করে না। (এখানে ইহা বুঝা যায় যে, বস্তুর বা পদার্থের স্বাভাবিক নিয়মপ্রবাহ অনুযায়ীই জীব সৃষ্টি হয়, উহাতে পদার্থের নিয়ম ব্যতীত কোন কর্ত্তা নাই।) ঐ জড়-চৈতন্য পদার্থ সকলের শক্তিই নিয়ন্তা বা কর্ত্তা।

পদার্থের স্বাভাবিক গতি জৈনমতে মান্য করে। যেমন দুইটি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে অন্য একটি যৌগিক বস্তু নির্ম্মিত হইল, তেমনি পূর্ব্বে যে পঞ্চ পদার্থ বা পৃথিবীকায় প্রভৃতি পঞ্চ পদার্থের নাম করা হইয়াছে, উহারা পঞ্চ শক্তি, যাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা দ্বারাই চালিত হইয়া জীবের সৃষ্টি করে। এই সৃষ্টি প্রবাহের মূলে কোন কর্ত্তা তাহারা মানে না। [ক্রমশঃ।

তথাগত ধর্ম্ম।

[জনৈক অভিজ্ঞ বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত।]

তথাগতের ধর্ম্ম বিস্ময়কর। ভারতে ইংরেজের আগমন অবধি ইহা য়ুরোপীয় দেশমধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, রুসিয়া, ডেনমার্ক, আমেরিকা, সুইডেন, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ইটালী, সুইট্‌জারলাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিদ্বন্মণ্ডলী ভগবান্ বুদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন এবং সংস্কৃত, পালি, চীনা, সিংহলী, বর্ম্মীজ, শ্যামদেশের ও তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থের অনুবাদ য়ুরোপীয় ভাষায় প্রকাশিত করিতেছেন। যে ভারতবর্ষ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা প্রভৃতি নদীজলে বিধৌত হইতেছে, সেই ভারতবর্ষের মধ্যভাগেই ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাস। নগরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে সিংহল দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত দেবগণ বুদ্ধদেবের গুণগান করিতেছেন।

ভারত যখন ভারতীয় রাজার অধীন ছিল, তখন উহা বৌদ্ধ দেশ ছিল। ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ এসিয়াখণ্ডের সর্ব্বত্র ঐ ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারের ফলে শৈব-সিংহলীগণ তাঁহাদের রাজা প্রিয়তিষ্যের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তদবধি আজ ২২০০ বৎসর সিংহলীরা ঐ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে নাই। সিংহল হইতে শ্যামদেশে ও ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। মুসলমানগণ যদি ভারতে এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পশ্চিমস্থিত দেশসমূহে বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশসাধন না করিত, তাহা হইলে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল থাকিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়। আরবগণ ঐ ধর্ম্মের বিনাশসাধন করে। বরোবদোরের ধ্বংসাবশেষ হইতে ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বৌদ্ধশিল্প কিরূপ উন্নত ও জমকালো ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই পবিত্র দয়ামূলক ধর্ম্ম তাহার জন্মভূমি হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আট শত বৎসর পূর্ব্বে যদি এই ধর্ম্ম ভারত হইতে উৎসাদিত না হইত, তাহা হইলে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, জাপান, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে উহা যেমন প্রবল রহিয়াছে, ভারতেও সেইরূপ প্রবল থাকিত। প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধগণ কর্ম্মবীর ছিলেন, সেই জন্যই তাঁহারা হিমালয়ের পরপারে এবং সাগরপারস্থ দ্বীপসমূহে এই ধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, অন্য দেশের জনসাধারণের কোন ধর্ম্ম নাই, তখন সেই সমস্ত মানবজাতির জন্য তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল, সেই জন্যই তাঁহারা তাহাদের দুঃখ দূর করিবার মানসে তাহাদের নিকট সদ্ধর্ম্মের প্রচার করেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম মানবকে অমঙ্গল পরিহার করিতে, মঙ্গলানুষ্ঠান করিতে এবং হৃদয় পবিত্র করিতে শিক্ষা দেয়। মনে রাখিবেন যে, যে সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরব্ধ হয়, সে সময় খৃষ্টানধর্ম্ম বা মুসলমান ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করে নাই; তখন অন্য দেশের লোক কর্ম্মবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা, স্বর্গ, নরক ও অন্যান্য লোকের কথা কিছুই অবগত ছিল না। বুদ্ধ ভগবান্ সেই জন্য ভিক্ষুদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন দুঃখপীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছিলেন। অজ্ঞতা অপেক্ষা মানবের আর অধিকতর দুঃখ কি আছে? জ্ঞানই মানুষকে সুখী করে, জাতি বা ধনসমৃদ্ধি মানবকে সুখী করিতে পারে না। জাতি যদি সুখপ্রদানে সমর্থ হইত, তাহা হইলে সাধুতার প্রয়োজন হইত না। অর্থ, গোধন ও শস্যাদি যদি মানুষকে সুখী করিতে পারিত, তাহা হইলে ধর্ম্মের আবশ্যকতা থাকিত না। মানুষ চাহে—মনের সুখ; কেবল মাত্র ঐশ্বর্য্য, জাতি বা পুস্তকগত বিদ্যা সে সুখদানে সমর্থ নহে। নিরীহ গো, ছাগ, মেষ বলি দিলে বা শরীরকে কষ্ট দিলে মানুষকে সুখ ও মানসিক শান্তি দিতে পারে না। মনের শান্তি ব্যতীত প্রকৃত সুখলাভ সম্ভবে না। তবে কি প্রকারে শান্তিলাভ করা যায়, সেই তত্ত্ব বুঝাইয়া দিবার জন্য ভগবান্ বুদ্ধদেব মহান্ অষ্টপথিসমন্বিত আর্য্যধর্ম্ম নামক ব্রহ্মচর্য্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিলে মানব মনের শান্তি ও সন্তোষ লাভ করে এবং তাহার ঘৃণা, অজ্ঞতা, লোভজনিত যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয়। চিরস্থায়ী শান্তি কি, তাহা বুদ্ধ ভগবান্ ধরাবাসীকে দিয়া গিয়াছেন এবং তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্যই ত্রিপিটকে নির্দ্দেশিত ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বিনয়-পিটক, সূত্র-পিটক ও অভিধর্ম্ম-পিটকই ত্রিপিটক নামে অভিহিত।

সর্ব্ব পাপস্স অকরণং।
কুসলস্স উপসম্পদা॥
সচিত্ত পরিয়োদপনম্।
এতং বুদ্ধান্ সাসনং॥

প্রথম ছত্রের উপদেশ,—কার্য্যে, কথায় ও চিন্তায় মন্দকে পরিহার করিবে। দ্বিতীয় ছত্রের উপদেশ,—কার্য্যে, কথায় ও চিন্তায় সুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। তৃতীয় ছত্রের উপদেশ,—যোগ ও ধ্যানদ্বারা মনকে পবিত্র করিবে।

চতুর্থ ছত্রের উপদেশ,—এই তিনটি বুদ্ধদেবের অনুশাসন বা উপদেশ।

প্রথম ছত্রে উক্ত কু বা মন্দকে পরিহার কিরূপে করিতে হয়, বিনয়-পিটকে তাহা উপদিষ্ট হইয়াছে। সু বা মঙ্গলের অনুশীলন কি করিয়া করিতে হয়, তাহা সূত্র-পিটকে কথিত আছে এবং হৃদয়কে কি উপায়ে পবিত্র করিতে হয়, তাহা অভিধর্ম্মের উপদেশে উক্ত হইয়াছে। মানবের বিবিধ বিপত্তি কি প্রকারে পরিহার করা যাইতে পারে, বিনয়-পিটক তাহা শিক্ষা দেয়। বিপত্তি চতুর্ব্বিধ; যথা—শীল-বিপত্তি, দৃষ্টি-বিপত্তি, আচার-বিপত্তি এবং আজীব-বিপত্তি। সামজিক উন্নতির জন্য নৈতিক সদাচার আবশ্যক। মানুষ যদি নীতিভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব-সমাজ বিড়ম্বিত হয়। উন্মাদনাজনক ধর্ম্ম সমাজকে বিপন্ন করে, সভ্য-সামাজিক নীতি সমাজকে রক্ষা করে, নতুবা মানুষ অসভ্য হইয়া যায়। নিষ্ঠুর এবং প্রাণসংহারক জীবনোপায় বর্ব্বরদের যোগ্য, সুসভ্য মানবের যোগ্য নহে। যে সকল জাতি নিষ্ঠুর এবং বর্ব্বরোচিত ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে, তাহারা লোকশিক্ষক হইতে পারে না। সেই জন্য আর্য্য-নিয়মমতে শিক্ষা ও শাসন মানবজাতির উন্নতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

শীল কাহাকে বলে? প্রাণিহত্যা ও প্রাণিহিংসা বিবর্জ্জন; চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাচার, পরিবাদ, রূঢ়বাক্য-প্রয়োগ, বৃথা গল্প, লোভ, বিদ্বেষ এবং মিথ্যা ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা পরিহারই শীল। যাহারা আর্য্যদিগের এই নৈতিক নিয়ম মানিয়া চলে, তাহাদের শীল-বিপত্তি ঘটে না।

দৃষ্টি-বিপত্তি কাহাকে বলে? যে ধর্ম্মমত কর্ম্মফল, পুনর্জ্জন্মগ্রহণ, স্বর্গনরক, দেবতা, পূর্ব্বজন্ম, ভবিষ্যৎ জন্ম প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা না দেয়—সেই ধর্ম্মমতের অনুবর্ত্তন করা, পিতামাতাকে অযত্ন করা বা তাহাদিগের পারলৌকিক কার্য্যাদি না করা, পবিত্র ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান না করা, স্বীয় চেষ্টাদ্বারা জ্ঞান ও নির্ব্বাণলাভ করিতে পারেন—এরূপ সাধুর অস্তিত্বে অবিশ্বাস করা এবং মানুষ স্বর্গলোকে জন্মে, এরূপ বিশ্বাস না করাই দৃষ্টি-বিপত্তি।

আচার-বিপত্তি কাহাকে বলে? সাধুজন, গুরুজন, বর্ষীয়সী ব্যক্তি, বিদ্বজ্জন প্রভৃতিকে সম্মানপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখতা, শীলতার নিয়ম—শিষ্টাচারের নিয়ম—ভদ্রতার নিয়ম প্রভৃতির লঙ্ঘন, উপবেশনে—ভ্রমণে—শয়নে লজ্জাহীনতাপ্রকাশ, পেটুকের মত ভোজন, অভদ্রভাষার প্রয়োগ, অশ্লীলভাষায় ব্যবহার, শৌচহীনতা, শরীর—আবাস—আসন প্রভৃতি অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা প্রভৃতি সমস্তই আচার-বিপত্তির অন্তর্গত।

আজীব-বিপত্তি কাহাকে বলে? অনার্য্যোচিত বৃত্তি বা ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ; যথা,—কশাইবৃত্তি, বিষবিক্রয়, মাদকদ্রব্যাদি বিক্রয়, দাসব্যবসায়, হত্যার্থ পশুবিক্রয়, হত্যার জন্য পশ্বাদিপালন এবং নরহত্যা প্রভৃতি কার্য্যে যে সকল অস্ত্র ব্যবহৃত হয়—তাহার ব্যবসায় প্রভৃতি কার্য্যে লিপ্ত হইলে আজীব-বিপত্তি ঘটে। বিনয়-পিটকে এই সমস্ত বিপত্তির কথা উক্ত হইয়াছে। মানুষ কার্য্যে, কথায় ও চিন্তায় ঐ পাপে লিপ্ত হইতে পারে। আর্য্য হইতে হইলে মানবকে এই চতুর্ব্বিধ বিপত্তি হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, ইহাই বুদ্ধ ভগবানের শিক্ষা।

কি প্রকারে পৃথিবীতে উচ্চ ও পবিত্রবংশে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, কি উপায়ে ছয় স্বর্গে অথবা ষোড়শ ব্রহ্মলোকে জন্ম হয় অথবা অরূপ ব্রহ্মলোকে গতি হয়, সূত্র-পিটকে তাহার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন সূত্র-পিটকে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল, মধ্যশীল, মহাশীল, অষ্টবিধ আর্য্যপন্থা, পঞ্চ অভিজ্ঞা, পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যপালনপূর্ব্বক নির্ব্বাণ-লাভের উপায়, ধ্যানচতুষ্টয়, অষ্ট সম্পত্তি, অষ্ট মোক্ষ, ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য যোগসাধনার চত্বারিংশৎ উপায়, করুণা, মুদিতা, মেত্তা ও উপেক্ষা এই চতুর্ব্বিধ ব্রহ্ম-বিহার, ছয় দেবলোকের নাম ও তাহার সুখভোগকাল নির্দ্দেশ, ষোল ব্রহ্মলোকের নাম ও তাহার সুখভোগসময় নির্দ্দেশ, চারি অরূপ ব্রহ্মলোকের নাম ও তাহার সুখভোগ-কাল নির্দ্দেশ, প্রেতলোকে ও নরকে দুঃখভোগকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। সূত্র-পিটকের সূত্রগুলি পাঠ করিলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। সূত্র-পিটক পাঁচ নিকায়ে বিভক্ত; যথা—দীর্ঘ-নিকায়, মজ্‌ঝিম-নিকায়, সম্যুত্ত-নিকায়, অঙ্গুত্তর-নিকায় ও ক্ষুদ্দক-নিকায়। দীর্ঘ-নিকায়ে ভগবান্ বুদ্ধদেব রাজা, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও আভিজাতদিগের নিকট দর্শন মনোবিজ্ঞান, বিভিন্ন ধর্ম্ম, পশুবলির অবৈধতা, যাদুবিদ্যায় বা অলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠানের অপ্রয়োজনীয়তা, অন্যের নিকট সাধুতার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক তাহাদের নরক-নিবারণের প্রয়োজনীয়তা, যোগ, ধ্যান ও অভিজ্ঞার অনুশীলনের আবশ্যকতাপ্রতিপাদনার্থ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। মজ্‌ঝিম-নিকায়ে প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্লেষণপূর্ব্বক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। সম্যুত্ত-নিকায়ে ভগবান্ বুদ্ধদেবের সহিত দেবগণ, রাজগণ, ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মলোকস্থ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, যতী, গৃহস্থ এবং স্ত্রী ও পুরুষের সহিত কথোপকথনের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। অঙ্গুত্তর-নিকায়ে কি প্রকারে গার্হস্থ্য-নীতি প্রতিপালন করিতে হয়, যুবতীদিগের কি প্রকারে পারিবারিক কর্ত্তব্য-সাধন, স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতির অনুবর্ত্তন করিতে হয়, পরিচারকের কর্ত্তব্য কি, শিক্ষক এবং ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য কি, দেবতা, রাজা, অতিথি, আত্মীয়-কুটুম্ব প্রভৃতিকে কিরূপ বলি (উপহার বা পূজার সামগ্রী) দিতে হয়, তৎসম্বন্ধে আলোচনা আছে।

ক্ষুদ্দক-নিকায়ে ভগবান্ বুদ্ধদেবের নীতিধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্জিকা—পঞ্চাঙ্গশোধন।

[কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি জ্যোতিষতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত।]

নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎ প্রসূতি-স্থিতি-নাশ হেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে
বিরিঞ্চি-নারায়ণ-শঙ্করাত্মনে॥

বেদ মন্বাদি প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে যজ্ঞ, বিবাহাদি সংস্কার, শ্রাদ্ধ, ব্রত, দেব-দেবীপূজা যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার যথাযোগ্য কালজ্ঞান আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, অযথাকালে কোন কার্য্য করিলে তাহার কোন ফল হয় না। অযথাকালে কোন কার্য্য করা হইলে যথাকালে পুনর্ব্বার তাহা করা উচিত।

অকালে চেৎ কৃতং কর্ম্ম কালে তস্য পুনঃ ক্রিয়া।
কালাতীতস্য যৎ কুর্য্যাদকৃতং তদ্বিনির্দ্দিশেৎ॥
স্মৃতিঃ।

কাল, কার্য্যের অঙ্গ হইলেও দ্রব্যাদি অন্য অঙ্গের অপ্রাপ্ততে যেরূপ তাহার ত্যাগ বা প্রতিনিধিদ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হয়, কালের সম্বন্ধে সেরূপ নহে; কাল অনুপাদেয় জন্য (মনুষ্যগণের সৃষ্ট নহে বলিয়া) যথাকালেই কার্য্যের বিধান করিবে।

অঙ্গত্বেঽপি চ কালস্য নত্যাগোঽনাঙ্গবৎ কৃতঃ।
অনুপাদেয় রূপত্বাৎ কালে কর্ম্ম বিধীয়তে॥

ধর্ম্মশাস্ত্রে আরও উল্লিখিত হইয়াছে,—দেবতাগণ মর্ত্ত্যাদি-লোকের কোথায় অবস্থিত, তাহা গণনাদ্বারা জানা উচিত। যথাকালে এক আহুতিও বরং ভাল, অকালে লক্ষ আহুতিতেও কোন ফল না।

গণিতাজ্ জ্ঞায়তে কালে যত্র তিষ্ঠন্তি দেবতাঃ।
বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষ কোটয়ঃ॥

জ্যোতিষশাস্ত্রদ্বারা কালজ্ঞান হয়, এ জন্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে বেদের অঙ্গ বলে। সিদ্ধান্তশিরোমণিতে উক্ত হইয়াছে,—

শাস্ত্রাদস্মাৎ কালবোধো যতঃ স্যাৎ।
বেদাঙ্গত্বং জ্যোতিষস্যোক্তমস্মাৎ॥

শাস্ত্রেও উল্লিখিত হইয়াছে,—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ, এই ছয়টি বেদের অঙ্গ।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাং চিতিঃ।
জ্যোতিষাং নিচয়শ্চেতি বেদাঙ্গানি বদন্তি ষট্॥

ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—জ্যোতিষশাস্ত্র বেদের চক্ষুস্বরূপ এ জন্য অন্য অঙ্গ অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতা। কারণ, কর্ণ-নাসিকাদি অঙ্গ থাকিলেও চক্ষুহীন ব্যক্তি কোন কার্য্য-সাধনে সমর্থ হয় না।

বেদ চক্ষুঃ কিলেদং স্মৃতং জ্যোতিষং
মুখ্যতা চাঙ্গ মধ্যেঽস্য তেনোচ্যতে।
সংযুতোঽপীতরৈঃ কর্ণনাসাদিভি-
শ্চক্ষুষাঙ্গেনহীনো ন কিঞ্চিৎকরঃ॥

বেদে নানা মন্ত্রে ও উপাখ্যানে উপনিষদ্ এবং ব্রাহ্মণাদিতে জ্যোতিষশাস্ত্রের মূলতত্ত্বগুলি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি লগধ বেদান্ত-র্গত তত্ত্বসকল সংকলিত করিয়া বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ নামক জ্যোতিষগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ পাঠ করিলে জানা যায়, সে সময় ক্রান্তিবৃত্ত ও বিষুবদ্বৃত্তের সম্পাত কৃত্তিকানক্ষত্রে ছিল। ইহাতেও অতি সংক্ষেপে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের তত্ত্বগুলি উল্লিখিত হইয়াছে। তৎপর অশ্বিনী-নক্ষত্রের নিকটে সম্পাত থাকার সময় সূর্য্য, ব্রহ্মা প্রভৃতি আট জন মহর্ষি আটখানা সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শাকল্য-সংহিতান্তর্গত ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে আমরা তাঁহাদের নাম জানিতে পারি। ব্রহ্মা নারদকে বলিয়াছেন,—আমি (ব্রহ্মা), চন্দ্র, পুলস্ত, সূর্য্য, রোমক, বশিষ্ঠ, গর্গ ও বৃহস্পতি, এই আট জন হইতে জ্যোতিষশাস্ত্র নির্গত হইয়াছে।

এতচ্চ মত্তঃ শীতাংশোঃ পুলস্ত্যাচ্চ বিবস্বতঃ।
রোমকাচ্চ বশিষ্ঠাচ্চ গর্গাদপি বৃহস্পতেঃ।
অষ্টধা নির্গতং শাস্ত্রং স্বয়ং পরম দুর্লভম্॥

পরাশরের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি, এই আট জন মহর্ষি তাঁহাদিগের শিষ্যগণকে এই শাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারাও সিদ্ধান্তে প্রণয়ন করিয়াছেন,—

নারদায় যথা ব্রহ্মা শৌনকায় সুধাকরঃ।
মাণ্ডব্য বামদেবাভ্যাং বশিষ্ঠো যৎ পুরাতনম্॥
নারায়ণো বশিষ্ঠায় রামেশায়াপিচোক্তবান্।
ব্যাসঃ শিষ্যায় সূর্য্যোঽপি ময়ারুণকৃতে স্ফুটম্॥
পুলস্ত্যাচার্য্য গর্গাত্রি রোমকাদিভিরীরিতম্। ইত্যাদি।

এইরূপে আমরা অষ্টাদশ মহর্ষিকে জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক বলিয়া জানিতে পারি।

১। সূর্য্য।
২। পিতামহ (ব্রহ্মা)।
৩। ব্যাস।
৪। বশিষ্ঠ।
৫। অত্রি।
৬। পরাশর।
৭। কশ্যপ।
৮। নারদ।
৯। গর্গ।
১০। মরীচি।
১১। মনু (পুলস্ত)।
১২। অঙ্গিরা।
১৩। লোমশ (রোমক)।
১৪। পৌলিশ।
১৫। চ্যবন।
১৬। যবন।
১৭। ভৃগু।
১৮। শৌনক।

যথা কশ্যপঃ।

সূর্য্যঃ পিতামহো ব্যাসো বশিষ্ঠোঽত্রিপরাশরঃ।
কশ্যপো নারদো গর্গো মরীচির্মনুরঙ্গিরাঃ॥
লোমশঃ পৌলিশশ্চৈব চ্যবনো যবনো ভৃগুঃ।
শৌনকোঽষ্টাদশশ্চৈতে জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ॥

পরাশরের বচনে লোমশস্থলে রোমক শব্দ এবং মনু স্থলে কোন বচনে পুলস্তের নাম দেখিয়া, কোন বচনে "পুলস্তো মনুরাচার্য্যঃ পৌলিশঃ শৌনকোঽঙ্গিরাঃ" পুলস্ত ও মনু উভয়েরই নাম দেখিয়া সুধাকর দ্বিবেদী ও শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত প্রভৃতি জ্যোতিষিক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন,—লোমশ ও রোমক এক এবং পুলস্ত মনুরই বিশেষণ।

মহামতি গণেশ দৈবজ্ঞ তিথিচিন্তামণি নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, সূর্য্য প্রভৃতি ঋষি প্রণীত গ্রন্থ তত্তৎকালে ঠিক ছিল। বহুকাল অতীত হইল, তদনুসারে গণনায় দৃষ্টির সহিত অমিল হওয়ায় সত্যযুগের অবসান সময়ে ময়াসুর তপস্যাদ্বারা সূর্য্যের সন্তোষসাধন করিয়া তাহা হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানলাভ করেন এবং সূর্য্য-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহাও কালক্রমে প্রত্যক্ষ-গণনায় অযোগ্য হওয়ায় পরাশরসিদ্ধান্ত প্রণীত হয়। তাহাও কালক্রমে অশুদ্ধ হওয়ায় আর্য্যভট্ট তাহা সংশোধনপূর্ব্বক নূতন সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তাহাও প্রত্যক্ষের সহিত অমিল হওয়ায় দুর্গাসিংহ বরাহ মিহির প্রভৃতি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের সংস্কার করেন। তাহাতেও কালক্রমে অন্তর দেখিয়া জিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্ত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের সংস্কার করিয়া ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক নূতন সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিছুকাল পরে ব্রহ্মগুপ্ত প্রণীত সিদ্ধান্তে দৃষ্টির সহিত পার্থক্য দেখিয়া কেশব দৈবজ্ঞ সূর্য্যসিদ্ধান্তের ও আর্য্যভট-সিদ্ধান্তের আসন্ন এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাও তৎপুত্র মহামতি গণেশ দৈবজ্ঞ ৬০ বৎসর পরে প্রত্যক্ষের সহিত কিছু অন্তর দেখিয়া স্বয়ং বেধদ্বারা গ্রহগতি প্রভৃতি নির্ণয় করেন এবং দৃষ্টি ও গণনার একতাসম্পাদক শুদ্ধ গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। গণেশ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছেন,—যখন বহুকাল পরে ইহাতেও অন্তর দৃষ্ট হইবে, তখন বৃহস্পতির ন্যায় নির্ম্মল-বুদ্ধি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গ্রহণ ও গ্রহ-যোগাদি অবলোকনদ্বারা গ্রহগণের গতি প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করিবেন। তাঁহার উক্তি এই,—

ব্রহ্মাচার্য্য বশিষ্ঠ কশ্যপমুখৈর্যৎখেটকর্ম্মোদিতং।
তত্তৎকালজমেব তথ্যমথতদ্‌ভূরিক্ষণেঽভূচ্ছ্লথং॥
প্রাপ্যাতোঽথ ময়াসুরঃ কৃতযুগান্তেঽর্কাৎ স্ফুটং তোষিতাৎ।
তচ্চাস্তিষ্ম কলৌতু সান্তরমথা ভূচ্চারু পারাশরং॥

তজ্‌জ্ঞাস্বার্য্যভটঃ খিলং বহুতিথে কালে করোৎ প্রস্ফুটং
তৎগ্রস্তং কিল দুর্গাসিংহমিহিরাদ্যৈস্তন্নিবদ্ধং স্ফুটং।
তচ্চাভূচ্ছিথিলং তু জিষ্ণুতনয়েনাকারি বেধাৎ স্ফুটং
ব্রহ্মোক্তাশ্রিতমেতদপ্যথ বহৌ কালেঽভবৎ সান্তরম্॥

শ্রীকেশবঃ স্ফুটতরং কৃতবান্ হি সৌরা-
র্য্যাসন্নমেতদপি ষষ্টিমিতে গতেঽব্দে।
দৃষ্ট্বা শ্লথং কিমপি তৎতনয়ো গণেশঃ
স্পষ্টং যথা স্বকৃতদৃগ্‌গণিতৈক্য মত্র॥

কথমপি যদিদং চেদ্‌ভূরিকালে শ্লথং স্যান্
মুহুরপি পরিলক্ষ্যেন্দুগ্রহাদ্যক্ষ যোগং।
পদমল গুরুতুল্যপ্রাপ্ত বুদ্ধি প্রকাশৈঃ
কথিত সদুপপত্ত্যা শুদ্ধিকেন্দ্রে প্রচাল্যো॥

ব্রহ্মগুপ্ত ও লিখিয়াছেন,—ব্রহ্ম প্রণীত সিদ্ধান্ত বহুকাল পর অন্তরিত হওয়ায় জিষ্ণুপুত্র ব্রহ্মগুপ্তকর্তৃক তাহা সংশোধিত হইতেছে—

ব্রহ্মোক্তং গ্রহগণিতং মহতা কালেন যৎ খিলীভূতং।
অভিধীয়তে স্ফুটং তজ্‌ জিষ্ণুসুত ব্রহ্মগুপ্তেন॥

বরাহ-মিহির ও পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় লিখিয়াছেন,—পৌলিশ-সিদ্ধান্তের মতে গণিত তিথি যথার্থ, রোমকসিদ্ধান্তের তিথি তাহার আসন্ন, সূর্য্যসিদ্ধান্তের (বরাহ-মিহির স্বয়ং যাহার সংস্কার করিয়াছেন) তিথি সর্ব্বাপেক্ষা যথার্থ, কিন্তু ব্রহ্মপ্রণীত ও বশিষ্ঠপ্রণীত সিদ্ধান্তের তিথি যথার্থ তিথি হইতে বহু-দূরবর্ত্তী হইয়াছে।

পৌলিশ তিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তথাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ—
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ।

যে গ্রন্থের গণনায় তিথি স্ফুটতর অর্থাৎ প্রত্যক্ষের সহিত মিল হয়, সেই গ্রন্থানুসারে গণিত তিথিতে ব্রতোপবাসাদি করিবে। ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মত সৌরপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞাত্বৈবং চন্দ্রসূর্য্যাভ্যাং তিথিং স্ফুটতরাং ব্রতী।
একাদশীং তৃতীয়াঞ্চ ষষ্ঠীঞ্চোপ বসেৎ সদা॥

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—যে পক্ষের (গ্রন্থের) গণনায় গ্রহগণ দৃক্‌তুল্য হয়, সেই পক্ষানুসারে তিথ্যাদি নির্ণয় করিবে।

যস্মিন্ পক্ষে যত্রকালে যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যকং।
দৃশ্যতে তেন পক্ষেণ কুর্য্যাৎ তিথ্যাদিনির্ণয়ম্॥

দামোদরপদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে,—যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহ দৃক্‌তুল্য হয়, সেই গ্রন্থানুসারে গণনা করিবে।

যান্তি যৎসাধিতাঃ খেটা যেন দৃগ্‌গণিতৈক্যতাম্।
তেন পক্ষেণ তে কার্য্যাঃ স্পষ্টাস্তৎ সময়োদ্ভবাঃ॥

জাতকসারে কথিত হইয়াছে,— জাতকাদিতে সর্ব্বত্র গ্রহ হইতে শুভাশুভ ফল জানা যায়, এ জন্য গণিত ও দৃষ্টির একতাসম্পাদক গ্রন্থ হইতে তৎকালীন গ্রহসাধন করিবে।

জাতকাদিষু সর্ব্বত্র গ্রহৈর্জ্ঞানং প্রজায়তে।
তস্মাদ্ গণিত দৃক্‌তুল্যাৎ স্বতন্ত্রাৎ সাধয়েদ্ গ্রহান্॥
বিবাহে বিগ্রহে যাত্রা প্রশ্নকাল ব্রতাদিষু।
জ্যোতিঃশাস্ত্রাৎ ফলং সর্ব্বং প্রস্ফুট-দ্যুচরাশ্রয়ং॥

যে রাঘবাচার্য্যের মতানুসারে বঙ্গদেশের সকল পঞ্জিকার গণনা হইতেছে, সেই রাঘবাচার্য্যও দৃক্‌তুল্য গ্রহসাধনের উপদেশ করিয়াছেন। তাহার উক্তি এই,—

অসকৃৎ কর্ম্মণা যেন যান্তি দৃক্‌তুল্যতাং দিবি।
নতোন্নতৌ ততঃ সাধ্যৌ ভাবাঃ খেটবলানি ষট্॥

বৃহত্তিথিচিন্তামণির টীকাকার লিখিয়াছেন,—এই গ্রন্থানুসারে গণিত তিথিতে গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ হয়, এ জন্য এই গ্রন্থের তিথ্যনুসারে ধর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

এষা তিথির্যতো দৃক্‌সমা গ্রহণাদি প্রত্যক্ষানুকূলা অতো মঙ্গলানি বিবাহাদীনি ধর্ম্মা একাদশ্যাদি-ব্রতাদয়স্তেষাং নির্ণয়বিধৌ গ্রাহ্যঃ। এতৎ তিথ্যনু-সারেণ ধর্ম্মশাস্ত্রাদিবিচারো বুধৈঃ কার্য্যঃ॥

এইরূপ যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহণাদি প্রত্যক্ষীভূত হয়, সেই গ্রন্থানুসারে গণিত তিথ্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুমোদিতজন্য সকল সিদ্ধান্তকারই দৃক্‌তুল্য গ্রন্থপ্রণয়নে যত্ন করিয়াছেন এবং নিজকৃত গ্রন্থের গণনা দৃক্‌তুল্য বলিয়া সকল লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—গ্রহগণের গতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও যেরূপে গ্রহগণ দৃক্‌তুল্য হন, সেইরূপ গণিত আমি বলিব।

তত্তদ্‌গতি বশান্নিত্যং যথা দৃক্‌তুল্যতাং গ্রহাঃ।
প্রয়ান্তি তৎ প্রবক্ষ্যামি স্ফুটীকরণমাদরাৎ॥

সূর্য্যসিদ্ধান্তে জ্যোতিষোপনিষদধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে,—ক্রান্তিবৃত্তস্থ (অপমণ্ডলস্থ) গ্রহগণের স্ফুটস্থান হইতে বিক্ষেপ তুল্য অন্তরে গ্রহবিম্ব দৃষ্ট হয়।

চন্দ্রাদ্যাশ্চ স্বকৈঃ পাতৈরপমণ্ডলমাশ্রিতৈঃ।
ততোঽপকৃষ্টা দৃশ্যন্তে বিক্ষেপান্তেষ্বপক্রমাৎ॥

এই অধ্যায়ে ইহাও বর্ণিত আছে,—শিষ্য গুরুর নিকটে যেরূপ গণনার উপদেশ পাইয়াছে, তদনুসারে গণনা করিয়া আচার্য্য (গুরু) শিষ্যদিগের বিশ্বাসের জন্য গ্রহদিগের স্ফুটস্থানাদি প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবে।

পারম্পর্য্যোপদেশেন যথাজ্ঞানং গুরোর্মুখাৎ।
আচার্য্যঃ শিষ্যবোধার্থং সর্ব্বং প্রত্যক্ষদর্শিবান্॥

গ্রহযুত্যধিকারে বর্ণিত হইয়াছে,—ছায়াগ্র ও শঙ্কুর অগ্রে সন্নিবেশিত সূত্র ছায়াকর্ণ। এই ছায়াগ্রপথে দৃষ্টিদ্বারা আকাশস্থ গ্রহ দৃষ্ট হইবে।

ছায়াকর্ণাগ্রসংযোগে সংস্থিতস্য প্রদর্শয়েৎ।
স্বশঙ্কু মূর্দ্ধগৌ ব্যোম্নি গ্রহৌ দৃক্‌তুল্যতামিতৌ॥

দৃক্‌তুল্য গ্রহসাধনই যে সূর্য্যসিদ্ধান্তে প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্তের বহুস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌রূপ কুমুদনিচয়ের প্রকাশক ভারতগৌরব মহামতি ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণি নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে স্ফুটাধিকারে লিখিয়াছেন,—যাত্রা, বিবাহ, উৎসব ও জাতকাদিতে স্ফুটগ্রহ হইতেই ফল নিশ্চয় হয়, এজন্য দৃষ্ট ও গণিতের একতাসম্পাদক স্ফুটক্রিয়া কথিত হইতেছে।

যাত্রা বিবাহোৎসব জাতকাদৌ
খেটৈঃ স্ফুটৈরেব ফলস্ফুটত্বং।
স্যাৎ প্রোচ্যতে তেন নভশ্চরাণাং
স্ফুটক্রিয়া দৃগ্‌গণিতৈক্যকৃদ্ যা॥

বশিষ্ঠও বলিয়াছেন,—যে সোণা কাণে দিলে কাণ কাটিয়া যায়, তাহা কাণে দিয়া লাভ কি? সেইরূপ যে গণনায় স্ফুটগ্রহস্থান প্রত্যক্ষীভূত হয় না, সে গণনার আবশ্যকতা কি? অর্থাৎ তাহা অগ্রাহ্য।

কিং তেনাপি সুবর্ণেন কর্ণঘাতং করোতি যৎ।
তথা কিং তেন শাস্ত্রেণ যন্ন প্রত্যক্ষতঃ স্ফুটম্॥

দৃষ্টি ও গণনার একতা যে গ্রন্থানুসারে সম্পন্ন হইবে, সেই গ্রন্থের গণনাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার করা উচিত। এ জন্য মুনি প্রণীত সিদ্ধান্তশাস্ত্রে কেহ বীজসংস্কারদ্বারা, কেহ গতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া, কেহ বা পরম মন্দ ফল ও পরম শীঘ্র ফলাদির হ্রাস বা বৃদ্ধি করিয়া, কেহ বা কতিপয় নূতন সংস্কারদ্বারা বা গণিতাদির সূক্ষ্মতাসম্পাদন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত বা করণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন (সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্)।

গণিতাগত গ্রহস্থানে যে অংশকলাদি সংস্কার (যোগ বা বিয়োগ) করিলে গ্রহ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয়, তাহার নাম বীজ। মরীচিকার বলিয়াছেন—

স্বকালে যৎ সংস্কারেণ গণিতাগত গ্রহ আকাশে প্রমাণীভূতো ভবতি তদ্‌বীজম্।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকায় রঙ্গনাথ দৈবজ্ঞ লিখিয়াছেন,—যুগমধ্যে ও কালান্তরে গ্রহগত্যাদিতে অন্তর দেখিয়া তৎকাল বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ অন্তরসাধন করিয়া নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এই অন্তর পূর্ব্বগ্রন্থে বীজ নামে অভিহিত হয়।

যুগমধ্যেঽপি অবান্তরকালে গ্রহচারেষু অন্তরদর্শনে তত্তৎকালে তদন্তরং প্রসাধ্য গ্রন্থাংস্তৎকাল-বর্ত্তমানাভিযুক্তাঃ কুর্ব্বন্তি। তদিদমন্তরং পূর্ব্বগ্রন্থে বীজমিত্যামনন্তি।

নৃসিংহদৈবজ্ঞও বীজসংস্কারের আবশ্যকতা লিখিয়াছেন,—

"অতএব আর্য্যভট ব্রহ্মগুপ্তাদিভিঃ স্বসত্তাকালে অন্তরং উপলভ্য মুনিকৃতগ্রন্থেষু নিক্ষিপ্য গ্রন্থা রচিতাঃ। নন্বু কালবশেন যদন্তরং পততি তৎ কথং অতীন্দ্রিয়জ্ঞানবদ্ভির্নোপলক্ষিতং, কথং চর্ম্ম-চক্ষুষ্মদ্‌ভির্ব্রহ্মগুপ্তাদ্যৈশ্চোপলক্ষিতমিতি। উচ্যতে মুনিভিরুক্তং যৎ তৎ তাদৃশমেব, কিন্তু কালবশেন যদন্তরং পততি, পুনস্তস্যাভাবঃ কিয়তাকালেন ভবতি, পুনরপি কিয়তাকালেন কিয়দন্তরং পততি তৎপূর্ব্বাপেক্ষয়া বিলক্ষণমেব ভবতি, কদাচিদন্তরা-ভাব এব। ইত্যেবং চাঞ্চল্যাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ নোক্তবন্তোঽপি ইদমূচুঃ, যদন্তরং তদ্‌উপলভ্য দেয়-মিতি। আচার্য্যৈঃ স্বসত্তাকালে লক্ষয়িত্বা দীয়ত ইতি।

দিবাকর দৈবজ্ঞও বীজসংস্কারের কর্ত্তব্যতা স্বীকার করিয়াছেন। তাহার উক্তি এই,—

তদন্তরং বীজসংজ্ঞং ব্রহ্মগুপ্তাদিভির্নানুষৈঃ স্বসত্তা-কালে লক্ষয়িত্বা মুনিশাস্ত্রেষু নিক্ষিপ্য তাদৃশ-নিক্ষেপযুক্তাঃ স্বগ্রন্থা রচিতাঃ তদ্‌যুক্তমেব। তদন্তর-মতীন্দ্রিয়জ্ঞৈর্মুনিভিশ্চাঞ্চল্যত্বাৎ গ্রন্থবাহুল্যভয়াচ্চ-নোক্তমপি দেয়মিত্যুক্তমেব।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মসিদ্ধান্তে উক্ত হইয়াছে,—নালকাদি গ্রহবেধোপযোগী যন্ত্রদ্বারা গ্রহবেধ করিয়া যে বীজ অবগত হওয়া যায়, সেই বীজদ্বারা সংস্কৃত গ্রহ হইতে তিথ্যাদিনির্ণয় ও ধর্ম্মকার্য্যের আদেশ করিবে।

সংসাধ্য স্পষ্টতরং বীজং নলিকাদি যন্ত্রেভ্যঃ
তৎ সংস্কৃতগ্রহেভ্যঃ কর্ত্তব্যৌ নির্ণয়াদেশৌ॥

যে রাঘবাচার্য্যের গ্রন্থানুসারে বঙ্গদেশের সকল পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্র স্ফুটাদি গণিত হয়, সেই রাঘবাচার্য্যও স্ফুট-গ্রহসাধনে সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মত অবিকল না লইয়া দৃগ্‌গণিতৈক্য-সাধনের নিমিত্ত বীজসংস্কার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, কলির যত বর্ষ অতীত হইয়াছে, তাহাকে তিন হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যে অংশাদি ফললাভ হয়, তাহার নাম বীজাংশ। এই বীজাংশ চন্দ্রকেন্দ্রে, ত্রিগুণিত বীজ মধ্যম শনিতে ও চতুর্গুণিত বীজ বুধের শীঘ্রোচ্চে যোগ করিবে এবং দ্বিগুণিত বীজ মধ্যম বৃহস্পতি হইতে ও ত্রিগুণিত বীজ শুক্রের শীঘ্রোচ্চ হইতে বিয়োগ করিবে। তাঁহার উক্তি এই—

কল্যব্দ পিণ্ডং ত্রিসহস্র লব্ধং
ভাগাদি বীজং ধনমিন্দু কেন্দ্রে।
ত্রিঘ্নং শনৌ বেদ হতং বুধোচ্চে
দ্বি ত্রিঘ্নমিজ্যাস্ফুজিতোর্বিশোধ্যম্॥

মিথিলা প্রভৃতি স্থানে গণেশ দৈবজ্ঞ রচিত গ্রহলাঘব-মতে পঞ্জিকাগণনা হয়। গণেশ দৈবজ্ঞ অবিকল সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মত না লইয়া যে গ্রহের যে গতি লইলে দৃক্‌-তুল্যতা সাধিত হয়, তাহাই লইয়াছেন। তিনি সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতের সূর্য্য ও চন্দ্রোচ্চ লইয়াছেন, সূর্য্যসিদ্ধান্তমতের চন্দ্রে নয় কলাহীন করিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, আর্য্য-ভটসিদ্ধান্তমতের বৃহস্পতি, মঙ্গল ও রাহু লইয়াছেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্তমতের বুধের কেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন, আর্য্যভট-সিদ্ধান্তের শনিতে পাঁচ অংশ যোগ করিয়াছেন, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও আর্য্যভটসিদ্ধান্তমতে সাধিত শুক্রকেন্দ্রের যোগার্দ্ধতুল্য শুক্রকেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—এইরূপ করিলে গ্রহগণ দৃক্‌তুল্য হয়, সুতরাং এই দৃক্‌তুল্য সাধিত গ্রহ হইতে ধর্ম্মকার্য্যাদি সাধন করিবে।

সৌরোঽর্কোঽপি বিধুচ্চমঙ্ক কলিকোনাব্জো গুরুস্ত্বার্য্যজোঽ-
স্গ্‌রাহু চ কজং জ্ঞকেন্দ্রক মথার্য্যে সেষুভাগঃ শনিঃ।
শৌক্রং কেন্দ্রমজার্য্যমধ্যগমিতীমে যান্তি দৃক্‌তুল্যতাং
সিদ্ধৈস্তৈরিহ পর্ব্বধর্ম্ম নয়সংকার্য্যাদিকং ত্বাদিশেৎ॥

বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন বরাহ-মিহির সূর্য্যসিদ্ধান্তের যে সংস্কার করিয়াছিলেন, তদনুসারেই শতানন্দ গ্রহণগণনার জন্য ভাস্বতী নামক প্রসিদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "ভাস্বতী গ্রহণে ধন্যা" এরূপ বাক্য অদ্যাপিও শুনা যায়। ভাস্বতীমতেও বঙ্গদেশের বহু স্থানে পঞ্জিকা-গণনা হইত। তিনি লিখিয়াছেন—

অথ প্রবক্ষ্যে মিহিরোপদেশাৎ
তৎ সূর্য্যসিদ্ধান্ত সমং সমাসাৎ॥ ইত্যাদি।

বরাহ-মিহির যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ তিথিচিন্তামণির বচন হইতে পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে।

বরাহ-মিহির পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা তৎকালে দৃক্‌তুল্য না হওয়ায় তিনি তাহাতে বীজসংস্কারদ্বারা শুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া-ছেন, প্রতিবর্ষ মধ্যমমঙ্গলে ১৭ বিকলা যোগ, বৃহস্পতিতে

দশ বিকলা বিয়োগ ও শনিতে ৭।৩০ সাড়ে সাত বিকলা যোগ করিলে দৃক্‌তুল্য হয়।

ক্ষেপ্যাঃ স্বরেন্দু বিকলাঃ প্রতিবর্ষং মধ্যম ক্ষিতিজে।
দশ দশ গুরৌ বিশোধ্যাঃ শনৈশ্চরে সার্দ্ধসপ্তযুতাঃ॥
ইত্যাদি।

সূর্য্যসিদ্ধান্তে এইরূপ সংস্কারদ্বারা দৃক্‌তুল্য হওয়ায় বরাহ-মিহির পঞ্চ সিদ্ধান্তিকায় লিখিয়াছেন,—পৌলিশ-রোমক, সৌর, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত, এই পাঁচখানা সিদ্ধান্তের মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের তিথিই সর্ব্বাপেক্ষা যথার্থ।

পৌলিশ তিথিঃ স্ফুটোঽসৌ তস্যাসন্নস্তু রোমকঃ প্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ॥

বর্ত্তমান প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত বরাহ-মিহিরধৃত প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে বিভিন্ন ও আধুনিক। পঞ্চসিদ্ধান্তিকার টীকায় সুধাকর দ্বিবেদী লিখিয়াছেন,—বরাহ-মিহিরধৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তে বরাহ-মিহিরের সময়েই রবির মন্দোচ্চ ৮০ অশীতি অংশ ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে বর্ত্তমান সময়েও রবির মন্দোচ্চ সাতাত্তর ৭৭ অংশ মাত্র। তাহার উক্তি এই—(বরাহ-মিহিরকালিক সূর্য্যসিদ্ধান্তে)

"অশীত্যংশ সমং রবের্ম্মন্দোচ্চং কল্পিতং সাম্প্রত-কালিক সূর্য্যসিদ্ধান্তমতেন সপ্তসপ্ততিরংশা রবেরুচ্চ মায়াতি।" ইত্যাদি।

তিনি আরও লিখিয়াছেন,—সিদ্ধান্তরাজনামক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের প্রণেতা নিত্যানন্দ দৈবজ্ঞমতে কলির ৩৬০০ শত বর্ষ (৪২১ শক) অতীত হইলে কোনও পণ্ডিত এই প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। আর্য্যভটসিদ্ধান্তও এই সময়েই প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও আর্য্য-ভটসিদ্ধান্ত সমকালিক গ্রন্থ। আর্য্যভটসিদ্ধান্তে কোথাও সূর্য্যসিদ্ধান্তের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

"সূর্য্যসিদ্ধান্তরচনাকালস্তু নিত্যানন্দেন সিদ্ধান্ত-রাজকৃতা কলেঃ ষট্‌ত্রিংশৎশতমিতে অব্দগণে ব্যতীতে নিগদ্যতে। স কালস্তু আর্য্যভটসিদ্ধান্তস্য প্রসিদ্ধ এব। অতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্ত আর্য্যভটসিদ্ধান্ত সমকালিক এব সিধ্যতি, বিভাতি চ তথ্যং নিত্যানন্দপ্রতি-পাদিতং আর্য্যভটীয় সিদ্ধান্তে ন কুত্রাপি সূর্য্যসিদ্ধান্ত-মতপ্রতিপাদনাৎ। সাম্প্রতং প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ কৃতযুগান্তকালিকস্তু কেনচিদন্যেন প্রকল্পিত-নবীন ইতি স্ফুটমেব সূক্ষ্মবিচারপ্রবৃত্তানাং গণকানামিতি।" [ক্রমশঃ।

মুষ্টিযোগ—টোট্‌কা ঔষধ।

[জনৈক বৃদ্ধের অভিমত।]

উৎকাসির ঔষধ।

এ কাসি আমাদের বঙ্গদেশে প্রায় অধিকাংশ লোকের আছে। অল্প ঠাণ্ডা লাগিলেই ইহা দেখা দেয়। ইহাতে ক্রমাগত কাসি হয় অথচ শ্লেষ্মা উঠে না। ইহা বড়ই কষ্ট-দায়ক ও শীঘ্র সারে না; টন্‌সিলাইটিস্ জন্মায়। ইহার ঔষধ ১২।১৪টি বিহিদানা (ইহা বেণের দোকানে ২।১ পয়সার পাওয়া যায়) একটি পাথরের বাটিতে এক তোলা মিছরির সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, পরে প্রাতে হাত-মুখ ধুইয়া সেই সাগুদানার ন্যায় দ্রব্যটি ঘোলমন্থনের ন্যায় নাড়িতে হইবে, পরে ছাঁকিয়া এক ছটাক আন্দাজ সেবন করিবে। ৩ দিন সেবন করিলে কাসি সারিয়া যাইবে।

***

আমাশয়ের ঔষধ।

১। একখানি বঁটি বা একখণ্ড লৌহ তপ্ত করিয়া লাল হইলে তাহার উপর তেলাকুঁচার পাতার এক ছটাক রস ঢালিবে, নীচে একটি পাথরের বাটি রাখিবে, তাহাতে সেই গরম রসটুকু পড়িয়া ঠাণ্ডা হইলে তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধব-লবণ মিশ্রিত করিয়া তিন দিন প্রাতে আধ ছটাক করিয়া খাইলে আমাশয় ভাল হইবে।

২। কুকুরসোঁকার পাতা ঐরূপ করিয়া খাইলেও আমাশয় আরাম হয়।

৩। কচি তেঁতুলের পাতা বাটিয়া আন্দাজ এক সিকি ওজনে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে আমাশয় আরাম হয়।

***

হজ্‌মী গুলী।

এক তোলা কালমেঘের পাতা, এক তোলা যোয়ান, এক তোলা মৌরি, এক তোলা কালজিরা, এক তোলা বেলশুঁট, এক তোলা বড় এলাচের খোসা, এক তোলা সৈন্ধবলবণ, কিছু মেতি, মৌরি ও নালিতা। চাল দিয়া বাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া ছোট ছোট বটী প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। বালক-বালিকাদের সপ্তাহে ২।৩ দিন প্রাতঃ-কালে সেবন করাইলে পেট ভাল থাকে।

হেঁচ্‌কির ঔষধ।

১। তালসাঁসের জল খাওয়াইলে হেঁচ্‌কি নিবারণ হয়।

২। গরম মুড়ি কিঞ্চিৎ জলে ফেলিয়া, সেই জল ঝিনুকে করিয়া অল্প অল্প খাওয়াইলে হেঁচ্‌কি ভাল হয়।

৩। একটি ডাব কাটিয়া তাহাতে ১ তোলা মধু ফেলিয়া রাখিবে ও এক ঝিনুক করিয়া মধ্যে মধ্যে খাওয়াইবে, ইহাও হেঁচ্‌কির অতি উৎকৃষ্ট মুষ্টিযোগ।

৪। কাবাবচিনি মুখে রাখিলে তাহাতে হেঁচ্‌কি সারে।

৫। ছাগলের দুগ্ধ গরম করিয়া অল্প শুঁটের গুঁড়া দিয়া সেবন করাইলে হেঁচ্‌কি ভাল হয়।

***

অর্শনাশনযোগ।

বাহিরের বলি হইলে কর্পূর ও রক্তচন্দন লেপ দিলে অর্শ ভাল হয়। রক্তচন্দন অভাবে সরিষাব তৈল ও কর্পূর দিলেও সারিবে।

***

পায়ের কড়া।

স্নান করিবার সময় পা কিছুক্ষণ জলে রাখিয়া, পরে কড়ার উপর একখানি ক্লুলঝামা দিয়া ঘর্ষণ করিলে কড়া পাত্‌লা হইয়া যায় ও কোন কষ্ট হয় না।

***

ক্রিমিবাণ।

১। পলাসবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিমছাল ও চিরেতা সমভাবে লইয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণ সামান্যমাত্র ইক্ষুগুড়-সহযোগে তিন দিন প্রাতে সেবন করিবে। উহাতে উদরের ক্রিমিসকল নিঃশেষে পতিত হইবে।

২। দাড়িমের মূলের কাথ তিলতৈলের সহিত পান করিলেও ক্রিমি পড়িয়া যাইবে।

৩। এক মাত্রা বিশুদ্ধ ক্যাষ্টর অয়েল ও এক মাত্রা সেণ্টনাইন একত্র করিয়া প্রাতে সেবন করিবে। উহাতে ক্রিমিঘটিত পেটব্যথা ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইয়া যাইবে। প্রাতে ছয়টার সময়ে এই ঔষধ সেবন করিবে এবং ঠিক একটার সময়ে পেট ভরিয়া জলসাগু সেবন করিবে। রাত্রে দুগ্ধসাগু খাইবে। পর দিন ঠাণ্ডা ঝোল-ভাত খাইবে।

ভূপালী—ঢিমেতেতালা।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দাস রচিত
কবিতা ও সুর।

আস্থায়ী।

সা ঋ | গ সা প গ | গ ঋ প গ | প ম প
এ স | রা | জ রা | জে শ্ব র

ধ প ম গ | গ প গ প গ গ | ধ সা ধ সা ধ প | ধ সা সা ধ
ব ন্দি ত | ঋ ষি ব র | জ গ জ ন | ম ঙ্গ ল

অন্তরাতে

গ প গ | গ || প ধ | ধ ম সা সা ঋ সা ন সা
দা তা || এ স | শা ন্ত ক

সা সা সা সা | সা ন ঋ ন ধ ধ | ন ন ধ প ম গ
ম ল ভূ ঙ্গ | তা প স | ঋ ষ্য শৃ ঙ্গ

প গ ঋ ঋ | সা ধ সা ঋ | গ প গ | গ ||
অ ঙ্গ প্র | জা প রি | ত্রা | তা

অন্তরা।

প ম প ধঁ ধঁ	প ধ নঁ নঁ	সাঁ সাঁ	সাঁ সাঁ সাঁ ‖
যো গা চা রী	ঋ গ্বে দ	হো তা	এ স

সা ন র্গ র্গ	ঋ ঋ ঋঁ ঋঁ	সাঁ ন সা ঋ র্গ ঋ সা নঁ ধ
কা শ্য প	কু ল র বি	নি র্ম্ম ল

ন ন ধ প ম গ ‖	গ প গ পঁ গঁ ঋঁ	সা ধ সা ঋ
দে ব ছ বি	দ শ র থ	ভা গ্য বি

প গ প গ	গ ‖
ধা তা	

রাজা দশরথ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত অঙ্গদেশ হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে লইয়া যখন অযোধ্যায় আগমন করেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অযোধ্যাবাসিগণ গাহিয়াছিলেন :—

এস রাজরাজেশ্বর বন্দিত ঋষিবর,
জগজন-মঙ্গলদাতা,
এস শান্তা কমল-ভৃঙ্গ, তাপস ঋষ্যশৃঙ্গ,
অঙ্গ-প্রজা-পরিত্রাতা।
এস ব্রহ্মচারীবর, ব্রহ্মবিদ্যাধর,
যোগাচারী ঋগ্বেদ হোতা,
এস কাশ্যপকুল-রবি, নির্ম্মল দেব-ছবি,
দশরথ ভাগ্য-বিধাতা।

বৃদ্ধের উপদেশ।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

১

ধন ও বিদ্যার গৌরব মানুষকে আত্মহারা করে; সেই অবস্থায় অন্য গর্ব্বিত ব্যক্তির উপদেশ বা সঙ্গদ্বারা মানব আরও অধিক ভুল করিয়া ফেলে। এই ভুল হইতেই সমাজে ও সংসারে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

২

শিক্ষা ও সংসর্গ, এই দুইটিই মানবের চরিত্রগঠন করে। উচ্চ আদর্শ, শাস্ত্র অধ্যয়ন, উপযুক্ত গুরুগ্রহণ, পিতা-মাতায় ভক্তি ও তাঁহাদের উপদেশ এবং আদর্শগ্রহণদ্বারা মানুষ চরিত্রগঠন করে। গুরুজনের আদর্শে চরিত্র গঠিত হইলে এবং স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন করিলে মানুষমাত্রেরই মঙ্গল হয়; স্বাস্থ্য, শান্তিসম্পন্ন, অভাবশূন্য, অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারে।

৩

মনুষ্য-জীবনে আশ্রয় আবশ্যক, তাই সমাজবন্ধন। আহার চাহি, মলমূত্রত্যাগের স্থান চাহি, অবস্থানুযায়ী পোষাক-পরিচ্ছদ চাহি, পীড়িত হইলে ঔষধ ও পথ্য চাহি, রোগে শোকে সেবা চাহি, প্রত্যেক মানুষেরই এই "প্রয়োজন"গুলি অবস্থানুযায়ী চাহি এবং যাহার উপায় না থাকে, দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের তাহা-দিগকে সাহায্য করা কর্ত্তব্য। অভাব মানুষকে অনেক সময়ে নিতান্ত নীচ ও দুর্ব্বৃত্ত করিয়া তুলে।

৪

উচ্চপদের ও উচ্চবংশের দায়িত্ব অনেক বেশী। যে সকল মানব সামান্য অবস্থা হইতে অর্থাৎ দশ বিশ টাকার চাকুরী হইতে আরম্ভ করিয়া লক্ষপতি হন, তাঁহাদের দায়িত্ব আরও বেশী। যিনি দুঃখী ও উপায়হীনের অভাব-মোচন করেন, তিনি তাহার নিকট গুরুর ন্যায় মান্য পান, ঈশ্বরের নিকটও যশস্বী হন; দেশে মান্য ও গণ্য হয়। অভাবগ্রস্তের অভাবমোচন করাই ধনী ও জ্ঞানীর প্রধান কর্ত্তব্য। যিনি উচ্চবংশে জন্ম লইয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হইয়াছেন, তিনি যদি অভুক্তকে ভোজন, দুঃখীর দুঃখমোচন, আশ্রয়হীনকে আশ্রয়দান প্রভৃতি স্বীয় কর্ত্তব্যসাধন না করেন, তাহা হইলে ক্রমে নিন্দার ভাজন হন ও পরে অবস্থাহীন অর্থাৎ তিনিও সেই দশাপ্রাপ্ত হন।

৫

আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। সাঁতার জান ত নিমজ্জিত লোককে উদ্ধার করিতে পার। নিজে সংযত হইতে না পারিলে, পরকে সংযত হইতে উপদেশ দিও না। ভাণ্ডারের অবস্থা বুঝিয়া দান করিবে। আয়ের অর্থ অযথা নষ্ট করিবে না। এক অংশ গ্রাসাচ্ছাদনাদির জন্য, দ্বিতীয় অংশ পুত্র-পৌত্রাদি ও রাজকরাদির জন্য, তৃতীয় অংশ দান ধর্ম্ম প্রভৃতি কার্য্যের জন্য এবং চতুর্থ অংশ জমা করিবে। কারণ, অসময়ে আবশ্যক হইতে পারে। খরচ ও সঞ্চয় দুইই চাহি। তবে হিসাব করিয়া এ সকল করিতে হয়। ঠিক হিসাব করিয়া চলিলে লোক কখনও দুঃখী হয় না। আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া অনেকেই ঋণগ্রস্ত হয়। ঋণী সর্ব্বদা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকে। অতএব শরীরযাত্রানির্ব্বাহানুযায়ী সবই করিবে, কিন্তু অতিরিক্ত কিছুই করিবে না।

৬

"পাওনার অতিরিক্তকে ফাজিল বলে।" আপনার গণ্ডীর বাহিরে কখনও যাইতে নাই এবং অযথা কোন কাজ করিতে নাই। মুখের থুথুটুকুও অরিতিক্ত ফেলিতে নাই, কারণ, তাহাতেও আয়ুঃ ক্ষয় হয়।

৭

এক পয়সার মাটির হাঁড়ি কিনিতে কতবার বাজাইয়া দেখ, একখানি নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা করিতে টাকাগুলি কতবার বাজাও, একখানি বস্ত্রের সমস্ত সূতা পরীক্ষা করিয়া তবে ক্রয় কর, এই সকল জিনিষ মুহূর্ত্তস্থায়ী। কিন্তু আজীবন যাহাতে তোমার দুঃখ-সুখ ন্যস্ত কর, যাহার সহিত মিত্রতা কর, যাহার উপর তোমার জীবন নির্ভর কর, কই, তাহাকে ত মাটির হাঁড়ির মতন বাজাইয়া দেখ না? হায়, মানুষ কি মূর্খ! যাহা চিরজীবনের সাথী হইবে, তাহাকে বাজাইয়া দেখে না, মাটির ভাঁড় লইয়াই যত ব্যস্ত!

৮

সর্ব্বদাই দেশকালপাত্র বিবেচনা করিবে। স্বেচ্ছাচারী বা হটকারী হইবে না। দান করিবে, কিন্তু যাহাতে নিজের অনিষ্ট হয়, এমন দান করিও না।

৯

সকলের উপরই যাহার সন্দেহ হয়, সে কখনও বিশ্বাসী হইতে পারে না এবং সুখী হইতে পারে না। যাঁহারা ধার্ম্মিক ও সরল, তাঁহাদের সকলেই মিত্র হয়।

১০

এমন কাজ করিবে, যাহাতে মানুষের অনিষ্ট না হয়। এমন আহার করিবে, যাহাতে নিজের রোগ না হয়। এমন কথা কহিবে, যাহাতে লোকের মনঃকষ্ট না হয়। সংসারে যদি সুখী হইতে চাও, তবে ধনের অপব্যবহার করিও না; যৌবনের অপব্যবহার করিও না; সৌন্দর্য্যের অপব্যবহার করিও না; বাক্যের অপব্যবহার করিও না; শক্তির অপ-ব্যবহার করিও না।

बूढ़े का उपदेश।

(अनुवादक—रामलक्ष्मी उपासनी)

१

धन तथा विद्याका गौरव ही मनुष्य को आत्म-ज्ञान रहित कर देता है। उस अवस्था में दूसरों की मत तथा संगत् में पड़ कर मनुष्य और भी अधिक भूल करने लगता है। ऐसी ही भूल समाज तथा संसार में गड़बड़ी मचादेती है।

२

शिक्षा तथा संसर्ग इन्हीं दोनों से मनुष्य के चरित्र का संगठन होता है। उच्च आदर्श, शास्त्र, अध्ययन उपयुक्त गुरुग्रहण, पितामाता की भक्ति, उनके उपदेश एवं आदर्श ग्रहण द्वारा मनुष्य अपने चरित्रका गठन करता है। गुरुजनों तथा पूज्यलोगों सरीखा महत् चरित्र बनालेने तथा अपना कर्त्तव्य साधन करने से मनुष्य मात्र का दोष मर्दन हो जाता है। निरोग, शान्त, अभाव-शून्य अऋणी तथा अप्रवासी ही मानव जाति सुखसे जीवन बिता सकती हैं।

३

मनुष्य जीवन में आश्रय नितान्त आवश्यक है। फिर समाज बन्धन भी जरूरी है, रोग में, शोक में सेवा की आवश्यकता पड़ती है, सारांश प्रत्यक मनुष्य को अवस्थानुसार इन "आवश्यक बातों" की दरकार पड़ती है। कहना यह है कि जिनके पास उपाय नहीं, शक्ति नहीं उन्हें देश के शक्तिशाली लोगों को उचित है कि वे उन्हें सहायता दें।

४

उच्चपद तथा उच्चवंशकी जवाबदेही बहुत अधिक है। जो मनुष्य दस बीस रुपये की नौकरी से लखपति हुआ है उनकी जवाबदेही औरभी अधिक है। जो दुःखी तथा निराश्रय का दुःख मोचन करते हैं, और जो दूसरों द्वारा गुरु ऐसा सम्मान पाते हैं वही ईश्वर द्वारा यशस्वी बनाया जाते हैं। देश में इज्जत भी पाते हैं। अभावग्रस्त मनुष्यों का अभाव दूर करना ही प्रत्येक धनी व ज्ञानी मनुष्य का धर्म है। जिन्होंने उच्चवंश में जन्मग्रहण कर ज्ञान तथा विज्ञान में उन्नति किया है, वे यदि भूखे को आहार, दुःखी का दुःख मोचन, आश्रयहीन को आश्रयदान आदि न करें तो उह क्रमशः निन्दा-भागी होना पड़ता है। अन्तमें वे भी उसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। दरिद्र को अवस्था जानकर उसे आश्रयदान तथा अन्नदान करना चाहिये।

५

आय समझ व्यय करना चाहिये। अपने संयम शिक्षा न कर दुसरे को संयम शिक्षा नहीं देना चाहिये। अवस्था समझ कर दान करना चाहिये। आय का अर्थ वृथा नहीं व्यय करना उचित है। पहिला भाग ग्रासाच्छादन के लिये, दुसरा भाग लड़के बालों तथा राजकर आदि के लिये तीसरा भाग दान, धर्मादि के लिये और चतुर्थ भाग जमा करना चाहिये, परन्तु हिसाब से चलें—कारण हिसाब से चलने वाले लोग कभी दुःख नहीं भोगते। आय से अधिक व्यय कर बहुतेरे लोग ऋणि हो गए हैं। ऋणिपुरुष सदा सर्व्वदा अपमानित तथा लांछित होते हैं। अतएव समय-बोतानियोग्य काम करना चाहिये, याद रहे, इनके अतिरिक्त कुछभी व्यय न हो, अन्यथा बेइज्जती तथा अपमान का सामना का करना पड़गा।

६

साविक दस्तुर के अधिक खर्चको फ़ज़ूल खर्च कहते हैं। अपनी सामर्थ अनुसार काम करना चाहिये, इसके अतिरिक्त कुछ न होना चाहिये। यहां तक कि अधिक थूकनाभी नहीं चाहिये क्यों कि आयु घटती है।

७

एक पैसे की हांड़ी लेनेपर आप जितनी बार बजाते हैं नोट भंजाकर आप रुपये को जितनी बार बजाते हैं, क्यों कि ये चीज क्षणस्थायी हैं। जिस वस्तु से आपके जीवन का सम्बन्ध है, जिन चीजों पर आपके जीवन का सुख दुःख निर्भर करता हैं, क्या उसको उत्तम प्रकार आप परख देखते हैं? उसे आप रुपये तथा मट्टी की बनी हुई हांड़ी सा क्यों नहीं वारंवार परख देखते? हाय! मानव जाति कैसी मूर्ख हैं। जिस जिस वस्तुपर उनकी मान मर्य्यादा निर्भर करती है उसे उतनी बार परीक्षा न कर अपनी इज्जत नष्ट करदेती है।

८

सदासर्व्वदा समयानुकूल काम करना चाहिये। स्वेच्छाचारी तथा जिद्दी न होना चाहिये। दान अवश्य करना किन्तु ऐसा दान न हो जिस में अपना अनिष्ट हो।

९

जिस मनुष्यपर हरएक का सन्देह है वह कभी विश्वासयोग्य नहीं हो सकता, न सुखी ही हो सकता। जो धार्म्मिक तथा सरल हैं, उन्हीं से ही सबकी मित्रता होती है।

१०

काम वह करना चाहिये जिस से दूसरे का कुछ अनिष्ट न हो, आहार भी इतना ही करना चाहिये जिससे किसी प्रकार का रोगादि न हो। बात भी ऐसी नहीं कहनी चाहिये जिससे दूसरे के मन को कुछ तकलीफ पहुंचे। संसार में मनुष्य यदि सुखी होना चाहे तो सर्व्व प्रथम अर्थ का अपव्यय उसे न करना चाहिये। यौवन का अपव्यवहार न करें, सुन्दरता को नष्ट न करें, शक्ति तथा वाक्य का वृथा व्यवहार न करें।

जानियात् प्रेषणे भृत्यान्
वान्धवान् व्यसनागमे ।
मित्रञ्चापदकाले च
भार्य्याञ्च विभवक्षये ॥

परदारान् परद्रव्यं
परिवादं परस्य च ।
परिहासं गुरोः स्थाने
चापल्यञ्च विवर्ज्जयेत् ॥

FOREWORD.

FIFTH *(Kartick)* NUMBER OF "ANATHBANDHU."

LIGHT AND DARKNESS.

AS in the world of matter the sun rises in the East and dispels darkness and enables us to see objects clearly, so in the world of the mind our inner eye opens and enables us to see matters in their true colours as wisdom appears in the mind. Owing to the materialistic tendencies of the age which prevails in the human sphere, darkness is being increased to such an extent that we have lost the power to discern right from wrong, and to see what really is conducive to our health, peace, and prosperity in life and how at least to enjoy the short span of our life. On the other hand, we are endangering our very lives by taking adulterated food and getting addicted to luxuries. Do costly dresses give us health, peace and prosperity? Do costly jewels, furnitures and modish equipages, garden parties and all the paraphernalia of a luxurious life conduce to the requirements of a healthy and good life? Most emphatically—No!

The ideal of a sound life is based on economy. A knowledge of economy is therefore very necessary. The man with a graceful appearance, with a sweet smile and suavity in his dealing mixed with sincerity and kindness and willing to help any real object calculated to benefit the needy although simple and self-sacrificing and detesting the pomp and show of the day, is the ideal man. He may be in the highest ladder, yet he knows he is a mortal and in the short span of life which again is shortened by sleep, sickness, study, the duties of the householder only a small time left us to do good to others who need our support. Hence we should not over-burden ourselves with too much brain-work and randum duties created for fancy-living.

My Anathbandhu may do some good to mankind as it gives some account of Dharma which should be the main subject of study in life, Agriculture which maintains us, the Arts which will solve the poverty-problem of the people and discusses preventives and cures of diseases. It also gives one some idea of the Yoga-Shastra to regulate the air that controls our system and keeps us healthy, the Yotish-Shastra which gives us knowledge, Exercise which makes us healthy, the merits of plants and trees and Mustijog which are invaluable and last but not least music which gives us the knowledge of how to sing our prayer and express our sacred love, happy and poetic thoughts.

I have been trying my best to do the best I can for the Journal. Although some of the highest personages have appreciated the usefulness of the Journal, yet I have still got only a limited number of paid subscribers.

The Annapurna Asram which I am trying to start, will not be my personal property or charity but an institution built up by charitably disposed persons where poor persons of both sexes will be admitted to work according to

their merit and capability and thereby support the Asram and themselves. I take up the duty to work and build it up, and pay a little from my humble purse. In the first instance we have got to build up an accomodation of an humble nature, not a costly building, and provide such appliances as are needed for making articles of domestic utility.

I am sorry to find that although I have spent a large sum of money towards plant and stock for printing and publishing the Anathbondhu and have been sending the journal prepaid to the best people of India, I find but poor support which is far from encouraging.

I have secured a plot of land near Baidyanathdham for the location of the Asram and I hope my patrons and friends will approve of my selection. It is a sacred and sanitary place.

I presume my Journal has not been perused in some places, and that is why I do not get any response to my appeal from such quarters.

The printing of the portrait of the eminent men of india in true colours is very expensive, printing life-sketches too, in these days of war when everything is expensive, is also costly and I believe if my patrons and friends do not come forward to help me early, the project of publishing the Album of the Indian Noblemen shall have to be abandoned

My strength and energy is yet full, though I am seventy. But it may fail shortly and my scheme will then become a mere dream to me, although my services to the noblemen from the Deccan to the Himalayas, from Karachi to Assam and Sylhet dates over half a century and my noble customers all over the country generally know me personally. I expect my appeal will be received with confidence and action taken at once.

Finally I appeal for quick despatch of the photos and life-sketches, the subscription to the Anathbondhu, and any support that may be given to the Annapurna Asram, as I intend to start making bricks.

My appeal is, Ist—Subscription of only Rs.10 a year for the Anathbandhu, 2nd—From the noblemen whose portrait and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu Rs. 500 or upwards if they are charitably and piously inclined to help the work of the Annapurna Asram, 3rd—Price of the Album of the Noblemen of India in English Rs. 300, to subscribers paying in advance Rs. 250. I believe my honorarium, I expect from my noble patrons and friends, is fair, which again goes to help the poor, and if co-operation is given I hope to build up the Asram for the poor soon. The Asram will be a monument of the charitable and intelligent people who will be glad and proud of such an Institution.

Yours obediently,

K. P. Mookherjee.

7, Warterlooo Street,
CALCUTTA.

My Three Schemes.

ANATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga*, if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.
(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) **D. Chatterjee.**
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,

I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,

(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,

(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee."

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,

(Sd.) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,

(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

PRESS OPINIONS.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such ("Anathbandhu") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called "Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street,

Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion, Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that acompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer, of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A NEW JOURNAL by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and

useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday,, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukh padhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religions, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public. The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlees to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anath-bandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committe of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,
Your humble servant,

K. P. Mookerjee

সূচনা।

ঐ

পঞ্চম (কার্ত্তিক) সংখ্যার অনাথবন্ধুর জন্য।

আলোক ও অন্ধকার।

জড়জগতে যখন পূর্ব্বাকাশে অরুণ-কিরণ ফুটিয়া উঠে—সূর্য্য উদিত হইয়া অন্ধকার নষ্ট করেন, তখনই আমরা জড়পদার্থ সমুদয়ই সেই সূর্য্যালোকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। সেইরূপ মানসজগতে যখন প্রজ্ঞার উদয় হয়, তখন আমাদের মানসচক্ষুর সম্মুখে পদার্থসমূহকে তাহাদের প্রকৃত বর্ণে সন্দর্শন করিতে সমর্থ হই। অধুনা জড়বাদের যুগ আসিয়াছে। এই সময় জড়বাদের সিদ্ধান্তগুলি মানবের মানসক্ষেত্রে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে এবং ক্রমশঃ সকল স্তরেই বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। তাহার ফলে আমরা ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছি। কিসে আমাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; কিসে আমরা সুখে জীবনযাপন করিতে পারিব, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছি না;—যেন দিশাহারা ও জ্ঞানহারা হইয়া এই সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছি। পক্ষান্তরে ভেজাল খাদ্য ভোজন করিয়া এবং বিলাসে নিমজ্জিত হইয়া আমরা আমাদের জীবনকে পর্য্যন্ত বিপন্ন করিয়া ফেলিতেছি। বহুমূল্য পরিচ্ছদ কি আমাদিগকে স্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রদান করিতে পারে? মহার্হ রত্নরাজি, আসবাবপত্র, পছন্দমত সাজসরঞ্জাম, বাগানে আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি বিলাসের উপকরণ স্বাস্থ্যপূর্ণ সুখময় জীবন দিতে পারে কি? নিশ্চয়ই নহে।

অর্থনীতির পাকা বনিয়াদের উপর সুখময় জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য অর্থনীতিজ্ঞান মানবের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। সুদর্শন, সহাস্যবদন, আদব-কায়দা-অভিজ্ঞ, অকপট, দয়ালু, জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে সাহায্যকারী ব্যক্তি যদি আড়ম্বরবিহীন, স্বার্থত্যাগী, বাহ্যাড়ম্বরশূন্য হন, তাহা হইলেই তিনি জনসাধারণের আদর্শ হইয়া থাকেন। তিনি উন্নতির সোপানের অতি উচ্চে আরূঢ় হইতে পারেন। তিনি জানেন যে, এই জীবন অনিত্য। নিদ্রায়, পীড়ায়, অধ্যয়নে, গৃহকার্য্যে স্বল্প জীবনের অনেক অংশই ব্যয়িত হইয়া যায়। সুতরাং যাহারা তাঁহার নিকট সাহায্যের দাবী রাখে, তাহাদের সাহায্যার্থ অতি অল্প সময়ই অবশিষ্ট থাকে। অতএব অতিরিক্ত মস্তিষ্ক চালনায় ও সুখলাঞ্ছিতজীবনের বিক্ষিপ্ত কর্ত্তব্য-সাধনের জন্য তাঁহার আত্মাকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করা শ্রেয় নহে।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ত্ব দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশা-স্বরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি স্থানাস্ত

আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আস্‌বাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

বৈদ্যনাথধামের সান্নিধ্যে

আমি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য কতকটা যায়গা লইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকবর্গ ও বন্ধুগণ আমার এই স্থান-নির্ব্বাচনের অনুমোদন করিবেন। স্থানটি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর।

আমার মনে হয়, কেহ কেহ আমার এই পত্র পড়েন নাই, সেই জন্য আমি ঐ সকল মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছি না।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎ-ব্যক্তিগণ যাঁহারা এখনও ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত না পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চক-কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ৩০।৩৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্যদাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

বড়ই আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, বহু সম্ভ্রান্ত, গণ্যমান্য, মহাপ্রাণ ব্যক্তি ইতিমধ্যেই গ্রাহক হইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহিত ও বাধিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কাহারও নাম প্রকাশ করিলে, বোধ হয়, অন্যায় হইবে না।

বঙ্গেশ্বর হিজ্ এক্সেলেন্সি লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর।
মহামান্য মহারাজা শোনপুর।
মহামান্য রাজাসাহেব বাম্ড়া।
অনরেবল স্যর্ মহারাজা দ্বারভঙ্গ।
অনরেবল স্যর্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর—কাশিমবাজার।
হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান।
অনরেবল মহারাজা বাহাদুর নশীপুর।
মহামান্য জেনারেল তেজ সাম্সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপাল।
জেনারেল কৈশর সাম্সের জঙ্গ বাহাদুর রাণা—নেপাল।
রাজা বিজয়সিংহ দুধোরিয়া—আজিমগঞ্জ।
স্যর্ মহারাজা প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর বাহাদুর।
মহামাননীয়া মহারাণী সাহেবা—আয়োয়াগড়।
শ্রীযুত রাজা প্রমথভূষণ দেব বাহাদুর—নলডাঙ্গা।
শ্রীযুত কুমার বিচিত্র সা ; টিহরি, গাড়োয়াল।
কুমার গোপিকারমণ রায়—শ্রীহট্ট।
দেওয়ান সাহেব—ধাররাজ্য।
রায়সাহেব মহারাজকুমার মহেশ্বরীপ্রসাদ সিং—গিধোড়।
লালা জ্যোতিপ্রকাশ নন্দী সাহেব—বর্দ্ধমান।
মহামান্য রাজা সাহেব—লন্জিগড়।
রায় বাহাদুর মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী ; রঙ্গপুর।
অনরেবল শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ; গৌরীপুর।
কুমার এ. পি. লাহিড়ী ; রাজসাহী।
শ্রীযুত প্রভাতচন্দ্র গিরি ; তারকেশ্বর।
স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীযুত কুমার জিতেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরী—মুক্তাগাছা।
শ্রীযুত বাবু ফণীন্দ্রনাথ মিত্র—ভবানীপুর।
পণ্ডিত এন্. বিদ্যারত্ন—কলিকাতা।
শ্রীযুত বাবু জ্যোতিষচন্দ্র চাটার্জ্জি—কলিকাতা।
শ্রীযুত বাবু আশুতোষ মজুমদার—কলিকাতা।
শ্রীযুত বাবু এন্. চাটার্জ্জি—কলিকাতা।
শ্রীমতী এস্. বি. দেবী—কলিকাতা।
শ্রীযুত লালা এস্. পি. নন্দীসাহেব—বর্দ্ধমান।
দেওয়ান সাহেব—বাম্ড়া।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্থানাভাবে অধিক নাম প্রকাশ করা গেল না, যাঁহারা অনাথবন্ধুর গ্রাহক হইয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেবল উপরি-উক্ত মাননীয় মহোদয়গণের নাম প্রকাশ করিলাম। ইঁহারা সকলেই যে অন্নপূর্ণা আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অনূ্যন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি।

৩য়। ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ—যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত
শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

मेरी दो बातें।

जिस प्रकार इस वसुन्धरामें सूर्य्य देव अपनी सुनहली किरण विकाश कर अन्धकार को दूर करते हुए हमलोगों को दिन रात समझने योग्य बनाते हैं,—उसी प्रकार इस आत्म जगत् में हमलोगों को आन्तरिक चक्षु हिताहित समझने योग्य बनाती है। महानुभवों! इस जगत् में मनुष्यजीवन अपस्थायी है, यह धन सम्पत्ति जो कुछ मनुष्य एकत्रित करता है वह सब पड़ी रह जाती है, रहती है केवल कीर्त्ति, क्यों कि मनुष्य मर जाता है, परन्तु उसका सत्कर्म नहीं जाता; उदाहरण स्वरूप देखिये शेक्सपियर मर गये मगर उनकी रचित कविता आजभी वर्तमान है, कालीदास मर गये परन्तु शकुन्तला, कादम्बरी आज तक उनके जीवित रहने की सूचना दे रही हैं। इसी लिये मेरा यह कहना है कि मनुष्य मर जाता है, परन्तु उसकी कीर्त्ति अटल रहती है। फिर प्रिय भातृवृन्दों! अपने पूर्व्वपुरुष सदृश हमलोग भी क्यों नहीं अपनी कीर्त्ति छोड़ जाय? कीर्त्ति छोड़ जाने का एक मात्र उपाय "परोपकार"। हम आज लखपति करोड़पति हो कर नित्य सैकड़ों रुपये गाना बजाना विलास मे व्यय करते हैं। मगर निर्धनों का कैसे गुजर होता है सो नहीं ख्याल करते कितने ही गरीब बिचारे अनाहार रह कर शरीर त्यागते हैं कितने हों बिचारे अपना कपड़ा लता बेच उदरपोषन करते हैं। इन बातों का ख्याल न कर हमलोग केवल अपने स्वार्थ की ओर ध्यान देते हैं। भाइयों!—केवल स्वार्थ ही से काम नहीं चलेगा कुछ परार्थ भी करना चाहिये।—आशा है, आप बन्धुओं मेरी निम्नलिखित उक्तिपर अवश्य ध्यान देंगे।

मैंने बहुत विचार कर कई वर्षों तक अनुभव करके और किसी बड़े उद्देश्य को लक्ष्य कर यह "अनाथबन्धु" प्रकाशित किया है। इस में मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं क्यों कि व्यवसाय द्वारा अबतक जो कुछ मैंने उपार्जन किया है और ईश्वर ने जो कुछ मुझे दिया है उसीसे मैं सन्तुष्ट हूं। निमल निष्कलङ्क आनन्द उपभोग करने की इच्छासे—इतना :ब्ज हो जाने परभी "अनाथबन्धु" प्रकाशित कर उसके पीछे पीछे अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने की अभिलाषा की है। मुझे सदा पूरी आशा रहती है कि ईश्वर मेरे कर्म का सहायक है। जोंही इस अनाथबन्धु की प्रथम संख्या निकल जाने पर मुझे मालूम हुआ कि :—

१। बहुत से लोग बङ्गभाषा नहीं जानते—समझते भी नहीं इसी से "अनाथबन्धु" इन्होंने लौटा दिया। परन्तु जिनलोगों के पास यह पत्रिका भेजी गई वे सभी गण्यमान्य सज्जन हैं अस्तु यदि वे किसी बङ्गभाषा जानने वाले सज्जन से पढ़वाकर इस में लिखे लेख सुनते तो वे लेखों के लाभ मालूम कर सकते और अन्नपूर्णा आश्रम के उद्देश्य भी समझ सकते। आश्रम की प्रतिष्ठा एक वृहत् कार्य्य है यदि सर्वत्र इसी प्रकार आश्रम स्थापित होजाय तो जगत् के सभी लोग इस से लाभ उठा सकें। बहुत लोग इस आश्रमें सुख भोजन वस्त्रादि लाभ कर एवं रोग शोक में औषधि और शुश्रूषा पाकर आनन्दमय जीवन बिता सकेंगे। थोड़े खर्च में यह सब कार्य्य कैसे हो सकते हैं इसकी शिक्षा देनी भी परमावश्यक है। इसी उद्देश्य की पूर्त्ति के निमित्त आश्रम के सहायक रूप में "अनाथबन्धु" का प्रचार मैंने किया है।

२। यह सत्य है कि धर्म्मनिष्ठपुरुष प्रायः प्रपंच द्वारा ठगे जा चुके हैं इसी कारणसे अब सब का ऐसे कार्य्यों की ओर अविश्वास हो गया है और सत्कार्य्य की ओर अश्रद्धा भी हो गई है। मेरा तो कहना केवल यह है कि यदि आप किसी ऐसे सहायता के काम में ठगे जा चुके हैं तो उसपर विचार करिये कि क्यों? देश काल पात्र इन तीनों पर विचार कर कार्य्य करने से किसी विषय में धोखा नहीं उठा सकते और न सत्कर्म की ओर अभक्ति ही होती है।

मेरी उम्र प्रायः ७० वर्ष की हो गई। मैं विगत ५० वर्षों से व्यवसाय कर रहाहूं और अपने अनुभव तथा धैर्य्यबल से अबभी एक बड़ा व्यवसाय चला रहाहूं। ईश्वरेच्छा से, भारतवर्ष, योरोप एवं एमेरिका के सभी महत् व्यक्तियों से मेरा व्यवसाई सम्बन्ध है परन्तु आज तक मेरे ऊपर उन महानुभावों का स्थायी विश्वास एवं श्रद्धा ज्यों की त्यों चली आरही है। मेरे द्वारा किसी प्रकार के प्रपंच की सम्भावना है या नहीं यह बात मेरे बहुत से पूज्य तथाबन्धुगण जानते हैं।

३। अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने का मैं उद्योग करूंगा। आश्रम स्थापना में प्रायः एक लाख रुपये की आवश्यकता है। कम से कम तीस पैंतीस हजार रुपये हो जाने परभी मैं किसी तरह इस को आरम्भ कर सकताहूं इसके पश्चात् सहायकवृन्द के अभिप्रायानुसार आश्रम के कार्य्य की वृद्धि हो सकती है।

४। "अनाथबन्धु" से जो कुछ आय होगी वह आश्रम के कार्य्यों में व्यय हुआ करेगी। यदि इस पत्रिका के पांच हजार ग्राहक हो जायं तो मैं समझताहूं कि फिर आश्रम के लिये अधिक सहायता की आवश्यकता नभी हो।

इस पत्रिका की प्रथम संख्या प्रकाशित कर जैसा मैं उत्साहित किया गया हूं उससे तो मेरे अभीष्ट सिद्धि में तनिक भी संदेह नहीं दीखता।

मैं पहिले ही लिख चुका हूं कि मेरा स्वार्थ केवल "आनन्द" मात्रही है। जहां तक सम्भव है मैं "अनाथबन्धु" को सर्व्वाङ्गसुन्दर बना आश्रम की सेवा में उपयोगी स्थान देने में कदापि त्रुटि न करूंगा। तिसपर मैं अपने सहायकों द्वारा भी खूब उत्साहित किया जा रहा हूं।

बड़े हर्षका विषय है कि बहुत से महानुभावों ने पत्रिका पाते ही अपना नाम ग्राहकों की श्रेणी में उदारता पूर्व्वक लिखवा मुझको अत्यंत उत्साहित तथा बाधित किया है। उन लोगों का नाम यहां प्रकाश करना मेरी समझ में अनुचित न होगा।

वंगेश्वर हिज एक्सेलेन्सी लौर्ड कारमाइकल बहादुर।
महामान्य महाराजा सोनपुर।
महामान्य राजासाहब बामड़ा।
अनरेबल सर महाराजा दरभङ्गा।
अनरेबल सर महाराजा मनीन्द्रचन्द्र नन्दी बहादुर—कासिमबाजार।
अनरेबल महाराज बहादुर—नसीपुर।
महामान्य जेनेरल तेज शमसेर जङ्ग बहादुर राणा—नेपाल।
राजा विजयसिंह धुधुरिया।
सर महाराजा प्रद्योत कुमार ठाकुर बहादुर।
लाला ज्योतिप्रकाश नन्दी साहब—वर्द्धमान।
महामान्य राजासाहब—लनजौगड़।
महामाननीया महाराणी साहबा, —आयीथागढ़।
रायबहादुर मृतुञ्जय रायचौधुरी—गौरीपुर।
कुमार ए, पी, लाहिरी—राजसाही।
श्रीयुत प्रभातचन्द्र गिरि—ताड़केश्वर।
अनरेबल स्यर गुरुदास वन्द्योपाध्याय।
श्रयुत कुमार जितेन्द्रकिशोर आचार्य्य चौधुरी —मुक्तागाछा।
श्रीयुत वावु फणीन्द्रनाथ मित्र—भवानीपुर।
पण्डित एन, विद्यारत्न।
श्रीयुत वावु ज्योतिषचन्द्र चाटार्ज्जि—कलकत्ता।
श्रीयुत वावु आशुतोष मजुमदार—कलकत्ता।
श्रीयुत वावु एन चाटार्ज्जि।
श्रीमती एस, वि, देवी—कलकत्ता।
श्रीयुत लाला एस, पि, नन्दीसाहेव—वर्द्धमान।
श्रीयुत राजा प्रमथभूषण देव वाहादुर—नलडाङ्गा।
श्रीयुत कुमार विचित्र सा; टिहरि, गाड़ोयाल।
कुमार गोपीका रमण राय—सिलहट।
दिवान साहेव—धारराज्य।
राय साहब महाराजकुमार महेश्वरी प्रसाद जी सिंह—गिद्धौर ष्टेट।
हिज हाइनेस महाराजधिराज, —वर्द्धमान।
जेनरल कैसर शमशेर जंग बहादुर राणा —नेपाल।
दिवान साहेव—वामरा राज्य।
इत्यादि इत्यादि।

जिन जिन मान्यवर महाशयों ने "अनाथबन्धु" का ग्राहक बन मुझे उत्साहित किया है उनमें से उपरोक्त सभी सज्जन इसके पृष्टपोषक तथा अभिभावक होंगे इसमें कोई सन्देह नहीं। आशा है सर्व्वसाधारण अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने के सम्बन्ध में मुझे सहायता देने में कदापि पीछे न हटेंगे एवं ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि, सब स्वस्थ और स्वच्छन्दता पूर्व्वक दिन बितावें तथा मंगलमय जगदीश्वर के आशीर्व्वाद से इस महत् कार्य्य में सम्मिलित हो जीवन सफल करें।

देशी हाथ का शिल्प तथा अत्यंतावश्यक नवाविष्कृत फलदायक औषधादि पर प्रबन्ध लिख भेजने से हमलोग उसे सादर ग्रहण करेंगे। प्राचीन समयका ग्राम्य-इतिहास, मन्दिरों के विवरण एवं चित्रादि भेजने पर प्रकाशित किये जायंगे। किसी की निन्दा, अश्लील शब्द पूर्ण निबन्ध अथवा राजनीति सम्बन्धीय लेख इसी पत्रिका में प्रकाशित न होंगे।

यदि कोई रमणी धार्म्मिक विषयपर लेख, काव्य अथवा गीत लिख कर भेजें तो छापी जा सकती है। "अनाथबन्धु" में छापने के लिये बहुतसी तसवीरें जीवन चरित्र के साथ मिली हैं। आशा है अन्य सज्जन भी अपना २ जीवनवृत्तान्त एवं चित्र भेजने में देर न करेंगे।

कुछ दिन बाद ही और एक भारतके राजालोगों के जीवन-चरित्र एवं फोटो का एलबम प्रकाशित करूंगा। इसका छापना अत्यंत सहज होगा, कारण प्रधान खर्च है ब्लौक बनवाई सो "अनाथबन्धु" के लिये बनेही हैं। इस विषय में सब राजाओं से सहानुभूति रखने की प्रार्थना है। जिन जिन माननीय महाशय-लोगोंने अपना अपना फोटो और जीवन-चरित्र अब तक नहीं भेजा है, उन महाशयलोगों से अपना अपना फोटो और जीवन-चरित भेजने के लिये प्रार्थना की जाती है।

"अन्नपूर्णा आश्रम"

का कार्य्य जिस तरह चलेगा उसका ब्यौरा हम लिख ही चुके हैं आशा है आपलोग इसको उन्नतिशील बनाने में कुछ उठा न रखेंगे मैं कृतज्ञता पूर्व्वक निवेदन करता हूं कि जिन महाशयोंने "अनाथबन्धु" की प्रथम एवं द्वितीय संख्या रखली है और इसके उद्देश्य को समझ ग्राहक हो गए हैं वे अबकी संख्या पातेही वार्षिक मूल्य भेजकर मुझे वाधित करें।

पहिले ही कह चुका हूं कि "अनाथबन्धु" की आय आश्रम सम्बन्ध में ही व्यय होगी अस्तु जिनलोगों को इच्छा इस आश्रम को सहायता पहुंचाना है वे इस अवसर पर देर नकरें। वे जितनी जल्दी सहायता प्रदान करेंगे उतनीही जल्दी कार्य्य होगा।

"अन्नपूर्णा आश्रम"

के लिये हमने श्रीवैद्यनाथ धाम के पास एक स्थान निश्चित किया है और उसके लिये बातचीत हो रही है, हमको आशा है कि हमारे सहायक बन्धुगण उसको पसन्द करेंगे। अब विलम्ब न कर इस सुअवसर को अपने हाथ से जाने न देकर कार्य्यक्षेत्र में अवतीर्ण हो मुक्तकण्ठ से अनाथबन्धु को पुकारते हुए अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने में सहायता दें।

सर्व्वसाधारण से १०) वार्षिक मूल्य इस मासिक पत्रिका के लिये लिया जायगा। जिन महानुभवों का इस पत्रिका में चित्र तथा जीवनचरित्र प्रकाशित किया जायगा उनसे ५००) लिया जायगा। अधिक देना उनकी दया पर निर्भर है। राजा महाराजाओं का जीवन चरित्र अंग्रेजी में प्रकाशित होगा वह ३००) रूप्ये मे मिलेगा, २५०) अग्रिम भेजने वालों को ५०) का किफायत होगा। मुझे आशा है, आप मेरे अनुरोधों को स्वीकार करते हुए मुझे अन्नपूर्णा आश्रम स्थापित करने में निर्म्मल चित्तसे सहायता प्रदान करेंगें।

विशेष सुविधा।

विद्यालय के छात्र, धर्म्मसभा, एवं जनसाधारण के उपकारार्थ जो लाईब्रेरी हैं वे सब इस "अनाथबन्धु" को आधे दाम में पावेंगे।

इसमें हिन्दीकेलेख भी निकाला करेंगे।

विनीत :—
श्रीकालीप्रसन्न मुखोपाध्याय
प्रकाशक।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপন-দাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তি-মত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপন-দাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
,, ২য় ,, ,, ,, ,, ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, ৩য় ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লকপ্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

'অনাথবন্ধু' মাসিকপত্র

শ্রীশ্রীমাতা অন্নপূর্ণা।

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥

চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্॥

চিত্রবস্ত্রপরিধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নত পয়োধরাম্॥

গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥

গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥

কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥

কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥

সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তুতে॥

প্রার্থনা—সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী।
দক্ষানন্দকরী বিপুক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী॥

প্রার্থনা—সর্ব্বত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী।
দক্ষানন্দকরী বিপুক্ষয়করী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী॥

সাক্ষান্মোক্ষকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

সাক্ষান্মোক্ষকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী।
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথাঃ—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং যুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কাযে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

श्रीश्रीजगद्धात्री ।

ध्यान ।

सिंहस्कन्धसमारूढां नानालङ्कारभूषितां ।
चतुर्भुजां महादेवीं नागयज्ञोपवीतिनीं ॥

ধ্যান।

সিংহস্কন্ধসমারূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাং ।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীং ॥

शङ्खचापसमायुक्तवामपाणिद्वयां तथा ।
चक्रबाणसमायुक्तदक्षपाणिद्वयां तथा ॥

শঙ্খচাপসমাযুক্তবামপাণিদ্বয়াং তথা ।
চক্রবাণসমাযুক্তদক্ষপাণিদ্বয়াং তথা ॥

रक्तवस्त्रपरिधानां बालार्कसदृशद्युतिं ।
नारदाद्यैर्मुनिगणैः सेवितां भवसुन्दरीं ॥

রক্তবস্ত্রপরিধানাং বালার্কসদৃশদ্যুতিং ।
নারদাদ্যৈর্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীং ॥

त्रिवलीवलयोपेतनाभिनालमृणालिनीं ।
ईषत्सहास्यवदनां काञ्चनाभां वरप्रदां ॥

ত্রিবলীবলয়োপেতনাভিনালমৃণালিনীং ।
ঈষৎ সহাস্তবদনাং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং ॥

नवयौवनसम्पन्नां पीनोन्नतपयोधरां
करुणामृतवर्षिण्या पश्यन्तीं साधकं दृशा ॥

নবযৌবনসম্পন্নাং পীনোন্নতপয়োধরাং ।
করুণামৃতবর্ষিণ্যা পশুন্তীং সাধকং দৃশা ॥

रत्नद्वीपे महाद्वीपे सिंहासनसमन्विते ।
प्रफुल्लकमलारूढां ध्यायेत्तां भवगेहिनीं ॥

রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে ।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীং ॥

स्तव ।

आधारभूते चाधेये धृतिरूपे धुरन्धरे ।
ध्रुवे ध्रुवपदे धीरे जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥

স্তব।

আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে ।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোহস্তুতে ॥

शवाकारे शक्तिरूपे शक्तिस्थे शक्तिविग्रहे ।
शाक्ताचारप्रिये देवि जगद्धात्रि नमोऽस्तु ते ॥

শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে ।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোহস্তুতে ॥

অযই জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

জয়দে জগদানন্দে জগদেকপ্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

পরমাণুস্বরূপেচ দ্ব্যণুকাদি স্বরূপিণি।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদিস্বরূপিণি।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদি রূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

কালাদিরূপে কালেশে কালাকাল বিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি।
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামাবে ববপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

অগম্যজগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

অগম্যজগতামাদ্যে মাহেশ্বরি ববাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

তীর্থযজ্ঞতপোদানযোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

দয়াকপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

অগমাধামধামস্থে মহাযোগীশহৃৎপুরে।
অমেয় ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তুতে॥

প্রণাম।

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে।

প্রণাম।

সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শবণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

প্রথম বর্ষ। সন ১৩২৩। | কার্ত্তিক। | প্রথম খণ্ড। পঞ্চম সংখ্যা।

অনাথবন্ধু।

[ভারতী শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ লিখিত।]

ওগো!—অনাথের নাথ!
পাপী-তাপী আজ চরণে এসেছে রাখিও তাহারে সাথ॥
জীবন-দৈন্য ঢাকিতে না পেরে
তোমার বিভূতি দূর হ'তে হেরে
আসিয়া তোমার চরণের তলে করে শত প্রণিপাত;
সে যে গো তোমার চরণের রেণু রেখ তারে সাথে সাথ॥

ওগো!—সকলের ভালো!
দূর হ'তে তব রূপের বিকাশে অন্ধ পেয়েছে আলো॥
খুলে গেছে তার মোহ-বন্ধন
পূজা করা তব ফুল-চন্দন
তাদের রক্ত বরণে ভূষিত হ'ল মাথা মোর কালো।
ওগো, মোরে পথ দেহ দেখাইয়া ধরিয়া বিবেক আলো॥

ওহে!—অনাথের স্বামী,
আমি যে তোমার পথ চেয়ে আছি নিখিল দিবস-যামী॥
দিয়ে যাও দেখা, এস এক বার,
করুণা-ভিখারী ডাকে বার বার,
ভকত-বাঞ্ছা কর গো পূর্ণ অখিল ভুবনস্বামী;
আমি জানি তুমি আমারি যেমন তোমারো তেমনি আমি॥

দিনপঞ্জিকা—১৩২৩।

অগ্রহায়ণ।

১লা অগ্রহায়ণ, ইং ১৬ই নবেম্বর, বৃহস্পতিবার।—ষষ্ঠী দিবা ঘণ্টা ৯।৪৮, পুষ্যানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘণ্টা ৬।২। যাত্রা-শুভ, দক্ষিণে পশ্চিমে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।২ গতে নক্ষত্র ও বিষ্টি এবং ব্যবহারিক অগস্ত্যদোষ। নিম্বভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩০ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

২রা অগ্রহায়ণ, ইং ১৭ই নবেম্বর, শুক্রবার।—সপ্তমী দিবা ঘ ১১।৫৫, অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।৫২। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১১।৫৫ মধ্যে তাল পরে নারিকেল, আমিষ অভক্ষ্য।

৩রা অগ্রহায়ণ, ইং ১৮ই নবেম্বর, শনিবার।—অষ্টমী দিবা ঘ ১।৫১, মঘানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৫৬। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।৫৬ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১১।১২ গতে বৈধৃতিযোগদোষ। দিবা ঘ ১।৫১ মধ্যে নারিকেল ও আমিষ পরে অলাবু অভক্ষ্য।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ইং ১৯শে নবেম্বর, রবিবার।—নবমী দিবা ঘ ৩।২৮, পূর্ব্বফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৫৬। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৫৬ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে উত্তরে নাস্তি। দিবা ঘ ৩।২৮ মধ্যে অলাবু পরে কলম্বী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্র-যোগ—দিবা ঘ ৩।৪৫ গতে ৪।৩০ মধ্যে।

৫ই অগ্রহায়ণ, ইং ২০শে নবেম্বর, সোমবার।—দশমী দিবা ঘ ১।৪১, উত্তরফল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।২৬। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে উত্তরে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৪১ গতে পশ্চিমে শুভ। দিবা ঘ ১।৪১ মধ্যে কলম্বী পরে শিম অভক্ষ্য।

৬ই অগ্রহায়ণ, ইং ২১শে নবেম্বর, মঙ্গলবার।—একাদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।২৫, হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৩১। যাত্রানাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৫।২৫ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি। একাদশীর উপবাস। সন্ধ্যা ঘ ৫।২৫ মধ্যে শিম পরে পূতিকা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৫০ মধ্যে।

৭ই অগ্রহায়ণ, ইং ২২শে নবেম্বর, বুধবার।—দ্বাদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬, চিত্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৫৩। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ২।০ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৫।৩৬ গতে পাপযোগদোষ। দিবা ঘ ১০।০।২৪ মধ্যে পূর্ব্বাহ্নে একাদশীর পারণ। সন্ধ্যা ৫।৩৬ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৭।১৬ গতে ৮।০ মধ্যে, পরে ১।৪১ গতে ৩।৪৮ মধ্যে।

৮ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৩শে নবেম্বর, বৃহস্পতিবার।—ত্রয়োদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।১৮, স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ঘ ৪।১০। যাত্রা-শুভ, দক্ষিণে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৪২ গতে পূর্ব্বে নাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৫।১৮ গতে পূর্ব্বে শুভ, রাত্রি ঘ ৪।১০ গতে যাত্রাশুভ, দক্ষিণে মাত্র নাস্তি। সন্ধ্যা ঘ ৫।১৮ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই ও আমিষ অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩২ গতে ৫।১২ মধ্যে।

৯ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৪শে নবেম্বর, শুক্রবার।—চতুর্দ্দশী দিবা ঘ ৪।৩১, বিশাখানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৪৮। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৪।৩১ গতে পক্ষান্তদোষ, রাত্রি ঘ ৩।৪৮ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। অমাবস্যার নিশিপালন। দিবা ঘ ৪।৩১ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য ও মাংস অভক্ষ্য।

১০ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৫শে নবেম্বর, শনিবার।—অমাবস্যা দিবা ঘ ৩।১৭, অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।২। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।১৭ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি। দিবা ঘ ৩।১৭ মধ্যে অমাবস্যার ব্রত উপবাস। দিবা ঘ ৩।১৭ মধ্যে মৎস্য ও মাংস পরে কুষ্মাণ্ডভক্ষণ নিষেধ।

১১ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৬শে নবেম্বর, রবিবার।—প্রতিপদ দিবা ঘ ১।৪১, জ্যেষ্ঠানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।৫৫। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১।৪১ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১।৫৫ গতে পশ্চিমে মাত্র নাস্তি। দিবা ঘ ১।৪১ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতীভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৪৮ গতে ৪।৩০ মধ্যে।

১২ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৭শে নবেম্বর, সোমবার।—দ্বিতীয়া দিবা ঘ ১১।৪৮, মূলানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১২।৩৬। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ১১।৪৮ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১২।৩৬ গতে যাত্রামধ্যম, রাত্রি ভোর ৬।৪ গতে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি। দিবা ঘ ১১।৪৮ মধ্যে বৃহতী পরে পটোল অভক্ষ্য।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৮শে নবেম্বর, মঙ্গলবার।—তৃতীয়া দিবা ঘ ৯।৪০, পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১১।৫। যাত্রাশুভ, উত্তরে অগ্নিকোণে ঈশানে নাস্তি, দিবা ঘ ৯।৪০ গতে রিক্তা-দোষ, রাত্রি ঘ ১১।৫ গতে নক্ষত্রদোষ। দিবা ঘ ৯।৪০ মধ্যে পটোল পরে মূলাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৫২ মধ্যে।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ইং ২৯শে নবেম্বর, বুধবার।—চতুর্থী দিবা ঘ ৭।২৩ পরে পঞ্চমী রাত্রি ভোর ঘ ৫।২, উত্তরাষাঢ়া-নক্ষত্র রাত্রি ঘ ৯।২৭। ত্র্যহস্পর্শ, যাত্রাদি শুভকর্ম্ম নাস্তি, স্নানদানে শুভ। শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৭।২০ গতে ৮।৬ মধ্যে, পরে ১।৪০ গতে ৩।৫০ মধ্যে।

১৫ই অগ্রহায়ণ, ইং ৩০শে নবেম্বর, বৃহস্পতিবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ঘ ২।৪০, শ্রবণানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।৪৭। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ২।৪০ গতে যাত্রামধ্যম, দক্ষিণে নাস্তি। রাত্রি ঘ ২।৪০ মধ্যে নিম্বভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩২ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ইং ১লা ডিসেম্বর, শুক্রবার।—সপ্তমী রাত্রি ঘ ১২।২৫, ধনিষ্ঠানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।১১। যাত্রানাস্তি। রাত্রি ঘ ১২।২৫ মধ্যে তালভক্ষণ নিষেধ।

১৭ই অগ্রহায়ণ, ইং ২রা ডিসেম্বর, শনিবার।—অষ্টমী রাত্রি ঘ ১০।১৯, শতভিষানক্ষত্র দিবা ঘ ৪।৪৪। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১০।১৯ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে দক্ষিণে নাস্তি। রাত্রি ঘ ১০।১৯ মধ্যে নারিকেল ও আমিষ অভক্ষ্য।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ইং ৩রা ডিসেম্বর, রবিবার।—নবমী রাত্রি ঘ ৮।২৮, পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৩।৩১। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ৩।৩১ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৮।২৮ গতে তিথ্যমৃতযোগ। রাত্রি ঘ ৮।২৮ মধ্যে অলাবু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৫০ গতে ৪.৩০ মধ্যে।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ইং ৪ঠা ডিসেম্বর, সোমবার।—দশমী সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৭, উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৩৩। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি, দিবা ঘ ২।৩৩ গতে যাত্রানাস্তি। সন্ধ্যা ঘ ৬।৫৭ মধ্যে কলম্বী পরে শিমভক্ষণ নিষেধ।

২০শে অগ্রহায়ণ,ইং ৫ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।—একাদশী সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৮, রেবতীনক্ষত্র দিবা ঘ ১।৫৯। যাত্রাশুভ, উত্তরে নাস্তি, দিবা ঘ ১।৫৯ গতে পাপযোগদোষ, সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৮ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে দক্ষিণে নাস্তি। একাদশীর উপবাস সর্ব্বসম্মত। সন্ধ্যা ঘ ৫।৪৮ মধ্যে শিম পরে পূতিকা অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৫৪ মধ্যে।

২১শে অগ্রহায়ণ, ইং ৬ই ডিসেম্বর, বুধবার।—দ্বাদশী বৈকাল ঘ ৫।৭, অশ্বিনীনক্ষত্র দিবা ঘ ১।৪৮। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ১০।৭ মধ্যে একাদশীর পারণ। বৈকাল ঘ ৫।৭ মধ্যে পূতিকা পরে বার্ত্তাকু অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৭।২২ গতে ৮।৮ মধ্যে, পরে ১।৪২ গতে ৩।৫২ মধ্যে।

২২শে অগ্রহায়ণ, ইং ৭ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার।—ত্রয়োদশী দিবা ঘ ৪।৫৪, ভরণীনক্ষত্র দিবা ঘ ২।৮। যাত্রানাস্তি। দিবা ঘ ৪।৫৪ মধ্যে বার্ত্তাকু পরে মাষকলাই, আমিষ অভক্ষ্য। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩৩ গতে ৫।১৩ মধ্যে।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ইং ৮ই ডিসেম্বর, শুক্রবার।—চতুর্দ্দশী বৈকাল ঘ ৫।১৩, কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ঘ ২।৫৭। যাত্রানাস্তি, দিবা ঘ ২।৫৭ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে দক্ষিণে নাস্তি, বৈকাল ঘ ৫।১৩ গতে পক্ষান্তদোষ ও বিষ্টিদোষ। পূর্ণিমার নিশি-পালন। বৈকাল ঘ ৫।১৩ মধ্যে মাষকলাই, আমিষ পরে মৎস্য ও মাংস অভক্ষ্য।

২৪শে অগ্রহায়ণ, ইং ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার।—পূর্ণিমা সন্ধ্যা ঘ ৬।৩, রোহিণীনক্ষত্র দিবা ঘ ৪।১৫। যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে পশ্চিমে নাস্তি, দিবা ঘ ২।২৭ গতে বায়ুকোণে নৈঋর্তে নাস্তি, দিবা ঘ ৪।১৫ গতে পাপযোগদোষ, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে মাত্র নাস্তি। মার্গীয় স্নানদানাদি। পূর্ণিমার ব্রত উপবাস। সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ মধ্যে মৎস্য ও মাংস অভক্ষ্য।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ইং ১০ই ডিসেম্বর, রবিবার।—প্রতিপদ রাত্রি ঘ ৭।২২, মৃগশিরানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।৩। যাত্রানাস্তি, সন্ধ্যা ঘ ৬।৩ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে পূর্ব্বে উত্তরে নাস্তি, রাত্রি ঘ ৭।২২ গতে নক্ষত্রদোষ। রাত্রি ঘ ৭।২২ মধ্যে কুষ্মাণ্ড পরে বৃহতী অভক্ষ্য। মাহেন্দ্রযোগ—দিবা ঘ ৩।৫৪ গতে ৪।৩৫ মধ্যে।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ইং ১১ই ডিসেম্বর, সোমবার।—দ্বিতীয়া রাত্রি ঘ ৯।৫, আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৮।১২। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ৯।৫ গতে যাত্রাশুভ, পূর্ব্বে নাস্তি। রাত্রি ঘ ৯।৫ মধ্যে বৃহতীভক্ষণ নিষেধ।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ইং ১২ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবার।—তৃতীয়া রাত্রি ঘ ১১।৫, পুনর্ব্বসুনক্ষত্র রাত্রি ঘ ১০।৪১। যাত্রানাস্তি। পটোলভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—রাত্রি ঘ ৭।৫৫ মধ্যে।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ইং ১৩ই ডিসেম্বর, বুধবার।—চতুর্থী রাত্রি ঘ ১।১৫, পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ১।১৮। যাত্রানাস্তি, রাত্রি ঘ ১।১৫ গতে যাত্রাশুভ, উত্তরে পশ্চিমে নাস্তি, রাত্রি ঘ ১।১৮ গতে নক্ষত্রদোষ, রাত্রি ঘ ৩।৪২ গতে বৈধৃতিযোগদোষ। মূলাভক্ষণ নিষেধ। মাহেন্দ্রযোগ—প্রাতঃ ঘ ৭।২৪ গতে ৮।১০ মধ্যে, পরে ১।৪৪ গতে ৩।৫৪ মধ্যে।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ইং ১৪ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার।—পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৩।২৩, অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৩।৫২। যাত্রানাস্তি। শ্রীফলভক্ষণ নিষেধ। বারবেলা দিবা ঘ ২।৩৫ গতে ৫।১৪ মধ্যে।

৩০শে অগ্রহায়ণ. ইং ১৫ই ডিসেম্বর, শুক্রবার।—ষষ্ঠী রাত্রি ভোর ঘ ৫।১৯, মঘানক্ষত্র রাত্রি ভোর ঘ ৬।১৭। যাত্রানাস্তি, নক্ষত্র ও সংক্রান্তিদোষ, রাত্রি ভোর ঘ ৬।১৭ গতে যাত্রাশুভ, পশ্চিমে নাস্তি। ষড়শীতি সংক্রান্তি। রাত্রি ভোর ঘ ৫।১৯ মধ্যে নিম্বসংক্রান্তি পর্ব্বজন্য আমিষ অভক্ষ্য।

সন ১৩২৩, অগ্রহায়ণ মাসের দিনপঞ্জিকা সমাপ্ত।

হিন্দু।

[ভারতী শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ লিখিত।]

তন্ত্রী তোমার ছিন্ন যন্ত্রী তপোবন বুঝি স্তব্ধ
নহিলে কোথায় উদ্‌গীথরব * সামের মধুর শব্দ।
ধর্ম্মের ধ্বনি নীরব আজিকে কাঁদে সকরুণে কর্ম্ম।
চতুর্ব্বর্গ সাড়া হীন ঠিক যেন প্রাণহীন চর্ম্ম।
মহাকাল-স্রোতে যেতেছে ভাসিয়া মহিমা তোমার সর্ব্ব।
ভুলেছ, একদা গরিমায় তব খর্ব্ব নিখিল-গর্ব্ব।
হয়েছে আত্ম- বিস্মৃতি তব জগত ভোলেনি' কিন্তু,—
তুমি যে অনাদি জ্ঞানের মালিক শাশ্বত মহা হিন্দু॥

হৃদয় তোমার স্বচ্ছ-উজ্জল বিজ্ঞান-আলো-স্পর্শে,
ধরার আঁধার ঘুচেছিল ওগো! তব উন্নতি দর্শে।
যদিও প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায় শুষ্ক স্নেহের বিন্দু—
উচ্চ তবুও বিশ্বের মাঝে তুচ্ছ নহ ত' হিন্দু।
শতেক ঝঞ্ঝা শত বিপ্লবে টলেনি' কেশের গুচ্ছ;
এ জগতী-তলে নৈতিক বলে তুমি যে সবার উচ্চ।
তোমারি কীর্ত্তি বিশ্ব-প্রথিত ভুলেছ কি ওগো হিন্দু,—
তোমারি যে কোন পূর্ব্ব-পুরুষ পান করেছিল সিন্ধু॥

চার্ব্বাক আদি নাস্তিক মত করিয়া এসেছ তুচ্ছ;
বেদান্ত তব অদ্বৈতবাদে বিতরে কিরণ উচ্চ।
সাংখ্যে কপিল ধবিল পুরুষে করিয়া বিহীন কর্ম্ম।
পৃথিবীর দ্বারে বুদ্ধ, নিমাই ধ'রেছিল তব ধর্ম্ম।
বিশ্বামিত্র দেখাল বিশ্বে সাধনায় বলী শক্ত।
গুরুর নিদ্রা ভগ্নের ভয়ে কর্ণ মাখিল রক্ত।
প্রভাকর ধায় রাবণ হুকুমে আবরিতে পুনঃ ইন্দু।
কর্ম্মের ভেরী থেমে গেল কেন জগতে তোমার হিন্দু॥

দেখাল নিজের আত্মার বল বশিষ্ঠ হ'য়ে নিঃস্ব,
পুত্র-হত্যা, প্রতিশোধে ক্ষমা চমকে সারাটি বিশ্ব।
ভিক্ষুণী নিজে বিবসনা হ'য়ে হাসিমুখে দিল বস্ত্র।
দধীচির দান অমৃত-মধুর † অমরের সেবা শস্ত্র।
তা.দের বংশে জনম তোমার ভুল না এ কথা হিন্দু।
তোমার পূর্ব্ব- পুরুষ ছিল যে নিখিল গুণের সিন্ধু।
যদিও সে যশ হয়েছে লুপ্ত তথাপি তাহার বিন্দু—
এক দিন তব উদয়-অচলে টানিয়া আনিবে ইন্দু॥

---

* বৈদিক-উচ্চারণ। † ন মৃত-অমৃত, চিরজীবিত।

মুর্শিদাবাদের নবাব সার্ ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা খাঁ বাহাদুর।

কে. সি. এস. আই., কে. সি. ভি. ও.।

ইতিসাম উলমুল্ক রইস্উদ্দৌলা আমীর উল্ ওমরা নবাব আসিফ কাদের সৈয়দ সার ওয়াসিফ আলি মির্জ্জা খাঁ বাহাদুর মহবৎ জঙ্গ কে. সি. এস. আই., কে. সি. ভি. ও. এখন মুর্শিদাবাদের মস্নদ অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর নবাব আলি কাদর সৈয়দ হাসান আলি মির্জ্জা বাহাদুরের পুত্র এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ নবাব-নাজিম সৈয়দ মনসুর আলি খাঁ বাহাদুরের পৌত্র। ইনি ইংরেজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। নবাব বাহাদুর পয়গম্বর মহম্মদের ও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হজরৎ আলির বংশধর। হজরৎ আলি মহাপুরুষ মহম্মদের উত্তরাধিকারী ও জামাতা ছিলেন। ইনি মহাপুরুষ মহম্মদের একমাত্র কন্যা হজরৎ ফাতেমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। হজরৎ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র এমাম হাসানের হাসান মাসান্না নামে এক পুত্র ছিল। হজরৎ আলির কনিষ্ঠ পুত্রের কন্যা ফাতেমা শোগ্রার সহিত হাসান মাসান্নার শুভ বিবাহ হয়। এই বংশের এক শাখা বহু শতাব্দ ধরিয়া মক্কার সেরিফের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। হাসান মাসান্নার ও ফাতেমা শোগ্রার এক পৌত্র ইব্রাহিম তাহা তাহেইক নামে অভিহিত হইতেন। ঐ নামের অর্থ পবিত্র বা নিষ্কলঙ্ক। মুর্শিদাবাদের নবাববংশ এই ইব্রাহিমের বংশ। ইব্রাহিমের বংশধরগণ কিছুকাল আরবের অন্তর্গত এমেন নামক অঞ্চলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এই বংশের সৈয়দ হোসায়ন নাজাফি নাজাফে হজরৎ আলির সমাধিমন্দিরের চাবিরক্ষক ছিলেন। মীরজাফর তাঁহারই পৌত্র। সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর এই মীরজাফরই বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফরের পিতামহ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহার খুল্লতাত নাজাফি খাঁ গোয়ালিয়র দুর্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; আর এক খুল্লতাত কটকের সুবাদার ছিলেন। মীরজাফর স্বয়ং আলিবর্দ্দী খাঁর সেনাপতি ও ভগিনীপতি ছিলেন। পলাসীর যুদ্ধে আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হইলে মীরজাফরই বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুর্শিদাবাদের বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর সেই মীরজাফরের বংশের অষ্টম পুরুষ। ইংলণ্ডের সম্রাট্ চতুর্থ উইলিয়ম নবাব বাহাদুরের প্রপিতামহ হুমায়ুন ঝাকে তাঁহার একটি পূর্ণায়তন প্রতিকৃতি এবং Grand Cross of the Royal Hanoverian Guelphic Order ও রাজচিহ্ন এবং স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্র দিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর বাল্যকালেই বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। শিক্ষাসম্পর্কিত ব্যাপার তিনি অল্প বয়সে যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেন, তত অল্প বয়সে ঐরূপ বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে বড় একটা কাহাকেও দেখা যায় না।

নবাব বাহাদুর বাল্যকালে কলিকাতার ডভটন কলেজেই বিদ্যাভ্যাস করেন। তথায় তিনি ইংরেজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি বিলাতে গমন করিয়া শেরবোর্ণ, রাগ্‌বি ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের বহু স্থানে, য়ুরোপের অনেক দেশে এবং মিশরে পরিভ্রমণ করিয়া অশেষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। নানাদেশের ও নানাজাতির আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি প্রভৃতির সহিত

পরিচিত হইবার বাসনা তাঁহার মনে এই সময় অত্যন্ত বলবতী হয়। তাঁহার সেই অর্জ্জিত অভিজ্ঞতা তাঁহার পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিবার সময় বিশেষ প্রয়োজনে আসিয়াছিল। কি সাংসারিক ব্যবস্থায়, কি রাজকার্য্য-পরিচালনে, সকল বিষয়ে তাঁহার সেই জ্ঞান তাঁহার কার্য্যের গৌরববৃদ্ধি করিত। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বংশের নরপালকগণ কখনও পশুবলে রাজ্যশাসন করেন নাই; তাঁহারা সকলেই ন্যায়ধর্ম্মানুমত বিচার-বুদ্ধিতে এবং প্রজাদিগের প্রয়োজনসাধনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রাজ্য-পালন করিতেন। যাঁহারা বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের চরিত্রবল অবগত আছেন, তাঁহারা সকল বিষয়ে সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারাই নবাব বাহাদুরের সংস্পর্শে আইসেন, তাঁহারাই তাঁহার প্রতিভাপ্রোজ্জ্বল সুন্দর বদনমণ্ডলদর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে তিনি ইংরেজী-ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। নবাব বাহাদুরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অদম্য কার্য্যকরী শক্তি এবং সর্ব্বপ্রকার অসুবিধাজনক ও প্রতিকূল অবস্থাতে প্রত্যেক ব্যাপারের ভাল দিক্‌টা দেখিবার প্রবৃত্তিই তাঁহার চরিত্রকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে। নবাব বাহাদুর যখন মুর্শিদাবাদের মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার তদানীন্তন ছোটলাট সার্ জন উডবার্ণ তাঁহাকে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক-পরিষদের সদস্য মনোনীত করিয়াছিলেন এবং তাহার পরবৎসরই লর্ড কার্জ্জন বাহাদুর তাঁহাকে বাঙ্গালার প্রতিনিধিস্বরূপ সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের দিল্লীর অভিষেক দরবারে নিমন্ত্রণ করেন। ইদানীং বাঙ্গালার বর্ত্তমান গবর্ণর বাহাদুর নবাব বাহাদুরকে দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্য মনোনীত করিয়াছেন।

নবাব বাহাদুরের আদবকায়দা সুন্দর ও মার্জ্জিত। তাঁহাতে প্রাচ্য রাজগুণের ও প্রতীচ্য ভদ্রলোকের গুণা-বলীর একত্র সমাবেশ লক্ষিত হয়। ইনি ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস্ প্রভৃতি পুরুষোচিত ক্রীড়া ভালবাসেন, ব্যাঘ্র শিকার করিতে নিবিড় জঙ্গলে গমন করেন। পোলো খেলিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন। ইনি যে পোলোদলের কাপ্তেন, সে পোলোদল প্রায় অন্য দলের নিকট পরাজিত হয় না।

কিল্লা নিজামৎ।

য়ুরোপে ও ভারতে নবাব বাহাদুরের বহু প্রাসাদ আছে সত্য, কিন্তু যাহার সহিত পৈতৃক ও পারিবারিক সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ—যাহাকে প্রকৃতপক্ষে 'বাড়ী' বলা যায়, তাহার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প। তাঁহার বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় নিজামৎ কেল্লা বা দুর্গ। বঙ্গবাসীর নিকট উহা "হাজার দেউড়ী" নামেই পরিচিত। ইহাই মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের প্রাসাদ। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে আরব্ধ হয়। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে এই গৃহে তদানীন্তন নবাব বাহাদুর প্রবেশ করেন। তদবধি ইহা নবাববংশের বাসস্থান হইয়া আসিতেছে।

এই প্রাসাদ দৈর্ঘ্যে ৪১৬ ফিট, প্রস্থে ২০৪ ফিট এবং উচ্চতায় ৮৫ ফিট। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১৬।৷০ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। ইহার চারিদিকেই সুন্দর বৃক্ষরাজি বিরাজিত। ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরে এই প্রাসাদ অবস্থিত। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার চতুঃপার্শ্বস্থিত শষ্পাচ্ছাদিত হরিৎ ক্ষেত্র, সুঠাম গঠন বর্ম্ম এবং প্রাসাদসংলগ্ন ইমামবাড়ীর গুম্বজ দর্শকের নয়নমন আকৃষ্ট করে।

ইতিহাস ও কলা-বিদ্যার হিসাবে এ প্রাসাদ ভারতের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই প্রাসাদ যে কেবল ওলন্দাজ, ফ্লেমিশ, ফরাসী ও ইটালীয় কারুশিল্প, অমূল্য রত্নরাজি ও সুন্দর ভাস্করশিল্পদ্বারা সুসজ্জিত, তাহা নহে; পরন্তু ইহার সহিত যে সকল সুকোমল ভাবপূর্ণ পারিবারিক স্মৃতি বিজড়িত আছে, তাহাই ইহাকে বিশেষরূপে চিত্তাকর্ষী করিয়া তুলিয়াছে, এ কথা অবিসম্বাদে বলা যাইতে পারে। এই প্রাসাদ ডোরিক ভঙ্গীতে রচিত। ইহাতে উঠিবার সিঁড়িতে ৩৬টি ধাপ আছে। ইহার নিম্ন ধাপ ১০৮ ফিট ও উচ্চতম ধাপ ৬৫ ফিট চওড়া। ইহার দেউড়ীর সম্মুখস্থ গাড়িবারান্দা ডোরিক স্তম্ভে অলঙ্কৃত, দেউড়ী বা তোরণ বাদামাকৃতি, উহার মেঝে ইটালী হইতে আনীত ধূসরবর্ণের মর্ম্মরপ্রস্তরে আস্তৃত।

প্রাসাদে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে দরবার-গৃহ। উহাতে নবাবের গদী বা সিংহাসন অবস্থিত। উহা মর্ম্মরনির্ম্মিত ও সুবর্ণখচিত। রাজসম্পর্কিত-ব্যাপারে সুবর্ণের আসনই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য বহুমূল্য আসন অনেক আছে। দরবার-গৃহের পরই ভোজ-গৃহ। ভোজ-গৃহ দৈর্ঘ্যে ৯৪ ফিট, প্রস্থে ৫৭ ফিট। কিন্তু যখন নবাব ভোজাদি প্রদান করেন, তখন পার্শ্বের সরান দ্বারগুলি উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকের গৃহগুলিতে প্রায় সাড়ে তিন শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তির স্থান সঙ্কুলান হয়।

নবাববাড়ী দেখিতে গেলে নবাবপ্রাসাদের চিত্রশালিকা সন্দর্শন করা কর্ত্তব্য। উহাতে বহু প্রসিদ্ধ চিত্রকরের অঙ্কিত অতি সুন্দর সুন্দর চিত্র আছে। তাহার মধ্যে কোন্‌টিকে ছাড়িয়া কোন্‌টির কথা বলা যাইবে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। স্কোটেলের অঙ্কিত "সাগর-দৃশ্য" অতি সুন্দর। চিত্রকর এমন অপূর্ব্ব কৌশলে সেই ঝটিকাতাড়িত সাগর-দৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন যে, তাহার চিত্রকার্য্যের গুণে ভ্রকুটি-ভীষণ কাদম্বিনীমালার এবং বারিধিবক্ষস্থিত চলোর্ম্মির

চাঞ্চল্যও যেন লক্ষিত হইতে থাকে। এই চিত্রের সন্নিকটে রাফেল, স্নাইডার, রেম্‌ব্রাণ্ট প্রভৃতি চিত্রকরের চিত্রকৌশল-পূর্ণ চিত্রাবলী রক্ষিত আছে। তাহার পর বড় নাচঘরে সম্রাট্ চতুর্থ উইলিয়মের পূর্ণাকৃতি প্রতিকৃতি। চতুর্থ উইলিয়ম মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম হুমায়ুন ঝাকে উপহার দিবার জন্যই ইহা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন বলিয়া নবাব-বংশীয় লোকরা ইহাকে অত্যন্ত মূল্যবান্ মনে করিয়া থাকেন। রাজা চতুর্থ উইলিয়ম ইহা নবাব বাহাদুরকে উপহার দিবার সময় ইহার সহিত স্বহস্তে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উহা লিখিত হয়। এই স্থানে জগদ্বিখ্যাত পশুচিত্রকর ল্যাণ্ডসিয়ারের চিত্র আছে, দর্শকদিগের তাহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। এই স্থানে মৌলিক সুন্দর সুন্দর চিত্রের অনেক তক্ষণ শিল্প আছে, অনেকেই তাহার বিবরণ অবগত আছেন। একখানি চিত্রে দৃষ্ট হইবে,—একটি ফরাসী কুক্কুর ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে। সে গম্ভীরভাবে একখানি চরণ একটি উন্মুক্ত আইনের পুস্তকের উপর রাখিয়াছে, আর তাহার সম্মুখে নানাজাতীয় ব্যবহারাজীব কুক্কুর রহিয়াছে; বিচারাসনে উপবিষ্ট কুক্কুর গম্ভীরভাবে তাহাদিগের প্রতি নেত্রপাত করিতেছে। সে দৃশ্যটি এমন সুন্দরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে যে, উহা দেখিলেই বোধ হয়, বিচারাসনে উপবিষ্ট সরমানন্দনের মুখ হইতে যেন অতিশয় উৎসাহী কৌন্সিলকে কোনপ্রকার তিরস্কারসূচক বাক্য বহির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে।

নাচঘরের আস্‌বাবগুলিও সম্রাট জর্জ্জের আমলের। কিন্তু ইহার মধ্যে দ্বিরদরদনির্ম্মিত কৌচ, কেদারা, অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গাড়ী, দেবদেবী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই নাচঘরের পরেই নবাব বাহাদুরের শয়নকক্ষ; দৈর্ঘ্যে ৪৭ ফিট, প্রস্থে ২৯ ফিট। তাহার পরেই নবাব বাহাদুরের পারিবারিক চিত্রশালা। ইহাতে নবাববংশে পূর্ব্বগত ও বর্ত্তমান ব্যক্তিদিগের চিত্র রক্ষিত আছে। এই স্থানে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, নবাব মীরজাফর, বর্ত্তমান নবাবের দুই পুত্র এবং আরও অনেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির প্রতিকৃতি চিত্রিত আছে। প্রধান বৈঠকখানায় অনেকগুলি সুন্দর চিত্র আছে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য গৃহে যে কত শিল্পকলার নিদর্শন, চিত্র, ভাস্করকার্য্য প্রভৃতি আছে, তাহা বলা যায় না। নবাববাড়ীর উপরে সুন্দর বলনাচের ঘর, উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ভোজ-গৃহের সমান। পুস্তকালয়টি বিশেষ দর্শনযোগ্য। ইহাতে প্রায় পাঁচ হাজার ইংরেজী গ্রন্থ ও চারি হাজার প্রাচ্যভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে তিন খণ্ড পবিত্র কোরাণই বিশেষ দর্শনীয়। ইহা সুন্দর-ভাবে স্বর্ণদ্বারা রঞ্জিত। ঐ তিনখানির তারিখ ১২৭৭, ১২৮১ ও ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দ।

ইহাতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত সেক্সপীয়রের সুন্দর গ্রন্থা-বলী, হগার্থের চিত্রাবলী, লিউইসের English Scenery প্রভৃতি সাহিত্যিকদিগের আদরের গ্রন্থ আছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, বর্ত্তমান নবাব বাহাদুর সাধারণের দর্শনের সুবিধার জন্য অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য গ্রন্থ ভিক্টোরিয়া স্মৃতিমন্দিরের ন্যাসীদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

এই নবাবপ্রাসাদের মধ্যে তোষাখানাটি অত্যন্ত বিস্ময়-কর। ইহাতে নানাবিধ বর্ম্ম, রত্ন, অলঙ্কার, সাজসজ্জা এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদিগের মর্য্যাদাজ্ঞাপক চিহ্নাদিও আছে। এইখানে কয়েকটি সুন্দর পান্না আছে। উহারা আয়তনে দৈর্ঘ্যে দুই ইঞ্চি, প্রস্থে পৌনে দুই ইঞ্চি; উহা সময় সময় বাহুতে, কখন কোমরবন্দে, কখন উষ্ণীষে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। উষ্ণীষে ব্যবহারের সময় উহা কয়েক খণ্ড হীরকের সহিত ব্যবহৃত হয়। দিল্লীর জনৈক বাদশাহ উহা উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করেন। উহার মূল্য অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। এই স্থানে কয়েকখানি হীরকখচিত তরবারি আছে। উহার একখানি স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বর্ত্তমান নবাব বাহাদুরের পিতাকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। আর একখানি হুমায়ুন বাদশাহের তরবারি ছিল। এই যাদুগৃহে নিরেট রজতনির্ম্মিত পাল্কী আছে এবং দেওয়ালে হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি কারিগরদিগের নির্ম্মিত কামান, তরবারি, বর্শা, বন্দুক ও বিচিত্র অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হইয়াছে।

কিল্লার বাহিরে রাজপ্রাসাদ হইতে অর্দ্ধমাইলের মধ্যে বহরমপুর রাজপথের পার্শ্বে নবাব বাহাদুরের হস্তিশালা, অশ্বশালা ও গাড়ীঘুড়ি থাকিবার আস্তাবল রহিয়াছে।

এক সময়ে তসর ও রেশমের শিল্পজ পণ্যের জন্য মুর্শি-দাবাদ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। প্রাচীন কাগজপত্রে সপ্রমাণ হয় যে, ১৬২১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিয়ালরা এখানে আর কাঁচা মাল খরিদ করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতেও এই শিল্পের অবনতি ঘটে নাই। কারণ ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইহার অবস্থা বেশ ভালই ছিল। কোম্পানী এই শিল্পসম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। যাহারা তুঁতের আবাদ করিবে, সেই সকল রাইয়তকে কোম্পানী দুই বৎসর বিনা খাজনায় পতিত জমী দান করিতে চাহিয়াছিলেন।

ভয়ে জয়।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

দেশভেদে লোকের কেমন প্রকৃতিভেদ হয়—বিশ্বাসভেদ হয়—ভয়ে তাহা বেশ বুঝা যায়। বিলাতের লোক ভয় জয় করিতে চাহে। বালক নেলশন যে বলিয়াছিলেন—"কৈ—ভয় ত কখন আমার কাছে আসে নাই"—তাহাই ইংরাজের আদর্শ। ভয় জয় করিতে হইবে। আমাদের কিন্তু আদর্শ অন্যরূপ। আমাদের দেশে গৃহিণীরা বলিতেন, "ভয় করিলেই জয় হয়।" ভয় থাকিলে সংযত থাকা হয়—ঔদ্ধত্য পরিহার করিতে হয়—বিনয় শিক্ষা করিতে হয়।

সে কালের গৃহিণীরা বলিতেন—

"ভয়! ভয়! ভয়! গুরুজনকে ভয়;
পাছে রুষ্ট হয়।"

গুরুজনকে ভয় করিবে। গুরুজন বলিলে কেবল পিতা-মাতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতাদি বুঝায় না; পরন্তু বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন, প্রভু, এমন কি দেশাধিপ প্রভৃতি সম্মানভাজন-দিগকেও বুঝায়। ইহাদিগকে ভয় করিবে অর্থাৎ যাহাতে ইঁহারা রুষ্ট না হয়েন, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। শ্রদ্ধা স্নেহ আকৃষ্ট করে। আমরা তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিলে তাঁহারাও আমাদিগকে স্নেহ করিবেন। আমরা তাঁহাদের বহুদর্শিতার ও অভিজ্ঞতার ফললাভ করিয়া—স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ—উপদেশ ও যত্ন পাইয়া উপকৃত ও কৃতার্থ হইব।

"ভয়! ভয়! ভয়! আব্দেরেকে ভয়;
পাছে কেড়ে লয়।"

পৃথিবীতে সকল লোকেরই আব্দার আছে। কি রাজা, কি প্রজা; কি ধনী, কি নির্ধন; কি বৃদ্ধ, কি বালক; কি পণ্ডিত, কি মূর্খ—আব্দার সকলেরই আছে। তবে আব্দারের প্রকারভেদ আছে। সেই সব আব্দারের ভয়ে আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত লোকদিগের বিশেষ সতর্কতাবলম্বন সঙ্গত। "চাল" দেখিয়া অনেকেই আব্দারেকে নির্দ্ধারিত করেন। জরীজোব্বার বাহার ও বাহুল্য দেখিলে রাজকর্ম্মচারীরা চাঁদার খাতায় অল্প সহিতে তুষ্ট হয়েন না—যাহার আছে, সে কেন লোকের কল্যাণকর কাজে বা উৎসবে অধিক দিবে না? আমাদের কোন পরিচিত জমীদার এক বার ইনকমটেক্স ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন, "আমার গাড়ী জুড়ী, রূপার বাসন দেখিয়া আমার অবস্থা ঠাহর করিবেন না; আমার দেনার খাতাখানা একবার দেখিতে হইবে।" প্রজার কাপড় যদি ভাল হয়—মাথায় যদি কেশের পারিপাট্য লক্ষিত হয়, তবে জমীদার নানা বাবদে তাহার কাছে বাজে আদায়ের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়েন। ডাক্তার রোগীর অবস্থা না বুঝিয়া গৃহস্থের অবস্থা বুঝিয়া ঔষধ-পথ্যের ও ঘন ঘন "ভিজিটের" ব্যবস্থা করেন। উকীল মক্কেল আসিলেই নানাপ্রশ্নে জানিতে চেষ্টা করেন, মক্কেল "শাঁসে জলে" অর্থাৎ Fat কি না? ইঞ্জিনিয়ার যদি জানিলেন,—লোকটির টাকা আছে, তবে পরম আদরে বাড়ীর নক্সা করিয়া—দেখিবার সব ভার লইয়া কাজ আরম্ভ করেন। তাহার পর টাকা জলের মত সরবরাহ না করিলে আর বাড়ী হয় না। তাই গৃহস্থের সাবধান না হইলে আর উপায় নাই।

সে কালের গৃহিণীরা নূতন কাপড় পরিবার সময় তাহা কাটিয়া এক "খেই" সূতা লইয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া বলিতেন—"কাঁটা লও; খোঁচা লও; চোর লও; আগুন লও"—ইত্যাদি অর্থাৎ তাঁহারা সর্ব্বদাই বিপদের কথা ও ব্যাঘাতের কথা মনে রাখিতেন—সুতরাং সর্ব্বদাই সাবধান হইয়া থাকিতেন। "সাবধানের বিনাশ নাই।"

আমরা আজকাল এ সব উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া—এ সব কুসংস্কার পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া থাকি। আমরা অসাবধান হই। আর তাহারই ফলে আমাদের পদে পদে বিপদ্ ঘটে।

আমরা যদি স্মরণ রাখি, ভয় জয় করিলেই জয়লাভ হয় না, ভয়েই সংসারে জয়লাভ হয়—তবে অনেক বিষয়ে আমাদের বিশেষ লাভ হয়। আত্মশক্তিতে অতিপ্রত্যয়ে অনেক সময় আমাদের অধঃপতন হয়—সর্ব্বনাশ ঘটে। সে অবস্থায় যদি আমরা ভয় করিয়া চলি, তবে সংযমের শাসন পদে পদে আমাদের উপকার করিতে পারে—আর বিপদের সম্ভাবনা হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া আমরা শান্তিতে সংসারযাপন করিতে পারি।

ইতিহাস।

আজকাল আমাদের দেশে ইতিহাসের কথঞ্চিৎ আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। অনেক প্রতিভাশালী মনস্বী মহাত্মা ইতিহাসের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। পুরা-বস্তুর সহায়তায় ইতিহাসের অনেক লুপ্ত অধ্যায়ের উদ্ধার-সাধনের প্রচেষ্টা হইতেছে। ইতিহাসনামধেয় কতকগুলি গ্রন্থও লিখিত এবং প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে। ইহা সুসংবাদ, সন্দেহ নাই। কারণ যদি কোন জ্ঞান মানুষকে ত্রিকালজ্ঞ করিতে পারে, তাহা হইলে একমাত্র ঐতিহাসিক জ্ঞান তাহা করিতে সমর্থ, ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

এখন জিজ্ঞাস্য,—ইতিহাস কাহাকে বলে? ইহার আভি-ধানিক অর্থ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বা প্রাচীন কথা। মানুষের সমাজে অতীত যুগে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহারই বিবরণপূর্ণ গ্রন্থ "ইতিহাস" নামে অভিহিত। আমাদের দেশে ইতিহাসের এইরূপ সংজ্ঞা প্রদত্ত হইত।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্।
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥

ইহার অর্থ এই যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-সম্বন্ধীয় উপদেশসমন্বিত পূর্ব্বকালের কথা যে গ্রন্থে আলোচিত হয়, সেই গ্রন্থকে ইতিহাস কহে। পূর্ব্ববৃত্ত কথার অর্থ কি? পূর্ব্বে যাহা ছিল, তাহারই কথা। অপিচ বৃত্ত অর্থে চরিত্রও হয়। পূর্ব্বে যে সকল লোক ছিল, তাহারই কথা। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, পূর্ব্বের লোকদিগকে ব্যষ্টিভাবে না সমষ্টিভাবে বুঝিতে হইবে? এ কথার উত্তর দেওয়া কঠিন। রামায়ণ বা মহাভারত গ্রন্থে ব্যক্তিগত কথারই বাহুল্য দৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐ দুই গ্রন্থেই সেই ব্যক্তিগত কথার ভিতর দিয়া সমাজগত কথা বেশ ফুটাইয়া তোলা আছে। উহাতে—বিশেষতঃ মহাভারতে রাজগণের কথা যেরূপ আছে, শবরী ও নিষাদীর কথাও সেইরূপ আছে। এক একটা চরিত্র ধরিয়া সমাজের সব চরিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত আছে। তবে সেই অঙ্কনের ছাঁচ বা ঢং সেই সেকালের রুচিসঙ্গত, আমাদের হাল-আমলের রুচির অনুযায়ী নহে। সুতরাং ইতিহাস অতীতকালের ব্যক্তিগত কথা কি সমাজগত কথা, তাহা লইয়া তর্ক চলিতে পারে, কিন্তু মীমাংসার সম্ভাবনা অল্প। কারণ দুইদিকেই অনেক কথা বলিবার আছে। আমার মতে বৃত্তশব্দের অর্থ যাহা ছিল। বৃৎ ধাতুর অর্থ বর্ত্তমান থাকা। পূর্ব্বে যাহা কিছু ছিল, তাহারই কথা অথবা বৃত্ত অর্থে সংঘটিত, পূর্ব্বে যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহারই কথা—পূর্ব্ববৃত্তকথা। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটিই মানুষের কাম্য অর্থাৎ মানুষের যাহা কিছু কাম্য তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হইতে পারে, এইরূপ উপদেশসম্বলিত যে পূর্ব্বে সংঘটিত ব্যাপারের কথা, তাহাই ইতিহাস। কোন দেশের ইতিহাস লিখিত হইলে সেই দেশে যে যে জাতি বাস করে, সেই জাতির অভ্যুদয় হইতে তাহার সমাজ ও সভ্যতা বিকাশের সকল কথাই বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হয়। সেই জাতির যাহা কাম্য, তাহার কারণকার্য্যানুক্রমে গবেষণা করিতে হয়। অনেকে হয় ত বলিবেন, আমাদের দেশে এরূপ ইতিহাস কোনকালেই ছিল না। আমার মতে সেরূপ কোন ইতিহাস এখন আর নাই বলাই সঙ্গত। কারণ যে দেশে প্রত্যেক বংশের কৌলিক ইতিহাস লিখিবার পদ্ধতি বহুকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, সে দেশের যে জাতীয় ইতিহাস ছিল না, তাহা মনে হয় না। তবে কালবশে তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। পরে সে কথা আলোচনা করিব।

আজকাল আমরা সকল বিষয়ই পাশ্চাত্যদৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। পাশ্চাত্য-শিক্ষাই আমাদের অস্থি-মজ্জায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। পাশ্চাত্য-আদর্শেই আমরা আজকাল ইতিহাসের আলোচনা করিতেছি। ইহাতে দোষের কথা কিছুই নাই। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে, তাহাও নানাকারণে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যাহারা ইতিহাস আলোচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ইতি-হাসের আলোচনাপদ্ধতি গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মানুমোদিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইতিহাস বলিলে ঘটনাবলীর আলোচনা—তাহার আবিষ্কার প্রভৃতি বুঝিয়া থাকেন। এই অর্থটি অবশ্য অত্যন্ত ব্যাপক। কিন্তু চলিতভাষায় কালানুসারে পর্য্যায়ক্রমে মানবসমাজে যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহারই বিবরণ বুঝায়। কিন্তু কেবল কালক্রমে বিন্যস্ত ঘটনাবলি বর্ণিত করিলেই ইতিহাস সম্পূর্ণ হয় না। সেই ঘটনাবলির মধ্যে কার্য্যকারণসম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাহাদিগকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানের রাজ্যমধ্যে আনিয়া ফেলিবার চেষ্টা করাও কর্ত্তব্য। কেবল কালক্রমে কতকগুলি ঘটনার ফিরিস্তি বা তালিকা দিলেই ইতিহাস লেখা হয় না। ইতিহাস লিখিতে হইলে অতীতের চিত্র জনসমাজের সম্মুখে স্পষ্টভাবে প্রকটিত করিতে হয়। সে কার্য্য বড় সহজ নহে। ইতিহাসে কল্পনার প্রয়োজন আছেও বটে, নাইও বটে। পর্য্যায়ক্রমে সংঘটিত কতকগুলি ঘটনা শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইতে হইলে ঐতিহাসিকের কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের কল্পনা যদি একটু বেচাল চলে, তাহা হইলে তাহাতে সওয়ার হইয়া যিনি ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহার লিখিত ইতিহাস উপন্যাসের রাজ্যে আসিয়া হাজির হইবে। সংযত কল্পনার অভাবে অনেক

মনস্বী লেখকের ইতিহাস ইতিহাসের সীমানা ছাড়াইয়া উপন্যাসের এলাকায় যাইয়া হাজির হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষ ঐরূপ কল্পনা পরিহার করিতে পারে না। মানুষের কল্পনা ইতিহাসকে কতকটা বিকৃত করিয়া ফেলিবেই ফেলিবে। সেই জন্য ফষ্ট (Faust) একজন ইতিহাস-শিক্ষার্থীকে বলিয়াছিলেন,—"The times which are gone are a book with seven seals, but what you call the spirit of the past ages is but the spirit of this or that worthy gentleman in whose mind these ages are reflected." "বন্ধুবর, অতীত যুগের প্রকৃত ব্যাপার জানিবার কোন উপায় নাই। যাহাকে তোমরা অতীতযুগের ব্যাপার বল, তাহা কোন না কোন ভদ্রলোকের কল্পনাফলিত মানসব্যাপার মাত্র।" ডাক্তার ফষ্টের কথা অবশ্য এখনকার যুগে বিশেষজ্ঞের উক্তি বলিয়া বিবেচিত নহে। কিন্তু কথাটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। আমাদের যাহার যেমন চক্ষু, সে সেইরূপই দেখি; যাহার যেমন বুদ্ধি, সে সেইরূপই বিচার করি। বর্ত্তমান যুগের মাপকাঠী দিয়া আমরা অতীতব্যাপারের পরিমাপ করিয়া থাকি। কাজেই অতীতের তথ্য যথাযথভাবে আমাদের মানস-মুকুরে প্রতিফলিত হয় না। কাজেই দর্পণের দোষে আমরা উহার বিকৃত প্রতিবিম্বই দেখি। একটা উদাহরণদ্বারা তাহা বেশ বুঝা যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটা গল্প আছে,—সত্যকাম নামক বালক ব্রহ্মবিদ্যাশিক্ষার জন্য গৌতমগোত্রিয় হারিদ্রুমত নামক জনৈক ঋষির নিকট গমন করে। ঋষি তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বৎস! তোমার গোত্র কি?" কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কাহাকেও ব্রহ্মবিদ্যা দান করা হইত না। সত্যকাম স্বীয় গোত্র জানিতেন না। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,"জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছি, তিনি আমার গোত্র জানেন না। তিনি বলিয়াছেন, যৌবনে আমি বহুলোকের পরিচর্য্যা করিয়া বেড়াইয়াছি; সেই সময় আমি তোমাকে লাভ করি; আমি তোমার গোত্র জানি না; আমার নাম জবালা, তোমার নাম সত্যকাম। তুমি আচার্য্যকে বলিও যে, তুমি জবালার পুত্র সত্যকাম।" হারিদ্রুমত ঋষি উত্তর করিলেন, "অব্রাহ্মণ কখনও এমন কথা বলিতে পারে না। তুমি সত্য হইতে বিচ্যুত হও নাই। সমিধ লইয়া আইস, আমি তোমাকে শিষ্য করিয়া লইব।"

কথা এইটুকু। এই ঘটনার বিবরণ হইতে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতের রীতি-নীতি-সম্বন্ধে কতরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিতেছেন, দেখুন। হিন্দু-সমাজের কালাপাহাড়ীদল সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, জবালা যৌবনে বহুপুরুষে উপগতা হইয়া সত্যকামকে লাভ করে। সুতরাং সত্যকাম কাহার ঔরসপুত্র, তাহা সে অবধারণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য সে তাহার পুত্রের গোত্র নির্দ্দিষ্ট করিতে অসমর্থ হয়। সত্যকাম সত্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য এত বড় একটা লজ্জার কথা গোপন করে নাই, বরং অকুতোভয়ে সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছে, সুতরাং তাহার সত্যনিষ্ঠায় বিস্মিত হারিদ্রুমত তাহাকে ব্রাহ্মণতনয় বলিয়াই উপনীত করিয়াছিলেন। আধুনিক যুগে অনেকেরই, বোধ হয়, শতকরা নিরানব্বুই জনের এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হইতে পারে। কারণ জননীর কলঙ্কের কথা পুত্রের পক্ষে অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে যেরূপ বুকের পাটার দরকার, যেরূপ সত্যনিষ্ঠার প্রয়োজন, তাহা দেখিয়া ঋষিরও বিস্মিত হইবার কথা। বুকের পাটা মাপিবার এই হাল-আমলের মাপকাঠী লইয়া বিচার করিতে হইলেই ঐরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক। এই মতাবলম্বী ঐতিহাসিকগণ এই বিবরণ হইতে দুইটি ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত করিলেন। প্রথম উপনিষদের যুগে যৌনসম্বন্ধের এত বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি ছিল না; তখনকার আর্য্যনারীরা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াও যে কেবল সমাজে স্থান পাইত, তাহা নহে; পরন্তু পুত্রের নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে সঙ্কোচবোধ করিত না! অহো প্রাচীন হিন্দু-সমাজের কি উদারতা!! দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে, প্রবল সত্যনিষ্ঠা থাকিলে বেশ্যাপুত্রও ব্রহ্মচর্য্য করিবার ও ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার অধিকারী হইত!

সত্য বটে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে স্ত্রীগণ অরুদ্ধা, স্বাধীনা ও স্বচ্ছন্দবিহারিণী ছিলেন। পতিকে অতিক্রম করিয়া পরপুরুষে উপগত হইলে তাঁহাদের অধর্ম্ম হইত না। প্রাচীনকালে ইহাই ধর্ম্ম ছিল। মহর্ষিরাও তখন এই ধর্ম্ম মান্য করিতেন।* তবে তখনও নারীরা স্বীয় বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণের পুরুষে উপগতা হইতে পারিতেন না।† "ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ," অত্রি-সংহিতার এই বচন সেই সময়ের প্রথার দ্যোতনা করিতেছে। কিন্তু তাহা হইলেও সে সময় বংশধারার নির্ম্মলতারক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরপুরুষে উপগতা স্ত্রী পুনরায় ঋতুকাল পর্য্যন্ত অশুদ্ধা থাকিতেন। পতি পুনরায় রজঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীর সহিত ব্যবহার করিতেন না। "রজসা শুধ্যতে নারী" এই প্রাচীন স্মৃতিবচনই তাহার প্রমাণ। উদ্দালক নামক মহর্ষির পুত্র শ্বেতকেতুই দাম্পত্যধর্ম্মের ও পাতিব্রত্যধর্ম্মের বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিয়া যান। কিন্তু আমাদের কথা হইতেছে যে, সত্যকাম-জাবালের কথা যদি সেই সময়েরই হয়, তাহা হইলে সে কথা বলিতে সত্যকামের লজ্জা কি ছিল? সঙ্কোচই বা থাকিবে কেন যে, হারিদ্রুমত ঋষি সেই সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাহাকে একেবারে অব্রাহ্মণ নহে সাব্যস্ত করিলেন? সমাজে যাহা

* প্রমাণ দৃষ্টো ধর্ম্মোহয়ং পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ। মহাভারত আদিপর্ব্ব ১২২ অধ্যায়.

† যথা গাবঃ স্থিতা তাত স্বে স্বে বর্ণে তথা প্রজাঃ। ঐ ঐ ঐ

চলিত, তাহা স্বীকার করাতে লজ্জার বা সঙ্কোচের কোন কারণই ঘটিতে পারে না। "ন সত্যদগাঃ" এই বলিয়া তিনি হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাহাকে উপনীত করিলেন কেন? আমরা এখনকার দৃষ্টিতে দেখিয়া সত্যকামের সত্যনিষ্ঠায় বিস্ময় প্রকাশ করি, সেই জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়। যে সমাজে থাকিয়া "আমি বহুপুরুষে উপগতা হইয়াছি" এই কথা মা বড় গলা করিয়া ছেলেকে বলিতে পারে, সেই সমাজে পুত্র, তাহার বাপের ঠিক নাই বলিলে বাহাদুরী পাইবে কেন? ঐরূপ স্বচ্ছন্দবিহারিণী রমণী যে সমাজে স্থান পায়, সে সমাজের কোন কাজই গোত্র-প্রবর লইয়া হইতে পারে না। সুতরাং উপর্য্যুক্ত ঐতিহাসিক গবেষণা ভ্রান্ত।

আর দল গবেষণাকারীরা বলেন—জবালা বহুস্থানে পরিচারিকাবৃত্তি করিয়া বেড়াইয়াছিল। সে সত্যকামকে কুড়াইয়া পায়। সত্যকাম জবালার পালিত পুত্র। সে কোন্ বর্ণের বালক, তাহার পালিকা মাতা তাহা জানিত না। কাজেই সে তাহা বলিতে পারে নাই। ইঁহারা এই উপাখ্যান হইতে সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে, প্রাচীনকালে ঋষিরা সত্যনিষ্ঠ যোগ্যব্যক্তি অজ্ঞাতকুলশীল হইলেও তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট করিতেন। এই সিদ্ধান্তও ঠিক মনে হয় না। কারণ সত্যকামের উত্তর শুনিয়া মহর্ষি হারিদ্রুমত বলিয়াছিলেন,—"নৈতদব্রাহ্মণো বক্তুমর্হতি" অব্রাহ্মণ কথনই এমন কথা বলিতে পারে না। এই দলের গবেষণাকারীরা বলেন,—ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার যোগ্য আর অব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার অযোগ্য। এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহার ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ), এরূপ কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সত্যকামের যদি ব্রহ্মজ্ঞানই জন্মিত, তাহা হইলে সে হারিদ্রুমতের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিখিতে আসিবে কেন? আর জবালা আমাকে কুড়াইয়া পাইয়াছে, এ কথায় ঋষি এমন কি সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন যে, তাহাতেই তিনি সত্যকামকে ব্রহ্মবিদ্যা শিখিবার যোগ্য মনে করিলেন? দুর্ভিক্ষের সময় অনেকে অনেক ছেলে কুড়াইয়া পায়। সে পরিচয় দিতে বিশেষ গৌরব বা সঙ্কোচের বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং এই সিদ্ধান্তও বিচারসহ নহে। এত সরল ও সহজ পরীক্ষায় ঋষিরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদান করিতেন না। এই দুইটিই আধুনিক ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্ত। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কষ্টের মতই ঠিক। ঐতিহাসিক গবেষণা ও সিদ্ধান্ত ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকলিত একটা মত মাত্র। সত্যের সহিত উহার কতটা মিল হয়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।

ঐ উপাখ্যান সম্বন্ধে আমাদের দেশের একটা প্রাচীন মত আছে। সে মতটা এই:—ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রাহ্মণ গৃহস্থের পক্ষে অতিথিসেবা অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। ব্রাহ্মণের গৃহে অনূঢ়া কন্যাদিগের হস্তেই অতিথিসেবার ভার থাকিত। কথাপ্রসঙ্গে শকুন্তলাই যে অতিথিসেবার ভার পাইয়াছিলেন, তাহা নহে, সকল ব্রাহ্মণবাড়ীতেই বয়স্থা কন্যা অতিথিসেবা করিতেন। ক্ষত্রিয় রাজগণের কন্যাদিগকেও ঐরূপ অতিথিসেবার আত্মনিয়োগ করিতে হইত। রাজবাড়ীতে রাজকন্যার সহিত অনেক দাসদাসী থাকিত সত্য, কিন্তু ব্রাহ্মণবাড়ী ব্রাহ্মণের দুই একটি কন্যাই ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অতিথির দেশ নাম-গোত্র-স্বাধ্যায় প্রভৃতি জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ। অনেক সময় অনেক ব্রাহ্মণবাড়ীতে ব্রাহ্মণকুমার অতিথি আসিলে কন্দর্প ও প্রজাপতি ষড়যন্ত্র করিয়া পরিচারিণী ব্রাহ্মণকুমারীর সহিত অতিথিঠাকুরের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিতেন। এই সকল বিবাহ কায়-বিবাহই হইত। অতিথি ঠাকুর কন্যার পিতার গোত্রাদি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং কন্যা যদি ভিন্ন গোত্রিয়া হইত, তবেই কন্যার পিতার অনুমতিমাত্র লইয়া কন্যাকে বিবাহ করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে পরিচারিণী কন্যা তাহার সর্ব্বদেবময় অতিথি স্বামীর গোত্রাদি জানিতে পারিত না। কারণ বিবাহের পূর্ব্বপর্য্যন্ত বর—অতিথি, পরিচারিণীর পক্ষে তাহার নাম গোত্র প্রভৃতি জিজ্ঞাসা নিষিদ্ধ। যৌবনে জবালাকে বহু অতিথির সেবা করিতে হইত; সেই সময় কোন এক অতিথি ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাহার কায়-মতে বিবাহ হয়। অতিথিঠাকুর বর হইবার পরই বোধ হয়, দুষ্মন্তের মত নিরুদ্দিষ্ট হন; কাজেই জবালা তাহার স্বামীর গোত্র জানিতে পারে নাই। কিন্তু এরূপ ব্যাপার কন্যার পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। শকুন্তলাকে এইরূপ লজ্জায় পড়িতে হইয়াছিল—কুন্তীর পক্ষে লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটিয়াছিল। কন্যা অবস্থায় কানীনপুত্রও হইত। কিন্তু কানীনপুত্রের গোত্র লইয়া গোল হইত না। কারণ তাহার পিতার পরিচয় না জানা থাকিলে সে মাতামহ গোত্রই প্রাপ্ত হইত। বিবাহিত দম্পতির পুত্র পিতৃগোত্রই পায়। সে ক্ষেত্রে পিতৃগোত্র না জানিলেই গোল ঘটে। সত্যকাম বিবাহিত দম্পতিরই পুত্র। কিন্তু তাহার জননী জবালা পতির গোত্র জানিত না বলিয়াই সে কথা বলিতে পারে নাই। সে বলিয়াছিল, "বহ্বহং চরন্তী পরিচারিণী যৌবনে ত্বামলভে" যৌবনে বহু অতিথিসেবায় ব্যস্ত থাকাকালীন আমি তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম (শাঙ্করভাষ্য)। এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই,—জবালা কোন অতিথির সহিত প্রাজাপত্য-বিবাহে বদ্ধ হইয়াছিল। সে যদি বিবাহিত অবস্থায় গূঢ়োৎপন্ন পুত্র প্রসব করিত, তাহা হইলে তাহার সেই পুত্র তাহার স্বামীর গোত্রই পাইত; অবিবাহিত অবস্থায় কানীনপুত্র হইলে সেই পুত্র জবালার পিতৃগোত্র পাইত; সুতরাং গোত্র লইয়া কোন গোলই উঠিত না। সত্যকাম জবালার বিবাহিত স্বামীর ঔরসজাত পুত্র, আর সে অতিথিসেবার ঐকান্তিকভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিল বলিয়াই

তাহার স্বামীর গোত্র জানিতে বা স্মরণ রাখিতে পারে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মহর্ষি হারিদ্রুমত সত্যকামের কথায় তাহাকে একান্ত সত্যনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণতনয় বুঝিলেন কেন? এরূপ অবস্থায় লোকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু যে লোকলজ্জার ভয়ে রাজনন্দিনী কুন্তী নিজের কানীন-পুত্রকে অশ্বতী নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, জবালা মনে প্রাণে জানিত, ধর্ম্মতঃ তাহার সে লোকলজ্জার কারণ নাই, তাই সে সত্যকামকে বলিয়া দিয়াছিল,—আচার্য্যকে বলিও, তুমি জবালার পুত্র সত্যকাম, (জবালা তু নামাহমস্মি, সত্যকামো নাম ত্বমসি স সত্যকাম এব জাবালো ব্রবীথা ইতি)। নির্দ্দোষ না হইলে কেহ বড় গলা করিয়া এমন কথা বলিতে পারে না। সত্যকামও জানিত যে, তাহার জননী সাধ্বী, তাই সে সরলভাবে ঋষির নিকট সেই কথা বলিয়াছিল। সে সময় কুলটা বা কামচারিণী সমাজে পতিতা ও নিন্দিতা হইত। কর্ণ যেমন নাম ও পরিচয় গোপন করিয়া পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সত্যকাম নিষ্পাপ বলিয়া তাহা করে নাই। ঋষি তাহার সরলতা দেখিয়া তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি সত্যকাম অব্রাহ্মণ নহে ইহা সাব্যস্ত করেন।

পাঠক দেখুন,—একই উপাখ্যান হইতে কত লোক কত প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার কোন্ সিদ্ধান্ত ঠিক, পাঠক তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। আমরা শেষোক্ত মতেরই পক্ষপাতী। প্রথম দুই মতেই গোত্র লইয়া গোল উঠিবার কথা নাই। বেশ্যাপুত্রের যদি বেদাধিকার বা ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আচার্য্যের পক্ষে শিষ্যত্ব-কামীর গোত্রজিজ্ঞাসা আবশ্যক হইত না। ঋষিও যে বেদবিধি লঙ্ঘন করিয়া একটা কাজ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। আসল কথা, ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্তে প্রাচীন ব্যাপারের সত্য তথ্য যত প্রতিফলিত হউক আর নাই হউক, তাহাদের বুদ্ধি ও কল্পনা উহাতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অনেকে সিদ্ধান্তটা পূর্ব্বেই করিয়া থাকেন, পরে নিজের মনের মত করিয়া সেই সিদ্ধান্তটাকে বাঁকাইয়া ঘুরাইয়া নিজের প্রতিপাদ্যের প্রমাণস্বরূপ করিয়া লোকলোচনের সম্মুখে হাজির করেন। তাই ইতিহাস প্রায় নির্ভুল হয় না। মহাবীর নেপোলিয়ন বলিতেন, "What is history but a fiction agreed upon? পাঁচ জনে মিলিয়া একটা কাল্পনিক ব্যাপার খাড়া করিয়া তাহারই নাম দেয় ইতিহাস। সত্য বটে, বড় যোদ্ধা ছিলেন বলিয়াই নেপোলিয়নের মত অভ্রান্ত, এ কথা মনে করা যায় না, কিন্তু সমসাময়িক ব্যাপারের বর্ণনা দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, সম্মুখে যে ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, তাহার বিবরণেই যখন বিস্তর গোল জন্মে, তখন সুদূর অতীতের কাহিনী কখনই ঠিক হইতে পারে না।

অতীত কাহিনী হইতে সত্য নিষ্কাশিত করিতে হইলে সেই সময়ের সমস্ত অবস্থার সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইতে হয়। সব অবস্থা সম্যক্‌রূপে জানিতে না পারিলে—সমস্ত পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলি বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, একটা অতীত কাহিনী বা একখানা তাম্রফলক হইতে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের নিষ্কাশন করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। ইহা কত বড় কঠিন ব্যাপার, অনেক ঐতিহাসিকই তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন না অথচ তাহারা একটা পূর্ব্বগঠিত সংস্কারের বশবর্ত্তী বা কোন গূঢ় উদ্দেশ্যসাধনের ইচ্ছায় চালিত হইয়া এক একটা উৎকট ভ্রান্তি করিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রান্তি হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের মধ্যে কয় জন লোক বর্ত্তমান সময়ের সামাজিক অবস্থার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত আছেন? বর্ত্তমান বঙ্গীয়সমাজে বরপণ নামক যে ঘোর অনিষ্টকর প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা উঠিতেছে না কেন, কেহ কি বলিতে পারেন? বরের বাপের বা অভিভাবকের লোভই ইহার কারণ বলিয়া অনেকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। কিন্তু লোভ ত কেবল এক বিষয়ে নিবদ্ধ থাকে না। যে লোভী, সে সকল দিকেই লোভ করে। তবে অন্যদিকে তাহার লোভ সফল হয় না। মেয়ের বাপের ঘাড় ভাঙ্গিয়া টাকা লইবার লোভটাই বা সফল হয় কেন? এ সকল কথার উত্তর পাওয়া কঠিন। আমরা যে অবস্থার ভিতর ডুবিয়া রহিয়াছি, সেই অবস্থাসম্বন্ধে আমাদের যখন এতই জ্ঞানাভাব, তখন সুদূর তমোময় অতীতের বিবর হইতে সত্যের উদ্ধার করা কত কঠিন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। আমরা অনুসন্ধানের বর্ত্তিকা লইয়া সেই তমসাচ্ছন্ন অতীতের গহ্বর হইতে দুই একটা ঘটনার উদ্ধার করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত ইতিহাসের উদ্ধার করিতে পারি না। প্রকৃত ইতিহাস ব্যক্তিবিশেষের বা ঘটনাবিশেষের বিবরণ নহে। [ক্রমশঃ।

বুদ্ধগয়া।

[শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক লিখিত।]

ভারতে বুদ্ধগয়া কি হিন্দু কি বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীর একটি অতি পবিত্র তীর্থ। এরূপ দ্বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীর একই তীর্থ আর কোথাও নাই। বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মের উত্থান এবং বিস্তারহেতু বিহার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীমাত্রেরই পক্ষে একটি আদরের স্থান। গয়াধামে শাক্যরাজকুমার সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া গয়াধাম বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর পক্ষে সর্ব্বোত্তম তীর্থক্ষেত্র। এই স্থান প্রকৃত পক্ষে গয়া ষ্টেসন হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী—বোধগয়া বা উরুবেল নামে খ্যাত। এইখানেই শাক্যরাজকুমার সিদ্ধার্থ এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে বজ্রাসনে সমাধিস্থ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—সেই বৃক্ষ এখনও মহাবোধিদ্রুম বলিয়া বিখ্যাত এবং যেখানে বুদ্ধদেব বসিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই আসন বজ্রাসন বলিয়া আখ্যাত।

এই সংখ্যার প্রচ্ছদপটে যে আলোকচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব। এই চিত্রখানি আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ডাক্তার স্পুনার সাহেব আমাকে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উপহার দিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার এরূপ আলোকচিত্র বড়ই বিরল। ইহাতে বুদ্ধগয়ার মন্দির ও মন্দিরপার্শ্ববর্ত্তী স্তূপগুলি অতি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে।

পুরাবৃত্ত লেখকগণের মধ্যে বৌদ্ধবিহারসম্বন্ধে হাওয়েন সাংএর লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোক মহাবোধিতে প্রথম বিহার বা মন্দির নির্ম্মিত করেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দির কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হয়, তাহার ঠিক পরিচয় এখনও পাওয়া যায় নাই। স্যার আলেক্সাণ্ডার কানিংহামের মতে এই মন্দির শকরাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান মন্দিরটি এককালে ত্রিতল ছিল, কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কারকালে ত্রিতলের কক্ষটি বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কথিত আছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে দশনামিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের গিরি উপাধিধারী এক দল সন্ন্যাসী আসিয়া মহাবোধিতে মঠস্থাপনা করেন এবং ক্রমশঃ তাঁহারা জমীদার ও বাদশাহগণের নিকট হইতে বহুবিধ সাহায্য পাইয়া তাঁহাদের মঠের উন্নতিসাধন করেন। বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের অনুমত্যানুসারে ১৮৮০ সালে এই মন্দিরের সংস্কার আরম্ভ করা হয় এবং ডাক্তার জে. ডি. এম. বেগলার সাহেবের অধ্যক্ষতায় ১৮৯২ সালে সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হয়। মন্দিরের সংস্কারকালে মন্দিরপ্রাঙ্গণে আরও দুটি একটি ক্ষুদ্র মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান মন্দিরের একটি মাত্র প্রবেশদ্বার এবং প্রথম গৃহের উভয় পার্শ্বে দ্বিতলে উঠিবার দুইটি সোপান আছে। এই গৃহের আচ্ছাদনের প্রস্তরসমূহে খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বৌদ্ধতীর্থযাত্রিগণের খোদিত লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহের প্রান্তে মন্দিরের গর্ভগৃহের দ্বার অবস্থিত; মন্দিরের অভ্যন্তরটি অত্যন্ত অন্ধকার; সম্মুখে পাষাণনির্ম্মিত সুবৃহৎ বেদী এবং বেদীর উপর প্রস্তরনির্ম্মিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাস্থিত বুদ্ধমূর্ত্তি। বর্ত্তমান যুগের তীর্থযাত্রিগণপ্রদত্ত শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় বুদ্ধ-মূর্ত্তি বেদীর উপর সংস্থাপিত। গর্ভগৃহের প্রাচীরে তিব্বত ও চীনদেশীয় নানাবিধ বর্ণের মন্ত্রপূত পতাকা লম্বিত আছে। সিংহাসনোপরি খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, এই মূর্ত্তি ও সিংহাসন ছিন্দবংশীয় কোন রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নানাদেশীয় বৌদ্ধতীর্থযাত্রী সময়ে সময়ে এই মন্দিরে বহুতর স্তম্ভ উৎসর্গ করিয়াছেন এবং এখনও তাহার বহু চিহ্ন স্তম্ভগাত্রে বিদ্যমান আছে; আবার অনেকগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বৌদ্ধগয়া মঠের মোহান্ত কিছু দিন পূর্ব্বে যে স্তম্ভ উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন ধ্বংসাবশিষ্ট বেষ্টনীর উপর সংস্থাপিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে নেপালী ও তিব্বতদেশীয় অনেকগুলি ঘণ্টা আছে। সম্মুখে পাষাণনির্ম্মিত বৃহৎ তোরণ এবং তোরণের বামপার্শ্বে পূর্ব্বতন মোহান্তগণের সমাধি। দক্ষিণপার্শ্বে ইষ্টকনির্ম্মিত কতকগুলি ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে পূর্ব্বতন মোহান্তগণের সমাধি এবং কতকগুলি বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি গৌড়ের রাজা প্রথম মহীপাল দেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। মন্দিরপ্রাঙ্গণের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন পুষ্করিণী আছে—ইহার নাম বোধপোখর বা বুদ্ধ-পুষ্করিণী।

মুসলমান রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হওয়ায় ক্রমশঃ মহাবোধি-বিহার বালুকারাশিতে আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল—গত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বালুকারাশি খনন করিয়া মন্দিরের নিম্নদেশ ও গর্ভগৃহের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে মহাবোধি-বিহারের অনুকরণেই ব্রহ্মদেশের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

যাঁহারা বুদ্ধগয়া দর্শনে যান, তাঁহারা মঠের অভ্যন্তর দর্শন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, বৌদ্ধজগতের কি আশ্চর্য্য-

জনক মূর্ত্তি সকল ঐ মঠে সংগৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধগয়া কি হিন্দু, কি বৌদ্ধ, সকলের পক্ষে সমান তীর্থ; আবার এই বুদ্ধগয়ায় কতকগুলি মূর্ত্তি এমনই আছে যে, তাহাতে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের চমৎকার সংমিশ্রণ স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

বুদ্ধগয়ার কথা বলিতে যাইলে বোধিদ্রুমসম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। কথিত আছে যে, আদি বৃক্ষটি সম্রাট্ অশোকের রাণী তিষ্যরক্ষিতা-কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল। নয় শত বৎসর পরে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত আর একবার বোধিবৃক্ষ নষ্ট করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বোধিবৃক্ষটি প্রায় ৪০।৫০ বৎসরের অধিক হইবে না। বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে একটি উচ্চ বেদী আছে এবং বৃক্ষের সম্মুখে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীন তোরণ বিদ্যমান আছে। বৃক্ষের পশ্চাতে অর্থাৎ বোধিবৃক্ষ এবং মন্দিরের মধ্যস্থলে বজ্রাসন সংস্থাপিত; এই বজ্রাসন একটি বৃহৎ পাষাণনির্ম্মিত বেদী এবং ইহার উপরিভাগ এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আচ্ছাদিত; বজ্রাসনের উপর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বজ্রাসনের একখণ্ড প্রস্তরে একটি খোদিত লিপির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।
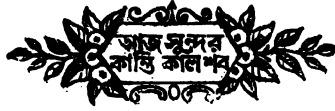
মুষ্টিযোগ—টোট্‌কা ঔষধ।

[জনৈক বৃদ্ধের অভিমত।]

বিছের কামড়।

ফট্‌কিরী আগুনে পুড়াইয়া চূর্ণ করত দংশিত স্থানে গরম গরম লাগাইয়া রাখিলে দারুণ যন্ত্রণা সত্বর দূর হইবে।

সাপের কামড়।

১। পিঁয়াজের রস এক ছটাক খাওয়াইয়া ও পিঁয়াজ থেঁতো করিয়া দংশিত স্থানে প্রলেপ দিলে রক্ষা হইতে পারে।

২। নিমপাতার প্রলেপ ও রস খাওয়াইলেও চলে।

৩। তুলসীপত্রের রস খাওয়া ও দংশিত স্থানে দেওয়া—ইহাও সাপের কামড়ে বড় উপকারী।

পোড়া।

১। টাট্‌কা পোড়াস্থানে ছাগলের নাদি পোড়াইয়া সরিষার তৈলের সহিত লাগাইতে হইবে।

২। পুঁই পাতার রস দিলেও জ্বালা নিবারণ হয়।

হোঁচট্ লাগা বা কাটিয়া যাওয়া।

প্রথমে রেড়ির তৈল দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে। যদি রক্ত পড়ে, দুর্ব্বাঘাস থেঁতো করিয়া চিনি দিয়া বা ঝুল ও চিনি দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে।

ব্রণ বা ফোড়া।

ব্রণ উঠিবামাত্র পানে খাইবার চুণ লইয়া ব্রণ বা কাঁচা ফোড়ার মুখ বাদ দিয়া চারিদিকে লেপন করিবে। অনেকে গোলমরিচ লইয়া পাথরের বাটিতে জলে ঘষিয়া চন্দনের ন্যায় করিয়া ব্রণ বা কাঁচা ফোড়ায় উক্তরূপে লেপিয়া দিয়া উপকার পান। যদি ইহাতে না বসিয়া যায়, তাহা হইলে নিম্নোক্ত ফুল্‌টিস্ অর্থাৎ প্রলেপ দিতে হয়।

১। তিসি বাটিয়া ঘৃত দিয়া ফুটাইয়া এক খণ্ড কাপড়ের টুক্‌রার উপর মাখাইয়া ঐ কাঁচা ফোড়ার উপর বসাইয়া দিবে। দুই এক ঘণ্টা অন্তর এক একটি করিয়া ফুল্‌টিস্ দিলে ফোড়া পাকিয়া গলিয়া যাইবে।

২। নিমপাতা ও হলুদ বাটিয়া তাহা ঘৃত দিয়া গরম করিয়া ঐরূপ করিয়া দিলেও পাকিয়া যায়।

৩। এক টুক্‌রা কাপড়ে সামান্য তোক্‌মারি কিছু জলের আছ্‌ড়া দিয়া ফোড়ার উপর পটির ন্যায় বসাইতে হয়। পটি শুষ্ক হইলে কঠিনভাবে আট্‌কাইয়া যায় ও ক্রমে ফোড়া ফাটাইয়া পূয নির্গত করে।

৪। গাঁদাফুলের পাতা বাটিয়া ঘৃতসংযোগেও ঐরূপ কাজ করে।

ফোড়া হইলে চুলকানো বা টেপা বিশেষ নিষিদ্ধ।

যদি এ সমস্ত ব্যবহারেও সুবিধা না হয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়ের মলম এই সকল বিষয়ে বিশেষ উপকারী। ইহাতে ফোড়া বসিয়া যায় বা ফাটিয়া গিয়া ঘা আরাম হইয়া যায়। ঠিকানা—৪২।১ নং কালীঘাট রোড, কালীঘাট মন্দিরের নিকট।

ছেলেদের মুখের ঘা।

ছেলেদের মুখের ঘা ভেড়ার দুধ দিলে আরাম হয়, যদি ভেড়ার দুধের ঘি করিয়া রাখা হয়, তাহাতেও আরাম হয়।

[ক্রমশঃ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

৫

শৌচ।

ধর্ম্মলক্ষণের মধ্যে শৌচ ধৃত হইয়াছে। শৌচ অর্থে শুচিতা বা নির্ম্মলতা। অপবিত্রতা পরিহারপূর্ব্বক পবিত্রভাব ধারণের নাম শৌচ। শৌচ দ্বিবিধ;—শারীরিক ও মানসিক। যথা—

শৌচন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যা স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিরথান্তরম্॥

শৌচ দুই প্রকারের—বাহ্য ও আভ্যন্তর অর্থাৎ বাহিরের আর ভিতরের। মাটি ও জলদ্বারা যে শৌচ, তাহা বাহিরের শৌচ আর মনের ভাবশুদ্ধিই ভিতরের শৌচ অর্থাৎ স্নান করা, গাত্রমার্জ্জনাদি করা, ধৌত-বস্ত্র পরিধান করা, দেহের কোন স্থানে মলামাটি থাকিতে না দেওয়া অর্থাৎ সর্ব্বথা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিলেই বাহ্যশৌচ লাভ করা যায়। কিন্তু অন্তরের বা ভিতরের শৌচ লাভ করাই কঠিন। চিত্তশুদ্ধি না হইলে সেই শৌচ লাভ করা যায় না। আজকাল অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বাহ্যশৌচ (Cleanliness) স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে অবশ্যই অবশ্যপ্রতিপাল্য; কিন্তু ধর্ম্ম-সাধনপক্ষে আভ্যন্তর বা মানসিক শৌচ (Purity)ই আবশ্যক, বাহ্যশৌচ বিশেষ আবশ্যক নহে। যাঁহারা এ কথা বলেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বাহ্যশৌচ নিতান্তই আবশ্যক। এ কথাও সত্য যে, দেহের পক্ষে যাহা নিতান্তই আবশ্যক—মনের পক্ষে তাহার আবশ্যকতা নিতান্ত অল্প নহে। দেহ রুগ্ন হইলে মন খারাপ হয়, মনের প্রসন্নতা থাকে না, ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা করা যায় না, এ কথা স্বীকার করিতে প্রায় সকল শিক্ষিত লোক সম্মত আছেন; কিন্তু শাস্ত্রানুমোদিত বাহ্যশৌচ প্রতিপালন না করিলেই যে আমি জাহান্নামে যাইব, এ কথা এখন অনেকেই স্বীকার করিতে চাহেন না। কিন্তু ঋষি-বাক্যের আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, বাহ্যশৌচকে তাঁহারা ধর্ম্মসাধনের পক্ষে বিশেষ আবশ্যকই মনে করিতেন। তাঁহারা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন,—

শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ।

শৌচাচারবিহীন লোক যে ধর্ম্মকর্ম্মই করুক না কেন, তাহা সমস্তই নিষ্ফল। আমাদের দেশের যে সমস্ত পতিত জাতি আছে, শৌচাচারবিহীন বলিয়াই তাহাদের জল অচল হইয়াছে। যাঁহারা বলেন,—এ স্থলে শৌচ অর্থে আভ্যন্তর-শৌচ, তাঁহাদের কথা ঠিক নহে; কারণ, যাহার আভ্যন্তর শৌচ হইয়াছে, তাহার আর কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্যই কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন। "চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম" ইহা শাস্ত্রের বচন। সুতরাং শৌচাচারবিহীন ব্যক্তির সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মই নিষ্ফল, একথা বলিলে মুখ্যতঃ বাহ্য-শৌচই বুঝায়। কারণ, ঋষিদিগের বিশ্বাস,—শরীর শুদ্ধ না হইলে মন শুদ্ধ হয় না; মন শুদ্ধ না হইলে সত্ত্বগুণের আধিক্য হয় না। আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, স্নানাদি করিয়া শুদ্ধবস্ত্রাদি পরিধান করিলে মনের যেরূপ প্রসন্নতা জন্মে, মলিন দেহে মলিন দুর্গন্ধপূর্ণ বস্ত্রাদি পরিধান করিলে কখনই সেরূপ হয় না। দৈহিক মলিনতার প্রভাবে মনও যেন বিশেষভাবে মলিন হয়, ইহা নিত্যপ্রত্যক্ষের বিষয়। কিন্তু কেবল দেহ ও পোষাক পরিষ্কৃত করিলেই শৌচধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। জমকালো পরিচ্ছদ পরিধান করা—এসেন্স প্রভৃতি কতকগুলি গন্ধদ্রব্য মাখাও শৌচের পরিপন্থী। উহাতে মনের ভিতর কেমন একটা অহঙ্কারের ভাব আনিয়া দেয়। উহা তমোগুণের ও রজোগুণের পোষক, সত্ত্বগুণের বাধক। দ্বিতীয়তঃ দেহ পরিষ্কৃত করিলেই শৌচ হয় না। বাহ্যশৌচ কিসে কিসে হয়, তাহাও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে,—

অভক্ষ্যপরিহারস্তু সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্ম্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমেতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
(বৃহস্পতি।)

অভক্ষ্যভক্ষণ পরিত্যাগ, সাধুসংসর্গ ও স্বধর্ম্মপালনই শৌচ। এই কয়টিই বাহ্যশৌচের অন্তর্গত। ইহাতে ভাবশুদ্ধি জন্মে। এ সম্বন্ধে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ কত দূর বিস্তৃত, তাহা বিজ্ঞান এ পর্য্যন্ত ঠিক নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে একথা সত্য যে, খাদ্যের উপাদান হইতেই দেহ গঠিত হইয়া থাকে। খাদ্যে সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে, যথা—প্রোটীড (Protied), কার্ব্বোহাইড্রেট্ (Carbo-hydrate), চর্ব্বি (Fat), ধাতব লবণ (Mineral Salts) এবং জল, ইহার মধ্যে প্রোটীড হইতে শরীরের মাংস জন্মে। এই প্রোটীড—দুগ্ধে, মাংসে, মৎস্যে, দাইলে, ময়দায়, যবে, কলায়, কাঁঠালে, খেজুরে, আমে, চিংড়ীমাছে, কাঁকড়া প্রভৃতিতে অধিক থাকে। চাউলেও প্রোটীড থাকে, কিন্তু উহার পরিমাণ অতি অল্প। মাংসে কার্ব্বো-হাইড্রেট থাকে না, কিন্তু চাউলে, দাইলে, গমে, যবে,

গোল আলু প্রভৃতিতে কার্ব্বো-হাইড্রেট্ অনেক আছে। ... দ্রব্যমাত্রেই বিদ্যমান। দেহরক্ষার্থ এই সকল দ্রব্যই আবশ্যক। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা ইহার দ্বারা দেহ কি ভাবে গঠিত হয়,—বড় জোর মস্তিষ্কের উপাদান কি ভাবে সংগৃহীত হয়, তাহার কতকটা সন্ধান পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা খাদ্য হইতে কি ভাবে মনোবৃত্তির ইতরবিশেষ হয়, তাহা জানিতে পারেন নাই। তবে তাঁহারা অনুসন্ধানদ্বারা সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, আহার্য্যের ইতরবিশেষে মনের ভাবেরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মাংস খাইলে চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পায়, ক্ষিপ্রকারিতা বৃদ্ধি পায়। মাংস রজোগুণের বর্দ্ধক, কোন কোন মাংসে তমোগুণ বৃদ্ধিও করে। মাদকদ্রব্যে অনেক সময় তমোগুণই বাড়াইয়া দেয়। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া দেখিলে সাত্ত্বিক আহারই প্রশস্ত, তামসিক আহার অধর্ম্মজনক। কেহ কেহ মনে করেন যে, মাংস বীর্য্য বা তেজ (Energy) বর্দ্ধক। সঘৃত দাইল এ বিষয়ে হীন নহে। আর বলাই বাহুল্য যে, ঘৃত, তৈল, মাখন, দাইল, ছানা, দুগ্ধ, আলু, চিনি প্রভৃতিই দৈহিক বীর্য্য এবং উত্তাপ বৃদ্ধি করে। মাছ, মাংস যেমন দেহের আঁশ (Tissue) বৃদ্ধি করে, ছানা, ক্ষীর, দাইল, লবণ, জল প্রভৃতিও শরীরের সেইরূপ আঁশ বৃদ্ধি করে। য়ুরোপে আমিষ ও নিরামিষ আহারসম্বন্ধে যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বিচারপূর্ব্বক নিরামিষাশী লোক আমিষাশী লোক অপেক্ষা হীনবীর্য্য হয় না। তবে নিরামিষাশী লোকেরা সাধারণতঃ ধীরপ্রকৃতি, স্থিরবুদ্ধি ও দীর্ঘজীবী হন। ব্রাহ্মণ-কায়স্থ ঘরের বিধবা বা নিষ্ঠাবান্ পুরোহিত প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহা বুঝা যায়। সেই জন্য যাঁহারা ধর্ম্মপথের পথিক, তাঁহাদের পক্ষে নিরামিষ ভোজন, কেবল নিরামিষ ভোজন নহে, সাত্ত্বিক ভোজন করাই সঙ্গত। সাত্ত্বিক ভোজনকারীরাই শুচি।

হিন্দুশাস্ত্রে অধিকারিভেদে পাপপুণ্য কার্য্যের ইতরবিশেষ আছে। যাহারা অত্যন্ত তামসিক, তাহাদের পক্ষে রাজসিক আহারই পুণ্যকার্য্য। যাহারা আমমাংসভোজী রাক্ষস, তাহারা যদি মাংস সিদ্ধ করিয়া খায়, তাহা হইলে তাহারা একটু পুণ্যপথে অগ্রসর হইয়াছে—একটু শুচি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার তাহারা সেই মাংস যদি পিতৃগণকে ও দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া খায়, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আবার যাহারা পার্ব্বণাদিতে যথাবিহিতভাবে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট মাংস ভোজন করে, তাহারা ধার্ম্মিক বলিয়াই সম্মানিত। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে এইরূপই ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মপথে অধিক অগ্রসর, যথা—সন্ন্যাসী, যতী, ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণের বিধবা, পূতচরিত্র ব্রাহ্মণ, ইঁহাদের মাংসভোজনে মহাপাপ হয়, কারণ উহা রজোগুণের বর্দ্ধক, সাত্ত্বিক-প্রকৃতি লোকের পক্ষে পাপজনক। সেই জন্য এক জন চণ্ডালের পক্ষে যাহা পুণ্যকর্ম্ম, এক জন যতীর পক্ষে তাহাই পাপজনক। ইহার কারণ এই যে, অনুশীলন ও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতির দ্বারা যে ব্যক্তি যেরূপ গুণ অর্জ্জন করিয়াছে, তাহার পক্ষে তাহা অপেক্ষা উচ্চতর গুণের বিকাশসাধনই আবশ্যক। যে ব্যক্তি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন, সে ব্যক্তির পক্ষে রজোগুণবর্দ্ধক খাদ্য ভক্ষণ বা অন্য কাজ করা পুণ্যজনক। কিন্তু যে ব্যক্তির সত্ত্বগুণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার পক্ষে সাত্ত্বিক আহার বা সাত্ত্বিক কার্য্য পরিহার-পূর্ব্বক তামসিক অথবা রাজসিক আহার পাপজনক। রজোগুণপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে রাজসিক আহার বিশেষ ক্ষতিকর নহে, কিন্তু সত্ত্বগুণপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মের হিসাবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই জন্য শাস্ত্রে অধিকারিভেদে ব্যবস্থার ভেদ আছে।

অনিন্দিত ব্যক্তির সহিত সংসর্গ—শৌচ। কারণ "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।" দোষ ও গুণ সংসর্গদ্বারাই সংক্রমিত হইয়া থাকে। সাধুর সঙ্গ করিলে সাধুতা জন্মে, অসাধুর সঙ্গ করিলে অসাধুতায় প্রবৃত্তি ধায়। মহর্ষি হারীত বলেন,—

শুদ্ধ্যাজশুদ্ধঃ শুদ্ধস্থ শুদ্ধোঽশুদ্ধস্তু শোধয়েৎ।
অশুদ্ধশ্চ তমোভূতঃ শুদ্ধবাসেন শুদ্ধ্যতি॥

অশুদ্ধ যে, সে শুদ্ধকে নষ্ট করে অর্থাৎ পাপী পুণ্যাত্মাকে পাপী করিয়া দেয়; আবার পূতচরিত্র লোক অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপমতি লোককে শুদ্ধ বা পুণ্যবান্ করে। কেন না, অশুদ্ধ ব্যক্তি তমঃস্বরূপ বা অন্ধকারের মত। অন্ধকার যেমন সূর্য্যের প্রভাবে দূরীভূত হয়, সেইরূপ অশুদ্ধ ব্যক্তি শুদ্ধ ব্যক্তির স্পর্শে আসিলে তাহার তমোগুণ বিনষ্ট হইয়া যায়।

এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে সাধুর অসাধুর সহিত সঙ্গ করা, ব্রাহ্মণের অন্ত্যজ বা কদাচারী ব্যক্তির সহিত মেলামেশা নিষিদ্ধ হইল কেন? নিন্দিত ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা অশৌচজনক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইল কেন? এই প্রশ্নের সমাধান করিতে হইলে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। শুদ্ধ বলিতে গেলে যাঁহারা গুণাতীত, তাঁহাদিগকেই বুঝায়। সূর্য্যকে যেমন ছায়ারূপেও তমঃ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি গুণাতীত, তাঁহাকেও সেইরূপ তমঃ প্রভৃতি গুণ স্পর্শ করিতে পারে না; কিন্তু যাঁহারা সাধারণ গৃহস্থ, নিবৃত্তিমার্গে যাঁহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাঁহারা যতই সত্ত্বস্থ হউন না কেন, তাঁহাদের কিছু রজস্তমোগুণ থাকিবেই থাকিবে। তাঁহারা যদি তমোগুণের সংস্পর্শে আসেন, তাহা হইলে তাঁহাদের চরিত্রে দুর্ব্বলীভূত তমোগুণ আবার প্রবল হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষতঃ নিম্নতর গুণগুলির আকর্ষণীশক্তি অত্যন্ত অধিক। নির্ভয়ে পাপ করিতে দেখিলেই সাধারণ লোকের মন পাপের দিকেই ধায়। মনুষ্যচরিত্রজ্ঞ মহাকবি সেক্সপীয়র যে বলিয়াছেন,—

"How oft the sight of means to do ill deeds
Makes ill deeds done"

এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন,—

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রী শ্রীযশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেত্যসৎ সঙ্গাৎ যাতি সংক্ষয়ম্॥

সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ প্রভৃতি গুণগুলি অসদ্‌সঙ্গহেতু অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায় যে, লজ্জাশীল যদি নির্লজ্জের সমাজে থাকে, তাহা হইলে তাহার লজ্জা আর থাকে না; দয়ালু লোক যদি নির্দ্দয়সমাজে মিশে,তাহা হইলে সে ক্রমশঃ নির্দ্দয়ই হইয়া উঠে; অল্পভাষী লোক যদি বহুজল্পক সমাজে থাকে, তাহা হইলে সেও অধিক কথা কহে। সেই জন্য অসৎ সঙ্গ অশৌচের কারণ। মহর্ষি ছাগলেয় বলিয়াছেন,—

আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শান্নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহশয্যাসনাধ্যায়াৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥

আলাপ, গাত্রস্পর্শ, নিশ্বাস, একত্র বসিয়া ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র অধ্যয়ন প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারা পাপ একই জন লোক হইতে অন্য জনে সংক্রমিত হয়। পরাশর বলিয়াছেন,—

আসনাচ্ছয়নাদ্‌যানাৎ ভাষণাৎ সহভোজনাৎ।
সংক্রমন্তি হি পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি॥

জলে যেমন এক ফোঁটা তৈল পড়িলে তাহা সমস্ত জলে ছড়াইয়া পড়ে, সেইরূপ এক সঙ্গে শয়ন, উপবেশন, এক যানে গমন, এক সঙ্গে আলাপ, আহার প্রভৃতি কার্য্য-দ্বারা পাপ সকলের মধ্যে সংক্রমিত হয়। মহর্ষি দেবল বলিয়াছেন,—

সংলাপস্পর্শনিঃশ্বাসসহশয্যাসনাশনাৎ।
যাজনাধ্যাপনাদ্‌যৌনাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং॥

পরস্পর আলাপ, পরস্পরের গাত্রস্পর্শ, নিঃশ্বাস, এক সঙ্গে শয়ন, উপবেশন, ভোজন, পাপীকে যাজন, অধ্যাপন ও পাপীর সহিত যৌনসম্বন্ধে মানবদিগের মধ্যে এক শরীর হইতে অন্য শরীরে পাপ পরিব্যাপ্ত হয়।

এইরূপ বহু আপ্তপ্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজ কবি কাউপার যে বলিয়াছেন,—To fly is safe—পাপ হইতে পলায়ন নিরাপদ, তাহা সত্য। সংস্পর্শদোষকে আর্য্যগণ এতই প্রবল মনে করিতেন যে, আপনার পাঁচ জনকে লইয়া এক সঙ্গে ভোজন করাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেন না। আহ্নিক-আচারতত্ত্বে স্বয়ং বেদব্যাসই লিখিয়াছেন,—

অপ্যেকপংক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি।
কো হি জানাতি কিং কস্য প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥

বন্ধু-কুটুম্বাদি পরিবৃত হইয়া এক পংক্তিতে ভোজন করিবে না, কারণ কাহার কি গুপ্তপাপ আছে, কে জানে? এই সকল বচন পাঠ করিয়া ইদানীন্তন শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায় মনে করিতে পারেন যে, প্রাচীন আর্য্যগণ শুচি-বায়ুগ্রস্ত ছিলেন। তাঁহারা অধ্যাত্মবিদ্যার চর্চ্চা করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। একবার এক জন পাপীর সহিত এক সঙ্গে খাইলেই যে সাধু পাপী হয়, তাঁহারা এরূপ কোন সিদ্ধান্ত করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন,—

সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।

পতিত ব্যক্তির সহিত শুদ্ধ ব্যক্তি যদি এক বৎসরকাল একত্র ভোজনাদি করে, তাহা হইলে সেই শুদ্ধ ব্যক্তিও পতিত হয়।

তবে বেদব্যাস প্রভৃতি পাপীর সহিত সহভোজনাদি করিতে নিষেধ করিলেন কেন? বিলাতের এক জন মনস্বী ব্যক্তি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ দিয়া এই উপদেশ দিয়াছিলেন, Avoid the first quarrel—তুমি তোমার পতির সহিত প্রথম বিবাদ পরিহার করিবে। অথচ একবার পতি পত্নীতে ঝগড়া হইলে বিশেষ কিছু আইসে যায় না। কিন্তু 'ক' বলিলেই 'খ' বলিতে হয়; প্রথম একবার ঝগড়া হইয়া গেলে দ্বিতীয়বার কলহ হইবার সম্ভাবনা অধিক হয়, শেষে কলহে দম্পতির দাম্পত্য-জীবন বিষময় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। এই আশঙ্কাতে প্রথম কলহ-পরিবর্জ্জনের উপদেশ। সংসর্গদোষসম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা।

এখানে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, বিলাতে এমনও ঘটে যে, প্রথম কলহই এরূপ গুরুতর হইয়া উঠে যে, তাহার ফলেই দম্পতি বিবাহ-বিচ্ছেদে আদালতের দ্বারস্থ হন। উহা উভয়ের প্রাকৃতিক পার্থক্যের উপর নির্ভর করে। তেমনই পরস্পরের প্রাকৃতিক পার্থক্য ও সংস্পর্শের গাঢ়তায় প্রথম সংস্পর্শেই পাতিত্য জন্মিতে পারে। সে আলোচনা স্বতন্ত্র-ভাবে করা যাইবে।

তবে এইমাত্র বলিতে পারি, শৌচ বায়ুরোগবিশেষ নহে। অভক্ষ্যভক্ষণ ও কুসংসর্গত্যাগ করিলেই শুচি হওয়া যায় না। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সত্যশৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
সর্ব্বভূতদয়াশৌচং জলশৌচস্তু পঞ্চমম্॥

সত্যনিষ্ঠা, ভাবশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় জয়, সর্ব্বপ্রাণীকে দয়া করা এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এই পাঁচটিই শৌচ। দিনের মধ্যে সাতবার করিয়া স্নান করা ও দাঁতখোঁটা শৌচ নহে, উহা এক প্রকার বায়ুরোগ। মহাপাপের ফলস্বরূপ ঐ রোগ ব্যক্তিবিশেষে আত্মপ্রকাশ করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত শুচি, তাহাকে সর্ব্বভূতে দয়াশীল হইতে হইবে। সে আত্ম-রক্ষার জন্য পাপীর সংস্পর্শ ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া পাপীকে ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিবে না, বরং তাহাকে দয়া করিবে। পাপী যাহাতে পাপ হইতে মুক্তি পায়, দুঃখ-যন্ত্রণা হইতে নিস্তার পায়, শুচি ব্যক্তির তাহাই কর্ত্তব্য। নিন্দাবাদী কখনও শুচি হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়পরায়ণ

বা অসংযমী কখনও শুচি হইতে পারে না, অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি কখনই শুচি হইতে পারে না, আর নির্ম্মমহৃদয় লোকও কখনও শুচি হইতে পারে না; কেবল স্নান করিলেই শুচি হওয়া যায় না।

আর এক কথা। সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে অর্থশৌচই প্রধান। কারণ, অর্থসম্বন্ধে অশুচি হইলে সে আর কিছুতেই শুচি হইতে পারে না। সাধু উপায়ে অর্থার্জ্জনকে অর্থশৌচ কহে। সমস্ত শৌচ অপেক্ষা অর্থশৌচই প্রধান। শাস্ত্র বলিতেছেন,—

সর্ব্বেষামেব শৌচানামর্থশৌচং বিশিষ্যতে।
যোঽর্থাঽর্থৈরশুচিঃ শৌচান্নমৃদা বারিণা শুচিঃ॥

যত প্রকার শৌচ আছে, তন্মধ্যে অর্থশৌচই সর্ব্বপ্রধান, যে লোক অর্থের জন্য অশুচি, সে মাটি বা জলদ্বারা কখনই শুচি হইতে পারে না।" কেননা, সত্যনিষ্ঠা, ভাবশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়জয় ও দয়া থাকিলে মানুষ পেটের দায়ে সহজে অসাধু-উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে যায় না। যে ব্যক্তি উৎকোচ গ্রহণ করে, পরপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে, অর্থের জন্য অন্যকে নিন্দিত, পীড়িত বা অবজ্ঞাত করে, সে কখনই শুচি হইতে পারে না। ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা কদাচ অসাধু উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিবে না। যাহারা অসাধু-উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহারা অশুচি, তাহাদের সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল।

যখন কর্ম্মদ্বারাই গুণের ক্ষয় করিতে হইবে, তখন শৌচও যে প্রতিপাল্য কর্ম্ম, তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায়। বাহ্যশৌচ হইলেই আভ্যন্তরশৌচ আইসে। শরীর মনের উপর প্রভাব বিস্তৃত করে। তবে শুচিতা কেবল Cleanliness নহে, সে কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শৌচের আর একটি অঙ্গ আছে, তাহা স্বধর্ম্মে ব্যবস্থান। স্বধর্ম্ম অর্থে আপনার অধিকারানুযায়ী ধর্ম্ম, স্বধর্ম্মে ব্যবস্থান অর্থে আপনার অধিকারানুযায়ী ধর্ম্মের অনুষ্ঠান। যাহার যে গুণ প্রবল, তাহার সেই গুণানুরূপ ধর্ম্মই প্রতিপালন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি তমোগুণপ্রধান, তাহার রজোগুণীর বা সত্ত্বগুণীর ধর্ম্ম ভাল বলিয়া তাহা প্রতিপালন করিতে যাওয়া ভাল নয়। হিন্দুদিগের সাধনপদ্ধতি অনুসারে মানুষকে ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠিতে হইবে। সেই জন্য গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎস্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

নিজের অধিকারানুযায়ী ধর্ম্ম যদি মন্দ (বলিয়াও মনে) হয়, তথাপি উহা সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষাও ভাল। আপনার গুণানুযায়ী ধর্ম্মে থাকিয়া মরাও ভাল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়াবহ।

ভগবান্ এ কথাটা কেন বলিলেন, তাহা বুঝিলেই স্বধর্ম্মে থাকার প্রয়োজন বুঝা যাইবে। মনে কর, এক জন লোক বেশ লেখা-পড়া শিখিয়া বুদ্ধিটি মার্জ্জিত করিয়াছে। কিন্তু সে তদনুরূপ চিত্তজয় করিতে পারে নাই। যাহার চিত্তজয় হয় নাই, তাহার রজস্তমোগুণ প্রবল। সে ব্যক্তি বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে বুঝিল যে, সংযম বা নিবৃত্তিই সুন্দর পথ। এই মনে করিয়া সেই প্রবৃত্তির দাস যদি নিবৃত্তির পথ ধরিতে যায়, তাহা হইলে তাহার পদস্খলনও অবশ্যম্ভাবী, পরন্তু তাহার গুরুতর পতন অনিবার্য্য। মনে করুন, একটা লোকের মাংসভোজনে প্রবল প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু সে মনে মনে ঠিক করিল, দেবোদ্দেশে পশুবলিপ্রদান গর্হিত। সে যদি সাত্ত্বিক ব্যক্তির পূজার ন্যায় পশুবলিপ্রদানে বিরত হয়, তাহা হইলে তাহার বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। কারণ, সে মাংসভোজনলোভ চরিতার্থ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পশু হিংসা করিবেই, কিন্তু দেব-প্রসাদবোধে ভক্তিসহকারে মাংসভোজনে বঞ্চিত হইবে। আহারে বিহারে ভগবচ্চিন্তা করাই ধার্ম্মিকের কর্ত্তব্য। তাহাতে জীব ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং গুণের বন্ধন শ্লথ হইয়া আইসে। একটা কথা এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, প্রবৃত্তি অনুসারে গুণের বিচার করিতে হইবে, সাংসারিক বুদ্ধি অনুসারে গুণের বিচার হয় না। সত্য বটে, সত্ত্বগুণ জ্ঞানের প্রকাশক, কিন্তু সে জ্ঞান বুদ্ধির প্রাখর্য্য নহে, ব্রহ্মজ্ঞান। যে জ্ঞানে প্রবৃত্তির দমন হয়, সেই জ্ঞানই সত্ত্বগুণমূলক, সাংসারিক জ্ঞান সামান্য সত্ত্বগুণাত্মক রজোগুণোদ্ভূত।

যাহা হউক, আপনার গুণানুসারী ধর্ম্মপালনই শৌচ। যে ব্যক্তি আপনার অধিকার অনধিকার বিচার না করিয়া উৎকৃষ্ট জ্ঞানে অন্য অধিকারীর ধর্ম্মপালনে আত্ম-নিয়োগ করে, সে অশুচি, তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান সমস্তই পণ্ড হইয়া যায়।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia)।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্ এম্ এস্.
লিখিত।]

ইংরাজী শিক্ষার তথা ইংরাজী চাল-চলনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যারামটির সমানুপাতে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। সহরের যুবকদিগেরই মধ্যে ইহার অত্যন্ত প্রভাব। পল্লীগ্রামে ইহার আবির্ভাব এখনও তাদৃশ সুস্পষ্ট নহে। অনেক ইংরাজী বাক্যের অসঙ্গত ব্যবহার আমরা প্রায়ই করিয়া থাকি; এই "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" বাক্যটিরও ব্যবহার নিতান্ত অসঙ্গত। যেহেতু, "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" বলিলে ইংরাজীতে শুধু পাকস্থলীরই পীড়া-বিশেষকে বুঝায়। অথচ বাঙ্গালায় সামান্য অগ্নিমান্দ্য হইতে আরম্ভ করিয়া উদরাময় পর্য্যন্ত সকল ব্যাধিই "ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে!

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কি?—এটি বুঝিতে হইলে, পরিপাক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে কতকটা স্থূল ধারণা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অতএব, আমরা সর্ব্বপ্রথমে পরিপাক-ক্রিয়া-সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ কথা বলিব।

পরিপাক-ক্রিয়া (Digestive process or the function or Digestion) বলিলে স্থূলতঃ যথানুক্রমে তিনটি কার্য্যবিশেষকে বুঝায়। যথা—

(১) ভুক্তদ্রব্যকে তরলীকরণ (digestion proper)

(২) তরল ভুক্তদ্রব্যকে পরিপাক-যন্ত্রের অভ্যন্তর হইতে সাধারণ দেহাভ্যন্তরে গ্রহণ করা—এক কথায় পাকাশয় হইতে উহা শোষণ করা (Absorption)।

(৩) শোষিত পদার্থকে রক্তের ও দেহতন্তুর সহিত সংমিলিত করা (Assimilation)। ইহাকেই সাধারণ কথায় "খাবার হইতে রক্ত হওয়া" বলা গিয়া থাকে।

"ডিস্‌পেপ্‌সিয়া" বলিলে শুধু প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটির ব্যত্যয় বুঝায় মাত্র—শেষের দুটির সঙ্গে উহার কোনও সম্বন্ধ নাই। এই জন্য শেষোক্ত দুইটি বিষয় আমরা ত্যাগ করিব।

পরিপাক-ক্রিয়া (Digestion proper) বুঝিতে হইলে পরিপাক-যন্ত্রের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। আমরা দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিতে বসি নাই—শুধু আবশ্যক মত যন্ত্রগুলির সহিত পরিচিত হইতে চাই। অতএব, আমরা ঠিক শব-ব্যবচ্ছেদকারীর দিক্ হইতে তাহাদিগকে না বুঝিয়া অন্যভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

প্রথমতঃ মুখ-গহ্বর। এখানে পরিপাক-ক্রিয়ার অনুকূল কি কি যন্ত্র আছে? এখানে তিনটি যন্ত্র আছে। প্রথমটি—জিহ্বা, দ্বিতীয়টি—দন্তপংক্তি, তৃতীয়টি—মুখের লালানিঃসরণকারী গ্রন্থিত্রয়। আমরা গ্রন্থিত্রয়কে দেখিতে পাই না বলিয়া শুধু লালার (Saliva) কথাই উল্লেখ করিব। একটি কলের ঘড়ির কার্য্যটিকে (watch) যদি বেশ মনোনিবেশ সহকারে দেখা যায়, তবে একটা জিনিষ গোড়া হইতে খুব বেশী করিয়া দৃষ্টিপথে পড়ে—সেটি চাকাগুলির পারম্পর্য্য ও পরস্পরাপেক্ষিতা (interdependence on each other)। যে কোনও একটি চক্র তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী চক্রের ক্রিয়ার অপেক্ষা করে; উহার যে কোনও একটি চক্র তৎপরবর্ত্তী চক্রসমূহের নিয়ন্ত্রী। আমাদের দেহের মধ্যেও পরিপাক-ক্রিয়ার স্তরভেদে, এই পারম্পর্য্য ও পরস্পরাপেক্ষিতা বিশিষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়। মুখের মধ্যে যে কোনও দ্রব্য যায়, সে তথায় পৌঁছিবামাত্রেই জিহ্বা তাহার আস্বাদটি গ্রহণ করিয়া লয়। জিহ্বায় যে পরিমাণে আস্বাদটি গৃহীত হইল, সেই আস্বাদনের স্বল্প বা অত্যন্তানুভূতির অনুপাতেই মুখের লালার স্রাব ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ যদি জিহ্বায় সে খাদ্যটির স্বাদটা তাদৃশ ভাল বোধ না হয়, তবে লালাস্রাব কম হয় এবং স্বাদটি যদি উগ্র বা মধুর বোধ হয়, তবে লালাস্রাব বেশী হইয়া থাকে। আমরা পরে দেখিব যে, যে পরিমাণে লালা স্রুত হয়, সেই অনুপাতে পাকাশয়িক রস এবং পাকাশয়িক রসের অনুপাতে ক্লোমরস স্রুত হয়। অতএব প্রথম মুখপাতের উপরেই শেষরক্ষা অনেকটা নির্ভর করে। এই বড় কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা আবশ্যক। যেহেতু, নিতান্ত ঔদরিক ব্যতীত জনসাধারণ আহার-কার্য্যটিকে অবশ্য-প্রতিপাল্য বা অনিবার্য্য ব্রত বলিয়া মনে করেন। এরূপ ব্যবহার যে কতটা দূষণীয়, তাহা বুঝান শক্ত কথা। বর্ত্তমান সময়ে "মন" বলিয়া যে দেহের রাজা আছেন, তাহা আমরা ভুলিয়া যাই। আমরা স্ব স্ব স্বার্থ বা সাংসারিক কাজ লইয়া এতই ব্যস্ত থাকি এবং বাহ্যিক জগতের ঘটনাপরম্পরায় এতটা বিজড়িত থাকি যে, মনস্তত্ত্বের কোনও সন্ধান রাখি না। তাই পদে পদে দুঃখও পাই। হিন্দুদিগের মধ্যে ভোজনটা একটা নিত্য অনুষ্ঠানের প্রধান অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রাহ্য হয়। সেই ব্যপদেশে স্বচ্ছন্দমনে, হৃষ্টচিত্তে এবং পুণ্যজ্ঞান লইয়া হিন্দুর ভোজনে বসিবার আদেশ আছে। যথার্থই সেই ধারণার প্রেরণায় ভোজনে লিপ্ত হইলে ভোজনে পরম তৃপ্তিবোধ হওয়া অবশ্যম্ভাবী এবং সেই তৃপ্তিই পরিপাক-ক্রিয়ার পরম সহায়। এই কথাটি উল্টা দিক্ হইতে দেখিলে আরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে কর, তোমার যখন

দারুণ জঠরজ্বালা ধরিয়াছে, সেই সময়ে খাইতে যাইতেছ, এমন সময়ে যদি দুর্ঘটনার সংবাদ আসে বা হঠাৎ ক্রোধের উদ্দীপন হয়, তবে সে জঠরাগ্নি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হয় এবং যে সুখাদ্য দেখিয়া লোলুপদৃষ্টিতে খাইতে বসিতেছিলে, সেই খাদ্যই ন্যক্কারের উদ্রেক করায়। অতএব, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, খাদ্যদ্রব্যের সরস আস্বাদগ্রহণের উপরে পরিপাক-ক্রিয়া অন্ততঃ আংশিকভাবেও নির্ভর করে; সেই আস্বাদগ্রহণ জিহ্বারই কার্য্য।

মুখগহ্বরের দ্বিতীয় সহায়—দন্তপংক্তি। সত্যই, দাঁত থাকিতে আমরা দাঁতের মর্ম্ম বুঝি না! পরিপাক-ক্রিয়ার জন্য দন্ত যে কত দূর প্রয়োজনীয়, তাহা দন্তহীনেরাই সম্যক্ বুঝিয়াছেন। দন্তদ্বারা খাদ্যদ্রব্য কর্ত্তিত, কুট্টিত ও পিষ্ট হয়। ঐ ভাবে খাদ্যদ্রব্যটি বিধ্বস্ত না হইলে তাহা তরল হইবার পথে অগ্রসর হইতে পারিত না। একটা টুক্‌রা রুটি বা মাংস যদি দাঁত দিয়া খণ্ডীকৃত না হইত, তবে কোনও কালে সে রুটি বা মাংসটুক্‌রা হজম হইতে পারিত না। চিকিৎসা করিতে যাইয়া অনেক স্থলে দেখিয়াছি যে, ব্যক্তি-বিশেষ অজীর্ণ, উদরাময় বা পরিপাক-সম্বন্ধীয় অপর পীড়া ভোগ করিতেছেন এবং চিকিৎসকও ঝুড়ি ঝুড়ি ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন, অথচ রোগীর ব্যারাম সারে না! এমন রোগীর দন্তবিহীন মুখে দুই পাটি উত্তম দাঁত বাঁধাইয়া দেওয়া-মাত্রেই তাহার সকল ব্যারাম বিনা ঔষধে সত্বর তিরোহিত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা দন্তের উপকারিতার আর কি দৃষ্টান্ত দিব?

মুখগহ্বরের তৃতীয় সহায়—লালাগ্রন্থিত্রয়। মুখের লালা খাদ্যদ্রব্যকে যে শুধু পিচ্ছিল ও নরম করে, তাহা নহে; পরন্তু মুখের লালার সাহায্যে আরও দুইটি অধিকতর প্রয়োজনীয় কার্য্য সংসাধিত হয়। (১) প্রথমটি এই—লালার সাহায্যে শ্বেতসার (starch) জাতীয় খাদ্যমাত্রেই কথঞ্চিৎ পরিমাণে শর্করায় পরিবর্ত্তিত হয়। বরফে ও জলে যে প্রভেদ, শ্বেতসার ও শর্করায় প্রায় সেই প্রভেদ অর্থাৎ একটি নিরেট ও কঠিন, অপরটি তরল ও সহজে গ্রাহ্য। সাগু, বার্লি, ময়দা, চাল ইত্যাদি শ্বেতসারজাতীয় পদার্থ। যদি এক গ্রাস ভাত মুখে লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্ব্বণ করা যায়, তবে মুখের মধ্যে কিঞ্চিৎ মিষ্টত্বের অনুভূতি হয়। সেটি কি? সেই মিষ্টত্ব ভাতের শ্বেতসারের শর্করায় আংশিক পরিবর্ত্তনের ফল। (২) লালার দ্বিতীয় কায—মুখে লালার স্রাব হইলে তবে পাকস্থলীতে পাকাশয়িক রসের আবির্ভাব হয় অর্থাৎ একটি অপরটির অনুপন্থী। অতএব বেশ বুঝা গেল যে, মুখের লালা পরিপাক-ক্রিয়ার পক্ষে একটি বিশিষ্ট সহায়। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা এ কথাটি আরও সুবোধ্য হইবে। আমাদের দেশে একটা কথা আছে, মুড়ি খাইয়া জল খাইতে নাই। মুড়ি শ্বেতসারজাতীয় অতীব শুষ্ক পদার্থ। যদি এক গ্রাস মুড়ির সঙ্গে এক ঢোঁক জলপান করা যায়, তবে মুড়িকে সত্বরই ও অতি সহজেই গলাধঃকরণ করা যায়। কিন্তু জলপান না করিলে যাবৎ মুড়ি লালাদ্বারা সিক্ত না হয়, তাবৎ উহাকে গিলিয়া ফেলা যায় না। মুড়িতে জল দিলে গিলিবার সুবিধা হয় বটে, কিন্তু লালার সাহায্যে উহার যে পরিমাণে শর্করায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিত, সে আশা ঘুচিয়া যায়; কাজেই মুড়ি হজম করা শক্ত হইয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে অনেকের পাঁউরুটি, রুটি, বিস্কুট, মুড়ি—এই সব খাবার জিনিষ দুধে, ডালে বা ঝোলে ডুবাইয়া নরম করিয়া খান। এরূপ করায় খাবার জিনিষটি খুব নরম হয় এবং তাহা অতি সহজেই গলাধঃকরণ করা যায়। দন্ত-হীনেরা বা রোগীরাই এই ভুলটি বিশেষ রকমে করিয়া থাকেন, আর দন্তহীনের ও রোগীদেরই পরিপাকশক্তি কম অর্থাৎ যাঁহাদের এরূপ করা বিশেষরূপে অনুচিত, তাঁহারাই ইহা করিয়া থাকেন। কাযেই অপকারও যথেষ্ট হয়। বাহ্যদৃশ্যতঃ ভিজান রুটি বা বিস্কুট নরম হইলেও তাহাকে মুখের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ও অল্পক্ষণ রাখার ফলে তাহাতে লালা কম লাগে, অতএব মুখপাত ভাল না হওয়ায় শেষরক্ষা ভাল হয় না। ন্যায্যভাবে চলিতে হইলে রুটি, বিস্কুট, মুড়ি, খই, পাঁউরুটি, ভাত প্রভৃতি শুষ্কভাবে মুখে লইয়া ক্রমাগত তাহাদিগকে মুখের ভিতরে নাড়াচাড়া করিতে হয়; যাবৎ সেগুলি একেবারে লালারসে সিক্ত না হয়, তাবৎ উহা গিলিতে নাই; পরে আবশ্যকমত দুধ, ডাইল বা ঝোল স্বতন্ত্র চুমুক দিয়া খাইতে পারা যায়। এই প্রথাই স্বাস্থ্যপ্রদ ও সমীচীন, ভিজাইয়া খাওয়া স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ ও অসমীচীন ব্যবস্থা। আশা করি, লালার উপকারিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। লালাস্রাবের ন্যূনাধিক্যের উপর পরবর্ত্তী সকল রসের ন্যূনাধিক্যের নির্ভরতা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য।

মুখগহ্বরের পরেই পাকাশয়ের কায। পাকাশয়ে (Stomach) আমরা দুইটি জিনিষ দেখিতে পাই। প্রথমটি, পাকাশয় একটি পেশীবহুল থালিবিশেষ; দ্বিতীয়টি, পাকাশয়ে একপ্রকারের রস (Gastric juice) স্রুত হয়। পাকাশয়গাত্রে মাংসপেশী থাকার জন্য উহার মধ্যে যে খাদ্য-দ্রব্য পড়ে, উহা তাহাকে ইতস্ততঃ পরিচালিত ও কতক পরিমাণে পেষণ (Churning) করিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা বাজী রাখিয়া অত্যন্ত ভোজন করে, তাঁহারা ঐ মাংসপেশীকে এত দূর প্রসারিত করেন যে, ক্রমে মাংসপেশীগুলি অক্ষম হইয়া পড়ে; তখন পাকাশয় আর খাদ্যদ্রব্যকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতে পারে না বা অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যসমূহকে পেষণও করিতে পারে না। পাকস্থলীর এই প্রসারিত (Dilatation of Stomach) অবস্থা ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার অন্যতম কারণ। পাকস্থলীতে যে রস স্রুত হয়, সেটির পরিপাক করিবার ক্ষমতা প্রচুর। সে রসটি অম্লরসাত্মক। মুখের লালাস্রাবের ঠিক অনুপাতে না হউক, অনেকটা লালার ন্যূনাধিক্যের সমানুপাতে পাকাশয়িক রস স্রুত হয়।

আবার পাকাশয়িক রসের অম্লত্বের অনুপাতে ইহার পরবর্ত্তী রস (Pancreatic juice and bib অর্থাৎ ক্লোম ও পিত্ত-রস) ক্ষত হয়। এই পাকাশয়িক রস সুস্থদেহে পরিপাকের মত যথাপ্রয়োজনীয় পরিমাণে ক্ষত হয়। কিন্তু যদি কোনও কারণে দেহ নিস্তেজ, দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত হয়, তবে ঐ রসও স্বল্প পরিমাণে ক্ষত হয়। আবার, সুস্থদেহে যথারীতি ও যথাপ্রয়োজনীয় পরিমাণে রস ক্ষত হওয়ার উপরে, আমরা যদি অনেক পরিমাণে জল পান করি, তবে ক্ষত রসটুকু এত পাত্‌লা হইয়া পড়ে যে, তাহার কার্য্যকরী ক্ষমতার হ্রাস হয়। ফলকথা, দেহ সুস্থ, সবল ও নীরোগ থাকিলেই পরিপাক-ক্রিয়া যথারীতি হইবার কথা। কিন্তু প্রত্যহই যদি আমরা ভাল করিয়া খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ না করি (অর্থাৎ মুখের লালা-স্রাবের হ্রাস করি), প্রায়ই যদি আমরা খাইতে বসিয়া পরিমাণে বেশী খাই (অর্থাৎ ক্রমশঃই পাকস্থলীর মাংসপেশী-গুলিকে অত্যন্ত প্রসারিত করিয়া কর্ম্ম-অক্ষম করিয়া তুলি) এবং প্রত্যহই যদি প্রতি গ্রাসের সঙ্গে এক ঢোঁক করিয়া জল খাই (অর্থাৎ ক্ষত রসটিকে পাত্‌লা করি ও সেই সঙ্গে পাকস্থলীকেও প্রসারিত করি),—তবে কেন না পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটিবে ? এই পর্য্যন্ত পাকস্থলীর কথা গেল।

পাকস্থলীর পরে ক্লোমযন্ত্র (Pancrear) ও পিত্ত-থালি (Gall Blader)। পাকাশয়ের মধ্যে যে পরিমাণে অম্লাত্মক রস ক্ষত হয়, সেই পরিমাণে ক্লোম ও পিত্তরস নিঃসৃত হইয়া থাকে। অতএব, অতিভোজন ও অতিশয় জলপান করিলে এই দুই রসের ন্যূনতা ঘটিবার কথা। অথচ পাকাশয়িক রসের অপেক্ষা এই রসদ্বয় বহুল পরিমাণে অধিক কার্য্যকরী। ইহাদের অভাবে পরিপাক-ক্রিয়ার অত্যন্ত গোলযোগ ঘটিবার কথা।

পাঠক মহাশয়, যদি এ যাবৎ ধৈর্য্যসহকারে সকল কথা পাঠ করিয়া থাকেন, তবেই তাঁহার বেশ উপলব্ধি হইয়াছে যে, পাককার্য্য স্থূলতঃ তিনটি যায়গায় ঘটিয়া থাকে। যথা—

মুখে (Mouth)—

জিহ্বাদ্বারা—স্বাদ গৃহীত হইয়া,

লালারসের—সঞ্চার হয় ; এবং

দন্তদ্বারা—খাদ্যদ্রব্য খণ্ডীকৃত হয়।

পাকাশয়ে (Stomach)—

মাংসপেশীসাহায্যে খাদ্যদ্রব্য পেষিত হয়,

পাকরস—সাহায্যে জীর্ণ হয়,

ক্ষুদ্রান্ত্রে (Small Intertines)—

ক্লোম ও পিত্তরসের দ্বারা খাদ্য জীর্ণ হয়।

এই সঙ্গে আর একটি কার্য্যের কথা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেটি এই রসসমূহের পরস্পরের মুখাপেক্ষা করার ধর্ম্ম। যাহাতে সেই কায কলের মত চলিতে পারে, তজ্জন্য পরস্পরের রসের বিরোধী গুণ আছে ; যথা—

মুখের লালা—ক্ষাররসাত্মক (alkaline)।

পাকাশয়িক রস—অম্লরসাত্মক (acid)।

ক্ষুদ্রান্ত্রের রস—ক্ষাররসাত্মক (alkaline)।

মুখের লালা ক্ষাররসাত্মক বলিয়াই উহা পাকাশয়িক অম্লরসকে নিঃসৃত করিতে পারে এবং পাকাশয়ের অম্লত্ব ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষারাত্মক রসের উত্তরসাধক। এই কথাটি বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য, যেহেতু, অনেক ডিস্‌পেপ্‌সিয়াগ্রস্ত রোগী আহারের পূর্ব্বে খানিকটা লেবুর রস খালিপেটে খাইয়া তবে আহারে বসেন। তাঁহাদের ধারণা এই যে, ঐরূপ করার ফলে যকৃৎ ভাল থাকে। কিন্তু ফল দাঁড়ায় ঠিক বিপরীত। কারণ, আহারের পূর্ব্বে অম্লরসভোজনে পাকাশয়িক রস নিঃসৃত হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। [আহারান্তে অম্লভোজন কোনও অপকার করে না। তবে, বিকট টক কোন ব্যঞ্জন বা অধিকমাত্রায় খাইলে খারাপ হয়।]

এতক্ষণে আমাদের পরিপাক-ক্রিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা সাঙ্গ হইল। এইবারে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার আলোচনা সংক্ষেপে করিব।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কি ?—চিকিৎসাশাস্ত্রের মতে পাকাশয়ের পরিপাক-ক্রিয়ার হ্রাসের দরুণ যে যে লক্ষণগুলি হয়, তাহাকেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কহে অর্থাৎ ডাক্তারীমতে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একটি ব্যারাম নহে—পাকাশয়ের অক্ষমতার পরিচায়কলক্ষণের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু চলিতকথায় ক্ষুধা-মান্দ্য, অম্লোদ্গার, বুকজ্বালা, উদরাধ্মান (পেটফাঁপা), কোষ্ঠকাঠিন্য বা তারল্য বা কখনও কাঠিন্য কখনও তারল্য, আহারান্তে পেটের মধ্যে ভারবোধ,—সবগুলিই একত্র বা একে একে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এগুলি যে ভ্রমাত্মক ধারণ, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজনীয়।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া বলিলে পাকস্থলীর কি কি দোষ বুঝায় ? এই এই গুলি সাধারণতঃ ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার প্রকৃত কারণ :—(১) পাকাশয়ের প্রসারিত অবস্থা (dilation of stomach) ; (২) পাকাশয়ের প্রদাহ (inflammation) ; (৩) পাকাশয়িক রসের অভাব ও শ্লেষ্মার আধিক্য (a-pepsia) ; (৪) পাকাশয়িক অম্লাধিক্য (hyper-acidity)।

এইবারে এই প্রত্যেক অবস্থা-সম্বন্ধে দু'চার কথা বলিলে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার ভিতরকার কথা বেশ পরিষ্কার হইবে। পাকাশয়টি রবারের ন্যায় কতকটা স্থিতিস্থাপকতা গুণ (alasticity) বিশিষ্ট একটি থালি অর্থাৎ যখন উহা শূন্য থাকে, তখন উহার যে আয়তন, পেট খুব ভরিয়া খাইলে বা প্রত্যহ কিছু কিছু বেশী বেশী খাইতে অভ্যাস করিলে শূন্য অবস্থার চারগুণ বা বেশী আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব। কিন্তু রবারকে প্রত্যহই জোরে টানিলে বা একবারও খুব বেশী টানিলে উহার সেই স্থিতিস্থাপকগুণটি নষ্ট হইয়া যায়—রবারটি যত দূর বাড়িয়াছিল, সেই বাড়ান অবস্থাতেই থাকে। পাকস্থলীর আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে

যে কেবল উহার পেষণ করিবার (churning) ক্ষমতার হ্রাস হয়, তাহা নহে; পাকস্থলীর ভিতরকার গাত্রে যে অসংখ্য রসসৃষ্টিকারী যন্ত্র আছে, তাহাদিগের অনেকগুলিই চিরদিনের মত নষ্ট হইয়া যায়। তাহার ফলে পরিপাক-ক্রিয়ার যে দুইটি মাত্র উপায় পাকস্থলীর জন্য ব্যবস্থিত আছে, সে দুইটিই চিরদিনের মত অক্ষম হইয়া পড়ে। যাহারা পাল্লা দিয়া নিমন্ত্রণে বসিয়া ক্রমাগতই পেট ঠাসিয়া খাইয়া আসিয়াছে বা যে ঔদরিকেরা ক্রমাগতই বেশী বেশী খাওয়ায় রত, তাহাদিগেরই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। তাহারা খাবার খায় বটে, কিন্তু তাহাদের পাকাশয়ের এমন ক্ষমতা থাকে না যে, খাদ্যদ্রব্যকে পেষিয়া চট্‌কাইয়া নরম করিয়া দেয় এবং তাহাদের আহারের পরিমাণের তুলনায় অতি সামান্যই রস নিঃসৃত হয়। তাহার ফলে কি দাঁড়ায়? সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভাত-ব্যঞ্জন গ্রীষ্মকালে ফেলিয়া রাখিলে যাহা হয়, সেই অবস্থা পেটের মধ্যেও হইয়া থাকে অর্থাৎ ভুক্তদ্রব্য পচিতে থাকে। পচনক্রিয়ার ফলে রাতদিন গ্যাস (বায়ু) উদ্গার হইতে থাকে, অম্লবোধ হয়, মুখে জল উঠা, পেট গড়-গড় করিয়া ডাকা, পিপাসাবোধ, কোষ্ঠকাঠিন্য, আলস্য ও শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া পড়া ইত্যাদি উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে গৃহস্থের মেয়েরা অনেক বেলায় খান বলিয়া ভাতের পরিমাণ বেশী খাইয়া ফেলেন, তাহার ফলে পাকস্থলীর প্রসারণ ঘটিয়া থাকে। কলিকাতা সহরে মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহিণীদের মধ্যে এই অবস্থা নিতান্ত বিরল নহে। ভাত কিছুদিনের জন্য একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে তাঁহারা সত্বরই সারিয়া উঠেন।

পাকাশয়ের প্রদাহ।—যাঁহারা সুরাসেবী, যাঁহারা চুরুটের বা দোক্তা বা তামাকের রস বা "ছেপ" গিলিয়া ফেলেন, যাঁহারা নিত্য পেঁয়াজ-রসুন গরম মস্‌লা খাইয়া থাকেন, যাঁহারা খাদ্যদ্রব্য ভাল করিয়া চর্ব্বণ করেন না, তাঁহাদিগের পাকস্থলীর প্রদাহ অবশ্যম্ভাবী। খালিপেটে কতকটা মিষ্ট খাইলেও ঐ ফল ফলে। যাঁহাদের দাঁতে "পোকা" আছে, যাঁহাদের মাড়ী টিপিলে পূয বাহির হয় বা মাড়ী চুষিলে রক্ত পড়ে, তাঁহারা মুখ ভাল করিয়া না পরিষ্কার করিয়া খাইলে তাঁহাদেরও পাকস্থলীর প্রদাহ (Chronic inflammation) হয়। খালি গায়ে পেটে ঠাণ্ডা লাগাইলে, ঠাণ্ডা মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইলেও ঐ ফল। যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাঁহারাও এই ব্যারামে ভোগে। পাকস্থলীর প্রদাহের ফলে তথায় শ্লেষ্মার আধিক্য ও পাকাশয়িক রসের হ্রাস ঘটে। শ্লেষ্মার পরিপাক করিবার ক্ষমতা আদৌ নাই, বরং পরিপাক-কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। কাযেই এই অবস্থার সঙ্গে পাকাশয়িক রসের হ্রাস হইলে প্রকৃতই মনসার সঙ্গে ধূনার গন্ধের সংযোগই ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা প্রত্যহ স্কুলে বা আফিসে যাইবার জন্য অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ খাদ্য তাড়াতাড়ি ভোজন করেন, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া তাঁহাদেরই ব্যারাম। এই জন্য কলিকাতার মেস্‌বাসীরা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একচেটিয়া করিয়া বসিয়াছেন। ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। কলিকাতাবাসীদিগের পক্ষে এটা লজ্জার কথা এবং কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ইহা দুরপণেয় কলঙ্কের কথা। অনেকে হয় ত মনে ক'রবেন, তাড়াতাড়ি অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ খাবার খাইলে এত কি দোষ ঘটে? যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, পাকস্থলীর ভিতরটি অতীব কোমল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রবিশিষ্ট পদার্থ। তাহাতে সামান্য অত্যাচার সহ্য হয় না। আমাদের দেশের মেয়েরা, এমন কি কচি কচি বালিকারাও দোক্তা খাইয়া থাকেন—যত ইচ্ছা পান খাইয়া থাকেন এবং পানের অপাচ্য সুপারীর কুচি, ধনের চাল, মৌরী, যোয়ান প্রভৃতি অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। এত অত্যাচারে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কেন হইবে না? আমাদের দেশের আর একটি দোষজনক প্রথা আছে। অধিক বেলা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিলে অনেকে তৃষ্ণানিবারণার্থ শুধু জলপান না করিয়া একটু গুড় বা চিনি গালে ফেলিয়া তবে জলপান করেন। খালিপেটে মিষ্টভোজন গর্হিত কার্য্য।

এইবারে পাকাশয়িক অম্লাধিক্যের কথা বলিব। পাকাশয়ে স্বাভাবিক যে অম্লরসের সঞ্চার হয়, তাহা পরিপাকক্রিয়ার অনুকূল। কোনও কোনও পাকাশয়ের ব্যাধিতে সেই রসের আধিক্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যখন আমরা "অম্ল হইয়াছে" বলি বা যখন উদ্গারের সঙ্গে টক্‌ঝাঁজ নির্গত হয়, তখন সেই অম্লও স্বাভাবিক অম্লের আধিক্যবশতঃ ঘটে না। খাদ্যদ্রব্য পচিতে আরম্ভ করিলে যে যে অম্লের সৃষ্টি হয়, সেগুলি অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত এবং তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক-ক্রিয়ার প্রতিকূল। এসিটিক্ অ্যাসিড বা শির্কাম্ল, বিউটাইরিক অ্যাসিড, ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড বা দইয়ের অম্ল, অক্সি বিউটাইরিক অ্যাসিড, এই সকল পচনশীল ও পরিপাক-ক্রিয়ার প্রতিকূল অম্লই "অম্লবোধের" হেতু। যাহাদিগের পরিপাকশক্তির হ্রাস হইয়াছে, তাহারা যদি নিজের ওজন না বুঝিয়া খায় বা অক্ষুধায় খায় বা যাহারা পচা, বাসি বা ভেজাল ঘিয়ের জিনিষ খায়, বেশীর ভাগ সেই রকমের লোকেরই পেটে ঐ সকল অম্লের সঞ্চার হয় এবং তখন তাহাদিগের বুকজ্বালা, চোঁয়াঢেঁকুর প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। অন্নভোজীদিগের স্বাভাবিক পরিপাক-ক্রিয়ার হ্রাস ঘটিলেও তাহাদিগের পেটের মধ্যে অন্ন পচিয়া নানাপ্রকারের অম্লের সৃষ্টি করিয়া থাকে। যাহারা বহুদিন অতিভোজন করিয়া আসিতেছে, যাহারা ম্যালেরিয়া, রক্তআমাশয়, রক্তস্রাব, যক্ষ্মাকাশ প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া বিবর্ণ (anaemic) হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের যকৃৎ বা প্লীহার ব্যারাম আছে, তাহাদেরই পরিপাকশক্তি কমিয়া আসে, আর সেই সকল লোকে নিজের অবস্থার অনুপযোগী ভোজন করিলে পেটে ব্যথা, পেটফাঁপা, চোঁয়াঢেঁকুর উঠা প্রভৃতি

উপদ্রবে ভুগিয়া থাকে। যাহাদের শৌচপ্রস্রাব নিয়মিতরূপে ভাল করিয়া হয় না, যাহাদের বাতব্যাধি আছে, তাহাদেরও ঐ অবস্থা ঘটে।

এইবারে ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার চিকিৎসার কথা বলিব। যদিও স্বতন্ত্রভাবে "এইটি ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার চিকিৎসা" এ রকমে কিছু বলি নাই, তথাপি ক্রমে ক্রমে সকল দোষ বলিয়া উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি, সেগুলিকে ত্যাগ করিলেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার চিকিৎসা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া একটা কারণসম্ভূত বা একলক্ষণবিশিষ্ট ব্যাধি নহে; এই জন্য উহার ঔষধও বহুরূপী। কিন্তু ঔষধ অপেক্ষা আহারের সুনিয়মগুলি প্রতিপালিত হইলেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার যথার্থ সুচিকিৎসা করা হয়। অতএব সেইগুলি সাধারণভাবে বলিয়া যাইব।

(১) আহারের উদ্দেশ্য দেহের পুষ্টিসাধন করা ও দেহে বলাধান করা। যদি বলাধানের উপযোগী আহার্য্য গ্রহণ করা যায় অথচ ব্যায়ামচর্চ্চা না করা যায়, তবে সেটা শরীরের ও খাদ্যের প্রতি অবিচার করা হয়। অতএব খাটিবে ত খাইবে এবং খাইবে ত খাটিবে, এটি মূলমন্ত্র হওয়া চাই। ধনীই হউন বা দরিদ্র হউন, পরিশ্রম না করিলে কাহারও খাইবার অধিকার নাই। বলা বাহুল্য, পরিশ্রম অর্থে আমরা শারীরিক পরিশ্রমেরই কথা বুঝি। যিনি কায়িক পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ বা যিনি একাধিক্রমে মানসিক পরিশ্রমেই অভ্যস্ত, তাঁহাদের পক্ষে স্বল্পাহারই প্রশস্ত। দুধ, ঘি, মাংস ইত্যাদি অর্থের দ্বারা ক্রয় করা সহজ হইলেও বিলাসীদের দেহের আয়ত্তাধীন নহে। সামাজিক অবস্থানির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই দুই বেলা নিয়মিত সময়ে ও ক্রমোন্নতির হারে আজীবন ব্যায়ামচর্চ্চা করা বাঞ্ছনীয়। ধনী বলিয়া বা রমণী বলিয়া ওজর করিবার অবসর নাই।

(২) মুখের মধ্যে একটি দাঁত যেন ফাঁক না থাকে। দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে তদ্দণ্ডেই সারাইবে। ছাই পাঁশ যা-তা দিয়া দাঁতমাজা, যত ইচ্ছা পান-দোক্তা প্রভৃতি খাইয়া মুখ না ধোয়া, যখন তখন বা যখন ইচ্ছা মুখ ধোয়া, তাড়াতাড়ি ভাল করিয়া চর্ব্বণ না করা, কখনও গরম কিছু খাইয়া তাহার পরেই ঠাণ্ডা কিছু খাওয়া, সাহেবীয়ানা করিয়া মুখশুদ্ধির ব্যবহার না করা, মাংস বা রুটি খাইয়া ভাল করিয়া দাঁত ও মুখ পরিষ্কার না করা—এই সব দোষে দাঁত খারাপ হয়। দাঁত যে সুধু মুখের শোভার জন্য, তাহা নহে; দাঁত চিবানরই জন্য। এই জন্য দাঁতের ব্যায়াম ও দাঁতের ফাঁক এক দণ্ডের জন্যও রাখিবে না। আর যাঁহাদের দাঁত ঠিক আছে, তাঁহারা যেন ভুলিয়াও তাড়াতাড়ি না খান। আপিষের বা স্কুলের বেলা হইয়াছে বলিয়া তাড়াতাড়ি খাওয়া বড়ই ভুল। তাড়াতাড়ি খাইলে কোনও কালে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারে না।

(৩) ভুক্তদ্রব্য যাহাতে পেটের মধ্যে না পচে, তাহা করা আবশ্যক। চারিটি কারণ বর্জ্জন করিলে সে সম্ভাবনা দূর হয়। প্রথম কারণ, অতিভোজন। অনুরোধে, উপরোধে, উপহাসের ভয়ে, ঝোঁকে পড়িয়া, লোভে পড়িয়া, কোনও কারণে অতিভোজন করা অতিশয় পাপ। দ্বিতীয় কারণ, গুরুপাক বা ভেজালদ্রব্য আহার। তৃতীয় কারণ, অক্ষুধায় উপরে খাওয়া। চতুর্থ কারণ, অত্যাচার করা। যথা, অপরিমিত জলপান করা বা সোডা ইত্যাদি পান করা, দোক্তা বা বেশী পান খাওয়া, চা পান করা ইত্যাদি। অনেকের মনে ধারণা আছে যে, ভোজনান্তে মিছরির পানা, ডাবের জল বা সোডাওয়াটার প্রভৃতি পান করিলে পরিপাক-ক্রিয়া ভাল হয়। এটি খুব ভ্রান্ত ধারণা। এরূপ করিলে হজমের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। কেহ কেহ চা'কে একটু গরমজল মাত্র মনে করেন। সেটিও ঠিক নয়—বিশেষতঃ দোকানের তৈয়ারী চা একটি প্রত্যক্ষ বিষ। অনেকের ধারণা, প্রত্যহ রীতিমত দধি বা ঘোল সেবন করিলে বা বেশী বেশী দধি ভোজন করিলে পরিপাক-ক্রিয়া ভাল হয়। উহাতে হজম ভাল হওয়া দূরের কথা, বিপরীত ফলই হইয়া থাকে।

(৪) আহারের সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক অত্যাচারগুলি নিবারণ করিতেই হইবে। অতিরিক্ত পান খাওয়া বা পানের ছিব্‌ড়া গলাধঃকরণ করা, দোক্তা বা অতিরিক্ত তামাক সেবন করা, অসিদ্ধ বা অর্দ্ধসিদ্ধ ভোজন করা, দোকানের তথাকথিত ঘৃতে ভাজা খাদ্য বেশীদিন খাওয়া, দোকানের তৈয়ারি চা পান করা, অনিয়মে যখন তখন ভোজন করা, যখন তখন বরফ খাওয়া—ইহারা কেহই সদ্যঃ ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার সৃষ্টি করে না বটে, কিন্তু ইহাদের সঞ্চিত ফল দারুণ ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই।

(৫) ক্ষুধা না পাইলে খাইতে নাই এবং ক্ষুধার সময়ে "পিত্ত পড়িতে" দিতে নাই। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া ভোজন করা সহরের লোক ও বালক-বালিকা ব্যতীত কাহারও অভ্যাস নাই। পয়সার অভাবে খানিকটা চা খাইয়া সহরের ছেলেরা ও বয়স্ক ব্যক্তিরা উদরপূর্ত্তি করেন। পল্লীগ্রামে মুড়ি, মুড়কি বা দুধ তৎস্থানীয়। যাঁহারা চাকুরিজীবী বা ছাত্র, প্রায়শঃ তাঁহাদিগেরই ডিস্‌পেপসিয়া হইয়া থাকে বলিয়া তাঁহাদিগেরই অবস্থা ধরিয়া ব্যবস্থা করিব। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে একটু চা পান করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই চা প্রত্যহ পান করা বালকদিগের কখনও উচিত নহে। বয়স্কদিগের পক্ষে চা পান করিতে করিতে ক্রমশঃই উগ্র চা-রস পানের প্রবৃত্তি জন্মায়—সে প্রবৃত্তির ফল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া। এই অভ্যাস প্রাতরাশের পরে ক্ষুধাবোধ হউক বা না হউক, সত্য সত্যই নাকে মুখে গুঁজিয়া আপিষে যাওয়ায় তাঁহাদিগের পরিপাক কম হয়। তাহার পরে দুপুরে বা বৈকালে দারুণ ক্ষুধায় কিছু খাইতে না পাওয়ায় পিত্তপড়ে। এই দুইটিই অপকারী।

আমাদিগের দেশে সকালে বৈকালে আপিষ ও স্কুল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তবে আমার মনে হয় যে, প্রাতঃকালে দুধ, চা, মুড়ি, মুড়কি যাহার যেমন অবস্থা, তেমনি খাইয়া আপিষ যাইবার সময়ে একটু মোহনভোগ বা সামান্য ঢুটি ভাত অর্থাৎ বেশ স্বল্পাহার করিয়া স্কুলে বা আপিষে যাওয়াই ভাল। পরে আপিষে বসিয়া বেশ করিয়া পেট ভরিয়া রুটি খাইয়া রাত্রে ভাত খাইলে মন্দ হয় না।

(৬) অনেকে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে যখন তখন গুঁড়া সোডা (Soda Bicarb) ব্যবহার করেন। ঐ সোডাতে অধিকাংশ স্থলেই সোডা কার্ব্বনেটের ভেজাল থাকায় উহা অতীব অপকারী হয়। এই জন্য যে সে সস্তার বাজে মেকারের সোডা মুঠা মুঠা খাইতে নাই। তিক্ত জিনিষও রোজ খাওয়া ভুল।

ডিস্‌পেপ্‌সিয়া এত বৃহৎ বিষয় যে, অতি সংক্ষেপে ইহার সব কথা বলা অসম্ভব। তাই নিতান্ত প্রয়োজনীয় ২.৪ কথা বলিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করিলাম।

খাদ্য-সংস্কার।

[ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ লিখিত।]

যে দ্রব্য আহার করিলে শারীরিক ক্ষয় নিবারিত, দৈহিক তাপ রক্ষিত এবং বল-পুষ্টি সংবর্দ্ধিত হয়, তাহাকে খাদ্য বলে। আমাদের খাদ্যে শরীররক্ষার উপযোগী পাঁচ প্রকার উপাদান আছে। রাসায়নিক ভাবে খাদ্য বিশ্লেষিত হইলে ঐ পঞ্চ উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়; যথা—

(১) শর্করা (Carbohydrates)।
(২) প্রোটীড বা ছানাজাতীয় উপাদান (Proticds)।
(৩) স্নেহ পদার্থ (Fat)।
(৪) লবণ (Salts)।
(৫) জল (Water)।

সকল খাদ্যে সকল উপাদান সমান নহে। যে খাদ্যে যে উপাদান অধিক, তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য বলে। চাউলে শর্করার (Carbohydrates) ভাগই অধিক, স্নেহ বা লবণাদির ভাগ অল্প, এ জন্য চাউল শর্করাজাতীয় খাদ্য। মৎস্যে প্রোটীডাংশ যথেষ্ট; এ কারণ উহা প্রোটীডজাতীয় খাদ্য মধ্যে গণনীয়।

এক জন শ্রমশীল পূর্ণবয়স্ক লোকের প্রাত্যহিক খাদ্যে ৭½ ছটাক শর্করা, ২ ছটাক প্রোটীড, ১½ ছটাক স্নেহপদার্থ এবং ১½ ছটাক লবণজাতীয় উপাদান থাকা আবশ্যক। ইহার অভাব ঘটিলে দেহ রুগ্ন বা ভগ্ন হইয়া পড়ে।

এক জাতীয় খাদ্য ভক্ষণ করিয়া মানুষ কখনই সুস্থ থাকিতে পারে না। শর্করা আমাদের দৈহিক শক্তি ও তাপ রক্ষা করে। প্রোটীডদ্বারা মাংসপেশী গঠিত হয়। স্নেহপদার্থগুলি তাপোৎপাদন ও বলবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চর্ব্বি প্রস্তুত করিয়া দেহ স্থূল করিয়া দেয়। লবণদ্বারা অস্থিসকল পরিপুষ্ট হয় এবং জল খাদ্যকে তরল করিয়া পরিপাকের উপযোগী করে।

আমরা যদি কেবলমাত্র অন্নাহার করি, তাহা হইলে শরীররক্ষার উপযোগী আবশ্যক পরিমাণ শর্করা পাইতে পারি বটে, কিন্তু অন্যান্য উপাদানের ভাগ কম পড়িয়া যায়। আবার কেবলমাত্র মৎস্য খাইলে প্রোটীডাংশ পূর্ণ হইতে পারে বটে, কিন্তু শর্করা, স্নেহ ও লবণের অভাব ঘটে।

আমরা বাঙ্গালী সাধারণতঃ ভাত, ডাইল, তরকারি মৎস্য ও দুগ্ধ আহার করি। ঐ সকল সামগ্রীর মধ্যে কোন্ দ্রব্যে পূর্ব্বোক্ত উপাদানগুলি কি পরিমাণ আছে, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি।—

চাউল।

জল প্রতি শত ভাগে	...		১০ অংশ।
প্রোটীড	...	...	৫ " ।
স্নেহপদার্থ	...	...	দশমিক আট অংশ।
শর্করা	...	...	৮৩.২ অংশ।
লবণ	...	...	দশমিক পাঁচ অংশ।

বঙ্গদেশে অনেক প্রকার চাউল আছে, কিন্তু তাহাদের উপাদানগত প্রভেদ অতি সামান্য।

ডাইল।

ডাইলে গড়ে নিম্নলিখিত উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

জল প্রতি শত ভাগে	... ...	১১·৩ অংশ।
প্রোটীড	... ...	২৩·৫ " ।
স্নেহপদার্থ	... ...	২·২৯ " ।
শর্করা	... ...	৫৫·৯ " ।
লবণ	... ...	৭·১ " ।

সকল ডাইলের উপাদান সমান নয়। মসুর ডাইলে প্রোটীডের ভাগ কিছু বেশী। উহাতে শতকরা ২৫·১ অংশ ছানাজাতীয় উপাদান আছে।

ডাইল উত্তমরূপে সুসিদ্ধ না হইলে তন্মধ্যস্থ প্রোটীড-উপাদান পরিপাকোপযোগী হয় না।

তরকারি।

আলুই আমাদের সর্ব্বপ্রধান তরকারি। উহার প্রতি শত ভাগে জল ৭৪ অংশ, প্রোটীড ২ অংশ, স্নেহপদার্থ দশমিক ষোল অংশ, শর্করা ২১ অংশ এবং লবণ ১ অংশ থাকিতে দেখা যায়।

রাঙ্গা-আলুর প্রতি শত ভাগে ৭৪·১০ অংশ জল, দশমিক আঠাত্তর অংশ প্রোটীড, ৩·৩১ অংশ স্নেহ, ২১·১৭ অংশ শর্করা এবং দশমিক বায়ান্ন অংশ লবণ আছে।

পটল, ঝিঙে, লাউ প্রভৃতিতে জলীয় ভাগই অধিক।

বেগুনেও জলের ভাগ যথেষ্ট; তবে উহাতে শতকরা ৩·৪৮ অংশ শর্করা এবং ১·৪৮ স্নেহ পদার্থ থাকে।

ফুলকপি ও বাঁধাকপিতে শর্করার অংশ অধিক আছে।

মূলায় শতকরা ৯৫·৭০ অংশ জল এবং ৩·৩৮ অংশ শর্করা। ইহাতে অন্যান্য উপাদান নাই বলিলেই চলে।

কাঁচকলায় শর্করার অংশ এবং কাঁঠালের বীজে প্রোটীডের অংশ অপরাপর তরকারি অপেক্ষা অনেক বেশী।

মটর, সুঁটি, শিম প্রভৃতি সুঁটিজাতীয় খাদ্যেও প্রোটীড উপাদান অধিক আছে।

বরবটীতে শর্করা, লবণ ও স্নেহপদার্থ অতি সামান্য। ইহাতে শতকরা ৯১·৯০ অংশ জল ও ৩·৫০ অংশ প্রোটীড থাকে।

বিলাতী কুমড়ায় শতকরা ১৫৩ অংশ স্নেহপদার্থ ও ৩·৯৬ অংশ শর্করা থাকিতে দেখা যায়। ইহাতে জলের ভাগ শতকরা ৯৩·৪০ অংশ।

ঢেঁড়সে ৯০·৪০ অংশ জল ও ৫·৭২ অংশ শর্করা। ইহাতে ছানাজাতীয় উপাদান শতকরা প্রায় ২ ভাগ।

ওলে শর্করা-উপাদানই অধিক। ইহার প্রতি শত ভাগে ৮০·৬০ অংশ জল, ২·৮৯ অংশ স্নেহ, ১২·৮ অংশ শর্করা, ২·২৯ অংশ প্রোটীড এবং ১·৪ অংশ লবণ।

মৎস্য।

মৎস্যে শর্করা একেবারেই নাই। সাধারণতঃ শ্বেত মৎস্যের উপাদান এইরূপ :—

জল প্রতি শত ভাগে	... ...	৭৮ অংশ।
প্রোটীড	... ...	১৮ " ।
স্নেহপদার্থ	... ...	৩ " ।
লবণ	... ...	১ " ।

এ দেশীয় পুকুরের রোহিত মৎস্যে ১৭·৫ অংশ প্রোটীড থাকিতে পারে। মাগুর মৎস্যে প্রোটীডের ভাগ শতকরা ১৯·৪৯ অংশ। ইলিশে তৈলাংশই বেশী। গল্দা চিংড়িতে শতকরা ৮৩·৫ অংশ জল এবং ১৫·৪৫ অংশ প্রোটীড থাকে।

অন্যান্য মৎস্যের উপাদান প্রায় সমান।

দুগ্ধ।

ইহা প্রকৃতির আদর্শ খাদ্য। দেহরক্ষার জন্য যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, একমাত্র দুগ্ধেই তৎসমুদয় বিদ্যমান আছে। এ জন্য একমাত্র দুগ্ধ পথ্যের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকা যায়। কিন্তু ইহা শিশুর পক্ষে যেরূপ উপযোগী, প্রাপ্তবয়স্কদিগের পক্ষে সেরূপ নহে। প্রত্যহ কেবলমাত্র দুগ্ধপান করিলে অরুচিরোগ জন্মিয়া থাকে। এতদ্দেশে গো-দুগ্ধই প্রচলিত। উহার প্রতি শত ভাগে ৮৭·৫ অংশ জল, ৪·২১ অংশ প্রোটীড, ৩·৮২ অংশ স্নেহপদার্থ, ৩·৬৭ অংশ শর্করা এবং দশমিক একাত্তর অংশ লবণ আছে। *

দধিও আমাদের একটি পুষ্টিকর হৃদ্য খাদ্য। শর্করা ব্যতীত দুগ্ধের আর আর সমস্ত উপাদানই উহাতে আছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, নিত্য দধিভোজন করিলে জরা আসিতে পারে না। দধিমধ্যস্থ দধিবীজ (Streptothrix Dadhi) আমাদের অন্ত্রস্থ অনিষ্টকারী জীবাণু-সকলকে বিনষ্ট করে।

খাদ্যের উপাদানসম্বন্ধে একরূপ মোটামুটি কথা বলা হইল। ইহা দ্বারা পাঠক সহজেই খাদ্যের প্রকার ও পরিমাণ স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। আজকাল এক জন মধ্য অবস্থার বাঙ্গালী ভদ্রলোক দুই বেলায় সাধারণতঃ যে খাদ্য গ্রহণ করেন, তাহাতে শরীরগঠনোপযোগী সকল উপাদান আবশ্যক পরিমাণ থাকে না। অধ্যাপক ম্যাকে ভূয়োদর্শন-দ্বারা এই অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন যে, এ দেশীয় ইংরাজ ছাত্রেরা অনেক স্থলেই বাঙ্গালী ছাত্র অপেক্ষা পুষ্ট ও বলিষ্ঠ। তাহাদের শরীরের দৈর্ঘ্য, বক্ষের প্রসারতা ও দৈহিক ভার অপেক্ষাকৃত অধিক। উক্ত ডাক্তার মহাশয় বলেন, ইহার কারণ বাঙ্গালীর খাদ্যে প্রোটীড বা ছানাজাতীয় উপাদানের ভাগ অল্প। ইংরাজ ছাত্রগণের খাদ্যে যে পরিমাণ প্রোটীড থাকে, বাঙ্গালী ছাত্রের খাদ্যে তাহা থাকে না।

* কলিকাতার সায়েন্স এসোসিয়েসনে পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এ দেশীয় গৃহপালিত গরুর দুগ্ধে ৮৬·৮৭ জল, ৩·৯৭ প্রোটীড, ৪·২৮ স্নেহ, ৪৮·২ শর্করা এবং দশমিক ছয় অংশ লবণ উপাদান আছে।

এক জন ইংরাজ যুবক সাধারণতঃ প্রতিদিন তিন বারে এইরূপে খাইতে পারে :—

পাঁউরুটি	... ...	৮ ছটাক।
মাংস	... ...	৪ „ ।
মাখন	... ...	২ „ ।
আলু	... ...	৪ „ ।
দুগ্ধ	... ...	৪ „ ।
ডিম্ব	... ...	২ „ ।
পনির	... ...	১ „ ।

৮ ছটাক পাঁউরুটিতে ·৬৪ দশমিক চৌশট্টি ছটাক প্রোটীড থাকে; ৪ ছটাক মাংসে ·৭২ দশমিক বাহাত্তর ছটাক; ২ ছটাক মাখনে ·০২ দশমিক শূন্য দুই ছটাক এবং ৪ ছটাক আলুতে ·০৮ দশমিক শূন্য আট ছটাক প্রোটীড থাকিতে পারে; ৪ ছটাক দুগ্ধেও প্রোটীডের মাত্রা ·১৬ দশমিক ষোল ছটাক; ২ ছটাক ডিম্বে ·২৬ দশমিক ছাব্বিশ ছটাক এবং ১ ছটাক পনিরে ·৩১ দশমিক একত্রিশ ছটাক। অতএব দেখ গেল, সর্ব্বশুদ্ধ এক জন ইংরাজ দৈনিক ২·১৯ দুই দশমিক উনিশ ছটাক বা মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১১ তোলা প্রোটীড গ্রহণ করিতেছে।

আর মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী যুবকের নিত্যভোজ্য কি? তাহারা সাধারণতঃ দৈনিক দুই বারে ৮ ছটাক চাউল, ১ ছটাক ডাইল, ৩ বা ৪ ছটাক তরকারি এবং ১ ছটাক বা তাহারও কম মৎস্য খাইয়া থাকে। দুগ্ধ, ঘৃত অনেকের ভাগ্যেই জুটে না।

৮ ছটাক চাউলে ·৪০ দশমিক চল্লিশ ছটাক প্রোটীড থাকে; ১ ছটাক ডাইলে প্রোটীডাংশ ·২৩ দশমিক তেইশ ছটাক; তরকারিতে ·০৮ দশমিক শূন্য আট ছটাকের অধিক প্রোটীড নাই এবং এক ছটাক মৎস্যে ·১৮ দশমিক আঠার ছটাক প্রোটীড থাকিতে পারে। কাযে কাযেই বাঙ্গালী-যুবক দৈনিক মোট ·৮৯ দশমিক উননব্বই ছটাক বা সোজা-সুজি হিসাবে প্রায় ৪½ তোলা অর্থাৎ আবশ্যক পরিমাণে অর্দ্ধাংশেরও কম প্রোটীড গ্রহণ করে। অথচ তাহাকে বিলক্ষণ পরিশ্রম করিতে হয়; সুতরাং শরীরও ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে।

বিশেষজ্ঞগণ বলেন,—আমাদের খাদ্য সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যেরূপ কাল পড়িয়াছে, তাহাতে খাদ্য সংস্কার না করিলে—প্রাত্যহিক খাদ্যে প্রোটীডের ভাগ না বাড়াইলে—বাঙ্গালী দিন দিন দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। অধুনা আমরা বিলাসিতায় অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি। “অন্ন মূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনং”—এই ঋষিবাক্য ভুলিয়াছি। একে আমাদের আয় অতি সামান্য। তাহার উপর পরিশ্রম করিয়া যাহা দুই পয়সা উপার্জ্জন করি, তাহা বিলাসিতার কল্যাণেই—বাবুগিরির সাজসজ্জা ও গৃহলক্ষ্মী-দের চুড়ি, সেমিজ, গন্ধতৈল খরিদ করিতেই ব্যয় করিয়া বসি। সুতরাং পেটের দিকে আর তাকাইবার অবসর নাই। পরিশ্রম ষোল আনা, তাহার উপর অর্দ্ধাহার, অনাহার ও কদাহার সমস্তই আছে। আমরা বিলাসিতায় যে অর্থ বৃথাব্যয় করিতেছি, সেই অর্থ সঞ্চয় করিয়া তদ্দারা পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহ করিয়া আহার করিলে এখনও বল, আরোগ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি। যে ম্যালেরিয়া আজ বাঙ্গালা জুড়িয়া বসিয়াছে, যাহাকে তাড়াইবার জন্য আমরা মশকের জাতি-লিঙ্গ নির্ণয় করিয়া মশকবংশ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছি, খাদ্য-সংস্কার করিতে পারিলে—খাদ্যের সুবিধানদ্বারা বিধিদত্ত ব্যাধিপ্রতিষেধক শক্তিকে জাগ্রত রাখিতে পারিলে সেও এত সহজে আমাদের আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

এক জন পরিশ্রমী বাঙ্গালী যুবকের দৈনিক দুই বারে এইরূপ আহারের পরিমাণ হওয়া উচিত :—

খাদ্য	পরিমাণ	উহাতে প্রোটীডাংশ।
চাউল	৮ ছটাক	·৪০ ছটাক।
ডাইল	২ „	·৪৬ „ ।
তরকারি	৪ „	·০৮ „ ।
মৎস্য	৪ „	·৭২ „ ।
দুগ্ধ	৮ „	·৩২ „ ।
	২৬ ছটাক	১·৯৮ ছটাক বা মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১০ তোলা।

মাংস জুটিলে মৎস্যের পরিমাণ কমাইলেও ক্ষতি নাই। মাংসে মৎস্যের ন্যায়ই প্রোটীড আছে। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা যথেষ্ট পরিমাণে মাংস ভক্ষণ করিতেন। তখন তাঁহাদের দৈহিক বলও বিলক্ষণ ছিল। আরণ্য কুক্কুট, আরণ্য শূকর, গোসাপ, খরগোশ, কচ্ছপ, এমন কি উষ্ট্র, গণ্ডার পর্য্যন্ত পর্য্যন্তও এক দিন হিন্দুর অভক্ষ্য ছিল না।

যাঁহারা নিরামিষভোজী, তাঁহারা ডাইলের মাত্রা কিছু বৃদ্ধি করিবেন। ঐ সকল ব্যক্তি রাত্রিতে অন্নের পরিবর্ত্তে রুটির ব্যবস্থা করিলে আরও ভাল হয়। ময়দা বা আটায় শতকরা ১১ ভাগ প্রোটীড আছে। উহা দ্বারা মৎস্যের অভাব অনেকটা পূর্ণ হইতে পারে। তবে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে, প্রোটীড উপাদান এমত মিশ্রিতভাবে আহার করিতে হইবে, যাহাতে উহা সহজেই পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। প্রোটীড খাইতে হইবে বলিয়া পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডাইল কিংবা মৎস্য খাইলে অথবা শর্করা খাইতে হইবে বলিয়া আকণ্ঠ ভাত, আলু বা মিষ্ট ভক্ষণ করিলে চলিবে না। কোন একটি নির্দ্দিষ্ট খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে আহার করা অপেক্ষা বহুবিধ খাদ্য অল্প অল্প খাইলে পরিপাকবিকার ঘটে না।

অবস্থাবৈগুণ্যহেতু যাঁহাদের মৎস্য, মাংস বা দুগ্ধ কিছুই জুটিয়া উঠে না, অথচ অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা ভাত-ডাইলের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া প্রোটীডাংশ কতকটা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিবেন। এই শ্রেণীর লোকদিগের জন্য দৈনিক ১৬ হইতে ২০ ছটাক চাউল, ৩ ছটাক ডাইল এবং ৪ ছটাক তরকারির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই খাদ্য-সমষ্টি বিভক্ত করিয়া তিন অথবা চারি বারে আহার করিলে পরিপাকবিকার উপস্থিত হইবে না। এতদ্দেশীয় দরিদ্র কৃষকগণ এই প্রকারে ভাত ডাইল খাইয়াই আমাদের অপেক্ষা বলীয়ান্।

কিছু দিন হইল, কেরিংটন-প্রমুখ কতিপয় পাশ্চাত্য-দেশবাসী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খাদ্যের পরিণতির সহিত আমাদের শারীরিক বলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। তাঁহারা বলেন,—খাদ্যই একমাত্র জীবনী-শক্তির উৎপাদক নহে;—ঐ শক্তি মানুষ অন্য উপায়েও প্রাপ্ত হয়। এই কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ জীবসকল দুই দিবস অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ না পাইলেই যখন চক্ষুতে অন্ধকার দেখিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন কেরিংটনের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া স্থির থাকিতে পারি কৈ? ভাবিয়া দেখিলে আমাদের এই দেহ ত একটি কল ব্যতীত আর কিছুই নহে। সময়মত খাদ্যপানীয়রূপ কয়লা ও জল যোগাইয়া ইহাকে সচল রাখিতে হইবে। তাই কবি গাহিয়াছেন:—

"এই দেহ রেলগাড়ীর কল; ভবপথে কচ্চে চলাচল।
কোথা জেমস্ওয়াটের বুদ্ধি, এ কলের এমনি কৌশল;
উদর-বয়লারে জম্‌চে বাষ্প, মিশে সদা আগুন জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়্‌চে তায় অবিরল;
ভাঙা ফুটো সারা, অয়েল করা, ডাক্তারের কায সকল।
সম্মুখেতে লণ্ঠন্ তারি, চক্ষু দু'টি সমুজ্জ্বল;
শ্বাস-প্রশ্বাসে হচ্ছে কলের ফোঁস-ফোঁসানি অবিরল।
সূক্ষ্ম শিরা, দেয় তারা, তারের খবর প্রতি পল;
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম-ক্রোধ-দয়া-দ্বেষ আরোহীদল।
লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্ট জননীর গর্ভস্থল;
জন্ম-মৃত্যু টারমিনাস্ দুই, ড্রাইভার মন চঞ্চল।"

শিল্পের কথা।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে বলিয়াছি, এ দেশে উটজ শিল্পের উন্নতি করিতে না পারিলে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। একে ত কোন দেশেই বড় বড় কল-কারখানায় দেশের সমাজের সব স্তরে অর্থ আশানুরূপ ছড়াইয়া পড়ে না—অর্জ্জুনের শরাহত ধরণীর বিদীর্ণবক্ষ হইতে উদ্গত জলধারা যেমন কেবল শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মৃত্যুতৃষ্ণাশুষ্ক মুখেই পতিত হইয়াছিল, তেমনই সে অর্থ কেবল মহাজনের—কলকারখানার ও ব্যবসার মালিক-দিগের ভাগেই পতিত হয়; তাহার উপর আবার এ দেশে বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার পথে বহু বাধাবিঘ্ন বিদ্যমান। বিশেষ ভারতবর্ষ যখন কৃষিপ্রাণ দেশই ছিল না, পরন্তু পণ্য বিক্রয় করিয়া বিদেশ হইতে বহু অর্থ আহরণ করিত, তখনও ভারতের যে সব পণ্য বিদেশে আদৃত হইত, সে সবই উটজ শিল্পজাত। এমন কি, বিদেশের বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রক্ষাশুল্কের বাধা দিয়া ভারতীয় বস্ত্রের আমদানী বন্ধ না করিলে বিলাতে কাপড়ের কল করা সম্ভব হইত না। সুতরাং এ দেশে উটজ শিল্পেরই উন্নতিবিধান করিয়া দেশকে দারিদ্র্য-দাবদাহ হইতে রক্ষা করা অসম্ভব নহে। তবে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, এ দেশের প্রাচীন উটজ শিল্পের যন্ত্রাদিতেও ব্যবস্থার আবশ্যক-পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। যাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অধিক পণ্য উৎপন্ন করা যায়—যাহাতে পণ্যে নক্সার আদর্শ অক্ষুন্ন রাখা যায়—যাহাতে যে স্থানে যে পণ্যের আদর, সেই স্থানে সেই পণ্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করা যায়, এ সব করিতে হইবে। নহিলে সব বিষয়ে সেই মামুলী প্রথায় কায করিলে প্রতিযোগিতার প্রবল প্রবাহবেগ প্রহত করা সম্ভব হইবে না।

এ দেশে সরকারী জেলে কয়েদীদিগের দ্বারা নানারূপ পণ্য উৎপন্ন করাইয়া বিক্রয় করা হয়। তাহাও উটজ শিল্প ব্যতীত আর কিছু বলা যায় না। সে সব পণ্য বিশেষ আদরও পাইয়া থাকে। সরকার যে পড়্‌তা না খতাইয়া জিনিষ বিক্রয় করেন, এমন মনে করিবার কারণ নাই। ইহা হইতেও বুঝা যায়, এ দেশে সুব্যবস্থা করিলে উটজ শিল্পের পণ্যে লাভ হয়। আর এ দেশে স্থানে স্থানে খৃষ্টধর্ম্মযাজকগণ উটজ শিল্পকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সে সব কেন্দ্রে এ দেশের শ্রমজীবীদিগকে আবশ্যক শিক্ষায়

সুশিক্ষিত করিয়া তাঁহারা যে সব পণ্যোৎপাদন করিতেছেন, সে সকলও সৌন্দর্য্যে ও শিল্পনৈপুণ্যে সর্ব্বত্র সমাদৃত হয়। এই সব শিল্পকেন্দ্রে শিল্পের যন্ত্রাদিতে নূতন নূতন উন্নতিকর ব্যবস্থাও হইতেছে। বহুদিন পূর্ব্বে শ্রীরামপুরের ঠক্‌ঠকি তাঁতের মাকু এখন পশ্চিম বঙ্গে প্রায় সর্ব্বত্র তন্তুবায়গণ-কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাতে পুরাতন তাঁতেই এখন অধিক পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হইতেছে।

সে দিন বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেলের পত্নী কালিম্পঙ্গের খৃষ্টধর্ম্মযাজকদিগের প্রতিষ্ঠিত শিল্পাশ্রমের পণ্য-বিক্রয়ের বাজারে সেই আশ্রমের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেও এ দেশে উটজ শিল্পের সম্বন্ধে লোকের সাধারণ বিশ্বাস বিদূরিত হইবার কথা। সে সব উটজ শিল্প ও লেস্ স্কুল মিসেস্ গ্রেহামের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত চারি বৎসরে সে সকল অনুষ্ঠানের ও প্রতিষ্ঠানের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কালিম্পঙ্গের নিকটস্থ স্থান-সমূহের অধিবাসীরাই মিসেস্ গ্রেহামের তত্ত্বাবধানে এই সকল পণ্য প্রস্তুত করে। তিনি স্ত্রীলোকদিগকে ও শিশুগণকে সযত্নে শিক্ষা দিয়া থাকেন। সেই শিক্ষার ফলে তাহারা অল্প-দিনেই আদর্শানুরূপ পণ্য প্রস্তুত করিতে পারে।

এই সব অনুষ্ঠানের কথায় লেডী কার্ম্মাইকেল বলিয়া-ছেন, সমগ্র প্রদেশে এইরূপ ব্যবস্থা করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। সেরূপ ব্যবস্থা করাও অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। পণ্যোৎপাদকগণ যাহাতে তাহাদের পণ্যের উপযুক্ত মূল্য লাভ করিতে পারে, সে জন্য সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহাতে তাহারা উৎসাহ পাইবে, আর অন্যান্য স্থান হইতে পণ্যের নমুনা আনিয়া আদর্শানুরূপ পণ্যোৎপাদনের বন্দোবস্ত করা যাইবে, সর্ব্বো-পরি তাহারা পণ্যের উপযুক্ত মূল্য লাভ করিতে পারিবে। যত দিন পণ্য বিক্রীত হইয়া মূল্য শিল্পীর হস্তগত না হয়, তত দিন তাহাকে যে সংসারের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে, সে জন্য তাহার অর্থের প্রয়োজন। সুতরাং শিল্পীকে কিছু টাকা অগ্রিম দিতে হইবে। শিল্পীর এই অভাব বুঝিয়াই মহাজনরা দাদন দেয় এবং সস্তাদরে পণ্য ক্রয় করে। তাহাতে শিল্পী পণ্যের উপযুক্ত মূল্য পায় না এবং ক্রমে নিরুৎসাহ হইয়া কার্য্যে অমনোযোগী হয়। ইহার জন্যই সমবায়-সমিতির প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এ দেশের সাধারণ শিল্পীরা এই সমবায়-সমিতির স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারে না; সেরূপ শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা তাহাদের নাই। তাহাদিগকে সে সব বিষয়ে আবশ্যক শিক্ষা দিতে হইবে। সে জন্য যে সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে,সেই সমিতি শিল্পীর কুটীরের ও বাজারের মধ্যে সংযোগসেতু নির্ম্মিত করিবেন।

লেডী কার্ম্মাইকেল যে প্রস্তাব করিয়াছেন, সেইরূপ প্রস্তাবানুসারে কায করিয়া সার্ হোরেস্ প্লাংকেট আয়ার্লণ্ডের উটজ শিল্পের উন্নতিসাধনে সফলযত্ন হইয়াছেন। তিনিও সহরে আদর্শপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্রেতাকে পণ্যের নমুনা দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ দেশে ক্রেতা যে অনেক সময় দেশে কোথায় কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা জানিতেও পারে না, সে কথা লর্ড কার্ম্মাইকেল বাঙ্গালায় শিল্পপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠাকালে বলিয়াছিলেন। সংপ্রতি সরকার এ দেশের পণ্যের যে প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষ উপকারও হইয়াছে। মজঃফরপুর অঞ্চলে আম্র ও লিচু প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ফলের সময় ফল সস্তাদরেই বিক্রীত হয়। আজকাল য়ুরোপে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিপক্ক ফল দীর্ঘকাল সংরক্ষার উপায় হইয়াছে। কয় বৎসর পূর্ব্বে মজঃফরপুরে সেইরূপে ফল কৌটায় পূরিয়া রাখিবার একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। সেই কারখানার কার্য্যাধ্যক্ষ সে দিন শিল্প কমিশনে সাক্ষ্য দিবার সময় বলিয়াছেন, প্রদর্শনীতে পণ্য-বিক্রয়ের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কোন দেশেই শিল্পপ্রতিষ্ঠা অসাধ্য-সাধন নহে। আমে-রিকা ও জাপান যেমন অল্পদিনের মধ্যেই শিল্প-সম্বন্ধে সমৃদ্ধ হইয়াছে, জার্ম্মাণীর শিল্প-সম্পদও তেমনই অধিক দিনের নহে। আমেরিকান্‌রা প্রধানতঃ কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করিয়াই দেশে অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য মূলধন অর্জ্জন করিয়াছে। লসন তাঁহার আমেরিকার শিল্প-ব্যবসা-বিষয়ক পুস্তকে দেখাইয়াছেন,—"It was as food-producers that the Americans got their first start in international trade." অর্থাৎ খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ করিয়াই আমেরিকান্‌রা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করে। গম, মাংস ও তুলা বিক্রয় করিয়া টাকা পাইয়াই তাহারা বড় বড় কল-কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কৃষিজ পণ্যেই তাহাদের সমৃদ্ধিসঞ্চারের সূচনা—আজও তাহাদের বড় বড় ব্যবসা কৃষির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। এই কথাটা ভারতবাসীর বিশেষভাবে মনে রাখা কর্ত্তব্য। যে কারণেই হউক, ভারত-বর্ষ এখন কৃষিপ্রাণ হইয়াছে। কিন্তু সেই জন্য যে এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, এমন মনে করিবার কোনই কারণ নাই। আমরা যদি কৃষিকার্য্যে আবশ্যক উন্নতি করিয়া অর্থার্জ্জনের পথ সুগম করি এবং বিলাসদ্রব্যে বিদেশে বহু অর্থপ্রদান না করি, তবে আমাদের সঞ্চয় হইতেই আমরা ক্রমে দেশে বিদেশের মত শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি। কৃষিকার্য্যে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যেরূপ উন্নতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা মনে করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এমন কি স্থানে স্থানে জমীতে টিকা দিয়া জমীর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে আবশ্যক ফসলের ফলনোপযোগী করা হইয়াছে! অতিরিক্ত শীতে বা অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হয় না—বাছাই করিয়া এমন ফসলের বীজও সংগৃহীত হইয়াছে! বিদেশে এইরূপ ব্যবস্থা হইতেছে—বিজ্ঞানের ইন্দ্রজালে অসাধ্য-সাধন হইতেছে; আর এ দেশে আমরা

পর্জ্জন্য বিমুখ হইলেই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারাইয়া সর্ব্বযন্ত্রণা মুক্ত হইতেছি! আমাদের উদ্যোগ নাই—উদ্যম নাই—উৎসাহ নাই; কাযেই দারিদ্র্য আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। আমরা দিন দিন পরমুখাপেক্ষী হইতেছি; শেষে আমরা আপনারাই মনে করিতেছি, বিদেশের কলকারখানায় পণ্যের উপকরণ যোগাইয়া কোনরূপে প্রাণরক্ষা করাই আমাদের নিয়তি। বিদেশী ব্যবসায়ীরা এ-দেশে আসিয়া ব্যবসা খুলিয়া যে অর্থ অর্জ্জন করিতেছেন, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। আর আমরা সেই সব ব্যবসায় চাকরী করিয়া কোনরূপে অন্নসংস্থান করিতেছি! এ অবস্থার প্রতীকার আমাদিগকেই করিতে হইবে। নহিলে আর উপায় নাই।

ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার সহিত আয়ার্লণ্ডের আর্থিক অবস্থার সাদৃশ্য নানাদিকে সপ্রকাশ। উভয় দেশেই উটজ শিল্পের আধিক্য ছিল—উভয় দেশেই সেই সব শিল্প আজ নির্জ্জীব—উভয় দেশেই শিল্পীরা কৃষক হইয়াছে, ফলে কৃষির আয় কমিয়াছে—উভয় দেশেই দারিদ্র্য-সমস্যা দিন দিন দেশে অসন্তোষবিস্তারের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে বিলাতের পার্লামেণ্ট আয়ার্লণ্ডের এই অবস্থার প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণজন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই কমিটী নানাদেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেই বিবরণে দেখা যায়, ডেনমার্কে কৃষকদিগকে কৃষিকার্য্য ভাল করিয়া করিবার শিক্ষা দিয়া অসাধারণ সুফললাভ হইয়াছে। উরটেম্বার্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠার যে বিবরণ সেই কমিটীর রিপোর্টে বিবৃত হইয়াছে, তাহা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে উরটেম্বার্গ কৃষিপ্রাণ ছিল—অধিবাসীরা অতিবৃদ্ধিতে ও দারিদ্র্যে কষ্ট পাইত, তাহাদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। আর ৪০ বৎসর পরে ইংলণ্ড এই ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে যে সব পণ্য ক্রয় করিতেন, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কম্বল, গালিচা, ফ্লানেল, মোজা ও গেঞ্জী, কাপড়, যন্ত্রপাতি, ছাপার হরপ, ঔষধ, রাসায়নিক বিবিধ বস্তু, কাগজ, গজদন্তের দ্রব্য, ক্ষোদাই করা কাষ্ঠের পণ্য, খেলানা, গৃহসজ্জা, টুপী, পিয়ানো, বাদ্যযন্ত্র, বারুদ, ঘড়ী। এক কালে যে বারুদের ব্যবসায় ইংলণ্ডেরই প্রাধান্য ছিল, ৪০ বৎসরের চেষ্টায় উরটেম্বার্গ সেই ব্যবসায় প্রাধান্যলাভ করিয়া বিলাতকেও আবশ্যক বারুদ সরবরাহ করিয়াছে।

এত অল্পদিনে ক্ষুদ্ররাজ্য উরটেম্বার্গে ব্যবসাব্যাপারে এ উন্নতি—এত পরিবর্ত্তন কেন ও কেমন করিয়া হইল, তাহা আমাদের ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

আমাদের বিশেষ দেখিবার বিষয়—সে দেশের শিল্পে যাহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছে, তাহারাও কৃষক। যে সময়ের কথার আলোচনা হইতেছে, তাহার ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা কৃষিজীবীই ছিল—শিল্পসম্বন্ধে কোন শিক্ষাই তাহাদের ছিল না। তাহার পর দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইলেও তাহারা কৃষিকার্য্য ত্যাগ করে নাই; পরন্তু শিল্পের প্রতিষ্ঠায়—নগরে ও গ্রামে শিল্পরত শ্রমজীবীদলের বৃদ্ধিতে তাহাদের কৃষিকার্য্যের উন্নতিই হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ৪০ বৎসরে সমগ্র রাজ্যে এক জনও নিরন্ন লোক ছিল না। শিল্পে ও কৃষিতে দেশের সব লোকেরই অন্নের উপায় হইয়াছিল। এমন কি বাণিজ্যের উন্নতি ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন সমগ্র য়ুরোপে ব্যবসাজীবীদিগকে অভাব অনুভব করিতে হইয়াছিল—তখনও সে রাজ্যে ইংরাজ রাজদূত লিখিয়াছিলেন—সে রাজ্যের লোক কোনরূপ অভাব ভোগ করে নাই—তাহাদের কোন কষ্ট হয় নাই।

এ পরিবর্ত্তন কিরূপে সংসাধিত হইয়াছিল, আমরা তাহাই দেখাইব। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ভন্ ষ্টিন্‌বিশ সে রাজ্যের শিল্পবিভাগের সভাপতি ছিলেন। তিনি লণ্ডনে প্রদর্শনীতে নানাদেশের পল্লীশিল্পের পণ্যের নমুনা দেখিয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার স্বদেশে শিক্ষায় লোক সেইরূপ পণ্য উৎপাদিত করিতে পারে কি না, পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে বলবতী হয় অর্থাৎ তাঁহার বিশ্বাস হয়, উপযুক্ত শিক্ষায় তাঁহার স্বদেশবাসীরাও অন্যান্য দেশবাসীর মত উটজ শিল্প প্রতিষ্ঠিত করিয়া পণ্য প্রস্তুত করিতে পারে। তাঁহার প্রস্তাব শুনিয়া দেশের রাজা তাঁহাকে শিল্পপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিবার উপদেশ দিয়া য়ুরোপের নানাদেশে শিল্পের অবস্থা ও ব্যবস্থা অধ্যয়ন করিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি তদনুসারে নানাদেশে শিল্পের অবস্থা দেখিয়া আসিয়া ষ্টুটগার্ট সহরে একটি শিল্পবোর্ড প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য তাহা সরকারী ব্যাপার—দেশে কারীগরীশিক্ষার বিস্তার-সাধন ও শিল্পপ্রতিষ্ঠাই সেই বোর্ডের উদ্দেশ্য। এই বোর্ডকে উপদেশ দিবার জন্য আবার একটি সমিতি গঠিত হয়—সে সমিতি বিবিধ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং বণিকসভাকর্তৃক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গে গঠিত হয়। এইরূপে সরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেন এবং সেই পথে ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকেন। আমরা পাঠকদিগকে সেই পথের একটু পরিচয় দিব।

উরটেম্বার্গের এই বোর্ড (Central Stelle) ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসাপ্রচারের সাহায্য করিয়া থাকেন। বোর্ড ব্যবসায়ীদিগকে সর্ব্ববিষয়ে আবশ্যক সন্ধান ও উপদেশ দিয়া থাকেন; ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাতে আবশ্যক অর্থসাহায্য প্রদান করেন; ব্যবসাশিক্ষাদানের জন্য উদ্দিষ্ট বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; এমন ভাবে শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেন যে, ভবিষ্যতে লোক সে ব্যবসা চালাইতে পারে। দেশের সব শিল্পব্যবসার সঙ্গে এই বোর্ডের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—রাজ্যমধ্যে যত মিউনিসিপ্যালিটী প্রভৃতি আছে, সে সকলের সঙ্গেও বোর্ডের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আবার স্থানে স্থানে অবস্থা বুঝিয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠাজন্য বোর্ড বিদেশে

শিক্ষার্থী পাঠাইয়া শিখাইয়া আনিয়া লোককে সাহায্যদান করেন; শিক্ষিত ব্যক্তিরা সহরে সহরে ও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া লোককে শিল্পবিষয়ে শিক্ষা দেয়। এমন কি প্রয়োজন হইলে বোর্ড বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া শিল্পের প্রতিষ্ঠায় ও উন্নতির উপায়বিধান করেন। বোর্ড সকল ব্যবসাকেন্দ্রে ব্যবসা ও পণ্যসম্বন্ধে সংবাদ প্রচার করেন এবং পণ্যপ্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের শিল্পজ পণ্য ব্যবসায়ীদলে পরিচিত করিয়া দেন।

এইরূপে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিয়াই সে রাজ্যের সরকার নিরস্ত হয়েন নাই; পরন্তু বিদ্যালয়ে যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে শিল্পপ্রতিষ্ঠার সোপান রচিত হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে রেখাচিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি শিখান হয়। তাহার পর শিল্পবিদ্যালয়ে ও ব্যবসাবিদ্যালয়ে ছেলেরা ও মেয়েরা যে শিক্ষা পায়, রাজধানীতে নানারূপ বিদ্যালয়ে তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়।

উরটেম্‌বার্গের শিল্পপ্রতিষ্ঠার সব কথা বুঝাইবার স্থান আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের মনে হয়, উরটেমবার্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, এ দেশে সেই প্রণালী অবলম্বিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শিবে। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সরকারও ইহা বুঝিয়াছেন। এ দেশে প্রদেশে প্রদেশে সরকারী বৈজ্ঞানিকরা নানারূপ পরীক্ষা করিতেছেন এবং সরকার এ দেশেও শিল্পের এক জন ডিরেক্টার নিযুক্ত করিতেছেন। কিন্তু এ সব বিষয়ে এখনও সুব্যবস্থা হয় নাই; অর্থাৎ অভিজ্ঞতার ফলে এখনও এ সব কাযে "গৃহিণীপনা" দেখা যাইতেছে না। সরকারী বিশেষজ্ঞগণ যে পরীক্ষা করেন, তাহার ফল সাধারণতঃ যে ভাষায় লিখিত হয়, তাহা দেশের সাধারণ লোক বুঝিতে পারে না। কয় বৎসর হইতে মিষ্টার অ্যানেট্ এ দেশে চিনির বিষয়ে পরীক্ষা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার পরীক্ষাফল আজও দেশের সাধারণ লোককে, চিনির কারখানাওয়ালাও মহাজনদলকে জানাইবার কোন উপায়ই হয় নাই। এমন কি দেশের সাধারণ লোককে এই যুদ্ধের সময় চিনি উৎপন্ন করিতে উৎসাহিতও করা হয় নাই। মিষ্টার অ্যানেট্ অনুসন্ধানজন্য যে সব স্থানে গিয়াছেন, যদি সেই সব স্থানে লোকদিগকে সে কাযে উৎসাহিত করিতেন, তবে যে এই দুই বৎসর চিনির ব্যবসায় বিশেষ উন্নতি হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সংপ্রতি সরকারী শিল্পকমিশনে সাক্ষ্যদানকালে শ্রীযুত বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, সরকার আবশ্যক সাহায্য করিলে এ দেশের নীলের ব্যবসার এমন দুর্দ্দশা হইত না। সরকার এ দেশে রেশমশিল্পের উন্নতিসাধনোপায় করিবার জন্য মোটা বেতনে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়াছেন। কিন্তু আজিও তাঁহাদের অনুসন্ধানফলে এ দেশে রেশমশিল্পের মৃতপ্রায়দেহে নবজীবনসঞ্চারসম্ভাবনা দেখা যায় নাই। ইহা অবশ্য সরকারের অভিজ্ঞতার অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে।

অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ সব অসুবিধাও দূর হইতেছে। যুদ্ধের ফলে সরকার এ দেশে যে যাযাবর প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার ফলে এ দেশের অনেক অজ্ঞাত পণ্য লোকের কাছে পরিচিত হইয়াছে। তাহার পর সেই সুফল লক্ষ্য করিয়াই সরকার সে প্রদর্শনী স্থায়ী প্রদর্শনীতে পরিণত করিয়াছেন। শিল্পকমিশনে কোন কোন ভারতীয় ব্যবসায়ী বলিয়াছেন, এই প্রদর্শনীর ফলে তাঁহাদের কারখানার পণ্যের প্রচার বাড়িয়াছে—অধিক কাট্‌তি হইতেছে। তাঁহারা কলিকাতার মত বোম্বাই সহরেও প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিয়াছেন।

কেবল ইহাই নহে, সরকার যুক্তপ্রদেশের জন্য কাচের কাযে যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বিদেশ হইতে আনাইয়াছেন, তিনি এ দেশে ছোট ছোট কারীগরদিগের কারখানায় ঘুরিয়া তাহাদের ব্যবহৃত উনানের উন্নতিসাধনের উপায় করিতেছেন। সামান্য পরিবর্ত্তনে—কোথাও একটু বদলে সে সব চুল্লীতে যে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, তাহাতে মাল উৎপাদনের সুবিধা হইবে। তাহা হইলে এ দেশের শিল্পজ পণ্য বিদেশী পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় আত্মরক্ষা করিতে পারিবে।

মান্দ্রাজেও সরকার এইরূপ কায করিয়াছেন। তথায় সরকারের চেষ্টায় চামড়া পরিষ্কার করিবার ও এলুমিনিয়ম ধাতুর বাসননির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখন স্থানীয় লোক সে সব কারখানা চালাইয়া লাভবান্ হইতেছেন। তথায় সাবানের ও বোতলের কারখানাও এইরূপ লাভজনক করিবার জন্য সরকার মনোযোগদান করিয়াছেন।

এবার সরকার যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের আশা হয়, অল্পকালমধ্যে ভারতে আবার বিবিধ শিল্পের সমৃদ্ধিতে দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের চেষ্টাতেই ঈপ্সিত ফললাভ হইতে পারে না; দেশের লোকের—বিশেষ দেশের শিক্ষিত লোকদিগের চেষ্টা ব্যতীত তাহা হইবে না। এ দেশে পুরাতন সামাজিকপ্রথার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া—বর্ণভেদে ব্যবসাভেদ-ব্যবস্থার সুযোগ লইয়া আমাদিগকে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আমরা যে "জাতব্যবসা" ঘৃণায় পরিহার করিয়া—বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও অভ্যাসসঞ্জাত নৈপুণ্য নষ্ট করিয়া সকলেই কেবল চাকরীর বা কয়টি মাত্র ব্যবসার জন্য মৃগতৃষ্ণিকালুব্ধ মরুপথগামী পথিকের দশাগ্রস্ত হইয়াছি, সে অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আজ যে দেশে পুরাতন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাগুলি বিলুপ্ত হইতেছে—আর আমরা কলের কেরাণী ও কুলী লইয়া কায়ক্লেশে সামান্য অর্থ অর্জ্জন করিবার চেষ্টায় প্রাণপাত করিতেছি, ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যেরই

দ্যোতক। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত—আমাদের বর্ত্তমান আদর্শের ও আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তন ব্যতীত—দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা হইবে না। এ দেশে প্রতীচ্যপ্রথায় ও প্রতীচীর অনুকরণে বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার অন্তরায়ের কথার আলোচনা আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। সে সব যে এ দেশের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী নহে, তাহাও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। এ দেশের লোকের মূলধনে দেশে যদি বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হয়, হউক। কিন্তু তাহার সম্ভাবনা অল্প বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আমাদের বিনাশ অনিবার্য্য। আমাদিগকে আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে হইবে। যাহা আমাদের আছে—যে সব শিল্পে ভারতবর্ষ শত শত বর্ষ হইতে সমৃদ্ধ ছিল—যে সব শিল্পজ পণ্যে ভারতে বাণিজ্যের স্রোতে অর্থাগম হইয়াছে—যে সব শিল্পে আমরা অভ্যস্ত—যে সব শিল্পে নৈপুণ্যনিদর্শনে এ দেশের শিল্পী বিদেশের লোককেও মুগ্ধ করিয়াছে, আমরা সেই সব উটজ শিল্পের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করি না কেন? অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত দেখিয়া পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া সেই আদর্শেরই অনুসরণে ও অনুকরণে সর্ব্বত্র সুফল ফলে না।

পঞ্জিকা—পঞ্চাঙ্গশোধন।

[কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিষতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত।]

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

জয়পুর সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক, বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ দ্বিবেদী মহোদয় সূর্য্যসিদ্ধান্ত-সমীক্ষা নামক পুস্তকে দেখাইয়াছেন,—বর্ত্তমান প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত সেই প্রাচীন সূর্য্যসিদ্ধান্ত নহে। বরাহ-মিহিরধৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের গ্রহভগণাদি ও বহু শ্লোকের পার্থক্য আছে। তাঁহার উক্তি এই,—

যদ্যয়ং (সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ) প্রাচীন এব, তদৈতন্নামধেয়েনোট্টঙ্কিতানাং বিষয়ানামেতদীয় বাক্যৈঃ সহ সংবাদঃ কুতো ন জায়তে? শৈললোচন বেদমিতে ৪২৭ শককালে বর্ত্তমান স্তত্র ভবান্ বরাহমিহিরাচার্য্যঃ পৌলিক রোমক বাশিষ্ঠ সৌর পৈতামহাখ্যানাং পঞ্চানাং সিদ্ধান্তানাং মতমুপাদায় পঞ্চসিদ্ধান্তিকাখ্যং করণগ্রন্থং প্রাণৈষীৎ। এবমেতন্নাস্ত-সূর্য্যসিদ্ধান্তবিষয়ৈঃ সহ সাম্প্রতমুপলভ্যমান-সূর্য্যসিদ্ধান্তবিষয়াণাং পরস্পরমুপজীব্যোপজীবকভাবে তদেকবাক্যতা ভবিতুমর্হতি। হা হন্ত! সৈব নোপপদ্যতে। ইদানীং সৌরশাস্ত্রেতি "দন্তত্র্যষ্ট রসাঙ্কাক্ষিলোচনানি কুজস্যতু" ইত্যাদিনা যে কুজাদিভগণা; "বস্বদ্ব্যষ্টাদ্রিরূপাঙ্ক সপ্তাদ্রিতিথয়ো যুগে" ইত্যনেন যে সাবনাহা বোধ্যন্তে তদনু প্রাণনার্থা অপি "দ্ব্যগণং কুজস্য চন্দ্রাহতং তু সপ্তাষ্ট ষড়্‌ভক্তম্। মনবঃ কুজস্য দেয়াঃ" ইতি পঞ্চসিদ্ধান্তোক্তাঃ কুজাদি সাধনবিষয়োনান্ন প্রাণ্যন্তে। তত্র যদি "শনি চুড়িধ্বব" ইত্যাদ্যার্য্যভটীয় তন্ত্রানুসারেণ ভগণাদয়ো গৃহ্যন্তে,তর্হি সুপপদ্যন্তে। তথাচোক্তং পঞ্চসিদ্ধান্তিকা প্রকাশিকায়াং দ্বিবেদৈঃ—"প্রায়ো বরাহ-মিহিরকালিক সূর্য্যসিদ্ধান্তীয়া ভৌমাদি ভগণা মহাযুগ সাবন দিবসাশ্চার্য্যভটীয় ভৌমাদি ভগণ সাবন দিনৈস্তুল্যাঃ সন্তীত্যমুমীয়তে আর্য্যভটীয় ভগণাদি গ্রহণে প্রকারাণামপপন্নত্বাৎ" ইতি তদ্বাসনাপি তত্রৈব দ্রষ্টব্যা। পুনস্তত্রৈব "শত গুণিতে বুধ শীঘ্রং" ইত্যস্য বাসনা প্রস্তাবে ১৭৯৩৭০০০ এতে বুধ শীঘ্রোচ্চভগণাঃ সাম্প্রতকালিক সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভগণেভ্যস্তথার্য্য-ভটীয় ভগণেভ্যশ্চ ভিন্নাঃ সন্তীত্যুক্তম্।" এতেন স্পষ্টতরমবগম্যতে, যৎ খলু বরাহ-মিহিরসত্তাকালে সৌরশাস্ত্রমাসীৎ তৎ সাম্প্রতিকাদ্‌ভিন্নমেব ... কিং বহুনা সাম্প্রতিক সূর্য্যসিদ্ধান্তে "মধ্যলগ্নসমে ভানৌ হরিজস্য ন সংভব" ইতি সূর্য্য-

গ্রহণপ্রারম্ভ শ্লোকে যাবনো হরিজ শব্দোহপি দৃশ্যতে......এতেন প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তস্য ভগবৎ কর্ত্তৃকত্বাদি কথনং ন যুক্তিযুক্তমিতি বিচারয়ন্ত গণিত গোল বিদোবিদ ইতি।

৮৮৮ শকে বর্ত্তমান ভট্টোৎপল বরাহ-মিহিরকৃত বৃহৎ সংহিতার টীকায় চন্দ্রচার ও রাহুচার অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে কয়েকটি শ্লোক সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তে দেখা যায় না। তাহার উদ্ধৃত শ্লোকগুলি এই—

মহত্তশ্চাপাধস্থস্য নিত্যং ভাসয়তে রবিঃ।
অর্দ্ধং শশাঙ্কবিম্বস্য ন দ্বিতীয়ং কথং চন॥
বিপ্রকর্ষং যথা যাতি হ্যধস্থশ্চন্দ্রমা রবেঃ।
তথা তথাস্য ভূদৃশ্যং ভাগং ভাসয়তে রবিঃ॥
ইন্দুনাচ্ছাদিতং সূর্য্য মধোহবিক্ষিপ্তগামিনা।
ন পশ্যতি যদালোকস্তদাস্যাদ্ ভাস্করগ্রহঃ॥
তমোময়স্য তমসো রবিরশ্মি পলায়িনঃ।
ভূচ্ছায়া চন্দ্রবিম্বং চ স্থানে দ্বে পরিকল্পিতে॥

অদ্ভুতসাগর নামক পুস্তকে বল্লাল সেনও "তমোময়স্য তমসঃ" এই শ্লোকটী সূর্য্যসিদ্ধান্তের শ্লোক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।

কাশী কলেজের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক মহা-মহোপাধ্যায় ৺বাপুদেব শাস্ত্রী, সি. আই. ই. মহোদয় সিদ্ধান্ত তত্ত্ববিবেক-পরীক্ষা নামক পুস্তকে বহু প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা দেখাইয়াছেন,—প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভগবৎ সূর্য্যকৃত নহে। বিস্তারভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হইল না। সূর্য্যসিদ্ধান্ত এইরূপে বহুবার সংশোধিত হইয়া বর্ত্তমান আকারের এই সূর্য্যসিদ্ধান্তে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি ইহা হইতে গণিত তিথ্যাদি ও গ্রহণাদি দৃকতুল্য হইতেছে না, সুতরাং নূতন সিদ্ধান্তগ্রন্থের আবশ্যক হইয়াছে। ভারত-গৌরব ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থে বলিয়াছেন,—সিদ্ধান্তশাস্ত্র মধ্যে মধ্যে মহামতিমান্ পণ্ডিতগণদ্বারা পরি-শোধিত হওয়ায় ইহাতে অধিক অন্তর থাকিতেছে না। তাঁহার উক্তি এই—

যদা পুনর্ম্মহতাকালেন মহদন্তরং ভবিষ্যতি তদা মহা-মতিমন্তো ব্রহ্মগুপ্তাদীনাং সমানধর্ম্মান এবোৎ-পৎস্যন্তে। তে তদনুলব্ধ্যানুসারিণীং গতি মুররী-কৃত্য শাস্ত্রাণি করিষ্যন্তি। অতএবায়ং গণিত-স্কন্ধো মহামতিমদ্ভির্ধৃতঃ সম্যনাদ্যন্তেহপি কালে খিলত্বং ন যাতি॥

গ্রহগণ দৃকতুল্য হইতেছে কি না জানিবার জন্য নানা-প্রকার যন্ত্রনির্ম্মাণের উপায় ও তাহাদ্বারা গ্রহবেধ করিবার উপায় সিদ্ধান্তশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। রাজগণও বহুস্থানে মানমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, কিন্তু ইদানীং বহুকাল গ্রহবেধাদিদ্বারা গণিতাগত গ্রহের সহিত আকাশে পরিদৃষ্ট গ্রহস্থানের কত অন্তর, তাহা নির্ণয় করিয়া নূতন গ্রন্থ এ দেশে কেহ প্রণয়ন করেন নাই। এ জন্য বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন দিন তিথিতে প্রায় ১৪।১৫ দণ্ড তফাৎ হই-তেছে। ইহাতে ব্রত, উপবাস, শ্রাদ্ধাদি অযথাকালে সম্পন্ন হওয়ায় সকল ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হইতেছে। এক পল দশমী থাকিলেও সে দিবস একাদশীর উপবাস হইবে না, পরদিন একাদশী না থাকিলেও দ্বাদশীতেই একাদশীর উপবাস করিতে হইবে, এইরূপ শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং ১৪।১৫ দণ্ড তিথির পার্থক্যকে অল্প বলিয়া উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। আলিপুরে যে বেধশালা আছে, তাহা হইতে প্রত্যহ দিনে এক ঘটিকার সময় তোপধ্বনি হইয়া থাকে; এই তোপের সময়ের সহিত যাঁহারা ঘড়ি মিলাইয়া লয়েন, তাঁহাদের সকলের ঘড়িতেই একরূপ সময় জানা যায়। যাঁহারা তোপের সহিত ঘড়ি মিলান না, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন ঘড়িতে ভিন্ন ভিন্ন সময় দেখা যায়। সেইরূপ প্রত্যক্ষের সহিত মিল হইলে সকল গ্রন্থানুসারে তিথ্যাদির মান একরূপই হইয়া থাকে; নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থানুসারে গণনায় ভিন্ন ভিন্ন মান পাওয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন, যে গ্রন্থের গণনায় গ্রহগণ প্রত্যক্ষীভূত হন, সেই গ্রন্থানুসারে গণিত তিথ্যাদি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে কেহ বা দিনচন্দ্রিকামতে, কেহ বা দিনকৌমুদীমতে, কেহ মকরন্দমতে কেহ গ্রহলাঘবমতে, তিথ্যাদি সাধন করিয়া পঞ্জিকা প্রস্তুত করিতেছেন; কিন্তু চন্দ্রগ্রহণ, সূর্য্যগ্রহণ প্রভৃতি সকলেই বিলাতের নাবিকপঞ্জিকা (Nautical) মতে গণনা করিতেছেন। কারণ, এই সকল গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে বা ইহার উপজীব্য সিদ্ধান্তানুসারে গণনা করিলে গ্রহণ মিল হয় না। ইহার কোন গ্রন্থই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ গণনার যোগ্য নয়, সুতরাং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থানু-সারে গণনা করিলে তিথ্যাদির মান ভিন্ন ভিন্ন পাওয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে হইবে, ইহার কোন গ্রন্থানুসারেই তিথ্যাদির যথার্থ মান অবগত হওয়া যায় না। যিনি বহুক্লেশে পুত্রটিকে বি. এ, এম. এ বা ন্যায়তীর্থ, স্মৃতিতীর্থ পাশ করাইয়া দ্বিতীয়ায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তাঁহার কৃতবিদ্য ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃভক্ত পুত্র কোন বৎসর প্রতিপদ, কোন বৎসর তৃতীয়ায়, কোন বৎসর বা কাকতালীয় ন্যায়ে দ্বিতীয়ায় পিতার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতেছেন। তাঁহার মাতা কখনও দশমীতে, কখনও দ্বাদশীতে, কখনও বা একাদশীতেও একাদশীর উপবাস করিতেছেন। এইরূপে সকল ধর্ম্ম-কার্য্য পণ্ড হইতেছে জানিয়া এক দল পঞ্জিকা-সংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছেন। অন্য দল সংস্কারের বিরোধী। এই বিরুদ্ধবাদিগণের মত উদ্ধৃত করিয়া যথাশাস্ত্র তাহার খণ্ডনের চেষ্টা করা হইতেছে।

১। প্রথম আপত্তি,—আমরা ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রানুসারে ব্রতোপবাসাদি করিয়া থাকি, গণনাও ঋষিপ্রণীত গ্রন্থানুসারেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। পঞ্জিকা সংস্কার করিলে য়ুরোপীয়দিগের নিকট হইতে কতক সংস্কার লইতে হয়, তাহা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থে নাই; সুতরাং পঞ্জিকা-সংস্কার অকর্ত্তব্য।

উত্তর—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ, এই চারি প্রকার প্রমাণমধ্যে শাস্ত্রে ব্রতোপবাসাদি যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণে জানা যায় না জন্য) বিধিবাক্য, কিন্তু তিথ্যাদি শাব্দপ্রমাণ ব্যতীতও প্রত্যক্ষপ্রমাণে জানা যায়, সুতরাং তিথি প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য, ইহা বিধিবাক্য নহে। এই জন্য বঙ্গদেশীয় স্মৃতিনিবন্ধকার রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে লিখিয়াছেন:—

প্রমাণান্তর লভ্যত্বেনাবিধেয়ত্বাৎ তিথ্যাদিগুর্ণ ইতি।

কালমাধব নামক গ্রন্থে মাধবাচার্য্যও জ্যোতিষশাস্ত্রকে প্রত্যক্ষমূলকই বলিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

"অস্মাকং দর্শনাপেক্ষয়া জ্যোতিষশাস্ত্রস্য প্রবৃত্তত্বাৎ" ইতি।

ভাস্করাচার্য্য বহু স্থানের উপপত্তি নির্দ্দেশকালে "অত্রোপলব্ধিরেব বাসনা" এইরূপ বলিয়াছেন।

বাস্তবিকপক্ষে যাহা অতীন্দ্রিয় বিষয়, তাহাই শাব্দপ্রমাণগম্য; যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণগম্য। এই জন্যই যোগবাশিষ্ঠে উক্ত হইয়াছে:—

"অতীন্দ্রিয়ার্থ বিজ্ঞান প্রমাণং শ্রুতিরেবহি।" কিন্তু গ্রহগণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সুতরাং ইহার গণনা প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য। জ্যোতিষশাস্ত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণগম্য, এ জন্যই যুক্তি ও প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ পুরাণাদিবর্ণিত পৃথিবীর আধারাদির বর্ণনা ভাস্করাচার্য্য, লল্লাচার্য্য প্রভৃতি খণ্ডন করিয়াছেন। পুরাণশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—সর্প, কচ্ছপ, হস্তী প্রভৃতি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছে, কিন্তু ভাস্করাচার্য্য তাহার খণ্ডনের জন্য লিখিয়াছেন,—যদি পৃথিবীর আধার কল্পনা করা যায়, তবে তাহারও অন্য আধার—তাহারও পুনঃ অন্য আধার কল্পনা করিতে হয়, এইরূপ করিলে অনবস্থা দোষ হয়; বিশেষতঃ নক্ষত্রচক্রের ভ্রমণ আছে জন্য এইরূপ আধারপরম্পরা অযুক্ত। যদি শেষে এমন কোন শক্তিশালী আধার স্বীকার করা যায় যে, সে নিজ শক্তিতেই শূন্যে স্থির থাকিতে পারে, তবে পৃথিবীরই কেন সেই শক্তি স্বীকার করা যায় না? পৃথিবীও তো মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির এক মূর্ত্তি। তাঁহার উক্তি এই—

মূর্ত্তোধর্ত্তা চেৎ ধরিত্র্যাস্ততোঽন্য-
স্তস্যাপ্যন্যোঽপ্যেবং মত্রানবস্থা॥
অন্ত্যে কল্প্যা চেৎ স্বশক্তিঃ কিমাদ্যে
কিং নো ভূমেঃ সাষ্টমূর্ত্তেশ্চ মূর্ত্তিঃ॥

লল্লাচার্য্য স্বপ্রণীত শিষ্যধীবৃদ্ধিদনামক গ্রন্থের মিথ্যাজ্ঞানাধ্যায় নামক অধ্যায়ে পুরাণাদির জ্যোতিষবিষয়ক বহুবিধ বর্ণনার ভ্রম দেখাইয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই:—

হিমদীধিতি তীগ্ম তেজসো-
গ্রহণং রাহুকৃতং তথাপরে।
উপরীন্দুরধো দিবাকর-
স্তমসা মেরু ভুবো বিভাবরীং।
প্রতিবাসরমিন্দুমণ্ডলং
বিবুধৈঃ পীয়ত ইত্যতঃ কৃশং।
ককুভোশ্চ সুমেরু ভূ ভৃতো
যুগলং চন্দ্রমসোস্তথার্কয়োঃ ইত্যাদি।

এইরূপে পুরাণবর্ণিত জ্যোতিষবিষয়ক ভ্রম উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিলেও ভাস্করাচার্য্য, লল্লাচার্য্য প্রভৃতি সিদ্ধান্তপ্রণেতৃগণ লোকসমাজে হেয় হন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রনিবন্ধকার রঘুনন্দন, মাধবাচার্য্য প্রভৃতি ইঁহাদের মত বহুস্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন মতের ভ্রমপূর্ণ গণনা পরিত্যাগ করিয়া আধুনিক শাস্ত্রমতে দৃক্‌তুল্য গণনা গ্রহণ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

ম্লেচ্ছ-যবনাদির সহিত জ্যোতিষবিষয়ক আদান-প্রদান বহুকাল চলিতেছে। পূর্ব্বে যে ১৮ জন ঋষির নাম করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে রোমক ও যবন, ইঁহারা যবনজাতীয়; পুলিশকেও অনেকে যবনজাতীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ময়াসুর বা ময়দানবও ভিন্ন জাতীয়, ইঁহাদের মত লইতে বা ইঁহাদের নির্দ্দেশানুসারে ধর্ম্মকার্য্যের সময় নিরূপণ করিতে প্রাচীন সিদ্ধান্তকারগণ বা ধর্ম্মশাস্ত্র নিবন্ধকারগণ সঙ্কোচবোধ করেন নাই। সূর্য্যারুণ-সংবাদে সূর্য্য অরুণকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মার শাপে আমি রোমক নামে রোমকনগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে আমি রোমকনগরে জ্যোতিষজ্ঞান প্রচার করিয়াছি। রোমক আবার তাহা রোমকনগরে বিস্তৃত করেন।

রোমকং রোমকায়োক্তং ময়া যবনজাতিষু।
জাতেন ব্রহ্মণঃ শাপাৎ তথা দুর্ব্বনস্তচ॥
রোমকে নগরে তচ্চ রোমকেন চ বিস্তৃতং।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের সভার জ্যোতির্ব্বিৎ জগন্নাথ পণ্ডিত, আরবীভাষার মেগাস্থিনামক গ্রন্থের সংস্কৃতে অনুবাদ করিয়া, সম্রাট্‌সিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার উক্তি এই—

আরবীভাষয়াগ্রন্থো মেগাস্থিনামকো স্থিতঃ।
গণকানাং প্রবোধায় গীর্ব্বাণ্যা প্রকটী কৃতঃ॥

এই গ্রন্থে তিনি অনেকগুলি নূতন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। উড়িষ্যাপ্রদেশের মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর

সামন্তও তাঁহার সিদ্ধান্তদর্পণ নামক গ্রন্থে এই সম্রাট্‌-সিদ্ধান্তের আশ্রয়েই চন্দ্রে তুঙ্গান্তরাদি তিনটি অতিরিক্ত সংস্কার গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্তদর্পণমতেই উড়িষ্যার পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়। এই পঞ্জিকার নির্দ্দিষ্ট রথযাত্রা, দোল প্রভৃতিতে জগন্নাথ দর্শন করিয়া বঙ্গবাসীযাত্রিগণও আপনাকে ধন্য মনে করেন।

রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

সুতরাং জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান যবনদিগের নিকট হইতে বহুকাল হইতেই লওয়া হইতেছে। যবনেরাও হিন্দুদিগের নিকট হইতে বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, হিন্দুরাও তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞান লইয়াছেন। এরূপ আদান-প্রদান সভ্যতারই পরিচায়ক। এরূপ জ্ঞানের আদান-প্রদান বর্ত্তমান সময়েও সকল দেশে প্রচলিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও যবনদিগের মত বহু স্থানে গৃহীত হইয়াছে।

"অষ্টৌ চ গর্গো যবনো দশাহং।"
"নদোষমেতদ্ যবনা বদন্তি" ইত্যাদি।

কটক কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বঙ্গে জ্যোতিষ-মানমন্দির" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন, দৃক্‌গণিতৈক্য পঞ্জিকা গণনা করিতে হইলে হয় ত ইংরেজী হইতে অনেক লইতে হইবে, কিন্তু নিজস্ব করিয়া লইতে পারিলে পরস্বগ্রহণে পাপ আছে কি? যাহাদের পিতামহগণ যবনাচার্য্যের কত মত গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে যবনবিদ্যা দূষ্য হইতে পারে কি? জ্যোতিষের অত্যাবশ্যক কেন্দ্র শব্দটাই নাকি যবনজাতির। ইহাতে পিতামহগণের নিন্দার কথা নাই, প্রশংসার কথা আছে। বিদ্যায় জাতিবিচার নাই। ইহা বিদ্যার প্রয়োগে তাঁহারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে য়ুরোপীয় গণিত ও সিদ্ধান্তজ্ঞান আমাদের শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে না। আমাদের সিদ্ধান্তশাস্ত্রে স্ফুটগ্রহ, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ প্রভৃতির যেরূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে, আমাদের বর্ত্তমান পঞ্জিকায় সেই সকল লক্ষণের সহিত ঠিক মিলিতেছে না জন্যই আমাদের ধর্ম্ম পণ্ড হইতেছে। শুদ্ধবাদীরা য়ুরোপীয় গণিত ও সিদ্ধান্তশাস্ত্রের সাহায্যে এই সকল স্ফুট-গ্রহাদির লক্ষণের সহিত ঠিক মিলাইয়া লইতে চাহিতেছেন মাত্র। চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহ য়ুরোপীয়দিগের কোন ফ্যাক্টরীতে (কারখানায়) প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ নহে। সমস্ত জগদ্ভাসিত করিয়া যে সূর্য্যাদি গ্রহ আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহারই যথার্থ স্থান নিরূপণের গণনার প্রণালী গ্রহণ করা কোন-মতেই দূষণীয় হইতে পারে না। স্বর্ণ ক্রয় করিতে হইলে লোকে কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া দেখে, স্বর্ণ খাঁটী কি না? কিন্তু স্বর্ণ খনি হইতে কোন্ জাতীয় লোকে উঠাইয়াছে, কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, (বারবেলা কালবেলাদি) কোন দূষণীয় সময়ে খনি হইতে উঠান হইয়াছে কি না, তাহার বিবেচনা করে না, সেইরূপ ক্রান্তিবৃত্তে (ইক্লিপ্‌টিক) গ্রহগণের স্থান (স্ফুটস্থান) গণনার প্রণালী যে কেহ আবিষ্কার করুক না কেন, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলে আমাদের লইতে কোন দোষ নাই। আমরা কেবল শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সহিত মিলাইয়া দেখিব,—লক্ষণের সহিত ঠিক মিল হয় কি না? জ্যোতির্গণিত নামক জ্যোতিষগ্রন্থের প্রণেতা বেঙ্কটেশ কেতকর মহোদয়, হান্‌সেন্, লবর, নিউকোম প্রভৃতির গ্রন্থ হইতে সারসঙ্কলনপূর্ব্বক যে জ্যোতির্গণিত নামক পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঠিকই বলিয়াছেন,—

> ইদং পশ্চিমাত্যং পরকীয়ং জ্ঞানমিতি নোপেক্ষণীয়ং জ্ঞানং হি প্রকাশবৎ পরমং পবিত্রম্। তচ্চ ভিন্ন-জাতীয় পণ্ডিতেভ্য উপলব্ধমিতি দোষার্হং ন ভবতি। ভারতীয়া জ্যোতির্ব্বিদঃ পূর্ব্বস্মিন্‌কাল আসুরান গ্রন্থানঙ্গীকৃতবন্তঃ। সূর্য্যসিদ্ধান্তো ময়াসুর প্রণীতঃ। রোমক সিদ্ধান্তস্ত যাবনঃ। তথৈব পৌলিশঃ। তথৈব হোরাশাস্ত্রম্।

অত ইদং প্রত্যক্ষং প্রতীয়মানং জ্যোতিঃশাস্ত্রং
সুজ্ঞাঃ স্বীকুর্ব্বীরন্ ইত্যাশাস্যাস্মিন বিষয়ে সাদৃশ্য মুচ্যতে—
স্বর্ণং নৈব বিচারয়ন্তি চতুরা উৎপাদিতং কেনবা
কস্মাদ্দেশত আগতং প্রথমতঃ কালে কদা নির্ম্মিতম্।
শুদ্ধিং শ্যামলতাং পরীক্ষ্য নিকষে ক্রীণন্তি নিঃশঙ্কিতা
স্তদ্বদ্ দৃকসমতাং পরীক্ষ্য চতুরাঃ স্বীকুর্ব্বতাং মৎ কৃতিম্॥

অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, দৃক্‌গণিতৈক্যসাধন করিবার জন্য য়ুরোপীয়দিগের গ্রন্থ হইতে জ্ঞান লইতে কোন দোষ নাই।

[ক্রমশঃ।
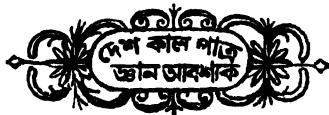
পেঁপে।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

পেঁপে আমরা পাকা খাই, কাঁচাও খাই;—সেই কাঁচা পেঁপে আবার ঝালে খাই, ঝোলে খাই, অম্বলে আরও ভাল খাই। এমন সুন্দর জিনিষ কোথা হইতে আসিল?

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আলোচনা করিলে তাহাতে পেঁপের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; তবে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থে এমন কতকগুলি ফলের নাম উল্লিখিত আছে, যাহা বর্ত্তমানে আমাদের সকলেরই অপরিচিত, তাহাদের মধ্যে কোনওটি পেঁপে কি না, তাহা বলা দুষ্কর। 'দ্রব্যগুণ' নামক কোনও একখানা আধুনিক অনার্ষ-সংগ্রহগ্রন্থে পেঁপেকে "পারীশফল" নামে অভিহিত দেখিতে পাওয়া যায় এবং উহার গুণবর্ণনাস্থলেও—

"পারীশং শীতলং রুচ্যং দীপনং পাচনং সরম্।
মধুরং রক্তপিত্তঘ্নং বিশেষাদর্শসে হিতম্।
পারীশক্ষীরযোগেন প্লীহাগুল্মশ্চ নশ্যতি॥"

এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহাকে প্রামাণ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায় না; যেহেতু উক্ত গ্রন্থকার মহামতি ভাবমিশ্র-প্রণীত ভাবপ্রকাশকে অনুসরণ করিয়াই এই সংগ্রহগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, ইহা ভাবপ্রকাশের দ্রব্যগুণ অধ্যায়ের অবিকল পুনরাবৃত্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সেই ভাবপ্রকাশে এই দ্রব্যগুণধৃত পারীশফলের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং সহজেই বোধ হয় বুঝিতে পারা যায় যে, এটি গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত নাম এবং স্বরচিত অনুষ্টুপ্‌ছন্দে গুণবর্ণনা। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, উক্ত শ্লোকে বর্ণিত গুণগুলি অপার্থক নহে, এই সমস্ত গুণই পেঁপেতে বিদ্যমান।

বাস্তবিকই যদি প্রাচীন সংহিতায় পেঁপের কোনও নাম ও গুণবর্ণনা না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সংগ্রহগ্রন্থকার এই নূতন নামকরণ ও ব্যবহারক্ষেত্রপরিজ্ঞাত গুণ সংস্কৃত ভাষায় বর্ণনা করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন,—প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জস্থিত পপুয়া বা নিউগিনি নামক স্থান হইতে ইহা এ দেশে আনীত হয়। উক্ত পপুয়া নামক স্থানজাত বলিয়াই ইহার ইংরাজী নাম Papaw এবং এই নামই পরিবর্ত্তিত হইয়া এ দেশে পেঁপে নামধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন সংহিতাগ্রন্থে এমন অনেক ফলের নাম আছে, যাহা কালবশে বর্ত্তমানে আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদি প্রকৃতই পেঁপে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত না হয়, অথবা পূর্ব্বে আমাদের দেশে ছিল না—এরূপ প্রমাণ স্থির হয়, তাহা হইলে পাশ্চাত্য

পেঁপেগাছ।

পণ্ডিতগণের এই মত এবং নামকরণের কারণ যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

যাহা হউক, যখন ইহা বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ইহার উপকারিতাও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহার গুণও আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলেন,—পেঁপের ক্ষীর (আটা)ই ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য। উহাতে Papain (vegetable Pepsin) নামক পদার্থ আছে, ইহা পাচক এবং ইহাতে শরীরস্থ Protin (মাংসনির্ম্মাপক পদার্থ) পরিপাক হইয়া Peptoneএ পরিণত হয়। শিশুদিগের উদরাময়ে ও তজ্জনিত বমনে ২ হইতে ১০ গ্রেণ মাত্রায় প্রযোজ্য।

ডিপ্‌থিরিয়া রোগে গ্লিসিরিনের সহিত পেঁপের আটা মিশ্রিত করিয়া তুলিদ্বারা গলার ভিতর লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রাচীন মহর্ষিগণের মতানুসারে অপরিজ্ঞাতগুণ দ্রব্যের শক্তি নির্ণয় করিতে হইলে রস, বিপাক, বীর্য্য ও প্রভাব, এই চতুর্ব্বিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়।

"রসো নিপাতে দ্রব্যাণাং বিপাকঃ কর্ম্মনিষ্ঠয়া।
বীর্য্যং যাবদধীবাসান্নিপাতাচ্চোপলভ্যতে।"

রসনার সহিত সংযোগে দ্রব্যের রস, ক্রিয়াসমাপ্তির দ্বারা বিপাক এবং অধীবাস অর্থাৎ শরীর নিবাস ও নিপাত অর্থাৎ শরীরসংযোগের দ্বারা বীর্য্য অনুভূত হয়।

"রসবীর্য্যবিপাকানাং সামান্যং যত্র লক্ষ্যতে।
বিশেষঃ কর্ম্মণাঞ্চৈব প্রভাবস্তস্য চ স্মৃতঃ।"

যেখানে রস, বীর্য্য ও বিপাকের সাম্য থাকিয়াও অবান্তর কর্ম্মবিশেষের উপলব্ধি হয়, সেস্থলে সেই কর্ম্ম দ্রব্যের প্রভাববশতঃ হইতেছে বুঝিতে হইবে। যেমন চিতা ও দন্তী সমগুণবিশিষ্ট হইলেও দন্তী বিরেচন করায়, ইহাই দ্রব্যের প্রভাব।

অপিচ—

"মণীনাং ধারণীয়ানাং কর্ম্ম যদ্বিবিধাত্মকম্।
তৎ প্রভাবকৃতং তেষাং প্রভাবোঽচিন্ত্য উচ্যতে।"

মণি প্রভৃতি ধারণ করিলে যে শরীরের উপর বিবিধ-ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, ইহাই প্রভাবকৃত কার্য্য। অচিন্ত্য শক্তিকেই প্রভাব বলে।

পাকা পেঁপে রসনায় নিপতিত হইলেই মিষ্ট বোধ হয়, সুতরাং ইহা মধুররসবিশিষ্ট। এখন দেখিতে হইবে, ইহার বিপাক ও বীর্য্য কিরূপে নির্ণীত হইতে পারে? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ক্রিয়াসমাপ্তির দ্বারা বিপাক ও অধীবাস ও নিপাতের দ্বারা বীর্য্য উপলব্ধি হয়। কিন্তু সেই ক্রিয়াসমাপ্তি, অধীবাস ও নিপাত সহজগম্য নহে। তবে কি করিয়া এই বিপাক ও বীর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে? ইহার কি কোনও সহজ উপায় নাই? অবশ্যই আছে। যাঁহারা এত বড় চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরপারে উপনীত হইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অবশ্যই এই বিষয় পরিজ্ঞানের একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন।

পাকা পেঁপে যে মধুর, তাহা রসনাসংযোগরূপ সহজ উপায়েই নির্ণীত হইয়াছে এবং "...পচ্যতে স্বাদুর্মধুরঃ" এই চরকোক্ত প্রমাণের সাহায্যে ইহা যে মধুর বিপাক, তাহাও স্থিরীকৃত হইয়া গেল। তৎপর—

"শীতং বীর্য্যেণ যদ্দ্রব্যং মধুরং রসপাকয়োঃ।"
(চরক)

যে দ্রব্য রস ও বিপাকে মধুর, তাহা শীতবীর্য্য।

এই প্রমাণসহযোগে ইহা যে শীতবীর্য্য, তাহাও আবিষ্কৃত হইল।

"মধুরো রসঃ শরীরসাত্ম্যাদ্রসরুধিরমাংসমেদোঽস্থিমজ্জঃশুক্রাভিবর্দ্ধন আয়ুষ্যঃ ষড়িন্দ্রিয়প্রসাদনো বলবর্ণকরঃ পিত্তবিষমারুতঘ্নস্তৃষ্ণাপ্রশমনস্ত্বচ্যঃ কেশ্যঃ কণ্ঠ্যঃ প্রীণনো জীবনস্তর্পণো বৃংহণঃ স্থৈর্য্যকরঃ ক্ষীণক্ষতসন্ধানকরো ঘ্রাণমুখকণ্ঠৌষ্ঠজিহ্বাপ্রহ্লাদনো দাহমূর্চ্ছাপ্রশমনঃ ষট্‌পদপিপীলিকানামিষ্টতমঃ স্নিগ্ধঃ শীতো গুরুশ্চ।"

মধুররস শরীরস্থ রসাদি সপ্ত ধাতুপোষক, বলবর্ণকর, পিত্ত, বায়ু ও বিষনাশক, তৃষ্ণানিবারক, স্নিগ্ধ, শীতবীর্য্য ও গুরু। (প্রবন্ধবিস্তৃতিভয়ে ইহার সমস্ত বঙ্গানুবাদ করা হইল না।)

স্থূলতঃ প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল যে, পাকা পেঁপে মধুর রস, মধুরবিপাক, শীতবীর্য্য, স্নিগ্ধ, গুরু, বায়ু, পিত্ত ও বিষনাশক, তৃষ্ণানিবারক ও সারক।

জগতে সমস্ত দ্রব্যই পাঞ্চভৌতিক, তাহার মধ্যে "সোমগুণাতিরেকান্মধুরঃ" বলিয়া পেঁপে স্বভাবতঃই সোমগুণবহুল। আবার সোমগুণবহুল দ্রব্যমাত্রেই সারক; যেহেতু—"সলিলপৃথিব্যাত্মকাস্ত প্রায়েণাধোভাজঃ পৃথিব্যাগুরুত্বান্নিম্নগত্বাচ্চোদকস্য।" সুতরাং পাকা পেঁপে যে সারক তাহাও স্থির হইল।

কাঁচা পেঁপে, পাকা পেঁপে হইতে কিঞ্চিৎ লঘু এবং ইহাতে আটা বেশী থাকে বলিয়া অজীর্ণ, অর্শঃ প্রভৃতি রোগগ্রস্তদিগের হিতকর। পেঁপের আটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ও ক্ষারগুণবহুল, সুতরাং ইহা পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক। অর্শঃ চিকিৎসার প্রধান লক্ষ্য—অগ্নিবৃদ্ধি ও বায়ুর অনুলোমন, "যদ্বায়োরানুলোম্যায় যচ্চাগ্নিবলবৃদ্ধয়ে। অন্নপানাদিকং সর্ব্বং তৎসেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ।" কাঁচা পেঁপে পাচক, অগ্নিবর্দ্ধক ও বায়ুর অনুলোমক, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অতএব পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহগ্রন্থকারধৃত "বিশেষাদর্শসে হিতং" এ কথা যথার্থ।

কাঁচা পেঁপের তরকারী বেশ উপাদেয়, চাট্‌নীও অত্যন্ত মুখপ্রিয়। তবে এই কাঁচা পেঁপে আমরা সাধারণতঃ যেভাবে ব্যবহার করি, তাহাতে সম্যক্ ফললাভের আশা করা যায় না। কারণ ইহার বিশেষ উপকারী অংশ আটা একেবারেই বাদ দিয়া ব্যবহার করা হয়। তাহা না করিয়া প্রথমতঃ কুটিবার পূর্ব্বে পেঁপেগুলিকে বেশ করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া পরে কুটিয়া আর না ধুইয়াই রন্ধন করিলে উপকার বেশী হইতে পারে, যেহেতু ইহার আটাটুকু তরকারীতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

এই আটা ২।৩ ফোঁটা হইতে ৭।৮ ফোঁটা পর্য্যন্ত মাত্রায় একটু চিনির সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উদরগতরোগে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

ইহা এত পাচক ও তীক্ষ্ণ যে, মাংসরন্ধনকালে উহাতে

কিঞ্চিৎ পেঁপের আটা নিক্ষেপ করিলে অতি সত্বর ঐ মাংস সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

এই মহোপকারী দ্রব্য যেখান হইতেই আনীত হউক না কেন, বহুদিন হইতেই ইহা যে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, তাহার প্রমাণও বিরল নহে। (বর্ত্তমানে সাঁওতাল পরগণা অঞ্চলেই উহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে।) অতএব আমরা এখন উহাকে নিজস্ব বলিয়াই মনে করিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না।

আমরা পিতামহ প্রভৃতির সমসাময়িক লোকের মুখেও শুনিয়াছি, তাঁহারাও আমাদের দেশে পেঁপের অস্তিত্বহীনতার কথা কিছুই জানেন না; তাঁহারা জন্মাবধি ইহার বহুল ব্যবহার দেখিয়া ও শুনিয়াই আসিতেছেন। সুতরাং ইহা ভিন্নদেশজাত হইলেও কত কাল যে আমাদের দেশে আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ বড়ই দুরূহ।

সচরাচর আমরা যে পেঁপে দেখিতে পাই, ইহা ভিন্ন আরও এক জাতীয় পেঁপে কোন কোনও স্থানে দেখা যায়। ইহার গাছের আকৃতিগত পার্থক্য বিশেষ কিছুই নাই। গাছগুলি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট আকারের হয় এবং জঙ্গলেও জন্মে। তবে ফলের সামান্য কিছু ইতরবিশেষ আছে। ফলের আকারও অপেক্ষাকৃত ছোট এবং লম্বা লম্বা শীষে লম্বমান থাকে। প্রত্যেক শীষে ৩।৪টি এমন কি, ৫।৭টি পর্য্যন্ত ফল ঝুলিতে থাকে, আর ঐ শীষের আকার অর্দ্ধ হাত হইতে অনুমান দেড় হাত পর্য্যন্ত লম্বা দেখা যায়। ইহার ভিতরাংশ সাধারণ দৃশ্যমান পেঁপে হইতে বেশী ফাঁপা অর্থাৎ ইহার সারাংশ (শাঁস) অপেক্ষাকৃত কম। এই জাতীয় পেঁপে সুপক্ক হইলেও ইহার মধুরত্ব অনেক কম। চলিতকথায় ইহাকে 'বুনো পেঁপে' বলা হয়।

বাস্তবিকই যদি পেঁপে আমাদের দেশে ছিল, এরূপ প্রমাণ হয় এবং প্রাচীন মহর্ষিগণধৃত বর্ত্তমানে অপরিজ্ঞাত ফলসমূহের অন্তর্ভুক্ত না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই সন্দেহ হইতে পারে যে, "কেন তাঁহারা ইহার উল্লেখ করেন নাই?"

পূর্ব্বে আমাদের দেশে দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর, সর, মাখন, দধি প্রভৃতি বর্ত্তমানের ন্যায় দুর্লভ ও দুর্ম্মূল্য ছিল না, তখন নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও এই সকল উপাদেয় দ্রব্যের অধিকারিত্বে বঞ্চিত ছিল না; সুতরাং এই সমস্ত উপাদেয় দ্রব্য ত্যাগ করিয়া তৎকালে জঙ্গলাফলরূপে পরিগণিত পেঁপে প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত না করা নিতান্ত অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে অধিক বাদানুবাদ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কেবলমাত্র ইহার গুণের বহুলবিস্তৃতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

হিন্দুমাতার কর্ত্তব্য।

[শ্রীগোপীনাথ সিংহ লিখিত। *]

মা—যার সঙ্গে মানব এক দিন এক অঙ্গ ছিল, এক প্রাণ—এক নিশ্বাস—এক আত্মা—যেমন "শক্তি" এক দিন "পুরুষকারের" মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তার পর পৃথক্ হ'য়ে এল, মা—যে তার দেহের রক্তে সুধা তৈরি ক'রে সন্তানকে পান করায়, যে সন্তানের রসনায় ভাষা দেয়, অধরে হাস্য দেয়, যে রোগে—শোকে—দৈন্যে, দুর্দ্দিনে সন্তানের দুঃখ নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, সন্তানের মলিন মুখখানি হাস্যোজ্জ্বল দেখ্‌বার জন্য যে স্বীয় প্রাণ বলি দিতে পারে, যার স্নেহ-মন্দাকিনী এই শুষ্ক মরুতে শত ধারায় ব'য়ে যাচ্ছে, মা—যে দয়া-বিতরণে কার্পণ্য করে না—বিচার করে না—প্রতিদান চায় না—কেবল দু'হাতে আপনাকে বিলায়, এত স্নেহময়ী যে মা, তাঁর সন্তানের প্রতি সমস্ত কার্য্যাবলী যে স্নেহদ্বারা পরিচালিত—ইহা বলা বাহুল্য।

সুস্থ সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য :—

সন্তান—যার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে মাতা সব যন্ত্রণা অক্লেশে ভুলে যায়, যাকে আদর কর্‌বার জন্য মার বুক ফেটে স্নেহরাশি উছলিয়া উঠে, সেই সন্তানকে মাতা স্নেহজলসেচনে

* 'অনাথবন্ধু'র জন্য "হিন্দুমাতার কর্ত্তব্য" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধলেখককে একটি মেডেল প্রদত্ত হইবে—এই সংবাদ প্রচার হইবার অল্পদিনমধ্যে যতগুলি প্রবন্ধ আমার হস্তগত হইয়াছিল, তন্মধ্যে উক্ত লেখকের প্রবন্ধ মনোনীত হওয়াতে উঁহাকেই মেডেল দেওয়া সাব্যস্ত হইল। —অনাথবন্ধু-সম্পাদক।

যেভাবে লালনপালন করেন ও যেরূপে তার ভবিষ্যৎচিত্র অঙ্কিত করেন, তাহা অতীব মনোহর। সিক্ত মৃত্তিকাকে ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ইচ্ছামত ছাঁচ তৈরি করা যায়, কিন্তু শুষ্ক মৃত্তিকাতে সেরূপ হয় না। বালকবালিকাগণের অন্তঃকরণ সিক্ত মৃত্তিকার ন্যায় কোমল; উহাকে যেদিকে যেরূপে চালিত কর, উহা সেইদিকে সেইরূপই চালিত হইবে। বাল্যকালে যে যেরূপ শিক্ষালাভ ও উদাহরণ দর্শন করে, তাহা তাহার অন্তঃকরণে প্রস্তররেখাবৎ অঙ্কিত হইয়া যায়, কখনই অপসৃত হয় না। সেইজন্যই সন্তানকে অল্পবয়স হইতেই জননীর শিক্ষাপ্রদান করা উচিত। চিরপূজ্য, প্রাতঃস্মরণীয় চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন :—

"লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ॥"

অর্থাৎ

পঞ্চবর্ষ সন্তানেরে করিবে পালন।
তারপর দশ বর্ষ করিবে তাড়ন॥
ষোড়শ বরষে যবে পড়িবে কুমার।
করিবে তাহার প্রতি মিত্রব্যবহার॥

বিদ্যা—যার মহৎ উত্তেজনায় মানব ত্রিদিব সুধা-মন্থন করিয়া গরীয়সী কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতেছে, যার ঝঙ্কারে মানব মোহিত—যার আস্বাদনে মানব ধন্য—এক কথায় যাহা মানব-জীবনের অমূল্য রত্ন। সেই বিদ্যা লাভ করিয়া পুত্র কিরূপে মনুষ্যজন্মের সার্থকতা করিবে, বাল্যকালে জননীর সেই বিষয়ে যত্নবতী হওয়া উচিত। পাঠাভ্যাস করিবার জন্য বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সুশিক্ষা—সদুপদেশ প্রদান করিয়া বালকের সুকোমল চিত্তক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধর্ম্মের বীজ বপন করা উচিত। আবার জননী যদি সুশিক্ষিতা হন, তবে ত মণিকাঞ্চনযোগ। পণ্ডিতাগ্রগণ্য সার্ উইলিয়ম্ জোন্স, বীরপুঙ্গব নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ও মহানুভব জর্জ্জ ওয়াশিংটন্, ইঁহারা সকলেই বাল্যকালে জননীর নিকট সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং সেই সুশিক্ষা-বলেই ইঁহারা জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। আমাদের দেশে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—সকলেই ধ্রুবোপাখ্যান অবগত আছেন। মহামতি ধ্রুব জননীর উপদেশবলেই আধ্যাত্মিক-জগতে এতাদৃশ উন্নতি করিয়া-ছিলেন বলিতে হইবে। পিতা ও বিমাতা কর্ত্তৃক অপমানিত হওয়াতে ধ্রুব মর্ম্মান্তিক যাতনায় অধীর হইয়া জননী সুনীতির নিকট অভিযোগ করেন। পুত্রের প্রতি সপত্নী ও স্বামীর এতাদৃশ বিসদৃশ আচরণের কথা শ্রবণ করিয়া সুনীতি কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না; ধীরে ধীরে পুত্রকে উপদেশ দিলেন :—

"সুশীলো ভব ধর্ম্মাত্মা মৈত্রঃ প্রাণিহিতে রতঃ।
নিম্নং যথাপঃ প্রবণাঃ পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ॥"

জননীর কণ্ঠনিঃসৃত এই উদারবাক্যগুলি মহাত্মা ধ্রুবের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। ধন, ঐশ্বর্য্য ও সাংসারিক সুখ অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া তিনি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করিলেন এবং কঠোর তপশ্চরণ করিতে করিতে সেই পরমব্রহ্মে লীন হইলেন।

সচরাচর এতদ্দেশীয় কথক মহাশয়গণের আখ্যাত জটিলোপাখ্যান এ স্থলে উল্লেখ্য। পিতৃহীন জটিল দরিদ্র মাতার দরিদ্র সন্তান। জটিল বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি বন পার হইয়া প্রতিদিন অধ্যাপকের গৃহে গমন করিত। একদা সে মাতাকে কহিল, "মা, বন দিয়া যাইবার সময় আমার বড় ভয় হয়।" মাতা কহিল, "বাছা জটিল! তুমি যখন ভয় পাইবে, তখন বনমালী দাদাকে ডাকিও, তাহা হইলে আর ভয় থাকিবে না।" মাতৃভক্ত সরল হৃদয় জটিল মাতার বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাস করিয়া বনের নিকট গমনপূর্ব্বক অকপটভাবে "বনমালী দাদা" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভক্তবৎসল বনমালী দাদাও মাতৃভক্ত সরলহৃদয় বালকের অকপট আহ্বানে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না।

নবজলদশ্যামতনু পীতাম্বর চূড়াধরাশোভিত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইয়া বালককে ক্রোড়ে লইয়া বন পার করিয়া দিলেন। জটিল প্রতিদিন এইরূপে বনমালী দাদাকে ডাকিত এবং বনমালী দাদাও তাহাকে পার করিয়া দিতেন। জটিল বাল্যাবস্থায় বনমালী দাদার সাহায্যে সামান্য বন পার হইত, আবার সেই বনমালী দাদার আশ্রয় পাইয়া কালে ভবার্ণব পারে সমর্থ হইয়াছিল। মাতার সদুপদেশই তাহাকে হরিপ্রেমসাগরে নিমগ্ন করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। যদি মাতা জটিলের সুকোমল চিত্তভূমিতে ধর্ম্মবীজ না বপন করিতেন, তাহা হইলে উহাতে যে কণ্টক বৃক্ষের বীজ উৎপন্ন হইত না, তা কে বলিতে পারে?

ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রাজপুতানা বীরপ্রসবিনী। তাঁহাদের বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিলে অদ্যাবধি শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহার মূলে রাজপুতমহিলার বুকভরা আশীর্ব্বাদ ও প্রাণমাতান উৎসাহ বাক্য। এই সব রাজপুত-মহিলা এমন কি প্রয়োজন হইলে চামুণ্ডার ন্যায় স্বয়ং রণ-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতেন। এই সব বীরমাতার তনয় যে মহাবীর হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? অতএব জননীর কার্য্যাবলি যখন আমরা প্রতি অক্ষরে গ্রহণ করি, তখন বাল্যকালে জননীর মহৎ দৃষ্টান্ত দেখান কর্ত্তব্য।

মাতার কর্ত্তব্য,—বাল্যকাল হইতে সন্তানকে (কি বালক কি বালিকা) "পরহিংসা অধর্ম্ম," "পরোপকার মহৎ ধর্ম্ম," "দয়াদাক্ষিণ্য" ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া। অসহায় বাল্য-কালে মাতার সন্তানের প্রাণের উপর সবিশেষ নজর রাখার কর্ত্তব্য।

তার পর পুত্রের স্বাস্থ্যরক্ষা :—

স্বাস্থ্য—যার শক্তিবলে মানুষ সাহসী, দীর্ঘজীবী, দুরূহ কর্ম্ম সাধনে উদ্যোগী, যার সংরক্ষণে বার্দ্ধক্য তার শত যন্ত্রণা নিয়ে দমাতে পারে না, মোটের উপর মানবজীবনে যাহা দুর্ল্লভ ও অমূল্য সামগ্রী, সেই স্বাস্থ্যের প্রতি মাতার বাল্যকাল হইতেই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

ধীরে ধীরে সন্তান যখন বয়োপ্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন মাতার কর্ত্তব্য—সন্তান কিরূপে প্রশংসার্হ জীবনযাপন করিতে পারে। মার কর্ত্তব্য—সন্তানের চরিত্রগঠনসম্বন্ধে সতর্ক থাকা, সন্তানকে কুকার্য্যে প্রশ্রয় না দেওয়া, সন্তান যাহাতে কুসঙ্গে পড়িয়া "নেশা" করিতে না শেখে, যাহাতে কুকর্ম্মে নৈতিক-জীবনের উন্নতিপথ রুদ্ধ না করে ও যাহাতে শত প্রলোভনের মাঝখান থেকে পুত্রের জীবন-গতি স্থির থাকে। যদি অজস্র উপদেশ ফলপ্রদ না হয়, তখন মার কর্ত্তব্য—এক আধারে সুধা ও অপর আধারে গরল, এক দিকে বুকভরা ভালবাসা ও অপর দিকে মুখভরা তীব্র গঞ্জনা, এক দিকে চোখভরা জল আর অপর দিকে শাস্তি নিয়ে পুত্রের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া। তখন মার সরলতা মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে কঠোরতার ছায়া অবলম্বন করা উচিত।

সংবাদপত্রপাঠকে অবগত আছেন বোধ হয় যে, কলিকাতানিবাসী এক ধনী কায়স্থ মাতা শত উপদেশ ও নির্য্যাতনসত্ত্বেও যখন পুত্রের চরিত্র শুধরাইতে পারিলেন না, পিতা যখন একেবারে হাল ছাড়িয়া দিলেন, তখন মা স্বীয় বাটির উঠানের মধ্যে এক গর্ত্ত খনন করাইয়া পুত্রের বুক পর্য্যন্ত মাটিচাপা দিলেন। তারপর অশ্রুপূর্ণনয়নে বাটীর সকলকে গহ্বর হইতে উঠাইতে নিষেধ করিলেন। সাত আট ঘণ্টা থাকিলে পুত্রের নিমনিয়া হয়। সেই সময় মাতা পুত্রকে উঠাইয়া ডাক্তারের দ্বারা বহু চেষ্টায় পুত্রকে বাঁচাইলেন। সেই পুত্র সেই দিন হইতে একান্ত মনোযোগসহকারে পাঠাভ্যাস করিয়া "রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ" স্কলার হইয়া বংশোজ্জ্বল করিয়াছিল। মাতার কঠোরতায় কি আশ্চর্য্য ফল !!!

তারপর সন্তান যাতে ধর্ম্মচ্যুত না হয়, মাতার সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এইখানে হিন্দুমাতার কারিকুরি—এইখানে শিক্ষিতা-জননীর শিক্ষার পরীক্ষা। প্রলোভনের আসক্তিবশতঃ পুত্রের ধর্ম্মচ্যুত হইবার বিষয় মাতা যদি ঘুণাক্ষরে জানিতে পারেন, তাহা হইলে মার কর্ত্তব্য—পুত্রকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, সনাতন ধর্ম্ম অপরাপর ধর্ম্মের চেয়ে কত উচ্চ, কত মহৎ, কত উদার, সনাতন ধর্ম্মে কত সুখ, সনাতন ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ নয়, তারই অপার শুভ্র করুণা মেঘবারির ন্যায় সকলের উপর সমানে বিতরণ করে। আর সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী এই হিন্দুজাতি—দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিতে জানে, দুর্ব্বলকে দমাতে চায় না, মৃতের উপর পদাঘাত করে না, গুণের সমাদর করে, পক্ষপাতিত্ব চায় না, ন্যায্য বিচার করে, আর এই হিন্দুজাতি পুরুর প্রতি আলেক্জাণ্ডারের ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দিতে জানে। যদি শত উত্তেজকে ফল না হয়, তা হ'লে সমাজের নির্য্যাতন, নরকের বিভীষকতা, চিন্তা-বৃশ্চিকের দংশন ইত্যাদি যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে যাতে পুত্র ধর্ম্মচ্যুত না হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হওয়া উচিত।

তার পর পুত্রের বিবাহ :—

মনোমত কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়া মাতার কর্ত্তব্য—বধূমাতাকে পুত্রের প্রতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি কর্ত্তব্য শিখিয়ে দেওয়া ও তাঁহার অবর্ত্তমানে সংসার যাতে সুখে চলে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া। পুত্র যদি গুণবান্ হয়, তখন মাতার কর্ত্তব্য—সেই পুত্রদ্বারা সমাজের বা দেশের বা ব্যক্তিগত যদি কোন অভাবপূরণ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা।

যদি সহসা কোন অভাবিত ঘটনার জন্য পুত্রের হৃদয় একবার ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা হইলে মাতার কর্ত্তব্য পুত্রকে শোকে সান্ত্বনা দেওয়া, তার ভাঙ্গা হৃদয় আবার প্রাণমাতান উৎসাহবাক্য দিয়া জোড়া লাগাইয়া, তার বিষাদ-ক্লিষ্ট হতাশ-মরু অন্তঃকরণে আবার আশা-বারি সেচন করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেওয়া।

বালিকার প্রতি কর্ত্তব্য :—

বাল্যকাল হইতেই কন্যাকে মাতার সুশিক্ষা, সদুপদেশ ও বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা উচিত।

গৃহস্থালী কর্ম্ম, রমণীসুলভ গুণাবলি—যার জন্য বালিকা বয়োবৃদ্ধিসহকারে ধীরে ধীরে সকলের নিকট প্রশংসিত হইতে থাকে, যার জন্য বধূমাতা গৃহস্থের সকলের নিকট আদরণীয় হয়, সেই সব গুণাবলির বীজ বাল্যকাল হইতেই কন্যার হৃদয়ে বপন করা উচিত।

দয়া ও দাক্ষিণ্য—যার জন্য রমণী চিরপ্রসিদ্ধা, যার মূর্ত্তি গৃহস্থের ঘরে ঘরে মঙ্গলনিনাদ করিতে করিতে ইষ্টদেবতাকে বরণ করে, যে দয়ার জন্য হর-রমা কৈলাস হইতে বারাণসীতে আসিয়া অন্নদান করিয়া অন্নপূর্ণা নাম গ্রহণ করিয়াছেন, যার জন্য দাতাকর্ণ একমাত্র পুত্রকে স্বীয় হস্তে বলি দিয়াছিলেন, যে গুণাবলির এত মহতী আকর্ষণী শক্তি, কন্যাকে বাল্যকাল হইতে সেই সব মায়ের শেখান কর্ত্তব্য।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যে কত উপকারী, বাল্যকালে কন্যাকে মাতার তৎসম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া ও কার্য্যে পরিণত করা কর্ত্তব্য।

বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বালিকা যখন লেখাপড়া শেখে, তখন নভেল-নাটক পড়িতে না দিয়া "রামায়ণ," "মহাভারত" ইত্যাদি ধর্ম্মপুস্তক পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

বালিকার যখন বিবাহের বয়স নিকটবর্ত্তী হয়, তখন

মাতার কর্ত্তব্য বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া—সতীত্ব কি জিনিস যে, এই সতীত্বের তেজে এক দিন সাবিত্রী তাঁহার স্বামীকে যমালয় হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এরি তেজে এক দিন ব্যাধ ভস্ম হইয়াছিল, এরি জন্য দময়ন্তী, অরুন্ধতী ও সীতা প্রাতঃস্মরণীয়া।

তার পর কন্যা যখন খেলার সঙ্গিনী, মাতার অঞ্চল ও পিতার ভবন ছাড়িয়া বধূভাবে অন্যের গৃহে প্রবেশ করে, তখন মাতার কর্ত্তব্য—কন্যাকে শ্বশুর, শাশুড়ী, ননদ, যা এবং পতি-গৃহের অন্যান্য সকলের প্রতি আচরণ শিখিয়ে দেওয়া।

যদি বিবাহের অল্প দিন পরে কন্যা বিধবা হয়, যদি শ্বশ্রূ গৃহ-কুলক্ষণা বলিয়া বধূকে তাড়াইয়া দেয়, তখন মার কর্ত্তব্য অতি কঠোর;—বালিকা যাতে কোন সুখী দম্পতি-যুগলের সম্পর্কে না থাকে, যাতে কোন অসচ্চরিত্র জাতিসম্পর্কীয় যুবকের সহিত না মেশে; তখন মার কর্ত্তব্য—বালিকাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত শিক্ষা দেওয়া, সংসারের কার্য্যে বিব্রত রাখা এবং মৃত স্বামীর প্রতি ভক্তি ও পূজা করিতে শিক্ষা দেওয়া।

আর যদি কন্যা সুখী হয়, যদি সন্তানের মাতা হয়, তখন মার কর্ত্তব্য—মাতার সন্তানের প্রতি কি কর্ত্তব্য, তাহা শিক্ষা দেওয়া।

রুগ্ন সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য ঃ—

সন্তান—পিতামাতার নয়নাভিরাম, তাঁহাদিগের ভবিষ্যতের আশা, বার্দ্ধক্যের ভরসা, দুর্দ্দিনের সম্বল—যদি কোন প্রকারে অসুস্থ হয়, তাহা হইলে পিতামাতার অন্তঃকরণ যে কি প্রকার আলোড়িত হয়, তাহা পিতামাতাই জানেন। তখন মার কর্ত্তব্য—পুত্রের শিয়রে অহোরাত্র বসিয়া থাকিয়া ডাক্তারের কথামত সেবা-শুশ্রূষা করা, কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করা, সন্তানের মঙ্গলের জন্য হিন্দুধর্ম্মানুযায়ী তাঁহাকে শত শত পূজা-উপবাস ইত্যাদি মানত করা, এমন কি প্রয়োজন হইলে আত্মবলি দেওয়া উচিত—যেমন হুমায়ুন পুত্রের রোগ আরোগ্যের জন্য আত্মবলি দিয়াছিলেন।

কিন্তু শত চেষ্টাতেও যদি সন্তান ধীরে ধীরে স্বীয় গণ্ডীর বাহির হইয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, যদি সত্য সত্যই পিতামাতার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়া যায়, তখন মাতার ক্রন্দনের পরিবর্ত্তে পুত্রের কর্ণে হরিনাম শুনান উচিত এবং পূর্ব্বজন্মের পাপেতে যদি পুত্রের অকালমৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করা উচিত, যেন এই জন্মেই পুত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইয়া যায় এবং সে যেন পরলোকে সুখী হয়।

কন্যার সম্বন্ধেও ঠিক এইরূপ।

যদিও হিন্দুরা সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিদ্যায় পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির সহিত সমতুল্য, তথাপি হিন্দুললনা রমণীসুলভ গুণাবলিতে রমণীর আদর্শ। সতীত্বে যেরূপ হিন্দুনারী অদ্বিতীয়া, সেইরূপ মাতৃত্বেও হিন্দুনারী গর্ব্বিতা। হিন্দুনারী অন্তঃপুরে থাকিয়া সে সব উজ্জ্বল, কঠোর ও আশাতীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে, আধুনিক জগতপূজ্যা আদর্শনারীরা সর্ব্বপ্রকার সমাজের সহিত সর্ব্বদা লিপ্ত থাকিয়া তাহার কণামাত্রও দেখাইতে সমর্থ নহে।

হিন্দুললনা শুধু যে স্বীয় সন্তানকে স্নেহচক্ষে দেখেন, তাহা নয়। তাঁহার জগতবাসী সকলকেই সন্তানের ন্যায় স্নেহ করা কর্ত্তব্য। তাই রাণী দুর্গাবতীর প্রাণ এক দিন দেশের লোকের জন্য কেঁদে উঠেছিল, তাই তিনি অসিহস্তে দেশকে অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য ম্লেচ্ছের সহিত যুদ্ধে ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

তাই রাণী ভবানী দেশের দুঃখমোচনের জন্য মুক্তহস্তে আপনাকে বিতরণ করেছিলেন।
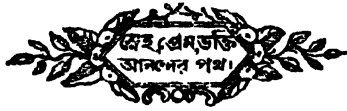
ফুল ও কুঁড়ি।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

ক্ষুদ্র তটিনীতীরে একটি সুন্দর গোলাপের গাছ। গাছে একটি সুন্দর পুষ্প বিকশিত হইয়া চারিদিকে সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। তাহার শোভায় যেন সেই দিক্‌টা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নে একটি ছোট ডালে একটি কুঁড়ি। সবুজ আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া তাহার রক্তরাগ যেন একটু উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। স্থানটি জনশূন্য। সান্ধ্য পবনের হিল্লোল গাছটিকে একটু একটু নাড়া দিতেছে,—নদীর বক্ষস্থিত ছোট ছোট ঢেউগুলি গোলাপ কুসুমের সেই শোভা কাড়িয়া লইয়া খেলা করিতেছে।

সেই নিভৃত নদীসৈকতে কুঁড়ি উঁচু ডালের গোলাপকে ডাকিয়া বলিল,—"দিদি—ও দিদি!"

গোলাপ।—কি বলিতেছ বোন্?

কুঁড়ি।—দিদি, তোমার কেমন বাহার—কেমন গন্ধ! তোমার গন্ধে যেন চারিদিক্ ভুর্‌ভুর্ করিতেছে। হ্যাঁ দিদি, আমার কখনও অমন বাহার হবে কি?

গোলাপ।—হবে বই কি বোন্। যখন গোলাপ হ'য়ে জন্মেছিস্, তখন একদিন তোরও এম্‌নি বাহার হবে। তখন এ বাহারে—এই ছার সৌন্দর্য্যে ও সৌরভে যে কত অসুখ, তা বুঝ্‌তে পার্‌বি।

কুঁড়ি।—সে কি দিদি, তোমার আবার ভাবনা—তোমার আবার চিন্তা! কত ভ্রমর গুন্‌গুন্ ক'রে তোমার গুণ গাচ্ছে, তোমায় দেখে আকাশের রাকা শশী হেঁসে খুন হচ্চে। তুমি ত রাজরাণী। তোমার কথা শুনে যে হাসি পায়।

গোলাপ।—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আগে আমার মত হও, তবে আমার কত ভাবনা, কত চিন্তা, তাহা বুঝ্‌তে পার্‌বে। এক জনের অবস্থা কি আর এক জনে বুঝ্‌তে পারে বোন্? তা যদি পার্‌তো ত সংসারে দুঃখ-জ্বালা থাক্‌তো না।

কুঁড়ি।—দম্ করে একটা বুকফাটা নিশ্বাস ফেলে কথা-গুলো বল্লে? হ্যাঁ দিদি, তোমার দুঃখ ভাবনা কি, তা কি শুন্‌তে পাই না?

গোলাপ।—শুনে কি হবে বোন্?

কুঁড়ি।—আর কিছু না হো'ক, তোমার মনটাও ত একটু হাল্কা হবে,—আমিও শুনে শিখ্‌বো।

গোলাপ।—যদি কেউ ব্যথার ব্যথী হয়, তা হ'লে তার কাছে মনের কথা ব'লে লাভ আছে। নৈলে যার-তার কাছে বল্লে কেবল উপহাসের পাত্র হ'তে হয়। আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে মন্দ কর্‌বার জন্যই ব্যস্ত!

কুঁড়ি।—আমি তোমার মায়ের পেটের বোন্, আমাকে এত অবিশ্বাস!

গোলাপ।—সংসারের গতিক দেখেই অবিশ্বাস কর্‌তে হয়। মনে কিছু করো না বোন্। দশ জন জুয়াচোরের হাতে ঠ'কে লোক শেষে সাধুকেও জুয়াচোর ভাবে। সেই জন্য সাধুরাও সৎকর্ম্ম কর্‌তে কত বাধা পায়।

কুঁড়ি।—সে কথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে এত অবিশ্বাস কর্‌তে গেলে ত সংসার চলে না—ঘর-কন্নাও করা হয় না। ভাল কাজ কর্‌তে গিয়ে যদি বিশ্বাস করেও ঠ'কি, সেও ভাল। তা হ'লেও ত মনকে বুঝান যায়। বেশী অবিশ্বাসও ভাল নয়।

গোলাপ।—তা বটে, তবে শোন। আচ্ছা, আমরা যে এই ফুল হ'য়ে জন্মেছি, আমাদের জীবনের সার্থকতা কি, বল্ দেখি? কি হ'লে আমাদের জন্ম সার্থক হয়?

কুঁড়ি।—কেন? বাস বিলিয়ে আর রূপ দেখিয়ে।

গোলাপ।—দূর্ ক্ষেপী, তাও কি হয়। আজ আমি ফোটা ফুল,—রূপ ফুটেছে, বাস বেরুচ্ছে; কাল্‌কের দিনটেও মেরে কেটে বাস ও রূপ থাক্‌বে; পরশু পাপ্‌ড়ি ঝ'রে পড়্‌বে, বাস টুটে যাবে; আমার এই দেহ মাটিতে গড়াগড়ি যাবে। তখন?

কুঁড়ি।—তবে কিসে জন্ম সার্থক হয়?

গোলাপ।—দ্যাখ্, যদি আমরা দেবসেবায় লাগি অথবা সাধুসঙ্গ পাই, তা হ'লে আমাদের জন্ম সার্থক হয়। কথায় বলে "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস। অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ।" যদি কোন সাধু-সন্ন্যাসী এই পথে এসে আমাকে নিয়ে দেবতার চরণে তুলে দেন, তা হ'লে আমার মত সৌভাগ্য-বতী কে আছে? যদি কোন ব্রাহ্মণ আসিয়া আমাকে গ্রহণ করেন ও দেবকার্য্যে—পিতৃকার্য্যে আমাকে নিয়োগ করেন, তা হ'লেও আমার জন্ম সার্থক। আর যদি—

কুঁড়ি।—চুপ ক'রে রৈলে কেন দিদি? আর যদি কি?

গোলাপ।—আর যদি কোন মাতাল নেশায় টলিতে টলিতে আসিয়া আমাকে জোর করিয়া ছিঁড়িয়া লয়, আর তাহার কামসঙ্গিনী রমণীর খোঁপায় গুঁজিয়া দেয় অথবা বমিতে বা বিষ্ঠায় ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমাদের জীবন কত কষ্টের হয়, আমাদের কত দুর্গতি হয়, বোন্ একবার ভেবে দেখ দেখি। অসতের হাতে পড়্‌লে আমাদের দুর্গতির আর সীমা থাকে না।

কুঁড়ি।—আমরা ত আর মানুষের কাছে যাই নে যে, আমাদের মাতালে ধর্‌বে।

গোলাপ।—কপালে যদি কষ্ট থাকে বোন্ ত কে খণ্ডাতে পারে? আমরা মানুষের কাছে না যাই, মানুষ আমাদের কাছে আস্‌বে। না হয় মর্কটে আসিয়া দাঁতে কাটিবে, পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িবে! গতি যে কি হ'বে, সেই ভাবনা ভেবেই ম'লাম।

কুঁড়ি।—হ্যাঁ দিদি, কি কল্লে সৎ সঙ্গ লাভ হয়?

গোলাপ।—সৎ কাজ কল্লে। যে সৎ কাজ করে, তারই অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়। তারই সাধুসঙ্গ মিলে। আর যে অসৎ কাজ করে, তার ভাগ্যে অসৎ সঙ্গ ঘটে ও ইহকাল পরকাল সবই ব্যর্থ হয়। দুনিয়ায় সৎকাজই সকল সুখের মূল। বোন্! সৎ কাজ কর, সুখী হবে। কেবল বাহারের ও গন্ধের গরব ক'রো না।

কুঁড়ি।—আমাদের কি ক্ষমতা যে, আমরা সৎ কাজ কর্‌বো?

গোলাপ।—ভগবান্ যা'কে যেমন শক্তি দিয়েছেন, সে তেম্‌নি সৎকাজ করে। সৎকর্ম্ম করিব মনে করিলে সৎকর্ম্মের অভাব হয় না। মনই সব বোন্, মনই সব। মন থাকলে কাজে শক্তির অভাব হয় না।

কুঁড়ি।—দিদি, আমরাও কি কর্ম্ম করিতে পারি?

গোলাপ।—পারি বই কি, আমরা যদি মনে সঙ্কল্প করি যে, সৎ কর্ম্ম কর্‌বো। এই জগৎটাই কর্ম্মসূত্রে বাঁধা। যার প্রাণ আছে, জ্ঞান আছে, আমি ও আমার এই ধারণা আছে, যার সঙ্কল্প করিবার সাধ্য আছে, সেই কর্ম্ম করিতে পারে। তবে কাহারও সৎকর্ম্মে রুচি হয়, কাহারও অরুচি হয়। রুচি অনুসারে প্রাণী কর্ম্ম করে, কর্ম্ম অনুসারেই জীবের গতি হয়। জীব মোহের ঘোরে এইটা বুঝে না; তাই অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

অকস্মাৎ এক সাধু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাধু বলিলেন, বাঃ বেশ গোলাপটি! আমি আজ সন্ধ্যার সময় এই গোলাপ ফুলটি দিয়া আমার ইষ্টদেবতাকে পূজা করিব। সাধুর কথা শুনিয়া গোলাপ খুব খুসী হইল। সে কুঁড়িকে বলিল, "ভগিনি যখন সৎসঙ্গ মিলেছে, তখন বোধ হয়, তোরও সদ্‌গতি হবে। আমি চলিলাম। আমার জীবন সার্থক হইল। তুই এখন ফুটিতে থাক্, কিন্তু সাধুসঙ্গ ছাড়িস্ না।"

नये चुटकुले।

(श्रीरामकृष्ण उपामानी लिखित)

दमा की दवा।

यह बिमारी हमारे देश में बहुत फैली हुई है। थोड़ी सर्दि लगने ही से इस बिमारी की उत्पत्ति होती है। यह बड़ी ही कष्टदायक बिमारी है, एक बार इसका शिकार बन जानेसे जन्म भर तक पीछा नहीं छुटता। इसकी दवा बिहिदाना (जो बनिया के दुकानों में २॥ पैसे को मिलती है) एक कूड़ीमें (पथरी) एक तोला मिस्री में रात के समय भीजों देना चाहिये, दुसरे दिन सुबह हाथ मुंह धोकर उस कटोरी में घोली हुइ दवा को उत्तम प्रकार मिला कर तथा छानकर एक छटांक पीना चाहिये। इसी प्रकार तीन दिन सेवन करनेसे यह भयंकर रोग आराम हो जाता है।

आमाशय की दवा।

१। लोहे के एक टुकड़े को आग में छोड़ देना चाहिये, जलकर लाल होनेपर तेलाकुचा का एक छटांक रस उसी जले हुए लोहेपर छोड़ देना चाहिये, परन्तु याद रहे, उस लोहे के नीचे एक पत्थर की कटोरी हो ताकि वह जमीन पर न गिरे। उस कटोरी में जब यह ठढां हो जाय तब थोड़ा सेंधा निमक मिला कर तीन दिन बराबर सुबह आधा छटांक खानेसे आमाशय आराम होता है।

२। कुकरौंधे के पत्तेका रस भी उसी प्रकार सेवन करनेसे फायदा होगा।

३। कच्चो इमली के पत्तेको पीस कर ६ माशा थोड़ा सेंधानिमक मिला कर खानेसे भी यह रोग आराम होता है।

हजमी गोली।

१ तोला कालमेघ का पत्ता एक तोला अजवाईन एक तोला, सौंफ एक तोला, काला जिरा एक तोला, बेतरा सोंठ एक तोला, बड़ी इलायची का छिलका एक तोला, सेंधानिमक थोड़ी मेथी इनसभोंको एक साथ पीस कर गोली बनाना चाहिये। बच्चों को सप्ताह मे दो तोन दिन सुबह देनेसे पेट की बिमारी कभी नहीं होती है।

हुच्की।

१। ताड़फल का पानी पीनेसे हुँचकि आराम होता है।

२। गरम खोई को थोड़े पानी में भीजों कर उसीपानी को थोड़ाथोड़ा पीनेसे हुँचकि आराम होती है।

३। एक नारियल काटकर उसमें १ तोला सहद छोड़ देना चाहिये, और उसे थोड़ा थोड़ा खिलाना चाहिये।

४। कबाब चिनी मुहं में रखनेसे हुचकि बन्द होती है।

५। बकरी के दुधमें थोड़ासा सोंठके चूर्ण को मिला कर खानेसे हुच्कि आराम होती है।

बवासीर की दवा।

बाहर की ओर होनेसे कपूर तथा रक्तचन्दन का लेप देनेसे आराम होता है। रक्तचन्दन न

मिले तो कपूर तथा सरसों का तेल देनेसे भी यह आराम होता है।

पांव का गट्टा।

नहाने के वक्त पांव को थोड़ी देर के लिये पानीमें भीजों कर गट्टे के उपर अच्छी तरह से झामा घस देनेसे गट्टा पतला हो जाता है।

क्रमि रोग की दवा।

१। पित्पसड़ा की (पलास) बीज, इन्द्रयव, वाबिड़ङ्ग, निमके गाछ का छिलका तथा चिरायता आदिका समान समान चूर्ण कर उसमे थोड़ासा गुड़ मिला कर बराबर तीन दिन सबेरे खाना चाहिये। इसके सेवन से पेट की क्रमि शीघ्र आराम होती है।

२। अनार के गाछ की जड़ का काढ़ा बना कर तिलके तेलके साथ खानेसे भी क्रिमि आराम होती है।

३। एक मात्रा विशुद्ध रेड़ी का तेल और एक मात्रा सेण्टुनाइन दोनों को मिला कर सुबह खाना चाहिये। उससे क्रिमि द्वारा हुआ पेट को दर्द और कबिजयत् आराम होती है। सुबह ६ बजे इस दवा को खावें फिर ठीक एक बजे पेट भर कर साबुदाना खावें, रातके वक्त भी साबुदाना खावें उसके दूसरे दिन रसा और भात खाना चाहिये।

हिन्दुनारी।

(श्रीरामकृष्ण उपासानी लिखित)

नारी के विविध नाम :—जननी, प्रजावती, माता, गृहश्री, अन्नदा अन्नपूर्णा, अभया आदि नारी का स्वरूप—मातृत्व, स्नेह, ममता, दया और माया।

शास्त्रमें लिखा है—"या देवी सर्व्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।" जो समस्त जगत् में मातृरूप में अवस्थान कर रही हैं वेही देवी महामाया भगवती हैं।

आर्य्योंने नारी को सर्व्वोच्चस्थान दिया है यह आश्चर्य्यजनक नहीं, वास्तव में ये सर्व्वोत्कृष्ट स्थानाधिकारिणी हैं। कारण ये जीवप्रसव करनेवाली महाशक्ति हैं। समस्त पृथिवी के जीवों को गर्भधारणकर इन्होने अपनी सर्व्वोत्कृष्टता का दृढ़प्रमाण दिया है अतएव ये सर्व्वांश में श्रेष्ठ हैं।

नारी की महिमा पुत्रही से जानी जाती हैं, मनुष्य जिस दिन इस जगत् में पहिले पहल पदार्पण करता हैं, सर्व्व प्रथम ही वह नारी को देखता है, और उसका स्तन्यपान कर तथा उसको मा कहकर पुकार अपना मानवजन्म सार्थक करता है।

जो मानव जाति को पैदा करनेवाली हैं, जिन पर मनुष्य की भावी उन्नति करती है, उनके सर्व्वाग्रगण्य पूजनीया होनेमें क्या तनिक भी

सन्देह है? स्वयम् धर्म्मस्वरूपिणी, आनन्द प्रेम-दायिनी मानव जाति के एकमात्र सुख सम्पद की आधार है। जीवके चरित्र की महिमा, जीव के जीवत्व की महिमा, तबही प्रकट होती है, जब वे अपने बाहुप्रसारित माता की गोद में स्थान या अपनी माता का आदरणीय होते हैं, इसी लिये वे इस जगत् में आदरणीय होते हैं, जिसने अपनी माताका सच्चा स्नेह पाया है, वेही धन्य है, उनके ऐसा भाग्यशाली पुरुष इस जगत में अति विरल दृष्टिगोचर होते हैं।

यही हिन्दुनारी का आदर्श है। साधना के प्रभावसे जननी जब प्रसन्न हो कर वर देने के लिये आती हैं, उस समय की महीयसी मूर्त्ती जिस मनुष्य ने नहीं देखी है वास्तव मे उससे बढ़ कर हतभाग्य इस जगत् में कौन हो सकता है? ऐसे मनुष्य का जीवन वृथा और व्यर्थ है।

नारी को सम्मान की दृष्टिसे देखने ही से उनकी महिमा जानी जाती है। क्या आपको ऐतिहासिक भारतीय हिन्दुनारी का आदर्श चरित्र स्मरण नहीं है? यदि स्मरण न हो तो पुनः—सीता, दमयन्ती, सती, पद्मिनी आदि महारानियों का चरित्र पढ़डालिये स्वयम् समझ लेवेंगे कि वास्तव में नारी सर्व्वोत्कृष्टा और पूजनीया हैं। देखिये कविवर भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जी ने वीर क्षत्राणियों पर क्या लिखा है?

धनि धनि भारतकी छत्रानी।

वीरकन्यका, वीरप्रसविनी, वीरवधूवरजानी॥
सती शिरोमणि धर्म धुरंधर बुधवल धीरजखानी।
इनके यश की तिहु लोक में अमलधुजा फहरानी॥

हम लोग हिन्दू हैं। नारी को इसी प्रकार सम्मान करते हुए हमलोग प्रारम्भ ही से इनकी महिमा घोषणा करते आरहे हैं। नारी हमलोगों के भोगलालसा की पुर्त्ति करनेवाली विलास सामग्री नही हैं बल्कि हमलोगों की आराध्य-देवी हैं।

गणपति देव ने अपनी माता से अपने विवाह के समय कहा था "यह क्या? आप मुझे विवाह करने के लिये कहती हैं, मैं जिस नारी की ओर दृष्टि डालता हूं उसी नारी में आपको पाता हूं। आप जगत् के हरएक नारी में वर्त्तमान है आपकी महिमा हरएक नारी में पाई जाती है। जिस नारी को आप मुझे पत्नीरूप मे ग्रहण करने के लिये कहती हैं, उसी नारी मे आपको वर्त्तमान देखता हूं अतएव हे जननि! मैं किस धर्म्मानुसार आपकी आज्ञापालन करूं।"

मातृभक्त जो होगा वही ऐसी दृष्टि प्रयोग करेगा। जगत् के हरएक नारी को मा सा मान-कर सब की पूजा करेगा। इसी प्रकार हिन्दू यदि हिन्दुनारी को समझ सके तो उसकी महिमा भी अनायास में समझ ने मे समर्थ होगा हमारे साहित्य में बहुतेरे नारीजीवन का चरित्र वर्त्तमान है। यदि हमलोग उन्ही सब चरित्रों को पढ़ सारतत्त्व ग्रहण कर सकें—तो वास्तव में हमलोगों से उन्नतिशील जाति इस जगत् में कोई नही हो सकती है!

सत्यही से हमलोगों की उत्पत्ति हुई है और सत्यही में हमलोगों की स्थिति है, यदि यह जानकर हमलोग सत्यमय नवदुर्वादल, श्याम-कान्ति पीतवसन पद्मपलाशलोचन, प्रफुल्लमुख, कोटि कोटि चन्द्रमा सूर्य्य जिनके पादपद्ममें सुप्रकाशित होते हैं ऐसे श्रीभगवान के श्रीचरण-तल पर खड़े होकर पवित्र कुसुम के ऐसा पवित्र हो जगत्पाता जगदीश्वर के आराधना करने योग्य हृदय गठन कर सकें तबही हमलोग वास्तव में, अपना जीवन सार्थक करनेमे समर्थ होगें।

नारी को समाज के सर्व्वोच्चशिखर में बैठाना,

उनका देवीत्व नष्ट न हो वल्कि उनकी उज्ज्वलता क्रमागत बढ़ती ही रहे इस ओर ध्यान रखना हरएक मातृभक्त हिन्दुओं का परम धर्म्म है।

जनकदुहिता सीता का चरित्र स्मरण कीजिये, जिनको सिवाय राम के कुछ नहीं सुहाता था उनके लिये यह वसुन्धरा राममय हो उठी थी। वन, उपवन, वाटिका सर्व्वत्र वे स्वामीसेवा में लिप्त रहती थीं। देखिये सतीत्व का प्रभाव, सावित्री अपने मृतस्वामीकी देहको गोद में रख स्वामीसाधना के बलसे उनकी देह में पुनर्ज्जीवन दान कराया क्या यह कम बात है? प्राचीन भारत में लाखों स्त्रियां ऐसी वर्त्तमान थी जिन्होंने अपनी सतीत्व रक्षा के लिये, अपने पतिके मंगल के लिये सदा सर्व्वदा जान न्योछावर करने के लिये प्रस्तुत रहती थी। ऐसी ऐसी वीरप्रसविनी नारियों ही पर देशकी भावी उन्नति निर्भर करती है। देशहितैषिणी वीरप्रसविनी, माताओं की शक्ति को भूल कर आज हमलोग मोहनिद्रा में निद्रित हो रहे हैं। परन्तु इस मोह निद्रा के कारण हमलोगों को नित्य कैसी भयंकर अवस्था होती आरही है, इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। अहा! जिस देवत्व महिमा को पाकर हमलोग आज संसार क्षेत्रमें अवतीर्ण हुए हैं, विलास में लिप्त हो आज हम उसी महिमा को नष्ट करने पर उतारू हो रहे हैं। जिसे सदा से हमलोग समस्त अनर्थ का मूल समझते आरहे हैं, जिसे अपने पास फटकने तक नहीं देते थे आज उसी अनर्थ की मूल अर्थके लिये हमलोग ललायित हो रहे हैं। स्मरण रहे, हमलोग आज चिरशान्ति विराजित अंग्रेज बहादुर के राजत्व में जिन्होंने हमलोगों के सुख शान्ति के लिये असम्भव को सम्भव रूपमें परिणत कर हमलोगों का उपकार किया है, यदि मनुष्य जन्म सार्थक न कर सकें तो जान रखें फिर भविष्यत् के होने की सम्भावना भी नहीं है।

Particulars of our Business for your kind perusal.

PRINTING DEPARTMENT.

PERHAPS you are not aware that we turn out most appropriate and artistic Xmas and New Year Cards, Birthday Cards, Wedding Congratulation Cards, Invitation Cards, Upahars Addresses of Welcome, Congratulation and Farewell, Illustrated Catalogues, Commercial and Zemindary Forms, in English, Bengali, Deb nagri, Kaithe nagri and Uriya languages.

Plans, Maps, Labels, Show Cards are lithographed in the best style.

Publishing of Valuable Books undertaken.

ENGRAVING DEPARTMENT.

Visiting Card Plates, Business Card Plates, Note and Letter Headings Plates, Bills of Exchange, Bills of Lading, Receipt and Bill Plates, engraved as neatly as European Work.

Halftone Blocks, Line Blocks, Tri-Colour Blocks, Woodcuts, Electros are done in A 1 style.

Specimen of Tri-Colour and other Blocks will be sent on request.

Engraving on Gold and Silver Ware, Plated Ware, Monograms, Crests, Arms, &c. are done in the best style, Brass and Silver Badges, Turban Badges are done neatly, Steel Dies engraved Monograms, Crests, Arms, Business and Address by first class experienced engravers, Gold and silver Medals made and engraved and embossed, Door plates, Branding Irons, Steel Punches are made to order by our own experienced hands. Marble Slabs and Brass Plates for doors in all languages and styles done.

Engraving on Glass-Ware undertaken.

RUBBER STAMP.

Rubber Stamps made. Specimen Books sent on application.

PICTURES & FRAMING DEPT.

We are prepared to undertake to Paint Oil Paintings, Engrave Steel Plates for Engravings, produce three colour Pictures. We import Pictures from Europe and have a department for framing Pictures and Mirrors very artistically and neatly at moderate charges.

Old Frames Renovated.

IMPORT DEPARTMENT.

We Import Stationery, Fancy Goods, Perfumery for our show rooms and can import anything our customers may want from Europe, America and Japan.

ORDER SUPPLY DEPARTMENT.

We are prepared to supply anything our customers want from Calcutta.

COMMISSION AGENCY DEPT.

We are prepared to take all classes of Goods on Commission Sale and render account sales monthly.

We issue to our patrons and regular customers a Pocket Diary and a Wall Calendar every year. Our Catalogue and supplementary Leaflets and specimens of our work are also regularly sent. We hope you will be pleased to enlist your name as a regular customer of our firm by sending orders in our line of business.

K. P. MOOKERJEE & Co.,

7, Waterloo Street,

CALCUTTA.

Printed and Published by Kally Prosonno Mookerjee at K. P. Mookerjee & Co.'s Press,
7, Waterloo Street, CALCUTTA.

অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত।

প্রথম বর্ষ :: প্রথম খণ্ড :: ষষ্ঠ সংখ্যা :: অগ্রহায়ণ :: সন ১৩২৩

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত।

ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, কৃষিতত্ত্ব, চিকিৎসা, ইতিহাস, শিল্প, বনৌষধ, যোগ, জ্যোতিষ ও সঙ্গীতাদি সম্বলিত

সচিত্র মাসিক পত্র।

Black Pagoda of Konarka—Puri.
কোনার্ক-মন্দির—পুরী।
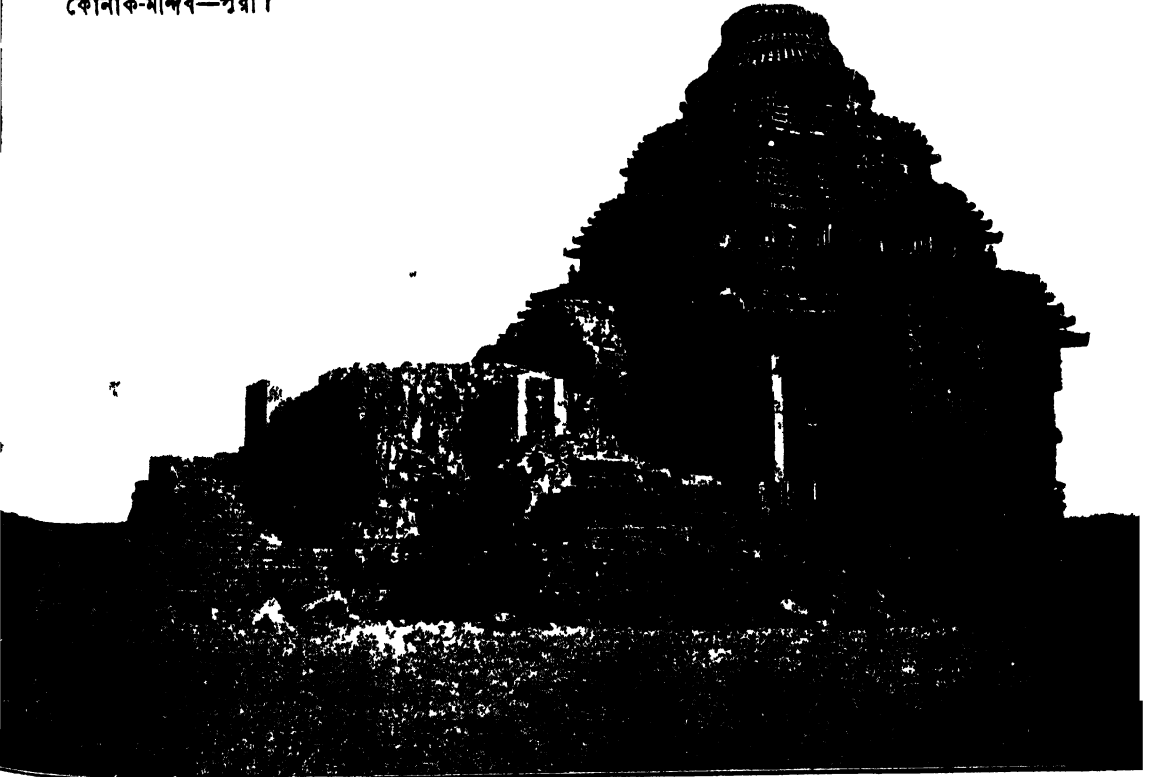
শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত।
৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"অনাথবন্ধু"—বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা।
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

"I think—therefore I am,"
And as I think, then so am I.
O may the thoughts sustaining me
Live so my work shall never die.

ॐ

It is easy to decide without thinking ; it is easy to think and not decide ; but it is hard to think fairly and decide courageously.

ॐ

In the long run, we pay most for what we try to get for nothing.

—*Quids and Quads.*

FOREWORD.

Sixth (*Agrahayan*) number of "Anathbandhu."

WE come and go, we do not know whence we come and where we go; but when we come, we must go. We do not bring anything with us nor do we carry away with us anything. Our life again is short and we are deluded with maya. In our childhood we follow pleasure and have aims and ambitions of one kind. These change as we change. Childhood passes, boyhood comes, when if we have sincere and well-trained teachers to prepare us we become useful to society and good to men and then we may pass a happy life. Then when we become householders, our duties change again.

We now enter manhood, and our most important duty should be duty to God and men, and all creatures. If, however, we are placed under unworthy teachers we pass an unhappy life and leave behind us troubles to our posterity.

To prevent troubles in life, we should sow seeds of love and duty to God and men and all creatures of God to enable us to pass a happy life and leave our children in equally happy position. Hence we should abandon luxury and live economically and be kind and good to all.

Crystal and glass shine bright like diamonds. They look like diamonds, but have none of the merits of the diamond. Such is the case with human beings. Most of those we see are mere materialistic men who pick up their duties at random according to association. Men trained in spiritual life with the knowledge of proper duties are called men. They are rare as diamonds.

Our ignorance, in securing proper teachers and worthy associations, places us in the dark and we follow men whom we foolishly consider great men. The great men of India were the Brahmins, who lived in caves and huts and practised religious austerities. The masses used to follow them and acted according to their instructions. Thus the people of the country were simple and sincere and possessed real wealth in their land which they cultivated and produced all their necessities. They kept cows for milk and other products of the milk, used cowdung as fuel and a sanitary paste and the ash as a manure. Thus the poorest in those days were richer than the rich men of the present day, who live in a fashionable style but possess neither land for cultivation nor cow to obtain milk and its products and those that possess land and cow do not know how to utilize them.

My grand-uncle, who was a teacher of music, used to tell his pupils at the start to unlearn all they had learnt before, and start a fresh with Sa, Re, Ga, Ma. To bring back the old peaceful time, we must unlearn what we have learnt and go back gradually to the old ways by such processes as will suit the people at present.

My Annapurna Asram will be a model home to teach economy and encourage Varnasram and pious living. The *Anathbondhu* has already given people an idea of teaching on the lines wanted for the good of the people.

When this model home will be built, it will bring back the ancient mode of teaching children in Patsalas and Toles, the industries of the caste-men as enjoyed in the Varnasram Dharma which is being preached by the Hon'ble Sir Rameswar Singh, Maharaja Bahadur of Darbhanga. I seek the favor of such personages who like him has the good of the people at heart.

My Three Schemes.

ANATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,
His Excellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,
I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga*, if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.
(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,
Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) **D. Chatterjee.**
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,
I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,

(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,

(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Dr. D. B. Spooner, Nalanda.

CAMP BARGAON.
Feb. 24th. 1917.

I beg to thank you for your kindness in sending me a copy of your monthly Journal Anathbandhu, upon whose admirable get-up I venture to congratulate you. I am glad the Bodh Gaya photo have been of use to you. * * *

Yours truly,

(Sd.) **D. B. Spooner.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee."

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,

(Sd.) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,

(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

From Sj. Provat Chandra Giri.

TARAKESHWAR.
22, 1, 17,

Dear Sir,

The fifth number of Anathbandhu has been received in due time. I have gone through the Magazine and found it very much interesting. The different subjects dealt therein are highly instructive and valuable. I doubt not that the object you have in view in this Journal is laudable. I wish it every success. I have not yet got the Journal Nos. 6th and 7th hope to receive them at an early date. I shall send my photo and life sketch later on.

Yours Sincerely

Provat Chandra Giri.

PRESS OPINIONS.

The British Printer.

October and November issue, Vol. XXIX, No. 172, 1916.

THE second number of *Anathbandhu* from the printers and publishers—K. P. MOOKERJEE & Co., Calcutta—offers a decided advance on the first issue of this new venture of that progressive house. Matter is in Bengali, with some advts. in English, a cover in red and black being both appropriate and quietly tasteful in character. A remarkable feature of the pages is the very praiseworthy standard attained by a series of three-colour illustrations interspersed amongst matter. Real progress is being made in this direction of highly-skilled printing, and all concerned are to be congratulated upon so good a result.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such (" Anathbandhu ") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called " Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

" Anathbandhu "—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that accompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer, of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

" Anathbandhu "—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee

of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A New Journal by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine. Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukhopadhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religions, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlees to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of

worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committe of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,
Your humble servant,

7, Waterloo Street,
CALCUTTA.

K. P. Mookherjee

সূচনা।

ঐ

ষষ্ঠ (অগ্রহায়ণ) সংখ্যার অনাথবন্ধুর জন্য।

আমরা আসি আর যাই, কিন্তু কোথা হ'তে আসি—কোথা চ'লে যাই, তাহা কিছুই জানি না। কিন্তু আমরা যখন আসিয়াছি, তখন আমাদিগকে যাইতেই হইবে। আমরা সঙ্গে কিছুই আনি নাই, সঙ্গে করিয়াও কিছু লইয়া যাইব না। আমাদের জীবন স্বল্পস্থায়ী, তাহার উপর আমরা মায়ায় অভিভূত। শৈশবে আমাদের যাহাতে আনন্দ হয়, আমরা তাহাই করি। আমরা এক রকম আশা ও আকাঙ্ক্ষা করি, কিন্তু আমাদের যেমন পরিবর্ত্তন ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে সেই আশার—সেই আকাঙ্ক্ষারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। শৈশব যায়—কৈশোর আসে, সেই সময় যদি আমরা উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট শিক্ষা পাই, তাহা হইলে আমরা ভাল লোক হইতে পারি, সমাজের কাজে লাগিতে পারি, তাহা হইলে আমরা সুখীও হইতে পারি। তৎপরে যখন আমরা গৃহস্থ হই, তখন আমাদের আবার কর্ত্তব্যের পরিবর্ত্তন ঘটে।

অতঃপর আমরা যৌবনপ্রাপ্ত হই, তখন ঈশ্বর, মানুষ ও সর্ব্বভূতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যপালন করাই ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক, আমরা যদি যোগ্য শিক্ষকের নিকট শিক্ষা না পাই, তাহা হইলে আমরা নিজে অসুখী হই এবং আমাদের বংশধরদিগকে অসুখী করি।

জীবনের অশান্তি পরিহার করিতে হইলে আমাদিগকে ভগবানের ও সর্ব্বভূতের প্রতি কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে। তাহার ফলে আমরা স্বয়ং ও আমাদের সন্তান-সন্ততিরা সুখী হইবে। অতএব আমাদিগকে বিলাসবর্জ্জন করিয়া মিতব্যয়ী ও সর্ব্বভূতে দয়ালু হইতে হইবে।

স্ফটিক ও কাঁচ দেখিতে অনেকটা হীরকের ন্যায়, কিন্তু তাহারা হীরার মত দেখাইলেও তাহাদের হীরার ন্যায় গুণ নাই। মানুষের পক্ষেও ঐরূপ আমরা যাহাদিগকে নরাকার দেখি, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই পশুমাত্র; তাহারা খোস্‌খেয়াল অনুসারে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকে। মানুষ যদি কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে, তাহা হইলেই সেই মনুষ্যনামের যোগ্য হয়। এরূপ মানুষ হীরার ন্যায় সংসারে বিরল।

উপযুক্ত শিক্ষক ও সঙ্গীনির্ব্বাচনে অযোগ্যতাই আমাদিগকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলে; আমরা নির্ব্বোধের মত যাহাকে বড়লোক ভাবি, তাহারই অনুবর্ত্তন করি। ভারতের যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কুটীরে গিরিকন্দরে বসিয়া কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, তাঁহারা বড়লোক ছিলেন; সাধারণ লোক তাঁহাদের অনুকরণ ও তাঁহাদের আদেশপালন করিতেন। সুতরাং এই দেশের লোক খুব সরল ও ঐকান্তিকতাসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা দেশের ভূমিকর্ষণ করিয়া এবং সমস্ত আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাস্তবিকই ধনশালী হইতেন। তাঁহারা দুগ্ধ—ঘৃত প্রভৃতির জন্য গো-পালন করিতেন, গোময় ইন্ধন ও শোধকদ্রব্যস্বরূপ সাররূপে ব্যবহার করিতেন। আজকাল যাঁহারা ধনী বলিয়া খ্যাত, যাঁহাদের চাল-চলনের খুব আড়ম্বর আছে অথচ যাঁহাদের জমীজমা গোধন প্রভৃতি নাই, তাঁহাদের চেয়ে বোধ হয় সেকালের নিতান্ত গরীবও সুখী ছিল।

আমার খুল্লপিতামহ এক জন সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ ছিলেন। তাঁহার নিকট কেহ সঙ্গীতশিক্ষা করিতে আসিলে তিনি বলিতেন যে, তুমি এ পর্য্যন্ত যাহা শিখিয়াছ, তাহা ভুলিয়া যাও এবং নূতন করিয়া সা, ঋ, গা, মা শিখ। সেই সেকালের সে শান্তিসম্ভোগ করিতে হইলে, আমাদের আধুনিক যুগের সমস্ত কুশিক্ষা পরিহার করিতে হইবে এবং পুরাতন ব্যবস্থাকে যথাসম্ভব আধুনিক করিয়া তাহারই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

আমার প্রতিষ্ঠিত "অন্নপূর্ণা আশ্রম" মিতব্যয়িতাশিক্ষার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপোষণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ আশ্রম হইবে। কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, "অনাথবন্ধু" সকলকে তাহার একটা আভাস দিয়াছে।

যখন এই আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন উহাতে পুরাতন সময়ের পাঠশালার ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী শিল্পাদি বিদ্যাশিক্ষার ও ব্যবস্থা বিহিত হইবে। যাঁহারা দ্বারবঙ্গের মহারাজ মাননীয় সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়ের সহিত সাধারণের মঙ্গলকামী, আমি তাঁহাদিগেরই সহায়তা প্রার্থনা করি।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ত্ব, দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশানুরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

পতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি সামান্য আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আসবাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

বৈদ্যনাথধামের সান্নিধ্যে

আমি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য কতকটা জায়গা লইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকবর্গ ও বন্ধুগণ আমার এই স্থান-নির্ব্বাচনের অনুমোদন করিবেন। স্থানটি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর।

আমার মনে হয়, কেহ কেহ আমার এই পত্র পড়েন নাই, সেই জন্য আমি ঐ সকল মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছি না।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎ-ব্যক্তিগণ যাঁহারা এখনও ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত না পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌ব্যাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না

বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্য-কল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চক কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এইজন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ১০।১৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্য-দাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি।

৩য়। ভারতীয় আভিজাত্যবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ - যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত
শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা রুচিবিরুদ্ধ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপন-দাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপন দাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তি মত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপন দাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
„ ২য় „ „ „ „ ১৫৲ টাকা হিঃ।
„ ৩য় „ „ „ „ „ „ „
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
„ শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লক প্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪ সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫ আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

'অনাথবন্ধু' মাসিকপত্র

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

ध्यान—तप्तकाञ्चनवर्णाभां बालेन्दुकृतशेखराम्।
नवरत्नप्रभादीप्तमुकुटां कुङ्कुमारुणाम्॥
चित्रवस्त्रपरीधानां सफराक्षीं त्रिलोचनाम्।
सुवर्णकलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्॥
गोक्षीरधामधवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्।
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठविराजितम्॥
कपर्द्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्।
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं दृष्ट्वानन्दमयीं पराम्॥
सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यां नितम्बिनीम्।
अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यामलङ्कृताम्॥

प्रणाम—अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि।
सर्व्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि माहेश्वरि नमोऽस्तु ते॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথাঃ মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কাষে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অনাথবন্ধু, অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

শ্রীশ্রীকার্ত্তিক।

कार्त्तिकेय ध्यान।

कार्त्तिकेयं महाभागं मयूरोपरिसंस्थितम्।
तप्तकाञ्चनवर्णाभं शक्तिहस्तं वरप्रदम्॥
द्विभुजं शत्रुहन्तारं नानालङ्कारभूषितम्।
प्रसन्नवदनं देवं सर्व्वसेनासमावृतम्॥

प्रणाम।

कार्त्तिकेय नमस्यामि गौरीपुत्रं सुतप्रदम्।
षड़ाननं महाभागं दैत्यदर्पनिसूदनम्॥

कार्त्तिकेय स्तोत्र।

योगीश्वरो महासेनः कार्त्तिकेयोऽग्निनन्दनः।
स्कन्दः कुमारः सेनानीः स्वामी शङ्करसम्भवः॥
गाङ्गेयस्ताम्रचूड़श्च ब्रह्मचारी शिखिध्वजः।
तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षड़ाननः॥
शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिद्धः सारस्वतो गुहः।
सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः॥
शरजन्मा गणाधीश-पूर्व्वजो मुक्तिमार्गकृत्।
सर्व्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदर्शनः॥
अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत्।
प्रत्यूषे श्रद्धयायुक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत्॥
महामन्त्रमयानीति मम नामानुकीर्त्तनम्।
महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्य्या विचारणा॥

কার্ত্তিকেয় ধ্যান।

কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥

প্রণাম।

কার্ত্তিকেয়ং নমস্যামি গৌরীপুত্রং সুতপ্রদম্।
ষড়াননং মহাভাগং দৈত্যদর্পনিসূদনম্॥

কার্ত্তিকেয় স্তোত্র।

যোগীশ্বরো মহাসেনঃ কার্ত্তিকেয়োঽগ্নিনন্দনঃ।
স্কন্দঃ কুমারঃ সেনানীঃ স্বামী শঙ্করসম্ভবঃ॥
গাঙ্গেয়স্তাম্রচূড়শ্চ ব্রহ্মচারী শিখিধ্বজঃ।
তারকারিরুমাপুত্রঃ ক্রৌঞ্চারিশ্চ ষড়াননঃ॥
শব্দব্রহ্মসমুদ্রশ্চ সিদ্ধঃ সারস্বতো গুহঃ।
সনৎকুমারো ভগবান্ ভোগমোক্ষফলপ্রদঃ॥
শরজন্মা গণাধীশ-পূর্ব্বজো মুক্তিমার্গকৃৎ।
সর্ব্বাগমপ্রণেতা চ বাঞ্ছিতার্থপ্রদর্শনঃ॥
অষ্টাবিংশতিনামানি মদীয়ানীতি যঃ পঠেৎ।
প্রত্যূষে শ্রদ্ধয়াযুক্তো মূকো বাচস্পতির্ভবেৎ॥
মহামন্ত্রময়ানীতি মম নামানুকীর্ত্তনম্।
মহাপ্রজ্ঞামবাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

সরস্বতীর ধ্যান।

তরুণশকলমিন্দো-
বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী
সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্য-
ল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ
পাতু বাগ্দেবতা নঃ॥

প্রণাম।

সরস্বতি মহাভাগে
বিদ্যে কমললোচনে।
বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি
বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীসরস্বতী।

सरस्वती-ध्यान।

तरुणशकलमिन्दो-
र्बिभ्रती शुभ्रकान्तिः,
कुचभरनमिताङ्गी
सन्निषण्णा सिताब्जे।
निजकरकमलोद्य-
ल्लेखनीपुस्तकश्रीः,
सकलविभवसिद्ध्यै
पातु वाग्देवता नः।

प्रणाम।

सरस्वति महाभागे
विद्ये कमललोचने।
विद्यारूपे विशालाक्षि
विद्यां देहि नमोऽस्तु ते॥

স্তব।

জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্।
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাং॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বজ্জীবন্মৃতং সদা।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগাধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দু কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী যা ভারত্যৈ তে নমো নমঃ॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাকর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভাকল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥

स्तव।

ज्ञानं देहि स्मृतिं देहि विद्यां विद्याधिदेवते।
प्रतिष्ठां कवितां देहि शक्तिं शिष्यप्रबोधिकाम्॥
ग्रन्थकर्त्तृत्वशक्तिञ्च सच्छिष्यं सुप्रतिष्ठितम्।
प्रतिभां सत्सभायाञ्च विचारक्षमतां शुभां॥
ब्रह्मस्वरूपा परमा ज्योतीरूपा सनातनी।
सर्व्वविद्याधिदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः॥
यया विना जगत् सर्व्वं शश्वज्जीवन्मृतं सदा।
ज्ञानाधिदेवी या तस्यै सरस्वत्यै नमो नमः॥
यया विना जगत् सर्व्वं मूकमुन्मत्तवत् सदा।
वागाधिष्ठातृदेवी या तस्यै वाण्यै नमो नमः॥
हिमचन्दनकुन्देन्दु कुमुदाम्भोजसन्निभा।
वर्णाधिदेवी या तस्यै चाक्षरायै नमो नमः॥
विसर्गबिन्दुमात्रासु यदधिष्ठानमेव च।
तदधिष्ठातृदेवी या भारत्यै ते नमो नमः॥
यया विनात्र संख्याकृत् संख्याकर्त्तुं न शक्यते।
कालसंख्यास्वरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः॥
व्याख्यास्वरूपा या देवी व्याख्याधिष्ठातृदेवता।
भ्रमसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः॥
स्मृतिशक्तिर्ज्ञानशक्तिर्बुद्धिशक्तिस्वरूपिणी।
प्रतिभाकल्पनाशक्तिर्या च तस्यै नमो नमः॥

THEIR EXCELLENCIES

LORD AND LADY CARMICHAEL,

1917.

Lord and Lady Carmichael.

LORD CARMICHAEL who has governed Bengal and governed it so well for five years will soon lay down the reins of office much to the regret of the people of Bengal. At a time when the sands of his official career are fast running out it may not be out of place to recall the chief landmarks of his administration.

He is the first Governor of Bengal and his administration marks an epoc in the peaceful progress of the province. The partition of Bengal had given rise to a persistent agitation in the two provinces into which Bengal had been devided by the scheme of partition and some shortsighted persons had succumbed to the subtle influence of the forces of disorder which have tarnished the fair fame of Bengal in more ways than one. They had sought to make administration in East Bengal impossible and some of them had resorted to the violent methods of the anarchists of Europe. It was at this time that His Imperial Majesty the King-Emperor modified the scheme of Partition—united East Bengal with West Bengal taking out Bihar and Orissa from the old province. Bengal was raised to the status of a presidency with a Governor with an Executive Council, and Lord Carmichael, then Governor of Madras, was selected the first Governor. The choice must have fallen upon him because of the success of his administration in the sister presidency of Madras, and he fully justified the choice.

Assuming office—he took this work before him seriously and set about enquiring into the needs of the province. He noticed that Bengal was pulsating with new ideas, new hopes and new aspirations and he found some of them legitimate. He helped the people to realise their legitimate aspirations, but was determined to put down disorder with a firm hand.

"Gentle yet firm, he won each
heart and mind,
Like the calm breathing of
the soft south wind."

In order to be able to understand the people better he began to learn the language of the province and in about two years could speak Bengalee well. So assiduously did he apply himself to understand the needs of the province that the Calcutta correspondent of the *Times of India* felt bewildered at the multiplicity of his endeavours and pronounced that five years would be too short a period for utilising his experience and information. He worked hard. But it was his suavity which at once won for him the love and admiration of Bengal.

He realised the importance of the question of sanitation and rural water-supply, and appointed a Committee to consider the question of the improvement of Rural Water-Supply. This Committee met on October 9th, 1912 and in opening their conference Lord Carmichael said—"During my tours in Eastern Bengal, one of the main subjects of conversation of those who came to see me was the need of a pure water-supply in rural areas." Subsequently he made over the entire amount of the Public Works Cess of each district to its District Board—not earmarking the amount for any special purpose, but leaving it to the discretion of the Board to ulitise it to the best advantage of the rural population. This was a significant sign of the times which indicated a larger measure of local self-government in store for Bengal in the near future.

Indeed Lord Carmichael wanted to give Bengal a larger measure of local self-government; and no one regretted more the unforeseen circumstances—over which he had no control—

which made it impossible for him to introduce the new local self-government bill in the local Legislative Council. Reluctantly he had to leave it to his successor to broaden the foundations of local self-government in Bengal and give effect to his policy and his wishes in the matter.

Lord Carmichael congratulated the Police on the courage and devotion to duty shown by members of the force who braved dangers and laid down their lives in the discharge of their duties—never shirking any risk or responsibility. But he was never blind to their shortcomings and deputed Mr. Gourley—his Private Secretary—who was always the "power behind the administration" to enquire into the condition of the Police in Bengal. The result of his enquiry was never made public; but we are sure he was able to adumbrate and advance—if not also to accomplish—a scheme of reform.

The question of the industrial development of the province also attracted Lord Carmichael's attention. A lover of art he became the patron of the industrial arts of Bengal. Referring to the opening of the Commercial Museum the Hon. Mr. Beatson-Bell truly said—"Of course, there have been many other exhibitions of this nature, but this was the most businesslike." In opening this Museum Lord Carmichael said—"Lord Curzon's object (in evolving the present Commerce and Industry Department) was, I take it, to emphasize that there is a community of interest between the Government on the one hand and those who are engaged in developing the resources of the country on the other. Their true interests in the matter are the same—the increase of the wealth of India—and they must work as partners, each doing his own part."

His interest in the home industries of Bengal has been instumental in establishing the Bengal Home Industries Association in which Lady Carmichael also has taken much active interest.

Lord Carmichael leaves behind him a name that Bengal will cherish.

Lady Carmichael has always taken an intelligent interest in the work of her husband. At the public meeting in connection with the Bengal Home Industries Association. Lord Carmichael Said—"I am the husband of a lady who has the cause of home industries very much at heart, and to whom I believe this meeting is in great part due." She has farely mixed with Indian ladies, and her work in connection with the war fund and numerous charities will long be remembered in Bengal.

H. P. G.

Indian Industries.

THE Industries Commission appointed by the Government of India to enquire into the industrial possibility of India is collecting evidence in the various industrial centres of the country ; and people who have experience of the industries or who have formed any opinion about the industrial development of the country are coming forward to give evidence before the Commission. Thus a lot of useful material is being collected for future use.

But what we all want is to devise means to produce useful articles—without which we cannot do—economically to meet our wants. Now what are our primary wants ? Shelter, food and wearing apparel—according to our position in life—articles to meet the manners and customs of the communities and medical aid when necessary. To meet these requirements we work and work hard. The first few years of our life is spent in study—in preparation for the struggle into which we are to enter later on. Then we become householders and taking upon ourselves the duties of life make frantic efforts to earn money to meet the growing needs of life. Leaving aside the time lost in sleep and sickness very little time is left for us to pursue our trade or business to procure money.

Our first and foremost duty is to our parents and relatives—those who depend on us, and by others—the people at large, especially suffering humanity. To enjoy this life and utilise it to the best advantage we should, first of all, devise means to meet the wants which we all feel. Our ambition now is to establish big industries requiring huge sums as capital. The disadvantages of establishing big industries in India are many. And the West is not happy over the industrial system that prevails there. This problem the ancient law-givers of India sought to solve by that wonderful organisation—the *Varnasram* which allotted to different communities different duties. So generations worked on the same lines—improving methods and acquiring dexterity in the processes. Thus the patient Hindu handicraftsman's dexterity was his second nature, inherited from father by son, through ages. The modern methods of apprenticehood and co-operation were there, the father teaching his son his trade and members of the same caste or guild helping one another according to the prevailing custom of society. Each tried to excel in his own work and there could be no jealousy between the different communities.

With this system the Hindus cultivated moderation. They combined plain living with high thinking. They knew that desire is natural to the mortal—a weakness the flesh is heir to—but our endeavour should be to extinguish desire and not to indulge in it. Material ambition and a craving for luxuries make men reckless—which in its turn make monied men without the requisite training lead an irregular life which pollutes society. They come to think that money is the criterion of social superiority, and money must be made even by harnessing knowledge and science to the service of destruction and death as has been the case in some of the countries in the West. This is bad for the men themselves, for society, and for the country to which they belong.

The old Hindu law-givers studied human nature to advantage. They understood that knowledge may develop a love of power, and so made the Brahmins—the custodians of knowledge—abjure all luxuries and concentrate their attention on the hereafter and attain spiritual improvement. They also divided the work of the other classes according to their capacities. If we go back to the old ideals we can yet

attain peace, health and happiness. We have the wherewithals of peace and happiness near at hand and need not roam all over the world for them.

Let us, therefore, revive the old conditions. The paths and rail-roads that block the water-ways and so make the land water-logged should be so constructed as to allow the water courses to follow their natural course without detriment to public health and interest. Old tanks should be re-excavated, wells dug, jute-steeping in rivers restricted. Thus will public health be improved, and the gradual deterioration of the urban population and the desertion of villages will cease. To meet the demands of the rural population small industries should be revived by hereditary handicraftsmen and the poverty problem of the country solved without much difficulty.

The rich people will then have no excuse to leave their villages and come to the towns to lead fast lives which often bring about their ruin. Once they leave their villages and are out of the reach of their old *Samaj* with its duties and obligations their views change and gradually the natural ties to their old homestead and society wane, the whole community suffer in consequence. The poor cannot contribute money for sanitary or educational purposes, but look up to their rich neighbours for help. If the rich leave them they become helpless. Almost all old houses had their *Thakurbarees* and *Atithsalas* where a host of people got shelter and food. Thus was the need of workhouses and almshouses avoided in India. These charitable institutions could be maintained because people were frugal and lived economically. That old ideal should be resorted to.

The prevailing system of education too is contributing to our poverty and bringing about discontent and unrest.

The food that we get is mostly adulterated, insufficient and the price is exorbitant. The cattle is deteriorating and their prices are going up. Such unnatural conditions cannot but spell ruin for us.

The struggle for existance has become so keen during the past fifty years that we shudder to think what is in store for us in the near future. Our mode of living is becoming more and more expensive every day, our system of education is making us discontented and disrespectful, and our health is becoming undermined. This is a serious state of affairs which cry aloud for redress.

Let us then go back to the old ideals and once more live in HEALTH and PEACE.

প্রথম বর্ষ। | অগ্রহায়ণ। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | ষষ্ঠ সংখ্যা।

লুকোচুরী।

[শ্রীপ্রবোধনাবায়ণ বন্দোপাধ্যায এম্. এ., বি. এল্ লিখিত।]

(১)

সৃজনের সুপ্রভাত হ'তে,
জনমের মরণের অবিশ্রাম স্রোতে
কি প্রেমের টানে
ছুটেছি তোমাব পানে—তোমাবই সন্ধানে,
মিলনের পথ, প্রভু!
কখন সরল অতি, বক্রগতি কভু,
কভু তরুচ্ছায়াস্নিগ্ধ মনোমুগ্ধকব,
কভু দগ্ধ-মরুময় দুরন্ত প্রান্তর,
ধরিতে তোমায় যত পথে পথে ঘুরি,
তুমি তত মোর সাথে খেল লুকোচুরী;
—তবু জানি ফুরাবে এ পথ,
তোমার চরণ পাব, পূর্ণ মোর হবে মনোরথ।

(২)

আদি-জন্মে অন্তবাত্মা মোব,
বাঁধিবাবে সদ্যশ্ছিন্ন তব প্রেম-ডোর,
নব অনুবাগে,
তোমা লাগি' জীবনেব প্রতিক্ষণ জাগে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে বিরহের ঘোরে
"দেখা দাও, প্রিয়তম! দেখা দাও মোরে";
—দেখা নাহি দিলে,
লুকোচুরী খেলা ছলে লুকায়ে রহিলে।

(৩)

প্রতি জন্মে বাড়ে ব্যবধান,
সে দীপ্ত প্রথম-প্রেম কালবশে হ'য়ে আসে ম্লান,

বিরহের তীব্র-তীক্ষ্ণ তীর
মুহুর্মুহু শিহরি' চিত্ত করে না অধীর,
আশা—উৎকণ্ঠায় ভরা অন্তর আমার,
তব পথ স্মরি' নাহি করে অভিসার ;
স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্বে উঠি ফুলি'
তুমি যে সর্ব্বস্ব মোর যাই তাহা ভুলি',
—লীলাময় ! একি হে চাতুরী
পথিকে ভুলায়ে পথ খেল লুকোচুরী ।

(৪)

কিন্তু সে গোপন থাকা শুধু ক্ষণতরে,
গুঞ্জরি' যে লীলাভরে আমার অন্তরে
দিলে সাড়া, ওগো প্রেমময় ।
আবার তোমার প্রেমে ভরিল হৃদয়.
মিলন-আশায় বক্ষ উঠিল আকুলি'
ছুটিল জীবাত্মা মোর লক্ষ বাহু তুলি'
চরণে তোমার
তাহারে নূতন ক'রে দিতে উপহার .
আবার হারায় পথ, তোমাকেও ভুলি.
সর্ব্বাঙ্গে লাগিল শুধু কুপথের ধূলি .
—লুকোচুরী খেলাইতে কি করিলে হরি ।
এমন প্রবল প্রেম দিলে ব্যর্থ করি ।

(৫)

পাইবারে তোমার উদ্দেশ,
লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরি' পরিয়াছি লক্ষ নব বেশ,
হইয়াছি কখনো ব্রাহ্মণ,
স্বর্গের কামনা করি', বেদমার্গে করিয়াছি তব অন্বেষণ,
কর্ম্মকাণ্ড অনুসরি' যজ্ঞকুণ্ডে হোমানল জ্বালি'
স্বাহা স্বাহা মন্ত্র পড়ি' হুতাশনে ঘৃতাহুতি ঢালি',
ঊর্দ্ধপানে জুড়ি' দুই কর
ইষ্টদেবতার কাছে মাগিয়াছি অভীপ্সিত বর ;
কভু বা তান্ত্রিক,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে মুখরিত করি' দশ দিক্,
ভীষণ শ্মশানমাঝে শবমুণ্ডে পাতিয়া আসন,
করিয়াছি প্রচণ্ড সাধন,
কখনো সন্ন্যাসী, যোগী, কভু ব্রহ্মচারী,
কভু বা শ্রমণ, ভিক্ষু, যতী, দণ্ডধারী,
গিরিশিরে, নদীতীরে, ঘন বনমাঝে,
তোমারে ধরিতে প্রভু । বহুরূপী সাজে
চুপি চুপি ঘুরেছি একেলা,
—তবু না ভাঙ্গিল তব লুকোচুরী খেলা ।

(৬)

হে ভক্তবৎসল ।
এবার বাঁধিব তোমা দিয়া আঁখিজল,
দীনের সম্বল
বাহিরে সংসারী থাকি' অন্তরে বৈরাগী,
তোমারে বাসিব ভাল শুধু তোমা লাগি'
সকল তেয়াগি,
জীবনে মরণে
সর্ব্বস্ব ধরিয়া দিব তোমার চরণে,
অতি সন্তর্পণে,
নিষ্ঠা করি' প্রাণ ভরি' শুধু অবিরাম
সকল কর্ম্মের মাঝে লব তব নাম
হইয়া নিষ্কাম,
ক্রমে ক্রমে চিত্ত মোর হ'বে সুনির্ম্মল,
কৃপা করি' সেথা হরি চরণকমল
রাখি' তাহা করিবে সফল,
নিত্য তবে পাব দরশন
দ্বিভুজ মুরলীধারী চিত্তহারী ব্রজেন্দ্রনন্দন,
গোপীজন-মানসমোহন,
—আর আমি নহি যে একেলা
পথশেষে হ'ল শেষ পথের সে লুকোচুরী খেলা ।

মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই. ই.

কাশিমবাজার।

আজ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নাম যেরূপ সুপরিচিত, বোধ হয়, আর কোন বাঙ্গালীর নাম সেরূপ সুপরিচিত ও সমাদৃত নহে। বাস্তবিকই তাঁহার দানপুণ্যে বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে। তিনি মাতুল-পরিবারের বিশাল সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত এ দেশে এমন কোন সদনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহাতে তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতির অভাব অনুভূত হইতে পারে। বঙ্গের সর্ব্বত্র তাঁহার বদান্যতার বর্ষণ হইয়াছে—তিনি দান-বীরের গৌরবে বাঙ্গালীকে গৌরবময় করিয়াছেন।

তিনি যে রাজপরিবারের সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহার যশ দিগন্তবিস্তৃত করিয়াছেন, তাহার সহিত এ দেশে ইংরাজ-প্রাধান্যের ইতিহাস অচ্ছেদ্য-ভাবে বিজড়িত। কালী নন্দী বর্দ্ধমানের সিজলা গ্রাম হইতে আসিয়া বাঙ্গালার তৎকালীন রাজধানী মুর্শিদাবাদের উপকণ্ঠে কাশিমবাজারের নিকটে শ্রীপুরে বাস করেন। তখন রেশমের ব্যবসার জন্য তথায় বিদেশী বণিক্‌দিগের কুঠী ছিল—কাল্কাপুরে ডাচ, ফরাসডাঙ্গায় ফরাসী ও কাশিমবাজারে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। ব্যবসার জন্য এই সব স্থানে মহাজন, সরাফ প্রভৃতিরও অভাব ছিল না। কালী নন্দী কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাধাকান্ত কাপড়ের ব্যবসা করিতেন এবং পান ও ঘুড়ী বিক্রয় করিতেন। তাঁহার ঘুড়ী উড়াইবার কৌশল দেখিয়া লোকে তাঁহাকে "খলিফা" বলিত। রাধাকান্ত খলিফার পুত্র কৃষ্ণকান্ত বা কান্তবাবু কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

কান্তবাবুর ব্যবসাবুদ্ধি ও লোকচরিত্রজ্ঞান যেমন অসাধারণ ছিল—ঘটনার ফলাফলনির্ণয়ক্ষমতাও তেমনই প্রবল ছিল। বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়া সঙ্গে সঙ্গে কান্তবাবু ইংরাজদিগের সঙ্গে কথা কহিবার মত একটু ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। সে সময় ইংরাজীজানা লোক প্রায় পাওয়া যাইত না—যাঁহারা ইংরাজী জানিতেন, তাঁহাদের অত্যন্ত আদর ছিল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কান্তবাবু কাশিমবাজারে ইংরাজের কুঠীতে শিক্ষানবিশরূপে প্রবেশ করিয়া ক্রমে মুহুরী হয়েন। তখন ওয়ারেণ হেষ্টিংশ কাশিমবাজার কুঠীর কর্ত্তা। সেই সময় হেষ্টিংশের সঙ্গে কান্তবাবুর পরিচয়। সেই পরিচয় হইতেই কান্ত বাবুর সৌভাগ্যোদয়।

এই সময় নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া হেষ্টিংশকে বন্দী করেন। হেষ্টিংশ পলায়ন করিলে তাঁহাকে পুনরায় ধরিবার চেষ্টা হয়। এই সময় কান্তবাবু তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া গোপনে কলিকাতায় পৌঁছাইয়া দিয়া যায়েন। হেষ্টিংশ কান্তবাবুকে একখানি 'লেখন' দিয়া বিদায় দেন। তাহার পর ঘটনাচক্রের অপ্রতর্কিত আবর্ত্তনে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হইল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কাউন্সিলের সদস্য হইয়া ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংশ বিলাতে গমন করিলেন। তাহার পর ফিরিয়া তিনি ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিলেন। তখন তিনি কান্তবাবুকে স্মরণ করিলেন। কান্তবাবু আসিলে হেষ্টিংশ তাঁহাকে তাঁহার মুৎসুদ্দী নিযুক্ত করিলেন। কান্তবাবু কান্দিরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে সহযোগী করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

দাওয়ান কান্তবাবুর সৌভাগ্য দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংশ তাঁহাকে গাজিপুরে জায়গীর দিলেন ও তাঁহার পুত্র লোকনাথকে বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দ্বারা

"মহারাজা" উপাধি প্রদান করাইলেন। ক্রমে তিনি রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বর্দ্ধমান, বগুড়া ও ২৪ পরগণা জিলাসমূহে নানা সম্পত্তির অধিকারী হইলেন। বারাণসীতে চেৎসিংহের গৃহ-আক্রমণকালে কান্তবাবুর চেষ্টাতেই অন্তঃপুরিকাগণের সম্ভ্রম রক্ষিত হয়। তাঁহারা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ কান্তবাবুকে বহু অলঙ্কার, লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা, দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ প্রভৃতি প্রদান করেন। সে সব আজও কাশিমবাজার রাজবাড়ীতে সযত্নে সংরক্ষিত। ১১৯৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র মহারাজা লোকনাথ পিতার মৃত্যুর পর কয় বৎসর জীবিত ছিলেন। কিন্তু তিনি রুগ্নদেহে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতে পারেন নাই। ১২১১ বঙ্গাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র হরিনাথ নাবালক। হরিনাথ হিন্দু কলেজে ১৫ হাজার টাকা দান করেন। তিনি সঙ্গীতের ও ব্যায়ামের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় কাশিমবাজারে বহু চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সংস্কৃত-শিক্ষাবিস্তারের সুব্যবস্থা হয়। রাজা হরিনাথ বৈষ্ণব ছিলেন এবং সাধুসঙ্গে কালযাপন করিতে ভালবাসিতেন। ১২৩৯ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে হরিনাথের মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ নাবালক। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক হয়েন। তিনি ইংরাজীতে সুশিক্ষিত ও শিকারপ্রিয় ছিলেন। তিনি অমিতব্যয়ী হইয়া ৪ বৎসরে সঞ্চিত ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। তিনি সংযম শিক্ষা করেন নাই। তাহার ফলে তাঁহার কোন ভৃত্যকে তিনি কর্ত্তব্যহেলার জন্য গুরুপ্রহারে জর্জ্জরিত করেন। তাহার মৃত্যু হয়। সেই অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট রাজাকে গ্রেপ্তার করিতে আদেশ দিলে রাজা কলিকাতার বাড়ীতে আত্মহত্যা করেন।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাহার পূর্ব্বদিন রাজা এক উইল করেন। তাহাতে তিনি পত্নী রাণী স্বর্ণময়ীর মাসিক ১৫ শত টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া সমস্ত সম্পত্তি শিক্ষাবিস্তারকল্পে দান করেন।

বর্দ্ধমান জিলার ভাটাকুল গ্রামে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী স্বর্ণময়ীর জন্ম হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা কৃষ্ণনাথের সহিত পরিণীতা হয়েন। তাঁহার পুত্রসন্তান জন্মে নাই। রাজা উইলে তাঁহাকে দত্তকগ্রহণের অধিকারেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি উইল অসিদ্ধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য মোকর্দ্দমা করেন। সে মোকর্দ্দমায় তাঁহারই জয় হয় এবং তিনিই কাশিমবাজার-রাজের বিশাল সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতে থাকেন। তিনি দাওয়ান রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের সাহায্যে সে সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিয়া সুশাসন করেন। সম্পত্তির আয়ের অধিকাংশই তিনি নানা সৎকার্য্যে দান করিতেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধিদান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষে তাঁহার দানে সরকার বিশেষ প্রীত হয়েন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে C. I. (Order of the Crown of India) উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই উপাধিদান উপলক্ষে কমিশনার যে দরবার করেন, তাহাতে তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন পর্য্যন্ত মহারাণী নানা সদনুষ্ঠানে ১১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। সেই সময় কমিশনার বলিয়াছিলেন, তাঁহার দানে ও অন্য অনেক দাতার দানে প্রভেদ আছে। তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি অন্য অনেক দাতার মত যশের আশায় নামের জন্য দান করেন না। তিনি দানের উপযুক্ত পাত্রের বা অনুষ্ঠানের সন্ধান করিয়া লইয়া দান করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কাশিমবাজারে যাইয়া তৎকালীন ছোট লাট মহারাণীকে "The best female subject of the Queen in the Bengal Presidency" বলিয়াছিলেন। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানে কাশিমবাজার রাজবংশের কীর্ত্তিকথা সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রীদিগের ছাত্রাবাসনির্ম্মাণের ব্যয় বহন করিয়াছিলেন। তিনিই ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে জলের কল প্রতিষ্ঠিত করেন এবং বহরমপুরে কলেজের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক ২০ হাজার টাকা প্রদান করিতেন। আর তাঁহার ব্যক্তিগত দানের সংখ্যানির্দ্দেশ করা যায় না। এই দানের জন্য তাঁহার নাম বাঙ্গালার সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইয়াছিল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট তারিখে তিনি লোকান্তরিত হয়েন। তখনও রাজা কৃষ্ণনাথের জননী রাণী হরসুন্দরী জীবিতা ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে মহারাণী স্বর্ণময়ীর মৃত্যুতে সম্পত্তিতে তাঁহারই অধিকার জন্মে। তিনি নগদ ৯ লক্ষ টাকা লইয়া মাসিক ১০ হাজার টাকা মাসহারা চুক্তিতে সম্পত্তি উত্তরাধিকারী দৌহিত্র মণীন্দ্রচন্দ্রকে প্রদান করেন।

মণীন্দ্রচন্দ্র সম্পত্তি পাইয়া সে সম্পত্তি ভোগবিলাসে ব্যয় না করিয়া ন্যাসরূপে রক্ষা করিতেছেন। যদি দেশে শিক্ষা-বিস্তারে সম্পত্তিদান সত্য সত্যই স্বল্পায়ু রাজা কৃষ্ণনাথের অভিপ্রেত থাকিয়া থাকে, তবে তদীয় উত্তরাধিকারীর কার্য্যে সে অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, দেশে শিক্ষা-বিস্তারে মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র যেরূপ দান করিয়াছেন, সেরূপ আর কেহ করেন নাই। বিদেশী কর্ণেগী প্রভৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে এ দেশে শিক্ষাবিস্তারে দাতাদিগের মধ্যে মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্রই অগ্রণী। মহারাণী স্বর্ণময়ীর দানে যে বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, মহারাজার দানে সে বংশের যশ অক্ষয় হইয়াছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে যেসব অনুষ্ঠানে ও প্রতিষ্ঠানে দেশে শিক্ষাবিস্তার সাধিত হয়, সে সব অনুষ্ঠানে প্রয়োজন হইলেই মহারাজা মুক্তহস্তে সাহায্যদান করিয়াছেন।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠাব্যাপারেও মহারাজা দানে কার্পণ্য করেন না। আর প্রার্থী তাঁহার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে প্রত্যাবৃত্ত হয় না। ভোগবিলাসে তাঁহার বিরাগ ও তাঁহার বিনয় দেখিয়া লোক তাঁহাকে "রাজর্ষি" বলিয়া থাকে। মহারাণী স্বর্ণময়ী যে স্থলে বহরমপুর কলেজে বার্ষিক ২০ হাজার টাকা দিতেন, মহারাজা সেই স্থলে সেই কলেজে বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা প্রদান করিতেছেন। তদ্ভিন্ন তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর পুণ্যনামে কলিকাতায় একটি ছাত্রাবাসসম্বলিত প্রথম শ্রেণীর কলেজপ্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক অর্থ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। নানা কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়কর্তৃক গৃহীত না হওয়ায় এ পর্য্যন্ত সে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। শৈশবাবধি তিনি নানারূপ দুর্ঘটনার পীড়ন সহ্য করিয়াছেন। সেই সকল দুর্ঘটনার অনলে তাঁহার চরিত্রের শ্যামিকা দগ্ধ হইয়া তাঁহার বিশুদ্ধ স্বর্ণাংশই আজ বিদ্যমান রহিয়াছে। মহারাজার বয়স যখন দুই বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার মাতা রাজকুমারী গোবিন্দসুন্দরীর মৃত্যু হয়। ৭ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও ১১ বৎসরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এরূপ অবস্থায় অভিভাবকশূন্য হইয়া বালকের পক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়া বিস্ময়কর নহে। কিন্তু মহারাজার তাহা হয় নাই। আবার শারীরিক পীড়ায় তাঁহার পক্ষে বিদ্যালয়ে পাঠও অসম্ভব হয়। চিকিৎসায় ও স্থানপরিবর্ত্তনে স্বাস্থ্য সঞ্চয় করিয়া তিনি গৃহে অধ্যয়ন করিয়া জগতের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রবেশদ্বার মুক্ত করেন। বোধ হয়, বাল্যকালে প্রতিকূল অবস্থা-বিপাকে অধ্যয়নবিঘ্নে তিনি যে মর্ম্মবেদনা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহাই স্মরণ করিয়া মহারাজা দেশে শিক্ষার অভাব দূর করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান করিতেছেন। তাঁহার সেই দান ভাগীরথীর পূতধারার মত সমগ্র দেশের কল্যাণসাধন করিতেছে। সেই ধারা প্রবাহিত করিবার গৌরব—মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরকার প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, মহারাণী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারীকে "মহারাজা" উপাধি প্রদান করিবেন। তদনুসারে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মে তারিখে তিনি "মহারাজা" উপাধিলাভ করেন।

সম্পত্তিলাভ করিয়াই তিনি দেশের সকল জনহিতকর অনুষ্ঠানে অর্থদান করিতে আরম্ভ করেন। এক বহরমপুর কলেজেই তিনি বৎসরে ৬০ হাজার টাকা ব্যয় করেন। তিনি সে কলেজ স্থায়ী করিবার জন্য আবশ্যক ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন,—কাশিমবাজার-রাজের সম্পত্তি হইতে সে ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে। তাঁহার চেষ্টায় কলেজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কলেজে ছাত্রসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে—বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে বিদ্যার্থীরা বিদ্যালাভাশায় বহরমপুরে সমাগত হইতে থাকে। সুতরাং কলেজগৃহের প্রসারসাধন প্রয়োজন হয়। মহারাজা নিজব্যয়ে তাহা করিয়া দেন। তাহার পর কলেজের স্কুলের জন্য স্বতন্ত্র গৃহনির্ম্মাণ প্রয়োজন হইলে তিনি সরকারকর্ত্তৃক কলেজ-কমিটিকে প্রদত্ত ভূখণ্ডে এক প্রাসাদোপম গৃহনির্ম্মাণ করাইয়াছেন—তাহাতে মহারাজার প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় পড়িয়াছে। তিনি কাপ্তেন পেটাভেলের নেতৃত্বে কলিকাতায় একটি সাধারণ ও কারীগরী-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং কলিকাতায় ছাত্রাবাসসম্বলিত "স্বর্ণময়ী-কলেজ"-প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে একটি বৃহৎ কারীগরী-কলেজপ্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতেছেন। তাঁহার পৈত্রিক বাসস্থান মাথরাণেও তিনি একটি ছাত্রাবাসসম্বলিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহার জন্য তিনি ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহার সম্পত্তির নানাস্থানে—শ্রীক্রুপুরে, ইথোড়ায়, জামগ্রামে, সৈদাবাদে ও উলীপুরে তিনি বহুব্যয়ে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই সকল বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রজাদিগের পুত্রগণ সামান্য বেতনে উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। মহারাজার কৃপায় বৎসর বৎসর শত শত ছাত্র বিদ্যার্জ্জন করিয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভের যোগ্যতালাভ করে। তিনি সংস্কৃত কলেজের ৫০ জন ছাত্রের বেতন প্রদান করিয়া থাকেন এবং বৎসর বৎসর পরীক্ষার্থীদিগের ফির জন্য ন্যূনাধিক ২ হাজার টাকা দিয়া থাকেন। বহরমপুরে, মাথরাণে ও কলিকাতায় তিনি শতাধিক ছাত্রকে আহার ও আশ্রয় দিয়া থাকেন।

দেশে কৃষি প্রভৃতি বিবিধ শিল্প-ব্যবসার বিস্তারবিষয়ে মহারাজার বিশেষ আগ্রহ আছে। তিনি নিজব্যয়ে যুবকদিগকে আমেরিকা, অষ্ট্রীয়া ও জাপান হইতে পণ্যোৎপাদক শিল্পে শিক্ষিত করিয়া আনিয়াছেন। বৎসর বৎসর প্রধানতঃ তাঁহারই ব্যয়ে বহরমপুরে তাঁহার বাগ্‌ডেটিয়া বাগানে কৃষি ও শিল্পপ্রদর্শনী হইয়া থাকে। তিনি স্বয়ংও বিবিধ কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুর ও তদীয় ভ্রাতার সহযোগে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কারখানার জন্য তিনি এক জন যুবককে জাপান হইতে শিক্ষিত করিয়া আনাইয়াছিলেন। তাহাতেও ফল আশানুরূপ না হওয়ায় জাপান হইতে মিস্ত্রী আনাইয়া এ দেশে লোককে শিখান হইয়াছে। তিনি বহরমপুর কাদাইয়ে চামড়া পরিষ্কার করিবার একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহা যৌথকারবারে পরিণত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাঁতের কাপড়ের কারখানাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তিনি বহু অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য:—ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞান সমিতি, জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ, বঙ্গীয় কারীগরী বিদ্যালয়, মূক ও বধির বিদ্যালয়, অন্ধ বিদ্যালয়, কলিকাতায় ও বহরমপুরে

মহাকালী পাঠশালা, মহুলা রামকৃষ্ণ অনাথাশ্রম, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে মহারাজার দান চিরস্মরণীয়। পরাবসথী-পরিষদের মন্দিরনির্ম্মাণার্থ তিনিই ভূমি দান করেন। তাহার পর আবার "রমেশ ভবন" নামক পুরাবস্তু গৃহের প্রতিষ্ঠার জন্য আবশ্যক ভূমি দান করিয়াছেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের এই রাজোচিত দান ব্যতীত পরিষদ্ স্থায়ী হইতে পারিত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

তাঁহার সাহিত্যানুরাগের নানা পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অর্থসাহায্যে যে বহু গ্রন্থকার পুস্তক প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ডাক্তার শ্রীযুত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁহার A History of Indian Shipping নামক গ্রন্থের ভূমিকায় মহারাজার নিকট কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ সাহায্য তিনি অনেক গ্রন্থকারকেই দান করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুত রাধাবিহারী সাংখ্যতীর্থ তাঁহারই সাহায্যে নির্ভর করিয়া বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করিতেছেন। আর শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহারই আশ্রয়ে পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাস-সঙ্কলন করিতে ব্যাপৃত আছেন। মহারাজার অর্থসাহায্যে 'উপাসনা' নামক মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন আজ বঙ্গদেশে সর্ব্বত্র সম্মানিত, মহারাজার চেষ্টায় কাশিমবাজারেই তাহার প্রথম অধিবেশন হইয়াছিল। সে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের কথা। যত দিন এই সম্মিলন থাকিবে, তত দিন তাহার সঙ্গে মহারাজার নাম বিজড়িত রহিবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও মহারাজার দানে বঞ্চিত হয় নাই। আবার সে দিন তিনি রঙ্গপুর কলেজে রাজোচিত দান করিয়াছেন। তিনি বৎসরে শিক্ষাবিস্তারজন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন।

বেলগেছিয়া অ্যালবার্ট ভিক্টর হাসপাতালে মহারাজা ১৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিনি কাশিমবাজারে কাৰ্জন দাতব্য হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং উলাপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ীর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন। বহরমপুরে জলের কল প্রতিষ্ঠায় তিনি মহারাণী স্বর্ণময়ীর আরব্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন। লেডী ডাফারিণ জেনানা হাসপাতালে তাঁহার দানও উল্লেখযোগ্য।

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের অসাধারণ অনুরাগ। প্রতি বৎসর তিনি বহুব্যয়ে বৈষ্ণব-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক একবার এক এক কেন্দ্রে—নবদ্বীপে, শান্তিপুরে, খড়দহে সম্মিলন হয়—কীর্ত্তনে ও ব্যাখ্যায় লোক হরিনামামৃত পান করিয়া ধন্য হয় এবং মহারাজাকে আশীর্ব্বাদ করে।

মহারাজা তাঁহার অনেক বন্ধুর ঋণভারগ্রস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করিয়া সে সকলের সুব্যবস্থাসাধন-চেষ্টা করিয়া থাকেন। তিনি আপনি সে সব সম্পত্তির ঋণ-শোধ করিয়া দিয়া তাঁহাদের উন্নতিসাধনের উপায় বিধান করেন। সব কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হয়, He is not an individual, but an institution.

মহারাজা দেশের কল্যাণকর কোন কার্য্যেই অমনোযোগী নহেন। তিনি ১০ বৎসরেরও অধিককাল বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান্ ছিলেন; এক্ষণে ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যে সর্ব্বদা বহরমপুরে থাকিতে পারেন না বলিয়া সে পদ ত্যাগ করিয়াছেন। British Indian Association ও Bengal Landholders' Association জমীদার সভাদ্বয়ে, Bengal National Chamber of Commerce and Murshidabad Association প্রভৃতি সভায় তিনি সদস্যদিগের অগ্রণী হইয়া অনেক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করিয়া দিয়াছেন। জমীদার সভা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলে যোগ্যতম প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া তাঁহাকেই সদস্য নির্ব্বাচিত করেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালার জমীদারদিগের প্রতিনিধিরূপে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে তিনি পরলোকগতা লেডী হার্ডিঞ্জের প্রবর্ত্তিত মহিলাদিগের জন্য চিকিৎসাগার ও হাসপাতালে ৫ হাজার টাকা প্রদান করেন। তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইলে বাঙ্গালার জমীদারগণ তাঁহাকেই পুনরায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। এবার আর কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতেও সাহস করেন নাই।

নানা শিল্পপ্রতিষ্ঠায় সহায় হইয়া তিনি এ দেশের শিল্প-সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে সরকার এ দেশে রেশমশিল্পের উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণ-জন্য যে সমিতি গঠিত করেন, মহারাজা তাহার সদস্য ছিলেন। এবার তিনি শিল্প-কমিশনে সাক্ষ্যে অর্জ্জিত অভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সরকার তাঁহাকে K. C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। সরকার এই উপাধি দিয়া তাঁহার নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্য তাঁহাকে সম্মানদান করিয়াছেন।

মহারাজার কর্ম্মজীবনের বৈচিত্র্য-বিষয় চিন্তা করিলে সত্য সত্যই বিস্মিত হইতে হয় এবং প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় হৃদয় অবনত হইয়া পড়ে। সুদূর মফঃস্বলে লোক তাঁহাকে আদর করিয়া আহ্বান করিলে—প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটনে বা স্কুল-প্রতিষ্ঠাকার্য্যে—তিনি কখনই সে আহ্বান অবহেলা করেন নাই; পরন্তু আশুতোষের মত শ্রদ্ধায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্রকে বিনয়ের অবতার বলিলেও

অত্যুক্তি করা হয় না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি যেরূপ বিলাসবিরাগের আদর্শ দেখাইয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ যখন মহারাজাকে সম্বর্দ্ধিত করেন, তখন সেই সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার ডাক্তার শ্রীযুত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় বলিয়াছিলেন, সিমলায় মহারাজাকে দেখিয়াই তিনি তাঁহার গুণানুরক্ত হইয়াছেন। কর্ম্মচারিগণে পরিবৃত মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি "মহারাজা কে" সহজে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। মহারাজার বেশে ও ব্যবহারে বৈশিষ্ট্যের পরিচয়মাত্র ছিল না; কর্ম্মচারীরা পত্র লিখিতেছিলেন, মহারাজা সহি করিয়া স্বয়ং সেগুলি লেফাপায় ভরিয়া দিতেছিলেন। এরূপ সারল্য কেবল বাঙ্গালায় কেন—সকল দেশেই ধনকুবেরদিগের মধ্যে দুর্লভ।

লোকসেবায় মহারাজার পরম আনন্দ। যাঁহারা বৈষ্ণব-সম্মিলনে শোভাযাত্রায় নগ্নপদ মহারাজাকে নগরকীর্ত্তনে যাইতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার বিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণসম্মিলনের পর তিনি ব্রাহ্মণদিগকে প্রাসাদে লইয়া স্বহস্তে তাঁহাদিগের চরণ ধৌত করিয়া দিয়াছিলেন। আজিকার দিনে এরূপ ব্যবহার কি কোথাও দৃষ্ট হয়? কিন্তু কেবল নিজগৃহেই নহে—পরন্তু বন্ধুগৃহে, এমন কি সভাসমিতিতেও সর্ব্বত্র মহারাজা লোকসেবার ভার লইয়া সে কার্য্যে পরম আনন্দ অনুভব করেন। আমাদের মনে আছে, কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশনে সাহিত্যশাখার অধিবেশনে সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন কবিসম্রাট্ মহাশয়ের আগমনে বিলম্ব ঘটিলে মহারাজাই কিছুক্ষণের জন্য সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিবার সময় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বলিয়াছিলেন, বিলাতের যুবরাজের "মটো"—I serve all—আমি সকলের সেবা করি; মহারাজার সম্বন্ধেও বলা যায়, লোকসেবাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের আদর্শ বঙ্গে গৃহে গৃহে অনুসৃত হউক।

তাঁহার উৎসাহ আন্তরিকতার উৎস হইতে উৎসারিত হয় বলিয়া তাহা কখন ক্ষীণ হয় না। তিনি সকল সৎকার্য্যেই অসাধারণ উৎসাহের পরিচয় দিয়া থাকেন।

শোকানলে মহারাজার মহত্বের পরীক্ষা হইয়াছে। তিনি জীবনে অনেক শোক পাইয়াছেন। তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি বৃন্দাবনে জ্যেষ্ঠপুত্র মহিমচন্দ্রকে হারাইয়াছিলেন। সেই দুর্ঘটনার স্মৃতি সুকবি কালিদাস রায়ের কবিতায় রক্ষিত হইয়াছে—

"সে দিন মাধবীনিশা; সপ্তবিংশ দোল পৌর্ণমাসীর স্বপন,
মাধবের অঙ্গে অঙ্গে মিলাইল গোবর্দ্ধনে ফাগের মতন।
মিতালি করিল হেথা রাধাপদরেণু মাঝে
তার পুণ্যধূলি—
এখনো ধরিয়া আছে দ্যুলোক রাজ্যের পথে
শ্যামের অঙ্গুলি।

* *

হৃদয়-সাগর মথে দেবাসুর-মহাদ্বন্দ্বে জয়ী দেবগণ
মোহন মহিমচন্দ্রে মধুর সুধার লাগি করিল হরণ।
জনক মণীন্দ্রকণ্ঠে জ্বলিতে লাগিল চির
শেষ-হলাহল;
মাতা কাশীশ্বরী-বুকে ইন্দুহারা শোকসিন্ধু
করে টলটল।"

যে দিন গোবর্দ্ধনে প্রাণাধিক পুত্রকে হারাইয়া মহারাজা কাশিমবাজারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সে দিনও শোক ও স্মৃতি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার হৃদয়ের বেদনা তাঁহার ব্যবহারে আত্মপ্রকাশ করে নাই—তিনি বহ্নিগর্ভ আগ্নেয়গিরির মত আপনার দারুণ শোক সহ্য করিয়াছিলেন। তাহার পরও তাঁহাকে বহু শোক সহ্য করিতে হইয়াছে। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রও অকালে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য পারিবারিক দুর্ঘটনাও সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজা শোকে কাতর হয়েন নাই—মুহূর্ত্তের জন্যও শোকাবেগে আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হয়েন নাই। তিনি দেশের ও মানবের কল্যাণসাধনই আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি গীতার সেই উপদেশে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

তদনুসারে পবিত্র জীবন লোকসেবায় ব্যয় করিয়া তিনি আজ দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে বিগতস্পৃহ এবং বীতরাগভয়ক্রোধ হইয়া "স্থিতধীর্মুনি" পদবাচ্য হইয়াছেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ.।

জন্ম ও মৃত্যু।

[ভারতী শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ।]

বাতাস আসে আলোর দেশে
আপন ভুলে কি গান গেয়ে,
কি সুরে তার ঢালে অপার
সুধার ধারা সকল ছেয়ে।
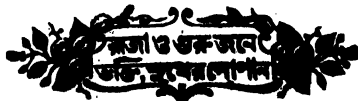
দম্‌কা হাওয়ায় নিব্‌লে আলো
সেও বুঝি তার লাগে ভালো।
সঙ্গহারা পাগলকরা
আলো আঁধার কেউ না চায়,
যদিও হেসে আঁধারশেষে
আলো আরও দীপ্ত পায়॥

সুখের রেখা ব'লেও আঁকা
উজ্জল তত নাহিক হ'ত,
দুঃখ যদি শেষ অবধি
হ'ত না তার পার্শ্বে নত।

বুঝ্‌ত' না কেউ সুখের তার
হাসি কান্নার সমান ভার
ব্যথার শেষে হর্ষ এসে
জ্বালে পুনঃ প্রীতির আলো,
উজ্জ্বলতা দেখ্‌তে, ব্যথা
তাই বলে কে বাসে ভালো?

ভাঙ্‌তে ভবে চাইত' সবে
গড়্‌তে যদি পারত হেলে,
ভাঙ্‌ত মোহে নবীন স্নেহে
সাঁঝ সকালে সকল ফেলে।

গড়্‌র বলে ভাঙ্‌তে চে'ত
ভাঙ্গার আমোদ দ্বিগুণ পে'ত।
ভগ্ন ভবে নূতন হবে
পূর্ণ-প্রাণে বইবে প্রীতি,
যত প্রবীণ করতে নবীন
তাই ব'লে কে ভাঙ্‌বে নিতি?

জন্মশেষে মৃত্যু আসে
বিছায়ে নিজ আঁচলখানি—
শেষের দিনে আপন চিনে
শান্তি কোলে লয় সে টানি'।

জনম সকল বেদন টুটি'
মরণপারে ওঠে ফুটি'
সকল ঢাকা হরষ আঁকা
নবজীবন পুলক-ভারে—
এগিয়ে এলে পুরাণ ফেলে
তাই বলে কে—চায় সে তারে?

জানত' সবে আসছে ভবে
ভবিষ্যৎ মধুর বেশে
অঙ্কে তার কিসের ভার
সুখ কাঁদে কি দুঃখ হাসে।

তা' হ'লে তার প্রীতির ভরে
সকল আবেগ ছিন্ন করে
স্বাগত গানে উদার তানে
বরিয়া নিত উদাস-বুকে
"মৃত্যু তরে জীবন ওরে"
বিজয়-গাথা গাইত সুখে॥

কিন্তু তা' ত দেখ্‌ছি না ত
দেখ্‌ছি শুধু অনিশ্চয়,
যাচ্ছে যেটি পায় না সেটি
হাহাকার যে হৃদয়ময়।

ব্যাথার বাণী করুণ সুর
ভরাল তার জীবন-পুর
জ্যোৎস্নামাখা স্মৃতির লেখা
জনমে তাই পুণ্য আলো,—
জীবনপারে ঘোর আঁধারে
মরণ বুঝি তাইতে কালো॥

রঙ্গপুর জেলার কুণ্ডির ভূম্যধিকারী

রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর।

বংশপরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত।

১৬০৪ খৃষ্টাব্দে অম্বরাধিপতি রাজা মানসিংহ বঙ্গবিজয় করিয়া আসাম অভিমুখে অভিযান করেন। সেই সময় মুর্শিদাবাদ হইতে উত্তরবঙ্গের পথে অগ্রসর হইবার কালে তাঁহার জনৈক কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হয়। বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন অঙ্গারপুর চরখিয়া নামক একখানি পল্লীগ্রাম আছে; তথায় শঙ্কর মুখোপাধ্যায় নামক একজন দরিদ্র সংকুলীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ফুলিয়া মেলের স্বভাবকুলীন ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ দেখিয়া, রাজ-অনুচরগণ তাঁহাকে কর্ম্মচারী নির্ব্বাচন করিয়া মহারাজ মানসিংহসমীপে আনয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নানা সদ্‌গুণ দেখিয়া মানসিংহ তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রংপুর গমন করিয়াছিলেন। মোগল-বিজয়বৈজয়ন্তী উত্তরবঙ্গে সর্ব্বাগ্রে কুণ্ডিতেই উড্ডীন হয়। তৎকালে কুণ্ডি পরগনা সরকার ঘোড়াঘাটের অধীন 'সূর্য্যাকুণ্ডি' নামে খ্যাত ছিল। রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের আদেশে যে সময় উত্তরবঙ্গ হইতে রাজধানী দিল্লী নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন কুণ্ডি পরগণার শাসনভার তাঁহার প্রিয় কর্ম্মচারী কেশবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। পরে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কেশবচন্দ্র দিল্লী গমন করেন। তথায় সম্রাট্‌সমীপে প্রভূত পেশ্‌কার ও অগ্রিম দুই বৎসরের কর প্রদান করিয়া কুণ্ডি পরগণার জমিদারীস্বত্বের সনন্দ এবং "রায় চৌধুরী" উপাধিসহ খেলাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্ত্তার নিকটেও বিশেষ সম্মানলাভ করেন। কেশবচন্দ্র মৃত্যুকালে স্বীয় জমিদারী তাঁহার আটটি পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যান। উক্ত আট পুত্রমধ্যে সর্ব্ব-জ্যেষ্ঠপুত্র ৺রামদেব রায় চৌধুরী সমুদায় সম্পত্তির চারি আনা অংশ প্রাপ্ত হন। শ্রীযুক্ত রায় মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর উক্ত ৺রামদেব রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশধর। এক্ষণে এই প্রাচীন জমিদারবংশ বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছেন। এই পর্য্যায় ব্যতীত অন্যান্য সকল সরিকেরই পোষ্য-পুত্রদ্বারা বংশরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সপ্তঃপুষ্করিণী গ্রামে ইঁহাদের আদি নিবাস। এই গ্রামের নামে একটি সুবৃহৎ সরোবর আছে। সম্ভবতঃ রাজা মানসিংহ অতি অল্পসময়মধ্যে এই পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। সপ্তঃপুষ্করিণীর পশ্চিমদিকের ঘাটের সন্নিকট রাজা মানসিংহের স্থাপিত একটি ৺শিবলিঙ্গ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। কুণ্ডির এই প্রাচীন ভূম্যধিকারী-বংশে সদ্‌গুণশালী বহু ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যত্নে ও চেষ্টায় রংপুর জেলার বহুতর উন্নতি সাধিত হয়। রংপুরের সর্ব্বপ্রথম জমিদারসভা, দাতব্য চিকিৎসালয়, ইংরাজী বিদ্যালয়, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, মুদ্রাযন্ত্র-স্থাপন, সংবাদপত্রপ্রচার, দেবালয়নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য এই বংশের ধুরন্ধরগণের চেষ্টার কীর্ত্তি। কুণ্ডির জমিদারগণ পরোপকার, স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, রাজভক্তি ও সদাশয়তার জন্য চির-প্রসিদ্ধ; বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় ইঁহারা পুরুষানুক্রমে

দীক্ষিত। ৺গঙ্গাধর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইনি সংসারে প্রবেশের পক্ষেই বহু দৈববিড়ম্বনায় বিশেষরূপ মানসিক অশান্তিভোগ করিয়াছিলেন। ধৈর্য্যাবলম্বনদ্বারা বিঁধ-বিড়ম্বনা হইতে ত্রাণ পাইয়া ইনি পূর্ব্বপুরুষগণের যশ ও কীর্ত্তিরক্ষার জন্য সতত যত্নবান্ আছেন। ইঁহার চেষ্টায় ও যত্নে স্থানীয় বহু বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং হইতেছে। বিশেষ যোগ্যতার সহিত পঞ্চদশ বৎসরকাল যাবৎ ইনি অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটপদে কার্য্য করিতেছেন এবং গত ৪ বৎসর যাবৎ রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রতি বাৎসরিক কার্য্য সমালোচনার রিপোর্টে ইঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদত্ত হইতেছে। ইনি লণ্ডন রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক জন সভ্য। বঙ্গসাহিত্য ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। দ্বিজ কমললোচন প্রণীত চণ্ডিকা-বিজয় গ্রন্থ রংপুর-সাহিত্য-পরিষদ হইতে ইঁহার ব্যয়ে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানীয় চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রভৃতিরও ইনি সম্পাদকতা অতি দক্ষতার সহিত করিতেছেন। ঐ সকল জনহিতকর এবং অন্যান্য সকল সৎকার্য্যেই ইঁহার বিশেষ উৎসাহ এবং অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইং ১৯১১, ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক-দরবারে গবর্ণমেণ্ট ইঁহাকে দরবার-মেডেল এবং একখানি "সার্টিফিকেট্ অব্ অনার" প্রদান করেন। তৎপরে ইঁহার গুণগ্রাহিতার জন্য গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন ভারত-সম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। কুণ্ডি চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী ইঁহার উদ্যোগে ও যত্নে স্থাপিত হইয়া বহু দরিদ্রের জীবনরক্ষা করিতেছে।

রংপুর পাব্লিক লাইব্রেরীর উন্নতিকল্পে ইনি বহু অর্থ দান করিতেছেন ও রংপুর কারমাইকেল কলেজ স্থাপন-জন্য যে বিস্তৃত ভূমিখণ্ড গ্রহণ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ইঁহার অংশের যে সমুদায় জমি পড়িয়াছে, তাহা ইনি দান করিয়াছেন। ইঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা ও অন্যান্য অনেক দ্রব্য বিশেষ দর্শনীয়। ঐ প্রকার প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রহ এক ভারতীয় চিত্রশালা ছাড়া অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। রায় বাহাদুরের স্বধর্ম্মনিষ্ঠা, মহানুভবতা, জনহিতৈষণা ও অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিশেষ প্রশংসনীয়। ইঁহার একটি পুত্রসন্তান জন্মিয়াছে। রায় বাহাদুরের বয়স অধিক নহে। এই অল্প বয়সেই ইনি যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ভগবদ্‌কৃপায় সুস্থদেহে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ইনি উত্তরোত্তর আরও যশস্বী হউন ও রাজদ্বারে অধিকতর উচ্চসম্মান লাভ করুন, এই প্রার্থনা।

তন্ত্রে দীক্ষা ও গুরু-বিচার।

[ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ লিখিত।]

যেরূপ বর্ণপরিচয় ব্যতীত গ্রন্থপাঠে অধিকার জন্মে না, তদ্রূপ দীক্ষা ব্যতীত ঈশ্বরসাধনে অধিকার জন্মে না। তন্ত্রে দীক্ষাশব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে :—

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ।
ততো দীক্ষেতি সা প্রোক্তা শৃণু দেবি প্রিয়ম্বদে॥"

অতএব শাস্ত্রালোচনাদ্বারা নিজে নিজে উদ্ধার হইবার চেষ্টায় বৃথা সময়ক্ষেপণ না করিয়া সাধনেচ্ছা জন্মিলেই সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হইলে তিনি যথাশাস্ত্র দীক্ষিত করিয়া শিষ্যের প্রকৃতি, আচার, ব্যবহার, ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষা-দ্বারা তাহার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ বিবেচনা করেন, তাহাই আচরণ করিবার উপদেশ দেন। গুরুর উপদেশানুসারে মন্ত্রজপ, পূজা, হোম প্রভৃতি আচরিত হইলে দেবতার প্রসন্নতা ও অন্তঃকরণের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়। গুরুর কৃপাই এই ভববন্ধন মুক্তির একমাত্র উপায়।

"গুরুঃ কর্ত্তা গুরুর্হর্ত্তা গুরুঃ পাতা মহীতলে।
গুরু সন্তোষমাত্রেণ তুষ্টাঃ স্যুঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥"

(গুরুতন্ত্র।)

তাই মহাত্মা তুলসীদাস বলিয়াছেন :—

"গুরু না মানে করে ভজন্‌কী আশ।
বারিকা বুন্দ্‌ পাকাড়্‌কে চড়্‌নে চায় আকাশ॥"

গুরু না মানিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করিলে জলবিন্দু ধরিয়া আকাশে উঠিবার চেষ্টা করার ন্যায় উহা নিষ্ফল হয়।

কুলার্ণবতন্ত্রের চতুর্দ্দশ উল্লাসে মহাদেব বলিয়াছেন :—

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকা ক্রিয়াঃ।
ন ফলন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্ত বীজবৎ॥
দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্‌গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥"

অদীক্ষিত জনগণের জপপূজাদি ক্রিয়াসকল শিলা-ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফল হয়। হে দেবি! দীক্ষা-হীন ব্যক্তির সিদ্ধি বা সদ্‌গতি হয় না। অতএব যত্নের সহিত গুরুকর্ত্তৃক দীক্ষিত হইবে।

নীলতন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে শিব ভগবতীকে দীক্ষার বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা পাঠেও দেখা যায় যে, দীক্ষা ব্যতীত তন্ত্রে-মন্ত্রে অধিকার জন্মে না। দীক্ষাই সমুদয় 'সাধনার মূল'; দীক্ষাই পরম তপস্যা। যে কোন আশ্রমে থাক না কেন, দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকিতেই হইবে। দীক্ষাগ্রহণমাত্র কোটি জন্মার্জ্জিত জ্ঞানাজ্ঞানকৃত পাপসকল ধ্বস্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণ অপহরণ প্রভৃতি মহাপাতক সকল দীক্ষাগ্রহণে নাশ হইয়া থাকে। অদীক্ষিত অবস্থায় মরণে রৌরব নামক নরকভোগ হয়। যে নরাধম পুস্তকদৃষ্টে মন্ত্রগ্রহণ করে, সহস্র মন্বন্তর পর্য্যন্ত তাহার নিষ্কৃতি নাই। সদ্‌গুরুর মুখ হইতেই এই পাপহারিণী মহাবিদ্যা লাভ করাই বিধি।

এক্ষণে সদ্‌গুরুর লক্ষণ কি, তাহা বলা যাইতেছে।

"সর্ব্বশাস্ত্রপরো দক্ষঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ সদা।
সুবচাঃ সুন্দরঃ স্বাঙ্গঃ কুলীনঃ শুভদর্শনঃ॥
জিতেন্দ্রিয়ঃ সত্যবাদী ব্রাহ্মণঃ শান্তমানসঃ।
পিতৃমাতৃহিতে যুক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মপরায়ণঃ॥
আশ্রমী দেশস্থায়ী চ গুরুরেবং বিধীয়তে।"

(বিশ্বসারতন্ত্র।)

বামাচ্চনচন্দ্রিকায়—

"শান্তো দান্তঃ কুলীনশ্চ বিনীতঃ শুদ্ধবেশবান্।
শুদ্ধাচারঃ সুপ্রতিষ্ঠঃ শুচির্দক্ষঃ সুবুদ্ধিমান্॥
আশ্রমী ধ্যাননিষ্ঠশ্চ মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

কামাখ্যাতন্ত্রেও শিব বলিয়াছেন,—"যিনি শান্ত, দান্ত এবং কুলীন, যিনি পঞ্চতত্ত্বের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, যিনি সিদ্ধ বলিয়া খ্যাত, যিনি দৈবশক্তির দ্বারা চমৎকার জন্মাইতে পারেন, যিনি সাধুসম্মত মনোহর বাক্য বলিয়া থাকেন, যিনি মন্ত্রতন্ত্রবিশারদ, যিনি শিষ্যের হিতের জন্য সর্ব্বদা যত্ন করেন, যিনি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, যিনি পরমার্থ বিষয়ই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং গুরুপাদপদ্মে যাঁহার সর্ব্বদা ভক্তি, হে প্রিয়ে! তিনিই সদ্‌গুরু পদবাচ্য। অক্ষম-গুরু ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন গুরুর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিবে।" শিষ্য গুরুকে পরীক্ষা করিয়া গুরু করিবে এবং গুরুও শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া শিষ্য করিবেন।

"গুরুতা শিষ্যতা বাপি তয়োর্বৎসর বাসতঃ।"

(তন্ত্রসার।)

গুরু-শিষ্য এক বৎসর কাল একত্র বাস ও পরীক্ষা করিয়া পরে দীক্ষাদান বা গ্রহণ করিবেন।

"জ্ঞানেন ক্রিয়য়া বাপি গুরুঃ শিষ্যং পরীক্ষয়েৎ।
সংবৎসরং তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা প্রযত্নতঃ" ॥

(কুলার্ণবতন্ত্র।)

জ্ঞানের দ্বারা বা ক্রিয়াদ্বারা গুরু এক বৎসর, অভাবে ছয় মাস এবং তদভাবে অন্ততঃ তিন মাস কাল শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া তবে দীক্ষা প্রদান করিবেন।

"শিষ্যোঽপি লক্ষণৈরেতৈঃ কুর্য্যাদ্‌গুরু পরীক্ষণং।"

শিষ্যও ঐ সকল লক্ষণদ্বারা গুরু-পরীক্ষা করিবে।

ধনেচ্ছা, ভয় বা লোভবশতঃ অযোগ্য ব্যক্তিকে দীক্ষা প্রদান করিলে গুরু শাপগ্রস্ত হন এবং তাহার কৃতকার্য্য সকল নিষ্ফল হয়। এতদ্‌সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিতেছেন, দেখুন :—

"ধনেচ্ছা ভয়লোভাদ্যৈরযোগ্যং যদি দীক্ষয়েৎ।
দেবতা শাপমাপ্নোতি কৃতঞ্চ নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

(কুলার্ণবতন্ত্র।)

এইবার বর্জ্জনীয় গুরুলক্ষণ বলা যাইতেছে।

কুষ্ঠী, শ্বিত্রী, নেত্ররোগী, বামন, কুনখী, শ্যাবদণ্ড, অঙ্গহীন বা অধিকাঙ্গ, ক্ষয়রোগী, দুশ্চর্ম্মা, বধির, অন্ধ, পূতনাসিক, বৃদ্ধ, চিররোগী, কুব্জ, নপুংসক, বেদশাস্ত্রবিবর্জ্জিত, মূর্খ, শুষ্কভাষী, কুৎসিত, বৈদ্য, কামুক, ক্রুর, দম্ভ ও মাৎসর্য্য-যুক্ত, ব্যসনী, কৃপণ, খল, কুসঙ্গী, নাস্তিক, মহাপাতক-চিহ্নিত, সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-মন্ত্রজ্ঞানবর্জ্জিত, লোভী ও সংস্কার-রহিত ব্যক্তিগণ তন্ত্রে ত্যাজ্য গুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

"কঠিনঞ্চ রিপুঞ্চৈব সোদরং বৈরিপক্ষিণং।
মাতামহঞ্চ পিতরং যতিনং বনবাসিনং॥
বর্জ্জয়িত্বা চ শিষ্যেন্দ্রো দীক্ষাবিধিমুদাচরেৎ।
অন্যথা তদ্বিরোধেন কায়নাশো ভবেদ্‌ধ্রুবং॥"

(তন্ত্রসার।)

কঠিন, রিপু, সোদর, শত্রুপক্ষ, মাতামহ, পিতা, সন্ন্যাসী এবং বনবাসী, ইহাদিগকেও ত্যাগ করিয়া অন্যত্র দীক্ষাগ্রহণ করিবে, নতুবা নিশ্চয় প্রাণনাশ হইবে।

উপরে যে সকল কথা বলা হইল—তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, গুরুকরণের পূর্ব্বে—যাঁহাকে গুরু করিতে হইবে, তিনি বর্জ্জনীয় গুরুলক্ষণাক্রান্ত, কি শাস্ত্রসঙ্গত গুরুকরণের উপযুক্ত, তাহা দেখিয়া গুরুনির্ব্বাচন করা উচিত। আমাদের দেশে প্রথা আছে, যে পিতা বা পিতামহ যে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাকে বা তাঁহাদের বংশের কোন লোককে গুরু করিতেই হইবে,—ইহার কোন যুক্তি বা শাস্ত্রীয় বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"গুরৌ মানুষবুদ্ধিস্তু মন্ত্রে চাক্ষরভাবনাং।
প্রতিমাসু শিলাবুদ্ধিং কুর্ব্বাণো নরকং ব্রজেৎ॥"

এমত অবস্থায় যাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া বোধ আছে, যাঁহাকে দেখিলে ভক্তির উদয় হয় না, প্রত্যুত অপ-কর্ম্মকারী হইলে তাঁহার সেই অপকর্ম্ম মনে হইয়া তাঁহার প্রতি অভক্তি জন্মে, তিনি পৈতৃক গুরুবংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করা কতদূর সমীচীন, তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন। গুরু করিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রতি ভক্তি নাই, ইহা নরকগমনের হেতু মাত্র। যদি অনুপযুক্ত হইলেও পৈতৃক-গুরুবংশজাত ব্যক্তিকেই গুরু করা শিবের অভিপ্রেত হইত, তবে সদ্‌গুরুর লক্ষণ, বর্জ্জনীয় গুরুর লক্ষণ এবং গুরু ও শিষ্যের পরস্পর পরীক্ষাবিধি ইত্যাদি ব্যবস্থা করিবার কি প্রয়োজন ছিল? পৈতৃক-গুরুবংশে গুরুকরণের উপযুক্ত ভাল লোক থাকিলে অবশ্য তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করা উচিত, কিন্তু যদি ঐ বংশে শাস্ত্রসঙ্গত গুরুকরণের উপযুক্ত লোক না থাকেন, তবে যেখানেই সদ্‌গুরু পাওয়া যায়, সেইখানেই গুরুকরণ করিতে শাস্ত্রে কোন নিষেধ দেখা যায় না। বরং মহাদেব স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, জ্ঞানের জন্যই গুরুসেবার আবশ্যক; অতএব যিনি জ্ঞানদানে অক্ষম, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানীগুরুর শরণাপন্ন হইবে। নিম্নে তন্ত্রের কথাগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

"সর্ব্বেষাং ভুবনে সত্যং জ্ঞানায় গুরুসেবনং।
জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নোতি তস্মাৎ জ্ঞানং পরাৎপরং॥
অতো যো জ্ঞানদানেঽপ্যক্ষমস্তং ত্যজেদ্‌গুরুং।
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সংত্যজতি প্রিয়ে॥
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ"।

(কামাখ্যাতন্ত্র।)

কামাখ্যাতন্ত্রের চতুর্থ পটলে শিব আরও বলিয়াছেন—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥"

মধুলুব্ধ ভ্রমর যেমন মধুর তল্লাসে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে গমন করিয়া থাকে, শিষ্যও তদ্রূপ মন্ত্রদাতা গুরু জ্ঞানদানে অক্ষম হইলে অন্য জ্ঞানীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে। তন্ত্রশাস্ত্রে বয়ঃকনিষ্ঠের নিকট দীক্ষা নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু "তস্মাদ্‌গুরোর্বংশজাতং বয়োঽল্পমপি পণ্ডিতং গুরুং কুর্য্যাত্তু দীক্ষায়ামবিচার্য্য গুরোঃ কুলং" অর্থাৎ গুরুবংশে যদি কেহ জ্ঞানী থাকেন, তবে তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবার কোন বাধা নাই, একথাও বলা হইয়াছে। ইহা দ্বারাও বেশ বুঝা যায় যে, গুরুকরণের জন্য জ্ঞানীগুরুই আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য।

গুরুতাব্যবসায়ীদিগকে বংশপরম্পরা গুরুকরণের শাস্ত্রীয় প্রমাণের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন—

১। "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎ সুতাদিষু।
গুরুবৎ পূজনং কার্য্যং গুরুবৎ তোষণাদিকং॥"

২। "গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্ত্বা ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ।"

৩। "গুরুত্যাগে ভবেন্মৃত্যুঃ মন্ত্রত্যাগে দরিদ্রতা।"

৪। "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতং।
অমার্গোস্থো মার্গস্থো গুরুরেব সদা গতি।"

৫। "পৈত্রং কুলগুরুং যস্তু ত্যজেদ্ বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকং।"

উপরি-উক্ত কথাগুলির দ্বারা পিতৃ-পিতামহের গুরু-বংশোদ্ভব অযোগ্য ব্যক্তিকেও গুরু করিতেই হইবে, এমত বুঝা যায় না।

প্রথমতঃ বিবেচনা করিতে হইবে, গুরু কাহাকে বলে এবং গুরুত্যাগ শব্দের অর্থ কি?

আমি গুরু শব্দের অর্থ যাহা দেখিয়াছি, তাহা যথাক্রমে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

১। "মন্ত্রদাতা গুরুঃ প্রোক্তো মন্ত্রোহি পরমো গুরুঃ।
পরাপর গুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠী গুরুরহং॥"

শিব ভগবতীকে বলিতেছেন যে, গুরুশব্দে মন্ত্রদাতা বুঝিতে হইবে। মন্ত্রকে পরমগুরু বলে। তুমি পরাপর-গুরু এবং পরমেষ্ঠী গুরু আমাকেই জানিবে।

২। "গুকারশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুকারস্তেজ উচ্যতে।
অজ্ঞানধ্বংসকং ব্রহ্ম গুরুরেব ন সংশয়ঃ।"

"গু" শব্দের অর্থ অন্ধকার, "রু" শব্দের অর্থ তেজঃ। অতএব অজ্ঞানরূপ অন্ধকারধ্বংসকারী গুরুই ব্রহ্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৩। "গুশব্দশ্চান্ধকারঃ স্যাদ্রুশব্দস্তন্নিরোধকঃ।
অন্ধকারনিরোধিত্বাৎ গুরুরিত্যভিধীয়তে॥"

"গু" শব্দে অন্ধকার, "রু" শব্দে তাহার নিরোধক অর্থাৎ তেজঃ পদার্থ। অতএব যিনি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করেন, তিনিই গুরু।

৪। "গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।
উকার শম্ভুরিত্যুক্ত স্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ॥"

"গ" শব্দে যিনি সিদ্ধিদান করেন, "র" শব্দে যিনি পাপনাশ করেন, "উ" শব্দে মহাদেব। এই তিন একত্রে গুরু শব্দ হইয়াছে।

এই অর্থসমূহের মধ্যে পিতা-পিতামহের গুরুবংশোদ্ভব ব্যক্তি গুরুশব্দবাচ্য, ইহা কোথায়ও দেখিতে পাই না।

"গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু" ইত্যাদি শব্দ বৈধকর্ম্মোপদেশ-মাত্র। গুরুকে যেভাবে প্রণাম, সম্মান ইত্যাদি করিবার ব্যবস্থা আছে, গুরুপুত্রপৌত্রাদিকেও সেইরূপ প্রণাম, সম্মান করিবার বিধি আছে। সুতরাং এই শ্লোকের দ্বারা পিতৃ-পিতামহের গুরুবংশোদ্ভব অথচ জ্ঞানদানে অক্ষম ব্যক্তিকে গুরু করিতেই হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

"গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্তা ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কোন ব্যক্তি দীক্ষিত হইবার পর সম্যক্-প্রকারে ক্রিয়াপদ্ধতির উপদেশ পাইবার পূর্ব্বে তাঁহার গুরুর দেহ নাশ হইলে ঐ সকল উপদেশের জন্য সেই ব্যক্তি গুরুসন্ততিকে গুরুরূপে আশ্রয় করত ঐ সকল অভাব পূরণ করিবে। তিনি অক্ষম হইলে যাঁহাদ্বারা সেই অভাব পূরণ হয়, তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"গুরুত্যাগে ভবেন্মৃত্যুঃ মন্ত্রত্যাগে দরিদ্রতা"—মন্ত্রগ্রহণের পর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ হয়। অতএব দীক্ষার পূর্ব্বে পিতৃ-পিতামহের গুরুবংশোদ্ভব ব্যক্তি গুরুকরণের অনুপযুক্ত বলিয়া বর্জ্জিত হইলে তাহাকে গুরুত্যাগ বলা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা—জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যের জন্য এমন কি দীক্ষা-গুরুও যদি জ্ঞানদানে অক্ষম হন, তবে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গুর্ব্বন্তরগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। "গুরুত্যাগে ভবেন্মৃত্যুঃ" ইহাও যে শিবের উক্তি, "মধুলুব্ধো যথাভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ, জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ"—ইহাও সেই শিবের বাক্য।

ব্রহ্মজ্ঞানই গুরুর সর্ব্বস্বধন। ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু বিদ্বানই হউন অথবা বিদ্যাশূন্যই হউন, তিনিই দেবতা। তিনি অমার্গস্থ হইলেও অর্থাৎ লোকাচারবিরুদ্ধ কোন কার্য্য করিলেও তাহা নিন্দনীয় নহে। তিনিই শিষ্যের একমাত্র গতি। ইহাই বোধ হয় "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতং" ইত্যাদি শ্লোকের তাৎপর্য্য। শিষ্যের গুরুভক্তি বৃদ্ধির জন্য এই কথা বৈধকর্ম্মোপদেশও হইতে পারে। মন্ত্রদাতা গুরুকে অমানুষ অর্থাৎ দেবতাভাবে ভক্তি ও পূজা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি গুরুকে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করে, সে নরকগামী হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেরূপ গুরুই হউন, তিনি শিষ্যের নিকট দেবতুল্য মান্য। পাছে কেহ গুরুকে অভক্তি করে, এই আশঙ্কায় মহাদেব বলিয়াছেন—গুরু যেরূপই হউন না কেন, অবিচলিত চিত্তে তাঁহাকে ভক্তি করা শিষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অতএব গুরু অবিদ্যই হউন আর সবিদ্যই হউন, তিনিই শিষ্যের দেবতা এবং তিনি মার্গস্থই হউন বা অমার্গস্থই হউন, তিনি শিষ্যের একমাত্র গতি বলায় বৈধকর্ম্মোপদেশ ব্যতীত পৈতৃক-গুরুবংশোদ্ভব ব্যক্তি বলিয়া মূর্খ অথবা গুরুকরণের অযোগ্য হইলেও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতেই হইবে, এমত বিবেচনা হয় না।

"পৈত্রং কুলগুরুং যস্তু"—ইত্যাদি শ্লোকটি দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় বটে যে, পৈতৃক-কুলগুরুত্যাগ করিয়া অন্য গুরুর

নিকট দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ। কিন্তু যখন তন্ত্রশাস্ত্রে গুরু-শিষ্যের লক্ষণ ও গুরু-শিষ্য পরস্পর পরীক্ষা করত দীক্ষা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যখন বর্জনীয় গুরুর লক্ষণসকল বলিয়া তদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের নিকট দীক্ষা নিষিদ্ধ, একথাও উক্ত হইয়াছে, যখন ব্রহ্মজ্ঞানই গুরু-করণের চরম উদ্দেশ্য, তখন উপরের লিখিত শ্লোকটি শিব-বাক্য কি কোন গুরুব্যবসায়ীর লেখা, তৎপ্রতি সন্দেহ হয়। যদি শিববাক্য বলিয়াও স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে, ইহা সাধারণ বিধি। সাধারণ অবস্থায় সাধারণ ও বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিধি পালনীয়। সাধারণ-বিধি অনুসারে পৈতৃক-গুরুবংশে দীক্ষিত হওয়াই উচিত। বিশেষ-বিধিদ্বারা বলা হইয়াছে যে, পৈতৃক-গুরুবংশে জ্ঞানদানে অক্ষম বা বর্জনীয় লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি থাকিলে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইবে না; তখন অন্যত্র জ্ঞানীগুরুর নিকটই দীক্ষিত হইবে। পৈতৃক-গুরুবংশে গুরুকরণের উপযুক্ত লোক না থাকিলেও বাধ্য হইয়া অজ্ঞানী ও অযোগ্য ব্যক্তিকেই গুরু করিতে হইবে, উক্ত শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্য হইলে অন্যান্য তন্ত্রের শিববাক্যে দোষস্পর্শ করে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাসে শিব বলিয়াছেন :—

"যথা যথা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা।
তদা তস্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে॥"

অর্থঃ—যে সময় যে লোক আমাকে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন, আমি তৎকালে তাঁহার উপকারের নিমিত্ত তাঁহার পক্ষে যাহা সঙ্গত, তাহাই বলিয়াছি।

ইহা দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক উপদেশ সাধারণ-ভাবে সকলের পক্ষে সমভাবে খাটে না। শিববাক্য সমুদয়ই সত্য, তবে পাত্র ও ক্ষেত্রবিবেচনায় গ্রহণ করিতে হইবে।

গুরুত্যাগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ আছে। আবার জ্ঞানলুব্ধ শিষ্যের জন্য দীক্ষাগুরু জ্ঞানদানে অক্ষম হইলে গুর্ব্বন্তরগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে গুরুত্যাগ হয় না। গুরুই ব্রহ্ম। তিনি কখনই ত্যাজ্য নহেন। তাঁহাকে পাই-বার জন্য মনুষ্যগুরুর আশ্রয় লইতে হয়। মনুষ্যগুরু সেই পরমগুরুর মন্ত্রবিশেষ। প্রতিমাতে দেবতার পূজার ন্যায়, মনুষ্যগুরুর পূজায় ভগবানের পূজা—মনুষ্যগুরুর সেবায় ভগ-বানের সেবা হইয়া থাকে। পরে সদ্‌গুরুর কৃপায় গুরুজ্ঞান হইলে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয়ই গুরুরূপে ভাসমান হয়। তখন সাধকের মনে—

"গুরুরেকঃ শিবঃ সাক্ষাৎ গুরু সর্ব্বার্থসাধকঃ।
গুরুরেব পরং তত্ত্বং সর্ব্বং গুরুময়ং জগৎ॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র।)

এই ভাবের উদয় হয়।

সাধারণ মনুষ্য গুরুকে প্রথম হইতে যে মহাত্মা সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন, যিনি গুরু-কথাই শাস্ত্র এবং গুরু-আদেশই সাধন বলিয়া অব্যভিচার-বুদ্ধিতে তাহা প্রতিপালন করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এত বিচার-আচার দেখিবার কিছুই প্রয়োজন হয় না। অব্যভিচার ভক্তি অতি উপাদেয়। গুরুর প্রতি অব্যভিচার ভক্তি হইলে ভক্তিযোগে সিদ্ধিও অতি নিকট হইয়া আসে।

একটি কথা আছে—

"তোম্ যায়সে রামকো ত্যায়সে তোম্‌কো রাম।"

অর্থাৎ তুমি রামকে যে ভাবে দর্শন করিয়া থাক, রামও তোমাকে সেই ভাবে দর্শন করিয়া থাকেন।

উপরে যে অব্যভিচার ভক্তির কথা বলা হইল, সে ভক্তি কয় জনের আছে? লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে সেরূপ ভক্ত এক আধ জন মিলে কিনা সন্দেহ। গুরুবিচারসম্বন্ধে তন্ত্র-শাস্ত্রে যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সন্দিগ্ধচিত্ত অথচ সাধনেচ্ছু ব্যক্তিদিগের জন্যই বিবেচনা করিতে হইবে। তাঁহাদের জন্যই শাস্ত্র ও যুক্তি।

গুরুবিচারসম্বন্ধে বহু তন্ত্রে বহু প্রকার উক্তি আছে। এই সামান্য প্রবন্ধে সে সকল বিশদরূপে বলা অসম্ভব। দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে বিবেচনাপূর্ব্বক সদ্‌গুরু নির্ণয় করা উচিত, এই প্রবন্ধে ইহাই মাত্র বলা আমার উদ্দেশ্য। গুরু ত্যাগ করিয়া নূতন গুরু কর, ইহা আমার মনোগত ভাব—এ কথা যেন কেহ মনে না করেন। পৈতৃক-গুরুবংশে সদ্‌গুরু থাকিলে তাঁহাকেই গুরুত্বে বরণ করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। কারণ তাঁহারা পুরুষানুক্রম শিষ্যবংশের হিতৈষী। আমার বলার তাৎপর্য্য এই যে, যে উদ্দেশ্যে গুরুকরণ, নির্দ্দিষ্ট গুরু হইতে সে উদ্দেশ্য সফল হইবে কি না, তাহা দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক। গুরুতে একান্ত নির্ভর করিতে পারিলেই সহজেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছান যায়। মহাত্মা তুলসীদাস এক সময় কোন লোককে যাঁতায় দাইল ভাঙ্গিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে, "যে সকল দাইল যাঁতার মধ্যস্থ কীলক ছাড়িয়া আসে-পাশে যাইতেছে, তাহারাই ভাঙ্গিতেছে; আর যেগুলি কীলক ধরিয়া আছে, তাহারা ভাঙ্গিতেছে না। অতএব ইহা দ্বারা আমি বুঝিলাম যে, যে সকল সাধক সাধনজন্য নানা পথ ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারাই মারা যায়; আর যাঁহারা কেবল গুরুর উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাঁহাদের কেহই পেষণ করিতে পারে না।"

যাঁহাকে আমার ন্যায় এক জন মানুষ বলিয়া বোধ আছে—যাঁহাকে দেখিলে মনে ভক্তির উদয় হয় না—তাঁহার বাক্যে কি প্রকারে শ্রদ্ধা জন্মাইতে পারে? সুতরাং গুরুকরণে কোন বাধ্য-বাধকতা থাকা উচিত নহে। বল্লাল-সেন নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা দিয়া-ছিলেন। ঐ মর্য্যাদা কালক্রমে বংশপরম্পরাগত হইয়া দেশের কত অনিষ্টই করিয়াছে। গুরুকরণও সেইরূপ বংশপরম্পরাগত হইয়াছে। শিব ইহা বলেন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন—

"অতো যো জ্ঞানদানে হি ন ক্ষমস্তং ত্যজেৎ গুরুম্।
অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নঞ্চ যথা সংত্যজতি প্রিয়ে॥
জ্ঞানত্রয়ং যদা ভাতি স গুরুঃ শিব এব হি।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনো ব্রজেৎ॥"

(কামাখ্যাতন্ত্র।)

এইবার আর একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ ...রিব। তন্ত্রে গুরুলক্ষণে অনেক স্থলে "কুলীন" শব্দ ...বহৃত হইয়াছে। কুলাচার বা বীরাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণই কুলীন"। ইঁহারা কোথায় বীর এবং কোথায় বা কৌল ...মেও অভিহিত হন। দীক্ষাদানবিষয়ে কুলীনগুরুদিগেরই শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ শক্তিমন্ত্রদানে ...লীন ব্যতীত অন্যের অধিকার একরূপ লোপ করা ...য়াছে। নিম্নলিখিত তন্ত্রবাক্যগুলি পাঠ করিলে ইহা ...ঝিতে পারিবেন।

"কৌলজ্ঞানী মহাযোগী গুরুরেব চ দৈবতম্।
কুলীনং সর্ব্বমন্ত্রাণাং দাতা সর্ব্বেষু সুন্দরি॥
দীক্ষাপ্রভুঃ স এবাত্মা না পরো বেদপারগঃ।
উৎপাদকব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্ কৌলনায়কঃ॥"

(বৃহন্নীলতন্ত্র।)

অর্থঃ—যিনি জ্ঞানী, মহাযোগী এবং কৌল, তিনিই ...রু। কুলীনগণই দীক্ষাস্বামী এবং সকল প্রকার মন্ত্রদান ...রিতে অধিকারী। কেবল বেদপারগ হইলেই মন্ত্রদান ...রিবার অধিকার হয় না। জন্মদাতা ও ব্রহ্মদাতা (অর্থাৎ ...ন্ত্রদাতা), ইঁহাদিগের মধ্যে মন্ত্রদাতাই অধিক গৌরবান্বিত।

ঐ তন্ত্রে শিব আরও বলিয়াছেন—

"শৈবে শাক্তে চ সর্ব্বত্র দীক্ষাস্বামী ন সংশয়ঃ।
কৌলস্তস্মাৎ প্রযত্নেন কুলীনং গুরুমাশ্রয়েৎ॥"

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুমন্ত্র, সৌরগণ সৌরমন্ত্র এবং গাণপত্যগণ ...ণপতি মন্ত্রদান করিতে পারেন, কিন্তু শৈব ও শাক্তগণ ...র্ব্বদেবতার মন্ত্রদান করিতে অধিকারী। অতএব কুলীন-...রুর আশ্রয় লইতে বলা হইতেছে।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

"শাক্তে শাক্তো গুরুঃ শস্তঃ, শৈবে শৈবো গুরুর্মতঃ।
বৈষ্ণবে বৈষ্ণবঃ সৌরে সৌরো গুরুরুদাহৃতঃ॥
গাণপে গাণপঃ খ্যাতঃ কৌল সর্ব্বত্র সদ্গুরুঃ।
অতঃ সর্ব্বাত্মনা ধীমান্ কৌলাদ্দীক্ষাং সমাচরেৎ॥"

তন্ত্রসারেও আছে—"কুলীনঃ সর্ব্বমন্ত্রাণামধিকারীতি ...ীয়তে"—কুলীনগণই সর্ব্ববিদ্যাদানে অধিকারী। সকল তন্ত্রেই তাঁহারাই দীক্ষাগুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

কুলাচার কি, তদ্‌সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করি-...ার ইচ্ছা রহিল।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ডাক্তার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ মহাশয় শাস্ত্রপ্রমাণাদিসহ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। যোগ্য ব্যক্তিকে গুরু করাই কর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু কুলগুরুত্যাগসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। "গুরোস্তু সন্ততিং ত্যক্ত্বা ন গুর্ব্বন্তরমাশ্রয়েৎ" এবং "পৈত্রং কুলগুরু যস্ত" প্রভৃতি শ্লোক শিববাক্য অথবা কোন ধূর্ত্ত গুরুতা-ব্যবসায়ীর লেখা, এ বিষয়ে তিনি সন্দিহান হইয়াছেন! সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের প্রতি সবিশেষ সম্মানপুরঃসর আমরা এই কথা বলিতে চাহি,—যদি শাস্ত্রবাক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে সন্দেহের উদ্ভব করা সঙ্গত নহে। গৃহস্থেরই কুলগুরু থাকে। গৃহস্থগণ পুরুষপুরুষানুক্রমে একই বীজমন্ত্রের সাধনা করেন। সেই বীজমন্ত্রসাধনে তাঁহাদের একটা কৌলিক অধিকার জন্মে। পুরুষপুরুষানু-ক্রমে মানুষ যে সাধনা করে, সে সাধনাপথে তাহার সিদ্ধিলাভ সহজ হয়। কুলগুরুর নিকট সেই কৌলিক বীজমন্ত্র পাওয়া যায়। সেই জন্য কুলগুরু সহজে ত্যাগ করিতে নাই। এখন প্রশ্ন,—তবে শাস্ত্রে গুরুপরীক্ষণ ও গুরুত্যাগের ব্যবস্থা কেন? তাহার কারণ,—গুরু দ্বিবিধ; যথা—পিচ্ছিলাতন্ত্রে

গুরুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ দীক্ষা-শিক্ষা-প্রভেদতঃ।
আদৌ দীক্ষাগুরুঃ প্রোক্তঃ ততঃ শিক্ষাগুরুর্মতঃ॥

"দীক্ষা ও শিক্ষাভেদে গুরু দুই প্রকার। প্রথমে দীক্ষা-গুরু—যিনি দীক্ষাকালে বীজটি উদ্ধৃত করিয়া দেন, পরে শিক্ষা-গুরু—তিনি সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষা দেন।" আমাদের মনে হয়, এই কুলগুরুত্যাগ করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ; কেন না, অন্য গুরু শিষ্যকে তাহার পৈতৃক বীজ দিতে পারেন না। তবে সেই কুলগুরু যদি অযোগ্য হন, তাহা হইলে অন্য এক জন যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাগুরু করিতে হয়। এই শিক্ষাগুরুর নাম উপগুরু। স্ত্রীলোকের কাছে মন্ত্র লইতে হইলে উপগুরু নিতান্তই আবশ্যক। কুলগুরু অযোগ্য হইলেও এইরূপ এক জন উপগুরু করাই যুক্তিসঙ্গত। সাধক যতই সাধনার উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিবেন, ততই তাঁহার উচ্চতর শিক্ষাগুরুর প্রয়োজন হইতে পারে। সেই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"মধুলুব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ।
জ্ঞানলুব্ধস্তথা শিষ্যো গুরোর্গুর্ব্বন্তরং ব্রজেৎ॥
অতএব মহেশানি লক্ষমেকং গুরুং ত্যজেৎ।"

শিক্ষাগুরুত্যাগই এখানে শিববাক্যের উদ্দেশ্য। তবে কুলগুরু যদি নিতান্তই অযোগ্য হন, তাহা হইলে সমস্যাটিও কঠিন হইয়া পড়ে। অলমিতিবিস্তরেণ।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

৬

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।

শাস্ত্রে ধার্ম্মিকের পক্ষে ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে, ধর্ম্মের লক্ষণে তাহা বলা হইয়াছে। কিন্তু "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ" শব্দের অর্থ লইয়া সময় সময় বিশেষ গোল ঘটে। কেহ কেহ মনে করেন যে, কতকগুলি ইন্দ্রিয়ের জোর করিয়া বিলোপসাধন করিলেই "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ" করা হয়। কোন কোন সন্ন্যাসী তাহা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই মত ঠিক নহে। সেই জন্য আমি এই বিষয়টি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ইন্দ্রিয়শব্দের অর্থ কি? ইন্দ্র এই দেহের রাজা—আত্মা। ইন্দ্রশব্দের উত্তর লিঙ্গার্থে ইয় প্রত্যয় করিয়া ইন্দ্রিয়শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ—যাহাদের উপর আত্মা রাজত্ব করেন। শাস্ত্রমতে ইন্দ্রিয় এগারটি। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর এই দশ জনের সকলের উপরে মোড়লী করেন—মন মহাশয়। এই এগারটি ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমরা বিষয়ভোগ বা পার্থিব সুখভোগ করিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়গণ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই জন্য দেহের আর একটা নাম—ইন্দ্রিয়ায়তন। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটিই জ্ঞানেন্দ্রিয়; ইহাদের দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। আবার বাক্য, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; ইহাদের দ্বারা কর্ম্ম করা যায়। ইহা ভিন্ন মনও একটি ইন্দ্রিয়, ইহাকে অন্তরেন্দ্রিয় বলা হইয়া থাকে। বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত, এই তিনটিকেও কেহ কেহ অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে গণ্য করেন। বেশী জটিলতা-সৃষ্টির ভয়ে আমি শেষোক্ত তিনটিকে বাদ দিয়া মোটামুটি এগারটা ইন্দ্রিয়ই ধরিলাম।

চোদ্দ জন দেবতা চৌদ্দটি ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক; যথা,—কর্ণের দেবতা দিক্, ত্বকের দেবতা বায়ু, চক্ষুর দেবতা সূর্য্য, রসনার প্রচেতা, নাসিকার অশ্বিনাদ্বয়, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, বাক্যের বহ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের শঙ্কর এবং চিত্তের অচ্যুত। অতএব ইন্দ্রিয়গুলি নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় নহে।

শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই ইন্দ্রিয়নিগ্রহের ব্যবস্থা আছে। ইন্দ্রিয় কি, তাহা মোটামুটি বুঝা গেল। শরীরে জ্ঞানার্জ্জনের ও কর্ম্মসাধনের জন্য যে সকল যন্ত্রাদি আছে, তাহাই ইন্দ্রিয়। এখন বুঝিতে হইবে,—নিগ্রহশব্দের অর্থ কি? আমরা সাধারণতঃ নিগ্রহ অর্থে পীড়ন বুঝি। কিন্তু বাস্তবিক উহা নিগ্রহশব্দের মুখ্য অর্থ নহে, উহা গৌণ অর্থ। নি+গ্রহ+অল করিয়া নিগ্রহশব্দ গঠিত হইয়াছে। গ্রহ ধাতুর অর্থ=গ্রহণ করা। নি উপসর্গদ্বারা নিকৃষ্টভাবে বুঝায়। নিগ্রহ অর্থে নিকৃষ্টভাবে গ্রহণ। সুতরাং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ অর্থে ইন্দ্রিয়গুলিকে বড় না ভাবিয়া ছোট বলিয়া গ্রহণ করা বুঝায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে আমার নিয়ন্তা না করিয়া আমাকে ইন্দ্রিয়গুলির নিয়ন্তা করা বুঝায়। আমার মন আমাকে যে দিকে লইয়া যাইবে, আমি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া সেই দিকেই ছুটিব, এরূপ না করিয়া আমি মনকে যে দিকে লইয়া যাইব, আমার মন সেই দিকে যাইবে—এরূপ শক্তিলাভ করা উচিত। মন হইতেছেন সকল ইন্দ্রিয়ের সর্দ্দার—মণ্ডল। মন যে দিকে না যায়, সে দিকে কোন ইন্দ্রিয়ই যায় না। কাজেই ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিতে হইলে মনকে সকলের আগে আত্মবশ করিতে হয়। সেই জন্য যাঁহার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ হইয়াছে, তাঁহাকে "বশী" বলে। বশী-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়গণ যাঁহার বশ হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য,—ইন্দ্রিয়দিগের কার্য্যই বা কি আর তাহাদিগকে নিগৃহীত করিবই বা কি জন্য? ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা বিষয়ভোগ হয়। প্রকৃতিদেবী জীবকে এই জগতে বাঁধিয়া বা আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ-ময় কত জিনিসই যে সাজাইয়া রাখিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। ভোগলোলুপ জীব সেই বিষয়-সাগরে ডুবিয়া থাকে। মুখে যত লোক বৈরাগ্যের ধ্বজা উড়ায়, তাহার অধিকাংশ—প্রায় সব বলিলেও বেশী বলা হয় না—লোকই এই ভোগের গামলায় মুখ জুবড়াইয়া আছে। তাহা হইতে তাহাদের মুখ তুলিয়া চোখ চাহিয়া আর কিছুই দেখিবার শক্তি নাই। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক রজ্জুর দ্বারা জীবকে দৃঢ় গোঁজে বাঁধিয়াছেন, আর তাহার মুখে ভোগের গামলা দিয়া তাহাকে সংসারে আসক্ত রাখিয়াছেন। ইহা মায়ের বন্ধনও বটে, মায়ার বন্ধনও বটে। বন্ধনের ফলেই হউক আর প্রকৃতির বলেই হউক, বিষয়ের প্রতি জীবমাত্রেরই একটা অতি তীব্র তৃষ্ণা আছে। সে তৃষ্ণা দুর্নিবার। যতক্ষণ গুণের বাঁধন আছে, ততক্ষণ বিষয়ের তৃষ্ণা আছে; সে তৃষ্ণা যায় না—যাইতে পারে না। তবে যদি গুণের বাঁধন ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়,—গুণাতীত হওয়া যায়, তাহা হইলে সে তৃষ্ণা ঘুচিয়া যায়। নতুবা সে তৃষ্ণা ঘুচিবার নহে। সুতরাং সাধারণ জীবকে বিষয়ভোগ করিতেই হয়। তাহার অন্য উপায় নাই।

এই বিষয়ের আবার প্রকারভেদ আছে। যোগীর দৃষ্টিতে ভেদ না থাকিলেও ভোগীর দৃষ্টিতে ভেদ আছে।

মনে করুন, সঙ্গীত একটি ভোগ্য-বিষয়। অনেকে সঙ্গীত ভালবাসে। তন্মধ্যে কেহ "কাঁচা খেউড়" ভালবাসে, কেউ নিধুবাবুর টপ্পা ভালবাসে, আবার কেহ বা সাধক-সঙ্গীত শুনিতে চাহে। জিজ্ঞাসা করি, ভোগীর দৃষ্টিতে এই ত্রিবিধ সঙ্গীতই সমান—না এই ত্রিবিধ ভোগকামীই তুল্য মূল্য? কখনই না। জগতে বিষয়ের ও বিষয়ীর প্রভিন্নতা লোকসমাজে সদাই স্বীকৃত। যে যত উচ্চ, সে তত উচ্চ বিষয় উপভোগে রস পায়। যে তমোগুণে আচ্ছন্ন, তাহার কাঁচা খেউড়ই ভাল লাগে। যাহার তমোঘোর কতকটা কাটিয়াছে, রাজসিক ভাব প্রবল হইয়াছে, হয় ত বা সাত্ত্বিক ভাব একটু অধিক উন্মেষিত হইয়াছে, সে নিধুবাবুর গীতে সুখ পায়। আবার যাহার সাত্ত্বিকভাবে প্রবল রজোতমোগুণ হীনবল হইতে বসিয়াছে, সে বিভুসঙ্গীতেই মজে। কিন্তু যতক্ষণ গুণ আছে, ততক্ষণ ভোগের বাসনা থাকিবে, কেবল গুণানুসারে ভোগ্য-বিষয়ের প্রভেদ হইয়া থাকে। যতক্ষণ জীব গুণের বন্ধনে বদ্ধ, ততক্ষণ তাহার কামনা শেষ হয় না। এই কামনাই কাম। বিষয়-তৃষ্ণাই কাম। ইহার আর একটি নাম স্পৃহা। রজোগুণ যতক্ষণ প্রবল থাকে, ততক্ষণ এই বিষয়-তৃষ্ণা বা স্পৃহা প্রবল থাকিবেই থাকিবে। সেই জন্য ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ॥"

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ অধিক থাকিলে বা বৃদ্ধি পাইলে এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়—লোভ, প্রবৃত্তি (ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কাজে আত্মনিয়োগ করা), কর্ম্মারম্ভ (কাজ করিবার জন্য উদ্যম, ফিকির) এবং স্পৃহা (বিষয়-তৃষ্ণা)।

সংসারী মানুষমাত্রেরই রাজসিকগুণ প্রবল। রজোগুণ কার্য্যক্ষেত্রে মানুষকে সাফল্য প্রদান করে। সুতরাং তাহাদের ভোগের ইচ্ছা প্রবল থাকে। ঐ অবস্থায় অর্থাৎ সংসারে ধূলা-কাদা মাখিয়া থাকিয়া একেবারে প্রবৃত্তিকে দমন করিবার চেষ্টা কখনই সার্থক হইতে পারে না। সে যদি জোর করিয়া নিষ্কাম ব্যক্তির মত বিষয়ভোগ পরিহার করিতে যায় অথচ বাসনা জয় করিতে না পারে, তাহা হইলে প্রকৃতির হাতের পাঁচনবাড়ি খাইয়া তাহাকে আবার দ্বিগুণ আসক্তির সহিত বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হইতেই হয়। সগুণা প্রকৃতি তাঁহার মায়াডোরে রুদ্ধজীবকে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে ব্রতী করিতেছেন। তাঁহার সে প্রেরণের প্রাবল্য বড় অল্প নয়। সেই জন্য সাধকপ্রবর তুলসীদাস বলিয়াছেন,—

"নির্গুণ হৈ সো পিতা হামারা, সগুণ হৈ মাহমারি।
কাকে নিন্দো, কাকে বন্দো, দুনো পাল্লা ভারি॥"

সুতরাং ইন্দ্রিয়দমন সহজ কথা নহে। প্রবৃত্তির দিকেও পাল্লা খুবই ভারি। ধীরে ধীরে জ্ঞানের অগ্নি জ্বলিয়া সেই প্রবৃত্তিকে ভস্মীভূত করিতে হয়, ভোগবাসনাকে ক্ষীণ করিতে হয়। সেই জন্য বৈরাগ্যের উদয় না হইলে প্রবৃত্তি-মার্গ ছাড়িয়া নিবৃত্তিমার্গে যাইতে নাই—সন্ন্যাসী হইতে নাই। সেই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বেষামেব বৈরাগ্যং জায়তে সর্ব্ববস্তুষু।
তদৈব সন্ন্যসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥

"যখন সাংসারিক সকল বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সময়েই সন্ন্যাস অর্থাৎ নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিবেন, অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশ বৈরাগ্য জন্মিবার পূর্ব্বে সন্ন্যাস বা নিবৃত্তিমার্গ ধরিলে পতিত হইতে হইবে।"

সুতরাং লোক দেখাইবার জন্য বা আবশ্যক ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে জোর করিয়া ইন্দ্রিয়দমন করিতে চেষ্টা করিতে নাই। ভোগের পথেই ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে হয় অর্থাৎ শিক্ষার ও সংযমের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে মন্দ হইতে ভাল বিষয় ভোগে রত করিতে চেষ্টা করিতে হয়। মনকে ভাল বিষয়ে রত করিতে চেষ্টা করিতে হয়, একেবারে জোর করিয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে নাই। কেবল দেখিতে হইবে, ইন্দ্রিয়সকল বিষয়ভোগে একেবারে ডুবিয়া না যায়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়সাধন—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্বদারনিরতাদি কার্য্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নহে, কিন্তু উহাতে অতি প্রসক্তি বা অত্যন্ত আসক্তিই দোষের। ইচ্ছা করিয়া তাহাতে আসক্তি বাড়াইবে না। মনুই স্বয়ং বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ার্থেষু সর্ব্বেষু ন প্রসজ্যেত কামতঃ।
অতিপ্রসক্তিঞ্চৈতেষাং মনসা সন্নিবর্ত্তয়েৎ॥

মনু ৪।১৬।

"ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্যবিষয়ে ইচ্ছা করিয়া উপভোগের নিমিত্ত অত্যন্ত আসক্ত হইবে না। যত্নপূর্ব্বক উহার প্রতি অতিপ্রসক্তি হইতে মনকে নিবৃত্ত করিবে।"

এইটি মনে রাখিবে যে, সমস্ত বিষয়ই বন্ধনের কারণ। বিষয়ভোগ অস্থির এবং শান্তিলাভের—স্বর্গাপবর্গের অত্যন্ত বিরোধী। গাড়ীর ঘোড়া যদি সারথির লাগাম না মানিয়া উধাও হইয়া ছুটিতে থাকে, তাহা হইলে সে যেমন রথ, সারথি ও রথারূঢ় ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ যদি উদ্দাম ও অসংযত হইয়া ভোগের পথে ছুটিতে থাকে, সংযমের বাধা না মানে, তাহা হইলে তাহারা জীবের সর্ব্বনাশ ঘটায়। সুতরাং গাড়ীর ঘোড়াকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিয়া যেমন চালাইতে হইবে, ইন্দ্রিয়গণকেও ঠিক সেইরূপ সংযত করিয়া চালাইতে হইবে। মনু বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষ্বপহারিষু।
সংযমে যত্নমাতিষ্ঠেদ্বিদ্বান্ যন্তেব বাজিনাম্।

সারথি যেমন রথে নিযুক্ত অশ্বদিগের গতি সংযত করিতে যত্ন করে, সেইরূপ পণ্ডিত ব্যক্তি চিত্তাপহারীবিষয়ে বিচরণ-শীল অর্থাৎ বিষয়ভোগে নিযুক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে সংযত রাখিতে যত্ন করিবেন। কোনরূপে তাহাদিগকে বেচাল চলিতে

দিবেন না। ইহাতে সাধারণ লোকের পক্ষে বিষয়ভোগ একেবারে নিষিদ্ধ হয় নাই, বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তিই বিশেষভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। বেদের শীর্ষস্বরূপ উপনিষদও ঐ কথা বলিয়াছেন—

যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥

কঠ, ৩ বল্লী ৫।৬।

যে সর্ব্বদা অসমাহিতমনা ও বিবেকবুদ্ধিশূন্য হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গুলি সারথির দুষ্ট অশ্বের মত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। আর যে ব্যক্তি সমাহিতমনা এবং বিবেকবুদ্ধিযুক্ত হয়, তাহার ইন্দ্রিয়গণ সদশ্বের মত (ব্রেক্‌করা ঘোড়ার মত) তাহারই বশীভূত হয়। আবার বলিয়াছেন—

বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগ্রহ বান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমম্পদম্।

বিজ্ঞান অর্থাৎ ভালমন্দ-বিচারসমর্থ বুদ্ধি যে ব্যক্তির দেহরথের সারথি এবং যে ব্যক্তির মন ইন্দ্রিয়দিগকে বল্গার মত সংযত রাখে অর্থাৎ যাহার মন সমাহিত, সেই ব্যক্তির এই অধ্বের অর্থাৎ পথের পারস্বরূপ (সংসারগতির গন্তব্যস্থানস্বরূপ) বিষ্ণুর (সর্ব্বত্র অণুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মের) পরমপদ পাইয়া থাকেন।

পাঠক দেখুন,—বেদে ও স্মৃতিতে ইন্দ্রিয়গণের উচ্ছেদসাধন উপদিষ্ট হয় নাই, কেবল ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বথা বশীভূত করিয়া বিষয়ভোগ করিতে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মনু অতি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"শ্রুত্বা স্পৃষ্ট্বা চ দৃষ্ট্বা চ ভুক্ত্বা ঘ্রাত্বা চ যো নরঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি বা স বিজ্ঞেয়ো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
ইন্দ্রিয়াণান্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ং।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞাদৃতেঃ পাত্রাদিবোদকং॥
বশেকৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং॥"

"যিনি শ্রবণ, স্পর্শ, দর্শন, ভোজন বা ঘ্রাণ করিয়া হর্ষ বা বিষাদপ্রাপ্ত না হন, তাঁহাকেই জিতেন্দ্রিয় বলিয়া জানিবে। যেমন একটি মাত্র ছিদ্রদ্বারা জলপাত্র হইতে সমস্ত জল বাহির হইয়া যায়, সেইরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যে কোন একটি ইন্দ্রিয় যদি বিষয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনিয়া, মনকে সংযত করিয়া স্বদেহের কোনরূপ কষ্ট না জন্মাইয়া বৈধ-উপায়দ্বারা সমস্ত পুরুষার্থসাধন করিবে।" সুতরাং শাস্ত্রে সংসারীর পক্ষে বিষয়োপভোগ নিষিদ্ধ হয় নাই, বশী ও সংযতমনা হইয়া বিষয়োপভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে।

ইন্দ্রিয়গুলিকে বশ করিতে হইলে মনকে বশীভূত করিতে হয়। কারণ মনই ইন্দ্রিয়গুলির প্রধান। ইন্দ্রিয়গুলি মনের সহায়তা না পাইলে কখনই বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না। কাজেই মনকে সর্ব্বাগ্রে জয় করিতে হয়। সেই জন্য মনু বলিয়াছেন,—

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

ইহার অর্থ,—মনই একাদশ ইন্দ্রিয়; এই মন স্বীয় গুণদ্বারা (সঙ্কল্পদ্বারা) কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়কেই বিষয়ভোগে প্রবর্ত্তিত করে। অতএব এই মনকে জয় করিতে পারিলেই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়কে জয় করা যায়।

বলা বাহুল্য, এগুলি সত্ত্বগুণপ্রধান দ্বিজাতিরই কর্ত্তব্য। গৃহস্থ ব্রাহ্মণের ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। তবে যাহাদের রজোতমোগুণের আধিক্য বর্ত্তমান—সত্ত্বগুণ অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাহাদের এ ভাবে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করা কঠিন। কিন্তু ইন্দ্রিয়নিগ্রহ জনসাধারণের ধর্ম্ম বলিয়াও উক্ত হইয়াছে। তাহাদের পক্ষেও এই আদর্শের যথাসম্ভব সন্নিহিত হওয়া উচিত। কিন্তু যে ব্যক্তি একেবারে ভোগসাগরে ডুবিয়া আছে, বিষয়ভোগ ভিন্ন যাহার অন্য কিছুতেই মন ধায় না, তাহাকে হর্ষবিষাদের অতীত হইয়া বিষয়ভোগ করিতে উপদেশ করা ঘোর বিড়ম্বনা। শাস্ত্র অনধিকারীকে তাহার পক্ষে অসম্ভব কিছু করিতে উপদেশ দেন না। তাহাদের পক্ষে সত্যকথন, সদাচার, সাধুসেবা, পরদারে মাতৃবুদ্ধি, পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবুদ্ধি প্রভৃতিই কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্র তাহাদিগকে সকলকে নিজের মত ভাবিতে বলিয়াছেন। এইরূপ করিয়া ধীরে ধীরে মনের উপর আধিপত্য করিতে হয়।

আবার যাঁহারা যতী বা সন্ন্যাসী, তাঁহাদের পক্ষে বিষয় বিষতুল্য পরিত্যাজ্য। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও চিত্তগুলির ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠিন। এ প্রবন্ধে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ।

কামিনী-কাঞ্চনত্যাগের প্রশংসা অনেকের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কারণ, ঐ দুইটিই ভোগের প্রধান বিষয়। ঐ দুইটি ত্যাগ করিতে পারিলে ভোগত্যাগী হইয়া যোগী হওয়া যায়। উহা সন্ন্যাসীরই ধর্ম্ম—গৃহস্থের ধর্ম্ম নহে। কেহ কেহ গার্হস্থ্য আশ্রমকেও নিন্দা করিয়াছেন। কপিল বলিয়াছেন,—"গার্হস্থ্যে কিং প্রয়োজনম্?" গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহার বলিবার প্রধান কথা এই,—যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে মোক্ষজ্ঞান জন্মে, তবে গার্হস্থ্যের প্রয়োজন কি? আবার নারদ বলিয়াছেন যে, "দোষবান্ হি পরিগ্রহঃ" বিবাহ নানা দোষের আকর। বলা বাহুল্য, এ সকল অনুশাসন অধিকারীবিশেষের পক্ষে, সাধারণের পক্ষে নহে। যদি সকলের পক্ষেই ইহা প্রযোজ্য হইত, তাহা হইলে

পিতৃগণ মহর্ষি রুচিকে বৃদ্ধবয়সে বিবাহ করিতে বলিতেন না, দ্রোণাচার্য্যও বিবাহ করিবার জন্য আদিষ্ট হইতেন না। শাস্ত্রও এ কথা বলিতেন না যে, "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং দারাসংপ্রাপ্তিহেতবঃ।" স্ত্রীই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রাপ্তির হেতু। পিতৃগণ রুচিকে বলিয়াছিলেন,—

বিহিতাকরণাৎ পুম্ভিরসদ্ভিঃ ক্রিয়তে তু যঃ।
সংযমো মুক্তয়ে সোঽন্তে প্রত্যুতাধোগতিপ্রদঃ॥

"বিহিত কার্য্য (বিবাহাদি) না করিয়া যে সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তি কঠোর সংযম, ক্লেশকর উপবাসাদি এবং বিষয়ত্যাগাদি করে, তাহাদের সেই কর্ম্ম মুক্তিপ্রদ না হইয়া অধোগতিপ্রাপ্ত করে।"

তবে এই মাত্র মনে রাখিতে হইবে যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও সংযত হইতে হইবে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গৃহস্থাশ্রম ভোগের জন্য নহে, কর্ত্তব্যসাধনের জন্য। আশ্রমধর্ম্মে সে কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার বাসনা রহিল। কাঞ্চনত্যাগসম্বন্ধেও ঐ কথা। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে অর্থোপার্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে অসদুপায়ে ধনসংগ্রহ সর্ব্বত্রই নিষিদ্ধ। বিশেষতঃ কামিনী ও কাঞ্চনে মানুষের অতিলোভ থাকাতে উহার জন্য লোক বহু পাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সেই জন্য অনেক স্থানে উহার নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি অর্থবাদ। লোককে নিবৃত্তির পথে লইয়া যাইবার জন্য শাস্ত্র ঐরূপ অনুশাসন করিয়াছেন। এ সকল কথা পরে বিস্তৃতভাবে বলা হইবে। মোটের উপর সংযত ও ধর্ম্মবুদ্ধি পরিচালিত হইয়া উহার ব্যবহার দোষের নহে, কাম ও লোভের বশীভূত হইয়া কার্য্য করাই দোষের। অর্থ যদি অনর্থই হইত, তাহা হইলে উহা দানের এত প্রশংসা হইত না। অর্থ ভোগবিলাসের জন্য নহে,—ধর্ম্ম-প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য।

শিল্প-সমস্যা।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. লিখিত।]

ভারতবর্ষ আজ কৃষিপ্রাণ—এ দেশ বহুকালাবধি কৃষিপ্রধান থাকিলেও কৃষিপ্রাণ ছিল না। এ দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন—সকল দেশেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অভাবের আবির্ভাব হয়, আর মানুষ সেই সব অভাব দূর করিবার জন্য উপাদান প্রস্তুত করে—তাহাতেই শিল্পের প্রতিষ্ঠা হয়। যে দেশের সভ্যতা যত প্রাচীন, সে দেশের শিল্প তত অধিক দিনের। আর শিল্প যত অধিক দিনের হয়, ততই উন্নত হয়। ভারতের সভ্যতা অত্যন্ত প্রাচীন। সে সভ্যতার পরবর্ত্তী অনেক সভ্যতা—গ্রীক, রোমক, মিশরীয়, বাবিলোনীয়—শিল্পে, সাহিত্যে আপন আপন চিহ্ন রাখিয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতের সভ্যতা বিশেষ কারণে আজও বিদ্যমান। এই প্রাচীন সভ্যতার দেশে যে বহু শিল্প ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না; তাহার পোষক প্রমাণেরও অভাব নাই। ভারতীয় শিল্প যে নূতন সভ্যতার সহগামী আদর্শপরিবর্ত্তনে ও প্রবল প্রতিযোগিতায় বিলয়প্রাপ্ত হয় নাই, তাহাতেই ভারতীয় শিল্পের শক্তি ও উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারতের শিল্পীরা প্রকৃত শিল্পী ছিল বলিয়াই তাহারা নূতন নূতন আদর্শও অবাধে গ্রহণ করিয়া বিদেশী আদর্শও আপনাদের করিয়া—তাহাকে ভারতীয় শিল্পের বৈশিষ্ট্যে সুন্দর করিয়া তুলিতে পারিয়াছে। বিদেশের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য যেমন ভারতে আসিয়া ভারতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্ত্তিত ও দেশোপযোগী হইয়াছে—অন্যান্য দেশের শ্রমশিল্পও তেমনই ভারতে আসিয়া ভারতের হইয়াছে। বিদেশী আদর্শ আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতাই শিল্পের সজীবতার পরিচায়ক। মুসলমানদিগের শাসনকালেও ভারতে শিল্পের ও শিল্পীর অভাব ছিল না। মুসলমানরা বিদেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কালে তাঁহারা ভারতেরই হইয়া গিয়াছিলেন—ইরাণ তুরাণের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের আদর করিতেন—ভারতীয় শিল্পীর দ্বারা আপনাদের ব্যবহারের ও বিলাসের সামগ্রী প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। তাঁহাদের সাহায্যে দেশে শিল্পের উন্নতি হইত, তাঁহাদের উৎসাহে শিল্পী পণ্যোৎপাদনে অধিক মন দিত—শিল্পীরা উৎকর্ষসাধনে পরস্পরকে পরাভূত করিতে প্রয়াস পাইত। এইরূপে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিই সাধিত হইত—ভারতীয় পণ্য

বিদেশেও বিক্রীত হইত এবং তাহাতে দেশে অর্থাগম হইত।

তাহার পর দেশের রাজনীতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়। ভারতের শাসনকেন্দ্র দিল্লীতে মুসলমানের শাসন শিথিল হইয়া আইসে—সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী হইতে চারি দিকে সুশাসনের বিস্তার-পথ বিঘ্নবহুল হইয়া উঠে। ভারতের নানা স্থানে শক্তিশালী ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়া সোৎসাহে স্বাধীনতালাভ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠেন। দেশে অনাচারের প্রাদুর্ভাবে লোক সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এ অবস্থা শিল্পের পক্ষে অনুকূল নহে। একে ত সম্রাট্‌দিগের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে অনেক শিল্প নির্ব্বাপিত হইয়া যায়—সম্রাট্‌দিগের ব্যবহারের ও বিলাসের দ্রব্যাদির আর তত প্রয়োজন ছিল না; তাহার উপর দেশের লোকের দুর্দ্দশাহেতু তাহাদেরও পণ্য কিনিবার শক্তির হ্রাস হয়। এইরূপে বহু শিল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়। সেই সময় এ দেশে ব্যবসাব্যপদেশে ইংরাজগণ কুঠী স্থাপিত করেন। তখনও কিন্তু তাঁহারা পণ্য দিয়া এ দেশ হইতে কেবল কাঁচা মাল বা পণ্যের উপকরণ লইতেন না, পরন্তু এ দেশ হইতেও বহুবিধ পণ্য স্বদেশে বিদেশে লইয়া যাইতেন। এ দেশের রেশমী ও কার্পাস বস্ত্র তখন বিদেশে রপ্তানী হইত। সেই জন্যই নানাস্থানে ইংরাজদিগের কুঠী স্থাপিত হয়। তখনও ইংরাজ বণিক্ ; ভারতে ব্যবসা করিয়া অর্থার্জ্জন করাই তাঁহাদের অভিপ্রেত। সেই জন্যই বিলাতে বিবিধ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়—কোম্পানীতে কোম্পানীতে ঈর্ষাদ্বেষ ফুটিয়া উঠে। এ দেশে ব্যবসার পত্তন করিতে ইংরাজকে যে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে ইংরাজের ধৈর্য্যের ও একাগ্রতার বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। বাস্তবিকই ইংরাজ বণিক্‌রা "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন" স্থির করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একবার উড়িষ্যায় বাঙ্গালার মুসলমান শাসকের প্রতিনিধি ইংরাজ বণিক্‌গণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তাঁহাদিগকে আপনার চরণ চুম্বন করিতে দিয়াছিলেন। একবার ইংরাজ বণিক্‌দিগকে সুমাত্রার রাজার জন্য ইংরাজ পত্নী দিবার কল্পনাও করিতে হইয়াছিল! আজ সে সব উপকথা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু এ সবই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আবার ইংরাজের স্বজাতিপ্রেম কখনও ইংরাজকে পরিহার করে নাই। যখন এ দেশে অর্থার্জ্জনের জন্য ইংরাজরা তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ সাগর পার হইয়া এই অপরিচিত দেশে আসিতেন, তখনও অনেক ইংরাজ পাতশাহকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া স্বীয় স্বার্থ তুচ্ছজ্ঞানে স্বজাতির স্বার্থসিদ্ধির জন্য নূতন নূতন অধিকার লাভ করিয়া সেই অধিকারে দেশের লোকের ব্যবসাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছেন। এমন স্বার্থত্যাগ কখন নিষ্ফল হয় না।

তাহার পর মুসলমানের শিথিলমুষ্টি হইতে শাসনদণ্ড খসিয়া পড়িল। দেশে চারিদিকে অরাজকতার প্রদীপ্ত বহ্নিতে সমাজের অনিষ্ট হইতে লাগিল। তখন ইংরাজ-দিগকেও নানা অত্যাচারে উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু তখনও ইংরাজ এ দেশে সাম্রাজ্য-সংস্থাপনের কল্পনা করেন নাই। পরন্তু তাঁহারা যত দিন পারিয়াছিলেন, তত দিন সে দায়িত্বগ্রহণ হইতে বিরতই রহিয়াছিলেন। ক্রমে ভাগ্যচক্রের অতর্কিত আবর্ত্তনে ইংরাজকেই এ দেশের রাজা হইতে হইল। কিন্তু তখনও ইংলণ্ডের রাজা ভারতের সম্রাট্ নহেন—সে কোম্পানীর আমল। কোম্পানী বণিক্‌-দিগের সঙ্ঘ। তাঁহারা দেশশাসনে মন দিলেন বটে, কিন্তু ব্যবসার দিকেই তাঁহাদের মন অধিক রহিল। ওদিকে আবার বিলাতের লোক—বিশেষ বিলাতের ব্যবসায়ীরা ভারতবর্ষের প্রতি মমত্ববোধের অভাবে ভারতে আপনাদের পণ্যবিক্রয় করিয়া অর্থলাভের উপায়-চিন্তাই করিতে লাগি-লেন। ভারতে যে সব পণ্য অধিক বিক্রীত হইবে, বিলাতে সেই সব পণ্য উৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল—আবার যে সব ভারতীয় পণ্য বিলাতে অধিক আদৃত ছিল, সে সকলও বিলাতে উৎপন্ন করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে সময় ভারতীয় শিল্পকে যে প্রতিযোগিতার প্রবল আক্রমণ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বতোভাবে অসহ্য। বিলাতের পক্ষে আইন করিয়া ভারতের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ করিয়া আপনার ব্যবসার উন্নতি করিবার যে শক্তি ছিল, সে শক্তি অব্যবহৃত রহিল না। কাজেই যত দিন যাইতে লাগিল, ততই ভারতের শিল্প শক্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল, আর বিলাতী শিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে লাগিল। সে কার্য্য—সে অবস্থাপরিবর্ত্তন দুই দশ বৎসরে হয় নাই। সে সুদীর্ঘ কথার আলোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দীপক হইলেও তাহার স্থান আমাদের নাই।

এই অবস্থায় কিছুকাল অতিবাহিত হইলে ইংরাজ যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন—ইংরাজ যখন ভারত-বর্ষকে সাম্রাজ্যের অবিচ্ছিন্ন অংশ বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিলেন, তখন এ দেশের অনেক শিল্পের দীপ নিবিয়াছে—যেগুলি আছে, সেগুলি তৈলাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই সেগুলিকে নির্ব্বাপিত হইতে দেয় নাই। ভারতীয় সমাজের নিম্নস্তরের যে সংস্কার—প্রাচীন প্রথাদির প্রতি যে অনুরাগ আজ কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞাত, তাহারই জন্য এ দেশের শিল্প একেবারে বিলুপ্ত হইল না; সেই স্তর হইতে আবশ্যক শক্তির আকর্ষণ করিয়া বাঁচিয়া রহিল।

এই অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল—দেশে দারিদ্র্যবিস্তার। তাহাই হইতে লাগিল—অজন্মায় যেমন, সুজন্মাতেও তেমনই, লোকের আর আয়ে ব্যয়সঙ্কুলান হয় না—দুর্ভিক্ষ ঋতু-পরিবর্ত্তনেরই মত হইয়া উঠিল। এই অবস্থা শাসক ও শাসিত উভয়েরই পক্ষে শঙ্কার কারণ। দেশের লোক বুঝিল,

দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের দারিদ্র্য-সমস্যার সমাধান হইবে না। দেশের লোক যত শীঘ্র এ কথাটা বুঝিল, সরকার তত শীঘ্র না বুঝিলেও বুঝিলেন, কিন্তু সরকার বুঝিয়াও সহসা কিছু করিতে পারিলেন না। কারণ, যখন রাজা ও প্রজা অবস্থা বুঝিয়া প্রতীকার করিতে উৎসুক হইলেন, তখন বহুদিনে বিলাতে শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—পণ্য বিক্রয় করিয়া অর্থ লইয়া সেই অর্থে আবশ্যক দ্রব্য-ক্রয়ে অভ্যস্ত বিলাতের লোক তখন মনেও করিতে পারে না যে, হয় ত যুদ্ধাদির জন্য এক দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথ অতর্কিভাবে রুদ্ধ হইতে পারে—তখন দেশের বিপদের আর অন্ত রহে না। তাই বিলাতের লোক অবাধ-বাণিজ্য-নীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছে—সেই বাণিজ্যের স্রোতে বিলাতে ধনাগম হইতেছে। কোন দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি-সাধন সরকারী সাহায্যসাপেক্ষ। অবাধ-বাণিজ্য-নীতি সেরূপ সাহায্যদানের বিরোধী। কাযেই বিলাতের লোক আপনাদের ব্যবসা ক্ষুণ্ণ করিয়া ভবিষ্যতে আরও ক্ষুণ্ণ করিবার পথ প্রস্তুত করিবার অধিকার ভারত সরকারকে দিতে অসম্মত হইল। তাহারা স্বার্থরক্ষার জন্য যে চেষ্টা স্বাভাবিক, সেই চেষ্টাই করিল। বিলাতের লোকের মত উপেক্ষা করিয়া—বিলাতের ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া এ দেশে কোন নীতির প্রবর্ত্তন ভারত-সরকারের সাধ্যাতীত। তাই ভারত-সরকার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও—দারিদ্র্যরোগের নিদাননির্ণয় করিয়াও—তাহার প্রতীকারের প্রকৃত ভেষজ-প্রয়োগ করিতে পারিলেন না।

কিন্তু সরকার যে এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট ছিলেন, এমনও নহে। বিলাতী বাণিজ্যনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এ দেশে শিল্পকে যতটুকু সাহায্য করা যায়, সরকার তাহাই করিতেন। সরকারী প্রয়োজনে এ দেশের পণ্য "যথাসম্ভব" ব্যবহার করিবার জন্য সরকার সকল বিভাগেই আদেশ ও উপদেশ দিয়াছিলেন। তবে একে এ দেশে নানারূপ পণ্য পাওয়া যায় না—আবার যাহা পাওয়া যায়, তাহাও কোথায় পাওয়া যায়, তাহার সন্ধান লইতে হয়। এই সব কারণে সরকারের আদেশ ও উপদেশ থাকিলেও সরকারের দ্বারা শিল্পের বিশেষ সাহায্য হইত না। আবার সরকার সময় সময় অবস্থা বিচার করিয়া এ দেশের শিল্পের উন্নতিবিধানোদ্দেশ্যে দেশের শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইতেন। সে সব অনুসন্ধানের ফল আশানুরূপ ও আবশ্যকানুরূপ হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কারণ, একদিকে যাঁহারা অনুসন্ধান করিতেন, তাঁহারা সিভিলয়ান—সুতরাং শিল্পবিষয়ে অনভিজ্ঞ; আর এক দিকে বিলাতের বাণিজ্যনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে এ দেশের শিল্পে কোনরূপ সাহায্যদান করিতে পারিতেন না। এরূপ অবস্থায় শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতির আশা করা যায় না। তবে সরকারের অভিপ্রায় বুঝা যাইত। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে যখন এ দেশে—বিশেষ বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলন রাজনীতিক আন্দোলনের অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন কলিকাতায় শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে বড়লাট লর্ড মিণ্টো যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতেই এ বিষয়ে সরকারের মত ব্যক্ত হইয়াছিল—I say to the supporters of Swadeshi that if Swadeshi means an earnest endeavour to develop home industries in an open market for the employment and for the supply of the people of India, no one will be more heartily with them than myself. অর্থাৎ অবাধ-বাণিজ্য-নীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ভারতের লোকের জন্য ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় তাঁহার আগ্রহের অভাব ছিল না।

কিন্তু সরকারের সদিচ্ছা থাকিলেও দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কার্য্য অগ্রসর হয় নাই—তাহার প্রধান কারণ, ভারতের শিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছিল; তাহার দেহে নবজীবনসঞ্চার সরকারী সাহায্য ব্যতীত হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ড ব্যতীত প্রায় সব দেশেই সংরক্ষণনীতি প্রবর্ত্তিত আছে; আমেরিকায় আবার রক্ষাশুল্কে যে ব্যবসার যত উন্নতি হইয়াছে, সে ব্যবসা তত সরকারী সাহায্য পাইয়াছে। ইংলণ্ডেও শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রথমে সরকারী সাহায্য দিতে হইয়াছিল।

এ দিকে দেশের লোকও বুঝিয়াছিল, দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে দেশের লোকের প্রবর্দ্ধমান দারিদ্র্য দূর হইবে না—কেবল কৃষির ও চাকরীর উপর নির্ভর করিলে কোন জাতির সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। সরকার যখন দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন—দেশের লোক তখন নিশ্চিন্ত ছিল না। বাঙ্গালার ভূমি স্বর্ণপ্রসূ—অতি অল্প চেষ্টাতেই ফসল জন্মে, জন্মেও প্রচুর। বিশেষ এ প্রদেশে জমার বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী, জমার প্রতি লোকের মমত্ব অধিক—লোক জমী পাইলে আর কিছু চাহে না। তাই বাঙ্গালায় ভূসম্পত্তির যত আদর, তত আর কোন সম্পত্তির নহে। বিশেষ বাঙ্গালী বহুদিন ব্যবসাবাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত না থাকায় বাঙ্গালীর হস্তে অধিক ধন সঞ্চিত হয় নাই। এই সব কারণে প্রথমে বাঙ্গালায় নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাহা হইয়াছে বোম্বাই প্রদেশে। তথায় পূর্ব্ব হইতেই বহু ব্যবসায়ীর হস্তে অর্থ সঞ্চিত ছিল—সে অর্থ প্রয়োগসন্ধান করিতেছিল। বিশেষ তথায় পার্শীসম্প্রদায় ব্যবসায়েই বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া হিসাবের খেরোর খাতাকে উপনিষদের গৌরব দিয়াছিলেন। তাঁহারা সেই সঞ্চিত অর্থে এ দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হইলেন। পূর্ব্বে আমদানী রপ্তানীর কাযই তাঁহারা বিশেষভাবে করিতেন, এখন দেশে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইলেন। আর তাঁহাদেরই দৃষ্টান্তে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রদেশের অন্যান্য

সম্প্রদায়ের লোকও সেইরূপ ব্যবসার পত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। বোম্বাই অঞ্চলে য়ুরোপীয় প্রথায় নানা কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল। তবে সে সবই য়ুরোপীয় প্রথায়—য়ুরোপের অনুকরণে।

তখন এ দেশে য়ুরোপের অনুকরণে কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার বিশেষ কারণ ছিল। তখন য়ুরোপের ব্যবসার প্রতিযোগিতায় ভারতের শিল্পসমূহ বিনষ্টপ্রায়; বিশেষ য়ুরোপে উটজ শিল্পের স্থান বড় বড় কলকারখানাকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। তখন য়ুরোপের অর্থনীতিবিদ্‌রা স্বদেশে ব্যবসার সাফল্য দেখিয়া এই মত প্রচারিত করিতেছেন যে, উটজ শিল্পের বিলোপই স্বাভাবিক। আর আমাদের দেশের শিক্ষিতসমাজে তাঁহাদের সেই মতই গৃহীত ও আদৃত। এই সব কারণে এ দেশের লোক তখন বিদেশীপ্রথায় বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইলেন। বিশেষ উটজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিবিশেষের বা সঙ্ঘের দ্বারা হয় না—সে জন্য অন্যরূপ চেষ্টার প্রয়োজন।

তাই বোম্বাই অঞ্চলে বড় বড় কলকারখানার প্রতিষ্ঠা হয়—অন্যান্য স্থানেও হয়। তবে এ দেশের বড় বড় কলকারখানা অধিকাংশই বিদেশী মূলধনে প্রতিষ্ঠিত ও বিদেশীর কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত। সে সকলের কথা আমরা আজ আলোচনা করিব না। কারণ, সে সকল কলের মূলধন বিদেশী বলিয়া লাভও বিদেশে যায়—আর কলের বড় বড় কর্ম্মচারীরা বিদেশী বলিয়া তাঁহাদের বেতনলব্ধ অর্থও দেশে থাকে না। এ দেশের লোকের লাভ কেবল কুলীমজুরের—কেরাণী সরকারের—সামান্য বেতন। তাহাতে জন কয়েক লোকের অন্নসংস্থান হয় বটে, কিন্তু দেশের দারিদ্র্যসমস্যা সমাধানের কোন উপায় হয় না—হইতে পারে না। তাই আমরা ভারতীয় শিল্প বলিতে এ দেশের লোকের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত—এ দেশের লোকের কর্ত্তৃত্বাধীন শিল্পই বুঝিব। সে সব শিল্পের জন্য কলকব্জা আমাদিগকে এখন বিদেশ হইতেই আনিতে হইবে, হয় ত বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা কারখানার পত্তন করিতে হইবে—লোককে শিখাইয়া লইতে হইবে। তাহা হইলেও সেইরূপ কলকারখানাই দেশে দারিদ্র্য দূর করিতে পারিবে।

এ দেশে অনেকগুলি কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সবই বিদেশীপ্রথায়। কিন্তু সে সকলকে বিদেশী ব্যবসার প্রবল প্রতিযোগিতা ভোগ করিতে হইয়াছে ও হইতেছে। অধিকাংশ কারখানাতেই লাভের পরিমাণ যে অধিক হইয়াছে ও হইতেছে, এমন নহে। দুই চারিটির কথা ছাড়িয়া দিলে—প্রায় সবগুলিই কোনরূপে টিকিয়া আছে। এ দেশে বর্ত্তমান অবস্থায় বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার পথে যে সব বিঘ্ন বিদ্যমান, আমরা পূর্ব্বে—অন্য একটি প্রবন্ধে—সে সকলের আলোচনা করিয়াছি। আর বড় বড় কলকারখানায় যে সামাজিক অনিষ্ট অনিবার্য্য, তাহার কথাও বলিয়াছি।

এখন দেশের উটজ শিল্পের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, সে দিন শিল্প কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যাইয়া বঙ্গের সমবায়সমিতিসমূহের অধ্যক্ষ রায় শ্রীযুত যামিনীমোহন মিত্র বাহাদুর যাহা বলিয়াছেন, আমরা বহুবার সেই কথাই বলিয়াছি ও বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। এ দেশের উটজ শিল্পের উপযোগিতা অত্যন্ত অধিক—সে শিল্প এ দেশের সমাজের ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহেতুই সৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছে। আর সেইজন্যই বড় বড় কলকারখানার প্রবল প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়াও সে সব শিল্প বাঙ্গালায় আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। সেই আত্মরক্ষাই তাহাদের শক্তির পরিচায়ক—আর সেই জন্য আজ অনেকের দৃষ্টি তাহাদিগের দিকে পড়িয়াছে।

এখন অনেকে মনে করিতেছেন, কলকারখানা হয় হউক—কিন্তু উটজ শিল্প বিলুপ্ত করিলে অনিষ্ট অনিবার্য্য। পরন্তু সে সব শিল্পের উন্নতিসাধনে সমাজে সমৃদ্ধি ও সন্তোষ বর্দ্ধিত হইবে— মহাজনে শ্রমজীবীতে কলহের কারণ উৎপন্ন হইবে না—এ দেশের প্রাচীন শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজের ব্যবস্থায় দেশের লোক আবার শান্তি ও সুখ সম্ভোগ করিবার অবকাশ পাইবে। সে লাভ বড় সাধারণ লাভ নহে।

তাই লেডী কার্মাইকেলের উদ্যোগে বাঙ্গালায় উটজ শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সে সমিতির সদস্যগণ যদি বিচারবিবেচনা করিয়া আবশ্যক চেষ্টা করেন, তবে এ দেশের উটজ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইতে পারিবে।

এ দেশের পক্ষে এখন বড় বড় কলকারখানার প্রয়োজন অধিক কি দেশের অবস্থায় উটজ শিল্পই অধিক উপযোগী—ইহাই আমাদের বর্ত্তমান শিল্প-সমস্যা।

কোণার্ক মন্দির।

[শ্রীসুরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত।]

উড়িষ্যাপ্রদেশে ভুবনেশ্বর এবং পুরীর মন্দির ব্যতীত অন্য যে উল্লেখযোগ্য হিন্দুর তীর্থস্থান আছে, ইহা বাঙ্গালার প্রত্নতত্ত্ববিৎ বা ভ্রমণকারী ভিন্ন অনেকে যে জানেন, এমন বোধ হয় না। চিল্কা হ্রদ হইতে প্রাচি নদী অবধি প্রায় চল্লিশ মাইলব্যাপী এক প্রস্থ দেশ সমুদ্রকূলে বিদ্যমান—স্থানে স্থানে ইহা অর্দ্ধ মাইল হইতে প্রায় সার্দ্ধ তিন মাইল প্রশস্ত। স্থানটি কোথাও সমুদ্রনিক্ষিপ্ত বালুকারাশি-পূর্ণ এবং কোথাও বা কর্দ্দমময় জলাভূমিস্বরূপ। এই ভূখণ্ডের উপর পুরী হইতে ১৯ মাইল উত্তরপূর্ব্বে কোণার্ক-মন্দির নির্ম্মিত হয়। ইহার নির্ম্মাণকালসম্বন্ধে বহুবিধ মত প্রচলিত আছে।

লিখিত ইতিহাসের মধ্যে পুরীর মাদলাপঞ্জিকা এবং আইন-ই-আক্‌বরীতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মাদলাপঞ্জিকামতে কেশরী-রাজবংশের ত্রিংশৎ রাজা পুরন্দর-কেশরী অর্কক্ষেত্রে এক মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং চারিটি শাসন বা ব্রাহ্মণসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের ৪৪ জন রাজা ৬৭০ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই বংশের পর গঙ্গাবংশীয় রাজগণ সিংহাসন লাভ করেন। মহাভারতের ইতিহাস হইতে পাওয়া যায় যে, রাজা লাঙ্গলদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে কোণার্ক মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয় এবং শিবসামন্ত রায় মহাপাত্রের হস্তে মন্দির-নির্ম্মাণের ভার অর্পণ করিয়া রাজা লাঙ্গুলদেব শক্রশাসনে বার বৎসরের জন্য বিদেশযাত্রা করেন। তাঁহার রাজ্যাঙ্কের ত্রয়োবিংশ বর্ষে এই মন্দিরনির্ম্মাণ শেষ হয়, তাঁহার রাজত্ব-কাল ষড়্‌বিংশ বর্ষে শেষ হয়। গঙ্গাবংশীয় রাজাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ৪৪ জন কেশরীবংশীয় রাজা ১৮২৩ বৎসর ৯ মাস ১৯ দিন কাল যাবৎ রাজত্ব করেন, কিন্তু তাহাতে পুরন্দরকেশরীর নাম পাওয়া যায় না।

মিঃ ফার্গুসনের মতে এই মন্দির নবম শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু মাদলাপঞ্জিকামতে ত্রয়োদশ শতাব্দীই ইহার নির্ম্মাণকাল বলিয়া নির্ণীত হয়।

এইরূপ সময়নিরূপণাদির অসামঞ্জস্য থাকিলেও ইহার নির্ম্মাণব্যাপারটা একেবারে কাল্পনিক নহে; কেননা, অন্য একটি সূত্র হইতে পাওয়া যায় যে, নরসিংহদেব পুরন্দর-কেশরীনির্ম্মিত মন্দিরসম্মুখে আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং পুরন্দরসিংহদেবের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

কবিপুরাণে উক্ত আছে যে, জাম্ববতীপুত্র শাম্ব অতি, সুন্দর সুরূপ ছিলেন, কিন্তু দাম্ভিক ও উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব-সম্পন্ন থাকায় গুরুজনদিগকে—বিশেষতঃ নারদ ঋষিকে—যথাযোগ্য ভক্তি বা সম্মান করিতেন না। এ জন্য নারদ বড়ই দুঃখিত ছিলেন এবং নানা উপায়ে তাহার চরিত্র-পরি-বর্ত্তনে অক্ষম হইয়া এক কৌশল অবলম্বন করেন। এমন কি নারদ, শ্রীকৃষ্ণেরও নিকট তাঁহার পুত্রের চরিত্রসম্বন্ধে উল্লেখ করিতে বাকী রাখেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ পুত্রের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের কথা শুনিয়া কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। ইহাতে নারদ ঋষি বড় সন্তুষ্ট হয়েন নাই এবং শাম্বের চরিত্রসম্বন্ধে "হাতে-নাতে" ধরাইবার জন্য এক কৌশল অবলম্বন করেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ রৈবতক পর্ব্বতে বিহার করিতে যাইলে নারদ এই অবসরে শাম্বকে আসিয়া বলেন যে, তাঁহার পিতা রৈবতক পর্ব্বতে তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছেন। শাম্ব পিতৃ-সকাশে গমনকালে পথিমধ্যে এক সরোবরে তাঁহার বিমাতা-গণকে জলবিহার করিতে দেখেন। সে সময়ে তাঁহার বিমাতারা মধুপানে উন্মত্ত ছিলেন এবং শাম্বের সুন্দর কান্তি দেখিয়া তাঁহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন। এবম্বস্থায় নারদ শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিয়া তাঁহার পুত্রের ব্যবহার তাঁহাকে সন্দর্শন করান এবং শ্রীকৃষ্ণ ক্রোধে তাঁহাকে "কুষ্ঠগ্রস্ত হও" বলিয়া শাপ প্রদান করেন। শাম্ব নিজের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করা সত্ত্বেও শাপ লঙ্ঘন হইবার নহে জানিয়া নারদের পরামর্শে মৈত্রবনে সূর্য্যোপাসনায় দ্বাদশ বৎসরকাল নিযুক্ত রহেন। চন্দ্রভাগাতীরে দ্বাদশ বৎসরকাল আরাধনার পর সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করেন এবং তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আর একটি বর প্রার্থনা করিতে বলেন। শাম্ব পরদিন প্রভাতে চন্দ্রভাগায় অবগাহনকালে এক প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। কথিত আছে যে, এই মূর্ত্তি বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত সূর্য্যমূর্ত্তির অংশবিশেষ। শাম্ব এই মূর্ত্তি নদীতীরে স্থাপনা করিয়া উহার উপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সূর্য্য-দেবের পরামর্শানুযায়ী চিকিৎসাব্যবসায়ী শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ আনাইয়া ঐ মূর্ত্তির পূজকরূপে নিযুক্ত করেন। ঐ মূর্ত্তি এখনও কোণার্কে বিদ্যমান।

৩৮০০ বৎসর পূর্ব্বের এই মন্দিরের চিহ্ন কোথাও এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে চন্দ্রভাগা নদীকে বর্ত্তমান পাঞ্জাবের চেনাব নদের সহিত পরিচয় করেন, কিন্তু এখানেও অনুসন্ধানে কিছু বাহির হয় নাই।

বঙ্গোপসাগরবাহী নাবিকবৃন্দ পুরীর মন্দিরকে White Pagoda এবং কোণার্ক-মন্দিরকে Black Pagoda বলিয়া পূর্ব্বে আখ্যা দিত। এই দুই মন্দির তাহাদের স্থাননির্ণয়ের চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরের
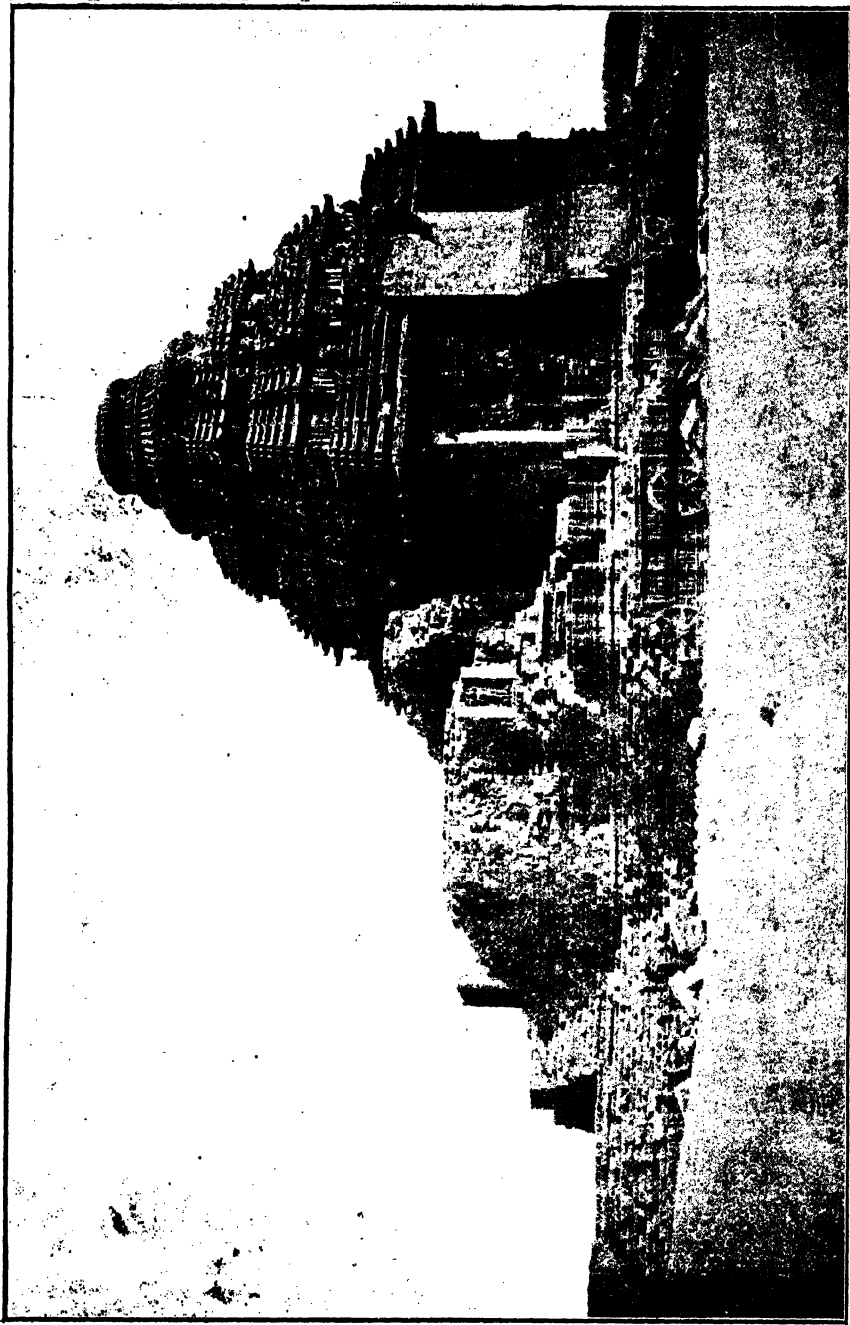
কোণার্ক মন্দির।

ন্যায় কোণার্ক-মন্দিরেরও একটি প্রধান অন্তরাল এবং একটি নাটমন্দির ছিল। নাটমন্দির এবং পূজামন্দিরটি একত্র একখানি রথের আকারে গঠিত এবং এই রথমন্দির সূর্য্যদেবের রথের অনুকরণ বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরটি সূর্য্যদেবের নামেই উৎসর্গিত। মন্দিরের দ্বাদশ যুগ্মচক্রে দ্বাদশ রাশিজ্ঞাপক চিত্রাদি অতি সুন্দররূপে খোদিত আছে এবং দ্বাদশ রাশির দ্বাদশ মার্গে ভ্রমণচিত্রও সুস্পষ্ট। চক্রগুলির কারুকার্য্য বিস্ময়জনক ও হৃদয়গ্রাহী।

মন্দির-রথের গাত্রে নবগ্রহ মূর্ত্তিসকল বিরাজমান এবং রত্নবেদীর কার্য্যগুলি দেখিবার ও ভাবিবার জিনিষ।

নবগ্রহ প্রস্তরের বামদিক্ হইতে প্রথম মূর্ত্তি রবি বা সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি; এই মূর্ত্তির হস্তদ্বয় উত্তোলিত এবং দুই হস্তে দুইটি পদ্মফুল ধৃত। দ্বিতীয় মূর্ত্তি সোম বা চন্দ্রদেবের, এ মূর্ত্তিটি প্রথম মূর্ত্তির ন্যায়, কিন্তু ইহার হস্ত সম্মুখে বিস্তৃত এবং বামহস্তে কুম্ভ এবং দক্ষিণ-হস্ত জপমালা গণনায় নিযুক্ত, তৃতীয় মূর্ত্তি মঙ্গল, চতুর্থ বুধ, পঞ্চম বৃহস্পতি, ষষ্ঠ শুক্র, সপ্তম শনি, অষ্টম রাহু এবং নবম কেতু।

মন্দিরের সম্মুখে এক বৃহৎ অরুণস্তম্ভ ছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্রগণ এই স্তম্ভটি এখান হইতে উত্তোলন করিয়া পুরীর সিংহদ্বারের সম্মুখে প্রোথিত করে এবং ইহা এখনও তথায় সেই অবস্থায় বর্ত্তমান আছে।

স্থাপত্য শিল্প এককালে ভারতে কত উন্নত ছিল, তাহা কোণার্ক মন্দির না দেখিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। কিন্তু কালের করালগ্রাসে কিছুই চিরস্থায়ী হয় না। বিশেষতঃ এই মন্দিরনির্ম্মাণকার্য্যে কতকগুলি দোষ থাকায় এবং ইহার ভিত্তিস্থান বালুকাময় ও জলাভূমি বলিয়া ইহার ধ্বংস ঘটিতে বিলম্ব হয় নাই। মন্দিরটির দুই মাইলের মধ্যে গ্রাম ছিল না; এখন ডাকবাঙ্গলা ইত্যাদি হইয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্বে স্থানটি দুর্গম ছিল। ভাল রাস্তা ছিল না বলিয়া তীর্থযাত্রীরা প্রায় কেহই এত দূর অগ্রসর হইত না এবং লোকসমাজপরিত্যক্ত স্থানে অবস্থিতির দরুণ ক্রমে ক্রমে মন্দিরটি অযত্নে রক্ষিত—পরে অরক্ষিত অবস্থায় থাকায় ধ্বংসের গতি অতি শীঘ্র অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল। এই মন্দিরধ্বংসের অনেক কারণ দর্শান হয়, তন্মধ্যে উপরি-উক্তগুলিই প্রধান এবং হিন্দু শত্রু কালাপাহাড় এই ধ্বংসগতি আরও দ্রুত করিয়া দিয়াছিল। তাহার প্রতিহিংসাগ্নি হইতে উড়িষ্যায় কোনও হিন্দুতীর্থ বা মন্দির নিস্তার পায় নাই। রাজা মুকুন্দদেবের রাজত্বকালে কালাপাহাড় এই মন্দির ধ্বংস করিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে ইহার চূড়াকলস ও ধ্বজা ভাঙ্গিয়া লইয়া
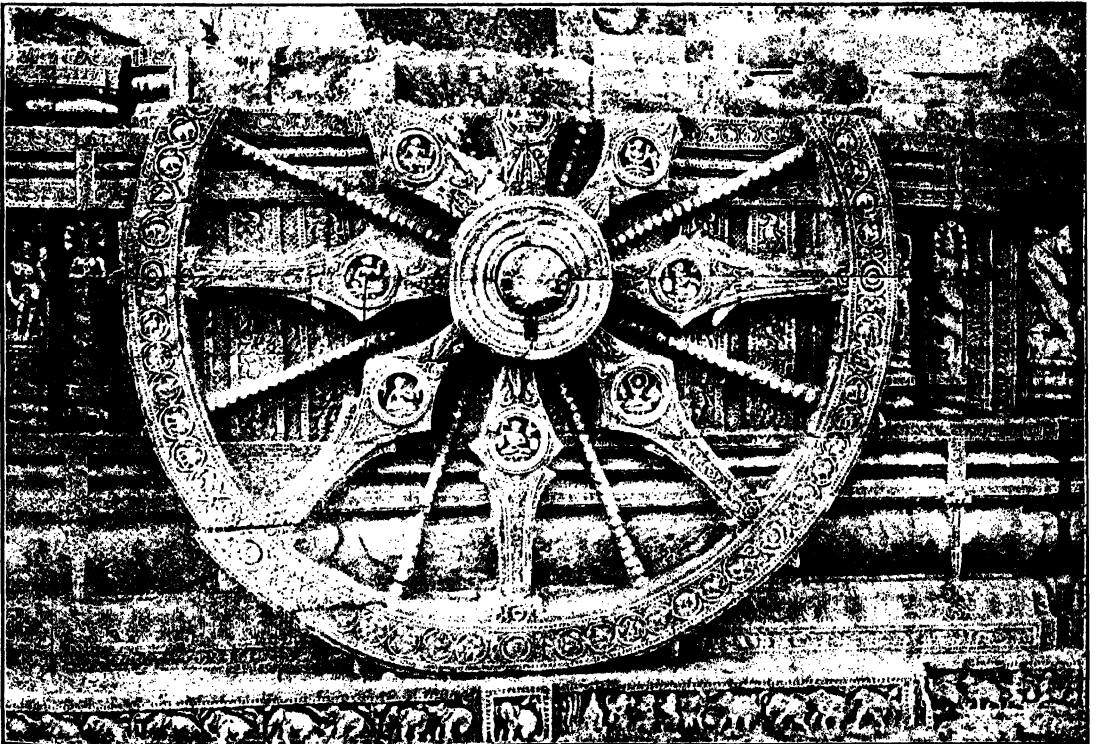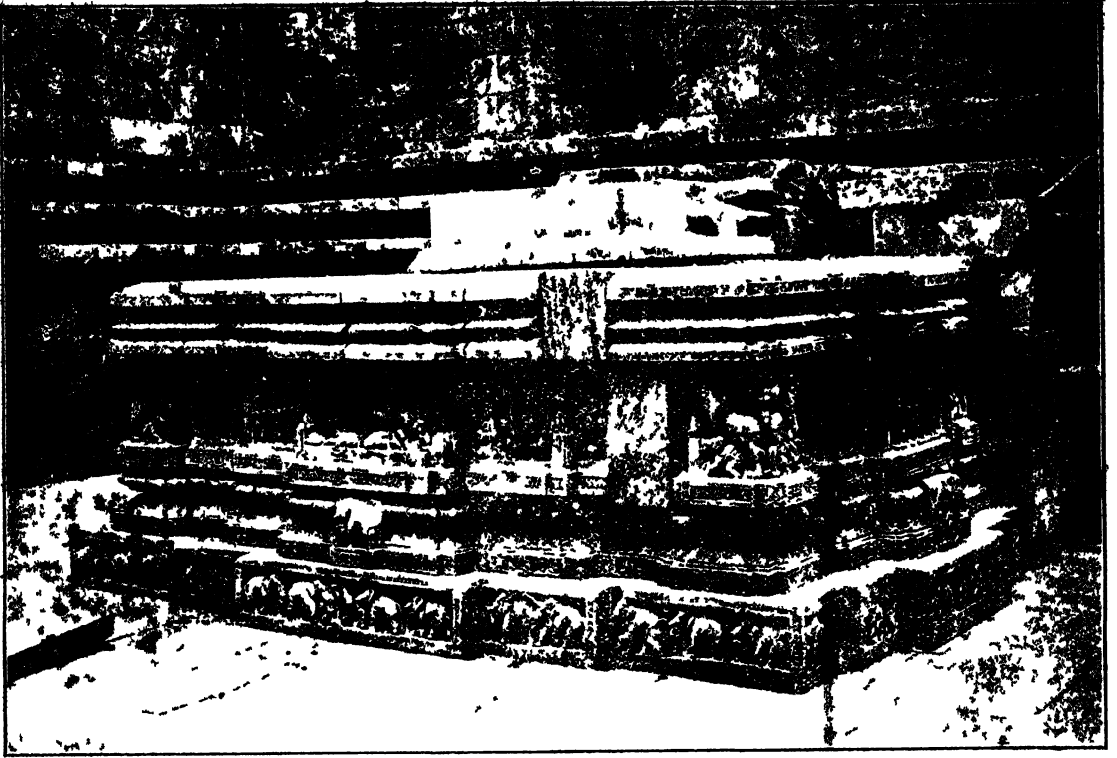
রথচক্র।

রত্নবেদী।

যায়। এই কলস অত্যন্ত ভারী ছিল বলিয়াই তাহার চাপে নিম্নস্তরের প্রস্তরগুলি যথাস্থানে নিবদ্ধ ছিল কিন্তু ভারচ্যুত হওয়ায় নিম্নস্তরের গুরুভার প্রস্তরের বেষ্টনী শিথিল হইয়া যায় এবং সেই কারণেই মন্দিরের ধ্বংস অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে ঘটিয়াছিল বলিয়াই বিবেচিত হয়।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস বেলীর সময়ে এই মন্দিরের উপর গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি পড়ে এবং ইহার সংস্কারে সামান্য অর্থ ব্যয়িত হয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরপার্শ্বস্থ বালুকা রাশি সরাইবার সময় অনেক জিনিষ পাওয়া যায়। ইহাতে সকলের আশা হয় যে, আরও অনেক অমূল্যনিধি এই বালুগর্ভে নিমগ্ন আছে। ১৯০১ সালে খননকার্য্যের সময় নাটমন্দিরের সন্নিকটে কতকগুলি রথ, অশ্ব ও চক্র প্রকাশ হইয়া পড়ে; অনুমান হয় যে, অন্ততঃ ৩০০ বৎসর সেগুলি এইভাবে বালুগর্ভে প্রোথিত ছিল। খননকার্য্যের সময় নাটমন্দির এবং নবগ্রহ প্রস্তরও পাওয়া যায়। এই নবগ্রহ প্রস্তর কলিকাতার যাদুঘরে আনিয়া সংস্থাপিত করিবার প্রস্তাব হয় এবং এতদুদ্দেশে প্রস্তরখানি অল্পদূর পর্য্যন্ত— প্রায় অর্দ্ধ মাইল— বহু অর্থব্যয়ে কামানের গাড়ীসাহায্যে আনা হয় পরে নানা কারণে এ সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয়। এই প্রস্তর এখনও সেইভাবে তথায় আছে।

গবর্ণমেণ্ট মধ্যে মধ্যে কোণার্ক মন্দিরের অনেক সংস্কার করিয়াছেন সত্য কিন্তু অর্থাভাবে এখনও অনেক বাকী। সে অর্থ শুধু রাজকোষের আশায় থাকিলে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ।

কোণার্ক মন্দির যে কি শোভাসম্পন্ন ছিল, তাহা প্রকাশিত চিত্রাবলী হইতেই পাঠকের কল্পনায় আসিবে। স্থাপত্য শিল্পের এরূপ প্রকৃষ্ট উদাহরণ ভারতে ব্যতীত আর কোথায় পাওয়া যায়? সেই ভারত আর এই ভারত!

ইতিহাস।

২

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইতিহাস জাতিবিশেষের অবদান-কাহিনী; জাতির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষের বা বংশবিশেষের কীর্ত্তিকাহিনী নহে। তবে জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবিশেষের বা বংশবিশেষের অবদানেরও একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অনেক ইতিহাস রাজগণের চরিতে ও বীরগণের কীর্ত্তিকথায় পূর্ণ। ঐ সকল অতীত কথায় জাতীয় অবদান কতকটা প্রতিফলিত থাকে, সেই জন্য উহা ইতিহাস বলিয়াই গ্রাহ্য হয়। কিন্তু একটা জাতির জাতীয়ত্বের ও বিশেষত্বের সহিত পরিচিত হইতে হইলে যতখানি জানিবার প্রয়োজন, অতি অল্প জাতির ইতিহাসে তাহা লিখিত আছে। পারিপার্শ্বিক ব্যাপার যেমন মানব-চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তৃত করে, সেইরূপ জাতীয় চরিত্রের ও জাতীয় ভাবের উপরেও উহা প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে। প্রাণী-দিগের জীবনবিকাশে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আলোক, উত্তাপ, জল, বাতাস, খাদ্যসঞ্চয় প্রভৃতি প্রতিবেশ-ব্যাপার তাহার জীবনের বিশেষত্বকে গড়িয়া তুলে। এই প্রতিবেশ-শক্তির মধ্যে কতকগুলি অনুকূল ও কতকগুলি প্রতিকূল থাকিবেই থাকিবে। এই অনুকূলশক্তির ও প্রতিকূলশক্তির দ্বন্দ্বে—ঘাত-প্রতিঘাতে—ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়িয়া যায়। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানুষকে যেমন তাহার ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ব্যাপার সমঞ্জসীভূত করিয়া লইতে হয়, জাতিকেও সেইরূপ করিয়া লইতে হয়। কারণ ব্যক্তি ব্যষ্টি, জাতি সমষ্টি; ব্যক্তি লইয়া জাতি। এক একটা জাতি একই প্রকারের প্রতিবেশপ্রভাবে প্রভাবিত হয়, তাহাতে তাহাদের জাতীয়ধারা একমুখী হয়। এই বিভিন্ন প্রকারের প্রভাব প্রত্যেক জাতিকে তাহার জাতীয়বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল নৈসর্গিক প্রতিবেশশক্তিই ব্যক্তি ও জাতিকে তাহার বিশেষত্ব প্রদান করে না। যে সকল সামাজিক, রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতিবিশেষের গতি হয়, তাহা তাহার বৈশিষ্ট্যগঠনে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার তথ্যগুলি সম্যক্‌রূপে ও সম্পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ করাই ঐতিহাসিকের কার্য্য। সমাজনীতিবিজ্ঞান, রাজনীতিবিজ্ঞান, অর্থনীতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি ইতিহাসেরই অঙ্গ। অন্ততঃ ইতিহাসের অঙ্গ হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহারা স্বতন্ত্র বিদ্যা বলিয়া পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইতিহাস যদি এই সকল বিজ্ঞানের প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ উপাদান যোগাইতে পারিত, তাহা হইলে ঐ সকল বিজ্ঞানকে এতদিন অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঘুরিতে হইত না, উহার সিদ্ধান্ত লইয়া এত বাদবিসংবাদ ঘটিত না।

ইতিহাসে গলদ্ রহিয়াছে বলিয়া কেবল ইতিহাসকে যে সকল বিজ্ঞানের মশলা যোগান দিতে হয়, তাহাদেরই অসুবিধা ঘটিতেছে তাহা নহে, ইতিহাসের নিজেরও তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে ও হইয়াছে। সৌধ যদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত হয়, তাহা হইলে তাহাতে যাহা ইচ্ছা তাহাই গুঁজিয়া দেওয়া যায় না, দিলেই তাহা বেমানান হইবেই হইবে; কিন্তু যেখানে চারিদিকেই খুঁত, চারি-দিকেই বেমানান, সেখানে যাহা ইচ্ছা, তাহাই গুঁজিয়া দেওয়া যাইতে পারে, কেহ তাহাতে কিছুই দোষ ধরিতে পারে না। তাগবাৎ নাসেরীর লেখক আবু ওমার মিন্‌-হাজুদ্দীন গিওর্জানি লিখিয়া বসিলেন যে, বক্তিয়ার খিলিজী সপ্তদশ জন অশ্বারোহী মাত্র লইয়া বাঙ্গালার রাজধানী নোদীয়া জয় করিয়াছিলেন, আর দেশশুদ্ধ লোক তাহাই ঐতি-হাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল!—ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ব্যাপার আর কি আছে? মিন্‌হাজের কথার ভিত্তি এই যে, তিনি কতকগুলি লোকের মুখে ঐ কথা শুনিয়াছিলেন! যাহারা তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়াছিল, তাহারা নাকি নোদীয়া-বিজয়ে বক্তিয়ারকে সাহায্য করিয়াছিল। মিন্‌হাজকে যাহারা এই অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য যোগান দিয়াছিল, তাহারা বিশ্বাসী ব্যক্তি কি গাঁজাখোর, তাহা কেহ সন্ধান লইল না। মিন্‌হাজ ৬৫৪ হিজিরীতে তাঁহার তাগবাৎ নাসেরী গ্রন্থ লেখেন অর্থাৎ ইংরেজী ১২৬০ খৃষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ লিখিত হয়। বক্তিয়ার ১১৯৮ অব্দে বঙ্গবিজয় করেন। সুতরাং বুঝা গেল, বঙ্গ-বিজয়ের বাষট্টি বৎসরের পর মিন্‌-হাজের গ্রন্থ লিখিত হয়। বক্তিয়ারকে যাহারা বঙ্গবিজয়ে সহায়তা করিয়াছিল, তাঁহাদের বয়স অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর ধরা যাইতে পারে। সুতরাং মিন্‌হাজের গ্রন্থ রচনাকালে বাঙ্গালাবিজয়ী বীরদিগের বয়স অন্ততঃ সাতাশী বৎসর হইবার কথা। এত অধিক বয়স পর্য্যন্ত লোক জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের স্মৃতিবিভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা; তাহার উপর বুড়া বয়সে বাহাদুরী দেখাইবার প্রবৃত্তিই বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেই অশীতিপর বৃদ্ধের বচনই ইতি-হাসের একটা পাকা কথা বলিয়া গ্রাহ্য হইল—অন্যান্য ঘটনার সহিত তাহা মানায় বা খাপ খায় কি না—তাহা কেহ সন্ধান করিল না। প্রথম কথা, বক্তিয়ার নোদীয়ায় বাঙ্গালার রাজধানী না করিয়া একেবারে গৌড়ে রাজ-মহলের কোলে উহা করিলেন কেন? ইহার বেশ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, লক্ষ্মণ সেন সসৈন্যে ঢাকা জেলায় অন্তর্গত বিক্রমপুর স্কন্ধাবারে গিয়াছিলেন, কিন্তু বক্তিয়ার

তাহার অনুসরণ না করিয়া ভুটান, তিব্বত, কামরূপ প্রভৃতি দেশজয় করিতে গেলেন কেন? সামন্ত সেন, বিজয় সেন ও বল্লাল সেনের আমলে যে বাঙ্গালী বহুদেশ জয় করিয়াছিল, লক্ষ্মণ সেনের আমলে সেই বঙ্গদেশ কেন এত নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িল যে, আঠার জন মাত্র আফগান-পাঠান অনায়াসে বিনাযুদ্ধে বাঙ্গালার রাজধানী অধিকৃত করিতে সমর্থ হইল? এ সকল প্রশ্ন কেহই জিজ্ঞাসা না করিয়া সকলে মিন্হাজের রচা কথা ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া মানিয়া লইল। তাহার কারণ, বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাসের অভাব।

ইতিহাসে এইরূপ গোঁজামিলের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সকলেই জানেন, রাজা অশোকের আমলে ভারতের সর্ব্বত্রই বড় বড় স্তম্ভ প্রোথিত হয়। ঐ সকল স্তম্ভ প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রস্তরগুলির কারুকার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে এইরূপ সাত আটটি লাট বা স্তম্ভ আছে। তাহার প্রত্যেকটিতে অশোকের অনুশাসন খোদিত রহিয়াছে। অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ভাস্করকীর্ত্তি ভারতে নাই। ইহা হইতে কতকগুলি য়ুরোপীয় পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভারতবাসীরা গ্রীকদিগের নিকট হইতেই পাথরকাটাবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডার খৃষ্ট জন্মিবার ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেক্‌জাণ্ডারের সহিত কতকগুলি গ্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে যে অধিক সংখ্যায় গ্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ বা নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু অশোকের সময় ভারতে পাথর-কাটাবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ যথেষ্ট বর্ত্তমান। খৃষ্ট জন্মিবার ২৭২ বৎসর পূর্ব্বে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন অর্থাৎ আলেক্‌জাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ৫৫ বৎসর পরেই অশোক রাজা হইয়াছিলেন। যদি ভারতে প্রস্তরতক্ষণ-শিল্প অজ্ঞাত থাকিত, তাহা হইলে পঞ্চান্ন বা ষাট বৎসরেই সিন্ধু হইতে সারনাথ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তম্ভ—ভাস্করকীর্ত্তি উত্থিত হইল, ইহা কি সম্ভবে? মহীশূরের ব্রহ্মগিরি হইতে জব্বলপুরের রূপনাথ পর্য্যন্ত, সিন্ধুর মিরপুর হইতে কাশীর সারনাথ পর্য্যন্ত সমস্ত ভাস্করকীর্ত্তি করিতে কতগুলি দক্ষ শিল্পীর প্রয়োজন হইয়াছিল? শত বর্ষের মধ্যে কোন জাতিই নূতন অর্জ্জিত বিদ্যায় এত দক্ষতালাভ করিতে পারে না। তদানীন্তন কালের দুর্গমপথে গ্রীস হইতে এত অধিক শিল্পী আমদানী করাও সহজ ব্যাপার ছিল না। আলেক্‌জাণ্ডারকে তাঁহার বাহিনী আনিতে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহাও ভাবিবার বিষয়। পাথর-পালিস প্রভৃতি শিল্পের এ দেশে যত উন্নত নিদর্শন পাওয়া যায়, গ্রীসেও তেমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সারনাথে প্রাপ্তস্তম্ভের শীর্ষমণ্ডন সিংহচতুষ্টয় যে ভাবে পালিস করা, তাহা দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথই বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পালিসের নিদর্শন আর কোথাও পাওয়া যায় নাই। ঐ পালিসবিদ্যা যে লুপ্ত হইয়াছে, তাহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরে যব-দ্বীপে, কাম্বোডিয়ায়, আনামে অনেক ভাস্করকীর্ত্তি আছে।

কিন্তু একটা প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে হিন্দুদিগের কোন ভাস্করকীর্ত্তি নাই কেন? ইহার উত্তর দেওয়া কঠিন। বৌদ্ধবিপ্লবে ভারতের কীর্ত্তি কতদূর বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। তাহার পর প্রায় পাঁচ শত বৎসর ইহা প্রবল প্রতাপে ভারতের ভিতরে ও বাহিরে বিস্তারলাভ করিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মালবদেশের বিক্রমার্ক উপাধিযুক্ত জনৈক রাজা বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে উহার প্রতাপ ক্রমশঃ কমিতে থাকে। ইনি বারাণসীতে অশোকস্তম্ভের ন্যায় একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত করিয়া যান। উহা লাটভৈরব নামে খ্যাত ছিল। মুসলমানগণ উহা ভাঙ্গিয়া দেয়। উহার ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। এই বিক্রমার্ক সম্বতের প্রবর্ত্তক। এই পাঁচ শত বৎসরে হিন্দুর বহু কীর্ত্তি যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাঁহারা এক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, পরিত্যক্ত ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের বিদ্বেষ স্বাভাবিক। সেই বিকট বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক নবদীক্ষিত বৌদ্ধ রাজা যে কালাপাহাড়ের ন্যায় হিন্দুকীর্ত্তি বিলুপ্ত করিতে আত্মনিয়োগ করেন নাই, ইহা মনে হয় না। যাহা স্বাভাবিক, মানুষ তাহাই করে। কিন্তু তাই বলিয়া কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করা চলে না। সুতরাং এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা যাইতেই পারে না।

কিন্তু একটা কথা আছে। ভারতের বাহিরে কোথাও হিন্দুজাতির কোন নিদর্শন পাওয়া যায় কি না? শুনা যায়, প্রাচীন আমেরিকার সহিত ভারতের অনেক বিষয়ে এরূপ সাদৃশ্য দেখা গিয়াছিল যে, অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এককালে ভারতবাসীরা স্থলপথে বেরিং প্রণালী দিয়া আমেরিকায় গিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, ভারতেই কার্পাসবস্ত্র উদ্ভাবিত হয়; প্রাচীনকালে অন্য কোথাও কার্পাসবস্ত্র ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু য়ুরোপীয়রা যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন মধ্য-আমেরিকার অধি-বাসীদিগকে তাঁহারা কার্পাসবস্ত্র পরিহিত দেখিয়াছিলেন। পেরু, বোলিভিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশের লোকের ভাবভঙ্গী অনেকটা ভারতবাসীর মতই ছিল। মেক্সিকো অঞ্চলের জঙ্গলে কতকগুলি প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, সে গুলির কারুকার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয় না হইলেও ভারতীয় কোন কোন দেবমূর্ত্তির সহিত তাহার বিশেষ

সাদৃশ্য আছে। প্রবন্ধলেখকের জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধু মার্কিণের কালিফোর্ণিয়া অঞ্চলে প্রায় নয় বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন; তিনি কখনও মেক্সিকোর ভিতর যান নাই সত্য, কিন্তু তথাকার ভগ্ন অশ্মমূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, তিনি যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ভগ্ন। সুতরাং তাহা হইতে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না সত্য, কিন্তু কয়েকটি মূর্ত্তি গণপতির মূর্ত্তি বলিয়াই বুঝা যায় এবং মূর্ত্তিগুলি দেখিলে যেন ভারতীয় ঢঙ্গের বলিয়াই মনে হয়। পেরু ও বোলিভিয়ার জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশেও দুই একটি অতি প্রাচীন জীর্ণমন্দির দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি সূর্য্যমন্দির দেখিয়া কয়েক জন য়ুরোপীয় সিদ্ধান্ত করেন, উহা ভারতীয় ভাবেই প্রস্তুত। সেই জন্য কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, ঐ অঞ্চলে প্রাচীনকালে ভারতবাসীর গতিবিধি ছিল। কিন্তু এরূপ আন্দাজী-সিদ্ধান্তে সত্য নির্ণয় হয় না। যাঁহারা ভারতীয় দেবমূর্ত্তির সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারা যদি ঐগুলি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পান, তাহা হইলে ইতিহাসের একটা তমসাচ্ছন্নপ্রদেশে কিঞ্চিৎ আলোকরশ্মি প্রবেশ করিতে পারে। আর এক কথা, বৌদ্ধযুগ হইতেই ভারতের কতকটা ইতিহাস পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে কোন ভারতবাসী আমেরিকায় উপনিবেশ করিয়াছে, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাস বিলুপ্ত। সুতরাং তখন কে কোথায় যাইত না যাইত, তাহা জানিবার উপায় নাই। এরূপ ক্ষেত্রে যদি আমেরিকার প্রাগৈতিহাসিক-যুগের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির মধ্যে গণপতি, ব্রহ্মা ও সূর্য্যমূর্ত্তির সদৃশ মূর্ত্তি দেখা যায়, তাহা হইলে স্বতঃই মনে হইতে পারে যে, বুঝি উহা হিন্দুর কীর্ত্তি। উহাও একটা presumption মাত্র—সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আমরা বৌদ্ধযুগের বা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তীকালের গণপতি, ব্রহ্মা ও সূর্য্যমূর্ত্তির সহিত পরিচিত আছি; কিন্তু ঐ সকল বিদেশী মূর্ত্তি যদি তাহার বহুকাল পূর্ব্বে ক্ষোদিত হইয়া থাকে ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সহিত আমাদের পরিজ্ঞাত মূর্ত্তির পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে মূর্ত্তি সনাক্ত করাই কঠিন। তবে গণপতির মূর্ত্তির বিশেষত্ব আছেই; কারণ আমেরিকায় হস্তী নাই। তথায় যদি করিমুণ্ডযুক্ত কোন মনুষ্যমূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হিন্দুর কীর্ত্তি বলিয়াই যেন স্বতঃই সন্দেহ হয়। যাহা হউক, এ বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান সময়ে বৌদ্ধযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী ভারতীয় ইতিহাসের উদ্ধারচেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা বিস্মৃতির তিমির-জালে আত্মগোপন করিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত হইতেই পারে না। তবে এইটুকু সত্য যে, প্রত্যেক জাতির সভ্যতা-বিকাশের একটা ধারা আছে; উন্নতিসাধনের একটা পন্থা আছে। সওয়া দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে জাতি ভাস্করবিদ্যায় বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিয়াছিল, আড়াই হাজার বা পৌনে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে সে জাতি যে ভাস্করবিদ্যা কিছুই জানিত না, এরূপ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। সাহবীকি ডেরী-স্তূপে কণিষ্কের স্থপতিপ্রধান Agisilaus-এর নাম পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই সমস্ত ভাস্করকীর্ত্তি গ্রীকদিগের প্রস্তুত, ইহা সিদ্ধান্ত করাও সঙ্গত নহে। উহাতে বড় জোর এই মাত্র সপ্রমাণ হয় যে, কণিষ্কের আমলে ভারতীয় ভাস্কর-শিল্পে গ্রীসের প্রভাব কিঞ্চিৎ বিস্তৃত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে এ কথাও সত্য যে, অশোকের আমলে ভারতীয় ভাস্কর-শিল্প যত উন্নত হইয়াছিল, কণিষ্কের আমলে উহা তত উন্নত ছিল না, কোন কোন বিষয়ে উহার কতকটা অবনতি লক্ষিত হইয়াছিল। বিদেশীয় প্রভাবে অনেক সময় শিল্প অবনত হইয়া পড়ে। পঞ্চনদপ্রদেশের কোন কোন ভাস্করকীর্ত্তিতে গ্রীসের Ionic ঢং লক্ষিত হয় সত্য, ইহাতে সপ্রমাণ হয় যে, ঐ অঞ্চলের ভাস্করকীর্ত্তিতে গ্রীক শিল্পের ছায়াপাত হইয়াছিল। কিন্তু অন্য কোথাও ঐরূপ প্রভাব লক্ষিত হয় না। ইহাই ভারতীয় ভাস্কর্য্যবিদ্যার বৈশিষ্ট্যের ও স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আমার বক্তব্য এই যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রথম হইতেই একটা উৎকট ধারণা লইয়াই এ দেশের ইতিহাসের ও পুরাবস্তুর সন্ধান করিতে বসেন, তাই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রায়ই ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। তাহারা অশোকের স্তম্ভ হইতে তাজমহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই গ্রীক শিল্পীর কৃতিত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকেন, ইহাতে তাহাদের একটা উৎকট পক্ষপাতিতা প্রকট হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সত্য বিড়ম্বিত হয়। কেহ কেহ সংস্কৃত নাটকে 'যবনিকা' শব্দ দেখিয়া উহাতে গ্রীসের প্রভাব দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু গ্রীক রঙ্গমঞ্চে যবনিকার অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। আজকাল কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক রামায়ণের দুই এক স্থানে শ্রমণশব্দ সন্দর্শনে উহা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তীকালের যোজনা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু ঠিক ঐরূপ অজুহতে গীতায় ব্রাহ্মশব্দ প্রয়োগদর্শনে ইহাও সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, রাজা রামমোহন রায়ের পরে ভগবদ্গীতা রচিত হইয়াছিল। শ্রমণশব্দটি সংস্কৃত। শ্রম ধাতুর উত্তরে অনট্ প্রত্যয়ে উহা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সংসারের নিষ্পেষণে যাহারা ক্লান্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহারাই শ্রমণ। এই শব্দ যে বৌদ্ধরা হিন্দুদিগের নিকট হইতে লয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? ভিক্ষু সম্বন্ধেও ঐ কথা। বুদ্ধদেব স্বতন্ত্র ধর্ম্মই প্রবর্ত্তিত করেন, স্বতন্ত্র ভাষার সৃষ্টি করেন নাই। বৈদিক-সাহিত্যে যে স্তম্ভের কথা আছে, এক জন য়ুরোপীয় তাহা বাঁশের খুঁটি বা বৃক্ষশাখার খুঁটি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন! কিন্তু এরূপ করিবার হেতুবাদ কি, তাহা তিনি প্রদর্শন করেন নাই। কোন প্রাচীন গ্রন্থে দার্ব্বদস্তম্ভ বা

প্রাচীরের উল্লেখ থাকিলে তাহা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী রচনা বলিয়াই সিদ্ধান্ত করা হয়। ইহাতে বিশেষ ভ্রম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ দার্ষদ শিল্প যে বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তীকালে উদ্ভাবিত হয়, এই সিদ্ধান্ত কোন অটল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, উহা একটা অনুমান বা presumption মাত্র। যদি এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহার উপর বনিয়াদ করিয়া যত থিওরী রচিত হইতেছে, সবই ভ্রান্ত হইয়া যাইবে।

এইরূপ লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারচেষ্টায় ভ্রান্ত ইতিহাসেরই সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার রাজনীতিক কারণেও সমসাময়িক ইতিহাসও বিকৃতভাবে লিখিত হইয়া থাকে। সকলেই স্বজাতির দিকে টানিয়া লিখিয়া থাকেন। অনেক সময় রাজারা যে ইতিহাস লেখাইয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদের স্তব মাত্র, প্রকৃত ইতিহাস নহে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে তাহাদের বিজিত জাতিদিগের অতীত গৌরবের বিশেষ উল্লেখ করিতেন না, বরং তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন, তাহার কারণ তাঁহাদের ধর্ম্মান্ধতা নহে, রাজনীতিক দূরদর্শিতা। যে রাজনীতিক বিশ্বাসের ফলে ওমার আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল পুস্তকাগার নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন, সেই রাজনীতিক বিশ্বাসের ফলে মুসলমান সেনাপতি নালন্দার ও বিক্রমশিলার পুস্তকাগার ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। যে কারণে তাহারা পুস্তকাগার বিনষ্ট করিতেন, সেই কারণেই বোধ হয়, তাহারা দার্ষদী কীর্ত্তির বিলোপসাধনে প্রয়াস পাইতেন। তাই মনে হয়, রাজনীতিক কারণেও প্রকৃত ইতিহাস বিলুপ্ত এবং ভ্রান্ত ইতিহাস প্রচারিত হইয়া থাকে।

স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতির প্রতি অহেতুক পক্ষপাত প্রভৃতি ইতিহাসবিকৃতির একটা বড় কারণ। অনেক জাতি আপনাদের দোষ সহজে প্রকাশ করিতে চাহেন না; আপনাদের দীনতা ও হীনতাস্বীকারে সম্মত নহেন। এরূপ গোঁড়ামি প্রকৃত ইতিহাসচর্চ্চার ঘোর পরিপন্থী। ধর্ম্মান্ধতাও ঐরূপ ঐতিহাসিক সত্যসন্ধানের প্রতিকূল। অনেক হিন্দুই মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দুগণ বুঝি বা দেবতাদিগের অপেক্ষাও উচ্চ ও একেবারে অভ্রান্ত ছিলেন। এরূপ বিশ্বাস লইয়া ঐতিহাসিক সত্যসন্ধান চলে না। এইরূপ গোঁড়ার দল প্রকৃত ইতিহাসপ্রচারের বিরোধী। আর এক দল লোক আছেন, তাঁহারা যাহা কিছু প্রাচীন—তাহাই অপকৃষ্ট, ইহা মনে করিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে যে কোন দেশে সভ্যতার জ্যোতিঃ প্রস্ফুটিত হইয়াছে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইয়াছে, তাহা তাহারা বিশ্বাসই করিতে পারেন না। প্রাচীন মিশরে একটা জনশ্রুতি ছিল যে, ভারতবাসীরা ঐ দেশে যাইয়া সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিল। তথাকার চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজ—পৌরাণিক আখ্যায়িকা—সামাজিক রীতি এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল করে। কিন্তু ঐতিহাসিক কুকটেলর ঐ কথাটা এইভাবে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করেন যে, ঐরূপ করা নিতান্তই অসম্ভব; কারণ ভারতবাসীদের যে কস্মিন্‌কালেও নৌবাহিনী ছিল, তাহার প্রমাণ নাই! অথচ সেই কুকটেলরই বলিয়াছেন যে, নীলনদের মোহানার কাছে—লোহিত সাগরের উপকূলে হিন্দুদিগের ছোটখাট উপনিবেশ ছিল। যাহারা সাগরপথে এত দূরদেশে ছোটখাট উপনিবেশ স্থাপিত করিতে পারে, তাহারা যে একটু দলে পুরু হইয়া আসিয়া একটা দেশে সভ্যতার বিস্তার করিতে পারে না, ইহাই বা কোন্ দেশী কথা, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। আর এক দলের সংস্কার যে, এই পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে। চারি হাজার সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহাতে একটা প্রলয়কাণ্ড ঘটে; তাহার পর ধরাপৃষ্ঠে মানবসমাজে সভ্যতার বিকাশ হয়। কাজেই তাঁহারা সকল দেশের সভ্যতাকেই চারি হাজার বৎসরের মধ্যে পুরিতে চাহেন। য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে এইরূপ কুসংস্কার অত্যন্ত প্রবল। বিজ্ঞান তাঁহাদের সেই সংস্কারের উপর মুদ্গরাঘাত করিলেও তাহা তাঁহারা সহজে ছাড়িতে পারিতেছেন না। মিশরের কোন কোন স্থান খনিত করিয়া তাঁহারা ভূগর্ভে কতকগুলি মৃণ্ময়পাত্রের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হন। যে স্থানে উহা পাওয়া যায়, সেইখান হইতে নীলনদের পলি পড়িয়া যতখানি ভূমি পুরিয়া উঠিয়াছে, বৈজ্ঞানিক হিসাবে ঐখানের ততখানি মৃত্তিকাপূর্ণ হইতে অন্ততঃ পনর হাজার বৎসর লাগে। তখন কেহ কেহ সাব্যস্ত করিলেন যে, ঐ স্থানে বোধ হয় প্রাচীনকালে কোনরূপ কূপ গর্ত্ত বা পাতকূয়া ছিল, সেই পাতকূয়ার ভিতর অতি প্রাচীনকালে অন্ততঃ দুই হাজার তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐ ভগ্ন মৃণ্ময়পাত্রগুলি নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তাহার পর যখন আরও কয়েক স্থানে ঐরূপ জিনিস পাওয়া গেল, তখন সে থিওরী পরিত্যক্ত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে এইরূপ একটা থিওরী বা মত প্রচারিত হইল যে, ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা বোধ হয় কোন অজ্ঞাত কারণে কতকটা বসিয়া গিয়া থাকিবে। যাহা হউক, তখন একটা আজামোজা রকমের হিসাব করিয়া সাব্যস্ত হইল যে, ঐ ভগ্নাবশেষগুলি প্রায় পাঁচ ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন। আবার কেহ কেহ উহা তিন চারি হাজার বৎসরের বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। কিন্তু সত্যসন্ধানে এরূপ আজামোজা ব্যবস্থা চালান উচিত নহে। [ক্রমশঃ।

হিন্দুশাস্ত্র ও বিজ্ঞান।

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্. লিখিত।]

আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার স্বাস্থ্যশাস্ত্রানুমোদিত। তবে, হিন্দুরা "অমুক করিলে অমুক হয়, অতএব অমুক কর", এই ভাবে কথাগুলি না বলিয়া ধর্ম্মের দোহাই দিয়া শাস্ত্রের বজ্রগম্ভীরস্বরে অনুজ্ঞার রূপে সেগুলিকে বলিয়া গিয়াছেন। সেরূপ বলিবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে; প্রথম কারণ, হিন্দুর ধর্ম্মপ্রাণতা—সকল কথাই ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত করিয়া দিলে হিন্দুর হৃদয়ে তাহা সহজে ও স্থায়ীরূপে স্থান পাইবে। দ্বিতীয় কারণ, সমাজের মূঢ়াবস্থা। নিতান্ত শিশুকে "আলমারির জিনিষগুলি ঘাঁটিলে আমার নানারূপ অসুবিধা হইবে, অতএব আলমারি ঘাঁটিও না" এ কথা বলা অপেক্ষা "আলমারির জিনিষ ঘাঁটিলে তুমি মার খাইবে" এইরূপ অনুশাসন বলিলে উহা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। যখন সমাজে অধিকাংশ লোকেই মূঢ় থাকে, তখন এই ভাবেই বলা সমীচীন। বোধ হয়, এই কারণে সকল কথাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া হিন্দুরা বলিতেন।

কিন্তু না বুঝিয়া কোনও বিষয় কণ্ঠস্থ করিলে যাহা দাঁড়ায়, আজ আমাদিগের ঠিক সেই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রকাররা প্রত্যেক জিনিষের হেতু বলিয়া না যাওয়ায় আমরা কেহ কেহ অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদাকে দূরে রাখিয়া তাহার বিধির অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করিয়া থাকি। কেহ কেহ বা হিন্দুশাস্ত্রটাকে ব্রাহ্মণদিগের চাতুরীজ্ঞানে সদর্পে উড়াইয়া দিই। উভয় পক্ষই যে অন্যায় করি, সেই কথাটা এই প্রবন্ধে কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

(১) মরণাশৌচ ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ, অশৌচের ব্যাপার। হিন্দুদিগের মধ্যে জনন ও মরণ—উভয়বিধ অশৌচগ্রহণের ব্যবস্থা আছে। অশৌচগ্রহণ করিলেই হিন্দুরা এই কয়েকটি জিনিষ করেন:—(১) অশৌচের কাল নির্দ্দেশ করেন। (২) হাঁড়ীকুঁড়ী ফেলাইয়া দেন। (৩) ধোপা-নাপিত বন্ধ রাখেন। (৪) ভিক্ষা দেওয়া বন্ধ রাখেন। (৫) গঙ্গাস্নান করেন। মরণাশৌচে—"কাছা"গ্রহণ, নগ্নপদ হওন, শ্রাদ্ধাদিকরণ—প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। একে একে উপর্য্যুক্ত আচরণগুলি সম্বন্ধে দু'চার কথার আলোচনা করিব।

আমাদের দেশে, দ্বিজদিগের জন্য দশ রাত্রের ও তদেতর বর্ণের জন্য বেশী দিন ধরিয়া অশৌচগ্রহণের রীতি আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই—সর্ব্বত্যাগী, ভিক্ষাজীবী, নিস্পৃহ ব্রাহ্মণেরা কি নিজেদের সুবিধার্থ দশ রাত্রি অশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? আর ব্রাহ্মণেতর বর্ণদিগের উপর আধিপত্য দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগের জন্য এমন কি মাসাধিককালাশৌচ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন? স্বার্থান্বেষী খৃষ্টীয়ান্ পাদরীরা যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে সে ভাব স্থান পায় না। যে সমাজের এক দিকে বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ প্রভৃতি আলোচিত হইত, আর যাহার অপরাংশে অহর্নিশ দণ্ডের ভয় প্রদর্শন করিয়া তবে স্বাস্থ্যনীতির অনুসরণ করান সম্ভবপর ছিল, সে সমাজে ব্রাহ্মণেরা চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং অপর সাধারণে ঘোর মূঢ় ছিল, এরূপ কথা বলা অন্যায় নহে। যাঁহারা আমার এরূপ যুক্তির বিরুদ্ধে কথা বলিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সহিত অপরাপর বঙ্গদেশবাসীর তুলনা করিতে বলি। ব্রাহ্মণেরা ইচ্ছা করিয়া—ঘোর স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া সকল বিদ্যা নিজেদের কবলিত করিয়া রাখেন নাই; বঙ্গদেশীয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালীও ইচ্ছা করিয়া বাকী বাঙ্গালীকে মূর্খ করিয়া রাখেন নাই। দেশে যখন ওলাউঠা, প্লেগ প্রভৃতির প্রকোপ বাড়ে, তখন শিক্ষিত সমাজ অপেক্ষা নিরক্ষর ব্যক্তিরাই বেশী ভুগিয়া থাকে; তাহার কারণ, শিক্ষিত ব্যক্তিরা অতি সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেই সহজে রোগমুক্ত হইতে পারেন নিরক্ষর, ব্যক্তিকে পরিষ্কৃত করা যত কষ্টের, পরিষ্কৃত রাখা ততোধিক কষ্টের, এই কারণে তাহারা অত ভুগিয়া থাকে। এই কথাগুলি যদি বেশ মন দিয়া বুঝিয়া থাকি, তবে আমরা সহজেই বুঝিব, ব্রাহ্মণদিগের বেলায় কেন দশ দিন এবং অপরের বেলায় কেন ১৫ অথবা ৩০ দিনের ব্যবস্থা ছিল। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, এত সংখ্যা থাকিতে দশ দিনের কম অশৌচ হয় না কেন? যাঁহারা চিকিৎসাশাস্ত্রের কিছু জানেন, তাঁহারা ইহার কারণ সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। যে কোনও সংক্রামক ব্যাধির সংস্পর্শে আসিবামাত্রই সেই ব্যাধি আক্রমণ করে না; পরন্তু তাহার বিষ দেহাভ্যন্তরে উপ্ত হইতে সময় লয়। এইরূপে কোনও বিষ ১ দিন, কোনও বিষ ৭ দিন, কোনও বিষ ১২ দিন সময় লয়। স্মরণ রাখিবার সুবিধার জন্যও গড়পড়্তা-হিসাবে এই জন্যই বোধ হয়, দশ দিনের জন্য অশৌচকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব বেশ বুঝা যায় যে, ব্যাধির গুপ্তাবস্থার কালানুসারে সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতবর্ণের জন্য দশ দিবস ও নিরক্ষর মলিনতা-দীনতাদুষ্ট ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাসকাল অশৌচের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। চাউল-কদলী-সংগ্রহের সুবিধার্থই এবম্ভূত ব্যবস্থা করা হয় নাই।

অপ্রাসঙ্গিক হইলেও জিজ্ঞাসা করি,—এই তথাকথিত সাম্য-বাদের যুগে, বঙ্গীয় খৃষ্টীয়ান্ ও ব্রাহ্ম ভ্রাতারা কি নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগের বিবাহকালে শ্রেষ্ঠবর্ণের পাত্র-পাত্রীই খুঁজিয়া থাকেন না ? মোগল-পাঠানবংশীয় মুসলমান ভ্রাতারা কি কখনও স্বেচ্ছায় এ দেশী মুসলমানদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করিতে চাহেন ? এই বর্জ্জনের হেতু কি কিছু নাই ? উচ্চবংশগত কৌলীন্যের মর্য্যাদা কি নাই ? বলা বাহুল্য, চর্ম্মগত বা চেহারাগত সুশ্রীই লক্ষ্য নহে—বহু-পুরুষগত সংস্কার ও উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা, আচার, ব্যবহারই ঐ সকল লোকের লক্ষ্য। তবেই দেখা যাইতেছে যে, বংশগত কৌলীন্যের একটা মর্য্যাদা থাকা অবশ্যম্ভাবী। বংশগত শুদ্ধাচার, সদাচার ও নিষ্ঠা একত্র বিজড়িত হওয়া প্রাকৃতিক নিয়ম। যে কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিকে একটা ইঙ্গিতে যতটা ফল হয়, আর অশিক্ষিত ব্যক্তিকে বর্ষকাল ধরিয়া শিখাইয়াও তাহার অর্দ্ধেকও ফল পাওয়া যায় না, সেই কারণে স্বল্পকাল অশৌচগ্রহণেই (অর্থাৎ Quarantine) উচ্চবর্ণের কায হয়, কিন্তু মাসাধিককালের কমে নীচবর্ণের কায হয় না।

রন্ধনের মৃৎপাত্রত্যাগের কারণ অতীব সুলভ। মৃৎপাত্রে বহুকাল ধরিয়া রন্ধনকার্য্য চালান যায়ও না এবং যাওয়া উচিতও নহে। এই হেতু হিন্দুরা অতি সামান্য সামান্য কারণেই তাহাদিগকে বদ্লাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গৃহে অশৌচ হইলে বা বংশে অশৌচের সংবাদ শুনিলেই যে পাত্রস্থ খাদ্য-দ্রব্যাদি ভূতপ্রেতস্পৃষ্ট হয়—এ বিশ্বাস এই পাত্রবর্জ্জনের মূলে নাই, বলাই বাহুল্য। পরন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় প্রেততত্ত্বজ্ঞ জাতি এ পর্য্যন্ত জন্মায় নাই—তাঁহারা যে এত জ্ঞানী হইয়া এমন কুসংস্কারাপন্ন হইবেন, এরূপ মনে করাই অন্যায়।

ধোপা-নাপিত বন্ধ রাখা, নিজ আসন ভিন্ন উপবেশনের নিষেধ ও ভিক্ষা না দেওয়ার হেতু একই—রোগের সংক্রমণ নিবারণ করা। আজকাল বহুসংখ্যক উপায়ে—যথা—রেলবিস্তার, পথঘাটের বাহুল্য, সংবাদপত্রের বিস্তৃতি ও তাড়িতবার্ত্তার প্রভাব প্রভৃতি নানা উপায়ে এক স্থানের সংবাদ অতি অল্পসময়ে স্থানান্তরে প্রচারিত হইতে অবসর পায় ; কিন্তু বোধ হয়, হিন্দুদিগের সময়ে এত সহজে সংবাদ-প্রচারের সুবিধা ছিল না অথচ তৎকালে সংক্রামক ব্যাধিরও অভাব ছিল না। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা এমন সাধারণভাবে সামাজিক বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, যাহার দ্বারা কাহারও বাড়ীতে সংক্রামক ব্যাধি হইলেও তাহা ব্যাপ্ত হইবার অবসর পাইবে না।

নগ্নপদে ভ্রমণ, "কাচাগ্রহণ," হবিষ্যান্ন ভোজন, মাছ, মাংস, তৈল ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন—এগুলি কতকটা সংযম-শিক্ষা হিসাবে, কতকটা লোকলজ্জা হিসাবে, কতকটা মানসিক শোকজ্ঞাপনার্থ বিহিত হইয়াছে। সে কালের লোকেরা এ কালের লোকের মত রাত-দিন পাদুকা ব্যবহার করিতেন কি না জানা নাই ; তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যে ব্যক্তিরা সদাসর্ব্বদা নগ্নপদে ভ্রমণ করেন, সর্দ্দি ব্যাধিটা তাঁহাদের অজ্ঞাত। আমরা আজকাল যেরূপ রাত-দিন মোজা-জুতা আঁটিয়া থাকি, আমাদিগের পক্ষে নগ্নপদ হওয়া আর ব্যারামকে আহ্বান করা একই কথা হইয়া পড়িয়াছে। কাযেই আমরা নগ্নপদ হওনের ব্যবস্থার মর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম।

অশৌচকালের আহার্য্য অতীব বিজ্ঞানসম্মত। সিদ্ধ তণ্ডুলান্ন অপেক্ষা আতপ তণ্ডুলান্ন বহুগুণ পুষ্টিকর ; মটর ডাইল মাংসাপেক্ষা কোনওরূপ কম পুষ্টিকর নহে ; অন্নে ও মটর ডালে স্নেহময় পদার্থের অভাব থাকায় ঘৃত ভোজনেরও ব্যবস্থা হইয়াছে। পরন্তু এই আহার্য্য বিজ্ঞানকল্পিত complete food অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর খাদ্য। মৎস্য ও মাংস কামোদ্দীপকবিধায়ে মৎস্য মাংস নিষিদ্ধ। তৈল অপেক্ষা ঘৃত সহজপাচ্যবিধায় ঘৃতই ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ফলকথা, যে দিক্ হইতেই দেখা যাইতেছে, সেই দিকেই বুঝা যায় যে, হিন্দুদিগের অশৌচব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ-রূপে স্বাস্থ্যানুকূল বিজ্ঞানানুমোদিত ব্যবস্থা। কিন্তু বর্ত্তমান-কালে তাহার অপভ্রংশ দেখিলে মনে হয়, আমরা কি সেই ঋষিগণের বংশধর ? এক প্রসবাগার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেই আমার কথার অর্থ উপলব্ধ হইবে।

(২) জননাশৌচ।

আমরা জানি ও হিন্দুরাও জানিতেন যে, শরীরের কোনও স্থান ক্ষত হইলে তাহা সহজেই রোগজীবাণুদুষ্ট হইয়া নানারূপ কঠিন পীড়া আনে, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্তও সংশয়াপন্ন করে। এই জন্যই ক্ষতস্থানটিকে প্রলেপ-সিক্ত করিয়া পরিষ্কার কাপড়ের খণ্ডদ্বারা বাঁধিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে। যখন রমণী প্রসব করেন, তখন তাহার জরায়ুগাত্রে ৮।১০ ইঞ্চি পরিধিযুক্ত একটি ক্ষতস্থান সৃষ্ট হয়। গর্ভাবস্থায় ঐ স্থানটিতে "ফুল" সংলগ্ন থাকে ; প্রসবান্তে "ফুল" পড়িয়া গেলে, জরায়ুগাত্রে সেই স্থানে প্রকাণ্ড ক্ষত দৃষ্ট হয়। রমণীর দেহ যে যে পরিচ্ছদ সংস্পৃষ্ট হয়, তিনি যে বস্ত্র, তুলা বা জল ব্যবহার করেন এবং তিনি যে ভূমিতে বা শয্যাতে বসেন এবং তাঁহার গৃহে যে বায়ু সঞ্চালিত হয়, ইহাদের সকলগুলি হইতেই ঐ জরায়ুজ ক্ষত দুষ্ট হইয়া পড়িতে পারে। এ কথা কে না জানেন ? কিন্তু কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি এই সকল জানিয়া শুনিয়াও নিজ পুরাঙ্গনাদের লোকাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতেছেন ? যে কোনও হিন্দুগৃহে যান, দেখিবেন, প্রসবের জন্য বাটীর মধ্যে অপকৃষ্ট ঘরটিই নির্দ্দিষ্ট হয়। সে ঘরটি হয় ত অতীব অন্ধকারময়, আর্দ্র, বায়ুসঞ্চারহীন, গো-গৃহ বা পায়খানার নিকটবর্ত্তী ! প্রসূতির ব্যবহারের জন্য যে শয্যাদ্রব্য দেওয়া হয়—তাহা

ত্যক্ত মাছুর, ত্যক্ত কম্বল, ছিন্ন কন্থা, মলিন উপাধান! প্রসূতির পানভোজনের জন্ম মৃৎপাত্র দেওয়া হয়—অধিকাংশ স্থলে একই পাত্র উপর্য্যুপরি প্রত্যহই ব্যবহৃত হয়। প্রসূতির পরিচারিকা এক জন হাড়ী বা তজ্জাতীয়া! সর্ব্বাপেক্ষা সুবন্দোবস্ত—সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময় আচার—যে ব্যক্তি প্রসূতির গৃহে যাইবে, সে ময়লা কাপড়ে যাইবে, কিন্তু বাহিরে আসিয়া সে কাপড় ত্যাগ করিবে! পাঠক, এতদপেক্ষা "উল্টা বুঝ্‌লি রামের" করুণ দৃষ্টান্ত আর দেখাইতে পার কি?

চরক-সংহিতায় প্রসবগৃহসম্বন্ধে এই এই লিখিত আছে,—"প্রশস্তরূপ-রস-গন্ধায়াং ভূমৌ উপ-লিপ্ত-ভিত্তিং সুবিভক্ত-পরিচ্ছদং প্রাক্‌দ্বারং দক্ষিণ-দ্বারং বা অষ্টহস্তায়তং চতুর্হস্তবিস্তৃতং বিধেয়ম্।" অর্থাৎ "সূতিকা গৃহটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক। ঘরের ভিতরের পরিসর দৈর্ঘ্যে ৮ হাত, প্রস্থে চারি হাত (প্রায় ১২ ফীট × ৬½ ফীট) হইবে। দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বদিকে দ্বার থাকিবে। ঘরের মেজে সমতল ও সুপরিষ্কৃত হইবে এবং সূতিকাগৃহ মৃণ্ময় হইলে ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গাত্রসকল গোময় ও মৃত্তিকাদ্বারা লেপিত হওয়া আবশ্যক। ঘরের মধ্যে কোনওরূপ দুর্গন্ধাদি থাকিবে না ও ঘরখানি দেখিতে বেশ সুদৃশ্য হইবে এবং যে স্থানে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হইবে, সে স্থান যেন জলসিক্ত বা অন্য কোনও কারণে অপ্রশস্ত না হয়।" আমার টিপ্পনী করা অনাবশ্যক। কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য—সকল শাস্ত্রের অনুজ্ঞা কি শুনুন, আর বাঙ্গালীর বাড়ী বাড়ী কি জঘন্য ব্যবস্থা হয়, তাহা নিজ নিজ বক্ষে হাত দিয়া স্মরণ করুন। আর একবার "সাধভক্ষণ" ও "পেঁচোয় পাওয়ার" কথা মনে করুন। যে দেশে সাক্ষাৎ যমরাজ্যের চতুঃসীমার মধ্যে ও যমরাজ্যানুমোদিত অবস্থার মধ্যে প্রসূতিগৃহ রচিত হয়, সে দেশে প্রসূত হওয়াটা জীবনমরণ ব্যাপার বলিয়া যে গণ্য হইবে এবং (হয় ত বা) চিরজন্মের মত সাধভক্ষণ করানর ব্যবস্থা থাকিবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? আমরা যাহাকে চিকিৎসার ভাষায় টিটেনাস্‌ বা ধনুষ্টঙ্কার বলি, সেই ব্যাধিই এতদিন "পেঁচোয় পাওয়া" নামে উপদেবতার কীর্ত্তিবোধে লুব্ধ পুরোহিতকর্ত্তৃক চর্চ্চিত হইতেছিল! ব্রাহ্মণেরা সমাজের নেতা ছিলেন, তখন তাঁহারা নির্লোভ ও শাস্ত্রচর্চ্চানুরত ছিলেন; এখন তাঁহাদের শাস্ত্র গিয়াছে, তাঁহাদের বুদ্ধিও লোপ পাইয়াছে—আজ তাই কয়েকটি মূর্খ ব্রাহ্মণসন্তান উপকথা, উপদেবতা, উপ-আচার, উপ-ব্যবহারের উপসর্গে সমাজকে পীড়ন করিয়া উপজীবিকা অর্জ্জন করিতেছেন!

ফলকথা, যদি আমরা হিন্দুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চাই, তবে ঐ ভাবে প্রসবগৃহ করিলে চলিবে না। বাটীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহটিই প্রসবগৃহ হওয়া চাই—যে গৃহ শুষ্ক—যে গৃহ জীর্ণ ভগ্ন নহে, যে গৃহে ময়লা নাই—দুর্গন্ধ নাই, যে গৃহ প্রশস্ত—বায়ুসঞ্চরণপূর্ণ, যে গৃহ পায়খানা—গোয়াল—নর্দ্দমা হইতে বহুদূরে, সেই গৃহেই প্রসব করান চাই। প্রসূতির ব্যবহারের জন্ম শয্যা, শয্যাস্তরণ, উপাধান, সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। প্রসবকার্য্য পালঙ্কের উপরে হইলেই ভাল হয়—এ কথা চরক ঋষিও আদেশ করেন। প্রসূতির ব্যবহার্য্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি সর্ব্বাঙ্গরূপে পরিষ্কার হওয়া চাই। নীচজাতীয়া মলিনতাদুষ্টা হাড়ী "ধাই" না রাখিয়া বাড়ীর অপর মেয়েদেরই মধ্যে প্রসূতির সেবার কার্য্য বণ্টন করিয়া লওয়া বাঞ্ছনীয়। যে কেহ প্রসবগৃহে প্রবেশ করিবেন, তিনি যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া—পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিয়া তবে প্রসবগৃহে যাইবেন—বাহিরে আসিয়া তিনি পুনরায় বস্ত্রত্যাগ বা স্নান করিতে পারেন—তাহাতে কিছু আসে যায় না। মোট কথা এই—বাহিরের কোনও ময়লা প্রসূতির গৃহে যাইবে না; যে হেতু ময়লা কাপড়-চোপড়, দূষিত বায়ু, ময়লা হাত, ময়লা জল—সকলগুলি হইতেই রোগবীজ প্রসূতির জরায়ুস্থ ক্ষতকে দুষ্ট করিয়া তাঁহার প্রাণসংশয় করিয়া তুলিতে পারে।

(৩) পানভোজন।

আহারসম্বন্ধে কথা বলা বড়ই শক্ত, যে হেতু, আজ আমরা ঠিক্ কতটুকু হিন্দুয়ানী তাহাতে রাখিয়াছি, তাহা বলা বড় শক্ত। বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ভোজনটা আধা হিন্দু, আধা মোগলাই, আধা ইংরাজী। সে যাহাই হউক, খাঁটি হিন্দুয়ানীর সন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালীর খাবার পর পর এই :—প্রথমে গণ্ডূষ, পরে সুক্ত (তিক্ত), পরে ঘৃত, পরে নানারূপ ব্যঞ্জন, শেষে অম্ল ও সর্ব্বশেষ মিষ্টান্ন। খাঁটি হিন্দুভোজনের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ে মাংসের স্থান নাই। কিন্তু ভাতের সঙ্গে ঘৃতের ও অপর ডাইলের মধ্যে মুগ ডাইলেরই আদর বেশী। এতদ্ব্যতীত হিন্দু স্বপাক-ভোজন করেন। হিন্দুরা ভোজনক্রিয়াটাকে ধর্ম্মের একটা অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন, হিন্দুরা ভোজনস্থানাস্থান বিচার করিয়া ভোজনে বসেন। এগুলির মধ্যে কতটা বিজ্ঞান বা যুক্তি আছে, তাহা দেখা যাউক।

প্রথমতঃ—আহারটাকে ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক মনে করা। ধর্ম্মভাবের সঙ্গে মনের পবিত্রতা ও সংযমের নিত্য সম্বন্ধ, এই জন্য আহার করিতে বসিয়া গুরুভোজনের সম্ভাবনা কম। যাঁহারা আহার করিতে করিতে গল্প করেন, তাঁহারা ঠিক যে ভাল করিয়া চর্ব্বণ করেন বা সকল সময়ে আহারের স্বাদ গ্রহণ করেন, এমন মনে হয় না। আহারে বসিয়া গল্প করিলে অনেক সময়ে ভোজনের মাত্রাও বেশী হইয়া পড়িতে পারে এবং অমনোযোগিতাবশতঃ অখাদ্য কিছু দৈবাৎ উদরসাৎ হইতে পারে ও বিষম লাগিয়া বিপদ্ হইতে পারে। এই জন্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া ধর্ম্মভাবে সংযত হইয়া পরিষ্কৃত স্থানে আহার করার এত আদর।

যে হিন্দুরা আহারকে এত পবিত্র মনে করেন, তাঁহাদের মধ্যে উচ্ছিষ্টভোজনব্যাপারটা কি বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয় না? ইহার উত্তরে সেই "উল্টা বুঝ্‌লি" কথাটিই বলিতে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে প্রসাদভক্ষণের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোথাও উচ্ছিষ্টভোজনের ব্যবস্থা নাই। বাঙ্গালার লোকাচারে কথায় "প্রসাদ" আছে, কার্য্যে "উচ্ছিষ্টভোজনই" আছে। হিন্দুশাস্ত্রকারেরা কখনও উচ্ছিষ্টভোজনের অনুমোদন করেন নাই, তাঁহারা প্রসাদেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। "প্রসাদ" বলিলে উচ্ছিষ্টান্ন বুঝায় না, প্রসাদ বলিলে সেই খাবারকে বুঝায়—যাহা কোনও গুরুলোক প্রসন্নচিত্তে অবলোকন করিয়া আশীর্ব্বাদপূত করিয়া দিয়াছেন। শাস্ত্রের ব্যবস্থা কোথায় আর আজ লোকাচারের প্রভাব কোথায়! ইহাকেই বলে—"কোথাকার জল কোথায় মরে!"

দ্বিতীয়তঃ—শারীরিক পরিপোষণে আহারের সম্পূর্ণতা। এ কথাটি একটু বিশদ করিয়া না বুঝাইলে সাধারণের বোধগম্য হইবে না। আহারটা উপভোগের বা বিলাসের সামগ্রী নহে। নিত্য শারীরিক ক্ষয় পরিপূরণ করা, শারীরিক দৈনিক কর্ম্ম যথাসম্ভব সর্ব্বাংশেই সম্পূর্ণ করা এবং তাহার গঠনে বা পরিপোষণে সহায়তা করাই খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য।...পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ঐ সকল কায করিতে হইলে, ছয় জাতীয় খাদ্য দ্রব্য খাওয়া উচিত। সেগুলি যথা:—(১) ছানা বা মাংসজাতীয় খাদ্য; ইহাদের দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ ও সৌষ্ঠবলাভ ঘটিয়া থাকে। মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, মৎস্য, ছানা, পনির—এই জাতীয় খাদ্য। (২) স্নেহময় পদার্থ—যথা তৈল, ঘৃত, মাখন, চর্ব্বি; ইহাদের দ্বারা শারীরিক উত্তাপ রক্ষা ও পেশীসঞ্চলন কার্য্য সমাধা হয়। (৩) শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য—যথা চাউল, আটা, ময়দা, সুজি, খৈ, মুড়ি, মুড়কী, শাকসব্জী, সাগু, বার্লি প্রভৃতি; ইহাদের দ্বারাও শারীরিক উত্তাপ রক্ষা ও পেশী সঞ্চলন কার্য্য হইয়া থাকে। (৪) লবণ, (৫) জল ও (৬) রোগক্ষয়নিবারক রস। এই শেষোক্ত জিনিষটিকে ইংরাজীতে (Vitamine) ভিটামীন্ কহে। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে বেরীবেরী, স্কার্ভি প্রভৃতি ব্যারাম জন্মে। টাট্‌কা ফলের রসে, টাট্‌কা মাংসে, চাউলের গাত্রসংলগ্ন রক্তাবরণে ইহা থাকে। এই জন্য হিন্দুদিগের মধ্যে ফলের আদর এত বেশী এবং বোধ হয়, এই জন্যই নিত্য অন্নভোজনও হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার ডাইলের মধ্যে মুগের ডাইলে এই ভিটামীন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আছে। অতএব কাঁচা মুগের ডাইল ভিজাইয়া খাওয়া [illegible] অপরাপর ডালের অপেক্ষা মুগের ডাইলই খাওয়া [illegible] অত্যন্তরূপে বিজ্ঞানসম্মত, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে। হিন্দুরা অত্যন্ত মেধাবী জাতি এবং মস্তিষ্কের চালনা তাঁহাদিগের মধ্যে অতিশয় প্রবল। এই কারণেই [illegible] হিন্দুরা কিছু বেশী বুঝেন। ডাক্তার ব্রান্টন ঘৃতকেই সর্ব্বাপেক্ষা মেধাবৃদ্ধিকর খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শীতপ্রধান পাশ্চাত্যদেশের খাদ্যমধ্যে মাংসের প্রাধান্য থাকিলেও গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালাদেশের পক্ষে শ্বেতসারবহুল অন্নই যে উত্তম পথ্য, তাহা বৈজ্ঞানিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। আর্য্যগণ যে মাংস খাইতেন না বা হিন্দুরাও যে মাংস খাইতেন না, এমন কথা বলি না। বৌদ্ধযুগের তথা বৌদ্ধরাজার (অশোকের) সার্ব্বভৌম্যে এ দেশে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানের মতে ছাগমাংসই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিবিবর্জ্জিত মাংস। ছাগমাংসভোজনে যক্ষ্মা প্রভৃতি মারাত্মক রোগ জন্মে না।

হিন্দুদিগের মধ্যে চায়ের প্রচলন ছিল না বটে, কিন্তু গুড়, মধু ও চিনির অত্যন্ত আদর ছিল। কেহ পরিশ্রান্ত হইলে এখনও পল্লীগ্রামে গুড় ও জল দেওয়া যায়। সুরাসেবী য়ুরোপ এককালে সুরার ও মাংসসারের (Meat extract) শতমুখে প্রশংসা করিতেন; সৈনিকগণের জন্য ও সামরিক অশ্ববৃন্দের জন্য পরিশ্রমের পরে সুরাসার ও মাংসসারের ব্যবস্থা ছিল; এখন তৎপরিবর্ত্তে শর্করাখণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া থাকে। চিনির এরূপ শ্রমহারী গুণের কথা হিন্দুরা বহুপূর্ব্বে জানিতেন। চিনির সম্বন্ধে আর একটি গুণ পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান এত দিন পরে শিখিতেছেন। সেটি "মধুরেণ সমাপয়েৎ"। হিন্দুদের এই আদেশ বিজ্ঞানানুমোদিত। আহারের প্রথমে তিক্ত রস ও শেষে মিষ্টরসের ব্যবস্থা সম্পূর্ণই বিজ্ঞানসম্মত। আহারের পূর্ব্বে সূপ (soup) বা সুক্তভোজনে পরিপাকক্রিয়া আরও বেশী হয়। শূন্যোদরে চিনি খাইলে পাকস্থলীর ভীষণ উত্তেজনা হয়; এই জন্য হিন্দুরা চিরকালই ভোজনের শেষে মিষ্টান্নভোজন করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ পুনরায় "উল্টা বুঝিয়াছে"! আমাদের দেশে বহুক্ষণ উপবাসী থাকার পরে এক গ্লাস সরবৎ খাওয়ার ব্যবস্থা কে করিল? আমার বিশ্বাস—ইহা আর্য্য প্রথা নহে, ইহা মোগলাই প্রথা। শূন্যোদরে এক গ্লাস সরবৎ খাইলেই তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা নষ্ট হয়, তৎপরবর্ত্তী আহার সহজে পরিপাক হয় না, পেট ভার হইয়া থাকে।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ায় এইবারে এইখানেই উপসংহার করিলাম। আশা করি, এই প্রবন্ধে তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা এই তিনটি সত্য প্রমাণ করিতে পারিয়াছি:—

(১) হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত প্রকৃত শাস্ত্রীয় আচারব্যবহারগুলি সর্ব্বাংশেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানসম্মত।

(২) বর্ত্তমান সময়ে অনেক স্থলে অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা প্রবেশ করিয়া শাস্ত্রীয় আচারকে লোপ করিয়া লোকাচারকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

(৩) শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য—সেই সকল দুষ্ট লোকাচারগুলির ক্রমশঃ নষ্ট করা।

গান।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস লিখিত।]

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যায়ামের উপকারিতা।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কণ্ঠস্বরসাধনা করিতে হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই ব্যায়ামসাধনা করিলে কণ্ঠস্বরের উৎকর্ষতালাভ ব্যতীত স্বাস্থ্যের উন্নতি, দেহে বল-সঞ্চার ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। গায়কের স্বাস্থ্যহানি হইলে কণ্ঠস্বর বিকৃত হয় ও মনে সম্যক্‌রূপে সঙ্গীতের রস স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না। সেই জন্য তিনি নিজে গান করিয়া আনন্দলাভে বঞ্চিত ও শ্রোতৃগণের মনোরঞ্জনে অসমর্থ হন। নিয়ম করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যার সময় ১৫।২০ মিনিট কাল শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম সাধনা করিলে রোগাক্রমণের সম্ভাবনা হ্রাস হইয়া যায়। শ্বাস কাশ, যক্ষ্মা—বিশেষতঃ শ্বাসযন্ত্র বা ফুসফুসসংক্রান্ত রোগসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না এবং আক্রমণের সূত্রপাত হইলেও ক্রমে তাহা নির্ম্মূল হইয়া যায়; দেহ ক্রমে সবল ও অধিকতর কার্য্যক্ষম হয় এবং সেই জন্য মনও সর্ব্বদা প্রফুল্লিত থাকে। বালক-বালিকাগণ এই ব্যায়াম অভ্যাস করিলে গঠনের স্বাভাবিক উন্নতি (Natural Development) এবং দৈর্ঘ্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

ব্যায়ামকালের পরিচ্ছদ।

প্রথমে এই শ্বাসপ্রশ্বাসসংক্রান্ত কতিপয় অত্যাবশ্যক সাধন উল্লেখ করিয়া তৎপরে কণ্ঠস্বরসাধনার বিষয় আরম্ভ করিব। ব্যায়ামসাধন করিবার সময় গেঞ্জি অথবা কোন লঘুভার ও শ্লথ পরিচ্ছদ পরিধান কর্ত্তব্য।

প্রথম সাধন।

উভয় গুল্‌ফের (গোড়ালীর) উপর সমভাবে ভর দিয়া ঠিক সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইবে। গুল্‌ফ দুইটি যেন ৮ ইঞ্চি ব্যবধানে ও পদের অগ্রভাগদ্বয় ১ম চিত্রের ন্যায় কিছু বহির্দ্দিকে ফিরিয়া থাকে। বক্ষঃ, পৃষ্ঠ, মস্তক ও গ্রীবা ঠিক সোজাভাবে এবং দুই হস্ত উভয়পার্শ্বে যেন সমানভাবে ঝুলিতে থাকে। এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান অবস্থার নাম **প্রথমাবস্থা**। এই প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান ও মুখবন্ধ করিয়া কেবল নাসিকাদ্বারা নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাসবায়ু গ্রহণ ও তৎসঙ্গে মনে মনে এক, দুই, তিন, চার করিয়া সংখ্যাগণনা করিতে থাকিবে। বায়ুগ্রহণের সময় কেবল বক্ষঃপ্রদেশ স্ফীত হইয়া উপরে উঠিবে, কিন্তু উদর স্ফীত হইবে না এবং স্কন্ধ দুইটি যেন উপরে না উঠে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। এইরূপে যত সংখ্যা গণনা করিয়া নিঃশ্বাস-বায়ুদ্বারা বক্ষঃপূর্ণ করিবে, তাহা মনে রাখিবে ও প্রতিবার নিঃশ্বাস টানিবার সময় তত সংখ্যা গণনা করিয়া বক্ষঃ বায়ু-পূর্ণ করিবে। নিঃশ্বাস টানিয়া বক্ষঃ সম্পূর্ণরূপে বায়ুপূর্ণ অর্থাৎ বায়ু টানিবার ক্ষমতা শেষ হইলে মুখ অল্প খুলিয়া অতি ধীরে ও নিঃশব্দে যত সংখ্যা গণনা করিয়া নিঃশ্বাস টানা হইয়াছিল, তত সংখ্যা মনে মনে গণনা করিতে করিতে মুখ দিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে। চারিবার করিয়া এইরূপ দীর্ঘ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করিয়া চারিবার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। পুনরায় চারিবার এইরূপ দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। কিন্তু এইবারে মুখ দিয়া শ্বাসত্যাগ না করিয়া নাসিকা দিয়া ত্যাগ করিবে। এইরূপে প্রথমে চারিবার দীর্ঘশ্বাস নাসিকাদ্বারা টানা ও মুখ দিয়া ফেলা, পরে চারিবার সহজ শ্বাস প্রশ্বাস, পরে চারিবার নাসিকাদ্বারা দীর্ঘ-নিশ্বাস টানা ও ছাড়া, পুনরায় চারিবার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস, পরে চারিবার নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস টানা ও মুখ দিয়া ছাড়া, চারিবার সহজ শ্বাস প্রশ্বাস এবং চারিবার নাসিকায় দীর্ঘশ্বাস টানা ও ছাড়া, পরে চারিবার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ১৬বার দীর্ঘ ও ১৬বার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস হইলেই প্রথম সাধন পূর্ণ হইবে।

সাধনের সময়।

এই সাধনসমূহ প্রথমে দিবসে চারিবার অর্থাৎ প্রাতে, দ্বিপ্রহরে, সন্ধ্যায় ও রাত্রি ৯টা হইতে ১১টার মধ্যে সাধনা করিবে। সাধনার সময় যেন উদর পূর্ণ না থাকে অর্থাৎ আহার করিবার পূর্ব্বে অথবা ৩।৪ ঘণ্টা পরে সাধনা করিবে। বালক, বালিকা, মহিলা ও শীর্ণকায় ব্যক্তিগণ এই প্রথম সাধন আরম্ভসময়ে প্রথম সপ্তাহ উপাধানবিহীন হইয়া (বালিসে মাথা না রাখিয়া) উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়নাবস্থায়, দ্বিতীয় সপ্তাহে উপবেশনাবস্থায় এবং তৃতীয় সপ্তাহ হইতে উপরের বর্ণনামত দণ্ডায়মান অবস্থায় সাধনা করিবে।

ব্যক্তিবিশেষে সাধনের পার্থক্য।

দ্বিতীয় সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে, কিন্তু পদদ্বয় ১৮ ইঞ্চি ব্যবধানে থাকিবে। উভয়পার্শ্বে হস্তদ্বয় দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ
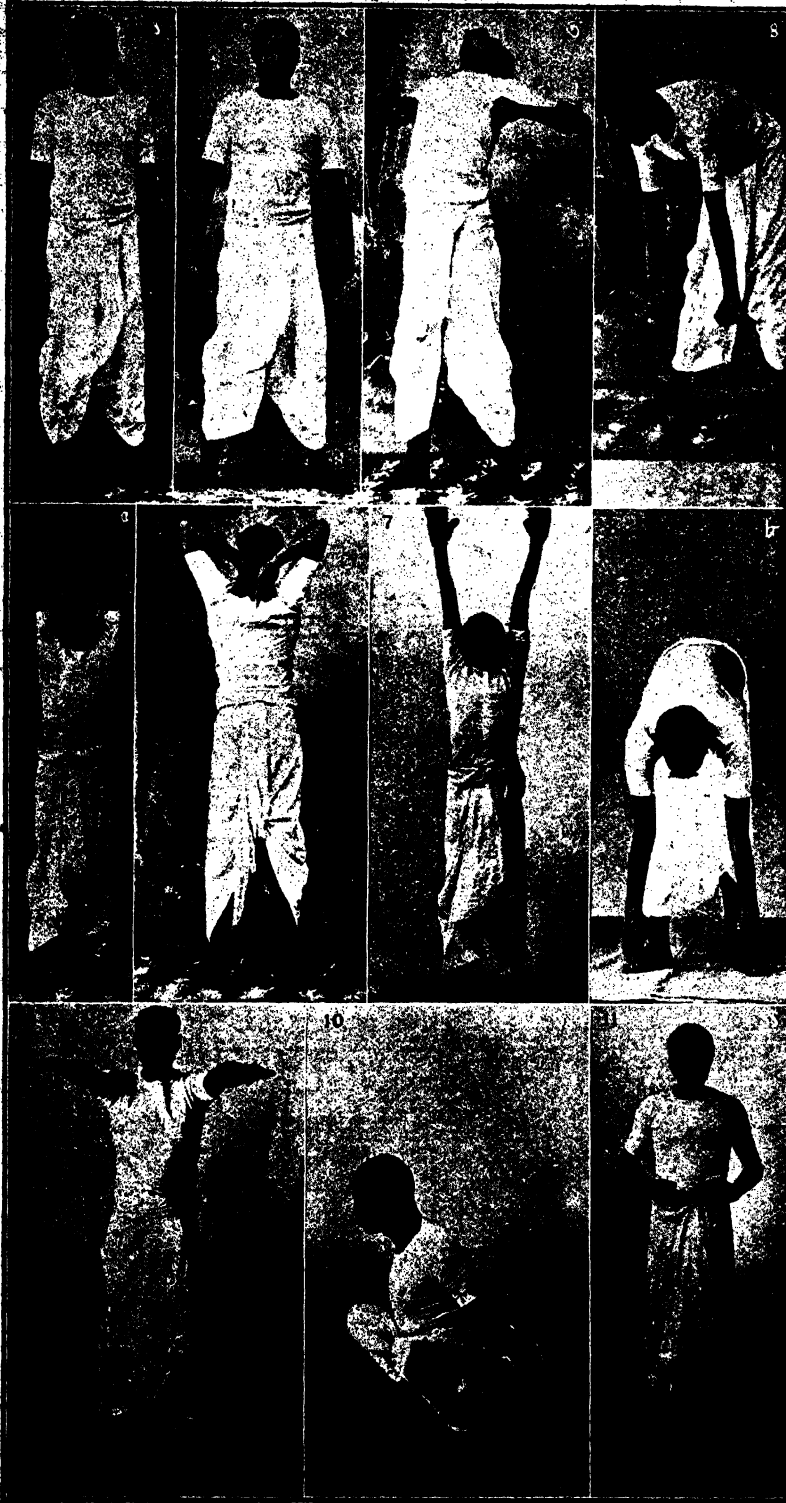
করিয়া মুষ্টি শরীরের দিকে ফিরাইবে ও কনুই এবং করতল বহির্দ্দিকে থাকিবে (২য় চিত্র); মুষ্টি ক্রমে ক্রমে উত্তোলন করিয়া কুক্ষির (বগলের) নিকটে আসিতে থাকিবে ও তৎসঙ্গে মনে মনে পূর্ব্ববৎ সংখ্যা গণনা করিয়া ধীরে ধীরে নাসিকাদ্বারা নিঃশব্দে শ্বাসগ্রহণ করিতে থাকিবে, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলন করিবার সময় যেমন কোন ভারী বস্তু ধারণ করিয়া উত্তোলন করিতে হস্ত ও শরীরের পেশীসমূহ কঠিন হয়, তাহা করিবে। মুষ্টি কুক্ষির নিকটে আনিবার পর ক্রমে দেহের উপরিভাগ গ্রীবা ও মস্তক পশ্চাদ্দিকে যত দূর আসিতে পারে, তাহা আনিবে (৩য় চিত্র) ও শ্বাসগ্রহণ এবং সংখ্যা গণনা শেষ করিবে। পরে যত সংখ্যা গণনা করিয়া শ্বাসগ্রহণ করা হইয়াছিল, তত সংখ্যা গণনা ও নাসিকাদ্বারা শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে ক্রমানুসারে সম্মুখদিকে হেঁট হইয়া হস্তদ্বয় উভয়পার্শ্বে নামাইবে ও শ্বাসত্যাগ এবং সংখ্যা গণনা শেষ করিবে (৪র্থ চিত্র)। এই প্রক্রিয়া প্রতি চারিবার করিয়া মধ্যে চারিবার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্রমে সর্ব্বসমেত ১৬বার প্রক্রিয়া ও ১৬বার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস লইলে ২য় সাধন পূর্ণ হইবে।

তৃতীয় সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। হস্তদ্বয় দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ

করিয়া নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা করিতে থাকিবে এবং ক্রমে ক্রমে বিস্তৃতভাবে উভয় পার্শ্ব দিয়া মস্তকোপরি মুষ্টিদ্বয় উত্তোলিত ও স্পর্শ করিবে (৫ম চিত্র)। পরে মুষ্টিদ্বয় নিম্ন করিয়া গ্রীবার পশ্চাতে আনয়ন করিবে (৬ষ্ঠ চিত্র)। পরে ধীরে ধীরে শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনা করিতে করিতে মুষ্টিদ্বয় যেরূপে পূর্ব্বে চালিত হইয়াছিল, তাহার বিপরীতভাবে চালনা করিয়া প্রথমাবস্থায় আসিবে ও শ্বাসত্যাগ এবং সংখ্যাগণনা শেষ হইবে। এই প্রক্রিয়া প্রতি চারিবার ও মধ্যে সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস চারিবার, এইরূপ ক্রমে সর্ব্বসমেত ১৬বার প্রক্রিয়া ও ১৬ বার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস লইবে।

চতুর্থ সাধন।

প্রথমাবস্থায় পদদ্বয় ১৮ ইঞ্চি ব্যবধান করিয়া দণ্ডায়মান হইবে। শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা করিতে করিতে হস্তদ্বয় উভয়পার্শ্ব দিয়া বিস্তৃতভাবে উত্তোলিত করিয়া স্কন্ধের সমান হইবে এবং ক্রমে উত্তোলিত করিয়া মস্তকের দুই পার্শ্বে বাহুদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে সমান হইয়া আসিবে (৭ম চিত্র)। পরে শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে হস্তদ্বয় সম্মুখদিকে ক্রমে স্কন্ধের সমান হইয়া আসিলে কটিদেশ হইতে দেহের উপরিভাগ ক্রমান্বয়ে নত করিয়া হস্তদ্বয়ের মধ্যমাঙ্গুলী পদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবে ও শ্বাস ত্যাগ এবং সংখ্যাগণনা শেষ হইবে (৮ম চিত্র)। দেহ নত করিয়া পদের অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিবার সময় যাহাতে জানু কুঞ্চিত না হয়, সে বিষয় বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। পূর্ব্ববৎ চারিবার করিয়া উক্ত প্রক্রিয়া ও মধ্যে চারিবার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস, ক্রমে সর্ব্বসমেত ১৬বার প্রক্রিয়া ও ১৬বার সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস লইবে।

পঞ্চম সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে যখন হস্তদ্বয় ধীরে ধীরে সম্মুখদিকে স্কন্ধের সমান হইবে, সেই সঙ্গে পদের অগ্রভাগে ভর দিয়া গুল্‌ফদ্বয়ও ক্রমে ক্রমে ভূমি হইতে ঊর্দ্ধদিকে উঠিবে, যাহাতে সমস্ত দেহের ভার পদদ্বয়ের অগ্রভাগে অবস্থিত হয় (৯ম চিত্র)। পরে শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে ক্রমে গুল্‌ফদ্বয় ভূমিস্পর্শ করিবার পর, হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ক্রমে নিম্নদিকে দেহের পার্শ্ব দিয়া পশ্চাতে ও তৎসঙ্গে জানুদ্বয় কুঞ্চিত হইয়া দশম চিত্রের ন্যায় উপবেশন অবস্থায় আসিবে এবং শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবে। পুনরায় শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা করিতে করিতে হস্তদ্বয় ও তৎসঙ্গে দেহ ক্রমে উত্তোলিত করিয়া দণ্ডায়মান ও হস্তদ্বয় সম্মুখে স্কন্ধের সমান হইলে গুল্‌ফদ্বয়ও ক্রমে উত্তোলিত করিয়া নবম চিত্রের অবস্থায় আসিবে ও শ্বাসগ্রহণ শেষ করিবে। পুনরায় শ্বাসত্যাগ করিবার সঙ্গে সংখ্যাগণনা এবং হস্ত ও গুল্‌ফদ্বয় ক্রমে নত করিয়া প্রথমাবস্থায় আসিবে এবং তৎসঙ্গে শ্বাসত্যাস ও সংখ্যাগণনা শেষ হইবে। এই দ্বিত্ব (ডবল) প্রক্রিয়া ও সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস মধ্যে চারিবার ক্রমে সর্ব্বসমেত আটবার, দ্বিত্ব প্রক্রিয়া ও ষোলবার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস করিবে।

ষষ্ঠ সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান ও হস্তদ্বয় নাভির দুই পার্শ্বে অবস্থান করিবে (১১শ চিত্র)। ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সংখ্যাগণনা ও বক্ষঃ বায়ুপূর্ণ করিয়া শ্বাসরোধ করিবে এবং মনে মনে এক হইতে চার সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনা করিতে করিতে ক্রমে উদর কুঞ্চিত করিয়া (আঁত মারিয়া) নাভি পৃষ্ঠে স্পর্শ করাইবার চেষ্টা করিবে। যদ্যপি উদর কুঞ্চিত করিবার ক্ষমতা কম থাকে, তবে প্রথম কয়েক দিবস উদরের উপরস্থিত হস্তদ্বারা চাপ দিয়া কুঞ্চনের সহায়তা করিবে। ক্রমে হস্তের সাহায্য বিনা উদর আপনি কুঞ্চিত হইতে পারিবে। উদর কুঞ্চিত হওয়া ও শ্বাসরোধাবস্থায় ৪ সংখ্যা গণনা শেষ হইলে শ্বাসগ্রহণ করিবার সমান সংখ্যা গণনা করিতে করিতে ক্রমে শ্বাসত্যাগ ও উদর সমান অবস্থায় আনয়ন করিবে। শ্বাসরোধসময়ের সংখ্যা গণনা ৪।৫ সপ্তাহমধ্যে ক্রমে ৪ হইতে ৮ পর্য্যন্ত করিবে। পূর্ব্ববৎ চারিবার প্রক্রিয়া ও সহজ শ্বাস-প্রশ্বাস চারিবার, ক্রমে সর্ব্বসমেত ১৬বার প্রক্রিয়া ও ১৬বার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস হইবে। এই প্রক্রিয়াসাধনে অজীর্ণ (Dyspepsia) আরোগ্য ও দেহের কান্তি বৃদ্ধি হয়।
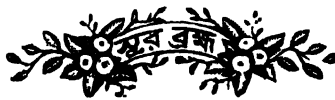
অশ্রুকণা।

[illegible]—কেবল বাঙ্গালায় কেন, প্রায় সব দেশেই—আজকাল গীতিকবিতাপুস্তকের এত বাহুল্য যে, নূতন একখানি কবিতাপুস্তক সমালোচনার্থ পাইলে সমালোচকের মনে প্রথমেই আতঙ্কের সঞ্চার হয়—বোধ হয়, পুস্তকপাঠ পণ্ডশ্রম হইবে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পুস্তকখানি সে জাতীয় নহে। ইহার গাম্ভীর্য্য ও গভীরতা ইহার বৈশিষ্ট্য। লেখিকা—নরেন্দ্রবালা মিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার স্বজনগণ এই পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। পুস্তকখানির নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা "মুমুক্ষু হৃদয়ের পবিত্র শোকাশ্রু।" ইহার ভূমিকায় লেখিকার গুণমুগ্ধা কোন মহিলা যথার্থই লিখিয়াছেন—"শরৎ প্রভাতের ক্ষুদ্র শেফালিকা যেমন আপনিই তরুতলে ঝরিয়া পড়ে, এই অশ্রুকণাগুলিও তেমনই আপনার ভারে আপনিই ঝরিয়া পড়িয়াছে।"

ইংরাজ কবি টেনিসন বলিয়াছেন—"I do but sing because I must"—হৃদয় যখন ভাবের ভারে পূর্ণ হয়, তখন কবিতা আপনি বাহির হয়—পর্ব্বতের অন্তরের কন্দরাও যেমনভাবে উৎস-বারি বাহির হয়, তেমনই ভাবে তাহা ভাষায় আত্মপ্রকাশ করে। সেই কবিতাই প্রকৃত কবিতা—কৃত্রিমতামুক্ত—স্বচ্ছ—নির্ম্মল।

হৃদয় যখন যে ভাবে পূর্ণ—তন্ময় তখন জাগরণে ও স্বপ্নে সেই একই ভাব দেখা দেয়। কবি বলিয়াছেন—

"ঘুমেতে সে ছবি কেন
জাগে এ নয়নপরে;
সে বাঁশী আবার কেন
বাজে এ নিরালা ঘরে?
নিশার স্বপন সে যে
চকিতে ফুরাযে গেছে,
তাহারি স্বপন পুনঃ
কেন মনে জাগিতেছে?
ফুল ত চলিয়া গেছে
সুবাস রয়েছে তা'র,
সুর গেছে, রেশটুকু
বাজে কাণে অনিবার।
গেল যদি সুখসাধ—
গেল যদি ভালবাসা.
কেন গো না যায় তবে
বুকভরা পোড়া আশা?"

এ কিসের আশা—যে আশা শ্মশানেও মানবকে সান্ত্বনা দেয়? যাহা মরণেও জীবনের পথনির্দ্দেশ করে? এ আশা পরপারের—অনন্ত মিলনের আশা। এই আশার স্বপ্নেই কবি বলিয়াছেন—"জীবন প্রভাসতীরে" বসিয়া দেখিতে পাইতেছি—"এই কূলে সন্ধ্যা—উষা অন্য তীরে মুগ্ধকরী।" এই আশার সান্ত্বনা নহিলে দুঃখশোক সহ্য করিয়াও মানুষ বাঁচিতে পারিত না। সে আশা স্বপ্নের স্বপ্ন—কিন্তু তাহা বাস্তব হইতেও সমুজ্জ্বল।

বিরহের বেদনার কথায় কবি বলিয়াছেন—

"নিমেষের তরে এসেছিল হেথা
আনমনে পথ ভুলিযা,
নিমেষে জানালে সুখ দুখ কত
আঁখিপানে আঁখি তুলিয়া।
নিমেষের দেখা নিমেষে ফুরা'ল
স্বপনেরি মত সহসা,
এ পরাণে মম জাগিয়া রহিল
শুধু স্মৃতি—শুধু পিয়াসা।
ছিঁড়ে চলে গেল গাঁথা মালা আর
ব্যথাটুকু দিল আমারে;
সে দিন হইতে ব্যথাই গাঁথিয়া
রেখেছি হিয়ার মাঝারে।"

কিন্তু বৎসরে কি কালের মাপ হয়? কালের মাপ ভাবে—আর অভাবে। তাই ত মিলনে যে সময় ক্ষণে শেষ হয—বিরহে তাহাই দীর্ঘ—অতি দীর্ঘ।

"লাখ লাখ যুগ হম হিয়ে হিয়ে রাখিনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।"

--মিলনে সে লক্ষ লক্ষ যুগ যে মুহূর্ত্তের মত বোধ হয়। কিন্তু এই "নিমেষের দেখা," ইহা ত ব্যর্থ হইবার নহে। ইহারই পবিত্র স্পর্শে কবির হৃদয় উদার বিশ্বপ্রেমে পূর্ণ হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন—

"বড় সাধ হয় মনে, মানবের ব্যথারাশি
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি' ল'ব আনন্দেতে আসি।
বড় সাধ হয় মনে, যেথা বহে আঁখিজল
সেথা প্রসারিব কর মুছি' নিজ শোকানল।
বড় সাধ হয় মনে, ভালবাসা দিয়ে আমি
অনাথ আতুর জনে তুষিব দিবস যামি।
বড় সাধ হয় মনে, নদীর লহরী হযে
মিটাতে পরের তৃষ্ণা দেশে দেশে যা'ব বযে।
বড় সাধ হয় মনে, মানবের সুখে দুখে
স্বার্থেরে আহুতি দিব যেন গো প্রসন্নমুখে।
বড় সাধ হয় মনে, প্রাণেশ-প্রণয় স্মরি'
বিশ্বের সবারে আমি ল'ব আপনার করি'।
বড় সাধ হয় মনে, কাযে, মনে, দেহে, ভাই—
ভগবৎ প্রেমগীতি উঠে যেন সর্ব্বদাই।"

পাঠক দেখিবেন, উদারতা কেমন স্তরে স্তরে—ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়াছে।

যখন হৃদয় এইরূপ ভাবে পূর্ণ হয, তখন দুঃখেও শান্তিলাভ করা সম্ভব। তখন মানুষ আর সুখের কাঙ্গাল হইযা সুখের সন্ধান করে না—সে অন্তরে তাহার সন্ধান পায়। তখন মনে হয়—

"ধরণী সুখের এ তো
নহে কাঁদিবার স্থান।"

—"ধরণী স্বর্গের দ্বার"—এ ধরণীতে

"সুখ দুঃখ মানবের
জীবন-উদ্দেশ্য নয়,
মানব জীবন শুধু
পালিতে কর্ত্তব্যচয়।"

এ অবস্থায মৃত্যুর ভয থাকে না। তখন মৃত্যুর আহ্বানও মধুর বোধ হয—

"এতদিন পরে যদি
ডাকিলে আমায় তুমি,
নিযে চল ত্বরা করে—
তোমার চরণ চুমি।"

বর্ত্তমান সংগ্রহের কবিতাগুলি এইরূপ ভাবে পূর্ণ।

পুস্তকের ছাপা, কাগজ, বাঁধাই মনোরম—মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। প্রকাশক শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ বি. এ., রায়পুর হাউস, ৮২ নং ল্যান্সডাউন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে দ্বারবঙ্গেশ্বর।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা শোভাবাজার রাজ-বাড়ীর ঠাকুরবাড়ীতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মসম্বন্ধে এক অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন। আমরা অনেক দিন এইরূপ সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করি নাই। বহুদিন হইতেই মহারাজ বাহাদুর হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে ভারতের নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে-ছেন। তাঁহার বক্তৃতাশ্রবণে পাশ্চাত্যশিক্ষাবিভ্রান্ত যুবকদল স্বধর্ম্মে আস্থাবান্ হইতেছে, ইহা বিশেষ আনন্দের কথা। পূর্ব্বে যাঁহারা অন্ধের মত পাশ্চাত্য পোষাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা প্রভৃতির অন্ধভাবে অনুকরণ করিতেন, এখন তাঁহারা যে কতকটা আর্যপ্রতিষ্ঠানের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন অনেকেই বুঝিয়া-ছেন যে, যাহা কিছু প্রাচ্য, তাহাই কুসংস্কারজড়িত নহে—আধ্যাত্মিকতার পূতবেদিকার উপর সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত। ইহা মহারাজ বাহাদুরের চেষ্টার ফল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মধ্যে ভারতের বিষম দুর্দ্দিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। মহা-রাজার ভাষায় বলিতে গেলে সেই সময়—নব্য যুবকসম্প্রদায় তখন বৈষয়িক শিক্ষা পাইয়া একদেশদর্শী হইতেছিল। তাহার ফলে তাহারা তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত আচারসম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ হইয়া পড়ে, সুতরাং শিক্ষিত ভারতবাসী দৃঢ় ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া পাশ্চাত্য মনস্বীদিগের মতেরই প্রতিধ্বনি করিতেছিল। মেকলের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, আমরা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকিলেও রুচিতে, আচারে, নীতিতে ও বুদ্ধিতে ইংরেজ হইয়া পড়িতে-ছিলাম! ঐ সময় এ দেশের পক্ষে বড়ই সঙ্কটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। যে আধ্যাত্মিক অবদান যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবাসীর মস্তিষ্কের উন্নতিবিধানের উপযোগী বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, ভারতবাসী তাহাই আশ্রয় করিয়া থাকিবে কি তাহা পরিহার করিবে, এই সমস্যাই তখন সাধারণের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

কিন্তু সে সমস্যার সমাধান ভালই হইয়াছে। দেশের মধ্যে—সমাজের মধ্যে একটা প্রাণের সাড়া পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ নিজেই বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মের জাগরণফলে দেশে একপ্রাণতার প্রতিষ্ঠা হইবে, অতীত অবদান বর্ত্তমানকে অনুপ্রাণিত করিবে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকে সাফল্য ও সামর্থ্যের আশায় উজ্জ্বল ও গৌরবমণ্ডিত করিবে, সেই ধর্ম্ম-সঞ্জীবনের পথে দেশবাসীরা অগ্রসর হইতেছে।

এই শুভলক্ষণসন্দর্শনেই মহারাজ আনন্দিত। আমরাও মহারাজের এই নিষ্কাম কর্ম্মের শুভফলদর্শনে তদপেক্ষা অধিক আনন্দিত। আমাদের দেশের যুবকগণ যাঁহাদের শিক্ষায় বিভ্রান্ত হইয়া এ দেশের সমস্তই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিতেন, সেই পাশ্চাত্য মনস্বিগণও এ দেশের সভ্যতার ও প্রতিষ্ঠানের কিরূপ সুখ্যাতি করিয়াছেন, মহারাজ নব্য যুবকদিগকে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন। আমরাও আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য মহারাজ বাহাদুরের সেই সারবান্ কথাগুলির মর্ম্ম নিম্নে প্রদান করিলাম ;—

য়ুরোপের ও আমেরিকার বিদ্বন্মণ্ডলী ক্রমশঃই আমাদের দর্শনশাস্ত্রের শাশ্বতী ভিত্তি, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের উদার ও প্রাণারাম ভাব এবং আমাদের আচার ও প্রতিষ্ঠানের দূর-দর্শিতাদ্যোতক পত্তন ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। আপনারা সকলেই জানেন যে, শোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন,—"উপনিষদ পাঠ করিলে যত উপকার ও উন্নতি হয়, আর কিছু পাঠ করিলে তেমন হয় না; ইহা আমার জীবনের শান্তি—মরণকালে ইহাই আমাকে শান্তি দিবে।" ম্যাক্সমুলার ও ডাউসেন উভয়েই উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বেদান্তের মতই মানবজীবনের গূঢ় প্রহেলিকার সমাধান-কল্পে বৈজ্ঞানিক নিশ্চিততার এবং আধ্যাত্মিক আগ্রহের অপূর্ব্ব সমাবেশ। তাঁহারা আমাদের দেশের কাব্য ও নাটক প্রাচ্যদেশসুলভ আধ্যাত্মিকতায় অনুরঞ্জিত ও ওতঃপ্রোত দেখিয়াছেন। মণিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌ও ঐ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আবে ডুবেঁ ঠিক ঐভাবে হিন্দুদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। ফরাসী মনস্বী ভিক্টর কুসিন বলিয়াছেন যে, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে গভীর সত্য নিহিত আছে, উহার সহিত য়ুরোপীয় মনস্বীরা এরূপ দীনতাপ্রদর্শন করিয়াছেন যে, য়ুরোপীয় বিদ্যার্থীরা ভারতীয় দর্শনের নিকট জানু অবনত করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা অকপট ও আন্তরিক প্রশংসা আর কিছুই হইতে পারে না।

অতঃপর মহারাজ বাহাদুর বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রশংসার ফলেই আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন সেই প্রশংসার ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন বিধিব্যবস্থাসম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইয়াছে, উহার মূলে কোন যুক্তি আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য একটা আগ্রহ জন্মিয়াছে। ইহাকে অনুকূল বাতাস বলিতে হইবে। মহারাজ বাহাদুর সেই কথাও অতি সুন্দরভাবে সভামধ্যে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

এক সময়ে তন্ত্রশাস্ত্র কুসংস্কারের মূর্ত্তিপূজার ও মনুষ্য-জাতির হীনতাদ্যোতক হেয় কার্য্যের আকর বলিয়া বিবেচিত হইত। সার্ জন্ উড্রফ ইহার দার্শনিকতার

দিকে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং ইহাকে অবজ্ঞার, বিস্মৃতির এবং নিন্দাবাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশার কথা। সে জন্য তাঁহার প্রতি আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিছুদিন পূর্ব্বে জাতিভেদ-প্রথা অহঙ্কার, কলহ ও লজ্জার একটা ভীষণ যন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। লোকে ভাবিত, ঐ প্রথার ফলে আমরা কাপুরুষ ও অন্তর্ব্বিবাদপ্রিয় হইয়া পড়িতেছি; উহাতে আমাদের জাতীয় চরিত্র অবনত হইয়া পড়িতেছে; এক কথায় ঐ প্রথা এত পৈশাচিক যে, অবিলম্বে ঐ প্রথা রহিত না করিলে আর আমাদের নিস্তার নাই। কিন্তু এখন সামাজিক ও আর্থিক দিক্ দিয়া জাতিভেদপ্রথার উপকারিতা উপলব্ধ হইতেছে, ইহাতে সমাজের বিভিন্ন স্তরে কর্ত্তব্যের ও দায়িত্বের—যথাসম্ভব সুন্দরভাবে বিন্যাস করা হইয়াছে এবং যাহাতে সমাজে শান্তি, সন্তোষ ও একতানতা রক্ষিত হয়, তাহার অতি সুব্যবস্থা হইয়া আছে, তাহা লোক ক্রমশঃ বুঝিতে সমর্থ হইতেছে। আমাদের ত্রিকালদর্শী মুনি ঋষিরা চিরদিনের জন্য জাতিভেদ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, এ কথা আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। তাঁহাদের নিকট অতীত ও বর্ত্তমান চিরসমুজ্জ্বল ছিল। ইহা ভিন্ন সংখ্যাতীত শতাব্দী ধরিয়া বিবন্ধগুলা যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানরাশি সম্বল করিয়া, তাক্দৃষ্টির সাহায্য লইয়া, আমাদের সমাজের এরূপ আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহাতে জীবনযাত্রা-কার্য্য স্বচ্ছন্দে যেন যন্ত্রের কার্য্যের ন্যায় সহজে নির্ব্বাহিত হয়।

যুগযুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞান ও বহুদর্শিতার সাহায্যে আধ্যাত্মিক চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যাইবে যে, যখনই চারিবর্ণ ভাঙ্গিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই তাহার ফলে সমাজে অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বর্ণাশ্রমের ভিত্তি বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা হইলে অথবা অতীত শিক্ষা হইতে বিচ্যুত হইতে চেষ্টা হইলে আমাদের জাতীয় স্বার্থ যে বিনষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

মহারাজ বাহাদুর দেখাইয়াছেন যে, যখনই জাতিভেদ-প্রথা বিপর্য্যস্ত করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তখনই আমাদের জাতীয়জীবন বিড়ম্বিত হইতে বসিয়াছে। কুরুক্ষেত্রের মহাপ্রান্তরে ভারতীয় শৌর্য্য অস্তমিত হইলে এবং তাহার ষট্‌ত্রিংশ বৎসর পরে প্রভাসক্ষেত্রে বলদৃপ্ত যদুবংশ ধ্বস্ত হইলে ভারতে ঘোর তমিস্রার আবির্ভাব হইয়াছিল। ঐ ঘোর উপপ্লবের ফলে ভারত প্রায় নিঃক্ষত্রিয় হয়। যে সকল ক্ষত্রিয় অবশিষ্ট ছিল, তাহারা অস্ত্রবিদ্যার অনুশীলন পরিত্যাগ করিয়া হীনবীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত করিয়া আপনাদিগের অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি, অনেকে ব্রাহ্মণ্যস্পর্দ্ধী হইয়া উঠিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণগণও তাহাদের আধ্যাত্মিকতা ও জীবনের উচ্চ আদর্শ হারাইয়া অধঃপাতের অন্ধতম কূপে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাই কলিযুগের আরম্ভকাল। এই সময়ে সমাজে প্রথম বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে এবং সেই বিক্ষোভ বর্ণাশ্রমব্যবস্থার বিপর্য্যয়জনিত,—মহারাজ তাহার অভিভাষণে এই কথাই বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কিন্তু সে বিক্ষোভেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম চিরদিনের মত বিপর্য্যস্ত হয় নাই। মধ্যে ঘোর বৌদ্ধবিপ্লব বহিয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলেও জাতিভেদপ্রথা বিলুপ্ত হয় নাই। মহারাজ সেই জন্যই বলিয়াছেন;—

যাহা হউক, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হিন্দুজাতি তাহাদের ক্ষুণ্ণশক্তি পুনরায় সঞ্চিত করিয়া লইয়াছিল। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, নন্দবংশের শেষ রাজার নামের ও খ্যাতির প্রভাবে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণশঙ্কা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। ৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডারের বিখ্যাত সেনাপতি সেলিউকাস যখন সিন্ধুনদী পার হইয়াছিলেন, তখন চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধ করিয়া সেলিউকাসকে পরাজিত করিয়াছিলেন; ফলে উক্ত গ্রীকরাজ হটিয়া গিয়াছিলেন এবং ভারতীয় সম্রাটের নিকট হীনতাস্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জাতিভেদ-ব্যবস্থা অল্পাধিক সমুন্নত অবস্থায় থাকিয়া সমাজে শান্তি, সমতানতা, একতা ও ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিতেছিল এবং সকল স্তরে সুখ ও স্বচ্ছন্দতা বিতরণ করিতেছিল। চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণধর্ম্মের উপর বিশেষ অনুরাগ ছিল না। কারণ, তিনি খাঁটি ক্ষত্রিয় ছিলেন না। পারস্যসাহিত্যের ও রীতি-নীতির উপর তাঁহার এরূপ অনুরাগ ছিল যে, একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত তাঁহাকে পারসিকবংশাবতংস বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম বহুকাল অবিসংবাদে রাজকীয় ধর্ম্ম বলিয়া সম্মানিত হইয়া আসিতেছিল, সেই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্যনিবন্ধন তাহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইতে আরব্ধ হইল; কিন্তু যে সময় অশোক প্রকাশ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দূরদূরান্তরে এই নূতন ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন, তখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সাংঘাতিক আঘাত লাগিয়াছিল। যে ভগবদ্বাক্য ও বিধান আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বনিয়াদ, তাহার উপর বৌদ্ধদিগের উপেক্ষা এবং অশোকের রাজত্বকালে বৈদিকধর্ম্মের পরিবর্ত্তে বৌদ্ধধর্ম্ম-নীতির প্রতিষ্ঠা হিন্দু-জাতির পক্ষে মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল—আমাদের সমাজের মধ্যগ্রন্থি ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া উহা চারিদিকেই ঘোর অনিষ্টের সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। এই অভিনব ধর্ম্ম—যদি ইহা ধর্ম্ম নামের যোগ্য হয়—পুরাতন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহাতে

জাতিভেদের সূক্ষ্মতত্ত্ব-বিচারের অভাব ছিল, উহা এক অসম্ভব বিশ্বমানবতার প্রচার করতঃ পূর্ব্বতন যুগের শান্তিময় বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে লোকের মনে সংশয়ের ও অসন্তোষের বীজ উপ্ত করিয়াছিল। যে আপাততঃ বৈষম্যময় জাতিভেদ কর্ম্মফলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহা সেই কর্ম্মফলবাদের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। যে ধর্ম্ম সমাজবিন্যাসের প্রতিষ্ঠা ছিল, বহুকালাগত পুরুষপরম্পরায় নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে লোকের যে সহজাত আনুরক্তি ছিল এবং বৈদিক সময় হইতে যে পদ্ধতি ও নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল, তাহার বিনাশফলে বিশৃঙ্খলা ও উদ্দামতা প্রকট হইয়া পড়িয়াছিল। অশোকের রাজ্যকালেই এই প্রকার দুর্লক্ষণ হইতে আরব্ধ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর যখন তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও বিস্ময়জনক প্রজ্ঞা অন্তর্হিত হইল, তখন তাঁহার বংশধরগণ আর ঐ রাজ্যরক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন সমস্ত জাতীয় ও সামাজিক সৌধ এইরূপ হীনবল ও পতনোন্মুখ হইয়া পড়িল যে, টুরেনীয়, উচি, কাম্বোজিয়া, শক ও পঙ্গপালের ন্যায় হূণজাতি বারংবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল।

জাতিভেদপ্রথার দ্বিতীয়বার ভঙ্গের কালে আমাদের সভ্যতা বিলুপ্ত হইয়া যাইতে বসে, ঐ সময় বহুপুরুষ ধরিয়া সভ্যতার আলোক ক্ষীণ হইয়া যায়। তখন বহুদিন ধরিয়া আমরা সম্মিলিত ভারত দেখিতে পাই নাই। বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারতে যখন সঞ্জীবনীশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, তখনই আমরা আবার নূতন শক্তিতে শক্তিশালিনী নূতন আলোকে উদ্ভাসিতা ভারতভূমির কথা শুনিতে পাই। উক্ত সম্রাটের নেতৃত্বে উজ্জয়িনীতে হিন্দুর বিদ্যা এবং হিন্দুর প্রতিভা আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহার ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী তিমিরাবৃত বহু শতাব্দীর পুরোভাগে এই সময় হিন্দুর কলাবিদ্যা, সাহিত্য ও ধর্ম্ম প্রভৃতির আলোক সমুজ্জ্বল হইয়া যেন হিন্দুর প্রতিভাপ্রভাদীপ্ত আগষ্টীয় যুগের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যে সময় হিন্দুধর্ম্ম তিমিরাবৃত যুগ হইতে পুনরায় বহির্গত হইতেছে দেখিতেছি, সেই সময় আমরা শ্রীভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতি প্রণতি করিতেছি। শঙ্করাচার্য্য অমানুষী প্রজ্ঞা ও অসাধারণ উৎসাহসহকারে প্রথমেই হিন্দুধর্ম্মের চৈতন্যসম্পাদন করিয়াছিলেন এবং শৃঙ্গেরী, পুরী, দ্বারকা ও হিমালয়ে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাবধি তাঁহারই শিষ্যানুশিষ্যগণকর্ত্তৃক তাঁহার কার্য্য তথায় পরিচালিত হইতেছে। তাঁহার পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত লোকশিক্ষক আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং রাজপুতানায় যে চারি জন অগ্নিকুলোদ্ভূত নৃপতি আবির্ভূত হইয়া ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মমতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পৃথ্বীরাজের আমলে হিন্দুসমাজের উপর তৃতীয় আঘাত আসিয়া পড়িয়াছিল। হিন্দুরা সেই সময় তাহাদের ধর্ম্মগত শক্তি হারাইয়াছিল, কাজেই এই ঘোর ঝটিকায় তাহাদিগকে নত হইতে হইয়াছিল। ফলে, হিন্দুরাজগণের মধ্যে গৃহকলহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহার ফলে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাহার উচ্চ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ রাজগণের সহিত বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, মহম্মদ ঘোরীর সহিত যুদ্ধেও জয়ী হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। তিনি যদিও পরাজিত হইয়াছিলেন, তথাপি হিন্দুসমাজের বনিয়াদ সুদৃঢ় ছিল বলিয়া হিন্দুসমাজ আপনার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাজ রণজিৎ সিংহ, শিখগুরুগণ ও অন্যান্য হিন্দুরাজগণের চেষ্টায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আবার পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখন বৃটিশ-শাসনের শান্তিময় ছায়াতলে আবার হিন্দুধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিতেছে। মহারাজ বাহাদুর দেখাইয়াছেন যে, এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এ দেশে প্রবর্ত্তিত ছিল বলিয়াই সনাতন বর্ণাশ্রমীসমাজে আভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ কস্মিন্‌কালেও আত্মপ্রকাশ করে নাই। ইহার ফলে হিন্দুসমাজ কালের ধ্বংসিনী শক্তিকে উপহাস করিয়া আজিও সগর্ব্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহার সমসাময়িক কোনও জাতি এতকাল আত্মসত্তা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। মহারাজ বাহাদুর এই সকল কথা অতি সুন্দরভাবেই বিবৃত করিয়াছিলেন। মহারাজ বাহাদুর দেখাইয়াছেন যে, হিন্দুরা কোন জাতিকেই ঘৃণা করেন না। তাহারা পতিত জাতিকেও অবজ্ঞা করে না। উদাহরণস্বরূপ তিনি রামচন্দ্রের চণ্ডালপ্রীতি ও সবরী-উদ্ধারের কথা বিবৃত করিয়াছেন।

অতঃপর মহারাজ বাহাদুর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি, তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি মানবদেহের সহিত মানবসমাজের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, মানবদেহের নানাস্থানে নানা সজীবকোষ স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আপন আপন কার্য্য সমাধা করিলেও যেমন আত্মাই দেহের জীবনকেন্দ্র আছেন, তেমনই প্রত্যেক সমাজের প্রত্যেক জাতিই স্ব স্ব স্থানে থাকিয়া আপন আপন কার্য্য সমাধা করিবেন, কিন্তু তাহাতে সমাজের বৈশিষ্ট্য ও জীবনীশক্তি অব্যাহত থাকিবে। ব্যক্তিগত জীবনের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া সমাজের কার্য্যসংসাধন করাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বৈজিক ও কৌলিকশক্তির উপরই এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। গুণের উৎকর্ষসাধন এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উদ্দেশ্য। সর্ব্বজাতির উপর প্রীতিই ব্রাহ্মণজাতির জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ব্রাহ্মণজাতি এই উচ্চ আদর্শের কতদূর সন্নিহিত হইয়াছিলেন, মহারাজ বাহাদুর তাহা অনেক বিদেশী মনস্বীর মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহার পর;

মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কর্ত্তব্য কি, তাহাও বুঝাইয়া দিয়াছেন। তৎপরে তিনি আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা ও হিন্দুধর্ম্মের উদারতার কথা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া অতি সুন্দরভাবে আপনার বক্তৃতার উপসংহার করিয়াছেন। অনাথবন্ধুতে এই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের কথা বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইবে, সুতরাং এখানে সে সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা হইল না।

মহারাজের বক্তৃতাগুলি অতি সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। আশা করি, তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণকে এইভাবে সদুপদেশদানে বাধিত করিবেন।
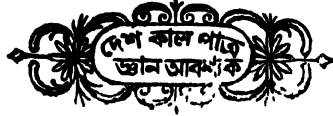
১৫৭২ সালের তীজ মেলা।

[শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

পীপার নগরে আজ বড় আনন্দ। আজ ভগবতী পার্ব্বতী-দেবীর পদে জবা-বিল্বদল দিবার জন্য বহু নর-নারী উপস্থিত। মরুস্থলীর ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র রাজপুত রমণীগণ নানা আভরণে বিভূষিত হইয়া বহুমূল্য রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া আপন আপন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য মহামায়ায় চরণ-কমলে ভক্তিভরে সকাতরে অর্ঘ্যদান করিতে আসিয়াছে।

দেবীর মন্দির নগরমধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। মন্দির ও প্রাঙ্গণের চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর। সম্মুখে সিংহদ্বার। ধ্বজা, পতাকা, পুষ্পমালা ও নানা প্রকার কারুকার্য্যখচিত মনোহর চন্দ্রাতপে প্রাঙ্গণ সুশোভিত। প্রাঙ্গণমধ্যে বহুলোক সমবেত। জনতার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

সহসা বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে "মহামায়ী পার্ব্বতীজীকি জয়" শব্দে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। মন্দির হইতে পরমেশ্বরী পার্ব্বতী দেবীর প্রতিমা বাহির হইবে। সকলেই উৎসুকনয়নে মন্দিরদ্বারে চাহিল। দেবালয়ের দৌবারিকগণ জনতার মধ্য দিয়া পথ পরিষ্কৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। পরক্ষণে সেবকদল ও পুরোহিতগণ রক্তচন্দনচর্চ্চিতদেহে রক্তজবার মাল্যে বিভূষিত হইয়া ভগবতীর স্তুতি পাঠ করিতে করিতে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে রক্তবস্ত্রপরি-হিতা কুমারীগণ পুষ্পমালাসুশোভিত বারিপূর্ণ সুবর্ণকলস মস্তকে লইয়া পথের উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে; এইবার মহামায়ার সিংহাসন বাহির হইল। সুসজ্জিত রত্নখচিত সুবর্ণসিংহাসনে পার্ব্বতীদেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা। সম্ভ্রান্ত রাঠোরবংশীয়া রাজপুতানীরা সিংহাসন স্কন্ধে করিয়া মঙ্গলগীত গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত মিলনের পূর্ব্বে গিরিকুমারী যে বহু কষ্ট-সাধ্য তপস্যাদ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন, তাহাই উপস্থিতক্ষেত্রে তাহাদের মঙ্গলগানের বিষয়। সমবেত ভক্ত-বৃন্দের জয়ধ্বনি এবং নানাপ্রকার বাদ্যের ঐক্যতানে এক অভিনব প্রাণমাতান শব্দ উত্থিত হইতেছিল। সকলেই উল্লাসে আত্মহারা।

এমন সময় "আল্লা আল্লা হো" শব্দে গগন নিনাদিত হইল। সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিতনয়নে পরস্পরের প্রতি চাহিল। এত যে আনন্দকোলাহল, মুহূর্ত্তমধ্যে সব যেন নিবিয়া গেল। এমন আনন্দের দিনে কেন মা এমন অমঙ্গল ঘটাইলে?

সহসা বহু অশ্বের পদশব্দ, সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, আবার সেই "আল্লা আল্লা হো" রব। মুসলমানগণ নগর প্রবেশ করিয়া মন্দিরদ্বারে উপস্থিত। রমণীগণ দীননেত্রে ঐ দিকে চাহিল। সকলেই যে নিরস্ত্র, রক্ষার তো কোন উপায় নাই। তখন প্রতিমা মন্দিরমধ্যে লইয়া দ্বার রুদ্ধ করা হইল। যে সমস্ত রাজপুত-রমণীর স্কন্ধে প্রতিমা ছিল, তাহারা মন্দিরমধ্যে আশ্রয় পাইল। সুবর্ণকুম্ভমস্তকে ১৫০ জন রাজপুত-কুমারী বহুসংখ্যক রমণীসহ বাহিরে পড়িয়া রহিল। মন্দিরের প্রহরী এবং পাণ্ডাগণ যে যে অস্ত্র সম্মুখে পাইল, তাহা লইয়াই মুসলমানগণের প্রাঙ্গণপ্রবেশের পথরোধ করিল। দ্বারের সম্মুখে ভীষণ যুদ্ধ। পাঠানেরা সশস্ত্র ও সংখ্যায় অধিক। রাজপুতগণ কেবলমাত্র লাঠিসোঁটায় কি করিবে? যে অল্পসংখ্যক রাঠোর-কৃষক উপস্থিত, তাহারা আপনাদের মাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, কন্যার জাত-মান রক্ষার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া মহামায়ার সম্মুখে প্রাণ দিল। রহিল কেবল রমণীগণ। তাহারা পাঠানহস্তে বন্দিনী। "ও মা কাত্যায়নি! রক্ষা কর; ও মা পার্ব্বতি! রক্ষা কর" বলিয়া তাহারা চীৎকার করিতেছে। দয়াময়ি! তাহারা যে উপবাসী থাকিয়া তোমার দ্বারে ব্রত-উদ্‌যাপন করিতে আসিয়াছে! এই কি মা তাহাদের ব্রত-উদ্‌যাপনের ফল? এই কি মা তাহাদের

শক্তি-উপাসনার ফল? সেই কুমারী ও বামাগণের ক্রন্দনে পাষাণও বিদীর্ণ হয়, কিন্তু পাষাণ-নন্দিনীর দয়া হইল না। পাঠানেরা ১৪০ জন কুমারীকে অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া পলায়ন করিল।

মহারাজ সূর্য্যমল্ল অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য ও কয়েক জন সর্দ্দার মাত্র সঙ্গে লইয়া রাজধানী হইতে দূরে মৃগয়ার্থ গমন করিয়াছেন। বনমধ্যে এক তৃণশষ্পপূর্ণ বিস্তীর্ণ স্থানে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছে। সকলেই সমস্ত দিন মৃগ অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া ক্লান্তদেহে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শিবিরে প্রত্যাগত। মহারাজ বিশ্রাম করিতেছেন, বিশ্রামের পর আহার করিবেন। এমন সময় কুমারী অপহরণের নিদারুণ সংবাদ তাঁহার নিকট পৌছিল। ক্রোধে ও ক্ষোভে তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অনল বাহির হইতে লাগিল। অবিলম্বে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে উপস্থিত রাজপুতবীরগণসহ তিনি কুমারী-অপহরণকারী পাঠানতস্করদলের শাস্তি দিবার জন্য ধাবিত হইলেন।

রাজপুতানার বিস্তীর্ণ মরুভূমি ধূ ধূ করিতেছে। নিদাঘের মধ্যাহ্ন-সূর্য্য মস্তকোপরি অজস্র কিরণজাল বর্ষণ করিয়া মার্ত্তণ্ডনামের সার্থকতা করিতেছেন। বায়ু জলন্ত অগ্নিস্রোতের ন্যায় প্রবলবেগে প্রবাহিত। দিগন্তব্যাপী প্রচণ্ড জ্বালামালা অনন্ত বালুকারাশি হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণা শোভার সৃষ্টি করিয়াছে। ছায়ার নাম-মাত্র নাই। আছে কেবল বায়ুবেগে উৎক্ষিপ্ত বালুকা-রাশির ক্ষণিকের তরে মেঘমালার ন্যায় ঊর্দ্ধদেশে ভাসমান হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পতন। দূরে আরাবলী পর্ব্বতশ্রেণী। এই পর্ব্বতমালায় মধ্য দিয়া পথ। পথ পঞ্চনদপ্রদেশ পার হইয়া উত্তরাভিমুখে চলিয়াছে। কুমারী-অপহরণকারী পাঠানদলকে এই পথেই যাইতে হইবে। এই পার্ব্বত্যপথে তস্করদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার সুবিধা হইবে বুঝিয়া মহারাজ সূর্য্যমল্ল অনুচরগণসহ দুরন্ত মরুভূমি পার হইয়া উত্তরদিক্ হইতে এই সঙ্কীর্ণ পথমধ্যে প্রবেশ করিয়া সুবৃহৎ শিলাখণ্ডের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন। পাঠানগণ সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে তাঁহাদের নিকটস্থ হইল। রাঠোর-বীরগণ ক্ষুধিত সিংহের ন্যায় তাহাদের উপর আপতিত হইলেন। রাজা সূর্য্যমল্ল অগ্রবর্ত্তী। পাঠানেরা এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভীত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। দুই ধারে দুরারোহ অত্যুচ্চ পর্ব্বত। পলাইবার পথ নাই। আর কি নিস্তার আছে? ক্ষত্রিয় বীরগণের বীর্য্যবহ্নিতে মুসলমানগণ তৃণের ন্যায় ভস্মীভূত হইল। রাজা স্কন্ধদেশে সাংঘাতিক আঘাত পাইলেন। বর্শাফলক স্কন্ধদেশ ভেদ করিয়া হৃদ্‌পিণ্ডে বিদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার দেহ রক্তস্রোতে আপ্লুত। রক্তস্রাব কিছুতেই বন্ধ হইল না। ক্রমে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছে! এই অবস্থায় তাঁহাকে দোলায় উঠাইয়া রাঠোরেরা কুমারীগণসহ গৃহে ফিরিলেন। পথে তাঁহার চৈতন্যলোপ হয়; প্রাসাদে পৌছিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ ক্ষণেকের জন্য তাঁহার জ্ঞান হয়। বীরবর সূর্য্যমল্ল আপনার জীবন-বিনিময়ে অপহৃত কুমারীগণকে উদ্ধার করিয়া স্ত্রী-পুত্র-স্বজন-সমক্ষে দেহত্যাগ করিলেন। রাজপুতানায় চারণগণ অদ্যাপি তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তিগাথা দ্বারে দ্বারে গাহিয়া বেড়ায়। রাঠোর-কৃষক শস্যক্ষেত্রে বসিয়া রাজা সূর্য্যমল্লের কাহিনী গাহিয়া দিগন্ত মুখরিত করিয়া তুলে।

সাধুর চশমা।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

(১)

বর্ষাকাল। আষাঢ়ের সুদীর্ঘ দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পথঘাট ডুবিয়া গিয়াছে। এখন বৃষ্টি থামিয়াছে সত্য, কিন্তু আকাশ ঘন-জালে আচ্ছন্ন। বোধ হয়, সন্ধ্যার পর আবার বর্ষণ আরব্ধ হইবে। বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীরের দাওয়ায় বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন। প্রাবৃটের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের ন্যায় তাঁহার মুখমণ্ডলও বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন। চন্দ্রনাথের চিন্তার যেন অন্ত নাই। তিনি বহুক্ষণ কেবল নীরব ও নিথরভাবে বসিয়া চিন্তাই করিতেছেন।

অকস্মাৎ কুটীরের ভিতর হইতে পত্নী মহামায়া আসিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন,—"বলি, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলে কি হইবে? একটা কিছু উপায় ত করিতে হইবে। মানুষ ক'দিন উপোস করিয়া থাকিতে পারে?"

চমকিত হইয়া চন্দ্রনাথ চক্ষু মেলিলেন; দেখিলেন, সম্মুখে শতগ্রন্থীবস্ত্রপরিহিতা পত্নী মহামায়া। তাঁহার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। তিনি কেবল উদাসভাবে পত্নীর শীর্ণমুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মহামায়ার বড় বড় চোখ দুইটি জলে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"ভাবিলে ত পেটের ভাত হইবে না, একটা কিছু উপায় ত করিতে হইবে?"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"কি উপায় করিব মহামায়া! আমার ত আর খাটিবার শক্তি নাই; এখন একমাত্র উপায় ভিক্ষা। কিন্তু আমাকে কে ভিক্ষা দিবে?"

মহামায়া।—কেন, ভিক্ষা ছাড়া কি আর কোনও উপায় নাই?

চন্দ্রনাথ।—আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আর কোন উপায়ই নাই।

মহামায়া।—যদি অন্য উপায় না থাকে, তাহা হইলে ভিক্ষাই করিতে হইবে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে যদি ভিক্ষা করা কপালে লেখা থাকে, তাহা হইলে কে তাহা খণ্ডাতে পারে? দেখ, আমরা যদি নিজে হইতাম, তা হ'লে না হয়, উপোস্ করিয়াই মরিতাম; কিন্তু বাছাগুলো সমুখে না খেয়ে মরবে, তাই বা কি ক'রে দেখি?

চন্দ্রনাথ।—আমাকে কি কেউ ভিক্ষা দিবে? আমি যে ভিক্ষা করিতে জানি না মহামায়া!

মহামায়া।—ভিক্ষা করার আবার জানাজানি কি? তুমি ত আর ফকবিটেল ভিখারী সাজিতেছ না; ক্ষুধায় কয়েকটি প্রাণী মারা পড়ে, তাদের জন্য তুমি ভিক্ষা করিতেছ। তুমি সরলভাবে লোককে তোমার দুঃখের কথা বল্‌বে, তা হ'লে যাদের শরীরে দয়া আছে, তা'রা তোমাকে ভিক্ষা দিবে।

চন্দ্রনাথ।—দেখ! আজকালকার দিনে দাতা বড় কম। লোক যশের জন্য—খেতাবের জন্যই দান করে। দুঃখীর দুঃখ বুঝে কেউ দান করে না। দিনকাল বড় শক্ত পড়েছে।

মহামায়া।—অত ভাবিলে চ'লে না। আমি আমার পোড়া পেটের জন্য তোমাকে ভিক্ষা করিতে বলিতেছি না। ছেলেমেয়েগুলোর মুখ চাহিয়া তোমাকে এই অপমান সহ্য করিতেই হইবে।

শেষে অনেক বাদবিতণ্ডার পর সাব্যস্ত হইল,—চন্দ্রনাথ পরদিন প্রাতে পাঁচমোহনার হাটে ভিক্ষা করিতে যাইবেন। সে দিন কিছু ঝড়ে-পড়া কলাগাছের থোড় সিদ্ধ করিয়া তাহারা কোন গতিকে জঠরজ্বালার নিবৃত্তি করিলেন।

(২)

রজনী প্রভাতা হইয়াছে। ছিন্ন চাদরখানি স্কন্ধে লইয়া বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ পাঁচমোহনার হাটের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পথে চেনা অচেনা কত লোক যাইতেছে, বৃদ্ধ কাহারও সহিত কোন কথাই কহিতেছেন না। তাঁহার বাড়ী ইন্দ্রপুর হইতে পাঁচমোহনার হাট প্রায় চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই হাটে পরিচিত লোক অল্প হইবে মনে করিয়া বৃদ্ধ এই দূরপথ অতিক্রান্ত করিয়া আসিতে মনস্থ করিয়াছেন। তাঁহার মনে কতই চিন্তা উঠিতেছে পড়িতেছে,—"হায়! আমি চন্দ্রনাথ শর্ম্মা—রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর সন্তান; আমার কপালে এতও ছিল! শেষে কি না ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করিতে হইল! এর চেয়ে ত মরণ ভাল ছিল।"

অকস্মাৎ হাটের লোককোলাহল বৃদ্ধের কর্ণে পশিল। বৃদ্ধ দণ্ডাহত সর্পের মত থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন; ভাবিলেন, এইবার জীবনের এই সায়াহ্নে তাঁহাকে ভিক্ষা করিতে হইল। কি লজ্জা—কি অপমান! তাহার চরণ আর চলিতে চাহে না;—হৃদ্‌পিণ্ড ধড়ফড় করিতে লাগিল। কি সর্ব্বনাশ! শেষে ভিক্ষাবৃত্তি!! বৃদ্ধের চরণ কাঁপিতেছে—বুক কাঁপিতেছে—এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "কি চক্রবর্ত্তী মহাশয়, এ হাটে যে?"

বৃদ্ধের মাথা ঘুরিতে লাগিল। "যার ভয় কর তুমি, সেই ভদ্রকালী আমি।" যে চেনালোকের ভয়ে বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ এতদূর পথ আসিলেন, হাটে সেই চেনালোকের সঙ্গেই দেখা। লজ্জায় তাঁহার মাথা টলিতে লাগিল। তিনি একবার ভাবিলেন, আর কাজ নাই—ঘরে ফিরিয়া যাই। কিন্তু ঘরে পত্নী ও শিশুসন্তানগুলি অনশনে আছে, আহা—তাহারা যে কয় দিন ভাত খাইতে পায় নাই, তাহারা যে আজ কত আশা করিয়া আছে! তিনি শূন্যহস্তে ফিরিয়া গেলে তাহারা কতই কষ্ট—কতই বেদনা পাইবে। তাহারা জঠরজ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিবে, তিনি কি তাহা দেখিতে পারিবেন? তাহাদের সেই কষ্ট অপেক্ষা কি তাঁহার লজ্জা এতই বড় হইল?

বৃদ্ধ মনকে দৃঢ় করিলেন। কিন্তু চরণ যে চলে না। হাঁটু যে কাঁপে। যাহা হউক, লোকলজ্জাভয়ের ভিতর সাহসে বুক বাঁধিয়া তিনি আবার চলিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি হাটে পৌঁছিলেন। দেখিলেন, কত জিনিসপত্র চাউল দাইল স্তূপীকৃত রহিয়াছে, কত লোক হাসিমুখে কত জিনিস কিনিতেছে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার বাছাদের জন্য কিছুই নাই। কারণ তিনি উহা কিনিতে অসমর্থ। আহা, কত পাপেই মানুষ গরীব হয়!

চন্দ্রনাথ হাটের এক পাশে দাঁড়াইলেন। তিনি কাহার নিকট অর্থভিক্ষা করিবেন? কি বলিয়া ভিক্ষা চাহিবেন? বড় বিষম পরীক্ষা। কিন্তু উপায় কি? সম্মুখে এক ব্যক্তিকে দেখিয়া চন্দ্রনাথ ভিক্ষা চাহিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া রহিল, তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। লোকটা চলিয়া গেল। আবার এক জন সুসজ্জিত ব্যক্তি চন্দ্রনাথের সম্মুখে শিস্ দিতে দিতে উপস্থিত হইল। এইবার বৃদ্ধ সাহসে বুক বাঁধিয়া তিনি তাহাকে বলিলেন, "বাবা, আমাকে কিছু দাও।" সে ব্যক্তি একটু কুটিল হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। ব্যর্থমনোরথ বৃদ্ধ এইরূপে অনেকের নিকটই যাজ্ঞা করিলেন। কেহ ধমক দিল, কেহ বিদ্রূপ করিল, কেহ কথাও কহিল না। অবশেষে ভিক্ষাকার্য্যে সম্ভ্রতী ব্রাহ্মণ এক বাবুবেশী যুবককে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা অনাহারে সপরিবারে মারা যাই, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।"

উদ্ধত যুবক দম্ভভরে উত্তর করিল, "কেন বাবা তোমায় ভিক্ষা দিব?"

চন্দ্রনাথ।—দুইটি শিশুসন্তানসহ আমরা আজ তিন দিন প্রায় উপবাসী। ছেলেরা ক্ষুধায় বড় কষ্ট পাইতেছে। দয়া করিয়া কিছু দিন।

যুবক।—খাইতে দিবার ক্ষমতা নাই, আবার ছেলে-পিলে! শিশুদিগের যখন সংসারে আনিয়াছিলে, তখন আমার পরামর্শ লইয়াছিলে কি?

চন্দ্রনাথ।—বাবা, সে দোষ আমার। আমাকে কিছু দিও না। তাহাদের ত কোন দোষ নাই, তাদের কিছু দাও।

যুবক।—চুপ রও! দূর হ! বেশী বকিলে গলাধাক্কা। শালা চোর!

বৃদ্ধ চন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিতে লাগিল। তিনি চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। টলিতে টলিতে একটা দোকানের রোয়াকে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন; লজ্জায়, ঘৃণায় তাঁহার শীর্ণদেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তিনি চক্ষু দুইটি মুদিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—হে অনাথের নাথ কাঙ্গালশরণ! আজ আমাকে কি কঠোর পরীক্ষায় ফেলিলে? আজ আমায় অকূলে কূল দাও। সপরিবারে অনশনে আজ মরিতে বসিলাম! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

(৩)

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে এক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। তিনি ভক্তিভরে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট আপনার দুঃখের কথা কহিলেন। সন্ন্যাসী চন্দ্রনাথকে সান্ত্বনাপ্রদান করিয়া কহিলেন,—"বৎস! দুঃখ করিও না। তুমি যাহাদের নিকট ভিক্ষা করিয়াছ, তাহারা কেহ মানুষ নয়, সবগুলাই পশু! পশুর নিকট যাজ্ঞা করিলে কি ভিক্ষা মিলে? পশুতে কি দুঃখীর দুঃখ বুঝে? বৎস! দরিদ্র-নারায়ণের সেবা করিলে যে নারায়ণ তুষ্ট হন, পশুতে তাহা বুঝে না—বুঝিতে পারে না। তুমি যাহাদের জন্য ভিক্ষা করিতেছ, তাহারা ভগবানেরই অংশ। তাহাদের জন্য তুমি অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষা করিতেছ, তাহাতে লজ্জা কি? যদি তোমার অন্য উপায় থাকিতে তুমি ভিক্ষা করিতে, তাহা হইলে তোমার লজ্জার কারণ থাকিত। এই সংসার কর্ম্মভূমি, এখানে তুমি তোমার কর্ত্তব্য করিয়া যাও। যে মানুষ, সে পরদুঃখে কাতর হইয়া তোমাকে দান করিবে। দেখিও, পশুর নিকট ভিক্ষা করিও না, মানুষের নিকট ভিক্ষা করিও।

চন্দ্রনাথ।—প্রভু! কে মানুষ, কে পশু, চিনিব কি প্রকারে?

সন্ন্যাসী।—বৎস! এই চশমাখানি লও। এইখানি চোকে দিলে তুমি কে মানুষ—কে পশু, তাহা দেখিতে পাইবে। মানুষ দেখিবে, তাহার নিকট যাজ্ঞা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিও না।

ব্রাহ্মণ চশমাখানি চোখে দিয়া হাটে যাইলেন। যাইয়া দেখেন,—কেবল চারিদিকে ছাগল, গোরু, গাধা, ভেড়া, সাপ ও বিছা, সেই বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। মানুষ একটিও নাই। কেবল হাটের এক পাশে এক জন মুচি বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,

ব্রাহ্মণ হইয়া শেষে মুচির নিকট ভিক্ষা করিব কি করিয়া? তিনি সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্য দ্রুতপদে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, সন্ন্যাসী সেখানে নাই। তখন তিনি পুনরায় সেই চর্ম্মকার মহাশয়ের নিকট আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিলেন

মুচি।—ঠাকুর মশাই। আমি সামান্য মুচি, আমি আপনাকে ভিক্ষা দিব কি করিয়া? আমার দানে কি আপনার দুঃখ ঘুচিবে?

ব্রাহ্মণ সেই মুচিকে আপনার দুঃখের কথা জানাইলেন। মুচি আনুপূর্ব্বিক সমস্তই শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"ঠাকুর, দিনকয়েক চুপ করিয়া থাকুন, আমি আপনার একটা উপায় করিয়া দিতেছি।"

ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—হরিবোল হরি। আজ আমার পরিবারবর্গ কি খায়—তাহার ঠিক নাই, চারিদিন পরে উপায় হইবে। যাই হ'ক, পরেও যদি একটা কিছু উপায় হয় ত মঙ্গল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তিনি বাজার হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, এমন সময় এক মুদী আসিয়া বলিল, "ঠাকুর! এক সন্ন্যাসীর আদেশে আমি আপনাকে কিছু চাউল, দাইল দিতেছি, গৃহে লইয়া যা'ন, ইহাতে আপনার তিন দিন বেশ চলিবে।"

(৪)

দেখিতে দেখিতে তিন দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিন প্রাতে সেই চর্ম্মকার একজোড়া জুতাহস্তে রাজবাড়ীর সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। দৌবারিক পাহারা দিতে দিতে সিদ্ধু বাঁরোয়া ভাঁজিতেছিল, সে বলিল, "কি চা'স?" মুচি উত্তর করিল,—আমি রাজসভায় যাইব। রাজার জন্ত এক জোড়া জুতা আনিয়াছি।" দৌবারিক দ্বার ছাড়িয়া দিল। চর্ম্মকার রাজার নিকট যাইয়া তাঁহাকে এক জোড়া সুন্দর জুতা প্রদান করিল। জুতাজোড়াটি খুব সুন্দর। রাজার উহা বেশ পসন্দ হইল। রাজা তাহাকে বকশিস দিতে চাহিলেন। মুচি বলিল,—'হুজুর! আমি বকশিস লইব না, ঐ টাকা আপনি ইন্দ্রপুরনিবাসী চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে দিবেন, নিতান্তই বিপন্ন হইয়া আমার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। হুজুর! আমি সামান্য মুচি। তাঁহাকে কি সাহায্য করিব? সেই জন্য আপনার হাত দিয়া আমি তাঁহাকে সাহায্য করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি।"

রাজা।—ব্রাহ্মণ হইয়া মুচির নিকট সাহায্য চাহে, সে কেমন ব্রাহ্মণ? আমি একবার তাঁহাকে দেখিব। তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইস।

মুচি চলিয়া গেল। পরদিন সে যথাসময়ে চন্দ্রনাথকে লইয়া রাজদরবারে হাজির হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি মুচির নিকট ভিক্ষা করিতে যাইলে কেন?" চক্রবর্ত্তী মহাশয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী-প্রদত্ত সেই চশমার কথা বলিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে সেই চশমা লইয়া নিজে চোখে দিলেন, দেখিলেন, তাঁহার সভাসদ্ সকলেই একটা না একটা জানোয়ার। মানুষ কেবল সেই ব্রাহ্মণ ও মুচি দেখিয়া রাজার বিস্ময়ের সীমা পরিল না। তিনি ব্রাহ্মণকে রাজসরকারে একটি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন সঙ্কল্প করিলেন।

অকস্মাৎ "হর হর বোম বোম" শব্দে রাজসভা নিনাদিত হইয়া উঠিল। রাজা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী দুই হাত তুলিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! মনুষ্যদেহ ধারণ করিলে জীব মানুষ হয় না। শৃগাল কুক্কুরদেহে যে জীবাত্মা, মানবদেহেও সেই জীবাত্মা। তবে মানবদেহ ধারণ করিয়া যে পরের দুঃখ না বুঝে, অন্যের দুঃখমোচনের জন্য যত্ন না করে, তাহার আকৃতি মানুষের মত হইলেও সে পশুমাত্র। দরিদ্রনারায়ণের সেবাই মানবের প্রধান ধর্ম্ম। মানুষ সহজে নারায়ণের সাক্ষাৎ পায় না, অতএব দরিদ্রকে যে নারায়ণবোধে সেবা করিতে পারে, সেই অন্তিমকালে সেই শবভঞ্জহারী গোলকবিহারীর সাক্ষাৎ পায়। আমরা মায়ামোহে মগ্ন হইয়া গরীবদিগকে ভগবানের অভিশপ্ত জীব বলিয়া মনে করি, কিন্তু তাহা নহে, মহারাজ! ভগবানই ধনাঢ্যদিগকে পরীক্ষা করিবার জন্যই দরিদ্ররূপে সংসারের সকল ক্লেশভোগ করিয়া থাকেন। সব জীবই শিব। যদি শিবকে পাইতে চাহেন, তবে দরিদ্রকে সেবা করুন।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলেন। রাজা তাঁহার রাজ্যে অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৃদ্ধ চন্দ্রনাথের হস্তেই তাহার তত্ত্বাবধানভার অর্পণ করিলেন।

Tri-Colour Blocks.

ALTHOUGH high-class artistic works can not be quoted until the design is finished yet we give a rate for usual class of work and hope our Patrons and Friends will find the charges moderate and favour us with a trial order.

Minimum upto 4 sqr. inch ..	Rs. 10
Blocks over 4 inch, per inch ...	.. 2

Design and painting extra according to work.

PRINTING.

Demy or Royal 8vo.

100 or any part of 100 ..	Rs. 6
500	,, 12-8
1,000	.. 20
5,000	,, 75

Demy or Royal 4to.

100 or any part of 100 ...	Rs. 8
500	,, 15
1 000 ..	., 25
5,000 ..	,, 100

EMBOSSING.

A portrait, within an inch, a Steel Die from ..	35
Stamping 100 or any part of 100 impressions ..	2

We can turn out Photos, Views, Pictures of Horses, Dogs, [illegible] Birds on receipt of Photo-colored or plain and particulars [illegible]ents, in this case, charge is made for colouring which will be submitted on application.

Charges for large orders will be quoted on request.

Price of paper according to quality which will be submitted on receipt of particulars, as prices fluctuating.

K. P. MOOKERJEE & CO.

7. Waterloo Street,

CALCUTTA.

The New Pharmacy,

42-1, Kalighat Road,

KALIGHAT, CALCUTTA.

Dr. Ashutosh Banerjee's

Most efficacious Medicines.

Mixture for Malaria (very effective)	...	Rs. 1-4, As. 12
Boil plaster (It will absorb or burst open and cure the ulcer)	...	Re. 1.
Lever Medicine a pot	...	Rs. 1-4, 2-0
Tooth Powder do.	...	As. 4
Ringworm Ointment do	...	As. 6
Perfumed Hair Oil 8 oz. phial.		Re. 1-0
Gonoreah Lotion	...	Rs. 2-0
Ointment for Venerial ulcers		As. 12
Eye Drops ...	...	As. 6
Ear Drops ...	...	As. 4
Dyspepsia Cure	...	Re. 1 8
Spirit of Camphor	...	As. 4

Wholesale drugs and appliances sold to trade at moderate prices.

Cash with order, or part with order and instruction to send per V. P. P.

The Dispensary is under expert supervision

Dr. Ashutosh Banerjee can be consulted **day and night**.

Mofusil calls attended to.

PURE MUSK.

Every person knows how useful is the Musk and every house ought to have it.

Apply to J. MITRA,

7, Waterloo St. or 43, Bancharam Akoor Lane,

CALCUTTA.

PHOTO ATELIER,

An up-to-date studio, where First-class work is produced plain & coloured.

A VISIT SOLICITED.

16, Bentinck Street, Entrance by Mangoe Lane,

CALCUTTA.

[অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত]

ধর্ম্ম আচার-ব্যবহার, কৃষিতত্ত্ব, চিকিৎসা, শিল্প ইতিহাস, বনৌষধ, যোগ জ্যোতিষ, গার্হস্থ্য-বিধান, ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদি সম্বলিত

সচিত্র মাসিক পত্র।

প্রথম বর্ষ · প্রথম খণ্ড ·· সপ্তম সংখ্যা
পৌষ ·· ১৩২৩

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।
৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
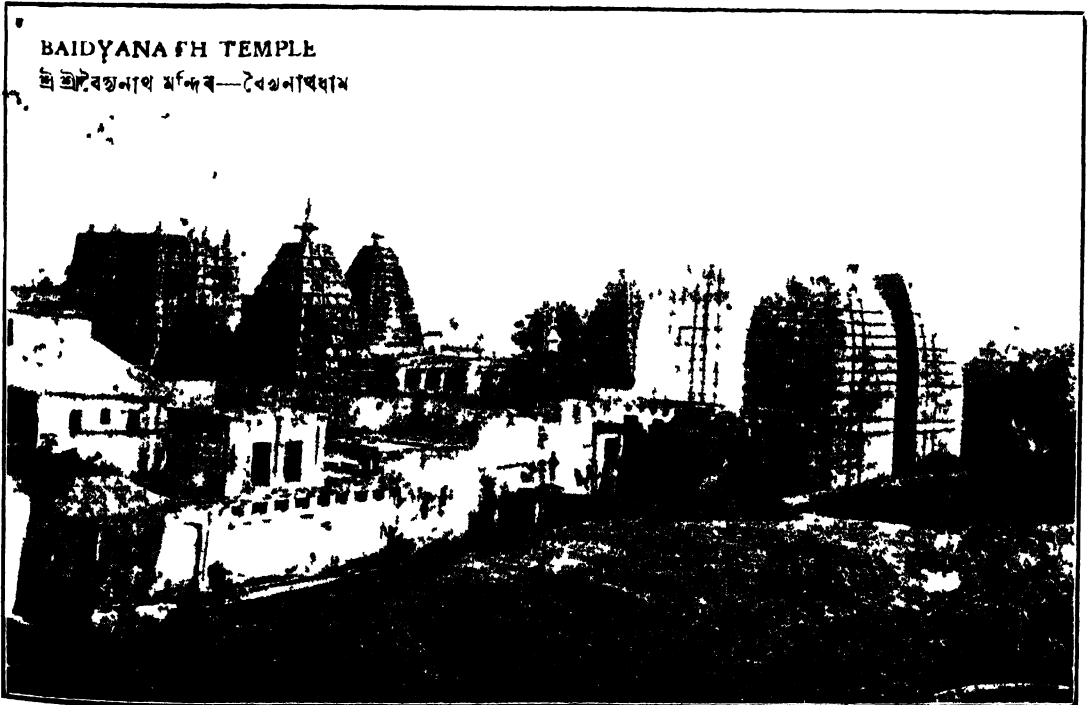
সম্পাদক শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

BAIDYANATH TEMPLE
শ্রীশ্রীবৈদ্যনাথ মন্দির—বৈদ্যনাথধাম

"অনাথবন্ধু"—বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা; প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা।
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

DEAR SIR,

It is with mixed feelings that I approach you with this the seventh issue of the "Anathbandhu" and considering the meagre response that has met my appeal for your generous help to enable me to realize the object that has led me in the seventieth year of my age to launch this venture, it would not be, I venture to think, out of place to recapitulate here briefly the aims and objects of this journal.

The more experience I have been gathering the more firmly convinced I am becoming that the salvation of our country and our people lies in our reverting to our old modes of living and thinking as far as modern circumstances would permit. Ours was essentially a case of plain living and high thinking and the more we keep that ideal in view in preparing the programme of our life-both national and individual—the better it would be for our future.

There are on all sides ample signs of a national re-awakening and if at this critical moment the new born energy of the people is not guided into the proper channel but is allowed to be moulded and materialised on the lines of the western countries, it would be sad indeed for India. Let us now, it is not yet too late, remodel our ideals and reconstitute our institutions—social, religious, political and industrial—with their foundations deep in the glorious past of our own country but adapted to modern circumstances as far as possible and practicable.

With this object in view I have ventured to start "Anathbandhu" whose sole mission is to try to point out and explain to my countrymen how best we can advance, retaining those virtues and qualities which at one time enabled our country to take the first place in the comity of nations.

The subscription (Rs. 10 a year) will appear too high, but is really not so when it is remembered that the proceeds will be entirely devoted to the practical illustration of the doctrines preached by the magazine. To explain more fully, it is my intention to found a model village on the lines of ancient India, adapted to the exigencies of modern times, a village self-contained and self-supporting, the unit of the Indian Nation, as it should be. In a month or two I hope to place in your hands a full prospectus of my scheme. In the meantime, I may assure you that some of the highest and noblest in the land have promised me their support and I hope and trust that my present appeal to you will not be in vain, at least it will enable you to give a favourable consideration to the scheme which I am now working out.

Yours faithfully,

K. P. Mookerjee.

My Three Schemes.

ANATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga,* if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.
(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) **D. Chatterjee.**
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,

I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,
(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,
(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Sj. Provat Chandra Giri.

TARAKESHWAR.
22, 1, 17,

Dear Sir,

The fifth number of Anathbandhu has been received in due time. I have gone through the Magazine and found it very much interesting. The different subjects dealt therein are highly instructive and valuable. I doubt not that the object you have in view in this Journal is laudable. I wish it every success. I have not yet got the Journal Nos. 6th and 7th hope to receive them at an early date. I shall send my photo and life sketch later on.

Yours Sincerely
(Sd.) **Provat Chandra Giri.**

From Dr. D. B. Spooner, Nalanda.

CAMP BARGAON.
Feb. 24th. 1917,

I beg to thank you for your kindness in sending me a copy of your monthly Journal Anathbandhu, upon whose admirable get-up I venture to congratulate you. I am glad the Bodh Gaya photo have been of use to you. * * *

Yours truly,
(Sd.) **D. B. Spooner.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee"

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,
(Sd.) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,
(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

From Babu Amulya Chandra Mukerji,

ELLINGHAM COTTAGE,
Simla, W. C. (Punjab.)
April 16th, 1917.

DEAR SIRS,

I am much obliged for the six copies of "অনাথবন্ধু" from আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, sent to me per V. P. P. for Rs. 10, I have read them with great interest and am much satisfied. Be pleased to send me the issues of the months from পৌষ to চৈত্র ১৩২৩, and for বৈশাখ ১৩২৪ if it has issued by now, and oblige.

Yours faithfully,
(Sd) **Amulya Chandra Mukerji.**

PRESS OPINIONS.

The British Printer.

October and November issue, Vol. XXIX, No. 172, 1916.

THE second number of *Anathbandhu* from the printers and publishers—K. P. MOOKERJEE & Co., Calcutta—offers a decided advance on the first issue of this new venture of that progressive house. Matter is in Bengali, with some advts. in English, a cover in red and black being both appropriate and quietly tasteful in character. A remarkable feature of the pages is the very praiseworthy standard attained by a series of three-colour illustrations interspersed amongst matter. Real progress is being made in this direction of highly-skilled printing, and all concerned are to be congratulated upon so good a result.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such ("Anathbandhu") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called "Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that accompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer, of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home, called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A New Journal by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukhpadhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and

fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religions, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public. The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

The Express, Bankipore.

Friday, March 23. 1917.

Messrs. K. P. Mookerjee and Co., the enterprising firm of stationers, printers, lithographers etc. of Calcutta are to be congratulated on the sixth issue of their pictorial journal, *Anath Bandhu* which contains useful and interesting articles and nice pictures. It is a pity that they have to discontinue the specimens of Hindi papers owing to want of sufficient response from the Hindi reading public. They have however added some English articles, but we think the public would have preferred more the encouragement of the vernaculars of the country. We beg to acknowledge with thanks also a calendar and a pocket diary from Messrs. K. P. Mookerjee.

The Beharee.

Thursday, April 5, 1917.

We are obliged to Messrs. K P. Mukerjee & Co. (7, Waterloo Street, Calcutta) for a very nice pocket book and calendar for the year 1917 which is very prettily got up. Their beautiful Bengali Magazine, "Anathbandhu" is appearing regularly and with improved features month by month. The current number to hand worthily keeps up the reputation.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlees to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committe of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,
Your humble servant,

7, Waterloo Street,
CALCUTTA.

K. P. Mookherjee

মহাত্মন্ !

আশা ও নৈরাশ্যবিজড়িত হৃদয়ে আমি "অনাথবন্ধুর" এই সপ্তম সংখ্যা লইয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত হইলাম। আপনাদিগের নিকট আমি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য আশা করিয়া এই সপ্ততিতম বর্ষ বয়সে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত উত্তর পাই নাই; সেইজন্য আমি পুনরায় আপনাদিগের নিকট আমার উদ্দেশ্য বিবৃতি করিতেছি।

আমার অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা যদি প্রাচীনভাবে চিন্তা করিতে ও প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের মঙ্গল ঘটিবে। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সেই প্রাচীন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক উচ্চবিষয় চিন্তা করাই আমাদের ব্যবস্থা। আমরা সেই আদর্শ অনুযায়ী যতই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব, ততই আশার সমুজ্জ্বল আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ আলোকিত হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে চারিদিকেই জাতীয় ভাবের সন্ধুক্ষণলক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সন্ধিক্ষণে যদি সেই নবজীবনজনিত শক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা না হয়, যদি উহা পাশ্চাত্য ছাঁচে—পাশ্চাত্যভাবে গঠিত করা হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে উহা বড়ই দুঃখের কারণ হইবে। অতএব এখনও সময় থাকিতে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রাখিয়া অতীত যুগের প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর আদর্শ সংগঠিত করিতে ও আমাদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক প্রতিষ্ঠান রচিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল গুণ ও ধর্ম্মপ্রভাবে এককালে আমাদের দেশ সমস্ত সভ্যদেশের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখিয়া কি প্রকারে আমরা উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহাই প্রদর্শন করা "অনাথবন্ধুর" উদ্দেশ্য।

"অনাথবন্ধুর" মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার লভ্যাংশ ইহার উপদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্যই ব্যয়িত হইবে। আমি উহার এক কপর্দ্দকও লইব না। আমি প্রাচীন ভারতীয় পল্লীর আদর্শে একটি আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠিত করিব। ঐ পল্লীর জনগণ আপনার অভাবের মোচন আপনারা করিতে পারিবে, আপনাদের জন্য পরের উপর নির্ভর করিবে না। দেশের কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি—সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। আশা করি, এইবার আপনার নিকট আমার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

আমার প্রতিষ্ঠিত "অন্নপূর্ণা আশ্রম" মিতব্যয়িতা-শিক্ষার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপোষণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ আশ্রম হইবে। কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, "অনাথবন্ধু" সকলকে তাহার একটা আভাস দিয়াছে।

যখন এই আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন উহাতে পুরাতন সময়ের পাঠশালার ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী শিল্পাদি বিদ্যা শিক্ষারও ব্যবস্থা বিহিত হইবে। যাঁহারা দ্বারবঙ্গের মহারাজ মাননীয় সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়ের সহিত সাধারণের মঙ্গলকামী, আমি তাঁহাদিগেরই সহায়তা প্রার্থনা করি।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ব, দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশানুরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি সামান্য আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ

করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আস্‌বাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

বৈদ্যনাথধামের সান্নিধ্যে

আমি আশ্রমপ্রতিষ্ঠার জন্য কতকটা জায়গা লইয়াছি। আমার বিশ্বাস, আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষকবর্গ ও বন্ধুগণ আমার এই স্থান-নির্ব্বাচনের অনুমোদন করিবেন। স্থানটি পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর।

আমার মনে হয়, কেহ কেহ আমার এই পত্র পড়েন নাই, সেই জন্য আমি ঐ সকল মহাশয় ব্যক্তির নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছি না।

"অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত করিবার জন্য অনেকগুলি ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত পাইয়াছি। ভরসা করি, মহৎব্যক্তিগণ যাঁহারা এখনও ফটোগ্রাফ ও জীবনবৃত্তান্ত না পাঠাইয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া শীঘ্র পাঠাইবেন।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুন্ন আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ৩০।৩৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্যদাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা

আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি

৩য়। ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ—যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তিমত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপনদাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
,, ২য় ,, ,, ,, ,, ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, ৩য় ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লক প্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন ঃ—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

স্যূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

ध्यान—तप्तकाञ्चनवर्णाभां बालेन्दुकृतशेखराम्।
नवरत्नप्रभादीप्तमुकुटां कुङ्कुमारुणाम्॥
चित्रवस्त्रपरीधानां सफराक्षीं त्रिलोचनाम्।
सुवर्णकलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्॥
गोक्षीरधामधवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्।
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठविराजितम्॥
कपर्द्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्।
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं दृष्ट्वानन्दमयीं पराम्॥
सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यां नितम्बिनीम्।
अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यामलङ्कृताम्॥

प्रणाम—अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि।
सर्व्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि माहेश्वरि नमोऽस्तु ते॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥

প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথাঃ—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদ্‌মায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কাযে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

ANATHBANDHU.

If a man does you a wrong deliberately and with malice, don't fret about it and plan reprisals. Sooner or later that man's meanness will engulf him.—*Rhodes' Colosuss.*

If

Discourtesy hurts the person who uses it more than the one toward whom it is directed.—*Facts and Fancies.*

Photo & Block by Statesman.

THEIR EXCELLENCIES

LORD AND LADY RONALDSHAY,

1917.

Lord and Lady Ronaldshay.

HIS EXCELLENCY LAWRENCE JOHN LUMLEY DUNDAS, EARL OF RONALDSHAY, is the second and eldest surviving son of the first Marquise of Zetland. He was born in 1876, and was educated at Harrow and Trinity College, Cambridge. He has travelled much in the East since his 22nd year, visiting Ceylon in 1898; India in 1899-1900; Persia in 1900-1; Asiatic Turkey, Persia, Central Asia, and Siberia in 1903; Japan, China, and Burma in 1896-7. He was an Aide-de-Camp on Lord Curzon's Staff in India in 1900. Of more recent memory is his visit to India as a member of the Public Services Commission a little more than two years ago.

At Home Lord Ronaldshay held a commission as temporary Major in the Yorkshire Territorials, having been previously Captain in the 1st North Riding of Yorkshire Volunteer Artillery.

In 1907 His Excellency married Cicely, second daughter of Colonel Mervyn Archdale, late of the 12th Lancers. Since 1907 he has represented the Hornsey Division of Middlesex in the House of Commons as a Unionist member. He was unopposed in 1906, Hornsey being a strong Unionist seat, and in the elections of 1910 he obtained majorities of 3,381 and 3,453.

Lord Ronaldshay is the author of several books of travel, his publications including "Sport and Politics under an Eastern Sky," published in 1902; "On the Outskirts of Empire in Asia," 1904; "A Wandering Student in the Far East," 1908; and "An Eastern Miscellany," 1911. He is the owner of the family estates in Orkney and Shetland, which were transferred to him by his father in 1912.

Lord Ronaldshay's son and second heir to the Marquessate—Lawrence Mervyn Alfred, Lord Dundas, was born in 1908. His elder daughter, Lady Viola Mary Dundas, was born in 1910, and another daughter was born in 1914. His residence in Scotland is Letterewe, Lochmaree, Achnasheen, Ross-shire; and his London address, 38, Grosvenor Street, W. He is a member of the Carlton, Turf, and Travellers' Clubs.

THE DUNDAS FAMILY.

The Dundas family, to the headship of which His Excellency the Governor of Bengal is heir, dates its titular honours from a baronetcy created in 1762 in favour of Sir Lawrence Dundas who four years later bought a Crown mortgage on the islands of Orkney and Shetland, from which the head of the family now takes his title. Sir Thomas Dundas, the second baronet, was made Baron Dundas of the United Kingdom, in 1794. His son, the second Baron Dundas, who was Lord Mayor of York and Lord Lieutenant of Orkney and Shetland, was made Earl of Zetland in 1838. Lord Ronaldshay's father, the third Earl, who was a nephew of the second earl, was born in 1844 and succeeded in 1873. He was Lord Lieutenant of Ireland from 1889 to 1892, and on his retirement was raised to the Marquessate with the titles Marquise of Zetland and Earl of Ronaldshay, the latter title being borne by his eldest son. He married in 1871 Lady Lilian Lumley, daughter of the ninth Earl of Scarborough.

His Excellency has one brother, Lord George Dundas, who was born in 1882 and who served in the South African war with the Argyll and Sutherland Highlanders. He has two sisters: Lady Hilda, who married in 1892 the present Lord Southampton, and Lady

Maud, who married in 1896 the present Earl Fitz William.

Lord Ronaldshay, as an aide-de-camp to Lord Curzon, had the opportunity of watching the methods of the brilliant Viceroy and of becoming acquainted with the diverse problems of Indian administration as well as with prominent Indians of many types. As a member of the Public Services Commission, His Excellency journeyed through the length and breadth of India, and listened to the evidence of some hundreds of witnesses and examined Indian administration in all its aspects. If it were necessary to "cram" a Governor-designate, no better method of preparing him for his duties could have been devised than to appoint him a member of a Commission such as that over which Lord Islington presided.

His Excellency took up the reins of the Bengal Government on the 26th March last and at once showed great experience by the able replies to the Addresses of Welcome presented to him by the British Indian Association and other Associations by deputation at the Government House Her Excellency is taking active interest along with her noblehearted husband in the various movements towards the War fund.

Ruskin on Work.

A lecture delivered before the Working Men's Institute, at Camberwell.

MY FRIENDS,—I have not come among you to-night to endeavour to give you an entertaining lecture; but to tell you a few plain facts, and ask you a few plain questions. I have seen and known too much of the struggle for life among our labouring population, to feel at ease, under any circumstances, in inviting them to dwell on the trivialities of my own studies; but, much more, as I meet tonight, for the first time, the members of a working Institute established in the district in which I have passed the greater part of my life, I am desirous that we should at once understand each other, on graver matters. I would fain tell you, with what feelings, and with what hope, I regard this institute, as one of many such, now happily established throughout England, as well as in other countries;—Institutes which are preparing the way for a great change in all the circumstances of industrial life; but of which the success must wholly depend upon our clearly understanding the circumstances and necessary *limits* of this change. No teacher can truly promote the cause of education, until he knows the mode of life for which that education is to prepare his pupil. And the fact that he is called upon to address you, nominally, as a 'Working Class,' must compel him, if he is in any wise earnest or thoughtful, to enquire in the outset, on what you yourselves suppose this class-distinction has been founded in the past, and must be founded in the future. The manner of the amusement, and the matter of the teaching, which any of us can offer you, must depend wholly on our first understanding from you, whether you think the distinction heretofore drawn between working men and others, is truly or falsely founded. Do you accept it as it stands? Do you wish it to be modified? Or do you think the object of education is to efface it, and make us forget it for ever?

Let me make myself more distinctly understood. We call this—you and I—a 'Working

Men's Institute, and our college in London, a 'Working Men's College. Now, how do you consider that these several institutes differ, or ought to differ, from 'idle men's institutes, and 'idle men's colleges? Or by what other word than 'idle' shall I distinguish those whom the happiest and wisest of working men do not object to call the 'Upper Classes'? Are there really upper classes—are there lower? How much should they always be elevated, how much always depressed? And, gentlemen and ladies—I pray those of you who are here to forgive me the offence there may be in what I am going to say. It is not *I* who wish to say it. Better voices say it; voices of battle and of famine through all the world, which must be heard some day, whoever keeps silence. Neither is it to *you* specially that I say it. I am sure that most, now present, know their duties of kindness, and fulfil them, better perhaps than I do mine. But I speak to you as representing your whole class, which errs, I know, chiefly by thoughtlessness, but not therefore the less terribly. Wilful error is limited by the will, but what limit is there to that of which we are unconscious?

Bear with me, therefore, while I turn to these workmen, and ask them, what they think the 'upper classes' are, and ought to be, in relation to them. Answer, you workmen who are here, as you would among yourselves, frankly; and tell me how you would have me call those classes. Am I to call them—would *you* think me right in calling them—the idle classes? I think you would feel somewhat uneasy, and as if I were not treating my subject honestly, or speaking from my heart, if I went on under the supposition that all rich people were idle. You would be both unjust and unwise if you allowed me to say that;—not less unjust than the rich people who say that all the poor are idle, and will never work if they can help it, or more than they can help.

For indeed the fact is, that there are idle poor and idle rich; and there are busy poor, and busy rich. Many a beggar is as lazy as if he had ten thousand a year: and many a man of large fortune is busier than his errand-boy, and never would think of stopping in the street to play marbles. So that, in a large view, the distinction between workers and idlers, as between knaves and honest men, runs through the very heart and innermost economies of men of all ranks and in all positions. There is a working class—strong and happy—among both rich and poor; there is an idle class—weak, wicked, and miserable,—among both rich and poor. And the worst of the misunderstandings arising between the two orders come of the unlucky fact that the wise of one class habitually contemplate the foolish of the other. If the busy rich people watched and rebuked the idle rich people, all would be right: and if the busy poor people watched and rebuked the idle poor people, all would be right. But each class has a tendency to look for the faults of the other. A hard-working man of property is particularly offended by an idle beggar; and an orderly, but poor, workman is naturally intolerant of the licentious luxury of the rich. And what is severe judgment in the minds of the just men of either class, becomes fierce enmity in the unjust—but among the unjust *only*. None but the dissolute among the poor look upon the rich as their natural enemies, or desire to pillage their houses and divide their property. None but the dissolute among the rich speak in opprobrious terms of the vices and follies of the poor.

[*To be continued.*
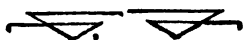
At the crossing.

1

THE darkest cloud has its silver lining. Every incident—be it in the life of an insignificant individual or in the life of a mighty nation—conveys a lesson if one would only care to read it. Even the present war which has affected the whole world is not without its object lesson. To us Indians the war is pregnant with a deep significance.

India had been slumbering for ages and when the British took over the reins of the government of the country from the already failing grasp of the Moghul, the glamour of European civilization at once caught the dazed eye of the people, and without waiting to examine the spirit of that civilization, they—the people of India—adopted it as their ideal. They began to adopt European modes of living and thinking with an avidity almost apish in nature.

With the spread of education, the writings of Raja Ram Mohan Roy, the teachings of the Theosophical Society and the researches of the Western Savants the tide has turned; they have caused these sorrry imitators to cry halt in their mad pursuit after European ideas; they have just been waking up to the glorious fact that a superior civilization was once their own and that they have so long been running after a shadow whereas the substance lies hidden in their own past. But a dream of the past is not enough. Something more is wanting to show up the true nature of the Western civilization. The war has come as a veritable eye opener.

The advent of the war has upset so many ideas and theories in every sphere of human action that even amidst the din of the war, the Europeans themselves are seriously thinking if they had not built up their civilization on a wrong foundation. But they are thinking more of Tariff reforms, Industrial reforms and other cognate reforms. Lord Chelmsford in his closing speech at the Imperial Legislative Council was pleased to observe;—"This war will have proved a blessing in disguise if through its teaching we shall have learnt how great a field of enterprise lies open to us in the industrial and agricultural spheres, and how necessary it is to organize ourselves industrially." Our own leaders go only a little beyond this. To industrial and agricultural spheres they add the political sphere.

It is now for us to decide what should be our attitude. It is for us to decide if we are to profit by the experience of the western peoples or realize the experience ourselves. Should we take warning from the present state of affairs and remodel our ideals and aspirations or should we proceed on the same lines as the western peoples and import into our country the worship of mammon and all its necessary rituals in its train.

Let us pause before we take the irrivocable leap—let us realize, first and foremost, our true conception of human life, for on this fundamental basis all our institutions should be built. Before we proceed to examine all these in detail we should ponder upon the following opinion of Dr. Chowry Muthu, the eminent specialist in tuberculosis, given to a representative of the "Bengalee":—

"India's salvation lay in going back to the country again and revive that old calm peaceful life with prosperous home industries, well laid villages, with proper sanitary arrangements and abundant supply of good water, long expanse of grazing lands, etc. England found out her mistake after suffering for more than a century and if India was not to commit that same mistake and repent, she must take lesson from England's case before it was too late. It was folly for India to be industrial after western fashion. She was an agricultural country and in the improvements of her agriculture and agricultural industries, rural sanitation, hygiene, clearing of jungle and other improvements of villages and pure food supply lay her only way to peace and prosperity."

N. C.

WILLOW DROPS.

By RAM SHARMA.

PART I.

1

Distracted,—heart sore,—all wild with unrest,
I take my harp,—my joy of early years,
Hoping perchance its notes may soothe the breast,
Which weeps and weeps, nor finds relief in tears.

2

Tears shed when o'er the world shines Phœbus' glare
Tears shed when Dian wields her milder power;
Tears shed amidst the whirl of wordly care,
Tears shed in pensive musing's silent hour.

3

They say that distance blunts the edge of woe,
They say that time doth heal the sorest smart;
Is this true? It may be so—I do not know;—
I only know that fresher bleeds my heart.

4

My heart! A wreck of feelings drown'd in grief!
A tomb where lie the joys that once have been!
A Smither'd stem that breaks not into leaf,
Nor knows the summer glow or vernal green!

5

Why pine I thus, why nurse a wasting care!
O heart, wrap thee in pride!—my love cares not
For me, alas, I cannot—can not bear
That agonizing—blinding,—madd'ning thought!

6

"They jest at scars who never felt a wound,"
They mock at griefs who never won and lost;
How can they, who cling to the firm-set ground,
Conceive the trials of the tempest-tost!

7

O friends, who ne'er have known a lover's woes,—
Ne'er thought a lover's thoughts nor felt his thrills,
Believe me, that the love-struck bosom grows
More sensitive far than the plant that feels.

8

There's more spell in my mistress' beaming eyes
Than ye can know, who ne'er those eyes did see;
One smile from them—where Love in ambush lies,—
Is worth much more than all the world to me.

9

I care not for the treasures of the deep,
To me more dear the treasure of her love:
One warm embrace, one kiss from her sweet lip,
To me were worth more than the heav'ns above.

10

Day follows night, and shine still follows shade,
And calm succeeds to ruffling storm; but Oh,
Perpetual glooms my weary soul pervade,
And rise perpetual thence storm-sighs of woe!

11

I loved,—I love,—I still must love till death,
The flame will burn like Gheber's fire for aye;
It warms my sighs, 't will warm my latest breath,
Till lost in blaze of an eternal day.

12

Thy moon-bright face, thy dark eye's lightning play,
Thy sweetest breath, thy lip's panting loveliness,
Thy lily form rich with blooms of May,
Thy raven locks where Love hangs on each tress;

13

Thy dimpled cheek, thy blue-veined marble brow,
Thy voice whose notes on th' ear like music steal;—
When first I saw and heard, a something thou
I thought which words can ne'er—Oh ne'er reveal

14

Could words reflect like to a mirror clear,
Or bring thee out with photographic art,
The sternest theist would kneel to thee, I fear,
A burning—lost idolator in heart!

15

Did I say, I thought? Oh! I think thee yet,
A lovely vision in a morning dream,—
A breathing ray,—conception animate,—
Yea, Cupid's Psyche by a golden stream!

16

I felt the force of all thy charms at once,
Like to a blow dealt by a spirit-hand;
Like lightning bright—yet fraught with death, thy glance
I could not—Oh who could—indeed withstand.

17

But years came and fled, I saw thee not,
And still a life-long hunger gnawed my breast ;
But years came and fled, no relief they brought,
And still that life-long hunger marred my rest !

18

Oh, blame me not if I could ne'er forget
The charms which so enthralled my yielding heart.
Not e'en the saints who upon Vishon wait
Could long resist their piercing dart.

19

At length we met again, and thou wert kind,
And earth below now changed to heaven above ;
O what delirium sweet possessed my mind
In those too happy, happy days of love !

20

O. say dost thou think of thy lover yet,—
Of him, who ne'er shall cease to think of thee,
Though oceans rolled 'tween us, and ruthless fate
Kept thee away, my life of life, from me !

21

Remember'st thou that stilly—witching hour,
When in my arms all tumbling thou wert borne—
A blushing pearl—to our bridal bow'r,
And Hymen held the torch, and vows were sworn ?

22

Remember'st thou those vows with kisses sealed,
Thy plight,—thy promises ne'er to forget ;—
When soul wed soul, and hearts with rapture filled,
And ardent glances answ'ring glances met ?

23

Remember'st thou—thy hand then clasped in mine—
Thou said'st to me in seraph accents sweet ;—
"This hand—this heart—my life itself are thine,"
When all entranced down I knelt at thy feet ?

24

O happy days ! O joys beyond compare !
When hearts dissolved in melting streams away.
And, like the perfume-laden summer air,
We breathed sweet thoughts all redolent of May.

25

O happy days ! when if we did not meet,
Our souls embraced in passion-breathing letters ;
Or struck out scintillations bright of wit,
In which were forged our bonds, our golden fetters !

26

We loved how tenderly ! each look—each glance,
From thee was pregnant with electric fire !
Thy motions—Oh they seemed the archis dance !
Thy words, rich music from the Muses' lyre !

27

We loved—we lived amidst a new creation,
And lo ! beneath the shadow of thine own
My soul was lost as in an ocultation,
When fades the star, and shines the moon alone !

28

We loved, and in that mystic oneness rare
Of twain,—the highest spiritualism giv'n
To man, we breathed blest Eden's balmiest air,
And proved the love by angels shared in heav'n.

29

As in fair Cynthia's beam all objects lie—
E'en darksome things—embathed in silver light,
So, Love, thou mighty wizard of the sky.
Beneath thy spell charmed nature looks all bright.

30

Through thy prism-glass what gorgeous hues are seen
To tint the meanest things that round us lie !
What gold, and purple, scarlet, blue and green,
By fairy hands are flung on earth and sky !

31

There was light—light where'er I turned my gaze,
Light—light in plain and wood and laughing brook
Light—light in air and sky, and diamond blaze,
O my nestling dove, in thy radiant look !

32

In the sweet heaven of thy face were met
Venus and Hesperus fair side by side ;
Oh, who that saw them once could e'er forget
Those twin starlets in all their twinkling pride !

33

And Time shook pearls of joy from off his pinions,
And Fancy strewed our path with richest treasures ;
And all the golden hours, like willing minions,
Waited on us with ever-changing pleasures.

The Wool Manufacture of the United States

By WINTHROP L. MARVIN,

Secretary and Treasurer of the National Association of Wool Manufacturers.

RANKING with Great Britain and Germany, the United States of North America has been for many years one of the chief wool manufacturing nations of the world. Less known in international markets because almost wholly bought and used by the vast, steadily increasing home population, North American wool fabrics represent the widest possible range of pattern and price. In the latest Federal census year, 1914, the total value of the product of the wool manufacture of the United States was $464,249,813, of which the value of the product of carded woolen and worsted mills—fabrics for personal wear or use—represented $379,484,379—rugs and carpets, felt goods and wool-felt hats constituting the remainder.

In the 795 carded woolen and worsted mills of the United States 478,000,000 pounds of raw wool were consumed during 1914. Less than 300,000,000 pounds of wool are now annually produced in the country, leaving a large quantity to be imported. A considerable portion of the imported wool comes from South American sources, which, in view of British restrictions upon the export of the wool of South Africa, New Zealand and Australia, have assumed an unprecedented importance to North American manufacturers.

It happened that the year 1914 was, during most of its months, a year of depressed business in the United States, and the total wool consumption that year was markedly below normal. In the year of full production like 1909 or 1915, the raw wool consumed in American woolen and worsted mills has been between 500,000,000 and 600,000,000 pounds. As the raw wool product of the United States has not recently increased, any additional demand must be met by importation.

The total capital invested in the wool manufacture of the Northern republic is upwards of $500,000,000 and about 200,000 workers are employed in the mills, which are mainly located in the older manufacturing region in the extreme northeast, from New England westward to Ohio and adjacent to the great ports of Boston, New York and Philadelphia. Though a substantial industry existed prior to 1860, the present magnitude of the North American wool manufacture may be said to date from the great Civil War of 1861-1865. That conflict, compelling the enlistment and equipment of huge armies, emphasized the natural advantages which the country possessed with its abundant water courses and skilled mechanical population for the maintenance of great textile industries. Thereupon, a vigorous system of protective tariff duties was applied to the wool manufacture, as to its allied industries, to such good effect that for many years before the opening of the present European war more than 95 per cent. of the woolen fabrics used in the United States were of native production.

In the harsh, wintry climate of North America, substantial clothing is a prime necessity of life, but the ingenuity of manufacturers has developed many remarkably light and yet durable fabrics of elegant design adapted to the heat of the brief North American summer and of sub-tropical and tropical climes throughout the world. All-wool fabrics overwhelmingly predominate among the products of the North American mills. Great Britain, with less than one-half of the population, operates nearly three times as many shoddy or rag grinding machines as the United States. Through sheer intrinsic merits American-made wool fabrics have been steadily supplanting European-made goods in the daily wear of the 100,000,000 North American people. The principal importer of English woolens of New York, who has become also a large dealer in high-class American fabrics, has recently stated in discussing American woolen manufactures :

"There are no more expert manufacturers anywhere than the best of those in this country. They are wonderfully quick to catch ideas, to modify, alter, improve and to meet quickly the ever-changing demands of fashion and fancy. They produce as great a variety of woolen cloths as can be found in the whole of Europe together.

"The fine and medium grades of the woolen cloths made here are generally better than those of equal quality to be obtained in any other country. American colors are, as a rule, better, clearer and more lasting than those of similar

foreign-made fabrics. The designing talent in America is quite equal to any in Europe."

Of course, the European war has given a great additional impetus to the North American wool manufacture. Not only Canada, Mexico and the West Indies, but the republics of Central America and South America, unable to procure their accustomed supplies from European sources, have turned to the United States and have learned by direct experience of the wide range and excellent qualities of the wool goods of North American production.

The wool manufacture of the United States, taken as a whole, has a very much more modern and efficient equipment than the corresponding industry of Great Britain and the Continent. This of itself is a very marked advantage. Moreover, the North American people, as a rule, enjoy considerably larger incomes than Europeans and are thereby enabled to indulge to a greater degree their desire for seasonable woolen apparel.

There has been developed to unequalled perfection in the United States the great modern industry of ready-to-wear clothing for men, women and children, adapted on the one hand to the humblest purse, but on the other also to the tastes of the liberal and exacting. This industry has been made possible by the production in the United States of great quantities of wool fabrics of moderate cost, but of attractive and enduring quality.

If the price of North American woolen cloths or dress goods is ever higher than the price of similar European fabrics, the difference is due altogether to the higher wages paid to the skilled workers in North American mills. Weavers and spinners receive earnings substantially twice as high in the Northern republic as in Great Britain, Germany or France. On the other hand, it is contended that the administrative and technical management of the great North American mills is more progressive and effective than on the other side of the Atlantic Ocean. Textile schools of a high order exist in the principal manufacturing communities of North America. There is an increasing recognition of the value of the work of men of scientific training. The best standard modern looms of the world are of North American invention and the new wool manufacturing plants of the United States are regarded the world over as embodying the most advanced principles of Twentieth Century manufacturing. The city of Lawrence, Mass., in the heart of New England, contains an immense worsted mill, the greatest wool manufacturing unit in existence. This concern, running full, employs 7,000 operatives. Philadelphia has more woolen mills than any other one community on the globe. Many of these are owned and managed by men who began their careers as wage-earners at the looms or spindles.

North American manufacturers, called upon to produce goods suitable for use over a wide area under sharply conflicting conditions of humidity and temperature, have developed a remarkable talent for adaptability to the needs of the business. It is the confident belief of these manufacturers that a considerable part of the export trade which the present war has developed in wool goods will be retained on its merits when the war is over. There is a feeling that in these fabrics, as in many other commodities of daily use, the tastes and needs of North America and of Central and South America are, to a very large degree, the same. Those North American mills that have entered upon the export trade are determined to remain hospitable to the ideas and suggestions of their Southern customers.

(Export American Industries)

প্রথম বর্ষ। | পৌষ। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | সপ্তম সংখ্যা।

কবির প্রার্থনা।

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্.]

(১)

কমল 'পরে বীণাটি করে কে গো মধুরহাসিনী,
জননী তুমি! এস মা তবে কমল হ'তে নামিয়া,
ধর গো ব্রত মায়েরই মত, হও গো ক্ষুধানাশিনী,
ধরণী হ'তে দুঃখের ধ্বনি এখনই যাক্ থামিয়া।

(২)

মুক্তামণি অঙ্গে পরি' রাণীর মত ভঙ্গীতে
কেন তুমি মা বাজাও বীণা নিখিল দিবা-যামিনী,
সারা অবনী ভরিয়া উঠে নিত্য নবীন সঙ্গীতে,
নৃত্য করে পুলকভরে তোমারই অনুগামিনী।

(৩)

পুত্র যে তোর অন্নতরে ধূলার 'পরে লুঠিছে,
ক্ষুধার লাগি' ভিক্ষা মাগি' ঘুরে না তবু কাঁদিয়া,
আপন মনে আঁখির কোণে অশ্রু তার টুটিছে,
তবুও সে যে তোমারই তেজে রেখেছে বুক বাঁধিয়া।

(৪)

দৈন্যদায়ে নোওায়ে মাথা অন্নকণা যাচিয়া,
ধনীর পিছে ছুটিতে মিছে সাধ্য আমার নাহি রে,
মৃত্যু ভাল লক্ষগুণে, কাজ কি হেন বাঁচিয়া,
ভিক্ষাঝুলি স্কন্ধে তুলি' বাঁচিতে নাহি চাহি রে।

(৫)

সত্যকথা বল গো মাতা, ক'র না বৃথা ছলনা,
মা থাকিতে ছেলের এমন দশা কি কেহ দেখেছে?
চরণ ধোরে সুধাই তোরে বল না মোরে বল না,
কোন্ জননী সন্তানে তার অন্নহীন রেখেছে?

(৬)

পর তবে মা মায়ের বেশ রাণীর সাজ খুলিয়া,
স্নেহের টানে ছেলের সনে দাঁড়াও ধরার ধূলাতে,
ফেলিয়া বীণা, লও না হাতে অন্ন থালা তুলিয়া,
অন্নপূর্ণারূপে এস জঠরজ্বালা ভুলা'তে।

(৭)

হায় রে ! মিছে তোমার কাছে জানান মনোবেদনা,
তুমি ত কোন বোঝ না ব্যথা স্বরগভূমির দেবতা,
বিদ্যা-জ্ঞানের আধার তুমি তৃষ্ণা-ক্ষুধার কেহ না,
দেবী যে তুমি, জননী নও, বুঝি না কেন এ কথা !

(৮)

মা নও তুমি, মায়াবিনী গো ! রাখিয়া মাকে আড়ালে,
কুহক-বীণার ইন্দ্রজালে সকল কাজ ভুলা'লে,
জীবনপ্রাতেঃ আমার পথে কেন গো আসি' দাঁড়া'লে,
মোর—আঁখির পাতে আপন হাতে স্বপন তুলি বুলা'লে !

(৯)

ঐ—উদাস-করা বিরাগ ভরা বীণার ধ্বনি পশিয়া,
কি জানি কেন মন্ত্রে যেন পরাণ-মন বিবশে,
মোর—সকল সাধন, সকল বাঁধন, নিমেষে যায় খসিয়া,
নিশায় দেখি রবির ভাতি, জ্যোৎস্না জ্যোতি দিবসে !

(১০)

হায় !—সঞ্জীবনী ও বীণাধ্বনি আমারই করম বিপাকে,
দেয়—সকল কাজে প্রাণের মাঝে মরণ-আঁধার আনিয়া,
মায়াবিনীর যন্ত্র ভাবি মায়েরই হাতের বীণাকে,
মোর—কপালদোষে গরল ওঠে সুধার সাগর ছানিয়া !

(১১)

স্বার্থে মজি' স্বরূপ তোমার বুঝি না তাই এ নিরাশা—
তোমায় আপন জননী-জ্ঞানে যে জন জানে মরমে,
সে জন তব চরণ-সুধায় ভোলে যে ক্ষুধা-পিপাসা,
কর যে তারে, করুণাময়ি ! সর্ব্বজয়ী চরমে।

(১২)

কবির মনোসরোবরে যে প্রেম-কমল সঞ্চারে,
তোমার রাঙা চরণ দুটি রাজিছে শুধু সেইখানে,
করের তব বীণাটি হ'য়ে কবি হৃদয়ই ঝঙ্কারে,
স্বপ্নভরে কবির প্রাণ নৃত্য করে সেই গানে।

(১৩)

জনম জনম এই স্বপনে রাখিও মোরে রাখিও,
চরণতলে নয়নজলে ইহাই আমার প্রার্থনা,
শেষের দিনে লইও চিনে, পুত্র বলি ডাকিও,
এমন মরণ পাই যদি, মা, জীবনধারণ ব্যর্থ না।

মহারাজ সার্ রাবণেশ্বর সিংহ বাহাদুর ;

কে. সি. আই. ই., গিধোড়।

গিধোড় অতি সুপ্রসিদ্ধ স্থান। ইহা বেহারেরই অন্তর্গত। জামুইয়ের সাত মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং গিধোড় নামক রেলওয়ে ষ্টেশনের এক মাইল দূরে এই সুপ্রসিদ্ধ নগর অবস্থিত। ইহা বেহারের এক প্রাচীন ও উচ্চবংশীয় রাজার বাসস্থান। চন্দ্রবংশীয় রাজপুতদিগের চান্দেল শাখার বীরবিক্রম সিংহ এই প্রাচীন রাজবংশের সংস্থাপক। এই রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, এই মহদ্বংশের আদিপুরুষগণ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মহোবা নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। দিল্লীর শেষ হিন্দুরাজা পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধে ইঁহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রাজ্য হারাইয়া তাঁহারা বুন্দেলখণ্ডে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া অবশেষে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে মুসলমানগণকর্ত্তৃক তাঁহারা ঐ স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা মির্জ্জাপুরের অন্তর্গত বিজয়গড় ও অঘোরী, বর্দ্দী প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ অধিকৃত করিয়া তথায় বসবাস করেন। কথিত আছে, এই বংশের এক জন রাজপুত্র, যিনি উপরি-উক্ত বর্দ্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ভগবান্ শিবের প্রত্যাদেশে বহুসংখ্যক অনুচর লইয়া দেওঘরের সন্নিহিত বৈদ্যনাথ-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। এই বীরবিক্রম সিংহ এই স্থানে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, নিকটবর্ত্তী প্রদেশে অসভ্যদিগের বাস। ঐ অসভ্যগণ দোসাদজাতীয়। বীরবিক্রম যুদ্ধে সেই অসভ্যদিগের সর্দ্দার নাগারিয়াকে পরাজিত করিয়া ঐ স্থানটি দখল করিয়া লইলেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী রাজপুতবীর যে পুষ্করিণীতে তাঁহার রক্তাক্ত তরবারি বিধৌত করিয়াছিলেন, সেই পুষ্করিণী এখনও পর্য্যন্ত "খাণ্ডোয়া পুখর" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। রাজপুতদিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূমিতে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন। তদবধি আজ ৯০০ নয় শত বৎসরকাল এই রাজপুতবংশ বাঙ্গালার আভিজাতদিগের মধ্যে খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মান ও সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন বলিয়া প্রতিপত্তিলাভ করিয়া আসিতেছেন।

প্রাচীন পুরাণোক্ত গৃধ্রকূট অর্থাৎ আধুনিক গিধোড় পর্ব্বতের পাদদেশে এই রাজগণের আদি বাসস্থান ছিল। এখনও তথায় অনুচ্চ ক্ষুপজঙ্গলে একটি ক্ষুদ্র দায়দ দুর্গের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাকারাদিও অন্যান্য গৃহাদির ভগ্নাবশেষ লুক্কায়িত রহিয়াছে। ইহার অনতিদূরেই নৌলাখগড় নামক একটি প্রকাণ্ড দুর্গের ভগ্নস্তূপ লক্ষিত হয়। এক সময়ে এই রাজাগণের রাজ্য পশ্চিমদিকে অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরভূমি পর্য্যন্ত অনেক দূর বিস্তৃত ছিল। গিধোড়ের চারি মাইল পূর্ব্বে কাকেশ্বর নামক স্থানে বীরবিক্রম সিংহের পুত্র সুখদেও সিংহ এক শত আটটি শিবমন্দির এবং একটি দুর্গা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এই বংশের অষ্টমপুরুষ পুরাণমল্ল গিধোড়ের আট ক্রোশ দূরে লছুয়াড় নামক স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। তথায় উৎকীর্ণ একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজা পুরাণমল্ল বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, তিনি বাবা বৈদ্যনাথের সেবার্থ পাণ্ডাকে বহু গ্রাম দেবোত্তরস্বরূপ প্রদান করেন। এখনও ঐ সম্পত্তি বৈদ্যনাথদেবের দেবোত্তর রহিয়াছে। প্রধান পাণ্ডার হস্তে ঐ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান-ভার ন্যস্ত আছে। তাঁহার ভগবান্ ভূতভাবন মহাদেবের প্রতি ভক্তি ও প্রীতি এত ঐকান্তিক ছিল যে, দূরত্বনিবন্ধন বৈদ্যনাথ জীউর মন্দিরে সচরাচর পূজা ও অর্চ্চনাদির অসুবিধা হইতে পারে, এই জন্য তিনি জামুইয়ের ও লছুয়াড়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সিমুরিয়াগ্রামে বৈদ্যনাথধামের

অনুকরণে দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। এ অঞ্চলে ইহা সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ।

পুরাণমল্লের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র তাঁহার সম্পত্তি বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সম্পত্তি-বিভাগসম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিম্বদন্তী আছে। প্রকাশ, দিল্লী হইতে জনৈক চারণ পুরাণমল্লের নিকট আসিয়া তাঁহার প্রশংসা করিয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ করেন। শ্লোকগুলি বিস্ময়-জনক ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। পুরাণমল্ল তাঁহাকে পারি-তোষিক দিতে চাহিলেন। চারণ উত্তর করিলেন যে, তাঁহার নিকট যে স্পর্শমণি বা পরশপাথর আছে, তিনি তাহাই চাহেন। কিন্তু তাঁহার নিকট কোন স্পর্শমণি ছিল না। কয়েকদিন পরে রাজা তাঁহার ছুরিকার দ্বারা অন্যমনস্ক-ভাবে এক স্থানে মাটি খুঁড়িতেছিলেন; এমন সময় দেখিলেন যে, তাঁহার ছুরিকাখানি সুবর্ণময়ী হইয়া গিয়াছে। রাজা বুঝিলেন যে, ঐ স্থানে নিশ্চয়ই পরশপাথর আছে। তিনি উহা খুঁড়িয়া বাহির করিলেন এবং উহা সেই চারণকে প্রদান করিলেন। চারণ উহা দিল্লীতে লইয়া গেলেন। তথায় যাইয়া তিনি তাঁহার সৌভাগ্যের কথা সকলকে জ্ঞাপন করিলেন। সেই কথা দিল্লীশ্বরের কর্ণে উঠিল। তিনি চারণদেবকে ডাকিয়া ঐ স্পর্শমণি দেখিতে চাহিলেন। চারণ বলিলেন, জাঁহাপনা, একটি সর্ত্তে আমি আপনাকে সেই স্পর্শমণি দেখাইতে পারি। যমুনাবক্ষে আপনি একখানি নৌকায় থাকিবেন, আমি একখানি নৌকায় থাকিব। বাদশাহ তাহাতেই সম্মত হইলেন। যমুনাবক্ষে উভয়ে দুইখানি স্বতন্ত্র নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়দ্দুর যাইলে চারণদেব বাদশাহকে বলিলেন, হুজুর, আপনার তরবারি-খানি বাড়াইয়া দিন। বাদশাহ তাহাই করিলেন। চারণ-দেব পরশপাথরখানি তরবারিতে স্পৃষ্ট করিয়াই উহা নদী-গর্ভে নিক্ষিপ্ত করিলেন। তরবারিখানি তৎক্ষণাৎ সুবর্ণে পরিণত হইল। বাদশাহ বুঝিলেন, স্পর্শমণির কথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে মণি আর পাইবার উপায় ছিল না। তিনি চারণদেবকে জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, পুরাণমল্লই তাঁহাকে ঐ পরশপাথর দিয়াছেন। তিনি পুরাণমল্লকে অবিলম্বে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ইতিমধ্যে পুরাণমল্লের মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার দুই পুত্র হরি সিং এবং বিশ্বম্ভর সিং তখন তাঁহার রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। হরি সিং দিল্লীতে নীত হইলেন। বাদশাহ তাঁহাকে আর একখানি পরশপাথর দিতে বলিলেন। হরি সিং উহা দিতে পারিলেন না। সম্রাট্ তাঁহাকে কারা-গারে পাঠাইলেন। হরি সিং যখন দিল্লীতে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন বিশ্বম্ভর সিংহ সমস্ত পৈতৃক-সম্পত্তির মালেক হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে হরি সিং ধনুর্ব্বিদ্যায় বাদশাহকে পরিতুষ্ট করিয়া মুক্তিলাভ করেন। বাদশাহ হরি সিংকে বিস্তহাজারী পরগণা প্রদান করেন। হরি সিং আপনার পৈতৃক-রাজ্যে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতা বিশ্বম্ভর সিংহ পৈতৃক-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ১০৬৬ অব্দে এই বংশের আদিপুরুষ বীরবিক্রম সিংহ যখন শাহ সুলতান সাহেবুদ্দীন ঘোরীর সহিত বঙ্গাভিমুখে অভিযান করেন, সেই সময় হইতেই রাজা পুরাণমল্লের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১) চকাই অঞ্চল সমেত গিধোড়, (২) দেওঘর সমেত রোহিণী, (৩) বিথৌড়, (৪) চানন্, (৫) ভুখা ও (৬) বিস্তহাজারী পর-গণা এই বংশের রাজ্যান্তর্গত ছিল। কিন্তু হরি সিং আপনার স্বত্ব বিস্তার করিয়া বিপুল রাজ্যের অধিকারী হইলেন। রাজবংশের নিয়ম অনুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই রাজ্যাধিকারী হইয়া থাকেন। সেই নিয়ম অনুসারেই এই রাজবংশ অনুশাসিত হইয়া আসিতেছিল। সেই জন্য রাজা বিশ্বম্ভর সিংহও জ্যেষ্ঠের অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন। যাহা হউক, শেষে উভয়ের মধ্যে একটা আপোষ নিষ্পত্তি হইল। এই নিষ্পত্তির বর্ণানুযায়িক গিধোড় ও অন্যান্য পরগণা রাজা পুরাণমল্লের বংশধরের মধ্যে বিভক্ত হইল। হরি সিংহ গিধোড়-রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ, বিশ্বম্ভর সিংহ খয়রার কুমারবংশের পূর্ব্বপুরুষ। হরি সিংহের দিল্লীতে অবস্থান-সম্বন্ধে আর একটা বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, পুরাণমল্লের সদাচরণের জামীনস্বরূপ হরি সিংকে দিল্লীতে রাখা হয়। তাহাতে পরশপাথরের কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে প্রথমোক্ত গল্পের সহিত তাহার বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

গিধোড়-রাজবংশের চতুর্দ্দশ রাজা দলন সিংহ মুসলমান সরকারের নিকট হইতে বিশেষ সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ শাজাহান একখানি সনন্দদ্বারা তাঁহার রাজা উপাধি পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। আজিও ঐ ফার্ম্মাণ বা সনন্দ-খানি বর্ত্তমান আছে। উহাতে তারিখ লিখিত আছে,—২১ রজব, ১০৬৮ সাল; অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে ঐ ফার্ম্মাণ-খানি লিখিত হইয়াছে। অতঃপর দিল্লীতে শাজাহানের পুত্র-গণের মধ্যে যে বিবাদ আত্মপ্রকাশ করে, তাহাতে রাজা দলন সিং দারাসেকোর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেই জন্য ধন্যবাদ দিয়া দারা দলন সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা গিধোড়-রাজগৃহে আজিও রক্ষিত হইয়াছে এবং সা সুজা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দলন সিংহকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহাও উক্ত রাজসংসারে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

"রাজা দলন সিংহ যাহাতে এই উৎসবে যোগদান করিতে পারেন, সেই জন্য তাঁহাকে তাঁহার নিজের সওয়ার ও পদাতিক লইয়া এখন উক্ত গৌরবমণ্ডিত দরবারে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে।"—এই কথাই উক্ত ফার্ম্মাণে লিখিত আছে। ফার্ম্মাণখানি গিধোড়-রাজ-সংসারের দপ্তরখানায় এখনও রহিয়াছে। আইন-ই-আকবরী

পাঠে জানিতে পারা যায় যে, গিধোড়-রাজকে আবশ্যক-কালে দিল্লীর সম্রাট্‌কে ২৫৯ অশ্বারোহী ও ১০ হাজার পদাতিক সৈন্য দিতে হইত। মোগল-বাদশাহদিগের আমলে গিধোড়-রাজবংশ যে গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন, উত্তরকালে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। সরকারী কাগজপত্র ও দলিলাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উল্লিখিত ছয়টি পরগণা গিধোড়-রাজদিগের করায়ত্তই ছিল। প্রথমে বিস্তহাজারী পরগণাটিই উক্ত রাজবংশের হস্তচ্যুত হয়। অবশেষে গিধোড়-রাজ বিশেষ চেষ্টা করিয়া ইহার মালেকানস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ সালে রোহিণী পরগণা গিধোড়-রাজের হস্তচ্যুত হইয়া বীরভূমের রাজার হস্তগত হয়। দেওঘর ও বিথৌর, এই রোহিণী পরগণারই অন্তর্গত। যখন এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তখন গিধোড়ের মসনদে রাজা অমর সিংহ প্রতিষ্ঠিত এবং খয়রার রাজা অজিৎ সিংহ রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের ঘাটোয়াল-বিদ্রোহে গিধোড়-রাজগণ সর্ব্বতোভাবে সরকারকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে সেই যুদ্ধে বীরভূমের মুসলমান রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা আর রোহিণী পরগণার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই। বৈদ্যনাথ জীউর তীর্থযাত্রিগণের বিজন দুর্গম গিরিপথমধ্যে সহায়তাজন্য যে সকল ঘাটোয়াল এই রাজবংশের বৃত্তিভোগী ছিলেন, কালে তাঁহারা পরাক্রান্ত হইয়া এই রাজবংশকে সর্ব্বচ্যুত করিয়া স্বাধীন হন।

বাঙ্গালা ও বেহারে বৃটিশরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বংশে ঊনবিংশতিতম রাজা গোপাল সিংহ কিছুদিনের জন্য রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, কিন্তু অল্পকালপরেই তিনি আবার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে এই বংশের রাজগণের সহিত বৃটিশ গবর্মেণ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন এবং ইহার রাজাকে রাজা বলিয়া স্বীকার ও সম্মান করেন। ইহার বংশধর মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহ ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সাঁওতালবিদ্রোহ প্রভৃতিতে সরকারের সাহায্য পাইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহে তিনি সরকারের সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে সেই কার্য্যের জন্য তিন হাজার টাকা আয়ের একটি নিষ্কর বিষয় আমরণ ভোগদখল করিতে দিয়াছিলেন। অবশেষে সরকার ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়মঙ্গল সিংহকে মহারাজ উপাধি এবং ১৮৬৬ অব্দে কে. সি. এস্. আই. উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে ভারতসাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, সেই সময় গিধোড়-রাজ পুত্রপৌত্রাদিক্রমে মহারাজ বাহাদুর উপাধিপ্রাপ্ত হন।

মহারাজ জয়মঙ্গল সিংহের পর মহারাজ শিবপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর গিধোড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিধোড়াধিপতি মহারাজ সার্ রাবণেশ্বর সিংহ বাহাদুর তাঁহারই পুত্র। ইনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে গিধোড় রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ইনি কে. সি. আই. ই. উপাধি-লাভ করিয়াছেন। ছয়বার ইনি ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-পদে বরিত হইয়া বিশেষভাবে কার্য্যদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বেহার অঞ্চলে ভূম্যধিকারী ও অভিজাতগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

গিধোড় রাজবংশ যে অত্যন্ত প্রাচীন ও কৌলীন্যগুণ-মণ্ডিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে বৎসর বৃটেনিয়ার ভাগ্য বিপর্য্যস্ত হয়, যে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সেন্‌লাকের ভীষণ প্রান্তরে নর্ম্মাণ্ডীর রাজা প্রথম উইলিয়ম ইংলণ্ডেশ্বর হারল্ডকে পরাজিত করিয়া ইংলণ্ডের রাজা হইয়াছিলেন, সেই বৎসর হইতে গিধোড়-রাজবংশ বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আপনার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। সে জাইগীরপ্রথা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যুদ্ধ, কূটনীতি, শৌর্য্য ও পবিত্রতার দিন আর নাই; কিন্তু গিধোড়-রাজগণ সেই প্রাচীন ভাব এখনও অব্যাহত রাখিয়াছেন। এখন জনহিতৈষণায়, সাধারণ কার্য্যে ও ব্যক্তিগত-ভাবে বিপন্নের সাহায্যার্থ দানে, ভূমিসম্প্রদানে, পথিনির্ম্মাণে, রেলবিস্তারে এবং নানাবিধ ধর্ম্মকার্য্যে অর্থনিয়োগে গিধোড়-রাজগণ আপনাদের সেই পূর্ব্বগৌরব ও ঔদার্য্যপ্রকাশ করিতেছেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা, ধর্ম্মশালা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি জনহিতকরপ্রতিষ্ঠানে ইঁহাদের পুরুষপুরুষানুক্রমে আগত গৌরব ও মহত্ত্ব আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই বংশের রাজগণ পুরুষপুরুষানুক্রমে ইংরেজ-রাজগণের একান্ত অনুরক্ত ভক্ত।

মহারাজ বাহাদুরের বয়স এখন সাতান্ন বৎসর হইয়াছে। তিনি নানাবিধ লোকহিতকর ও শ্রমসাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিতেছেন। প্রায় একপাদ শতাব্দ পূর্ব্ব হইতে তিনি বাঙ্গালাপ্রদেশে যাহা করিয়া আসিয়াছিলেন, এ স্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার পিতামহ মহারাজ সার্ জয়মঙ্গল সিংহ বাহাদুর কে. সি. এস্. আই. বাহাদুরের উপদেশ ও শিক্ষার প্রভাবে তিনি এক জন অত্যন্ত উন্নতিশীল ও উচ্চ-মনা ব্যক্তি হইয়াছেন। তাঁহার পিতামহ তাঁহার মনে যে ভাবের বীজ বপন করিয়াছেন, এই ভাবের ও শিক্ষার বীজ তাঁহার মানসক্ষেত্রে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া এখন নানাবিধ সুফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি কার্য্যক্ষেত্রে সেই উপদেশেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। বৃটিশরাজের সহিত যাহাতে জনসাধারণের সৌহৃদ্য ও ঘনিষ্ঠতা বৰ্দ্ধিত হয়, তিনি সে বিষয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা ও যত্ন করিয়া থাকেন। প্রজাদিগকে তিনি সন্তানের ন্যায় যত্ন ও প্রতিপালন করেন। তিনি শিকারে সিদ্ধহস্ত, রাজ্যশাসনে সুদক্ষ, সেবক ও পোষ্যবর্গের প্রতি সহানুভূতিতে

অনন্যসাধারণ এবং সর্ব্বোপরি এক জন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু। প্রাচীনকালের ধর্ম্মভাব তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রতিফলিত। শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে তিনি সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন। বৈষয়িক ও ধর্ম্মকার্য্যের বাহুল্যের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ডিষ্ট্রীক্ট ও লোক্যাল বোর্ডের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়াও বিশেষ যশোলাভ করিয়াছেন। এক জন মহারাজের পক্ষে এত কাজ করিয়া উঠাও কঠিন। তিনি ল্যাণ্ডহোল্ডার্স য্যাসোসিয়েসনের স্থায়ী ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট। গত বৎসর তিনি বেহারের নূতন ব্যবস্থাপক পরিষদে দ্বিতীয়বার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাতে মহারাজ বাহাদুর কিরূপ জনসাধারণের ভক্তি প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় এবং নবগঠিত বেহার ও উড়িষ্যাপ্রদেশে লোকমতগঠনে ও শান্তিসংস্থাপনে তাঁহার প্রভাব কত অধিক, সরকারও তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

গিধোড়ের মহারাজ বাহাদুরের সৌজন্য, অমায়িকতা, লোকের সহিত মিশিবার ক্ষমতা বাঙ্গালার সর্ব্বজনবিদিত। বাঙ্গালায় জনসাধারণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা প্রভৃতির স্মৃতি, বাঙ্গালার সহিত তাঁহার পূর্ব্বসম্বন্ধ এখনও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই ঘনিষ্ঠতাসম্বন্ধ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশেই তিনি রাজকুমার সমভিব্যাহারে শারীরিক অসুস্থতা ও রাজকার্য্যের হানি সত্ত্বেও গত বড়দিনের সময় বড়লাট বাহাদুরের কলিকাতায় অবস্থান উপলক্ষে কলিকাতায় থাকেন এবং যদিও এক্ষণে বেহার ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট বাঙ্গালা ও বিহারের প্রাচীন আত্মীয় সম্পর্ক এখনও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুপ্রকট।

মহারাজ বাহাদুরের পারিবারিক জীবন মধুময় ও শান্তিপ্রদ। তাঁহার জীবন অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির আদর্শ হওয়া উচিত। সন্তানের প্রতি স্নেহে, সহধর্ম্মিণীর প্রতি প্রেমে, অনুজীবী ও পোষ্যবর্গের সহিত সদয় ব্যবহারে বর্ত্তমান মহারাজের সমকক্ষ অত্যন্ত বিরল। তাঁহার ভগবদ্ভক্তি, ঔদার্য্য, মিষ্ট স্বভাব এবং মনের প্রশান্তভাব বেহার এবং উড়িষ্যাপ্রদেশে জনসাধারণের নিকট সুপরিচিত। লোক ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিবার সময় তাঁহাকেই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করে। তাঁহার আত্মীয়কুটুম্বগণ পোষ্যবর্গ এবং প্রজাবৃন্দ ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে যেভাবে সসম্মানে আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি স্তুতিনুতি করে, তাহা দেখিলে প্রাচীনকালের সে জায়গীরদারদিগের আমলের গৌরব কথা মনে পড়ে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বেহারের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট বাহাদুর যখন গিধোড় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি গিধোড়রাজের প্রজাবর্গের এই রাজভক্তিসন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বাহাদুরের একটি পুত্রসন্তান জন্মে। তিনিই গিধোড়ের যুবরাজ। যুবরাজ বাহাদুরের ব্যবহার ও বুদ্ধিমত্তা প্রজাসাধারণের নিকট আশাপ্রদ। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার পিতার হইয়া রাজ্যের অনেক দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। শাসনকার্য্যে মহারাজ বাহাদুরের অভিজ্ঞতা পরিপক্বতা লাভ করিয়াছে। সেই মহারাজ বাহাদুরের শ্যেনদৃষ্টির অধীনে থাকিয়া মহারাজকুমার শ্রীযুত চন্দ্রমৌলেশ্বরপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর জটিল রাজাশাসনকার্য্যে ব্যুৎপত্তিলাভ করিতেছেন। তিনি লোক্যাল বোর্ড এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে কাজ করিয়া সরকারের কার্য্য করিতেছেন এবং অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কঠোর রাজকার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরে ঐ সকল অবৈতনিক কার্য্যগ্রহণ করিয়াছেন। মহারাজকুমার বাহাদুর এক জন মার্জ্জিতবুদ্ধি ও যোগ্য যুবরাজ। সকলেই মহারাজকুমার বাহাদুরের কার্য্যদক্ষতায় গৌরব অনুভব করে। ভগবান্ মহারাজা বাহাদুর ও যুবরাজকে দীর্ঘজীবী করুন ও রাজসংসারের গৌরব ও কুশল অক্ষুণ্ণ রাখুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

৭
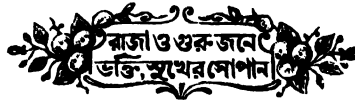
বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।

হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত নাম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। কারণ, বর্ণবিভাগ ও আশ্রমবিভাগই এই ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। বর্ণ এবং আশ্রমবিভাগ অনুসারে এই ধর্ম্মে আচার-অনুষ্ঠানেরও বিভিন্নতা বিহিত হইয়াছে। শূদ্রের পক্ষে যে ধর্ম্ম বিহিত, ব্রাহ্মণের পক্ষে সে ধর্ম্ম বিহিত হয় নাই; গৃহস্থের পক্ষে যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সন্ন্যাসীর পক্ষে সে ধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। এই ধর্ম্মে অধিকারতত্ত্ব লইয়া যেরূপ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছে, এমন আর কোন ধর্ম্মে হয় নাই। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম্মেই "চুরি করিও না," "ব্যাভিচার করিও না," "পরনিন্দা করিও না" প্রভৃতি নীতিবাক্যের অনুসরণ এবং নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিমতে উপাসনা বা ভজনা করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; তদনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেই ধর্ম্মলাভ করা যায়। হিন্দুধর্ম্মের কিন্তু সে ব্যবস্থা নাই। হিন্দুধর্ম্মে অধিকারিভেদে আচারভেদ, অনুষ্ঠানভেদ, উপাসনার পদ্ধতিভেদ বিহিত হইয়াছে। ইহাতে একের পক্ষে যে কার্য্য করিলে অধর্ম্ম হয়, অন্যের পক্ষে সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়। সেই জন্য য়ুরোপীয়রা এই ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ইহাকে নানাধর্ম্মের খিচুড়ী বলিয়া থাকেন। সাধারণ বুদ্ধিতেও ইহার বিভিন্ন অনুশাসনের সামঞ্জস্য করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে। সেই জন্য হিন্দুর ধর্ম্মানুষ্ঠানে গুরুর উপদেশ গ্রহণ বড়ই আবশ্যক।

গুণভেদে জাতিভেদ বা বর্ণভেদ বিহিত হইয়াছে। মোটামুটি জাতি চারিটি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। হিন্দুধর্ম্ম যতদিন, ততদিনই হিন্দুসমাজে এই জাতিভেদপ্রথা বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল সাধারণের নিকট য়ুরোপীয়দিগের মতের মূল্য বেশী। সেই য়ুরোপীয়রাই ঋগ্বেদকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। সেই ঋগ্বেদেই লিখিত আছে,—

> ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
> উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥
>
> ঋগ্বেদ ৮।১০।৯০।

ব্রাহ্মণ সেই বিরাট পুরুষের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে বুঝা গেল যে, যত দূর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে সকল সময়ে হিন্দুসমাজে জাতিভেদপ্রথা চলিয়া আসিতেছে। * সেই জন্য হিন্দুধর্ম্ম বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নামে অভিহিত।

ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,— আমিই গুণকর্ম্মভেদে সৃষ্টি করিয়াছি অর্থাৎ জাতিভেদ ভগবানের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি নহে। দ্বিতীয়তঃ গুণই উহার বনিয়াদ, কর্ম্মই উহার অবলম্বন। আমি পূর্ব্বে যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কথা বলিয়াছি, সে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের তারতম্য অনুসারেই জাতিভেদ হইয়াছে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,— "গুণবৈষম্যাৎ ন সর্ব্বে সমানস্বভাবাঃ" ত্রিগুণের ইতরবিশেষনিবন্ধন সকলের স্বভাব এক রকম হয় না, প্রত্যেকের স্বভাবের মধ্যে তারতম্য লক্ষিত হয়। এই তারতম্য ব্যক্তিগত। তবে এই তারতম্যের ভাগ অনুসারেই জাতিভেদ ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক গুণবৈষম্যের উপর ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা ভগবানের সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি নহে, এই কথাই বলা হইয়াছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ বর্ণচতুষ্টয়বিভাগের কর্ত্তা হইলেও তাঁহাকে উহার কর্ত্তা বলিয়া জানিও না অর্থাৎ ব্রহ্ম বা অব্যয় পরমাত্মা জাতিভেদাদি কিছুই করেন নাই, তাঁহা হইতে উদ্ভূতা তাঁহারই শক্তিরূপিণী প্রকৃতিই ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভিন্নতা অনুসারেই জাতিভেদব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। আর এক হিসাবে মানুষ নিজেই জাতিভেদের কর্ত্তা। কারণ মানুষ যেমন যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই তেমনই গুণ প্রাপ্ত হয়। গুণ অনুসারে সে জাতিবিশেষে জন্মে। যে হিসাবে মানুষ নিজের অদৃষ্টের স্রষ্টা, সেই হিসাবে সে নিজের জাতিত্বের স্রষ্টা।

এখন কথা হইতেছে, জাতি গুণগত হয় হউক, উহা বংশগত হয় কেন? সমস্যা এইখানে। শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করিলে জানা যায়, ঋষিরা বীজশক্তির প্রাধান্য ও প্রভাব খুবই স্বীকার করিতেন। বৈজিকী ধারা ধরিয়া গুণ বিসর্পিত হইয়া থাকে। এ কথাটা আধুনিক পাশ্চাত্য

---

* কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, এই ঋক্‌টি প্রক্ষিপ্ত। এই উক্তির সমর্থক কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ তাঁহারা দেন না। ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি বলেন, ইহাতে যে রাজন্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে অন্য কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। এ যুক্তি বিচারসহ নহে। বেদে ক্ষত্রিয় শব্দবাচক অন্য শব্দ আছে। বিশেষতঃ যে শব্দ একবার ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা যে প্রক্ষিপ্ততার অকাট্য প্রমাণ, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ।

বৈজ্ঞানিকরা অনেকটা স্বীকার করেন। বোহিমিয়ার ব্রহ্মচারী যোহান গ্রেগর মেণ্ডেল উদ্ভিদ্‌জাতির মধ্যে পরীক্ষা করিয়া অনেক বৈজিক তথ্য আবিষ্কৃত করিয়াছেন। সেই উদ্ভিদ্‌জাতির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ন্যাংড়া আমের বংশেই ন্যাংড়া এবং ফজলী আমের বংশেই ফজলী আম জন্মে। টোকো চাল্‌তা আমের আঁটি হইতে ন্যাংড়া বা ফজলী ফলান যায় না। পাতি-নেবুর বীজসম্ভূত বৃক্ষে বাতাবিনেবু ফলান যায় না, বাতাবি-নেবুর গাছও সহজে পাতিনেবু প্রসব করে না। শ্রীহট্টের কমলা বাঙ্গালার মাটিতে রোপণ করিলে তাহাতে গোঁড়া-নেবুর মত নেবুই জন্মে, কিন্তু সেই সকৃৎভঙ্গ গোঁড়ার বীজকে যদি আবার শ্রীহট্টের ক্ষেত্রে রোপণ করা যায়, তাহা হইলে তাহাতে আবার ঠিক কমলাই জন্মে, কিন্তু বাঙ্গালার মৌলিক গোঁড়ার বীজকে যদি শ্রীহট্টের ক্ষেত্তে বপন করা যায়, তাহা হইলে সেখানে যাইয়া সে গোঁড়াই প্রসব করে, কমলা প্রসব করিতে পারে না। তবে চারি পাঁচ পুরুষে কি হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। সেই জন্য বৈজিকশক্তির প্রভাবকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তবে মানুষের পক্ষে এই বৈজিকী শক্তি কতদূর প্রভাব বিস্তৃত করে, তাহা অবিসম্বাদিতরূপে সপ্রমাণ হয় নাই। এই মাত্র জানা গিয়াছে যে, কতকগুলি বিষয়ে মানুষে বৈজিকী শক্তি দুর্লঙ্ঘ্য। পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বহুপুরুষপুরুষানুক্রমে সংক্রামিত কৌলিকগুণ বংশধরে যত সহজে বর্ত্তে, পিতার স্বোপার্জ্জিত গুণ তত সহজে পুত্রে বর্ত্তে না। একবার এডিনবরার স্কুলের চৌদ্দ শত ছেলেকে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল; তাহাতে সপ্রমাণ হয় যে, যে সকল ছেলেমেয়ের পিতামাতা মদ্যপানাদি করিয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে, মানসিক অবনতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা যে সকলক্ষেত্রে অবনত হইয়াছে, তাহা নহে; যাহারা "বংশজ" অর্থাৎ যাহাদের বংশ ভাল, কিন্তু যাহারা উপস্থিত দুই এক পুরুষ বংশগত সদ্‌গুণ হারাইয়াছে, তাহাদের সন্তানদিগের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দৈহিক বা মানসিক কোন অবনতিই লক্ষিত হয় নাই। সদ্‌গুণসম্পন্ন বংশে দুই এক পুরুষ নিতান্ত অধঃপতিত হইলেও সেই অধঃপতিত বংশজের সন্তান দৈহিক বা মানসিক হীনতার কোন লক্ষণই প্রকটিত করে নাই। এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়া এক জন বিশেষজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন,—Nevertheless the fact that it was not found suggest that the habits of the parents are relatively unimportant compared with the nature of the stock in determining the character of the children.

ইহার মর্ম্মার্থ এই—"সে যাহা হউক, পিতা-মাতার অতিরিক্ত পানদোষ সন্তানের মানসিক অবনতির হেতু কি না, এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক না পাওয়া গেলেও ইহা কতকটা বুঝা যায় যে, সন্তানের চরিত্রগঠনে কৌলীন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, পিতা-মাতার অভ্যাস আচার-ব্যবহার প্রভৃতির গুরুত্ব তাহা অপেক্ষা অনেক হীন।" য়ুরোপের এক জন সুপ্রসিদ্ধ সাম্যবাদী বৈজ্ঞানিক নানা সংগৃহীত ও পর্য্যবেক্ষিত তথ্য আলোচনা করিয়া কৌলিকশক্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। য়ুরোপের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সিস গাল্টন Eugenics বা জাতিবিজ্ঞান নামক যে নূতন বিদ্যার আলোচনা আরব্ধ করিয়াছেন, আজ বিংশতি বর্ষমাত্র যে বিদ্যার চর্চ্চা বিশেষভাবে আরব্ধ হইয়াছে, সেই মানবজাতির উৎকর্ষসাধিনী বিদ্যার বীজমন্ত্রেও কৌলিকশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ কথাও বলিতেছেন যে, য়ুরোপে অধুনা সাম্যবাদের প্রাবল্য যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই যৌনসম্বন্ধসংস্থাপনের গণ্ডি শিথিল হইয়া পড়িতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে তথায় মানবজাতির অবনতির লক্ষণ প্রকটিত হইতেছে! অবশ্য এই কথা লইয়া এখন অনেক বাদানুবাদ চলিতেছে। এই যে জাতীয় অবনতির দিকে ঝোঁক (Tendency of the race to degenerate), ইহা আধুনিক সভ্যতারই অবস্থাগত ফল। কিন্তু যে দিন জাত্যুৎকর্ষসাধন বিজ্ঞানের Eugenics-এর আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিনই কৌলিকশক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের সমর্থন বা সিদ্ধান্ত লইয়াই আমরা বর্ণবিভাগের সমর্থন করিতে চাহি না। উহার চেষ্টা পাওয়া বাতুলতা মাত্র। তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, অতি প্রাচীনকালে আর্য্য ঋষিরা যে কৌলিকশক্তির উপর বর্ণ-বিভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রাকৃতিক বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগের প্রাকৃতিক তত্ত্বানুসন্ধান-তৎপর প্রতীচ্য মনস্বীরা ভিন্ন পথে অনুসন্ধানের বর্ত্তিকা লইয়া অগ্রসর হইলেও সেই প্রাকৃতিক বিধানের সন্ধান পাইতেছেন। সুতরাং উহাকে একেবারে উপহাস করা যায় না। বিশেষতঃ আমাদের দেশে বর্ণবিভাগের ফলে বিবাহবন্ধনের অনেকটা বাঁধাবাঁধি গণ্ডি আছে। এ দেশে এই দুর্দ্দিনেও আমরা দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, এই কয়টি উচ্চজাতির মধ্যে প্রতিভা যেরূপ আত্মপ্রকাশ করে, অন্য জাতির মধ্যে সেরূপ করে না। আবার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র অন্তর্গত কয়েকটি কুলীন ও বংশজের বংশে এবং কায়স্থদিগের মধ্যে ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ প্রভৃতি কুলীন বা কুলীনের বংশধরের মধ্যে যত প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়, অন্য ব্রাহ্মণ-কায়স্থবংশে তাহা অপেক্ষা প্রতিভার বিকাশ কতকটা কমই লক্ষিত হইয়া থাকে। যুক্ত-প্রদেশের বহুস্থানে ব্রাহ্মণগণ অবস্থাগতিকে লালা কায়েত অপেক্ষা যেন হীন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই অনুমিত হয়। কিন্তু অনুকূল অবস্থা পাইলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রতিভার

সুষমা যেরূপভাবে বিকাশলাভ করে, অন্য কোন বংশে সেরূপ করে কি? পণ্ডিত বাপুদেব শাস্ত্রী সুধাকর দ্বিবেদী, মদনমোহন মালবী, দয়ানন্দ সরস্বতী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতির ন্যায় লোকই বা কয় জন অন্য জাতিমধ্যে জন্মিয়াছে? অবশ্য অন্য বংশে ঐরূপ প্রতিভাশালী লোক যে একেবারে জন্মে নাই, এ কথা আমি বলি না। তবে আনুপাতিক হিসাবে অন্য জাতির অপেক্ষা পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়বংশেই প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তাবিকাশের যেন বাহুল্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহার মৌলি‹ কারণ কি কৌলিকশক্তি নহে? সুতরাং প্রত্যক্ষ ব্যাপা' কৌলিকশক্তির প্রভাব প্রকাশমান।

সুতরাং জাতিভেদ বংশগত করা হ য়াছে। কিন্তু ইহার মূল বনিয়াদ গুণকর্ম্মভেদ। ব্রাহ্মণজাতিকে সত্ত্বগুণপ্রধান ও সাত্ত্বিক কর্ম্মরত হইতেই হইবে। বংশানুক্রমে তাঁহারা এই গুণের উৎকর্ষসাধন ও সাত্ত্বিককর্ম্মে রত থাকিয়া আপনার জাতীয় উৎকর্ষসাধন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ক্ষত্রিয়জাতি রজোগুণপ্রধান। তাঁহারা রাজসিক কার্য্যেই প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিবেন। শৌর্য্য, বীর্য্য, তেজ, যত্ন, কার্য্যদক্ষতা, চতুরতা, প্রভুত্ব, সুখভোগেচ্ছা, ঐশ্বর্য্যাভিমানিতা প্রভৃতি রাজসিক গুণ ক্ষত্রিয়জাতিতে বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষত্রিয়ের সত্ত্বগুণ নিতান্ত সঙ্কুচিত হইবে না। তাঁহাদের মেধা, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, জিতেন্দ্রিয়তা, উদারতা প্রভৃতি গুণও প্রবল রাখা চাই। তবে রজোগুণের বাহুল্যবশতঃ তাঁহাদের সাংসারিক বুদ্ধি অধিক হওয়া আবশ্যক। বৈশ্যের ক্ষত্রিয় অপেক্ষা সত্ত্বগুণ হীন ও রজোগুণ প্রবল। শূদ্রের তমোগুণই প্রবল। বলা বাহুল্য, যতদিন মানুষ গুণাতীত না হইবে, ততদিন প্রত্যেক মানুষেই তিনটি গুণ থাকিবেই থাকিবে। একটি গুণ বিলুপ্ত হইলেই তিনটি গুণই বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং ব্রাহ্মণেরও তমোগুণ থাকিবে, শূদ্রেরও সত্ত্বগুণ থাকিবে। প্রত্যেক জাতিতে মোটামুটি একটা গুণের তারতম্য আছে। ইহা ভিন্ন প্রত্যেক ব্যক্তিতেই গুণবৈষম্য লক্ষিত হয়। এই বিষয়টি বুঝিবার জন্য একটা মোটামুটি হিসাব দেখান যাইতে পারে। মানুষে যে পরিমাণ গুণ থাকে, তাহার পূর্ণমান এক শত ডিগ্রী ধরা হউক। এরূপভাবে জাতিহিসাবে সত্ত্বরজস্তমক্রমে জাতিহিসাবে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে এইরূপ গুণ বিন্যস্ত থাকিবে। ব্রাহ্মণে ৪০।৩৫।২৫, ক্ষত্রিয়ে ৩৫।৪০।২৫, বৈশ্যে ২৫।৪০।৩৫, শূদ্রে ২৫।৩৫।৪০। বলা বাহুল্য, ইহা বুঝিবার জন্য একটা মনগড়া মোটামুটি আনুপাতিক হিসাব। ব্রাহ্মণজাতি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ থাকিলে তাঁহার সত্ত্বগুণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে। স্বধর্ম্মপরায়ণ গৃহস্থ ব্রাহ্মণের সত্ত্বরজস্তমোগুণের এইরূপ আনুপাতিক বিন্যাসও হইতে পারে, ৫০।৩০।২০ কাহারও বা ৪৫।৪০।১৫ও হয়। ধর্ম্মকার্য্যের অনুশীলন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চর্চ্চার দ্বারা সাত্ত্বিকগুণের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সাংসারিক জ্ঞান, জড়বিজ্ঞান, রাজনীতির আলোচনা প্রভৃতির দ্বারা রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়াদির ধর্ম্মবুদ্ধি বেশী হইতে পারে। মনে করুন, কোন ব্রাহ্মণের গুণানুপাত ৩৫।৩৩।৩২, কোন ক্ষত্রিয়ের ৩৬।৪০।২৪, এই উভয়ের তুলনা করিয়া দেখিলে ক্ষত্রিয়কেই অধিকতর উন্নত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও গুণগতহিসাবেও ঐ ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়কে ক্ষত্রিয় বলিতেই হইবে। বলা বাহুল্য, জন্মগত সকল ব্রাহ্মণে যে সত্ত্বগুণের অধিক বিকাশ হয়, তাহা নহে। অনেক জাতি ব্রাহ্মণে শূদ্র অপেক্ষাও রজস্তমোগুণের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। শিক্ষার দোষে ঐরূপ ঘটে। পারিপার্শ্বিকপ্রভাবে গুণবিপর্য্যয় ঘটে। তবে কোন দ্বিজাতিবংশে দুই এক পুরুষ যদিও অবনতি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও পরবর্ত্তী পুরুষ অনুকূল অবস্থায় পড়িলে তাহার আবার স্বজাতির অনুরূপ গুণ বিকাশিত হয়। কিন্তু বহুপুরুষ ক্রমাগত অবনত হইলে সেই দ্বিজবংশও ক্রমে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ফলে ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বপ্রাপ্তি প্রাচীন কালে বিরল ছিল না।

শাস্ত্রে অধোদিক্ হইতেই জাতিভেদের ক্রম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যথা ;—

> প্রথমং স্থাবরাজাতিস্ততঃ সারীসৃপী মতা।
> পক্ষিজাতিস্তৃতীয়াতু চতুর্থী মৃগজাতিকা॥
> পঞ্চমী পশুজাতিস্তু ষষ্ঠীচৈবান্ত্যজা স্মৃতা।
> সপ্তমী শূদ্রজাতিস্তু বৈশ্যজাতিস্তথাষ্টমী॥
> নবমী ক্ষত্রজাতিস্তু দশমীবিপ্রসংজ্ঞিতা।

প্রথমে স্থাবরজাতি, (২) সরীসৃপ, (৩) পক্ষী, (৪) মৃগ, (৫) পশু, (৬) অন্ত্যজ, (৭) শূদ্র, (৮) বৈশ্য, (৯) ক্ষত্রিয় ও (১০) ব্রাহ্মণ। এইখানে জীবদিগের মধ্যে দশটি জাতির উল্লেখ দেখা গেল। স্থাবর হইতে জৈবস্তরের অবরোহক্রমে ব্রাহ্মণের আবির্ভাব হইয়াছে। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত হইয়াছে ;—

> স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
> কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষঞ্চ পক্ষিণঃ॥
> ত্রিংশল্লক্ষ পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
> ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
> এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
> সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

জীব চতুরশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ব্রাহ্মণযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ প্রাণী ৯ লক্ষ, কূর্ম্মাদি সরীসৃপ ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ, এই ৮২ লক্ষ যোনিতে পরিভ্রমণ করিলে পর তাহার মনুষ্যযোনিতে জন্ম হয়। মানবদেহে জন্মগ্রহণের পর তাহার কর্ম্ম করিবার শক্তি জন্মে। কর্ম্মফল

তাহার উপর প্রভাব বিস্তৃত করে। সে যদি পর পর ভাল কাজ করিয়া যায়, তাহা হইলে অন্ত্যজ, আন্তরালিক প্রভৃতি নিম্নস্তরের মনুষ্যযোনিতে জন্মিয়া ক্রমে দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়। ক্রমশঃ বৈশ্য-ক্ষত্রিয়াদি হইয়া শেষে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া ত্রিগুণের বন্ধন ছিন্ন করিলে তবে সে মুক্তিলাভ করে।

কেবল যে মানুষের মধ্যেই জাতিভেদ আছে, তাহা নহে। অন্যান্য জীবেও জাতিভেদ আছে। শাস্ত্র বলিতেছেন ;—

এষা তু মানবী সৃষ্টিঃ সর্ব্বশো হি চতুর্ব্বিধা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চেতি পৃথক্ পৃথক্ ॥
সুরাসুরনরাঃ পক্ষী পশুদ্রুমলতাদয়ঃ ॥
এবং চতুর্ব্বিধা সর্ব্বা প্রজাবর্ণচতুষ্টয়ী ॥

মানবী সৃষ্টি চতুর্ব্বিধা ;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। সুর, অসুর, মানব, পক্ষী, পশু, লতাদ্রুম, সমস্তই গুণের তারতম্য অনুসারে চতুর্ব্বিধ। মানুষ চারিবর্ণের।

বেদে দেবতাদিগের মধ্যেও জাতিভেদের উল্লেখ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখা যায় যে, ব্যক্ত জগৎ যখন অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, তখন একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, তখন জাতিভেদ ছিল না। তাহার পর ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া অগ্নিকে সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিরূপী ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ জাত্যাভিমানবশতঃ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইলেন। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ হইলে সৃষ্টি হয়ও না, থাকেও না। তখন ব্রহ্মা রজোগুণ আশ্রয় করিয়া ক্ষত্রিয় হইলেন। তখন সেই ব্রহ্মাই আবার ইন্দ্র, যম, বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য, মৃত্যু, ঈশানরূপ ক্ষত্রিয়দেবতায় বিভক্ত হইলেন। ইঁহারা সকলেই এক এক বিভাগের রাজা। কিন্তু কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হইলেই সৃষ্টি চলে না। তখন তিনি আবার বৈশ্যদেবতা হইলেন। বৈশ্যদিগের একাকী কোন কার্য্য হয় না, তাহাদের গণ বা Company থাকা চাই। সেই জন্য অষ্ট-বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ত্রয়োদশ বিশ্বদেব এবং উনপঞ্চাশৎ মরুৎ সৃষ্ট হইলেন। কিন্তু তথাপি সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না। তখন তিনি শূদ্রদেবতা পুষার সৃষ্টি করিলেন। এই পুষার সৃষ্টির পর ব্রহ্মা সৃষ্টিকার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই বৈদিক আখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, আদৌ ব্রাহ্মণ সৃষ্ট হইয়াছিল। দেবতার মধ্যে যাহা হইয়াছে, মানুষের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণ, পরে ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্য এবং বৈশ্য হইতে শূদ্র জন্মিয়াছে। ভৃগু বলিয়াছেন,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্ ॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥
গোভ্যং বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণা শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।

এই জগৎ ব্রহ্মময়, সুতরাং বর্ণের মধ্যে বৈশিষ্ট্য নাই। ব্রাহ্মণরাই প্রথম সৃষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু কর্ম্মবশে সেই ব্রাহ্মণরা নানাবর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। যাহারা কামভোগে রত, উগ্রপ্রকৃতি, ক্রোধী ও সাহসী এবং রজো-গুণাধিক্যবশতঃ রক্তবর্ণ হইল, সেই দ্বিজগণই ক্ষত্রিয়, আর যাহারা গোপালন, কৃষিজীবী হইয়া ব্রাহ্মণোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগ করিল, সেই সকল দ্বিজাতি এবং রজস্তমোগুণাধিক্যে পীতবর্ণ হইল, তাহারা বৈশ্য এবং হিংসুক, মিথ্যাবাদী, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, শৌচাচারবিহীন এবং তমোগুণা-ধিক্যহেতু কৃষ্ণবর্ণ হইল, সেই সকল দ্বিজ শূদ্র হইয়া গেল। সুতরাং বুঝা গেল, চারিবর্ণই আদিতে এক ছিল। পরে বহুপুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করাতে তাহারা নানাবর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। ভৃগু অন্যত্র বলিয়াছেন,—

সর্ব্বভক্ষ্যরতির্নিত্যং সর্ব্বকর্ম্মকরোঽশুচিঃ।
ত্যক্তবেদস্ত্বনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ ॥

অর্থাৎ যে সকল ব্রাহ্মণ বেদপাঠ, শৌচ, আচার, সমস্তই বর্জ্জন করিয়াছে, তাহারাই কালবশে শূদ্র হইয়া গিয়াছে।

সুতরাং বুঝা গেল, শূদ্রগণ অনার্য্য নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আর্য্যগণ এ দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকেই শূদ্র বা দাস করিয়াছেন, এ সিদ্ধান্ত ভুল। তবে যে সকল দ্বিজ ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার ও গম্যাগম্য বিচার বর্জ্জন করিয়া শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদের সহিত অনার্য্যজাতির মিশ্রণ অবশ্যম্ভাবী। সেই জন্য কোন কোন শূদ্রজাতির সহিত অনার্য্যজাতির অস্থিসংস্থানগত কিছু সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাস্তবিক শূদ্র অনার্য্য নহে।

[ক্রমশঃ।

আচার।

[ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।]

কুলাচার কি? তদ্‌সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিব বলিয়াছিলাম। এই সন্দর্ভে তন্ত্রোক্ত সকল আচারের কথাই সংক্ষেপে বলিতেছি।

আচার সাধনপথের একটি প্রধান অঙ্গ। আচার-বিহীন ব্যক্তিগণ কখনও সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। ঈশ্বরসাধনের ইচ্ছা থাকিলে গুরুনির্দ্দিষ্ট কোন একটি আচার অবলম্বন করিতে হয়। তন্ত্রশাস্ত্রে সাধকের প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে আচারকে মোটামুটি তিন-ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—পশ্বাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার। এই ত্রিবিধ আচারের অপর নাম পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাব।

পশ্বাচারী ও বীরাচারী স্বীয় স্বীয় আচারকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া অনেক সময় অনেক বাদানুবাদ ও পরস্পর পরস্পরের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বুঝিবার ভ্রমেই ঐ সকল বিবাদ উপস্থিত হয়। সকল আচারই শিবনির্দ্দিষ্ট। সাধকের প্রকৃতি ও অধিকারানুসারে তাহাদের হিতের জন্য মহাযোগী মহাদেব ভিন্ন ভিন্ন আচারের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে কোন আচারই নিন্দনীয় নহে।

জ্ঞানের তারতম্যই পশুভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবের কারণ। জ্ঞান দ্বিবিধ—ভেদ ও অভেদ। ভেদজ্ঞানের নাম পশুভাব এবং অভেদজ্ঞানের নাম দিব্যভাব। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভেদাভেদ জ্ঞানীর ভাবকে বীরভাব বলে।

প্রথমতঃ পশুভাব; এই পশুভাব সমাপ্ত হইলেই বীর-ভাব আরব্ধ হয়। বীরভাবের সমাপ্তিতেই আবার দিব্য-ভাবের উদয় হইতে থাকে। তাই শিব বলিয়াছেন,—
"আদৌ পশুস্ততোবীরশ্চরমো দিব্য উচ্যতে।"

যেমন বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, একের পর এক আসিয়া উপস্থিত হয়, যেমন ফুল হইতে ফল এবং ফল হইতে বীজ, যেমন দুগ্ধ হইতে নবনীত এবং নবনীত হইতে ঘৃত, যেমন প্রথমে সঙ্কল্প, তৎপরে কার্য্য এবং সর্ব্বশেষে দক্ষিণান্ত, পশু-ভাব, বীরভাব ও দিব্যভাবও সেইরূপ।

(১) পশ্বাচার।

এই আচারকে আমরা সাধারণতঃ শুদ্ধাচার বলিয়া থাকি। এই আচারের লক্ষণ এইরূপ;—

"হবিষ্যং ভক্ষয়েন্নিত্যং তাম্বুলং ন স্পৃশেদপি।
ঋতুস্নাতাং বিনা নারীং কামভাবে নহি স্পৃশেৎ॥
পরস্ত্রীয়ং কামভাবে দৃষ্টা স্বর্গং সমুৎসৃজেৎ।
সংত্যজেন্মৎস্য মাংসাদীন্ পাশবো নিত্যমেব চ॥
গন্ধমাল্যানি বস্ত্রাণি চীরাণি প্রভজেন্ন চ।
দেবালয়ে সদাতিষ্ঠেদাহারার্থং গৃহং ব্রজেৎ॥
কন্যা পুত্রাদি বাৎসল্যং কুর্য্যান্নিত্যং সমাহিতঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রার্থয়েন্নৈব যদ্যস্তি তত্তু ন ত্যজেৎ।
সদা দানং সমাকুর্য্যাৎ যদি সন্তি ধনানি বৈ॥
কার্পদ্রোহান্ ক্ষিপেৎ সর্ব্বমহঙ্কারাদিকং ততঃ।
বিশেষেণ মহাদেবি ক্রোধং সংবর্জ্জয়েদপি॥"
(কামাখ্যাতন্ত্র।)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের প্রথম উল্লাসে উক্ত আছে;—
"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং স্বয়মেবাহরেৎ পশুঃ।
ন শূদ্রদর্শনং কুর্য্যাৎ মনসা ন স্ত্রিয়ং স্মরেৎ॥"

পশ্বাচার চিত্তশুদ্ধির প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে এই আচার প্রথমেই পালনীয়। এই আচারিগণ ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিবে, হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, গন্ধমাল্য ও মূল্যবান বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবে না, মৎস্য মাংসাদি পরিত্যাগ করিবে, কখন তাম্বুল স্পর্শ করিবে না, সর্ব্বদা শুচি থাকিবে ও দেবালয়ে যাইবে, ঐশ্বর্য্যের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ধন থাকিলে দান করিবে এবং কৃপণতা ও অহঙ্কারাদি পরিত্যাগ করিবে। বিধি-পূর্ব্বক এই আচার আচরিত হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি সকল দূর হয় এবং ক্রমশঃ ভোগবাসনা তিরোহিত হইয়া অন্তঃকরণে শান্তি সংস্থাপিত হয়। বাসনাক্ষয়নিবন্ধন মনের চঞ্চলতা অনেক পরিমাণে নিবৃত্ত হয়; হিংসা কমিয়া যায়, ক্ষমা বৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বভূতে দয়া উপস্থিত হয়। মনে কর, যে ব্যক্তি নিত্য হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে—যে সাত্ত্বিক আহারে অভ্যস্ত—সে পলাণ্ডুসংযুক্ত কোন উপাদেয় খাদ্য দেখিলেও তাহা আহার করিতে চাহে না। এইরূপ যে ব্যক্তি শূদ্রের দোকানের মিষ্টান্ন খাইতে ঘৃণাবোধ করে, সে শূদ্রসংস্পৃষ্ট-বোধে অনেক উৎকৃষ্ট ভোজ্যও পরিত্যাগ করিয়া থাকে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোভও ক্রমশঃ নিবৃত্ত হইয়া পড়ে।

আবার দেখ—দিবারাত্র শুচি থাকাই যাহার অভ্যাস, সে অশুচি লোককে স্পর্শ করিতে বা তাহার সংশ্রবে থাকিতে কষ্টবোধ করে। এমন কি, স্ত্রীপুত্রাদি পরম

স্নেহাস্পদগণও অশুচি থাকিলে সে তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে; কাযে কাযেই ক্রমশঃ তাহার মায়া-মোহাদিও কমিয়া যায়।

বিধিপূর্ব্বক অহিংসা আচরিত হইলেও ক্রমে সর্ব্বজীবে দয়া উপস্থিত হইয়া ক্ষমাগুণের বৃদ্ধি হয়।

মিত মৈথুনদ্বারাও ক্রমশঃ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হইতে থাকে। সুতরাং মন স্বতঃই তখন ঈশ্বরের দিকে ধাবিত হয়। কৃপাময় জগদ্‌গুরু এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে পশ্বাচার আচরণ করিবার বিধি দিয়াছেন।

জীবদেহে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। এই গুণত্রয়বিরহিত কোন প্রাণী কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে কাহার তিন গুণ সমান নাই; কারণ, গুণ-বৈষম্য হইতেই এই বিশ্বসৃষ্টি। যাহার প্রকৃতিতে তমোগুণ অধিক আছে, তাহাকে তামস, যাহার রজোগুণ অধিক আছে, তাহাকে রাজস এবং যাহার সত্ত্বগুণ অধিক আছে, তাহাকে সাত্ত্বিকলোক বলে। যাহাদের শরীরে তমোগুণ অত্যধিক, রজোগুণ তদপেক্ষা কম এবং সত্ত্বগুণ নাই বলিলেই হয়, তাহারা অসমাহিত, বিবেকশূন্য, অনম্র, পরাবমাননাকারী, অনুদ্যমশীল, শোকার্ত্ত ও দীর্ঘসূত্রী হইয়া থাকে। যাহাদের শরীরে রজোগুণের একান্ত আধিক্য আছে, তাহারা পুত্রকলত্রাদিতে আসক্ত, হিংস্র, পরবিত্তাভিলাষী, বিহিত শৌচবিবর্জ্জিত এবং লাভালাভে হর্ষশোকান্বিত হয়। যে সকল পূত আত্মা ব্যক্তির রজস্তমঃ উভয়বিধ গুণ ক্ষুণ্ণ হইয়া সত্ত্বগুণ উন্মেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আসক্তিত্যাগী, গর্ব্বোক্তিরহিত, ধৈর্য্য ও উদ্যমসমন্বিত এবং কৃতকার্য্যের সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য। তাঁহারা আত্মাভিমান বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সকল কর্ম্মকেই সেই ভগবানের কর্ম্ম বলিয়া ধারণা করেন। আমি নিমিত্ত মাত্র।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

মনে এই ধারণা তাঁহারা সুদৃঢ় রাখিতে পারেন। তখন চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়;—প্রভুত্বপ্রিয়তা, রিপুবশতা, স্বার্থপরতা এবং ঐশ্বর্য্যের জন্য ব্যাকুলতা—এ সকল কিছুই তাঁহাদের মনকে আর ক্লিষ্ট করিতে পারে না।

পশ্বাচারে যে রজঃ ও তমোগুণের বৃদ্ধিকারক বস্তুসকল পরিহার এবং সত্ত্বগুণবৃদ্ধিকারক বস্তুসকল গ্রহণ করিবার বিধি আছে, গুরুপদেশানুসারে সেইগুলি প্রতিপালিত হইলে, সেই অমূল্য ধন—সত্ত্বগুণ লাভ করা সাধকের পক্ষে সহজসাধ্য হইয়া পড়ে।

কোন কোন তন্ত্রে পশ্বাচারকে চারিটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং উহাদের প্রত্যেক ভাগকে এক একটি স্বতন্ত্র নামেও অভিহিত করা হইয়াছে; যথা—বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার এবং দক্ষিণাচার, ইহাদের প্রত্যেকটির লক্ষণও কিছু কিছু বলা যাইতেছে।

বেদাচার—"বেদাচার প্রবক্ষ্যামি শৃণু সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি।
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে উত্থায় গুরুং নত্বা স্বনামভিঃ॥
আনন্দনাথশব্দান্তে পূজয়েদথসাধকঃ।
সহস্রাম্বুজে ধ্যাত্বা উপচারৈস্তু পঞ্চভিঃ।
প্রজপ্য বাগ্‌ভবং বীজং চিন্তয়েৎ পরমাং কলাং॥"
"অথ বক্ষ্যে মহেশানি বৈষ্ণবাচারমুত্তমং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালস্থাদিহিতাঞ্জলিঃ॥

বৈষ্ণবাচার—"বেদাচার ক্রমেনৈব সদা নিয়মতৎপরঃ।
মৈথুনং তৎ কথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥
হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনং।
রাত্রৌ মালাঞ্চ যন্ত্রঞ্চ স্পৃশেন্নৈব কদাচন॥
বিষ্ণৌ সমর্চ্চয়েদ্দেবি বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥"

শৈবাচার—"শৃণু চার্ব্বাঙ্গি সুভগে শৈবাচারং সুদুর্লভং।
বেদাচার ক্রমেনৈব শৈবে শাক্তে ব্যবস্থিতং॥
তদ্বিশেষং মহাদেবি কেবলং পশুঘাতনং।"

দক্ষিণাচার—"ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রি়
দক্ষিণামূর্ত্তি মুনিনা আশ্রিতোঽসৌ যতঃ পুরা॥
অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে।
প্রবর্ত্তকোয়মাচারঃ প্রথমো দিব্যবীরয়োঃ॥
বেদাচার ক্রমেনৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জাপমন্ত্র মনন্যধীঃ॥"

(নিত্যাতন্ত্র।)

মোট কথা, উপরিলিখিত এই আচারচতুষ্টয়ের মধ্যে কিছু কিছু পৃথক্‌ভাব থাকিলেও উহারা সাধারণতঃ পশ্বাচারেরই অন্তর্গত।

(২) বীরাচার।

তন্ত্রে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন, এই পাঁচটিকে পঞ্চতত্ত্ব বা পঞ্চ-মকার বলে। এই পঞ্চ-মকার সহযোগে উপাসনার নামই বীরাচার বা কুলাচার। এই আচারী সাধকগণই "কুলীন" পদবাচ্য, ইঁহারাই প্রকৃত দীক্ষাস্বামী।

পশ্বাচারে আমি জীব, দেবতার পূজা করিতেছি—দেবতার ভোগ দিতেছি—দেবতার প্রসাদভোজনে আত্মাকে চরিতার্থ করিতেছি ইত্যাদি দ্বৈতভাবে উপাসনা হইয়া থাকে।

দেহস্থ কুণ্ডলিনীশক্তিই জীব-চৈতন্যের মূল কারণ; আমার কর্তৃত্ব ভ্রমমাত্র। আমি খাই না—যাই না—দেখি না ইত্যাদিরূপ অহঙ্কারত্যাগই বীরাচারের শিক্ষা। পঞ্চতত্ত্ব ঐ শিক্ষার বলবান সহায়। যেমন ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থ আকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, সেইরূপ অহঙ্কার লুপ্ত হইলে জীবরূপী ক্ষুদ্র আত্মা ব্রহ্মরূপ পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকেন।

আমাদের দেশের অনেকেই বীরাচার—মদ্য-মাংসাদি ব্যবহারের কথা শুনিয়াই তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। তাঁহারা বলেন, মদ্য-মাংসাদি পাঁচটি সামগ্রী অত্যন্ত প্রলোভনের বস্তু। এইগুলি লইয়া নিত্য সাধন করিতে হইবে অথচ মনের বিকার জন্মিবে না। ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? মদ্যের নাম শুনিলেই ত আমাদের ঘৃণা হয়। শাস্ত্রে "মদ্যমদেয়মপেয়মগ্রাহ্যম্" বলা হইয়াছে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, এ সকল মহাপাতকের মধ্যে গণনীয়। তবে সেই মদ্যপান করিয়া আবার উপাসনা কি? শিববাক্য সমুদয় সত্য; ইহা স্থির রাখিয়া অনুকূল যুক্তি ও প্রমাণ অনুসন্ধান করতঃ আমি এ সম্বন্ধে যেটুকু বুঝিয়াছি, নিম্নে তাহা বলিতেছি।

যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে শত শত যোদ্ধাকে পরাভূত করিতে পারেন, তিনি যেমন লোকসমাজে বীর বলিয়া পরিগণিত হন, সেইরূপ যিনি দুর্দ্দমনীয় মনকে জয় করিতে সমর্থ, সাধনক্ষেত্রে তিনিই বীর আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বীরাচার সাধারণের আচরণীয় নহে। পশ্বাচার-আচরণের দ্বারা যাঁহার অন্তঃকরণ শান্ত ও নিরুপদ্রব হইয়াছে—সংসারের অনিত্যতা বুঝিতে পারিয়া মনে বৈরাগ্যোদয় হইয়াছে—কাম-ক্রোধাদি মানসিক বিকারসকল যাঁহার ক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না, তিনিই বীরাচারের যথার্থ অধিকারী। মদ্য-মাংস খাইব অথচ সাধন হইবে, ইহা শুনিতে খুব সহজ, কিন্তু শাস্ত্রানুযায়ী আচরণ করা বড়ই কঠিন। এক বিন্দু পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ; ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে। বীরাচারের অধিকারী-সম্বন্ধে তন্ত্র কি বলিতেছেন, দেখ—

সর্ব্বহিংসাবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।
সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারীস্যাদন্যথা ভ্রষ্টসাধকঃ॥
কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যবর্জ্জিতঃ।
মানাপমানসন্তুষ্টোঽপ্যধিকারী স এ বহি॥"

(যোগিনীহৃদয়।)

উৎপত্তিতন্ত্রে বীরপ্রশংসায় মহাদেব বলিতেছেন—

"যো বীরঃ স শিবং সাক্ষাদ্দেব এব ন সংশয়ঃ।
যত্র বীরো বসেদ্দেবি তত্র কস্য ভয়ং ভবেৎ॥"

অধিকারী না হইয়া যিনি অনধিকারে বীরাচার আচরণ করিতে যান, তিনিই অধোগতিপ্রাপ্ত হন।

"অপ্রাপ্ত বীরভাবস্তু যদি বৈর্য্যং সমাশ্রয়েৎ।
ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টশ্ছন্নোভবতি তৎক্ষণাৎ॥"

(ভৈরবসংহিতা।)

তাহার পর আর এক কথা এই, যে প্রকৃত বীরাচারী, তাহার কখন মদ্যপানে ভ্রান্তি বা বিকার জন্মিবে না। যে ব্যক্তির মদ্যপানে বিকার উপস্থিত হয়, সে কখনই এই সাধনের অধিকারী নহে।

"পানে ভ্রান্তির্ভবেদ্ যস্য ঘৃণা চ শক্তিসাধকে।
স পাপিষ্ঠঃ কথং কুর্য্যাদাস্থা কালীং ভজামাহং॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

উপরি-উক্ত শাস্ত্রবাক্যগুলির মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে বীরাচারকে সাধারণে যেরূপ ঘৃণার চক্ষুতে দেখেন, তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। মদ্য-মাংসাদি তোমার আমার প্রলোভনের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বীরাচারীর পক্ষে উহারা কোনই ক্ষতি করিতে পারে না। বীরাচার জ্ঞানীর বা উচ্চ অধিকারীর জন্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। রজঃ ও তমোগুণ নিবৃত্ত হইয়া সাত্বিকভাব উপস্থিত হইলেই জ্ঞানের স্ফুরণ হইয়া থাকে। প্রকৃত সাত্বিকভাব উপস্থিত হইলে বাসনারহিত হয় এবং তদবস্থায় বৈধকর্ম্মের অনুরোধে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব রহিত হইয়া যাহা কিছু করা যায়, তদ্দ্বারা পাপ-পুণ্য কিছুই সঞ্চয় হয় না। অতএব কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরহিত হইয়া গুরুবাক্যানুসারে বৈধকর্ম্মবোধে মদ্য-মাংসাদি ব্যবহার করিলে তাহা অসাত্বিক বা নিন্দনীয় নহে;—লোভবশতঃ তৃষ্ণার সহিত ব্যবহারই নিন্দনীয়। "ন মাংসভক্ষণে দোষা ন দোষো মদ্যপানতঃ, প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলাঃ"—ইহাই শাস্ত্রবাক্য।

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

যিনি কর্ম্মফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া আসক্তিত্যাগে বৈধকর্ম্ম করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপপুণ্যে লিপ্ত হন না।

বাস্তবপক্ষে বীরাচার ঘৃণার বস্তু নহে। ব্যভিচারে যাহা দেখা যায়, তাহা আচারগত নহে; ব্যক্তিগত। কোন লোক দুষ্কর্ম্ম করিয়া আচারের দোহাই দিলে তাহার সেই অন্যায় কথা শুনিয়া শিববাক্যে দোষারোপ করা অনুচিত।

বীরাচারে মদ্যপানসম্বন্ধে আর একটি কথা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

মদ্যের অপকারিতা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতেছি। মদ্যপানের পরিণাম দেখিয়া মদ্যের উপর আমাদের এমত একটি সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মদ্যের নাম শুনিলেই তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণা হয়; উহার গুণাগুণসম্বন্ধে বিচার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান, মানাপমানে সমভাব, সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকারভাব ইত্যাদি মদ্যের যে গুণ আছে, তদ্সম্বন্ধে আমরা একবারও পর্য্যালোচনা করি না। তন্ত্রে মদ্যের গুণ এইরূপ বর্ণিত আছে—

"সমতা সর্ব্বভূতেষু মানাপমানয়োঃ সমঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমো লোষ্ট্রে চ কাঞ্চনে॥
ব্রহ্মচিন্তোদ্ভবানন্দো নিবৃত্ত বাহ্যচিত্ততা।
সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র সমত্বং নির্ব্বিকারতা॥

চক্ষুষোরনিমেষত্বং মধুরস্মিত ভাষণং।
অমৃতস্য গুণা এতে কথিতা ভুবি দুর্লভা।"
(গন্ধর্ব্বতন্ত্র।)

মদ্য একরূপ চিত্তদর্পণ। মদ্যব্যবহারে চিত্তের কপটতা দূর হইয়া যথার্থ ভাবের স্ফূরণ হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবগণ আপন আপন প্রকৃতিকে বিবেচনাপূর্ব্বক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে; কিন্তু মদ্যব্যবহারে সে কপটতা থাকে না: যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে তদনুরূপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। হিংসকগণ হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে, ইন্দ্রিয়াসক্তগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে ব্যস্ত হয়; ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তিরা ঈশ্বর আরাধনায় নিযুক্ত হন। ভক্তগণ ভক্তিভাবে গদগদ হইতে থাকেন। এ অবস্থায় জিতেন্দ্রিয় সাধুচরিত্র সাধকের পক্ষে মদ্য উপাদেয় পদার্থ বলিয়া গণ্য হইবে, তৎপক্ষে সন্দেহ কি? শুনা যায়, সাধক রামপ্রসাদ উপাসনাকালে মদ্যপান করিতেন। এ জন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলিয়া বিদ্রূপ করায় তিনি গাহিয়াছিলেন,

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ,
মদ-মাতালে মাতাল বলে॥"

মনুষ্যের স্বভাব এই যে, কেহই ছোট হইতে চাহে না। এ জন্য সদ্‌গুরুর প্রতিই অধিকারনির্ণয়ের ভার অর্পিত হইয়াছে। সদ্‌গুরুর অভাবে অনেক সময় ব্যবসায়ী গুরুকর্ত্তৃক অনধিকারীকে উচ্চ অধিকার প্রদত্ত হয়। তাহার ফলে গুরু-শিষ্য উভয়েই এই শ্রেষ্ঠাচারকে অযথা কলঙ্কিত করিয়া বসেন।

কলিকালের মনুষ্যসকল কামবিভ্রান্ত চিত্ত। একালে প্রকৃত বীরাচারী সাধক প্রায় মিলে না। অপরিপক্ক অবস্থায় অনেকেই এই আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই সকল দুর্ব্বল সাধক চিত্তস্থির রাখিতে না পারিয়া পাছে ব্যভিচার করিয়া বসেন, এ জন্য শিব অধিকারীভেদে মদ্যাদির অনুকল্প ব্যবহারের ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে উক্ত হইয়াছে,—

"গৃহকার্য্যৈক চিত্তানাং গৃহিণাং প্রবলে কলৌ।
আদ্যতত্ত্ব প্রতিনিধৌ বিধেয়ং মধুরত্রয়ং।
দুগ্ধং সিতা মাক্ষিকঞ্চ বিজ্ঞেয়ং মধুরত্রয়ং।
বলিরূপমিদং মত্বা দেবতায়ৈ নিবেদয়েৎ॥"

প্রবল কলিকালে বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে মদ্যের পরিবর্ত্তে মধুরত্রয় ব্যবহার করাই উচিত। দুগ্ধ, চিনি ও মধু একত্র করত তাহাকেই মদ্য বিবেচনা করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিবে।

উক্ত তন্ত্রের উক্ত উল্লাসে শেষতত্ত্ব (মৈথুন) সম্বন্ধে শিব বলিয়াছেন—

"স্বভাবাৎ কলিজন্মানঃ কামবিভ্রান্তচেতসঃ।
তদ্রূপেণ ন জানন্তি শক্তিং সামান্যবুদ্ধয়ঃ॥
অতস্তেষাং প্রতিনিধৌ শেষতত্ত্বস্য পার্ব্বতি।
ধ্যানং দেব্যাঃ পদাম্ভোজে স্বেষ্টমন্ত্রজপস্তথা॥"

কলিতে দুর্ব্বল অধিকারীরা শেষতত্ত্বের অনুকল্পে দেবতার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে।

কেহ কেহ বলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে যে মদ্যাদির উল্লেখ আছে, তাহা বাহ্যপ্রচলিত মদ্যাদি নহে; উহার অর্থ স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইহার প্রমাণস্বরূপ "আগমসারোক্ত" নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি দেখাইয়া থাকেন,—

মদ্য—"সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ॥"

ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত সোমধারা পান করিলে জীব আনন্দময় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই অমৃত পান করেন, তিনিই প্রকৃত মদ্যসাধক।

মাংস—"মাশব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনাপ্রিয়ে।
যদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ॥"

মা শব্দের অর্থ রসনা। বাক্যসকল রসনাসম্ভূত। যে ব্যক্তি বাক্‌সংযম করিতে সমর্থ, তিনিই মাংসসাধক।

কেহ কেহ এই শ্লোকের অন্য অর্থ করেন; যথা—

মা শব্দের অর্থ রসনা অর্থাৎ জিহ্বা। ঐ জিহ্বা তালু-বিবরে প্রবেশ করাইলে উহাতে অমৃততুল্য একরূপ রসের সংযোগ হয়। যিনি ঐ অমৃতরস সর্ব্বদা পান করেন, তিনিই মাংসসাধক নামে অভিহিত হন।

মৎস্য—"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে দ্বৌ মৎস্যৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ॥"

ইড়ানাড়ীকে গঙ্গা ও পিঙ্গলানাড়ীকে যমুনা বলে। এই দুই নাড়ীর দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস প্রবাহিত হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের নাম মৎস্য। যে ব্যক্তি প্রাণায়ামযোগে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিরোধ করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যসাধক।

মুদ্রা—"সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমঃ॥
সূর্য্যকোটিপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম্।
অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে॥"

সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকামধ্যে পারদসদৃশ আত্মার অবস্থিতি। ঐ আত্মা কোটি সূর্য্যের প্রভাযুক্ত এবং কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। ঐ আত্মা অতিশয় মনোহর এবং সতত কুণ্ডলিনীশক্তিসমন্বিত। তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাসাধক।

মৈথুন—মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণং।
মৈথুনাং জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভং॥"

মৈথুন অতি পরমতত্ত্ব। ইহার মর্ম্ম অবগত হইলে আর সংসারে গতায়াত করিতে হয় না। মৈথুন হইতে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়।

গুরুবাক্যানুসারে সাধনদ্বারা মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তিকে

সুষুম্নাপথে উত্তোলন করত সহস্রদলপদ্মস্থ পরব্রহ্মে সংমিলন করাকে মৈথুন বা শিবশক্তিযোগ বলে।

উপরে যাহা দর্শিত হইল, তাহাতে বাহ্যপ্রচলিত মদ্যাদির সত্যতাপক্ষে সন্দেহ হইতে পারে বটে, কিন্তু তন্ত্রের নিম্নলিখিত শিববাক্যসকল মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বাহ্যপ্রচলিত মদ্য যে একেবারে মিথ্যা, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না।

"গৌড়ী পৈষ্টী তথা মাধ্বী ত্রিবিধা চোত্তমা সুরা।
সৈব নানাবিধা প্রোক্তা তালখর্জ্জুরসম্ভবা ॥
তথা দেশবিভেদেন নানা দ্রব্য বিভেদতঃ।
বহু ধেয়ং সমাখ্যাতা প্রশস্তা দেবতার্চ্চনে ॥"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

শাস্ত্রের সকল কথাই সত্য। অধিকারবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা হইয়াছে। যেমন স্থূলশরীরের অবলম্বন ব্যতীত সূক্ষ্মশরীরের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, সেইরূপ স্থূল মদ্যাদির অবলম্বন ব্যতীত সূক্ষ্ম মদ্যাদির জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। এই জন্য পঞ্চ-মকারসম্বন্ধে শাস্ত্রে বিরুদ্ধ উক্তি থাকিলেও তাহাতে দোষারোপ করা কথনই সঙ্গত হইতে পারে না।

যাঁহারা বাহ্যপ্রচলিত মদ্যাদির কথা স্বীকার করেন না, তাঁহারা যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, এক জন কর্ত্তৃক একই শাস্ত্রে পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি অসঙ্গত। কিন্তু বিশেষরূপ অনুধাবন করিলে শিববাক্যে দোষারোপ করিবার বা প্রথমোক্ত মদ্যাদির বিষয় কোন মাতালের উক্তি, এমত সিদ্ধান্ত করিবার কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রসকল কোন এক নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য লিখিত হয় নাই। উহা জগতের সমুদয় লোকের জন্য লিখিত হইয়াছে। কর্ম্মী উহা হইতে কর্ম্মের এবং জ্ঞানী উহা হইতে জ্ঞানের উপদেশ-গ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তরছলে যখন যে অধিকারের প্রশ্ন হইয়াছে, করুণাময় মহাদেব প্রশ্ন অনুসারে অধিকারিনির্ণয় করিয়া তখন তাহার পক্ষে যাহা হিতকর, সেই উপদেশই দিয়াছেন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে একই উপদেশ হইলে তদ্দ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। ব্রহ্ম নিরাকার, নির্গুণ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তিনি সর্ব্বব্যাপী। তিনি ভিন্ন জগতে অন্য পদার্থ নাই। আমরা যে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ দেখি, শুনি বা ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করি, তৎসমুদয় অজ্ঞানসম্ভূত। উহা ভ্রমমাত্র। এই সকল কথাই শাস্ত্রবাক্য। জ্ঞানিগণ ইহার তাৎপর্য্য বুঝিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ভাবিয়া লাভালাভ, নিন্দাস্তুতি এবং জয়পরাজয়ে বিচলিত না হইয়া অনাসক্তভাবে অবস্থিতি করেন। বিষ্ঠা-চন্দনকে তাঁহারা সমদৃষ্টিতে দেখেন। অজ্ঞানীকে ঐ উপদেশ দিলে কিন্তু বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে।

ভগবান্ জগতের হিতের জন্য সকল অধিকারের সকল কথাই বলিয়াছেন এবং সাধনপথ গুরুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। সদ্গুরু অধিকার অনুসারে যাহার পক্ষে যাহা শ্রেয়ঃ, তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে ভগবতীর প্রশ্নে মহাদেব স্পষ্টই বলিতেছেন,—

"যদা যদা কৃতাঃ প্রশ্নাঃ যেন যেন যদা যদা।
তদা তদ্যোপকারায় তথৈবোক্তং ময়া প্রিয়ে।"

তন্ত্রে পশ্বাচার অপেক্ষা বীরাচারের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার গূঢ় অর্থ না বুঝিয়া শুদ্ধ প্রশংসায় মুগ্ধ হইয়া অথবা প্রলোভনে পড়িয়া যিনি অনধিকারে উচ্চ অধিকার আশ্রয় করিতে যান, তিনিই "ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" হইয়া মারা পড়েন। সদ্গুরুর অভাবে অনভিজ্ঞ লোভী ব্যবসায়ী গুরুর কুহকে পড়িয়া আচারবিপর্য্যয়ে অনেকেই দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন। রাজৈশ্বর্য্যভোগের লোভ যেমন দরিদ্রের পক্ষে কষ্টেরই কারণ, সেইরূপ অনধিকারীর পক্ষে বীরাচার আচরণের চেষ্টা অধোগতিরই কারণ হইয়া থাকে। বীরাচার বীরেরই আচরণীয়; অন্যের নহে। এই আচার সাধারণের আচরণীয় হইলে তন্ত্রে ইহার অধিকারনির্ণয়-পক্ষে এত বাঁধাবাঁধি থাকিত না। শিব স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন,—

"অপ্রাপ্য বীরভাবস্তু যদি বৈর্য্যং সমাশ্রয়েৎ।
ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টশ্চয়ো ভবতি তৎক্ষণাৎ।"

(ভৈরবসংহিতা।)

(৩) দিব্যাচার।

দিব্যাচার বীরাচারেরই পরিপক্বাবস্থা বা সর্ব্ববিধ আচারেরই পরিপক্বাবস্থা। কোন কোন তন্ত্রে বীরাচার ও দিব্যাচারকে একত্র করত তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে; যথা—বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচার। প্রথম দুইটী বীরভাব এবং শেষোক্তটী দিব্যভাব বলিয়া খ্যাত। ফলকথা, ইহারা সকলেই একই শ্রেণীর অন্তর্গত; অবস্থাভেদ মাত্র। দিব্যাবস্থায় বিধিনিষেধ কিছুই থাকে না।

দিব্যশ্চ দেবতাপ্রায়ঃ শুদ্ধান্তঃকরণঃ সদা।
দ্বন্দ্বাতীতো বীতরাগঃ সর্ব্বভূতসমঃ ক্ষমী।"

(মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

দিব্যগণ সর্ব্বপ্রকার মায়ামুক্ত এবং সদা দম্ভপরায়ণ। ইঁহারা জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ এবং সর্ব্বজাতির প্রতি সম-ভাবসম্পন্ন। ইঁহারা কর্দ্দমে চন্দনে শ্মশানে ভবনে, কাঞ্চনে তৃণে, পুত্রে বা শত্রুতে কোনই পার্থক্যবোধ করেন না। লাভালাভ, নিন্দাস্তুতি অথবা জয়পরাজয়েও বিচলিত হন না। ইঁহারা সর্ব্বদর্শী, সর্ব্ববক্তা এবং সর্ব্ব-দুষ্টনিবারক;—দুষ্টগণ ইঁহাদিগকে দেখিয়া দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়।

বঙ্গের উটজ শিল্প।

[শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ. ।]

লেডী কার্মাইকেলের উদ্যোগে বাঙ্গালার উটজ শিল্পসমূহের উন্নতিসাধনোদ্দেশে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার কার্য্য সুপরিচালিত হইলে যে বাঙ্গালার উটজ শিল্পে যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে লর্ড কার্মাইকেল বলিয়াছিলেন, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন, এখনও বঙ্গদেশে নানা উটজ শিল্প বর্ত্তমান; কিন্তু সেগুলির অবস্থা সমৃদ্ধ নহে—শিল্পী শিল্প হইতে কোনরূপে অন্নসংস্থান করিতে পারে—এই পর্য্যন্ত। কিন্তু সেগুলি যদি সমৃদ্ধ হইত, তবে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর যে বিশেষ উপকার হইত, তাহাতে আর দ্বিমত থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে বঙ্গদেশে বিবিধ উটজ শিল্প ছিল—সে সব শিল্পে শিল্পী বিশেষ লাভবান্‌ও হইত। মোগল সম্রাট্‌ আকবরের সময় যে বাঙ্গালার কাপড় বিশেষ আদৃত ছিল, তাহার প্রমাণ আইন-ই-আকবরীতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রালফ ফিচ বাঙ্গালার শিল্পজ পণ্যের উৎকর্ষে বিস্মিত হইয়াছিলেন—বার্ণিয়ার ও টেভার্ণিয়ারও তদ্রূপ বিস্ময়প্রকাশ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন য়ুরোপীয় বণিক্‌রা ভারতে বাণিজ্যকেন্দ্র সংস্থাপিত করেন, তখনও সোরা বাদ দিলে—রেশমী ও সূতা কাপড়ই তাঁহাদের ব্যবসার সর্ব্বপ্রধান পণ্য ছিল। য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসার রীতিতেই বাঙ্গালায় উটজ শিল্পের অবনতি আরব্ধ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তন্তুবায়দিগের সহিত চুক্তি করিতে আরম্ভ করেন। কোম্পানী তাহাদিগকে দাদন দিতেন—তাহারা কেবল কোম্পানীর কাজই করিত; আর কোম্পানী প্রয়োজন বুঝিলেই চুক্তির সর্ত্ত পালন করাইতে বলপ্রয়োগ পর্য্যন্ত করিতেন। এইরূপে কোম্পানী মহাজন হইয়া লাভের অধিকাংশই গ্রাস করিতে থাকেন। তাহাতে শিল্পীর অবস্থার অবনতি ঘটে। মোগল দরবারে বাঙ্গালার অনেক পণ্য বিক্রীত হইত। মোগলপ্রাধান্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সে সব পণ্যের আদর আর থাকে না; শেষে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার উটজ শিল্পের আরও অবনতি ঘটে।

লর্ড কার্মাইকেলের এই নিদাননির্ণয় যথার্থ। এ দেশে যখন য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ব্যবসা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা কেবল অর্থার্জ্জনের দিকেই দৃষ্টি দিতেন। ইংরাজ তখনও এ দেশশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন নাই। তখন ইংরাজ বণিক্‌দিগের চুক্তির সর্ত্তপালনের দায় হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তন্তুবায়গণ আপনাদের হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিয়াছিল, এমন কথাও শুনা গিয়াছে। এক জন ইংরাজ লেখকই তাহা বলিয়াছেন। মোগল সম্রাট্‌গণ যে দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, সে দেশে বিলাসের সামগ্রীর অভাব ছিল—তাঁহারা ভারতেই বাস করিতেন—ভারতের নানা স্থান হইতে বিলাসোপকরণ ও আবশ্যক দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিতেন। ভারতের শিল্প তাহাতে উপকৃত হইত। এ দেশে ইংরাজরা যথাসম্ভব ভারতীয় দ্রব্য পরিহার করিতেন। কাযেই তাঁহাদের ব্যবহারফলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতির কোন আশাই ছিল না। কেবল তাহাই নহে—এ দেশের মধ্যবিত্ত ও ধনী এই দুই সম্প্রদায় ইংরাজের অনুকরণে বিদেশী দ্রব্যেরই সমধিক আদর করিতে থাকায় এ দেশের শিল্পের আরও অবনতি ঘটে। কিন্তু এখন দেশের শাসক ও শাসিত সকলেই বুঝিয়াছেন, এ দেশে শিল্পের প্রতিষ্ঠা না করিলে লোকের দুর্দ্দশা দূর হইবে না এবং দেশে বড় বড় কলকারখানাপ্রতিষ্ঠার পক্ষে যে সব অন্তরায় বিদ্যমান, উটজ শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিসাধনের পক্ষেই সে সব অন্তরায় নাই। বিশেষ এ দেশের উটজ শিল্পে যে শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শিত হয়, তাহা সৌন্দর্য্যহিসাবে মনোরম। সে জন্যও সে সব পণ্য আদরণীয়।

লেডী কার্মাইকেলের প্রতিষ্ঠিত এই সমিতির উদ্দেশ্যসাধনের উপায় বিচার করিয়া হাইকোর্টের বিচারক সার্‌ জন উডরফ একটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন, সর্ব্বপ্রথমে দেশের উটজ শিল্পসমূহের অবস্থা বুঝিবার জন্য দেশে অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে হইবে—

(১) এখনও এ প্রদেশে কোন্‌ কোন্‌ শিল্প বর্ত্তমান?

(২) সে সব শিল্পের অবস্থা কিরূপ?

(৩) কোন্‌ কোন্‌ কারণে তাহাদের উন্নতি হইতে পারিতেছে না?

(৪) সে সব শিল্পের বর্ত্তমান কালোপযোগী কত দূর উন্নতিসাধন সম্ভব? (বর্ত্তমানে সে সব শিল্পের উন্নতিসাধন করিতে হইলে পণ্যোৎপাদনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।)

(৫) সে সব শিল্পের পণ্যবিক্রয়ের সম্ভাবনা কিরূপ? (যে সব পণ্য আজকাল আর ব্যবহৃত হয় না, সে সব পণ্যের উৎপাদন করা নিষ্প্রয়োজন।)

(৬) সে সব শিল্পের উন্নতিসাধনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক?

(৭) নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা কিরূপ?

এ প্রদেশে উটজ শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে পদ্ধতিবদ্ধভাবে কায করিতে হইবে—যে কোন স্থানে যে কোন শিল্প লইয়া তাহার উন্নতির উপায়চিন্তা করিলে সুফল ফলিবে না। সেই জন্য আবশ্যক অনুসন্ধান করিয়া সমগ্র প্রদেশের শিল্পসমূহের অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। কারণ, অনেক স্থলে বহু শিল্প পরস্পর পরস্পরের সাপেক্ষ—একের উন্নতি ব্যতীত অপরের উন্নতি হইতে পারে না—একটি শিল্পের জন্যই আর একটি শিল্পের প্রয়োজন। পিত্তলের পণ্যের উপর এ দেশে কি না করা হয়—কাপড়ের উপর ফুল "তোলা" হয়—ইত্যাদি। এই অবস্থায় দেশের সব শিল্পের অবস্থার সম্যক্ আলোচনা ব্যতীত ঈপ্সিত ফললাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না।

সার্ জন উডরফ বলিতেছেন, অনুসন্ধানের ফলে আবশ্যক সংবাদসংগ্রহের পর কি করা যাইতে পারে? প্রধানতঃ তিনটি উপায় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে—

(১) সমিতি ব্যবসার হিসাবে (শিল্পীর নিকট হইতে) পণ্য কিনিয়া—ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে পারেন অর্থাৎ যথাসম্ভব অল্পদরে পণ্য কিনিয়া যথাসম্ভব অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করিতে পারেন।

(২) প্রথমোক্ত কার্য্য সিদ্ধ করিবার জন্য মফঃস্বলে শাখা সংস্থাপিত করিয়া একটি সমবায়সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন।

(৩) যাঁহারা এই উদ্দেশ্যে কায করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আবশ্যক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

প্রথমোক্ত উপায়ে সমিতির পক্ষে সাফল্যলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প। কারণ, তাহাতে অনেক টাকা মূলধনের প্রয়োজন। কেবল তাহাই নহে—সে কায করিতে হইলে সমিতিকে সাধারণ ব্যবসায়ীদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। এইরূপ সমিতির পক্ষে দেশীয় ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া সাফল্যলাভ করিবার আশাই করা যায় না। প্রথমোক্ত উপায় যেমন সমিতির পক্ষে কার্য্যোপযোগী নহে—সমিতির পক্ষে দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করিয়া সমবায়সমিতিসমূহের সহিত সমভাবে কায করাও তেমনই অসঙ্গত। সার্ জন উডরফ সমিতিকর্ত্তৃক পণ্যবিক্রয়ের বিপণিপ্রতিষ্ঠারও পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলেন, সমিতি অনুসন্ধান করিয়া দেশের উটজ শিল্পসমূহের অবস্থা বুঝিয়া—আবশ্যক উপদেশ প্রদান করুন, শিল্পসমূহের উন্নতির উপায় নির্দ্দেশ করুন, শিল্পসমূহসম্বন্ধে পুস্তিকার ও পণ্যের মূল্য-তালিকার প্রচার করুন, স্থানে স্থানে প্রদর্শনীপ্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করুন এবং বিদেশে কিরূপে ভারতীয় শিল্পজ পণ্যের কাট্‌তী হয়, তাহার উপায় চিন্তা করুন।

আমরা সার্ জন উডরফের শেষকথার সমর্থন করিতে পারি না। এ দেশে শিল্পীর যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট উপায়সমূহ অবলম্বিত হইলেই তাহার উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। সমিতি উপদেশ দিলেও সে কিরূপে সে উপদেশ লইবার ব্যবস্থা করিবে? সমিতির পুস্তিকা প্রচারিত হইলেও সে তাহা পাইবে না, পাইলেও পাঠ করিতে পারিবে না। এ দেশের পল্লীর শিল্পীরা যে প্রদর্শনীতে পণ্য পাঠাইবে বা তথায় আসিয়া পণ্য দেখিয়া আদর্শানুরূপ পণ্য উৎপন্ন করিবে, এমন আশা করা যায় না। কাযেই সার জন উডরফের উপদেশ গৃহীত হইলে সমিতির চেষ্টা ব্যর্থই হইবে—শিল্পী তাহার মহাজনের কাছে দাদন লইয়া তাহারই ফরমাইস্‌মত পণ্য প্রস্তুত করিয়া কোনরূপে অন্নসংস্থান করিবে। অথচ এই যে অবস্থা, ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া—শিল্পীকে কালোপযোগী ও বর্ত্তমান রুচির অনুমোদিত পণ্য প্রস্তুত করিতে উৎসাহিত করিয়া তাহার অবস্থার উন্নতিসাধনই সমিতির উদ্দেশ্য।

সমিতির অবলম্বিত উপায়সমূহে বাঙ্গালার উটজ শিল্প পরোক্ষভাবে উপকৃত হইতে পারে। কারণ, এই সব উপায় অবলম্বিত হইলে বাঙ্গালার শিক্ষিত লোকের বিকৃত রুচির পরিবর্ত্তন হইবে—তাঁহারা স্বদেশী পণ্যের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারিয়া আবার তাহারই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবেন—অবজ্ঞাত স্বদেশী পণ্য আবার আদৃত হইবে। সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইলে বাঙ্গালীর ঘরে আবার স্বদেশী উটজ শিল্পজ পণ্য বিদেশী পণ্যের স্থান গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহা যত দিনে হইবে, তত দিনে বাঙ্গালায় আরও অনেক উটজ শিল্প উৎসাহের অভাবে বিলুপ্তই হইয়া যাইবে। কারণ, কোন সম্প্রদায়ের রুচিপরিবর্ত্তন অল্পকালে হয় না। যত দিনে সে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইবে, তত দিনে যদি বাঙ্গালার বহু শিল্প বিলুপ্ত হয়, তবে সমিতির উদ্দেশ্য সাধনপথ আরও বিঘ্নবহুল হইয়াই উঠিবে।

যদি ধীরে ধীরে লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলেই যে পুরাতন প্রথায় শিল্প চালাইলে লাভ হইবে—বাঙ্গালায় এই যে—

"তাঁতি কর্ম্মকার করে হাহাকার—
সূতা জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার"

এ অবস্থার প্রতীকার হইবে, এমন আশা করা যায় না। লোকের আচারব্যবহারের রীতিনীতির যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা বিলুপ্ত হইবে না—হইতে পারে না; কেননা, আমাদের সমাজেও জীবনযাপনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সে পরিবর্ত্তন আমরা মুছিয়া ফেলিতে পারিব না, কেননা, তাহা কালের গতির অনিবার্য্য ফল। এ দিকে যেমন পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ও দিকে শিল্পে তেমনই কোন পরিবর্ত্তনই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরিবর্ত্তন ব্যতীত বাঙ্গালার শিল্প কালোপযোগী হইয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এ দেশে যে চুরুটের বাক্স বা রুমালের বাক্স—বিদেশী বাজারের জন্য গঠিত হয়, তাহাতে কেহ কেহ দুঃখপ্রকাশ করিয়া

থাকেন। তাঁহারা বলেন, এ সব কাযে ভারতীয় শিল্পের পুরাতন আদর্শ বিকৃত হয়। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না, পানের ব্যবহার না থাকিলে শিল্পী আর পানের বাটা প্রস্তুত করিতে পারে না। কোন শিল্পীই তাহার রচিত দ্রব্যের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না; তাহাকে পরের নিকট আদৃত হইবে এমন পণ্য প্রস্তুত করিতে হয়—কেননা সেই পণ্য বিক্রয় করিয়াই তাহাকে অন্নার্জ্জন করিতে হইবে। সেই জন্য যুগে যুগে—কালের সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের আদর্শও পরিবর্ত্তিত হয়, সে পরিবর্ত্তন একান্তই স্বাভাবিক।

আবার আমাদিগকে নূতন অবস্থার উপযোগী করিয়া পুরাতন শিল্পকে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। নহিলে কিছুতেই প্রতিযোগিতা প্রহত করিয়া আমাদের উটজ শিল্পসমূহ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। পূর্ব্বে এ দেশে—সে কালের চুল্লীতে কাচের জিনিষ প্রস্তুত করা হইত। তাহার পর বিদেশ হইতে—বিশেষ অষ্ট্রীয়া হইতে নানারূপ কাচের জিনিষের আমদানী আরব্ধ হয়। সে সব জিনিষের মত সুন্দর জিনিষ প্রস্তুত করিয়া তেমনই সস্তাদরে বেচিতে হইলে আমাদিগকে নূতন চুল্লী গঠিত করিতে হইবে—নূতন ছাঁচ ব্যবহার করিতে হইবে—নূতন বিজ্ঞানসম্মত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ হয়, আরও ভাল বুঝা যাইবে। এ দেশে সরকার কাচের শিশিতে কুইনাইন বেচিতেন। য়ুরোপে যুদ্ধ বাধিলে সে শিশির আমদানী বন্ধ হয়। অষ্ট্রীয়া হইতে আনিলে শিশির দাম ৯ টাকা ১ আনা হাজার পড়িত। সে শিশির আমদানী বন্ধ হইলে সরকার এ দেশে সেইরূপ শিশি প্রস্তুত করাইবার ইচ্ছা করিয়া কাচের কারখানায় দর জানিতে চাহেন। এ দেশের সর্ব্বনিম্ন দর—৬২ টাকা ৮ আনা! সরকার বাধ্য হইয়া কিছুদিন বিলাত হইতে ২২ টাকা ৬ আনা দর দিয়া শিশি আনাইয়াছিলেন। এই জন্য কর্ণেল বুকানন ও মিষ্টার বিটসন বেল কলিকাতায় হ্যারিসন রোডে কাচের জিনিষের কারখানাগুলিতে ঘুরিয়াছিলেন। সরকারকে যে বাধ্য হইয়া টিনের নল ব্যবহার করিতে হইতেছে, তাহাতেই বুঝা যায়, সে সব কারখানা হইতে আদর্শানুরূপ শিশি সরবরাহ করা সম্ভব হয় নাই। অথচ যদি এই সব কারখানায় নূতন চুল্লী রচিত হয় ও নূতন উন্নত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তবে পণ্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে। যুক্তপ্রদেশের সরকার পরীক্ষা করিয়া ইহা বুঝিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষা করিলে যে এ দেশের অনেক উটজ শিল্পে যে বিশেষ উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কিন্তু সেই কার্য্যের জন্য বিশেষ অভিজ্ঞতার ও বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন। লেডী কার্মাইকেলের যত্নে যে সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমিতির দ্বারা সেই কার্য্যের আরম্ভ হইতে পারে। এই সমিতি যদি দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাহায্যে দেশের সকল শিল্পকেন্দ্রে শাখা সংস্থাপিত করিয়া স্থানীয় পণ্যের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া শিল্পগুলির অবস্থানুসারে উন্নতিপ্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা করেন, তবে অল্পকালমধ্যেই শিল্পীরা সে সকল উন্নতি প্রবর্ত্তিত করিতে পারে। এ দেশের শিল্পীরা উন্নত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অসম্মত নহে—ঠক্ঠকি তাঁতেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাকে দেখাইয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। আর সর্ব্বোপরি দারিদ্র্যহেতু সে নূতন যন্ত্রাদি বা যন্ত্রাদির উপকরণ ক্রয় করিতে পারে না। সমবায়সমিতির প্রতিষ্ঠাতারা বা অর্থসাহায্য দান করিয়া শাখাসমিতিগুলি তাহাদের সেই অভাবও দূর করিবার সুব্যবস্থা করিতে পারেন।

যুক্তপ্রদেশের সরকার উটজ শিল্পের সংবাদ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্ব স্ব গ্রামের পণ্যের সংবাদ দিতেছেন। সেই সব পণ্যের নমুনা যদি একটি প্রদর্শনীতে রক্ষিত হয়, তবে তাহা দেখিয়া কেহ কিনিতে ইচ্ছুক হইলে সরকারী ব্যবসা-বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই পণ্যের উৎপত্তিস্থানের সদস্যকে লিখিয়া সেই পণ্য আনাইয়া দিবেন। এইরূপে কোন পণ্য বাজারে চলিত হইলে ক্রমে তাহার টান হইবে। তখন ব্যবসায়ীরা প্রত্যক্ষভাবে শিল্পীর সঙ্গে ব্যবসায়সম্বন্ধ সংস্থাপিত করিয়া জিনিষ কিনিতে আরম্ভ করিবে। এই কার্য্য স্বেচ্ছায় বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য করিতে ইচ্ছুক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সাহায্য ব্যতীত হইতে পারে না। এই বঙ্গদেশে আজও নানা স্থানে নানা শিল্প বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালা সরকার এ দেশের শিল্পসম্বন্ধে অনুসন্ধান করাইয়া যে বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই নানা স্থানের নানা পণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মিষ্টার কামিং বলেন, মুর্শিদাবাদ জঙ্গীপুরে ও খুলনা সাতক্ষীরায় উৎকৃষ্ট জাঁতি প্রস্তুত হয়; যশোহরের স্থানে স্থানেও সেইরূপ জাঁতি ও বঁটী প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমরা অবগত আছি, মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে অতি উৎকৃষ্ট কম্বল প্রস্তুত হয়। সেই সব পণ্য যদি খরিদদার মহলে পরিচিত করিবার ব্যবস্থা হয় এবং খরিদদাররা যদি সে সব সহজে পাইতে পারে, তবে নানা শিল্পের উন্নতি হয় এবং ব্যবসাও চলে। লর্ড কার্মাইকেল যে মুর্শিদাবাদী রেশমের রুমাল ব্যবহার করেন, তাহার কথা এখন অনেকেই অবগত হইয়াছেন। তাহারই ফলে সেই মৃতপ্রায় শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধিত হইয়াছে।

উটজ শিল্পের একটি অসুবিধা এই যে, এক সঙ্গে অনেক জিনিষ না পাওয়ায় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে সে সব জিনিষ লইয়া ব্যবসা করিবার সুবিধা হয় না। কিন্তু সে অসুবিধাও প্রতীকারসাপেক্ষ। অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব সর্ব্বত্রই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। নহিলে সাধারণতঃ দেখা যায়, যে স্থানেই কোন শিল্প বিকশিত হইয়াছে, সেই স্থানেই একাধিক পরিবারের সেই শিল্পই অবলম্বন। সুতরাং শিল্পিসঙ্ঘদ্বারা পণ্য উৎপন্ন করা যায়।

আর যদি সমবায়সমিতি বা ঐ জাতীয় কোন ব্যবস্থায় শিল্পীদিগকে উপকরণ কিনিবার ও পণ্যবিক্রয় করিয়া অর্থ হস্তগত হওয়া পর্য্যন্ত সংসার চালাইবার আবশ্যক অর্থ দেওয়া যায়, তবে শিল্পীরা অনন্যাকর্ম্মা হইয়া আদিষ্ট পণ্য প্রস্তুত করিতে পারে; পণ্যের অল্পতা নিবারিত হয়।

কিন্তু এ সব ব্যবস্থা শৃঙ্খলসহকারে ও পদ্ধতিবদ্ধভাবে কাজ না করিলে হয় না। সে কাজের ভার এ দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে লইতে হইবে। শিল্পের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের লোকের দারিদ্র্য দূর করা যাইবে না এবং দারিদ্র্যদোষ সকল গুণ বিনষ্ট করে, ইহা বুঝিয়া তাঁহাদিগকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কাযের ভার লইতে হইবে। তাঁহারাই কলিকাতায় বা অন্যান্য বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত মূল সমিতিগুলির সহিত শিল্পীর সংযোগসেতু হইবেন।

লেডী কার্ম্মাইকেলের যত্নে প্রতিষ্ঠিত সমিতির শাখা জিলায় জিলায় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এখন যদি গ্রামে গ্রামে শিক্ষিত ব্যক্তিরা জিলায় জিলায় এই অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন, তবেই নানা জিলার সমিতিগুলি শাখা নদীর মত মূল সমিতিতে মিলিত হইয়া তাহার উন্নতিবিধান করিতে পারিবে, নহিলে মূলসমিতি ও ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এতদিন সরকার এ দেশে উটজ শিল্পসম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন—কিন্তু বোধ হয়, কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতার উটজ শিল্প রক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াই সে সকলের কোনরূপ সাহায্য করেন নাই। বিশেষ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেখকগণ বরাবরই বলিয়া আসিয়াছেন, উটজ শিল্পের উন্নতিসাধনজন্য অর্থ ব্যয় কেবল অর্থের অপব্যয়। যাহা হউক, এতদিনে সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে—সে ধারণা ত্যাগ করিয়া এ দেশের উটজ শিল্পের উন্নতিসাধনপ্রয়াসী হইয়াছেন। আজ বাঙ্গালীর পক্ষে বাঙ্গালার অবজ্ঞাত শিল্পের উন্নতি সাধিত করিয়া শিল্পীকে দারিদ্র্যদাবানলদাহ হইতে রক্ষা করিবার সুযোগ সমুপস্থিত। আমরা আশা করি, বাঙ্গালার সর্ব্বত্র শিক্ষিত বাঙ্গালীরা এই সুযোগ হেলায় না হারাইয়া যথাসাধ্য কায করিবেন।

হিন্দুয়ানী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। (২)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্.।]

হিন্দুদিগের অশৌচব্যবস্থা বর্ণনাকালে দেখাইয়াছি যে, উহার মূলে স্বাস্থ্যানুযায়ী সকল ব্যবস্থাই আছে। আজ আরও ছ' চারিটি কথাদ্বারা ঐ কথাটিই অধিকতর পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। অনেকেরই ধারণা আছে যে, বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য সকল প্রথাই বিজ্ঞানসম্মত, আর পুরাতন হিন্দু প্রথাগুলি কুসংস্কারের একটি মূর্ত্তি মাত্র।

প্রথমে শয্যাত্যাগের কথা ধরা যাউক। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করাই হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত। ঐ সময়ে প্রকৃতির নৈসর্গিক মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয় আনন্দে মগ্ন হয় না? ঐ সময়ে উঠিয়া উদ্যানভ্রমণ, পুষ্পচয়ন ও স্নানাদি করা যে পরম স্বাস্থ্যপ্রদ বিধি, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই। রাত্রিজাগরণ করিয়া বেশী বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রা যাওয়া পাশ্চাত্য সমাজানুমোদিত বা বিলাসিতার উত্তরসাধক বিধি হইতে পারে—কিন্তু কোনও মতে স্বাস্থ্যকর নহে।

শয্যাত্যাগের পরে স্নান করা ও পূজা-বন্দনাদি করা হিন্দুর কর্ত্তব্য। শরীরের আলস্যত্যাগের ও তাহাকে কর্ম্মঠ করিবার পক্ষে প্রাতঃস্নানের মত অনুকূল বিধি খুব কমই আছে। যাঁহারা জামাজোড়া আঁটিয়া সকালে বেড়ান ও দুপুরে স্নান করেন, শীতকালে শীত তাঁহাদিগকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে এবং তাঁহারাই সহজে সর্দ্দি-কাসির দ্বারা আক্রান্ত হয়েন। কিন্তু রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গ করিয়া স্নান করিলে শরীর ও মন বড়ই সুস্থ থাকে।

স্নানের সময়ে আমরা তৈল ব্যবহার করি, বলিয়া য়ুরোপীয়েরা আমাদিগকে greasy বলিয়া উপহাস করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছু দৃষ্টি আছে, তাঁহারাই জানেন যে, তৈলাভ্যঙ্গকালীন রীতিমত ব্যায়াম (exercise) করার ফল পাওয়া যায়—যে হেতু সমস্ত পেশীই সঞ্চালিত বা দলিত বা উত্তেজিত হয় এবং রক্তসঞ্চলনও বৃদ্ধি পায়, ঘর্ম্ম নির্গত হয়। এইরূপে শরীরের ক্লেদ বিদূরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা রীতিমত তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহাদের ত্বক্ অত্যন্ত মসৃণ থাকে—ঘামাছি, চুলকাণি, ফোড়া, ক্ষত তাঁহাদিগের প্রায় হয় না; পাশ্চাত্যদিগের অনুকরণে তৈলত্যাগ করিয়া রীতিমত সাবান ব্যবহার করিলে চর্ম্ম উগ্র হয় এবং নানারূপ রোগের আকর হইয়া উঠে। তৈলব্যবহারের ফলে শীতকালে

শীতবোধটা খুব কমই হয় এবং গ্রীষ্মকালে অতীব ঘর্ম্মস্রাব হইলেও অকস্মাৎ "chill লাগিবার" ভয় কমিয়া যায়। যে সময়ে খুব ঘর্ম্ম হইতে থাকে, সে সময়ে সেই ঘর্ম্ম যদি বাষ্পাকারে ত্বক্ হইতে দ্রুত উপিয়া যাইতে থাকে, তবে দেহ শীতল হইয়া নানারূপ আকস্মিক পীড়া জন্মাইতে পারে। কিন্তু তৈলাক্তদেহে ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইলেই চর্ম্মসংলগ্ন অদৃশ্য তৈলবিন্দুর সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে উপিয়া যাওয়ায় "sudden chill" অর্থাৎ আকস্মিক শীতলীকরণের ভয় দূর হইয়া যায়। হাম, বসন্ত, আরক্ত জ্বর প্রভৃতি ব্যাধিগুলির সারিবার সময়ে দেহ হইতে মৃতচর্ম্মত্বক্ স্খলিত হইতে থাকে। ঐ মৃতত্বকেই ঐ সকল ব্যাধির সংক্রমণসমর্থ বীজ থাকে। যে দেশে তৈলের ব্যবহার আছে, সে দেশে ঐ ব্যাধির সংক্রমণ অন্য যে কোনও কারণে হউক, তাহা স্বতঃই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে পারে না। আমাদের দেশে সংক্রামক ব্যাধি হইতে আরোগ্য হইতে না হইতেই রোগীকে "নিম হলুদ" মাখানর প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানানুমোদিত। আজ পাশ্চাত্য দেশেও ঐ সকল ব্যাধির প্রচার নিবারণোদ্দেশে ঐ সময়ে ভ্যাসেলীন বা জলপাইয়ের তৈল ব্যবহারের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। নিম ও হরিদ্রা ঘোল আনারূপে antiseptic বা রোগবীজাণুহারী না হইতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে যে ঐ ধর্ম্ম যথেষ্টই আছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্নানের পরেই আহ্নিকের ব্যবস্থা। আহ্নিক করিতে হইলে কখনও নগ্নগাত্রে বা শুধু মেঝের উপরে যেমন তেমন করিয়া বসিতে নাই। পট্টবস্ত্র বা রেশমের বস্ত্র পরিধান করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইয়া পূর্ব্বাস্য হইয়া আহ্নিকে বসিতে হয়। এই সকল বিধির মূলে আধ্যাত্মিকতা ত আছেই, তদ্ভিন্ন স্নানের পরে দেহকে উষ্ণ করিয়া লওয়ার অনুকূল সকল বিধিই আছে। আসন, পট্টবস্ত্র—এতদুভয়ই অপরিচালক। সন্ধ্যা করিবার সময়ে প্রাণায়াম করিতে হয়—প্রাণায়ামও দীর্ঘায়ুঃপ্রদ। সন্ধ্যাবন্দনার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার স্পর্দ্ধা রাখি না—আধ্যাত্মিক ভাব বিচারও করিব না। কিন্তু সকল কাযের পূর্ব্বে, ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে সকৃতজ্ঞ প্রণাম করিলে হৃদয় ও মন যে বড়ই পবিত্রতা অনুভব করে—সমস্ত দেহ, মন, প্রাণ যে একটা অব্যক্ত পুলকস্পন্দনে অনুপ্রাণিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি? যদি একটা প্রাণ ভরিয়া হাসিলে দশ দিন পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, তবে ঐ পুলকস্পন্দনে পরমায়ুর শত বর্ষ বৃদ্ধি হয়।

তৎপরে ভোজন। প্রকৃত হিন্দু স্বপাক ভোজন করিবেন, দিনে একবার অন্ন খাইবেন। সংযমশিক্ষা দেওয়া হিন্দুয়ানীর পদে পদে উদ্দেশ্য। এই জন্যই হিন্দু খাদ্যসম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছেন যে, আহারে বসিয়া কথা কহিবে না। আহারে বসিয়া কথা কহিবার অনুমতি থাকিলে অমিতাহারের সম্ভাবনা। এখনকার দিনে, নূতন "ব্রহ্মচারী" (?) এক বৎসর আহারে বসিয়া কথা কহেন না বটে, কিন্তু ইসারায় সকল রকম ঈপ্সিত ভোজ্যই চাহিয়া লয়েন। কিন্তু প্রকৃত হিন্দু তাহা করেন না। তিনি আহার্য্যগুলি নারায়ণকে নিবেদন করিয়া সন্তুষ্ট মনে পুণ্যচিত্তে নারায়ণের প্রসাদ গ্রহণ করেন। যে ব্যক্তি প্রকৃতই "আমি শ্রীভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করিতেছি" এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আহারে বসেন, তিনি ভোজন করিয়া যতটা আত্মতৃপ্তি,—যতটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন, তাহা কি বর্ত্তমানকালীন উচ্ছৃঙ্খলভোজী ভোজনবিলাসী চর্ব্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় গ্রহণ করিয়াও বোধ করে? ভোজন করিতে বসিয়া সংযতভাবে খাইলে এবং আহারান্তে শারীরিক ও মানসিক প্রসাদ বর্ত্তমান থাকিলে পরিপাকক্রিয়া বেশী হয়, না কতকগুলা হাঁস, মেষ "কুঁচকি কণ্ঠায়" খাইয়া অবসন্ন দেহ ও লোভজনিত অতৃপ্তি লইয়া উঠিলে সহজে পরিপাক হয়? তাহার পরে হিন্দুরা স্বপাক খান, পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া খান ও কাহারও স্পৃষ্ট ভোজন করেন না। এইরূপ করার প্রধান গুণ এই যে, এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে কোনও রোগ সংক্রামিত হইতে পায় না। এই জন্যই বোধ হয়, আমাদের দেশে টাইফয়েড জ্বর খুব কমই হইত। একই হুঁকায় তামাকসেবন, হোটেলে একই গ্লাসে পান করা প্রভৃতি দোষের ফলে ডিফ্থিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড প্রভৃতি ব্যাধি ব্যাপ্ত হইতে পারে। হিন্দুর ভোজনব্যাপারটা ঐ ব্যাপ্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল। নিজ ভোজ্য নিজে সংগ্রহ করিয়া নিজে রাঁধিলে আরও দুইটি সুফল পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, নিজে প্রত্যহ হাত পুড়াইয়া খাইতে হইলে রকমারি করিয়া বিলাসিতার আশ্রয় দেওয়া চলে না এবং নিজের মনের মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলে অনেক ব্যাধির হাত এড়ান যায়। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে পাচকঠাকুর ও ঠাকুরাণীদের প্রভাব বড় বেশী। উঁহাদের মধ্যে কত জন যে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ-ঔরসজাত এবং কতকগুলিই যে উপপতি বা উপপত্নীরত, তাহা জানা গৃহস্থ আবশ্যকীয় মনে করেন না। অথচ এই সকল পাচকদিগের মধ্যে দদ্রু, উপদংশ ("পারার ঘা") ও মেহ (গণোরিয়া) যে কত বেশী পরিমাণে দেখা যায়, তাহা চিকিৎসকমাত্রই অবগত আছেন। ইহারা যে কাপড় পরে, তাহার গন্ধ, রূপ ও রস গৃহস্থবাঞ্ছিত না হউক, গণিকালয়লাঞ্ছিত বটে। যাঁহারা ময়রাদিগকে বা এই সকল পাচকদিগকে তাহাদিগের অলক্ষ্যে দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, ইহারা যেমন নোংরা, তেমনই কাণ্ডজ্ঞানহীন—আর স্বপাকাহারী ব্রাহ্মণসন্তানদিগের বংশধর হইয়া আজ আমরা বিলাসিতার তাড়নায়, তথাকথিত ব্রাহ্মণের নামে অজ্ঞাতকুল, বেশ্যাসক্ত, বেশ্যালয়প্রতিপালিত, নানারোগ ও মলিনতাদুষ্ট পাচকের হস্তে নিঃসঙ্কোচে আহার করিয়া

পরম আত্মপ্রসাদে স্বজাতি ও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ধন্য হইতেছি! এই সকল "ঠাকুরেরা" প্রত্যহ স্নান করিয়া তবে হেঁসেলে (রন্ধনশালায়) প্রবেশ করে—কিন্তু ত্রিসন্ধ্যা দূরে যাউক, গায়ত্রীর তিনটা অক্ষরও ইহারা জানে না এবং ইহাদের দেহে যেমন কুৎসিত রোগ আশ্রয় করিয়া আছে, ইহাদের বস্ত্রও তেমনি মলিন এবং দুর্গন্ধযুক্ত। ইহারা যে গামছা ব্যবহার করে, তাহাতে ইঁহাদের উপপত্নিগণেরও সেবা হয় এবং সেই গামছায় হাত মুছিয়া ইহারা আমাদিগকে পরিবেশন করিয়া আপ্যায়িত করে। তাই বলিতেছিলাম যে, প্রকৃত হিন্দুয়ানী বড়ই খাঁটি জিনিষ—বর্ত্তমান হিন্দুয়ানী অনেক বিষয়ে অন্ধ গোঁড়ামী, স্বেচ্ছাকৃত ভণ্ডামী।

ভোজনের পরেই বিশ্রাম করিবার কথা—দিবানিদ্রা কখনও হিন্দুর অভিপ্রেত নহে, এই জন্যই যজ্ঞোপবীতধারণকালীন আচার্য্য নব ব্রহ্মচারীকে তারস্বরে বলিয়া দেন—"মা দিবা স্বাপ্সী" কদাচ দিনে নিদ্রা যাইবে না। যে দেশ উষ্ণপ্রধান, সে দেশে নিদ্রা স্বতঃই দ্বিপ্রহরে অনাহূতভাবে উপস্থিত হয়। তাহা জানিয়াই হিন্দুরা বারংবার দিবানিদ্রার নিষেধ করিয়াছেন। তাহার কারণ, দিবানিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। দিবানিদ্রা নিষেধের অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যপ্রদ ব্যবস্থা ছিল, আমাদের পূর্ব্বরীত্যনুযায়ী কায করিবার সময় নির্দ্দেশ বিধিটি। বর্ত্তমানকালে, প্রাতে ১০টা ১১টা পর্য্যন্ত আমাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট কায নাই। আমাদিগের কাযের সময় সাড়ে দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত। ইংরাজের দেশে কোট প্যাণ্টালুন সঙ্গত হইতে পারে, কুহেলিকাসনাচ্ছন্ন ইংলণ্ডে প্রাতে ৯টার পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করা কষ্টকর হইতে পারে, কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আসিয়াও কোট প্যাণ্টালুন বিড়ম্বিত হওয়াও যতটা হাস্যজনক ব্যাপার, এ দেশে দীর্ঘদিবসের মধ্যাহ্নে কাযকর্ম্ম করাও তাদৃশ স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ। দশ ঘটিকায় আফিসে যাইতে হইলে, প্রাতে ৬টায় প্রাতরাশ করিবার প্রবৃত্তি খুব অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। কাযেই, গত রাত্রি ৯টা হইতে পর দিবস প্রাতে ৯টা পর্য্যন্ত এই বারো ঘণ্টা অভুক্ত থাকিতে হয়। এতক্ষণ অভুক্ত থাকা কষ্টকর বলিয়া অনেকে রাত্রেই গুরুভোজন করিয়া থাকেন। রাত্রেই নিমন্ত্রণাদির ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পরে বেলা এক ঘটিকার সময়ে "টিফিন" করিবার সময়। যে ব্যক্তি ১০টায় আফিযে যায়, যে ব্যক্তি ৯টায় আহার করে—কাযেই বেলা ১টায় (অর্থাৎ ৪ ঘণ্টা পরে) তাহার তাদৃশ ক্ষুধার উদ্রেক হয় না। পরে, বেলা ৪টার সময়ে যখন তাহার ক্ষুধা পায়, সে খাইবার অবকাশ পায় না। তাহার "পিত্ত পড়িতে" থাকে—সে সন্ধ্যায় (৬।৭টায়) বাড়ীতে আসিয়া জলযোগ করে, রাত্রি ৯।১০টায় পুনরায় আহার করে। এই সময়ের তালিকাটি বেশ করিয়া বুঝিতে হইবে :—

সাহেবদিগের আহারের সময় :—
প্রাতে ৬।৭টায়—"ছোট হাজরী" (লঘু)।
প্রাতে ৯।১০টায়—"ব্রেকফাষ্ট" (লঘু)।
দুপুরে ২টায়—"লাঞ্চ" (গুরু)।
বৈকালে ৪টায়—চা (লঘু)।
রাত্রি ৮টায়—ডিনার (গুরু)।
রাত্রি ১১টায়—সাপার (লঘু)।

হিন্দুদিগের পূর্ব্বে যাহা ছিল :—
প্রাতে ৮।৯টায়—জলযোগ (লঘু)।
মধ্যাহ্নে—ভোজন (গুরু)।
সায়াহ্নে—জলযোগ (লঘু)।
রাত্রে—ভোজন (গুরু)।

হিন্দুদিগের এখন যাহা হইয়াছে :—
প্রাতে ৯॥০টায়—অন্নাহার (গুরু)।
বেলা ১টায়—জলযোগ (লঘু)।
সন্ধ্যায় ৬।৭টায়—জলযোগ (ঐ)।
রাত্রি ১০টায়—অন্নাহার (গুরু)।

উপরে "গুরু" ও "লঘু" এই দুইটি বাক্য যাহা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা আহার্য্যের পরিমাণজ্ঞাপকরূপেই ব্যবহৃত হইয়াছে—পরিপাকের তারতম্যানুসারে ব্যবহৃত হয় নাই। এইবার বেশ মনোযোগের সহিত উপর্য্যুক্ত তালিকাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, সাহেবেরা যে রকম সময়ে যাহা আহার করেন, সেই ঠিক বিধি এবং হিন্দুরা স্বেচ্ছায় যে রকম সময়ে যেরূপে আহার করিতেন, তাহাও সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যানুকূল বিধি। কিন্তু ইংরাজরাজত্বে কর্ম্মজীবী হিন্দুর আহারের কালাকাল বিচার করিবার অবসর নাই। প্রাতে সম্পূর্ণ ক্ষুধার উদ্রেক হইতে না হইতেই অর্দ্ধসিদ্ধ, অত্যুষ্ণ ও মাত্র দুই একটি ব্যঞ্জন সাহায্যেই হিন্দুকে আহার সমাপ্ত করিয়া মসীযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়। আফিযে যখন তাঁহার ক্ষুধার সম্যক্ উদ্রেক হয়—তখন নির্দ্দিষ্ট "টিফিন" সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীতে ক্লান্ত অবস্থায় আসিয়া ভোজন করিতে গেলেই ভোজনের মাত্রা বেশী হয় এবং পরিপাক কম হয়। যে কয়টি কারণ থাকিলে অজীর্ণতা আইসে, বর্ত্তমানকালে হিন্দুর জীবনে সে সকলগুলিই আসিয়াছে। দ্রুত আহার করা, পূরা ক্ষুধার উদ্রেক হইবার পূর্ব্বে আহার করা, আহার করিয়া অনেক পথহাঁটা, পূরা ভোজনের পর একাধিক্রমে মস্তিষ্কচালনা করা, পূরা ক্ষুধার উদ্রেক হইলে আহারের অবসর না পাওয়া এবং ক্লান্তদেহ পথহাঁটার পরে আহার করা—এ সবগুলিই বাঙ্গালীর নিত্য অভ্যাস হইয়া ডিস্পেপ্সিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে।

"সকড়ীতত্ত্ব"টাও পূরা বিজ্ঞানানুমোদিত। সাহেবেরা ও মুসলমানেরা শয্যায় বসিয়া খাইতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু হিন্দুরা মনে করিয়া থাকেন যে, দ্বিতীয় পাত্র পর্য্যন্ত "সকড়ী" হইয়া থাকে অর্থাৎ এক থালা ভাত যেখানে বসান যায়, সেটাও "সকড়ী" হয়—কিন্তু যদি এক থালা ভাত বড় একটা বারকোষের উপরে বসাইয়া সেই বারকোষটিকে মাটিতে বসান যায়, তবে সে মাটি এঁটো হয় না। অবশ্য টেবিলে বসিয়া ভোজন করিলে, জল ছিটাইয়া সে জায়গাটিকে পরিষ্কার করার (নিকাইয়া লওয়ার) প্রয়োজন হয় না; কিন্তু সাহেবেরা বনভোজন করিতে বসিলে স্থানাস্থান বিচার করেন না। কিন্তু হিন্দু যেখানেই বসুন, সে জায়গাটাকে পরিষ্কার করেন এবং "সকড়ী" "সকড়ী" করিয়া 'উদ্ব্যস্ত' করেন। এটা কি গোঁড়ামী না মূর্খতা? এটা দুইয়ের কিছুই নহে। যাঁহারা জীবাণুতত্ত্ব বা ব্যাক্‌টিরিওলজি জানেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আহার্য্য-সামগ্রীর কণামাত্র পাইলেই জীবাণুগণ বংশবৃদ্ধি লাভ করিতে থাকে এবং আহার্য্য জিনিষের অবাধস্পর্শে নানা-রূপ সংক্রামক ব্যাধি ব্যাপ্তিলাভ করে। এই জন্যই হিন্দুরা যাহার তাহার স্পৃষ্ট ভোজ্য গ্রহণ করেন না, যথা তথা পংক্তিভোজনে আপত্তি করেন এবং "সকড়ী" "সকড়ী" বলিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যে সকল ভোজ্য সদ্যঃ ধুইয়া আহার করা চলে (যেমন ফল), হিন্দু সে সকল ভোজ্য যেখানে সেখানে গ্রহণ করিয়া থাকেন। লুচি ও সন্দেশের চলনটা বর্ত্তমান যুগের; কিন্তু ভাতটা বহুকালের চলন। ভাত ধুইয়া আহার করা চলে না বলিয়া, হিন্দু যেখানে সেখানে অন্নগ্রহণ করেন না।

হিন্দুরা বলেন, দুগ্ধে লবণ দিয়া পান করিলে গোমাংস ভক্ষণ করার তুল্য হয়। অনেকের অভ্যাস আছে, দুধে ভাত মাখিয়া খাইতে খাইতে মাছ বা তরকারী খায়। এ রকম করিলে, দুধে লবণ দিয়া পান করারই তুল্য হয়। একত্র দুধ ও মাংসভক্ষণের নিষেধের হেতুও এই। অনেকে এ সকল কথাগুলি গোঁড়ামী ও বোকামীর দৃষ্টান্ত বলিয়া উড়াইয়া দেন। কিন্তু আজ পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন যে, লবণসংযোগে দুধের পরিপাকক্রিয়া ভাল হইতে পারে না। অতএব এখন আমরা নিশ্চয়ই বুঝিলাম যে, হিন্দুরা লবণসংযোগে দুধের ব্যবহার নিষেধ করিয়া ঠিক কাযই করিয়াছিলেন।

হিন্দুরা মৃতদেহের সৎকার করিয়া থাকেন—অপরাপর জাতিরা প্রোথিত করেন। সৎকার করাই সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রানুমোদিত বিধি। অগ্নিসংযোগে মৃতদেহস্থ যাবৎ রোগবীজ ও জীবাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়—প্রোথিত করিলে তাহার ফলে অনেকটা জমী ও তদূর্দ্ধস্থ বায়ু দূষিত হইতে থাকে। তবে প্রসবের ফুল ও সদ্যোজাত শিশু মরিলে, এতদুভয়কে পুঁতিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা তত অস্বাস্থ্যকর নহে, যে হেতু এই দুইটিরই সংক্রামক রোগদুষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম।

বর্ত্তমান সময়ে "ইউজেনিক্‌স্‌" বলিয়া একটি বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উহার তাৎপর্য্য এই :—পুষ্টদেহ ও পরিণত বয়সে সন্তানাদি হইলে, তাহারা স্বাস্থ্য ও মেধা বেশী লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই কথার আলোচনা অপর একদিন করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু হিন্দুরা যে এ বিষয়ে খুব মনোযোগী ছিলেন, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে সে ধারণা আছে যে, অষ্টম গর্ভের সন্তান হইলেই কৃতী হয়, বোধ হয়, সেই ধারণা ঐ ইউজেনিক্‌সেরই সাক্ষ্য দিতেছে।

এই প্রবন্ধে ইতস্ততঃ দু' চারিটি বিষয় লইয়া আমি ইঙ্গিত করা হিসাবে কথা বলিয়াছি। তাহাদিগের মধ্যে যে কোনও একটি বিষয় লইয়া অনেক কথা বলা চলে। যেমন বর্ত্তমানকালে অন্ততঃ কলিকাতার ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে "Brain food" বলিয়া একটা মস্ত আকাঙ্ক্ষা প্রকট হইয়াছে, তাহার কারণ, তথা কথিত বিলাতী ঔষধের বিজ্ঞাপন। এ সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা করিলে বড় প্রবন্ধ হইয়া পড়ে—অথচ সার সত্য হিন্দুরা বহু বর্ষ পূর্ব্বে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, ঘৃতই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট "Brain food", এই জন্যই সাত্বিক চিন্তাশীল মনীষীরা ঘৃতভোজনই করিতেন, মাংসের জন্য লালায়িত হইতেন না।

ইতিহাস।

৩

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ইতিহাস জাতিবিশেষের অবদানকাহিনী—জাতীয় কীর্ত্তিমালার বিবরণ। কিন্তু মানবসমাজের প্রাথমিক বিকাশকালে জাতির বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয় না। সকলেই প্রায় সামান্য পশুধর্ম্ম পালন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। তবে যখন পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, যখন পরিবর্ত্তিত প্রতিবেশ অবস্থার সহিত তাহাদের জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপায়গুলির সামঞ্জস্যসাধন করিয়া লইতে হয়, তখন তাহাদের সেই একটানা একঘেয়ে ইতিহাসে একটা নূতন ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনাগুলি ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। দুর্ভাগ্যক্রমে আদিম অবস্থায় ঐরূপ বিশেষ ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিবার কেহই থাকে না। সুতরাং তাহা অতি সত্বরই বিস্মৃতির তিমিরজালে আত্মগোপন করে, অথবা আদিম মানবের উদ্দামকল্পনায় তাহা এরূপ অতিরঞ্জিত ও অনুরঞ্জিত হয়—প্রকৃত ব্যাপার এরূপ অতিপ্রাকৃত কাহিনীতে পরিণত হয় যে, তাহা হইতে প্রকৃত তথ্য নিষ্কাসিত করা মানবের ত দূরের কথা, বুঝি বা দেবতারও অসাধ্য হইয়া উঠে। কাজেই মানবসমাজের প্রাথমিক ইতিহাস প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়া যায়। উহা আর উদ্ধার করিবার উপায় থাকে না। এখন এই যুগের ইতিহাস অনেকটা সমাজবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত হইয়াছে। ইহার পর যখন সমাজে সভ্যতার ক্রমশঃ বিকাশ হইতে থাকে, তখন সাধারণ লোকের জৈবনিক ব্যাপারের স্রোত প্রায় একটানা বহিতে থাকে, কেবল জনকয়েক লোক সমাজে অসাধারণ সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহারাই তাহার সমাধানে আত্মনিয়োগ করে। তখন দলের সর্দ্দার বা রাজা এবং শৌর্য্যশালী ব্যক্তিরাই শত্রুদিগের হস্ত হইতে দলস্থ লোকদিগকে রক্ষা করিত এবং আবশ্যক হইলে অন্যের নিকট হইতে উর্ব্বরাভূমি কাড়িয়া লইত। ইহাদের কীর্ত্তিকাহিনীই তখন সেই জাতির ইতিহাসের সর্ব্বস্ব ছিল। সুতরাং তখন ইতিহাসে স্থায়ী ব্যাপার স্থান পাইত না. যে সকল ব্যাপারের সহিত জনসাধারণ চিরপরিচিত, ইতিহাসে সে সকল ব্যাপারের স্থান হইত না, পক্ষান্তরে পরিবর্ত্তনের অনেক কাহিনীই ইতিহাসে লিখিত হইত। যখন লিপিকৌশল আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন লোক গীতিতে ও গাথায় অনেক অবদানকাহিনী গ্রথিত করিয়া রাখিত এবং হাটে মাঠে গোঠে বাটে কৃষকবালক ও চারণগণ সেই জাতীয় গান ও গাথা গাহিয়া বেড়াইত। ইহাই হইতেছে—ঐতিহাসিক যুগের অরুণোদয়কাল। এই সময় হইতে জননায়কদিগের কাহিনীই ঐতিহাসিককাহিনী বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে আরব্ধ হয়। তখন হইতে প্রধান প্রধান ব্যক্তির কীর্ত্তিকথাই ইতিহাস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। এখনও অনেকের ধারণা, জনকতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চরিতমালাই ইতিহাস। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইতিহাস যেমন সমাজনিয়ন্তা ও দেশনিয়ন্তাদিগের কীর্ত্তিকাহিনী কীর্ত্তন করে,তেমনই সেই নিয়ন্তৃগণের কার্য্যাবলী সামাজিকগণের ও দেশবাসীদিগের উপর কিভাবে এবং কেন প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন করে। দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজে যে স্বেচ্ছাচারমূলক কৌলীন্য ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রবর্ত্তনার কোন প্রয়োজন হইয়াছিল কি না—যে বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণসমাজ সর্ব্বসাকল্যে রঘুনন্দনের স্মৃতির ব্যবস্থা মান্য করে নাই, সেই বাঙ্গালার ব্রাহ্মণসমাজ অর্থাৎ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজ কার্য্যতঃ না হউক, নামতঃ দেবীবরের স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া লইল কেন?—এইরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহই চেষ্টা করেন না, এ পর্য্যন্ত এইরূপ প্রশ্নের কোন মীমাংসাই হয় নাই, অথচ শুনা যাইতেছে, বাঙ্গালায় ইতিহাসচর্চ্চার বন্যা নামিয়াছে! কেবল রাজা গোপাল বা রাজা গণেশের দুই চারিটি কীর্ত্তিকথা লইয়া আলোচনা করিলে বা শিলালিপিতে নিবদ্ধ স্তুতিবাদের পাঠ লইয়া বিতণ্ডার সৃষ্টি করিলে ইতিহাসের চর্চ্চা করা হয় না। এককালে বাঙ্গালায় মাৎস্যন্যায় উপস্থিত হইলে বাঙ্গালার প্রজাবর্গ রাজা গোপালকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল, কেবল এইটুকু খবর লইয়া যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বাঙ্গালায় প্রজাশক্তি তখন খুবই প্রবল হইয়াছিল, তাঁহাদের দেখান উচিত যে, ঐরূপ অন্যান্য কার্য্যেও বঙ্গীয় প্রজা ঐরূপ প্রজাশক্তির নির্ভয়ে পরিচালনা করিয়াছিল। আসল কথা, ঐতিহাসিকের পক্ষে কেবল বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্যাবলীর বর্ণনা করিলে চলিবে না; সেই কার্য্যাবলীর দ্বারা সমাজ কিভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল, তাহার দ্বারা সমাজগতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহাও বলা আবশ্যক। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইতিহাস কেবল কতকগুলি তারিখবদ্ধ অতীত ঘটনামালার ফিরিস্তি নহে, উহা মানুষের জ্ঞানসম্পদবৃদ্ধির একটি বিশিষ্ট বিদ্যা; সুতরাং উহার এলাকাভুক্ত ঘটনাপুঞ্জেরও অবদান-পরম্পরার সহিত মানবসমাজের যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, তাহারও আলোচনা উহাতে থাকা চাই। যদি তাহা না থাকে, তাহা হইলে বলিব, সে ইতিহাস ইতিহাস নহে, তাহা ঘটনাবলীর একখানা catalogue বা ফিরিস্তিপুস্তক। উহা পড়িয়া বিশেষ কোন লাভ নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ঐতিহাসিক ঘটনাবিশেষ

অবশ্য সমাজের উপর প্রভাব বিস্তৃত করিয়া থাকে, কিন্তু একই রকমের কাজ সকল সমাজে সমানভাবে প্রভাব বিস্তীর্ণ করে না, সুতরাং ঐতিহাসিক ব্যাপারকে কোন সাধারণ নিয়মের আমলে আনা যায় না। সামাজিকগণের ধাতুর ও প্রকৃতির উপর কার্য্যের প্রভাব অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এ কথা অংশতঃ সত্য হইতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাহ্যকার্য্য সকলের উপর একই ধরণের প্রভাব বিস্তৃত করে, কিন্তু সামাজিকগণের ধাতু ও প্রকৃতিহিসাবে তাহাদের প্রগাঢ়তা সমান হয় না। গ্রীকদিগের অধীনতাপাশ প্রাচীন আইওনিয়ানদিগের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, মুসলমানদিগের অধীনতাপাশও যে কতকটা সেইভাবে বাঙ্গালীদিগের উপর প্রভাব বিস্তৃত করে নাই, তাহা বলা সঙ্গত নহে। তবে যে উহা সম্পূর্ণ সমান প্রভাব বিস্তীর্ণ করে নাই, তাহার কারণ স্বতন্ত্র।—প্রথমতঃ গ্রীকশাসন ও মুসলমানশাসন ঠিক সমান ছিল না, উভয়ের শাসনগত পার্থক্য বিলক্ষণ ছিল; সুতরাং ভিন্নপ্রকারের কার্য্যের প্রভাব ভিন্ন হইবেই। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালীজাতির প্রকৃতিতে যে ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল, প্রাচীন আইওনিয়ানদিগের মধ্যে তাহা ছিল না। একটা প্রতিকূল শক্তি যদি বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া ধাক্কা মারে, তাহা হইলে মূলকার্য্যের প্রভাবও অনেকটা ক্ষীণ হইয়া পড়ে। মেকলে আইওনিয়ানদিগের চরিত্র স্মরণ করিয়া বাঙ্গালীর চরিত্র আঁকিয়াছিলেন, যদি তিনি সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন বাঙ্গালীর চরিত্রে ধর্ম্মভাবের আতিশয্যটা হিসাবের মধ্যে আনিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অঙ্কনে যে গুরুতর ভ্রান্তি হইয়াছিল, তাহা হইত না। তাহার প্রমাণ এখন বাঙ্গালী যতই সেই ধর্ম্মভাব হারাইতেছে, ততই তাহারা ধীরে ধীরে মেকলেচিত্রিত চরিত্রের সন্নিহিত হইতেছে। পক্ষিবিশেষের ন্যায় কুসংস্কারের বালুকাবিস্তারে মাথা গুঁজিয়া থাকিলে প্রকৃত তথ্য অপহ্নুত হইতে পারে, অপোহিত হয় হয় না। অস্ত্র-আইন বাঙ্গালীর সাহস ও শৌর্য্যকে সঙ্কুচিত করিয়াছে, পাঞ্জাবীর সাহস ও শৌর্য্যকেও সঙ্কুচিত করিয়াছে। তবে উভয় জাতির সাহস ও শৌর্য্য সমানভাবে হ্রাস পায় নাই, তাহারও কারণ আছে। যে রাজপুতানাবাসীর শৌর্য্যে এক সময় ভারত চমকিত হইয়াছিল, সেই রাজপুতানার অহিংসাধর্ম্মসেবক জৈনধর্ম্মাবলম্বী শান্তপ্রকৃতিতে ও সৌম্যভাবে বাঙ্গালীকেও পরাজিত করিয়াছে, ইহা নিত্য-প্রত্যক্ষের বিষয়। ফলে ধর্ম্মসমাজ এবং রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত মানবের ব্যক্তিগত ও জাতীয় প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তৃত করে। এই সকল ঐতিহাসিক তথ্য হইতে মনস্বী পণ্ডিতগণ প্রাণিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। সেই জন্য ইতিহাসে যাহাতে কার্য্যকারণতত্ত্ব মোটামুটিভাবে আলোচিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। তাহা হইলে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ভালভাবে বুঝাও যায়, ঐ সকল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত করিবার সুবিধা হয়।

ইতিহাস কি, উহার উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা জানিয়া এবং তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তবে ইতিহাস সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমি বরাবরই বলিয়া আসিতেছি যে, কতকগুলি তথ্যের স্তূপ ইতিহাস নহে। ইট, কাঠ, চূণ, সুরকী, লোহালক্কড় এক স্থানে স্তূপীকৃত করিলে তাহাকে প্রাসাদ বলা যায় না। কতকগুলি টুক্‌রার গাদাকে পূর্ণ জিনিস বলা যায় না। উহা যেখানে যেটি বিন্যস্ত করা উচিত, সেইখানে তাহা মানানসই করিয়া বিন্যস্ত করিলে তবে সৌধ রচিত হয়, টুক্‌রাগুলি যথাযথভাবে সাজাইলে তবে তাহাতে অখণ্ড জিনিসের পরিচয় পাওয়া যায়। সারনাথের যে গৃহে পুরাবস্তুসকল রক্ষিত আছে, তাহাতে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত ছত্রও রক্ষিত রহিয়াছে। ছত্রটি অত্যন্ত ভগ্ন টুক্‌রা অবস্থায় পাওয়া যায়। যদি সেই টুক্‌রাগুলি এক স্থানে স্তূপীকৃত করিয়া রক্ষিত হইত, তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে কেহই একটা ধারণা করিতে পারিত না। কিন্তু উহার যে অংশ যেখানে থাকা উচিত, সেই অংশ সেইখানে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাই সর্ব্বসাধারণে সেই ছত্রসম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারিতেছে—উহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছে। সারনাথে যে সকল বস্তু পাওয়া গিয়াছে, তাহা যেখানে যেভাবে বিন্যস্ত ছিল, সেইখানে যদি সেইভাবে বিন্যস্ত করা সম্ভব হইত, তাহা হইলে উহার সৌন্দর্য্য লোক পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারিত। ঐতিহাসিক ঘটনাসম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথাই বলা যাইতে পারে। অতীতের তমসাচ্ছন্ন গিরিকন্দর হইতে কেবল কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের উদ্ধার করিলেই একটা বড় ঐতিহাসিক কাজ করা হয় না; অন্যান্য তথ্যের সহিত পর্য্যায় মানাইয়া উহাকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের কাজ। অবশ্য তথ্যের উদ্ধারসাধনের যে কোন প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমি বলিতেছি না, কারণ তথ্য না পাইলে বিন্যাসের কথা উঠিতেই পারে না; তবে তথ্যের উদ্ধারসাধন অপেক্ষা উহার বিন্যাসেই বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাপ্ততথ্যগুলি কালের অঙ্কে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিতে হইলে অতীতসম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। অতীতকালে কিভাবে ঘটনাপরম্পরা বিন্যস্ত ছিল, কিভাবে সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহা যাঁহারা স্পষ্টভাবে প্রণিধান করিতে না পারিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা ঐতিহাসিক তথ্যবিন্যাস একেবারেই অসম্ভব। কেবল রাজার কথা, যুদ্ধের কথা অথবা অন্যান্য ঘটনার তারিখ নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিলেই ঐতিহাসিক হওয়া যায় না, পরন্তু অতীতের অবদান হইতে সারসত্য সংগ্রহ করিয়া যদি

তাহা হইতে ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, তাহা বুঝিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিব যে, আমাদের ইতিহাস আলোচনা সার্থক হইয়াছে।

যুগবিশেষের বা সমাজবিশেষের ইতিহাস একটা ভিতরের নিয়মদ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে; সেই নিয়মটি ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম না করিলেই সমস্তই যেন বিক্ষিপ্ত, পারম্পর্য্যহীন ও খণ্ডিত হইয়া পড়ে। মানবসভ্যতাবিবর্ত্তের দুইটা দিক্ আছে;—একটা সাংসারিক, আর একটা ধর্ম্মের দিক্। যে কোন যুগের এবং যে কোন সমাজের ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে, সেই যুগের ও সেই সমাজের জনগণ কিভাবে সামাজিক ও নাগরিক (municipal) কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, ঐ সকল বিষয়ে তাহাদের আদর্শই বা কিভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে আদর্শের বৈশিষ্ট্যই বা কি ছিল, তাহা বেশ করিয়া তলাইয়া বুঝিয়া দেখিতে হইবে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধর্ম্মভাব কিভাবে বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন্ বিশেষ ধারা ধরিয়া ঐ ধর্ম্মভাব প্রবাহিত হইয়াছিল, সামাজিক ও রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানে উহা কিরূপে কত দূর প্রভাব বিস্তৃত করিয়াছিল, তাহা বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। ভাসা ভাসা ভাবে বুঝিলে হইবে না, বেশ তলাইয়া বুঝিতে হইবে। সেই ধর্ম্মভাবের বৈশিষ্ট্য কোথায়, তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। তাহা হইলেই ইতিহাস বুঝা যাইবে। এইগুলি যিনি নিরপেক্ষভাবে কোনরূপে কোনরূপ গোঁড়ামী না করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, অতীতের গৌরব তাঁহার মানসনেত্রসম্মুখে সহস্রসূর্য্যসমপ্রভায় প্রতিভাসিত হইবে। এই গোঁড়ামী নানাভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সভ্যতাবিশেষের প্রতি একান্ত অনুরাগও একটা উৎকট গোঁড়ামী। জড়বাদের প্রতি বা আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রগাঢ় পক্ষপাতও বিষম গোঁড়ামী। ঐতিহাসিককে এই সমস্তই পরিহার করিতে হইবে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় তাঁহার মনের ভাবকে ঠিক রাখিতে হইবে, কোন প্রকারে কোন দিকে মনকে অণুমাত্রও ঝুঁকিতে দিলে সবই নষ্ট হইয়া যাইবে। দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা এইরূপ ঐতিহাসিকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। তাই ইতিহাসও সুন্দর হইতেছে না।

ইট, কাঠ, মাল-মসলা স্তূপীকৃত পাইলেই সকলে বাড়ী প্রস্তুত করিতে পারে না। বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইলে কি ভাবে বাড়ীটি রচিতে হইবে, তাহার একটা মতলব (Plan) চাই। যিনি যত ভাল Plan করিতে পারেন, তিনি তত দক্ষ স্থপতি। যেখানে দেখিবে যে, একটি সুন্দর বাড়ী বা হর্ম্ম্য নির্ম্মিত রহিয়াছে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে, তাহার অন্তরালে স্থপতির একটা মতলব আছে। সেই মতলব হইতে স্থপতির উদ্দেশ্য বুঝা যায়। আর সেই স্থপতি তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধনের উপযোগী করিয়া বাড়ীটি নির্ম্মিত করিতে কতদূর সমর্থ হইয়াছেন, তাহা দেখিলেই তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য ও বাড়ীর রচনা—দুই বিচার না করিয়া দেখিলে বাড়ীটি ঠিক বুঝা যায় না। দেবমন্দির রচনা করিতে হইলে যে স্থানে দেবতার পীঠ বা রত্নবেদী থাকে, সে স্থানটি একটু অন্ধকারময় করাই উচিত। কারণ অস্ফুট আলোক ঐ দেবস্থানকে একটা গাম্ভীর্য্য প্রদান করে। দেবস্থানে সে গাম্ভীর্য্যের প্রয়োজন আছে। কিন্তু নাটমন্দিরের সেরূপ হইবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ উদ্দেশ্য বুঝিয়া মন্দিরাদির আলোচনা করিলে তবে উহা বুঝা যায়। নতুবা জগন্নাথদেবের মন্দির লাটসাহেবের বাড়ীর মত করিয়া রচিত হয় নাই বলিয়া তর্ক তুলিলে তার্কিকের মূর্খতাই প্রকাশ পায়। সেইরূপ প্রাচীন সমাজ, প্রাচীন সভ্যতা প্রভৃতি বুঝিতে হইলে সেই সমাজ ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কি ও সেই বৈশিষ্ট্যের উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক সভ্যতা কতকগুলি প্রতিভা-শালী ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই সমাজের ও সেই সভ্যতার স্থপতি। তাঁহাদের মানসক্ষেত্রে যে স্বপ্ন সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল, তদনুসারে তাঁহারা সেই সমাজের ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠান রচিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সেই স্বপ্ন অর্থাৎ প্রজ্ঞানেত্রসম্মুখে সমুদ্ভাসিত সেই Plan উক্ত সমাজ ও সভ্যতার আকার দান করিয়াছে। গৃহাদি-নির্ম্মাণকারী স্থপতির যেমন Plan, সমাজ ও সভ্যতা-নির্ম্মাণকারী স্থপতির সেইরূপ স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সফল করিবার ইচ্ছাই সমাজে সভ্যতারচনার প্রযোজক কারণ। ঐতিহাসিকের মানসনেত্রের সম্মুখে সেই প্রতিভাশালী মহাত্মগণের স্বপ্ন সমুদ্ভাসিত হয় না, সেই ইচ্ছা উপলব্ধ হয় না। ঐতিহাসিক দেখিতে পান, প্রাচীন সমাজও সভ্যতার কঙ্কাল। সেই কঙ্কালটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি যদি সেই স্বপ্ন বা মতলবের সন্ধান পান, তাহা হইলে তিনি সেই সমাজের ও সভ্যতার সন্ধান পাইবেন। তাঁহার ইতিহাস-রচনা সফল হইবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-মহিমা।

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একটি শ্লোক।

ওঁ নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়—

কুমনাঃ সুমনস্ত্বং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে॥

(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—
আদি ১৫শ পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক।)

মর্ম্মার্থ:—যাঁহার চরণকমলে সুমনঃ (=জাতিপুষ্প, পক্ষান্তরে সুসংগত চিত্ত) সমর্পণ করিবামাত্র কুমনাব্যক্তিরও মন সুনির্ম্মল হয়, সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে আমি ভজনা করি।

পরম রসিকভক্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার বিরচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের আদিলীলার ১৫শ পরিচ্ছেদের ১ম শ্লোকেই শ্রীমহাপ্রভুকে উক্তপ্রকারে বন্দনা করিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় এক জন সিদ্ধভক্ত ছিলেন. অতি বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহে ও অন্ধ অবস্থায় কেবলমাত্র শ্রীবৃন্দাবনধামের অধিষ্ঠাতৃদেবতা শ্রীশ্রীমদনগোপালের আদেশে ও ভক্তবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এবম্প্রকার গ্রন্থকারের গ্রন্থে মিথ্যাকথা দূরে যাক্, কোন প্রকার অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন থাকাও সম্ভব নহে। কোন কথা না বুঝিতে পারিলেই যে সেটা মিথ্যা হইবে, এরূপ ধারণা করা নিতান্ত মূঢ় ও অজ্ঞেরই কাজ। সকলের সমস্ত কথাই যে মানিয়া লইতে হইবে, আমি এমন কথাও বলিতেছি না, তবে স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কখন কখনও ব্যক্তিবিশেষের কথা মানিয়া লওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য, আমি ইহাই বলিতে চাহি। শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী যেরূপ মুক্তাত্ম সাধুপুরুষ ছিলেন, তাহাতে তাঁহার উক্তিসমূহ মানিয়া লওয়াই উচিত এবং তাহা না করিলে আমাদের প্রত্যবায় হয়, ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে ও মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। তবে সকলেই যে এত দূর স্বীকার করিবেন, তাহা আমি আশা করিতে পারি না, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উক্তি যে মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত, এ কথা বলিবারও কাহারও অধিকার নাই। বিনা বিচারে কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত করা ধর্ম্ম ও ন্যায়সঙ্গত নহে, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উক্তির সত্যাসত্যের বিচার না করিয়াই তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে বোধ হয় সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেই সঙ্কুচিত হইবেন। অতএব এরূপ ক্ষেত্রে পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের উক্তিটি বিশ্লেষণ করিলে এই বুঝায় যে, যদি কোন পাপী একনিষ্ঠ ও দৃঢ়চিত্ত হইয়া ক্ষণকালের জন্যও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া সেই চরণে আত্মসমর্পণ করে, তবে তাহার মনের সমস্ত পাপ-তাপ-রূপ মলিনতা বিদূরিত হইয়া যায় ও সেই পাপী নরজন্ম লাভ করিয়া পরম পুণ্যাত্মা হইয়া উঠে ও ধর্ম্মের বিমলানন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়। এক্ষণে যিনি এই বাক্যের সত্যাসত্যের পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে কি করিতে হইবে? তাঁহাকে করিতে হইবে—(১) প্রথমতঃ সুসংযত-চিত্তে হৃদয়মধ্যে মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমলের ধ্যান ও ধারণা এবং (২) দ্বিতীয়তঃ ঐ শ্রীচরণে তাঁহার মন সর্ব্বোতোভাবে সমর্পণ। যদি কেহ এই দুইটি কার্য্য যথাযথরূপে সম্পন্ন না করিয়াই বলেন:—"কৈ, মহাপ্রভুর চরণ ধ্যান-ধারণা করিলাম, তাহাতে মনও সমর্পণ করিলাম, তবুও ত আমার মনের ময়লা গেল না, এখনও ত আমার পাপপ্রবৃত্তি, মনের মলিনতা পূর্ব্বের মতই রহিল, অতএব কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি সত্য নহে।"—তবে তাহার কথা কেই বা বিশ্বাস করিবে, আর এরূপ কথার মূল্যই বা কি? এইরূপ ব্যক্তি যে ইচ্ছা করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়া প্রবঞ্চনা করিতেছে, ইহা না হইতেও পারে, তবে তাহার এই প্রকার উক্তি জ্ঞানকৃত মিথ্যা না হইলেও যে অজ্ঞানকৃত মিথ্যা, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না। কিন্তু মিথ্যার প্রসূতি এই যে অজ্ঞতা, ইহা কোথা হইতে আইসে? ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের বা ভগবত্তত্ত্বানুসন্ধানের একান্ত অনিচ্ছা বা উক্ত বিষয়ে একান্ত আলস্যই এই লজ্জাস্কর ও অনিষ্টকারী অজ্ঞতার জননী বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আমার স্থির ধারণা এই যে, নরদেহধারী যে কোন ব্যক্তিই ইচ্ছা করিলে ভগবৎ-তত্ত্বানুসন্ধানের অভাবজনিত তাঁহার মনের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া ভগবৎ-প্রেম-সূর্য্যের চিরোজ্জ্বল রশ্মিমালায় হৃদয়কন্দর নিত্যকাল আলোকিত রাখিতে পারেন।

ইচ্ছা করিলেই মনের উক্তপ্রকার অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় বটে, কিন্তু এই সদিচ্ছা চিত্তাকাশে চপলা চমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হইলে চলিবে না, পরন্তু তাহা সুদৃঢ় সুসংযত ও নিত্য স্থায়ী হওয়াই নিতান্ত আবশ্যক। ভগবদ্বিষয়ে এই-রূপ ঐকান্তিকী ইচ্ছা লাভ করা সহজ নহে এবং বিনা যত্নে ও পরিশ্রমে তাহা পাওয়াও যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া হতাশ বা নিরুদ্যম হইবার কোন কারণ নাই। ভক্তিগ্রন্থে যে সমস্ত পথ নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই পথ অবলম্বন করিয়া চলিলেই ভগবদ্‌কৃপায় ঐ সুদুর্লভ ভগবন্মুখী ইচ্ছা বীজ স্বতঃ মনের মধ্যে উপ্ত হইবে এবং একনিষ্ঠ হইয়া সেই পথ ধরিয়া চলিতে থাকিলেই ঐ বীজ ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও শাখা-

প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া মহান্ মহীরুহের আকার ধারণ করিয়া অমৃতাধিক সুস্বাদু ও হিতকারী ফল-ফুল ও সুশীতল ছায়া প্রদান করিয়া মানবকে ধন্য ও চরিতার্থ করিবে। এই মহতী ইচ্ছা হৃদয়ে জাগরিত ও স্থায়ী রাখিতে হইলে প্রথমেই সাধু ভক্তের সঙ্গ অতীব প্রয়োজনীয়। কিন্তু প্রকৃত সাধু ভক্তের সঙ্গলাভ ত দূরের কথা, দর্শনলাভও দুর্লভ; যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধ, ২য় অধ্যায়—১৯শ শ্লোক :—

দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্॥

মর্ম্মার্থ :—এই মানবদেহ ক্ষণভঙ্গুর বটে, তবুও ইহা মানবের পক্ষে দুর্লভ (কারণ নরদেহই সাধনপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট আধার) এবং এই মানবদেহ-ধারিগণের মধ্যেও আবার কৃষ্ণভক্ত নর সুদুর্লভ।

ভাগ্যক্রমে যদি একটি প্রকৃত সাধু ভক্তের দর্শনলাভ হয়, তবে প্রথমে সেই সাধুর সঙ্গলাভ করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে, পরে তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া অকপটচিত্তে নিজের দৈন্য তাঁহার নিকট নিবেদন করিতে হইবে, তদনন্তর ঐ সাধু কৃপা করিয়া যেরূপ উপদেশ দিবেন, তদনুযায়ী চলিতে হইবে। এইরূপে প্রথমে মনকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে হইবে, মনের বশে না থাকিয়া মনকে নিজের বশে আনিতে হইবে। মন সম্পূর্ণরূপে বশীকৃত হইলেই তাহাকে "সুমনঃ" বা সুসংযত মন বলা যায়, তৎপূর্ব্বে নহে। এই মনকে বশ করা বড় অল্প কথা নহে, ইহার উপর সাধকের সিদ্ধির ফলাফল পরোক্ষভাবে অনেকটা নির্ভর করে। এই মন বশ করিবার পক্ষে শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন এবং প্রত্যেক পথেই নানাপ্রকার বিধি-নিষেধ আছে। মন সংযত করিবার এই নানাবিধ প্রণালীর মধ্যে যোগমার্গ একটি বিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ উপায় এবং এই পথের পান্থসংখ্যাও সমধিক। যোগের সংজ্ঞা এই—যোগশ্চিত্তবৃত্তিঃ নিরোধঃ। সমুদায় চিত্তবৃত্তির নিরোধকেই যোগ বলে। এই যোগসাধনপ্রণালী আবার বহুকষ্টসাধ্য; ইহাতে নানাপ্রকার আসন আছে, নানাপ্রকার ক্রিয়া আছে। প্রথমে আসনসিদ্ধ হওয়াই একটা দুরূহ ব্যাপার, তারপর অন্যান্য সাধন। যাহা হউক, এই যোগমার্গ মন বশ করিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হইলেও তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় নহে। ভক্তিমার্গের প্রণালীই মন বশ করিবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল ও কার্য্যকরী। যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যোগমার্গ ও ভক্তিমার্গের তুলনায় সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি না, আর ঐরূপ সমালোচনা করিবার আমার অধিকারও নাই। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, যোগমার্গ অবলম্বনকারী যোগিগণের অধঃপতনের কথা অনেক স্থলে বর্ণিত আছে, কিন্তু ভক্তিমার্গ অবলম্বনকারী ভক্তগণের ঐরূপ অধঃপতনের কথা কোথাও পাওয়া যায় না, বরঞ্চ এমত উল্লেখ আছে যে, ভক্তিপথের পথিকগণ কৃষ্ণ-কৃপায় কখনও পথভ্রষ্ট হয়েন না।

এক্ষণে পুনর্ব্বার চৈতন্যচরিতামৃতোদ্ধৃত শ্লোকটিতে পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত শ্লোকের প্রথম ছত্রে "সুমনঃ" শব্দ আছে, দ্বিতীয় ছত্রেও ঐ সুমনঃ শব্দ আছে। শেষোক্ত সুমনঃ শব্দের অর্থ জাতিপুষ্পও হয়, সুসংযত মনও হয়, আমরা এই দ্বিতীয় অর্থেই ঐ শব্দ গ্রহণ করিয়াছি; প্রথম অর্থটিও বেশ উপযোগী এবং এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত উহার বেশ সামঞ্জস্যও আছে, তবে দ্বিতীয় অর্থটি আগে না বুঝিয়া প্রথম অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিলে নূতন পাঠকের মনে গোলযোগ হইতে পারে, এই-রূপ আশঙ্কা করিয়াই প্রথমে দ্বিতীয় অর্থ লইয়াই বিচার করিতে চেষ্টা করিলাম।

শ্লোকটির প্রথম ছত্রের সুমনঃ শব্দের অর্থ—ভাল বা সুন্দর মন; ইহার সহিত দ্বিতীয় ছত্রের সুসংযত মনের বিশেষ পার্থক্য নাই, কারণ, মন সুসংযত হইলেই সুন্দর বা ভাল হয়। কুমনাঃ (অর্থাৎ যাহার মন কদর্য্য, অসংযত চিত্তবিশিষ্ট পাপী ব্যক্তি) যদি চৈতন্য প্রভুর পাদপদ্মে তাহার অসংযত মনকে সুসংযত করিয়া অর্পণ করে, তবে তাহার পাপপঙ্কিল মন তৎক্ষণাৎ সুসংযত বা সুন্দর অর্থাৎ পাপ-ধৌত হইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়। কি কি বিধানে মন সুসংযত করা যায়, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস ইতিপূর্ব্বে দিয়াছি, তাহার উপর আবার সেই সুসংযত মন শ্রীচৈতন্যচরণে অর্পণ করিতে হইবে। এই মন অর্পণ করাও বড় সহজ নহে, কিরূপে মন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে হয়, তাহারও বিধান ভক্তিগ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত আছে। আরও একটি কথা আছে, এই যে সুসংযত মন, ইহা কোথায় অর্পণ করিতে হইবে?—শ্রীচৈতন্যদেবের চরণকমলে। এই চরণকমল প্রথমে ঐকান্তিকীভক্তি সহকারে হৃদয়ে ধ্যান ও ধারণা করিতে হইবে, পরে চৈতন্যদেবেরই কৃপায় ঐ চরণ-যুগলের মাহাত্ম্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলেই তাহাতে ঐ সুসংযত মন অর্পণ করা সম্ভবপর হইবে। এই উভয় ব্যাপারই অন্যোন্যসাপেক্ষ, একটিতে ক্রটী হইলে অপরটিতে সফলতালাভ করা যাইবে না।

এক্ষণে পাঠকবর্গ বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিলেন যে, উদ্ধৃত শ্লোকের ছোট্ট দুই ছত্রের ভিতর কত নিগূঢ় ভাব নিহিত আছে। এক্ষণে কি কেহ সহসা পরম শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের কথায় অশ্রদ্ধা করিতে পারি-বেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে, যদি তিনি কৃপা করিয়া এ অধমের দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল বিবেচনা করিব।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্. এ., বি. এল্.।

পঞ্জিকা—পঞ্চাঙ্গশোধন।

[কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ-জ্যোতিষতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত।]

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

২। দ্বিতীয় আপত্তি,—প্রাচীনমতে গণনা করিলে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় হয়, কিন্তু দৃক্‌তুল্য গণনা করিলে সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় হইয়া থাকে। সুতরাং দৃক্‌তুল্য গণনা গ্রহণীয় নহে।

উত্তর— বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় তিথির লক্ষণ নহে। স্ফুটরবি ও স্ফুটচন্দ্রের অন্তরের প্রতি দ্বাদশাংশে এক এক তিথি হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে রঘুনন্দনকর্ত্তৃক তিথিতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে—

অর্কাদ্বিনিসৃতঃ প্রাচীং যদ্‌যাত্যহরহঃ শশী।
ভাগৈর্দ্বাদশভিস্তৎ স্যাৎ তিথিশ্চান্দ্রমাসং দিনং॥

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরপুরাণ হইতেও তিথির লক্ষণ রঘুনন্দন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

ত্রিংশাংশকস্তথা রাশের্ভাগা ইত্যভিধীয়তে।
আদিত্যাদ্বিপ্রকৃষ্টস্তু ভাগদ্বাদশকং যদা।
চন্দ্রগাঃ স্যাৎ তদা রাম তিথিরিত্যভিধীয়তে॥

রবির গতি অপেক্ষা চন্দ্রের গতি অধিক। চন্দ্র যত সময়ে গত্যন্তর দ্বারা রবি হইতে এই দ্বাদশাংশ অন্তরিত হয়, তাবৎকাল এক তিথির পরিমাণ।

দৃক্‌তুল্য গ্রহসাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থকার ভিন্ন ভিন্ন পরম মন্দফল গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্যের যে পরম মন্দফল গৃহীত হইতেছে, তাহাতে বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় হইতেছে সত্য, কিন্তু এই পরম মন্দফলে দৃক্‌তুল্য হয় না জন্য দৃক্‌তুল্য গণনায় পরম মন্দফলের পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে, সুতরাং ইহাতে সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় হইতেছে। দৃক্‌তুল্য গ্রহসাধনই জ্যোতিষশাস্ত্রের উদ্দেশ্য; ইহাতে যখন যেরূপ পরম মন্দফল গ্রহণ করিলে দৃক্‌তুল্য হয়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে।

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক স্বর্গীয় পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয়, পঞ্চাঙ্গপ্রভাকর নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"মকরন্দ-সারণীতে তিথির পরম হ্রাস ও পরম বৃদ্ধি বাণবৃদ্ধি রসক্ষয়ের কাছাকাছি দেখা যায়। ইহার কারণ জানিতে হইলে চন্দ্রে যে ফলসংস্কার করা হইয়া থাকে, তাহার মূলনিয়মের অনুসন্ধান করা আবশ্যক। ৯০ অংশ কেন্দ্রে যে ফল হয়, তাহাকে পরমফল বলে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে সমপদান্তে চন্দ্রের পরমফল ৫।৫।৩৬, বিষমপদান্তে ৫।২।৩০ বলিয়াছেন। মকরন্দ ইহা মান্য করিয়া চলেন নাই। তিনি সর্ব্বত্র পরমফল ৫।২।৪৮ মানিতেছেন। গুপ্তপ্রেসাদি পঞ্জিকার আধারভূত গ্রন্থের কর্ত্তা রাঘবানন্দ ৯০ অংশ কেন্দ্রে পরমফল ৪।৫৫ কলা মানিতেছেন, ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু ইহা বরাহ-মিহিরের সংশোধিত পঞ্চসিদ্ধান্তিকার আসন্ন। বরাহ-মিহির নিজগ্রন্থে সর্ব্বত্র ৪।৫৬।৩ পরমফল মানিয়াছেন। তিনি চন্দ্রের মধ্যগতিতে প্রতিচক্রে — ৩৭/২০ বিকলা প্রভেদ ও চন্দ্রোচ্চে প্রতিচক্রে + ২৯/৭ বিকলা প্রভেদ স্থির করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। রাঘবানন্দ তিন হাজার বৎসরে চন্দ্রকেন্দ্রে এক অংশ অধিক করিতে হইবে স্থির করিয়া গ্রন্থ লিখিয়াছেন। আধুনিকেরা মধ্যমচন্দ্রে ভেদ

$$১০.১৮১৬২১২৬৮ব^{২} + ০.০১৮৫৩৮৪৪০৮ব^{৩} \quad ব = \frac{ইষ্টশক-১৬২২}{১০০}$$

স্থির করিতেছেন। লল্লাচার্য্য পরম মন্দফল ৫।১, ভাস্করাচার্য্য ৫।২।৮ মানিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যাদিগের পরীক্ষালব্ধ ফলস্বরূপ পরম ফলগুলির আলোচনা করিয়া সহজেই স্থিরসিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, চন্দ্রের পরমফল 'চল' অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল। বাস্তবিকও আধুনিক গণিতজ্ঞেরা সহস্র সহস্র পরীক্ষাদ্বারা ঠিক স্থির করিয়াছেন যে, চন্দ্রের পরমফল 'চল' হইয়া থাকে। চন্দ্রোচ্চের অবস্থিতি অনুসারে কখন ৭।৪০ চন্দ্রের পরম মন্দফল হয়, কিন্তু উচ্চের কোন কোন অবস্থিতিতে কখনও লল্লাচার্য্যের স্বীকৃত ৫।১ পরম মন্দফল হইয়া থাকে। এই জন্য প্রথমে ঐ উভয়বিধ পরম মন্দফলের যোগার্দ্ধ ৬।২০।৩০ পূর্ব্বাচার্য্যোক্ত প্রণালীতে মধ্যম চন্দ্রে সংস্কার করিতেছেন। আর অবশিষ্ট মন্দফলের সংস্কার কিঞ্চিদন্যভাবে করিতেছেন। পরবর্ত্তী মন্দফলের সংস্কারগুলিকে বীজসংস্কার নাম দিতেছেন। এখন বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, যথার্থ মন্দফল সংস্কার করিয়া সূর্য্যসিদ্ধান্ত বচনানুরূপ ঠিক দৃক্‌তুল্য চন্দ্রগণনা করিয়া তিথিসাধন করিলে পরমাল্পমান ৫০ দণ্ড এবং পরমাধিকমান ৬৭ দণ্ড হইয়া থাকে। আর পরম মন্দফল ৪।৫৫ ইত্যাদির কোন একটি স্বীকার করিয়া চন্দ্রগণনা করিয়া তিথিসাধন করিলে তিথিমান ৫৩ হইতে ৬৬ দণ্ডের মধ্যে থাকে। এরূপ তিথি অশুদ্ধ, তাহা আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না; পরমফলের আলোচনায় তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন—

"আমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে উগ্রতপা মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়া এই জগৎকে পবিত্র করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। সেই মহাত্মা পরমাল্পতিথির মান—যাহা সর্ব্বজনপ্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহারই আশ্রয়ে ধর্ম্মকার্য্যে দণ্ডী-দিগের একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই মহাত্মার বচন এই—

অবিদ্ধানি নিষিদ্ধৈশ্চেন্নলভ্যন্তে দিনানি তু।
মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চাভিবিদ্ধা গ্রাহ্যৈবৈকাদশী তিথিঃ॥"

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি. আই. ই. মহোদয় বহুতর শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা এই বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়রূপ প্রবাদবাক্যের খণ্ডন করিয়াছেন—বাহুল্যভয়ে তাঁহার সকল প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া মাত্র একটি হেতুর উল্লেখ করা হইতেছে। তিনি নির্ণয়ামৃত নামক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—

বিদ্ধাধিকা দ্বাদশী হীনাতু গৃহস্থৈঃ পূর্ব্বৈ বোপাষ্যা, যতিভিরুত্তরেতি ব্যবস্থা। ...নন্থ...দ্বাদশীক্ষয়ে নক্তাদিকং বিহিতং, তৎ কথং গৃহি যতি বিষয়ত্বেন ব্যবস্থেতি চেৎ, সত্যং একাদশী ব্রতস্য নিত্যত্বাদ্ ব্যবস্থা সিদ্ধিরিতি। তদুক্তম্—

অবিদ্ধাত্বনিষিদ্ধা চেন্ন লভ্যেত যদা তিথিঃ।
মুহূর্ত্তৈঃ পঞ্চাভিবিদ্ধা গ্রাহ্যাপ্যেকাদশী তিথিঃ।

ইতি পঞ্চমুহূর্ত্তৈর্বিদ্ধায়ামপি গ্রহণাৎ।

এ স্থলে অধিক বেধেও একাদশীর উপবাস হইতে পারে, এই ব্যবস্থা সপ্রমাণ করিতে গিয়া হেতু দেওয়া হইয়াছে—পাঁচ মুহূর্ত্ত বিদ্ধার ও (একাদশীরও) বচনে গ্রহণ আছে; পঞ্চমুহূর্ত্ত বিদ্ধায়া অপি গ্রহণাৎ।

একে এটি হেতুবাক্য—(সিদ্ধ না হইলে হেতু হইতে পারে না) তাহাতে আবার "অপি" শব্দের যোগ আছে। সুতরাং এ স্থলে আর কোনরূপ (বাণবৃদ্ধিরসক্ষয়রূপ) কল্পনাই স্থান পাইতে পারে না।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে জানা যায়, বাণবৃদ্ধি রসক্ষয় তিথির স্থায়িমান নহে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দৃক্‌তুল্যতা-সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পরম মন্দফল ও বীজ গ্রহণ করিতে হয়, সুতরাং তিথির পরম হ্রাস-বৃদ্ধিও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে।

৩। তৃতীয় আপত্তি—সপ্তবৃদ্ধি দশক্ষয় স্বীকার করিলে মুখ্যাপরাহ্ন না পাওয়ায় শ্রাদ্ধলোপ হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যক্ষগণনা গ্রাহ্য নহে।

উত্তর—দশ দণ্ড কেন, পনের দণ্ড ক্ষয় হইলেও শ্রাদ্ধলোপ হইতে পারে না। রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্ব ও তিথিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—রাত্রিতে, উভয় সন্ধ্যাকালে ও অচিরোচিত (সদ্য উদিত) সূর্য্যে ও রাক্ষসীবেলায় শ্রাদ্ধ করিবে না। ইহা ছাড়া অন্য সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারে।

রাত্রৌ শ্রাদ্ধং নকুর্ব্বীত রাক্ষসী কীর্ত্তিতা হি সা।
সন্ধ্যায়োরুভয়োশ্চৈব সূর্য্যে চৈবাচিরোদিতে।
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু।

প্রাতঃসন্ধ্যায় অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, অচিরোদিত সূর্য্য জন্য ১ মুহূর্ত্ত, রাক্ষসীবেলা ৩ মুহূর্ত্ত, মোট ৪½ সাড়ে চারি মুহূর্ত্তকাল শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ (পর্য্যুদস্ত) কাল। ইহা ছাড়া দিনে সকল সময়েই শ্রাদ্ধ করিতে পারে। পৌষ মাসে যখন দিন সর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়, তখনও ২৬ দণ্ডের কম দিনমান হয় না। ইহার ৪½ মুহূর্ত্ত প্রায় ৮ দণ্ড। এই ৮ দণ্ড ব্যতীত অবশিষ্ট ১৮ দণ্ড শ্রাদ্ধের বিহিত কাল। ইহার ১০ দণ্ড তিথিক্ষয় হইলেও ৮ দণ্ডমধ্যে শ্রাদ্ধ হইতে পারে, সুতরাং শ্রাদ্ধলোপের আশঙ্কা নাই। রঘুনন্দন চারি প্রকার শ্রাদ্ধকাল বলিয়াছেন এবং তাহাদের বিহিত, প্রশস্ত, প্রশস্ততর ও প্রশস্ততম, এই চারি প্রকার নাম দিয়াছেন।

রাত্র্যাদি পর্য্যুদস্তেতর কাল—কুতুপাদি মুহূর্ত্তপঞ্চক, রৌহিণাদি মুহূর্ত্তচতুষ্টয়, দশমাদি মুহূর্ত্তত্রয়রূপ-কাল চতুষ্টয়ং আপরাহ্নিকশ্রাদ্ধে বিহিত-প্রশস্ত-প্রশস্ততর-প্রশস্ততমত্বেন বোধ্যং অক্ষয়াদি ফল-শ্রুতেঃ।

উপরি-উক্ত চারি প্রকার কালও আবার দুই ভাগে বিভক্ত, একাদশ ও দ্বাদশ মুহূর্ত্তের নাম মুখ্যকাল, অন্য সকল গৌণ-কাল। পৌষ মাসে যখন দিনমান অল্প হয়, তখন প্রচলিত পঞ্জিকাতেও সকল দিনে মুখ্যকালে তিথির প্রাপ্তি হয় না, সুতরাং গৌণকাল লইয়া শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিতে হয়। তিথির দশক্ষয় হইলেও ঐরূপ স্থলে গৌণকাল লইয়াই শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা হইবে। অতএব দশক্ষয় হইলেও শ্রাদ্ধলোপের আশঙ্কা নাই। বরং প্রচলিত পঞ্জিকামতে নিত্যই শ্রাদ্ধলোপ হইতেছে, কারণ ইহাতে তিথিগণনা ভুল হওয়ায় কখন যথার্থ তিথির পূর্ব্ব তিথিতে কখন পর তিথিতে কখন বা কাকতালীয় ন্যায়ে যথার্থ তিথিতেও শ্রাদ্ধ হইতেছে। কিন্তু পঞ্জিকাসংস্কার হইলে এরূপ কখনই শ্রাদ্ধলোপ হইবে না।

৪। চতুর্থ আপত্তি—আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রমতে সূর্য্য ভ্রমণ করে, কিন্তু য়ুরোপীয়দিগের মতে পৃথিবী ভ্রমণ করে, এ জন্য য়ুরোপীয়দিগের গণনা গ্রাহ্য নহে।

উত্তর—পৃথিবীর ভ্রমণই প্রাচীন সিদ্ধান্তকারদিগের অভিপ্রেত। পৃথিবীর ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই তাঁহারা গ্রহভগণাদি নির্ণয় করিয়াছেন এবং সেই ভগণের আশ্রয়েই সকল প্রকার গণনা হইতেছে। বুধ ও শুক্রের পঠিত পাত্ত

ভগণের সহিত তাহাদের শীঘ্র কেন্দ্র-ভগণ যোগ করিয়া পাত আনয়নের উপায় সিদ্ধান্তকারগণ লিখিয়াছেন,—পৃথিবীর ভ্রমণ স্বীকার না করিলে তাহার উপপত্তিই হয় না। পৃথিবীর ভ্রমণ সিদ্ধান্তকারদিগের অভিপ্রেত হইলেও তাঁহারা লোকপ্রতীতির জন্য সূর্য্যের ভ্রমণই বলিয়াছেন, ইহাতে গণনার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বহু প্রাচীন ভারতগৌরব আর্য্যভট বলিয়াছেন, —নৌকার আরোহিগণ তীরস্থ পর্ব্বতকেও যেরূপ নৌকার বিপরীতদিকে গমনকারী মনে করে, সেইরূপ পৃথিবীরই পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ভ্রমণহেতু আমরা নক্ষত্র প্রভৃতিকে পশ্চিমগামী মনে করি। তাঁহার উক্তি এই—

অনুকূলগতিনৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোমগং যদ্বৎ।
অচলানি ভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াং ॥

আর্য্যভটের পরবর্ত্তী লল্লাচার্য্য, শ্রীপতি প্রভৃতি কুযুক্তি-দ্বারা পৃথিবীর ভ্রমণ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিলেও গ্রহভগণ তাহাই ঠিক রাখিয়াছেন, সুতরাং পৃথিবীর ভ্রমণ-স্বীকারেই বর্ত্তমানকালেও আমাদের পঞ্জিকা প্রভৃতি গণিত হইতেছে। বাপুদেব শাস্ত্রী মহোদয় প্রাচীন জ্যোতিষাচার্য্যাশয়বর্ণন নামক পুস্তকে স্পষ্টভাবে ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা হইতে কিঞ্চিদুদ্ধৃত হইতেছে।

ভারতবর্ষীয়াঃ সকল মূলগ্রন্থকারাঃ, সর্ব্বে গ্রহান্তরণীং পরিতো ভ্রমন্তীত্যভিপ্রেত্য গ্রহপাতভগণান্ নিরণায়িষতেত্যেতদুপপাদনার্থমুচ্যতে................অতএব ভৌমাদীনাং পঞ্চাণামপি গ্রহাণাং সূর্য্যকেন্দ্রকং ভ্রমণং মূলকারাণা অভিমতমিত্যবসীয়তে। অন্যথা তন্মতীয় পাতভগণপঠনানৌচিত্যাৎ ন চ............ ...সূর্য্যমভিতো গ্রহভ্রমণমভিপ্রায়তা মাধ্বাচার্য্যানাং ভূমিং পরিতো ভ্রমণপ্রদর্শনমসঙ্গতমিতি বাচ্যং, লোক-প্রতীত্যনুসৃতয়ে লাঘবেন গোলস্থিত্যবগতয়ে চ সূর্য্যধর্ম্মাণাং ধরণ্যামারোপণস্য তৈরঙ্গীকরণাৎ। তদেব আরোপরসিকা আচার্য্যা বোধলাঘবং লোক-প্রতীতিং চানুসরন্ত এব কল্পনালাঘবেন সিদ্ধে অপি তরণিসহিতস্য ভপঞ্জরস্য ধরণ্যাশ্চাচলত্ব-চলত্বে অন্যোন্যস্মিন্নারোপ্যৈব তরণিং ভচক্রং চ চলং ধরণীং চাচলাং বর্ণয়াঞ্চক্রুরিত্যপি প্রতীয়তে। ইত্যাদি।

য়ুরোপীয়গণ সূর্য্যের স্থিরতা ও পৃথিবীর ভ্রমণ নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিলেও যেমন তাঁহারাও সূর্য্যোদয় (Sunrise) ও সূর্য্যাস্ত (Sunset) প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন, সেইরূপ পৃথিবীর ভ্রমণস্বীকারে আমাদের গণনা চলিলেও সাধারণতঃ লোকে সূর্য্যের ভ্রমণ ও পৃথিবীর স্থিরতাই বলিয়া থাকে। সুতরাং বুঝা গেল, য়ুরোপীয় গণনা লইতে আমাদের কোন দোষ নাই।

[ক্রমশঃ।

গান।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস লিখিত।]

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

সপ্তম সাধন।

প্রথম সাধনের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া যত সংখ্যা মনে মনে গণনার সঙ্গে নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিবে, শ্বাসরোধ করিয়া তত সংখ্যা গণনা করিবে। শ্বাসত্যাগের সময় প্রতিবার কেবল নাসিকাদ্বারা শ্বাসত্যাগ না করিয়া একবার নাসিকা ও অন্যবার মুখ দিয়া ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণের সমান সংখ্যা গণনা করিতে করিতে শ্বাসত্যাগ করিবে। এইরূপ ক্রমে ১২বার শ্বাসগ্রহণ, রোধ ও ত্যাগ করিবে।

অষ্টম সাধন।

দ্বিতীয় সাধনের ন্যায় শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে যখন গ্রীবা ও মস্তক তৃতীয় চিত্রের ন্যায় পশ্চাদ্দিকে আসিবে, তখন শ্বাসরোধ করিয়া শ্বাসগ্রহণের সমান সংখ্যা গণনা করিতে করিতে মস্তক, গ্রীবা ও হস্তদ্বয় প্রথমাবস্থায় আনয়ন করিবে এবং সেই সমান সংখ্যাগণনার সহিত শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে চতুর্থ চিত্রের ন্যায় সম্মুখদিকে হেঁট হইয়া শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবে। শ্বাসত্যাগকার্য্য সপ্তম সাধনের ন্যায় একবার মুখ দিয়া ও অন্যবার নাসিকাদ্বারা সম্পন্ন করিবে। এই প্রক্রিয়া ১২বার করা কর্ত্তব্য।

নবম সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে। উভয় হস্তের অঙ্গুলীগুলি পরস্পর সন্নিবিষ্ট করিয়া নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা করিতে করিতে সন্নিবদ্ধ হস্তদ্বয় ক্রমে মস্তকোপরি উত্থিত করিয়া মস্তক উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তৎপশ্চাদ্ভাগে স্থাপন করিবে (দ্বাদশ চিত্র)। ক্রমে মস্তক ও গ্রীবা পশ্চাদ্দিকে যত দূর নিম্নে আসিতে পারে, তত দূর আনয়ন এবং শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবে। এখন শ্বাস রোধ করিয়া শ্বাসগ্রহণের সমান সংখ্যাগণনার সহিত ক্রমে মস্তক ও গ্রীবা সম্মুখে আনয়ন করিয়া চিবুক বক্ষে স্পর্শ করাইবে ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবার পর শ্বাসগ্রহণের সমান সংখ্যাগণনা করিতে করিতে মুখ দিয়া শ্বাসত্যাগ ও অঙ্গুলী সকলের সন্নিবেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রমে হস্তদ্বয় উভয় পার্শ্বে লম্বমান হইয়া প্রথমাবস্থায় অবস্থান হইলে শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনা শেষ হইবে। এই প্রক্রিয়া প্রতি চারিবারের পর চারিবার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্রমে ১২বার প্রক্রিয়া ও ১২বার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস লইবে।

দশম সাধন।

প্রথমাবস্থায় দণ্ডায়মান হইবে, কিন্তু পদদ্বয় দৈর্ঘ্যের তারতম্যানুসারে যেন ১৮ হইতে ২৪ ইঞ্চি ব্যবধানে অবস্থিত হয়। নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে হস্তদ্বয় দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ এবং ক্রমে পার্শ্ব দিয়া বিস্তৃতভাবে উত্তোলিত করিয়া স্কন্ধের সমান করিবে ও শ্বাসগ্রহণ এবং সংখ্যাগণনা শেষ হইবে। এখন শ্বাসরোধ করিয়া ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত মনে মনে গণনা করিতে করিতে কটিদেশ হইতে দেহের উপরিভাগ ক্রমে বামপার্শ্বে ফিরাইবে অথচ দেহের নিম্নভাগ ও পদদ্বয় যেন সম্মুখদিকে ঠিক থাকে (ত্রয়োদশ চিত্র)। এখন যত সংখ্যা গণনা করিয়া শ্বাসগ্রহণ করা হইয়াছিল, তত সংখ্যা গণনার সঙ্গে দেহের উপরিভাগ ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় ক্রমে বামদিকে নত ও বামজানু কুঞ্চিত করিয়া দেহের উপরিভাগের সম্পূর্ণ ভার বামপদের উপর ন্যস্ত করিবে এবং শ্বাসত্যাগ ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবে। (চতুর্দ্দশ চিত্র)। এই অবস্থা হইতে দ্বিতীয়বার শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনার সঙ্গে দেহের উপরিভাগ ও মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয় ক্রমে বামদিক হইতে উত্তোলিত করিয়া পুনরায় সম্মুখদিকে ও স্কন্ধের সমানে আনয়ন করিবে এবং শ্বাসগ্রহণ ও সংখ্যাগণনা শেষ করিবে। এইবার শ্বাসরোধ করিয়া ১ হইতে ১০ সংখ্যা পর্য্যন্ত গণনার সঙ্গে কটিদেশ হইতে দেহের উপরিভাগ দক্ষিণদিকে ফিরাইবে ও অন্যান্য প্রক্রিয়া পূর্ব্বে বামদিকে ফিরিয়া যেরূপ করা হইয়াছিল, তৎপরিবর্ত্তে দক্ষিণদিকে তদ্রূপ হইবে। এইরূপ একবার বামদিকে ও অন্যবার দক্ষিণদিকে ফিরিয়া চারিবার প্রক্রিয়ার, চারিবার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস, ক্রমে সর্ব্বসমেত ১২বার প্রক্রিয়া ও ১২বার সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস হইবে।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সাধন দশটি মাত্র দিলাম। এই দশটি সাধন সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করিতে প্রায় তিন মাস কাল অতিবাহিত হয়। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, দিবসে চারিবার করিয়া এই সাধন করা কর্ত্তব্য ; কিন্তু তিন মাস অতিবাহিত হইলে আর এক মাস দিবসে তিনবার এবং পঞ্চম মাস হইতে দিবসে দুইবার করিয়া ষষ্ঠ হইতে দশম সাধন পর্য্যন্ত পাঁচটি মাত্র সাধন অভ্যাস করিলেই চলিবে। তবে প্রতি সপ্তাহে একদিন করিয়া সকল সাধনগুলিই অভ্যাস করা উচিত।

শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম কিরূপে কতদিন করা কর্ত্তব্য।

য়ুরোপীয় প্রথার প্রায় সকল প্রকার শ্বাস সাধনাই এই দশটি সাধনার অনুরূপী। এই সাধনার আরও অধিক উন্নতিলাভ করিতে হইলে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিতে হয়। ঋষিদিগের এই শ্বাসসাধন প্রক্রিয়া হঠযোগান্তর্গত প্রাণায়াম নামে অভিহিত। পুরাকালে আর্য্যগণ সকলেই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেন। সেই জন্য তাঁহারা প্রায় সকলেই নীরোগ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন এবং সুস্থ শরীরে থাকিয়া সকল বিষয়ে উন্নতিলাভে সমর্থ হইতেন। তাঁহাদিগের প্রাণায়াম অভ্যাসের কার্য্যকরী ধারাবাহিক পদ্ধতি অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। সময় ও সুবিধা পাইলে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণের শ্বাসসাধনের উৎকর্ষতা।

শরীর অসুস্থ থাকিলে বিশেষতঃ সর্দ্দি কাশি হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসসাধন ও সঙ্গীত অভ্যাস বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য এবং যত শীঘ্র সর্দ্দি আরোগ্য হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। সর্দ্দি আরম্ভ হইলে তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিষেধক কর্পূরের ধূম আঘ্রাণ। একটি লৌহ অথবা পিতলের দর্ব্বী (হাতা) মধ্যে অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ সর্ষপ তৈল লইয়া অগ্নিসন্তাপে ফুটাইবে। তৈলের ফেনা মরিয়া আসিলে দর্ব্বী অগ্নি হইতে অপসারিত করিয়া সেই উত্তপ্ত তৈলে দশ গ্রেণ পরিমাণ কর্পূর নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহা হইতে কর্পূরের ধূম নির্গত হইতে থাকে। সেই ধূম নাসিকাদ্বারা আঘ্রাণ করিবে। তৈল কিঞ্চিৎ শীতল হইয়া আসিলে পুনরায় উত্তপ্ত করিয়া কিছু কর্পূর দিবে। এইরূপে তিন চারিবার কর্পূরের ধূম আঘ্রাণ করিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি উপশম হয়। যদি কিছু সর্দ্দি থাকে, তবে দিবসে দুই তিনবার ঐরূপ কর্পূরের ধূম ঘ্রাণ করিলে সর্দ্দি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যায়। কফপ্রধান ব্যক্তিগণ পানের সহিত কিছু কর্পূর সেবন করিলে কফ দমন থাকে।

শ্বাসপ্রশ্বাস ও সঙ্গীত-সাধনের নিষিদ্ধাবস্থা।

সর্দ্দির প্রতিষেধক।

কণ্ঠস্বর ও শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম প্রভৃতি সকলপ্রকার সাধন পরিসরযুক্ত নির্ম্মল বায়ু ও আলোকসম্বলিত স্বাস্থ্যকর গৃহে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বোক্ত শ্বাসপ্রশ্বাসব্যায়ামের ষষ্ঠ সাধন অভ্যাস হইবার পর সপ্তম সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর সাধনার যে কয়েকটি পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনা আবশ্যক, তাহা অগ্রে উল্লেখ করিয়া করিয়া পরে প্রকৃত স্বরসাধনবিষয় আলোচনা করিব।

কণ্ঠস্বর সাধনের গৃহ।

কণ্ঠস্বর সাধনার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন ও যে সময়ে তাহা আরম্ভ করা উচিত।

প্রথম সাধন।

একটি দর্পণের সম্মুখে এইরূপে দণ্ডায়মান হইবে, যেন নিজমুখ তাহা হইতে তিন ইঞ্চি ব্যবধানে থাকে এবং নাসিকাদ্বারা বেগে শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক বক্ষ বায়ুপূর্ণ করিবে। পরে এক ইঞ্চি পরিমাণ মুখ খুলিয়া তদ্দ্বারা এরূপ ধীরে ধীরে সমস্ত শ্বাসত্যাগ করিবে, যাহাতে মুখনির্গত বাষ্পের দাগ দর্পণে না লাগে। এই শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ ছয়বার করিবে।

দ্বিতীয় সাধন।

পূর্ব্ববৎ দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবে। জিহ্বা উল্টাইয়া তালুমূলে তাহার অগ্রভাগ যতদূর আসিতে পারে, তাহা আনিবে ও মুখ দিয়া অল্প বেগে শ্বাসগ্রহণ করিয়া বক্ষ বায়ুপূর্ণ হইলে জিহ্বাগ্র নিম্নপংক্তির দন্তমূলে স্থাপনপূর্ব্বক মুখ দিয়া এরূপ বেগে শ্বাসত্যাগ করিবে, যাহাতে দর্পণে বাষ্পের দাগ না লাগে। এই প্রক্রিয়া ছয়বার করিবে।

তৃতীয় সাধন

দ্বিতীয় সাধনের ন্যায়। কেবল শ্বাসত্যাগের সময় বিনা স্বরসংযোগে অর্থাৎ চুপি চুপি "আ" শব্দ চারিবার উচ্চারণ করিয়া শ্বাসত্যাগ করিবে; এবং প্রথমবার "আ" উচ্চারণের পরবর্ত্তী প্রতিবার "আ" উচ্চারণের পূর্ব্বে প্রায় তিন চার সেকেণ্ড শ্বাসরোধ করিয়া থাকিবে। এই প্রক্রিয়া আট বার করিবে।

চতুর্থ সাধন।

তৃতীয় সাধনের ন্যায় কেবল "আ" শব্দের পরিবর্ত্তে "হা" শব্দ চুপি চুপি বলিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া আট বার করিবে।

পঞ্চম সাধন।

প্রথম সাধনের ন্যায় দর্পণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাসগ্রহণ করিয়া তাহা রোধ করিবে এবং এই শ্বাসরোধাবস্থায় ১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত মনে মনে গণনা করিয়া এরূপ ধীরে ধীরে মুখ দিয়া শ্বাসত্যাগ করিতে করিতে "আ" পরে "হা" চুপি চুপি বলিবে, যেন দর্পণে বাষ্পদাগ না লাগে। এই প্রক্রিয়া আট বার করিবে।

ষষ্ঠ সাধন

পঞ্চম সাধনের ন্যায়; তবে, শ্বাসগ্রহণের সময় দ্বিতীয় সাধনের মত জিহ্বা উল্টাইয়া জিহ্বাগ্র তালুমূলে স্থাপনপূর্ব্বক মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিতে হইবে এবং যতক্ষণ শ্বাসরোধ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জিহ্বা তালুমূলে অবস্থান করিবে, কেবল শ্বাসত্যাগের সময় জিহ্বাগ্র দন্তমূলে আনিবে। এই প্রক্রিয়া দশ বার করিবে।
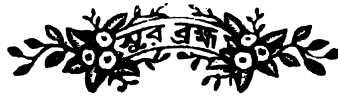
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

[শ্রীবিধুভূষণ মুখোপাধ্যায় লিখিত।]

ক্রিষ্টোফার কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে প্রত্যাগত হন। পোর্টুগালেশ্বর ফার্ডিনাণ্ড ও তদীয় মহিষী এই মহৎ কার্য্য সংসাধন করিবার জন্য তাঁহাকে ধন ও জন দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কলম্বস্ তাহার বিনিময়ে এই বদান্য রাজদম্পতিপদে তাঁহার নবাবিষ্কৃত ভূখণ্ড অর্পণ করেন। সেই সময় হইতে আমেরিকা পোর্টুগালের অধীন রাজ্য হইল। পোর্টুগীজ বণিক্‌গণ জানিতে পারিলেন যে, সে দেশের মাটীতে প্রচুর পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায়। তাঁহারা দলে দলে জাহাজ সাজাইয়া স্বর্ণ অন্বেষণ করিতে আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই বিপদসঙ্কুল সমুদ্রযাত্রা করিয়া অনেকে আমেরিকা হইতে আশাতিরিক্ত স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে আসিয়া আজীবন রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করিতেছিলেন। এই সময় ডম্ জ্যাও নামে এক ধনীর সন্তান প্রলুব্ধ হইয়া স্বর্ণঅন্বেষণে আমেরিকা যাত্রা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া পোতক্রয় করিলেন। অনেক নির্ভীক যুবা অল্পকালমধ্যে ধনেশ্বর হইবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দেন। বহুকালব্যাপী জলযাত্রার উপযোগী দ্রব্যজাত সংগৃহীত হইলে তাঁহারা সকলেই দেশত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

ডম্ জ্যাওর এক জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তাঁহার নাম ডম্ পিড্রো। পিড্রো অতীব বিচক্ষণ ও শান্তস্বভাব ছিলেন। যখন তিনি শুনিলেন, ভ্রাতা স্বর্ণপিণ্ড সংগ্রহ করিবার জন্য আমেরিকা যাইতে উদ্যত, তিনি তাঁহাকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের কথা মান্য করা দূরে থাকুক, তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া ভীরু—কাপুরুষ ইত্যাদি বচনে অভিহিত করিয়া অপমান করিতে ক্রটি করিলেন না। পিড্রো যখন বুঝিলেন যে, ভ্রাতা কোনমতেই সমুদ্রপারে যাইতে বিরত হইবে না, তখন তিনিও নিজে ভ্রাতা ও ভ্রাতার সঙ্গিগণসহ আমেরিকা যাইবেন বলিয়া কনিষ্ঠের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কনিষ্ঠ কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে লইতে সম্পূর্ণ অসম্মত। পিড্রো অনেক অনুনয়-

বিনয় করিলেন। জ্যাও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি কনিষ্ঠকে অনেক অর্থ জাহাজভাড়া দিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইবার অনুমতি পাইলেন।

পিডুরো সঙ্গে লইলেন—অনেক শস্য, পাঁচ ছয় জন চাষী, দুই তিন জোড়া বলদ, কতকগুলি মেষ ও কুকুটাদি গৃহপালিত পক্ষী এবং এক শত বিঘা জমী চাষ করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদি। জ্যেষ্ঠের সঙ্গে যাইবার জন্য এই সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজন হইতেছে জানিতে পারিয়া কনিষ্ঠ সঙ্গিগণসহ হাসিয়া আকুল। ভ্রাতাকে সমুদ্রপারে চাষের জিনিষ লইয়া যাইবার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। পিড্রো তাহাতে বলিলেন যে, যখন তিনি উপযুক্ত পোতভাড়া দিয়া যাইতেছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় জানিবার কাহারও অধিকার নাই। আর যদি জানিতে হয়, তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত স্থানে গিয়া সকলে তাহা জানিতে পারিবেন। যাহা হউক, উভয় ভ্রাতা সঙ্গিগণসহ পোতারোহণে আটলাণ্টিক মহাসাগর পার হইয়া যথাসময়ে আমেরিকা পৌছিলেন।

সেখানে উপস্থিত হইয়া পিড্রো সমুদ্রতীরের অনতিদূরে উর্ব্বরা ভূখণ্ড নির্ব্বাচিত করিয়া ভৃত্যগণদ্বারা তাহা ঘিরিয়া ফেলিলেন। পরে তাহার একপার্শ্বে অনেকগুলি ঘর নির্ম্মিত হইল, সে ঘরগুলি দ্রব্যাদি রাখিবার এবং পশ্বাদি ও আপনাদের বাসের পক্ষে পর্য্যাপ্ত। উপযুক্ত সময়ে ভূমিকর্ষণ করিয়া তাহাতে গম, কলাই প্রভৃতি শস্য বপন করা হইল। জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া জ্যাও অবিলম্বে সঙ্গিগণসহ স্বর্ণখনির উদ্দেশে খাদ্যদ্রব্যাদিসহ দেশমধ্যে রওনা হইলেন। এই সময় আমেরিকার সর্ব্বস্থানেই জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই দুর্গম অরণ্যানীর মধ্যে স্থানে স্থানে অসভ্য আদিম-নিবাসিগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী। অসভ্যগণ সর্ব্বথা শ্বেতকায় বিদেশীদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিত। তাঁহারা এই প্রকার বিপদসঙ্কুল দেশের মধ্যে বহুদূর যাইয়াও স্বর্ণখনি পাইলেন না। স্থানে স্থানে দেখিলেন, কেবল স্বর্ণখনির শূন্যগর্ভ খাদ। বহুদিন পূর্ব্বে তাহা হইতে তাঁহাদের স্বদেশবাসিগণ স্বর্ণ আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কোথাও আশানুরূপ সুবর্ণময় ভূমি না পাইয়া তাঁহারা দেশের আরও অভ্যন্তরপ্রদেশে যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু সম্মুখে অতি দুর্গম প্রদেশ। নানাপ্রকার হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ বনভূমি। খাদ্যাদিও ক্রমে শেষ হইয়া আসিতেছে। এই সমস্ত কারণবশতঃ জ্যাওর সঙ্গিগণমধ্যে কেহ কেহ আর অধিকদূর যাইতে অসম্মত হইলেন। তিনি কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিদ্রূপের আশঙ্কা করিয়া সঙ্গিগণকে উৎসাহিত করিয়া সমুদ্রতীরে ফিরিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন এবং আর অল্পদূর গমন করিলে তাঁহাদের এতদিনের পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ সুবিস্তীর্ণ সুবর্ণময়ী ভূমি পাওয়া যাইবে, তাহা তাহাদিগকে বার বার বুঝাইয়া দিয়া সকলের সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এই প্রকারে পর্য্যটন করিতে করিতে চারিমাস পরে তাঁহারা প্রচুর সুবর্ণমিশ্রিত মৃত্তিকাময় স্থানে আসিয়া উপস্থিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাঁহাদের সঙ্গের খাদ্যাদি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক, দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা অতি অল্পকালমধ্যে ইচ্ছামত স্বর্ণপিণ্ড সংগ্রহ করিয়া সকলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পথে খাদ্যদ্রব্য একেবারে শেষ হইল। এমন কিছু রহিল না, যাহাদ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে পারা যায়। ফলমূলাদি আহার করিয়া এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। তাহাও পথের অনেক অংশে দুষ্প্রাপ্য। অখাদ্য খাইয়া অনেকে রোগগ্রস্ত হইলেন। দুই চারি জন পথে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া অনাহার ও রোগযন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা অনাহারে পথশ্রমে মৃতকল্প হইয়া সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত।

এই সময়ের মধ্যে পিড্রোর ক্ষেত্রে প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। মেষাদি পশুপক্ষী চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। সেই জনহীন স্থানে পিড্রোর নিকট ভিন্ন অন্য কোন স্থানে খাদ্য পাওয়া যায় না। অগত্যা স্বর্ণ-অন্বেষণকারী সকলকে আসিয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইল। পিড্রো জানিতেন যে, তাঁহার অদূরদর্শী ভ্রাতা ও তাঁহার সঙ্গিগণের শেষ এই দশা হইবে। বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রচুর পরিমাণ খাদ্যাদি প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভ্রাতাকে জীবিত দেখিয়া তিনি মনে মনে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন; কিন্তু বাহ্যিক সন্তোষের কোন চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা খাদ্যসামগ্রী প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ইহাও বলিলেন যে, বিনিময়ে মাংসাদি খাদ্যের সমান ভার স্বর্ণপিণ্ড না দিলে তাহা পাওয়া যাইবে না। এই অযথা মূল্যের কথা শুনিয়া সকলেই মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু উপায়ান্তর নাই, সকলেই অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। কাযেই পিড্রোর প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া আপন আপন স্বর্ণপিণ্ড বিনিময়ে সকলেই খাদ্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সকলেরই কষ্টলব্ধ সোনার ঢেলা শেষ হইল। রহিল কেবল জাহাজখানি। কিন্তু দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে ত? কাযেই তাহার মূল্য অবধারিত করিয়া সকলের জন্য খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হইল।

পিড্রো তদ্দেশবাসী উপযুক্ত লোকের উপর সেখানকার চাষবাসের ভার দিয়া অধিকাংশ দ্রব্যাদি জাহাজে উঠাইয়া সকলের সঙ্গে দেশাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে আর কোন কথা হইল না। অনুকূল বায়ুর সাহায্যে সত্বর সকলে পোর্টুগাল পৌছিলেন। তখন পিড্রো ভ্রাতাসহ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদিগকে স্বর্ণ

অন্বেষণ করিবার জন্য যাইতে নিষেধ করিয়াছিলাম। তোমরা আমার কথা উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলে। ভাব দেখি! আমি যদি না যাইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা দেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতে না। খাদ্যাভাবে সেইখানেই তোমাদের মরিতে হইত। নিশ্চয় জানিও, আমি তোমাদের স্বর্ণপিণ্ডলাভের আশায় সেখানে যাইয়া চাষ করি নাই। তোমাদের পরিণাম ভাবিয়া খাদ্যাদির সংস্থান করিতে সেখানে গিয়াছিলাম। যাহারা খাদ্যাভাবে অখাদ্য খাইয়া রোগগ্রস্ত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি। এক্ষণে আপন আপন কষ্টলব্ধ ধন গ্রহণ কর। মনে রাখিও, পৃথিবীর সকল স্থানের মাটিতে স্বর্ণ অর্থাৎ ধন আছে। যে সংগ্রহ করিতে জানে, তাহার সমুদ্র পারে যাইবার আবশ্যক হয় না।”—এই বলিয়া তিনি সকলকে আলিঙ্গন করিয়া প্রত্যেকের স্বর্ণপিণ্ড প্রত্যর্পণ করিয়া বিদায় করিলেন।

দিয়াশলাই।

দিয়াশলাই বা দেকাঠী আজকাল আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক দ্রব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার সময় দিয়াশলাইয়ের বাক্সটি বালিসের নীচে বা হাতমহড়ার কোন স্থানে রাখিয়া নিদ্রা যাওয়াই বিধি। প্রয়োজন হইলে ঘর্ষণ-দ্বারা অনায়াসেই আলো জ্বালা যাইতে পারে। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে পাতকাঠীর মুখে গন্ধক লাগাইয়া দেশালাই প্রস্তুত করা হইত। ঘরেই তুঁষ ও ঘুঁটের সজ্জিত মালসা থাকিত। মালসায় প্রধূমিত অগ্নি থাকিত। তখন আবশ্যক হইলে লোক সেই গন্ধকমুখ পাতকাঠী বা পাকাঠী আগুনের মালসায় ধরিত। গন্ধক জ্বলিয়া পাকাঠী ধরিত। লোক রাত্রিতে আবশ্যক হইলে তাহা দিয়া প্রদীপ জ্বালিত। আধ পয়সার গন্ধকে আর বিনা পয়সার পাতকাঠীতে তখন যে পরিমাণ দেশলাই প্রস্তুত হইত, তাহাতে মাঝারি রকম গৃহস্থের বোধ হয় এক বৎসর চলিয়া যাইত, কোন কষ্ট হইত না। সে কালের সরল সভ্যতার একটা লক্ষণ এই ছিল যে, সকলেই নিজের আবশ্যক জিনিসপত্র নিজেই তৈয়ারী করিয়া লইত, অধিকাংশ অত্যন্ত আবশ্যক জিনিষের জন্য লোককে পরের নিকট নগদ পয়সা ফেলিতে হইত না। যাহাতে নগদ পয়সার অভাবেও সংসার চালান যায়, হাতে পয়সা না থাকিলে মুখে মাছি না ঢুকে, সেইরূপই ব্যবস্থা ছিল, কাজেই সে কালে এত হাহাকার ছিল না। তখন পয়সার জন্য লোককে পরকাল খোয়াইতে হইত না।

তবে সে কালের সেই সোজা দেশালাইয়ের একটু অসুবিধাও যে না ছিল, তাহা নহে। বিছানার মাথার কাছে আঁটিবাঁধা গন্ধক-দেশালাই বাঁধা থাকিত আর আগুনের মালসাটা বিছানা হইতে কিছু দূরে রক্ষিত হইত। অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া দেকাঠী টানিয়া লইয়া শয্যা হইতে উঠিতে হইত এবং তথা হইতে বীরবিক্রমে পাঁচ ছয়বার চরণ বাড়াইয়া আগুনের মালসার সন্নিহিত হইতে হইত, তৎপরে দেশলাইয়ের সহিত অগ্নির গাঢ়সংযোগ সম্পাদন করিলে তবে আলো জ্বলিত। সুতরাং তাহার আখড়াইটা বড়ই জটিল ছিল। আর হাল আমলের দেশলাই কিবা চমৎকার! বালিসের নীচে হইতে টানিয়া লইয়া ফস্ আর অমনই দপ্! কোন বালাই নাই। কাজেই বিলাতী দেশলাই প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হইল। এই দেশলাই জ্বালিতে আর অন্ধকারে গৃহের মেঝেয় পদন্যাস করিতে যাইয়া সর্পদষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, গৃহে প্রবিষ্ট তস্কর মহাশয়ের হস্তে বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। এমন সুযোগ কে ছাড়িবে?

এই সুবিধাটুকুর জন্য আমাদের বৎসর বৎসর কত টাকা বিদেশীকে গণিয়া দিতে হইতেছে, তাহার একটা খতিয়ান করিয়া দেখা আবশ্যক। ১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দে এই ভারতে বিদেশ হইতে দেড় শত কোটি গ্রোস দেশালাই আমদানী হইয়াছে। বারোটায় এক ডজন হয়, বারো ডজনে এক গ্রোস হইয়া থাকে। অতএব অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে ১ শত ৪৪টিতে এক গ্রোস হইয়া থাকে। সুতরাং আলোচ্য বর্ষে ২১ হাজার ৬ শত কোটি বাক্স দেশলাই বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে অর্থাৎ আমাদের দেশের বালক-বৃদ্ধ-বনিতানির্ব্বিশেষে প্রত্যেক লোক গড়ে প্রায় ৭ শত বাক্স দেশালাই খরচ করিয়াছে। ঐ বৎসর ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের দেশালাই ভারতে আমদানী হইয়াছে অর্থাৎ এই আগুন জ্বালিবার সুবিধাটুকুর জন্য আমাদিগকে প্রায় এক কোটি টাকা প্রতি বৎসর বিদেশীকে গণিয়া দিতে হইতেছে! যে দেশ হইতে এত টাকা বিদেশে বাহির হইয়া যায়, সে দেশ গরীব হইবে না ত গরীব হইবে কোন্ দেশ?

কোন্ দেশ হইতে কোন্ বৎসর কত টাকার দেশালাই আমদানী হইয়া থাকে, সরকার তাহার একটা করিয়া তালিকা বাহির করিয়া থাকেন। নিম্নে আমরা তাহার একটা হিসাব দিলাম। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে সরকারের যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই বৎসর ও তাহার পূর্ব্বের দুই বৎসর—এই তিন বৎসরে গড়ে কোন দেশ হইতে কত পাউণ্ডের দেশালাই এ দেশে আসিয়াছে, তাহার তালিকা দেখুন :—

দেশের নাম	মূল্য পাউণ্ড হিসাবে
জাপান হইতে	১ লক্ষ ৪১ হাজার পাউণ্ড
সুইডেন হইতে	১ ,, ৮২ ,, ,,
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী হইতে	৬১ ,, ,,
নরওয়ে হইতে	৬৩ ,, ,,
জার্ম্মাণী হইতে	২১ ,, ,,
বেলজিয়াম হইতে	৯ ,, ,,
ইংলণ্ড হইতে	৫ ,, ,,
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট হইতে	১৯ ,, ,,
অন্যান্য দেশ হইতে	১ ,, ,,
মোট	৫ লক্ষ ৬২ হাজার পাউণ্ড

১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দের হিসাবটাও একবার দেখিয়া লউন :—

জাপান হইতে	২ লক্ষ ৬১ হাজার পাউণ্ড
সুইডেন হইতে	২ ,, ৯ ,, ,,
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী হইতে	৫৫ ,, ,,
নরওয়ে হইতে	৭৬ ,, ,,
জার্ম্মাণী হইতে	২২ ,, ,,
বেলজিয়াম হইতে	১৬ ,, ,,
ইংলণ্ড হইতে	৪ ,, ,,
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট হইতে	১২ ,, ,,
অন্যান্য দেশ হইতে	১ ,, ,,
মোট	৬ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড

এই বৎসরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকার দেশালাই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছিল। উহার মূল্য হইয়াছিল—৬ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউণ্ড। এক পাউণ্ডের মূল্য পনর টাকা। সুতরাং এই হিসাবে ৯৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার দেশালাই ঐ বৎসর বিদেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছে।

ইহার পর দেশালাই আমদানী হ্রাস পাইতে থাকে। ১৯১৩—১৪ খৃষ্টাব্দে কোন্ দেশ হইতে কত দেশালাই আমদানী হয়, তাহারও তালিকা দেখুন :—

জাপান হইতে	২ লক্ষ ৬০ হাজার পাউণ্ড
সুইডেন হইতে	১ ,, ৮২ ,, ,,
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী হইতে	৬৪ ,, ,,
নরওয়ে হইতে	৪৭ ,, ,,
জার্ম্মাণী হইতে	১৭ ,, ,,
বেলজিয়াম হইতে	১৪ ,, ,,
ইংলণ্ড হইতে	৬ ,, ,,
ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্ট হইতে	৫ ,, ,,
অন্যান্য দেশ হইতে	২ ,, ,,
মোট	৫ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউণ্ড

ইহার পর যুদ্ধ বাধে। এ দিকে ভারতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৫ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ঐ আইনের নাম Indian White Phosphorus Matches Prohibition Act অর্থাৎ শ্বেত ফস্‌ফরাস্ হইতে প্রস্তুত দেশালাই রহিতের আইন। ঐ আইন অনুসারে ভারতে শ্বেত ফস্‌ফরাস্ হইতে দেশালাই প্রস্তুত করা এবং বিদেশ হইতে ঐ প্রকার দেশালাইয়ের আমদানী করা নিষিদ্ধ হইয়া যায়। যাহারা শ্বেত ফস্‌ফরাস্ হইতে দেশালাই প্রস্তুত করে, তাহারা এক প্রকার অস্থিরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। সেই জন্য কোন সভ্যদেশেই ঐ প্রকার দেশালাই ব্যবহার করা হয় না। ভারতবর্ষে ঐ সভ্যদেশসম্মত ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সরকার বাহাদুর এই আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। জাপানে, নরওয়েতে এবং সুইডেনে এই প্রকার দেশালাই প্রস্তুত হইত। শেষোক্ত দুইটি দেশের অধিবাসীরা ঐ দেশালাই ব্যবহার করেন না, তাঁহারা কেবল বিদেশে রপ্তানীর জন্য ঐরূপ দেশালাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ঐ ধরণের দেশালাই বালিস প্রভৃতির নীচে রাখিলে উহা জ্বলিয়া উঠিয়া বিষম বিপদ্ ঘটায়। অনেক সময় লোকের পকেটে ঐ প্রকার দেশালাই জ্বলিয়া উঠিয়াছে শুনা যায়। সুতরাং ঐ প্রকার দেশালাইয়ের আমদানী ও প্রস্তুতকার্য্য রহিত করিয়া সরকার বড় ভাল কাজই করিয়াছেন।

এখন শ্বেত ফস্‌ফরাস্ হইতে প্রস্তুত দেশালাইয়ের আমদানী বন্ধ হওয়াতে লোক অন্য প্রকার দেশালাই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু সুইডেন এবং নরওয়ে হইতে দেশালাই আমদানী অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধ বাধিয়া উঠাতে অষ্ট্রীয়া, হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম এবং জার্ম্মাণী হইতে দেশালাইয়ের আমদানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধ আরব্ধ হইবার কিছুদিন পর পর্য্যন্তও ঐ সকল দেশ হইতে সামান্য কিছু দেশালাই আসিয়াছিল, এখন একবারে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পক্ষান্তরে জাপান হইতে দেশালাইয়ের আমদানী বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

...যুদ্ধের ফলে দেশালাইয়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, অনেকে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেশালাইপ্রস্তুতের অনেক উপকরণ পাওয়া এখন কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। বাক্স মুড়িবার কাগজও পাওয়া যাইতেছে না। তাহার উপর আমদানীর গোলযোগ ও অসুবিধাও কিছু আছে। এখন কলিকাতার বাজারে দেশালাইয়ের দর দ্বিগুণেরও উপর হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সুইডেনের দেশালাইয়ের গ্রোস সাড়ে বার আনা—তের আনা ছিল, এখন তাহা প্রায় দুই টাকা গ্রোস হইয়াছে! জাহাজ মার্কা, দোয়ানী মার্কা দেশালাই খুচরা একটা এক পয়সা সকল সময় পাওয়া যায় না! দেশালাই চিরকালই খুচরা একটু চড়া দরে বিকায়। জাপানী দেশালাইই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা।

যুদ্ধের পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়ার পাইপ, রেক্স, রিনাউণ্ড, সিগার, কাঁচি মার্কা দেশালাই কলিকাতায় সাড়ে এগার আনা গ্রোস পাইকারী দরে বিকাইত।

হনুমান, ল্যাম্প, করাত ও তিন চাবী এগার আনা গ্রোস ছিল।

গন্ধক-দেশালাইয়ের মধ্যে ইশাভই দেশালাই, বর্শাতি ও কৌড়ি মার্ক দেশালাই এগার আনা গ্রোস এবং :পাজাৎজি ও টেলিগ্রাফচিহ্নিত দেশালাই সাড়ে দশ আনা গ্রোস বিকাইত।

জার্ম্মাণী হইতে লাল, নীল, শাদা প্রভৃতি আলোকওয়ালা বাজীর দেশালাই আসিত। তন্মধ্যে বেঙ্গল লাইট দেশালাই প্রতি গ্রোস এক টাকা চৌদ্দ আনা এবং বৃলিয়াণ্ট ষ্টার ম্যাচেজ দুই টাকা চারি আনা দরে গ্রোস বিকাইত। আমোদ-উৎসবের সময় এই জাতীয় দেশালাইয়ের অনেক কাট্‌তী হইত। এখন ভারতেও এই প্রকার বাজীর দেশালাই প্রস্তুত হইয়া থাকে। উহারও যথেষ্ট কাট্‌তী হইয়াছে। ভারতে প্রস্তুত বেঙ্গল লাইট ম্যাচেজের মূল্য ১।৵০ গ্রোস এবং বৃলিয়াণ্ট ষ্টারের মূল্য ১৸৵০ গ্রোস। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ, জার্ম্মাণী হইতে আমদানী ঐ প্রকার আতসবাজীর দেশালাই অপেক্ষা ভারতে প্রস্তুত ঐ ধরণের দেশালাই বিশেষ হীন নহে।

ভারতে দেশালাইয়ের যেরূপ কাট্‌তী, তাহাতে এদেশে দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে অনায়াসেই চলিতে পারে। তবে ইহা উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক এবং ইহার উপযোগী কাঠ বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মিঃ R. S. Troup ইণ্ডিয়ান ফরেষ্ট মেময়ারে দ্বিতীয় ভলমের ১ম অংশে ইহার কথা আলোচনা করিয়াছেন। উহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, ভারতে দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত করিলে চলেও ভাল, লাভও হয় বেশ। তবে ভাল লোকদ্বারা কাজ চালাইতে হইবে। দেশালাইয়ের উপযোগী কাঠের বিষয়টির এখনও চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। তবে এ দেশে যে কয়টি দেশালাইয়ের কল আছে, তাহার প্রস্তুত দেশালাই দেখিলে মনে হয়, কাঠের হাঙ্গামায় দেশালাই প্রস্তুত আট্‌কাইবে না। সরকারী বাণিজ্য-বিভাগ হইতে যে পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অল্প মূলধন লইয়া এই কাজ আরম্ভ করিলে ক্ষতি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ এই সকল কাজে প্রথমেই অধিক খরচ করিতে হয়। এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের বাঙ্গালায় যে কয়টি দেশালাইয়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়া অকালমৃত্যু বরণ করিল, তাহাদিগকে এই সুযোগে জাগাইয়া তোলা কি সম্ভব নহে?
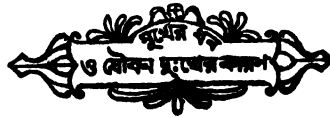
কালমেঘ।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

যবতিক্তা, শঙ্খিনী, তিক্তফলা, সূক্ষ্মপুষ্পী প্রভৃতি কালমেঘের সংস্কৃত নাম। কোন কোনও স্থানে ইহাকে কল্পনাথও বলে। ইহা শিশুদিগের পরম হিতকর।

> "যবতিক্তা শঙ্খিনী তু দৃঢ়পাদা বিসর্পিণী।
> নাকুলী চাক্ষপীড়া চ নেত্রমীলা যশস্বিনী॥
> শঙ্খিনী কটুতিক্তাম্লা গুরুস্নিগ্ধা বিশোধনী।
> ত্রিদোষশমনী কুষ্ঠশ্বয়থূদরনাশিনী॥"
>
> (ধঃ নিঘণ্টুঃ।)

যবতিক্তা, শঙ্খিনী, দৃঢ়পাদা, বিসর্পিণী, নাকুলী, অক্ষপীড়া, নেত্রমীলা ও যশস্করী, এইগুলি কালমেঘের নামান্তর। ইহা কটু, তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, গুরু, স্নিগ্ধ, শোধন অর্থাৎ শরীরের মলনিঃসারক, ত্রিদোষপ্রশমক, কুষ্ঠ, শোথ ও উদররোগনাশক।

> "যবতিক্তা সতিক্তাম্লা দীপনী রুচিকৃৎপরা।
> ক্রিমিকুষ্ঠবিষামাস্রদোষঘ্নী রেচনী চ সা॥"
>
> (রাজনিঘণ্টুঃ।)

যবতিক্তা অর্থাৎ কালমেঘ তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, অগ্নিবৰ্দ্ধক ও রুচিজনক এবং ইহা ক্রিমি, কুষ্ঠ, বিষদোষ, আমদোষ ও রক্তদোষনাশক এবং রেচক।

> "যবতিক্তা মহাতিক্তা শ্বেতবুহ্ণা তু শঙ্খিনী।
> সূক্ষ্মপুষ্পা তিক্তফলা যাবী তিক্তা যশস্বিনী॥
> তিক্তাম্লা দীপনী রুচ্যা রেচনী চ বিষাস্রনুৎ।
> ক্রিমিকুষ্ঠজ্বরহরী বালানাং শুভদায়িনী॥"
>
> (ভাবপ্রকাশঃ।)

যবতিক্তা, মহাতিক্তা, শ্বেতবুহ্ণা, শঙ্খিনী, সূক্ষ্মপুষ্পা, তিক্তফলা, যাবী, তিক্তা ও যশস্বিনী, এইগুলি কালমেঘের পর্য্যায়বাচক।

ইহা তিক্তাম্লরস, অগ্নিদীপক, রুচিজনক ও রেচক এবং ইহাতে বিষদোষ, রক্তদুষ্টি, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহা বালকদিগের পরম হিতকর।

শিশুদিগকে বয়ঃক্রমানুসারে ১০ হইতে ৩০ ফোঁটা পর্য্যন্ত কালমেঘের রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করাইলে যকৃৎ দোষ, অগ্নিমান্দ্য, অস্বাভাবিক মলনিঃসারণ প্রভৃতি দোষ সমূলে বিনষ্ট হয়।

আজকাল শিশুদিগের সামান্য একটু বিকৃত মল দেখিলেই চিকিৎসক ডাকা হয়, কিন্তু পূর্ব্বে প্রাচীন গৃহিণীগণ নিতান্ত কঠিন ব্যাধি না হইলে চিকিৎসকের শরণ লইতেন না। সামান্য সামান্য পীড়ায় তাঁহারা এই সমস্ত টোট্‌কা ঔষধের সাহায্যে যে পরিমাণ ফললাভ করিতেন, বর্ত্তমানে রাশি রাশি ঔষধপ্রয়োগেও তাদৃশ ফললাভ করিতে দেখা যায় না, বোধ হয়, শিশু ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতেই রাশি রাশি ঔষধপ্রয়োগ করিয়া তাহার রোগপ্রতিষেধক স্বাভাবিক বলকে খর্ব্ব করিয়া দেওয়াই ইহার অন্যতম কারণ।

এই যে কালমেঘসম্বন্ধে এত আলোচনা করা হইল, "বালানাং শুভদায়িনী" এই মহোপকারী দ্রব্য অতি সুলভ অথচ সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। পূজনীয়া গৃহলক্ষ্মীগণ যদি অন্ততঃ একবারও ইহার কার্য্যকারিতা শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই আমরা ধন্য হইব।

বিগত আষাঢ় মাসে আমার জনৈক আত্মীয় তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক শিশু পুত্রের চিকিৎসার জন্য আমাকে আহ্বান করেন। শিশুটি প্রায় ৩।৪ মাস যাবৎ জ্বর ও পেটের অসুখে ভুগিতেছিল, চিকিৎসায় সাময়িক উপকার হইত, আবার মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বভাব দেখা দিত। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার যকৃৎ সামান্য একটু বড় হইয়াছে এবং অনুসন্ধানেও যত দূর জানিতে পারিলাম, তাহাতে আমার বেশ বোধ হইল—এই যকৃৎ দোষই ব্যাধির মূল-কারণ। আমি কয়েকদিন চিকিৎসা করাতে তাহার জ্বর বন্ধ হইল এবং উদরাময়ও অনেক কমিয়া গেল। তখন আমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে ১০।১২ ফোঁটা কালমেঘের রস ৪।৫ ফোঁটা মধুর সহিত সেবন করাইবার ব্যবস্থা করি। এক মাস যাবৎ এইরূপ করায় শিশুটি সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এবং অদ্যাপি আর তাহার কোনও অসুখ হয় নাই।

আজকাল পাশ্চাত্য-চিকিৎসকগণও কালমেঘকে পরম সমাদরে ঔষধশ্রেণীভুক্ত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।

কথার গোপাল।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

দীনবন্ধু শর্ম্মা গ্রামের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। এক সময়ে তাঁহার ভূমিসম্পত্তির কিছু আয় ছিল। তাহাতে তাঁহার সংসারখরচও চলিত, অতিথিসেবা, পুরাণ পাঠ শ্রবণ, সামান্য সামান্য ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি বাবদ কিছু কিছু ব্যয়ও হইত। ব্রাহ্মণ ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সমস্ত আয়ই সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেন, দুর্দ্দিনের জন্য কিছুই জমা রাখিতেন না। এইরূপে আনন্দে তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত।

অকস্মাৎ দেশে আকাল উপস্থিত হইল। পর্জ্জন্যদেব সময়ে বারিদানে কার্পণ্য করিলেন, মাঠের ধান মাঠেই শুকাইল। সামান্য দুই চারি বিঘা জমীতে যাহা জন্মিয়াছিল, তাহা অগ্নিমূল্যে বিকাইতে লাগিল। দেশ জুড়িয়া হাহাকার উঠিল। অনেকে আহার্য্য না পাইয়া মরিতে বসিল।

দীনবন্ধু শর্ম্মার জমীতে সেবার কিছু ফসল হইয়াছিল। যাহা জন্মিয়াছিল, তাহাতে কষ্টে-সৃষ্টে দীনবন্ধুর দিন কাটিত। কিন্তু চারিদিকেই হাহাকার, আশে পাশে ক্ষুধিতের ক্রন্দন! দয়ালহৃদয় দীনবন্ধু চক্ষু মুদিয়া সেই অন্নগ্রাস মুখে তুলিতে পারিলেন না। বিশেষ তখন পয়সা দিলেও চাউল মেলা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন রেল ষ্টীমার ছিল না। দূরদেশ হইতে চাউল ধান আমদানী করা কতকটা সময়সাপেক্ষ ছিল। শীঘ্র ধান চাউল আমদানী হইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া গ্রাম্য মহাজন ধানের দর চড়াইয়া দিল। লোকের হাহাকার বাড়িল।

দীনবন্ধু পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, পাড়ার ছোট ছেলে মেয়ে কেহ যেন অভুক্ত না থাকে। তাহাদিগের সকলকে অন্ততঃ এক বেলা তিনি খাইতে দিবেন। ইহাতে তাঁহার সম্বৎসরের খরচের উপযুক্ত সঞ্চিত ধানের পরিমাণ কিছু কমিবে সত্য, কিন্তু নদীপথে ধান চাউল আমদানী হইলে তিনি কিছু ধান কিনিয়া সে অভাব পূর্ণ করিবেন।

দুর্ভিক্ষের সময় দান করিতে বসিলে উমেদারের অভাব হয় না। গরীব দীনবন্ধুকে দান করিতে দেখিয়া ভিন্ন পাড়া হইতেও কয়েকজন প্রতিবেশী আসিয়া তাহার নিকট ধর্ণা দিল। সৎকর্ম্মেরও একটা নেশা আছে। দয়ালু দীনবন্ধু শেষে গ্রামশুদ্ধ শিশুকেই অন্ন বিতরণ করিতে থাকিলেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার সঞ্চিত ধান্য নিঃশেষ হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে ঘাটে ধানের কিস্তি আসিল। ধান চাউলের দর কমিল। কিন্তু দর কমিলেও সকলের ধান কিনিবার সংস্থান ছিল না। কাজেই দীনবন্ধুর শিশু-অন্নসত্রের জনসংখ্যা কিছু কমিল সত্য, কিন্তু অনেকে থাকিয়া গেল। তিনি কিছু ধান খরিদ করিলেন। ক্রমে তাহাও ফুরাইল। ক্রমে গ্রামের মহাজনের নিকট তাঁহার জমী বন্ধক পড়িল।

(২)

আকাল কাটিয়া গিয়াছে। দীনবন্ধুর ক্ষুদ্র অন্নসত্রও আর নাই। কিন্তু তাঁহার যে সামান্য বিষয় ছিল, গ্রাম্য মহাজন তাহা দেনার দায়ে নীলাম করিয়া লইয়াছে। দীনবন্ধুর দিন আর যায় না। তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সপরিবারে উপবাস করিতে হয়। প্রতিবেশীরা তাঁহার কোন খোঁজ লয়ও না, পায়ও না।

সরলস্বভাব দীনবন্ধু স্থির করিলেন যে, তিনি বনে যাইয়া গোপালের আরাধনা করিবেন; গোপাল যদি দয়া করেন, তাহা হইলে এই দুঃখপারাবারে তিনি পার পাইবেন। নতুবা গোপাল গোপাল করিয়া বিজন বিপিনে তিনি দেহত্যাগ করিবেন।

গ্রাম হইতে বহুদূরে এক ঘোর বনে যাইয়া দীনবন্ধু গোপালকে ডাকিতে লাগিলেন। ডাকিতে ডাকিতে ভক্তিভরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান লোপ পাইল। তিন দিন তিন রাত্রি তিনি জ্ঞানহারা হইয়া কেবল গোপালকে ডাকিতে থাকিলেন। ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, বাহ্যজ্ঞান পর্য্যন্ত নাই! মুখে কেবল 'গোপাল' 'গোপাল' ধ্বনি। বৈকুণ্ঠে গোপাল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অমনই এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া দীনবন্ধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন; বলিলেন, "বৎস! গোপালকে ডাকিতেছ কেন?" দীনবন্ধু তাঁহাকে সমস্ত দুঃখের কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণবেশী গোপাল দীনবন্ধুর হাতে একটি পাথরের গোপাল দিয়া বলিলেন, "তোমার যখন যে দ্রব্যের প্রয়োজন হইবে, তুমি এই গোপালের নিকট হইতে তাহা চাহিয়া লইবে। অনাবশ্যক কোন জিনিসই ইঁহার নিকট চাহিবে না।"

হর্ষোৎফুল্ল দীনবন্ধু গোপালটি মাথায় করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে সন্ধ্যার সময় এক নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন। নগরে এক রাজবাড়ী ছিল। দীনবন্ধু তথায় যাইয়া আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজ-অনুচরগণ অতিথি-

সেবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আনিবার উদ্দেশে ভাণ্ডারার নিকট ছুটিল।

দীনবন্ধু হাত-পা ধুইয়া সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইলেন; পরে গোপালের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "গোপাল, আজ আমার উত্তম লুচির ফলার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" অমনই ব্রাহ্মণের সম্মুখে একখানি পাত্রে উত্তম গরম গরম লুচি, তরকারী এবং ফলাহারের জন্য আবশ্যক অন্যান্য সমস্ত দ্রব্যই উপস্থিত হইল।

ঠিক সেই সময় রাজানুচরগণ তথায় উপস্থিত হইল। তাহারা ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময়ে বিভোর হইয়া পড়িল। কথাটা রাজার কাণে উঠিতে বিলম্ব ঘটিল না। রাজাও ব্যাপার শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন এবং কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ যখন নিদ্রা যাইবে, তখন তোমরা আমাদের ঘরের গোপালটি তাহাকে দিয়া তাহার গোপালটিকে ঠাকুরবাড়ী খুব যত্ন করিয়া রাখিবে।"

(৩)

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ গোপাল মাথায় করিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে বাড়ীতে ফিরিলেন। গোপালের গুণের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীর আনন্দ আর গায়ে ধরে না। ব্রাহ্মণ স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া যথানিয়মে করযোড়ে বাটীর সকলের জন্য আবশ্যক অন্নব্যঞ্জন চাহিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্য বাতাসে মিলাইয়া গেল। পাথুরে গোপাল ব্রাহ্মণের প্রার্থনা পূর্ণ করিল না। ব্রাহ্মণ বার বার কাতর হইয়া গোপালকে স্তুতি নুতি করিতে লাগিলেন। কিছুতেই গোপালের পাষাণ-হৃদয় টলিল না।

তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গত-কল্য রাত্রিকালে কোথায় ছিলে?" ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, তিনি রাজবাড়ীতে অতিথি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তথায় সম্ভবতঃ কেহ তোমার গোপাল বদ্‌লাইয়া লইয়াছে।" কিন্তু আর উপায় কি? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া ব্রাহ্মণ পুনরায় বনগমনের সংকল্প করিলেন।

বনে যাইয়া ব্রাহ্মণ আবার পূর্ব্বের ন্যায় ঐকান্তিক-ভাবে গোপাল গোপাল করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গোপাল আবার বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে দীনবন্ধুকে দেখা দিলেন। ব্রাহ্মণ-বেশী গোপাল দীনবন্ধুকে কহিলেন, "তোমাকে কৌশলে সেই গোপালটি উদ্ধার করিতে হইবে। তুমি এক কাজ কর। আমি তোমাকে আর একটি ঠিক সেইরূপ গোপাল দিতেছি, এই গোপালটি কথা কহিতে পারে। এই গোপাল কথায় তোমার ইচ্ছামত সকল জিনিস দিতে চাহিবে, কিন্তু কাজে কিছুই করিবে না। এই গোপালকে লইয়া তুমি পুনরায় সেই রাজবাড়ীতে যাইয়া অতিথি হও এবং একান্তে এমনভাবে উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে আরম্ভ কর যে, তাহা শুনিয়া রাজার যেন সেই গোপালটি দিয়া এই গোপালটি লইবার লোভ জন্মে।"

(৪)

ব্রাহ্মণ পুনরায় এই দ্বিতীয় গোপালকে মস্তকে করিয়া রাজবাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইলেন। রাজানুচরগণ সমাদরে তাহাকে অতিথিশালায় স্থান দিলেন। ব্রাহ্মণ একটি নির্জ্জন ঘর চাহিলেন। রাজভৃত্য তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল এবং অলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ এই নূতন গোপাল লইয়া কি করে, তাহা লক্ষ্য করিতে লাগিল।

সকলে সরিয়া গেলে ব্রাহ্মণ এই দ্বিতীয় গোপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "গোপাল, আজ আর আপনাকে কিছু দিতে হইবে না। আজ রাজবাড়ী হইতে যে সিধা পাওয়া যাইবে, তাহাই খাইব; কি বলেন?"

গোপাল উত্তর করিলেন, "বেশ, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। আর সেই গোপালের জন্য দুঃখ করিও না। সে গোপাল তোমার যাহা ন্যায্য দরকার, তাহা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারিবে না। আর তুমি যাহা চাও, আমি তাহাই দিব; রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সৈন্য, সেনাপতি, খাদ্য, সবই দিতে পারি।"

দীনবন্ধু।—গোপাল, আমি ও সব কিছুই চাহি না গরীব ব্রাহ্মণ, আমার যাহা না হইলে নহে, তাহা পাইলেই হইল।

গোপাল।—আরে পাগল, তুই চা'স্ আর নাই চা'স্, আমি যা'র কাছে থা'ক্‌বো, তাকে রাজা কর্‌ব্বোই কর্‌ব্বো।

রাজা স্বয়ং অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিলেন এবং পাথরের গোপাল কথা কহিতেছে দেখিয়া রাজা এই গোপালটি লইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি মন্ত্রীকে কহিলেন, "দেখ মন্ত্রী! এই গোপালই ভাল। আগেকার গোপাল কথা কহিতে পারে না, অনাবশ্যক কিছুই দিতে চাহে না। এ গোপাল সাধিয়া রাজ্য দিতে চায়, কথা কয়, এই গোপালটি লইতেই হইবে।"

মন্ত্রী।—তবে পূর্ব্বের গোপালটি দিয়া এই গোপালটি লওয়া হউক। আগেকার গোপালে বামুন পণ্ডিতের পোষায়, এই ঠিক রাজারাজড়ার গোপাল। এখন বামুন ঘুমাইলে হয়।

রাজভোগে পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণ কপটনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। রাজানুচরগণ প্রথম গোপালটি ব্রাহ্মণকে দিয়া দ্বিতীয় গোপাল লইয়া প্রস্থান করিল। রজনী প্রভাত হইলে ব্রাহ্মণ পূর্ব্বের গোপাল লইয়া প্রস্থান করিলেন। রাজার ঠাকুরবাড়ীতে গোপালের পূজার খুব ধূম পড়িয়া গেল।

(৫)

বজনা দ্বিপ্রহব। সমস্ত বাজপুবী সুপ্ত। পৃথিবী ঝিল্লী ববে মুর্খাবত। ক্বচিৎ কোথাও গ্রাম্য সাবমেয়েব শব্দ শ্রুতিগোচব হইতেছে। এমন সময় বাজা গোপালেব গৃহে একাকী প্রবেশ কবিলেন। গোপালকে প্রণামপূর্ব্বক রাজা কহিলেন, "গোপাল! আমাকে দশ কোটি স্ববর্ণমুদ্রা দিতে হইবে।"

গোপাল উত্তর কবিলেন, "নিশ্চয়ই দিব। শীঘ্রই আপনি ঐ প্রার্থিত মুদ্রা পাইবেন। মহাবাজ! উতলা হইবেন না।"

বলা বাহুল্য, বাজকোষে সেই মুদ্রা আসিল না। বাজা ভাবিলেন, একি ব্যাপাব! ইহাব পব বাজা আব এক জন বাজার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিবাব মনস্থ কবিয়া গোপালকে কহিলেন, "গোপাল, আমাকে দশ হাজাব ফৌজ দিতে হইবে।"

গোপাল কহিলেন, "নিশ্চয়ই দিব। তুমি তথায় তোমাব সৈন্য পাঠাও। আমি যথাসময়ে তথায় দশ হাজাব যুদ্ধকুশল সৈন্য পাঠাইব।"

সময়ে বণক্ষেত্রে গোপালেব সৈন্য পৌঁছিল না। রাজ-সৈন্য পরাস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল। বাজা তখন নির্জ্জনে গোপালকে কহিলেন, "কৈ গোপাল, তোমাব সৈন্য ত বণস্থলে উপস্থিত হয় নাই।"

গোপাল কহিলেন "আমি কেবল কথাব গোপাল। কাজেব গোপাল সে বাজাদেব বাড়ী গিয়াছেন।"

বাজা বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, ভগবানেব অতি সূক্ষ্ম বিচাব।

আমাদের দেশে এখন কথাব গোপাল অনেক জন্মগ্রহণ কবিয়াছেন। মিটিং, কন্‌ফাবেন্স প্রভৃতিতে কথাব গোপালদের বক্তৃতাকৌশল অতি সুন্দব, কিন্তু কার্য্যে কিছুই পবিণত হয় না। সামান্য জলেব ব্যবস্থা কবিলে ম্যালেরিয়া কমে, আইন ও তাহাব ক্রিয়া ঠিক হইলে—বাসস্থান, আহার্য্য, পবিধেয় ও ঔষধ সুবিধায় পাইলে লোকেব স্বাস্থ্য ভাল হয় ও তাহাবা সুখে থাকিতে পাবে, কিন্তু সকল বিষয়েই মহার্ঘ ও খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল, কাজে কাজেই লোক পীড়িত ও দুঃখী হয়।

এই গল্পটি আমাব ছেলেবেলায় শোনা। এখন অনেক কথাব গোপাল দেখা যায়, ইঁহাবা কাযে কিছু নন, এই জন্য এই গল্পটি সময়োচিত বিবেচনায় প্রকাশ কবিলাম।

প্রার্থনা।

অসময় দযাময় বেখো পায় প্রার্থনা
জন্মাবধি নিববধি সুখ আমি জানি না।
মহামোহে ভবঘোবে ঘুবি আব পাবি না
সুখ দুঃখ জ্ঞানহাবা, পাই খালি যাতনা।
সুখ যে দুঃখেব পথ, তাহা আমি বুঝি না
দুঃখ যে জ্ঞানেব পথ, তাও মনে হয় না।
অহঙ্কাব হবে জ্ঞান, এ কথাটি বুঝি না
বাগ সকলেব 'পব, অনর্থ বৈ কবে না।
মিস্ট কথা বড ভাল, তাও সদা বলি না,
দযাব সমান নাই যত্ন পাবি কবি না।
পথহাবা হ'যে চলি, সুপথেতে যাই না
সাধুসঙ্গ মুক্তিপথ, তবু তাহা কবি না।

আমি চ'লে যাব।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

একটু কষ্ট হইলেই মানুষ সে স্থানে থাকিতে চাহে না। সে বলে, আমি চ'লে যাব। শিশু, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, সকলেই অশান্তি হইলে যে স্থানে থাকে, সে স্থান ছাড়িয়' অভিমান-ভরে চলিয়া যাইতে চাহে। সে যে চলিয়া যাইতে চাহে, কিন্তু কোথায় চলিয়া যাইবে, কোথায় গেলে শান্তি পাইবে, তাহা বুঝে না। সে স্থান ছাড়িয়' অন্য স্থানে যাইলে তাহার অশান্তি বাড়িবে কি কমিবে, তাহাও সে বুঝে না, কেবল যেন কেমন একটা অস্থিরতায় স্থানত্যাগ করিতে চাহে।

শিশু ভাল মোজা, জুতা, রেশমের পোষাক, বাহার দেওয়া টুপি পাইলেই খুসী। যদি একটু ত্রুটি হয়, অমনই অভিমানভরে বলে, "আমি থাকবো না চ'লে যাব "

যুবক যবতীদিগের কোন স্থানে থাকা কঠিন। কারণ তাহাদিগকে পথে বড় একটা কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে না। কিন্তু তবও অনেক ছেলে বাড়াতে মায়ের বা বাপের বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা লইয়া গৃহ হইতে চম্পট দেয়। বিদেশে যাইয়া বিষম বিপদে পড়ে। কেহ কুসঙ্গে পড়িয়া কুপথে যায়, কেহ বেঘোরে প্রাণ হারায়, কেহ অর্থনাশ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। যবতীরা এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া কুল ত্যাগিনী হয়, শেষে তাহাদিগকে ঘোর অশান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হয়। অনেকে শেষে আত্মীয়-স্বজনকে দেখিবার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়ে, কিন্তু তখন আর তাহাদের উপায় থাকে না।

প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়াদিগের সংসারের বন্ধন ও মায়ার টান বড় বেশী। কিন্তু তথাপি নানা অশান্তিতে তাহারাও মধ্যে মধ্যে 'পালাই পালাই' ডাক ছাড়েন। অনেকে রাগের ভরে কাশী প্রভৃতি স্থানেও যান। যদি হাতে কিছু টাকা থাকে ত দিনকয়েক দেবদর্শনে ও গঙ্গাস্নানে বেশ কাটিয়া যায়, তাহার পর গৃহে ফিরিবার জন্য তাহাদের মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন নানা কৌশলে আত্মীয় স্বজনকে চিঠি-পত্র লিখিয়া গৃহে ফিরিবার চেষ্টাটাই করিতে থাকেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা অত্যন্ত পরবশ হইয়া পড়েন, সেইজন্য তাহারা সহজে কোথাও যাইতে চাহেন না। গেলেও পার সেই যাত্রা তাঁহাদের শেষযাত্রায় পরিণত হয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, অশান্তি উপস্থিত হইলে মানুষ আর সে অবস্থায় থাকিতে চাহে না। সে সেই অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থায় যাইতে চাহে। কিসে অশান্তির শান্তি হয়, তাহা সে ঠিক ঠাওর করিতে পারে না বলিয়া বলে, "আমি চ'লে যাব।" তাহার "মহাপ্রাণী" সে অবস্থায় যেন অতিষ্ঠ হইয়া পড়ে, তাই সে চলিয়া যাইতে চাহে। ইহা প্রাণের একটা অস্থিরতা মাত্র। আজকাল এই অস্থিরতাটা কিছু বেশী বেশী দেখা যাইতেছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে,—কিসে এই অশান্তির শান্তি হয়, কিসে আপন আপন অবস্থায় আরাম পাওয়া যায়? সকলের ভাগ্যে কিছু গাড়ী ঘোড়া, গহনা, বাবুয়ানা জুটে না, জুটিতে পারে না। কাহারও যেমন আশা, তেমন আয় হয় না। সকলেই তা বুঝে। কিন্তু এক জনের বাবুয়ানা ও বিলাস দেখিলে অন্যের তাহা করিতে বড়ই বাসনা জন্মে। এক জন মহিলার গায়ে নানাবিধ অলঙ্কার দেখিলে আর দশ জন নারীর তাহা পরিবার জন্য প্রাণে বড় ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়। আমার ছেলে মাটির পুতুল লইয়া খেলা করে, কিন্তু তোমার ছেলের কাচের পুতুল ও কলের পুতুল দেখিলেই সে কাঁদিবেই কাঁদিবে। আমার স্ত্রী বাসন মাজে, ঘরে গোবর দেয় আর কাচে, ঘুঁটে প্রস্তুত করে, কিন্তু তোমার স্ত্রী যদি খট্বাঙ্গশায়িনী, নভেলবিনোদিনী, বৈদ্যুতিক ব্যজনসেবিনী হন, তাহা হইলে আমার গৃহিণী আপনার অদৃষ্টকে ত ধিক্কার দিবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। এ দোষ আমার নহে, আমার স্ত্রীরও নহে, এ দোষ তোমার। তুমি বিলাসিতায় নিজে মজিতেছ, সঙ্গে সঙ্গে আর শত জনকে মজাইতেছ। তুমি সর্ব্ববিধ সংকল্পকে শিকায় তুলিয়া রাখিয়া নিজে ঘোর বাবু সাজিতেছ, গৃহিণীকে বাইজী সাজাইতেছ, তাহার ফলে তুমি নিজেও অশান্তির ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া পাক খাইতেছ, আর দশ জনকে তাহাতে পাক খাওয়াইতেছ। ইহকালেই হউক বা পরকালেই হউক, ইহার শাস্তি তোমায় ভোগ করিতে হইবেই হইবে।

আসল কথা, সকলকেই এখন বিলাস-বাবুয়ানা ছাড়িয়' সাদাসিদাভাবে জীবনযাপন নির্ব্বাহ করাই কর্ত্তব্য। মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিয়া মোটা চালে থাকিলে কাহারও কোনরূপ অশান্তি ঘটিবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সংশিক্ষার অভাবেই বড় কষ্ট হইতেছে। আমরা ভালমন্দ বুঝিতে পারিতেছি না যে বিদ্যা কর্ম্মত্যাগ ও আচার ব্যবহার ত্যাগ করিতে শেখায়, সে শিক্ষা শিক্ষাই নহে। উহা কুশিক্ষা।

AN INFORMATION.

WE issue free annually a Wall Calendar to our regular customers. It is much appreciated by our European and Indian customers alike Price to non-customers for a copy Annas 8 only.

The same rule applies to our Pocket Diary the Price being Re. 1 each

We print Bijaya Greeting Cards, Xmas Cards, Wedding and other Invitation Cards Upahars for Wedding day, Address of Welcome, Congratulation and Farewell in the best style.

In Wedding Cards we can print portraits of Bridegroom and Bride in halftone Blocks or in their true colours.

We print school and other Books in English and Vernaculars with illustrations in halftone or tri colour process

Zemindary Forms, Wasilbaki, Patta Kabuliat, Dakhilas are neatly printed and at moderate charges

Badges—Brass or Silver, Rubber Stamps, Dies-Arm, Crest, Monogram, Address, &c., Copper-plates for Visiting Cards, Business Cards, Note and Letter Headings, Invitations; Door-plates, Gold and Silver Medals are done as good as English work. Marble slabs for the door are done in A-1 style.

If you have not done any business with this firm please try and let us register your name as a regular customer

K. P. Mookerjee & Co.

7, Waterloo Street, CALCUTTA.

অনাথবন্ধু

প্রথম বর্ষ : প্রথম খণ্ড : অষ্টম সংখ্যা : মাঘ : ১৩২৩।

শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। :: শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত। :: ৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০, দশ টাকা : প্রতি সংখ্যা নগদ ১, এক টাকা ; বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

Noblemen and Gentlemen !

In issuing the 8th issue of Anathbandhu I am glad to submit to my readers that since the issue of the 7th number I have registered some subscribers a fact which is encouraging, no doubt, but I expect better appreciation of my endeavours from my noble patrons and friends by sending their photos and life-sketches early, by paying subscription to the journal and the Album of the Noblemen of India and the charges for publishing the portrait and life-sketch in the journal. It shall facilitate the working of the Annapurna Asram.

I have now a big parcel of land under negotiation on the bank of a river and a sanitary place like Baidyanath and the plan for building the Asram is being designed.

I hope my patrons and friends will fully appreciate the object and lend their helping hand to build a model village on the Varnasram principle for the benefit of mankind.

The land I have acquired near Baidyanath is a small parcel and the expectation of acquiring the parcels near it is distant. Hence it appears to me that a thousand bigga—plot which I am negotiating for the Asram will be just the quantity of land we want, this land will suit our purpose. We can start work almost immediately after obtaining the Patta.

Yours faithfully,

K. P. Mookerjee.

My Three Schemes.

ANATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

 OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Exccellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) W. R. Gourlay.

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga*, if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) D. Sarvadikary.

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.

(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) D. Chatterjee.
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,

I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,
(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,
(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Sj. Provat Chandra Giri.

TARAKESHWAR.
22, 1, 17,

Dear Sir,

The fifth number of Anathbandhu has been received in due time. I have gone through the Magazine and found it very much interesting. The different subjects dealt therein are highly instructive and valuable. I doubt not that the object you have in view in this Journal is laudable. I wish it every success. I have not yet got the Journal Nos 6th and 7th hope to receive them at an early date. I shall send my photo and life sketch later on.

Yours Sincerely
(Sd.) **Provat Chandra Giri.**

From Dr. D. B. Spooner, Nalanda.

CAMP BARGAON.
Feb. 24th. 1917.

I beg to thank you for your kindness in sending me a copy of your monthly Journal Anathbandhu, upon whose admirable get-up I venture to congratulate you. I am glad the Bodh Gaya photo have been of use to you. * * *

Yours truly,
(Sd.) **D. B. Spooner.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee"

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,
(Sd) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,
(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

From Babu Amulya Chandra Mukerji,

ELLINGHAM COTTAGE,
Simla, W. C. (Punjab.)
April 16th, 1917.

DEAR SIRS,

I am much obliged for the six copies of "অনাথবন্ধু" from আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, sent to me per V. P. P. for Rs. 10, I have read them with great interest and am much satisfied. Be pleased to send me the issues of the months from পৌষ to চৈত্র ১৩২৩, and for বৈশাখ ২৩২৪ if it has issued by now, and oblige.

Yours faithfully,
(Sd.) **Amulya Chandra Mukerji.**

বেনারসের শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী লিখিয়াছেন ঃ—

BENARES CANTT.
8.7.1917.

মহাশয় !

যোগেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের মারফত প্রেরিত সাত কপি "অনাথবন্ধু" পূজ্যপাদ পাইয়াছিলেন। এই মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি ভাল এবং অনেক আবশ্যকীয় উপদেশগর্ভিত। পত্রের নিবন্ধ ও গঠনাদির পারিপাঠ্য দেখিয়া পূজ্যপাদ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীভগবানের নিকট ইহার দৈনন্দিন উন্নতির প্রার্থনা করিতেছেন।

আপনাদের আশ্রমের Prospectusআদি এখানে পাঠাইতে পারেন। আমাদের দ্বারা যদি ইহার কোন সহায়তা হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
দয়ানন্দ।

PRESS OPINIONS.

The British Printer.

October and November issue, Vol. XXIX, No. 172, 1916.

THE second number of *Anathbandhu* from the printers and publishers—K. P. MOOKERJEE & Co., Calcutta—offers a decided advance on the first issue of this new venture of that progressive house. Matter is in Bengali, with some advts. in English, a cover in red and black being both appropriate and quietly tasteful in character. A remarkable feature of the pages is the very praiseworthy standard attained by a series of three-colour illustrations interspersed amongst matter. Real progress is being made in this direction of highly-skilled printing, and all concerned are to be congratulated upon so good a result.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such (" Anathbandhu ") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called " Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that accompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer, of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen-and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A New Journal by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K P. Mookerjee & Co., was omitted It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to

open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday,, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukh padhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well'known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religions, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public. The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

The Express, Bankipore.

Friday, March 23. 1917.

Messrs. K. P. Mookerjee and Co., the enterprising firm of stationers, printers, lithographers etc. of Calcutta are to be congratulated on the sixth issue of their pictorial journal, *Anath Bandhu* which contains useful and interesting articles and nice pictures. It is a pity that they have to discontinue the specimens of Hindi papers owing to want of sufficient response from the Hindi reading public. They have however added some English articles, but we think the public would have preferred more the encouragement of the vernaculars of the country. We beg to acknowledge with thanks also a calendar and a pocket diary from Messrs. K. P. Mookerjee.

The Beharee.

Thursday, April 5, 1917.

We are obliged to Messrs. K P. Mukerjee & Co. (7, Waterloo Street, Calcutta) for a very nice pocket book and calendar for the year 1917 which is very prettily got up. Their beautiful Bengali Magazine, "Anathbandhu" is appearing regularly and with improved features month by month. The current number to hand worthily keeps up the reputation.

The "STATESMAN."

Saturday, 19th May, 1917.

"ANATH BANDHU."—The seventh number of the illustrated magazine published by Messrs. K. P. Mookerjee, of 7, Waterloo Street, Calcutta, is full of interesting and useful reading matter. A full page portrait of Lord and Lady Ronaldshay is given as frontispiece and the number is illustrated with several other half-tone and tri-colour blocks. The publishers have in this number introduced a few articles and a poem in English, so that the publication may appeal to a wider range of readers.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlees to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India

and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committe of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,

Your humble servant,

K. P. Mookerjee.

7, Waterloo Street,
Calcutta.

মহাত্মগণ !

"অনাথবন্ধুর" অষ্টম সংখ্যা বাহির হইল। এই সংখ্যায় আমি আমার পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে, সপ্তম সংখ্যা বাহির হইবার পর আমি কতকগুলি গ্রাহক পাইয়াছি। ইহা উৎসাহজনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি আমার মহানুভব অভিভাবক ও বন্ধুগণের নিকট হইতে আরও অধিক আশা করি, তাঁহারা যদি শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদের ফটো ও জীবনকথা প্রেরণ করেন, এই পত্রিকায় ও প্রস্তাবিত Album of the Noblemen of Indiaর মূল্য প্রেরণ করেন এবং এই কাগজে তাঁহাদের ছবি ও চরিত্র প্রকাশের মূল্য পাঠান, তাহা হইলে আমার উৎসাহ আরও বর্দ্ধিত হইত। ঐরূপ কার্য্যে অন্নপূর্ণা-আশ্রমের কার্য্যেরও সুবিধা জন্মে।

বৈদ্যনাথের ন্যায় কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে নদীতীরে একখণ্ড প্রকাণ্ড জমী আমার লইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এবং আশ্রমগৃহনির্ম্মাণের প্ল্যানও প্রস্তুত হইতেছে।

আশা করি, আমার অভিভাবকগণ ও বন্ধুবর্গ আমার উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করতঃ আমাকে মানবজাতির উপকারার্থ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী একটি আদর্শ পল্লীগ্রামপ্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবেন।

বৈদ্যনাথের সান্নিধ্যে আমি যে জমী লইয়াছি, তাহা সামান্য; তাহার নিকটস্থ জমী গ্রহণ করা এখন সত্বর সম্ভাবনা নাই। সেই জন্য আমি এই আশ্রমের জন্য যে হাজার বিঘা জমী লইবার কথাবার্ত্তা কহিতেছি, তাহাই আমার উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে। আমি ঐ জমীর পাট্টা লইবার পরই আশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিব।

আমার অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমি ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, আমরা যদি প্রাচীনভাবে চিন্তা করিতে ও প্রাচীন রীতি-পদ্ধতি-অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারি, তবেই আমাদের দেশের মঙ্গল ঘটিবে। অবশ্য বর্ত্তমান অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া সেই প্রাচীন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে। সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক উচ্চবিষয় চিন্তা করাই আমাদের ব্যবস্থা। আমরা সেই আদর্শ অনুযায়ী যতই আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিব, ততই আশার সমুজ্জ্বল আলোকে আমাদের ভবিষ্যৎ আলোকিত হইবে।

আজকাল আমাদের দেশে চারিদিকেই জাতীয় ভাবের সচ্ছুরণলক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সন্ধিক্ষণে যদি সেই নবজীবনজনিত শক্তিকে প্রকৃত পথে পরিচালিত করা না হয়, যদি উহা পাশ্চাত্য ছাঁচে—পাশ্চাত্যভাবে গঠিত করা হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে উহা বড়ই দুঃখের কারণ হইবে। অতএব এখনও সময় থাকিতে বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রাখিয়া অতীত যুগের প্রতিষ্ঠানের সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর আদর্শ সংগঠিত করিতে ও আমাদের সামাজিক, আধ্যাত্মিক, রাজনীতিক ও অর্থ-নীতিক প্রতিষ্ঠান রচিতে হইবে।

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল গুণ ও ধর্ম্মপ্রভাবে এককালে আমাদের দেশ সমস্ত সভ্যদেশের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়াছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি প্রকারে আমরা উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহাই প্রদর্শন করা "অনাথবন্ধুর" উদ্দেশ্য।

"অনাথবন্ধুর" মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার লভ্যাংশ ইহার উপদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্যই ব্যয়িত হইবে। আমি উহার এক কপর্দ্দকও লইব না। আমি প্রাচীন ভারতীয় পল্লীর আদর্শে একটি আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠিত করিব। ঐ পল্লীর জনগণ আপনার অভাবের মোচন আপনারা করিতে পারিবে, আপনাদের জন্য পরের উপর নির্ভর করিবে না। দেশের কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি—সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। আশা করি, এইবার আপনাদিগের নিকট আমার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

আমার প্রতিষ্ঠিত "অন্নপূর্ণা আশ্রম" মিতব্যয়িতা-শিক্ষায়, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপোষণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ আশ্রম হইবে। কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, "অনাথবন্ধু" সকলকে তাহার একটা আভাস দিয়াছে।

যখন এই আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন উহাতে পুরাতন সময়ের পাঠশালার ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী শিল্পাদি বিদ্যা-শিক্ষারও ব্যবস্থা বিহিত হইবে। যাঁহারা দ্বারবঙ্গের মহারাজ মাননীয় সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়ের সহিত সাধারণের মঙ্গলকামী, আমি তাঁহাদিগেরই সহায়তা প্রার্থনা করি।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ত্ব,

দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশানুরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি সামান্য আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আস্‌বাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুরা যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌ব্যাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া

কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ৩০।৩৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্য-দাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি।

৩য়। ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ—যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

ध्यान—तप्तकाञ्चनवर्णाभां बालेन्दुकृतशेखराम्।
नवरत्नप्रभादीप्तमुकुटां कुङ्कुमारुणाम्॥
चित्रवस्त्रपरीधानां सफराक्षीं त्रिलोचनाम्।
सुवर्णकलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्॥
गोक्षीरधामधवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्।
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठविराजितम्॥
कपर्द्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्।
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं दृष्ट्वानन्दमयीं पराम्॥
सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यां नितम्बिनीम्।
अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यामलङ्कृताम्॥
प्रणाम—अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि।
सर्व्वमङ्गलमाङ্গल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि माहेश्वरि नमोऽस्तु ते॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥
প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথাঃ—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদমায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কার্য্যে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপন-দাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপন-দাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তি-মত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপন-দাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
" ২য় " " " " ১৫৲ টাকা হিঃ।
" ৩য় " " " " " " " "
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
" শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।

বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লক প্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ANATHBANDHU.

"ALL THAT GLITTERS IS NOT GOLD."

Although fashion and style brighten a man, they make him forget his position and duty. Adoption of alien manners and customs tells upon a people. If you stick to your social manners and customs, you maintain your position and keep your family out of disgrace and trouble.

The Hon'ble Mr. Justice Syed Sharfuddin,

Bar-at-Law.

(Member-Designate of the Executive Council of the Lieutenant-Governor of Behar and Orissa.)

TWO years before the invasion of Shahabuddin Ghori, *i. e.*, in 1174, Syed Husain Khing Sowar, a lineal descendant of the Prophet, came to India and settled in the country. By and by he made a name for military prowess and was ultimately given the command of the hillfort of Taragarh in Rajputana where he lies buried having fallen fighting with the Rathors and the Chauhans in 1210. Mr. Sharfuddin is a descendant of a younger brother of this Syed Husain Khing Sowar.

Mr. Sharfuddin was born on the 10th September, 1856, at Neora in the District of Patna where a branch of the family had removed having obtained a Jagir in that part of the country from the Moghul Emperor. He is the youngest of the five children of Syed Farzand Ali, a well-known pleader in those days practising at Chupra. The eldest son died when Mr. Sharfuddin was on his way back from England after having been called to the Bar. The second, Khan Bahadur Syed Nasiruddin, C.I.E., was a brilliant member of the Provincial Executive Service and for sometime filled with great credit the post of Junior Secretary to the Board of Revenue, Bengal. Subsequently his services were lent to H. H. the Begum of Bhopal who appointed him first as Judicial Minister, and then as Revenue Minister of her State. He died in the service of the Begum in 1912. The remaining two are daughters, the eldest of whom is married to Nawab Shams-ul-ulema Syed Imdad Imam and their sons, Sir Syed Ali Imam (late Law Member of the Imperial Council and a Judge-designate of the Patna High Court) and Mr. Syed Hassan Imam (late a Judge of the Calcutta High Court) are well-known to the Indian public. The youngest daughter is married to Khan Bahadur Syed Zahiruddin, the very popular Vice-Chairman of the Patna District Board.

In his early years Mr. Sharfuddin was very sickly and nobody ever expected he would grow

into manhood, so much so, that his education was not seriously thought of till he was a boy of 10 years or more. He was educated at the Patna Collegiate School and after a couple of years at the St. Xavier's College, he was sent to England to qualify for the Bar. It should be remembered that in those days the Mahomedans had almost as much prejudice against going to Europe as the Hindus. And though the visit of the late Sir Syed Ahmad to England in 1869-70 had removed much of such prejudice, the more orthodox section of the community still looked askance at their Europe-returned brethren : so that on his return from England, Mr. Sharfuddin had to re-establish his right to smoke in the same *Hukka* as the orthodox members of his community, by his mode of living. Mr. Sharfuddin joined the Middle Temple and was called to the Bar in June, 1880. On his return to India he set up his practice in the Calcutta High Court from where he went to Chupra and finally to Bankipur. There he made a name for himself. At one time his practice extended from Benares and Gorrukhpur in the West to Bhagulpur in the East and from Bettiah and Motihari in the North to Gaya and Sasseram in the South. In criminal cases of any importance he was almost invariably retained on behalf of one or the other of the parties. His reputation as a cross-examiner has not yet been surpassed in Behar. He is an effective speaker and his painstaking habits combined with his forensic abilities, and conscientiousness make him an ideal Counsel. Unless it was some small application, he could never be induced to accept more than one brief for one day and it can never be said of him that having once taken a brief he was found engaged elsewhere when that particular case was called on for hearing. His abilities and character soon drew the attention of the official world and Mr. Halliday, the then Commissioner of Patna, submitted to the Government his name as that of one suitable for a seat on the Bench of the Calcutta High Court. Mr. (afterwards Sir James) Bourdillon, another Commissioner of Patna also did the same on a subsequent occasion. But when the appointment of Mr. Ameer Ali's successor was announced it was felt that Mr. Sharfuddin had no chance and that his being a member of the "Mofussil Bar" was the only objection to such appointment. However, when Justice Sale took furlough, Sir Andrew Fraser, the then Lieutenant-Governor of Bengal, strongly urged the claims of Mr. Sharfuddin before the Government of India and in 1907, he was appointed a Judge of the Calcutta High Court and the rights of the Mofussil Bar were then vindicated.

On the establishment of the new High Court at Patna, in April 1916, Mr. Sharfuddin was transferred there and has now been appointed as a Member of the Executive Council of the Government of Behar and Orissa to succeed the Hon'ble Maharaja Sir Rameswar Singh of Darbhanga, whose term of office expires in August next.*

That his appointment to the Executive Council of Behar has been a happy one goes without saying : indeed, taking all facts into consideration there could not have been a better selection. Behar as a New Province has not yet 'settled down' and with the Patna University Bill still on the Legislative anvil and the question of the relation between the Indigo Planters and the ryots looming large before the public, the presence of a man of Mr. Sharfuddin's calibre in the Executive Council of the Province cannot but be to the advantage of both the Government and the people. Enjoying the confidence of the Government, Mr. Sharfuddin is essentially a man of the people. His strong common sense, his wonderful tact,

* It has since been announced that the Maharajah of Darbhanga's term of office has been extended up to the 6th November next.—Ed. A.

his intimate knowledge of the people of his province gathered during his extensive practice at the Bar extending over a quarter of a century will surely be brought to bear on all problems that are likely to come up before the Behar Government during the next five years.

Mr. Sharfuddin's unostentatious manners and his supreme ignorance of and utter disregard to the art of self-advertisement may sometime cause misapprehension in some quarters but to the careful student of Indian History his many-sided activities are not unknown. He began his public life as a Municipal Commissioner of Patna, and for three successive terms, *i. e.* for nine years altogether, he was the Vice-Chairman of the District Board of Patna. Many a Government Resolution on the Administration Report of the working of the Local Self-Government Act in Bengal during that period testifies to his solid work in that capacity.

When the Indian National Congress was started Mr. Sharfuddin along with his friend Mr. Hamid Ali Khan, Bar-at-Law, of Lucknow, joined the movement and threw himself heart and soul into it. For four years he worked for the Congress very hard attending all the meetings held during those years and did his utmost to induce his co-religionists to join the movement in a body. But the late Sir Syed Ahmad had declared himself against the movement. Mr. Sharfuddin saw that backwardness in education of his co-religionists and the influence of Sir Syed Ahmad openly backed as it was by the authorities, were too much to contend against and that he could render much greater service to the cause of the national movement from within the pale of his community than as an outcaste by actively participating in it. He therefore ceased attending the meeting of the Congress but he has never stopped working for it. Unostentatiously, silently but steadily he has gone on preaching the aims and objects of the National Congress among his co-religionists affirming always that the Congress is his religion. He never missed an opportunity of advocating the cause of the Congress. In 1902 when the starting of the All-India Muslim League was discussed at a meeting held at Lucknow, Mr. Sharfuddin delivered a remarkable speech there urging the Mussalmans not to fritter away their energies by starting a separate political organization, but to join in a body the existing institution which would meet all their necessities and pointed out that if they insisted upon having a separate political propoganda of their own they were bound, in the long run, to join the sister movement. His prophecy has been fulfilled and to-day we find the Indian National Congress and the All-India Muslim League joining hands in presenting their demands to the Government. The speech was delivered in Hindustani and a substance of it was published in the "*Bengalee.*" Again, in 1903 when Mr. Surendra Nath Banerji accompanied by Mr. J. Chowdhury, Bar-at-Law, went to Patna in connection with Congress work, an anti-Congress movement of unprecedented volume and strength was set up under the leadership of Mr. (now Sir) Syed Ali Imam and a largely attended meeting was held at the Chowhatta House of Mr. Sharfuddin. It was purely a Mahomedan meeting and except the writer of the present article, no non-mahomedan was allowed to be present at it. Delegates had come from all the towns of Behar and the late Khan Bahadur Syed Fazal Imam was almost dragged from what proved to be his death-bed to preside over the meeting. Mr. Sharfuddin was called upon to explain to the meeting the aims and objects of the Congress. He spoke in Hindustani for over an hour clearly and lucidly explaining what the Congress was striving for. After summarizing all the resolutions adopted by the Congress, he pointed out that there was nothing

in them that would not benefit the Hindu and the Mahomedan alike. He also explained the minority clause in the rules and regulations of the Congress and told the audience that by virtue of that rule the Mahomedans could at any stage get the Congress to drop all such proposals as they thought would be detrimental to their interests. A packed meeting as it was—the members having come there prepared what to vote for—the impression created by Mr. Sharfuddin's speech was immense: so much so that some of the principal organizers of the meeting (I am glad to note here that they are now all staunch supporters of the Congress and the names of some of them are coupled with its future Presidentships) were heard to whisper to each other "All is lost: after this speech it is doubtful if the members will vote as expected." The party "whips" if I may use the expression, had a strenuous half-an-hour after that. But though the meeting voted against the Mahomedans joining the Congress, the seed sown there has at last borne fruit. It is a pity indeed that another five years must pass before Mr. Sharfuddin is free to again actively take up what he believes is the mission of his life.

Mr. Sharfuddin's way of doing things is quiet and without any fuss. The numerous riots that broke out in Behar on the promulgation of the plague Regulations in 1899 and 1900 are a matter of common knowledge. They caused not a little anxiety to the authorities and Sir Alexander Mackenzie and the late Sir John Woodborn visited the province more than once. Under orders from Sir Alexander Mackenzie, a Durbar was held at the Commissioner's Bungalow at Bankipur under the Presidency of Mr. (afterwards Sir James) Bourdillon, the then Commissioner of Patna where the latter explained that the object of the Government in enforcing segregation and house-to-house visitation was for the welfare of the people themselves, and openly told the people that those who opposed the regulations were the enemies of the Government and the people and would be treated as such. There was nobody present on the occasion to say anything against this. But Mr. Sharfuddin rose and pointed out that howsoever good the intentions of the Government might be—and he doubted not that they were good and for the benefit of the people—the effect of enforcing the Regulations would practically interfere with some of the most cherished relegious ideas of the people and would also break their *purdah*. One of the highest ambitions of the Indian is to die surrounded by the members of his family and the last rites are relegious in their character. Anything therefore that goes to interfere in the least with these is sure to be resented by the people. The institution of the *purdah* is also looked upon by the people in general with veneration born of long usage and any outsider intruding upon the privacy of the *purdah* would be roughly handled no matter under what circumtances he did so. Later on the late Sir John Woodburn visited Behar and the same matter was discussed again and again. At last Mr. Sharfuddin was asked by Government to suggest the necessary alterations in the Regulations and it was at his suggestion that the Plague Regulations were modified and the sting was taken out of them.

Mr. Sharfuddin is an Indian first and then a Behari: he is a man first and then a Mahomedan. He yields to none in his respect for the Prophet or the Al'Koran and though not a strict observer of the outward forms of his religion, he is essentially a religious man. Religion is a matter of practice with him: every action of his life is guided and controlled by his religion: in fact his whole life is permeated with religion. He holds that no education is worth the name unless religion is made the basis of such education. In his presidential address at the All India Mahomedan Education Conference held at Dacca in 1906, he laid great stress on

this aspect of the education problem in India. His whole-hearted and active support to the Nadwat-ul-ulema is another example of his conviction in this matter.

He was for a number of years the Honorary Secretary of the Behar Landholders' Association, the premier institution of its kind in Behar. The members are mostly Hindus and his unopposed election speaks volumes in favour of his absolute non-secterianism. On the death of Babu Saligram Singh, the representative of the Behar Landholders' Association on the Bengal Legislative Council, Mr. Sharfuddin was unanimously elected to the same place and though he was in the Council for only about a year, he succeeded in inducing Sir Andrew Fraser to hold out the promise that he would get the rules of the Budget discussion altered so that the non-official members may have an opportunity of discussing it before it was formally presented to the Council in its cut and dried form and it is well known how that promise of Sir Andrew Fraser was fulfilled. His interpellations (in those days the members could not move resolutions) regarding the Industrial Survey of the country and the treatment of Juvenile and First Offenders were also not without some good—though not immidiate and direct.

About female education and female emancipation he holds advanced views but he is a cautious reformer. He holds that all reforms must proceed slowly and from within.' The slowness is not a drawback but on the other hand proves social stability. One of the strongest factors of such stability is the inertness or rather the active hostility with which human societies receive all new ideas. It is the crucible where the dross is separated from the genuine metal and which saves the body social from a succession of unprofitable and possibly injurious changes. That the reformer should also be the martyr is, perhaps, not a great price to pay for the caution with which society as a whole must move: to replace an individual man may require years, but a stable and efficient society is the product of centuries of development.

N. C.
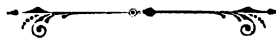
The Cattle of Bengal.

IN an agricultural province like Bengal the importance of cattle cannot be overestimated. And it was with considerable concern that those interested in the agriculture of the province had been viewing the deterioration of her cattle. This deterioration had advanced so far as to make the Government institute an enquiry into its causes and remedies. The results of that enquiry have been embodied in Mr. J. R. Blackwood's "Survey and Census of the Cattle of Bengal" published by the local Government. Inspite of its shortcomings it is a valuable work in which the graveness of the situation has been very openly discussed. It is, moreover, the first work of its kind and rich in illustrations representing the types of cattle in Bengal.

Though one feels a little surprised when in the list of authorities consulted one misses the name of the most important book on Dairy Farming in India—that by Majors D. J. Meagher and R. E. Vaughan of the Indian Army (published by the Government of India in 1904) one must admit that Mr. Blackwood has taken pains to consult the books and articles of most of his predecessors in the field of enquiry. Here we would like to point out that Bagerhat is a Sub-division not of the Dinajpore

District but of the Khulna District in the Presidency Division.

A reference to the reports of the Agricultural Department of Bengal shows that the steps to be taken for the improvement of the cattle of the province have been "under constant discussion for more than 20 years." But evidently the discussion has not helped the Government in the solution of the problem which has been growing more and more complicated with the growing shortage of pasture land and the scarcity of bulls for breeding purposes.

The breeds of cattle in Bengal can be divided into three classes :—

(1) Wild cattle.
(2) Hill cattle.
(3) The cattle of the plains.

It is with the cattle of the plains that we are chiefly concerned.

In an article on "Improvement of cattle in Bengal" in the Agricultural Journal of India Mr. E. Shearer advanced the opinion that "Bengal cattle are probably of the same stock originally as those of Bihar, but have become diminutive because they have not been properly fed." He said—"In this country the common experience is that the quality of the cattle varies inversely with the intensiveness of the cultivation, and hence it is hardly surprising that Bengal cattle are the worst in India. It is almost entirely a question of food-supply. For many generations the cattle have been constantly starved, and the result is seen in the degenerate specimens existing to-day."

But how are we to reconcile this opinion with what he says in another place? He says—"the average cow is such a wretched specimen that the cultivator cannot afford to feed her better than he does. What he wants is a good milch cow which will not only rear a calf, but leave a substantial surplus of milk to her owner. Such a cow he is prepared to pay for and prepared to feed." If that is so how has the Behar cattle degenerated in Bengal through want of food? If the cultivator was prepared to feed the cow well when she had not degenerated so far why did she degenerate through constant starvation? It was not merely a question of food-supply which was not difficult to solve when the growth of the population in rural Bengal had not rendered the conversion of pasture land into cultivated fields necessary.

Various circumstances must combine to change the nature of the cattle of a province, and such change must be gradual—extending over generations and years. And, as Mr. Blackwood puts it, "it has always to be remembered that these cattle are the ultimate product of their environment and that by a long process of natural selection a type has been evolved most suited to the particular conditions under which they are compelled to live." The introduction of a new breed of cattle often proves unsuccessful because of new environments. In "*Dairy Farming in India*" we read—"The great variations in the Indian climate largely affect the milk yields of cattle imported from foreign districts. Hansi-Hissar cows will not prove as satisfactory, say in Jubbulpore, as they will in Delhi or Meerut, and this should be borne in mind before condemning the Hansi-Hissar breed. It appears to be a fact that the further they travel east or south (*i.e.*, the damper the climate becomes,) the more certain is the decrease in the yield. The difference between the outturn in Benares, Calcutta and Nagpur will be sharply marked. * * * It is notorious that cattle from the plains going to the hills drop to some times a third and even a quarter of their normal yield, a circumstance which must be due to climatic conditions."

Mr. Blackwood has quoted several instances of decrease in the milk-yield of imported cows in Bengal. Our experience in the matter has been less unfortunate. But we must acknowledge that the heavy imported cows are illsuited to the conditions of Bengal.

The circumstances averse to cattle breeding in Bengal are according to Mr. Blackwood :—

(1). The climate (especially of the eastern part of the province.)

(2). The deficiency of pasture.

(3). The deficiency of breeding bulls.

The climatic conditions of a country cannot be changed, but its rigours can be mitigated. That must depend on the education of the people in this matter. That question we shall take up later on.

The deficiency of pasture is a great deterrent especially in congested parts of the province where every inch of land is brought under the plough and the much-vituperated zemindars are helpless in the matter of providing pasture. A reference to the Bengal Landholders' Association on the subject elicited the following reply—"In view of the possible reluctance on the part of the tenants and in view of the comparative helplessness of the Zemindars some of the most estimable among our correspondents have suggested a recourse to legislative action on the part of Government. Thus it has been suggested that Government should acquire land for grazing purposes under the provisions of the law, and that the money may be taken either from the Road Cess Fund or from the funds which have accumulated in district Treasuries on account of the Landlords' Fees which, before 1907 Zemindars refused to accept out of misapprehensions."

The Landlords' Fees in the Treasuries cannot suffice to remove the want, and it will be neither prudent nor advisable to divert the Road Cess to this new purpose. It may, of course, be said that funds may be found out of the P. W. Cess. But even there are meet with certain difficulties. Mr. Blackwood suggests--"The most practical attempt towards a solution of this difficult problem is in the direction of showing how the cultivation of crops can be combined with the adequate and economic feeding of cattle."

For about five or six months when the fields are bare the cattle get more or less grass. In the eastern districts where only paddy is grown the cattle are set free in January and allowed to roam about till the rains set in. The grass grow up rapidly and the cattle have enough to eat. Even when they cannot be let lose fodder crops are grown in some districts. In fact the owners of cattle try their best to provide them with food. But their poverty and ignorance often combine to put an obstacle in their way which only proper education can make them obviate.

This question of pasture had attracted the attention of the late Mr. A. O. Hume who discussed it at some length in his book—*Agricultural Improvement in India*—a work which contains much valuable information about setting apart land for purposes of pasture.

Here it may not be out of place to quote the words of the authors of *Dairy Farming in India* about the ravages of years of drought when fodder becomes difficult to procure—"Much serious damage has been caused by recent years of drought. It is to be regretted that the cultivator cannot be protected from the loss of his cattle. The loss of his crops can sooner or later be got over, but loss or damage to his live-stock takes him many years to remedy. It would seem desirable that pasture-reserves should be established to meet the emergencies of drought and famine."

We shall now take up the question of the deficiency of breeding bulls—a deficiency that can be and ought to be overcome. To quote the words of the authors of *Dairy Farming in India*--"the small milk-yield of the cattle of many districts is conclusive evidence of want of care in breeding, and it is from greater attention to this matter that improvement will first come * * * The plan adopted to encourage horse-breeding, by making chosen Government sires available for selected dams, must have a favourable effect if applied to

cattle: the steps which have proved successful in the one case will be equally so in the other."

Mr. Blackwood also holds the same opinion. "It is quite clear," he says, "that the main and most direct method of effecting an improvement of cattle in the province must be by the introduction of studbulls." Unfortunately we read in his Report.—"There is not a single District in the province which * * has an adequate supply of good breeding bulls." The remarks of Captain Raymond are clearer still—"Out of some 128 divisions 5 are reported to have too many bulls, 45 have enough, and 74 have not enough." And in the 74 divisions where there are not enough the covering of cows is done by immature and weedy bulls which "are active enough, are near at hand, and serve the purpose for the time being." In the past when there were numerous bulls the fittest only survived the weaker being always driven out after fight by the stronger.

The Hindus had not overlooked the advantage of keeping strong bulls for purposes of breeding. And Mr. Blackwood has remarked—"The old Hindu system of breeding by sacred bulls was a good one from the point of view of the cattle themselves, because, if properly carried out, it ensured that the calves dedicated to the deity were picked animals and the practice of allowing them to roam at will ensured that they were well fed and had plenty of exercise." But "the encroachment of cultivation on waste land is perhaps the chief reason for the gradual diminution of the number of Brahmini bulls, although the High Court decision that the Brahmini bull must be regarded as a *res nullius* has been a contributory cause."

The note of the Superintendent, Civil Veterinary Department, Bengal, shows clearly the evil effects of this "contributory cause." The remarks for the year 1907-08 show that "Brahmini bulls were continued to be taken away by butchers and others from Eastern Bengal and Assam and the lower districts of the Province. This evil assumed such alarming proportions that it had a serious effect on cattle-breeding." The remarks for 1911-12-13 point to another evil. "Another evil which is assuming an alarming aspect is that the Brahmini bulls are taken away by butchers and Mahammadans for meat purposes."

(To be continued.)

Hemendra Prasad Ghose.

WILLOW DROPS.*

By RAM SHARMA.

PART II.

I

When mortal love to heights ethereal flies,
The rarest air oft stops, alas! its breath;
Like pismires new-possessed of wings it dies,
The growing power but heralds fast its death!

II

How oft our dreams foreshadow coming fate!
I dreamt that on the ma gin of a flood
Which curled in many a sparkling—silver fret,
With a pretty flower on my breast I stood.

III

The waters dashed on in resistless flow,
As if they sought in motion wished—for rest;
When lo, it dropped into the stream below—
That pretty flower which adorned my breast.

IV

And shortly after thou wert taken ill,
And flickered then thy life 'tween day and night;
At length thou wert spared,—such was Heaven's will,
But love's sweet flower felt a with'ring blight.

V

And thy look was cold when we met again!
On thy sweet lips one kiss I longed to press;—
I sued with earnest voice but sued in vain;
Coldly in scorn thou turned'st thy icy face.

VI

All wild, mad with despair I came away,
While tear-drops fast from conscious heaven fell;—
Nor once—as was thy wont—thou bad'st me stay,
Nor once, O madd'ning thought, bad'st me farewell!

VII

I thought it was a case of love in pout,—
I thought thou wert sullen at some offence
I knew not;—time hath since dispelled my doubt,—
Alas, thy coldness had a deeper sense!

VIII

I yearned—appealed for one short interview;
Coldly thou spurned'st my passionate appeal,—
Cold—cold was thy reply;—thy words were few,
But sharp and cutting as the keenest steel.

IX

Thy letters penned in passion's blooming hour—
The treasured relics dear of days of yore—
As now I read, each word hath still such pow'r,
With gushing floods at once my eyes brim o'er.

X

Were these dear words traced by those cruel fingers?
Were they dictated by that cruel heart?
Ah, each word is a charm where Cupid lingers,
Like a well-pleased guest still loth to depart.

XI

That such a heart should dwell in such a mould—
A wonder and a marvel seems, I own;
It is like iron cased in softest gold:—
The diamond shines, but oh 'tis still a stone!

XII

And days and weeks and months have come and fled,
And still thyself thou wrapp'st all in pride,—
While ever more I languish—all but dead—
A widower lone, with a living bride!

XIII

The fire that lives the lofty tree within,
All wildly breaking forth, consumes the wood;—
Just so the flame that burns in me unseen,
Now fiercely raging makes my heart its food.

XIV

'T is said the cause away the evil ceases,
In love, howe'er, this truth but scarcely holds;
For in thy absence still my pain increases,
And grief coils round my mind her crushing folds.

XV

Man's passions, like refracted rays of light,
Chameleonize all things on which they play;
Now my despair, into the noon of night,
Turns, as by magic black, the noon of day.

XVI

There's gloom on earth, and gloom in sky and air,
Gloom in mead—gloom in street—gloom in my room;
Gloom—gloom in sun and moon and stars so fair.—
And in my heart,—the darkness of the tomb!

XVII

Though false to truth and faithless to thy vow,
Though grown so cold—unkind—and hard to me,
Though like the fickle moon inconstant thou;—
Like dews to dusk, I still am true to thee!

XVIII

O truth in happier hours between us plighted!
O promises by her so oft repeated!
O vows so warmly made, but now so slighted!
O Love,—all-conquering Love, by her defeated!

XIX

Where are ye fled? Ah, cast to winds of heav'n!
But still my heart, as looks a blasted tree
Skywards whence flashed the fire by which 't was riv'n,
Turns to its tyrant, turns, my love, to thee!

XX

Thou didst love me once as thy own dear breath,
And call me, "my life," sitting by my side;
Beseems thee then with scorn to cause my death,
My death? nay, rather thy own suicide!

XXI

Melt—melt, thou flinty soul, O melt again
In streams of love, and fresh'n my withered heart;
Soften that breast where once my head hath lain,
And be, my Goddess, kind as once thou wert!

XXII

I cannot bear this torturing, wild unrest,—
I cannot bear this cruel, ling'ring death;
O come, if Pity yet doth sway thy breast,
And with one killing glance remove my breath!

Dec, 1873.

---

*ERRATA.

Some printing mistakes have inadvertently crept in in "The Willow Drops" by Ram Sharma, which appeared in our last issue of Anathbandhu, and which we hasten to correct us below;—

Stanza 4th, line 3rd—
Read Wither'd for Smither'd.
Stanza 12th, line 2nd—
Read pouting for panting.
Stanza 18th, line 3rd—
Read Vishnu for Vishon.
Stanza 21st, line 2nd—
Read trembling for tumbling.
Stanza 21st, line 3rd—
Read peri for pearl.
Stanza 26th, line 3rd—
Read circle's for archis.

Eastern and Western Ideals.

IN the course of his presidential address at the last annual meeting of the Calcutta University Institute, H. E. Lord Ronaldshay said :—

Now, gentlemen, there are a few words, if you will bear with me, which I should like to say upon the subject of your studies. You, the students of Calcutta, are the trustees of posterity. You, the students of to-day, will be the citizens of to-morrow. You, the heirs of the civilization of the East, are being given through the agency of the Western tongue an education which is the product of the civilization of the West. Now it is, perhaps, rather rash to generalise in matters of this kind but I don't think I should be far wrong if I were to say that when Western education was first introduced into Bengal there was a tendency for those who came under its immediate influence to adopt, without discrimination, not only the teachings but also the ways and modes of life of Europe. After a time re-action against this excessive westernisation of the East took place and there are in Bengal, I believe, to-day Indian gentlemen who have themselves enjoyed the benefits of Western education but who look with dismay, indeed, I do not think I should be wide of the mark now if I said, look with horror upon the prospect of a further westernisation of Bengal. Let me quote here in the words of a speech which I was reading not very long ago and which are typical of that point of view. The gentleman in question spoke thus :—"Western education has given rise to a kind of soulless culture in our midst—a culture that is powerless for good but is ambitions of much. . . . Mimic Anglicism has become an obcession with us ; we find its black footprint in every walk and endeavour of our life. . . . We have become hybrid in dress, in thought, in sentiment and culture, and are making frantic attempts to become hybrid even in blood."

Now, gentlemen, this is an extreme view. It is an exaggerated view and I think it is a wrong view. But while I think it is a wrong view, I think I can understand the frame of mind of the man who spoke these words. In his opinion the westernisation of Bengal means the destruction of the genius of Bengal, and the genius of Bengal is a very real and a very precious thing. It is a spiritual force of great potentiality which has been fashioned by the hand of destiny in the glowing crucible of time. The culture of Bengal has been fashioned by forces which are different from the forces which have fashioned the culture of the West, and in his opinion the Indian who adopts in *toto* the culture, the thought, the ways and modes of life of the West is something artificial—a mere mimic of a man, whose soul has become atrophied leaving a mere empty husk. Now, gentlemen, as I have said, I think that view is a very wrong view, but there is a moral to be drawn from it which I would commend to your careful attention and that is this : that you should bring to bear upon the Western teaching that you receive, a discerning and discriminating mind. You may benefit enormously by the arts and the science of the West, but believe me, it is not necessary in order that you should so benefit you should cut yourselves entirely adrift from your own paths.

Let me give you an example of what I mean. It is not necessary to adopt all the customs of Europe because you desire to benefit from the fruits of your European teaching. Let us take a quite simple example :—the drinking of wines or spirits is a common custom

in European countries and in the case of people who live in a temperate climate, it is not injurious so long of course as moderation is observed. It does not follow, however, that the same custom is suitable to people brought up in a different way and living in a different climate. I have quoted that example because I was much interested in reading a short time ago extracts from the autobiography of a well-known Bengali gentleman of the last century, Babu Raj Narain Bose. In his autobiography I find these words:—"It was a common belief of the alumni of the College that the drinking of wine was one of the concomitants of civilization. . . . At the beginning of 1884 I became dangerously ill and the cause of it was excessive drinking." Well, that is one small example to illustrate what I mean.

Now let me give you another. It does not follow that because a Bengali artist studies anatomy on Western lines he need, when he sits down to paint a portrait divest himself of the artistic conceptions of his own country. Far from it. He may be a better artist by reason of the fact that he has made a scientific study of anatomy but at the same time he need not divest from his painting the spirit of his own people.

Take another example. Sir Rabindra Nath Tagore has not disdained to come into contact with the culture of the peoples of Europe and America. Is it maintainable, therefore, that he does not in his writings give expression to the very spirit of Bengal? Does not Bankim Chandra Chatterjee portray the very soul of Bengal burdened with fruits, green with its rice fields, cooled with the southern breezes?

Or take another example. What about Sir Jagadish Chandra Bose? Is not Sir Jagadish Chandra Bose a great representative of Bengal? And is it not a fact that because he has carried on his investigations on the lines of Western science, he had added immeasurably to the lustre of Bengal? Let me put it in another way. Would that great man Raja Ram Mohan Roy have ever been the great man that he was—the great Bengali that he was—if he had not drunk deep of the wells of Western thought? So my advice to you, gentlemen, is this that you should tread the golden path of the happy mean. Take a discriminating and intelligent interest in your Western studies, but do not cut yourselves adrift from the spiritual instincts which are your immortal birthright, and do not jump to the conclusion, as is so often done, quite wrongly, that the culture and civilization of the West is built up upon a purely materialistic basis. No, you must benefit by all the instruction in Western science, Western art and Western throught which you will get in this University and I would beg you, each man according to his ability, to play his part in weaving the golden threads of Indian idealism into the more sombre way of Western empiricism, for in that way he will play his part, a worthy part in weaving under Providence that great cosmic pattern which embodies the strivings and achievements and which represents the evolution not of this people or of that people, not of this country or of that country, not of this race or of that race, but of mankind.

At the crossing.

II.

WE are at the parting of ways: the angle of vision has changed. The whole civilized world has come to form quite a different opinion of India. Our rulers themselves are prepared to consider any constructive programme for the future administration of India. Since their occupation of the country they have been doing their very best, according to their own light, for the advancement of India. The Indians themselves have caught up the idea and have been proceeding along those lines But the time has come when the question of the future has forced itself upon the minds of all. It is not the Indians alone but all the nations of the world who are busy preparing plans for the future. "The whole state of Society" to quote Lloyd George, "is, more or less, molten and you can stamp upon that molten mass almost anything so long as you do so with firmness and determination. It is therefore very important that the imprint which is left is a clear one." The present generation is the trustee of the future generations and the present generation owes it to God, to itself and to the future generations to see not only that the imprint which is left is a clear one but they have also to decide upon the nature of the imprint to be left. The matter for our consideration now is, therefore, whether we should proceed along the lines on which we have been moving for the last hundred years or more—whether we should import *en bloc* western civilization and western culture with all their attendant institutions, political, social, commercial and industrial or whether we should strike a different line. We should carefully consider if modern civilization and modern culture are suited to the genius of the people of this country or if some modification in that civilization and in that culture is required. In order to arrive at a proper conclusion the first thing necessary is a careful examination of modern civilization and modern culture.

A tree is to be judged by its fruit and the fruit of western civilization has not been found to be what was claimed for it. It has been asserted that western civilization is the most perfect civilization that the world has yet seen. Before examining this proposition from the general point of view, it would not be useless to see what some of the western thinkers—some of the highest products of that very civilization—have got to say on the subject. Huxley says:—"Even the best of modern civilization appears to me to exhibit a condition of mankind which neither embodies any worthy ideal nor even possesses the merit of stability. I do not hesitate to express the opinion that if there is no hope of a large improvement of the condition of the greater part of the human family; if it is true that the increase of knowledge, the winning of a greater dominion over nature which is its consequence, and the wealth which follows upon that dominion, are to make no difference in the extent and the intensity of want with its concomitant physical and moral degradation amongst the masses of the people, I should hail the advent of some kindly comet which would sweep the whole affair away as a desirable consummation." ('Government: Anarchy or Regimentation.' Collected Essays, vol I.) Again, Marie Corelli, belonging to quite a different school of thoughts, says: "Civilization is a great word. It reads well—it is used everywhere—it bears itself proudly in the language. It is a big mouthful of arrogance and

self-sufficiency. The very sound of it flatters our vanity and testifies to the good opinion we have of ourselves. We boast of civilization as if we were really civilized just as we talk of "Christianity" as if we were really Christians. Yet it is all the veriest game of make-believe, for we are mere savages still: savages in the 'lust of the eye and pride of life'—savages in our national prejudices and animosities, our jealousies, our greed and malice and savages in our relentless efforts to overreach or pull down each other in social and business relations."—*(Nash's Magazine.)*

Modern Civilization—modern civilization and western civilization are practically convertible expressions—is based upon what is termed Natural Science. The inventions and discoveries of the last two centuries are at once the wonder and glory of the present age. They are proudly pointed out as unparalleled in any other period in the history of the world. Sir E. Ray Lankester thus sums up the effect of these inventions and discoveries upon modern civilization:— "And it is to this world of knowledge built up and applied to the industries and well-being of human communities that we owe our modern civilization, our steam engines, railways, ocean ships, our chemical manufactures, our electric telegraphs, lighting and power transmission, our healthier food and habitations, our fuller and safer lives." (The Rationalist Press Association Annual for 1915, p 11.) Steam and electricity by annihilating distance have made it possible for the Western nations to acquire vast empires and to hold them. It has been claimed by more than one authority that the discoveries of modern science have made modern civilization stable and permanent unlike the ancient civilizations of Babylon and Carthage, of Rome and Greece. But, on the other hand, the discoveries of modern science—aeroplanes, zappelins, lyddite shells, long range guns—have also made possible the present world-wide cataclysmal strife. The last three years have amply proved that it is those very discoveries of modern science that have made the conflict assume such dimensions the ultimate effect of which one cannot even guess. General Smuts, the South African soldier and statesman speaking the other day at a meeting of the League of Nations Society, said:— "Civilization itself was almost crumbling to pieces and if some means were not found to prevent war in future the whole fabric of civilization was in danger." Another writer from London says in the *Englishman*:— "Looked at coldly and dispassionately the news from all the nations that are participants in the war show that a gradual process of disintegration is going on." It would not be wide of the mark to say that it is modern civilization alone based as it is upon the scientific discoveries of the age, which has made the present war possible. General Sir William Robertson (Chief of the General Staff) speaking at the Newspaper Press Fund Dinner on the 12th May last, is reported to have said: "No war had so differed from its predecessors as the present one. Aeroplanes had entirely changed the character of operations. The enormous masses of artillery rendered the preparation for battle a long process, requiring an elaborate system of transport. We had expended in five or six weeks 2,00,000 tons of ammunition in France alone, and had conveyed thither 50,000 tons a week." Again Mr. Percival Phillips, in a description of the fighting at Bullecourt, says: "It was scientific warfare of the type the Germans introduced in 1915, flame machines and gas shells being used freely." It is these scientific discoveries alone which have made possible the present carnage unparallaled in point of immensity in the history of the world—ancient or modern—the actual extent of which can be gathered from the following extract from the same speech of Sir William Robertson referred to above:— "The greatest peculiarity

of the war was the colossal numbers engaged, amounting to something like 24,000,000. In the Franco-Prussian War of 1870 the armies numbered 100,000 to 200,000 each, and at Granelotte, where the casualties were highest, the losses reached 30,000 for both sides, while for the whole war the total of killed and wounded was below half-a-million, whereas in the present war the killed alone were counted by the million. It was not a war between armies, but a war between nations; and no man or woman in the empire was not doing something to win or lose the war." Does it not therefore stand to reason that before we adopt western institutions which are the products of a civilization of which the latest outward manifestation is the present holocaust of blood in Europe, we should carefully analyse that civilization and find out what there is in it or rather what there is *not* in it, which can account for the present war and see if our own ancient civilization cannot be made to assimilate all the good points in modern civilization and while retaining our own individuality we cannot take our proper place among the other nations of the world.

N. C.

Water-Supply in Bengal.

THE following Circular has recently been issued by the Government of Bengal on the important question of water-supply in the province.—L. S. S. O'Malley, Esq, I. C. S., Secretary to the Government of Bengal has addressed the following circular to all Commissioners of Divisions.

Sir,—I am directed to refer to the instructions contained in Mr. Samman's letter No. 388-92M., dated the 7th February 1914, and in Mr. De's letter No. 2319-23 L. S. G., dated the 25th September 1915, regarding the utilization of the public works cess. In the former letter District Boards were informed of the desirability of devoting a substantial portion out of the public works cess for the sanitation of villages and small towns, the improvement of the water-supply and anti-malarial operations. In the latter they were advised to utilize large sums for the excavation of tanks in rural areas.

2. The manner in which the District Boards have exercised their discretion in spending the public works cess on the provision or improvement of water-supply was reviewed in paragraph 15 of the resolution on the working of District Boards during 1915-16. It was observed that during the year 25-3 per cent of the cess was spent on water-supply by all the Boards taken together, but that in some districts, the proportion which the expenditure on water-supply bore to the public works cess receipts was under 11 per cent, while in one district it was as low as 6 per cent. It was also pointed out in paragraph 23 of the resolution that the amount actually spent was practically the same as in the preceding year and that in some districts there was a slackening off of the efforts for the improvement of water-supply.

3. It will be seen from the table given in paragraph 15 of the resolution above referred to which shows the average expenditure on certain heads during the three years preceding and immediately following the surrender of the public works cess, that the average annual expenditure on civil works during the latter triennium exceeded that for the triennium ending in 1912-13 by approximately 21½ lakhs. The amounts available for expenditure on communi-

cations consist of the road cess receipts and of the augmentation grant, in the utilization of which it was laid down in Government order No. 26 L. S. G., dated the 3rd April 1905, that preference should be given to expenditure on roads and bridges in all cases in which additional outlay on such works should be incurred with advantage. The undermentioned table shows that during the last two years the expenditure on communications has largely exceeded the receipts from both these sources, though the augmentation grant is intended for educational and medical purposes and for veterinary relief, as well as for communications and that the excess has increased to a remarkable extent since the transfer of the public works cess. The excess can only have been met from the funds made available by this transfer, and it is apparent therefore that the public works cess receipts are being used not only for objects specified by Government, but also to a disproportionately large extent for the construction of new roads and the improvement of old roads.

4. The Governor in Council deprecates the tendency to devote to communications large sums in excess of both the road cess receipts and the augmentation grant and desires to reiterate the desirability of utilizing the public works cess for the objects mentioned in Mr. Samman's letter above referred to and especially for the improvement of water-supply. I am accordingly to request that the attention of the District Boards may again be drawn to this important matter, and that their budget estimates may be carefully scrutinized to see that adequate provision has been made for expenditure on water-supply.

The figures are for the years 1913-14, 1914-15, and 1915 16 respectively

Road cess including interest on arrears.	Augmentation grant.	Total.
Rs.	Rs.	Rs.
29.18,638	5,79,874	34,98,512
30,11,639	6,97,032	37,08,671
31,37,152	5,91,688	37,28,844
	Expenditure on communications.	Excess or deficiency.
Rs.	Rs.	Rs
	34,63,466	−35,046
	43,96,011	+6,87,340
	47,01,051	+9,72,211

The question of the supply of pure drinking water in rural areas has become acute. The local press had been drawing the attention of the authorities to it and the Bengal Provincial Conference had year after year passed resolutions requesting the authorities to set free the collection charges of the Road Cess. But evidently neither the press nor the Conference had clearly understood the magnitude of the want.

On the re-partition of Bengal Lord Carmichael became the Governor of the province and took up the question seriously. He appointed a Committee to consider the question of the improvement of Rural Water-Supply. The first meeting of the Committee was held on October 9th, 1912.

In opening the Conference of the Committee Lord Carmichael said—

"During my tours in Eastern Bengal, one of the main subjects of conversation of those who came to see me was the need of a pure water-supply in rural areas. I need not dwell on the importance of the subject, for the fact that you are here is evidence that you already realize it yourselves ; but what struck me most was that among those gentlemen who were most interested in the subject, there was little unanimity as to the best method of tackling the problem. That the water-supply was bad was admitted on all hands, but the

method of providing a pure supply suggested by one gentleman was often, I found, scoffed at by another. * * * The object of bringing you together is not to discuss controversial points as to the best means of providing money, but to discuss the best way of tackling the problem of providing rural districts with a pure water-supply."

The general sense of the meeting was that "the re-excavation of the existing tanks was more important than the excavation of new tanks." The committee were also unanimous in the opinion that "any fresh source of income should be ear-marked for this purpose."

In November, 1913 the public works cesses, amounting to 29 lakhs and odd, were surrendered by the Government of Bengal in favour of the District Boards. But the Government did not ear-mark the amount for rural water-supply leaving it to the discretion of the Boards to utilise it as they thought best, it being understood that water-supply in rural areas would not be neglected.

In 1915 the Government took another step in advance. And on October 14th the following communique was issued—

"Government have recently had under their consideration the question of expenditure by District Boards of the grants on account of Cess to be placed at their disposal during the current year. In view of the agricultural stress experienced in certain parts and the comparative cheapness of labour, it is hoped that these funds will be largely devoted to the much needed improvement of excavating tanks in rural areas. It is believed that thereby immediate employment will be found for local labourers, while a lasting betterment of rural conditions will be effected at a minimum cost. District Boards have been advised where circumstances justify the concession to dispense with the contribution usually expected from the locality in which a tank is constructed."

So in this matter no blame can be shot at the door of the Government which when warmed to its task has nobly endeavoured to remove the crying want of the province. The placing of the Public Works Cess at the disposal of the District Board was an occasion for rejoicing in many quarters; and those who had so often written about the want of drinking water in the mofussil thought that after all they had achieved their end.

Unfortunately the District Boards in several districts failed to realise their responsibility. And a question in the Local Legislative Council asked by the Hon. Rai Mahendra Nath Mitra Bahadur elicited the fact that in many districts the Boards had not striven to grapple the question of rural water-supply. In the Resolution of the Government reviewing the Reports of the working of the District Boards in Bengal during the year 1915-1916 it was said—"Three years have elapsed since the resources of the District Boards were augmented by approximately 30 lakhs owing to the transfer of the Public Works Cess, and it is now possible to review the manner in which they have exercised their discretion in its expenditure. Orders were not issued definitely hypothecating the whole or any part of the Public Works Cess to particular objects; but the District Boards were informed in February 1914 of the desirability of devoting a substantial portion for sanitation, the improvement of the water-supply and anti-malarial measures; while in September 1915 they were advised to utilize large sums for the excavation of tanks in the rural areas." But "taking the figures for the Province as a whole, 23·3 per cent of the Public Works Cess was spent on water-supply, during the year under review, and the Governor in Council recognizes that there has been a considerable advance in providing good drinking water in rural areas. Fuller use should however, in his opinion, be made of the large resources now at the disposal of District Boards. It may sometimes be difficult to spend large

amounts with advantage because programmes and detailed schemes may not have been prepared and the necessary organization is not ready; but these difficulties should not exist in districts where a water survey has been carried out, and Commissioners of Divisions will be directed to scrutinize the budget estimates carefully and satisfy themselves that adequate provision has been made for expenditure on water-supply."

Thus it appears that though the tendency of the Government has been gradually to minimise the control of the Commissioners on the budgets of the Boards the delinquent Boards have themselves by their gross neglect of duty made it necessary for the Government to direct the Commissioners "to scrutinize the budget estimates carefully and satisfy themselves that adequate provision has been made for expenditure on water-supply." A sad commentary on Bengal's demand for a larger measure of local self-government!

Hemendra Prasad Ghose.

The Indian Match Industry.

HITHERTO one of the chief difficulties the match industry in India has had to encounter has been the difficulty of extraction from the high elevations at which woods suitable for the purpose of match-making are to be found, a difficulty which it is thought can probably be overcome by mechanical extraction. It is noted in the Government report on the Forest Department, says the *Indian Daily News*, that in Central and Southern India the cost of extraction to a line of communication, and the high freight on the timber in the rough to the factory, are prohibitive, and here it is considered that the solution lies in the formation of plantations. In Northern India where far superior wood for the purpose is obtainable in the silver fir and the spruce, which grow at high elevation in the Himalayas, it is suggested that the solution may be found in the erection of portable or semi-portable splint machines in the hills, in the vicinity of the spruce and silver fir forests, and by transporting the prepared splints to central match factories in the plains, a system of working which it is understood has been inaugurated in Japan and elsewhere. There are at present eight large match factories at work in India, and a number of smaller ones working with a more limited outturn. That the foreign match trade is well worth capturing, in whole or in part, is shown by the fact that the import of matches had grown in value from Rs. 49 lakhs in 1904-1905 to Rs. 113 lakhs in 1914-1915. Sweden and Norway used to send the bulk of the matches used in this country until Japan, owing to the careful manipulation of the trade by the Japanese combine of manufacturers and shippers, have now practically captured the Indian trade at the expense of Norway and Sweden. These imported matches are sold at such extraordinary cheap rates that the Indian trade, handicapped as it is by excessive freights, not only for landing the timber in the round at the factory site, but in connection with imports of chemicals and the distribution of the manufactured product, cannot compete with them. There is no scarcity of suitable timber, and there are large factories already in existence. But the difficulties above enumerated prevent the timber from being brought to the factory at a cost that will allow the indigenous article to compete with the foreign importations. So far, no means have been found to overcome these difficulties.

Ruskin on Work.

2

There is, then, no worldly distinction between idle and industrious people; and I am going to-night to speak only of the industrious. The idle people we will put out of our thoughts at once—they are mere nuisances—what ought to be done with *them*, we'll talk of at another time. But there are class distinctions among the industrious themselves;—tremendous distinctions, which rise and fall to every degree in the infinite thermometer of human pain and of human power,—distinctions of high and low, of lost and won, to the whole reach of man's soul and body.

These separations we will study, and the laws of them, among energetic men only, who, whether they work or whether they play, put their strength into the work, and their strength into the game; being in the full sense of the word 'industrious,' one way or another—with purpose, or without. And these distinctions are mainly four:

I. Between those who work, and those who play.

II. Between those who produce the means of life, and those who consume them.

III. Between those who work with the head, and those who work with the hand.

IV. Between those who work wisely, and those who work foolishly.

For easier memory, let us say we are going to oppose, in our examination,—

I. Work to play;

II. Production to consumption;

III. Head to hand; and,

IV. Sense to nonsense.

I. First, then, of the distinction between the classes who play. Of course we must agree upon a definition of these terms,—work and play, before going farther. Now, roughly, not with vain subtlety of definition, but for plain use of the words, 'play' is an exertion of body or mind, made to please ourselves, and with no determined end; and work is a thing done because it ought to be done, and with a determined end. You play, as you call it, at cricket, for instance. That is as hard work as anything else; but it amuses you, and it has no result but the amusement. If it were done as an ordered form of exercise, for health's sake, it would become work directly. So, in like manner, whatever we do to please ourselves, and only for the sake of the pleasure, not for an ultimate object, is 'play,' the 'pleasing thing,' not the useful thing. Play may be useful, in a secondary sense; (nothing is indeed more useful or necessary); but the use of it depends on its being spontaneous.

Let us, then, enquire together what sort of games the playing class in England spend their lives in playing at.

The first of all English games is making money. That is an all absorbing game; and we knock each other down oftener in playing at that, than at football, or any other roughest sport: and it is absolutely without purpose; no one who engages heartily in that game ever knows why. Ask a great money-maker what he wants to do with his money,—he never knows. He doesn't make it to do anything with it. He gets it only that he *may* get it. 'What will you make of what you have got?' you ask. 'Well, I'll get more,' he says. Just as, at cricket, you get more runs. There's no use in the runs, but to get more of them than other people is the game. And there's no use in the money, but to have more of it than other

people is the game. So all that great foul city of London there,—rattling, growling, smoking, stinking,—a ghastly heap of fermenting brick-work, pouring out poison at every pore,—you fancy it is a city of work? Not a street of it! It is a great city of play; very nasty play, and very hard play, but still play. It is only Lord's cricket-ground without the turf:—a huge billiard-table without the cloth, and with pockets as deep as the bottomless pit; but mainly a billiard-table, after all.

Well, the first great English game is this playing at counters. It differs from the rest in that it appears always to be producing money, while every other game is expensive. But it does not always produce money. There's a great difference between 'winning' money and 'making' it: a great difference between getting it out of another man's pocket into ours, or filling both. Collecting money is by no means the same thing as making it; the tax-gatherer's house is not the Mint; and much of the apparent gain (so called), in commerce, is only a form of taxation on carriage or exchange.

Our next great English game, however, hunting and shooting, are costly altogether; and how much we are fined for them annually in land, horses, gamekeepers, and game laws, and all else that accompanies that beautiful and special English game, I will not endeavour to count now; but note only that, except for exercise, this is not merely a useless game, but a deadly one, to all connected with it. For through horse-racing, you get every form of what the higher classes everywhere call 'Play,' in distinction from all other plays; that is—gambling; by no means a beneficial or recreative game: and, through game-preserving, you get also some curious laying out of ground; that beautiful arrangement of dwelling-house for man and beast, by which we have grouse and blackcock—so many brace to the acre, and men and women so many brace to the garret. I often wonder what the angelic builders and surveyors—the angelic builders who build the 'many mansions' up above there; and the angelic surveyors who measured that four-square city with their measuring reeds—I wonder what they think, or are supposed to think, of the laying out of ground by this nation, which has set itself, as it seems, literally to accomplish, word for word, or rather fact for word, in the persons of those poor whom its Master left to represent him, what that Master said of himself—that foxes and birds had homes, but He none.

Then, next to the gentlemen's game of hunting, we must put the ladies' game of dressing. It is not the cheapest of games. I saw a brooch at a jeweller's in Bond Street a fortnight ago, not an inch wide, and without any singular jewel in it, yet worth £3000. And I wish I could tell you what this 'play' costs, altogether, in England, France, and Russia annually. But it is a pretty game, and on certain terms I like it; nay, I don't see it played quite as much as I would fain have it. You ladies like to lead the fashion:—by all means lead it—lead it thoroughly—lead it far enough. Dress yourselves nicely, and dress everybody else nicely. Lead the *fashions for the poor* first; make *them* look well, and you yourselves will look in ways of which you have now no conception, all the better. The fashions you have set for some time among your peasantry are not pretty ones; their doublets are too irregularly slashed, and the wind blows too frankly through them.

Then there are other games, wild enough, as I could show you if I had time.

There's playing at literature, and playing at art;—very different, both, from working at literature, or working at art, but I've no time to speak of these. I pass to the greatest of all—the play of plays, the great gentleman's game, which ladies like them best to play at,—the game of War. It is entrancingly pleasant to the imagination; the facts of it, not always so pleasant. We dress for it, however, more finely

than for any other sport ; and go out to it, not merely in scarlet, as to hunt, but in scarlet and gold, and all manner of fine colours ; of course we could fight better in gray, and without feathers ; but all nations have agreed that it is good to be well dressed at this play. Then the bats and balls are very costly ; our English and French bats, with the balls and wickets, even those which we don't make any use of, costing, I suppose, now about fifteen millions of money annually to each nation ; all which you know is paid for by hard labourer's work in the furrow and furnace A costly game !—not to speak of its consequences ; I will say at present nothing of these. The mere immediate cost of all these plays is what I want you to consider ; they all cost deadly work somewhere, as many of us know too well. The jewel-cutter, whose sight fails over the diamonds ; the weaver, whose arm fails over the web ; the iron-forger, whose breath fails the furnace—*they* know what work is—they, who have all the work, and none of the play, except a kind they have named for themselves down in the black north country, where 'play' means being laid up by sickness. It is a pretty example for philologists, of varying dialect, this in the sense of the word as used in the black country of Birmingham, and the red and black of Baden Baden. Yes, gentlemen, and gentlewomen, of England, who think 'one moment unamused a misery not made for feeble man,' this is what you have brought the word 'play' to mean, in the heart of merry England ! You may have your fluting and piping ; but there are sad children sitting in the market-place, who indeed cannot say to you, 'We have piped unto you, and ye have not danced ;' but eternally shall say to you, 'We have mourned unto you, and ye have not lamented.'

This, then, is the first distinction between the 'upper and lower' classes. And this is one which is by no means necessary ; which indeed must, in process of good time, be by all honest men's consent abolished. Men will be taught that an existence of play, sustained by the blood of other creatures, is a good existence for gnats and sucking fish ; but not for men : that neither days, nor lives, can be made holy or noble by doing nothing in them : that the best prayer at beginning of a day is that we may not lose its moments ; and the best grace before meat, the consciousness that we have justly earned our dinner. And when we have this much of plain Christianity preached to us again, and enough respect what we regard as inspiration, as not to think that 'Son, go work to-day in my vineyard,' means 'Fool, go play to-day in my vineyard,' we shall all be workers in one way or another ; and this much at least of the distinction between 'upper' and 'lower' forgotten.

[*To be continued.*
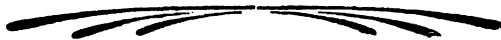
প্রথম বর্ষ। | মাঘ। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | অষ্টম সংখ্যা।

ত্রিধারার গান।

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্.]

আমরা ত্রিধারা, সারা ত্রিভুবনে, বহি' পুলকের কাহিনী,
আঁকিয়া বাঁকিয়া, নানা পথ দিয়া, চলেছি সাগর-বাহিনী,
চির যুগ ধরি' চলিয়াছি শুধু, প্রাণ ভরি গান গাহিয়া,
তোমাদের দ্বারে, আসি বারে বারে, তোমাদেরই মুখ চাহিয়া,
আনন্দ-সাগরে, চলিয়াছি মোরা, আনন্দ-উৎসে জনমি',
আনন্দময়ের চরণ-কমলে উর্ম্মির ছলে প্রণমি'।

কুলু কুলু স্বরে, কত স্নেহভরে, তোমাদের ঘরে আসিয়া,
শিশু বেশ ধরি' কত খেলা করি, কত না কাঁদিয়া হাসিয়া,
আবার কখন, ধরণী-শোভন, বহি যৌবন-তরণী,
মাটীর বিশ্ব, প্রেমের মন্ত্রে, হ'য়ে যায় হেম-ধরণী,
বৃদ্ধের বেশে, দেখা দিয়া শেষে, শান্ত-মধুর-আননে,
এই ধরণীরে করি পরিণত ঋষিদের তপঃ-কাননে।

ভূলোকে দ্যুলোকে, পরম পুলকে, বাজনা যাঁহার বাজিছে,
নিখিল বিশ্বে, সকল দৃশ্যে, পদ-রেণু যাঁর রাজিছে,
তাঁহারই আমরা, ত্রিতার-যন্ত্র, ত্রিধারা হইয়া বহি গো,
জগৎ জনের প্রাণের ভিতরে, তাঁহারই বারতা কহি গো,
বলি পুনঃ পুনঃ, শুন ভাই শুন, থেকো না জীবনে মরিয়া,
ত্রিধারার জল করহ সম্বল, সংসার যাবে তরিয়া।

ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না নাড়ীর, সূক্ষ্ম আকার ধরি' রে,
আমরা কি আনি, মুক্তির বাণী, মর্ত্ত্য প্রাণীর শরীরে,
সত্ত্ব ও রজঃ, তমঃ উপাদানে, মোদের ত্রিধারা গড়া কি,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশের গানে, মোদের ত্রিধারা ভরা কি,
অথবা আমরা কর্ম্ম জ্ঞানের সঙ্গে মিলাই ভকতি,
মোদের ধারায় সবই আছে হায়!—বোঝ যদি থাকে শকতি।

মৃত্যুঞ্জয়ী ধারা, আমাদের জয়, করে জরা-মরণে,
তাই ফুলে-ফলে, মুকুলে-ফসলে, শোভে ধরা নানা বরণে,
মানবের দেহে, মানবের গেহে, মানবের মহা সমাজে,
নিতে পুরাতন, আনিতে নূতন, মোদের ত্রিধারা বিরাজে,
নব-জন্মের, উন্মেষ মোরা, দেখি মৃত্যুর আঁধারে,
শ্মশানের পাশে, সূতিকার ঘর, আছে পর পর বাঁধা রে।

আমরা ত্রিধারা, নহি পথ-হারা, পরমেশ-পদ পরশি',
আসি ভব হিতে, দিতে এ সংসারে, স্বরগ-সুধার সরসী,
চিরদিনই হায়! মায়া কি তোমায়, র'বে চারিধারে ঘিরিয়া,
দ্বারে দ্বারে আসি' ত্রিধারার ধারা, বারে বারে যাবে ফিরিয়া?
এ অকূল ভব-জলধির যদি, পেতে চাও কূল-কিনারা,
স্মরি ভগবান, করি নাম গান, পান কর তাঁর ত্রিধারা।

কাশী-নরেশ

মহারাজ সার্ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর, জি. সি. আই. ই.।

কাশীর রাজগণ ব্রাহ্মণ। ১৭৩০ অব্দে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহ গঙ্গাপুরের জমীদার মনসারামকে কাশীর রাজা মনোনীত করেন। ইনি ত্রিকর্ম্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনসারামের পুত্র বলবন্ত সিংহ ১৭৪০ অব্দে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইহার পর চেৎ সিং কিছুদিন কাশীর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। চেৎ সিংহ সিংহাসনচ্যুত হইলে পর ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ রাজা বলবন্ত সিংহের দৌহিত্র মহীপনারায়ণকে বারাণসীর জমীদারী প্রদান করেন। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুত সার্ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর সেই মহীপনারায়ণ সিংহেরই প্রপৌত্র।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহারাজ সার্ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহীপনারায়ণের পৌত্র রাজা ঈশ্বরীনারায়ণ প্রসাদের পোষ্যপুত্র। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি এক জন প্রতিভাশালী পুরুষ এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরাজা। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষায় ইঁহার প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইঁহার কার্য্যে সরকারও বিশেষ সন্তুষ্ট। সেই জন্য ১৮৯২ অব্দে ইনি K. C. I. E. এবং ১৮৯৭ অব্দে G. C. I. E. উপাধিপ্রাপ্ত হন। মহীপনারায়ণকে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সামান্য জমীদার বলিয়া সনন্দ প্রদান করাতে এই বংশের সামন্তরাজোচিত ক্ষমতা কিছুদিনের জন্য লুপ্ত হয়। সরকার বাহাদুর ১৯১১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখেই ইঁহাকে বারাণসীর সামন্তরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র কুমার শ্রীযুত আদিত্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ১৮৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি এলাহাবাদে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এখন বিষয়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। কুমার সাহেব যুক্তপ্রদেশের এক জন খ্যাতনামা সদস্য।

বারাণসীতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থাপনে মহারাজ প্রভুনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার স্বদেশভক্তি ও স্বধর্ম্মানুরাগের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠ নরপতি অতি অল্পই আছেন। রাজপুরুষগণও অনেক সময় ইঁহার পরামর্শ লইয়া কাজ করিয়া থাকেন।

কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির।

প্রাচীনকালে হুয়েন্থসাং প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকগণ বারাণসীধামে যে বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমান বিশ্বেশ্বরের মন্দির হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত ছিল। এখন যে স্থানে আদি বিশ্বেশ্বরের মন্দির অবস্থিত, তাহার নিকটেই সেই মন্দির ছিল। তথায় যে বিশ্বনাথের বিগ্রহ ছিল, তাহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৬ হস্ত। কান্যকুব্জ বিজয় করিয়া মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি সালার মাশুদ গাজী যখন বারাণসীধাম লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি বিশ্বেশ্বরজীর সেই লোকপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। মন্দির বিধ্বস্ত হইলে পর হিন্দুরাজগণ ঐ স্থানে পুনরায় বিশ্বেশ্বর-মন্দির নির্ম্মিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণ তাঁহাদিগকে উক্ত মন্দির পুনর্গঠিত করিবার অনুমতি প্রদান করেন নাই। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির মাশুদ গাজী কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

অবশেষে যখন খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে মুসলমান সম্রাট্‌দিগের মূর্ত্তিমান গৌরব আকবর বাদশাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন, তখন জয়পুরের রাজা মানসিংহ সেই প্রাচীন মন্দিরের প্রায় দেড় শত ফিট দক্ষিণে এক অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে সঙ্কীর্ণচেতা ঔরঙ্গজেব সেই সুন্দর মন্দির বিধ্বস্ত করিয়া তাহার স্থানে এক প্রকাণ্ড মস্‌জিদ নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন।

ঐ মন্দির বিধ্বস্ত হইলে পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইন্দোরের প্রাতঃস্মরণীয়া কীর্ত্তিমতী মহারাণী অহল্যাবাঈ বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দির উচ্চে ৫১ ফিট হইবে। অনন্তর শিখরাজ পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ উহার গুম্বজ ও চূড়া সুবর্ণদ্বারা মণ্ডিত করিয়া দিয়াছেন। সেই জন্য য়ুরোপীয়রা ইহাকে Golden Temple বা হৈম-মন্দির বলিয়া থাকেন। 'অনাথবন্ধু'র প্রচ্ছদপৃষ্ঠায় এবার যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে, উহাই সেই গুম্বজ ও চূড়ার মনোহারিণী প্রতিকৃতি।

এই মন্দিরমধ্যে রাণী অহল্যাবাঈ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। ইহা ভিন্ন ইহাতে নেপালরাজপ্রদত্ত একটি সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ঘণ্টা আছে। মন্দিরস্থ অন্যান্য সমস্ত ঘণ্টা অপেক্ষা এই ঘণ্টাটি বৃহত্তর।

বিশ্বেশ্বরের বর্ত্তমান মন্দিরটি পূর্ব্ব মন্দির অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। ঔরঙ্গজেব যে মন্দির বিনষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহার চারি ভাগের এক ভাগ হইবে। শুনা যায়, বাবা বিশ্বনাথ স্বপ্নে ভক্তবৃন্দকে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ স্থানে আবির্ভূত হইবেন। সেই জন্য ঐ স্বল্প পরিসর স্থানে তাঁহার মন্দির রচিত হইয়াছে। মন্দিরের তুলনায় নাট-মন্দির আরও ক্ষুদ্র। স্থানাভাবই ক্ষুদ্রত্বের কারণ।

ঔরঙ্গজেবের মস্‌জিদের পশ্চাদ্ভাগে মানসিংহ-রচিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে। উহা এখন তথায় হিন্দু শিল্পের গৌরবকেতন ও ঔরঙ্গজেবের ধর্ম্মান্ধতার কীর্ত্তিকেতন উড্ডীন করিতেছে। উহা যে বিনষ্ট হইয়াছে, সে দোষ কালের নয়, সে দোষ কপালের।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

৮

ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ কে ?—পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে সর্পরূপী নহুষ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, যে সময় নহুষ এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই সময় ভারতে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত ছিল; তখন দেশে মুনি ঋষিরা ছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালক ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গোপ্তা ছিলেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাকে নহুষ হঠাৎ 'ব্রাহ্মণ কে' এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন কেন? বিশেষতঃ, সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর ভীমসেনের জীবন-মরণ নির্ভর করিতেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে প্রশ্নটি যে বিশেষ কঠিন এবং সাধারণে তাহার উত্তর দিতে অসমর্থ, ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। নহুষের প্রশ্নটি এই,—

"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্ রাজন্? বেদ্যং কিঞ্চ যুধিষ্ঠির?" অর্থাৎ হে রাজন্, ব্রাহ্মণ কে? আর বেদ্যই বা কি? এই প্রশ্নের ভিতর একটু মারপ্যাঁচ আছে। ইহার ঠিক অর্থ এই,—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ ত অনেক দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সত্য সত্যই ব্রাহ্মণ কে? আর বেদ্য অর্থাৎ জানিবার বিষয় ত অনেকই আছে, কিন্তু সত্য সত্যই জানিবার বিষয় কি অর্থাৎ যাহা জানিলে আর কিছু জানিবার প্রয়োজন হয় না, সেই জ্ঞাতব্য বিষয়টি কি? এই দুইটি প্রশ্ন ঠিক একই ভঙ্গীতে রচিত—একই সুরে গাঁথা। নহুষও জানিতেন যে, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতির আলোচিত বিষয়গুলিও বেদ্য। বিদ্যামাত্রই বেদ্য। কিন্তু সে উত্তর দিলে ভীমসেন নহুষের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতেন না, হয়তঃ যুধিষ্ঠিরকেও সেই সঙ্গে ভবের খেলা শেষ করিতে হইত। তাই প্রশ্নের মর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন, "বেদ্যং সর্প পরংব্রহ্ম নির্দুঃখং সুখঞ্চ যৎ।" হে সর্প! সুখ দুঃখের অতীত, নির্ব্বিকার যে পরব্রহ্ম, তিনিই বেদ্য। প্রশ্নের প্রথম অংশও ঐরূপ জটিলভাবে রচিত। উহার মর্ম্মার্থ কি হইলে ঠিক ব্রাহ্মণ হওয়া যায়? প্রশ্নের জিজ্ঞাসা-ভঙ্গীই হেঁয়ালী। তাই যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন,—

সত্যং দানং ক্ষমা শীলং আনৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র! স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

যে লোকের সত্য, দান, ক্ষমা, চরিত্র-বল, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া আছে, সেই লোকই প্রকৃত ব্রাহ্মণ।

কিন্তু এইটুকু বলিয়াই যুধিষ্ঠির ক্ষান্ত হন নাই। কথাটাতে অধিক জোর দিবার জন্যই তিনি আরও বলিয়াছেন,—

শূদ্রে তু যদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছুদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈ তল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং সঃ ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈ তন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দেশেৎ।

শূদ্রে যদি এই লক্ষণগুলি থাকে, আর ব্রাহ্মণে যদি ঐ লক্ষণগুলি না থাকে, তাহা হইলে সেই শূদ্র শূদ্র নহে (সেই শূদ্র প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ) এবং সেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহে (অর্থাৎ সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র)। হে সর্প! যাহাতে এই বৃত্তগুলি লক্ষিত, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং যাহাতে উহার অভাব লক্ষিত হয়, তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবে।

ইহাতে বুঝা গেল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণ্যকে প্রধানতঃ গুণগত বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আজকাল কেহ কেহ এই কয়টি বচন উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণ্য বংশগত নহে, উহা সম্পূর্ণ গুণগত, ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কেহ কেহ এই শ্লোকের দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন যে, আদৌ হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ছিল না! কিন্তু সে প্রচেষ্টা সত্যের অপহ্নব মাত্র, সত্যসন্ধান নহে। কারণ সর্পরূপী নহুষ যুধিষ্ঠিরকে জেরা করিতে কসুর করেন নাই। তিনি প্রশ্ন করিলেন,—

যদি তে বৃত্ততো রাজন্ ব্রাহ্মণঃ প্রসমীক্ষতঃ।
বৃথা জাতিস্তদায়ুষ্মন্! কৃতির্যাবন্ন বিদ্যতে॥

হে রাজা যুধিষ্ঠির! চরিত্রবিচার করিয়া ব্রাহ্মণ্যনির্ণয় করিতে হইবে, ইহাই যদি তোমার মত হয়, হে আয়ুষ্মন্! তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত মানুষের পরিচয়যোগ্য কার্য্য না থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার জাতি ব্যর্থ?

যুধিষ্ঠির তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, সর্ব্ববর্ণেই বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে; সেই জন্য বর্ণভেদ অনুসারে ব্রাহ্মণ্যনির্ণয় অসম্ভব। কে বর্ণসঙ্কর, তাহা বলা কঠিন। আকৃতি দেখিয়া যখন বর্ণসঙ্করত্ব নিশ্চয় করা অসম্ভব, তখন প্রকৃতি দেখিয়াই তাহা নিশ্চয় করিতে হইবে। সেই জন্য যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন,—

কৃতকৃত্যাঃ পুনর্ব্বর্ণাঃ যদি বৃত্তং ন বিদ্যতে।
সঙ্করস্তত্র নাগেন্দ্র! বলবান্ প্রসমীক্ষতে॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণে জাত শিশু যদি স্ববর্ণোচিত সংস্কারে সংস্কৃত হইলে তাহার বৃত্ত * অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠাদি চারিত্রিক গুণ

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠ 'বৃত্ত' শব্দের ব্যাখ্যা অন্যরূপ করিয়াছেন। তিনি বৃত্ত অর্থে এই স্থানে বৈদিক সংস্কার বলিয়াছেন। তাঁহার মতে

প্রকটিত না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সেই ক্ষেত্রে সাঙ্কর্য্যদোষ বলবান্ হইয়াছে।

পাঠক দেখুন,—সত্য, দান, দম প্রভৃতি ব্রাহ্মণোচিত চারিত্রিক গুণ বংশানুক্রমে সংক্রমিত হয়, ইহা যুধিষ্ঠিরের কথা। তবে "বাঙ্মৈথুনমথো জন্মমরণঞ্চ সমং নৃণাম্" এই হেতু ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণসঙ্করত্ব অপরিহার্য্য, সেই জন্য বংশধারা ক্ষুণ্ণ হয়। সেই হেতু ব্রাহ্মণসন্তানে ব্রাহ্মণ্যের আবির্ভাবে ব্যভিচার ঘটে। পরে ইনি আবার বলিয়াছেন,—

যত্রেদানীং মহাসর্প! সংস্কৃতং বৃত্তমিষ্যতে।
তং ব্রাহ্মণমহং পূর্ব্বং উক্তবান ভুজগোত্তম॥

হে সর্পরাজ! যে ক্ষেত্রে সংস্কারযুক্ত চরিত্র আছে, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, ইহা আমি তখনও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি।

উল্লিখিত যুধিষ্ঠির-নহুষ-সংবাদে জন্মগত বর্ণভেদও স্বীকৃত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, "ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।" শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না, ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ হয় না। ইহার অর্থ এই যে, জাতিতে শূদ্র হইলেই লোক শূদ্র হয় না, আবার জাতিতে ব্রাহ্মণ হইলেই লোক ব্রাহ্মণ হয় না।† যুধিষ্ঠিরের উক্তিতে জন্মতঃ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা গুণগত ব্রাহ্মণ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ হইবে, সুতরাং ব্রাহ্মণসন্তানে সত্য, দম প্রভৃতি চারিত্রিক গুণ স্বভাবতঃই বিকাশলাভ করিবে। কারণ "সমান প্রসবাত্মিকা জাতিঃ" যাহা সমানবুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি প্রসব করে, তাহাই জাতি। দুইটি তুল্যভাবাপন্ন বংশের নরনারীর মধ্যে যদি বিবাহ হয়, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেই তাহাদের বংশগত গুণও সংক্রমিত হইবেই হইবে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বর্ণসঙ্করত্ব একেবারে পরিহার করা যায় না। কুলটা ব্রাহ্মণ-কামিনীর গর্ভে শূদ্রের ঔরস-জাত সন্তান জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে তাহা ধরা কঠিন। সেই জন্য যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত কোন ব্যক্তি যদি যথাবিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াও ব্রাহ্মণাচরিত্র প্রকটিত না করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সে বর্ণসঙ্কর-দোষদুষ্ট। সংস্কার অর্থে মার্জ্জনা বা Culture, দশবিধ অনুষ্ঠানদ্বারা ঐ সংস্কারকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে। শূদ্রের ঐ সংস্কার নাই। "ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্ন চ সংস্কার-মর্হতি"—এই স্মৃতি-বচনই তাহার প্রমাণ। গর্ভাধান হইতে ইহার আরম্ভ ও শ্মশানে দাহকার্য্যে ইহার পরিসমাপ্তি। সুতরাং দ্বিজাতির বংশে না জন্মিলে এই সংস্কারকার্য্য হয় না। অতএব এখানেও প্রকারান্তরে জাতি-ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, জন্মগত ব্রাহ্মণ্য একটা সামাজিক বা লৌকিক ব্যাপার, প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য গুণগত; শূদ্রেও সে ব্রাহ্মণ্য থাকিতে পারে।

যুধিষ্ঠিরের সহিত নহুষের অনেক কথাবার্ত্তা হয়। পাঠক তাহা মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখিবেন। সেই কথাবার্ত্তার উপসংহারে নহুষ বলিয়াছিলেন,—

"সত্যং দমস্তপোদানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ॥

হে নৃপ! সত্য, দান, তপঃ, দম, অহিংসা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা, ইহাই কাজের, জাতি বা কুল কাজের নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া যুধিষ্ঠির জাতিগত ব্রাহ্মণ্য উচ্ছেদ করিতে বলেন নাই। তাঁহার কথার মর্ম্ম এই যে, যে ব্রাহ্মণ-তনয় যথাবিহিত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াও—ব্রাহ্মণোচিত শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়াও যদি কুচরিত্র ও কুক্রিয়াশীল হয়, তবে সে ব্রাহ্মণ শূদ্র। ব্রাহ্মণের শূদ্রত্বলাভে ব্যভিচারের কথাই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং যুধিষ্ঠির জাতি-ব্রাহ্মণের কথা অস্বীকার করেন নাই। ব্রাহ্মণবংশে কয়েক-পুরুষ ধরিয়া যদি এইরূপ কুচরিত্রের লোক জন্মিত, তাহা হইলে সেই বংশের লোক শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণজাতির বিশুদ্ধি ও চরিত্রবলরক্ষার জন্য এইরূপ বর্জ্জননীতি (process of elimination) পূর্ব্বে অনুসৃত হইত। শূদ্রে যদি সত্যনিষ্ঠাদি বৃত্ত বা চারিত্রিক গুণ লক্ষিত হইত, তাহা হইলে সেই শূদ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান পাইতেন এবং পরলোকে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত গতিলাভ করিবেন, ইহাও সকলে স্বীকার করিতেন। কেবল সামাজিক হিসাবে তিনি শূদ্র থাকিতেন। ইহার কারণ, সে কালে ঋষিরা ব্রাহ্মণদিগের বিশুদ্ধি ও চরিত্ররক্ষার জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। শূদ্রবংশে দৈবযোগে এক জন ব্রাহ্মণ্যগুণোপেত ব্যক্তি জন্মিয়াছেন বলিয়াই তাঁহারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ করিয়া লইতেন না। ইহা স্বার্থপরতা নহে, দূরদর্শিতা।

বিশেষ সাবধান না হইলে এই সব উচ্চ গুণ সহজে বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। মানুষ স্বতঃই পাপপথে ধায়। বিশেষতঃ কৌলিক দোষ-গুণ বহুপুরুষ সুপ্ত থাকিয়া পরে আবার বংশধরে আত্মপ্রকাশ করে। ইহাকে পূর্ব্বনিপাত (atavism) বলে। সেই জন্য ঋষিরা সহজে কাহাকেও ব্রাহ্মণবর্ণে উন্নীত করিতেন না। পারশবজাতি সাতপুরুষ ক্রমাগত যদি ব্রাহ্মণ্যগুণ প্রকটিত করিত, তাহা হইলে তাহারা তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ কর্ত্তৃক কচিৎ কখন ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে নীত হইত শুনা যায়।

পক্ষান্তরে বর্জ্জনের ব্যবস্থাটি অত্যন্ত কঠোর ছিল। ব্রাহ্মণ যদি অব্রাহ্মণের কার্য্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি ব্রাহ্মণসমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন। তাঁহার সহিত কেহ পংক্তিভোজন করিত না। তাঁহাকে দান করিলে দাতাকে

বৈদিকসংস্কারে না থাকিলে সকলেই শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হয়। এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে।

† ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে ভৃগুও ঠিক ঐ কথাই বলিয়াছিলেন। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৯।৮ দেখ।

পাতকগ্রস্ত হইতে হইত। এমন কি, ব্রাহ্মণে যদি গুণগত ব্রাহ্মণ্য না থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাকে ভিক্ষা দিলে ভিক্ষাদাতাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত।

অত্রি বলিয়াছেন,—

অব্রতাশ্চানধীয়ানা যত্র ভৈক্ষ্যচরা দ্বিজাঃ।
তং গ্রামং দণ্ডয়েদ্রাজা চৌরভক্তপ্রদং বধৈঃ॥

"যে গ্রামে ব্রতহীন, অধ্যয়নশূন্য ব্রাহ্মণ ভিক্ষাদ্বারা জীবন-ধারণ করিতে পায়, সেই গ্রামের লোক চোরের ভাত যোগায়, রাজা সেই গ্রামশুদ্ধ লোকের প্রাণদণ্ড করিবেন।" ব্রাহ্মণকে সংযত হইয়া পুণ্যকার্য্য করিতে হইবে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিতে হইবে, তবে সে ভিক্ষালাভ করিবার যোগ্যতালাভ করিবে। অন্য স্মৃতিতে আছে যে, কুকর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ যদি মৃত্যুমুখেও পতিত হয়, তাহা হইলেও কেহ তাহার মুখে জল পর্য্যন্ত দিবে না। এই সকল দেখিয়া বুঝা যায়, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণের পবিত্রতারক্ষার জন্য ঋষিরা কতই কঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্জ্জননীতিই তখন বলবৎ ছিল।

ব্রাহ্মণ্যলক্ষণসম্বন্ধে মহাভারতের অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, তপঃ শ্রুতঞ্চ যোনিশ্চাপ্যে তদ্ব্রাহ্মণ্যকারণম্। তপস্যা, বেদাধ্যয়ন এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, ইহাই ব্রাহ্মণ্যের কারণ; সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মিলেই লোক ব্রাহ্মণ হয় না। ব্রাহ্মণ্য প্রধানতঃই গুণগত।

যুধিষ্ঠির-নহুষ-সংবাদে যুধিষ্ঠির মনুর দোহাই দিয়াছিলেন। সেই মনুও বলিয়াছেন,—

অনার্য্যতা নিষ্ঠুরতা ক্রূরতা নিষ্ক্রিয়াত্মতা।
পুরুষং ব্যঞ্জয়ন্তীহ লোকে কলুষযোনিজম্॥

অনার্য্যভাব, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা ও নিষ্ক্রিয়াত্মতা, এইগুলি মানুষের জন্মগতদোষের সূচনা করে। অবশ্য শিক্ষার দোষেও লোকের এইরূপ চরিত্রদোষ ঘটে, ইহাও শাস্ত্র-কারগণ বলিয়া গিয়াছেন। কুসংসর্গের ফলে দোষ-গুণ সমস্তই সংক্রমিত হইয়া থাকে। সেই জন্য ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারিতেন না। বাস্তবিক ব্রাহ্মণ শূদ্রকে ঘৃণা করিতেন না, তবে তখন শূদ্রগণ সাধারণতঃ কুকর্ম্মী ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ আত্মরক্ষার জন্য তাহাদের সহিত মিশিতেন না।

যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণ প্রকটিত না করিয়া নিকৃষ্টতর গুণ প্রকটিত করিত এবং ক্রমশঃই যাহাদের বংশ গুণের হিসাবে নিকৃষ্ট হইয়া পড়িত, তাহারাই ক্রমে অধস্তনবর্ণে অবনমিত হইত। শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে; যথা ভৃগু বলিয়াছেন,—

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রাহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মাভির্বর্ণতাং গতম্॥

বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিশেষ কিছুই নাই, কারণ সমস্ত জগতই ব্রহ্মময়। প্রথমে কেবল ব্রাহ্মণই ছিল, পরে কর্ম্ম অনুসারে, তাহাদেরই বংশধরগণ বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একই ব্রাহ্মণ কোন্ কোন্ গুণে কোন্ কোন্ জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ভৃগু তাহাও সুন্দরভাবে বলিয়াছেন। আমরা ভৃগুর কথাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যঃ বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিয়া লুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচ পরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়াং তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে॥
ইত্যেতৈ চতুরো বর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ কামভোগে আসক্ত, উগ্রস্বভাব, ক্রোধী, সাহসিক, স্বধর্ম্মত্যাগী (ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মত্যাগী) ও লোহিতাঙ্গ অর্থাৎ রজোগুণময়, তাহারাই ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িল। আবার যাহারা গো-সমূহ হইতে জীবিকা অর্জ্জন ও কৃষি অবলম্বন করিল, যাহারা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না এবং যাহারা পীতবর্ণ অর্থাৎ রজস্তমোগুণান্বিত হইল, তাহারাই বৈশ্য হইল। ইহার পর যে সমস্ত দ্বিজ হিংসারত ও মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, সব কাজেই আত্মনিয়োগ করিল অর্থাৎ যাহাদের অকরণীয় আর কিছুই রহিল না, তাহারা কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ তমোময় শূদ্রবর্ণ হইল। এইরূপে কর্ম্মদ্বারাই ব্রাহ্মণরা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহাদের যজ্ঞক্রিয়াদি ধর্ম্ম করিতে কোন নিষেধ নাই। দ্বিজাতিগণ চারিবর্ণে বিভক্ত হইলেও সকলেরই পূর্ব্বে বেদে অধিকার ছিল, কেবল যাহারা লোভহেতু অত্যন্ত অজ্ঞান হইয়া পড়িল, তাহাদেরই বেদে অধিকার নষ্ট হইল।

পাঠক দেখুন, একমাত্র ব্রাহ্মণজাতি হইতেই চারিবর্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহাই প্রাচীন মত। শূদ্র অনার্য্যজাতি, ইহা আর্যমত নহে।

উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রাচীন-কালে ব্রাহ্মণজাতিকে সত্বগুণপ্রধান রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হারাইতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতির মধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইতেন। ব্রাহ্মণজাতি হইতেই সকল বর্ণাশ্রমীজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সেই জন্য ব্রাহ্মণকে "অগ্রজন্মা" ও "অগ্রজাতক" বলা হয়। তাহার পর বর্জ্জননীতির ফলে ঐ ব্রাহ্মণ হইতে নানাজাতির উদ্ভব হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের কতকগুলি অধিকার দেখিয়া য়ুরোপীয়গণ মনে করিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণরা জাতিহিসাবে সেই অধিকারগুলি আগুলিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক লাভজনক কাজ ব্রাহ্মণের পক্ষে করা অত্যন্ত নিষিদ্ধ। কতকগুলি কাজ করিলে

ব্রাহ্মণ সত্ত্ব শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। সকলেই জানেন যে, প্রতিগ্রহ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে বৈধ; কিন্তু সেই প্রতিগ্রহও ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশংসার কার্য্য নহে। শাস্ত্র তারস্বরে বলিতেছেন,—

"প্রতিগ্রহেণ চৈকেন ব্রাহ্মং তেজঃ প্রণশ্যতি।"

এক প্রতিগ্রহেই ব্রহ্মতেজ বিনষ্ট হয়, সেই জন্য ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে উঞ্ছশীলবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কোন গতিকে কায়-প্রাণের সম্বন্ধ রক্ষা করিতেন। ক্ষেত্রে পতিত, হাটকুড়ান জিনিস লইয়াই তাঁহারা অনেকে জীবনধারণ করিতেন, তথাপি প্রতিগ্রহ করিতেন না। রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া প্রচুর ধনরত্ন সদ্‌ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য এক জন সদ্‌ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে চর পাঠাইয়াছিলেন। জনৈক চর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিতে পাইল যে, এক ব্রাহ্মণ এক মাঠে পতিত ব্রীহি বা যব খুঁটিয়া খুঁটিয়া সংগ্রহ করিতেছে। রাজানুচর ভাবিল, এই ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দরিদ্র; এ সম্ভবতঃ রাজার দান লইতে পারে। তিনি ব্রাহ্মণকে যুধিষ্ঠিরের দানের কথা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে ঐ দান গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শুনিয়া ব্রাহ্মণের নয়নে নীরধারা বহিল। দূত ভয়ে পলাইয়া গেল। চর সেই কথা যুধিষ্ঠিরের গোচর করিলে যুধিষ্ঠির কাঁদিয়া উঠিলেন। কথাটা শ্রীকৃষ্ণের কাণে উঠিল। তিনি একটু হাসিলেন। ভীম ব্যাপারটা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—ব্রাহ্মণ কাঁদিয়াছে, তাহার কারণ, ব্রাহ্মণ মনে করিল, তাঁহার যদি ব্রহ্মতেজ অধিক থাকিত, তাহা হইলে রাজানুচরগণ কখনই তাহাকে ঐরূপ অনুরোধ করিতে সমর্থ হইতেন না। যুধিষ্ঠির কাঁদিয়াছেন, কারণ, তাঁহার মনে হইয়াছে যে, কোন সদ্‌ব্রাহ্মণই যদি তাঁহার যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত ধনরত্ন না গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাঁহার যজ্ঞই পণ্ড হইবে। আর শ্রীকৃষ্ণ হাসিয়াছিলেন, তাহার কারণ, তিনি ভাবিয়াছিলেন, কলি প্রবল হইলে এই ব্রাহ্মণই দ্বারে দ্বারে ধন যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইবে, আর শিয়াল কুকুরের ন্যায় ধনগর্ব্বিত ব্যক্তিদিগের গৃহ হইতে বিতাড়িত হইবে। আমাদের সে দিন আর নাই। লুব্ধ, স্বধর্ম্মবিচ্যুত ব্রাহ্মণ আজ পদে পদে লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতেছেন। কিন্তু তাই বলিয়া আজও প্রতিগ্রহহীন ব্রাহ্মণ একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। এই প্রবল কলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মহিষী ত্রিবেণীর ঘাটে বুনো রামনাথের পত্নীকে বহুমূল্য অলঙ্কার দিবার প্রস্তাব করিয়া যেরূপভাবে প্রত্যাখ্যাতা হইয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার হাতের এই রাঙ্গা-সূতা নবদ্বীপাধিপতির মহিষীর হস্তের হীরকখচিত সুবর্ণবলয় অপেক্ষা মূল্যবান।" সে বুনো রামনাথের মত ব্রাহ্মণও আর কোথায়, সেই সাধ্বী ব্রাহ্মণকন্যার ন্যায় ব্রাহ্মণপত্নীও অতি বিরল। কিন্তু প্রতিগ্রহহীন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এখনও আছেন। তবে এই দুর্দ্দিনে তাঁহাদের খোঁজ প্রায় কেহই লন না। নিশাগমে নলিনীর মত তাঁহারা এখন সঙ্কুচিত।

আদর্শ ব্রাহ্মণ অনেক উচ্চ। সেরূপ হওয়া বড় কঠিন। তাঁহাদের লক্ষণ দুই একটি বলিব,—

ন ক্রুধ্যেন্ন প্রহৃষ্যেচ্চ মানিতোঽমানিতশ্চ যঃ।
সর্ব্বভূতেষ্বভয়দস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

* * *

জীবিতং যস্য ধর্ম্মার্থং ধর্ম্মং রত্যর্থমেব চ।
অহোরাত্রাশ্চ পুণ্যার্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

সম্মানে যাঁহার আনন্দ নাই, উপেক্ষায় যাঁহার ক্রোধ নাই, যিনি সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ, যাঁহার জীবন ধর্ম্মার্থ, যাঁহার ধর্ম্ম রত্যর্থ, যাঁহার অহোরাত্র পুণ্যার্থ, সে ব্রাহ্মণ এখন কোথায়? এখন সর্ব্বজাতির অবনতির সহিত ব্রাহ্মণেরও অবনতি হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ নাই একথা বলা উচিত নহে। রাজা যুধিষ্ঠিরই বলিয়াছেন,—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ।"

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে যে বালক জন্মে, সেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু সে যদি কুকর্ম্মান্বিত হয়, তাহা হইলে সামাজিক হিসাবেই সে ব্রাহ্মণ মাত্র, অন্য হিসাবে তাহার ব্রাহ্মণ্য নাই। তবে তাহার পূর্ব্বপুরুষের অর্জ্জিত ব্রাহ্মণ্য তাহার প্রকৃতিতে সুপ্ত অবস্থায় থাকে বলিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণজাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয় না। কারণ, তাহার পুত্র পৌত্র আবার শিক্ষার গুণে পিতৃপুরুষের গুণের অধিকারী হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সেই সত্ত্বগুণপরিভ্রষ্ট 'জাতি ব্রাহ্মণ' ঠিক ব্রাহ্মণের সম্মান পাইবে না। তাহারা পঙ্‌ক্তিদূষণ বা অপাংক্তেয়। তাহাদের সহিত কোন ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে ভোজন করিবেন না। সুতরাং তাহারা প্রকারান্তরে জাতিচ্যুত। এইরূপ কয়েক পুরুষ হইলেই তাহারা জাতিচ্যুত হইত।

অধুনা সাধারণতঃ ব্রাহ্মণজাতি অবনত। কতকগুলি ধর্ম্মবিশ্বাস হারাইয়া প্রায় ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। আর কতকগুলি ধর্ম্মধ্বজী হইয়া প্রতিগ্রহকেই জীবনের সার করিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের দোহাই দিয়া যাহারা ভিক্ষা করে, তাহারা ঘোর পাপী। সত্য বটে, শাস্ত্রে প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ আপনার উদরান্নের জন্য প্রতিগ্রহ করিবেন না। যথা—

প্রতিগ্রহং ন গৃহ্লীয়াদাত্মভোগবিধিৎসয়া।
দেবতাতিথিপূজার্থং যত্নাদ্ধনমুপার্জ্জয়েৎ॥

আপনার ভোগবিধানের জন্য ব্রাহ্মণ কখনও প্রতিগ্রহ করিবে না। দেবতার ও অতিথির সেবার জন্য স্বয়ং ধন

উপার্জ্জন করিবে। মূর্খ ও সন্ধ্যাবন্দনাবর্জ্জিত ব্রাহ্মণকে দান করিতে নাই। যথা—

"বিদ্যা তপোভ্যাং হীনেন ন তু গ্রাহ্যঃ প্রতিগ্রহঃ।
গৃহ্নন্ প্রদাতারমধোনয়ত্যাত্মানমেব চ॥"

যে ব্রাহ্মণের বিদ্যাও নাই, তপস্যাও নাই, তাহার দান লওয়া উচিত নহে; যদি সে দান লয়, তাহা হইলে সে নিজে অধোগতি পায় এবং যে দান করে, তাহাকেও নিরয়-গামী করে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে চাহিয়া দান লওয়া উচিত নহে। বাঞ্চা করিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহা ভিক্ষা, প্রতিগ্রহ নহে। ব্রাহ্মণকে মনে রাখিতে হইবে,—

"বিদ্যা তপশ্চ যোনিশ্চ এতদ্ব্রাহ্মণ্য কারণম্।"

বিদ্যা, তপস্যা (সন্ধ্যাবন্দনা ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান) এবং ব্রাহ্মণবংশে জন্ম, এই তিনটি ব্রাহ্মণ্যের কারণ। সুতরাং ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যা অর্জ্জন করিবেন, শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক তপস্যা করিবেন, তবে তিনি প্রকৃত ব্রাহ্মণ হই-বেন। এই তিনটি যাঁহারা করেন, তাঁহাদের লোকের নিকট সম্মানভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হয় না, লোক আপনিই তাঁহাদিগকে সম্মান করে।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য। (১)

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্. এস্.।]

আমাদিগের দেশে যেভাবে পুরাকালে শিক্ষাবিধি প্রচলিত ছিল, আজ আর সেভাবে শিক্ষাদান হয় না। পূর্ব্বে স্বাস্থ্যপ্রদ পল্লীগ্রামে, স্নিগ্ধ সান্ধ্য-সমীরণে, তরুচ্ছায়ে বা টোল-মঞ্চে গুরুশিষ্য সম্মুখীন হইয়া পাঠগ্রহণ ও পরীক্ষা-দানের ব্যবস্থা ছিল। চেয়ার-টেবিলের বিড়ম্বনা ছিল না, কামিজ-কোটের বাহুল্য ছিল না, ছোট অক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইত না, ছাত্রগণ শুধু মুখস্থ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিত না। যাহা হউক, "তেহি নো দিবসা গতা।" এখন যাহা আছে, তাহাই লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া দু'চার কথা বলিব।

ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের কথা জানি না, শুধু বাঙ্গালাদেশেরই কথা লইয়া আলোচনা করিব। আমাদের বাড়ীতে একটি বালক জন্মাইলে তাহার জীবনেতিহাস মোটামুটি কি? সেটি এই:—চার পাঁচ বৎসরকাল তাহার লালন-পালন ঘটিয়া থাকে; যদি জিজ্ঞাসা করি যে, "ঐ সময়ের মধ্যে উহার শিক্ষার কি কি ব্যবস্থা হয়?" তাহা হইলে অধিকাংশ পিতামাতাই বলিবেন, "অতটুকু ছেলের আবার শিক্ষা কি?" তাঁহারা মনে করেন যে, কেতাবতীশিক্ষাই শিক্ষা। পিতামাতার প্রত্যেক কায, প্রত্যেক ব্যবহার, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী যে শিশুর শিক্ষার বিষয়, তাহা তাঁহারা ভাবিতেও পারেন না, জানেনও না। তাহার পরে পাঁচ বা ছয় বৎসরে শিশুর কেতাবতীশিক্ষার সূত্রপাত হয়। প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, শিশুশিক্ষা, তৃতীয় ভাগ শেষ হইতে না হইতেই প্যারীচরণ সরকারের ফার্ষ্ট বুক, অঙ্ক প্রভৃতি ধরান হয়। কেতাবতীশিক্ষার আরম্ভ হইতে যে কোনও সময়ে বালককে স্কুলে প্রবিষ্ট করান হয়। স্কুলে অন্ততঃ নয় বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া অর্থাৎ প্রায় ষোড়শবর্ষপ্রান্তে বালক "মনুষ্যত্ব" লাভ করিয়া কলেজে প্রবিষ্ট হয়। কলেজে যথাকালে বিনা-বিচারে পর্য্যায়ক্রমে ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এ., এম্. এ. ও আইন-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া বালক যখন সংসারে প্রবিষ্ট হয়, তখন অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় সংসাররূপ কঠিন প্রাচীরে মস্তক সংঘর্ষ হওয়ায় চৈতন্যোদ্রেক হয়, "তাই ত, আমি এতদিনে শিখিলাম কি?" এই চিন্তার উত্তর আইসে,—"হয় সামান্য বেতনে গোলামী কর, নতুবা স্বদেশ উদ্ধারকারীর দলে নাম লিখাও!"

বঙ্গভাষায় যাহা বর্ণনা করিলাম, সেইটিই অদ্য আমাদের বিবেচ্য বিষয়। বঙ্গদেশে ভদ্রবংশে জন্মিলেই যথাক্রমে তোমাকে বি. এ., এম্. এ. ও আইন-পরীক্ষা দিতেই হইবে। পরে, কোথায় গিয়া দেওয়ালে মাথা ঠুকিবে, সে কথা তৎকালে বিচার্য্য। এইটি বাঙ্গালীর বালকজীবনের সার-সত্য। এরূপ কেন হয়? এরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ। প্রথম কারণ,—অন্য বিষয়ে না হউক, এই বিষয়ে বাঙ্গালী গড্ডালিকা ন্যায়ের অনুসরণ করে। ছেলে পরে পরে পরীক্ষায় পাশ দিতে থাকুক্—ততদিন ছেলের পিতা "কি করিবে? কোথা যাইবে? কিসে উপার্জ্জন হইবে?" ইত্যাকার চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করেন। দ্বিতীয় কারণ,—অদৃষ্টবাদিতা; "ছেলে ত এখন পড়ুক, পরে অদৃষ্টে

যাহা আছে, তাহাই হইবে" এইরূপ মনের ভাব পরিপোষণ করা। তৃতীয় কারণ,—স্বার্থান্ধতা অর্থাৎ সকলেরই বিশ্বাস যে, অন্ততঃ তাঁহার পুত্ররত্ন হাইকোর্টের জজীয়তী লাভ করিতেও পারে; এবং চতুর্থ কারণ,—"কিঞ্চিৎ পঠনং বিবাহকারণং।" যাঁহারা পুত্রের পিতা, তাঁহারাও যেরূপ শিক্ষিত, পুত্রেরাও প্রায় সেইরূপ শিক্ষিত, এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা মূলকারণ অর্থাৎ পুত্রের জন্ম হইতে তাহার পাঠশেষ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তাহার শারীরিক ও মানসিক গঠন, তাহার প্রবৃত্তি, তাহার কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি কয়টি পিতা পর্য্যবেক্ষণ করিতে জানেন? গৃহে "প্রাইভেট টিউটার" নামক সচল "অর্থ পুস্তক" (key), বিদ্যালয়ে নিদ্রালু, অলস, শ্লথদেহ জীর্ণশীর্ণ শিক্ষক আছেন—এই দুয়ের ভরসায় পিতা কুম্ভকর্ণের বৃত্তি অনুসরণ করেন। তিনি জানেনও না, তাঁহার বুঝিবার শক্তিও নাই—যে প্রাইভেট শিক্ষক ও স্কুল শিক্ষক—উভয়েই অতীব সামান্য শিক্ষার দাবী রাখেন, উভয়েই অত্যন্ত দারিদ্র্যপীড়িত, উভয়েই "মোট ফেলা"র মত কায করিতে প্রয়াসী, উভয়েই ঘড়ির দাস, উভয়েই প্রাণহীন শিক্ষা দিতে জানেন। এই দুইটি যন্ত্রের পেষণে অতীব মেধাবী ছাত্রও সত্বর মেধাশূন্য হইয়া পড়ে। শুধু এই পর্য্যন্তই যদি দোষ থাকিত, তাহা হইলে কথা ছিল না; ছেলের পিতা নিজ আফিস ও নিজ সাহেব ও নিজ বড় বাবু প্রভৃতি লইয়া নিরন্তর এতই ব্যস্ত যে, সভ্যজগতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য—ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য কি কি সভা হইয়াছে বা কি কি প্রবন্ধ বা গবেষণা বাহির হইয়াছে, তাহা জানেনও না এবং জানা প্রয়োজনীয় মনেও করেন না—যে হেতু তিনি ছেলের শিক্ষার জন্য কড়িখরচ করিতেছেন। তাঁহাদের উত্তর—"সারাদিন আফিসে খাটিয়া আর কি ও সব ভালো লাগে? ও সব স্কুল-মাষ্টারদের কায, তাহারা খবর লউক, শিক্ষাজগতে কোথা কি হইতেছে!" কিন্তু এই উদাসীনতার ফল অত্যন্ত বিষময়। আমি যদি আমার নিজ দায়িত্ব স্কন্ধ হইতে নামাইয়া দিই, আমি যদি আমার ন্যায্য প্রাপ্য কি কি তাহার সন্ধান না রাখি—তবে কাহার এত পিতৃমাতৃদায় যে, সাধিয়া অযাচিতভাবে আমাকে আমার অধিকার দান করিতে আসিবে? যে দিন স্কুল-মাষ্টারেরা ও স্কুলব্যবসায়ী স্বত্বাধিকারীরা বুঝিবেন যে, ছেলেদের অভিভাবকের নিজ নিজ অধিকার ও প্রাপ্য দাবী করিতে শিখিয়াছে, সেই দিন—তাহার এক অনুপল পূর্ব্বেও নহে—সেই দিন বিদ্যালয়ে মূর্খ বা স্বল্পশিক্ষিত মাষ্টারপাল আর দেখা যাইবে না, সেই দিন যে-সে প্রাইভেট টিউটার হইবার স্পর্দ্ধা করিবে না, সেই দিন অভিভাবকগণকে গড্ডালিকা ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া অনর্থক বি. এ., এম্. এ. সকল ছেলেকেই পড়াইতে হইবে না।

এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ছেলেদের পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। প্রথমেই কবির ওজোস্বিনী ভাষায় বলি:—

"আর ঘুমাইও না—দেখ চক্ষুঃ মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে, অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত, কিবা কুতূহলী"—

আজ যে শিশু আছে, তোমার বৃদ্ধ বয়সে সে তোমার পিতৃস্থানীয় হইবে—তাহারই অর্থে, তাহারই সামর্থ্যে, তাহারই তত্ত্বাবধানে তোমাকে থাকিতে হইবে। আজ যে শিশু আছে, সে যদি প্রকৃতই সুশিক্ষিত হয়, যদি সে অটুটস্বাস্থ্য হয়, তবে তোমার দেশের ও দশের কত সুখের বিষয়! হিন্দুরা "বংশরক্ষা" "বংশধর" করিয়া পাগল হইতেন, তাঁহাদের চক্ষে প্রত্যেক বালকই তাবৎ দেশেরই আদরের সামগ্রী। আমরা দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া সকল হিন্দুয়ানী কথার সঙ্গে ওটাকেও ব্যঙ্গ করি। আজ পাশ্চাত্য কুরুক্ষেত্র মর্ম্মে মর্ম্মে সকলকে বুঝাইয়া দিতেছে, হিন্দুরা কেন এত "বংশধর" বলিয়া পাগল হইতেন। সমাজরক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, দেশরক্ষার জন্য বংশধরের প্রয়োজন—সে বংশধর শুধু তোমার নয়নের মণি নহে—সে বংশধর তোমার দেশের মণি। আজ য়ুরোপ এই মন্ত্রে দীক্ষিত, তাই আজ য়ুরোপের একতা, একপ্রাণতা, স্বার্থত্যাগ, মনুষ্যত্ব এত প্রকট। শুধু সংবাদপত্রে বা পুস্তকে শৌর্য্যবীর্য্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়া কোনও জাতি কল্যাণের পথে অগ্রসর হয় নাই! কেতাবে স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তপাঠে মৌন, বিস্ময় বা অপর কোনও উচ্চভাবানুভবে কোনও জাতি বড় হয় নাই। অতএব, শুধু বড় বড় প্রবন্ধ পড়িয়া মনে মনে "বেশ লিখেছে ত" বলিয়া পাশ ফিরিলে আর চলিবে না। সত্য সত্যই পৃথিবীর সকল জাতিই কাযের পথে অগ্রসর হইতেছে—আর আমাদের জন্যে কি—"ওই দেখ চেয়ে, আছে রসাতল!" আমরা যদি বাঁচিতে চাই, তবে আজ এইখানেই আমাদের কাযের সূচনা করিতে হইবে—আজই হইবে—এখনিই হইবে। দীর্ঘসূত্রিতাই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ।

তবে একবার সন্ধান লওয়া যাউক—"অবনীমণ্ডলী" এই সম্বন্ধে "কিবা কুতূহলী," সে কথা শুনিলেও যদি আমাদের জড়দেহে প্রাণ আসে! আজ ঊনবিংশ বৎসর হইয়া গেল, জার্ম্মাণীর উইসব্যাডেন, নিউরেম্বার্গ প্রভৃতি স্থানে ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা লইয়া আলোচনার সূত্রপাত হয়। আজ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণী যুদ্ধের জন্য যে যে উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিল, ইহাও তাহার অঙ্গীভূত। জার্ম্মাণবাসীরা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, শৈশব হইতে ছেলেদের পেছনে লাগিয়া না থাকিলে, ভবিষ্যতে মানুষ গড়িয়া তোলা যায় না। ছেলেদের অভিভাবকদের সকলের এমন অবস্থা নহে যে, প্রত্যেক ছেলেটির জন্য যথাযোগ্য ব্যয় করে; কাহারও বা এমন সময় নাই যে, ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রাখে; কাহারও বা এমন বিদ্যা বা জ্ঞান নাই যে, দেখাইয়া দিলেও ছেলেদের প্রতি সেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া যাইতে

পারে। এই জন্য শৈশব হইতেই দেশের কর্ত্তব্য ও রাজার কর্ত্তব্য এই যে, প্রত্যেক ছেলেকে সমান যত্ন হয়। ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যত্ন করিতে হইলে ছেলেদের স্বাস্থ্য, ছেলেদের শিক্ষা, ছেলেদের অভাব, ছেলেদের অভিযোগ—সকল বিষয়ে রীতিমতভাবে অনুসন্ধান করিতে হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে সমগ্র জার্ম্মাণীতে এই কার্য্য চলিতেছে—অসীম সুফলও ফলিয়াছে।

জার্ম্মাণীর দৃষ্টান্তে ফ্রান্স, সুইজারলাণ্ড, অষ্ট্রীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা—সকলেই ক্রমশঃ এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। জার্ম্মাণীর কৃতী ও প্রিয় ছাত্র জাপানেও ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই পদ্ধতি অনুষ্ঠিত হইতে আরব্ধ হয়। এতদিন ইংলণ্ড এ বিষয়ে অনেকটা উদাসীন ছিল। পরে যখন বুয়র যুদ্ধ হয়, তখন ইংলণ্ডের দিব্যদৃষ্টিলাভ ঘটে—তখন চতুর্দ্দিকে সাড়া পড়িল—ইংলণ্ডের অধিবাসীরা ভগ্নস্বাস্থ্য হইতেছে কেন? অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্যানুসন্ধান করিতে করিতে বুঝা গেল যে, বালক বালিকাদিগের ছাত্রাবস্থায় যত্ন হয় না বলিয়া তাহারাই পরে ভগ্নস্বাস্থ্য অধিবাসী হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডেও ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এক্ষণে দেখা যাউক, আমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কি কি করা হইয়াছে বা হইতেছে। গত বৎসরে (১৯১৬) এপ্রেল মাসে এই সম্বন্ধে আমার মনে কৌতূহল উপস্থিত হয়। তখন সন্ধানে জানিতে পারি যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং ইহার উপকারিতাও স্বীকার করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাব ও বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটি এই সম্বন্ধে কার্য্যারম্ভ করেন; ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশে ও মান্দ্রাজে এই কার্য্য হয়। কিন্তু এ যাবৎ বাঙ্গালাদেশে সরকারী কমিটির রিপোর্ট পেশ ব্যতীত অপর কিছুই কায হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যায়ামবিৎ ডাক্তার সিগার্ড এতৎসম্বন্ধে কায করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন মাত্র—কায বিশেষ কিছুই করেন নাই। এই সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া আমি বঙ্গের শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমতি অনুসারে দুইটি রাজকীয় বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করি। সে পরীক্ষার ফল ক্রমশঃই প্রকাশিত হইবে।

ছাত্রদিগের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার কালে কত রকমের যে বাধা বিপত্তি ঘটিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রথমতঃ, সরকারের অনুমতি পাওয়া একটু কঠিন হইলেও, পরে সরকারের কর্ম্মচারীদিগের যথেষ্টই সাহায্য পাইয়াছি। ছাত্রগণ কত রকমের দুষ্টামী করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। অবাধ্যতা, গোলযোগ করা, মিথ্যা বর্ণনা করা, প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা করা—ছাত্রেরা নানারকম উৎপাতই করিয়াছে। কোনও ধনীর সন্তান, ধনীদিগের বিদ্যালয়ে না পড়িয়া সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠার্থী হইলেও পরীক্ষা দেওয়াটা অপমানজনক মনে করেন। সেই কথা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে জানাইলে তাঁহারা বিদ্যালয়ের মর্য্যাদা পদদলিত করিয়া সেই ছাত্রটিকে নানারকমে অনুনয়-বিনয়-সহকারে নিমরাজী করান। সরকারী বিদ্যালয়ে যখন এই ব্যাপার, তখন বে-সরকারী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কগণ যে ধনীর পুত্রদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে থাকিবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? কলিকাতার মধ্যস্থলে সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যেরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহার দেখিয়াছি, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি।

এই গেল ছাত্রদিগের কথা। তাঁহাদিগের অভিভাবকগণ নানারকমের কথা কহিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, লেখক সভায় নাম কিনিবার জন্য এই কায করিতেছেন। কেহ বলিয়াছেন যে, অ্যাম্বুল্যান্সকোরে বা বাঙ্গালী ডবল কোম্পানীতে ছাত্রবৃন্দকে ভর্ত্তি করিবার জন্য এই পরীক্ষার ভাণ। কেহ মনে মনে অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "আমাদিগের বাড়ীতে কি গৃহ-চিকিৎসক নাই—না আমরা ছেলেদের যত্ন করি না?" এই বলিয়া বালককে কুশিক্ষা দিয়াছেন, যাহাতে সে বালকটি পরীক্ষিত না হয়। কেহ কেহ নিজ মাসিক আয় ও পুত্রকন্যার সংখ্যা জানানটা অপমানজনক মনে করিয়া বালকদিগকে প্রদত্ত "ফারম" খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছেন।

যে যে বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিবার অধিকারলাভ করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে তিনটি বিদ্যালয়ে অতি সহজেই অনুমতি পাইয়াছিলাম। দুটি শ্বেতাঙ্গবালকদিগের বিদ্যালয় বিধায়ে অনুমতি দিলেন না; অপর দুইস্থানে বাঙ্গালীবালক ছাত্র হইলেও এক জন অনুমতি দিয়া পরে আর স্বীয় বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন না, অপরটি গোড়া হইতে মৌনব্রত অবলম্বন করিতেছেন।

এই সকল ঘটনাগুলি উল্লেখ করিবার কারণ কি? অভিযোগ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমার উদ্দেশ্য—এদেশে এখনও কতদূর অজ্ঞতা, কতদূর আত্মম্ভরিতা, কতদূর স্বার্থান্ধতা আছে, তাহাই দেখান। ছাত্রদিগের অভিভাবকগণেরা নিজেরা ও স্ব স্ব বালকবালিকাগণকে রীতিমত তত্ত্বাবধারণ করিবেন না—আবার কেহ যদি তাঁহাদিগের হইয়া বিনাব্যয়ে ঐ কায করে, তবে তাহাও সহ্য করিবেন না; এ দৃষ্টান্ত এদেশ ভিন্ন অন্যত্র বিরল। বিলাত প্রভৃতি স্থানে অভিভাবকগণের আপত্তি হয় নাই কি? হইয়াছে—কিন্তু এ ভাবে নহে। তাঁহারা স্বাধীনজাতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন, এখন সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করেন। আমাদের দেশে ছেলেদের মানুষ করা হয় না—ছেলেরা আপনা-আপনিই মানুষ হইয়া উঠে। সাধারণ গৃহস্থের গৃহে যে রকম অস্বাস্থ্যকর অবস্থায়, যে রকম এলোমেলো ভোজ্য উদরস্থ করিয়া, যে রকম ইতর-ভদ্র সঙ্গী পাইয়া, যে রকম নীচজাতির

রীতিনীতি লক্ষ্য করিয়াও আমরা মানুষ হই, তাহা আমাদিগের পিতৃপুণ্যের পরিচায়ক বটে। আমাদিগের ছেলেরা কি খায়—সে খাদ্য তাহাদিগের পক্ষে উপযোগী বা যথেষ্ট কি না, এ সংবাদ আমরা কখনও লই না—অথচ বাড়ীর ঘোড়াটা রোগা হইলে তাহার খাদ্যে জৈ, গুড় প্রভৃতি মিশাইয়া দিই, পালিত কুক্কুরটার স্বাস্থ্যহানি হইলে তাহাকে দুধ ও অস্থিচূর্ণ খাওয়াই, গোদুগ্ধ বৃদ্ধি করিবার জন্য ভুসি, লাউ প্রভৃতি খাওয়াই। কিন্তু আমাদিগের ছেলেরা রোগা হইলেই চিন্তিত হইয়া পড়ি না—যাবৎ তাহার জ্বর না ফুটে বা অরুচি না আইসে বা দৌর্ব্বল্যের আধিক্য না হয়। আমাদিগের বাড়ীতে যখন গৃহের ষষ্ঠীদেবী বৎসরে বৎসরে সন্তান প্রসব করিতে থাকেন, তখন একটি কচি শিশু তাহার কনিষ্ঠটিকে "কাঁকে কোলে" করিয়া সর্ব্বদাই ফেরে, সে গুরুভারে জ্যেষ্ঠটির মেরুদণ্ডের যে অপকার হয়, তাহা আমরা কখনও চক্ষু দিয়া দেখিয়াও দেখি না। আমাদের ছেলেরা মাটী হইতে মিছরি, মুড়ি, খৈ যখন খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায় ও সেই সঙ্গে দরবিগলিত সর্দ্দি লেহন করিতে থাকে—তখন আমরা সে দিকেও ফিরিয়া তাকাই না—কিন্তু পরে সেই শিশুর আমাশয় হইলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াই কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাই। আমরা যেখানেই খাই, সেখানই ময়লা করি। আমরা তিন বেলা কাপড় ছাড়ি বটে—যেহেতু তা না করিলে "শুচিবাই" রক্ষা হয় না—কিন্তু হয় ত এমন ময়লা কাপড় পরি—যাহার গন্ধে প্রকৃতই ভূত পালায়! কাপড় ময়লা হউক, তাহাতে দুঃখ নাই—কাপড় ছাড়িতে পারিলেই দেহ শুদ্ধ হইয়া যায়! সেই আদর্শে পুরুষেরা উপরে ধোপদস্ত কাপড় ব্যবহার করেন, ভিতরে দুর্গন্ধময় ময়লা কাপড় ব্যবহারে কুণ্ঠিত হন না।

নৈতিকদিক্ ধরিলে আমরা শিশুদিগকে যে সর্ব্বদাই ভাল আদর্শ দেখাই, তাহা নহে। সার্থক, অনর্থক—সকল কারণেই আমরা ভূতের ভয় প্রদর্শন করাই; কারণে, অকারণে, "এটা দিব, ওটা দিব" মিথ্যাকথা বলি। ছেলের সামান্য দোষ হইলেই ভর্ৎসনা করি এবং তদ্দ্বারা কাপুরুষ ও মিথ্যাবাদী সৃজন করি। নিজ নিজ আহার, কথাবার্ত্তা, ভৃত্যাদির সহিত আচরণ, লৌকিকতার ব্যবহার,—সকল কাযেই সংযমের অভাবের পরিচয় দিই। যেভাবে কিশোরবয়স্ক বালকবালিকারা একত্রে শয়ন করে, যেভাবে স্বামীস্ত্রী ও বালকবালিকা একঘরে থাকেন—এ সকলই ছেলেদের নৈতিক প্রতিকূল ব্যবস্থা।

বিদ্যালয়ে শিক্ষককে আমরা ভয় করিতে শিখি। শিক্ষকের দীন মলিন বেশ, হীনকান্তি, অলসজীবন, ছাত্রদিগের পক্ষে কোনও মতে উচ্চ আদর্শ হইতে পারে না।

তাই বলি, আমাদিগের দেশের লোকের জানা উচিত যে, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কোথায় অবহেলা হইতেছে? আমাদিগের জানা আবশ্যক, আমাদিগের শিশুদিগের প্রতি কি কর্ত্তব্য? এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা গেল। [ক্রমশঃ।
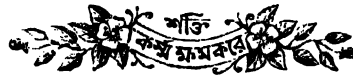
সঙ্কেত।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

ভাল কথা ভালবাসে, ভাল কথা সবে ভাষে,
তবে কভু লোক-মাঝে কলহ কি হয়?
মিষ্টকথা ব্যথা হরে, পর আপনার করে,
বুঝিলে মানব সুখে ধরা'পরে রয়।
অর্থ অনর্থের মূল, হ'য়ো না রে মনাকুল,
যৌবনে মূর্খতা মিলে দেয় নানা দুখ।
সুখ বলে যাঁরে বুঝি, সেই যে দুঃখের সাজি,
পীড়া বিত্তহানি নিন্দা—একে বলে সুখ!
কর্ত্তব্য ভুলায় যা'তে, সেই অ-সুখের পথে,
যাইতে আনন্দে মন, অনুক্ষণ চায়;
মায়ায় ভুলিয়া জীব অপথেতে ধায়!

সংসার-চিত্র।

[জনৈক বঙ্গবাসী।]

দেশভেদে মানুষের আচার-ব্যবহারের প্রভেদ হয়; মানুষের সংসারচিত্রও ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়। যুরোপীয় পণ্ডিতরাও মানবসমাজকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করেন,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য। কিন্তু এইরূপ বিভাগ যে অনেক স্থলে ভ্রান্তিরই পরিচায়ক, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। সমগ্র প্রাচীর আচার-ব্যবহার যেমন একরূপ নহে, সমগ্র প্রতীচীর আচার-ব্যবহারও তেমনই একরূপ নহে। আবার যে সব দেশে সামাজিক সকল ব্যবস্থাই ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত, সে সব দেশের আচার-ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্য স্বতঃই বিকশিত হয়। ভারতবর্ষের কথা ধরা যাউক। বিখ্যাত পণ্ডিত ওল্ডেনবার্গ বলিয়াছেন—যে সকল পর্ব্বত উত্তরে ও পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত হিমপ্রধান দেশসমূহ হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল—তাহারাই যেন ভারতবাসীকে স্বতন্ত্রভাবে জীবন-গঠনের উপায় করিয়া দিয়াছিল। ভারতবাসীরা একদিকে অভ্রভেদী গিরির দ্বারা ও অপরদিকে সমুদ্রদ্বারা অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনার যে সভ্যতার—যে সমাজের—যে ধর্ম্মের উন্নতি সাধিত করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের বৈশিষ্ট্যই বিকশিত। সে সভ্যতা—সে সমাজের আদর্শ ও সে ধর্ম্ম ভারতের বাহিরে নীত হইলে আর সে রূপ রক্ষা করিতে পারে নাই। ভারতের সভ্যতা—ভারতের আদর্শ—ভারতের ধর্ম্ম স্থলপথে হিমালয় অতিক্রম করিয়া ও জলপথে তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে চীনে, জাপানে ও কোরিয়ায় নীত হইয়াছিল। কিন্তু কোথাও তাহাদের স্বরূপ অবিকৃত থাকে নাই। চীনে অধিবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষপূজায় ভারতের শ্রাদ্ধতর্পণ ও জাপানে বুদ্ধ-বৃদ্ধার ছেলেখেলায় ভারতের বানপ্রস্থ নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, ভারতবাসীরা জীবনের সব কাষ যেমন ধর্ম্মের সঙ্গে বিজড়িত করিতে পারিয়াছিল, তেমন আর কেহ পারে নাই। বাস্তবিক হিন্দুর সব কাযই ধর্ম্মের সহিত বিজড়িত।

হিন্দুর সংস্কার প্রধানতঃ দশবিধ—(১) বিবাহ, (২) গর্ভাধান, (৩) পুংসবন, (৪) জাতকর্ম্ম, (৫) সীমন্তোন্নয়ন, (৬) নামকরণ, (৭) অন্নপ্রাশন, (৮) চূড়াকরণ, (৯) উপনয়ন, (১০) সমাবর্ত্তন।

এই দশবিধ সংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ এমনভাবে বিজড়িত যে, হিন্দুর সাংসারিক জীবন সর্ব্বতোভাবেই ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যে গার্হস্থ্যাশ্রমকে সর্ব্বোপকারক্ষম বলিয়া কীর্ত্তিত করা হইয়াছে, সেই সংসারাশ্রমের ভিত্তিই—বিবাহ। বিবাহ করিয়াই মানুষ সংসারী হয়। হিন্দুর বিবাহব্যাপারও তাহার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সমাজ যত সভ্য হয়, বিবাহ ততই ধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়—ইহাই প্রাচীন ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে আবার সে ধারণার পরিবর্ত্তন হইতেছে, বিবাহ দাম্পত্যচুক্তিতে পরিণতিলাভ করিতেছে। যুরোপে বিবাহ বিচ্ছিন্ন ত হয়ই, আবার আজকাল কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট-কালের জন্য—পাঁচ সাত বৎসরের জন্য—বিবাহ নির্দ্দিষ্ট করিবার প্রস্তাব করিতেছে। কিন্তু হিন্দুর বিবাহ চুক্তি নহে। আমাদের কথা—পুত্রের জন্য বিবাহ—পিণ্ডের জন্য পুত্রের প্রয়োজন। সুতরাং এই যে বিবাহ, ইহা ইহকাল পরকালের সংযোগসেতু। বংশের ধারা রক্ষা করিবার জন্য বিবাহ।

সেই জন্যই এক পরিবার হইতে কুলশীল মিলাইয়া একটি বালিকাকে লইয়া অপর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বালিকার মনোভাব দৃঢ়তালাভ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে শ্বশুরের পরিবারভুক্ত করিবার উদ্দেশ্য—সে যেন সর্ব্বতোভাবে সেই পরিবারেরই আচার ব্যবহারে অভ্যস্তা হইয়া সেই পরিবারেরই হইয়া যায়। তাহাকে সেই পরিবারেরই করিবার বিশেষ কারণও আছে। হিন্দুর সংসারের কেন্দ্র গৃহিণী—গৃহলক্ষ্মী। গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী না হইলে সংসারের শ্রী ও শৃঙ্খলা থাকে না; যে সংসারে "লক্ষ্মীশ্রী" থাকে না, সে সংসারে সর্ব্বদাই অসুখ ও অশান্তি। বধূ বালিকাবয়সে নূতন পরিবারে আসিয়া ধীরে ধীরে পিতৃগৃহের আচার-ব্যবহার—প্রথা প্রভৃতি ভুলিয়া শ্বশুরগৃহের আচার-ব্যবহারে—প্রথাদিতে অভ্যস্তা হয়। সে যত বড় হয়, ততই সংসারের কার্য্যভার শাশুড়ীর হস্ত হইতে তাহার হস্তগত হয়। ক্রমে—পরিণতবয়সে যখন প্রাচীনা গৃহিণী মহাযাত্রা করেন, তখন বধূ সংসারের সব কার্য্যে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। গৃহে পুরাতন গৃহিণীর তিরোভাবে সব ভার যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে নূতন গৃহিণীর হস্তগত হয়, যে ভাবে সংসারের কার্য্য চলিতেছিল—তেমনই ভাবে চলিতে থাকে। সংসারের কেন্দ্রে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বাহিরে কেহ বুঝিতেও পারে না। আজকাল অনেকে নূতন সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের আচার-ব্যবহারের বিচার করেন বলিয়াই আমরা আরম্ভে এত কথা বলিলাম।

হিন্দুর বিবাহ পুত্রার্থ এবং ইহাই জীবনের সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। বিবাহ হিন্দুর—গৃহীর অবশ্যকরণীয় সংস্কার বলিয়া পরিগণিত হইত বলিয়া মধ্যে কিছুদিন প্রতীচ্য সভ্যতায় মুগ্ধ ব্যক্তিরা হিন্দুদিগকে বর্ব্বর ও রক্ষণশীল বলিয়া উপহাসও করিতেন। তাঁহাদের কথা—

"নিরন্ন দরিদ্র পিতা কোন্ অধিকারে—
দরিদ্র সন্তানে আনে দরিদ্র সংসারে?"

কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, হিন্দুর সংসারের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে দারিদ্র্য তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তাহার আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল; সে ইহকালসর্ব্বস্ব ছিল না বলিয়াই স্বার্থসর্ব্বস্ব থাকিতে পারিত না। আজ আমরা একান্নবর্ত্তিপরিবার বর্ব্বরতার অবশেষ বলিয়া "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" হই, আর বিদেশী আদর্শে জীবনবীমা করিয়া সমবায়নীতি অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের উপায় করিতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ আমরা আমাদের সমবায়নীতি পরিহার করিয়া বিদেশী সমবায়নীতি গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হই। আমাদের সমাজে—আমাদের সংসারে যে সমবায়নীতি Co-operation চিরাচরিত ও চিরাদৃত—সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া যাহা সৃষ্ট ও পুষ্ট, তাহাই আজ আমাদের কাছে অনাদৃত! একটা প্রাচীন সভ্য জাতি পূর্ব্বপুরুষের পরীক্ষার ও অভিজ্ঞতার ফল পদদলিত করিয়া প্রবল অনুকরণবৃত্তিবশে বিদেশী ও আধুনিক আচার-ব্যবহারের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে—বহু যত্নে খনিত গৃহপ্রাঙ্গণস্থ স্বচ্ছসলিল সরোবর ত্যাগ করিয়া মৃগতৃষ্ণিকায় প্রলুব্ধ হইয়া ছুটিতেছে! যুরোপে ও মার্কিণে লোক যত বিলাসী ও স্বার্থপর অর্থাৎ যত ইহকালসর্ব্বস্ব হইতেছিল, ততই বিবাহ ধর্ম্মার্থ মনে না করিয়া বিলাসপথের অন্তরায়বোধে পরিহার করিতেছিল। তাহার ফলে যে দেশ যত বিলাসী, সে দেশে লোকসংখ্যাও তত কমিতেছিল। এবার তাহার কুফল সপ্রকাশ হইয়াছে—লোকক্ষয়ে দুর্ব্বল ফ্রান্স বিষম সময়ে ঠেকিয়া শিখিয়া প্রজাবৃদ্ধির প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। এবার ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে বিবাহের সংখ্যা বাড়িয়াছে; এমন কথা বলা হইতেছে যে, যে রমণী সন্তান প্রসব করিবে, সে-ই জাতির কল্যাণ সাধিত করিবে—জারজ সন্তানও আর সমাজে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে না।

বিবাহের পর বধূ প্রাপ্তবয়স্কা অর্থাৎ পদার্পিতযৌবনা, সুতরাং গর্ভধারণক্ষম হইলেই পরিবারের ধারারক্ষার সময় সমাগত হয়। যাঁহারা হিন্দুর বাল্যবিবাহেও বর্ব্বরতার চিহ্ন ও জাতীয় দৌর্ব্বল্যের কারণ লক্ষ্য করেন, তাঁহারা হিন্দুর আচারপদ্ধতি না জানিয়াই এক তরফা ডিক্রি দিয়া থাকেন। হিন্দুর সমস্ত জীবনটি আচারানুষ্ঠানবদ্ধ। সে সব আচার ও অনুষ্ঠান দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাফলসঞ্জাত। হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যহেতুই হিন্দুপরিবারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত; কিন্তু বাল্যবিবাহে অপ্রাপ্তবয়স্কা বধূর গর্ভে দুর্ব্বল সন্তান জন্মগ্রহণ করে না; সংস্কারের ব্যবস্থাই অন্যরূপ।

বধূ প্রাপ্তবয়স্কা হইলে আবার কতকগুলি সংস্কার আছে। যাহাতে বিবাহ ধর্ম্মার্থ বলিয়াই বিবেচিত হয়—ভোগার্থমাত্র বিবেচিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা হিন্দু শাস্ত্রকারগণ ও সমাজপতিরা পদে পদে করিয়া গিয়াছেন।

বধূ গর্ভবতী হইলে যে সব সংস্কার—(শাস্ত্রোক্ত বা আচারপ্রচলিত) সে সকলে বধূর প্রতি যত্নের ও স্নেহের পরিচয় সপ্রকাশ। যাহাতে দুর্ব্বল জননীর কোনরূপ ক্লেশ না হয়, যাহাতে তাহার চিত্ত প্রফুল্ল থাকে, যাহাতে সে মাতৃত্বের গুরুত্ব ও গৌরব অনুভব করিতে শিখে, এই সব সংস্কারে তাহারই ব্যবস্থা আছে। পিতৃপরিবারে ও পতিপরিবারের তাহার এই অবস্থান্তরে তাহার পদ যেন পরিবর্দ্ধিত হয়। উভয় পরিবারেই সকলে তাহার সন্তানপ্রসবের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে—সে সংসারের ধারা রক্ষা করিবে—দুই কূলের পিণ্ডোপায় তাহার আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

তাহার পর শিশু প্রসূত হইলে সূতিকাগারে যে সব ব্যবস্থা, সে সবও আমরা আর মানিয়া চলি না।

সূতিকাগার।

সন্তানের জন্ম পরিবারে আনন্দের কারণ হয়। প্রসূতিকে স্বতন্ত্র কক্ষে স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা করা হয় এবং সূতিকাগারের ব্যবস্থায় সর্ব্ববিষয়ে শুচিতা পরিলক্ষিত হয়। প্রতীচ্য বিজ্ঞান যত উন্নত হইতেছে, আমরা সেই সব ব্যবস্থার উপযোগিতা ততই উপলব্ধি করিতেছি। তাই এখন আবার আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অভিজ্ঞতালব্ধ ও ভূয়োদর্শনপরিচায়ক ব্যবস্থাসমূহ পুরাতন রূপে না হউক, নূতন রূপে গৃহীত হইতেছে। শিশুর নাড়ী কাটিবার সময় অস্ত্রের দোষে শিশুর দেহে রোগসঞ্চার হইতে পারে বলিয়া এখন অস্ত্র ঔষধযোগে বা উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া পরিষ্কার করিয়া লইবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে চেঁচাড়ীর দ্বারা সে কার্য্য হইত এবং প্রত্যেকবার নূতন চেঁচাড়ী

ব্যবহৃত হওয়ায় তাহাতে কোনরূপ রোগবীজ থাকিবার সম্ভাবনা থাকিত না। সেইরূপ সেকতাপের যে সব ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, সে সকল বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার অপেক্ষা অনুপযোগী ছিল না। একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, দেশে প্রচলিত প্রথাসমূহ লোকের খেয়ালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই, বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলেই সে সকলের প্রচলন। এমন কথাও বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বে এই সব ব্যবস্থার ফলেই প্রসবের পর প্রসূতির ক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্য শীঘ্র শীঘ্র উন্নতিলাভ করিত।

আমরা বলিয়াছি, সন্তানের জন্মে পরিবারে আনন্দের সঞ্চার হয়, শঙ্খনাদে সে আনন্দ ঘোষিত হয়। কিন্তু হিন্দুর সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের শাসন—আনন্দেও যাহাতে আতিশয্য না ঘটে, তাহার ব্যবস্থার জন্যই সর্ব্বপ্রথমে—শিশুর ষেটেরা পূজা। শিশুর বয়স ছয় দিন পূর্ণ হইলে ষেটেরাপূজার অনুষ্ঠান। ইহাই শিশুর জীবনের প্রথম মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান।

ষেটেরাপূজা।

ষেটেরাপূজার পর যে আনন্দোৎসব, তাহাতে পুরোহিতের কোন কায নাই। তাহাতে পরিবারের ও প্রতিবেশীদিগেরই অধিক আনন্দ। এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালার স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে। ইহাই আটকৌড়ে।

প্রসবাবধি এক মাসকাল প্রসূতিকে স্বতন্ত্র থাকিতে হয়; ততদিন তাঁহাকে অশুচি বিবেচনা করা হয়। এই ব্যবস্থার বিশেষ কারণ আছে। শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও প্রসবান্ত স্রাবাদি দৈহিক অবস্থা বিবেচনা করিলে এই ব্যবস্থার কারণ উপলব্ধ হইবে। এই সময় প্রসূতির পক্ষে দৈহিক
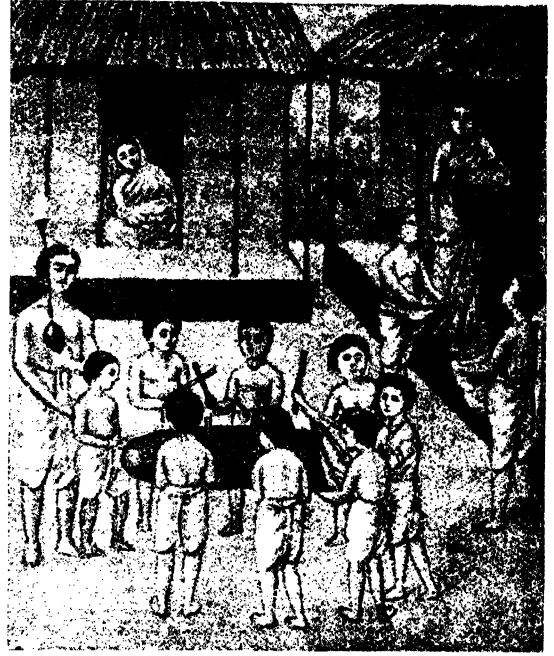
আটকৌড়ে।

দৌর্ব্বল্যহেতু গৃহকার্য্য কষ্টকর হয়—বিশেষ এই অবস্থায় শ্রমসাধ্য কোন কার্য্য করিলে কেবল যে দৌর্ব্বল্যমুক্তিতে বিলম্ব ঘটে এমনই নহে, পরন্তু রোগও জন্মিতে পারে।

ষষ্ঠীপূজা।

আবার এই সময় নবজাত শিশুর প্রতি বিশেষ মনোযোগদান নিতান্ত প্রয়োজন। এই সকল কারণে যাহাতে বিশ্রামলাভ করিয়া প্রসূতি শীঘ্র শীঘ্র দেহের বায়িত শক্তি পুনরায় লাভ করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারেন, সেই জন্যই এ ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা যে প্রসূতির অবস্থা বিবেচনা করিলে বিশেষ উপযোগী বলিয়াই মনে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আবার এই সময় গৃহস্থ সকলেই প্রসূতির প্রতি বিশেষ যত্নের ব্যবস্থা করেন—যেন সকলেই তাঁহার জন্য শঙ্কিত—সকলেই তাঁহাকে লইয়া ব্যস্ত। প্রসূতির পথ্যাদিসম্বন্ধেও বিশেষ নিয়ম পালিত হয়।

ফলে অল্পকালমধ্যেই প্রসূতি দৌর্ব্বল্যমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইয়া থাকেন। এ দিকে শিশুও একটু বড় হয় এবং কিছুদিন অনন্যকর্ম্মা হইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতে পাইয়া প্রসূতি তাহার শারীরিক ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য বিশেষরূপে বুঝিয়া আবশ্যক ব্যবস্থা করিতে পারেন।

এইরূপে এক মাস গত হয়। তখন প্রসূতি আবার তাঁহার অভ্যস্ত পারিবারিক জীবনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন—আবার তাঁহার গৃহকার্য্যের ও দেবসেবার অধিকারলাভ ঘটে। সেই সময় আবার হিন্দুর আচারানুসারে একটি ধর্ম্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। তাহা—ষষ্ঠীপূজা।

শিশুর গৃহপ্রবেশের আরম্ভে ইহা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পর প্রসূত ও প্রসূত আর অশুচি বলিয়া বিবেচিত হইবার কারণ থাকে না। সেই দিন হইতে উভয়ে পরিবারের অঙ্গীভূত। [ক্রমশঃ।

পরলোকের কথা।

মেস্ ছাড়িয়া কেবল কলিকাতায় নূতন বাসা লইয়াছি। বাড়ীটি ভাড়া লইয়া দশ দিন একাকীই সেই বাড়ীতে ছিলাম। তাহার পর গৃহিণী আসিয়া বাসার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন। কলেজে পড়া বিদ্যার গরহজম তখনও একেবারে কাটে নাই, মধ্যে মধ্যে তাহার উৎকট উদ্গার উঠিত।

গ্রীষ্মকাল। তাহাতে সে দিন বড়ই গরম পড়িয়াছে। ঘরে তিষ্ঠান ভার। আমি দ্বিতলের ছাদে যাইয়া শুইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে গৃহিণী মেয়ের ভার ঝির হাতে দিয়া স্বয়ং সশরীরে ছাদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিসে কম খরচে বাসাখরচ চালাইয়া হাতে দু'পয়সা রাখিতে পারা যায়, সেই বিষয়েই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। আকাশে শশিখণ্ড সে কথা শুনিয়া হাসিতেছিল। অকস্মাৎ বোধ হইল, বাড়ীর নিম্নতল হইতে দীর্ঘ ঘণ্টানিনাদবৎ শব্দ উঠিল—"ও—ও—ও।" শব্দটি প্রায় এক নিশ্বাসে আধ মিনিটকাল স্থায়ী হইল। শব্দ গভীর, কিন্তু খুব উচ্চ নহে। এমন বিষাদভরা কাতরতামাখা শব্দ ত কখনও শুনি নাই। বোধ হইল, যেন কাহারও বুকের সাত পর্দ্দা ভেদ করিয়া এই তীব্র যাতনাপূর্ণ শব্দটি উত্থিত হইল। আমি স্বভাবতঃই কাণে কম শুনি; কিন্তু তবুই সেই যাতনাবিজড়িত গম্ভীর ধ্বনি আমার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল। গৃহিণী একটু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের শব্দ?" আমি বলিলাম, "কি জানি? শব্দটা কোন্ দিক হইতে আসিল বল দেখি?" গৃহিণী কহিলেন, "বোধ হইল, নীচের দিক হইতে উহা আসিতেছে।" আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আবার সেই শব্দ উত্থিত হইল। ততক্ষণ স্থায়ী সেইরূপ বিষাদমাখা। গৃহিণীর ভয় ও আমার কৌতূহল বাড়িল। গৃহিণী বলিলেন, "বাড়ীটি ভাল ত?" আমি বলিলাম, "ও সব কিছু মনে করিও না; নিকটের কোন বাড়ীতে কেহ যন্ত্রণায় কাৎরাইতেছে, রাত্রিতে সেই শব্দ কাণে আসিতেছে।" আবার সেই শব্দ উত্থিত হইল। আবার উহা বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল। আমরা ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম।

পরদিন বিশেষ অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু নিকটে কোন বাড়ীতে কেহ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়াছে, এমন কোন সন্ধান পাইলাম না। ইহার পর এক মাস কাটিয়া গেল। আর কোন দিন কোন শব্দ শুনা গেল না। একদিন আবার দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া তামাকু খাইতেছি, অকস্মাৎ আবার সেই শব্দ! তখন রাত্রি দশটা। গৃহিণী ভয় পাইলেন। আবার অনেক কষ্টে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলাম। তাহার পর মধ্যে মধ্যে ঐরূপ একটা শব্দ শুনা যাইত। পরে শুনা গেল, ঐ বাড়ীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন অত্যন্ত যাতনা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার পর হইতেই কেহ কেহ তথায় ঐরূপ শব্দ শুনিতে পায়।

ব্যাপারটি কি, তাহা বুঝা যায় নাই। আমি স্বয়ং কিছু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে বাড়ীর ঝি, চাকর ও অন্যান্য লোক নানা কথা বলিত, সে সকল কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। যাহা হউক, এই ব্যাপার লইয়া আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা ও তর্ক হইত।

ভৌতিক-ব্যাপার-সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথাই বলিয়া থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে সকলে এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করে না। যাহারা ইহা প্রত্যক্ষ করে, তাহারা এই ব্যাপারে সাধারণতঃ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। সে অবস্থায় তাহাদের সত্যসন্ধানের শক্তি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া যায়। সেইজন্য তাহারা যাহা বলে, তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু সর্ব্ব দেশে—সকল সমাজে—সর্ব্ববিধ লোকের মধ্যে ভৌতিক কাহিনী শুনা যায়, তবে অনেকেই ভৌতিক ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে এক পাই লোক সত্য সত্য এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পায় কি না সন্দেহ। তাহার উপর আজকাল ভৌতিক ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া স্বীকার করিলে পাছে লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অথবা মিথ্যাবাদী মনে করে, এই আশঙ্কায় অনেকে সত্য সত্য কিছু দেখিলেও তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। অনেকে ঐরূপ ব্যাপারকে দৃষ্টিবিভ্রম বা জাগ্রত স্বপ্ন মনে করেন। আমার জনৈক বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধাস্পদ্ বন্ধু চিরকালই ভৌতিক কাহিনীকে গাজাখুরি গল্প ও ঐরূপ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া উপহাস করিতেন। এই ব্যাপার লইয়া তিনি দুই এক স্থলে দুই একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকেও অপমানিত করিয়াছেন, ইহা আমি জানি। কিন্তু তাঁহার প্রথম পক্ষের স্ত্রীবিয়োগের পর অকস্মাৎ তাঁহার এই বিদ্রূপের সুরটি অনেকটা নরম হইয়া আসিল। এই বিদ্রূপব্যাপারে বর্ত্তমান সন্দর্ভের লেখকও তাঁহার যুড়িদার ছিলেন। তবে তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে আমার অবিশ্বাস কোনও বিশিষ্ট কারণে ঘোর সন্দেহে পরিণত হয়। আমার সন্দেহের কারণ আমার নিজের প্রত্যক্ষদৃষ্টবিষয় নহে, আমার জনৈক পরম শ্রদ্ধাভাজন ও সত্যনিষ্ঠ গুরুজনেরই প্রত্যক্ষবিষয়। আমি কখনও তাঁহার কথায় অবিশ্বাস করি নাই, কিন্তু অনেক সময় ভাবিতাম, তিনি বোধ হয়, কোনরূপ দৃষ্টিবিভ্রমে পড়িয়া থাকিবেন। বন্ধুবরের এইরূপ মতপরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখিয়া আমি একদিন নির্জ্জনে তাঁহার নিকট ঐ প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলাম ও উক্ত গুরুজনের প্রত্যক্ষঘটনার বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, "উহা বোধ হয় কোনরূপ Hallucination হইবে, লোক ঐরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে।" আমি উত্তর করিলাম, "সে কি, তুমি এ কথা স্বীকার করিয়া ফেলিলে? আগে কেহ ও কথা বলিলে যে মারিতে উঠিতে? কেন, নিজে কিছু দেখিয়াছ নাকি?" তাঁহার চোক মুখের ভঙ্গী যেন তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঐরূপ অভিজ্ঞতা সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিল। কিন্তু মুখে বলিলেন, "মাষ্টার! ঐরূপ inconvenient question না করাই ভাল।" আমি নাছোড়বান্দা। শেষে তিনি ব্যাপারটি গোপন রাখিতে অনুরোধ করিয়া কহিলেন, "যে সময় আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়, তখন আমি কলিকাতায়। আমি জনৈক আত্মীয়ের শব লইয়া নিমতলায় গিয়াছিলাম। তথা হইতে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইয়াছিল, রাত্রি অধিক ছিল না, নিদ্রাও হইল না, সেই জন্য আমি একটা বড় আয়নার সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। আমার ঘুম একেবারেই আসিতেছিল না। চোকজ্বালা করিতেছিল। অকস্মাৎ দেখিলাম, আমার স্ত্রী যেন কেমন একটা বিবর্ণমূর্ত্তিতে সেখানে উপস্থিত! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি হঠাৎ এখানে! তিনি উত্তর করিলেন, 'বাড়ীর লোক আমার গহনাপত্র সমস্ত কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে।'—এই বলিয়া সেই ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। আমি ভাবিলাম, আমি কি ক্ষেপিব নাকি? এ যে মাথা খারাপ হইবার লক্ষণ! পরদিন সেই আত্মীয়ের বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী গিয়া সংবাদ পাইলাম, পূর্ব্বরাত্রি ঠিক ঐ সময়ে অকস্মাৎ কলেরায় গৃহিণীর দেহান্ত হইয়াছে! কলেরায় মরিলে লোক যেমন বিবর্ণ হয়, আমি সেই ছায়ামূর্ত্তিটি ঠিক সেইরূপ বিবর্ণ দেখিয়াছিলাম।"

আমি এই বন্ধুটির কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। ইহাকে Hallucination বা জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নসন্দর্শন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলিত; কিন্তু পত্নী ঠিক যে সময় দেহরক্ষা করিয়াছিলেন, পতি সেই সময় ছত্রিশ মাইল দূরে তাহারই স্বপ্ন দেখিলেন! বিশেষ হাতে আলতা ও রাঙ্গা সুতাবাঁধা, মাথায় সিঁদুর ঢালা, এ মিল যে বড়ই বিস্ময়কর। এরূপ গল্প অনেক আছে। অনেকগুলির সত্যতা বিলাতের বড় বড় লোক কর্ত্তৃক স্বীকৃত। এরূপ ক্ষেত্রে এই সকল তথ্য জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়াও কি মূর্খতা নহে? আমরা এ সম্বন্ধে বিলাতের জনকয়েক বড় বড় বৈজ্ঞানিকের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করিতেছি।

ডাক্তার জর্জ্জ জে রোমানিস্ বিলাতের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক। তিনি বিলাতের সাইকিকাল রিসার্চ্চ সমিতির সেক্রেটারী স্বর্গীয় মেয়ার্সকে লিখিয়াছেন,—

"১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে নিশীথ সময়ে আমি দেখিলাম, আমার শয়নকক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একটি শ্বেত পরিচ্ছদপরিহিত মূর্ত্তি আমার শয্যার পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় সে আমার দিকে ফিরিল। তাহার আপদমস্তক শ্বেতচাদরে আচ্ছন্ন। হঠাৎ সে দুই হাত দিয়া তাহার মুখের আবরণ সরাইয়া ফেলিল। আমি তাহার হস্তদ্বয়ের মধ্যে আমার ভগিনীর মুখ দেখিতে পাইলাম! ভগিনী পীড়িতা, গৃহান্তরে শয়িতা। আমি তৎক্ষণাৎ তাহার নাম ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। ছায়ামূর্ত্তি অদৃশ্য হইয়া গেল! আমার বিশ্বাস, আমি তখন জাগিয়াছিলাম। পরদিন আমি সার্ উইলিয়াম জেনারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তিনি বলিলেন, 'তোমার ভগিনী আর অধিকদিন বাঁচিবেন না।' সত্য সত্যই তিনি

ইহার কয়েকদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।' প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমার স্বাস্থ্য তখন ভালই ছিল। কোনরূপ দুঃখ বা উদ্বেগ ছিল না। আমাদের বাড়ীর ডাক্তারই আমার ভগিনীর চিকিৎসা করিতেছিলেন। ঐ পীড়া যে বিশেষ কঠিন হইবে, ডাক্তার এরূপ কোন শঙ্কা করেন নাই। সেই-হেতু ভগিনীর জন্য আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ জন্মে নাই। তাঁহার নিজেরও কোনরূপ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে বা পরে আমি আর কখনও এরূপ ব্যাপার দেখি নাই।"

ইহা মৃত্যুর পূর্ব্বকার ঘটনা। হিন্দুর বিশ্বাস, নিদ্রাবস্থায় দেহীর আত্মা কখনও কখনও অতি অল্প সময়ের জন্য দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অন্যত্র যায়। যুরোপীয়রা এই ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা আত্মাকে কতকটা জড়পদার্থের মতই ধারণা করিয়া থাকেন। কাজেই তাঁহাদের অনেক ব্যাপার বুঝিতে গোল হয়। এ সব বিষয়ের আলোচনা পরে করা যাইবে। আপাততঃ কোন ব্যক্তির ঠিক মৃত্যুর সময় বা অতি অল্প পরে তাহার দূরস্থ বন্ধু বা আত্মীয় এইরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক।

ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই বিলাতের ম্যাণ্ড্ল্যাঙ্গের নাম শুনিয়াছেন। ইঁহাকে কেহ কুসংস্কারাবিষ্ট বলিতে পারেন না। ইনি এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বৃটানিকা নামক গ্রন্থে Apparitions নামক একটি সন্দর্ভ লিখিয়াছেন। সেই সন্দর্ভেই তিনি লিখিয়াছেন, "এই সন্দর্ভ লেখকের বিশ্বাস, এক সময়ে তিনি এক শত মাইল দূরে থাকিয়া ইংলণ্ডীয় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ও সুপণ্ডিত অধ্যাপককে তাঁহার মৃত্যুসময়ে দেখিয়াছিলেন। তর্কের খাতিরে যদি এ কথাও স্বীকার করা যায় যে, এই সন্দর্ভলেখক অন্য এক ব্যক্তিকে উক্ত অধ্যাপক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও উক্ত অধ্যাপকের মৃত্যুর সময়ের সহিত তাহার এই মানসিক ধারণার সময়ের অদ্ভুত মিল, খুব ছোট করিয়া বলিতে হইলেও অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।" এই কয় ছত্র লেখার ভঙ্গী দেখিয়াও মনে হয় যে, ম্যাণ্ড্ল্যাং অন্য ব্যক্তিকে উক্ত অধ্যাপক বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহারও বিশ্বাস নহে। তিনি তর্কের খাতিরে উহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং তিনি সে মুমূর্ষু অধ্যাপকের একটা ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছেন, ইহাই মনে হয়।

ম্যাণ্ড্ল্যাং যাহা খুব সাবধানে বলিয়াছেন, অনেকে সেই ভাবের ব্যাপার বেশ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন। সমাজে যাঁহাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আছে, তাঁহারা হঠাৎ একটা কথা বলিয়া আপনাদের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করিতে চাহেন না। সেই জন্য অনেক পদস্থ ব্যক্তি ছদ্ম নামে বা সাঙ্কেতিক নামে আপনার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এক সময় অকস্মাৎ এক জনতার মধ্যে তাঁহার কোন পরিচিত লোকের মত ঠিক একটি লোককে দেখিতে পান। পরে জানিতে পারেন যে, সেই ব্যক্তি ঠিক সেই সময় বহুদূরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পদস্থ লোকরা অতি সাবধানে কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু এ সকল বিষয়ে পদস্থ লোক অপেক্ষা সত্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত ও সত্য কথা বলিতে নির্ভীক লোকেরই কথা অধিক আদরণীয়। নিম্নে বিলাতের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ সত্যনিষ্ঠ ও ধার্ম্মিক ধর্ম্মযাজকের প্রত্যক্ষ ব্যাপারের মর্ম্ম অনুবাদ করিয়া দিলাম।

রেভারেণ্ড মথিফ্রষ্ট ইংলণ্ডের ইসেক্সে থাকিতেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি চা খাইতে খাইতে তাঁহার স্ত্রীর সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, জানালার দুয়ারে কে টোকা মারিতেছে। ফ্রষ্ট ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁহার দিদিমা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে তাঁহার অভ্যস্ত পরিচ্ছদ। ফ্রষ্ট ভাবিলেন, দিদিমা বুঝি কোন রকম খবর না দিয়াই আসিয়াছেন। তিনি খুব কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। দিদিমা তখন ইয়র্কশায়রে ছিলেন। উভয় স্থানের ব্যবধান দুই শত মাইল। পাদ্রী ফ্রষ্ট গৃহের বাহিরে যাইয়া আতিপাতি করিয়া বৃদ্ধার সন্ধান করিলেন; কোথাও তাঁহার কোন সন্ধান পাইলেন না! তখন এপ্রিল মাস। বেলা পাঁচটা। সুতরাং ইংলণ্ডে তখন দিবালোকের অবসান হয় নাই। কিন্তু শ্রীমতী ফ্রষ্ট কিছুই দেখেন নাই। পরে জানা গেল যে, ঐ দিন ইয়র্কশায়রে বেলা সাড়ে চারিটার সময় বৃদ্ধার দেহান্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক সিজুইকের প্রশ্নের উত্তরে পাদ্রী ফ্রষ্ট বলিয়াছেন, বৃদ্ধা যে পীড়িত, তাহা তাঁহারা কেহই জানিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধেও তাঁহারা কোন কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন না। সেই ঘটনায় দুই বৎসর পূর্ব্বে ফ্রষ্টের সহিত তাঁহার দিদিমার দেখা হইয়াছিল। দিদিমা শেষ দেখাশুনার সহিত নাতি ফ্রষ্টকে বলিয়াছিলেন, "আমার কঠিন পীড়া হইলে দেখিতে আসিস্। আর যদি তাহা না পারিস্ ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময় আসা চাই।" ফ্রষ্ট হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "শুনিয়াছি লোক মরিলে তাহাদের ভালবাসার লোককে দেখা দেয়। দিদিমা! তুমি যদি মরিয়া সুখী হও, তাহা হইলে আমাকে দেখা দিবে ত?" দিদিমা তখন উত্তর করিয়াছিলেন, "যদি দেখা দিতে পারি ত দেখা দিব।" অধ্যাপক সিজুইকের নিকট পাদ্রী ফ্রষ্ট স্পষ্টই বলিয়াছেন, মৃত্যুর পর অনেকে আত্মীয় বান্ধবকে দেখা দেয়, এ কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। তবে দিদিমাকে আমোদ করিয়া কথা বলিয়াছিলেন। তিনি এ কথাও বলিয়াছিলেন যে, এই ঘটনার পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে অন্য কেহ যদি তাঁহার নিকট ঐরূপ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতেন না।

এইরূপ বৃত্তান্ত যথেষ্টই আছে। প্রেততত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির বিবরণ-পুস্তকের দশম খণ্ডে এইরূপ বিস্তর ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, পাঠক, তাহা পড়িয়া দেখিবেন। আমাদের মধ্যে অনেকের এইরূপ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয়। একবার এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় দশ বার জন শিক্ষিত ব্যক্তি বসিয়া প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। তন্মধ্যে পরলোকে অবিশ্বাসী পাঁচ জন, প্রেতযোনিতে অবিশ্বাসী আট জন (তিন জন পরলোক মানিতেন, ভূত, প্রেত, মানিতেন না) অবশিষ্ট তিন চারি জন প্রেততত্ত্বে অল্লাধিক বিশ্বাসী। তন্মধ্যে বর্ত্তমান সন্দর্ভলেখক অন্যতম। বহুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর, কথাটা যখন শেষ হইয়া গিয়াছিল, তখন অবিশ্বাসীদলের মধ্যে যিনি বিশেষ তার্কিক ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তিনি বলিয়াছিলেন, আত্মীয় বন্ধুর বা বিশেষ প্রিয়পাত্রের মৃত্যু হইলে অনেক সময় দূরস্থ লোক তাহার ছায়ামূর্ত্তি দেখিয়াছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা যাহা দেখে, তাহা একটা ভ্রান্তিমাত্র। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করা হইল, "আপনার কখনও এরূপ ভ্রান্তি ঘটিয়াছে কি না ?" তিনি নিজে ঐরূপ ব্যাপারের প্রত্যক্ষদর্শী, ইহা অতি কষ্টে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু বৃত্তান্তটি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। কেবল এইমাত্র বলিলেন, তিনি নিজে যাহা বুঝেন না, সে সম্বন্ধে কোন কথাই তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন না। ভৌতিক ব্যাপার যখন তাঁহার বিচার-বুদ্ধির আমলে আইসে না, তখন তিনি একটা Solitary instance (একমাত্র দৃষ্টান্ত) দেখিয়া তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে চাহেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে কেহই এই সকল ব্যাপার বার বার দেখে না। সকলের ভাগ্যে এইরূপ দর্শনলাভ ঘটে না। যদি সকলে ঐরূপ ব্যাপার দেখিতে পাইত, তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান থাকিত না। সংসারের গতি ভিন্নমুখী হইত। কিন্তু তথ্যকে অবহেলা করা কখনই সঙ্গত নহে। যাঁহারা কোন তথ্য সত্য জানিয়াও তাহা অস্বীকার করেন, তাঁহারাই প্রকৃত কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

কেহ কেহ মনে করেন, ভৌতিক ব্যাপার বিজ্ঞানবিরোধী। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। ইহা বিজ্ঞানবিরোধী নহে, বিজ্ঞানসম্মতও নহে। ইহা বিজ্ঞানের অধিকারবহির্ভূত। কোন কোন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ইহা বিজ্ঞানের এলাকার মধ্যে আনিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস, ইহা কখনই জড়বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞানের আমলে আসিতে পারে না। কারণ তথ্যের পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণই বিজ্ঞানের বনিয়াদ। যেখানে তথ্যের পর্য্যবেক্ষণ (observation) ও পরীক্ষণ (experiment) না চলে, সেখানে বিজ্ঞান তাহার সৌধ রচিবার বনিয়াদ পাইবে কোথায় ? এই অশরীরী ভূত ত কখনই পঞ্চভূতের মত পরীক্ষা-মন্দিরের (laboratory) ভিতর প্রবেশ করিবে না।

যে ব্যাপার এখন মানুষের যুক্তির ভিতর আইসে না, মানুষ তাহা সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না। এক সময় মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতা অধিক ছিল। তখন মানুষ অনৈসর্গিক ও উদ্ভট ব্যাপারেও বিশ্বাস করিত। পূর্ব্বে যদি কেহ বলিত, "অমুক স্থানে চন্দনবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে", তাহা হইলে সে কালের অনেক লোক এবং এখনকার অনেক অশিক্ষিত অধিকবিশ্বাসী লোক সে কথা বিশ্বাস করিত ও করে। এখনকার শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ লোক তাহা একেবারেই বিশ্বাস করে না। কারণ স্বর্গের দেবতারা সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শ্বেতচন্দন ঘসিয়া একটা বিস্তীর্ণ জনপদময় কেবল ছড়া দিবে, ইহা বিশ্বাস করিবার মত বুদ্ধি এখনকার লোকের আর নাই। যে কয়েক জন আছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছে। কাজেই কথাটা শুনিলে লোক হাসে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের এক বিস্তীর্ণ জনপদে চন্দনবৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ পায়। যে স্থানে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, সে স্থানের লোক বিস্ময়ে বিভোর হইয়া পড়ে। যে স্থানে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেই স্থানের বাহিরে এই ব্যাপার অতিরঞ্জিত ও পল্লবিত হইয়া নানা গুজবে পরিণত হইয়াছিল। কোন কোন স্থানের লোক শুনিয়াছিল যে, যে সময় এই চন্দনবৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সময় চন্দনের গন্ধে দশদিক্ পূর্ণ হইয়াছিল। ইত্যাদি। যে স্থানে এই চন্দনবৃষ্টি হইয়াছিল, বর্ত্তমান সন্দর্ভলেখক সেই স্থানে ছিলেন। ভেরাণ্ডা গাছে, আণ্ডাওড়া গাছে বড় বড় ফোঁটা আমি স্বয়ং দেখিয়াছি। উহা তখন শুকাইয়া গিয়াছিল। উহা দেখিতে শুষ্ক শ্বেতচন্দন ফোঁটার মত। আমি হাতে করিয়া দেখিয়াছি, উহাতে কোন গন্ধই নাই। শুষ্ক ফোঁটা হাতে ঘসিলে অতি সূক্ষ্ম ধূলার মত বলিয়াই মনে হইল। কয়েকদিন পরে সংবাদপত্রে ঐ ব্যাপার লইয়া বৈজ্ঞানিকরা বড় বড় প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহারা বুঝাইলেন, ব্যাপার একেবারেই অনৈসর্গিক নহে! বায়ুবেগে ধূলিরাশি আকাশে উৎক্ষিপ্ত হইলে উহার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ অতি ঊর্দ্ধে উঠে এবং বহু দূর চলিয়া যায়। তাহার পর আকাশে হঠাৎ মেঘ যখন বিন্দু বিন্দু জলে পরিণত হয়, তখন সেই সূক্ষ্ম ধূলিকণা বারিবিন্দুর সহিত মিশিয়া ফোঁটার আকারে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়। এই ধূলিকণা সময় সময় বায়ুবেগে বহু দূর হইতে চালিত হইয়া আসে। সেই জন্য স্থানবিশেষের মাটির রঙ্গের সহিত উহার রঙ্গের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। সংবাদপত্রে যখন এই হেতুবাদ প্রকাশিত হইল, তখন সকলেই উহা বিশ্বাস করিলেন। যাঁহারা না দেখিয়া সমস্ত ব্যাপারটি গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারাও শেষে ব্যাপারটা না দেখিয়াই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপার এইরূপই হইয়া থাকে। কোন ব্যাপার যদি বুদ্ধির বাহিরে থাকে এবং সেই ব্যাপার

বৃষ্টি কচিৎ কখনও ঘটে, তাহা হইলে লোক তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে চাহে। চন্দনবৃষ্টি অর্থাৎ চন্দনবৎ কর্দ্দম-বৃষ্টি সংসারে নিত্য ঘটে না। কাজেই সকলের ভাগ্যে উহা দেখা সম্ভবে না। আবার অনেক সময় প্রথম ঐরূপ কর্দ্দম-বৃষ্টির পর যদি ভয়ঙ্কর জোরে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহা ধুইয়া যায়, উহার চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকে না। কাজেই এরূপ ঘটনা কচিৎ দেখা যায়। এরূপ স্থলে উহা যদি বুদ্ধির অতীত ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করা হয়, তাহা হইলে অনেকেই উহা মিথ্যা বলিয়া মনে করে। প্রেতাত্মাদর্শনও সেইরূপ। ব্যাপারটা ঘটে। কিন্তু উহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না এবং উহার মর্ম্ম বুঝা যায় না বলিয়াই লোক উহা বিশ্বাস করিতে চাহে না। সেই জন্য যাঁহারা উল্টা দিকে কুসংস্কারাপন্ন, তাঁহারা তথ্যকে তথ্য উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পান। ইহা মানুষের স্বভাব। [ক্রমশঃ।

বৈদ্যনাথ।

[মহামান্য গিধোড়াধিপতির প্রেরিত।]

বৈদ্যনাথের মন্দিরের আদি ইতিহাস পৌরাণিক রূপকের আবরণে লুক্কায়িত। মন্দিরাধিষ্ঠিত বিগ্রহের নাম রাবণেশ্বর। কথিত আছে, লঙ্কাধিপতি দশানন স্বকীয় রাজধানীতে এই দেবতাকে লইয়া যাইতে যাইতে কোন কারণবশতঃ—বোধ হয়—অন্য দেবমণ্ডলীর শত্রুতাসাধনহেতুই ইঁহাকে এই স্থানে নামাইয়াছিল এবং তদবধি দেবতা এই স্থানেই বিরাজ করিতেছেন। পুরাণোক্ত এই কিম্বদন্তী সত্য হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ত্রেতাযুগে এই দেবতার এই স্থলে অধিষ্ঠান হইয়াছিল। কিন্তু জনসাধারণের বিশ্বাস যে, বৈদ্যনাথ শিবের দ্বাদশ লিঙ্গের একটির আশ্রয়স্থান। কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে, সত্যযুগেই মহাদেব এই স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

শুনা যায় যে, বৈজু নামক এক পার্ব্বত্য ভীল প্রথম এই দেবতার কথা জানিতে পারে ও তাহার পূজক হয়। পদ্মপুরাণে এই বৈজু ভীলের কথা আছে। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের বেশে তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে এই দেবতার সংবাদ দেন। লোকের ধারণা যে, এই বৈজু ভীলের নামানুসারে অত্রস্থ দেবতার নাম হইয়াছে,—বৈজুনাথ বা বৈদ্যনাথ। সাঁওতালী প্রবাদ এইরূপ রটনা করিয়া থাকে এবং Sir W. W. Hunterএর "The Sonthal Traditions of Baidyanath"এ এই কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু যে দেবমূর্ত্তি অসভ্য সাঁওতালজাতির পূজার পাত্র ও যাহা হিন্দুদের গণ্ডীর বাহিরে বহুদূরে অবস্থিত, তাহা কেমন করিয়া ভারতব্যাপী গৌরবের অধীশ্বর হইল, কেমন করিয়াই বা ভারতবাসীর সমস্ত পূজা ও ভক্তির সামগ্রী হইয়া [illegible] যে এই স্থানে ইঁহাকে আনাইয়াছিল [illegible] যে [illegible] পূজীভূত শ্রোতার অন্তস্থল, তাহা অনেক পুরাণে ও প্রত্নতত্ত্বজ্ঞের পুস্তকে উল্লিখিত আছে। সত্য বটে যে আধুনিক দুমকা, দেওঘর ও তৎসন্নিহিত স্থান বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, এবং মৎস্যপুরাণে এই মহাপীঠস্থ ভৈরবের নাম আছে, কিন্তু ইহার প্রধান প্রতিপত্তি যে, ইহা মহাদেবের অনুগ্রহে পবিত্র। সেইজন্য বৎসরে বৎসরে ভারতের সমস্ত প্রদেশ হইতে শত সহস্র নরনারী এই তীর্থে ছুটিয়া আসে এবং এই দেবতার চরণে অর্ঘ্যদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করে। যে দ্বাদশ স্থলে শৈব-মহিমা বিকাশ হইয়াছিল, ইহা তাহাদের অন্যতম এবং এই জ্যোতির্লিঙ্গের অবস্থিতিহেতুই স্থানের মাহাত্ম্য এত অধিক। স্থানের ও সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া ইহার যশ ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

শিবপুরাণে কথিত আছে যে, দেওঘর জ্যোতির্লিঙ্গের আশ্রয়স্থান বলিয়াই ইহার এত মাহাত্ম্য। সাঁওতালজাতির দেবতা প্রভৃতির নিয়ন্তা বাহুশক্তিবৃন্দ এবং সেইজন্যই ইহা স্বাভাবিক যে, জননশক্তির মূর্ত্ত বিকাশকে তাহারা বিশেষ ভক্তির সহিত পূজা করিবে। তাহাদের আদিম বাসস্থান মধ্য এসিয়া, এবং তাহারা Scythian জাতির শাখা। আদিম জাতিসকলের যে সব দেবতা ছিল, ইহাও সে সকলের মধ্যে অন্যতম। ক্রমশঃ ইহার পূজা সমগ্র হিন্দুস্থানের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। Hunter সাহেবের রচিত গ্রন্থে ইহার সমস্ত ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বেই বৈদ্যনাথের কথা ভারতে বিবৃতিলাভ করে। লোকরচিত কাহিনীর জাল ইহাকে অতুলনীয় পবিত্রতার আধার বলিয়া প্রকাশিত করে।

অনেক গ্রন্থ—যাহা দশম শতাব্দীর পরে লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল গ্রন্থ এই স্থানের মর্য্যাদা কীর্ত্তন
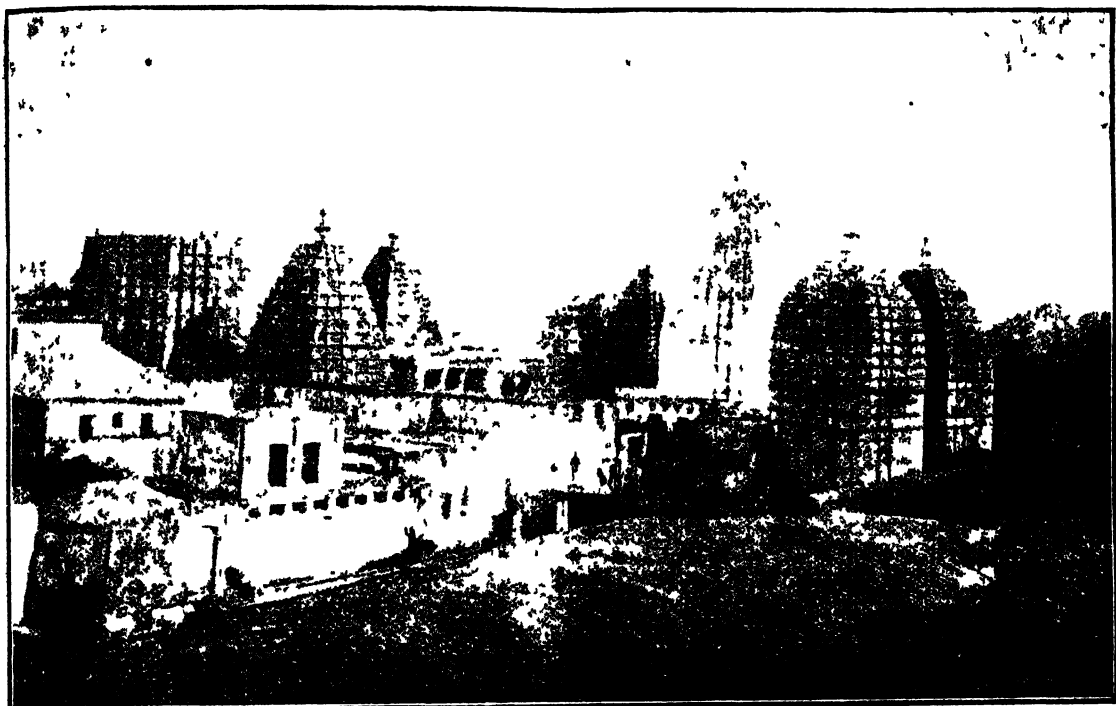
Photo kindly p... ...

শ্রী শ্রীবৈদ্যনাথের মন্দির।

করে। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় তাঁহার রচিত বিবরণে লিখিয়াছেন যে, এই মন্দির বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, শত শত বৎসর ধরিয়া বিগ্রহ মন্দিরাধিষ্ঠিত না হইয়াই বর্ত্তমান ছিল। মহারাজ বিক্রমসিংহের বংশের অষ্টমপুরুষ রাজা পুরাণমল যদি এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন, তবে তাহার পূর্ব্বে দেবতা কি উন্মুক্ত প্রান্তরে ছিলেন?

যখন ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মন্দিরের নির্ম্মাণকালনির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন, তখন অন্য কেহই পার্শ্ববর্ত্তী সাঁওতাল দিগের জাতীয়দেবতা ও দেবমন্দিরের কথা ভাবে নাই। যে জাতি শালবৃক্ষের তলে শিলাস্থাপনা করিয়া স্বকীয় মনের সবল ভক্তিতে তাহাকেই ইষ্টদেবতা বলিয়া মনে করিত, দেউলের আবরণ যে তাহার দেবতার পক্ষে অতি হীন ও দীন বলিয়া বিবেচনা হইত, সে তাহার দেবতাকে নীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে, প্রকৃতিনির্ম্মিত কুঞ্জাভ্যন্তরে, বৃক্ষ লতাদির শ্যামল শোভার বেষ্টনের মধ্যে রাখিয়া দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার সংঘর্ষ এই এক স্থলে। হিন্দুধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা আছে, আবার ইন্দ্রিয়বর্গের বাহ্যসাধনাও আছে। এই ধর্ম্মের aestheticism একটা প্রধান উপাদান। সাঁওতাল জাতির তাহা নহে।

কেমন করিয়া সাঁওতালজাতির অধিকার হইতে এই দেবতা অন্যজাতির হস্তে গিয়াছিল, তাহা পার্শ্ববর্ত্তী গিধোর রাজপরিবারের একখানি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরাণমল সন্নিহিত স্থানটি সমস্ত জয় করিয়াছিলেন। এই মন্দিরও তাঁহার নিজ অধিকারভুক্ত করেন।

নিম্নলিখিত বিবরণটি Imperial Gazetteএ পাওয়া যায় (Provincial Series, Bengal, Vol. II, 1909) এবং ইহাতে গিধোরের রাজপরিবারের উদ্ভবসম্বন্ধে যথেষ্ট তত্ত্ব আছে।

"এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম বিক্রমসিংহ। তিনি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিন্ধ্যাচলের নিকটস্থ কোন স্থান হইতে এই অংশে আগমন করেন এবং স্থানীয় কোন এক 'দেসোদ' ভূস্বামীকে পরাজিত করিয়া নিজের প্রতিপত্তি স্থাপন করেন এবং সেই সঙ্গেই গিধোরবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের বর্ত্তমান মহারাজের নাম Sir R. P. Singh, K.C.S.I. হয়। পারিবারিক ইতিহাস রাজবাটীতে আছে এবং যাহা অতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী, তাহাতেই এই বিক্রমসিংহের ইতিহাস পাওয়া যায়। তাঁহার জন্মভূমিতে জ্যেষ্ঠের শাসনের মধ্যে শৃঙ্খলিত থাকিতে অক্ষম হইয়া রাজা বিক্রমসিংহ কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে

লইয়া ভাগ্যলক্ষ্মীর অনুসন্ধানে বিদেশভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং একজন ভক্ত ছিলেন। মহাদেবের ত্রিশূল তাঁহার পথের ও জীবনের একমাত্র উপদেষ্টা হইয়াছিল। স্বপ্নে তিনি দেশবিজয়ব্যাপারে শৈব-আদেশ পাইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই অদ্যাবধি ত্রিশূল এই রাজপরিবারের একটি পবিত্র স্মৃতি ও বিশেষ গৌরবচিহ্ন।" মহারাজ বিক্রম সিংহের উত্তরাধিকারীদিগের হস্তে তাঁহার স্বকীয় পরাক্রমে অর্জ্জিত রাজত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মুঙ্গের এবং District Gazeteerএ বিক্রমসিংহের ইতিবৃত্ত কিছু পাওয়া যায়। এই বংশের মধ্যে অন্যতম পুরাণমল বৈদ্যনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তদবধি ইহা রাজবংশেরই অধিকারভুক্ত হইয়া আছে।

এই দেবতার নামের সহিত এই রাজবংশের নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত আছে এবং বংশের রাজাদিগকে বৈদ্যনাথ-নরেশ বলিয়া সকলে জানে। হিন্দুত্বের সমগ্র পবিত্রতা বজায় রাখিয়া, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের সহস্র উপদ্রব ও বিদ্রোহ উপেক্ষা করিয়া এই বংশ আপনার দেবতাকে হৃদয়ের কাছে আপনার প্রাণের মত রাখিয়া দিয়াছে।

সমস্ত ইতিবৃত্তে দেখা যায় যে,১৫১৭ শকাব্দে (1596 A.D.) রাজা পুরাণমল এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বৈদ্যনাথের মন্দিরাবস্থিত একটি খোদিত লিপিতে ইহার প্রধান ও অভ্রান্ত প্রমাণ আছে। ঐ খোদিত লিপি বংশের ইতিহাস 'মদনমাধবী' হইতে গৃহীত। কিন্তু কালক্রমে মন্দিরের পুরোহিতবংশ মন্দিরের স্বত্ব উপভোগ করিয়া বেশ প্রভুত্বশালী হইয়া উঠিয়াছিল। পরিশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হইল যে, এই পুরোহিতবংশ রাজবংশকে উপেক্ষা করিয়া মন্দিরটি তাহাদের স্বকীয় অধিকার বলিয়া তাহা আত্মসাৎ করিবার জন্য সচেষ্ট হইল।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলালের ইতিহাসে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বিশদরূপে লিখিত আছে। ব্রাডেন সাহেবের মত শাসনকর্ত্তা এই মন্দিরের অধিকার-ইতিবৃত্তসম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে এই পুরোহিতবংশসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে, প্রথম পুরোহিত রঘুনাথ ওঝার বংশধরগণ বহুকাল যাবৎ মন্দিরের দেবোত্তর সম্পত্তি ও অন্যান্য সমস্ত বিষয় ভোগ করিতে থাকেন। ক্রমে এমন হইল যে, মন্দিরের প্রকৃত অধিকারীর নাম লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল এবং ইহা সর্ব্বতোভাবে পুরোহিতসম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল এই আদি ইতিহাস জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই। তিনি যদি বর্ত্তমান গিধোড়রাজকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে এ সম্বন্ধে অনেক সংবাদ পাইতেন। রাজবাটীর বংশীয় ইতিহাসও বোধ হয় তিনি দেখিতে পাইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই পারিবারিক ইতিহাস রাজসংসারে একটি পবিত্র ও পূজ্যস্মৃতি। বর্ত্তমান মহারাজ কাহাকেও তাহা দেখিতে দেন না। গৃহদেবতার মত ইহার সম্মান। পুস্তকখানির নাম মদনমাধবী। মদনমাধবীর আদর ও মূল্য মহারাজের চক্ষুতে অত্যন্ত অধিক। ইহাতে লেখা আছে, কেমন করিয়া রাজা পুরাণমল এই মন্দিরনির্ম্মাণেচ্ছু হইয়া প্রস্তরের পর প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ভক্তির মূর্ত্তস্তম্ভ—তাঁহার প্রস্তরীভূত শ্রদ্ধাভক্তির চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তিনিই রঘুনাথ ওঝাকে মন্দিরের পুরোহিত করেন। ললিতাক্ষরছন্দে এই সকল বৃত্তান্তই মদনমাধবীতে পাওয়া যায়। মন্দিরগাত্রে খোদিত শ্লোকের কথাও ইহাতে মিলে।

সময়ের গতির সহিত মানুষেরও ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়। দৈবের প্রতিকূলতায় যে রোহিণী পরগণা (বর্ত্তমান দেওঘর) গিধোড়রাজের অংশভূত ছিল, তাহাও তাঁহার হস্তচ্যুত হইল। ব্রাডেন সাহেবের বিবরণে (14 May, 1860) নিম্নলিখিত সংবাদ আমরা পাই :—

"The control of the temple was formerly in the hands of the Raja of Gidhour, but was more than a century usurped by the Raja of Beerbhum who conquered the whole of the territory belonging to the Gidhour Family in the neighbourhood of Baidyanath. From this time Government released the temple and the proceeds were enjoyed by the Beerbhum Rajas. The officiating priest or ojhas having a six-anna share in the profits after repraying the expenses of the Puoja and Sadabrata."

কিন্তু ১৭৯১ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বীরভূমের রাজাদের সহিত একটি বন্দোবস্ত করিয়া কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া মন্দিরের স্বত্ব প্রধান পুরোহিত রামদত্ত ওঝার হস্তে অর্পণ করিলেন। আধুনিক পুরোহিতবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই রামদত্ত ওঝা। এ ব্যক্তির পিতার নাম দেবকীনন্দন ওঝা ও পিতামহের নাম যদুনন্দন ওঝা। এই যদুনন্দন ওঝার নামে গিধোড়রাজ শ্যামসিংহ ও মর্দ্দনসিংহের এক দানপত্র এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং বৈদ্যনাথের সমুদয় দেবোত্তরসম্পত্তি গিধোড়রাজেরই দান।

পুরোহিত নিযুক্ত করা চিরকালই গিধোড়রাজপরিবারের অধিকারে ছিল। এমন কি, যখন গবর্ণমেণ্টের নিয়ম হইল যে, ভোটদ্বারা সর্দ্দার পাণ্ডা মনোনীত করা হইবে, তখন নির্ব্বাচক সমিতিতে গিধোড়রাজের মতই প্রধান প্রভুতার আধার ছিল। রাজা পুরাণমলের বংশধরগণ, গিধোড় এবং খয়রার রাজপরিবার বহুকাল যাবৎ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর হইতে এই মন্দিরের ও দেবোত্তরসম্পত্তির ভার লইয়াছিলেন। কতকগুলি সর্ত্তের অধীন হইয়া, তাঁহারা এখনও সেই পূর্ব্বের অধিকার উপভোগ করিতেছেন। পাণ্ডারা দেবতাকে অর্পিত দ্রব্যনিচয়ের অধিকারী হইলেও

হস্তী, অশ্ব বা ভূমি প্রভৃতির সমস্তই দেবতার ভোগে ও সেবায় উৎসৃষ্ট। এই দুই রাজবংশের অধিকারবলে তাঁহারা নিজেদের পূজার সময় ঘণ্টা, চামর, পদ্মাসন সমস্তই ব্যবহার করিতে পারেন।

মন্দির-সংস্কার বা দেবতার অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজন মিটান তাঁহাদেরই কার্য্য। এই অধিকার কিন্তু এমনভাবে রক্ষা করা হইয়াছে যে, মন্দির জনসাধারণের হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ইহার প্রধান পরিচালক পুরোহিতই হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় পুরোহিতরা বুঝিলেন যে, তাঁহারা দেবতার প্রতিভূ এবং মন্দির-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ই তাঁহাদের স্বকীয়। বর্ত্তমান পুরোহিতের পূর্ব্বগামী শৈলজানন্দ ওঝা এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া নিজের ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির ধ্বংস করিতেছিলেন। তাই অপরাপর পাণ্ডারা একত্র হইয়া গিধোড়রাজের নিকট আবেদন করিলেন যে, শৈলজানন্দের পৌরোহিত্য কাড়িয়া লওয়া হউক। ন্যায় ও ধর্ম্মের পক্ষাবলম্বী মহারাজ নিজের অর্থব্যয় করিয়া, এই শৈলজানন্দকে তাহার পুরোহিতপদ হইতে বিচ্যুত করিলেন।

শৈলজানন্দের পর হইতেই মন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং সেই সমিতির কার্য্যাবলী নির্দ্দিষ্ট হইল। এই সমিতির প্রধান সভ্য হইয়াছেন, গিধোড় কিম্বা খয়রার কোন বংশধর। কেন না মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা রাজা পুরাণমল ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ। অমরানন্দ ওঝা এখন প্রধান পুরোহিত। দুঃখের বিষয়, তিনিও তাঁহার পবিত্র কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। দেবতার সেবার জন্য যে প্রকার ভক্তির আবশ্যক, যেরূপ প্রাণের আকুলতার ও হৃদয়ের উচ্চতার প্রয়োজন, তিনি সে প্রকারে কিছুরই অধিকারী নহেন।

বিষয়-সম্ভোগে দেবার্চ্চনা হয় না। যে সরলতা ও বিলাসহীনতা বিশ্বাস ও ভক্তির প্রাণ, তাহা তাঁহার নাই। তাই সমিতি ও গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক স্বীকৃত তাহার অধিকারগণ্ডী তাঁহার পক্ষে বড়ই সঙ্কীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দেবতা অধিকার দেখিতে চাহেন না, তিনি যাচ্ঞা করেন—ভক্তের প্রাণ।
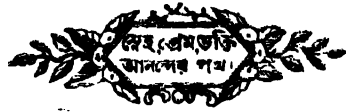
ইতিহাস।

(৪)

ইতিহাসসম্বন্ধে মোটামুটি যাহা বলিবার, তাহা পূর্ব্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্যখণ্ডে ইতিহাসের আলোচনা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বে জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়াই অতীত যুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হইত। ঐতিহাসিকেরা আপন আপন বিশ্বাসের মানদণ্ড লইয়া সেই জনশ্রুতি বা কিম্বদন্তী হইতে সত্যের পরিমাপ করিয়া লইতেন। এখন ঠিক সে দিন নাই। এখন নিদর্শন-দর্শনে সত্যের ও তথ্যের আবিষ্কারের প্রয়াস চলিতেছে। এখন ইতিহাসের ক্ষেত্রেও "বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান" চলিতেছে। আমার মনে হয়, এই অনুসন্ধানকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান না বলিয়া "আভিজ্ঞানিক" অনুসন্ধান বলিলেই ঠিক হয়। কারণ উহাতে অভিজ্ঞান বা স্মারকচিহ্ন বা পুরাবস্তুদর্শনেই লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারসাধন করিতে হয়। সংহারক কাল অতীতের সমস্ত অভিজ্ঞান ও অবদান নিশ্চিহ্ন করিয়া মুছিয়া দিতে দিতে চলিয়া যাইতেছে। জনশ্রুতিকে ও কিম্বদন্তীকে এমনভাবে বিকৃত করিয়া দিতেছে যে, তাহা হইতে সত্যের সন্ধান করা দুঃসাধ্য করিয়া তুলিতেছে; এমন কি, মানবের বুদ্ধিকেও এমনভাবে বিকৃত করিয়া তুলিতেছে যে, এক যুগে যাহা বাস্তব ছিল, পরবর্ত্তীকালে তাহা লোক কাল্পনিক বলিয়া মনে করিতেছে; কিন্তু আমাদের এই ধরিত্রীদেবী কালের কবল হইতে নিজগর্ভে অতীতের অনেক অভিজ্ঞান—অনেক নিদর্শন লুকাইয়া রাখিয়াছেন ও রাখিতেছেন, যাহা বর্ত্তমানকালে অতীতের সেই সত্যকে জনসমাজে প্রচার করিয়া দিতেছে। এড়ুক (Dolmen), পাতালগৃহ, পিরামিড, গুহাগুম্ফ প্রভৃতি যেমন অতীত যুগের মানবীয় কীর্ত্তিমালাকে প্রকাশ করিয়া দিতেছে, তেমনই ভূগর্ভে লুক্কায়িত অস্থিপঞ্জর ও প্রস্তরীভূত জীবকঙ্কাল অতীত যুগের জীবগণের পরিচয় দিতেছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা সেই সমস্ত নিদর্শন ধরিয়া লুপ্ত ইতিহাসের সন্ধান করিতেছেন। তাহার ফলে যে, পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকদিগের কত সিদ্ধান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। গত অর্দ্ধশতাব্দীকালমধ্যে

ঐতিহাসিকগণের চিন্তার ধারা নূতন নিখাতে প্রধাবিত হইতেছে। অধুনা এই পরিবর্ত্তন অত্যন্ত দ্রুত হইতেছে। নোয়া বা বৈবস্বত মনুর আমলে যে জলপ্লাবনের কথানধ্যে লোক গঞ্জিকাধূমপ্রবৃদ্ধ কল্পনাকলিত বর্ণনা বলিয়া বিশ্বাস করিত, অধুনা তাহাতে কেহ কেহ একটু সত্যের সন্ধান পাইতেছেন। কেবল ইতিহাসের কেন, বিজ্ঞানের রাজ্যেও কাল যাহা একেবারে অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছিল, আজ তাহা বাস্তব সত্যরূপে মানবনয়নের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে।

ইতিহাসের যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা জানেন যে, ঐতিহাসিকরা একটা যুগকে প্রাগৈতিহাসিক যুগ (prehistoric period) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন। মানবজাতির সৃষ্টিকাল হইতে যে পর্য্যন্ত মানুষের ইতিহাস রচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে,তাহার মধ্যবর্ত্তী সুদীর্ঘ যুগকেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ বলা হইয়া থাকে। ঐ যুগের কোন ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া জাতীয় বৈশিষ্ট্যগঠনে সেই যুগের মানবীয় অবদানের প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। কাহারও কাহারও মতে সেই প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রভাব। সুদীর্ঘ প্রাগৈতিহাসিক যুগের তুলনায় ঐতিহাসিক যুগ সম্বৎসরের তুলনায় মুহূর্ত্তমাত্র। ঐতিহাসিক যুগের বয়স বড় জোর পঞ্চসহস্র বৎসর; কেহ কেহ অনুমান করেন, উহার বয়স তিন হাজার বৎসরের অধিক হইবে না। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগের বয়স যে কত লক্ষ বৎসর, তাহার ইয়ত্তাই হয় নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূতত্ত্ববিষয়ক পুস্তকে লিখিত হইত, এই পৃথিবী ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছে; অধুনা সে মত একেবারেই অগ্রাহ্য হইয়া পড়িয়াছে। এখন বৈজ্ঞানিকগণ ধরিত্রীর বয়স বহু কোটী বৎসর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন। মানবজাতিই এই ধরাতলে কতকাল আবির্ভূত হইয়াছে, তাহা আজিও সাব্যস্ত হয় নাই। অভিব্যক্তিবাদীরা বলেন, ক্রমবিকাশের ফলে সমুন্নত বানর হইতে নরের আবির্ভাব হইয়াছে। আদিম মানব অনেকটা নরাকার ছিল সত্য, কিন্তু তাহারা একপ্রকার পশুই ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উহাদিগকে নর-পশু (man-animal) বলিয়াছেন। তখন মানুষ আকৃতিতে নরবৎ হইলেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পশুবৎ ছিল। এই আদিম মানবের জন্ম গভীর অরণ্যে হইয়াছিল, কি বনস্পতিপরিশোভিত পর্ব্বতে হইয়াছিল অথবা অপেক্ষাকৃত বিরলপাদপ শৈলে হইয়াছিল, তাহা কেহই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান এই স্থলে কতকগুলি মাত্র তথ্য সম্বল করিয়া কল্পনার আশ্রয় লইয়াছে। কাজেই এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে ঐকামত নাই। কালসম্বন্ধে ঐকমত্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অভাব। ফলে যে মানবের ইতিহাস লইয়া এত আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, সেই মানুবের জন্মকথাই এখনও অজ্ঞাত। তবে জঙ্গলে বানরসমাজেই আদিনরের জন্ম, ইহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

এই আদিম মানব কেমন ছিল, বৈজ্ঞানিকরা তাহারও একটা আভাস দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই মত, আদিম মানব আধুনিক মানব অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায়, লোমশতনু, সুদৃঢ় মাংশপেশীসম্পন্ন, উলঙ্গ, প্রশস্ত চোয়ালযুক্ত ও নুব্জললাট জীব ছিল। তাহাদের সমাজ ছিল না, সহায় ছিল না, বুদ্ধিও অল্প ছিল, তাহাদের রমণী ও সন্তানমাত্র সম্বল ছিল। বৃক্ষের ফল ও অরণ্যচর পশুহনন করিয়া তাহারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত। সন্তানগণ একটু বড় ও আত্মরক্ষাক্ষম হইলেই পিতামাতা ছাড়িয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত, এক একটি পুরুষ বহু নারী লইয়া ভ্রমণ করিত। এই বিষয়ে তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষ বানরদিগের ধারাই বজায় রাখিয়াছিল। তখন সমাজ ছিল না, ধর্ম্ম ছিল না, স্নেহ-মমতাও খুব প্রবল ছিল না।

এখন জিজ্ঞাস্য, আদিতে একটি মানব কোন গতিকে আবির্ভূত হইয়া সমস্ত মানবের সৃষ্টি করিয়াছে—না বহু মানব এক বা বিভিন্ন সময়ে ধরিত্রীর বিভিন্ন অংশে আবির্ভূত হইয়া বিভিন্ন মানব সমাজের পত্তন করিয়াছে? এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক সমাজেও ঐকমত্য নাই। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এক আদি জনক-জননী হইতে সমস্ত মানবজাতির আবির্ভাব হইয়াছে। এই মতবাদীদিগকে ইংরেজী ভাষায় Monogenist বলে। বাঙ্গালায় ইহাদিগকে একগোত্রবাদী বলা যায়। আর একদল বলেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে শ্বেত, পীত, লোহিত ও কৃষ্ণ এই চারিবর্ণের মানব আবির্ভূত হইয়াছে। ইহাদের মতে এই বর্ণবিভাগ সনাতন। এই চারিবর্ণের সংমিশ্রণে ধরাতলে বিভিন্ন বর্ণের মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে। এই মতবাদীদিগকে ইংরেজী ভাষায় Polygenist বা বহুগোত্রবাদী বলা হইয়া থাকে। মোটামুটি এই মতবাদীদিগের ভিতর আবার নানাদল বর্ত্তমান। ছোটখাট বিষয়ে তাহাদের মতভেদও যথেষ্ট আছে। সেই সকল বিষয় লইয়া বাজে কচ্‌কচি করিয়া লাভ নাই। কারণ এ সমস্যার সমাধান কেহই করিতে পারেন নাই। কেবল কচ্‌কচিই সার হইয়াছে।

এইরূপ পশুভাবে মানুষ কতদিন ছিল, তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই পশুভাবাপন্ন মানুষ ভগ্ন ধারাল প্রস্তর কুড়াইয়া তাহাই প্রথমে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিত। কালক্রমে সেই মানুষের পক্ষে ভগ্নপ্রস্তর পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। ইচ্ছামত ধারাল প্রস্তর অনুসন্ধান করিতে তাহাদের অনেক সময় যাইত। অভাবের তীব্র অনুভূতি চিরদিনই মানুষকে উদ্ভাবনার পথ দেখাইয়া দিয়া আসিতেছে। মানুষ এইরূপে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া উপলখণ্ড ভাঙ্গিয়া আপনাদের

আবশ্যক অস্ত্রশস্ত্র গড়িয়া লইবার কৌশল শিখিল। যে সময় মানুষ পাহাড়ে কুড়াইয়া পাওয়া ভগ্নপ্রস্তর ব্যবহার করিত, তাহার অন্ততঃ দেড় লক্ষ বৎসর পরে মানুষ পাথর ভাঙ্গিয়া উহাকে সুবিধামত আকৃতির অস্ত্রে পরিণত করিবার কৌশল শিখিয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন যুগে উন্নতির গতি কত মন্থর হইয়াছিল, তাহা সহজেই উপলব্ধ হইতেছে। যে নর-পশু প্রথমে পাথর ভাঙ্গিয়া তাহাকে আবশ্যক অস্ত্রে পরিণত করিবার কৌশল উদ্ভাবিত করিয়াছিল, মানবের জাতীয় ইতিহাসে তাহার স্থান ষ্টীম ইঞ্জিনের উদ্ভাবক জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন বা মাধ্যাকর্ষণের আবিষ্কর্ত্তা সার্ আইজাক্ নিউটন অপেক্ষা হীনতর নহে। কারণ সেই ব্যক্তিই মানব-সমাজকে উন্নতি-সোপানের প্রথম ধাপে উন্নীত করিয়াছে। কিন্তু মানবের ইতিহাসে তাহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহার কোন নাম ছিল কি না, তাহাও জানা নাই। তবে এ কথা সত্য যে, তাহার অবদানকে বনিয়াদ করিয়া আজ মানবীয় সভ্যতার এই সমুন্নত সৌধ রচিত হইয়াছে।

আদিম মানব নির্জ্জনে ধরাতলে প্রায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় আহারান্বেষণে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। তাহার সঙ্গে থাকিত, তাহার স্ত্রীগণ ও সন্তানবর্গ। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এইরূপ নিঃসঙ্গ ও সমাজশূন্য অবস্থায় মানব থাকিত বলিয়া সেই অবস্থায় মানুষের মানসিক উন্নতি দ্রুত হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত যে কতদূর সত্য, তাহার সিদ্ধান্ত করা অত্যন্ত কঠিন। আদিমযুগের মানুষ বা নর-পশু নিঃসঙ্গ অবস্থায় কেবল পৃথিবীময় যথেচ্ছভ্রমণ করিত কি না, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ কেহ কখনও নিঃসঙ্গ মানুষ দেখেন নাই। গারোজাতি অতি অসভ্য, গাছেই তাহাদের বাস, তাহারা অবশ্য তীর-ধনুক প্রভৃতির ব্যবহার জানে, কিন্তু সেই গারোজাতি ত নিঃসঙ্গ থাকে না। তাহারা যে জঙ্গলে থাকে, সেই জঙ্গলে গাছে গাছেই তাহারা থাকে, নিঃসঙ্গ অবস্থায় তাহারা কোথাও থাকে না। হটেণ্টট, চিপাবারো, পাপুয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যবর্গ সকলেই পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে বাস করে। কেহ একেবারে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি গিবন, ওরাং, উটাং, সিম্পাঞ্জি, গোরিল্লা প্রভৃতি যে সমস্ত জীবের সহিত মানুষের দৈহিক সাদৃশ্য দেখিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মানবের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, তাহারাও কতকটা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে। কোন জঙ্গলেই একটা গোরিল্লা বা উরাং উটাং দম্পতী বাস করে না। উহারা যে জঙ্গলে থাকে, সেই জঙ্গলে পালে পালেই থাকে। তবে আদিম মানুষ যে নারীসঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ কল্পিত না, সে সিদ্ধান্ত করিবার বলবৎ হেতু কোথায়? মানুষ ঐ সকল নরাকার জীব হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, ইহা যদি ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে যে সামাজিকতা আছে, উচ্চতর স্তরে আরূঢ় আদিম মানবে তাহা ছিল না, ইহাই বা কল্পনা করা হয় কেন? আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃতি কতকগুলি জীবকে সংঘচারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যথা—মৎস্য, পিপীলিকা, মধুমক্ষিকা, বানর ও বনমানুষ। মৎস্যের সঙ্ঘমধ্যে কোন সামাজিক ভাব আছে কি না, তাহা মানুষের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। পিপীলিকার মধ্যে সামাজিক ভাবের একটু উন্মেষ লক্ষিত হয়। মধুমক্ষিকার উহা বেশ পরিস্ফুট। বিভার প্রভৃতি জীবেও উহা লক্ষিত হইয়া থাকে। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, প্রকৃতি উদ্দেশ্যহীন হইয়া কাহাকেও কোন গুণ দেন নাই, মৎস্য প্রভৃতি যে সকল জীব সঙ্ঘচারী, তাহাদের সেই সংহতির একটা উদ্দেশ্য ও ফল আছেই আছে। সেই উদ্দেশ্য কি, তাহা সকলক্ষেত্রে এখনও মানুষের গোচর হয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে ঐরূপ সংহতির কোন উদ্দেশ্য নাই, এরূপ মনে করা উচিত নহে। শার্দ্দূল, সর্প প্রভৃতি জীব সঙ্ঘচারী নহে, তাহারা স্বতন্ত্র থাকিতেই ভালবাসে, স্বতন্ত্রই থাকে। এক ঝোপে দুই জোড়া বাঘ থাকে না, এক গর্ত্তে দুই জোড়া সাপ বাস করে না। কিন্তু বহু বানর এক গাছে থাকে; অনেক বানর শীতের ও ঝড়ের সময় একত্র তাল পাকাইয়া থাকে, ইহাও লক্ষিত হয়। গোরিল্লারা জঙ্গলের এক এক দেশে দল বাঁধিয়া বাস করে এবং বিপদের সময় পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করে। সুতরাং এই সকল উচ্চস্তরের জীবের সংহত হইবার প্রবৃত্তি সহজাত। যদি এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, নিকৃষ্টতর জীব হইতে উৎকৃষ্টতর জীব ক্রমশঃই পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করিতে হয় যে, বানর প্রভৃতির সঙ্ঘিপ্সা ক্রমে পরিণতিপ্রাপ্ত হইয়া মানবে সামাজিক সম্মিলনেচ্ছায় পরিণত হইয়াছে। বিশেষতঃ একথা খুবই সত্য যে, মানুষ সৃষ্ট হইবার পর জীবপ্রবাহের আকৃতিগত পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই, কিন্তু মানসিক পরিবর্ত্তন অনেক অধিক হইয়াছে। নর-পশুর আকৃতির সহিত আধুনিক সভ্য মানুষের আকৃতিগত পার্থক্য যত অধিক, তাহাদের বুদ্ধিগত বা মানসিক পার্থক্য তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। সেই জন্য কোন কোন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ বলিয়া থাকেন, প্রকৃতিদেবী দৈহিকগঠনের দিক্‌টা যতদূর পারেন, মানুষে তাহার চরম করিয়া তুলিয়াছেন, এখন তিনি মানুষের মানসিক দিকে উন্নতিসাধন করিতেছেন। বাস্তবিক উচ্চস্তরের জীবসমূহে মানসিক বিকাশ যত দেখা যায়, দৈহিক বিকাশ তত লক্ষিত হয় না। যে মানসিক শক্তিনিচয় মানুষকে জৈবনিঃশ্রেণীর উচ্চতম ধাপে পরিণত করিয়াছে, সেই গুণাবলীর বীজ নরপশুর মানসক্ষেত্রে প্রথম অঙ্কুরিত হয় নাই, অতি নিম্নশ্রেণীর জীবে তাহার প্রথম উন্মেষ হইয়াছে।* জীব যত প্রাণিনিঃশ্রেণীর ধাপে ধাপে

* "The attempt to draw a psychical distinction is futile and that even the highest faculties of feeling and

উঠিয়াছে, ততই তাহার উন্নত গুণগুলি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরাও স্বীকার করিয়া থাকেন যে, সামাজিকতার প্রভাবই মানুষের মানসক্ষেত্র এত উন্নত হইয়াছে। ভাবের আদানপ্রদান, মতামতের সঙ্ঘট্টন প্রভৃতিতে মানুষ জীবজগতে বিস্ময়ের উদ্ভব করিয়াছে। সুতরাং সামাজিকতাই মানুষের মানসী উন্নতির মূল। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে প্রকৃতি যে মুহুর্ত্তে মানব প্রসব করিয়াছেন, সেই মুহুর্ত্তেই তাহার পূর্ব্বজগণ তাহাকে অধিকমাত্রায় সামাজিকতার উপযুক্ত গুণাবলী প্রদান করিয়াছেন। তাহার সজিঘাংসা ও তাহার অগ্রবর্ত্তীদিগের অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। সে কখনই একাকী রমণীসনাথ এই সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে নাই। অন্য স্বজাতির সঙ্গে সে নিশ্চয়ই প্রীতি অনুভব করিত।

দুর্ভাগ্যক্রমে এই বিজন পৃথিবীতে প্রকৃতি কি অবস্থায় মানবকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহার স্মৃতি লোপ পাইয়াছে। মানবের জন্মকথা, মানবের ইতিহাসের একটা অতি প্রয়োজনীয় তথ্য হইলেও তাহা প্রাগৈতিহাসিক ব্যাপার বলিয়া পরিত্যক্ত। শিলায় কপাল কুটিয়া মস্তক চূর্ণ করিলেও সে তথ্য উদ্ধারের আর উপায় নাই। উহা ইতিহাসের বিষয় হইলেও উহাকে ইতিহাসের বহির্ভূত করিয়া রাখিতেই হইবে।

ইতিহাস যেখানে নীরব, বিজ্ঞান যেখানে তথ্যের অভাবে কল্পনাকে আশ্রয় করিয়া এক একটা উদ্ভট উপপত্তি এবং তাহার খণ্ডন করিতেছে, ধর্ম্মশাস্ত্র সেখানে তারস্বরে আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ভগবান্ আদিতে আদিম ও হবাবতীকে সৃষ্টি করিয়া এই সংসারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ধরা তখন নন্দনকানন ছিল; আদিদম্পতি বিচারবুদ্ধিবর্জ্জিত, সুতরাং নিষ্পাপ ছিলেন। বিচারবুদ্ধি জন্মিলে সয়তান তাহাদিগকে আশ্রয় করে ও তাহারা পাপী হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রের এই উক্তি যে একেবারেই মিথ্যা, তাহা নহে। অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রের মত এই যে, ভগবানের সিসৃক্ষায় আদিতে এক নর ও এক নারী সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই এক নরনারীর বংশে সমগ্র পৃথিবীর নরনারী উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দুরা ঠিক এই কথা বলেন না। হিন্দুরা বলেন ;—

যথর্ত্তু লিঙ্গান্যৃতবঃ স্বয়মেবর্ত্তু পর্য্যয়ে।
স্বানি স্বান্যভিপদ্যন্তে তথা কর্ম্মাণি দেহিনঃ॥

যে বসন্ত প্রভৃতি ঋতুগুলি আপনাদিগের সময়মত আপনারাই চ্যুতপল্লবাদি প্রভৃতি ঋতুচিহ্ন লইয়া দেখা দেয়, সেইরূপ জীবগণ আপনাদের সময়মত নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে দেহধারণ করিয়া উদ্ভূত হইল। (মনু ১৷৩০) এ মতের সহিত কোন বৈজ্ঞানিক মতেরই বিরোধ হইতে পারে না। এই মতানুসারে সময়কালে বহুজীবই নিয়তির নির্দ্দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু গৌরাঙ্গ-মহিমা।

(২) অবতার ও অবতারী।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়—

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া।
প্রসভং নৃত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োঽপ্যয়ম্॥
চৈ, চরিঃ।

যিনি আমার ন্যায় মূর্খ, জড়ভাবাপন্ন অধম ব্যক্তিকেও তাঁহার মহিমাবর্ণনরূপ সুকঠিন কার্য্যে সহসা নিযুক্ত করিলেন, সেই ইচ্ছাময় ভগবান্ গৌরচন্দ্রকে আমি বন্দনা করি।

ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, ভগবান্ ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্, অর্থাৎ আমরা এমন কোন কার্য্যই কল্পনা করিতে পারি না, যাহা তিনি সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন এবং তাঁহার ইচ্ছার গতি সর্ব্বত্রই এবং সর্ব্বদাই অপ্রতিহত। অধিকন্তু তিনি দেশ-কাল পরিচ্ছেদরহিত নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ভগবান্‌সম্বন্ধে দেশ বা কালের ব্যবধান নাই, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমান থাকিতে পারেন। ভগবানের এই সমস্ত গুণ যাঁহারা যথার্থই অন্তরমধ্যে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই ভগবানের অবতার হইবার সম্ভাবনাসম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন না। কিন্তু দেখা যায় যে, কেহ কেহ আপনাকে একেশ্বরবাদী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন অথচ অবতারবাদ উড়াইয়া দিয়া গর্ব্ব অনুভব করেন। অবতারবাদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের যুক্তি এই যে, ভগবান্ যখন নরদেহ ধারণ করিয়া

of intellect begin to germinate in lower forms of life."—*Huxley's Man's Place in Nature.*

এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন, তখন ত এই বিপুল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অপর সমস্ত অংশই পরমেশ্বরশূন্য অবস্থায় রহিল! পৃথিবীর যে অংশে ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন, সেই স্থানেরই জনকয়েক লোক ভগবানের সাক্ষাদ্দর্শনলাভ করিয়া উদ্ধার হইয়া গেল, আর বক্রী অসংখ্য লোকের ত ঐরূপ সুবিধা হইল না। সুতরাং তাঁহাদের মতে এরূপ কার্য্য ভগবানের পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত ও অসম্ভব। কিন্তু অবতারবাদের বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের সংখ্যা যতই অধিক হউক না কেন, তাঁহাদের এবম্প্রকার যুক্তির কোনরূপ সারবত্তা নাই। ইহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর ও বালকজনোচিত অদূরদর্শিতা ও একদেশদর্শিতাদোষে দুষ্ট। মানুষের কার্য্যকলাপের পরিমাণ-দণ্ডদ্বারা ভগবল্লীলার পরিমাপ ও বিচার করিতে গেলেই পদে পদে ভুল হওয়া অনিবার্য্য। সাধারণ মানুষ এক সময়ে দুই স্থানে থাকিতে পারে না বলিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের পক্ষেও কি তাহা অসম্ভব? যদি অসম্ভব হয়, তবে তাহা কেন অসম্ভব? ভগবানের শক্তির অভাব বলিয়া! কিন্তু ভগবানে শক্তির অভাব আরোপ করিলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি হয়, অতএব, হয় বল, ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ নহেন—নয় অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার কর যে, ভগবান্ এক সময়েই একাধিক স্থানে থাকিতে পারেন। মানবগণের মধ্যেও শক্তির তারতম্য যথেষ্ট আছে, একথা কে না জানে? সাধারণ মানবের পক্ষে যাহা অসাধ্য ও অসম্ভব, একজন অসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষে তাহা বেশ সুসাধ্য ও সম্ভব। কে না জানেন যে, সিদ্ধ-যোগিগণ ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ; এই ভারতবর্ষে এখনও এমন মহাযোগী আছেন, যাঁহারা সূক্ষ্মদেহধারী হইয়া এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিচরণ করিতে পারেন। সাধারণ মানব যদি যোগবলে অসাধারণ শক্তিলাভ করিয়া অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন, তবে যাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ ক্ষান্তগুণসম্পন্ন ও ইচ্ছাময় ভগবান্ বলিয়া স্বীকার কর, তিনি কি ইচ্ছা করিলে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইতে পারেন না? আবার যখন তিনি কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হন, তখনও কি তিনি অপর সমস্ত স্থানও পূর্ব্বের ন্যায় আপনার সত্তায় পরিপূর্ণ রাখিতে পারেন না? আসল কথা এই, অবতারবাদ হিন্দুর একটা কুসংস্কার মাত্র, এই ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া—এই তথাকথিত কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াই অনেক সজ্জনব্যক্তি আপনারাই কুসংস্কারগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা মুখে বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ এবং তাঁহাদের মতের পরিপোষকরূপে ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাসও করেন বটে, কিন্তু তার বেশী নহে; ইঁহারা আপন আপন চিরপোষিত ব্যক্তিগত মতকেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন এবং উক্ত মতের পরিপন্থী বুঝিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বকেও আবশ্যক ও সুবিধামত খর্ব্ব করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না।

ভগবানের অনন্ত ও অত্যদ্ভুত গুণরাশির মধ্যে একটি গুণ এই যে, তিনি ইচ্ছাময়। ভগবান্ যখন যেরূপ কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতে পারেন, এ বিষয়ে তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই নাই। তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে, তিনি নরদেহ ধারণ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া কিছুকাল প্রকটলীলা করিবেন, তবে তাহাতে কে বাধা দিবে? ভগবান্‌কে এইরূপ ইচ্ছাময় বলিবার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে। মানুষ তাহার জ্ঞান-বুদ্ধির চরমোৎকর্ষতা লাভ করিয়াও ভগবানের কার্য্যকলাপ সব সময় সম্পূর্ণরূপে—কখন বা আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভগবল্লীলাবিষয়ে এমন অনেক নিগূঢ় রহস্য আছে, যেখানে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোনপ্রকার পার্থক্য নাই, সে সমস্ত লীলা বুঝিতে বা বুঝাইতে অজ্ঞানী যেমন অক্ষম, জ্ঞানীও সেই রকম অক্ষম। ভগবানের এই লীলা-রহস্যোদ্ঘাটনে অক্ষমতানিবন্ধই কি মানবগণ হতাশ হইয়া তাঁহাকে ইচ্ছাময় বলিয়া থাকেন? না, তাহা নহে। ভগবল্লীলা এক পক্ষে যেমন অজ্ঞেয় ও অননুমেয়, অন্যদিকে আবার তেমনই প্রত্যক্ষ দর্শনীয়। যে সমস্ত মহাপুরুষ ভক্তিমার্গে সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবেই ভগবানের লীলা দর্শন করিয়া থাকেন; যেমন আমি তোমাকে দেখি, তুমি আমাকে দেখ, আমি তোমার কথা শুনিতে পাই, তুমি আমার কথা শুনিতে পাও, আমি তোমাকে স্পর্শ করিতে পারি, তুমিও আমাকে স্পর্শ করিতে পার, ঠিক সেই রকম প্রত্যক্ষভাবেই ভক্ত ভগবান্‌কে দেখিতে পান, তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন ও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারেন। এই সমস্ত প্রত্যক্ষদর্শী সিদ্ধভক্তগণই সম্যক্ বুঝিয়া ভগবান্‌কে ইচ্ছাময় বলিয়া থাকেন এবং ইঁহারাই তাঁহার প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে অবগত হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ আখ্যায় নিরূপিত করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় ভগবানের পক্ষে অবতার হওয়া একটুও অসম্ভব নহে, বরং সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। কিন্তু কখন্ কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন? এ প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বপ্রথমেই মনে আসে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোক :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥৮। ৪র্থ অঃ।

সুখের বিষয়, এই শ্লোক দুইটির বঙ্গানুবাদের কোন প্রয়োজন নাই। ইহা এত সুন্দর, এত সরল ও এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও কণ্ঠে ইহা নিত্য প্রতিধ্বনিত হয়। অধিকন্তু, ইহার শব্দার্থ যেমন সরল, ইহার মর্ম্মার্থও তেমনই সহজবোধ্য। তবে যাঁহারা ধর্ম্মগ্রন্থের মর্য্যাদার ও গুরুত্বের হানিকারক বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থোক্ত কোন শ্লোকেরই সহজ ও সরল অর্থ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন,

তাঁহারা অবশ্য এমন স্বচ্ছ সরল শ্লোকেরও সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একটা অত্যুৎকট আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিয়া গীতার "সম্ভ্রম" রক্ষা করিবেন! আমরা কিন্তু এরূপ অকারণ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আদৌ পক্ষপাতী নহি এবং পাঠকবর্গকেও এইরূপ আধ্যাত্মিক বাতিকগ্রস্থ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে শতহস্ত দূরে থাকিতে কাতরভাবে অনুরোধ করিতেছি।

উদ্ধৃত শ্লোক হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যখনই এ সংসারে ধর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া পড়েন, অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে এবং সেইহেতু যখনই ধার্ম্মিক সাধুব্যক্তিগণ বিপন্ন ও আর্ত্ত হয়েন এবং দুরাচার পাপিগণ অত্যধিক শক্তিশালী ও মদগর্ব্বিত হইয়া সাধুগণের উপর অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠে, সেই সময়েই পাপিগণকে দমন করিয়া ধার্ম্মিকগণকে রক্ষা করিবার জন্য এবং অধর্ম্মকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য শ্রীভগবান্ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; এই আশাপ্রদ মহদুক্তি শ্রীভগবানেরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, জীবের প্রতি অহেতুকী কৃপাবশতঃ সেই করুণাময়েরই স্বেচ্ছাকৃত অঙ্গীকার। তবে এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলেই যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু ঐরূপ দুরবস্থা না ঘটিলে যে ভগবানের অবতার হওয়া অসম্ভব, এমন কথা কোনক্রমেই বলা যায় না; অর্থাৎ ধর্ম্মের গ্লানি, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান প্রভৃতি পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে বর্ণিত অবস্থা শ্রীভগবানের অবতারের একটি কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। এবম্বিধ অবস্থায় যে অবতারের আবির্ভাব হয়, তাঁহাকে যুগাবতার বলা যায় এবং উদ্ধৃত শ্লোকে যে ঐ যুগাবতারেরই লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহা শ্লোকান্তর্গত "সম্ভবামি যুগে যুগে" এই পদাংশ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে।

শ্রীজয়দেব গোস্বামীর কৃপায় আমরা "ছেলেবেলা" হইতেই ভগবানের দশ অবতারেরই কথা জানিয়াছি, ভাল করিয়া বাঙ্গালা শিখিবার আগেই বোধ হয়, "প্রলয় পয়োধি জলে" মুখস্থ করিয়াছিলাম; আমাদের "ছেলেবেলা"—সে অবশ্য অনেকদিন আগের কথা, আজকালের ছেলেরা জয়দেবের নাম শুনিয়াছে কি না বলিতে পারি না, যদি না শুনিয়া থাকে, তবে আমি তাহাদের দোষ দিই না, দোষ দিই ছেলেদের কর্ত্তৃপক্ষের। আজকাল বালকেরা শিক্ষা পায় না বলিয়াই দশাবতার স্তব, গঙ্গার স্তব, নবগ্রহস্তোত্র প্রভৃতি মনোপ্রাণস্পর্শী সুমধুর স্তবাবলীর আস্বাদ হইতে বঞ্চিত থাকে এবং সুকুমার বাল্যকালের এই অসম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য উত্তরকালেও তাহারা হিন্দুদেবদেবীর মহিমার পরিচয় বোধ হয় প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, শ্রীকৃষ্ণও ভগবানের একটি অবতার। জয়দেবোক্ত দশ অবতারের মধ্যে বলরামের উল্লেখ আছে অথচ শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ নাই, ইহাতে তাঁহাদের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়া থাকে, তাঁহারা বুঝিতে পারেন না, অবতারশ্রেণী হইতে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণকে কেন বাদ দিলেন, ইহা কি জয়দেবের অজ্ঞতা না অসাবধানতা? যাঁহারা স্থির করিয়াছেন যে, ভগবানের অবতার সংখ্যা ঠিক দশ—নয়ও নহে, এগারও নহে, তাঁহারা বলেন, বুদ্ধকে বাদ দিয়া কৃষ্ণকে ধরিলেই সব দিক্ রক্ষা পাইত; আবার এমনও অনেকে আছেন, যাঁহারা খেয়ালই করেন না, অবতারতালিকায় কৃষ্ণের নাম আছে কি কাটা গেছে! যাহা হউক, দশাবতারের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের নাম না করা জয়দেবের অজ্ঞতাও নহে, অসাবধানতাও নহে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন বলিয়াই তাঁহার নাম অবতারশ্রেণীর মধ্যে ধরা হয় নাই।

এখন ত পরম বিজ্ঞের মত বলিলাম, শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, শ্রীরামচন্দ্র যেমন ত্রেতাযুগের অবতার, দ্বাপরযুগেরও তেমনই শ্রীকৃষ্ণ অবতার এবং সেদিন পর্য্যন্তও ঐরূপ ধারণা আমার ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। পরমভাগবত গোস্বামী প্রভুগণের গ্রন্থ হইতেও জানিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণ অবতার নহেন, তিনি স্বয়ং অবতারী। যাঁহার অবতার হয়, তিনিই অবতারী; যিনি অবতীর্ণ হন, তিনি অবতার। এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই কেহ যেন সিদ্ধান্ত করিয়া না বসেন যে, অবতারী ও অবতারের মধ্যে মূলতঃ বস্তুগত কোন পার্থক্য আছে। অবতার সম্পূর্ণরূপে অবতারী না হইলেও তাহা হইতে স্বতন্ত্র বা তদতিরিক্ত কোন বস্তু নহেন। কখন কখন এমনও হইয়া থাকে যে, যুগাবতারের কার্য্যকালে অবতারী স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন অবশ্য অবতারী ও অবতার একীভূত হইয়া যুগপৎ প্রকট হইলেন। নদী সমুদ্রে মিশিয়া গেলে যেমন তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, স্বয়ং অবতারীর প্রকটকালেও তেমনই যুগাবতারের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। এই হিসাবে বোধ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে দ্বাপরযুগের অবতার বলিলে দোষ হয় না, তবে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতে হইবে যে, তিনিই স্বয়ং অবতারী, আর অবতারগণ তাঁহারই অবতার।

ভগবানের অবতার-সংখ্যা এক, দুই, দশ বা শত নহে, সহস্রও নহে, লক্ষ—কোটিও নহে; শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত আছে যে, ভগবানের অবতার সংখ্যার মধ্যে পড়ে না, তাহা অসংখ্য। অবতারের সংখ্যারও যেমন সীমা নাই, তাহার প্রকারভেদেরও তেমনই সীমা নাই। সে সব অনেক কথা, অনেক ব্যাপার; ভগবানের ইচ্ছা হইলে, তাঁহার কৃপা ও আমার অধিকার অনুযায়ী যথাস্থানে সাধ্যমত বলিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
এম্. এ., বি এল্.।

তেলাকুচা।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]

তেলাকুচা না চেনেন, এমন লোক আ[illegible]দেব [illegible] অতি বিবল। ইহা বঙ্গদেশেব সর্ব্বত্রই প্রভূত পবিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যান্য প্রদেশেও ইহাব অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচব হয়। ইহাব গাছ লতার ন্যায়—বড বড গাছেব উপব উঠিয়া তদুপবি প্রতানসমূহ বিস্তাব কবিয়া বৃক্ষটিকে একেবাবে আচ্ছাদিত কবিয়া বাখে। ফুলগুলি শ্বেতবর্ণ ও ফল দেখিতে কতকটা পটোলেব ন্যায়। ঐ ফল পাকিলে লালবর্ণ হয়। যখন একটি গাছেব উপব অনেক গুলি তেলাকুচাব ফল পাকিয়া থাকে, তখন সেই গাছটি একটি অপূর্ব্ব শোভা ধাবণ কবে, যেন কি, যেন সমস্ত কাননপ্রদেশ আলোকিত হয়। এই পাকা-ফল মধুববসবিশিষ্ট ও দেখিতে অতি সুন্দব বলিয়া নানা-জাতীয় বিহঙ্গমগণ আনন্দেব সহিত অব্যক্ত মধুবধ্বনি কবিতে কবিতে উহা ভক্ষণ কবে। যখন তাহাদেব ঐ কোলাহলে সমুদয় বনভূমি মুখবিত হইতে থাকে, তখন বোধ হয়, যেন অচেতন বৃক্ষসমূহও সেই তানে তান মিশাইয়া সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের অপরিসীম মহিমা কীর্ত্তন কবিতেছে।

ইহাকে হিন্দুস্থানে—কন্দুবী, মহাবাষ্ট্রে—গোড়তোংড়লী, গুজবাটে—ঘোলাংমিঠাং ও বাঙ্গালাদেশে—তেলাকুচা বলে।

"বিম্বী বক্তফলা তুম্বী তুণ্ডিকেবী চ বিম্বিকা।
ওষ্ঠোপমফলা প্রোক্তা পীলুপর্ণী চ কথ্যতে॥"

বিম্বী, বক্তফলা, তুম্বী, তুণ্ডিকেবী, বিম্বিকা, ওষ্ঠোপম-ফলা ও পীলুপর্ণী, এইগুলি তেলাকুচাব সংস্কৃত নামান্তর।

"বিম্বীফলং স্বাদু শীতং গুরু পিত্তাস্রবাতজিৎ।
স্তম্ভনং লেখনং রুচ্যং বিবন্ধাধ্মানকাবকম্॥"

ভা. পূ. খ.

তেলাকুচা—মধুববস, শীতবীর্য্য, গুরু, বক্তপিত্ত ও বায়ু-নাশক, স্তম্ভন, লেখনগুণবিশিষ্ট, রুচিজনক, বিবন্ধ ও আধ্মানকাবক।

এইগুলি ব্যতীত ইহাব আবও কতকগুলি গুণ আছে—

"শণপুষ্পী চ বিম্বী চ ছর্দ্দনে........ .."

চ. সং. সূ. ১ম অঃ॥

শণপুষ্পী ও তেলাকুচা বমনার্থ প্রয়োজ্য।

" বিম্বী শণপুষ্পী · · ইতি দশেমানি বমনোপগানি ভবন্তি।"—চ সং সূ. ৪র্থ অঃ।

· বিম্বী শণপুষ্পী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য বমনোপগ অর্থাৎ বমনক্রিয়াব সাহায্যকাবী।

"বরুণাওগল বিম্বী বসুক ·
বরুণাদিগণো হ্যেষ কফমেদোনিবাবণঃ।
বিনিহন্তি শিবঃশূলং গুল্মাভ্যন্তববিদ্রধীন্॥"

সু সং সূ ৩৮ অঃ।

এই বরুণাদিবর্গ কফ ও মেদনাশক এবং ইহাতে শিবঃশূল, গুল্ম ও আভ্যন্তবীণ বিদ্রধিবোগ বিনষ্ট হয়।

"মদনকুটজজীমূত · শণপুষ্পী বিম্বীবচা .. ·
.. · চেতি ঊর্দ্ধভাগহবাণি।"—সু সং সূ ৩৯ অঃ।

এইগুলি ঊর্দ্ধদিকে দোষনিঃসাবক অর্থাৎ বমনকাবক।

এখন দেখা গেল যে, চবক ও সুশ্রুত এই উভয় গ্রন্থ-কাবই তেলাকুচা বমনার্থে প্রয়োগ কবিয়াছেন; কিন্তু উহাব কোন্ অংশ প্রয়োজ্য? সুশ্রুত-সংহিতায় স্পষ্টই উল্লিখিত আছে যে, তেলাকুচাব মূলই বমনার্থ প্রয়োজ্য।

"মদনকুটজজীমূতকেক্ষ্বাকুধামার্গবকৃতবেধনসর্ষপবিড়ঙ্গ-পিপ্পলীকরঞ্জপ্রপুন্নাড়কোবিদারকর্ব্বুদারারিষ্টাশ্বগন্ধাবিদুলবন্ধু-জীবকশ্বেতাশণপুষ্পীবিম্বীবচামৃগের্ব্বারুচিত্রা চেতি ঊর্দ্ধভাগহরাণি। তত্র কোবিদারপূর্ব্বাণাং ফলানি। কোবিদারাদীনাং মূলানি।"—সু. সং. সূ. ৩৯ অঃ।

তেলাকুচা বমনকারক হইলেও উৎকট বামক নহে। ইহা বমনক্রিয়ার সহায় মাত্র, এ কথা চরকে "বমনোপগ" বলিয়া স্পষ্টই উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার অন্য গুণ-সমূহ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

পাশ্চাত্যচিকিৎসকগণও ইহা বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী বলিয়া থাকেন।

লৌকিক ব্যবহার।—তেলাকুচার কচিফল ও শাক তরকারীরূপে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় এবং ব্যাধগণ ইহার সুপক্ব ফল দেখাইয়া বন্যপক্ষী ধরিয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। তেলাকুচার পাতার স্বরস তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রপক্ব করিয়া মাথায় মাখিলে শিরঃপীড়ায় বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। তেলাকুচাপাতার স্বরস ২ তোলা আন্দাজ একটি পাথরের বা মাটীর পাত্রে রাখিয়া একখানা লৌহদণ্ড অগ্নিতে উত্তপ্তরূপে পোড়াইয়া সেই রসের ভিতর ডুবাইবে, পরে তৎসহ কিঞ্চিৎ ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তাতীসার ও রক্তামাশয়ে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

৩। রৌদ্র লাগিয়া বা গরমের জন্য মাথা ধরিলে তেলাকুচার পাতার রস কপালে প্রলেপ দিলে তৎক্ষণাৎ বেশ শান্তি পাওয়া যায়।
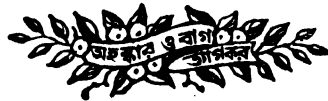
খেল্‌না।

সভ্যদেশে খেল্‌নার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। ছেলে ভুলাইতে, ঘর সাজাইতে খেল্‌না অনেকেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের দিক দিয়া দেখিলে খেল্‌নার আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয়। উহা মানুষের সৌন্দর্য্য উপলব্ধির শক্তি বর্দ্ধিত করে। অবশ্য যে শিশু শৈশব হইতে সুন্দর খেল্‌না লইয়া খেলা করে, সেই শিশু পরিণত বয়সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার বিশেষ শক্তিলাভ করিয়া থাকে। শিশুদিগের মনের মত করিয়া খেল্‌না প্রস্তুত করা নিতান্ত সহজ কাজ নহে। উহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবশ্যক হইয়া থাকে। ঘর সাজাইবার খেল্‌না প্রস্তুত করিতেও বিশেষ কৌশল, উদ্ভাবিনী প্রতিভা ও তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন। যে জাতি যত ভাল খেল্‌না প্রস্তুত করিতে পারে, সে জাতির সৌন্দর্য্যজ্ঞান ততই সমুন্নত, একথা সকলকেই নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে হইবে।

খেল্‌না প্রস্তুত একটা অতি লাভজনক ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ে অনেক লোক ও অনেক জাতি বড়মানুষ হইতেছে। আজ যে জার্ম্মাণজাতি এতগুলি বড় বড় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতেছে, সেই জার্ম্মাণজাতি খেল্‌নার ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থলাভ করিয়া থাকে। যে জাপানীজাতি আজকাল প্রাচ্যখণ্ডে ধনধান্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে, সেই জাপানীজাতি এখন অন্যান্য ব্যবসায়ের মধ্যে খেল্‌নার ব্যবসায় করিতেও আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীরও খেল্‌নার ব্যবসায় নিতান্ত অল্প নহে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাহাদুর পুরুষ আমরা, যাহারা আপনাদিগকে আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করি। সকল দেশেই এক শ্রেণীর সাহিত্যিক আছেন, যাঁহারা নিজে কোন কিছুই জানেন না, মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পদ্ বৃদ্ধি হইতে পারে, এমন কিছুই লিখিবার বা বুঝিবার উপযুক্ত বিদ্যার বা প্রতিভার ধার ধারেন না, অথচ লম্বশাটপটাবৃত হইয়া অন্য লেখকের লেখার খুঁত ধরিতে সহস্রলোচন হন; এই শ্রেণীর সাহিত্যিক যেমন সাহিত্য-সংসারের অতি হেয় ও অপকৃষ্ট জীব, তেমনই আমরা, যাহারা নিজের অভাব মোচন করিবার উপযুক্ত সামান্য সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে অসমর্থ, কিন্তু নিজের অতিকষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ পরের ঘরে তুলিয়া দেই এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দোষ দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হই, আমরাও সেইরূপ অতি হেয় ও জঘন্য জীব। উভয়েই তুল্য অপদার্থ। আমরা নিজেদের ছেলে ভুলাইবার ও ঘর সাজাইবার জিনিসের জন্য পরের মুখের দিকে তাকাইয়া আছি, অথচ জাতীয়তার অহঙ্কারে এতদূর আত্মহারা হইয়া সদম্ভে ধরণীবক্ষে এমনভাবে পদন্যাস করি যে, আমাদের দম্ভের ভরে ধরণীদেবীও মধ্যে মধ্যে শিহরিয়া উঠেন। কিন্তু আমাদের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, আমরা পদে পদে যেরূপ পর-

প্রত্যাশী হইয়া পড়িতেছি, এমন কি, সামান্য ছেলে ভুলাই-বার খেল্‌নার জন্য আমরা বিদেশীর হস্তে যেরূপ কষ্টলব্ধ অর্থ গণিয়া দিতেছি, আমাদের যদি আত্মসম্মানবোধ থাকিত, তাহা হইলে আমরা লজ্জায় মাটির সহিত মিশাইয়া যাইতাম।

এক সময়ে আমাদের দেশে নানাবিধ খেল্‌না প্রস্তুত হইত। মাটির, হাতীর দাঁতের, ধাতুর, কাঠের ও কাপড়ের খেল্‌না এদেশে যথেষ্ট নির্ম্মিত হইত। আমাদের দেশের বহুলোক উহার ব্যবসায় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, আত্মসম্মান ও স্বজাতিপ্রীতি হারাইয়া বিদেশী খেল্‌নায় নিজেরা ভুলিতেছি, ছেলেদিগকেও ভুলাইতেছি। এই যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীই আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক খেল্‌না রপ্তানী করিত। তদ্ভিন্ন অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী, জাপান, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশও এদেশে যথেষ্ট খেল্‌না বিক্রয় করিয়া এদেশের অর্থ লইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের সময় জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী হইতে খেল্‌না আমদানী হইতেছে না সত্য, কিন্তু জাপান হইতে এই সময়ে যথেষ্ট খেল্‌না আসিতেছে। এই খেল্‌না বাবদ প্রতি বৎসর আমরা কত টাকা বিদেশীর ধনভাণ্ডারে তুলিয়া দিয়া থাকি, তাহার একটা হিসাব দেখিলে হয় ত দুই চারিজনের কিঞ্চিৎ চৈতন্যোদয় হইতে পারে। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে আমরা যে দেশ হইতে যত টাকা মূলের খেল্‌না আমদানী করিতাম, তাহার উপর্য্যু-পরি দুই বৎসরের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে প্রতি বৎসরের ৩১শে মার্চ্চ বৎসরের শেষ তারিখ ধরা হইয়াছে।

দেশের নাম	১৯১৩ অব্দ	১৯১৪ অব্দ
জার্ম্মাণী	১০,১৮,৬৫০	১০,৫৭,৩৫০ টাকা।
গ্রেট বৃটেন	৬,৯২,৪৯০	৬,১৫,৩১৫ „
জাপান	৩,১০,০৮০	৫,০২,৪৫৫ „
অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী	৩,১৭,৪২৫	৩,০৭,৯৬৫ „
অন্যান্য দেশ	১,৭৯,৯৭০	১,৮৬,৭০৫ „
মোট	২৪,১৮,৬১৫	২৬,৬৯,৭৯০

পাঠক দেখুন, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে আমরা ২৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৬ শত ১৫ টাকার এবং তাহার পর বৎসর ২৬ লক্ষ ৬৯ হাজার ৭ শত ৯০ টাকার খেল্‌নাই ভারতে আমদানী করিয়াছি। আমরা আমাদের দেশে যদি খেল্‌না প্রস্তুত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এত টাকা বৎসর বৎসর আমাদের দেশেই থাকিয়া যাইত। আরও দেখুন, জার্ম্মাণী ভারতে এই খেল্‌নার ব্যবসায় দিন দিন কিরূপ বৃদ্ধি করিতেছিল। জার্ম্মাণীই এই বাবদ ভারতে সাড়ে দশ লক্ষ টাকার খেল্‌না বেচিতেছিল। এখন জাপান ধীরে ধীরে এই দিকে ব্যবসার বৃদ্ধি করিতেছে।

জার্ম্মাণীতে রীতিমত খেল্‌নার কারবার আছে। তথায় দুই প্রকারে খেল্‌না প্রস্তুত হয়। প্রথমতঃ তথায় কল-কারখানায় খেল্‌না প্রস্তুত হয়, আবার লোক বাড়ী বসিয়াও উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে খেল্‌না প্রস্তুত করিয়া থাকে। জার্ম্মাণীর নারেমবার্গে কলকারখানায় খেল্‌না প্রস্তুত হয়। সোন্নেবার্গ গৃহে প্রস্তুত খেল্‌নার আড়ত। জাপানে গরীব গৃহস্থরা ঘরে বসিয়া খেল্‌না প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইদানীং তাহাদের ঐ ব্যবসায় বিশেষ প্রসারলাভ করিতেছে। তাহাদের তথায় গরীব লোকদিগের অন্ন-সংস্থানের একটা বিশেষ উপায় হইতেছে। ভারতেও এক সময় প্রচুর খেল্‌না প্রস্তুত হইত, এখনও হইয়া থাকে। ভারতে কাঠের খেল্‌নাই কিছু বেশী প্রস্তুত হইয়া থাকে। জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত খেল্‌না বেশ দর্শনধারী, সুতরাং সাধারণের বেশ পসন্দসই। জার্ম্মাণীতে প্রচলিত অনেক খেল্‌নার মাল-মসলা এদেশে পাওয়া যায়, সুতরাং একটু উদ্যোগ ও চেষ্টা করিলে তাহাদের অনুকরণে এদেশে অনেক খেল্‌না প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তবে যে সকল খেল্‌নায় কলকৌশল অধিক, সেই সকল খেল্‌না যে এদেশে সহজে প্রস্তুত করা যাইবে এবং প্রস্তুত করিয়া প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত করা সম্ভব হইবে, ইহা মনে হয় না। এই বিষয়ে ইংরেজরাই জার্ম্মাণীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। এই দিকে জার্ম্মাণী তাহার উদ্ভাবিনী প্রতিভার যথেষ্ট বিকাশ দেখাইয়াছে। ইদানীং ইংরেজরা কতকগুলি জার্ম্মাণ খেল্‌নার অনুকরণে সাফল্যলাভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণরা একপ্রকার খেল্‌না প্রস্তুত করিয়াছে, উহা শায়িত করাইলেই চক্ষু মুদিত করে। সম্প্রতি কতক-গুলি ইংরেজ কারিগর উহার অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে বিলাতেই জার্ম্মাণী হইতেই প্রতি বৎসর দেড় কোটী টাকার করিয়া খেল্‌না আমদানী হইত। ইংলণ্ডে যে সকল খেল্‌না জার্ম্মাণী হইতে আমদানী হইত, এদেশে সে সকল খেল্‌না প্রায়ই আমদানী হয় না। ইংলণ্ড ধনবানের দেশ, সে দেশের লোক যাহা করে, তাহাই শোভা পায়। আমাদের দেশে জার্ম্মাণী ও জাপান হইতে যে সকল খেল্‌না আমদানী হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত সস্তা ; ইংলণ্ডে প্রস্তুত খেল্‌না অপেক্ষা জার্ম্মাণীতে প্রস্তুত খেল্‌না দামে কম, সেই জন্য বিকায় বেশী। অন্যে পরে কা কথা, বিলাতেই জার্ম্মাণ খেল্‌নার কাটতী অধিক ছিল।

এই খেল্‌নাপ্রস্তুতে জার্ম্মাণী যে কিরূপ যত্ন ও চেষ্টা করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে ও ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। জার্ম্মাণী হইতে চীনামাটি প্রভৃতির প্রস্তুত অনেক হিন্দু দেব-দেবীর পুতুল এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। ঐ সকল পুতুলের যেখানে যেরূপ করা উচিত, যেরূপ রং দেওয়া বিধেয়, জার্ম্মাণ কারিগররা ঠিক সেইরূপ ভাবে উহা প্রস্তুত

করিয়া এদেশে পাঠাইতেছিল। যাহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী, তাহাদিগের পক্ষে এই সমস্ত খুটিনুটি জানিয়া উহা প্রস্তুত করা নিতান্ত সামান্য ব্যাপার নহে। ইহাতে জার্ম্মাণজাতির ব্যবসায়বুদ্ধি কিরূপ প্রবল, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়।

জার্ম্মাণরা খুব সুলভে ভারতে খেল্‌না বেচিয়া থাকে; কাপড়ের পুতুল এক আনা হইতে বার আনা পর্য্যন্ত বিকায়। মৃত্তিকা চীনামাটি প্রভৃতির উলঙ্গ পুতুল বার আনা হইতে নয় সিকা মূল্যে বিকায়। নাঙ্কিন পুতুল, (যে পুতুলের মাথা ও হাত পা চীনামাটির, কিন্তু আর সমস্ত বস্ত্রখণ্ড ও তৃণদ্বারা প্রস্তুত) তাহার দুই পয়সা হইতে পাঁচসিকা পর্য্যন্ত দাম।

ইহা ভিন্ন ছেলেদের হারমোনিয়াম, মেটালোফোন, বাঁশী হারমোনিয়াম, দুন্দুভি প্রভৃতিও জার্ম্মাণী হইতে আসিত। ছেলেখেলার পিয়ানো ছয় আনা হইতে প্রায় দুই টাকা, মেটালোফোন দুই আনা হইতে বার আনা, ছেলেদের বাঁশী হারমোনিয়াম চারি আনা হইতে বার আনা দরে বিকায়। ব্যবসায়ীরা শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে কমিশন পাঠাইয়া থাকে।

ভারতে হাতে বাজাইবার ছেলেদের হারমোনিয়াম প্রস্তুত হইতেছে। জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে ছেলেদের খেলিবার যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র আমদানী হইয়া থাকে, তাহা ভারতেও প্রস্তুত হইতে পারে। খেলাঘরের জয়ঢাক, করতাল প্রভৃতি বিলাত হইতে আসে, এদেশেও প্রস্তুত হইয়া থাকে। তবে এদেশে যাহা প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতী জিনিষ অপেক্ষা হীন।

কলিকাতা পটারীতে চীনামাটির চক্‌চকে মূর্ত্তি, দেবমূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া থাকে, কিন্তু জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার চীনামাটির জিনিষই আমদানী হইত। ইহা ভিন্ন জার্ম্মাণী হইতে বিস্কুট, চীনামাটি, ডিমের খোলা, চীনামাটি প্রভৃতির খেল্‌না আসিত। কলিকাতা পটারী ওয়ার্কস্ উহা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আশা করি, ক্রমে তাহারা ইহা প্রস্তুত করিতে মনোযোগী হইবেন।

জার্ম্মাণী হইতে য়্যালুমিনামের চায়ের পাত্র, খাবার পাত্র, কফি খাইবার পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া আসে। এদেশে চীন বা য়্যালুমিনামে ঐরূপ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারা যায়। কিন্তু সে দিকে দেশের লোকের চেষ্টা কই? চাকুরীর সন্ধানে আফিসে মাথা না খুঁড়িয়া এই দিকে একটু চেষ্টা করিলে ক্ষতি কি?

বিদেশ হইতে ভারতে অনেক কলের খেল্‌না আমদানী হইয়া থাকে। রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, ইঞ্জিন, গোরু, ঘোড়া, বাঘ প্রভৃতি চলন্ত খেল্‌নাও বিস্তর আসিত। উহা নানারূপ মূল্যেরই প্রস্তুত হইত। ইহা প্রস্তুত করিতে বিশেষ কৃতিত্বের প্রয়োজন। আমাদের মনে হয়, আমরা যাহা সহজে প্রস্তুত করিতে পারি, সেই বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশেও নানারূপ খেল্‌না ও ঘর সাজাইবার জিনিষ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহা এদেশে প্রস্তুত হয় না, অথচ পছন্দসই, তাহা প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করা না হইবে কেন? জীবনসংগ্রামের এই দুর্দ্দিনে স্বদেশবাসীর যাহাতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হয়, দেশের ধনীব্যক্তিমাত্রেরই তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হইতে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী বিতাড়িত হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্থানে হয় ত জাপান, চীন প্রভৃতি আসিবে। আর আমরা কি চিরকালই নিশ্চেষ্ট থাকিয়া আপনাদিগের অকর্ম্মণ্যতার পরিচয় দিতে থাকিব?

সমালোচনা।

আমরা সমালোচনার্থ The Mahamandal Magazine (জুন সংখ্যা) উপহার পাইয়াছি। এই পত্র সুপ্রসিদ্ধ ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের মুখপত্র। আলোচ্য সংখ্যায় অনেকগুলি উপদেশপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ আছে। আর্থার এভালন ছদ্মনামধারী বিচারপতি সার্ জন উডরফের তন্ত্র-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ সকলেরই পাঠ্য। মহামণ্ডলের প্রাণস্বরূপ স্বামী দয়ানন্দজী Esoteric Science নামক প্রবন্ধে অতি সরলভাবে গুপ্তবিজ্ঞানের জটিল রহস্য বুঝাইয়াছেন। পাঠ করিলেই বুঝা যায়, তিনি যে বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ অধিকার—উৎসমুখ হইতে জলধারা যেমন স্বাভাবিক সরলভাবে উৎসারিত হয়, তাঁহার রচনায় তত্ত্বকথা তেমনই ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে। ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল যে মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—বহু অন্তরায় অতিক্রম করিয়া স্বামীজী এখন সেই উদ্দেশ্যের সাধনার পথ পরিষ্কার করিয়াছেন এবং আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহার চেষ্টায় সাধনার সিদ্ধি অদূরবর্ত্তিনী হইবে। তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইলে কেবল তিনি নহেন, পরন্তু সমগ্র ভারতবাসী তাহার সুফল সম্ভোগ করিবে। বর্ত্তমান সংখ্যায় ত্রিবাঙ্কুরের ভাগবত মহাশয়ের হিন্দুসঙ্গীতের ইতিহাস প্রবন্ধটিও মনোজ্ঞ। পত্রখানি বারাণসী শ্রীভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ন'দে ভট্‌চাজ।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

(১)

তেপান্তর মাঠ। যতদূর দৃষ্টি চলে, প্রায় ততদূর ধু ধু করিতেছে। মাঠের অনেক স্থলে শস্যক্ষেত্র। ক্ষেত্রে চাষীরা কাজ করিতেছে। যখন কেহ কেহ পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে, তখন তাহারা নিকটস্থিত একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পরস্পর একটু আলাপ করিতেছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় এই দেশে সন্তসন্তাপহারিণী সন্তদুঃখবিনাশিনী অশেষহৃদরোগবিধায়িনী তামাকুদেবীর আবির্ভাব হয় নাই; তখন ক্লান্ত হইলে কৃষকরা কেহ একটু ভাঙ, কেহ বা একটু গঞ্জিকাসেবন করিত। সুতরাং বৃক্ষতলের কৃষক-মজ্‌লিসে তখন ছাপগুড়ুক ও বোলেনের আগুনের ব্যবস্থা ছিল না। মাঠে বড় গাছও অধিক ছিল না। একপোয়া দেড়পোয়া অন্তর এক একটি বড় গাছ শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। রাখাল-বালক ও শ্রান্ত কৃষকগণ তাহারই তলে আসিয়া পরস্পর আলাপ করিয়া শ্রান্তি দূর করিত।

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। অনেক চাষী লাঙ্গলের গোরু ছাড়িয়া দিয়া গাছতলায় আসিয়া বসিয়াছে। কাহারও কাহারও কাজের কিছু অবশেষ আছে বলিয়া তাহারা বলদের কাঁধ হইতে যোয়াল নামাইতে পারে নাই। তাহারা জোরে বলদের ল্যাজ মলিতেছে এবং সঙ্গীদিগকে তাহাদের জন্য একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিতেছে। গাছতলায় কেহ সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে, কেহ গাঁজা টানিতেছে, কেহ গ্রাম্য তানলয়হীন সুরে গান ধরিতেছে,—

"ভক্তিভরে ডাক্‌লে আমি রৈতে পারি কৈ ?"

এমন সময় এক জন গ্রামের মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করিল, "মোড়ল! আমাদের ন'দে ভট্‌চাজের বিদ্যের বহরটা কতখানি বল্‌তি পার ?"

মোড়ল। আরে ক্ষ্যাপা! ন'দের বিদ্যের কি আর কূল-পা'ড় আছে ? মিচ্ছির ঠাকুর কাছে শুনেছি, ন'দে যখন দশ বৎসরের, তখন সে ভ্যাকরণ পর্য্যন্ত প'ড়েছিল। ভ্যাকরণ বড় সোজা শাস্তর নয়। ঐ শাস্তর পড়্‌লে মানুষ গলা থেকে কত জীব জানোয়ারের আওয়াজ বাহির করিতে পারে!

আর একজন কৃষক তখন গাঁজায় দম মারিতেছিল; সে তাড়াতাড়ি গাঁজার কলিকা রাখিয়া নাসারন্ধ্র দিয়া ধূম ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "ঠিক বলেছ মোড়ল! আমি সেদিন গোঁফকিস্তি করিবার ব্যবস্থা জান্‌বার জন্যি ন'দের বাড়ী গিছ্‌লাম; দেখ্‌লাম, ন'দের বড় ছেলেটা একখানা পুঁথির উপর মুখ জাব্‌ড়ে টা-ভ্যাম্-ভিস্ টা-ভ্যাম্-ভিস্ ব'লে হরকছমের সুর আদায় কর্‌ছিলো।"

একজন কৃষক জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ মোড়ল! উহা কিসের বোল ?"

মোড়ল গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, "আরে জানিস্ না ক্ষ্যাপা, ওটা কাঠ্‌ঠোক্‌রার বোল।"

কৃষক। কৈ, কাঠ্‌ঠোক্‌রাকে ত কখনও টা-ভ্যাম্-ভিস্ বলিতে শুনি নাই!

মোড়ল। আরে ক্ষ্যাপা! ও এদেশের কাঠ্‌ঠোক্‌রার বোল নহে, হিমালয় পাহাড়ের কাঠ্‌ঠোক্‌রার বোল।

আর একজন অমনই বলিয়া উঠিল, "অত বড় পণ্ডিত ন'দে ভট্‌চাজ, ওটা না জেনে কি তার পঁচিশ বছুরে ছেলেকে ঐ বোল আওড়াইতে দিয়েছে ?"

বৃক্ষতলে কৃষকদিগের এইরূপ আলাপ হইতেছে, এমন সময় অকস্মাৎ প্রান্তরপ্রান্তে একখানি পাল্কী দেখা দিল। একজন কৃষক উহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কি আসে ?" সকলের চক্ষু সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

দিগন্তের কোল হইতে পাল্কীখানি ক্রমে কৃষকদিগের সন্নিহিত হইতে লাগিল। মোড়ল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "কে বুঝি পাল্কী মেরে এই দিকে আস্‌চে।"

পাল্কী ক্রমশঃ নিকটে আসিল। সেই গাছের পাশ দিয়াই পথ। পাল্কী নিকটে আসিলে চাষীরা উহা ঘিরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পাল্কীতে কে যায় ?"

একজন বেহাঁরা উত্তর করিল, "পাল্কীতে কালিদাস পণ্ডিত যাইতেছেন।"

মোড়ল বলিল, "বটে! আচ্ছা, এই কালিদাস পণ্ডিতকে আমাদের গ্রামের ন'দে ভট্‌চাজের সহিত লড়াই করিতে হবে, নতুবা আমরা পাল্কী ছাড়্‌ব না।"

অগত্যা সেই নির্ব্বান্ধব প্রান্তরে কালিদাস পণ্ডিতকে বিচার করিবার জন্য আটক থাকিতে হইল।

এদিকে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন চাষী কোলাহল করিতে করিতে ন'দে ভট্‌চাজকে আনিবার জন্য গ্রাম অভিমুখে ছুটিল।

(২)

গ্রামের মধ্যস্থলে ন'দে ভট্‌চাজের বাস। গ্রামস্থ চাষীরা প্রায় সকলেই তাহার যজমান। যজমানদিগের কৃপায়

ন'দের কোন বিষয়ে কিছু অভাব ছিল না। তাহার গোলা-ভরা ধান, গোয়ালভরা গাভী। বার মাসে তের পার্ব্বণে তাহার পাওনাগণ্ডা কিছু কম ছিল না। বিশেষতঃ চাষী-মহলে তাহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি যথেষ্ট ছিল। সেই জন্য সাধারণ লোক তাহাকে যথেষ্ট ভক্তি করিত।

ন'দের বিদ্যার বহর কিন্তু অসাধারণ। সে কোন গতিকে বর্ণমালার অক্ষর কয়টির সহিত পরিচয় করিয়া সরস্বতীর সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছিল। কোনমতে সে লক্ষ্মী-পূজা ষষ্ঠীপূজার মন্ত্রগুলি অভ্যাস করিয়াছিল, আর গোটা-কতক উদ্ভট শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া তালে বেতালে তাহাই আবৃত্তি করিত।

একবার ন'দে তাহার প্রতিবেশিনী জনৈক ব্রাহ্মণকন্যার কতকটা জমী কাড়িয়া লইয়াছিল। বিধবা লোকের কাছে কাঁদিয়া-কাটিয়া সেই কথা জানায়। গ্রামের মাতব্বর যখন আসিয়া ন'দেকে বলিল, "ঠাকুর! জমীটুকু ঐ বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যারই সত্য।" তখন ন'দে তাহাকে নির্জ্জনে বলিল, "বাপুহে! তা কি আর আমি জানি না? তা খুব জানি। তবে জমীটি আমার দরকার। শাস্ত্রে বলে—

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।

অর্থাৎ কিনা, মার শাপ পুত্রে লাগে না, উহা ছেলের পক্ষে আশীর্ব্বাদ হয়, আর মহী লাভ কর্‌লে দোষ হয় না অর্থাৎ জমী নিলে পাপ হয় না, লাভ হয়। দেখ, এ সব বেদের কথা, সকলে উহা জানে না। আমার ঠাকুরদাদা কত বড় পণ্ডিত ছিলেন, তাহা জান ত? তাঁর কাছে আমার এই বিদ্যা শেখা। আমি কি অশাস্ত্রীয় কাজ কর্ত্তে পারি?"

এ হেন নবদ্বীপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আহারান্তে তাঁহার বৈঠক-খানায় বসিয়া তাম্বুলচর্ব্বণ করিতেছেন, এমন সময় সেই চাষীর দল কলরব করিতে করিতে তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া কহিল, "ঠাকুর! তোমাকে এখনই উহার সহিত লড়াই কর্ত্তে যেতে হবে। মোড়ল তাহাকে গাছতলায় আট্‌কে রেখেছে।"

কালিদাস পণ্ডিতের নাম শুনিয়া ন'দে ভট্‌চাজের মুখ শুকাইয়া গেল। কিন্তু সে তাহার স্বাভাবিক প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সাহায্যে বলিল, "বটে, বিচারে এক কথায় তাহাকে হটিয়ে দিতে পারি। তবে কি জান, ইহাতে আমার অপমান।"

সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসিল, "কেন ঠাকুর?"

ন'দে উত্তর করিল, "সে পাল্কী চেপে এসেচে, আমি তাহার কাছে পায়ে হেঁটে গেলে আমার কি কম অপমান?"

গ্রামে পাল্কী পাওয়া যায় না। ভিন্ন গ্রাম হইতে পাল্কী আনিতে হইলে বিলম্ব ঘটে। অগত্যা চাষীরা এক মাচানে ন'দে ভট্‌চাজকে বসাইয়া তাহা কাঁধে করিয়া "হু হুম্ বেয়ারা" শব্দ করিয়া কালিদাসের সম্মুখে লইয়া উপস্থিত করিল। ব্যাপার দেখিয়া মহাকবি কালিদাসের আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

কালিদাস মহা সমাদরে ন'দে ভট্‌চাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কস্ত্বং?"

ন'দে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কহিল, "কি কস্তং?—কস্তং খস্তং গস্তং—এত বড় কথা?"

কালিদাস অমনই কহিলেন, "বাপুসকল! তোমাদের ইনি মস্ত পণ্ডিত। ইঁহার নিকট আমি হারি মানিলাম। আমি একটা কথা বলিতে না বলিতে ইনি তিনটি কথা শুনাইয়া দিয়াছেন। ইঁহার সহিত বিচার করাই বাপু আমার বেয়াদপি, অতএব আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

তখন ন'দে ভট্‌চাজ হাসিয়া বলিল, "বাপুহে! তোমার পূর্ব্বপক্ষ দেখিয়া বুঝিলাম, তোমার বেশ পড়াশুনা আছে। তুমি কালিদাস পণ্ডিতই বট! তবে কিনা, এ সব বিদ্যা তোমরা কোথায় পাইবে? ইহা আমার ঠাকুরদাদার কাছে শেখা।"

কালিদাস রেহাই পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। চাষী মহলে ন'দের মাহাত্ম্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাহারা তাহাকে কাঁধে করিয়া মহাহর্ষে গ্রামাভিমুখে চলিয়া গেল।

গল্পটি পুরাতন। কিন্তু আজকাল এই ন'দে ভট্‌চাজের মত পণ্ডিতই আমাদের সমাজে অধিক হইয়াছে। ইহারা কোন শাস্ত্রের ধার ধারে না, কেবল "কস্তং খস্তং" বলিয়া পসার জমায়। পাঠক, এই সকল পণ্ডিত হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবেন।

HIMALAYAN GENUINE MUSK,

TIBETIAN AND NEPALI.

Pure and precious up-to-date Musk, cheap & good. Please secure early.

SHILAJATU, **Pure and genuine Shilajatu ready for Market.**

Pure Medicinal Drugs!

ISHWARI OIL,

A remedy for Skin-diseases and Paralysis of the Joints.

Every house ought to keep a bottle.

The Nepal Himalayan Genuine Musk Co.,

MERCHANTS AND COMMISSION AGENTS.

Proprietor :—**K. M. KRISHNA LALL, NEPALI.**

Branch Office :
103/2, Lower Chitpore Rd., (*Sindurnaputti*),
CALCUTTA.

Head Office :
HIMALAYAN BHUTAN.

বঙ্গভাষায়

Edwin Arnold's 'Light of Asia'

নামক বিশ্ববিদিত মহাগ্রন্থের

— অষ্টম অধ্যায়ের প্রাণস্পর্শী উক্তিগুলির সুমধুর পদ্যানুবাদ —

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্. কর্ত্তৃক অনূদিত।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—২৮ নং ঈশ্বর গাঙ্গুলীর লেন, কালীঘাট।

[অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত।]

ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার, শিল্প, কৃষিতত্ত্ব, চিকিৎসা, যোগ, ইতিহাস, বনৌষধ, জ্যোতিষ, গার্হস্থ্য-বিধান, ব্যায়াম এবং সঙ্গীতাদি সম্বলিত

সচিত্র মাসিক পত্র

প্রথম বর্ষ   প্রথম খণ্ড   নবম সংখ্যা

ফাল্গুন ... ১৩২৩

সম্পাদক—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

TOMB OF SHERE SHAH.—SASARAM, SHAHABAD.
সের সার কবর,—সাসারাম, সাহাবাদ।

"অনাথবন্ধু"—বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা, প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা।
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

Noblemen and Gentlemen !

My ambition will be almost satisfied when the Putta of the land will be granted to me as Sebait of the Goddess Annapurna by the noble granter of the land. I do not want to do wonders by building palatial buildings and a show of grandeur but humble cottages and a simple Thakurbari and accomodation for men to work in their humble occupation to help the Asram and themselves, it will not cost much money.

Although I know one of my patrons can help, if he pleases, to build up the Asram. But times are hard and the various designing men have abused charity and good work by dragging the best of the noblemen to speculating movements and caused heavy loss of money and have broken their hearts. There is another draw-back, when a richman receives an appeal for a charitable and good work of some kind he generally refers it to his most intimate friends the lawyer and the secretary, who are generally a Subjanta class, they say something against it either to show their great experience in the line or to protect a loss to their friend or employer which may arise by helping such a cause.

Twenty-five years ago I was thrown in the street from a high position and I know from experience of my half-a-century's business career what trouble it is to respectable men and women when they are pulled down in the world by the death of the earning member or members or loss of everything by litigation of designing relatives and neighbours.

There are many respectable men and women I know who have become homeless and beggars but if they find an humble shelter, food and something to cover their body they can work for themselves and the Asram which will be a shelter to them.

There are families getting ruined by the introduction of Western manners, customs and luxuries and you will hardly find few of the old renowned families where they had Thakurbari, Atitsala, Patsala, Kabiraj and Tole for the good of mankind.

At the present day our modern charity and good work is simply exhibited in the columns of news-papers with very little real work. A magnificent building, large number of fashionable furniture and the so called imported requirements for the good of mankind means waste of money.

If I do not receive much help I have made up my mind to sacrifice a portion of my interest in my business and convert it into a joint-stock concern and start the work of the Asram.

My age may tell upon me quickly and I should not lose this opportunity when God has induced a premier noble of Bengal to help me by grant of the land.

I expect to form a Committee to take up active work shortly. I thank Kunwar Bichitra Shah Saheb Bahadur of Tehri, Garhwal State, for his first instalment of donation and his eagerness to help the cause of the Asram.

I find some people in high position give their verdict without judging the matter before them, or pass an order hearing something regarding an appeal before them from his confidential Officer who attempts to save the Raj or estate the immediate loss of some money, which may be Rs. 2/- or Rs. 10/- without giving proper thought over the matter and some response to the appeal is again ridiculous.

I should not comment upon dealings of these nature but simply regret their ignorance to judge right from wrong and real interest of the state.

I thank my subscribers and well-wishers of my infant Journal for their co-operation.

Yours faithfully,

K. P. MOOKERJEE.

Light and Darkness.

LIGHT brightens up everything around us, it makes us see and enables us to do what we want to do. While darkness casts a gloom over everything, makes us blind, so if we are to do anything we must have some light. In the economy of nature day follows night and night follows day. This change exerts a healthy influence upon us, stimulates our good nature and helps us to realize the providence of God and to find out the path of our duty. Since our very birth we have to undergo many changes, changes wrought through the influence of manners, customs, social position, etc., etc. Moreover we learn many things from our neighbours and outsiders which are not always very good for us. Hence we should be very careful when we pick up anything from outside.

In India we had a peculiar type of civilization, an unique method of solving the problems of life which brought happiness well within our reach. Under the old system the struggle for existence was never very keen. Almost all the necessaries of life could be had for a mere song. Grain, vegetables, milk, etc., etc., were very cheap. The people did not know any want.

Now adulteration has become the order of the day. Few things can be had pure and if pure things are to be had anyhow they are worth a Jew's eye, consequently our health is being undermined and we are falling an easy prey to sickness and premature death.

We are now groping in the dark. We want light. We had light but we have most foolishly blown it out and now in the dark we are getting the wrong sow by the ear. We are driving headlong towards the brink of a precipice. In spite of our muchvaunted intelligence and knowledge we have not been able to keep the wolf from the door. We have not been able to secure a place of abode, cheap food and clothing and medical aid for the poor. So long as we are unable to bring the necessaries of life within the easy reach of all, so long will our society remain steeped in deep misery. The problem which cries loudest for solution is the problem of high prices. We are unable to make out how to get rid of the difficulty. We want light—more light.

My Three Schemes.

NATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga,* if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.
(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper 'Anathbandhu' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) **D. Chatterjee.**
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,

I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,
(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,
(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Sj. Provat Chandra Giri.

TARAKESHWAR.
22, 1, 17,

Dear Sir,

The fifth number of Anathbandhu has been received in due time. I have gone through the Magazine and found it very much interesting. The different subjects dealt therein are highly instructive and valuable. I doubt not that the object you have in view in this Journal is laudable. I wish it every success. I have not yet got the Journal Nos. 6th and 7th hope to receive them at an early date. I shall send my photo and life sketch later on.

Yours Sincerely
(Sd.) **Provat Chandra Giri.**

From Dr. D. B. Spooner, Nalanda.

CAMP BARGAON.
Feb. 24th. 1917.

I beg to thank you for your kindness in sending me a copy of your monthly Journal Anathbandhu, upon whose admirable get-up I venture to congratulate you. I am glad the Bodh Gaya photo have been of use to you. * * *

Yours truly,
(Sd.) **D. B. Spooner.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee"

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,
(Sd.) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,
(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

From Babu Amulya Chandra Mukerji,

ELLINGHAM COTTAGE,
Simla, W. C. (Punjab.)
April 16th, 1917.

DEAR SIRS,

I am much obliged for the six copies of "অনাথবন্ধু" from আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, sent to me per V. P. P. for Rs. 10, I have read them with great interest and am much satisfied. Be pleased to send me the issues of the months from পৌষ to চৈত্র ১৩২৩, and for বৈশাখ ২৩২৪ if it has issued by now, and oblige.

Yours faithfully,
(Sd.) **Amulya Chandra Mukerji.**

বেনারসের শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী লিখিয়াছেন ঃ—

BENARES CANTT.
8.7.1917.

মহাশয় !

যোগেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের মারফত প্রেরিত সাত কপি "অনাথবন্ধু" পূজ্যপাদ পাইয়াছিলেন। এই মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি ভাল এবং অনেক আবশ্যকীয় উপদেশগর্ভিত। পত্রের নিবন্ধ ও গঠনাদির পারিপাট্য দেখিয়া পূজ্যপাদ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীভগবানের নিকট ইহার দৈনন্দিন উন্নতির প্রার্থনা করিতেছেন।

আপনাদের আশ্রমের Prospectusআদি এখানে পাঠাইতে পারেন। আমাদের দ্বারা যদি ইহার কোন সহায়তা হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
দয়ানন্দ।

PRESS OPINIONS.

The British Printer.

October and November issue, Vol. XXIX, No. 172, 1916.

THE second number of *Anathbandhu* from the printers and publishers—K. P. MOOKERJEE & Co., Calcutta—offers a decided advance on the first issue of this new venture of that progressive house. Matter is in Bengali, with some advts. in English, a cover in red and black being both appropriate and quietly tasteful in character. A remarkable feature of the pages is the very praiseworthy standard attained by a series of three-colour illustrations interspersed amongst matter. Real progress is being made in this direction of highly-skilled printing, and all concerned are to be congratulated upon so good a result.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such (" Anathbandhu ") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called "Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

"Anathbandhu"—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion. Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that accompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer, of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

"Anathbandhu"—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu*. The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram*, where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi*, *Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era.

9th August, 1916.

A NEW JOURNAL by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to

open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday,, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukh padhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religious, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public. The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

The Express, Bankipore.

Friday, March 23. 1917.

Messrs. K. P. Mookerjee and Co., the enterprising firm of stationers, printers, lithographers etc. of Calcutta are to be congratulated on the sixth issue of their pictorial journal, *Anath Bandhu* which contains useful and interesting articles and nice pictures. It is a pity that they have to discontinue the specimens of Hindi papers owing to want of sufficient response from the Hindi reading public. They have however added some English articles, but we think the public would have preferred more the encouragement of the vernaculars of the country. We beg to acknowledge with thanks also a calendar and a pocket diary from Messrs. K. P. Mookerjee.

The Beharee.

Thursday, April 5, 1917.

We are obliged to Messrs. K P. Mukerjee & Co. (7, Waterloo Street, Calcutta) for a very nice pocket book and calendar for the year 1917 which is very prettily got up. Their beautiful Bengali Magazine, "Anathbandhu" is appearing regularly and with improved features month by month. The current number to hand worthily keeps up the reputation.

The "STATESMAN."

Saturday, 19th May, 1917,

"ANATH BANDHU."—The seventh number of the illustrated magazine published by Messrs. K. P. Mookerjee, of 7, Waterloo Street, Calcutta, is full of interesting and useful reading matter. A full page portrait of Lord and Lady Ronaldshay is given as frontispiece and the number is illustrated with several other half-tone and tri-colour blocks. The publishers have in this number introduced a few articles and a poem in English, so that the publication may appeal to a wider range of readers.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlecs to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India

and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committe of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,

Your humble servant,

K. P. Mookerjee.

7, Waterloo Street

Calcutta.

আলোক ও আঁধার।

যেখানে আলোক সেইখানেই জ্ঞান, যেখানে অন্ধকার সেই-খানেই অজ্ঞান। আলোকে ধরা হাসে, অন্ধকারে বিশ্ব আচ্ছন্ন হয়। আলোকে দর্শনশক্তি খুলিয়া যায়, অন্ধকারে নয়ন মুদিয়া আইসে। সেইজন্য কাজ করিতে হইলে আলোক আবশ্যক। সংসারে আলোকের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলোক, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম—বিশ্বেশ্বরের বিধান। এই পরিবর্ত্তন আমাদের সাধু প্রকৃতি সন্ধুক্ষিত করে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান্ করে এবং আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। এই সংসার পরিবর্ত্তনময়। আমরা জন্মাবধি নানা পরিবর্ত্তন ভোগ করি। আচার, ব্যবহার, সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। ইহা ভিন্ন আমরা পরের নিকট হইতে অনেক বিষয় শিখিয়া থাকি, তাহার মধ্যে অনেক মন্দ জিনিষও শিখি। সুতরাং পরের নিকট হইতে কিছু শিখি-বার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

ভারতে যে সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, ভারতীয় মনীষীরা জীবনযাত্রানির্ব্বাহ-সম্পর্কিত সমস্যায় এমন এক অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তখন মানবের যাহা প্রয়োজনীয় পদার্থ, অভাব-মোচনের জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্তই সুলভ ছিল। শস্য, তরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি নামমাত্র মূল্যে বিকাইত।

এখন কেবল চারিদিকেই ভেজালের রাজত্ব। খাঁটি জিনিস ত পাওয়াই যায় না, আর যদিই বা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা খরিদ করিতে ঢাকের দামে মনসা বিকায়। এই ভেজালের ফলে আমরা রোগ, শোক ও অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িতেছি।

আমরা অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এখন আলোক চাই। আমাদের যে আলোক ছিল, তাহা আমরা মূঢ়ের মত নিবাইয়া ফেলিয়াছি। এখন এই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এক করিতে আর এক করিয়া বসিতেছি। আমরা তীব্রবেগে উৎসন্নের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। আমরা জ্ঞানের ও বিদ্যার অহঙ্কারে আত্মহারা, কিন্তু সেই জ্ঞান বিদ্যায় দৈন্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছি না। সমাজে যাঁহারা দরিদ্র, আমরা তাহাদের জন্য বাসভবন, অশন-বসন ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছি না। যতদিন আমরা সহজে সকলের অভাবমোচন করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের সমাজ চিরদুঃখেই নিমজ্জিত থাকিবে। এখন দুর্ম্মূল্যতা সমস্যা সকল সমস্যা অপেক্ষা উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান করিব, তাহা বুঝিয়া পাইতেছি না। আমরা চাই—আলো—আলো—আলো!

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল গুণ ও ধর্ম্মপ্রভাবে এককালে আমাদের দেশ সমস্ত সভ্যদেশের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়া-ছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি প্রকারে আমরা উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহাই প্রদর্শন করা "অনাথবন্ধুর" উদ্দেশ্য।

"অনাথবন্ধুর" মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার লভ্যাংশ ইহার উপদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্যই ব্যয়িত হইবে। আমি উহার এক কপর্দ্দকও লইব না। আমি প্রাচীন ভারতীয় পল্লীর আদর্শে একটি আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠিত করিব। ঐ পল্লীর জনগণ আপনার অভাবের মোচন আপনারা করিতে পারিবে, আপনাদের জন্য পরের উপর নির্ভর করিবে না। দেশের কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি—সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। আশা করি, এইবার আপনাদিগের নিকট আমার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

আমার প্রতিষ্ঠিত "অন্নপূর্ণা আশ্রম" মিতব্যয়িতা-শিক্ষার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপোষণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ আশ্রম হইবে। কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, "অনাথবন্ধু" সকলকে তাহার একটা আভাস দিয়াছে।

যখন এই আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন উহাতে পুরাতন সময়ের পাঠশালার ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী শিল্পাদি বিদ্যা-শিক্ষারও ব্যবস্থা বিহিত হইবে। যাঁহারা দ্বারবঙ্গের মহারাজ মাননীয় সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়ের সহিত সাধারণের মঙ্গলকামী, আমি তাঁহাদিগেরই সহায়তা প্রার্থনা করি।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ত্ব,

দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশানুরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি সামান্য আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আস্‌বাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌ব্যাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া

কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ৩০।৩৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্য-দাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি।

৩য়। ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ—যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

'অনাথবন্ধু'

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

মাসিকপত্র

ध्यान—तप्तकाञ्चनवर्णाभां बालेन्दुकृतशेखराम्।
नवरत्नप्रभादीप्तमुकुटां कुङ्कुमारुणाम्॥
चित्रवस्त्रपरीधानां सफराक्षीं त्रिलोचनाम्।
सुवर्णकलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्॥
गोक्षीरधामधवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्।
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठविराजितम्॥
कपर्द्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्।
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं दृष्ट्वानन्दमयीं पराम्॥
सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यां नितम्बिनीम्।
अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यामलङ्कृताम्॥
प्रणाम—अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि।
सर्व्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि माहेश्वरि नमोऽस्तु ते॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্ট্বানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥
প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথাঃ—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদ্‌মায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের শেষে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ANATHBANDHU.

CHARITY BEGINS AT HOME.

The joint family system may be alluded to as charity done to all the members by the earning member of the family ; if this practice extends all over the world, the people may have health as the experience of the elders is received by the Juniors with reference to all that kept the elders well. When kindness and sweet and lovely expressions are used by the Seniors peace prevails, and by joint efforts all the wants of the family are provided for and thus comfort is gained. Health, peace and comfort prolong life, as the life is kept well owing to the reverence the children have for their superiors whose instructions they follow to the letter, and thus the family pass their time smoothly. Some members may be blind, or deaf and dumb, some may be orphans and some widows but they are well provided for and there would be no necessity for exerting ourselves for creation of Homes and Schools for them. This being the standard of life, good feeling and kindness prevail and charity will be everywhere.

The Cattle of Bengal.

II.

THE Resolution recorded on the Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department Bengal for the year 1912—1913 stated—"The difficult and important question of the improvement of cattle-breeding has continued to engage the attention of Government and of the Agricultural Department. Shortly before the close of the year the sanction of Government was accorded to the establishment of a cattle and cultivation farm at Rangpur, and a prominent place in the work of the farm will be given to the improvement of the breed of cattle. The main object of the farm is to demonstrate to private persons the feasibility of such undertakings and the possibility of working them at a profit, and it is hoped that, if success attends the present experiment, Government will ultimately be able to withdraw in favour of private enterprise. Progress, however, must necessarily be slow, and the gloomy picture which Mr. Kerr draws of the present position as regards cattle-breeding clearly shows that it would be idle to expect any material improvement in the breed of cattle in Bengal for years to come. Use is made of debilitated and badly shaped bulls, and little or no care is taken to prevent in-breeding. Though suitable bulls have been placed at the disposal of District Boards, they are seldom used, and even when used the value of the good stock is often lost owing to the neglect of the cow or the calf."

Here the whole blame was thrown on the people who are accused of not taking advantage of the suitable bulls provided The charge was repeated in the Resolution of the next year—"The Superintendent of the Civil Veterinary Department again remarks on the indifference displayed by cattle-owners and the cultivators generally to the efforts which are being made to improve the breed of the cattle of this Presidency. It is reported that very little advantage is taken of the stud bulls serving in the various districts which are the property of the Jail authorities or of the District Boards.

Unfortunately the Return of stud bulls for the year 1913—14 shows that on the 31st March the number of bulls in 19 districts belonging to the Government did not exceed 30 and the number of bulls belonging to the District Boards did not exceed 34 !

The following extracts from the Note of the Superintendent, Civil Veterinary Department, Bengal will show how the shortage of bulls has never been remedied :—"There were applications for 25 more bulls, which could not be supplied during the year" (1898—99) "An opportunity was offered by the Superintendent, Civil Veterinary Department, Madras, who reported that excellent young bulls and cows were obtainable in Nallore at a much reduced price. Unfortunately no funds were available" (1899—1900). "Attempts were made to buy up the young stock of the Hisser bulls for preservation from castration, but there were no. funds" (1900—1901). "There was a fairly constant demand for bulls from District Boards and Jails for improving milch

breeds, but we were not in a position to help them." (1904—1905) "Requests were received for bulls but could not be complied with." (1906—07). "As usual applications were received for bulls, but could not be complied with for want of suitable animals" (1911-12-13). And the Department admitted—"The raiyats appreciated these bulls wherever they were sent." Thus the charge brought against the cattle-owners stands refuted.

The charge of neglect to utilise suitable bulls brought against the people have been so fully and conclusively answered by Mr. Blackwood that we need only quote his words—"There is constant complaint regarding the apathy of villagers in bringing their cows to be covered, even although the fee charged is only nominal. There are several reasons for this. One is that if a cow is brough from a distance of, say, more than 2 or 3 miles, there is a danger that she will go off heat before she can be brought to the bull. If the bull is kept stationary in one place, the sphere of his activities is thus limited to a radius of about 3 miles from where he is stationed. The next reason is that in many cases great difficulty was found in getting the cow covered owing to the disparity in the size of the bull as compared with that of the cow, and in several cases where the covering was successful, the cow has died in the act of calving owing to the fact that the calf was too large to admit of birth being given to it."

The disparity in the size of the bull as compared with that of the ordinary Bengal cow shows how little care is taken in selecting suitable bulls by the authorities. When a judicious selection is made, the result is an improvement in the breed. Mention has been made in the Report how in Jessore Mr Maclead of Kotchandpur has improved the cattle in the neighbourhood by the introduction of a Hissar bull. We have marked that improvement. And our experience with a Montgomery bull has given very satisfactory results; and we can recommend an average Montgomery bull for the improvement of cattle in Bengal.

The introduction of foreign breeds has not been very successful except, perhaps, in Patna where the Taylor breed has given every satisfaction. And we need not indent costly foreign bulls, for Indian bulls have been found good enough, even in foreign countries. In his *Notes on England* Taine has remarked that in an English farm he found among selected and expensive breeds an Indian bull and his progeny which "re-call the Buddhist Sculptures." And only the other day the President of the Karachi Cattle Show remarked that the local authorities have been much exercised lately by the steady drain set up by the foreign demand for the well-known Karachi breed. At the last show, we were told, the best milch cow and the best stud bull exhibited were purchased by a representative of the Japanese Government. What is wanted is adequate care in the selection of suitable bulls for cows in the Province, and—what is more—a scheme should be devised for making the bulls available in the villages through local bodies or local landlords.

"There is a general concensus of opinion," says Mr. Blackwood, "that a Bengali animal, if a good one, is much to be preferred for breeding purposes to one which is imported. It stands the climate better, is much easier to feed, and is not too big for local cows. If an imported animal is introduced, care should be taken to see that it is not the product of conditions essentially different to those of Bengal." The meagre yield of milk of cattle in most districts is ascribed by the authors of *Dairy Farming in India* to careless breeding. If it is found that Bengal bulls are best suited to Bengal an attempt should be made to increase the supply of really good Bengal bulls. It has been found that "it is with great difficulty and only by means of *Khus Khus tatties* that

English cattle can be kept alive on the plains in India." It has also been found that in many cases bulls brought from other parts of India by depriving their native districts of really good bulls have not proved suited to the requirements of the cattle of the province. Hence we welcome the establishment of the Rangpur Farm where attention is being paid to rear good breeding bulls of the Bengal breed for supply to the districts.

It is a pity that many dry cows, irrespective of age and condition, ultimately find their way to the butcher. In Calcutta the number of horned cattle slaughtered annually at the Tangra Slaughter-house amounts to about 90,000 and at Sonadanga to about 10,000. Of these 8,000 cows are said to be prime cows *i.e.*, cows under seven years of age and fit for breeding purposes. The tocsin of alarm was sounded by the authors of *Dairy Farming in India* more than ten years back—"Large numbers of milch cattle pass down yearly to Calcutta, chiefly from the Kosi market, and are there sold to local gowallas, the purchase-money being usually paid by instalments. At the end of the cold weather, when the cows are beginning to run dry and the sales of milk tend to decrease, they are sold to the butchers for slaughter. * * * This rapid exhaustion of stock ends in scarcity of supply." And as the pick of the market is supplied to Calcutta the effect of the slaughter of these prime cows cannot but be considered disastrous to the cattle of the country. In the Report of the special Committee of the Calcutta Corporation appointed in 1910 to consider the question of the milk supply of Calcutta and re-constituted in 1914 we read—"As regards the slaughter of prime cows, there are various reasons why the *goala* sends his dry cows to the butcher. The space in his shed is limited and he can only accommodate a fixed number of cows. He keeps that number and as soon as they are off milk he sells them to the butcher and replaces them by cows in milk. His capital is also limited and whenever he needs to buy a new milking cow he has to sell a dry one. For similar reasons he cannot afford to keep the calves, which accordingly he also sells to the butcher; and as cows in this country are generally of poor milking capacity and do not give milk without their calves, the *goala* has recourse to *phooka*—a process which, as the evidence shows, is not only painful but tends to make the cow sterile, at least for some considerable time. The *goala* therefore finds it profitable to dispose of his dry cows, though undoubtedly the slaughter of cows, which under different conditions would continue to bear calves and give milk much longer, results, in the long run, in the permanent deterioration of the breed and seriously affects the milk-supply of the country, which is already deficient both in quantity and quality. The town dairies draw to themselves year after year the best milking animals in the country, and there is already deficiency of such cattle in the up-country markets."

Then there is the huge waste of female buffaloes in Eastern Bengal where they are used for ploughing the fields. There one finds hundreds of prime female buffaloes without one bull for breeding purpose. And this when it is easier to improve the breed of the buffaloes than the breed of cows—in as much as even wild buffalo bulls cross with domesticated buffaloes.

The effect is a deficiency in the milk-supply. "The present price of milk in the larger towns is about 4 to 5 seers per rupee or Re. 1-4 to Re. 1-8 per gallon. This is probably dearer than the retail price at present (before the war) ruling in Great Britain. In Scotland the wholesale price per gallon (5 seers) is from 10*d*. to 1*s*. The price of milk in Bengal has at least doubled within the last 10 years and is likely to go up still further."

This is certainly very serious in a country where the vast majority of the population abstains from meat and milk is an article of everyday dietery.

In Great Britain the tendency is to gradually throw more and more cultivated land into pasture. "In the whole of the United Kingdom—England, Wales, Scotland and Ireland"—wrote the Portuguese author of *England of To-day*, "the area under cultivation is now forty-eight million acres, and twenty years ago it was forty-five millions. Pasture-land, natural and artificial, amounted to twenty-seven millions, or sixty per cent., and land for cereals to eleven millions, or about twenty-five per cent. Now the pasture land is thirty-three millions, or seventy per cent., and cereals nine millions, or less than twenty per cent. In England and Wales, among twenty millions of cultivated acres, eighteen are for pasture, seven for cereals, and three for vegetables and garden-produce. In Scotland the pasture-land consists of three millions of acres out of a total of five millions under cultivation. In Ireland there are twelve out of a total of fifteen. Is or is not Great Britain a great meat-factory?"

But in India the conditions are not similar. On the other hand here the tendency is to bring every acre of fallow land under the plough. So the solution of the problem must be differently sought and accomplished in India.

At the ninth meeting of the Board of Agriculture held at Pusa (February 1916) Mr. C. H. A. Still is reported to have said—"There is some risk, I venture to think, that unless great care is observed, some confusion may arise in regard to what are essentially in India separate branches of the same subject. Over large tracts of India, in fact, over, I believe, most of the country cattle-breeding, excluding buffaloes, is principally not for dairying purposes at all, but for the production of bullocks for agricultural purposes. Any scheme for the improvement of the breeding of cattle should bear this in mind. The problem of improving the breeding of cattle should bear this in mind. The problem of improving the breeding of plough cattle is in some respects entirely distinct from the problem of improving the milking qualities of Indian cattle."

We consider it unfortunate that because the two branches are separate one should be given preference to the other. In fact from what we have showed before the question of improving the plough cattle is as important as the question of improving the dairy cattle in India where while the bullock is the mainstay of the agricultural population the cow is a necessity to the householder.

We are of opinion that for years to come the two questions—distinct though they are—can be handled together the same measure's tending to improve the plough cattle and the dairy cattle. We would suggest the establishment of more farms like the one at Rangpur for the rearing of reliable bulls and cows and the supply of bulls to villages though local bodies and local landlords interested in the improvement of agriculture.

The climatic conditions of the country cannot be charged ; and the question of pasture may be difficult to solve. But the question of the supply of reliable bulls is easily solved. And we are sure the owners of cattle worth feeding will not fail to provide the food necessary to keep them in proper condition. A little attempt to induce the Zemindars and headmen to set an example in the matter of taking proper care of the cattle by providing sanitary sheds and healthy food and the question of the improvement of the cattle of the province will be easily solved.

Hemendra Prasad Ghose

At the crossing.

III.

WE are now passing through a period of transition. The old-world ideals are changing and people are just now bewildered—they are just groping their way towards other ideals. Signs are not wanting to show that a change is wanted—nay, a change has become an absolute necessity. On the 4th August last at the intercessory service held to mark the third anniversary of the declaration of war on Germany, the Bishop of Calcutta began the service at St. Paul's Cathedral with the following words :—

"After three years of war, we again gather together before God. The outlook is changed : especially is it changed since last year. Are we also changed? As we look back on the long three years and recount the events, what strikes us most? Time and again we have been held back from victory by circumstances which were not or could not be expected. From the time that the raiders of Scarborough escaped from under the guns of our grand fleet in a sudden storm of rain to the time that the failing light impaired the victory off Jutland, the Navy has, as the saying goes, had no luck. The offensive on land on the Somme and on the Ancre has been at critical moments held up by weather. This is all known now to any one who can read and think. What was God saying all this while to our nation and Empire? 'You must change, you must change, before I can give you victory.' 'You must change' is addressed to the nation as a whole and to all the individuals of it. As a nation we have changed some things, we are willing to change others. But still the demand continues. The year 1917 opened with the prospect of decisive military success in Europe. All men's minds in Great Britain were elated and expectant. But instead of what we hoped, we found the Russians paralysed by revolution and the campaign in Europe thus rendered inconclusive. This train of events might have led to the conclusion of a peace unfavourable to the Allies. But that was not permitted. The United States of America joined with us, and their adhesion makes the continuation of the War certain. Thus our nation is granted another chance to change itself. The same divine demand is reiterated, 'You must change before I can give you victory.' Let us begin our service to-day with a confession of our sins, both national and personal, and let us beg of God to give us a change of heart, and a loyal willingness to advance with a changed heart to live a changed life."

Further on in the course of his address he said :—

"The world of politics and newspapers may talk of that peace which is the absence of war : but we must talk with God of his peace which passeth all understanding. We need that peace in our hearts, in our homes, in our Church, and then it will spread to our nation and to other nations. If we, like God, willed that no man should perish but that all should come to a knowledge of the truth, what a change would come over national life and international relations! 'The Lord is loving unto every man and his mercy is over all his works.' If we had that spirit, how difficult it would be for quarrels to arise! How different would be our objects in private and public life! Then we should know the peace of God which passeth all understanding."

On the same occasion at the United Service

held by the Free Churches of Calcutta at the Thoburn Methodist Episcopal Church, the Rev. Mr. C. C. Dawson, of the Baptist Church, in the course of his sermon, said that "People everywhere were moving on to a new birth of freedom. Already crowns and thrones, emblems of Royal office and dignity, which had been degraded by the use of despotism, had perished, and others seemed almost ready to follow them. The world was moving steadily on to the dawning of a new day. Old institutions and old tyrannies were passing away. They were moving towards the dawn of a better day. The great Allied armies were fighting for this—to crush and destroy all the ugly and sinister bars to human progress ; to remove the power that would deny to humanity its inherent right, and deprive it of its God-given freedom. To attain all this, there was a might of turmoil and suffering and sacrifice still to pass through—but the great armies of freedom had pitched their camp towards the sunrise, and however long the night may be, however sharp the pain and bitter the sacrifice, they were working, and with them they could look expectantly for the crimson herald of the coming morn. Then out of a chaos of strife will be born a new world, a world of freedom and of lasting peace and goodwill."

The speeches made in London at the League of Nations Society are also suggestive of the effect of current thought on the subject. Lord Bryce said that there were only two ways by which the world could avoid being the ever lasting victim of national hatreds and ultranational ambitions. One was a change of heart in the peoples of the world and the other was the league of nations he proposed. He rejected the change of heart in the peoples because it provided only a very slow remedy. Did we, he asked, see even the beginnings of a change of heart such as was involved in a diminution of the passion of national hatred and vanity which prompts agression, in a stronger respect for the rights of others and in the growth of international good faith. At the same meeting General Smuts said that "the war had stamped into the hearts of millions an intense desire for a better order of things. They saw the result in a meeting like that, where they had not only dreamers and idealists but practical men and even a man of blood like himself. It was high time something was done. One could not contemplate without emotion the horror that had overcome Christianity. It was computed that about 8,000,000 people had already been killed in this war, not the old and decrepit but the very best. Still larger numbers had been maimed. The number of killed and wounded was as large as the whole white population of the British Empire. Was not that a subject to stir humanity to its deepest depths? They had seen the most criminal disregard of laws, human and divine. Civilisation itself was almost crumbling to pieces, and if some means were not found to prevent war like this in future the whole fabric of civilisation was in danger. If one-tenth or one-hundredth of the consideration or the thought that had been given to this war were given to schemes of peace then they would never see war again." He went on to say that "He was not sure that a passion had not been born for peace that would prove stronger than all the passion for war that had nearly overwhelmed us. At the end of this war they would find two hostile camps, with a chasm of hatred between them such as had never been known before. The time for schemes of peace might seem unpropitious. But, on the other hand he had a feeling that deeper than that had been the good work the war had done in creating a better feeling in the hearts of men, such that the present state of affairs would never be tolerated again. The war had carried us to fundamentals. In recent years there had been quite enough talk of peace—Hague Conferences and peace treaties in large numbers. Yet all

the time there was this dark scheme which had broken out in this great conflict The war had shown that there was very great danger in merely believing in papers and institutions. We must have not merely agreements but that change in the hearts of men which would be a good basis for them; otherwise they would be "scraps of paper" again. There must be created a strong, sound, healthy public opinion that would see that Governments were kept in order, that diplomatists were kept in order, and it was only in proportion as that result was achieved that we could have any reasonable confidence that there would be peace in the world. At the end of the war we must conclude a good peace. He did not see how a perpetual peace was to be secured if this war was going to be ended like so many other wars—as a mere patchwork compromise between so many conflicting interests. The war had carried us to the depths and let us build from the depths. It was only when we had established the principle that nations should decide their own fate that it would be possible to talk of peace in the future. Another condition of lasting peace was a league or union of nations with some common organ of co-operation and decision of vital issues." Lord Buckmaster was more sanguinely certain as to the outcome of the war, but he along with the other speakers, spoke of the trembling earthquake which is shaking the world's moral fabric. Lord Hugh Cecil suggested that the entire Christian Church should co-operate to assert that not only war but also nationalism is contrary to Christianity.

These views all suggest that at least in the case of some leaders of thought in Europe, their minds are completely overawed by the fearful events of the last three years. Lord Bryce, the once sanguine historian—philosopher, sees no sign of the hoped—for change of hearts in the people and suggests an essentially material remedy for the world's ills. General Smuts, in the very breath in which he warns the audience against paper guarantees that can be easily broken, advocates the combination of all civilized powers to prevent the destruction of civilization. It may be pertinently asked, what will prevent such an international pact from degenerating as did the Holy Alliance concluded after the Napoleonic wars?—wherein the princes who composed the Alliance pledged themselves to regard each other as brothers and their peoples as their children and to found all their acts "on the sacred principles of the gospel of our Lord and Saviour JESUS CHRIST." While devising means for a lasting peace, there are not wanting people who even from now are thinking about arms and supplies. Mr. E. S. Montagu speaking at West Cambridgeshire on the 23rd July last said:—"Has not the war taught us, revivified and made more acute as a motive power, the sense of Nationality? *Our country and Empire must be made secure not only in arms, but in supplies.*" Though every one is crying for peace—lasting peace—though the best minds of the west are bent upon solving the problem of how to prevent similar catastrophes for all time to come, yet it is curious that nowhere any serious attempt is made to get at the root cause of the war—every one is trying to diagnose the evil by its symptoms: no one appears to care for its real cause. Perhaps the existing state of affairs is not propitious for that detatched condition of the mind which is necessary for the purpose. It is generally admitted that the tragedy of Servia was a mere pretext and that the real cause of the war lay elsewhere. But in vain one tries to find in the analysis on the side of the Allies anything beyond this that the war has broken out on account of German barbarism and German megalomania. Just before the war and in spite of the knowledge of the huge preparations for a life-and-death struggle that were being made by her, the people of Germany "were looked upon as the most cultured and

the most advanced of all western nations, who were the admired of all admirers, who have produced some of the greatest scientists, the greatest philologists, the greatest historians and the greatest psychologists of the present day, whose educational institutions were regarded as models and were thronged by students from all parts of the world"—in short before the outbreak of the war "Germany was worshipped as the apothesiosis of culture." But today the Germans are accused of committing all the sins and crimes that a nation can be conceived capable of committing—today they are the breakers of all laws, human and divine. Nowhere in the history of the world can be found such a sudden change—a change so sharp and clear—in the attitude of one nation or a set of nations against another nation. Yet the change has not come in a day. If the mind is divested of all the fearful events that have characterised this "Cataclysmal outburst of ruthless militarism"—if the mind is made to assume that detatched condition which is so necessary to arrive at a correct conclusion, it will be seen that the change has not come in a day but that the trend of occidental culture—all that that culture connotes and denotes—has been in the direction of a world-wide life-and-death struggle. Darwin's theory of the survival of the fittest—Bacon's motto—Man is the servant and interpreter of Nature—the writings of Nietzsche who boldly declared that let us have not contentedness, but more power, not peace but warfare, not virtue but efficiency; that the weak must perish! that is the first principle of charity; that war and courage have done more great things than love to the neighbour; that man should be educated for war, and woman for the recreation of the warrior; all these show the ethical condition of the west—they show the dominant trend of occidental culture.

The present war has shocked us—but it should not surprize us. It is only the logical sequence of a culture of which the latest High Priests have been men like Nietzsche, Treitschke and Bernhardi. Thousands, if not millions, of men and women have drawn their inspiration from the writings of these apostles of modern culture: indeed, it would not be wide out of the mark to say that the whole of the western world is even today steeped in the poisonous ideas and idea's preached by such writers—even now when perhaps humanity is crying louder than ever against warfare and its attending fearfulness—when everyone whether a belligerent or a neutral has grown sick of the whole thing—even now in their schemes for bringing about peace and maintaining it in the future, they are laying the foundation of a struggle more stupendous in extent and more terrible in intensity than the present one. Lord Robert Cecil in his statement just published regarding the reference to the economic leagues in President Wilson's reply to the Pope observes:—

"It is scarcely extravagant to say, that if the war continues many months longer the Central Powers will find literally the whole of the rest of the world arrayed in arms against them. That state of things gives rise to two observations.

"In the first place it shows that in the modern world military force is not everything and even if the Germans were really successful and invincible as the Kaiser and his Generals boast, Germany's future would still be increasingly dark. The second and more hopeful observation indicates perhaps the real solution of the greatest world problem of the day, namely, how we can take precautions to prevent future wars. The great difficulty of all schemes for leagues of nations and such like has been to find an effective action against nations determined to break peace. I do not wish now to discuss at length the difficulties of joint armed action, but everyone who has studied the question knows that they are very

great. It may be, however, that a league of nations, properly furnished with machinery for enforcing financial, commercial and economic isolation of the nation determined to force its will upon the world by mere violence would be a real safe-guard for the peace of the world."

Another writer writing on the same subject says in one of the leading papers of this country: "The Allies, America included, must look to their own safety and welfare after this war, and the bitter experience of the last three years has been entirely thrown away if they have failed to learn the lesson, that *they must be strong in arms* and in industry and commerce if they are to repel, with more success on future occasions, the surprise attacks of future assailants." Yet one does not know if these preparations, now intended for self-defence, will not be utilised in making an attaek on any other nation which may actually tresspass on the preserves of that nation or only supposed to do so. On the other hand President Wilson deems such "punitive damages, the dismemberment of Empires, and the establishment of selfish exclusive economic leagues to be inexpedient and ultimately worse than futile." This diversity in the views of the great problem of securing peace and avoiding warfare in the future shows that the peoples of the west are making a great effort to arrive at the truth and paradoxical as it may appear, it is in this diversity of opinions that the hope lies that the present struggle will form a conspicuous turning point on the road the peoples of the west are travelling towards their general betterment—in this diversity of views "we may catch the first low whispers of a wind which blows towards a lasting peace."

N. C.

Food Adulteration.

THE organised agitation against the adulteration of food especially *Ghee* has not come a day too early. On the other hand one may say that the agitation should have been commenced at least 20 years back when the evil effects of adulteration began to felt in the upper middle classes falling martyrs to dyspepsia.

Ghee is an article of every day diatry in the middle class and upper class household, and is also used for Hindu religious ceremonies. Both for food and for religious ceremonies we need pure and unadulterated ghee. Unfortunately unscrupulous traders and shopkeepers seldom sell the pure article. They mix with ghee every kind of abomination. To give our readers some idea of their work we quote the following from the Report of the Acting Health Officer of the Calcutta Corporation on the working of the Dhappa Skinning Platform (1906)—

"The period for the completion of the new installation at the Dhappa Skinning Platform for dealing with carcasses having expired. I inspected the arrangements now being conducted by the new lessees Messrs. Moll Skull Schitte & Co., on the 21st August with one of the firm who courtiously showed me the whole construction and explained in detail the new process adopted.

"The new building is situated on the other side of the canal some 400 yards further east than the old platform. It is on somewhat raised ground between the two canals.

"I may say at once that carcasses are being disposed of with the least possible annoyance, but as the carcasses are brought to the platform in various stages of decomposition it is manifest

that this business cannot be anything than unsavoury. It is this collection of carcasses which necessitates the platform being far removed from human habitations as the method of disposal does not itself add to the nuisance otherwise existing. The following is a brief description of the processes adopted—the carcasses are laid out on a cemented platform situated outside one end of the building. This is properly drained to an underground and covered cesspool which is periodically emptied into the adjoining outfall sewer canal. Here, on the platform, they are skinned, and, for purposes of convenience in packing into the skinning chamber, they are more or less divided up. The portions of several animals (up to 12 or 15) are then placed in a central compartment of a huge iron cylindrical vessel. The vessel is tightly closed down and steam under great pressure (60 lbs) is forced in. The action of the steam melts and dissolves up the flesh and breaks up the bones; and after about four hours this steam is cut off from the interior and fresh steam is forced only into the outer jacket with which the cylinder is provided. The heat from this second supply gradually dries up the mass of moist material in the central chamber and when sufficiently desiccated the resulting powder forms an artificial manure.

" During the first stage the fatty and gelatinous portions of the carcass are melted and disolved and the resulting mixed fluid is conducted to a resort where they are subsequently separated—the fatty material after purification being employed for several purposes and the gelatinous and gluey fluid being also rendered capable of use."

This report should be carefully read and read between the times.

The fatty matter thus obtained from the dead animals of Calcutta—the impure fat—says the Health Officer "is employed for several purposes." And one of the purposes is the adulteration of Ghee. Thus the Ghee that we—Hindus and Mehomedans use in our household is adulterated not only with foreign matter but with fatty matter got from the carcasses. Every horse, every cow, every pig, every dog that dies in Calcutta contributes its quota of fat which is mixed with the ghee we consume. It has been an open secret that the fat obtained from serpents is also freely mixed with ghee.

It is a matter of great surprise that the provision of the law does not preclude the possibility of unscrupulous traders palming off as ghee a mixture which contains only a small percentage of the real article. The Calcutta Corporation has—from time to time—prosecuted some ghee merchants and they have been found guilty. But they evade the law by putting on a board in some obscure corner of their shop that they sell not the pure article but "mixed ghee" that does not signify much to the average purchaser who pays for a poison which undermines his health and far from satisfies his religious scruples. In Great Britain law after law have been enacted to prevent adulteration of foodstuff. And the dealer who adulterates his butter with margarine is compelled to sell his butter not as butter, but as a mergarine. We can follow suit and here in India unscrupulous dealers should be compelled to sell their adulterated articles as the article used for purposes of adulteration.

In the markets pure and unadulterated food has become actually scarce and often it is difficult, if not impossible, to get the geunine article! This is a deplorable state of affairs which cries aloud for drastic remedies.

The people and the Government should act together in the matter. The Government can legislate; but without the co-operation of the people no legislation can be successful. And, what is more, in this matter the people—both Hindus and Mahomemdans—should revive the old system of social penalty. Thus and thus alone can we hope to succeed in the matter.

Hemendra Prasad Ghose.

WILLOW DROPS.

By RAM SHARMA.

PART III.

I

Ah me! what vision's this before mine eyes,
Like a bright presence shining from above?
It is thy radiant face, my sweet, I spy,
Called up by the spiritualism of love!

2

What, then, is absence? mere fancy, I ween,
Since thou art ever present in my heart;
The' time and space between us intervene,
I'd hold thee *there* as its most precious part.

3

A mystic spell, methinks, pervades my mind,—
Thou fillest all the circumambient space;
And Nature helps the dear deceit, I find,
By bearing thy sweet image in her face.

4

'Tis not the moon and stars that I behold,—
'Tis not the glories of earth that I see;
But nameless beauties, graces all untold,
Summed up in Small circumference in thee!

5

The balmy air is full of thee, my dear,
I but enhale thy breath in every breeze;
Thy witching voice in every grove I hear,
As music streams forth from the peopled tree.

6

The virgin lily and the blushing rose;
The ripe red *Bimba* with its brilliant hue;
The lotus as in morning beam she glows;—
These only bring thy glories to my view.

7

And Oh the vision that still haunts my sight!
I see thee dove—like nestling in my breast,
And in those moments joyous—happy—bright,
When time we sped caressing and carest.

8

I see thee sitting thro' the sultry hour
Of noon—alone—unoped the scattered books—
Like lovely Seeta in her prison bow'r,—
A perfect statue glancing marble looks!

9

I see thee droop—I see thee pine away—
A flower canker-eaten in its pride;
And yet, alas! thy lips refuse to say
The word that brings thy lover to thy side.

10

I see thee at eve, from thy casement high,—
Another ev'ning star—as lovely—fair—
Seeking, as thou wert wont in days gone by,
Him who perchance no more may wander there.

11

At thine own shadow now I see thee start,
Anon in bed I see thee restless lie;
Is that a sigh now breaks out from thy heart?
Is that a tear now glistens in thine eye?

12

I haste—I fly with all a lover's speed,
To soothe thy lab'ring bosom heaving high—
To kiss away the tear-drop from thy lid;—
But ah me! where art thou, and where am I?

13

Lo, Recollection, like a wizard grim,
Dissolves the magic shadows fast away,—
Dissolves the vision—melts the fairy dream,
And shows me to myself,—castaway!

14

Avaunt, ye idle dreams—Visions Vain!
Away. thou false mirage by Fancy wrought
To deeeive my distracted, wild'ring brain
With hopes that cheer, but soon resolve to nought

15

Now change the scene—What do my eyes survey?
Such living constancy as mine to thee?
'Ah, no! False girl, I see thee blithe some—gay—
With scarce a thought that fondly dwells on me!

16

Blithe as the lark when morn appears in view—
Gay as the butterfly in summer grove;—
Raising the hopefull Phœnix of a new,
From out the ashes of thy former, love.

17

I see thy head laid on another breast ;
Another heart now beating close to thine ;
Another arm entwined around thy waist ;
Other lips pressing those that once were mine !

18

Enough ! I can't endure the maddening sight,
Despair ! Be propitious to my mind ;
Thy gloom is better far than Hope's best light,
Which, like the false lanthorn, misleads, I find.

19

And what of thee, poor fickle heart ? forget
The past with all its joys so rich and free ;
Forget—if thou canst—that we ever met,
Or ever felt passion's wild ecstacy !

20

For me, my love is boundless as the main ;
Unfathomable as the self-same deep ;
Still true to thee, inspite of change and wane,
As the sea to you born in heaven's steep.

21

Not more the needle faithful to the pole,
Or his own flower to the god of day,
Than is to thee, dear girl, my constant soul,—
Thine, thine alone till freed from mortal clay.

22

If highest faith means faith in one alone,
That faith is mine,—my, mine it needs must be ;
For all these years one goddess have I known,
One only loved—adored, and thou art o he !

23

Had I worshipped kind Heav'n with half the zeal,
Half the devotion I have spent on thee,
Sainthood would be mine ; but I knelt—state kneel
To thee, a passionate, lost devotee.

24

Lost ! ay, hopelessly lost ! and I but muse
On the past with a burning, wild emotion ;
My wreath of love turned to a throttling norse,—
My nectar'd cup to deadly poison potion.

25

The rose hath thorns ; there's madness in the vine ;
The vivid lightning is alive with death ;
The emerald sea is all full of brine ;
And Beauty—isn't thy other name Unfaith ?

26

There are bright eyes that fondly. kindly smile,
There are sweet lips whose nectar might be mine ;
But nought, alas ! can my sad soul beguile :—
Though scorned and sparned, still—still 'tis wholly thine.

27

Oh what a miracle of eyes hath love !
Where'er I turn my steps—direct my gaze.
In crowded street, or lonely walk, or grove,
I see thy face as through a starlit haze.

28

It shines in all its glory most at night,
And then I see two moons ;—one far on high,
The other in my breast :—delusive sight,
That ever mocks and flouts the inner eye !

29

And yet my thoughts, all loyal to thy soul,
Have by a mystic law around thee spun
Through the long years as tardily they role,
Like planets ever circling round the sun.

30

Oh what a miracle of sense is love !
'Tis passions' highest phase Its power is such,
The lowest hill, and highest heav'n above,
Meet in the soul that's kindled by its touch.

31

That heaven once was mine when thou wert kind,
I now endure that hell's deep agony :
Alas, my very senses now I find
In unholy league with mine enemy !

32

O disenchant the charm that thou hast thrown
Around my soul—unweave the magic chain !
Delighted thou to see me pine alone ?
Triumphest thou over my grief and pain ?

33

With me,—in happier days thou oft hast said,—
The desert drear were paradise to thee
Now reft of thee, thou cruel, heartless maid,
'The world's a wild Sahara unto me !

34

Love—mem'ries, like lines writ in air or water,
Have faded from thy mind too soon, alas !
In mine they live in lasting character,
Like deep—cut prints on monumental brass.

35

Would I could seep in some Lethean stream
The memory of bless enjoyed with thee,—
Drug all thought—drug the ever—wakeful dream
That reproduces all the past to me !

36

Whene'er thy change my pensive heart deplores,
This sad reflection tinges every thought :
Can memory be stilled by sudden force ?
Can tenderness so soon be quite forgot ?

37

Take back thy vows, false fair, give back my heart!
In mercy, let me be myself again!
But, then, to live a life from thee apart,
Will that be life? Rather existence vain!

38

Oh! my mind wanders. Can I ever free
Thee from the vows of love thou once hast made?
No—no! They are as rose-scents unto me—
They cheer, though the rose of thy love be dead!

39

Perchance thy strangeness may be simple feigning,
Put on to try my truth, though proved too well:
But think, O think, suspense the while is draining
My life—blood like a rav'ning vampire fell.

40

Perchance when I am gone thou mayst relent—
The dead more than the living may thee melt;
Perchance thy stubborn heart may then be bent,
And pangs unknown to thee be keen'ly felt!

41

No more! I lay my mournful harp aside,—
Be hushed its voice awhile in silent slumbers:
The hand now falters that its strings did guide,
The heart now fails that waked its plaintive numbers.

42

And O Farewell! however I may fare,
I wish thee well, false—fickle as thou art:
Oh! may thou never—never know despair—
The black hell of a broken, blasted heart!

43

May every earthly happiness be thine!
May ne'er a cloud o'ershade thy sunny brow!
May a world's love around thee fondly twine!
May Heav'n keep thee in charge! So farewell now!

44

Farewell! Ev'n to my life's last flicker, dear,
Enthroned thy image in my soul shall be;
With my last gasp—my last sad, parting tear—
These lips shall breathe a fervent pray'r for thee!

A New Remedy for Malaria.

Exceedingly Pleasant.

THE current number of the *Indian Medical Journal* has an Article on malaria. The article, written by Dr. Horace Willis of Assam, deals with a new specific for the disease and recounts how he had come to the conclusion, based on the unsatisfactory results given by quinine both as a prophylactic and a cure, that as the destruction of the red blood corpuscle prevented the most prominent feature of malarial infection, the obvious treatment of the disease lay, not in causing its further decrease by the administration of quinine—as several authors agree it does—but in re-building this most important structure of the life stream. "For this purpose I cast about in my mind," says the writer, "for those natural constructants that are known to improve the quality of the blood. Salts of various descriptions were, therefore, of the first consideration, and to procure these in the crude natural form necessitated a considerable amount of study into the Indigenous products of India."

In showing how he arrived at the materials for his remedy the writer says: "It was a deeply rooted conviction in my mind that as the disease was indigenous to the country so must also the remedy be. With the assistance of my wife as an Urdu scholar, it greatly simplified my researches in this direction as she was able to read in old medical books of various natural salts, lime-minerals, barks, herbs, and fruit juice, that had for hundreds of years been used with success by the Indians for various diseases. On the suggestion of my wife I concocted a mixture from the raw juice of a certain species of lemon, a quantity of crude bi-borate of sodium, and the sulphate, phosphate, and chloride of calcium. The combination was at first

incompatible, but by experiment and perseverence, I ultimately produced a clear brandy-coloured liquid, and with the approval of the I. G. C. H., Burma, proceeded to experiment with this mixture upon twenty-three men in my battalion who were being invalided from the service as incurable from Malarial Cachexia." All the twenty-three cases rocovered, some later than others, but all certainly for none of the men relapsed.

Dr. Willis goes on to deal with his experience in treating the ordinary malaria fever cases. He says: "Up to this time (1905) the specific had been used only in those cases accompanied by splenic enlargement and diagnosed as "Spenic and Malarial Cachexia" by these officers, and I now thought that by the addition of iron and antimony (vinum) it might possibly have as gratifying a result, in only the fever cases. I made the addition and tried the new mixture on every type of malaria, with, in every case, uniform and perfect results, I found that in hyperpyrexia it acted as a diaphoretic, and quickly broke the temperature permanently even in those cases that had no splenic enlargement, while in the cases where enlargement was very marked the spleen became normal in from four to six weeks. From 1901 to 1913, as a Civil Surgeon and in various other medical appointments in Burma, I used only this mixture in my practice and in my hospitals, and in all those years I never had a single failure. . . . . I have no hesitation in stating that I can record many therapeutical advantages not only over quinine, but over the recently invented tartar emetic by intravenous injection." And he mentions one advantage which will appeal to patients—it is exceedingly pleasant to take.

Education and Religion.

I.

IN the July issue of Mahamandal Magazine Sjt. Kunjabihari Bose has dealt with "Education and Religion" in the true Indian light and we reprint it for the edification of our readers.

A few years ago, I was led by circumstances to make a study of system of education pursued in the old Sanskrit Tols of Bengal which may, perhaps, be called the ancient Universities of that part of India. Many of them still exist in different parts of the Province and give some faint idea of what they were in the days when they were centres of light and learning. They are certainly an interesting study and what struck me most about them at the time was the curious and complete contrast they presented in almost every point to the Indian Universities in modern days. They were opened only to a single caste. Only Brahmans were allowed to study there, while the modern University is open to all classes and all creeds. The course of study lasted normally about 25 years, and might be continued for a good deal longer; whereas the course of a modern University is hurried through in 4 or 5 years at the most. The students were all educated free and supported by their teachers (still the system is in existence), whereas the students of a modern

University have to pay fees and support their professors. The course of study was confined to the sacred books of Hinduism and consisted entirely of Philosophy, Logic, and Grammar; whereas the course in a modern University includes a comprehensive study of the facts and laws of nature, and human history. The method of study, too, consisted very largely of discussions and disputations, which apparently led to fierce quarrels and factions, and occasionally, I believe, even ended in blows. When I was engaged in educational work in Bengal I used often to wish that a little of this excessive zeal for truth could have been infused into the modern Indian student. I am afraid in this respect he compares somewhat unfavourably with his ancestor in the Sanskrit Tols, and I think it would be a very hopeful sign if I heard one morning that there had been a riot in Calcutta or anywhere else owing to a dispute among the students of the University over the subject of the freedom of the will or the nature of the Absolute. And the most striking difference of all was that in the old Sanskrit Tols there was an entire absence of the spirit of utilitarianism. So far as I could gather, the course of study from a worldly point of view seemed to be of no practical use whatever. The object of the students in going through it was not to get a post under Government or further their worldly interests, but to save their souls. I need hardly remark that the object with which a modern Indian student wishes for a B. A. degree has very little connection with his spiritual and religious state in the future. Now there can be no doubt that, looking at the two systems of education the modern University has seldom any connection with the Sanskrit Tol. The object of education in the former is to prepare the young for the work, life and responsibilities of manhood or womanhood. But the course of study in a Sanskrit Tol is entirely out of touch with practical life. It leads the student into a region of abstract thought and involves him in a maze of verbal controversies and hair-splitting disputes which have no relation to man's practical duties and responsibilities in the present world, and its exclusiveness is fatal to its freedom. The mere fact that the Tol is limited rigidly to a single caste is quite enough to rob it of that atmosphere of freedom which is essential for the true development of thought. At the same time, with all its narrowness and pedantry I cannot help feeling a lurking regard for those old-fashioned institutions. There is something very refreshing in the thought of those keen, eager discussions, even though they may have been about verbal trifles and abstract principles, and one cannot restrain a sigh of regret for the days when students were so zealous in their pursuit of truth that they actually fought over their rival theories. And then the Sanskrit Tol, with all its defects and failings, thoroughly grasped one great truth, which un-happily our modern Univsrsities under the stress of circumstances have abandoned. They assumed as a matter of course that man is a religious being, that religion is the most important part of human life, and that every true system of education must be based and grounded upon religion. And however much they may have exaggerated and perverted this truth in applying it to their system of education, still, the principle itself is sound and cannot be abandoned without great injury to education.

In the first place, religion is undoubtedly one of the most powerful instruments for forming and elevating character. And education can ill-afford to lose any help that it can get in this most difficult part of its work. [The universal experience of the race is that naturally, left to itself, the moral tone of] every society tends to degenerate. Ancient literature both of East and West is on this point uniformly pessimistic. The "succession of the ages is never from the iron to the golden, but always from the golden to the iron. And every one

who has had any practical experience of education will bear me out in saying that by far the most difficult part of a schoolmaster's work is the effort to influence for good the lives and characters of his pupils. I can only say for myself that during the long time that I was engaged in the Education department" I can confidently say the mere teaching was by far the easiest and least anxious part of my work. The work that beyond all comparison was the most difficult, caused the deepest anxiety, and often, I must add, the most bitter disappointment, was the constant effort to my students a high moral tone and make them honest, pure, temperate, truthful and unselfish. And if I had not been able to use to the full the vast moral force, that Sanatan Dharma imbibed in me, I must confess without reserve that I should have given up the task in despair with all the help that the Hindu religion could give me, the effort to fight against the enormous powers that make for evil in lives and characters of the young was difficult and at times discouraging. Without that help, to me it would have been impossible. For that reason, then alone I feel that it is difficult to overestimate the loss to the higher education of India that arises from the simple fact that it is compelled to ignore religion.

But there is another reason besides this why the non-religious character of our higher education in India is greatly to be deplored. After all, religion is a great part of life. Of course if a man does not believe in God or in the possibility of knowing God: if he holds that, even if God exists, man can come into no personal relations with Him; if he looks upon religion, therefore, as a mere parasite of human life, a noxious weed to be rooted out, or a delusion to be exposed and banished—then naturally he will take a very different view of the value of religion and the part of it ought to play in education. But if God exists, if He may be known, if He has revealed Himself to man, if He really rules and governs the Universe, if our duty to Him is the highest and most binding of all duties and obligations; if the life we now live on earth is the preparation for a fuller, richer, and more enduring life in the world beyond the grave; if time is but the ante-chamber of the eternity there can surely be no doubt or question but that the knowledge of God is the one form of knowledge which man cannot afford to be without; that man's duty to God is the one form of duty which it is of supreme importance for him to know and fulfil, and that the reverence, fear and love of God, are the highest and noblest qualities of the human character. And if that is so, then education which ignores religion is ignoring the chief part of life. It may prepare young men to be clerks, magistrates, lawyers, doctors, etc., but it does not in the highest and truest sense prepare them for the responsibilities of life. And I would venture to maintain, what perhaps may seem rather paradoxical, that life without religion is a different thing from life with religion. Human life is essentially an organic whole. The higher principles are not added to the lower, like the top storeys of a house to the lower storeys: but they enter into them, take them up and transform them into something higher. A man does not differ from one of the lower animals simply from the fact that he has reason and conscience *plus* the passions, desires, and lower faculties in man are themselves so transformed and transfigured by reason and conscience that they are raised up to a higher level and become something widely different to what are in the ape or the dog.
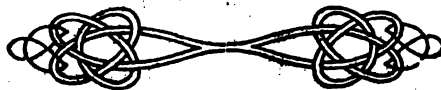
A New Industry.

Manufacture of Strawboards.

A Bombay Government press *communique* states:—An industry that has not hitherto met with the attention it deserves in this country is the manufacture of strawboards, of which large quantities, amounting in value to about 8½ lakas of rupees in 1913-14, are imported into India. The chief exporting countries, prior to the war were Holland, Germany and the United Kingdom. Recently imports from Japan are noticed to have been increasing with great rapidity. The purposes for which strawboards are used are mainly packing yarn in bundles, book-binding, constructing cardboard boxes and mounting pictures. There must, therefore, always be a large demand for this article, the local manufacture, of which should repay the investment of capital in this country. The chief raw materials required are straw and lime, the straw being converted into pulp by digesting with lime and water ("milk of lime"). The following is a brief description of the process obtained from the Imperial Institute :—

"The straw is chopped into pieces from 1 to 2 inches in length and is placed in revolving boilers with the 'milk of lime.' About 600 gallons of water and 2 to 4 cwt. of lime are used for each ton of straw. The charge is digested in the boilers for about 4 hours with steam at a pressure of 60tb. per square inch, and is then discharged. The digested straw is converted into pulp by treatment in an edge runner mill, or in beating mahcines. The pulp thus obtained is used for the manufacture of boards and coarse packing papers.

"A ton of straw is stated to yield from 12 to 14 cwt. of pulp suitable for the manufacture of strawboard. The pulp is run on to a paper-making machine where the water is removed, and is then built up into boards of the desired thickness by winding it round a press roll. The boards are dried in hot-air chambers or in the open air."

Straw is also used in Europe, in addition to its use for the production of boards and packing paper, for the manufacture of higher grade paper, comparable with esparto papers, for which purpose however it is digested with a solution of caustic soda instead of with milk of lime.

From enquiries made by the Bombay Indigenous Industries Committee, it has been ascertained that the cost of machinery for the production of both paper and boards on a moderately large scale would be about three lakhs of rupees at the present timo, excluding freight, the cost being reduced by about 12 per cent. if the plant is required for the production of boards only. This is, however, not recommended, as the production of paper is said to be more profitable than of boards. The plant has been specially designed for the treatment of straw, grass and like material by a very cheap process.

Ruskin on Work.

II. I pass then to our second distinction between the rich and poor, between Dives and Lazarus,—distinction which exists more sternly, I suppose, in this day, than ever in the world pagan or Christian, till now. I will put it sharply before you, to begin with, merely by reading two paragraphs which I cut from two papers that lay on my breakfast table on the same morning, the 25th of November, 1864. The piece about the rich Russiau at Paris is common place enough, and stupid besides ; (for fifteen francs,—12s. 6d.,—is nothing for a rich man to give for a couple of peaches out of season). Still, the two paragraphs printed on tha same day are worth putting side by side.

'Such a man is now here. He is a Russian, and, with your permission, will call him Count Teufelskine. In dress he is sublime ; art is considered in that toilet, the harmony of colour respected, the *chiar' oscnro* evident in well-selected contrast. In manners he is dignified—nay, perhaps apathetie ; nothing disturbs the placid serenity of that calm exterior. One day our friend breakfasted *chez* Bignon. When the bill came he read, "Two peaches, 15f." He paid. "Peaches scarce, I presume?" was his sole remark. "No, sir," replied the waiter, "but Teufelskines are." '—*Telegraph*, November 25, 1864.

'Yesterday morning, at eight o'clock, a woman, passing a dung heap in the stone yard near the recently-erected alms-houses in Shadwell Gap, High Street, Shadwell, called the attention of a Thames police-constable to a man in a sitting position on the dung heap, and said she was afraid he was dead. Her fears proved to be true. The wretched creature appeared to have been dead several hours. He had perished of cold and wet, and the rain had been beating down on him all night. The deceased was a bone-picker. He was in the lowest stage of poverty, poorly clad, and half-starved. The police had frequently driven him away from the stone yard, between sunset and sunrise, and told him to go home. He selected a most desolate spot for his wretched death. A penny and some bones were found in his pockets. The deceased was between fifty and sixty years of age. Inspector Roberts, of the K division, has given directions for inquiries to be made at the lodging-houses respecting the deceased, to ascertain his identity if possible.'—*Morning Post*, November 25, 1864.

You have the separation thus in brief compass ; and I want you to take notice of the "a penny and some bones were found in his pockets," and to compare it with this third statement, from the *Telegraph* of January 16 of this year :—

'Again the dietary scale for adult and juvenile paupers was drawn up by the most conspicuous political economists in England. It is low in quantity, but it is sufficient to support nature : yet, within ten years of the passing of the Poor Law Act, we heard of the Paupers in the Andover Union gnawing the scraps of putrid flesh, and sucking the marrow from the bones of horses which they were employed to crush.'

You see my reason for thinking that our Lazarus of Christianity has some advantage over the Jewish one. Jewish Lazarus expected, or, at least, prayed, to be fed with crumbs from the rich man's table ; but *our* Lazarus is fed with crumbs from the dog's table.

Now this distinction between rich and poor

rests on two bases. Within its proper limits, on a basis which is lawful and everlastingly necessary; beyond them, on a basis unlawful, and everlastingly corrupting the frame-work of society. The lawful basis of wealth is, that a man who works should be paid the fair value of his work; and that if he does not choose to spend it to-day, he should have free leave to keep it, and spend it to-morrow. Thus, an industrious man working daily, and laying by daily, attains at last the possession of an accumulated sum of wealth, to which he has absolute right. The idle person who will not work, and the wasteful person who lays nothing by, at the end of the same time will be doubly poor—poor in possession, and dissolute in moral habit; and he will then naturally covet the money which the other has saved. And if he is then allowed to attack the other, and rob him of his well-earned wealth, there is no more any motive for saving, or any reward for good conduct; and all society is thereupon dissolved, or exists only in systems of rapine. Therefore the first necessity of social life is the clearness of national conscience in enforcing the law—that he should keep who has JUSTLY EARNED.

That law, I say, is the proper basis of distinction between rich and poor. But there is also a false basis of distinction; namely, the power held over those who earn wealth by those who levy or exact it. There will be always a number of men who would fain set themselves to the accumulation of wealth as the sole object of their lives. Necessarily, that class of men is an uneducated class, inferior in intellect, and, more or less, cowardly. It is physically impossible for a well educated, intellectual, or brave man to make money the chief object of his thoughts; as physically impossible as it is for him to make his dinner the principal object of them. All healthy people like their dinners, but their dinner is not the main object of their lives. So all healthily minded people like making money—ought to like it, and to enjoy the sensation of winning it: but the main object of their life is not money; it is something better than money. A good soldier, for instance, mainly wishes to do his fighting well. He is glad of his pay—very properly so, and justly grumbles when you keep him ten years without it—still, his main notion of life is to win battles, not to be paid for winning them. So of clergymen. They like pew-rents, and baptismal fees, of course; but yet, if they are brave and well educated, the pew-rent is not the sole object of their lives, and the baptismal fee is not the sole purpose of the baptism; the clergyman's object is essentially to baptize and preach, not to be paid for preaching. So of doctors. They like fees no doubt,—ought to like them; yet if they are brave and well educated, the entire object of their lives is not fees. They, on the whole, desire to cure the sick; and,—if they are good doctors, and the choice were fairly put to them—would rather cure their patient, and lose their fee, than kill him, and get it. And so with all other brave and rightly trained men; their work is first, their fee second—very important always, but still *second*. But in every nation, as I said, there are a vast class who are ill educated, cowardly, and more or less stupid. And with these people, just as certainly the fee is first, and the work second, as with brave people the work is first, and the fee second. And this is no small distinction. It is the whole distinction in a man; distinction between life and death *in* a man; between heaven and hell *for* him. You cannot serve two masters:—you *must* serve one or other. If your work is first with you, and your fee second, work is your master, and the lord of work, who is God. But if your fee is first with you, and your work second, fee is your master, and the lord of fee, who is the Devil; and not only the Devil, but the lowest of devils—the 'least erected fiend that fell.' So there you have it in brief terms; Work first—you are God's servants; Fee first—

you are the Fiend's. And it makes a difference, now and ever, believe me, whether you serve Him Who has on His vesture and thigh written, 'King of Kings,' and whose service is perfect freedom; or him on whose vesture and thigh the name is written, 'Slave of Slaves,' and whose service is perfect slavery.

However, in every nation there are, and must always be, a certain number of these Fiend's servants, who have it principally for the object of their lives to make money. They are always, as I said, more or less stupid, and cannot conceive of anything else so nice as money. Stupidity is always the basis of the Judas bargain. We do great injustice to Iscariot, in thinking him wicked above all common wickedness. He was only a common money-lover, and, like all money-lovers, did not understand Christ;—could not make out the worth of Him, or meaning of Him. He didn't want Him to be killed. He was horror-struck when he found that Christ would be killed; threw his money away instantly, and hanged himself. How many of our present money-seekers, think you, would have the grace to hang themselves, whoever was killed? But Judas was a common, selfish, muddle-headed, pilfering fellow; his hand always in the bag of the poor, not caring for them. He didn't understand Christ;—yet believed in Him, much more than most of us do; had seen Him do miracles, thought He was quite strong enough to shift for Himself, and he, Judas, might as well make his own little bye-perquisites out of the affair. Christ would come out of it well enough, and he have his thirty pieces. Now, that is the money-seeker's idea, all over the world. He doesn't hate Christ, but can't understand Him—doesn't care for Him—sees no good in that benevolent business; makes his own little job out of it at all events, come what will. And thus, out of every mass of men, you have a certain number of bagmen—your 'fee-first' men, whose main object is to make money. And they do make it—make it in all sorts of unfair ways, chiefly by the weight and force of money itself, or what is called the power of capital; that is to say, the power which money, once obtained, has over the labour of the poor, so that the capitalist can take all its produce to himself, except the labourer's food. That is the modern Judas's way of 'carrying the bag,' and 'bearing what is put therein.'

[*To be continued.*

প্রথম বর্ষ। | ফাল্গুন। | প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। | | নবম সংখ্যা।

বহাম্যহং।

(শ্রীশ্রীভক্তমাল অবলম্বনে।)

রজনী তমিস্র—
গীতার ভাষ্য রচনে মগ্ন
সাধু অর্জ্জুন মিশ্র ;
"বহাম্যহং"—পাঠ নিরখি'
পণ্ডিত-হৃদি উঠিল চমকি',
চিন্তিয়া বলে—অধিক কব কি,
এই পাঠ অবিমৃষ্য।
কেমনে বুঝিব, কেমনে বুঝাব
কথাটি যে বড় শক্ত,
কি করিয়া ইহা প্রত্যয় করি
বোঝা বহি' হরি স্কন্ধ উপরি—
দিবেন তাহার ভাণ্ডার ভরি'
যে জন তাঁহার ভক্ত।
শ্রীহরি উপর করি' নির্ভর
স্থির কর যদি চিত্ত,
তবে ভগবান হইয়া সহায়
মুক্ত করিতে ভক্তের দায়
পরোক্ষে তাহার করেন উপায়
ইহাই সত্য নিত্য।
দেন নারায়ণ জানে সব জন,
—তবু চাই উপলক্ষ্য,
বহাম্যহং পাঠ এই তবে
সমীচীন পাঠ কখনো না হবে,
—নিখিলের প্রভু কভু কি সম্ভবে,
নিজে বহিবেন ভক্ষ্য ?
এতেক বিচারি' পণ্ডিতবর
করিয়া মধুর হাস্য,
তীক্ষ্ণ লেখনী হস্তে ধরিল
বহাম্যহং পাঠ কাটি' দিল
"দদাম্যহং" নূতন লিখিল,
বিরচিল নব ভাষ্য।
প্রত্যূষ হ'লে ব্রাহ্মণী বলে
ঘরে নাহি যে গো অন্ন,
সাধু হাসি' তারে অকাতরে ক'ন
এ কথাটা মোটে নহে গো নূতন
ভিক্ষায় তবে চলিনু এখন
ভাবনা কি তার জন্য।
নাহিক বিরাম, গাহি হরিনাম
সাধু করিছেন ভিক্ষা,
"ওহে নারায়ণ নিখিল-কারণ
দাতারূপে ধন কর বিতরণ

দীনরূপে পুনঃ করিছ গ্রহণ
নরে দিতে দয়া শিক্ষা।”
হায়, বিধি বাম, একি অবিরাম
দুর্য্যোগ ঝড়-বৃষ্টি,
সাধু ফিরিছেন দ্বার হ’তে দ্বারে,
শ্রান্ত চরণ চলিতে না পারে
ভিক্ষা-মুষ্টি মিলিল ত না রে,
যেন এ শনির দৃষ্টি।
হেথা ব্রাহ্মণী সাধুর গৃহিণী—
রয়েছে চিন্তামগ্ন,
বলে, দয়াময়, কোথা তবে যাই,
ঘুচিল না এই নিত্য নাই-নাই,
তোমার চরণে তবে কি বৃথাই,
মোদের চিত্ত লগ্ন।
বেলা বয়ে যায়, গৃহিণীর হায়,
চিন্তার নাহি অন্ত;
হেন কালে দুটি শিশু সুকুমার—
বহি’ আনি’ নানা দ্রব্যের ভার—
কহিলা, জননি! জানিও তোমার
ভাণ্ডার অফুরন্ত।
ভাসি’ আঁখিজলে নারী তবে বলে
একি অপরূপ কাণ্ড!
লীলাময়, আজি কি লীলা তোমার,
এ দ্রব্য-সম্ভার কেন ঘরে তার
সারাটি জীবন কাটিল যাহার
লইয়া ভিক্ষা-ভাণ্ড।
কিবা মনোহর যুগল কিশোর—
অনিন্দ্য-সুন্দর কান্তি,
কে তোরা রে বাছা, কাহার তনয়
নরে হেন রূপ সম্ভব না হয়
ভরিল হৃদয়, হইল উদয়
অন্তরে চির-শান্তি।
আহা, একি! একি! রক্ত-ধারা দেখি!
কেন রে তোদের বক্ষে,
কে বা নির্দ্দয় আছে তার মত—
যে জন করেছে এ হৃদয় ক্ষত,—
ধরায় না দেখি কোন কার্য্য ত—
অসাধ্য তাহার পক্ষে।
বলে শিশুগণ, কর মা শ্রবণ—
কেবা সেই ক্রূর হিংস্র,—
তীক্ষ্ণ শলাকা বক্ষে মারিয়া
স্কন্ধে মোদের গুরু-ভার দিয়া—
বলিল হেথায় আনিতে বহিয়া
সাধু অর্জ্জুন মিশ্র!

এত বলি’ হায়, তারা চলি’ যায়,
নারী ভাবে নিরানন্দ—
“পতি যে আমার পুণ্য আধার,
জানে না কখনো ক্রূর ব্যবহার,
কি জানি কেন গো আজি এ তাঁহার—
ঘটিল বুদ্ধি মন্দ।”
গাহি’ হরি-গুণ আসে অর্জ্জুন—
কিছুতেই নহে ক্ষুণ্ণ,
বলে, ব্রাহ্মণী, না দেখি উপায়
এ ঝড়-বাদল করিয়া মাথায়
ঘুরিলাম এত, তবু দেখ হায়,
ভিক্ষার ঝুলি শূন্য!
গৃহিণী শুধায় ক্ষুধার জ্বালায়
হ’রাইলে হায় ধর্ম্ম!
পাঠাইলে দুটি কিশোর-কুমার
স্কন্ধে চাপায়ে বোঝা গুরু-ভার
বক্ষে তাদের পড়ে রক্ত-ধার—
এই কি তোমার কর্ম্ম?
শুনি বিবরণ মিশ্র তখন
বুঝিল সকল স্পষ্ট,
কাতরকণ্ঠে কাঁদিল আতুর—
“ওগো, দয়াময়, দীনের ঠাকুর,
সন্দেহ মোর করিবারে দূর,
সহিলে কত না কষ্ট!
স্থির জানিলাম হ’তে ভগবান্
গীতা নহে কভু ভিন্ন
ভগবদ্গীতা—গ্রন্থ প্রধান,
ভগবদ্গীতা—নিজে ভগবান্,
এ মহা-সত্য করিতে প্রমাণ,—
হরি ধরিলেন চিহ্ন।
গীতার বচন মানে না যে জন
অধম সে পশুতুল্য,
সে জন নিত্য সংশয়-বশ,
চিত্ত তাহার শুষ্ক নীরস,
—ভক্তি-বিহীন বিস্তার যশ(ঃ)
কিছু নাহি তার মূল্য।
আজি জানিলাম, আজি মানিলাম,
নিগূঢ় পরম-তত্ত্ব,
বহাম্যহং পাঠ যে প্রাচীন
ভাবে—গৌরবে—অর্থে প্রবীণ
বহাম্যহংই পাঠ সমীচীন—
বহাম্যহংই সত্য।”

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

[সম্পাদক।]

৯

ক্ষত্রিয়।

ব্রাহ্মণের গুণাগুণ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। এইবার অন্যান্য জাতির কথা আলোচনা করিব। যাহাদের সত্ত্বগুণোপেত রজোগুণ প্রবল অর্থাৎ যাহাদের ধর্ম্মজ্ঞানও আছে আবার বিষয়াসক্তিও আছে, তাহারাই ক্ষত্রিয়; ইহাদের রজোগুণপ্রভাবে শৌর্য্য, বীর্য্য, অহঙ্কার, চাঞ্চল্য, যত্ন, কার্য্যদক্ষতা, প্রভুত্ব, তাড়নশীলতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি গুণ ধর্ম্মের সহিত জড়িত থাকে। ক্ষত্রিয়-জাতি কামভোগে রত, উগ্রপ্রকৃতি, সাহসী, ক্রোধী, বীর এবং রক্তবর্ণ অর্থাৎ রজোগুণপ্রধান। ধর্ম্মবুদ্ধির সহিত এই গুণগুলির বিকাশ করা কঠিন। ইহা বিশেষ প্রযত্নসাপেক্ষ। পুরুষানুক্রমে অনুশীলনদ্বারা এই গুণগুলি মানব-প্রকৃতিতে সহজাত হইতে পারে। সেই জন্য গীতায় উক্ত হইয়াছে,—

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥

ক্ষত্রিয়ের স্বভাব বা প্রকৃতিগত গুণ হইতে এইগুলির উদ্ভব হয়,—শৌর্য্য (নির্ভীকতা), তেজ (প্রতিপক্ষের উপর প্রভাববিস্তার করিবার ক্ষমতা), ধৃতি (ধৈর্য্য বা অবসাদ-শূন্যতা), দাক্ষ্য (কার্য্য সম্পন্ন করিবার কৌশল ও বন্দোবস্ত করিবার ক্ষমতা—power of organisation), যুদ্ধে অপ-রাঙ্মুখতা, মমতাশূন্য হইয়া দান করিবার প্রবৃত্তি এবং অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণোচিত গুণও ক্ষত্রিয়ে থাকা চাই। নতুবা ক্ষাত্রভাব আসুরভাবে পরিণত হয়। এই শক্তিগুলি ক্ষত্রিয় অনুশীলনদ্বারা লাভ করিবে না, উহা আপনাপনিই কৌলিকশক্তিরূপে তাহাতে প্রকাশ পাওয়া চাই। কাজেই ক্ষত্রিয়রা একটা স্বতন্ত্র জাতি হইল। তাহাদের ব্রাহ্মণজাতির সকল অধিকারই রহিল, কেবল যজন-যাজন ও অধ্যাপনার অধিকার রহিল না। যাহার রজোগুণ প্রবল, তাহার যজন-যাজনে অধিকার নাই।

অধ্যয়ন, যজন ও দান, এই তিনটি কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। কিন্তু ক্ষত্রিয় কখনই অধ্যাপন, যাজন ও প্রতিগ্রহ করিতে পারিবেন না। ক্ষত্রিয় শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু ছাত্র পড়াইতে পারিবেন না। কারণ, সাত্ত্বিকী বুদ্ধি প্রবল না হইলে শাস্ত্রের অধ্যাপনা করা যায় না। ক্ষত্রিয় নিজগৃহে যজ্ঞ, হোম, পূজা করিতে পারেন, কিন্তু পৌরোহিত্য করিতে পারেন না। ক্ষত্রিয় কখনই যাচ্ঞা করিবেন না। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে। সামাজিকদিগের পরস্পরের মধ্যে যাহাতে বৃত্তি লইয়া বিরোধ উপস্থিত না হয়, ঋষিগণ সেইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তি লইয়া এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের যদি বিরোধ ও বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে সমাজে কিরূপ অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে, য়ুরোপে তাহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত বিরাজিত। তথায় বৃত্তি লইয়া পরস্পর মারামারি—কাম্ড়াকাম্ড়ি যে কত চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে খুব ক্ষমতা দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে যে বৃত্তি দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ধনাঢ্য বা ধনগর্ব্বিত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ব্রাহ্মণ অধ্যাপনা করিবেন, শিষ্যদিগকে নিজ আশ্রমে পুত্রবৎ প্রতি-পালন করিবেন, কিন্তু ছাত্রদিগের নিকট হইতে রীতিমত ফিস্ বা বেতন লইতে পারিবেন না। অধ্যয়ন শেষ করিলে পর ছাত্রের কিঞ্চিৎ গুরুদক্ষিণা দিবার ব্যবস্থা ছিল। তাহা শিষ্যের সামর্থ্যোপযোগী। তবে ক্রিয়াকর্ম্মে পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়ের ব্যবস্থা ছিল। অধ্যাপক ব্রাহ্মণরা তাহাতে কিছু কিছু পাইতেন। তাহা হইতে এবং যাজনক্রিয়া হইতে যাহা কিছু আয় হইত, গৃহী ব্রাহ্মণ তদ্দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ, পরিবার পোষণ ও ছাত্রপালন করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের ধনাঢ্য হইবার উপায় ছিল না। ইহা ভিন্ন ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ একটি বৃত্তি ছিল। তবে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া কিছু লইলে নিন্দিত হইতেন। তাঁহাদের পক্ষে প্রতিগ্রহই নিন্দিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাচ্ঞা ব্রহ্মচারী ও বানপ্রস্থীরই একমাত্র বৃত্তি। এ সকল কথা আশ্রম-ধর্ম্মে বিশেষভাবে বলা হইবে। আপাততঃ এইটুকু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ব্রাহ্মণদিগের জন্য যে সঙ্কীর্ণ লাভ-জনক বৃত্তি বিহিত হইয়াছিল, তাহাতে যদি আবার ক্ষত্রিয় আসিয়া ভাগ বসাইত—প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্ভব করিত, তাহা হইলে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ নিশ্চিতই উচ্ছিন্ন হইত। এইজন্য ক্ষত্রিয়ের ঐ বৃত্তিগুলি একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি রাজার বৃত্তি। ক্ষত্রিয় প্রজাপালন এবং সৈনিক-বৃত্তি গ্রহণ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে বর্ণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥

ক্ষত্রিয় শাস্ত্র পড়িবে, কিন্তু পড়াইবে না, প্রজাপালন (administrative works) করিবে, দস্যু বা লোক-পীড়কদিগকে নিহত করিবে এবং রণক্ষেত্রে বিক্রমপ্রকাশ করিবে। বিষ্ণুও বলিয়াছেন, "ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষিতিত্রাণম্।" পৃথিবীর ও প্রজাসাধারণের হিতসাধই ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি। মানুষকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের উচিত। সুতরাং সামান্য কনেষ্টবলের কাজ হইতে সেনা-পতিত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত রাজকার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার। শাসন-কার্য্যেও ক্ষত্রিয়ের সম্পূর্ণ অধিকার। কেবল পুরোধাঃর কার্য্যে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। মন্ত্রিসভায় প্রধান (Premier) সচিব (War-Minister), মন্ত্রী (Counciller or Diplomatist). সুমন্ত্রক (Finance Minister), অমাত্য (Ordinary Minister), প্রতিনিধি (Viceroy) প্রভৃতির পদ ক্ষত্রিয়েরই প্রাপ্য। প্রাড়বিবাক (Chief Justice) ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ই হইতেন। তবে মন্ত্রিসভায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারি জাতিই থাকা চাই। যথা,—

চতুরো ব্রাহ্মণান্ বৈদ্যান্ প্রগল্ভান স্নাতকান্ শুচীন্।
ক্ষত্রিয়াঞ্চ তথা চাষ্টৌ বলিনঃ শস্ত্রপাণিনঃ॥
বৈশ্যান্ বিত্তেন সম্পন্নানেকবিংশতি সংখ্যায়া।
ত্রীংশ্চ শূদ্রান্ বিনীতাংশ্চ শুচীন্ কর্ম্মণি পূর্ব্বকে॥
অষ্টাভিশ্চ গুণৈর্যুক্তং সূতং পৌরাণিকং তথা।
পঞ্চাশদ্বর্ষবয়সং প্রগল্ভমনসূয়কম্॥
শ্রুতিস্মৃতিসমাযুক্তং বিনীতং সমদর্শিনম।
কার্য্যে বিবদমানানাং শক্তমর্থেষ্বলোলুপম্।
বর্জ্জিতং চৈব ব্যসনৈঃ সুঘোরৈ সপ্তভির্ভৃশম্।
অষ্টানাং মন্ত্রিণাং মধ্যে মন্ত্রং রাজোপধারয়েৎ॥

রাজা চারি জন বেদবিৎ, উৎসাহী ও স্নাতক ব্রাহ্মণকে, আট জন বলবান্ ও শস্ত্রপাণি ক্ষত্রিয়কে, একুশ জন ধনাঢ্য বৈশ্যকে, নিত্যকর্ম্মশীল শুচি ও নম্রস্বভাব তিন জন শূদ্রকে এবং পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক শ্রুতিস্মৃতিবিশারদ, বিনীত, সমদর্শী, পুরাণজ্ঞ, লোভশূন্য, ব্যসনবর্জ্জিত এক জন সূতকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করিবেন। তন্মধ্যে চারি জন ব্রাহ্মণ, তিন জন শূদ্র ও এক জন সূত মন্ত্রীর সহিত সর্ব্বদাই পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, মন্ত্রিত্বে সর্ব্বজাতিরই অধিকার ছিল। তবে ব্রাহ্মণ কখনও ভৃতি অর্থাৎ বেতন লইয়া কাজ করিতেন না। যাহা হউক, এইরূপ রাজকার্য্যে আত্মনিয়োগও ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত বৃত্তি নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণগণ যে নিজের সুবিধা করিয়া সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, একথা বলা সঙ্গত নহে। পার্থিবভোগব্যাপারে ক্ষত্রিয়ের অধিকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

বৈশ্য।

বৈশ্য রজস্তমোগুণান্বিত, শূদ্র অপেক্ষা কিছু উন্নত। কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। এক কথায় বৈশ্য সমাজের ধনোৎপাদক ও ধনের বণ্টন-কর্ত্তা। ইহা ভিন্ন বৈশ্যের কুসীদগ্রহণও একটি বৃত্তি। যাহারা টাকা-পয়সা লইয়া নাড়াচাড়া করে, অর্থবৃদ্ধিই যাহাদের জীবনের লক্ষ্য, তাহাদের মন অত্যন্ত নীচু হইয়াই পড়ে। তাহাদের সরলতা, সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ প্রায় থাকে না। কিসে ধনবৃদ্ধি হইবে, এই চিন্তায় তাহারা বিভোর থাকে। সুতরাং তাহাদের ভিতর সাত্ত্বিকভাব ফুটিতেই পায় না। তবে ধর্ম্মবুদ্ধিকে যাহাতে পদদলিত না করিয়া ইহারা অর্থার্জ্জনে নিযুক্ত হয়, তাহার জন্য শাস্ত্রে কতকগুলি বিধি-নিষেধ আছে। বর্ণাশ্রমী বৈশ্যমাত্রেরই তাহা পালনীয়। বৈশ্যের শাস্ত্রচর্চ্চা ও সন্ধ্যাবন্দনা করা কর্ত্তব্য। সতত সংযত হওয়া উচিত। বৈশ্য ব্যবসায় করিবে সত্য, কিন্তু লবণ, তৈল, ঘৃত, দুগ্ধ, ঘোল, মধু, মদ্য, মাংস প্রভৃতি তাহার পক্ষে অবিক্রেয়। দান ও অতিথিসেবাই বৈশ্যের প্রধান ধর্ম্ম। বৈশ্যে যদি উচ্চতর বর্ণের গুণ অধিক মাত্রায় প্রকাশ পায়, তাহা হইলে সেই বৈশ্য সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত হইয়া থাকে। বৈশ্যগণ ব্রহ্মার বা বিরাট পুরুষের উরুযুগল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জন্য উহারা সমাজের পোষক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরিয় সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে, প্রজাপতি মধ্য হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে বৈশ্যজাতি ও পশুদিগের মধ্যে গোজাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বেদের ভাষা রূপকভাবেই গ্রাহ্য। ইহার অর্থ গাভীগণ যেমন দুগ্ধদ্বারা মানুষকে পোষণ করে, বৈশ্যগণও তেমনই ধনের উৎপাদনবর্দ্ধনাদির দ্বারা সমাজের পোষণ করিয়া থাকেন।

বাজসনেয় সংহিতায় বৈশ্যের উৎপত্তিসম্বন্ধে উরু হইতেই বৈশ্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই লিখিত হইয়াছে। আবার উক্ত সংহিতায় অন্যত্র (১৪।৩০) লিখিত হইয়াছে,—

নবদশভিরস্তুয়ত শূদ্রার্য্যাবসৃজ্যেতা মহোরাত্রে
অধিপত্নী আস্তাম্।

"প্রজাপতি দেহের ঊর্দ্ধ এবং অধঃস্থ নয়টি ছিদ্র এবং হাতের দশটি অঙ্গুলি, এই উনিশটি দ্বারা স্তব করিলে শূদ্র ও বৈশ্য সৃষ্ট হইল; অহোরাত্র ইহাদের অধিপতি হইলেন।" প্রজাপতি বিষয় উপভোগের নবদ্বার ও কার্য্যসাধনের দশ অঙ্গুলির বিনিয়োগে শূদ্র ও বৈশ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। অর্থাৎ সাংসারিক ভোগকার্য্যের সহায় ভোগে রত থাকিবে, সেই জন্য অহোরাত্র (সূতিকা হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত পরিচ্ছন্নকাল) ইহাদের অধিপতি; অর্থাৎ ইহারা সাংসারিক ব্যাপারেই আসক্ত থাকিবে। এখানে বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি স্থান একই কথিত হইয়াছে।

শূদ্র।

বর্ণাশ্রমী সমাজে শূদ্র নিম্নস্থান অধিকৃত করিয়া আছে,—বিরাট পুরুষের চতুর্ধাবিভক্ত দেহের নিম্নভাগ অর্থাৎ চরণদ্বয় হইতেই শূদ্রজাতির উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাই বেদের কথা। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে উক্ত আছে,—

যৎ পুরুষং বাদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা উরূ পাদা উচ্যেতে॥
ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়তঃ॥

যখন পুরুষকে বিভক্ত করা হয়, তখন কত ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল? উহার মুখ, বাহুদ্বয়, ঊরুদ্বয় ও চরণদ্বয় কি কি হইল? উহার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য, পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। বাজসেনেয় সংহিতায় ও অথর্ব্ববেদেও ঐ পুরুষসূক্ত আছে। ইহাতে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, চারিবর্ণ একই পুরুষের দেহ হইতে উৎপন্ন। একই পুরুষের দেহ চারিখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, সুতরাং উহারা একই সমাজের প্রত্যঙ্গ। শ্রীযুত বালগঙ্গাধর তিলক এই বিরাট পুরুষ প্রজাপতিকে বিরাট হিন্দুসমাজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মণ এই সমাজের মস্তক বা চিন্তাশীল সম্প্রদায়, ক্ষত্রিয় উহার বাহু বা বল, বৈশ্য উহার উরু বা পোষণশক্তি এবং শূদ্র উহার চরণ বা চলচ্ছক্তি। শূদ্র না হইলে সমাজ চলে না।

য়ুরোপীয়রা কিন্তু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেন। য়ুরোপীয়দিগের মতে শূদ্রগণ অনার্য্যবংশসমুদ্ভূত। আর্য্যগণ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দাসত্বে নিয়োগ করিয়াছেন। হিন্দুর প্রাচীন গ্রন্থে ইহার সমর্থক প্রমাণ বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে,—

দৈব্যো বৈ বর্ণোব্রাহ্মণঃ আসুর্য্যো শূদ্রঃ।

"ব্রাহ্মণবর্ণ দেবতা হইতে এবং শূদ্র অসুর হইতে উৎপন্ন।"

এই বেদবাক্য হইতেই আধুনিক পণ্ডিতগণ সাব্যস্ত করিয়াছেন যে, শূদ্রগণ অনার্য্য। তাঁহাদের মতে দেবাসুরের যুদ্ধ কেবল আর্য্য অনার্য্যের যুদ্ধ। সুতরাং শূদ্র সেই অনার্য্য অসুরগণেরই সন্ততি। হিন্দুরা এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে বেদের মধ্যেই পরস্পর বিরোধ ঘটে এবং স্মৃতিশ্রুতিপুরাণের ও বেদবাক্যের সামঞ্জস্য থাকে না। এই তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে,—

অসতো বৈ এষ সম্ভূতো যৎ শূদ্রাঃ।

"অসৎ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে।" এই অসৎ অর্থে কি অসুরই বুঝায়? তাহা নহে। অসৎ অর্থে যাহা সৎ নহে। অর্থাৎ অসাধু হইতেই শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত। যাহা সাধু তাহাই দৈব্য, যাহা অসাধু তাহাই আসুর্য্য। এই অর্থ করিলে বেদবাক্যের পরস্পর সঙ্গতি হয়, স্মৃতিপুরাণতন্ত্রের সহিতও উহার মিল থাকে। তৈত্তিরিয় সংহিতায় লিখিত হইয়াছে,—

পত্ত একবিংশং নিরমিমীত তমনুষ্টুপছন্দঃ অন্বসৃজ্যত বৈরাজং সাম শূদ্রো মনুষ্যাণামশ্বশ্চ পশূনাং তস্মাত্তৌ ভূতসংকামিণাবশ্বশ্চ শূদ্রশ্চ তস্মাচ্ছুদ্রো যজ্ঞেন বক্লৃপ্তো ন হি দেবতা অন্বসৃজ্যৎ পাদাবুপজীবতঃ পত্তোহ্য সৃজেতাম্॥

প্রজাপতি তাঁহার চরণ হইতে একবিংশ স্তোম নির্ম্মিত করিলে পর অনুষ্টুপছন্দঃ বৈরাজ সাম মনুষ্যগণের মধ্যে শূদ্র ও পশুদিগের মধ্যে অশ্ব সৃষ্ট হইল। এই অশ্ব ও শূদ্রই ভূতসংকামী, শূদ্র যজ্ঞে অনুপযুক্ত কারণ একবিংশ স্তোমের পর আর কোন দেবতার সৃষ্ট হয় নাই। পা হইতে উৎপন্ন বলিয়া অশ্ব ও শূদ্র উভয়েই পত্ত অর্থাৎ পদদ্বারা জীবনরক্ষা করিবে।

শূদ্রগণ ভূতসংকামী। সংকামী—সম্যক্‌রূপে যাহার কামনা করে। এই পাঞ্চভৌতিক জগৎই যাহারা সম্যক্‌রূপে কামনা করে, অর্থাৎ যাহারা too much materialistic, তাহারাই শূদ্র। অশ্বও মাটিতে গড়াগড়ি দেয়, সেই জন্য তাহারা ভূতসংকামী। ছান্দোগ্য উপনিষদে রৈকঋষি ক্ষত্রিয়রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণকে দুইবার শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পৌত্রায়ণ প্রথমবার রৈককে ছয়শত গাভী, একছড়া মুক্তার মালা, একখানি অশ্বতরবাহিত রথ দিয়া প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা করেন। তখন সেই উপঢৌকন প্রত্যাখ্যানকালে তিনি পৌত্রায়ণকে "শূদ্র" বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় রৈকঋষিকে এক সহস্র গোধন, নিজের দুহিতা, মুক্তার মালা, অশ্বতরী রথ ও যে গ্রামে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই গ্রামখানি দিতে চাহিয়াছিলেন। সেবারও উহা প্রত্যাখ্যানকালে ঋষি রাজাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই দুইবারমাত্র তিনি তাঁহাকে শূদ্র বলিয়াছিলেন। ঋষির ঐ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ অত্যন্ত ভূতসংকামী পার্থিববাপারে বিজড়িত, তাই পার্থিবসম্পদ্ দিয়া তিনি ঋষির মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঋষি ক্ষত্রিয়রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণের গুণগত শূদ্রত্বের দিকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

পদ্মপুরাণে এই রৈক-পৌত্রায়ণ-সংবাদ লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়রাজা জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ শোকে অভিভূত হইয়া রৈক ঋষির নিকট প্রাণবিদ্যা শিক্ষা করিতে গমন করেন। রৈক তাঁহাকে শোকাভিভূত দেখিয়া শূদ্র

সম্বোধন করিয়াছিলেন। মাধবাচার্য্যও শূদ্র (শুচ+দ্র) অর্থে যে শোক দ্রবীভূত হয়, এই অর্থ করিয়াছেন। বেদান্ত-সূত্রকার ভগবান্ বেদব্যাসও উক্ত উপনিষদের কথা তুলিয়া "শূদ্র" শব্দে শোকে দ্রবীভূত অর্থ করিয়াছেন। ইহার উপর আর আমাদের আলোচনা করা চলে না।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণকার শূদ্র শব্দের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, যথা—

শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাস্তানব্রবীৎ তু সঃ॥

যাহারা শোক-দুঃখে মুহ্যমান, নিস্তেজ, অল্পবীর্য্য এবং অন্যজাতির পরিচর্য্যায় রত হইল, ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে শূদ্র বলিয়াছিলেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ আছে কি? একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। যাহারা ভূতসংকামী অর্থাৎ পার্থিবব্যাপারে অত্যন্ত সংলিপ্ত, যাহারা পার্থিবব্যাপার ভিন্ন অন্য কিছুই বুঝে না, তাহারাই শোকে অধিক অভিভূত হয়। যাহারা পরকালে ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস না করে, তাহারা সামান্য ক্ষতিতেই শোকে আপনহারা হয়। সুতরাং দুই কথায় বিশেষ বিরোধ নাই।

ব্রাহ্মণশীর্ষক প্রবন্ধে মহাভারত হইতে ভৃগুর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসাপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, লোভী, যাহারা সর্ব্বকার্য্যে রত অর্থাৎ যাহাদের অকরণীয় কিছুই নাই, যাহারা অশুচি ও তমোগুণ প্রধান হইল, তাহারাই শূদ্র হইল। এইখানে এক কাণ্ড হইতে চারিবর্ণরূপ চারি শাখা উদ্ভূত হইয়াছে, কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, অথর্ব্ববেদ, বাজসনেয় সংহিতা, তৈত্তিরিয় সংহিতা প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রে একই বিরাট পুরুষ বা প্রজাপতি হইতে চারিবর্ণের উদ্ভবকীর্ত্তিও হইয়াছে। মনু প্রভৃতির স্মৃতি, সমস্ত পুরাণ ঐ উক্তিরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। সুতরাং তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণগণ দৈব্য অর্থাৎ দেবসম্ভব আর শূদ্রগণ আসুর্য্য অর্থাৎ অসুরসম্ভব, ইহার অর্থ ব্রাহ্মণগণ দেবগণের ও শূদ্রগণ অসুরগণের সন্ততি তাহা নহে, পরন্তু ব্রাহ্মণগণ দেবভাব লইয়া এবং শূদ্রগণ অসুরের ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত ব্রাহ্মণেই অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, শূদ্রগণ অসৎ বা অসাধু হইতে জন্মিয়াছেন। আসল কথা, সমাজের মধ্যে যাহারা তামসিক, তাহারাই শূদ্র বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। এই অর্থ গ্রহণ করিলে শাস্ত্রবাক্যের সর্ব্বত্রই সঙ্গতি রক্ষিত হয়। সুতরাং এই অর্থই হিন্দুর গ্রাহ্য।

কেহ কেহ বলেন, শূদ্র যে দাসশব্দ উপাধিরূপে ব্যবহার করে, তাহা দস্যু শব্দের অপভ্রংশ, দস্যু অর্থে অনার্য্য। ঋষিরা দস্যুশব্দে ঠিক অনার্য্যজাতি বুঝিতেন না। আর্য্যজাতির মধ্যে যাঁহারা আর্য্যোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতেন না, তাঁহারাও দস্যু নামে অভিহিত হইতেন। মনু বলিয়াছেন,—

মুখবাহূরুপাজ্জানাং যা লোকে জাতয়ো বহিঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্য বাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারি জাতির মধ্যে ক্রিয়ালোপহেতু যাহারা জাতির বাহিরে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমী সমাজের বাহিরে যাইয়া পড়িত, তাহারা সাধুভাষীই হউক আর ম্লেচ্ছভাষাভাষীই হউক, তাহারাই দস্যু নামে অভিহিত হইত। সুতরাং শূদ্ররাই দস্যু নামে অভিহিত হইত না, শূদ্রাচার হইতে পরিভ্রষ্ট ব্যক্তিরা দস্যু নামে অভিহিত হইতেন। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণত্রয় বর্ণাশ্রমী সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইলে দস্যু নাম পাইতেন। সুতরাং দস্যু ও শূদ্র এক নহে। শূদ্রের সেবাবৃত্তি বলিয়া তাহারা দাস নামে অভিহিত। দস্যু হইতে দাস শব্দের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা ভ্রান্ত মত।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শূদ্রা যদি আর্য্যজাতিই হইবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিরা শূদ্রকে একাসনে বসিতে দিতেন না কেন? শূদ্রকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে আপনাদিগকে অশুচি মনে করিতেন কেন? শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের আসনে বসিত, তাহা হইলে তাহাদিগকে কঠোরদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত কেন? ইহার কারণ, পূর্ব্বকালে শূদ্রগণ অত্যন্ত অশুচি, পাপাচারী ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। অশুচি, পাপাচারী লোকের সহিত মিশিলে যে ক্ষতি হয়, শৌচপ্রবন্ধে তাহা পূর্ব্বেই বিশেষভাবে বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সকল শূদ্র শৌচাচারপরায়ণ ও ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণগণও তাঁহাদিগকে সম্মান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১।১১৬) কেবল তাহাই নহে, শূদ্র যদি সত্য, দান প্রভৃতি গুণযুক্ত হয়, তাহা হইলে সে প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণতুল্য সম্মানের অধিকারী হইত। হরিবংশে "শূদ্রাঃ ধূমবিকারতঃ" ধূম অর্থাৎ তমোগুণের বিকার হইতে শূদ্র উৎপত্তি হইয়াছে, একথা উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত হইয়াছে,—

এভিস্তু কর্ম্মভির্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥

"এই সকল কর্ম্ম ও শুভ আচরণদ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব পায়, বৈশ্য ক্ষত্রিয় হয়।" এই সকল বিধি-নিষেধ আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, ঐ সকল কঠোর ব্যবস্থা অত্যন্ত হীনকর্ম্মা, পাপাচারী, অশুচি ও হিংস্র শূদ্রগণের উপর প্রযোজ্য ছিল। যাহারা জন্মতঃ ও গুণতঃ শূদ্র, তাহাদিগের প্রতি ঐরূপ কঠোর ব্যবহার করা অনেক সময় নিতান্ত দরকার হইয়া পড়ে।

নবগ্রহ।

[ডাক্তার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাহিত্য-বিশারদ।]

বাল্যকালে পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম "নয়-ত্র নবগ্রহ"। আজ সেই নবগ্রহের বিষয় কিছু আলোচনা করিব।

রবি (Sun), চন্দ্র (Moon), মঙ্গল (Mars), বুধ (Mercury), বৃহস্পতি (Jupiter), শুক্র (Venus), শনি (Saturn), রাহু (Dragon's head) এবং কেতু (Dragon's tail),—এই নয়টিকে নবগ্রহ বলে। রাহু ও কেতু বাস্তবপক্ষে গ্রহ না হইলেও জাগতিক জীবের উপর উহাদের বিলক্ষণ প্রভাব দৃষ্ট হয়। এজন্য হিন্দুজ্যোতিষশাস্ত্রকর্ত্তারা উহাদিগকে গ্রহমধ্যে গণনা করিয়া গিয়াছেন।

নবগ্রহের বলাবল এবং শুভাশুভের উপরই মানবজীবনের সমুদয় ফল নির্ভর করে।

নভোমণ্ডলস্থ এক কল্পিত রাশিচক্রের (Zodiac) ভিতর গ্রহগণ নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। এই রাশিচক্র মেষ (Aries), বৃষ (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarins), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius) ও মীন (Pisces) নামে দ্বাদশভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের পরিমাণ ৩০ অংশ (30 degrees) এবং উহা সওয়া দুই নক্ষত্রদ্বারা গঠিত *।

শাস্ত্রে গ্রহগণের রাশিভোগের কাল এইরূপ লিখিত আছে;—

"রবির্মাসং নিশানাথঃ স পাদ দিবসদ্বয়ম্।
পক্ষত্রয়ং ভূমিপুত্রো বুধোহষ্টাদশ বাসরান্॥
বর্ষমেকং সুরাচার্য্য শ্চাষ্টাবিংশদ্দিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষং স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধ বৎসরম্॥

মোটামুটি হিসাবে সূর্য্য এক রাশিতে পূর্ণ এক মাস, চন্দ্র ২ দিন ১৫ দণ্ড, মঙ্গল দেড় মাস, বুধ ১৮ দিন, বৃহস্পতি এক বৎসর, শুক্র ২৮ দিন, শনি ১ বৎসর ৬ মাস এবং রাহু ও কেতু প্রত্যেকে ১ বৎসর ৬ মাস অবস্থিতি করে।

তাহা হইলে দেখা গেল, দ্বাদশরাশি পরিভ্রমণ করিতে রবির এক বৎসর, চন্দ্রের ২৭ দিন, মঙ্গলের ৫৪০ দিন, বুধের ২১৬ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর, শুক্রের ৩৩৬ দিন, শনির ৩০ বৎসর এবং রাহু ও কেতু প্রত্যেকের ১৮ বৎসর সময় লাগে। কিন্তু গ্রহগণের গতি একপ্রকার শক্তির দ্বারা সম্পাদিত হয় না। সুতরাং সময় সময় তাহাদের গতির ন্যূনাধিক্য হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাশিভোগকালেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া পড়ে।

রাহু-কেতু ভিন্ন আর সকল গ্রহই রাশিচক্রে বামাবর্ত্তক্রমে পরিভ্রমণ করে অর্থাৎ মেষরাশি হইতে বৃষরাশিতে, বৃষ হইতে মিথুনে—এইরূপ ভাবেই ঘুরিতে থাকে। রাহু ও কেতুর গতি ইহার বিপরীত। তাহারা মেষ হইতে মীনে, মীন হইতে কুম্ভে—এইরূপ দক্ষিণাবর্ত্তেই ভ্রমণ করে।

আর্য্যঋষিরা গ্রহগণের মূর্ত্তি এবং স্বভাবাদির বিষয়ও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

রবি—খর্ব্বাকার, অরুণশ্যামবর্ণ, পিত্তপ্রকৃতি, তিক্তরসপ্রিয় ও স্থিরস্বভাব।

চন্দ্র—গৌরবর্ণ, পুষ্টদেহ, কফবাতপ্রকৃতি ও লবণরসপ্রিয়।

মঙ্গল—গৌরবর্ণ, তমোগুণপ্রধান, হিংস্র, সাহসী, পিত্তপ্রকৃতি, উদার অথচ অল্প গর্ব্বিত।

বুধ—শ্যামবর্ণ, মধ্যমাকার, রজোগুণপ্রধান, পিত্ত বাত ও কফ প্রকৃতি এবং সর্ব্বদা বালকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট।

বৃহস্পতি—পীতবর্ণ, খর্ব্বদেহ, সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, সমপ্রকৃতি ও মধুররসপ্রিয়।

শুক্র—শ্যামবর্ণ, রজোগুণবিশিষ্ট, ক্রীড়াকৌতুকরত এবং অম্লরসপ্রিয়।

শনি—কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকৃশদেহ, চপল, খলস্বভাব এবং কুপিতবায়ুপ্রকৃতি।

রাহু ও কেতু—কৃষ্ণবর্ণ, ক্রূর এবং অতি ভয়ঙ্কর।

জন্মকালীন লগ্ন স্থির ও রাশিচক্রে নবগ্রহ সন্নিবেশ করিয়া গ্রহগণের বলাবল বিচারপূর্ব্বক জ্যোতির্ব্বিদেরা জাতকের স্বরূপ ও স্বভাবাদি নির্ণয় করিয়া থাকেন। জন্মপত্রিকায় যে রাশিতে "লং" (লগ্নের সাঙ্কেতিক চিহ্ন) অঙ্কিত লিখিত থাকে, সেই রাশিকে লগ্নস্থান বা তনুস্থান কহে। তনুস্থানে বয়স, বর্ণ, আয়ুঃ, জাতি ও সুখ-দুঃখাদি অবগত হওয়া যায়। বামাবর্ত্তক্রমে লগ্নের দ্বিতীয় স্থানে ধন; তৃতীয়ে সহজ; চতুর্থে বন্ধু; পঞ্চমে বিদ্যা, বুদ্ধি ও অপত্য; ষষ্ঠে শত্রু, মাতুল ও পীড়াদি; সপ্তমে জায়া; অষ্টমে মৃত্যু; নবমে ধর্ম্ম; দশমে কর্ম্ম, মান ও কীর্ত্তি এবং দ্বাদশে ব্যয়াদিসম্বন্ধে বিচার করা হয়।

এই তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের অপর নাম দ্বাদশ ভাব। ইহার মধ্যে আবার লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম ভাবস্থানগুলি

---

* অশ্বিনী, ভরণী প্রত্যেকের ৪ পাদ এবং কৃত্তিকার ১ পাদ দ্বারা মেষরাশি। কৃত্তিকার অবশিষ্ট ৩ পাদ, রোহিণীর ৪ পাদ এবং মৃগশিরার ২ পাদ দ্বারা বৃষরাশি। এইরূপ অশ্বিনী হইতে রেবতী পর্য্যন্ত ২৭টি নক্ষত্রের দ্বারা দ্বাদশরাশি গঠিত।

রাশিচক্রে গ্রহগণের আদ্যক্ষরই লেখা থাকে। যথা—র, চ, ম অর্থাৎ রবি, চন্দ্র, মঙ্গল। গ্রহের সঙ্গে যে অঙ্ক থাকে, তাহা নক্ষত্রাঙ্ক।

"কেন্দ্র" এবং পঞ্চম ও নবম ভাবস্থান "ত্রিকোণ" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

সূর্য্যাদি গ্রহগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ; কতকগুলি শুভ এবং অপরগুলি অশুভ। রবি, মঙ্গল, শনি, রাহু ও কেতু পাপগ্রহ। চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র শুভগ্রহ। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত চন্দ্র পাপ। বুধ যখন যাহার সঙ্গে থাকে, তখন সেই ভাবাপন্ন হয়। রাহু-কেতুর সম্বন্ধেও ঐ কথা। "যদ্‌যদ্ভাবগতৌ বাপি যদ্‌যদ্ভাবেশ সংযুতৌ, তত্তৎ ফলানি প্রবলৌ প্রদিশেতাং তমোগ্রহৌ।" ইহার অর্থ—রাহু ও কেতু কোন গ্রহের সঙ্গে থাকিলে সেই গ্রহ যে ভাবের অধিপতি, উহারা সেই ভাবেরই বৃদ্ধি করে।

শুভগ্রহগণ শুভফল এবং অশুভগ্রহগণ অশুভফল প্রদান করে, ইহাই সাধারণ বিধি। কিন্তু গ্রহদিগের ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থিতি অনুসারে নৈসর্গিক শুভগ্রহও অশুভ হয়, আবার নৈসর্গিক অশুভগ্রহও শুভফলদাতা হইয়া থাকে। এই জন্য শনির দশায় কেহ রাজা, কেহ বা ফকির হয়।

আমাদের যেমন এক অথবা একাধিক গৃহ আছে, গ্রহ-গণেরও সেইরূপ একটি অথবা দুইটি করিয়া গৃহ আছে। সেই গৃহগুলিই তাহাদের স্বক্ষেত্র অর্থাৎ তাহারাই সেই গৃহের অধিপতি।

"কুজশুক্রবুধেন্দ্বর্ক সৌম্যশুক্রাবনীভূবাং।
জীবার্কি ভানুজে জ্যানাং ক্ষেত্রাণি স্যারজাদয়ঃ॥"

রবির স্বক্ষেত্র সিংহরাশি। চন্দ্রের কর্কট, মঙ্গলের মেষ ও বৃশ্চিক, বুধের কন্যা ও মিথুন, বৃহস্পতির ধনু ও মীন, শুক্রের তুলা ও বৃষ, শনির মকর ও কুম্ভরাশি নিজের ক্ষেত্র। রাহু-কেতুর কোন ক্ষেত্র নাই।

মানুষ যেমন বাহির হইতে নিজের গৃহে আসিয়াই তৃপ্তি-লাভ করে, গ্রহগণও সেইরূপ রাশির পর রাশি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বক্ষেত্রে আসিয়া তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তগ্রহ বিশেষ বলবান্।

নিজের ক্ষেত্রের মধ্যেও আবার গ্রহদিগের এক একটি আনন্দ-ভবন দেখা যায়। ঐ আনন্দ-ভবনের নাম "মূল-ত্রিকোণস্থান"।

"সিংহো বৃষশ্চ মেষশ্চ কন্যা ধন্বী ঘটো ঘটঃ।
অর্কাদীনাং ত্রিকোণানি মূলানি রাশয়ঃ ক্রমাৎ॥"

রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা এবং শনির কুম্ভরাশি মূল-ত্রিকোণস্থান। রাহু ও কেতুর মূলত্রিকোণ যথাক্রমে কুম্ভ ও সিংহরাশি।

চন্দ্র কর্কটাধিপতি হইলেও বৃষরাশিই উহার মূল-ত্রিকোণস্থান।

স্বক্ষেত্র ও মূলত্রিকোণ ব্যতীত গ্রহদিগের আরও একটি শান্তি-নিকেতন আছে। তাহার নাম উচ্চস্থান বা তুঙ্গস্থান। তুঙ্গী বা উচ্চস্থ গ্রহমাত্রই মহাবলশালী ও সুফলপ্রদ। রবির মেষরাশি, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মকর, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন, শনির তুলা, রাহুর মিথুন এবং কেতুর ধনুরাশি উচ্চস্থান। তুঙ্গীগ্রহের ফল এইরূপ,—

"একতুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ।
ত্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজা চতুর্থে চক্রবর্ত্তিনঃ॥"

জন্মকালে একটি গ্রহ তুঙ্গী হইলে জাতক ভোগী, দুইটিতে ধনেশ্বর, তিনটিতে রাজা এবং চারিটিতে রাজ-চক্রবর্ত্তী হয়।

ভগবান্ রামচন্দ্রের জন্মসময়ে পাঁচটি গ্রহ তুঙ্গী ছিল।

"মধুমাসি সিতে পক্ষে নবম্যাং কর্কটে শুভে।
পুনর্ব্বস্বৃক্ষসহিত উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে॥
মেষং পুষণি সংপ্রাপ্তে পুষ্পবৃষ্টি সমাকুলে।
আবিরাসীজ্জগন্নাথঃ পরমাত্মা সনাতনঃ॥"

পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণেরও চারিটি গ্রহ উচ্চস্থ।

"উচ্চস্থাঃ শশিভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো।
জীবঃ সিংহতুলাদিষু ক্রমবশাৎ পুষ-শনি রাহবঃ॥
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্রক্ষণে।
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষমভু দাবিঃ পরংব্রহ্মতৎ॥"

যে রাশি যে গ্রহের উচ্চস্থান, ঠিক তাহার সপ্তম রাশি তাহার নীচস্থান।

রবির তুলা, চন্দ্রের বৃশ্চিক, মঙ্গলের কর্কট, বুধের মীন, বৃহস্পতির মকর, শুক্রের কন্যা, শনির মেষ, রাহুর ধনু এবং কেতুর মিথুনরাশি নীচস্থান। নীচস্থ গ্রহ অতি দুর্ব্বল।

মানুষের মত গ্রহদিগের মধ্যেও শত্রুতা ও মিত্রতা আছে। রবির মিত্র চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি ; শত্রু শুক্র ও শনি এবং সম বুধ অর্থাৎ বুধ শত্রুও নহে, মিত্রও নহে।

চন্দ্রের শত্রু নাই ; বুধ ও রবি ইহার মিত্র, সম মঙ্গল।

মঙ্গলের মিত্র রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি ; শত্রু বুধ ; সম শনি।

বুধের মিত্র রবি, শুক্র ; শত্রু চন্দ্র ; সম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

বৃহস্পতির মিত্র রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ; শত্রু বুধ ও শুক্র ; সম শনি।

শুক্রের মিত্র বুধ ও শনি ; শত্রু রবি, চন্দ্র ; সম মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

শনির মিত্র বুধ, শুক্র ; শত্রু রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল ; সম বৃহস্পতি।

রাহুর মিত্র শুক্র ও শনি ; শত্রু রবি, চন্দ্র, মঙ্গল।

কেতুর মিত্র রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ; শত্রু শুক্র ও শনি।

মিত্রগৃহে অথবা মিত্রসংস্পর্শে থাকিলে গ্রহগণ প্রসন্ন থাকে। অপরপক্ষে শত্রুগৃহে অথবা শত্রুর সহিত অবস্থিতি করিলে অপ্রসন্ন হইয়া পড়ে।

জীবগণের ন্যায় গ্রহগণও চক্ষুষ্মান্। তবে তাহারা যে কোন স্থানে দৃষ্টি করিতে পারে না। প্রত্যেক গ্রহ নিজের-

অধিষ্ঠিত রাশি হইতে বামাবর্ত্তক্রমে সপ্তমস্থানে পূর্ণ, চতুর্থ ও অষ্টমে তিন পাদ, পঞ্চম ও নবমে অর্দ্ধ এবং তৃতীয় ও দশমস্থানে একপাদ দৃষ্টি করিয়া থাকে। পরন্তু "পশ্যন্তি সপ্তমং সর্ব্বে শনি জীব কুজাঃ পুনঃ, বিশেষ তশ্চ ত্রিদশ ত্রিকোণ চতুরষ্টমান্" এই শ্লোক অনুসারে বিশেষ এই যে, শনি তৃতীয় দশম, বৃহস্পতি নবম পঞ্চম এবং মঙ্গল চতুর্থ ও অষ্টমে পূর্ণদৃষ্টি করিতে পারে। রাহুর গতি যেমন বক্র, তাহার দৃষ্টিও সেইরূপ। এই গ্রহ দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে পঞ্চম, নবম ও দ্বাদশস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি করে।

কেতু অন্ধ; উহার দৃষ্টিশক্তি একেবারেই নাই।

শুভ অথবা মিত্রগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্টগ্রহ শুভফলদাতা এবং পাপ অথবা শত্রুদৃষ্টগ্রহ অশুভফলদাতা হইয়া থাকে।

দ্বাদশরাশিস্থিত গ্রহগণের সাহায্যে সাধারণতঃ যোগফল, ভাবফল ও দশাফল নামক তিনপ্রকার ভাগ্যফল গণনা করা হয়।

(১) যোগফল।

জন্মসময়ে বিশেষ বিশেষ গ্রহের বিশেষ বিশেষ রাশিতে অবস্থানহেতু যে ফল হয়, তাহাকেই যোগফল কহে। যেমন—"শশিনা সহিতো মন্দঃ শুক্রভৌমযুতো ভবেৎ, তেন দারিদ্র্যযোগেন সমুদ্রমপি শোষয়েৎ।"

চন্দ্রের সহিত শনি, মঙ্গল এবং শুক্র যুক্ত হইলে প্রধান দারিদ্র্যযোগ হয়। এই যোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়া যায়; অর্থাৎ সে ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হয়।

যোগফল অতি নিশ্চিত; ইহা প্রায় মিথ্যা হয় না।

(২) ভাবফল।

তন্বাদি দ্বাদশভাবের বিচারকেই ভাবফলবিচার কহে।

কোন্ ভাবের অধিপতি কোন্ গৃহে অবস্থিত, কাহা কর্ত্তৃক দৃষ্ট অথবা যুক্ত, এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া দ্বাদশভাবের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হয়। একটি সামান্য উদাহরণ দিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মপত্রিকায় পঞ্চমস্থানে ধনুরাশিতে বলবান্ পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতি তাহার মিত্রগ্রহ মঙ্গলযুক্ত হইয়া স্বক্ষেত্রে আছে। ঐ স্থানে কোন শত্রুগ্রহের দৃষ্টি নাই। অতএব বুঝিলাম, ইহারই বলে তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং জগতের শিক্ষাদাতা হইয়াছিলেন। কেন না, পঞ্চমস্থানেই বুদ্ধি-বিদ্যাদি চিন্তা করিতে হয় এবং ঐ পঞ্চমাধিপতি বৃহস্পতিই শ্রদ্ধা-ভক্তি-জ্ঞান-কীর্ত্তি ও পাণ্ডিত্যাদিকারক গ্রহ।

(৩) দশাফল।

জন্মনক্ষত্র হইতে জাতকের প্রথম ভোগ্যদশা নির্ণীত হয়। শাস্ত্রে বহুপ্রকার দশার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদেরা অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী—এই দুইপ্রকার দশার দ্বারা শুভাশুভ বিচার করিয়া থাকেন।

"কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ"—কলিকালে পরাশরের মতই প্রবল। মহর্ষি পরাশর বলিয়াছেন—"দশা বিংশোত্তরী চাত্র গ্রাহ্যা নষ্টোত্তরী মতা।" অতএব এখন বিংশোত্তরী দশাই গ্রাহ্য।

এইমতে মানুষের পূর্ণপরমায়ুঃ ১২০ বৎসর স্থির আছে। তন্মধ্যে রবির দশা ৬ বৎসর, চন্দ্রের ১০ বৎসর, মঙ্গলের ৭ বৎসর, রাহুর ১৮ বৎসর, বৃহস্পতির ১৬ বৎসর, শনির ১৯ বৎসর, বুধের ১৭ বৎসর, কেতুর ৭ বৎসর এবং শুক্রের ২০ বৎসর এইরূপ ভাবেই পর পর ভোগ হয়।

কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী বা উত্তরাষাঢ়া, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে বিংশোত্তরীমতে প্রথমে রবির দশা হয়।

এইরূপ রোহিণী, হস্তা বা শ্রবণা, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে চন্দ্রের দশা; মৃগশিরা, চিত্রা বা ধনিষ্ঠা, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে মঙ্গলের দশা; আর্দ্রা, স্বাতি বা শতভিষা, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে রাহুর দশা; পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে বৃহস্পতির দশা; পুষ্যা, অনুরাধা বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শনির দশা; অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা বা রেবতী, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে বুধের দশা; মঘা, মূলা বা অশ্বিনী, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে কেতুর দশা এবং পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া বা ভরণী, ইহাদের মধ্যে যে কোন নক্ষত্রে জন্ম হইলে প্রথমে শুক্রের দশা হইয়া থাকে।

জন্মনক্ষত্রের পূর্ণমান কত, তাহা পঞ্জিকাদৃষ্টে নির্দ্ধারণ করতঃ, জন্মসময়ের পর ঐ নক্ষত্র কতক্ষণ ছিল, তাহা জ্ঞাত হইয়া, নক্ষত্র পূর্ণমানে এত বৎসর দশা ভোগ হইলে নক্ষত্র ভোগ্যমানে কত বৎসর ভোগ হইবে, এইরূপ ত্রৈরাশিক দ্বারা প্রথম দশার ভোগ্যবর্ষাদি নির্ণয় করা হয়। শেষে পর পর দশাকাল উহাতে যোগ হইতে থাকে।

শুভকারকগ্রহগণ স্বীয় দশায় শুভফল এবং অশুভকারক গ্রহগণ স্বীয় দশায় অশুভফল প্রদান করে। কোন কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

গ্রহগণের মধ্যে চতুর্ব্বিধ সম্বন্ধ আছে। পরস্পরের ক্ষেত্রে পরস্পরের বাসের নাম প্রথম সম্বন্ধ; যেমন রবি মেষ রাশিতে এবং মঙ্গল সিংহরাশিতে।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের দৃষ্টির নাম দ্বিতীয় সম্বন্ধ; যেমন মেষরাশিতে মঙ্গল এবং তুলাতে রবি থাকিয়া পরস্পর দৃষ্টি করিতেছে।

এক গ্রহ কেবলমাত্র অপরকে দৃষ্টি করার নাম তৃতীয়

সম্বন্ধ; যেমন সিংহরাশিস্থ মঙ্গল মীনরাশিস্থ রবিকে দৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু রবি মঙ্গলকে দেখে না।

দুই গ্রহের একত্র বাসের নাম চতুর্থ সম্বন্ধ; যেমন বৃষ-রাশিতে রবি ও মঙ্গলের একত্র অবস্থান।

গ্রহ স্বীয় দশাকালে আত্মভাবানুরূপ শুভাশুভ ফল না দিয়া আপনার সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ অপর কোন গ্রহের দশাকালেও স্বদশার ফল প্রদান করে। সাধারণ কোষ্ঠীতে এতদ্দেশীয় অনেক গ্রহাচার্য্য ঐ সকল বিচার না করিয়াই পুঁথির বাঁধাগদ লিখিয়া থাকেন। জাতকের বৃহস্পতির দশা পড়িয়াছে দেখিলে অমনই লিখিয়া বসিলেন,—

"রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্ত বিশাল ভোগান্,
পর্য্যাপ্ত সৌখ্যং ধনধান্যসমাশ্রয়ঞ্চ।
ধর্ম্মার্থকামসুখভোগ বহুপ্রয়োগং,
যাবদ্ বৃহস্পতি দশা পুরুষোহি তাবৎ॥"

ঐ বৃহস্পতি তাহার পক্ষে কিরূপ ফলদাতা, উহার বল কিরূপ, এ সকল কিছুই বিচার করা হইল না। সুতরাং ফলেরও অনৈক্য হইল। রাম, শ্যাম বা যদু তাহার জন্মপত্রিকা খুলিয়া দেখিল, ৩৬ বৎসর ৫ পাঁচ মাস বয়সের সময় তাহার ভাণ্ডার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু কৈ? সরিকের সহিত মোকদ্দমা বাধিয়া যে পৈতৃক ব্রহ্মত্রটুকু পর্য্যন্ত ঘুচিল!

এইরূপে লোকের "ফলিত জ্যোতিষের" প্রতি আস্থা কমিয়া যাইতেছে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, শাস্ত্র অবিশ্বাস্য নহে। দোষ আমাদের; আমরা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ অবগত না হইয়াই শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বসি।

নবগ্রহের শুভাশুভত্ব বিশেষরূপে বিচার করিয়া দশাফল গণনা করিতে পারিলে জীবনের কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা ঘটিবে, তাহা অনায়াসেই জানিতে পারা যায়।

বারান্তরে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।
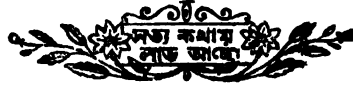
খাদ্যে ভেজাল।

[লেখক—ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র রায়, এল্. এম্ এস্.।]

বহুকালের ধূম গত ভাদ্রমাসে হঠাৎ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল। বহুবর্ষব্যাপী ঘৃতে-ভেজালের-আন্দোলন ঐ মাসে অকস্মাৎ মাড়বারীকুলকে সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার ফলে, যে মাড়বারিগণ এত বৎসর ধরিয়া নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিকার হইয়া ভেজাল ঘৃত ভোজন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারা হঠাৎ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বসিলেন, ভেজালকারীদিগকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন এবং গোচারণের মাঠ ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই আন্দোলনের ফলে সমগ্র হিন্দুসমাজে একটা চেতনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু হিন্দুসমাজ ইহাতে জাগিবে কি পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া পুনরায় ঘোর নিদ্রামগ্ন হইবে, তাহা বলা কঠিন। আমার মনে হয়, একটা প্রহসনেরই অভিনয় হইয়া গেল—বঙ্গভঙ্গের, বয়কটের, রাখীবন্ধনের, অখণ্ড-বঙ্গভবনভিত্তিস্থাপনেরই মত সাময়িক উত্তেজনায় বিফল আস্ফালনের অভিনয় হইয়া গেল। আমরা যত দিন না আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন ও স্বার্থশূন্য হই, ততদিন মনুষ্যত্ব আমাদিগকে বরণ করিবে না এবং ততদিনই আমরা কালের করের পুতুলই থাকিয়া নৃত্য করিতে থাকিব।

কিন্তু এখন এমন সময় আসিয়াছে যে, আমাদিগকে জাগ্রত হইতেই হইবে, নতুবা মরণ অবশ্যম্ভাবী। মিথ্যা ও ভেজালের ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল স্রোতের মুখে আমাদিগকে রসাতলের অতলগর্ভে লইয়া যাইবে, যদি না আমরা এখন হইতে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই। কিরূপে এই ভেজালের বিরুদ্ধে দাঁড়ান যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত উত্তর—সত্যের সাহায্যে। কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তর অত্যন্ত কষ্ট, ত্যাগ ও শ্রম এবং কাজেই সময়সাপেক্ষ।

ভেজালের উদ্দেশ্য, অযথা উপায়ে, অল্পসময়ের মধ্যে, ধনী হওয়া। উপকারী বিশ্বাসী বন্ধুর ধন হস্তে আসিবামাত্র তাহার আত্মসাৎ করা যেমন হেয়, বিশ্বাসী প্রতিবেশীর দেহের পুষ্টির দ্রব্যে ভেজাল দেওয়া তদ্রূপই হেয়। যে ব্যক্তির ব্যবসায় অতীব প্রশস্ত ভিত্তির উপরে স্থাপিত, যাহার ব্যবসায়ের প্রসার অত্যন্ত বেশী, বা যে ব্যবসায়ে সম্যক্ পরিশ্রম করিতে প্রস্তুত—সে জাতীয় ব্যক্তি সহজে কেন, বোধ হয় আদৌ ভেজাল করিতে প্রবৃত্ত হয় না। যে ব্যবসায়ীর কায সামান্য গণ্ডীবদ্ধ বা যে ব্যবসায়ী নিরুৎসাহী, শ্রমকাতর ও মূঢ়, সেই সহজে ভেজালের পক্ষপাতী হয়। একটা দৃষ্টান্তদ্বারা এ কথাটা সহজ হইবে। ধরা যাউক ঘৃত-ব্যবসায়। যে ব্যবসায়ী পরম উদ্‌যোগী এবং বহু অর্থ

ব্যবসায়ে নিয়োজিত করিয়াছে, সে ব্যক্তি গ্রাম হইতে নানা উপায়ে, প্রকৃত ঘৃতই সংগ্রহ করিবে এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্যই সরবরাহ করিবে, যেহেতু তাহার কর্ম্মকুশলতা, তাহার কার্য্যের সুশৃঙ্খলা এবং তাহার প্রচুর অর্থব্যয়ই তাহার ব্যবসায়ের মেরুদণ্ড—সে সত্যের মর্য্যাদা না রাখিলে, একেবারে অতলজলে ডুবিবে; এবং, সে সত্যের মর্য্যাদা রাখিবার জন্যই এত পরিশ্রম পূর্ব্ব হইতেই করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু যে মূঢ় শ্রম করিতে চাহে না, যাহার মূলধন সামান্য, সেই অসত্যের সাহায্যে ধনী হইতে চায়, যেহেতু তাহার দোষ প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তাহার কোনও বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

পাশ্চাত্যদেশে ঘৃতের ব্যবহার না থাকুক, মাখনের ব্যবহার আছে। এই মাখনের ভেজাল হয়। কিন্তু সুখের বিষয়, উর্ব্বরমস্তিষ্ক পাশ্চাত্যবাসীরা অনুর্ব্বরমস্তিষ্ক মাড়বারি নহেন। তাঁহারা কৃত্রিম মাখন বা মার্গারিণ তৈয়ারী করিয়া অতি স্বল্পমূল্যে বেচিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের মার্গারিণ ব্যবহারের ফলে মাখনের অযথা মূল্যবৃদ্ধি হয় নাই; কিন্তু আমাদের দেশে এই আন্দোলনের ফলে ঘৃতের ভেজাল ত চলিবেই, পরন্তু এই অছিলায় মাড়বারিগণ ঘৃতের মূল্য অযথা বাড়াইয়া দিয়া নিজেদের দিন ক্রয় করিয়া লইবে।

এখন উপায় কি? উপায় অনেকগুলি! প্রথম উপায়—কঠোর আইনের ব্যবস্থা। এমন আইন হউক যে, যে কেহও ভেজালমিশ্রিত জিনিষ বিক্রয় করিলে, তাহার উপরে স্পষ্টাক্ষরে ভেজালের নাম ও পরিমাণ লিখিতে বাধ্য থাকিবে। এবং যে না বলিয়া, বা গোপনে, ভেজালমিশ্রিত খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিবে, সেই ব্যক্তির অন্যূন এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে; জরিমানা বা জামিন আদৌ গৃহীত হইবে না। যে ভেজালের সাহায্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা লাভ হয়, তাহার জন্য দু'চার শত টাকা দণ্ড কি করিবে? দীর্ঘকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডই একমাত্র শাস্তি বিহিত হইলে সুফল অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মাণী ও আমেরিকায় এই দুইটি বিধানের সাহায্যে ভেজাল বন্ধ হইয়াছে। বিক্রেতাকে হয় খাঁটি জিনিষ রাখিতে হয়, নতুবা ভেজালমিশ্রিত জিনিষ রাখিলে তাহার আধারের উপরে স্পষ্টাক্ষরে কি কি ভেজাল কি পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে,তাহা প্রকাশ করিয়া রাখিতে হয়।

দ্বিতীয় উপায়—ঘৃতের পরিবর্ত্তে অপরাপর স্নেহজাতীয় পদার্থের ব্যবহার করা। মাখন, মহুয়ার তৈল, চিনাবাদামের তৈল, তুলার বীজের তৈল, জলপাই তৈল, নারিকেল তৈল, চর্ব্বি—প্রভৃতি ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়। একথা অন্ততঃ পনর কুড়ি বৎসর ধরিয়া আমরা শুনিয়া আসিতেছি—অথচ বেশী মূল্যে ঘৃতের নাম করিয়া ঐ সকল পদার্থ এতকাল সেবন করিয়া আসিতেছি। এখন কেন আমরা স্পষ্টতঃই, জানিয়া শুনিয়া, মহুয়ার তৈল, তিল তৈল, নারিকেল তৈল বা টাট্‌কা চর্ব্বি ব্যবহার করি না? তাহাতে ত আমাদের আত্মমর্য্যাদার হানি হইবে না। বরং ঐ সকল পদার্থ ব্যবহারের ফলে, ঘৃতের মূল্য ও ঘৃতের ভেজাল স্বতঃই কমিয়া যাইবে। যেন-তেন-প্রকারেণ শরীরের প্রয়োজনমত স্নেহময় পদার্থ গ্রহণ করিলেই দেহ অক্ষুণ্ণ থাকিবে, এই সার সত্য। তাই যদি সত্য হয়, তবে ঘৃতই যে খাইতে হইবে, এমন কি কথা আছে? মান্দ্রাজীরা টাট্‌কা নারিকেল তৈল খাইয়া থাকেন; কোন কোন দেশবাসীরা তিল তৈলই খাইয়া থাকেন। তবে আমরা কেন ঘৃতে আবদ্ধ থাকিব? আজকাল বিজ্ঞানের চর্চ্চার ফলে যদি কোনও কৃত্রিম, অথচ উপকারী, স্নেহময় পদার্থ আবিষ্কৃত হয়, তাহাও কেন না ব্যবহার করিব? যতদিন গড্ডালিকা বৃত্তি অবলম্বন করিব, ততদিন পরকৃপাভিক্ষার্থী হইয়া থাকিতেই হইবে; সামর্থ্য নাই, চেষ্টা নাই, আত্মরক্ষার্থ উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগ নাই, সুধু সুধু আস্ফালন করিলে চলিবে কেন?

আমাদের দেশে গাভীর অবস্থা ক্রমশঃই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। তাহার কারণ অনেকগুলি; প্রথম—দেশের অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, দ্বিতীয়—আমাদিগের অমনোযোগিতা, তৃতীয়—গোচারণ-মাঠের অভাব, চতুর্থ—বলিষ্ঠ ষণ্ডের অভাব, পঞ্চম—সকল কার্য্যে আমাদিগের গতানুগতিকতা। আমরা সকলেই পল্লীভবন ত্যাগ করিয়া, দু'পাতা ইংরাজী পড়িয়া, চেয়ার টেবিলে বসিয়া কাজ করিবার জন্য লালাইত হই। শিক্ষার বেলায় অষ্টরম্ভা, খালি দু'চারটি পড়ান বুলি বলিতে শিখি এবং তদ্বিনিময়ে নিজস্ব (চিন্তাশক্তি) জলাঞ্জলি দিই। এদিকে নিরক্ষর, ক্ষীণকায়, রোগজীর্ণ কৃষকের ও গোপালের উপরে মাদার দিয়া সংবাদপত্রে বড় বড় প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাই। আর তাহা করিলে চলিবে না। পল্লীজীবনকে পুনরায় জাগাইয়া তুলিতে হইবে, পল্লীভবনে হৃদয়ের গ্রন্থিকে জড়াইয়া রাখিতে হইবে, "চাষার" সঙ্গে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব স্থাপিত করিতে হইবে। পাশ্চাত্য শিক্ষার গূঢ়তথ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের প্রচলিত রীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া গ্রাম্যব্যবসায়গুলির উন্নতি করিতে হইবে। প্রত্যেক গৃহস্থকে গাভী প্রতিপালন করিবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে, প্রত্যেক গ্রামে সুন্দরভাবে গোচারণের মাঠ রক্ষা করিতে হইবে। গৃহস্থের আবশ্যকাতিরিক্ত দুগ্ধ, দধি হইতে ঘৃত করিবার উৎসাহ দিতে হইবে। এবং প্রত্যেক গৃহস্থের ঘর হইতে কিছু কিছু ঘৃত সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অনেক যুবক এই পন্থাবলম্বনে ধনবান্ হইতে পারেন। গো'র তুল্য মহিষও রাখিতে হইবে। যদি তৃণশষ্পবিরল, বারিহীন উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গো-মহিষজাত ঘৃত দুরধিগম্য "দেহাত" হইতে সংগৃহীত হইতে পারে, তবে শস্যশ্যামলা বাঙ্গালার প্রত্যেক গ্রামে তাহাকে সুলভ করা কি এতই কঠিন?

গ্রামে গ্রামে এই সম্বন্ধে লোকমত সৃজন করা অবশ্য-কর্ত্তব্য।

সহর কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুসংখ্যক ভদ্রসন্তান প্রত্যহ ডেলি প্যাসেঞ্জার হইয়া কলিকাতায় আফিসে কর্ম্ম করেন। ইঁহাদের অনেকেরই ভিটা ব্যতীত খানিকটা জমী, একটা দুইটা পুষ্করিণীও আছে। তাহা ছাড়া অনেকেরই ঘরে বিধবা ভগ্নী বা অপরাপর পোষ্য আছেন। এই ভদ্রসন্তানেরা সামান্য ৪০৲ বা ৫০৲ টাকা বেতনের জন্য কতই যে কষ্ট সহ্য ও লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা যে সময় যে শ্রম ও যে সহিষ্ণুতা ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহার উপরে আর একটু কষ্ট করিয়া, নিজ নিজ জমী ভাগে চাষ করাইলে, পুষ্করিণীতে মাছ ছাড়িলে, দুই চারিটি গাভী পুষিলে এবং বাড়ীর রমণী-দিগকে কিছু কিছু সূতা বা উল কিনিয়া দিলে, নিজের আয়ও বাড়াইতে পারেন, দেশেরও উপকার করিতে পারেন। ইহার উত্তরে অনেকে হয়ত বলিবেন, টাকা পাইব কোথায়? "গাভী ক্রয় করিতেও টাকার আবশ্যক, রক্ষা করিতেও তাই; পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করাও ব্যয়সাপেক্ষ।" ইহার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিব,—"কন্যার বিবাহের সময়ে টাকা আসে কোথা হইতে?" তখন বাধ্য হইয়া ঋণগ্রহণ করিতে হয় এবং সেই ঋণ হইতে কোনও রকমে আয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি ভরসা করিয়া ঋণ লইয়া পুকুরে মাছ ছাড়া যায় বা ভাগে জমী চাষ করান যায়, বা ভেড়া, ছাগল, হাঁস, পারাবত প্রভৃতি পোষা যায়, ইহাদের সকলগুলি হইতেই ঋণ পরিশোধের উপায় আপনিই হইয়া আইসে।

ভেজালের আশ-পাশ কথা বলিয়া ভেজালতত্ত্বের আলোচনা না করা অসঙ্গত হইবে বিবেচনায়, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভেজাল-তথ্যের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভেজাল যে সুধু খাদ্যদ্রব্যেতেই মিশান হয়, তাহা নহে; ঔষধিতেও বহু-প্রকারের ভেজাল দেওয়া চলে। স্বাদবিহীন কুইনিনের সৃষ্টি হওয়া অবধি, হোমিওপ্যাথভায়াদিগের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা মুখে কুইনিনের অজস্র নিন্দাবাদ করিতে করিতে দুগ্ধ-শর্করার সহিত ইউকুইনিন ব্যবস্থা করেন এবং স্বহস্তে রোগীকে দিয়া থাকেন। এ ভেজাল কি কম দুষ্টামীমাখা?

কবিরাজ মহাশয়েরাও কম ভেজাল ব্যবহার করেন না। আমি সকল কবিরাজের কথা বলিতেছি না—কিন্তু কি ছোট কি বড়, অনেক কবিরাজ মহাশয়ই পুরাদস্তুর এলোপ্যাথিক ঔষধকে কবিরাজী নামে চালাইয়া থাকেন। কুইনাইনের নামে অযথা দোষারোপ করিতে করিতে কুইনাইনঘটিত মিকশ্চার ও বটিকা তাঁহারা অনেকেই ব্যবহার করেন। এলাইচের আরক—নির্ভেজাল বিলাতী আরক—বোতলমধ্যে যাইয়া কবিরাজী নামে বহুগুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। খাঁটি পোর্ট ওয়াইন সূতিকা প্রভৃতি রোগের কবিরাজী ঔষধ বলিয়া দশগুণমূল্যে বিক্রীত হয়। ডাক্তারী অনেক লৌহ এখন কবিরাজ মহাশয়দিগের লৌহের স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। রুবার্ব্ব বা রেউচিনি এখন কবিরাজখানায় বর্ত্তমান থাকেন। ইত্যাকার দৃষ্টান্ত আর কত দিব? যত-দিন আমাদের দেশের লোকেরা তথ্যানুসন্ধিৎসু না হইবেন, ততদিনই তাঁহারা প্রতারিত হইবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভেজালব্যাপার অতীব বিস্তৃত হইয়াছে। অহিফেনসেবীরা জানেন না যে, অহি-ফেনের সঙ্গে কত ধূলা, বালি, পোস্তদানা, চিটা গুড়, কাষ্ঠা-ঙ্গার চূর্ণ, তামাকপাতা, গঞ্জিকা, বেলের কাথ, পুরাতন তেঁতুল, বাবলাগাছের পত্রচূর্ণ ও গোময় মিশাইয়া অহি-ফেনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। নস্যসেবীরা জানেন না যে, নস্যে কত পরিমাণে চূণ ও সাজিমাটি মিশান হয়। দেশী মদ্যপায়ীরা জানেন না যে, মদ্যে কি পরিমাণে গাজররস, লঙ্কাবীজ প্রভৃতি মিশান হয়।

আজকাল প্রতিযোগিতার ফলে কোনও কোনও ডাক্তারখানায় ঔষধের অভিনব "ভেজাল" আরম্ভ হইয়াছে। এক নং ব্রাণ্ডি চাহিলে, দুই নং ব্রাণ্ডি কেহ দিয়া থাকে। প্রেস্ক্রপসানে প্রত্যেক মাত্রায় ১০ গ্রেণ ঔষধ লেখা থাকিলে তাহার স্থলে ২।৩ গ্রেণ মাত্র দেওয়া হয়। কোকেন-দ্রবে অনেক সময়ে কোকেন থাকেই না, আবার সুধু কোকেনের সঙ্গে ফেনাসেটিন নামক ঔষধ মিশাইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। এরূপ দৃষ্টান্ত আর স্বতন্ত্র না দিয়া নিম্নে কোষ্টকাকারে ভেজালের তালিকা দিলাম :—

এরোরুটে—ভেজাল গোল আলুর চূর্ণ, চালের গুঁড়া, ভুট্টার চূর্ণ।

আটা—Soap-stone নামক একপ্রকারের পাথরের গুঁড়া, খড়িচূর্ণ, চূণ, ফটকিরি, চিনামাটি, চাউল, যব, আলু, জৈ বা মটরচূর্ণ। এতদ্ব্যতীত জিঙ্ক সালফেট, বেরিয়াম সালফেট ও কার্ব্বনেট।

বার্লি—ছাতু, আটা, আলুচূর্ণ, খড়ি।

পাঁউরুটি—ফটকিরি, তাড়ি ও কাপড়কাচা সোডা, ভুট্টা, চাউল, মটরচূর্ণ।

মাখন—"পাম" (palm) তৈল, চর্ব্বি, নারিকেল তৈল, ভ্যাসেলিন, মার্গারিণ, মোমবাতি, পক্ককদলী।

লঙ্কাচূর্ণে—লৌহচূর্ণ (মরিচা), ইষ্টকচূর্ণ, লাল শীষক-লবণ।

ছানাতে—বাসি ছানা।

সিরাপে—স্যালিসিলিক আসিড।

ঘৃতে—সকল জাতীয় জীবন্ত ও মৃত জীবজন্তুর চর্ব্বি, মহুয়া তৈল, এরণ্ড তৈল, ভ্যাসেলীন, চিনাবাদাম তৈল, চাউল ও বাজরাচূর্ণ, গোল আলু ও রাঙ্গা আলু, কচু, পক্ক-কদলী।

মধুতে—চিনি ও জেলাটিন নামক পদার্থ (টেংরি হইতে যাহা পাওয়া যায়।

চর্ব্বিতে—তুলাবীজ তৈল, জল।

দুগ্ধে—মাখন তুলিয়া বাতাসা, এরোরুট, মহিষ দুগ্ধ, জল, চুণের জল।

সর্ষের তৈলে—ব্লুমলেস অয়েল নামক একপ্রকারের কেরোসীন তৈল, সোরগোঁজার তৈল, চিনাবাদামের তৈল, লঙ্কাচূর্ণ।

চাউলে—ছাতাপড়া, ভগ্ন, পোকাধরা ও নিকৃষ্ট জাতীয় চাউল।

জাফ্রাণে—অপর ফুলের পরাগ ও মাংসটুকরা।

মৃগনাভিতে—মৃগের রক্ত ও ধূলা।

চিনিতে—সুজি, বালি।

[যাঁহারা এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা লেখক প্রণীত ইংরাজী "Outlines of Hygiene and Public Health" গ্রন্থ দেখুন।—অনাথবন্ধু সম্পাদক।]

পরলোকের কথা

সম্পাদক।]

(২)

তথ্যই বিজ্ঞানের বনিয়াদ। তথ্য ছাড়িয়া বিজ্ঞান কখনই আপনার সোধ রচিতে পারে না। যেখানে তথ্য বাদ পড়ে, সেইখানেই বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। প্রেততত্ত্বসম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। সে সকল তথ্যের সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করা বড়ই কঠিন। একজন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন,—"এই ক্ষেত্রে আমরা অতি-বিশ্বাসী এবং দায়িত্বজ্ঞানবর্জ্জিত লোকের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করি নাই, পরন্তু শিক্ষিত নরনারীর নিকট হইতেই ঐ সম্বন্ধে প্রমাণ পাইয়া থাকি। ঐ সকল লোক, তাঁহাদের দায়িত্ব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেন এবং তাঁহারা এই সম্পর্কে তাঁহাদের নাম প্রকাশ করিতে সঙ্কোচবোধ করেন না। তাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিকতাসম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহই করা যায় না। তবে তাঁহাদের ভ্রান্তি হইতে পারে" * * * কিন্তু সকল ক্ষেত্রে উহা ভ্রান্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না; কিন্তু বহু-ক্ষেত্রে, দৈবাৎ মিল যত ক্ষেত্রে হইতে পারে—তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক ক্ষেত্রে, একটা অজ্ঞাত অচিন্তিতপূর্ব্ব সত্য ঘটনার সহিত যদি তাহার বিস্ময়জনক মিল ঘটে, তাহা হইলে সেরূপ তথ্যকে chance coincidence বা দৈবযোগে মিল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করা মহামূর্খের কার্য্য। আমরা যে বিজ্ঞানের এত বড়াই করিয়া থাকি, তাহারই বা কয়টি তথ্য আমরা ঠিক বুঝিয়া থাকি? বিজ্ঞানের সংগৃহীত তথ্য ঠিক হইতে পারে, কিন্তু তাহার যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তাহার কয়টি একেবারে অভ্রান্ত হইয়াছে? কয়টি তথ্যের গূঢ় রহস্য বুঝা গিয়াছে? যাঁহারা রসায়নশাস্ত্রের বর্ণমালা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, Oxygen এবং Carbonএর সম্মিলনে গ্যাসের আলো হয়। কিন্তু উহার দুইটির কোনটিই স্বতন্ত্রভাবে আলোক বিকীরণে সমর্থ হয় না। যাহা ব্যষ্টিতে নাই, তাহা সমষ্টিতে আসিল কোথা হইতে? রসায়নশাস্ত্র ইহার ব্যাখ্যায় শেষকথা বলিতে পারেন নাই, সকল জিজ্ঞাসা নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন, ইহা একটা তথ্য। তোমরা আমাদের পরীক্ষাগারে আইস, আমরা হাতেনতে তোমাদিগকে উহা যে সত্য, তাহা দেখাইয়া দিতেছি। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক সম্মিলনে জল হয়। কিন্তু যদি কোন পিপাসা-পীড়িত ব্যক্তি এক পোয়া হাইড্রোজেন আর আধ পোয়া অক্সিজেন খায়, তাহা হইলে তাহার পিপাসা শান্তি হয় কি? কখনই না। অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, দেহে জলের অভাব বা প্রয়োজন হইলেই জলপিপাসা বোধ হয়। জলের অভাব বা প্রয়োজন অর্থে ঐ দুই উপাদানেরই অভাব বা প্রয়োজন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে উহাতে পিপাসার শান্তি হয় না কেন? উপাদানে যে গুণ নাই, উপাদানের সমবায়ে বা সম্মিলনে সে গুণ আসে কোথা হইতে? তুমি বলিবে, রাসায়নিক সংশ্লেষণের ফলে ঐ গুণের উদ্ভব হইয়াছে, আমি বলিব, গুণ কখনও দ্রব্যকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না। কোন্ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া জলে ঐ গুণ বর্ত্তিল? রাসায়নিক সংশ্লেষণ (Chemical

Combination) একটা বিশেষভাবে সম্মিলন মাত্র; কিন্তু সম্মিলন যে ভাবেই হউক, উহাতে নূতন উপাদান দেয় না। আবার অগ্নিনির্ব্বাপণেও আমরা ঐ ব্যাপার দেখিতে পাই। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন কেহই স্বতন্ত্রভাবে অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে পারে না, কিন্তু জল পারে। এই গুণ কোথা হইতে আসিল? প্রত্যক্ষহিসাবে বলিতে হয় যে, রাসায়নিক সংশ্লেষণই ঐ গুণের বা শক্তির উদ্ভব করিয়া দিয়াছে। অথবা উহা উপাদানবিশেষে সুপ্ত ছিল, বিন্যাস-বিশেষের ফলে প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা একটা গোঁজা-মিল বা আজামোজা ব্যাখ্যা। সংশ্লেষণ বা সংযোগ একটা কার্য্য বটে, কিন্তু দ্রব্য নহে। কার্য্য গুণের উদ্ভব করিতে পারে না। ঐ গুণ যে মূলপদার্থে সুপ্ত ছিল, তাহাও প্রমাণ করা যায় না। রাসায়নিকরা বলেন, মূলপদার্থগুলির সংযোগে এক নূতন পদার্থের আবির্ভাব হইল; সেই নূতন পদার্থ নূতন ধর্ম্ম প্রকটিত করিয়া থাকে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিয়া জল হইল। কিন্তু হাইড্রোজেনও জল নহে, অক্সিজেনও জল নহে। জল স্বতন্ত্র পদার্থ, সুতরাং বিভিন্ন ধর্ম্মী। পার্থক্য এই যে, জল রূঢ় পদার্থ (element) নহে, উহা যৌগিক পদার্থ। আমরা হাতেনতে দেখাইয়া দিতেছি, রূঢ় পদার্থে যে গুণের বিকাশ নাই, যে ধর্ম্ম লক্ষিত হয় না, যৌগিক পদার্থে সেই ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। এই প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ তথ্য অস্বীকার করা বাতুলতা মাত্র। আমরা পৃথিবী শুদ্ধ লোক ঐ রহস্য না বুঝিলেও কার্ব্বন ও অক্সিজেন সম্মিলিত হইয়া কার্ব্বনিক এসিডে পরিণত হইবার সময় আলোক বিকীর্ণ করিবে, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন জলে পরিণত হইয়া পিপাসার শান্তি ও অগ্নির নির্ব্বাণসাধন করিবে। তুমি যতই বল, কার্ব্বনিক অক্সাইড গ্যাস স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, জল দুইটি রূঢ় পদার্থের বিকার মাত্র, তাহাতে কিছুই আসিবে যাইবে না। উহার ঐ ধর্ম্মগুলি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহা না বুঝিলেও লোক তাহা বিশ্বাস করে। জল কেন পিপাসার শান্তি করে, সে জিজ্ঞাসা কয়জনকার?—কিন্তু পিপাসা পাইলেই সকলেই জল খায়। তাই বলি কারণ না বুঝিলে যে লোক কোন তথ্য স্বীকার করে না, তাহা নহে; বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই যাহা প্রত্যক্ষ দেখে, তাহাই বিশ্বাস করে। রসায়নশাস্ত্রের অনেক ব্যাপারের কারণ অজ্ঞাত থাকিলেও তথ্য সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য।

Phemominal science বা স্থূলবিজ্ঞান মাত্রেরই ঐ দশা। উহাতে যুক্তিতর্ক অতি অল্প। রসায়নশাস্ত্রে কোন কোন রূঢ় পদার্থের (elements) সহিত কোন কোন রূঢ় পদার্থের সম্মিলিত হইবার একটা প্রবণতা (affinity) আছে, তাহা কেন হয়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ করা যায়। ইহার ফলেই এই বিশ্বচরাচর ভাঙ্গিতেছে, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। ইহা না থাকিলে একটি রূঢ় পদার্থের সহিত অন্য রূঢ় পদার্থের রাসায়নিক সংশ্লেষণ হইত না। পদার্থ-বিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রভৃতি Phemomenal scienceএরও ঐ দশা। ম্যালেরিয়ার নিদান আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে কুইনাইন যে উহার প্রতিষেধক, তাহা লোক জানিতে পারিয়াছিল। কিন্তু তখন কুইনাইন কেন ঐ রোগের প্রতিষেধক, তাহা বুঝিতে পারে নাই। এখন বিজ্ঞান আর একপদ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু সকল জিজ্ঞাসা নিরস্ত করিতে পারে নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, আমরা যে বিজ্ঞানকে এত বড় করিয়াছি, তাহা যদি তথ্যমূলকই হয়, আমরা কেবল দেখিয়াই বিনা বিচারে তাহা মানিয়া লই, তাহা হইলে 'প্রেততত্ত্ব' সম্বন্ধে আমরা তথ্যকেই বড় না করিব কেন? কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রেততত্ত্ববিষয়ক তথ্যগুলি সকলের গোচরে আনা যায় না। পাশ্চাত্যখণ্ডে উহা সকলের গোচর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উহা যে সকল সন্দেহ নিরস্ত করিতে পারিয়াছে, তাহা কোনমতেই বলা যায় না। তবে উহার কতকগুলি তথ্য একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—বশীকরণবিদ্যা (Hypnotism) চিন্তাসংক্রমণ (Telepathy) এবং চিন্তাগ্রহণবিদ্যা (Thought Reading)। লোক যে এগুলি বুঝিয়া পড়িয়া মানিয়া লইয়াছে তাহা নহে, তথ্য দেখিয়া উহা মানিয়া লইয়াছে এবং Chemical affinityর ন্যায় উহা এক অজ্ঞাত শক্তির খেলা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে আমরা যত কড়া হই যত অবিশ্বাসের ভাব দেখাই, অন্য কোন বিজ্ঞানসম্বন্ধে তত কড়া হই না। যখনই আমরা এ দৃষ্ট তথ্যের যাথার্থ্য অস্বীকার করিতে না পারি, তখনই আমরা উহা মনের ভ্রান্তি বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করি। যাঁহারা এরূপ-ভাবে কুসংস্কারাবিষ্ট, তাঁহাদিগকে কোন কথাই বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

এই সম্পর্কে একটা কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। মানুষ যে কেবল নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে, তাহা নহে, জাগ্রত অবস্থাতেও মানুষ সময় সময় স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। আমি হয় ত স্পষ্ট দেখিলাম,—মাণিকবাবু ছাতা-হস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু বাস্তবিক মাণিকবাবু সে সময় সেখানে আইসেনই নাই, তাহার অনেক পরে তিনি আসিলেন। তেমন ব্যাপার সময় সময় ঘটে। ইহা নিশ্চিতই ভ্রান্তি বা জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্ন। মাথা গরম হইলে জাগ্রত অবস্থায় মানুষ এমন স্বপ্ন দেখে। ভৌতিক ব্যাপারে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা সমস্ত ভৌতিক ব্যাপারকে এই-রূপ "ভ্রান্তি" বা জাগ্রত অবস্থায় দৃষ্ট স্বপ্নের পর্য্যায়ে ফেলিতে চাহেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সকল ক্ষেত্রে ফেলা যায় না।

আমি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আমার বিশ্বাসভাজন বন্ধুর কথা যাহা বলিয়াছি এবং ইসেক্সনিবাসী রেভারেণ্ড মণ্টিফ্রুষ্টসম্বন্ধে যে ঘটনা বিবৃত করিয়াছি, তাহাকে ঐরূপ জাগ্রত-স্বপ্নের পর্য্যায়ে ফেলিলে ভুল করা হয়। কারণ উহার প্রত্যেকের সহিত একটা বাস্তব ঘটনা অতি বিস্ময়করভাবে জড়িত রহিয়াছে। বাস্তব ঘটনার সহিত এরূপ বিস্ময়কর সম্বন্ধকে chance coincidence বলা সঙ্গত কি না, তাহাই বিচার্য্য। যাহা দৈবাৎ ঘটে, তাহাকে chance coincidence বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। দুই একটি ঘটনা এমনই ঘটিয়া থাকে যে, তাহাকে আর দৈবাৎ মিল বলিবার উপায় নাই। এক ব্যক্তি পুত্রের ব্যবহারে নিতান্ত মনের কষ্টে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি রাত্রিকালেই গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র তখন সেই স্থান হইতে বহুশত মাইল দূরে ছিলেন। যে রাত্রিতে তাঁহার পিতা গলায় দড়ি দিয়াছিলেন, সেই নিশাতেই পুত্রের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তিনি বাহিরে আইসেন। গৃহের দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন যে, সম্মুখে তাঁহার পিতার বিবর্ণমূর্ত্তি ও তাঁহার গলায় দড়ি! দেখিয়াই তিনি ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। বাড়ীতে অনেক লোক ছিল। তাঁহারা সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। মাথায় জল ঢালিয়া অনেক কষ্টে তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করা হয়। তখন তিনি সমস্ত বিবরণ বিবৃত করেন। তাহার দুই তিন দিন পরে তিনি বারাণসী হইতে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার পিতা গলায় দড়ি দিয়া সেই রাত্রিতেই দেহত্যাগ করিয়াছেন।

যে রাত্রিতে পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, ঠিক সেই রাত্রিতেই পুত্রের জাগ্রত অবস্থায় পিতৃমূর্ত্তি স্বপ্নে দেখা না হয় তর্কের খাতিরে দৈবাৎ মিল বলিয়া ধরিয়া লইলাম। কিন্তু গলায় দড়ি পর্য্যন্ত দেখাও কি দৈবাৎ মিল ধরিয়া লইতে হইবে? এরূপভাবে দৈবাৎ মিল ধরা কি সঙ্গত? এরূপ মিলকে বিস্ময়কর মিল বলিলে সত্যকে চাপা দেওয়া হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে আমি যে বন্ধুর কথা বলিয়াছি, তাহাও অনেকটা ঐরূপ বিস্ময়কর। পাদ্রী মণ্টিফ্রুষ্ট নিজেই বলিয়াছেন, "মৃত্যুর পর অনেকে আত্মীয়-বান্ধবকে দেখা দেয়, একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস করেন নাই। সুতরাং এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল নহে। যাহা বিরল নহে, তাহাকে কখনই দৈবাৎ ঘটনা বলা চলে না।"

মানুষের মনে যে ভ্রান্তি জন্মে, মানুষ যে জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে, একথা সত্য। পূর্ব্বে ডাক্তাররা মনে করিতেন যে, উন্মাদরোগগ্রস্ত, নেশাখোর অথবা পীড়িত লোকেরই ভ্রান্তি জন্মে। কিন্তু ইদানীং জানা যাইতেছে যে, সে ধারণা ঠিক নহে। আমরা যাহাদিগকে সচরাচর প্রকৃতিস্থ বলি, যাহারা সংসারের সাধারণ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যেও অনেকে এইরূপ ভ্রান্তির অধীন। কতকগুলি লোক আছে, তাহাদের মনে হয় যেন কে তাহাদিগকে ডাকিতেছে, কে যেন তাহাদের পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে; কেহ বা হঠাৎ যেন কোনরূপ গন্ধ পাইল, এইরূপ মনে করে। অধিকাংশ লোকের দর্শনেন্দ্রিয়সম্পর্কে বিভ্রম জন্মে। যাহাদের দর্শনেন্দ্রিয়সম্বন্ধে বিভ্রম ঘটে, অর্থাৎ যেখানে যে বস্তু নাই, সেইখানে সেই বস্তু আছে বলিয়া মনে করে, তাহাদের মধ্যে আবার অনেকে ভ্রান্তির ফলে মানুষই দেখিয়া থাকে। সুস্থ মানুষের এই মগজের রোগ বা দৃষ্টিবিভ্রম ইদানীং ধরা পড়িতেছে। এই রোগ কোন্ জাতির মধ্যে কত দূর বিস্তৃত, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। তবে এটুকু সত্য যে, পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এই রোগ অধিক হইয়া থাকে। হিষ্টিরিয়াগ্রস্ত বা সামান্য একটু হিষ্টিরিয়ার ঝোঁক আছে, এমন স্ত্রীলোকের ভিতর এই রোগের খুব প্রাবল্য দেখা যায়। আবার পুরুষ অপেক্ষা মেয়েদের মধ্যে প্রেতাত্মা-দর্শকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং যদি লোক দৃষ্টিবিভ্রমের অধীন হয়, তাহা হইলে তাহাদের দৃষ্টভ্রান্তি দৈবযোগে বাস্তবের সহিত মিলিয়া যায়। যে লোক প্রায়ই স্বপ্ন দেখে, তাহার দুই একটা স্বপ্ন যে খাটিয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

নিদ্রিত ও জাগ্রত অবস্থায় মানুষ কেন স্বপ্ন দেখে, য়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা সে বিষয় লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের স্মৃতি কেন থাকে, সে কথারও আলোচনা হইতেছে। প্রেততত্ত্বের আলোচনার সহিত এই বিষয়টি যখন বিশেষভাবে বিজড়িত, তখন এইখানে সংক্ষেপে তাহার একটু আভাস দেওয়া কর্ত্তব্য। কারণ এই প্রসঙ্গে যত কথা উপস্থাপিত করা হইয়াছে, যত প্রকার ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে, অন্ততঃ তাহার প্রধান প্রধান কথার আলোচনা করা উচিত।

একদল পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা বলেন,—প্রেতাত্মাদর্শন মানসী ভ্রান্তির ফল। যে কারণে মানুষ স্বপ্ন দেখে, সেই কারণেই জাগ্রত স্বপ্ন দেখে। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতরা স্থির করিয়াছেন যে, মানুষের মগজে তিন হাজার কোটি কোষ (cell) আছে। মানুষের যত ইন্দ্রিয়জ অনুভূতি হয়, তাহার প্রত্যেকটির একটি করিয়া দাগ ঐ কোষে পতিত হয়। আমরা যাহা দেখি, শুনি বা অন্য প্রকারে অনুভব করি, তাহার প্রত্যেকটির এক একটি করিয়া দাগ (impression) উহার একটি না একটি কোষে পড়িবেই পড়িবে। যখন সেই দাগ পড়া কোন কোষ কোন কারণে উদ্দীপ্ত বা উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গেই সেই ইন্দ্রিয়জ অনুভূতিরই পুনরভিনয় হয়। মনে করুন, আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে বিমলকে দেখিয়াছি। তাহার চেহারার দাগ আমার মগজের একটা কোষে পড়িয়াছে। যখন কোন কারণে সেই কোষটি উত্তেজিত হইবে, তখনই বিমলের কথা ও চেহারা আমার মনে পড়িবে। ঐ কোষ যদি কোন কারণে

বড় বেশী উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে বিমলের চেহারা হুবহু আমার নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইবে। মৃদু উত্তেজনায় বিমলের কথা মনে পড়ে, তদপেক্ষা অধিক উত্তেজনায় তাহার চেহারা মনে পড়ে; অতি প্রচণ্ড উত্তেজনা ব্যতীত জাগ্রত অবস্থায় বিমলের চেহারা আমার নয়নসমক্ষে উপস্থিত হয় না। মস্তিষ্কের এই কোষগুলি পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ও জটিলভাবে বিজড়িত। এক প্রকোষ্ঠের কোষগুলিতে কোনরূপ আঘাত পড়িলে তাহার সহিত নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ অন্য প্রকোষ্ঠের কোষগুলিতে তাহার ঝঙ্কার লাগে। ফলে একটা অনুভূতির সহিত অন্য অনুভূতি অল্পাধিক জাগিয়া উঠে। একটা ভাব তাহার সহিত বিজড়িত অন্য ভাবের স্ফুরণ করে। জাগ্রত অবস্থার আমাদের মনে যে সমস্ত অনুভূতি হয়, তাহার সহিত অন্য অনুভূতির স্মৃতিও জাগিয়া উঠে, কিন্তু উপস্থিত অনুভূতি এত প্রবল হয় যে, অন্য অনুভূতি তখন গ্রাহ্যের মধ্যেই আইসে না। জাগ্রত অবস্থায় মন সেই জন্য উপস্থিত ব্যাপার লইয়াই ব্যস্ত থাকে। আমরা উপস্থিত যাহা কিছু দেখি, শুনি, ভাবি, তাহা লইয়া মশ্‌গুল থাকি; সঙ্গে সঙ্গে যে বাজে চিন্তা, বাজে চিত্র, বাজে স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠে, তাহা প্রবল বৈদ্যুতিক আলোকের সন্নিহিত মৃদু প্রদীপের আলোকের ন্যায় নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন আমরা নিদ্রিত হইয়া পড়ি, তখন আমাদের প্রত্যক্ষ কোন অনুভূতি বা চিন্তা থাকে না। তখন যদি ভিতরের বা বাহিরের কোন প্রকার গোলযোগের ফলে মস্তিষ্কের কোন প্রকোষ্ঠস্থিত কোষগুলি উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেতারের তারের ঝঙ্কারের মত পর পর সন্নিবিষ্ট কোষগুলি উত্তেজিত হইয়া একটা মানসচিত্রের সৃষ্টি করে। আমরা তখন স্বপ্ন দেখি। জাগ্রত অবস্থায় যে প্রবল প্রত্যক্ষ অনুভূতি থাকে, নিদ্রিত অবস্থায় তাহা থাকে না। সেই জন্য প্রবল বিদ্যুতের আলো অপসারিত হইলে প্রদীপের আলো যেমন প্রবল হয়, নিদ্রিত অবস্থায় উদ্বোধিত সেই স্মৃতিজ চিত্র তখন তেমনই প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপারের ন্যায় সমুজ্জ্বল মনে হয়। স্বপ্ন উদ্বুদ্ধ স্মৃতি মাত্র। তবে কখনও সেই স্মৃতি সরলভাবে অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু প্রায়ই নানা কোষে ঝঙ্কার পড়াতে নানা স্মৃতি এলোমেলো জগাখিচুড়ীর মত একটা নূতন চিত্রের সৃষ্টি করে। সে চিত্র বাবাজীর আলখাল্লার মত নানা টুক্‌রা স্মৃতি যোড়া দেওয়া। ইহাই হইল—মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা।

এখন জিজ্ঞাস্য,—জাগ্রত অবস্থায় আমরা স্বপ্ন দেখি কি করিয়া? যখন দ্যুতিমান বিবস্বানের আলোক সমুজ্জ্বল রহিয়াছে, তখন ক্ষুদ্র খদ্যোতের আলো তাহাকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়া আপনি বড় হয় কেমনে? স্মৃতি প্রত্যক্ষকে ছাপাইয়া যায় কেন? মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এ কথার খোলসা উত্তর দিতে পারেন নাই। তাঁহারা বলেন,—কোন কারণে, যে কারণ এখনও সম্যক্‌ভাবে বুঝা যায় নাই এমন কারণে, অপ্রত্যক্ষ ব্যাপারের স্মৃতি বা চিত্র ঠিক যেন বাস্তব ব্যাপারের মত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। মনোবিজ্ঞানের মতে স্মৃতিজ চিত্রে ও প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির চিত্রে অন্য কোন পার্থক্য নাই, কেবল এইমাত্র পার্থক্য আছে যে, প্রত্যক্ষ চিত্র স্মৃতিজ চিত্র হইতে অধিকতর সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে। আমি সম্মুখে হেমেন্দ্রকে দেখিতেছি, কিন্তু বিমলের কথা আমার মনে পড়িতেছে এরূপ ক্ষেত্রে হেমেন্দ্রের চিত্র আমার সম্মুখে যেরূপ পরিস্ফুট হইবে, বিমলের চিত্র সেরূপ কখনই হইবে না। ইহাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যদি কেহ বলে যে, সে কলিকাতায় বসিয়া সত্য সত্যই কাণপুরস্থিত বিমলকে তাহার সম্মুখে দেখিতেছে, তাহা হইলে তাহার কথা বিশ্বাস করা ভিন্ন অন্য উপায় কি আছে? মানুষ যতটুকু সত্য সত্যই চোখে দেখে, কল্পনা অনেক সময় তাহার কতকটা অস্পষ্ট জিনিস পূর্ণ করিয়া দেয়। অন্ধকারে, অতি মৃদু আলোকে যখন আমরা কোন অস্পষ্ট পদার্থ দেখিবার জন্য চক্ষুকে বিস্ফারিত করি, তখন হয়ত একটা কুকুর দেখিয়া বাঘও মনে করিতে পারি! রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। পত্রশব্দ শুনিয়া রথচক্রের নির্ঘোষ মনে করি। ইহা হয় কেন? তাহার কারণ সম্যক্‌ আলোকের অভাবে চক্ষু সমস্ত ব্যাপারটা দেখিতে পায় না, কতকটা দেখে মাত্র, বাকীটা কল্পনায় পূরাইয়া লয়। কাজেই সারমেয়কে শার্দ্দূল মনে হয়। রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভয় পাই। শব্দসম্বন্ধেও ঐরূপ হয়। যাহারা আড়কালা, তাহাদের ঐরূপ ভ্রম অধিক হইয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য,—মানুষ যখন মানসিক কোন অজ্ঞাত উত্তেজনাবশতঃ হঠাৎ চোখের সাম্‌নে একটা চিত্র উদ্ভাসিত দেখে, তখন সে হয়ত বাস্তবিক যতটা না দেখে, তাহার কল্পনা সেই চিত্রের ততটা পূরণ করিয়া দেয়।

বলা বাহুল্য, এই জাগ্রত-স্বপ্ন বা ভ্রান্তি-সম্পর্কিত ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নহে। উন্মাদগ্রস্ত বা প্রলাপপীড়িত রোগীর ঐ ভ্রম হয়, হইতে পারে। সুস্থব্যক্তির পক্ষে এরূপ হওয়া বড়ই বিস্ময়কর, অনেকটা অসম্ভব। টানিয়া বুনিয়া একটা ব্যাখ্যা খাড়া করিলেই বিষয়টা বুঝা যায় না। একটা তথ্যকে উড়াইয়া দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া একটা ব্যাখ্যা দেওয়া হইতে সত্য বুঝিবার জন্য ব্যাখ্যা দেওয়া স্বতন্ত্র। পক্ষবিশেষকে টানিয়া ওকালতী করিলে ব্যাখ্যা করা হয় না। এ ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবল আপত্তি এই,—

(১) এইরূপ জাগ্রত-স্বপ্নদর্শন বা মানসী-ভ্রান্তি মস্তিষ্কের পীড়া দ্যোতনা করে। যাহার ঐ পীড়া আছে, তাহার পক্ষে জীবনে উহা একবার ঘটা বিস্ময়কর।

(২) এরূপ ভ্রান্তিসংঘটন মানস-বিকার। বাহ্য-ব্যাপারের সহিত উহার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ ভ্রান্তির সহিত সত্যসংঘটিত কোন ব্যাপার বিশেষভাবে জড়িত হয়, তাহা হইলে উহাকে মানস-বিকার বলি কি করিয়া?

যদি আমি কলিকাতায় থাকিয়া কাশীর কোন মুমূর্ষু বা অত্যন্ত পীড়িত বন্ধুর চেহারা দেখি, দেখিবার সময় বা পূর্ব্বে তাহার পীড়া বা মৃত্যুর কোন খবর না পাই, তাহা হইলে উহাকে নিছক মানসবিকার বলিয়া ছাড়িয়া দিলে সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয় কি? অবশ্য যদি কচিৎ এইরূপ দুই একটা ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলেও না হয় ঐ ব্যাখা মানিয়া লওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ 'বিস্ময়কর মিল' এত ঘটে যে, তাহাকে দৈবযোগে মিল বলাই যাইতে পারে না।

(৩) রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। কিন্তু রজ্জু না থাকিলে ত আর তাহাতে সর্পভ্রম হয় না। মানসরজ্জুতে আর সর্পভ্রম সম্ভবে না। যদি কেহ কোন অন্ধকার ঘরে যাইয়া সাপ সাপ বলিয়া চীৎকার করে, তাহার পর সত্য সত্যই যদি কেহ সেই ঘরে সর্পকর্তৃক দষ্ট হয়, তাহা হইলেও যদি কেহ ঐ ব্যাপারকে এই বলিয়া ব্যাখা করেন যে, ঐ লোকটার রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছিল, তাহা হইলে সেই ব্যাখ্যাতাকে কি বাতুলালয়ে স্থান দিবার ব্যবস্থা হয় না?

কামন্দকীয় নীতিসার। *

[শ্রীযুত গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন কর্তৃক লিখিত।]

প্রথম সর্গ।

রাজ প্রশংসা।

যাঁহার প্রতাপে জগৎ সনাতন ধর্ম্মপথে অবস্থান করিয়া থাকে, সেই দ্যুতিশীল, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, দণ্ডধারী ভূপতির জয় হউক।

ইহার তাৎপর্য্য এই,—অষ্টদিক্‌পালের অংশে অবতার্ণ প্রজাপালক রাজা শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন না করিলে—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন না করিলে—রাজ্যমধ্যে ভীষণ অরাজকতা এবং প্রবল অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা ঘটিত; সনাতনধর্ম্ম বিচ্ছিন্ন হইত; ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান লোপ পাইত; নিরীহ প্রজাবর্গের ধনপ্রাণ সর্ব্বদাই আতঙ্কে পূর্ণ থাকিত। এই কারণে প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাপালক দণ্ডধর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ শাসনদণ্ডের ভয়ে কেহই উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইতে পারে না। এইরূপ প্রতাপশালী, ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং দণ্ডধর ভূপতির সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ কামনা সর্ব্বথা যুক্তিসঙ্গত ॥১॥

নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বিষ্ণুশর্ম্মাকে অভিবাদন।

মহর্ষিগণ যেরূপ বিশালবংশে জন্মিয়া থাকেন, সেইরূপ যাঁহারা দান লইতেন না, এইরূপ অনেক মহাকুলজাত মহাপুরুষদিগের বংশে যিনি ভূতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, যিনি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, যিনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য, যিনি বুদ্ধির প্রাখর্য্যে সকল বিষয়ে সুনিপুণ এবং যিনি চারিখানি বেদকে একখানি বেদের ন্যায় অনায়াসে ও সহজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, বজ্রপাণি ইন্দ্র যেমন বজ্রানলদ্বারা পক্ষযুক্ত পর্ব্বতের সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রানলতুল্য তেজঃসম্পন্ন যাঁহার অভিচার (মারণ, বশীকরণাদি) রূপ বজ্র উত্তম উৎসবক্রিয়াসম্পন্ন ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরূপ পর্ব্বত সমূলে উৎপাটন করিয়াছিল; যাঁহার আভিচারিক ক্রিয়াদ্বারা নন্দবংশ সমূলে ধ্বংশপ্রাপ্ত হইয়াছে; যিনি শক্তিদ্বারা শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের তুল্য এবং যিনি একাকী বা অসহায় হইয়া মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে নৃপশ্রেষ্ঠ চন্দ্রগুপ্তের নিমিত্ত মেদিনী আহরণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ যিনি নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া ভূপতি চন্দ্রগুপ্তকে মগধরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন; এবং যিনি ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া অর্থশাস্ত্ররূপ মহাসমুদ্র হইতে নীতিশাস্ত্ররূপ অমৃত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, আমি সেই বিধাতার তুল্য অতুল শক্তিশালী সুধীবর বিষ্ণুশর্ম্মাকে নমস্কার করি ॥২—৬॥

নীতিশাস্ত্রের সরলতা।

সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী মহামতি বিষ্ণুশর্ম্মার সুদৃষ্টিতে পতিত হইয়া, রাজনীতিশাস্ত্রের জটিলতা ও অপ্রিয়তা দূরীভূত হইয়া, অর্থবিশিষ্ট অথচ একখানি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ॥৭॥

কিরূপে বিপক্ষবর্গ বিদলিত করিয়া পৃথিবী জয় করিতে হয় এবং কিরূপেই বা জয়লব্ধ পৃথিবীর পালন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতানুসারেই সংক্ষেপে রাজনীতির বিষয় প্রকাশ করিব ॥৮॥

পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে সমুদ্রের যেরূপ জলস্ফীতি হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাগণের নয়নাভিরাম ভূপতিও এই জগতের বৃদ্ধির বা অভ্যুদয়ের কারণ বলিয়া প্রাচীন পণ্ডিতগণের

অভিমত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রাজা শাসনদণ্ড পরিচালন করেন বলিয়া জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে না এবং প্রজাবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হয় ॥৯॥

রাজার আবশ্যকতা।

যদি নরপতি স্বকরে যমদণ্ডতুল্য ভীষণ শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন না করিতেন, সম্যক্‌রূপে দুষ্টদমন না করিতেন, তাহা হইলে প্রজাবর্গ সমুদ্রে কর্ণধারবিহীন তরণীর ন্যায় এই সংসারে রক্ষকবিহীন হইয়া পদে পদে বিপদাপন্ন হইত ॥১০॥

যে ভূপতি রাজধর্ম্মে তৎপর, যে রাজা সম্যক্‌রূপে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালনকার্য্যে অভিনিবিষ্ট এবং যে নৃপতি অসীম শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে শত্রুগণের নগর জয় করিয়া থাকেন, সেই বলবিক্রমশালী বিপক্ষবিজয়ী রাজাকে প্রজাকুল প্রজাপতি ব্রহ্মার ন্যায় বিবেচনা করিবে। ফলতঃ বিধাতা যেমন প্রজাবর্গের সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মানুসারে তাহাদের পালন করেন, সেইরূপ রাজাও প্রজাগণের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় প্রজাপতির তুল্য লক্ষিত হন ॥১১॥

রাজা সম্যক্‌রূপে প্রজাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। সেই প্রজাকুল রক্ষাগুণে বশীভূত ও কৃতজ্ঞ হইয়া ভূমিপতিকে করদানে এবং অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতাসূচক সম্মানদানে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। এই রক্ষণ ও বর্দ্ধনের মধ্যে বর্দ্ধন অপেক্ষা রক্ষণকার্য্য অধিকতর মঙ্গলজনক। কারণ, রক্ষার অভাব হইলে অর্থাৎ রাজা প্রজারক্ষা না করিলে সদ্বস্তুও অসদ্বস্তু হইয়া থাকে, মঙ্গলও অমঙ্গলরূপে পরিণত হয়, ফলতঃ বিদ্যমান বস্তুও রক্ষণাভাবে বিনষ্ট হইয়া যায় ॥১২॥

ন্যায়পরায়ণ রাজা নীতিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে এবং প্রজাদিগকেও ধর্ম্মার্থকাম এই ত্রিবর্গদ্বারা সংযোজিত করিয়া থাকেন অর্থাৎ নীতিপরায়ণ রাজাই ত্রিবর্গসাধন করিতে সমর্থ; এবং ত্রিবর্গসাধনক্ষম ভূপতির পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া সমস্ত প্রজাবর্গও ত্রিবর্গসাধন করিতে পারে; কিন্তু রাজা নীতিপথে প্রবৃত্ত না হইলে—রাজা অন্যায়াচরণপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিলে আপনাকে এবং প্রজাদিগকে নিশ্চয়ই বিনষ্ট করেন। নীতিগ্রহণই মঙ্গলের আলয় এবং নীতিবর্জ্জনই ধ্বংসের মূল বলিয়া পরিগণিত ॥১৩॥

ধর্ম্মানুসারে এবং অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনের ফল।

যবন নামে এক ভূপতি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া দীর্ঘকালই পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন এবং নহুষ রাজা অধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াই পুনর্ব্বার ধরাতলে নিপতিত হন * ॥১৪॥

অতএব পৃথিবীপতি ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া ধর্ম্মকবচে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া অর্থসাধনের নিমিত্ত যত্নপ্রকাশ করিবে। অগ্রে ধর্ম্ম, পশ্চাৎ অর্থ। ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, কি ধার্ম্মিক না হইলে কেহই অর্থলাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মের ফল অত্যন্ত মহৎ ও সুন্দর। কারণ, ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা রাজার রাজ্যের বৃদ্ধি হয় এবং ধর্ম্মই রাজলক্ষ্মীর সুস্বাদু ফলস্বরূপ। ফলতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে রাজা কখনও ঐশ্বর্য্যফললাভে সমর্থ হন না; অধার্ম্মিক ভূপতির সমস্ত ঐশ্বর্য্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ॥১৫॥

রাজা, মন্ত্রী, রাজ্য, দুর্গ, ধন, সৈন্য এবং সুহৃৎ (মিত্রস্বরূপ সামন্ত নৃপগণ)—এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য। সত্ত্বগুণাত্মিকা বুদ্ধিকে অবলম্বন করিয়া এই রাজ্যের স্থিতি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। যে স্থানে সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান, সেই স্থানেই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে ॥১৬॥

যে রাজা বুদ্ধিবলে রাজ্যের ধ্বংস কিরূপে হইতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই দূরদৃষ্টিবশতঃ বুঝিতে পারেন, সেই ভূপাল প্রবল সত্ত্বগুণ অবলম্বন করিয়া, অথবা মহৎ উৎসাহ অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বদা আলস্য পরিহারপূর্ব্বক উদ্যমের সহিত জাগরূক থাকিয়া, এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। রাজাদের তিনটি শক্তি আছে। প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি এবং উৎসাহশক্তি। মন্ত্রশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। কিন্তু মন্ত্রশক্তিসত্ত্বেও অনেক সময়ে উৎসাহশক্তি অভাবে রাজ্যের ধ্বংস হইয়া থাকে। উৎসাহসম্পন্ন ভূপতি কখনও অবসন্ন ও বিষণ্ণ হন না। আলস্য থাকিলে উৎসাহ থাকে না। আলস্য উৎসাহের মহান্ অন্তরায়। পক্ষান্তরে উৎসাহও আলস্যের পরম শত্রু। উৎসাহশীল ভূপতির সপ্তাঙ্গ রাজ্যলাভ করিতে কোনই ক্লেশ পাইতে হয় না ॥১৭॥

রাজার প্রধান চারিটি কার্য্য।

ন্যায়দ্বারা বা নীতিপথের অনুসরণ করিয়া অর্থের উপার্জ্জন; ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত অর্থের রক্ষণ; ন্যায়পূর্ব্বক অর্জ্জিত ও রক্ষিত অর্থের বর্দ্ধন এবং বর্দ্ধিত অর্থ সৎপাত্রে শ্রোত্রিয়াদি ব্রহ্মনিষ্ঠ—উপযুক্ত ব্রাহ্মণাদিপাত্রে দান; এই চারিপ্রকার রাজার বৃত্ত বা ব্যবহারকার্য্য। অর্থব্যবহারসম্বন্ধে রাজার এই চারিপ্রকার প্রধান কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য ॥১৮॥

নীতিকুশল, বিক্রমশালী, সতত উদ্যমশীল ভূপাল ঐশ্বর্য্যের বিষয় চিন্তা করিবেন। নীতি, বিক্রম ও উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া সম্পদের চিন্তা করিলে কোনই ফল হয়

* পুরাকালে ইন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইলে কিয়ৎকাল স্বর্গে রাজা ছিল না। ঋষিগণ পরামর্শ করিয়া ধার্ম্মিক, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় নহুষ রাজাকে স্বর্গে লইয়া গিয়া স্বর্গরাজ্যে স্থাপিত করেন। একদা নহুষ ইন্দ্রাণীকে দেখিয়া তাঁহার সহিত সম্ভোগসুখ ভোগ করিতে সঙ্কল্প করেন। বৃহস্পতির পরামর্শে শচী নহুষকে একটা নূতনত্ব দেখাইতে অনুরোধ করেন এবং বিশেষত্ব দেখাইলে আমি তোমার পত্নী হইব, এইরূপ নিয়ম করেন। নহুষ নূতনত্ব দেখাইবার জন্য ঋষিবাহ্যযানে গমন করেন। মহর্ষি অগস্ত্য পথিমধ্যে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, রাজা নহুষ অগস্ত্যের মস্তকে পদাঘাত করেন। মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, 'তুই অজগর সর্প হইয়া ভূতলে পতিত হইবি।'—ইতি মহাভারতীয় কথা।

না। ঐশ্বর্য্যের মূলে নীতি প্রভৃতি থাকার একান্ত প্রয়োজন। বিনয় বা নম্রতা নীতির মূল। অবিনয়ী বা দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি নীতিজ্ঞ হইতে পারে না। অতএব নীতির মূল বিনয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। বিনয় যে কি বস্তু, তাহা শাস্ত্র-পাঠে জানিতে পারা যায় ॥১৯॥

মানবশরীরে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের দৌরাত্ম্যে এবং আধিপত্যে মানব পশুপ্রকৃতি হইয়া থাকে। এই সকল দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করা আবশ্যক। এই প্রবল ইন্দ্রিয়-গণের জয়কেই বিনয় বলে। ইন্দ্রিয়জয় না হইলে বিনয় আসিতে পারে না। সেই বিনয়যুক্ত মানব শাস্ত্রজ্ঞান—শাস্ত্র-মর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ। বিনয়ী না হইলে গুরূপদিষ্ট শাস্ত্রীয় অর্থ অবগত হওয়া যায় না। বিনয়ীর নির্ম্মল অন্তঃকরণ-দর্পণে শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়জয়, শাস্ত্রজ্ঞান এবং শাস্ত্রের অর্থপ্রকাশ, এই সকল বিষয়ের মূলীভূত কারণ—একমাত্র বিনয় ॥২০॥

সম্পদের কারণগুলি নির্দ্দেশ।

শাস্ত্রশব্দে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রজ্ঞান; প্রজ্ঞাশব্দে বুদ্ধিশক্তি; ধৃতিশব্দে ধৈর্য্য বা সন্তোষ; প্রগল্‌ভতাশব্দে ধৃষ্টতা; ধারয়িষ্ণুতাশব্দে ধারণশীলতা; উৎসাহ-শব্দে উদ্যম; বাগ্মিতাশব্দে বক্তৃতাশক্তি; দাঢ্যশব্দে মনের দৃঢ়তা; আপৎক্লেশসহিষ্ণুতাশব্দে বিপদ্‌কালে কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা; প্রভাবশব্দে তেজ; শুচিতাশব্দে পবিত্রতা অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জলদ্বারা দেহের, এবং প্রাণায়ামাদিদ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি; মৈত্রীশব্দে সকল জীবে মিত্রভাব; ত্যাগশব্দে দান; সত্যশব্দে যথার্থ কথন; কৃতজ্ঞতাশব্দে পরের উপকারস্মরণ; ক্ষমাশব্দে পরকৃত অপকারে প্রত্যপকার না করা; শীলশব্দে, সংস্বভাব এবং দমশব্দে বাহ্যেন্দ্রিয়দমন—কেহ কেহ মনের দমনকেও দম বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র হইতে দম পর্য্যন্ত—এই উনিশটি গুণকে সম্পত্তির কারণ বলা হইয়াছে। ফলতঃ শাস্ত্রজ্ঞানাদি থাকিলেই মানব ঐশ্বর্য্যলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥২১—২২॥

ভূপতি সর্ব্বাগ্রে নিজে বিনীত হইবেন। স্বয়ং বিনয়ী না হইলে অপরকে বিনয়ী করিতে পারা যায় না। এই কারণে আপনাকে বিনয়যুক্ত করিবার পর অমাত্যদিগকে বিনয়সম্পন্ন করিতে হইবে। অমাত্যদিগকে বিনয়ী করি-বার পর ভৃত্যদিগকে বিনয়োপপন্ন করিবেন। ভৃত্যবর্গকে বিনীত করিবার পর রাজা আপনার তনয়দিগকে বিনীত করিবেন এবং তৎপরে প্রজাদিগকে বিনয়ান্বিত করিবেন। রাজা স্বয়ং বিনীত না হইয়া অপরকে বিনীত করিবার চেষ্টা করিলে সেই চেষ্টা ফলবতী হয় না। যাহার যে গুণ নাই, তিনি সেই গুণে অপরকে বিভূষিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলে অথবা উপদেশ দিলে অবশ্যই তিনি জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন, সন্দেহ নাই ॥২৩॥

যাঁহার প্রজাবর্গ সর্ব্বদা অনুরক্ত, যিনি প্রজাপালনে আসক্ত এবং স্বয়ং বিনীত, সেই ভূপতিই বহুতর ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের অনুরক্তি, প্রজাপালনে আসক্তি এবং আপনার বিনয়,—এই তিনটি ঐশ্বর্য্যভোগের কারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥২৪॥

হস্তী যেমন অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকে এবং সেই প্রবল হস্তীকে নিগৃহীত করিতে পারা যায় না, সেইরূপ নেত্রকর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপ মত্তমাতঙ্গ বিস্তীর্ণ রূপ-রসাদি ভীষণ বিষয়ারণ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে, এই প্রবল ইন্দ্রিয়-হস্তী সর্ব্বদাই অনিষ্টসাধন করিতেছে, কেহই ইহাকে নিগ্রহ করিতে পারে না। রাজা এইরূপ বিষয়বনে বিচরণ-কারী প্রমাথী বা অনিষ্টকারী ইন্দ্রিয়রূপ বন্য মত্তকরীকে জ্ঞানরূপ অঙ্কুশদ্বারা বশীভূত করিবেন। যেরূপ অঙ্কুশদ্বারা হস্তী বশীভূত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানদ্বারা প্রবল ইন্দ্রিয়দমন হয় ॥২৫॥

প্রবৃত্তির কারণ নির্দ্দেশ।

প্রথমে আত্মা বা জীবাত্মা শব্দ-স্পর্শাদিরূপ বিষয়ভোগ করিবার জন্য সযত্নে অন্তঃকরণে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই আত্মা ও মনের সংযো-গেই মানবের শুভাশুভ কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে ॥২৬॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয়, আমিষ বা লোভনীয় বস্তুর তুল্য। এই বিষয়রূপ আমিষের লোভে মন ইন্দ্রিয়দিগকে চালনা করে। কর্ণ শব্দ, ত্বক্ স্পর্শ, নেত্র রূপ, জিহ্বা রস এবং নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করিবার জন্য দিবারাত্র ধাবমান হইতেছে। এই বিষয়গ্রহণে ইন্দ্রিয়-গণের বিরাম নাই। এই দুর্দ্দম ইন্দ্রিয়দিগকে যত্নপূর্ব্বক নিরোধ বা দমন করিবে। সেই ইন্দ্রিয়দিগকে জয় করিতে পারিলে মানব জিতেন্দ্রিয় হয় ॥২৭॥

বিজ্ঞান, হৃদয়, চিত্ত, মন ও বুদ্ধি—ইহারা এক পর্য্যায়-বাচক শব্দ; ইহারা সকলেই সমান। এই জগতে আত্মা এই বিজ্ঞানাদিদ্বারা জীবকে কার্য্যে লওয়াইয়া থাকে। জীবের এইরূপে কার্য্যপ্রবৃত্তি এবং কার্য্যনিবৃত্তি অহরহঃ সম্পাদিত হইতেছে ॥২৮॥

চিহ্নদ্বারা আত্ম-নিরূপণ।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ এবং তদ্রূপ প্রযত্ন, জ্ঞান ও সংস্কার,—এইগুলি আত্মচিহ্ন। এই সকল চিহ্ন-দ্বারা আত্মনিরূপণ হয় ॥২৯॥

জ্ঞানের অযোগপদ্য অর্থাৎ ক্রমবিকাশ, মনের লিঙ্গ বা চিহ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এককালে সকল বস্তুর জ্ঞান হয় না; ঘটজ্ঞান কালে পটজ্ঞানের উদয় হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উদয় হয়। এইরূপ মনো-মধ্যে জ্ঞানের এককালীন উদয় না হওয়াই মনের চিহ্ন অর্থাৎ জ্ঞানের এইরূপ অযোগপদ্য দেখিয়া পণ্ডিতগণ মন নিরূপণ করেন। এবং নানাবিধ কার্য্যে বা নানাবিধ বিষয়ে মনের যে সঙ্কল্প, তাহাকেই মনের কর্ম্ম বলা হইয়াছে *॥৩০॥

* অমর সিংহও "সঙ্কল্পকে মানসিক কর্ম্ম" বলিয়াছেন।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকাকে লইয়া পাঁচ ;—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। পায়ু (গুহ্যদ্বার), উপস্থ (লিঙ্গ), হস্ত, পাদ এবং বাক্য—এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। এইরূপে দশটি ইন্দ্রিয় হইল ॥৩১॥

জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াপ্রদর্শন।

শ্রোত্রের শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, জিহ্বার রস এবং নাসিকার গন্ধ, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। পায়ুর উৎসর্গ বা মলনিঃসরণক্রিয়া, উপস্থের (লিঙ্গের) আনন্দক্রিয়া, হস্তের আদান বা গ্রহণক্রিয়া, পাদের গতি বা গমনক্রিয়া এবং বাক্যের আলাপ বা কথনক্রিয়া ; এইরূপে ইন্দ্রিয়বর্গের যথাক্রমে ক্রিয়াসকল হয় ॥৩২॥

অন্তঃকরণ ও সঙ্কল্প।

আত্মজ্ঞ ও মনস্তত্ত্ববিৎ মনীষিগণ, আত্মা এবং মনকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকেন। এই আত্মা এবং মন উভয়ের যত্ন হইতে সঙ্কল্প উৎপন্ন হয়। ফলতঃ আত্ম-মনের প্রযত্ন বা চেষ্টার নামই সঙ্কল্প। এই উভয়ের চেষ্টা না হইলে সঙ্কল্প হইতে পারে না ॥৩৩॥

বাহ্যেন্দ্রিয়।

আত্মা, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়বর্গ এবং শব্দাদি বিষয়সমূহই বাহ্যেন্দ্রিয়। সঙ্কল্প এবং অধ্যাবসায়দ্বারা এই বাহ্যেন্দ্রিয়ের সিদ্ধি বলা হইয়াছে। অধ্যবসায়শব্দে নিশ্চয়, ইহা বুদ্ধির গুণ ॥৩৪॥

এই দুইটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ এই বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় (অন্তঃকরণ), যত্ন এবং আনন্তর্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রবৃত্তির নিরোধহেতু অর্থাৎ এই সকল ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তি দমন করিয়া মনের লয় চিন্তা করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রবৃত্তিই মনের কার্য্য, প্রবৃত্তি থাকিলেই মনের অস্তিত্ব থাকে ; প্রবৃত্তির নিরোধ করিলে মনের অস্তিত্ব থাকে না। প্রবৃত্তিশূন্য মন মনই নহে, তখন মনের লয় হইয়াছে বুঝিতে হইবে ॥৩৫॥

এইরূপে নীতি এবং অপনীতি বা অনীতিবেত্তা ভূপতি ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে আপনি আত্মসংযম করিয়া, আপনার মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিবেন—অর্থাৎ আত্মদমন ব্যতিরেকে আত্মহিত হইতে পারে না ॥৩৬॥

চিত্তসংযম ব্যতীত রাজ্যশাসনে ও পৃথিবীজয়ে অসামর্থ্য।

যে রাজা—অন্যের কথা দূরে থাকুক—কেবল একটিমাত্র ক্ষুদ্র মনেরই দমনে অসমর্থ, তিনি কিরূপে সাগর-মেখলাপরিবেষ্টিতা এই বিস্তীর্ণা বসুন্ধরা জয় করিতে সমর্থ হইবেন? যিনি চিত্তদমন করিতে পারেন না, তিনি নিশ্চয়ই পৃথিবী জয় করিতে পারিবেন না ॥৩৭॥

শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকল স্ব স্ব ক্রিয়ার অন্তে বিরস হয় ; অর্থাৎ সকল বিষয়ই পরিণামে নীরস এবং সমস্ত বিষয়ই প্রথমে জীবকে প্রলোভিত করিয়া শেষে তাহার মন হরণ করে। ফলতঃ ক্রিয়াবসানে নীরস অথচ প্রলোভনকারী বিষয়দ্বারা আকৃষ্ট চিত্ত হইয়া হস্তী যেরূপ ক্লেশ পায়, বিষয়াকৃষ্ট রাজারও পরিণামে সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে ॥৩৮॥

যে ভূপতি নীতিবিরুদ্ধ সমস্ত অকার্য্যে আসক্ত, শব্দস্পর্শাদি বিষয়দ্বারা যাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, সেই অকার্য্যপরায়ণ বিষয়ান্ধ রাজা, নিজেই অতি ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত হন ॥৩৯॥

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এই পাঁচটি বিষয়। এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে এক একটি বিষয়ই বিনাশসাধনে সমর্থ। কেবল শব্দ, কি কেবল স্পর্শ, কেবল রূপ, কেবল রস, অথবা কেবল গন্ধ, মানবকে প্রলুব্ধ করিয়া বিনাশ করে। অতএব যদি পাঁচটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তখন কিরূপ যে অনিষ্ট ও বিপদ্ ঘটে, তাহা কল্পনারও অতীত—চিন্তারও অতীত ॥৪০॥

[ক্রমশঃ।

গান।

[শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস।]

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রকৃত স্বরসাধনের উপক্রমণিকা।

স্বরসাধনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছয়টি সাধন ১ সপ্তাহ অভ্যাসের পর প্রকৃত স্বর-সাধনের উপক্রমণিকাসাধন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ২।৩ সপ্তাহ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী সাধন কয়েকটি অগ্রে আবৃত্তি করিয়া উপক্রমণিকাসাধন প্রণালী অভ্যাস করিবে।

১ম সাধন।

একটি প্রশস্ত গৃহমধ্যে যে স্থানে অবস্থান করিলে বহমান বায়ু লাগিয়া প্রজ্বলিত বাতির শিখা কম্পিত না হয়, সেই স্থানে সোজাভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বাতির শিখা মুখ হইতে ৪ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপন করিবে। নাসিকাদ্বারা ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিয়া বক্ষঃ বায়ুপূর্ণ করিবে এবং লক্ষ্য রাখিবে, যেন উদর স্ফীত না হয়। বক্ষঃ বায়ুপূর্ণ হইলে জিহ্বাগ্র নিম্নপঙ্ক্তির দন্তমূলে রাখিয়া মুখ ১ ইঞ্চি পরিমাণ খুলিবে ও সতেজস্বরে "অ" শব্দ এরূপে করিবে, যেন ঐ বাতির শিখা কম্পিত না হয়; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমানতেজে কণ্ঠস্বর চলিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রাখিয়া পুনরায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণের সময় কণ্ঠস্বর বন্ধ রাখিবে। প্রথমে তিন মিনিটকাল এইরূপ স্বর অভ্যাস করিয়া তিন মিনিটকাল বিশ্রাম করিবে, পুনরায় তিন মিনিট ঐ প্রকার সাধন করিয়া তিন মিনিট বিশ্রাম, ক্রমে সর্ব্বসমেত ৪ বার সাধন করিবে।

২য় সাধন।

মুখ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে প্রজ্বলিত বাতির শিখা স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "এ" শব্দ এরূপে উচ্চারণ করিবে, যাহাতে বাতির শিখা কম্পিত না হয়। কেবল শ্বাসগ্রহণের সময় কণ্ঠস্বর বন্ধ রাখিয়া ঐরূপে তিন মিনিট-কাল "এ" শব্দ আবৃত্তি করিয়া তিন মিনিটকাল বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম করিবে।

৩য় সাধন।

প্রজ্বলিত বাতির শিখা মুখ হইতে ৪ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "ই" শব্দ এরূপে উচ্চারণ করিবে, যাহাতে বাতির শিক্ষা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ তিন মিনিটকাল "ই" শব্দ আবৃত্তি করিয়া তিন মিনিটকাল বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম করিবে।

৪র্থ সাধন।

বাতির শিখা মুখ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "ও" শব্দ এরূপে উচ্চারণ করিবে, যাহাতে বাতির শিখা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ তিন মিনিটকাল "ও" শব্দ আবৃত্তি করিয়া তিন মিনিট বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম হইবে।

৫ম সাধন।

বাতির শিখা মুখ হইতে ৮ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণপূর্ব্বক সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "উ" শব্দ এরূপে উচ্চাচরণ করিবে, যাহাতে বাতির শিক্ষা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ তিন মিনিটকাল "উ" শব্দ আবৃত্তি করিয়া তিন মিনিটকাল বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম হইবে।

৬ষ্ঠ সাধন।

বাতির শিখা মুখ হইতে ৫ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "আ," "এ," "ই," শব্দ প্রশ্বাসের সময় সমভাগে ভাগ করিয়া ক্রমানুসারে উচ্চারণ করিবে। উচ্চারণসময় যেন লক্ষ্য থাকে যে, মুখনির্গত বায়ুর বেগে বাতির শিক্ষা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ এইরূপ তিন মিনিটকাল আবৃত্তি করিয়া তিন মিনিট বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম হইবে।

৭ম সাধন।

বাতির শিখা মুখ হইতে ৬ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরসহযোগে "ও" "উ" শব্দ প্রশ্বাসের সময় সমভাগে ভাগ করিয়া ক্রমানুসারে উচ্চারণ করিবে। উচ্চারণের সময় যেন বাতির শিখা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ তিন মিনিটকাল আবৃত্তি ও তিন মিনিট বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম করিবে।

৮ম সাধন।

বাতির শিখা মুখ হইতে ৫ ইঞ্চি ব্যবধানে স্থাপনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান অবস্থায় নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া সতেজ কণ্ঠস্বরে "আ," "এ," "ই," "ও," "উ," শব্দ প্রশ্বাসের সময় সমভাগে ক্রমানুসারে এরূপে উচ্চারণ করিবে, যেন বাতির শিক্ষা কম্পিত না হয়। পূর্ব্ববৎ তিন মিনিটকাল আবৃত্তি ও তিন মিনিট বিশ্রাম, ক্রমে ৪ বার আবৃত্তি ও বিশ্রাম হইবে।

মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ অভ্যাস।

শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি সাধনের বিষয় উল্লেখ করিলাম, তাহাতে অধিকাংশস্থলে কেবল নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণের বিষয় কথিত আছে। কিন্তু গান গাহিতে হইলে প্রায় সকল সময়ে বিশেষতঃ যে স্থানে শ্বাসগ্রহণের জন্য অতি অল্প সময় পাওয়া যায়, সেখানে সেই অল্প সময়মধ্যে নিঃশব্দে মুখদ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বায়ুপূর্ণ করিয়া লইতে হয়। কারণ, অল্প সময়মধ্যে নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ করিয়া ফুস্‌ফুস্ বায়ুপূর্ণ করা যায় না; তদ্ব্যতীত, নাসিকাদ্বারা বেগে শ্বাসগ্রহণের শব্দ অতিশয় অপ্রীতিকর। এজন্য প্রকৃত স্বরসাধনের এই আটটি উপক্রমণিকাসাধন সম্যক্‌রূপে এক সপ্তাহকাল আবৃত্তি করিবার পর আর এক সপ্তাহ নাসিকাদ্বারা শ্বাসগ্রহণ না করিয়া কেবল সবেগে মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করিয়া অভ্যাস করিবে।

পুস্তক অবলম্বন করিয়া কণ্ঠ অথবা যন্ত্র-সঙ্গীত অভ্যাস করিতে হইলে স্বরলিপিসম্বন্ধে জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

ভারতবর্ষে স্বরলিপি না থাকার অপকারিতা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সঙ্গীতের আলোচনা থাকিলেও সুর লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। ওস্তাদগণ ছাত্রদিগকে কেবল মুখে মুখে শিক্ষাপ্রদান করিতেন; এবং অদ্যাপিও তাঁহাদিগের মধ্যে সে প্রথা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত আছে। এইরূপে শিক্ষাপ্রদানে যে অনর্থক সময় নষ্ট হয়, তাহা তাঁহারা এখনও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হন নাই। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গানসমূহ স্বরলিপিবদ্ধ না থাকায়, ব্যক্তিগত ভ্রম ও অভ্যাসপটুতার তারতম্যে ক্রমান্বয়ে বিলক্ষণ বিকৃত ও লোপপ্রাপ্ত হইতেছে।

প্রথম বাঙ্গালা স্বরলিপি।

ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের এই অভাব দূর করিবার জন্য পরলোকগত রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় বাঙ্গালা-ভাষায় প্রথম স্বরলিপি প্রণয়ন করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত স্বরলিপি যদিও য়ুরোপীয় সাঙ্কেতিক স্বরলিপির (Symbolic Notation) ন্যায় সর্ব্বতোভাবে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ও সার্ব্বভৌমিক নহে, তথাপি ঐতিহাসিক সম্বন্ধপ্রযুক্ত আমাদের দেশে উহা গৌরবস্থল এবং সেইজন্য আমরা তাঁহার প্রচলিত স্বরলিপিই অবলম্বন করিলাম।

স্বরলিপিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক।

আমাদের আলোচ্য কণ্ঠস্বরসাধন-বিষয়মধ্যে স্বরলিপি-শিক্ষাপদ্ধতি অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু বাঙ্গালা স্বরলিপি-সংক্রান্ত চিহ্নগুলির বিবরণ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় হইবে না বলিয়া আমরা কেবল তাহাই বর্ণনা করিব। যাঁহারা স্বরলিপিশিক্ষায় সরল ও উৎকৃষ্ট সাধনাপদ্ধতি জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত "হারমোনিয়ামে গান-শিক্ষা" পুস্তক আলোচনা করিবেন।

স্বরগ্রাম।

স্বরগ্রামে নিম্ন হইতে উচ্চক্রমে

সা ঋ গ ম প ধ ন

এই সাতটি সুর ব্যবহৃত হয়। এই সাতটি সুর-সমষ্টির নাম সপ্তক। ততোধিক নিম্ন অথবা উচ্চ সুর ঐ সাতটি সুরেরই পুনঃসংজ্ঞাক এবং তাহাদের পার্থক্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ সাতটি সুরের নিম্নে ও উপরে বিন্দুচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যথা :—

নিম্নসপ্তক

সা̣ ঋ̣ গ̣ ম̣ প̣ ধ̣ ন̣

মধ্যসপ্তক

সা ঋ গ ম প ধ ন

উচ্চসপ্তক

সাঁ ঋঁ গঁ মঁ পঁ ধঁ নঁ

এতদধিক নিম্ন অথবা উচ্চসুর প্রয়োজন হইলে নিম্নের ও উপরের বিন্দুসংখ্যা বৃদ্ধিদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে (১৫শ চিত্র)।

স্ত্রী-পুরুষভেদে স্বরের তারতম্য।

মানবগণের স্ত্রী ও পুরুষভেদে কণ্ঠস্বরের তারতম্য আছে। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর পুরুষের স্বর অপেক্ষা উচ্চ। এই উভয় জাতীয় স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরের নিম্ন ও উচ্চ সীমা সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করা যায়। পিয়ানো অথবা হার্ম্মোনিয়াম যন্ত্রের সুর নির্দ্দিষ্ট ওজনে বাঁধা এবং উহাদের সারণাশ্রেণী (Key-Board) একই প্রকার। এ স্থলে ১৫শ চিত্রে পিয়ানো অথবা হার্ম্মোনিয়ামের অঙ্কিত সারণাশ্রেণীমধ্যে স্ত্রী ও পুরুষকণ্ঠের নিম্ন ও উচ্চসুরের সাধারণ ও স্বাভাবিক সীমা প্রদর্শিত হইল।
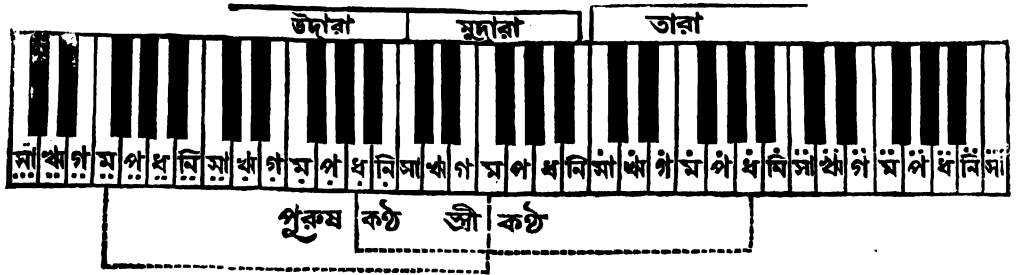
১৫শ চিত্র।

১৫শ চিত্রে স্ত্রী ও পুরুষকণ্ঠের নিম্ন ও উচ্চ সুরের যে সীমা উল্লিখিত হইল, তাহা ব্যক্তিবিশেষে স্বভাবতঃ এবং অভ্যাসের দ্বারা ব্যক্তিমাত্রেরই উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া নিম্ন ও উচ্চ সুরের সীমা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

কড়ি ও কোমল।

প্রথমে উল্লেখ করিয়াছি, সা উচ্চ র্সা পর্য্যন্ত ১২টি অর্দ্ধসুর আছে। হার্ম্মোনিয়াম অথবা পিয়ানোর সারণাশ্রেণীমধ্যে সা হইতে উচ্চ র্সা পর্য্যন্ত ৫টি কালো চাবি দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—সা ও ঋার মধ্যে একটি, ঋা ও গার মধ্যে একটি, ম ও পার মধ্যে একটি, প ও ধার মধ্যে একটি এবং ধ ও নার মধ্যে একটি। গ ও মর মধ্যে এবং ন ও সার মধ্যে কালো চাবি নাই। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে, সা হইতে ঋার মধ্যে যে কালো চাবি আছে, তাহা সা হইতে অর্দ্ধসুর ব্যবধান; এবং তাহাকে সা কড়ি অথবা ঋা কোমল বলা যায়। স্বরলিপিতে কড়ির চিহ্ন পতাকা ও কোমলের চিহ্ন ত্রিকোণ। সুতরাং যে সুরের উপর পতাকাচিহ্ন থাকে, তাহা কড়ি বা অর্দ্ধসুর উচ্চ ও যাহার উপর ত্রিকোণচিহ্ন থাকে, তাহা কোমল বা অর্দ্ধসুর নিম্ন হইয়া থাকে। এখন দেখা যাইতেছে যে, সা হইতে ঋা দুইটি, ঋা হইতে গ দুইটি, গ হইতে ম একটি, ম হইতে প দুইটি, প হইতে ধ দুইটি, ধ হইতে ন দুইটি, ন হইতে র্সা একটি অর্দ্ধসুর ব্যবধান।

তাল ও তাহার চিহ্ন।

রাগ রাগিণী সম্বলিত গান অথবা যন্ত্রবাদ্যে নানাবিধ ছন্দে গীত বা বাদিত হয়। সেই সকল বিভিন্নপ্রকার ছন্দের নাম তাল। ছন্দের গতি অনুযায়ী প্রত্যেক তালে সম, ফাঁক প্রভৃতি যে সকল ছেদ বা অংশ আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটি সমান ও কোনটি অসমান-মাত্রাবিশিষ্ট। অতএব মাত্রাকে তালের সমকালসম্পন্ন তালের ভগ্নাংশ বলা যায়। কাওয়ালী, যৎ, আড়াঠেকা, একতালা প্রভৃতি খেয়াল ও ঠুংরি গানের সচরাচর ব্যবহৃত তালে ফাঁক, প্রথম তাল, সম, তৃতীয় তাল, এই চারিটি সমান মাত্রাবিশিষ্ট অংশ আছে। তালের এই অংশের প্রত্যেকটি সচরাচর তাল বলিয়া অভিহিত হয় এবং সম, তৃতীয়তাল, ফাঁক, প্রথমতাল—এই চারিটি অংশসম্বলিত তালের একটি সম্পূর্ণ ফের (full cycle) কে ওস্তাদ গায়কগণ এক আওর্দা বলেন। স্বরলিপিতে প্রত্যেক তালের যে ছেদ থাকে, তাহার উপরে অথবা তাহার পরবর্ত্তী প্রথম সুরের মাত্রা-চিহ্নের উপরে তালের চিহ্ন স্থাপন করা হয়। যথা :—
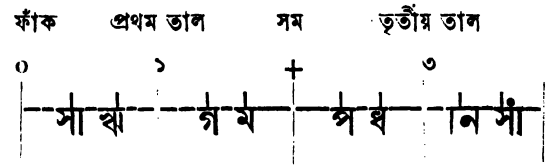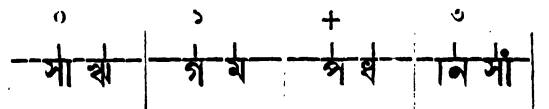
কাচ।

[সম্পাদক।]

আমাদের দেশে ইদানীং কাচের ব্যবহার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। কতদিন যাবৎ কাচ এদেশে মানুষের ব্যবহারে আসিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। সেই ঐতিহাসিক গবেষণা করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে না। তবে প্রায় দেড় হাজার বা দুই হাজার বৎসর এদেশে কাচের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। এদেশে কাচ-শিল্পের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, এখন তাহা বলা কঠিন। অধুনা এদেশে যে উটজ কাচশিল্প প্রচলিত আছে, তাহার অবস্থা অত্যন্ত হীন। সেই জন্য এদেশে বিদেশী কাচ-পণ্যের আমদানী অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। বর্ত্তমান যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে অষ্ট্রীয়া, জার্ম্মাণী, ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, জাপান, চীন, ইটালী প্রভৃতি দেশ হইতে প্রচুর কাচের জিনিস আমদানী হইত। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮ শত ৫৩ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৭ শত ৯৫ টাকার কাচের জিনিস আমদানী হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, কেবল কাচ বিক্রয় করিয়া বিদেশীরা আমাদের দেশ হইতে কত টাকা লইয়া যাইতেছে। আমরা নিতান্তই আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। অষ্ট্রীয়া হইতেই এদেশে কাচের জিনিস অধিক আমদানী হইয়া থাকে। যুদ্ধের পূর্ব্বে কোন্ দেশ হইতে কত কাচের জিনিস আমদানী হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে পাউণ্ডে প্রদত্ত হইল। পাঠক জানেন, এক পাউণ্ডের মূল্য পনর টাকা। যাঁহারা টাকায় উহা বুঝিতে চাহেন, তাহারা উহার প্রত্যেক অঙ্ক পনর গুণ করিয়া লইবেন।

যে দেশ হইতে আমদানী হয়	১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে	১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দে
অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী	৪৬০৪৮২	৫৮২৫৪১
জার্ম্মাণী	১৭২১১৬	১৯০৫৭৭
বিলাত	১৫৫৬৮৬	১৭৪৬৯৯
বেলজিয়াম	১২৭২৪৫	১২৯০২৩
জাপান	১৫০৮৫০	১০৫৪২২
চীন	৩২০১৫	৩৩২৪৮
ইটালী	২৬৭০৫	৩২৬২৯
ফ্রান্স	২৪০১৯	২৪৯৮৮
অন্যান্য দেশ	১৯৮১৩	১৯২৭৬
মোট	১১৬৮৯৩১	১২৯৬৮৫৩

ইহার পূর্ব্বের তিন বৎসরের গড় হিসাব ধরিলে দেখা যায় যে, এই তিন বৎসরে অর্থাৎ ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ যে বৎসরের শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে ৯ লক্ষ ৭৭ হাজার ১ শত ৬১ পাউণ্ড বা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ৪ শত ১৫ টাকার কাচের দ্রব্য বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী হইয়াছিল। ঐ তিন বৎসরে গড়ে প্রতি বৎসর কোন্ দেশ হইতে কত টাকার কাচের জিনিস আমদানী হইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেশের নাম	তিন বৎসরে প্রতি বৎসর গড় আমদানী
অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী	৪১৮৮১৪ পাউণ্ড
জার্ম্মাণী	১৪২২৭২
বিলাত	১৩৭২৩৪
বেলজিয়াম	১০৫৫৬০
জাপান	৬৯৬১২
চীন	৩৫৮৪৯
ইটালী	২৭৫৮৫
ফ্রান্স	২৭৪৪৭
অন্যান্য দেশে	১২৭৮৮
মোট	৯৭৭১৬১

অষ্ট্রো-হাঙ্গেরীতে চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেই জন্য অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী কাচের দ্রব্য আমদানীতে সকলের অগ্রণী হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তথা হইতে মালার গুলি, কৃত্রিম মুক্তা ও আলোর কাচ আমদানী হইয়া থাকে। জার্ম্মাণী হইতেও শিশি, বোতল, আলোর কাচ, মালার গুলি ও কৃত্রিম মুক্তা আমদানী হইত। সম্ভবতঃ জার্ম্মাণী হইতে যে সকল দ্রব্য আমদানী হইত, তাহার কতকগুলি অষ্ট্রীয়াতেই প্রস্তুত, কিন্তু অষ্ট্রীয়ার ট্রিয়েষ্টি ভিন্ন অন্য বন্দর না থাকাতে হাম্বার্গ হইতে ষ্টীমারযোগে উহা চালান করা হইত। বিলাত হইতে সোডাওয়াটারের বোতল ও অন্যান্য বোতল এবং বড় বড় কাচও আমদানী হইয়া থাকে। বেলজিয়াম হইতে বড় বড় কাচ ও টেবিলে রাখিবার কাচের আসবাব আমদানী হয়। জাপান হইতে মালার ছিদ্রযুক্ত গুটি, কৃত্রিম মুক্তা এবং সোডাওয়াটারের বোতল ভিন্ন অন্য প্রকারের বোতল, শিশি ও নানাবিধ জিনিস আমদানী হইয়া থাকে। চীন হইতে চুড়ীই আসে, আর ফ্রান্স এবং ইটালী হইতে সছিদ্র গুটিকা ও কৃত্রিম মুক্তা আসিয়া থাকে।

অষ্ট্রীয়ার ডিট্‌মারের চিম্‌নী লোকের খুব পসন্দসই।

জার্ম্মাণী চিমনীগুলি সহজে ময়লা হইয়া যায় বলিয়া ইহা লোকে বিশেষ পসন্দ করে না। জাপানী চিম্‌নী খুব সস্তা, তবে যুদ্ধের পূর্ব্বে উহার কাট্‌তি তেমন অধিক হয় নাই। এই যুদ্ধের সময় অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী, বেলজিয়াম ও জার্ম্মাণী হইতে আমদানী বন্ধ হওয়াতে উহার কাট্‌তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অষ্ট্রীয়ার কাচের গেলাস সকলেই পসন্দ করিতেন, তবে বেলজিয়ামের ও জাপানের গেলাসের কাট্‌তি নিতান্ত অল্প ছিল না। শেষোক্ত গেলাসগুলির মূল্য কিছু অধিক, কিন্তু উহা টিকেও অধিক দিন।

জার্ম্মাণীতে মজুরী অপেক্ষাকৃত সুলভ, সেই জন্য অনেক ইংরেজ কাচওয়ালারা জার্ম্মাণী হইতে কাচের দ্রব্য লইয়া আসিতেন। হিঙ্কস্ মার্কার যে চিম্‌নী বাজারে বিক্রয় হইত, তাহা জার্ম্মাণীর সাক্সনীতেই প্রস্তুত হইত।

ভারতে দুই প্রকার কাচের শিল্প বিদ্যমান। প্রথম উটজ শিল্প, দ্বিতীয় হাল আমলের কলকারখানায় শিল্প। উটজ শিল্পী কেবল চুড়ী, বালা প্রভৃতি প্রস্তুতেই ব্যস্ত, অন্য কিছুই উটজ শিল্পীরা প্রস্তুত করিতে চাহে না। ভারতের সর্ব্বত্রই এইরূপ কাচের উটজ শিল্প আছে। উটজ শিল্পে সাধারণতঃ সাদা বা রং-করা কাচের চুড়ী নির্ম্মিত হয়, ঐ চুড়ীর উপর গালা দেওয়া থাকে; টিনের নানারূপ পাত দিয়া উহাতে বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়। উহা অত্যন্ত সুলভ। যেখানে উহা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেইখানে উহা টাকায় তিন হাজার পর্য্যন্ত বিকায়। সাধারণতঃ তিন হাজার গাছ চুড়ী এক টাকা হইতে চারি টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে আমদানী চুড়ীর সহিত এ স্বদেশী উটজ শিল্পজাত চুড়ীর কোনরূপ প্রতি-যোগিতা উপস্থিত হয় নাই। দেশের অত্যন্ত গরীব লোক-রাই ঐ প্রকার স্বদেশী চুড়ী পরিয়া থাকে। তবে এই স্বদেশী চুড়ীর অনেকটা উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে। আগ্রা জেলার ফিরোজাবাদের কাচের ও চুড়ীর কারবারের এইরূপ অনেকটা উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ফেরোজাবাদে যুক্তপ্রদেশের সমস্ত কাচের কাজ হইত। সিভিলিয়ান শ্রীযুত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আন্দাজ করিয়াছেন যে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে দুই লক্ষ মণ মোটা কাচের চুড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত হইত। ইহার মধ্যে ফুকা কাচের জিনিস অতি অল্পই প্রস্তুত হইত, কিন্তু ঐ অঞ্চলে প্রধানতঃ কাচের চুড়ী, বালা প্রভৃতিই তৈয়ারী হইত। উক্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে, যাহারা এই কাচের কাজে কিছু কিছু মূলধন নিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের অবস্থা বেশ সচ্ছল। তাহারা নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিতে প্রস্তুত আছে। চুড়ীপ্রস্তুতকারীরা ইহার মধ্যে অনেক নূতন নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছে। মোটামুটি কাচের কাজ ভিন্ন ফিরোজপুর হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে সমস্ত যায়গামধ্যে আনুমানিক পাঁচ শত কাচের চুড়ী, বালা প্রস্তুতের চুল্লী বা উনান আছে, এবং উহাকে সর্ব্বসাকল্যে দশ হাজার লোক খাটাইয়া খাইতেছে। চুড়ীর কারিগররা বেশ নূতন ভাবগ্রহণ করিতে পারে। তাহারা চুড়ীর অনেক নূতন ঢং ও রং করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে ঐ অঞ্চলে যে ভাবে চুড়ী প্রস্তুতের উনান প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাতে কাঠকয়লা বেশী পুড়ে, অথচ যতটা উত্তাপ হওয়া আবশ্যক, ততটা উত্তাপ হয় না। উনানগুলির ঢং বদলাইতে না পারিলে আর বিদেশ হইতে আমদানী চুড়ীর সহিত ইহারা প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না। বর্ত্তমানে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ফিরোজাবাদের কারিগররা উপযুক্ত পরামর্শদাতার অভাবে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বে অষ্ট্রীয়া হইতে যে বিশেষজ্ঞ-দিগকে আনা হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারা কাজ সন্তোষজনক হয় নাই। জার্ম্মাণী হইতে রং আমদানী করা হইত, এখন রং লইয়া বড়ই অসুবিধা ঘটিতেছে।

দেশীয় চুল্লীতে ফুকা বা কাচচূর্ণ হইতে মোটা কাচের জিনিস অনেক স্থানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। রেলওয়ে প্রভৃতি স্থানে উহারা ভাঙ্গা কাচ ক্রয় করিয়া উহা প্রস্তুত করে। বীজনুর জেলার নাগিনা অঞ্চলে ঐরূপ কাচের কারবার হইয়া থাকে। কিন্তু এই প্রকারে যে সমস্ত জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহার পরিমাণ অতি অল্প। এই প্রকারে কাচা বা ফুকা শিশি প্রস্তুত হয়। ইহা ভিন্ন দোয়াত, গন্ধদ্রব্যের শিশি, আলোর টেমি প্রভৃতিও উহাতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এইরূপে যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা বিদেশ হইতে আমদানী ভাল জিনিসের সহিত প্রতি-যোগিতা করিতে পারে না। বিদেশ হইতে আমদানী অতি অপকৃষ্ট জিনিসের সহিত উহার সামান্য একটু প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে।

ভারতে উন্নত ধরণের কলকারখানার সাহায্যে কাচের কারবার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিশেষ আশাপ্রদ হয় নাই। ইহার পথে বাধাও অনেক ঘটিয়াছে। বাঙ্গালার টিটাগড়ে পাইওনীয়ার গ্লাস ম্যানুফ্যাক্টরিং কোম্পানী ১৮৯০খৃষ্টাব্দে ও সোদপুরে বেঙ্গল গ্লাস কোম্পানী ১৮৯৮ অব্দে কার্য্য আরব্ধ করে। উভয় কোম্পানীই বিলাত হইতে বিশেষজ্ঞ আনাইয়া এবং হাল আমলের বিজ্ঞানসম্মত চুল্লী প্রস্তুত করিয়া কাজ আরব্ধ করিয়াছিল। কিন্তু উহার প্রথমোক্তটি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয়টি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া যায়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ গ্লাস ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। সম্প্রতি উহা আবার কার্য্যারম্ভ করিবে শুনা গিয়াছিল। হাইদারাবাদে একটি কাচের কাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়; আম্বালার কাচের কাজের কর্ত্তৃপক্ষ উহার কল প্রভৃতি খরিদ করিয়া লইয়া-ছেন। দেরাডুনের রাজপুরে হিমালয়ান্ গ্লাস ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হইয়া তিন চারি বৎসর বেশ কার্য্য চালাইয়াছিল,

তাহার পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে উহা অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া যায়, তাহার পর নূতন লোক উহার তত্ত্বাবধানভার গ্রহণ করাতে উহার কাজ আরব্ধ হইয়াছিল। আম্বালার আপার ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কার্য্য আরম্ভ করে, প্রথমে উহাতে বিশেষ লাভ হয় নাই, বরং অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। তাহার পর ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত কারখানা হস্তান্তরিত হয়। এখন উহার কাজ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে। ভারতে এখন ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন কাচের কারখানা। ইহারা গোড়া হইতে চুড়ীর কাচ প্রস্তুত কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া আপনাদের বনিয়াদ পাকা করিয়া লইয়াছে। আম্বালা ও ফিরোজা চুড়ীই এখন বাজার দখল করিয়া বসিয়াছে। পূর্ব্বে বেলজিয়াম হইতে এইরূপ চুড়ী অনেক আমদানী হইত। আপাততঃ ভারতে দুই একটা কাচের কারখানা চলিতেছে; বোম্বাই সহরে ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া গ্লাস ওয়ার্কস লিমিটেড নাম দিয়া একটা কারবার শীঘ্রই কার্য্যারম্ভ করিবে শুনা গিয়াছিল।

কাচের কাজের এইরূপ অসাফল্য হইবার কতকগুলি বড় বড় কারণ আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি কারণের প্রতিকার আবশ্যক। প্রথমতঃ যে সকল কোম্পানী কাজ আরম্ভ করেন, তাহারা বাজেখরচের জন্য প্রচুর টাকা রাখেন না, কাজেই গোড়ায় কতক মোটা খরচ তাঁহারা করিয়া উঠিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ কর্ত্তৃপক্ষের ঐ কার্য্যে বিশেষ জ্ঞানের অভাব। এই দুইটি কারণের অবশ্য প্রতিকার হইতে পারে।

ইহা ভিন্ন কতকগুলি কাজের অসুবিধাও আছে। যথা—(১) ভারতের উষ্ণতা। গ্রীষ্মকালে ভারতে যেরূপ গরম পড়ে, তাহাতে বিদেশী বিশেষজ্ঞরা এদেশে সুবিধামত করিয়া কাচপ্রস্তুতের চুল্লী প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। (২) কাচে ফুঁ দিবার জন্য শিক্ষিত মজুর পাওয়া দুর্ঘট। বিদেশী ফুঁকদারদের কাজও এখানে সন্তোষজনক হয় নাই। নাগিনা প্রভৃতি অঞ্চলের স্বদেশী ফুঁকদাররা নূতন কিছু শিখিতে বা করিতে সম্মত হয় না। সেই জন্য এদেশে নিরেট কাচের কাজ যেরূপ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আছে, ফুকা কাচের কাজে সেরূপ সাফল্যলাভের সম্ভাবনা আপাততঃ নাই। (৩) উপযুক্ত বালুকা ও ক্ষারপ্রাপ্তির অসুবিধা। অনেক স্থলের বালি ভাল কাচপ্রস্তুতের উপযুক্ত নহে, আবার উপযুক্ত ক্ষারও পাওয়া যায় না। উত্তর ভারতে রে বলিয়া যে জিনিসটা পাওয়া যায়, তাহা কাচপ্রস্তুতের সম্যক্ উপযোগী নহে। আপাততঃ বিলাত হইতে বাইকার্ব্বনেট অব সোডায় অবশ্য ঐ কাজ চালান হইতেছে।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, আপাততঃ ভারতে উচ্চশ্রেণীর কাচের কারবার প্রতিষ্ঠিত করা অসুবিধাজনক হইবে।

আবেগ।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

মনে মনে কত ভাবি মহা ভাবনা,
জানি না কিসে কি হয়, বিধি-রচনা।
বড়ই বিস্তৃত ভাবনা—আসে না তার যে উপমা,
খেলি তাঁর মায়ায়, কিছু বুঝেও বুঝি না।
মনে হয় আমি করি' পূরি নিজ বাসনা,
ভ্রমমাত্র এ যে! কিছু হয় না তিনি বিনা॥

সাহিত্যের সার্থকতা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

যাঁহাকে "অবাঙ্মনসোগোচরঃ" বলিয়া শুষ্ক জ্ঞানী নিরস্ত হয়েন, অথচ যিনি তাঁহার একনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে নিত্যই বিরাজমান, যিনি অনন্ত হইয়াও সান্ত, অরূপ হইয়াও সরূপ, যিনি জাতি বা বর্ণাশ্রমভেদের অপেক্ষা রাখেন না, ভক্তিই যাঁহাকে পাইবার একমাত্র উপায় এবং যাঁহার অহৈতুকী কৃপাই জীব-হৃদয়ে সেই ভক্তি-লতার অঙ্কুরোৎপাদন ও পরিপুষ্টির একমাত্র কারণ, সেই পরম করুণাময় শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে ভক্তিভরে প্রণতঃ হইয়া এই প্রবন্ধের আরম্ভ করিলাম।

সাহিত্যশব্দে সাহচর্য্য বুঝায়; সাহিত্য মানবেরই সহচর। মানবজীবনের সহিত সাহিত্যের নিত্যসম্বন্ধ, এই নিত্য-সম্বন্ধ-জ্ঞান হৃদয়ে নিত্য জাগরূক রাখিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে হইবে, নতুবা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সাহিত্যসেবীর অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। মানবহৃদয়ে যে সমস্ত বৃত্তি আছে, তাহাদেরই প্রকাশের নামান্তর—মানবজীবন। মানবজীবন কতকগুলি চিন্তা ও সেই চিন্তাপ্রকাশক কার্য্যের সমষ্টি মাত্র, কিন্তু সেই চিন্তা ও কার্য্যের মূলে মানবহৃদয়নিহিত বৃত্তিনিচয় বিদ্যমান আছে। এই বৃত্তিসমূহের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ অনুসারেই মানবজীবনের তারতম্য হইয়া হইয়া থাকে। অতএব সাধুজীবন যাপন করিতে হইলে অগ্রে হৃদয়ের সদ্বৃত্তিগুলির উন্মেষণ, পরিপোষণ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কুপ্রবৃত্তিগুলিরও দমন ও মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে। জীবনের এই মহদুদ্দেশ্য-সাধনের জন্য জীবনের প্রধান সহচর সাহিত্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সুতরাং এই পরম কল্যাণকর কার্য্যে সাহিত্য যাহাতে আমাদিগকে প্রকৃত সাহায্য করিয়া আমাদের সার্থক সহচররূপে পরিগণিত হইতে পারে, সাহিত্যকে সেই মত করিয়াই বাড়াইয়া তুলিতে হইবে।

মূল উদ্দেশ্য লইয়াই কার্য্যের বিচার করা কর্ত্তব্য। কার্য্যদ্বারা সব সময় তাহার মূল উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ না হইতে পারে, কিন্তু সেই কার্য্য যদি সদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহা যদি সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির অনুকূলে কথঞ্চিৎও সহায়তা করে, তবে তাহাকে নিতান্ত নিষ্ফল বলা যায় না। মানবের চিন্তার কিয়দংশ সাহিত্য-নির্ম্মাণ-কার্য্যে নিয়োজিত হয়, সুতরাং সাহিত্যের সফলতা বা বিফলতার বিচার করিতে হইলে সেই সাহিত্য মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য-সাধনকল্পে কতটা সাহচর্য্য অর্থাৎ সহচরের দেয় সাহায্য করিয়াছে, তাহাই বিচার করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মানবজীবনের মূল উদ্দেশ্য কি? অগ্রে এই উদ্দেশ্য সুচারুরূপে ও সুস্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত না হইলে মানবজীবনের নিত্যসহচর সাহিত্যের নিকট হইতে আমরা কিরূপ সাহায্য প্রত্যাশা করি, তাহার নির্দ্ধারণ হইতে পারে না, সুতরাং সাহিত্যের সফলতা বা বিফলতার বিচার করাও চলে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবান্ মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন? কিন্তু ইহা একটি অত্যন্ত কঠিন ও অত্যন্ত জটিল দার্শনিক প্রশ্ন। দার্শনিকের নিকট এই প্রশ্নের সর্ব্ববাদিসম্মত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মীমাংসা বোধ হয়, আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই; এবং কখনও যে পাওয়া যাইবে, তাহারও আশা বড় নাই। দর্শনের দিক্ দিয়া দেখিলে এই রকমই মনে হয় বটে, কিন্তু দর্শন মানবহৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্ নহে। শুধু শুষ্ক জ্ঞান বা নীরস যুক্তি তর্কের দ্বারা সমস্ত বস্তুরই উপলব্ধি হয় না। মানবহৃদয়ে ভক্তি বলিয়া একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আছে। সেই ভক্তির দ্বারাই এই মহা প্রশ্নের একটি সরল ও সুন্দর সমাধান পাওয়া যায়। ভক্ত বলেন যে, এই জীবসৃষ্টি লীলাময় ভগবানের একটি মহতী লীলা। এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। উপরে দর্শন ও দার্শনিক শব্দ তাহাদের প্রচলিত সাধারণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছি। স্থূলদৃষ্টিতে দর্শন-শাস্ত্রের সহিত ভক্তি-শাস্ত্রের একটি বিরোধ প্রতীয়মান হইতে পারে বটে, কিন্তু প্রকৃত দার্শনিক ও প্রকৃত ভক্ত দর্শনশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সহিত ভক্তিশাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের সামঞ্জস্য দেখিতে পান। সাধারণের ধারণা এই যে, ভক্তির সহিত জ্ঞানের কোন সদ্ভাব নাই, বরং বিরোধই আছে। কিন্তু ভক্তমাত্রই জানেন যে, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও অমূলক। বস্তুতঃ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান আছে এবং তদুপরি আরও এমন একটু পদার্থ আছে যাহা ভক্ত ব্যতীত আর কোথাও নাই, তাহাই ভগবৎপ্রেম।

জ্ঞান ও ভক্তির এই প্রকৃত সম্পর্ক মনে করিয়া রাখিলে ভক্তকৃত পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টি-রহস্যের সমাধান গ্রহণ করিতে জ্ঞানী কখনও কুণ্ঠিত হইবেন না। জীবসৃষ্টি যদি জগদীশ্বরের লীলা হইল, তবে জীবের জীবনধারণের উদ্দেশ্য কি এবং জীবনে কর্ত্তব্যই বা কি? জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায় আছে। আমরা কি চাই, কিসের জন্যই বা অবিরাম পরিশ্রম করিতেছি, আবার কেনই বা কখনও কখনও শ্রমবিমুখ হইয়া গৃহকোণে বসিয়া আছি? এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে

প্রবৃত্ত হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আমাদের সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্ম-বিমুখতার সমস্ত পরিশ্রম ও বিশ্রামের সমস্ত চেষ্টা ও নিশ্চেষ্টতার মূলে বিদ্যমান আছে, আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক গতি—আনন্দলাভের বলবতী ইচ্ছা। এই আনন্দলাভের জন্যই আমাদের সারাজীবনব্যাপী উদ্যম ও পরিশ্রম বা তদ্বিমুখতা, এই আনন্দ পাইলেই আমরা সুখী হই, না পাইলেই আমরা হতাশের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া থাকি, জীবনে মৃত্যুর কামনা করি।

আনন্দলাভের জন্য আমাদের এই চিরব্যাকুলতার অন্তরালে সেই পরম আনন্দময়েরই লীলা বিদ্যমান আছে। মহাজ্ঞানী ও পরম-প্রেমিক তৈত্তিরীয় উপনিষৎকার এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তাঁহার অন্তরের নিভৃততম ও গভীরতম উৎস হইতে এক শুভক্ষণে এই অমৃতময়ী মহতী বাণী নিঃসৃত হইয়াছিল :—"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তীতি—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ভৃগুবল্লী, ৬ষ্ঠ অনুবাক্। আনন্দেই আমাদের উৎপত্তি, আনন্দেই আমাদের সংস্থিতি ও পরিপুষ্টি এবং আনন্দেই আমাদের সমাপ্তি। ধনীর সন্তান ধনের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে, আনন্দময়ের সন্তান আমরা আনন্দের অধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং এই আনন্দলাভ করিবার আকাঙ্খাই আমাদের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। ধনীর সন্তান জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই পিতৃধনের অধিকারী হইলেও অনেক সময়ে পৈত্রিক সম্পত্তিলাভ করিবার পথে বাধাবিঘ্ন পাইয়া থাকে এবং কখনও বা পিতৃধন ভোগ করা তাহার জীবনে ঘটিয়াই উঠে না, সেইরূপ আমাদের পৈত্রিক সম্পত্তি আনন্দলাভের পথেও বিস্তর বাধাবিঘ্ন আছে। এই সমস্ত বাধাবিঘ্ন একমাত্র মায়া হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই মায়া এতই প্রবলা, আমরা ইহার প্রভাবে এমনই অভিভূত হইয়া আছি যে, আমরা যে পরম আনন্দলাভের অধিকারী হইয়াও সেই পরম নিত্য পদার্থ হইতে যে বঞ্চিত আছি, তাহা অনেক সময়েই বিস্মৃত হইয়া যাই। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই মায়াপ্রসূত বিস্মৃতির মেঘ আমাদের চিত্তাকাশ চিরদিনই সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে না, মাঝে মাঝে জীবনের এক এক শুভমূহূর্ত্তে সেই মায়াধীশের ফুৎকার প্রভঞ্জনে মায়া-মেঘ অপসারিত হইয়া যায় এবং সেইক্ষণে মায়াপ্রভাব বিমুক্ত হইয়া চিৎসবিতার কিরণোদ্ভাসিত সুনির্ম্মল হৃদয় লইয়া জীব তাহার চিরকালের ন্যায্য অধিকার আনন্দলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হয়। যতক্ষণ আমরা মায়ামোহিত হইয়া থাকি, ততক্ষণই আমাদের দুঃখ, ততক্ষণই আমাদের নিরানন্দ। এই মায়ার হাত হইতে মুক্তি পাইলেই আমাদের দুঃখের ও নিরানন্দের নাশ হয়। কিন্তু দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই যে সেই ভূমানন্দলাভ হইবে, এমত নহে; তবে তাহাতে ভূমানন্দলাভের পথ কণ্টকমুক্ত হইয়া অনেকটা সুগম হয় বটে। দুঃখনাশ ও আনন্দলাভ দুইটি ঠিক একই বস্তু নহে, তবে আনন্দলাভ হইলে দুঃখ থাকে না, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। এই আনন্দলাভ করাই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অতএব মানবহৃদয়ের বৃত্তিসমূহকে এই উদ্দেশ্যমুখেই পরিচালিত করিতে হইবে এবং এই মহদুদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই মানবের যাবতীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যে কার্য্য এই আনন্দলাভের সহায়, তাহাই শ্রেয়, তাহাই কর্ত্তব্য এবং যাহা তাহার বিপরীত, তাহা সর্ব্বদাই সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। মানবের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য্যের ইহাই একমাত্র পরিমাপদণ্ডস্বরূপ পরিগণিত হওয়া উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রেও অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

জীবের অন্তর্নিহিত এই আনন্দলাভেচ্ছার মূলকারণ সেই সকল-আনন্দের আকর পরমানন্দময় ভগবান্; তাঁহারই অখণ্ড, পূর্ণ, বিরাট আনন্দের কণামাত্র পাইয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই নিখিল বিশ্বে দৃশ্য বা অদৃশ্য যাহা কিছু আছে, সমস্তই সেই পূর্ণানন্দেই মগ্ন হইয়া আছে, সৃষ্ট পদার্থের প্রত্যেক অণু-পরমাণুই সেই আনন্দকণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আনন্দসাগরের তরঙ্গের তালে তালে নৃত্য করিতেছে। এই বিশ্বব্যাপী আনন্দরাশির অভ্যন্তরেই আমরা বাস করিতেছি এবং জন্মাবধি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত এই আনন্দসুধা সেবন করিয়া জীবিত আছি। এই আনন্দের ভিতর দিয়াই সকল আনন্দের মূল উৎস সেই ভগবান্‌কে পাইতে হইবে, এই আনন্দ-নদী বাহিয়া গেলেই আমরা সেই আনন্দসাগরে গিয়া পৌছিব, ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই, অন্য উপায় নাই। কিন্তু এই ভুবনভরা আনন্দকে আনন্দ বলিয়া না বুঝিতে পারিলে, এই সুপরিব্যাপ্ত খণ্ড খণ্ড চূর্ণ আনন্দের স্বরূপজ্ঞান না হইলে, সেই অখণ্ড পূর্ণানন্দের সন্ধান পাইব কিরূপে? অতএব সর্ব্বাগ্রে সেইমত চিন্তা করিতে হইবে, সেইমত কার্য্য করিতে হইবে, যাহাতে আমরা এই নিখিল বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের ও বাহিরের আনন্দরাশির সত্তা অনুভব ও উপভোগ করিতে পারি এবং ক্রমশঃ মানবের চরম গন্তব্যস্থান সেই পরম আনন্দময়ের শ্রীচরণতলে উপনীত হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি। বহিঃপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি, গৃহ, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই আনন্দের সন্ধান লইতে হইবে, আনন্দের আস্বাদন লইতে হইবে, এবং সেই আনন্দময়ের সংবাদ লইতে হইবে। এই পরম উদ্দেশ্য সাধনকল্পে সমস্ত কার্য্যেই মানবের চিন্তাস্রোত প্রণালীবদ্ধ করিয়া ছুটাইতে হইবে। নতুবা বিপথগামী হইয়া, কলুষ-পঙ্কিল হইয়া, সেই স্রোত ব্যর্থ হইবে। যে চিন্তার ধারা পতিতপাবনী পবিত্র জাহ্নবীর ন্যায় সুখদা ও মোক্ষদা হইত, তাহা কর্ম্মনাশায় পরিণত হইয়া সর্ব্বনাশ করিবে। অতএব সাহিত্যের মধ্য

দিয়া মানবের যে চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহারও গতি ভিন্নমুখী হইলে চলিবে না, সাহিত্য যদি এই আনন্দের সন্ধান না দেয়, তবে তাহা মানবজীবনের চরম লক্ষ্য সাধনকার্য্যে কোন প্রকারই সাহায্য করিল না বলিতে হইবে। সেরূপ সাহিত্য মানবের সহচর হইবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী; সুতরাং সে সাহিত্যের সার্থকতা নাই।

শব্দার্থহিসাবে সাহিত্য হইতে আমরা সাহচর্য্যের ভাব পাই বটে, কিন্তু শুধু শব্দের অর্থ ধরিয়া বস্তুর বিচার করিলে চলিবে না, সাহিত্য বলিতে আমরা কি বুঝি, এক্ষণে তাহাই দেখিবার চেষ্টা করিতেছি। প্রকৃত শব্দার্থ হইতে অনেকটা সঙ্কুচিতার্থেই আমরা সাহিত্যশব্দের ব্যবহার করি। শব্দার্থহিসাবে বলা যাইতে পারে, যাহাই আনন্দলাভের পথে মানবকে সাহায্য করে, তাহাই সাহিত্য; যাহা হইতে মানব আনন্দ পায়, তাহাই সাহিত্য। বিজ্ঞানবিদ্ বিজ্ঞান হইতেই আনন্দ পায়, সঙ্গীতজ্ঞ সঙ্গীত হইতেই আনন্দ পায়, বণিক্ বাণিজ্য হইতেই আনন্দ পায়, শিল্পী শিল্প হইতে আনন্দ পায়, অতএব বিজ্ঞান, সঙ্গীতশাস্ত্র, শিল্পকলা, বাণিজ্যনীতি, সমস্তই সাহিত্য। কিন্তু ব্যবহৃত সঙ্কুচিত অর্থে বিজ্ঞানাদি পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিদ্যাই সাহিত্যের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। প্রকৃত সাহিত্যে আনন্দ ত আছেই, অধিকন্তু রসও আছে। মানবচিন্তার অন্তর্গত বিজ্ঞানাদি অন্যান্য বিদ্যায় শুধু আনন্দ আছে, রস নাই এবং এই রসের অভাবই তাহাদিগকে প্রকৃত সাহিত্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। আনন্দের সহিত রসের একত্র সন্নিবেশন ও সংমিশ্রণই সাহিত্যের বিশেষত্ব। প্রকৃত ও সার্থক সাহিত্যপাঠে আমরা আনন্দ উপভোগের সঙ্গে সঙ্গেই রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া থাকি।

কিন্তু এই রসের অবতারণায় একটু গোলযোগ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কেহ হয়ত বলিবেন যে, কেহ কেহ কুৎসিত বিষয় হইতেও যথেষ্ট আনন্দ ও রস পাইয়া থাকেন, তবে অশ্লীল কুৎসিত বিষয়কেও সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিতে হইবে, নতুবা সাহিত্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। এ কথার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যে আনন্দ ও রস উপভোগ করিয়া সেই পরম আনন্দ ও রসের আভাস পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃত আনন্দ ও প্রকৃত রস, এবং তাহারই স্থান সাহিত্যে আছে। কুৎসিত বিষয় হইতে কখনই এই প্রকার আনন্দ বা রস পাওয়া যায় না এবং পাওয়া সম্ভবও নহে; কারণ তাহা বস্তুগত প্রকৃতিবিরুদ্ধ। অতএব সাহিত্যে অশ্লীল, কুৎসিত বিষয়ের স্থান হইতে পারে না। কুৎসিত বিষয় হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাহা আনন্দ নহে, আনন্দের আকারে মোহ; রস নহে, রসের আকারে বিষ! যে ব্যক্তি মানবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু মায়াদ্বারা যত অধিক মোহিত হয়, সেই ব্যক্তিই কুৎসিত বিষয় উপভোগ করিয়া তত অধিক তথাকথিত আনন্দ ও রস পাইয়া থাকে। আনন্দের ও রসের স্বরূপ কি, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইলে অগ্রে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া, সাধনা করিয়া, অধিকারী হইতে হইবে, নচেৎ অশ্লীল বস্তু হইতে উপজাত পঙ্কিল মোহকেই আনন্দ বলিয়া—বিষকেই রস বলিয়া অপজ্ঞান হইবে। সুতরাং যাহা প্রকৃত আনন্দ, যাহা বিশুদ্ধ রস, যে আনন্দে মোহ নাই, যে রস সত্ত্বগুণকে আবরণ করে না, যাহা কুপ্রবৃত্তি হইতে জাত নহে, যাহা কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক নহে, যে আনন্দে ও যে রসে সেই পরম আনন্দময়ের—সেই পরম রসময়ের আভাস পাওয়া যায়, সেই আনন্দ - সেই রসই সাহিত্যে স্থান পাইবে এবং সেই আনন্দ ও রসের অস্তিত্ব, গভীরতা ও পরিব্যাপ্তি অনুসারেই সাহিত্যের সার্থকতার বিচার হইবে।

শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা হইতে সাহিত্যকে যেরূপ স্বতন্ত্র করা যায়, সেইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতেও সাহিত্য গ্রন্থকে স্বতন্ত্র করা যায়। ধর্ম্মগ্রন্থে যে আনন্দ ও রস আছে, তাহা অত্যন্ত গাঢ় ও গূঢ় অবস্থায় আছে, সে আনন্দের সন্ধান পাওয়া এবং সে রস সুচারুরূপে উপভোগ ও পরিপাক করা অসাধারণ সৌভাগ্যশালী ও শক্তিশালী ব্যক্তির পক্ষেই সুসাধ্য, অপরের পক্ষে নহে। উপনিষদের একটিমাত্র সূত্রের মধ্যে বা ভাগবতের একটিমাত্র শ্লোকের মধ্যে ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তি হয়ত একত্র এত আনন্দের—এত রসের সন্নিবেশ দেখিতে পান যে, সেই সূত্র বা সেই শ্লোক আস্বাদন করিয়াই তিনি সারাজীবন বিভোর হইয়া থাকেন। কিন্তু সাধারণ পাঠকের নিকট সেই অপরূপ সূত্র বা শ্লোকটি নিতান্ত সাধারণভাবেই প্রতীয়মান হইবে। এইরূপেই সাধারণ পাঠক ধর্ম্মগ্রন্থনিহিত আনন্দ ও রসের প্রকৃত আস্বাদন হইতে বঞ্চিত থাকে। সাহিত্যেও উক্ত প্রকার আনন্দ ও রস আছে, কিন্তু তাহা অপেক্ষাকৃত তরল ও লঘু-ভাবে থাকিয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। যাহা ধর্ম্মগ্রন্থে অভ্রভেদী সুনির্ম্মল তুষারশৈলরূপে নির্জ্জনে দণ্ডায়মান থাকিয়া যোগিগণেরই অধিগম্য ও উপযোগী স্থান ছিল, সাহিত্যে তাহা করুণাবিগলিত হইয়া অমৃতপ্রবাহিণী স্রোতস্বিনীর আকার ধারণ করিয়া—নানাবিধ গ্রাম নগর জনপদকে শোভাসম্পদে ভূষিত করিয়া—তাহাদিগের সমস্ত আবর্জ্জনারাশি ধৌত করিয়া—তাহাদিগকে নির্ম্মল পবিত্র করিয়া—তাহাদের শস্যক্ষেত্রকে উর্ব্বর করিয়া—তাহাদিগের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত কার্য্যেই সহায়তা করিয়া—তাহাদের সকল সন্তাপ দূর করিয়া—জননীর ন্যায় হাসিমুখে তাহাদের সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া—কলকলনাদে সাগরাভিমুখে চলিয়াছে। ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সাহিত্যগ্রন্থের এইখানেই পার্থক্য এবং এইজন্যই সাহিত্য-পথই সাধারণের পক্ষে ভগবৎসাধনার প্রথম অবস্থায় প্রধান ও প্রশস্ত পথ। সাহিত্যিক মাত্রেরই বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত যেন সর্ব্বসাধারণের এই প্রথম সাধনের পথ সর্ব্বদাই আবর্জ্জনামুক্ত ও কণ্টকাদিশূন্য থাকে, যেন

এই পথের গতি চিরদিন অনুক্ষণ ঈশ্বরাভিমুখী থাকে, এই পথের পান্থ যেন ধীরমন্থরপাদবিক্ষেপে এককালে সেই তুষারবিমণ্ডিত অভ্রভেদী সর্ব্বোচ্চ শৈলশিখরে, সেই আনন্দভবনে, উপনীত হইতে পারে। সাহিত্যদ্বারা এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই সাহিত্যের সার্থকতা হইল।

সাহিত্যের এই স্বরূপবিচারে সাহিত্যের সার্থকতার এইরূপ সিদ্ধান্তনির্ণয়ে শঙ্কিত হইয়া কেহ হয়ত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তবে সাহিত্য কি শুধু বৃহদাকার হস্তীর ন্যায় গুরুভার হইয়া মন্থরগতিতেই চলিতে থাকিবে, গুরুমহাশয়ের ন্যায় গম্ভীর আসনে বেত্রহস্তে ছাত্রদিগকে কেবল নীতিশিক্ষা দিতেই ব্যস্ত থাকিবে, তাহার মুখে কি কখনও হাসি দেখা দিবে না? আমাদের বেদনায় কি তাহা বেদনা অনুভব করিবে না?" এই প্রশ্নের উত্তরে অকুণ্ঠিতচিত্তে আমি বলিব, "সাহিত্যের এই বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিবার কোন কারণ নাই এবং সাহিত্যের আকৃতি ঐরূপ ভীতিপ্রদও নহে।" সাহিত্যে অশ্লীলতা থাকিবে না বটে, কিন্তু তাহাতে কৌতুক, হাস্য, রহস্য, করুণার অশ্রুজল, ব্যথিতের বেদনা, এ সমস্তই থাকিবে; এবং তাহা থাকা বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয়ও বটে। হাসি যদি নির্দ্দোষ হয়, যদি তাহা বিমলানন্দপ্রদ হয়, তবে সাহিত্যে সে হাসির স্থান অতি উচ্চে। মোট কথা, সাহিত্য গুরু হউক, লঘু হউক, গাঢ় হউক, তরল হউক, তাহা সকল সময়েই কিন্তু বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়া চাই। এই নীতির তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলেই সাহিত্যের সার্থকতার ক্ষতি হইল বুঝিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আনন্দের সহিত রসের সংমিশ্রণই সাহিত্যের বিশেষত্ব। সাহিত্যে এই রস আছে বলিয়াই সাহিত্যে এত বৈচিত্র্য আছে, যে নিত্য উৎস হইতে আনন্দধারা নির্গত হইতেছে, সেই উৎস হইতেই রসধারা বিগলিত হইতেছে। এই জন্যই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে "রসো বৈ সঃ।" যিনি আনন্দময়, তিনিই রসময়, সেই রসময়ই সর্ব্বপ্রকার রসের আকর ও উৎপত্তি স্থান। আমরা যতপ্রকার রসের ধারণা করিতে পারি, যতপ্রকার রসের কল্পনা করিতে পারি, তাহার প্রত্যেক রসই সেই পরমরসময়েরই করুণাপ্রেরিত। তাহা না হইলে রসমাত্রেরই আলোচনায় আমরা আনন্দ পাই কেন? হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস প্রভৃতি কয়েক প্রকার বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে এই রসের অবতারণা ও পরিপুষ্টি করা হয় বটে, কিন্তু মূলতঃ সমস্ত রসই এক এবং সমস্ত রসের মধ্য দিয়াই পরমানন্দের আভাস পাওয়া যায়। যে রসে ইহা না পাওয়া যায়, তাহা দুষ্ট রস অর্থাৎ রসের আকারে বিষ, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যে সাহিত্য এই দুষ্টরসে সিক্ত, তাহা বিষবৎ পরিত্যাজ্য। সূর্য্য হইতে যেমন শ্বেত-রশ্মি বিকীর্ণ হয়, কিন্তু সেই রশ্মিকে যখন কাচখণ্ডবিশেষের (Prism) মধ্য দিয়া প্রবাহিত করা যায়, তখন তাহা লাল, নীল, হরিদ্রা প্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র বর্ণে বিশ্লিষ্ট হইয়া বিভিন্ন আকারে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ সমস্ত রসই প্রকৃতিগত এক হইলেও বিষয়ভেদে ও অবস্থাভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া মানবমনে কার্য্য করে এবং সাহিত্যে তাহাই বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়। সমস্ত রসই যে একজাতিত্ব সূত্রে আবদ্ধ, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, প্রত্যেক রসেরই অন্তরালে আনন্দ আছে। করুণ রসাত্মক কাহিনী বা রৌদ্র-বীভৎস-রসাত্মক কাহিনীও বার বার পড়িতে ইচ্ছা হয়; কেন না, উহার ভিতর দিয়াও আমরা আনন্দের আস্বাদন পাই। করুণরসের অশ্রুজলের ভিতরও যে আনন্দ, রৌদ্ররসের উত্তেজনার মধ্যেও সেই আনন্দ, এই আনন্দের সন্ধান না পাওয়া যাইলে কোন রসই উপভোগ করা সম্ভব হইত না।

আনন্দ ও রস লইয়া সাহিত্য বটে, কিন্তু এই আনন্দ ও রসের একটি আধার থাকা চাই, নতুবা সাহিত্য—সাহিত্যপদবাচ্য হইতে পারে না। আমরা কেবলমাত্র উপযুক্ত চিন্তাদ্বারাই মনে মনে এই আনন্দ ও রস উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু সেই চিন্তা সাহিত্য হইবে না। সেই চিন্তা যতক্ষণ না উপযুক্ত রূপ ধরিয়া প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ তাহা সাহিত্যে পরিণত হয় না। এই চিন্তা যাহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেই ভাষা কহে। এই ভাষাই ঐ চিন্তার আধার। আনন্দ সাহিত্যের আত্মা, রস সাহিত্যের প্রাণ এবং ভাষা সাহিত্যের দেহ। যেমন আত্মার কল্যাণ করিতে হইলে শরীরের দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হয়, সেই রকম সাহিত্যে আনন্দ ও রস পাইতে হইলে সাহিত্যের ভাষাকেও তদুপযোগী করিয়া গঠিত করিতে হইবে। সুস্থ সুন্দর মানুষ দেখিলে তাহার প্রতি আমরা স্বতঃই আকৃষ্ট হইয়া থাকি, পক্ষান্তরে রুগ্ন কদাকার মানুষ দেখিলে ঘৃণা না করি, অন্ততঃ দেখিবামাত্রই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবার কোন সঙ্গত কারণ পাই না। সাহিত্যেও এই নিয়ম বেশ খাটে। ভাষা যদি সবল, সরল ও সুন্দর হয়, আমরা সহজেই সে ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হই, যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে, আমরা সে ভাষার সহিত বেশীক্ষণ আলাপ করিতে পারি না। এই দায়ে ঠেকা দুইশ্রেণীর পাঠকের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। প্রথমতঃ যে সমস্ত ছাত্র—"পাশ" করিবার আশায় একেবারে "মরিয়া" হইয়া আছে, তাহারা বাধ্য হইয়াই ভাষা-নির্ব্বিচারে পাঠ্য পুস্তক পড়িয়া থাকে; শুধু পড়া নয়, আবশ্যকমত মুখস্থও করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ যখন গ্রন্থকার স্বয়ং তাঁহার রচিত গ্রন্থ তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট পাঠ করিয়া তাঁহাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পীড়া দিতে থাকেন, তখন সেই হতভাগ্য গ্রন্থকার-বন্ধুরা ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জার খাতিরে ঐ দায়ে পড়িয়াই পুস্তকের ভাষার শ্রুতিকটুতার বিষয় বিচার না করিয়াই ঐ ভাষা শুনিতে বাধ্য হয়। নতুবা

সাধারণ স্বাধীনচেতা পাঠকমাত্রই ভাষার বিভীষিকায় পশ্চাৎপদ হইয়া থাকেন। অতএব সাহিত্যিক মাত্রেরই ভাষার প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

জীবের পক্ষে দেহ, প্রাণ, আত্মা, এ তিনটিই মূল্যবান্ হইলেও দেহ অপেক্ষা প্রাণ এবং প্রাণের অপেক্ষা আত্মাই বেশী মূল্যবান্; সেইরূপও সাহিত্যের পক্ষে ভাষা ও ভাব উভয়ই মূল্যবান্ হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভাষার অপেক্ষা ভাবেরই মূল্য অধিক। যেমন রূপবান্ ও বলিষ্ঠ দেহধারী পাপাত্মা অপেক্ষা কুরূপ ও রুগ্নদেহী পুণ্যাত্মা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ, সেইরূপ দুষ্টভাবযুক্ত পুষ্ট ও সৌন্দর্য্যশালী ভাষা অপেক্ষা সাধুভাববিশিষ্ট শ্রীহীন দুর্ব্বল ভাষাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এই শেষোক্ত প্রকার ভাষা ঔষধের ন্যায় তিক্ত হইলেও সেবনীয়, আর পূর্ব্বোক্ত অশ্লীলভাবযুক্ত সুন্দর ভাষা বিষের ন্যায় তরল ও উজ্জ্বল হইলেও পরিত্যাজ্য। তবে যাহাতে ভাব ও ভাষা উভয়ই সুন্দর ও শোভন হয়, উভয়ই হৃদয়গ্রাহী ও নয়নরঞ্জনকারী হয়, সে বিষয়ে সাহিত্যিক মাত্রেরই যত্নবান্ হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে কোন একটু ত্রুটি হইলেই সাহিত্যের সার্থকতারও সেই পরিমাণে ত্রুটি হইল বুঝিতে হইবে। সাধুভাষা ব্যবহার করিতে হইবে কি চলিত ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে, ইহা লইয়া আজকাল অনেক তর্ক-বিতর্ক হইতেছে দেখিতে পাই। কিন্তু এইরূপ তর্কে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, ভাবপ্রকাশের জন্যই ভাষার প্রয়োজন। অতএব যেখানে যে ভাষা প্রয়োগ করিলে বক্তব্যটি সুচারুরূপে, সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, সেইখানে সেইরূপ ভাষাই ব্যবহার করিতে হইবে। ইহার জন্য কোন বাঁধা ধরা নিয়ম করা যায় না, করা সম্ভবও নহে। শ্রীকৃষ্ণের যেমন রাজবেশও ছিল, রাখালবেশও ছিল এবং ঐ দুইপ্রকার বেশের তাঁহার প্রয়োজনও ছিল, ভাষারও তেমনি রাজবেশ ও রাখালবেশ এই দুই বেশেরই আবশ্যকতা আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মহা ঐশ্বর্য্যশালী দ্বারকাপুরীতে বিবিধ মণিরত্নবিমণ্ডিত অপরূপ রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া পার্ষদপরিবেষ্টিত থাকিয়া রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তখন তিনি মণিমাণিক্যখচিত তৎকালোপযোগী মহামহিমান্বিত রাজবেশই পরিধান করিতেন, আবার যখন পরম রমণীয় বৃন্দারণ্যে শ্রীদামসুবলাদি অন্তরঙ্গ সখাপরিবেষ্টিত হইয়া গোচারণ করিতেন, তখন তাঁহার তৎকালোপযোগী রাখালবেশই থাকিত; তখনকার পীতধড়া, শিখিপুচ্ছশোভিত ঈষৎ বঙ্কিম চূড়া, গলদেশে বিলম্বিত অপরূপ বনফুলের মালা, মোহনবেণু, গোতাড়নদণ্ড প্রভৃতি অপরূপ বেশভূষা মুনিগণেরও মনোহরণ করিত। এইরূপ ভাষার বেলাও বেশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে।

"সাধুভাষা বনাম চলিতভাষা" আখ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যপ্রাঙ্গণে যে মহাসমর চলিতেছে, তাহাতে খ্যাত অখ্যাত অনেক রক্ষীই এক এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল কোলাহলসহকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোন্ পক্ষের জয় হইবে, তাহা এখনও বলা যায় না, কারণ জনার্দ্দনকে ত এ পর্য্যন্ত কোন পক্ষেরই সারথীর কার্য্য করিতে দেখা গেল না। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, ভাষার-বেশ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করিয়া রণে প্রবৃত্ত হইলে অন্ততঃ যুদ্ধের কোলাহলটা অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইত। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় যদি হুতোমের ভাষায় মহাভারত লিখিতেন এবং মহাভারতের ভাষায় হুতোম লিখিতেন, অথবা কবিবর ৺মধুসূদন দত্ত যদি ব্রজাঙ্গনার ভাষায় মেঘনাদ লিখিতেন এবং মেঘনাদের ভাষায় ব্রজাঙ্গনা লিখিতেন, তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে যে তাজ্জব ব্যাপারের অভিনয় হইত, তাহা বঙ্গীয় নাট্যরঙ্গমঞ্চে অভিনীত তাজ্জব ব্যাপার অপেক্ষা নিশ্চয়ই কোন অংশে হীন হইত না। কিন্তু সাহিত্যে তাজ্জব ব্যাপার কোন সাহিত্যসেবীই ইচ্ছা করেন না। সুতরাং যাহাতে সাহিত্যে ঐরূপ অঘটন না ঘটে, সে বিষয়ে লেখক ও পাঠক উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ যত্নবান হওয়া উচিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ইহাতে পাঠকের হাত কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, পাঠক Passive resistance দ্বারা অর্থাৎ ঐরূপ অপাঠ্য ভাষায় লিখিত পুস্তক না পাঠ করিয়া পরোক্ষভাবে ভাষা বিষয়ে সাহিত্যের মহদুপকার করিতে পারেন, কিন্তু যদি ঐ পুস্তক "অনুমোদিত ও নির্ব্বাচিত পাঠ্য" পুস্তক হয় এবং পাঠক যদি পরীক্ষার্থী হন, তবেই "বিপত্তৌ মধুসূদন!"

প্রবন্ধ ক্রমশই দীর্ঘ হইতেছে, অতএব যদি কোন পাঠক এ পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকেন, তবে তাঁহার অনন্ত ধৈর্য্য ও অসীম সহিষ্ণুতার জন্য তাঁহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

Bengalee National Anthem.

বঙ্গীয় রাজ-স্তুতি ।

Written and Composed by
KRISHNA CHANDRA DASS.

ral .... Tempo

জ য় স স্রা টের জয় গাও স স্রা টের জয় চি র জী বি

সু খী হ রি ক র তাঁর শ ত্রু ক্ষয় থা কুক্ অ

ক্ষ য় কী র্ত্তি রাজ ভ ক্তি পূ র্ণ স্ফু র্ত্তি অ নু গ ত প্র জা শ ক্তি

বৃদ্ধি পা ল নে তে হয়

পরপৃষ্ঠায় গানটির বিষয় দেওয়া গেল।

রাজ-স্তুতি।

জয় সম্রাটের জয়, গাও সম্রাটের জয়,
চিরজীবী সুখী হরি কর তাঁর শত্রুক্ষয়।
থাকুক্ অক্ষয়কীর্ত্তি, রাজভক্তি পূর্ণস্ফূর্ত্তি,
অনুগত প্রজাশক্তি বৃদ্ধি পালনেতে হয়।

TRANSLATION.

Oh Lord Hari ! send victory to our King-Emperor, let us sing victory to our King-Emperor, bless him with long life, happiness and annihilate his enemy. Let his glory be perpetual, our devotion to him remain in full vigour and the submissive energy of his people be increased by his benevolent reign.
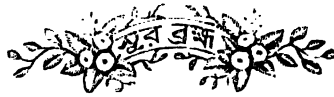
সাধুর পরীক্ষা।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

নদীয়া জেলার অন্তর্গত নাকাশীপাড়া হইতে কিছু দূরে শিবধাম একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এক সময় গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধ ছিল, এখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামটি হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। এখন গ্রাম্যপথে আর লোকের সে কলরব নাই, গ্রামপ্রান্তস্থিত হাটে আর সেই জনতা নাই, বাড়ুয্যেদের বৈঠকখানায় আর সে মজলিস্ নাই। এমন কি গ্রামের দলাদলিরও আর তেমন জাঁক নাই। গ্রাম্যদেবী-মন্দিরে পূজার সে আড়ম্বর আজ কয়েক বৎসর লোপ পাইয়াছে; এখন রামী, বামী, ক্ষেমীর সে ভোগ-রন্ধনের ধূম নাই, গ্রাম্য বালকগণের বলিদানদর্শনের জন্য সে ছুটাছুটি নাই, অতিথি ব্রাহ্মণাদি ভোজনের সে জাঁক নাই, গ্রাম্য বধূগণের বর্ষীয়সীদিগের সহিত আরত্রিক দেখিতে যাইবার সে ব্যস্ততা নাই। এখন গ্রাম্য পূজারী বিপিনঠাকুর, বেলা দশটা এগারটার সময় কোন গতিকে কাসিতে কাসিতে একখানা ক্ষুদ্র নৈবেদ্য লইয়া বিশালাক্ষী দেবীর পূজা করিয়া আইসেন, আর বেলা পাঁচটার পরই আরত্রিক সারিয়া ও শীতলি দিয়া, বিশালাক্ষীর সামান্য দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নিজের দাবীটা দৃঢ় করিয়া আইসেন। ফলে গ্রামের সজীবতার লক্ষণ সবই লোপ পাইয়াছে, আর নির্জ্জীবতার লক্ষণগুলি পূরামাত্রায় প্রকট হইয়াছে।

গ্রামে লক্ষ্মীমন্ত লোক আর বড় কেহই নাই। মুখুয্যেদের পূর্ব্বসম্পত্তি এখনও সমস্ত নিঃশেষ হয় নাই, তবে তাঁহারা এখন আর 'দেশে' থাকেন না, ম্যালেরিয়ার ভয়ে কলিকাতায় কায়েমমোকাম করিয়াছেন। মিত্রদের অবস্থা মন্দ নহে, তবে তাঁহারা বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে বিদেশেই থাকেন, বাড়ীরক্ষার ভার এক মালীর উপরই আছে। গ্রামের অন্যান্য সকলের অবস্থা প্রায় সমান, কাহারও অতিকষ্টে দুই বেলা দুই মুঠা জুটে, কাহারও সকল দিন এক বেলাও জুটে না। ফলে গ্রামবাসী সকলেই খুব দুঃখী; তন্মধ্যে টুনো ভট্চাজ আর প্যানা বাড়ুযোর অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ।

টুনো ভট্চাজের পিতা একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। টুনো বাল্যকালে ঠাকুরমার ও পিসিমার আদুরে ছেলে ছিল, কাজেই তাহার পিতার টোলে অনেকের বিদ্যালাভ হইলেও তাহার কিছুই হয় নাই। প্যানা বাড়ুয্যে কুলীনের ছেলে, মামার বাড়ীতেই প্রতিপালিত। তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কেহ যত্নও করে নাই, সে কিছু শিখেও নাই। মামার দেহান্ত হইলে, মামাতো ভাইরা তাহাকে একটু জমী দিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, আর কৌলীন্যের জোরে প্যানা একটি বিবাহ করিতেও পারিয়াছে। টুনোর কিছু আয় ছিল, কিন্তু সাংসারিক বে-বন্দোবস্তর ফলে তাহার সেই আয়ে কুলায় না, মাসের মধ্যে দুই চারিদিন উপবাস করিতে হয়। প্যানার কোন আয় ছিল না সত্য, কিন্তু তাহার পত্নী জলের কল্সী তুলিয়া, গাছের ডুমুর পাড়িয়া অতি কষ্টে সংসার চালাইত, তবে উপবাসের হস্ত হইতে সে একেবারে পরিত্রাণ পাইত না।

টুনোর সহিত প্যানার বড় সদ্ভাব। উভয়ে বিরলে বসিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট দুঃখের কথা বলিয়া মনের ভার লঘু করিত। চৈত্রমাসে একদিন উভয়েরই অন্ন জুটে নাই। টুনো গৃহিণীর সহিত ঝগড়া করিয়া হাঁড়ি-কুঁড়ি ভাঙ্গিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, প্যানা জঙ্গল ঘুরিয়া কয়েকটা ফল সংগ্রহ করিয়াছিল, দুই স্ত্রী-পুরুষে তাহা কিছু খাইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে ক্ষুন্নিবৃত্তি না হওয়াতে টুনোর সন্ধানে বাহির হইয়াছে। উদ্দেশ্য, দুই জন কথাবার্ত্তা কহিয়া দিনের অবশিষ্ট অংশটা কাটাইয়া দিবে।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া প্যানা বিশালাক্ষীদেবীর মন্দিরাভিমুখে যাইতেছিল, পথে দেখিতে পাইল, টুনো এক বাঁধানো বটবৃক্ষতলে বসিয়া কি ভাবিতেছে। প্যানা একটু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে ভায়া, আকাশ পানে চেয়ে ভাব্‌চো কি?"

টুনো।—ভাব্‌চি মাথা আর মুণ্ডু; ভগবান্ চিরকাল যে ভাবনা ভাব্‌তে দিয়েছেন, তাই ভাব্‌চি।

প্যানা।—ভায়ার মুখটো দেখ্‌চি একেবারে শুকিয়ে গেছে। ভায়ার বুঝি আজি হরিবাসর?

টুনো।—ওটা ত আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক, ও কথা জিজ্ঞাসা করাই বৃথা। আমরা কি শুভলগ্নেই জন্মিয়াছিলাম? তোমার খবর কি?

প্যানা।—ত-থৈ-ব-চ।

টুনো।—তোমার তবু ভাই বাড়ীতে একটু সুখ আছে, আমার যে তা'ও নাই। আমার বাড়ীতে যেন রাবণের চিতা অষ্টপ্রহর জ্বল্‌চে।

প্যানা।—তোমার ভাই আবার ঐ একটা ফ্যাসাদ। আমার বাড়ীর মাগীটা বেশ শান্তশিষ্ট আছে। কিন্তু ভাই পেটে ভাত না থাক্‌লে সবই জ্বালা।

টুনো।—সে আর ভাই একবার। তবে আমার আবার "গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকম্!"

প্যানা।—যা'ক্, এখন কিসে এই দুঃখ যায়, তাহা

বলিতে পার? একটা শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিলে হয় না?

টুনো।—এ ব্যাধি শান্তি স্বস্ত্যয়নে যাবার নয়। আমি অধ্যাপকের ছেলে, ও ঢের করে দেখেচি। তেমন কোন সাধু সন্ন্যাসীর দেখা পেতাম।

প্যানা।—আমাদের এ দিকে সাধু সন্ন্যাসী ত প্রায় আসে না। কেবল মাঝে মাঝে দুই এক বেটা গাঁজাখোর ও জুয়াচোর আসে। আসল সন্ন্যাসী পাই কোথায়? আর যে চলে না। একটা কিছু করা ত চাই?

টুনো।—শুনেছি, সাধু দর্শনের জন্য মন বড় ব্যাকুল হইলে সাধুরা আপনিই আসিয়া দেখা দেন। কিন্তু আমাদের ত সে ব্যাকুলতা নাই।

প্যানা।—আমাদের দোষ যে ভাই ষোল আনা। ভগবান্ কি আর বিনা দোষে কাউকে কষ্ট দেন?

টুনো।—কর্ম্মফল, কর্ম্মফল ভায়া, সবই কর্ম্মফল।

(২)

প্যানা ও টুনোর এই কথোপকথনের পর কয়েক মাস কাটিয়া গিয়াছে। এই সময় যুরোপীয় যুদ্ধের জন্য বাঙ্গালার অবস্থা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। কাপড়, চিনি প্রভৃতি দুর্ম্মূল্য; যাহাদের কষ্টে সংসার চলিত, তাহাদের সংসার অচল হইয়া উঠিয়াছে। প্যানা ও টুনোর কষ্টের আর সীমা নাই।

এই সময় শিবধামে অকস্মাৎ এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল। সন্ন্যাসী আসিয়া বিশালাক্ষীদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। গ্রামের বাহিরে বিশালাক্ষীর মন্দিরে। সন্ন্যাসী আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা মন্দিরাভিমুখে ছুটিল। বহুদিন পরে মন্দিরে যাইবার পথ লোককোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল।

সন্ন্যাসী কাহারও সহিত কথা কহিলেন না, কাহারও নিকট কিছু চাহিলেন না। লোক তাহার চারিপাশে ভিড় করিয়া বসিল, শেষে নিরাশ হইয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িতে লাগিল এবং ফিরিবার পথে সন্ন্যাসীর সমালোচনায় কাননপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

নটবর বলিল,—বেটা বদমায়েস। উহার চেহারাটা দেখ্‌লে না, কেমন নাদুসনুদুস্।

শ্যামাচরণ বলিল,—চেহারা আবার নাদুসনুদুস্ দেখ্‌লে কোথায়? তোমাদের যে কেমন, যাকে দেখ্‌তে নারি, তার চলন বাঁকা! আগে দু'দিন দেখ, লোকটা কেমন? তার পর ভালমন্দ বিচার করিও।

হরিনারায়ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল,—উহার পাঁচটা উপপত্নী আছে। লোকটা ধড়িবাজ বদমায়েস! সাধু! সাধু ওর মাথা?

উমাচরণ বলিল,—লোকটা চোরের সর্দ্দার বা পুলিসের গোয়েন্দা হইলেও পারে।

ভূপতিচরণ বলিল,—তোমরা যে যাই বল ভাই, আমার মনে হইল, লোকটাতে বস্তু আছে।

এইরূপ দলে দলে লোক ফিরিতে লাগিল এবং দফায় দফায় সন্ন্যাসীর সমালোচনা চলিতে লাগিল। ফলে মেজরিটির মতে সন্ন্যাসী গুণ্ডা ও বদ্‌মায়েস বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন, দুই এক জন সন্ন্যাসীকে সমর্থনও করিলেন, কিন্তু ভোটে নিন্দুকদিগেরই জয় হইল।

সন্ধ্যার পর বাঞ্ছা জেলে, আত্মারাম মালো, তারাপদ ঠাকুর প্রভৃতি 'ত্বরিতানন্দ' সেবকের দল সন্ন্যাসীর সহিত গঞ্জিকাসেবন করিবার জন্য বিশালাক্ষীর নাটমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী সে পথে তাহাদিগকে বিশেষ আপ্যায়িত না করায় তাহারাও চলিয়া গিয়াছে। রাত্রি আন্দাজ সাড়ে আটটার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ হইল। সন্ন্যাসী সেই নাটমন্দির প্রতিধ্বনিত করিয়া চণ্ডীপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন,—

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদিসংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

এই সময় ধূমধূসর লণ্ঠন হস্তে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি অকস্মাৎ সেই মন্দিরপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং অতি সাবধানে সন্তর্পণে যে স্থানে সন্ন্যাসী বসিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া বসিল। সন্ন্যাসী আপন মনে চণ্ডীপাঠ করিতে লাগিলেন।

চণ্ডীপাঠ শেষ হইল। সন্ন্যাসী সস্নেহে আগন্তুক দুইজনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা এত রেতে কি জন্য এসেছ?"

পাঠক! এই দুই জন আর কেহই নহে, আমাদের সেই চিরপরিচিত প্যানা আর টুনো। তাঁহারা উভয়ে সন্ন্যাসীর কথা শুনিয়া যেন হাতে স্বর্গ পাইল। তাঁহারা উভয়ে একে একে সন্ন্যাসীর নিকট আপন আপন দুঃখ নিবেদন করিল এবং কিসে তাহার প্রতীকার হয়, তাহার উপায় করিবার জন্য সন্ন্যাসীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল। সন্ন্যাসী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমি এখানে কয়েকদিন আছি, একদিন আমি তোমাদের বাড়ী যাইব, যাইয়া যা হয় ব্যবস্থা করিব। তোমরা এখন বাড়ী যাও।"

(৩)

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি অনুসারে সন্ন্যাসী আজ টুনো ভট্টাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। টুনো যেমন সন্ন্যাসীকে লইয়া গৃহপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, অমনই তাহার গৃহিণী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সর্ব্বনাশ! আবার একটা চোর লইয়া এসে হাজির! বেরো বাড়ী থেকে।" সন্ন্যাসী নীরব। টুনো কাতরভাবে বলিল, "একটু চুপ কর, ইনি ভাল সন্ন্যাসী।"

টুনোর গৃহিণী অমনই ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি যেমন ভাল, সন্ন্যাসীও তেমনই ভাল।"

টুনো আর কথা কহিল না। সন্ন্যাসীকে লইয়া ঘরের দাওয়ায় বসিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "একটু মাটি আনিতে হইবে।" টুনো গৃহিণীকে একটু মাটি আনিতে বলিল। ক্রুদ্ধা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া টুনোর ঘরণী বলিল, "লক্ষীছাড়া হাভাতে মিন্সে, আমি এখন মাটি কোথায় পা'ব? উনুনটা ভেঙ্গে দেব?" টুনো ভয়ে জড়সড় হইয়া নিজেই একটু মাটি সংগ্রহ করিয়া আনিল। সন্ন্যাসী বলিলেন, "ঐ মৃত্তিকাটুকু চূর্ণ করিয়া একটু কাপড়ে ছাঁকিতে হইবে। একখণ্ড বস্ত্র চাই।" টুনো যেন ঘোর অপরাধীর মত জড়সড় হইয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, "একটু ন্যাকড়া দিতে পার?" আর রক্ষা নাই। ব্রাহ্মণকন্যা পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের পরিধানের কাপড় ছিঁড়িতে উদ্যত হইল। তখন টুনো এক প্রতিবেশীর নিকট হইতে এক টুকুরা ছিন্ন বস্ত্র আনিল। সন্ন্যাসী আবার কিছু ঘৃত চাহিলেন। এবার টুনো তাঁহার স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া নিজে দোকান হইতে ধারে ঘৃত আনিল, সন্ন্যাসী ঘৃতটুকু মৃত্তিকায় মাখিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিয়া টুনোর গৃহিণী ক্রোধে অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল, চীৎকার করিতে করিতে বাড়ী হইতে বাহির হইল এবং রাস্তায় দাঁড়াইয়া নানা অকথ্যভাষায় নিজের স্বামীকে ও সন্ন্যাসীকে গালি দিতে থাকিল, তখন সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিয়া টুনোকে বলিলেন,—"বাপুহে! তোমার এই দুর্দ্দশা ঘুচিবার নয়! কথায় বলে স্ত্রীর ভাগ্যে ধন, আর পুরুষের ভাগ্যে জন। তা বাবা, যার বাড়ীতে এত অশান্তি, স্ত্রী-পুরুষে যেখানে কলহ, সেখানে কখনই লক্ষ্মীশ্রী হয় না। যাহার ঘরে তৃপ্তি নাই, ভগবান্ তাহার শ্রীবৃদ্ধি করেন না। তোমার কষ্ট কখনই ঘুচিবে না।"

এই বলিয়া সন্ন্যাসী প্যানা বাড়ুযোর বাড়ীতে গেলেন। প্যানার স্ত্রী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল এবং সন্ন্যাসী যাহা যাহা চাহিয়াছেন, তাহা সমস্তই চেষ্টা করিয়া আনিয়া দিলেন। তখন সন্ন্যাসী প্যানাকে কহিলেন, "বাবা, তোমার গৃহে লক্ষ্মী রহিয়াছেন; তোমার ত কষ্ট হইবার কথা নহে। তুমি কষ্ট স্বীকার করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তোমার কোন কষ্ট থাকিবে না। তোমার গৃহে যখন শান্তি আছে, তখন তোমার লক্ষ্মীশ্রী হইবেই হইবে। তবে কখনও আলস্য করিও না। পুরুষের কাজ আহরণ। অন্ততঃ বাড়ীতে আসিবার সময় একগাছা কঞ্চি সংগ্রহ করিয়াও বাড়ীতে প্রবেশ করিবে।"

সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। প্যানা সন্ন্যাসীর কথামত কার্য্য করিবে বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প আঁটিল। সে লেখাপড়া জানিত না। সুতরাং লেখাপড়ার কার্য্য করিতে চেষ্টা না করিয়া সে অন্য উপায়ে কিছু উপার্জ্জনে মন দিল এবং বিশেষ পরিশ্রম করিয়া আপনার দীনতাকে নির্ব্বাসিত করিল।

Noblemen and Gentlemen !

My ambition will be almost satisfied when the Putta of the land will be granted to me as Sebait of the Goddess Annapurna by the noble granter of the land. I do not want to do wonders by building palatial buildings and a show of grandeur but humble cottages and a simple Thakurbari and accomodation for men to work in their humble occupation to help the Asram and themselves, it will not cost much money.

Although I know one of my patrons can help, if he pleases, to build up the Asram. But times are hard and the various designing men have abused charity and good work by dragging the best of the noblemen to speculating movements and caused heavy loss of money and have broken their hearts. There is another draw-back, when a richman receives an appeal for a charitable and good work of some kind he generally refers it to his most intimate friends the lawyer and the secretary, who are generally a Subjanta class, they say something against it either to show their great experience in the line or to protect a loss to their friend or employer which may arise by helping such a cause.

Twenty-five years ago I was thrown in the street from a high position and I know from experience of my half-a-century's business career what trouble it is to respectable men and women when they are pulled down in the world by the death of the earning member or members or loss of everything by litigation of designing relatives and neighbours.

There are many respectable men and women I know who have become homeless and beggars but if they find an humble shelter, food and something to cover their body they can work for themselves and the Asram which will be a shelter to them.

There are families getting ruined by the introduction of Western manners, customs and luxuries and you will hardly find few of the old renowned families where they had Thakurbari, Atitsala, Patsala, Kabiraj and Tole for the good of mankind.

At the present day our modern charity and good work is simply exhibited in the columns of news-papers with very little real work. A magnificent building, large number of fashionable furniture and the so called imported requirements for the good of mankind means waste of money.

If I do not receive much help I have made up my mind to sacrifice a portion of my interest in my business and convert it into a joint-stock concern and start the work of the Asram.

My age may tell upon me quickly and I should not lose this opportunity when God has induced a premier noble of Bengal to help me by grant of the land.

I expect to form a Committee to take up active work shortly. I thank Kunwar Bichitra Shah Saheb Bahadur of Tehri, Garhwal State, for his first instalment of donation and his eagerness to help the cause of the Asram.

I find some people in high position give their verdict without judging the matter before them, or pass an order hearing something regarding an appeal before them from his confidential Officer who attempts to save the Raj or estate the immediate loss of some money, which may be Rs. 2/- or Rs. 10/- without giving proper thought over the matter and some response to the appeal is again ridiculous.

I should not comment upon dealings of these nature but simply regret their ignorance to judge right from wrong and real interest of the state.

I thank my subscribers and well-wishers of my infant Journal for their co-operation.

Yours faithfully,

K. P. MOOKERJEE.

Printed and Published by Kally Prosonno Mookerjee at K. P. Mookerjee & Co.'s Press,
7, Waterloo Street, Calcutta.

অনাথবন্ধু

[অন্নপূর্ণা আশ্রমের সাহায্যার্থ প্রকাশিত।]

সচিত্র মাসিক পত্র

ধর্ম্ম, আচার-ব্যবহার, শিল্প, কৃষিতত্ত্ব, চিকিৎসা, যোগ, ইতিহাস, বনৌষধ, জ্যোতিষ, গার্হস্থ্য-বিধান, ব্যায়াম এবং : : সঙ্গীতাদি সম্বলিত : :

প্রথম বর্ষ ✣ প্রথম খণ্ড ✣ দশম সংখ্যা

চৈত্র ✣ ১৩২৩।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৭ নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সম্পাদক—শ্রীশশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

HIMALAYAN VIEW. The country of the Musk.

"অনাথবন্ধু"—বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা ; প্রতি সংখ্যা নগদ ১৲ এক টাকা
বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা ও লাইব্রেরীর পক্ষে অর্দ্ধমূল্য।

Oh ! Almighty have peace on earth,

Peace is not a piece of rag to tie and twist in some shape, it results when we learn to respect our superiors and gain their favour, love our equals and gain their friendship, sympathize with our juniors and gain their respect. Thus our mutual help gives us our health, peace and natural prosperity, we may be poor yet there will be contentment when we have confidence on our people.

When people have peace, with physical exercise, yoga, proper diet and contented mind, can secure health, which prolongs life.

When peace and health are secured people can work properly and have prosperity, the highest blessings in life.

My Three Schemes.

NATHBANDHU—I have succeeded in bringing out the journal to the satisfaction of the highest personages of Bengal, Behar, Orissa, Assam and Sylhet and beg to submit their Opinions and the Opinions of the Press for your kind perusal.

OPINIONS.

From the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

GOVERNOR'S CAMP, BENGAL,
22nd July, 1916.

" Dear Mr. Mukharji,

His Excellency has received the first copy of your Magazine " Anathbandhu. " I will be glad if you will send me copies regularly. Please send me a bill for Rs. 10. The object is a laudable one. * * *"

Yours sincerely,
(Sd.) **W. R. Gourlay.**

From the Vice-Chancellor of Calcutta University.

SENATE HOUSE,
Calcutta, 8th November, 1916.

Dear Mr. Mookerji,

I am much obliged to you for your letter of the 6th November and also for the three copies of the "Anathbandhu," which you have been good enough to send me.

I trust the Home that you seek to establish and the industries in connexion with it will all prosper and I wish them every success. Where will the home be ?

Some of the pictures in the magazine are very good and the article on *Mushthi-Yoga,* if completed, ought to be very useful. Many of our grand-mothers' medicines are being lost sight of and it is fully worth somebody's while to collect and publish available information about them.

Yours sincerely,
(Sd.) **D. Sarvadikary.**

From the Personal Assistant to Rai Bahadur Mrityunjay Rai Chowdhury.
(Zemindar of Koondi.)

SHYAMPUR P. O.,
RANGPUR.
The 7th Nov., 1916.

Gentlemen,

Your paper ' Anathbandhu ' has been appreciated by Rai Bahadur and many other gentlemen of this locality. I wish it every success.

Yours faithfully,
(Sd.) **D. Chatterjee.**
P. A. to Rai Bahadur.

From Rai Bahadur Rajendra Chandra Sastri.

CALCUTTA,
30, Tarak Chatterjee's Lane,
The 9th Nov., 1916.

My Dear Sir,

I have read your Bengali magazine "Anath Bandhu" with very great pleasure.

It bids fare to be a new venture in Bengali journalism and is decidedly a step in the right direction. The subjects are very carefully selected and there treatment have nothing to be desired. I wish all success to your new venture and the motives of charity which has called it into being.

Yours sincerely,
(Sd.) **Rajendra Chandra Sastri.**

From Sir Gooroo Dass Banerjee.

NARIKELDANGA, CALCUTTA,
14th September, 1916.

Dear Sir,

* * * I have read portions of the first two numbers of Volume I of the Journal, and I think that the Journal will, on the whole, be useful to the public, if it continues to be conducted in the manner it has commenced. The articles headed "ভারতে শিল্পব্যবসা," "কৃষি," "যক্ষ্মারোগ," "বনৌষধ," and "ম্যালেরিয়া," in these two numbers are excellent, each in its own way. They are written in simple, elegant and lucid style, they contain useful information, and they are really instructive.*

Yours truly,
(Sd.) **Gooroo Dass Banerjee.**

From Sj. Provat Chandra Giri.

TARAKESHWAR.
22, 1, 17,

Dear Sir,

The fifth number of Anathbandhu has been received in due time. I have gone through the Magazine and found it very much interesting. The different subjects dealt therein are highly instructive and valuable. I doubt not that the object you have in view in this Journal is laudable. I wish it every success. I have not yet got the Journal Nos. 6th and 7th hope to receive them at an early date. I shall send my photo and life sketch later on.

Yours Sincerely
(Sd.) **Provat Chandra Giri.**

From Dr. D. B. Spooner, Nalanda.

CAMP BARGAON.
Feb. 24th. 1917,

I beg to thank you for your kindness in sending me a copy of your monthly Journal Anathbandhu, upon whose admirable get-up I venture to congratulate you. I am glad the Bodh Gaya photo have been of use to you. * * *

Yours truly,
(Sd) **D. B. Spooner.**

From Babu Gokulananda Prosad Varma, Editor of the "Beharee"

Dear Sir,

I heartily appreciate your object in publishing it. I admire your noble aspirations. I have directed my office to purchase necessary articles obtainable from your firm. You have achieved success in business ; may you achieve equally marked success in life of charity.

Yours truly,
(Sd.) **Gokulananda Prosad Varma.**

From the Editor of Sarasvati.

JUHI, CAWNPORE.
2nd Dec., 1916.

Dear Sir,

Your favour of the 29th ultimo together with the four issues of the Anath Bandhu to hand, for which many thanks the magazine is excellent in every way. * * *

Yours faithfully,
(Sd.) **M. P. D. Divedi.**
Editor, Sarsvati.

From Babu Amulya Chandra Mukerji,

ELLINGHAM COTTAGE,
Simla, W. C. (Punjab.)
April 16th, 1917.

DEAR SIRS,

I am much obliged for the six copies of "অনাথবন্ধু" from আষাঢ়—অগ্রহায়ণ, ১৩২৩, sent to me per V. P. P. for Rs. 10, I have read them with great interest and am much satisfied. Be pleased to send me the issues of the months from পৌষ to চৈত্র ১৩২৩, and for বৈশাখ ২৩২৪ if it has issued by now, and oblige.

Yours faithfully,
(Sd.) Amulya Chandra Mukerji.

বেনারসের শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল হইতে শ্রীমৎ স্বামী দয়ানন্দজী লিখিয়াছেন :—

BENARES CANTT.
8.7.1917.

মহাশয় !

যোগেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের মারফত প্রেরিত সাত কপি "অনাথবন্ধু" পূজ্যপাদ পাইয়াছিলেন। এই মাসিক পত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ আমরা পাঠ করিয়াছি। প্রবন্ধগুলি ভাল এবং অনেক আবশ্যকীয় উপদেশগর্ভিত। পত্রের নিবন্ধ ও গঠনাদির পারিপাট্য দেখিয়া পূজ্যপাদ সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং শ্রীভগবানের নিকট ইহার দৈনন্দিন উন্নতির প্রার্থনা করিতেছেন।

আপনাদের আশ্রমের Prospectusআদি এখানে পাঠাইতে পারেন। আমাদের দ্বারা যদি ইহার কোন সহায়তা হইতে পারে, তাহা করিবার চেষ্টা করিব।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
দয়ানন্দ।

PRESS OPINIONS.

The British Printer.

October and November issue, Vol. XXIX, No. 172, 1916.

THE second number of *Anathbandhu* from the printers and publishers—K. P. MOOKERJEE & Co., Calcutta—offers a decided advance on the first issue of this new venture of that progressive house. Matter is in Bengali, with some advts. in English, a cover in red and black being both appropriate and quietly tasteful in character. A remarkable feature of the pages is the very praiseworthy standard attained by a series of three-colour illustrations interspersed amongst matter. Real progress is being made in this direction of highly-skilled printing, and all concerned are to be congratulated upon so good a result.

The Empire.

Saturday, 16th September, 1916.

"THE FRIEND OF THE POOR."

Such (" Anathbandhu ") is the title of a pictorial magazine in Bengali which is being publihsed by Babu Kaliprasanna Mukherji of Messrs. K. P. Mukherji & Co., of 7, Waterloo Street. The journal, we are told, has been started to help the founding of a home called " Annapurna Asram," where poor men and women find shelter and work, food and medical aid; and it deserves wide patronage of the Indian public inasmuch as its income will be given to support the Asram. The first two numbers, which we have received for review, augur well of the future of the journal. We wish the journal every success, the popularity of which will be sufficiently borne out by the fact that among others, His Excellency the Governor of Bengal has been pleased to subscribe to it.

The Amrita Bazar Patrika.

Saturday, 19th August, 1916.

" Anathbandhu "—This is a monthly Magazine issued, for helping the Annapurna Asram, by Mr. K. P. Mukerjee of Messrs. K. P. Mukerjee & Co., of 7, Waterloo Street, Calcutta. It is not always safe to judge a magazine on its first issue. But if the high water-mark of excellence reached in the first issue is maintained, the "Anathbandhu" under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mukerjee will be a valuable addition to Bengalee magazines. It contains a character sketch of the Maharaja Bahadur of Durbhanga, and articles on such diverse subjects as Art, Industry, Agriculture, Sanitation, Indigenous Drugs, Religion Music and Yoga, the editor contributing as many as six articles. We wish the new magazine a career of usefulness.

The Indian Mirror.

24th November, 1916.

"ANATH BANDHU."—The third issue of this well-conducted monthly is as cosmopolitan in its character as is the object which it has been started with a view to aid, namely, the establishment of the Annapurna Asram, which will be at once a humanitarian and industrial institution. Two biographical sketches are inserted, one being that of the Maharaja of Jaipur and the other that of Raja Bijay Sing Dhudhoria of Azimganj. The coloured portaits that accompany the texts are executed with excellent skill. The contents are varied and calculsted to interest all classes of readers, and the portion published in Nagri characters is for benefit of non-Bengali readers residing in other parts of the country. The earnestness of the proprietor Mr. K. P. Mukerji, the well-known Publisher and Stationer of 7, Waterloo Street, should meet with practical recognition.

The Indian Daily News.

Tuesday, 18th July, 1916.

" Anathbandhu "—This is a new Bengali monthly published by Messrs. K.P.Mookerjee of 7, Waterloo Street. The idea is to start a home called "Annapurna Asram," where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid, and the income of this monthly Journal will be given to support the Asram. The journal aims at diffusing knowledge of Art, Dharma, Music, Physical Exercise, Cultivation, Medicine, Merits of Plants and Trees, Yoga and Yotish Shastras, lives of living Noblemen and their Portraits in true colours, diseases and their treatment. The first number under the editorship of Babu Sasi Bhusan Mookerjee gives promise of useful career.

The New India.

Wednesday, 19th July, 1916.

Messrs. K. P. Mookerjee & Co., Calcutta, send us a copy of *Anathbandhu.* The journal is started to help the founding of a home called *Annapurna Ashram,* where poor men and women will find shelter and work, food and medical aid. The income of the journal will be given to support the Ashram. Among the contents of the journal are papers on the merits of the *Tulshi, Bael* and *Neeme* trees, and the publication of the merits and of various medicinal plants known at the present day is promised. Papers are also included on various maladies of the present day; Physical Exercise to help the children to get healthy and thus avoid diseases; Shilpa or Artistic Work to encourage people to work for their living in art-crafts and to revive old industries. A paper on the History of Music is the precursor of lessons on higher music.

Eastern Bengal and Assam Era,

9th August, 1916.

A NEW JOURNAL by an oversight which we regret the name of the paper recently started by Messrs. K. P. Mookerjee & Co., was omitted. It is called "Anathbandhu" and is an illustrated monthly organ printed in the vernacular. It is full of useful information, dealing with Religion, the Arts, Agriculture, History, Astronomy, Science, Music, Medicine, Physical Exercise, etc., etc. This organ is devoted to supporting the "Annapurna Asram" established with a view to

open a field for training orphans and the destitute in the sciences in which the paper deals. We trust this Journal has a long and useful career before it. The very name "Anathbandhu," friend of the orphan should enlist the sympathies of all good citizens. We predict this paper will be a great success and the benevolent intentions of Messrs. K. P. Mookerjee, will be appreciated and recognised by a charitably disposed public.

The Beharee.

Sunday,, 22nd October, 1916.

Anathbandhu—A monthly magazine started in aid of the Annapurna Ashrama established by Sriyukta Kali Prasanna Mukhopadhya, founder of the firm of Messrs. K. P. Mookerjee & Co. the well known stationers and fine printing contractors of Calcutta. Editor—Babu Shashi-Bhushan Mukhopadhya. Published at 7, Waterloo Street, Calcutta. Annual subscription Rs. 10. We heartily welcome this Bengalee magazine. It is not an ordinary literary review. It is started with a sacred object. It has gained the patronage of Princes and noblemen throughout India. It contains all sorts and varieties of articles. Its special feature is to publish good articles on Hinduism. Articles on Buddhism, Jainism and other religions are also published. Articles on trade, agriculture and technical arts are also published. The coloured print pictures, portraits and designs are most beautiful. In the third number a very good article has appeared in Hindi and we commend the idea of the publisher and hope the Hindi reading public will appreciate it. We have read some of the articles and they are really very much interesting and useful. In the first number a fine portrait of the Maharaja of Durbhanga accompanied with a sketch of his life is given. The association of the Maharaja Bahadur of Durbhanga with the inception of this magazine is indeed worthy of his magnanimity and love learning that pervades uniformly within and outside his province.

The Advocate.

Tuesday, 26th September, 1916.

Anathbandhu.—This is an illustrated Bengali Monthly, published by Messrs. K. P. Mookherjee & Co., the well-known Firm of Printers and Stationers of Calcutta. We have just received its II number. The Magazine has been issued with a view to have a Fund to open and maintain a Home for the needy and distressed. The issue before us contains some useful and interesting articles on religions, social, agricultural, scientific and hygenic subjects. It contains also a life-sketch (with his coloured portrait) of the Maharajah of Nashipore, a scion of Bengal and the publisher announces that lives of other notables will be published from time to time. The object with which the Magazine has been started is a most laudable one and as such, we trust it will receive the patronage of the landed aristocracy and the educated classes of Bengal. * * *

The Empire.

Monday, 8th January, 1917.

The fourth number of the "Anathbandhu" opens with a foreword by the publisher, Mr. K. P. Mookerjee, as to why the journal has been inaugurated—namely, to support the Annapurna Asram, an industrial and religious home for the poor, which is to be started near Baidyanathdham, on the East Indian Railway, and where local industries will be encouraged and various works executed by the inmates of the home, who will be kept, fed, clothed, and given medical aid in times of need. The object is certainly praiseworthy and deserves the patronage of the public. The number under review is well worthy of its predecessors, and contains contributions of interest, both in Bengali and in Hindi. A feature of it is its production, which is excellent and decidedly better than that of the average run of Bengali magazines. We wish the journal success.

The Express, Bankipore.

Friday, March 23. 1917.

Messrs. K. P. Mookerjee and Co., the enterprising firm of stationers, printers, lithographers etc. of Calcutta are to be congratulated on the sixth issue of their pictorial journal, *Anath Bandhu* which contains useful and interesting articles and nice pictures. It is a pity that they have to discontinue the specimens of Hindi papers owing to want of sufficient response from the Hindi reading public. They have however added some English articles, but we think the public would have preferred more the encouragement of the vernaculars of the country. We beg to acknowledge with thanks also a calendar and a pocket diary from Messrs. K. P. Mookerjee.

The Beharee.

Thursday, April 5, 1917.

We are obliged to Messrs. K P. Mukerjee & Co. (7.Waterloo Street, Calcutta) for a very nice pocket book and calendar for the year 1917 which is very prettily got up. Their beautiful Bengali Magazine, "Anathbandhu" is appearing regularly and with improved features month by month. The current number to hand worthily keeps up the reputation.

The "STATESMAN."

Saturday, 19th May, 1917.

"ANATH BANDHU."—The seventh number of the illustrated magazine published by Messrs. K. P. Mookerjee, of 7, Waterloo Street, Calcutta, is full of interesting and useful reading matter. A full page portrait of Lord and Lady Ronaldshay is given as frontispiece and the number is illustrated with several other half-tone and tri-colour blocks. The publishers have in this number introduced a few articles and a poem in English, so that the publication may appeal to a wider range of readers.

II. My next scheme is to establish the **ANNAPURNA ASRAM.** It is a pleasure to me to announce to my patrons and friends that I have secured a plot of land for the location of the Asram near *Baidyanathdham,* a sacred and sanitary place and many of my patrons and friends approve of the selection immensley. I shall be very happy to build suitable Bungalows, and give each Bungalow the name of the donor, so that he will have his accomodation when he wants a change in such a sanitary place. It is needlees to mention here that it will be a shelter for the poor and it is for this purpose that I appeal to your charity.

The programme of the Asram is appearing in the Anathbanhu.

III. My third scheme :—

The Album of the Noblemen of India,

as the portraits and life-sketches are being printed in the pages of the Anathbandhu, the same Blocks will do for the work, only the sketches shall have to be translated into English. This work will be a book of peerage of India

and in a glance one will see all the nobles in their true colours. Life of worthies, accounts of their charity and good work may be followed by even the poor man in an humble scale. I hope, with the co-operation of the noblemen of India, this journal will continue to do its duty.

In conclusion I beg to submit that the Asram will be a self-supporting one after it is once settled and a committee of management formed. I shall be glad to print and submit a list of programme of work when I shall be confident of its success. Homes like this may be started all over India for the relief of the poor.

I am,
Your humble servant,

K. P. Mookerjee.

7, Waterloo Street
Calcutta.

আলোক ও আঁধার।

যেখানে আলোক সেইখানেই জ্ঞান, যেখানে অন্ধকার সেই-খানেই অজ্ঞান। আলোকে ধরা হাসে, অন্ধকারে বিশ্ব আচ্ছন্ন হয়। আলোকে দর্শনশক্তি খুলিয়া যায়, অন্ধকারে নয়ন মুদিয়া আইসে। সেইজন্য কাজ করিতে হইলে আলোক আবশ্যক। সংসারে আলোকের পর অন্ধকার, অন্ধকারের পর আলোক, দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম—বিশ্বেশ্বরের বিধান। এই পরিবর্ত্তন আমাদের সাধু প্রকৃতি সন্ধুক্ষিত করে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে আস্থাবান্ করে এবং আমাদের কর্ত্তব্যের পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়। এই সংসার পরিবর্ত্তনময়। আমরা জন্মাবধি নানা পরিবর্ত্তন ভোগ করি। আচার, ব্যবহার, সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি আমাদের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দেয়। ইহা ভিন্ন আমরা পরের নিকট হইতে অনেক বিষয় শিখিয়া থাকি, তাহার মধ্যে অনেক মন্দ জিনিষও শিখি। সুতরাং পরের নিকট হইতে কিছু শিখি-বার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

ভারতে যে সভ্যতা বিকাশলাভ করিয়াছিল, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, ভারতীয় মনীষীরা জীবনযাত্রানির্ব্বাহ-সম্পর্কিত সমস্যায় এমন এক অপূর্ব্ব সমাধান করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে সমাজ হইতে দারিদ্র্য-দুঃখ নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। তখন মানবের যাহা প্রয়োজনীয় পদার্থ, অভাব-মোচনের জন্য যাহা নিতান্ত আবশ্যক, তাহা নিতান্তই সুলভ ছিল। শস্য, তরকারী, দুগ্ধ প্রভৃতি নামমাত্র মূল্যে বিকাইত।

এখন কেবল চারিদিকেই ভেজালের রাজত্ব। খাঁটি জিনিস ত পাওয়াই যায় না, আর যদিই বা পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা খরিদ করিতে ঢাকের দামে মনসা বিকায়। এই ভেজালের ফলে আমরা রোগ, শোক ও অকালমৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িতেছি।

আমরা অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এখন আলোক চাই। আমাদের যে আলোক ছিল, তাহা আমরা মূঢ়ের মত নিবাইয়া ফেলিয়াছি। এখন এই অন্ধকারে দিশাহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এক করিতে আর এক করিয়া বসিতেছি। আমরা তীব্রবেগে উৎসন্নের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। আমরা জ্ঞানের ও বিদ্যার অহঙ্কারে আত্মহারা, কিন্তু সেই জ্ঞান বিদ্যায় দৈন্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছি না। সমাজে যাহারা দরিদ্র, আমরা তাহাদের জন্য বাসভবন, অশন-বসন ও চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারিতেছি না। যতদিন আমরা সহজে সকলের অভাবমোচন করিবার ব্যবস্থা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের সমাজ চিরদুঃখেই নিমজ্জিত থাকিবে। এখন দুর্ম্মূল্যতা সমস্যা সকল সমস্যা অপেক্ষা উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। আমরা কি প্রকারে এই সমস্যার সমাধান করিব, তাহা বুঝিয়া পাইতেছি না। আমরা চাই—আলো—আলো—আলো!

এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য আমি "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়াছি। যে সকল গুণ ও ধর্ম্মপ্রভাবে এককালে আমাদের দেশ সমস্ত সভ্যদেশের শীর্ষস্থান অধিকৃত করিয়া-ছিল, সেই সকল সদ্‌গুণ ও ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি প্রকারে আমরা উন্নতিসাধন করিতে পারি, তাহাই প্রদর্শন করা "অনাথবন্ধুর" উদ্দেশ্য।

"অনাথবন্ধুর" মূল্য অধিক বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহার লভ্যাংশ ইহার উপদিষ্ট কার্য্য করিবার জন্যই ব্যয়িত হইবে। আমি উহার এক কপর্দ্দকও লইব না। আমি প্রাচীন ভারতীয় পল্লীর আদর্শে একটি আদর্শ পল্লী প্রতিষ্ঠিত করিব। ঐ পল্লীর জনগণ আপনার অভাবের মোচন আপনারা করিতে পারিবে, আপনাদের জন্য পরের উপর নির্ভর করিবে না। দেশের কয়েক জন পদস্থ ব্যক্তি—সম্মানিত ব্যক্তি আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি করিয়াছেন। আশা করি, এইবার আপনাদিগের নিকট আমার অনুরোধ ব্যর্থ হইবে না।

আমার প্রতিষ্ঠিত "অন্নপূর্ণা আশ্রম" মিতব্যয়িতা-শিক্ষার, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পরিপোষণের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদর্শ আশ্রম হইবে। কিরূপভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা উচিত, "অনাথবন্ধু" সকলকে তাহার একটা আভাস দিয়াছে।

যখন এই আদর্শ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন উহাতে পুরাতন সময়ের পাঠশালার ও টোলের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করা হইবে; বর্ণাশ্রমধর্ম্মানুযায়ী শিল্পাদি বিদ্যা-শিক্ষারও ব্যবস্থা বিহিত হইবে। যাঁহারা দ্বারবঙ্গের মহারাজ মাননীয় সার্ রামেশ্বর সিংহ বাহাদুরের ন্যায় হৃদয়ের সহিত সাধারণের মঙ্গলকামী, আমি তাঁহাদিগেরই সহায়তা প্রার্থনা করি।

আমার প্রকাশিত—

"অনাথবন্ধু"

মানবসমাজের কিছু উপকার দর্শিতে পারে। কারণ, ইহাতে মানবজীবনের অবশ্য আলোচ্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন মানবের জীবনোপায়, কৃষিতত্ত্ব,

দারিদ্র্য-সমস্যা সমাধানের জন্য শিল্পকলা, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অবশ্য জ্ঞাতব্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কথা ইহাতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ইহাতে যোগশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যায়ামকৌশল, গাছগাছড়ার গুণাগুণ, মুষ্টিযোগ, সঙ্গীত-বিদ্যা প্রভৃতি নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা থাকে।

আমার যতদূর সাধ্য, আমি এই পত্রখানিকে প্রয়োজনীয় করিবার প্রয়াস পাইতেছি। যদিও অনেক বড় বড় লোক এই পত্রখানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন, তথাপি আশানুরূপ অর্থ দিয়া অনেকে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হন নাই।

"অন্নপূর্ণা আশ্রম"

প্রতিষ্ঠা করিতে আমি যে প্রয়াস পাইতেছি, তাহা আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা দানশালা হইবে না। পরন্তু উহা দয়ালু ব্যক্তিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি দরিদ্রপোষণের আশ্রম হইবে। ঐ আশ্রমে স্ত্রী-পুরুষনির্ব্বিশেষে সকল দরিদ্রই আপন আপন সামর্থ্য অনুসারে কার্য্য করিয়া নিজের ও আশ্রমের সেবা করিবে। প্রথমে আমাদিগকে একটি সামান্য আশ্রম নির্ম্মিত করিতে হইবে। প্রকাণ্ড সৌধ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই। ঐ আশ্রমে গৃহস্থের আবশ্যক জিনিসপত্র প্রস্তুত করিবার জন্য আবশ্যক আস্‌বাব ও যন্ত্রাদি রক্ষিত হইবে।

আমি যদিও যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া "অনাথবন্ধু" ছাপিবার জন্য মুদ্রাযন্ত্রাদি খরিদ করিয়াছি এবং মাশুলখরচ দিয়া দেশের ভাল ভাল লোকের নিকট ইহা পাঠাইতেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমি তাঁহাদের নিকট আশানুরূপ আনুকূল্যলাভে সমর্থ হই নাই।

পূর্ব্ব হইতে বলিয়া আসিতেছি, অল্পদিনমধ্যে আমি আর একখানি ভারতের রাজন্যবর্গ ও মহৎ ব্যক্তিগণের ফটোগ্রাফ এবং জীবনবৃত্তান্তের

য়্যাল্‌বাম

প্রকাশিত করিব। সেখানি ছাপাও অনেক সুবিধায় হইবে। কারণ, প্রধান খরচ—ব্লকগুলি; সেগুলি পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া "অনাথবন্ধু"তে প্রকাশিত হইতেছে। এ বিষয়ে ভারতের মহামান্য রাজন্যবর্গ এবং সমস্ত মহদ্ব্যক্তিগণের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছি।

বলাই বাহুল্য যে, ঐ সকল বর্ণচিত্রমুদ্রণে অত্যন্ত অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। এই যুদ্ধের সময় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সময়ে জীবনচরিত মুদ্রিত করিতেও অনেক ব্যয় পড়ে। সুতরাং আমার অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুবর্গ যদি সত্বরই আমাকে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ভারতীয় আভিজাত্যবর্গের য়্যাল্‌ব্যাম প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, কিন্তু তথাপি আমার উদ্যম ও শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে। শীঘ্রই আমার এই শক্তি ও উদ্যম নষ্ট হইতে পারে, তখন আমার এই সঙ্কল্প স্বপ্নে পরিণত হইবে। হিমালয় হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত—করাচি হইতে আসাম ও শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত সমস্ত আভিজাতবর্গের আমি অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সেবা করিয়া আসিতেছি। সমস্ত দেশেই আমার কর্ম্মের সম্পর্ক আছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানেন। আমার দ্বারা কোন প্রবঞ্চনা সম্ভব কি না, আমার অসংখ্য মুরুব্বি ও বন্ধুরা বোধ হয়, তাহা বিশেষরূপে জানেন। সুতরাং আমি আশা করি, সকলে বিশ্বাসসহকারে আমার আবেদন শ্রবণ করিবেন এবং অবিলম্বে এই কার্য্যসম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিবেন।

আমি অনেক চিন্তা করিয়া, বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া, এই মহৎ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াই "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমার নিজের কোন স্বার্থ নাই। কারণ, ব্যবসাদ্বারা যাহা আমি এতাবৎকাল উপার্জ্জন করিয়াছি এবং ভগবান্ যাহা আমাকে দিয়াছেন, তাহাতেই আমি সন্তুষ্ট আছি। কেবল নির্ম্মল আনন্দভোগ করিব, এই উদ্দেশ্য লইয়া—এই অতি বৃদ্ধ হইয়াও "অনাথবন্ধু" প্রকাশ করিয়া তাহার পশ্চাতে অন্নপূর্ণা-আশ্রমস্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছি। আমি নিজে সর্ব্বদাই আশান্বিত। ঈশ্বর আমার কর্ম্মের সহায়।

কতকগুলি লোক বাঙ্গালা জানেন না—বুঝেন না বলিয়াই "অনাথবন্ধু" ফেরত দিয়াছেন। এই সম্প্রদায় সকলেই বড় লোক। তাঁহারা কোন বাঙ্গালীর দ্বারা পড়াইয়া শুনিলে, মুদ্রিত প্রবন্ধগুলির বিশেষ উপকারিতা বুঝিতে পারিতেন। বিশেষ অন্নপূর্ণা-আশ্রমের অনুষ্ঠানও বুঝিতে পারিতেন। আশ্রমপ্রতিষ্ঠা একটি মহৎকার্য্য এবং দেশের সর্ব্বত্র এইরূপে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে জগতের বহু লোক ইহাদ্বারা উপকৃত হইবে, বহু লোক এই আশ্রমদ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনাদি লাভ করিয়া এবং রোগ-শোকে ঔষধ ও সান্ত্বনাদি পাইয়া জীবন আনন্দময় করিতে পারিবে। অল্প খরচে কিরূপ উপায়ে ঐরূপ কর্ম্ম হইতে পারে, উহাও শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। সেই উদ্দেশ্যসাধনজন্য আশ্রমের সাহায্যকল্পে "অনাথবন্ধু" প্রচার করিতেছি।

ইহা সত্য যে, অনেক মহদ্ব্যক্তি মধ্যে মধ্যে প্রবঞ্চককর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছেন; এই জন্য সকলকে অবিশ্বাস করেন এবং কোন সৎকার্য্যে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক হন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, যদি তাঁহারা কখনও কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া হতাশ হইয়া থাকেন, সেইটি তদন্ত করিয়া দেখা উচিত। দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া

কাজ করিলে কোন বিষয়ে প্রবঞ্চিত বা হতাশ হইতে হয় না এবং সৎকর্ম্মেও বিরাগ আসে না।

অন্নপূর্ণা আশ্রমস্থাপনে প্রায় এক লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে পারে। ৩০।৩৫ হাজার টাকা হইলেই আমি এক প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া আশ্রমপ্রতিষ্ঠা করিতে পারি, পরে সাহায্য-দাতৃগণের অভিপ্রায়মতে কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারা যায়।

ভরসা করি, জনসাধারণমাত্রই আমাকে অন্নপূর্ণা আশ্রমপ্রতিষ্ঠাকল্পে সাহায্যদানে বৈমুখ হইবেন না এবং ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা, যেন সকলে সুস্থ ও স্বচ্ছন্দে থাকিয়া, মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে ইহাতে যোগদান করিয়া জীবন সফল করিবেন।

"অনাথবন্ধু"র আয় আশ্রমেই ব্যয় হইবে। যদি "অনাথবন্ধু"র পাঁচ হাজার গ্রাহক সংগ্রহ হয়, তাহা হইলে আশ্রমের জন্য অধিক সাহায্য আবশ্যক নাও হইতে পারে। যাঁহারা কৃপা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, এই অবসরে তাঁহারা যত শীঘ্র সাহায্যদান করিবেন, তত শীঘ্র আশ্রমকর্ম্ম সমাধা হইবে।

অবশেষে আমি সকলকে সত্বর ফটো ও জীবনচরিত এবং "অনাথবন্ধু"র বার্ষিক মূল্য ও অন্নপূর্ণা আশ্রমে যাহা দান করিবেন, তাহা পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

আমার আবেদন ;—

১ম। অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য ১০৲ দশ টাকার জন্য।

২য়। যাঁহাদের জীবনকথা প্রকাশিত হইতেছে, তাঁহাদের নিকট হইতে অন্যূন ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা করিয়া অন্নপূর্ণা আশ্রমের জন্য সাহায্যদান। যাঁহারা বদান্য, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি আরও অধিক আশা করিতে পারি।

৩য়। ভারতীয় আভিজাতবর্গের য়্যাল্‌বামের মূল্য বাবদ ৩০০৲ তিন শত টাকা। তবে যাঁহারা অগ্রিম দিবেন, তাঁহাদের আড়াই শত টাকা দিলেই হইবে।

আমার মুরুব্বি ও বন্ধুবর্গ—যাঁহারা এই মহৎ কর্ম্মে যোগদান করিবেন, এই আশ্রম তাঁহাদের দয়া ও গৌরবের স্মৃতিচিহ্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

বিনীত

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক।

৭ নং ওয়াটার্‌লু ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

'অনাথবন্ধু' মাসিকপত্র

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা।

ध्यान—तप्तकाञ्चनवर्णाभां बालेन्दुकृतशेखराम्।
नवरत्नप्रभादीप्तमुकुटां कुङ्कुमारुणाम्॥
चित्रवस्त्रपरीधानां सफराक्षीं त्रिलोचनाम्।
सुवर्णकलसाकारपीनोन्नतपयोधराम्॥
गोक्षीरधामधवलं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम्।
प्रसन्नवदनं शम्भुं नीलकण्ठविराजितम्॥
कपर्द्दिनं स्फुरत्सर्पभूषणं कुन्दसन्निभम्।
नृत्यन्तमनिशं हृष्टं दृष्टानन्दमयीं पराम्॥
सानन्दमुखलोलाक्षीं मेखलाढ्यां नितम्बिनीम्।
अन्नदानरतां नित्यां भूमिश्रीभ्यामलङ्कृताम्॥
प्रणाम—अन्नपूर्णे नमस्तुभ्यं नमस्ते जगदम्बिके।
तच्चारुचरणे भक्तिं देहि दीनदयामयि।
सर्व्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्व्वार्थसाधिके।
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि माहेश्वरि नमोऽस्तु ते॥

ধ্যান—তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুকৃতশেখরাম্।
নবরত্নপ্রভাদীপ্তমুকুটাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
সুবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
প্রসন্নবদনং শম্ভুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্।
নৃত্যন্তমনিশং হৃষ্টং দৃষ্টানন্দময়ীং পরাম্॥
সানন্দমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যাং নিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমিশ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্॥
প্রণাম—অন্নপূর্ণে নমস্তুভ্যং নমস্তে জগদম্বিকে।
তচ্চারুচরণে ভক্তিং দেহি দীনদয়াময়ি॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে॥

অন্নপূর্ণা-আশ্রমসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য নিয়ম।

১। আশ্রমের নাম "অন্নপূর্ণা-আশ্রম" হইল।

২। এই আশ্রমে অশক্ত পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের বাসস্থান, আহার ও পীড়ার সময় ঔষধ দিবার ব্যবস্থা থাকিবে।

৩। আশ্রমে একটি ঠাকুরঘরে অন্নপূর্ণা দেবীর পট ও ঘট প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। উহার রীতিমত পূজাদির ব্যবস্থাও থাকিবে।

৪। এই আশ্রমে কতকগুলি ঢেঁকী, জাঁতা, চরকা, ধামা, কুলা ইত্যাদি থাকিবে এবং ধান, দাইল, সরিষাদি যথাসময়ে খরিদ করিয়া গোলায় রাখা হইবে।

৫। আশ্রমের সংশ্রবে একটি পাঠশালা ও টোল স্থাপিত হইবে।

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ীদিগকে বিনা খাজনায় তিন বৎসরের জন্য এক হইতে দুই কাঠা জমীতে বাস করিতে দেওয়া হইবে। যথা:—মালী, ময়রা, গোয়ালা, কলু, কুমার, ধোপা, নাপিত, কামার, ডোম, চাষী, ছুতার, ঘরামী, রাজমিস্ত্রী, দোকানী, দেশী মণিহারী।

৭। ঐ সকল লোককে যে জমী দেওয়া হইবে, তাহাতে সে নিজের টাকায় ঘর বাঁধিবে। পরে যদি আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্যবসায়ের জন্য আশ্রমের ফণ্ড হইতে হিসাবমত অর্থ সাহায্য করা যাইবে।

৮। প্রত্যেক অশক্ত ব্যক্তিকে কর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট আশ্রমে স্থান পাইবার জন্য দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তপ্রাপ্তির পর ঐ ব্যক্তি আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য কি না, তাহার তদন্ত হইবে। তদন্তে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে, তবে তাহাকে আশ্রমে স্থান দেওয়া হইবে।

৯। রাজদণ্ডে দণ্ডিত, বদ্‌মায়েস, নেশাখোর ও দুশ্চরিত্র লোক আশ্রমে স্থান পাইবে না।

১০। একটি ঘরে চিকিৎসার জন্য ঔষধাদি থাকিবে।

১১। অবস্থাবিশেষে বাহিরের গরীব লোককে মুষ্টিভিক্ষা দেওয়া হইবে।

১২। আশ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য একটি ঘরে রক্ষিত হইবে। তথায় দ্রব্যাদি প্যাক্ করিবার বন্দোবস্ত থাকিবে। দ্রব্যাদি প্যাক্ করা হইলে তাহা কলিকাতায় চালান দেওয়া হইবে। কলিকাতায় আশ্রমের এক জন এজেণ্ট থাকিবেন। তিনি ঐ সকল দ্রব্য বাজারদরে বিক্রয় করিবেন ও বিক্রয়লব্ধ টাকা প্রতিদিন আশ্রমে চালান দিবেন।

১৩। আশ্রমে এক জন ধনাধ্যক্ষ থাকিবেন, তিনি সমস্ত টাকা লইবেন এবং কর্ম্মাধ্যক্ষের মঞ্জুরী লইয়া ঐ টাকা খরচ করিবেন।

১৪। প্রত্যেক মাসের হিসাব প্রস্তুত করিয়া ডিরেক্টর ও পেট্রণদিগের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কর্ম্মাধ্যক্ষ তাহা করিবেন।

১৫। বৎসরের শেষে একটি প্রদর্শনী করিয়া তাহাতে আশ্রমের উৎপন্ন দ্রব্য ও অন্যান্য স্থানীয় দ্রব্য ও শিল্পজ পণ্য প্রদর্শন করা হইবে। এই উপলক্ষে পেট্রণ, ডিরেক্টার ও দেশহিতৈষীদিগকে এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রিত করা হইবে।

১৬। এক বৎসরের কার্য্যে ঐ বৎসরের হিসাব ও অন্য আবশ্যক ব্যবস্থার কথা পেট্রণ ও ডিরেক্টারদিগের গোচর করা হইবে ও তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সকল ব্যবস্থা করা হইবে।

১৭। পেট্রণ, ডিরেক্টার ও অন্যান্য কার্য্যভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের নাম পরে প্রকাশ করা যাইবে।

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

অনাথবন্ধুর নিয়মাবলী।

১। প্রতি মাসের শেষে অনাথবন্ধু প্রকাশিত হইবে।

২। সহর ও মফঃস্বল সর্ব্বত্রই ডাকমাশুলাদি সমেত অনাথবন্ধুর বার্ষিক মূল্য অগ্রিম ১০৲ দশ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ১৲ এক টাকা।

৩। বিদ্যালয়ের বালকগণ, ধর্ম্মসভা এবং জনসাধারণের উপকারার্থ প্রতিষ্ঠিত সাধারণ লাইব্রেরী "অনাথবন্ধু" অর্দ্ধমূল্যে পাইবেন।

৪। আষাঢ় মাস হইতে অনাথবন্ধুর বৎসরারম্ভ। যিনি যে মাসেই গ্রাহক হউন না কেন, আষাঢ় মাস (প্রথম সংখ্যা) হইতে তাঁহাকে পত্রিকা লইতে হইবে।

বিজ্ঞাপনদাতাদিগের জ্ঞাতব্য।

(১) অনাথবন্ধুতে বিজ্ঞাপন দিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এই পত্র ভারতের সর্ব্ব স্থানের ধনাঢ্য, রাজন্য ও ভূস্বামীদিগের নিকট প্রেরিত হয়। ইহা ভিন্ন বিলাতে এই পত্রিকা যায়। ব্যবসায়ীরা ইহাতে বিজ্ঞাপন দিয়া লাভবান্ হইবেন।

(২) অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন ইহাতে প্রকাশিত হয় না।

(৩) একাধিক্রমে তিন মাস বিজ্ঞাপন দিবার পর বিজ্ঞাপনদাতা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞাপনের ভাষা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) চুক্তির সময় পূর্ণ হইবার পর যদি কোন বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পূর্ব্ব মাসের প্রথমেই তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে নিষেধপত্র লিখিতে হইবে। তাহা না হইলে চুক্তিমত হারে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে এবং বিজ্ঞাপনদাতার ঐরূপ অভিমত, ইহা বুঝিয়া লওয়া হইবে।

(৫) মাসের ১০ইএর পূর্ব্বে বিজ্ঞাপন না পাইলে ঐ মাসে ঐ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না।

(৬) ☞ বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিতে হইবে।

কভারের ৪র্থ পৃষ্ঠা সম্পূর্ণ—প্রতি বার ৩০৲ টাকা হিঃ।
,, ২য় ,, ,, ,, ,, ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, ৩য় ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,
ভিতরে—কভারের পর ১ম পৃষ্ঠায় ১৫৲ টাকা হিঃ।
,, শেষ—কভারের পূর্ব্ববর্ত্তী পৃষ্ঠায় ঐ।
শেষদিকে বিজ্ঞাপন দিবার ১ম পৃষ্ঠায় ১২৲ টাকা হিঃ। অন্যান্য পৃষ্ঠায় ১০৲ টাকা; অর্দ্ধপৃষ্ঠা ৬৲ টাকা; সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। ইহার কম বিজ্ঞাপন লওয়া হয় না।
বিজ্ঞাপন বাঙ্গালা বা ইংরাজী উভয় ভাষায় মনোনীত করিয়া ছাপা হইবে। ছবিও দেওয়া যাইবে, তবে ব্লকের নক্সা ও ব্লকপ্রস্তুতের মূল্য স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

লেখকদিগের প্রতি।

(১) রাজনীতিসম্পর্কীয় বিষয় ভিন্ন আর সকল বিষয়ের সন্দর্ভই অনাথবন্ধুতে প্রকাশিত হইবে।

(২) লেখকগণ কাগজের অর্দ্ধেক বাদ দিয়া এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট অক্ষরে সন্দর্ভ লিখিবেন।

(৩) প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে তাহা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।

(৪) সম্পূর্ণ প্রবন্ধ হস্তগত না হইলে তাহা ছাপা হইবে না।

(৫) আবশ্যক হইলে লিখিত সন্দর্ভগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা যাইবে। উহাতে যে লাভ হইবে, লেখক তাহার অংশ পাইবেন।

চিঠি-পত্র, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন কিম্বা টাকাকড়ি সমস্তই আমার নামে পাঠাইবেন :—

শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।
৭নং ওয়াটারলু ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচি।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

A New Industry.

IT is not unoften that we are slow to recognise the economic importance of articles which are easily available and of which an abundant supply can be ensured. Everything has its value and has only to be utilised properly to yield a return. Such is the case with the Mohua. In a recent number of the *Calcutta Review* Dr. McPhail wrote an interesting paper on Indian trees. Of the Mohua tree he wrote—"In many regions of North and Central India the tree that is most highly valued by the people as a source of food, and which forms the most valuable economic asset of the jungles is one for which there is no English name." It is the Mohua. "Throughout many parts of Chota Nagpur and Bihar the formation of the buds of this wild tree is watched as eagerly by the poor as the advance of the monsoon is awaited a few months later by the more prosperous cultivator who relies mainly upon the rice fields for his supply of food." The flowers of the tree are eaten raw or cooked. After having been dried in the sun they resemble raisins in appearance and make a convenient form of food to use in travelling. "The Sontal or Bhil setting out on a hunting expedition will tie a few handfuls of Mohua flowers in the corner of his cloth, and that will serve as his food supply for several days." The flowers are often used in the form of sweetmeats and are invaluable for feeding cattle; for, in the hot weather when grass is scanty the flower of the Mohua is found useful in increasing the supply of milk.

"The Mohua flowers are also the main source of the supply of distilled liquor or 'daru' in many places where the trees are found. The dried flowers are immersed in water for four days, and then fermented and distilled. The spirit obtained in this way is said to resemble good Irish whisky except that it has a strong smoky odour. Some years ago an Italian in Monghyr patented a process for getting rid of the essential oil or whatever else it is that gives rise to this odour. A specimen of the spirit thus purified was submitted to the Chemical Examiner in Calcutta who reported that it was very similar to good foreign brandy. A new industry seemed to be in prospect, a brisk demand for the spirit having been created. But the rum distillers in Calcutta petitioned the Board of Revenue and a prohibitive duty was imposed which ruined the trade. It transpired a good many years ago that Mohua spirit was being used as an adulterant of brandy, and on this ground its importation into France was forbidden."

As it is Dr. McPhail's calculation is that the value of the Mohua to the people must be at least Rs. 35,00,000 per annum, so the trees, at fifteen years' purchase, may be said to represent a capital worth three and a half million pounds sterling. And Dr. McPhail regrets that almost nothing is done to preserve this valuable tree—the landlord in need of ready cash selling it in order to get an immediate gain.

But this is not all. Recent experiments in Hyderabad prove the Mohua tree to be still

more valuable. We quote the following from Mr. Wakefield's Note on the Industrial Potentialities of Hyderabad :—

"Our investigations commenced on the flowers of the Mohua from which all our country liquor is manufactured. Shortly after I assumed charge of the Department of Revenue, it occurred to me that it might be possible to make our own sugar out of these flowers instead of importing, as we do, more than thirty lacs of rupees worth of sugar annually into the State. With the help of Mr. Mc.Ewen, who was at that time Professor of science in the Nizam College, it was found that the flowers contained a very considerable quantity of sugar, and in addition acetic acid, and also some acetone which is one of the principal ingredients of cordite. We continued to experiment in making sugar, but did not pay much attention to the discovery of acetone until the Great War commenced. Last year the late Sir Alexander Pinhey, with whom I was staying at the time in Ootacamund, was good enough to take me to the Cordite Factory in the Nilgiris at my request, and in the course of conversation with Col. Babington, the officer in charge, I was surprised to learn that he had to import acetone all the way from Canada, where it was laboriously manufactured out of wood, which rendered only one per cent of acetone, that is to say, to produce one ton of acetone it was necessary to cut down, boil and thus destroy one hundred tons of wood. I acquainted him with our discovery, pointing out the facility of manufacture from the flowers of the Mohua as compared with manufacture from wood, and the fact that the use of these flowers did not entail harmful destruction as did the use of wood. He considered the discovery important and asked me to acquaint the Government of India with it, because they were at that time negotiating with certain people who, in return for large subsidies, desired to make acetone for them out of other materials. He also asked me to send him a consignment of the flowers to enable his chemist to examine them also. On returning from Ootacamund His Highness' permission was obtained and the Government of India were informed about the discovery. In the meanwhile we continued to experiment; a chemist from Bombay was retained and spent a few days in Hyderabad advising us. An experimental factory was set up in the Mint because of workshop and power facilities, certain microbes necessary to the process of manufacture were imported from England and eventually with the valuable help of Mr. Gamlen and under the superintendence of Mr. Mutyala, Distillery Chemist, acetone was produced."

Owing to ill-health Mr. Wakefield had to take leave to England, and during his stay in that country he took the opportunity of investigating the utilization and manufacture of the said products of Hyderabad to enable him to be in a position to render advice in the industrial development of the State. He went to the India Office and pressed upon them the importance of the discovery of acetone in Mohua. He saw Sir Thomas Holderness at the India Office and told him all about the discovery pointing out that the Cordite Factory at Ootacamund was importing all its acetone from Canada at great cost. He also told Sir Thomas that the Government of India had lately written to the India Office asking for a chemist to be sent out to India at once to help them to make acetone in Madras out of wood as suggested by Mr. Chatterton of Madras. He pointed out that the making of acetone out of wood was not only a process destructive of much wood, but owing to the bulky nature of the material involved it was a most labourious process and required extensive buildings and equipment. On the other hand the flowers of Mohua were like raisins, a natural product, the use of which was in no way destructive, and manufacture from so convenient a material was a simple, expeditious and inexpensive business

compared to the manufacture from wood. Sir Thomas Holderness seemed impressed and said that as soon as a chemist had been selected to go to India, he would be directed to see Mr. Wakefield first in London and then to proceed to Hyderabad to go into the question of manufacture from Mohua flowers. In the course of his investigation into industries suitable to Hyderabad Mr. Wakefield made the acquaintance of Dr. Fowler of the Manchester University, and in the course of conversation with him learnt that a friend of his, a chemist at the Admiralty, by name Dr. Weizmann, had invented a new and simple process of extracting acetone from starch and sugar and that his process was being made use of by the Admiralty. Mr. Wakefield said at once that such a process was applicable to the flowers of the Mohua, which are full of sugar, and he felt sure that starch and sugar, however, obtained in London, were bound to be very much more expensive than Mohua flowers. He wrote at once to Sir Thomas Holderness acquainting him with these facts and begging that the Chemist selected should be instructed to see Dr. Weizmann of the Admiralty and become acquainted with the latest discovery. A conference was held at the India Office in the room of the Director General of Stores, at which Dr. Weizmann, Dr. Fowler and Mr. Wakefield were present. It transpired that the Admiralty were manufacturing acetone by the Weizmann process at great cost out of maize and were spending 75,000 pounds sterling in the erection of a large factory. He described his efforts and the nature of the flowers of the Mohua and stated his conviction that it would undoubtedly be both simpler and cheaper to extract acetone from Mohua flowers than from maize. Dr. Weizmann thought so also and the conference was adjourned to give Mr. Wakefield time to obtain a sample of flowers from India to enable Dr. Weizmann to test them. He cabled to India for a sample. It was tasted by the Admiralty Chemist in London and the results proved to satisfactory that Dr. Fowler, an eminent chemist, was sent out to India by the Secretary of State. He is to manufacture acetone from Mohua on a large scale at Nasik, which place has been chosen beause of the suitability of its climate. "The Government of India," we read in Mr. Wakefield's Note—"are going to spend some seven lacs of rupees in erecting a special factory at Nasik for the extraction of acetone from Mohua and have already purchased from us about 70,000 rupees worth of Mohua." The Mohua tree abounds in the Hyderabad forests and fields, more especially in the districts of Nizamabad, Medak and Asafabad. During the hot weather the flowers drip off the tree and are gathered and dried to the consistency of raisins. Hitherto they have been utilized for liquor only. Annually about 25,000 tons are gathered, of which about 10,000 tons are used for liquor, leaving a balance of 15,000 tons which are at present a drug on the market and which it is certainly profitable to put to some use. With this it will be possible to make sugar, motor spirit, and several other valuable products.

Regarding motor spirit, Mr. Wakefield says—"We have run several kinds of motor cars successfully for some time on a spirit prepared from Mohua at half the cost of petrol, and during Dr. Fowler's late visit to Hyderabad, the motor cars which conveyed him were run entirely on that spirit." "I would draw attention" says Mr. Wakefield, "to the revolutionary nature of this achievement. A cheap motor spirit spells great reduction in the working charges of railways, waterpumps, motor cars, in fact every description of power engine. The present annual consumption of petrol in Hyderabad and Secunderabad is about 1,00,000 gallons and we require only about 1,500 tons of Mohua to make that quantity."

Nor is this all. For the flowers of the tree do not exhaust its resources. The seed is of great value also; and just before the war broke out Hyderabad alone was exporting over 50,000 maunds annually the value being calculated at a lac of rupees. During Mr. Wakefield's investigation in England he found that a great demand existed for the oil extracted from the seed, because it has a higher melting point than most of the vegetable oils, and is, in consequence, used to give various preparations of oil a thicker consistency. He found it being used in conjunction with cotton-seed oil for the manufacture of margarine which is a cheap and wholesome substitute for butter in universal use in European countries. He purchased some real butter in London and made *ghee* out of it and took it to a margarine factory, where they at once made him a mixture out of cotton-seed and Mohua seed oils which exactly resembled *ghee* and cost about half as much. Mohua oil is not only edible if properly prepared, but soap, candles, glycerine and many other valuable products are made from it. This point should be clearly understood by all interested in the industrial welfare of India. For, by exporting seed instead of oil we lose firstly in money value, because we are paid less on account of the freight charges of the refuse which must be carried away and which it would not be necessary to carry if we extracted the oil ourselves for export; secondly, we lose the benefits of labour which would accure to our people if we did our own extraction; thirdly, we lose the oils themselves of which, although they are of the greatest value to us, we have so far, through ignorance, made no use; fourthly, we lose the cake which is a most valuable cattle food.

Thus in the Mohua which grows wild in the forests and fields we have a source of income which we have only to utilize. We have already shown that the Mohua tree is to be found not only in Hyderabad but also in various other parts of India. India cries aloud for industries other than the universal but insecure industry of agriculture. Will her sons turn a deaf ear to her cries—behaving like the deaf adder that stoppeth her ear?

Hemendra Prasad Ghose.

Eugenics or Race-Culture.

EUGENICS is the name of a new science which has come into being only since the beginning of the present century. Its aim is to study "the agencies under social control that may improve or impair the racial qualities of future generations, either physically or mentally." The science though still in its embryonic stage has opened up a new vista of vision undreamt of by our past generations. It has thrown a flood of new light on the much derided caste system of the Hindus and has proved that the science though new to Westerners was not unknown to the ancient Easterners. The science was first formally expounded in May 16th 1904 by Dr. Galton at the first meeting of the Sociological Institute, London, and has since grown up rather unexpectedly. Men of the highest intellectual eminence, including leaders of science, of biological, medical and social reform—have stood up for and against this novel science, and much learned dust has been kicked up by them to obscure the vision of the ordinary intellect. But still the science has a wonderful

vitality; for in spite of tremendous opposition it has already taken its place in the galaxy of recognised sciences.

The laws of heredity are the principal butresses of this infant science. Francis Galton the founder of this science says;—

"The fact that the laws of heredity apply to man equally with the lower animals and plants and that the mental functions are subject to the same laws of heredity as the physical ones has yet to be taken to heart by the public."

"The salutory effects of natural selection in preventing the degeneracy of a race are so largely interfered with, and sometimes even inverted by civilization, that another form of prevention is peremptorily demanded."

From the passages quoted above, it is apparent that the Eugenist bases his theory of race-culture on the laws of heredity. He wishes to introduce into Western societies a caste-system not very unlike our own caste-system, only that he would not allow the *Sudras* to propagate their species. The Eugenist seeks to exterminate where the early Hindu sages segregated or isolated the banned' classes into watertight compartments' of caste-system. Says Dr. Galton;—

"Probably one of the first efforts in practical Eugenics will be to restrict the propagation of children by the notoriously unfit, whose marriages are now unhindered, if not sometimes fostered, by mistaken kindness."

Several scientists have joined issue on this point and a learned controversy is raging as to whether it is desirable to discourage the propagation of bad stock. Those whom we call the misfits of nature may have some latent virtues in them. We cannot doubt physical and moral defects co-exist with qualities, important for national welfare. Cæsor, Alexander and Napoleon were epileptics; Pascal was a neurasthanic; Spinoza, Keats, Mozart were tubercular; Chatterton, Neitzche,. the Brontes, John Davidson may be called the misfits of nature. Yet they were the persons who changed human history, reformed human institutions and gave new directions to human thought. Thousands of such names may be added to the list, so that it may be doubted whether genius and unfitness go hand in hand. It is still impossible to account for the genius upon the ordinary lines of evolution. It is not inherited. It is rather a sport of Nature. On the other hand it has some close affinity with insanity. If so, is it expedient to put a ban upon the propagation of the so-called unfit?

Another point is one who is useless as an individual may not necessarily be useless as a parent. It is known that in some cases the rogue or the wastrel has become the parent of a discoverer or a statesman. Some there are who have broken their birth's invidious bar. If so, we are not entitled to discourage the propagation of those who seem to us to be no better than more caitiffs. The Environmentalists hold that the jetsoms and flotsoms of society are what they are not for some inherent defects, but because our ignorant society does not know how to utilize them. Several wastrels have been reclaimed from the scum of society and have been turned into useful citizens. Under such circumstances we should not rashly rush to play the Providence.

The third objection is that the laws of heredity are not sufficiently and accurately known; so that we cannot, at present, take any drastic measure of social reform, based upon them.

The fourth objection is that our aim should not be to produce the exceptional man and woman. They will not promote the well-being of society and are as a rule out of harmony with their surroundings. Most of them die childless. The list of those men of distinction who have either remained unmarried or died childless is a long one. Kant, Hume, Newton, Lister, Beithoven, Handel, Pope, Dr. Johnson, Neitzsche, Carlyle etc., etc. may be

named as forming a small fragment of the formidable list. Hence there are some who think that the fruit of the body is in inverse ratio with the fruit of the brain.

These are the four sets of argument against which the Eugenist has to contend. The first and second sets of argument are almost identical. The first argument that the unfit may possess some latent qualities which are seldom met with among the common run of the fit is of rare occurrence. The out and out Eugenist holds that such cases are so rare that they may safely be neglected. The laws of heredity as observed in plants and animals apply to man. There can be no doubt about it. The gardener and the breeder have improved the qualities of their production by carefully following the biological laws. When they have succeeded in cases of plants and animals, it is foolish to cry halt when we set about applying these laws for the betterment of human race.

As to the second objection, that is the objection of the environmentalist, we hold that men do not gather grapes of thistles. The Eugenists have succeeded in showing by facts and figures that some distinction should be made between the degenerate who comes of a good stock and the degnerate who is the descendant of a bad stock. The offspring of a good family may become useless as an individual member of society but he may not be useless as a parent. The most crushing argument against the environmentalist is that since the middle of the last century the environmental conditions in England have improved immensely but the waifs and strays, have not been turned into good human stuff. In short, the racial progress have not been able to keep pace with environmental progress. A few cases of reclamation do not prove much owing to the shocking laxity of sexual reltionship in the lower strata of society.

The third objection is the argument of caution. It is admitted that ability, talent, capacity, etc. are inherited and so are their opposites—weakness of intellect, obtuseness of moral sensibility, laziness, etc. True we have no exact knowledge of all the laws of heredity. We should not base our action on insufficient knowledge. We should curb the enthusiasm which is born of ignorance. This objection carries some weight and we should act with the reservations which the complexity of the subject demands. We should encourage the propagation of the good stock. But how are we to distinguish the good from the bad, the fit from the unfit ? Brawniness is not fitness. The healthiness of body and mind is fitness. The diseased should be weeded out. We may encourage worthy parenthood but we cannot ban 'unworthy' parenthood, except where the couple suffer from heritable diseases. The ancient Hindus were Eugenists and their aim was the accentuation of special qualities. In the Brahmins they tried to cultivate religious feelings and psychic powers, in the Kshetryas they tried to develop the martial power, in the Vayshya class they tried to promote the commercial instincts and the waifs and strays of these three classes were swept into the fourth class namely the Sudra class. They knew that the Sudras, that is the wastrels of the three higher classes might possess some latent properties of valuable kind which should be transmitted to the next generation and hence they did not prohibit the propagation of the Sudras. Marriage was prohibited only to those who suffered from heritable diseases. But the Sudras were moral wrecks, and hence they were shelved into a separate caste.

The objection that we do not know enough to suppress anything is weighty enough to check propagation of the so-called undesirables and hence no serious attempt has at yet been made to prevent their propagation. But something is being done to control the feeble-minded. The hasty and extreme action taken

in Germany has produced "human brutes"

The fourth objection is quite beside the mark. In Europe, they have not as yet tried to produce the exceptional man. They are not trying to raise the average standard of humanity. But the question now staring them in the face is that in trying to suppress insanity, they may suppress genius. This consideration has put a restraint upon the wild enthusiasm of the ultra-Eugenists while the moderates aver that they put the case of genius altogether aside. Like the wind the genius bloweth where it listeth, but it is an observed fact that it very rarely arises in the lowest strata of society. The production of ability and practical efficiency is the aim of the Eugenist. The accentuation of special qualities is not his aim.

Now how does the practical Eugenist try to carry his object out? First, by selective breeding and secondly by promoting the early marriage of suitable persons. The caste system which is nothing but a system of select breeding is even now being commended with a hinted censure while early marriage is being damned with faint praise While the ultra-radicals of India are loading the caste system of the Hindus with reproaches, a voice from Europe pays a stifled tribute to it. An esteemed Eugenist writes—"Caste is a word of somewhat sinister significance, but no cautious observer will pronounce the caste system of the East wholly evil." Even this much from a European is quite unexpected. But the selective breeding of the Eugenist, which has already been adopted in Germany, France and America, has not infrequently led to the *cul de sac* of sterility. So they may have to recourse to a caste system not very unlike our own. Even early marriage has been marked with a white stone. Says a Western writer;—"keep down the cost of living which tends to delay marriage and so to diminish fertility. Endow motherhood and give it the honour which it may fairly claim, subsidise marriage or give exemption from taxation to the fathers of families of a certain size." Here the writer condemns the late marriage of Europe, cries for the introduction of early marriage among suitable persons, but does not approve of child marriage or infant marriage. We admit that our social institutions have deteriorated with the march of time; with our imperfect knowledge and misdirected education we cannot understand them in full. The Eugenist has brought them in the penumbra and the full illumination is yet to come.

SASI BHUSHAN MUKHERJI.

Ruskin on Work.

4

NAY, but (it is asked) how is that an unfair advantage? Has not the man who has worked for the money a right to use it as he best can? No, in this respect, money is now exactly what mountain promontories over public roads were in old times. The barons fought for them fairly:—the strongest and cunningest got them; then fortified them, and made every one who passed below pay toll. Well, capital now is exactly what crags were then. Men fight fairly (we will, at least, grant so much, though it is more than we ought) for their money; but,

once having got it, the fortified millionaire can make everybody who passes below pay toll to his million, and build another tower of his money castle. And I can tell you, the poor vagrants by the roadside suffer now quite as much from the bag-baron, as ever they did from the crag-baron. Bags and crags have just the same result on rags. I have not time, however, to-night, to show you in how many ways the power of capital is unjust; but this one great principle I have to assert—you will find it quite indisputably true,—that whenever money is the principal object of life with either man or nation, it is both got ill, and spent ill; and does harm both in the getting and spending; but when it is not the principal object, it and all other things will be well got, and well spent. And here is the test, with every man, whether money is the principal object with him or not. If in mid-life he could pause and say, 'Now I have enough to live upon, I'll live upon it; and having well earned it, I will also well spend it, and go out of the world poor, as I came into it,' then money is not principal with him; But if, having enough to live upon in the manner befitting his character and rank, he still wants to make more, and to *die* rich, then money is the principal object with him, and it becomes a curse to himself, and generally to those who spend it after him. For you know it *must* be spent some day; the only question is whether the man who makes it shall spend it, or some one else. And generally it is better for the maker to spend it, for he will know best its value and use. This is the true law of life. And if a man does not choose thus to spend his money, he must either hoard it or lend it, and the worst thing he can generally do is to lend it; for borrowers are nearly always ill-spenders, and it is with lent money that all evil is mainly done, and all unjust war protracted.

For observe what the real fact is, respecting loans to foreign military governments, and how strange it is. If your little boy came to you to ask for money to spend in squibs and crackers, you would think twice before you gave it him: and you would have some idea that it was wasted, when you saw it fly off in fireworks, even though he did no mischief with it. But the Russian children, and Austrian children, come to you, borrowing money, not to spend in innocent squibs, but in cartridges and bayonets to attack you in India with, and to keep down all noble life in Italy with, and to murder Polish women and children with; and *that* you will give at once, because they pay you interest for it. Now, in order to pay you that interest, they must tax every working peasant in their dominions; and on that work you live. You therefore at once rob the Austrian peasant, assassinate or banish the Polish peasant, and you live on the produce of the theft, and the bribe for the assassination! That is the broad fact—that is the practical meaning of your foreign loans, and of most large interest of money: and then you quarrel with Bishop Colenso, forsooth, as if *he* denied the Bible, and you believed it! though, wretches as you are, every deliberate act of your lives is a new defiance of its primary orders; and as if, for most of the rich men of England at this moment, it were not indeed to be desired, as the best thing at least for *them*, that the Bible should *not* be true, since against them these words are written in it: 'The rust of your gold and silver shall be a witness against you, and shall eat your flesh, as it were fire.'

III. I must pass now to our third condition of separation, between the men who work with the hand, and those who work with the head.

And here we have at last an inevitable distinction. There *must* be work done by the arms, or none of us could live. There *must* be work done by the brains, or the life we get would not be worth having. And the same men cannot do both. There is rough work to be done, and rough men must do it; there is

gentle work to be done, and gentlemen must do it; and it is physically impossible that one class should do, or divide, the work of the other. And it is of no use to try to conceal this sorrowful fact by fine words, and to talk to the workman about the honourableness of manual labour and the dignity of humanity. That is a grand old proverb of Sancho Panza's, 'Fine words butter no parsnips'; and I can tell you that, all over England just now, you workmen are buying a great deal too much butter at that dairy. Rough work, honourable or not, takes the life out of us; and the man who has been heaving clay out of a ditch all day, or driving an express train against the north wind all night, or holding a collier's helm in a gale on a lee shore, or whirling white-hot iron at a furnace mouth, is not the same man at the end of his day, or night, as one who has been sitting in a quiet room, with everything comfortable about him, reading books, or classing butterflies, or painting pictures. If it is any comfort to you to be told that the rough work is the more honourable of the two, I should be sorry to take that much of consolation from you; and in some sense I need not. The rough work is at all events real, honest, and, generally, though not always, useful; while the fine work is, a great deal of it, foolish and false, as well as fine, and therefore dishonourable: but when both kinds are equally well and worthily done the head's is the noble work, and the hand's the ignoble; and of all hand work whatsoever, necessary for the maintenance of life, those old words, 'In the sweat of thy face thou shalt eat bread,' indicate that the inherent nature of it is one of calamity; and that the ground, cursed for our sake, casts also some shadow of degradation into our contest with its thorn and its thistle; so that all nations have held their days honourable, or 'holy,' and constituted them 'holydays,' or 'holidays,' by making them days of rest; and the promise, which, among all our distant hopes, seems to cast the chief brightness over death, is that blessing of the dead who die in the Lord, that 'they rest from their labours, and their works do follow them.'

And thus the perpetual question and contest must arise, who is to do this rough work? and how is the worker of it to be comforted, redeemed, and rewarded? and what kind of play should he have, and what rest, in this world, sometimes, as well as in the next? Well, my good working friends, these questions will take a little time to answer yet. They must be answered: all good men are occupied with them, and all honest thinkers. There's grand head work doing about them; but much must be discovered, and much attempted in vain, before anything decisive can be told you. Only note these few particulars, which are already sure.

As to the distribution of the hard work. None of us, or very few of us, do either hard or soft work because we think we ought; but because we have chanced to fall into the way of it, and cannot help ourselves. Now, nobody does anything well that they cannot help doing: work is only done well when it is done with a will; and no man has a thoroughly sound will unless he knows he is doing what he should, and is in his place. And, depend upon it, all work must be done at last, not in a disorderly, scrambling, doggish way, but in an ordered, soldierly, human way—a lawful way. Men are enlisted for the labour that kills—the labour of war: they are counted, trained, fed, dressed, and praised for that. Let them be enlisted also for the labour that feeds: let them be counted, trained, fed, dressed, praised for that. Teach the plough exercise as carefully as you do the sword exercise, and let the officers of troops of life be held as much gentlemen as the officers of troops of death; and all is done: but neither this, nor any other right thing, can be accomplished—you can't even see your way to it—unless, first of all, both servant and master are resolved that, come what will of it, they will do each other justice.

People are perpetually squabbling about what will be best to do, or easiest to do, or adviseablest to do, or profitablest to do; but they never, so far as I hear them talk, ever ask what it is *just* to do. And it is the law of heaven that you shall not be able to judge what is wise or easy, unless you are first resolved to judge what is just, and to do it. That is the one thing constantly reiterated by our Master—the order of all others that is given oftenest—'Do justice and judgment' That's your Bible order; that's the 'Service of God,'—not praying nor psalm-singing. You are told, indeed, to sing psalms when you are merry, and to pray when you need anything; and, by the perversion of the Evil Spirit, we get to think that praying and psalm-singing are 'service.' If a child finds itself in want of anything, it runs in and asks its father for it—does it call that doing its father a service? If it begs for a toy or a piece of cake—does it call that serving its father? That, with God, is prayer, and He likes to hear it: He likes you to ask Him for cake when you want it; but He doesn't call that 'serving Him.' Begging is not serving: God likes mere beggars as little as you do—He likes honest servants,—not beggars. So when a child loves its father very much, and is very happy, it may sing little songs about him; but it doesn't call that serving its father; neither is singing songs about God, serving God. It is enjoying ourselves, if it's anything; most probably it is nothing: but if it's anything it is serving ourselves, not God. And yet we are impudent enough to call our beggings and chauntings 'Divine service:' we say, 'Divine service will be "performed"' (that's our word—the form of it gone through) 'at eleven o'clock.' Alas!—unless we perform Divine service in every willing act of life, we never perform it at all. The one Divine work—the one ordered sacrifice—is to do justice; and it is the last we are ever inclined to do. Anything rather than that! As much charity as you choose, but no justice. 'Nay,' you will say, 'charity is greater than justice. Yes, it is greater; it is the summit of justice—it is the temple of which justice is the foundation. But you can't have the top without the bottom; you cannot build upon charity. You must build upon justice, for this main reason, that you have not, at first, charity to build with. It is the last reward of good work. Do justice to your brother (you can do that whether you love him or not), and you will come to love him. But do injustice to him, because you don't love him; and you will come to hate him. It is all very fine to think you can build upon charity to begin with; but you will find all you have got to begin with begins at home, and is essentially love of yourself. You well-to-do people, for instance, who are here to-night, will go to 'Divine service' next Sunday, all nice and tidy, and your little children will have their tight little Sunday boots on, and lovely little Sunday feathers in their hats; and you'll think, complacently and piously, how lovely they look! So they do: and you love them heartily, and you like sticking feathers in their hats. That's all right: that *is* charity; but it is charity beginning at home. Then you will come to the poor little crossing-sweeper, got up also—it, in its Sunday dress,—the dirtiest rags it has,—that it may beg the better: we shall give it a penny, and think how good we are. That's charity going abroad. But what does Justice say, walking and watching near us? Christian Justice has been strangely mute, and seemingly blind; and, if not blind, decrepit, this many a day: she keeps her accounts still, however—quite steadily—doing them at nights, carefully, with her bandage off, and through acutest spectacles (the only modern scientific invention she cares about). You must put your down ear ever so close to her lips, to hear her speak; and then you will start at what she first whispers, for it will certainly be, 'Why shouldn't that little crossing

sweeper have a feather on its head, as well as your own child?' Then you may ask Justice, in an amazed manner, 'How she can possibly be so foolish as to think children could sweep crossings with feathers on their heads?' Then you stoop again, and Justice says—still in her dull, stupid way—'Then, why don't you, every other Sunday, leave your child to sweep the crossing, and take the little sweeper to church in a hat and feather?' Mercy on us (you think), what will she say next! And you answer, of course, that 'you don't, because everybody ought to remain content in the position in which Providence has placed them.' Ah, my friends, that's the gist of the whole question. *Did* Providence put them in that position, or did *you*? You knock a man into a ditch, and then you tell him to remain content in the 'position in which Providence has placed him.' That's modern Christianity. You say—'*We* did not knock him into the ditch.' How do you know what you have done, or are doing? That's just what we have all got to know, and what we shall never know, until the question with us, every morning, is, not how to do the gainful thing, but how to do the just thing; nor until we are at least so far on the way to being Christian, as to acknowledge that maxim of the poor half-way Mahometan, 'One hour in the execution of justice is worth seventy years of prayer.'

[*To be continued.*

The Window Glass Machine.

Its invention and perfection in the United States has immediately increased output per Tank and per man. Better quality and Wider Range of Thickness of Glass secured.

By ROBERT LINTON,

Extract from an address before the Engineers' Society of Western Pennsylvania, by whom it is copyrighted.

THERE are two kinds of transparent sheet glass, termed commercially plate glass and window glass, manufactured by two radically different operations. In making the former, a quantity of molten glass is poured upon a casting table and rolled out in a sheet, which is placed in a kiln where it is annealed and cooled. The sheet produced in this way is rough, as the metal table and roller, no matter how smooth, will leave an impression on the soft glass; consequently it has to be ground down to a plane surface on both sides and then polished in order to render the surface smooth and the sheet transparent. Window glass is made by blowing or drawing a cylinder in such a manner that nothing but air comes in contact with the
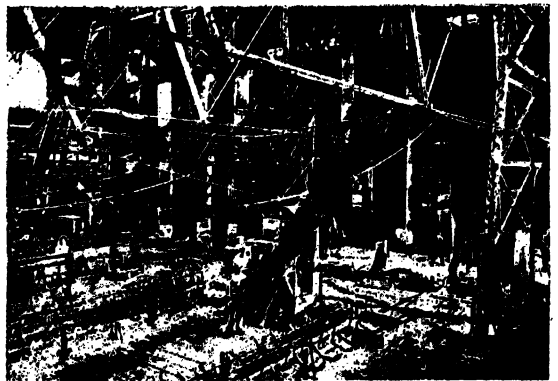
WINDOW GLASS MACHINES IN OPERATION.

The simple and safe means of handling the heavy cylinders now being made is shown.

surfaces during the operation, cutting open the cylinder longitudinally, reheating it, and flattening it out in a sheet which is then annealed.

Prior to 1903 window glass was made entirely by hand, and there is still about 40 per cent. of the production of the United States manufactured by this method. A brief description may therefore be of interest and aid in making clear the difficulties involved in devising apparatus to do the work mechanically. The tool used is the blower's pipe, about 5 feet long, with a mouthpiece on one end, and on the other the bell-shaped wrought "pipe head." The workmen are the blower, gatherer and snapper, or blower's helper, the three men constituting a "shop." The gatherer starts the operation by dipping the glass which adheres and forms a small ball. He blows through pipe head, which has been previously heated, sufficiently to expel the soft glass from the interior and form a small bubble in the ball. The glass is then cooled to the proper stiffness, more glass gathered and the operation repeated until there is sufficient glass to yield a cylinder of the desired size. For an ordinary cylinder the gatherer usually gathers five minutes.

The lump, which is in a state of rather stiff plasticity, is then carried to the "blower's block," an iron mould set in water to keep it from becoming too hot, and lined with charcoal to prevent the glass from being marked by contact with the iron. By turning the ball in the block, blowing air into the lump through the pipe and drawing it up towards him, the blower so manipulates the operation as to form a pear-shaped ball, the upper part of which has the diameter and thickness of the cylinder to be produced, the bottom containing a thick mass of glass that has now become quite stiff. The ball is now re-heated in a "blow furnace" and when soft enough the blower swings it out in a "swing hole" alongside the blow furnace. The weight of the glass elongates the cylinder, and the blower keeps it distended to proper diameter by intermittently blowing air into it through the pipe.

The re-heating and swinning out is repeated until the glass in the closed end of the cylinder is of the same thickness as the other parts. This closed end is now exposed to the heat of the blow furnace, the workman at the same time blowing into the pipe and keeping the air confined by holding his thumb over the mouthpiece. The glass in the end softens, and the heat at the same time expands the air in the cylinder, which finally bursts out through the end. The open end is heated still further and swung out into the swing hole in such manner as to make it cylindrical to the end. The pipe is removed by touching a cold iron to the glass just below the pipe head, and the pear-shaped cap removed by stretching a thread of hot glass around the cylinder, allowing it to remain until a heated streak is formed, and touching this streak with a cold iron causes the cap to snap off. The cylinder is split by passing a hot iron back and forth through the cylinder to produce a similar line of heat and touching it at one end with a cold iron, which results in a straight crack from end to end.

DOUBLE REVERSIBLE POT AND FURNACE.

No other form of receptacle for the molten glass can equal it for high output and economical operation.

The cracked open cylinder is then carried to a flattening oven. It is laid on an iron carriage and pushed into the oven, where it is heated, lifted with an iron tool from the carriage and laid on the flattening stone—a large, flat fire clay tile with a carefully leveled and highly polished surface. As the glass softens the cylinder is spread out and then rubbed down flat with a wooden block mounted on a light steel bar. The stone with the sheet lying on it is then moved out of the flattening compartment into a cooler one, the sheet is gradually cooled down and when it is sufficiently hardened it is lifted by means of a fork with smooth steel tines and laid on a conveyor which carries it slowly out of the oven.

This part of the oven, called "lehr," is for the purpose of annealing the glass by cooling it slowly and gradually, for otherwise it would be too brittle for commercial use. The ordinary type of flattening oven has four flattening stones set on a circular table, the "wheel," which is carried on a vertical shaft, turned by hand from the bevel gear drive.

It will be readily appreciated that blowing window glass requires unusual judgment and manual skill as well as more than ordinary physical strength and endurance; also that the size and thickness of sheets that can be produced by hand is quite limited. In single strength (1-12 inch thick) the limit is about 14 inches diameter by 60 inches long; in double strength (⅛ inch thick) about 19 inches diameter by 70 inches long.

Regenerative tank furnaces are now almost universally employed for window glass melting. A tank furnace consists of a long, rectangular hearth or "tank" constructed of massive fire clay blocks and kept filled with molten glass. The firing is through ports in side walls above the blocks, the flame sweeping across between the glass level and the crown from the end where the batch is filled in to a point usually slightly more than half way to the working end. The batch floats on the surface of glass bath, exposed to the heat of the fire above and the molten glass below, and is gradually melted, refined and cooled to proper consistency as it is drawn down by the continuous working out of the glass at the other end. The temperature of the melting end is about 2,600° Fahr., and at the working end about 2,150-2,250° Fahr. in machine plants.

Glass does not have a definite melting point in the sense of a fixed temperature at which it passes from a solid to a liquid state. Strips of window glass under test have shown a slight deflection at 840° Fahr., while they lost stiffness at 920° and bent freely at 980°. The glass becomes softer as more heat is applied and becomes entirely liquid, so as to assume readily the shape of a vessel into which it is poured, at about 1,700°. With the application of still more heat the glass becomes, of course, more and more fluid, until finally a point is reached where a slight decomposition and loss of alkali takes place, which manifests itself by bubbles of gas rising through the heated mass.

Somewhere around 1896 John H. Lubbers, a window glass flattener by trade, began experimenting with a machine to make glass cylinders. He was a man of unusual natural ability and in working at his trade, he had acquired a general practical knowledge of the physical properties of glass. He believed that he had devised a practical method of drawing glass cylinders from a bath of molten glass, but, being of limited means and realizing that considerable money would be required for his experiments, he disclosed his proposed method to James A. Chambers, in whose factory Lubbers was working, and one of the ablest window glass manufacturs in the United States. Mr. Chambers was much impressed with the practicability of Lubbers' proposed method, crude though the details must have been at that time, and advanced the necessary money to cover the cost of some preliminary experiments.

Later a small company was formed for the purpose of carrying out these experiments on a more extensive scale, for while Lubbers was actually making window glass cylinders, there were a great many difficulties still to be overcome in order to render his apparatus suitable for the manufacture of window glass in a commercial way.

As a matter of fact, it required years of work and an enormous amount of money to develop the apparatus to the point where it was

BLOWING WINDOW GLASS CYLINDERS BY HAND.
About 40 per cent. of the window glass production of the United States is made by this method.

finally operated at a profit. Nevertheless, the machine of today still retains the basic features of the Lubbers inventions, and, considering how completely they revolutionized the established processes of window glass manufacture, his ideas, as set forth in his various patents, show a surprising knowledge of the essential conditions for mrking glass cylinders by machinery.

The Lubbers process is a process for drawing cylinders vertically from a bath of molten glass. This in itself was not a new idea, as several patents—one dating back as far as 1854—proposed this. Lubbers, however, was the first to devise a workable method for really doing it, a process that took into account the peculiar conditions actually involved in working molten glass, and apparatus that actually made glass cylinders—cylinders that were in every respect similar to those that were blown by hand.

The experiments were continued at Alleghny, Pa., until the spring of 1902, when a factory at Alexandria, Indiana, was leased to Lubbers and the work was transferred to that point. There was a 54-blower continuous tank furnace at this plant, with all accessory flattening and other equipment for this capacity, and the machine installation was designed with a view to testing it out on a practical working scale, and to developing it as rapidly as possible to the point where it could be utilized. The work of developing and improving the various parts of the apparatus continued for about two years longer before satisfactory results began to be obtained, but finally there was perfected a machine that is today producing results far beyond the most optimistic expectations of its inventor. One by one the causes of the troubles were located and the apparatus modified or adjusted to correct them.

That this work was so slow and so difficult was largely due to two facts: first, that in the liquid state in which glass is worked in machine operations it is so soft as to be extremely sensitive to changes in temperature or variations in exterior or interior pressure exerted at the point of draw; and, second, that in working glass, cooling strains develop as the glass passes from the liquid to the solid state, causing brittleness.

The method of reheating the residue remaining in the pot after drawing a cylinder and then ladling fresh glass into the pot was not very satisfactory. It was difficult to get good quality of glass, for unless the glass in the pot and that which was ladled into it were heated to the same temperature and brought to a very fluid condition, they would not mix properly, and thus produce streaks in the cylinder. Similar difficulty was experienced in melting back the residues in the forehearth; if the glass was heated hot enough and skimmed when necessary in the manner employed in skimming the gatherers' rings in hand operation, the quality was satisfactory, but the operation was very slow.

It was then proposed to drain the pot between draws, and to accomplish this a furnace was built with four pots mounted on a turntable and so arranged that each pot would be tilted at a certain point. In this way there would always be one pot used for drawing cylinders while the others would be heating and draining. An improvement on this apparatus was the double reversible pot mounted on trunnions, invented by L. A. Thornburg, in using which one side was always being drained while a cylinder was being drawn from the glass in the other. This apparatus is still used by the American Window Glass Company and it is doubtful if any other form of receptacle for the molten glass can equal it for high output and economical operation.

It was thought in the early days of machine operations that some change in the chemical composition of the glass, or in the character of the materials from which it was made, would be necessary in order to adapt it to the new working conditions. Considerable experimenting was done with various mixtures and various kinds of materials, but in the end it was found that the chemical composition that gave the best glass under hand operations was also the best for machine operations.

The original Lubbers' machine made a cylinder about the size of a hand blown cylinder. It soon became obvious that production could be very materially increased by ladling a larger quantity of glass into the pot and drawing a longer cylinder which could be cut up, after lowering, into lengths suitable for flattening. This introduced complications in the control of drawing speed and air supply, but eventually the point was reached where five flattening lengths about 14 inches in diameter by 60 inches long could be produced at one draw.

The next step—and a most important one in increasing production—was to increase the diameter of the cylinder. It was not possible to flatten a single strength cylinder that was much larger than the standard size of 14 inches in diameter by 60 inches long. It was suggested, however, that there would not be any difficulty in flattening, if the dimensions would be reversed, and flattening lengths produced which would be 19 inches diameter by 42 inches long, employing, of course, pots of larger diameter and containing a larger quantity of glass. This method was tried out and proved so successful that it was immediately adopted in all factories operating machines. The size of the cylinders has since then been considerably increased, so that today, using a 36-inch pot, single strength cylinders are made up to 21 inches diameter by 460 inches long, and double strength up to 24 inches in diameter by 320 inches long.

As the length of the cylinders was increased, another complication entered. It was found that even with the graduating valve opening and increasing with automatic precision the amount of air entering the cylinder, the pressure at the point of draw was not constant, but was applied in a series of surges which produced corrugations in the cylinder termed "pulsations." However, Lubbers devised a means for overcoming the trouble sufficiently to meet the requirements of practical operations. That was to introduce an excess of blowing air and then allow a portion of it to escape through a vent hole. With the discovery of this principle, Lubbers completed the devising of a system of air control that stands today unchanged except in perfecting and applying improved mechanical details required by the huge cylinders now drawn.

This outline gives an inadequate idea of the immense amount of study and research expended on the various problems involved, and the numerous alterations in the mechanical details that were found necessary while the machine was being developed and conditions of machine operation determined. It was a tedious and difficult task, but one by one the difficulties

were overcome until finally machine operation attained such a degree of success as to dominate the window glass business of the United States and has reached out to new fields abroad.

Machine operation has immensely increased the output per tank and output per man in the blowing room. The machine blower, operating four machines, displaces on an average eight hand blowers, and not only this, he produces a great deal more glass than the eight hand blowers could possibly make. The whole labor force of a present-day machine blowing room is less than half the labor force in the blowing room of a hand operated plant. Under hand operation a tank furnace was rated as so many blowers' capacity. A 48-blower tank, for instance, was a tank designed to melt sufficient glass to supply 16 blowers on each of the three working shifts. It was estimated that if the blowers all worked to the limit of capacity fixed by trade union rules it was as much glass as the tank would melt. The same tanks after being remodeled—not enlerged, or only slightly enlarged—have yielded an output in finished glass that has shattered all records in hand-blown operation, and completely upset all previous ideas of tank capacity.

Not only in point of capacity, but as regards quality of product as well, has the machine score a remarkable success. In the early operations a great deal of doubt was felt as to whether machine glass would ever equal hand-blown glass in quality. Now the standard is set by machine-made glass, which is recognize(as the highest and most uniform quality pro duced in United States or abroad.

A wider range of thickness of glass is als(produced by machine than can be made b ordinary hand blowers. Glass as thin as 1-2 inch and as thick as 3-16 inch is made regular ly, together with all intermediate thicknesse between these limits for which there is a demand. Ordinary hand blowers make tw(thicknesses, single strength (1-12 inch), doubl(strength (⅛ inch).

On account of the better quality and wide range of thickness of machine glass, its us(has been constantly extending. The bulk of the product, of course, continues to be use fo glazing, picture framing and similar purposes In addition, however, the lighter thicknesses are now very generally employed for photographic plates, stereopticon slides, and microscopic slides, all of which previously had been imported from Europe; none had been made in the United States by hand blowing. Faces for clocks, gauges, dials, etc., are likewise largely furnished from machine glass. The heavy glass finds a wide use for automobile lamp doors, wind shields and as a substitute for plate glass.

The invention of the window glass machine and its perfection to the present high standard of efficient operation is one of the most notable industrial achievements of recent years.

প্রথম বর্ষ। চৈত্র। প্রথম খণ্ড।
সন ১৩২৩। দশম সংখ্যা।

ভগবান্ রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিলে সমাগত দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন।

[শ্রীপ্রবোধনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ, বি. এল্]

অচিন্ত্য অব্যক্ত প্রভু! কেমনে বুঝিব
মোরা, কখন কি ভাবে দেব প্রকাশিছ
বিশ্ব মাঝে স্বপ্রকাশ। ছিলাম সকলে
সুখে সুপ্ত তব অঙ্কে প্রলয় বিধানে ;
কিন্তু তব ইচ্ছাশক্তি বলে, লাভ করি
তব শক্তি-কণা, হইনু প্রকাশ মোরা
তোমারি নিয়োগে, পোষিবারে সুমহান
বিশ্বলীলা তব। সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে
কতবার করিয়াছ ভুবন উদ্ধার
তুমি কত রূপে। কিছুই বুঝি না। শুধু
করি অভিনয়, যখন যে ভাবে তুমি
নাচাও সকলে সুত্রধার নটরাজ—
বিচিত্র তোমার বিশ্বনাট্যশালা মাঝে।

সর্ব্বশক্তিমান বিভু বিরাট সবিতা,
কার সাধ্য বুঝে কোন মহাশক্তি বলে
অনাহত প্রণব হিল্লোল কেন্দ্রীভূত
চারি অংশে নশ্বর জগতে ? জানি মোরা
ব্রহ্মাণ্ড বিশ্লিষ্ট হয় ঈক্ষণে যাঁহার
দুরাচার রাক্ষস নিধনে শুধু, কিবা
প্রয়োজন তাঁর অবতারে ? কেন তবে
ধরিয়াছ সুবিমল—নব দুর্ব্বাদল
রূপ জগমন লোভা ? রাক্ষস-দলন
মাত্র উপলক্ষ করি, আসিয়াছ বুঝি
প্রেমময়—বিতরিয়া তব বিশ্বপ্রেম
নিস্তারিতে যত মলিন পার্থিব জীবে ?
এসেছ কি বিনাশিতে দুষ্কৃতি অন্তর,
বল দর্প স্বেচ্ছাচার করিতে দমন,
স্থাপন করিতে লোকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম,
শিখাইতে রাজনীতি, করিতে রঞ্জন
প্রজাগণে করি ত্যাগ নিজ সুখ স্বার্থ ?
হীন বুদ্ধি মোরা ; কেমনে জানিব দেব
কি মহা উদ্দেশ্য তুমি করিবে সাধন।
দাও পদাশ্রয়, যেন পাই পরিত্রাণ
মোরা মহাভয় রক্ষরাজ ত্রাসে।

শ্রীল শ্রীযুক্ত ঝালোয়ারের রাজরাণা বাহাদুর।

ঝালাওয়ারের বর্ত্তমান নরপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার্ ভবানী-প্রসাদ সিংহ কে, সি, এস, আই, বাহাদুর রাজপুত জাতির ঝল্ল বা ঝালা সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই ঝালা সম্প্রদায় হইতে রাজ্যের নামই ঝালাওয়ার বা ঝালোয়ার হইয়াছে। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভাও সিংহ কাঁথিবাড়ের হলওয়াদ হইতে রাজপুতনায় আগমন করেন। তাহার পুত্র মাধো সিংহ কোটায় আগমন করেন এবং মহারাজ ভীম সিংহ কর্ত্তৃক কোটা রাজ্যের ফৌজদার বা সেনাপতি পদে নিযুক্ত হন। ভীম সিংহ তাঁহাকে নান্তা নামক জনপদ জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই জায়গীর ও পদ ঐ বংশ পুরুষপরম্পরা হিসাবে ভোগ দখল করিয়া আসিতে ছিলেন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মাধো সিংহের প্রপৌত্র বিখ্যাত জালিম সিংহ কোটা রাজ্যের ফৌজদার ও নান্তা পরগণায় জায়গীরদার হইয়াছিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে জালিম সিংহের কৃতিত্বফলে ভাটওয়ারার রণক্ষেত্রে জয়পুর রাজ্যের সৈন্যদল কোটার সৈন্যদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পরে কোটার অধীশ্বর মহারাও গুমান সিংহের সহিত জালিম সিংহের মনান্তর ঘটে। সেইজন্য তিনি উদয়পুরে গমন করেন। তাঁহার কার্য্যদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া উদয়পুরের মহারাণা তাঁহাকে রাজরাণা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পুনরায় কোটায় প্রত্যাগমন করেন; সেই সময় মহারাও গুমান সিংহের সহিত তাহার মনোমালিন্য দূর হয় এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাও গুমান সিংহ বাহাদুর যখন অন্তিম রোগশয্যায় শায়িত হইয়াছিলেন, তখন তিনি রাজরাণা জালিম সিংহকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহার হস্তে আপনার পুত্র উমেদ সিংহের ও কোটা রাজ্যের ভার অর্পণ করেন। সেই সময় হইতেই রাজরাণা জালিম সিংহই কার্য্যতঃ কোটা রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, তাহার শাসনফলে কোটা রাজ্য সুখ-সমৃদ্ধিতে বিশেষ সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে তিনি পঞ্চাশ বৎসর কাল কোটা রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের সহিত কোটা রাজ্যের এক সন্ধি হইয়াছিল। সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ইংরেজরাজ কোটা রাজ্যের রক্ষাকর্ত্তা হইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ঐ সন্ধিপত্রে এই মর্ম্মে আর একটি সর্ত্ত সংযোজিত হয় যে সমস্ত কোটা রাজ্যের শাসনভার রাজরাণা জালিম সিংহের এবং তাঁহারই বংশধরের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। রাজরাণা জালিম সিংহ একজন তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক ছিলেন; তিনি কোটা রাজ্যের ও বৃটিশ সরকারের যে উপকার করিয়া গিয়াছেন ইতিহাসে তাহা বিষদভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং উত্তর কালে যখন দেখাগেল যে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য পরিচালন করা অসম্ভব, তখন বৃটিশ সরকার রাজরাণা জালিম সিংহের বংশধরদিগের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিলেন এবং জালিম সিংহের পৌত্র মদন সিংহকে কোটা রাজ্য হইতে সতরটি পরগণা বাহির করিয়া উহা পুরুষ পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিতে ছিলেন। ঐ সম্পত্তির আয় বার্ষিক বার লক্ষ টাকা, এইরূপে ঝালোয়ার রাজ্যের পত্তন হয়, ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে এই রাজ্য বৃটিশ সরকারের রক্ষাধীন হইয়াছে।

ঝালাওয়ারের বর্ত্তমান রাজরাণা কোটার প্রথম ঝালা ফৌজদার মাধো সিংহের বংশধর। ইনি ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ভূমিষ্ট হইয়াছেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি আজমীরের মেয়ো কলেজে অধ্যয়ন করিতে গমন করেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে উক্ত কলেজ পরিত্যাগ করেন। কলেজে অবস্থানকালে অধ্যয়নে এবং ক্রীড়ায় ইনি বিশেষ

প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকগুলি পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রীকেট প্রভৃতি খেলায় তিনি অসামান্য পটুতালাভ করিয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ঝালাওয়ারের বর্ত্তমান রাণা বাহাদুরকে জালিম সিংহের গদীর উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি গদীতে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে ভারতসরকারের রাজপুতানাস্থিত এজেণ্ট সার্ আর্থার মার্টিণ্ডেল সার্ শ্রীযুক্ত ভবানী সিংহ বাহাদুরকে রাজশাসনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করেন।

বর্ত্তমান মহারাজ গদীতে আরোহণ করিবার পরই ১৮৯৯—১৯০০ অব্দের ভারতব্যাপী ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাজরাণা বাহাদুর অত্যন্ত দক্ষতার সহিত স্বীয় রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর দুর্ভিক্ষজনিত ক্লেশের প্রশমন করিয়াছিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় রাজ্যে দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাবর্গের প্রাণরক্ষাকল্পে পূর্ত্তকার্য্য ও নিতান্ত আতুরদিগের সাহায্যকল্পে দরিদ্রাবাস খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানি করিয়াছিলেন। ঐ শস্য তিনি যুক্তপ্রদেশ হইতে যে মূল্যে খরিদ করিতেন, রাজ্যের কর্মচারীদিগকে ও জনসাধারণকে তাহা অপেক্ষা অনেক অল্প মূল্যে উহা বিক্রয় করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন প্রজাদিগের নিকট প্রাপ্য বকেয়া খাজনা বাবদ ৩ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬ শত ২৭ টাকা রেহাই দিয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে রাজরাণা বাহাদুর স্বীয় স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যুরোপে গমন করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ড এবং যুরোপের অন্যান্য দেশে পরিভ্রমণ করিয়া ঐ বৎসরের নবেম্বর মাসে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ইংলণ্ডেশ্বর বাকিংহাম প্রাসাদে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। রাজরাণা বাহাদুর যখন মোরিয়েনবাদে ছিলেন তখন সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ড সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত দেখা করিতেন এবং তাহাকে বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। রাজরাণা যখন যুরোপভ্রমণে গমন করিয়াছিলেন তখন মেজর বেন, তাঁহার সঙ্গে যাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহায়তায় রাজরাণা বাহাদুর যুরোপের যাহা দর্শনযোগ্য তাহা সমস্তই দেখিয়াছিলেন। এই ভ্রমণে তাহার অভিজ্ঞতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা তাহার জ্ঞানের পরিসর পরিবৃদ্ধ করিয়াছে। যুরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর এই ভূপতি বাহাদুর নানাদিকে আপনার প্রজাদিগের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।

রাজরাণা বাহাদুর যে যে বিষয়ে স্বীয় রাজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল;—

(১) রাজরাণা বাহাদুর সমস্ত ভারতীয় পোষ্টাফিসের সহিত নিজ রাজ্যের পোষ্টাফিসের একতাসাধন করিয়াছিলেন।

(২) তিনি স্বীয় রাজ্যে ইংরেজ রাজ্যে প্রচলিত মুদ্রা ও ওজন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

(৩) ঝালাওয়ার রাজ্যের আদালতে ও সরকারে নাগরী অক্ষরের প্রচলন করিয়াছেন।

(৪) ইহা ভিন্ন ঝালাওয়ার রাজ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর প্রবর্ত্তিত ছিল; উহা প্রজাদিগের বড়ই অসুবিধা জন্মাইতেছিল। রাজরাণা বাহাদুর ঐ কর সমস্তই উঠাইয়া দিয়াছিলেন।

রাজরাণা বাহাদুর একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি। শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার আগ্রহ অত্যন্ত অধিক। তাঁহার রাজ্যের রাজধানী জালারপট্টনে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় আছে, উহাতে অধ্যয়ন করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পাশ করা যায়। ইহা ভিন্ন মফঃস্বলেও কতকগুলি স্কুল আছে। বালিকা বিদ্যালয়ও অনেকগুলি বর্ত্তমান। ঐ গুলিতে হিন্দীভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদত্ত হয়। ইহা ভিন্ন বালিকা বিদ্যালয় ছাত্রীদিগকে সূচের কার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। সম্প্রতি রাজরাণা বাহাদুর ছওয়ানী রাজ্যের বালিকাদিগকে উচ্চশিক্ষা প্রদানের বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তিনি ঐ অঞ্চলের বিদ্যালয় সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। শিক্ষকদিগের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন এবং উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়টিতে একজন বিজ্ঞানশিক্ষক ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। রাজরাণার বিদ্যালয়গুলিতে এমন কি হাইস্কুলে ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মফঃস্বল স্কুলেও বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদিগকে পুস্তক ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হয়। অদূর ভবিষ্যতে রাজসরকারে যে সমস্ত নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার জন্য রাজরাণা বাহাদুর শিক্ষক প্রস্তুত করিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন সার্ ভবানী সিংহের প্রণোদনে ও প্ররোচনায় উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, এবং অন্যান্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সার্ শ্রীযুত ভবানী সিংহের পুস্তকপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক। তাঁহার নিজের একটি সুন্দর পুস্তককালয় আছে। সেই পুস্তকালয়ে নানা বিষয়ের পুস্তক রক্ষিত হইয়াছে। বিষয়ের বাহুল্যে ও পুস্তক নির্ব্বাচনের উৎকর্ষে সমস্ত রাজপুতানায় ইহার তুল্য পুস্তকাগার আর নাই। সাহিত্যক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সকল গ্রন্থকারের গ্রন্থই এই পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। বিখ্যাত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থের ভাল ভাল সংস্করণই উহার গৌরববর্দ্ধন করিতে। ভবানী সিংহ বাহাদুর স্বয়ং ঐ সকল পুস্তক বাছাই ও পসন্দ করিয়া তাঁহার পুস্তকাগারে

রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র এই ব্যাপারেই তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা কত অধিক তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজরাণা বাহাদুর বিলাতের রয়েল ইনিষ্টিটিউটের অন্যতম সদস্য; ইনি ভারতের য়্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি বা জ্যোতিষ সমিতির ভাইস প্রেসিডেণ্ট। ইহা ভিন্ন তিনি আজমীঢ়ের মেয়ো কলেজের, ইন্দোরের ডালি কলেজের ও রাজপুতানা যাদুঘরের পরিচালন সমিতিরও সদস্য।

যাহাতে ছওআনির অধিবাসী সর্দ্দার ও রাজপুরুষবর্গ সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করিতে অভ্যস্ত হইতে পারেন, তাহার জন্য রাজরাণা শ্রীযুত ভবানী সিংহ বাহাদুর রাজেন্দ্র লিটারারী ইনিষ্টিটিউট নামক এক পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রাজকুমারের নাম অনুসারেই উহার নামকরণ হইয়াছে। এই পরিষদের সদস্যগণ সাহিত্য, সমাজ অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা এবং আলোচনা করিয়া থাকেন।

স্বরাজ্য মধ্যে কৃষির উন্নতিসাধমোদ্দেশে রাজরাণা শ্রীযুত ভবানী সিংহ বাহাদুর একটি কৃষি ও ঔদ্যানিকী প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহার ক্ষেতের ও উদ্যানের উৎপন্ন জিনিস ভাল হয়, প্রতিযোগিতার হিসাবে সাধারণের সমক্ষে তাহাকে পারিতোষিক দেওয়া হইয়া থাকে। প্রজাবর্গ যাহাতে নানাপ্রকার দাইল কলাই, তরকারী, শাক সব্জী, ফল ফুল উৎপন্ন করিতে পারে, মহারাজের সেই দিকেই বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন পরিলক্ষিত হয়।

রাজরাণা বাহাদুরের কৃষি ও ঔদ্যানিক শিল্পে কিরূপ আসক্তি ও অনুরাগ তাহা তাঁহার কুঠীর উদ্যানগুলিতেই সুপ্রকাশ। ঐ উদ্যান অতি সুন্দরভাবে রচিত। পূর্ব্বে যেখানে বৃক্ষের শ্রেণী ছিল, এখন সেইখানে যেরূপ সুন্দর ও নয়নাভিরাম হরিৎক্ষেত্রে, লতাকুঞ্জ, গোলাপ কেয়ারী, টেনিস খেলিবার স্থান প্রভৃতি রচিত হইয়াছে, তাহাতে রাজরাণা বাহাদুরের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

যাহাতে প্রজাদিগের উন্নতিসাধিত হয়, ভবানী সিংহের সেইদিকে বিশেষ দৃষ্টি আছে। তিনি প্রত্যেক বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজপুরুষদিগের সহিত ঐ বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, এবং সে সম্বন্ধে সকলকে স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করিবার অবকাশ দেন। ঝালোয়ার সরকারের রাজপুরুষগণ যাহাতে সাধুতার ও যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্যপরিচালন করিতে পারেন, সেই জন্য তিনি তাহাদের বেতন যথাসম্ভব বর্দ্ধিত করিয়া দিয়াছেন। সরাসরি প্রজাবর্গের মনোভাব জানিবার জন্য তিনি ভ্রমণকালে স্বয়ং পটেল, গ্রামমুখ্য ও কৃষকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে সার্ শ্রীযুত ভবানী সিংহ K. C. I. E., এই উপাধিলাভ করিয়াছেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতায় দরবারে তিনি উহার চিহ্ন সনন্দাদিলাভ করিয়াছেন।
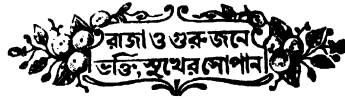
সনাতন হিন্দুধর্ম্ম।

[সম্পাদক।]

১০

সেবাবৃত্তি।

এখন একটা কথা, শূদ্রের ধর্ম্ম—সেবা। উর্দ্ধতন তিন জাতির পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শিল্পানুশীলনও শূদ্রের অন্যতর বৃত্তি। কুশিক্ষা শূদ্রের এই সেবাবৃত্তিতে দোষারোপ করিয়া জাতি বিদ্বেষের অনলে ইন্ধন যোগাইতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা শিক্ষার প্রভাবে, বুদ্ধি বিকৃতির ফলে, পূর্ব্ব হইতে এই সম্বন্ধে একটা কুসংস্কার পোষণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ভিন্ন অন্যে যদি নিরপেক্ষভাবে এই বিষয়টির অনুধাবন করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা ছিল; কাল সহকারে এবং সময়ে সময়ে সামাজিকগণের বিমূঢ়তার ফলে ইহার কিছু বিকৃতি ঘটিয়াছে। বিকৃত প্রতিষ্ঠান (institution) দেখিয়া অবিকৃত প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে গেলেই ভুল হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিক হইয়াই থাকে। কাজেই শূদ্রের এই সেবাবৃত্তির ব্যবস্থা দেখিয়া অনেক ভুল ধারণা করিয়া বসিতেছেন।

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিচার করিতে হইলে সমষ্টিভাবে সামাজিক হিতাহিতটাই বড় করিয়া দেখিতে হয়। সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের হিতাহিত ও সেই সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করিতে হয়। তবে ব্যষ্টির মঙ্গল অপেক্ষা সমষ্টির মঙ্গল বড়। ব্যস্ত অপেক্ষা সমস্তই প্রধান। একথা য়ুরোপীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা একবাক্যে স্বীকার করেন। তাই দেশশুদ্ধব্যক্তির জন্য দেশের কতকগুলি লোক সমরক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে। আর্য্য ঋষিরাও ইহা স্বীকার করিতেন। তবে আর্য্যঋষিরা ব্যস্ত (Individualistic) ভাবের সহিত সমস্ত (collective) ভাবের একটা সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা এই যে, প্রত্যেক লোক ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের মঙ্গলের পথে চলিবে, সমাজ তাহার সেই মঙ্গলের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবে।

এখন জিজ্ঞাস্য, এই মঙ্গল কি, অমঙ্গলই বা কি? হিত কাহাকে বলিব, অহিত বা কিসে বুঝিব? গোল এইখানে। আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তার সহিত প্রাচীন ভারতীয় চিন্তার গোলের গোড়াও এইখানেই। আধুনিক পাশ্চত্য চিন্তাশীলগণ ইহকালবাদী। অনেকে নামতঃ পরকালবাদী হইলেও কার্য্যতঃ পরকালের জন্য তত ব্যস্ত নহেন। পাশ্চাত্য মতে মঙ্গল অর্থে স্ফূর্ত্তি (pleasure) * অমঙ্গল অর্থে দুঃখ, বিষন্নতা (pain) প্রভৃতি। সংসারে যাহা করিলে আমার সুখ হয়, আমোদ হয়, খোসখেয়ালের তৃপ্তি হয়, দুঃখের বা যাতনার নিবৃত্তি হয়, তাহাই আমার মঙ্গল (good)। আর যাহাতে তাহার বাধা জন্মে তাহাই অহিত, তাহাই অমঙ্গল (evil)। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহাতে আমাদের আসক্তি তাহাই মঙ্গল, যাহাতে বিরক্তি তাহাই অমঙ্গল। † এই ধারণাবশেই পাশ্চাত্য সভ্যতার এই বিরাট সৌধ বিরচিত হইয়াছে। মানুষের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহা করাই এই সভ্যতার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য-পথে এই সভ্যতা যে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে, তবে তাহার ফলে মানুষ কতটা সুখী হইতে পারিয়াছে, সে কথা স্বতন্ত্র। এই সভ্যতা মানুষকে সুবিধার পথে যতটা অগ্রসর করিয়া দিয়াছে, পারত্রিকের পথে তাহার সহস্রাংশের একাংশও অগ্রসর করিয়া দিয়াছে কি না সন্দেহ। পাশ্চাত্য দর্শনে ঐহিক সুবিধার কথা, সাংসারিক আসক্তি বিরক্তির কথা যত বিষদভাবে আলোচিত হয়, পারত্রিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলামঙ্গলের কথা তত বিষদভাবে আলোচিত হয় না। পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের Beatitude আনন্দ বটে, কিন্তু সে আনন্দ ইদানীং এতই আকর্ষণশূন্য হইয়া পড়িয়াছে যে, কেহ সাংসারিক সুখের কথা ছাড়িয়া তাঁহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় না। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীরা মঙ্গল অর্থে পারত্রিক মঙ্গলই বুঝিতেন। তাহাদের মতে মানবের আত্মা অবিনশ্বর। সে ত্রিগুণে আবদ্ধ হইয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে। এই ত্রিগুণের বন্ধন ছেদন করাই তাহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। সেই দিকেই মানবমাত্রেরই সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হওয়া উচিত। সেই জন্য হিন্দু

---

* আমি pleasure অর্থে আনন্দ লিখিলাম না। আনন্দ শব্দটি উচ্চতর অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, আমি সেই অর্থে উহা ব্যবহার করিব বলিয়া উহাকে লৌকিক pleasure অর্থে ব্যবহার করিলাম না। অর্থাৎ লৌকিক হিসাবে pleasure অর্থে আনন্দ লিখিলে কোন ক্ষতি হয়, ইহা আমার মনে হয় না, কিন্তু পাছে বর্ত্তমান প্রবন্ধে দুই আনন্দের সংঘাতে পাঠকদের ঘোর নিরানন্দ ঘটে, তাই এই পরিবর্জ্জন।

† Good and evil are names that signity our appetites and aversions. Hobbes.

সমাজের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠানই পারলৌকিক পরিত্রাণ লক্ষ্য করিয়াই পরিকল্পিত হইয়াছে। অবশ্য ইহলোকের সুবিধাগুলি যে উপেক্ষা করিয়া ঐ সকল সামাজিক বিধি-নিষেধ, আচারানুষ্ঠান, নিয়মসংযম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নহে। উভয়ের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য করিয়াই ঐ সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই জন্য গুণাকুর্ম্মানুসারে এই জাতি বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে।

উদ্যানে যদি মালীর সতর্ক দৃষ্টি না থাকে, তাহাতে যেমন আগাছা জন্মে, আবদ্ধ গৃহে যেমন আবর্জ্জনা জুটে, সেইরূপ সদ্‌গুরুর সতর্ক দৃষ্টি না থাকিলে প্রত্যেক মানব সম্প্রদায়ে আবর্জ্জনা বা বদলোকের আবির্ভাব হইয়াই থাকে। অনেক সময় মালীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়াও দুই একটা আগাছা বাগানে আবির্ভূত হয়। সেইরূপ নানা-কারণে প্রত্যেক জাতিতে দুষ্টলোক জন্মে। তাহাদিগকে সেই জাতির আবর্জ্জনা (wastrels) বলা যাইতে পারে। এই সকল দুষ্টলোক বা সামাজিক আবর্জ্জনাকে ঋষিরা শূদ্র-শ্রেণীতে স্থান দিতেন। উচ্চতর তিন শ্রেণীর আবর্জ্জনা লইয়াই শূদ্রশ্রেণী গঠিত। সেই জন্য বেদ বলিয়াছেন, অসৎ হইতে শূদ্রের উদ্ভব হইয়াছে। ভৃগু-ভরদ্বাজ-সংবাদে ভৃগু বলিয়াছেন যে, যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসাপ্রিয়, মিথ্যাবাদী, লোভী অশুচি ও কুকর্ম্মী তাহারাই শূদ্র হইয়াছে। ফলে শূদ্রগণ সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত দ্বিজাতি। যাহাতে লোক ঐ জাতিতে অবনমিত হইতে ভয় পায়, যাহাতে সংসর্গজন্য শূদ্রজাতি সহজে উচ্চবর্ণে নিজ নিজ দোষ সংক্রমিত করিতে না পারে, সামাজিকগণ সর্ব্বাগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহার পর শূদ্রের যাহাতে উন্নতি হয়, ঋষিরা তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেবক প্রভুর অনেকগুণ পাইয়া থাকে। সর্ব্বদা সর্ব্বথা ছন্দানুবর্ত্তননিবন্ধন শূদ্র প্রভুর গুণের সহিত পরিচিত হইতে পারে। ইহাতে তাহাদেরও উন্নত হইবার প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষতঃ যিনি ধার্ম্মিক, যাঁহার চরিত্র ভগদ্ভক্তিতে আপ্লুত, তাঁহার সেবার অতি বড় পাপীর ও আত্মোন্নতি অবশ্যম্ভাবী। কারণ ভক্তিবৃত্তি বিশেষ সংক্রামক। সত্ত্বগুণ প্রধান ব্রাহ্মণমাত্রই অনন্যভক্তি সম্পন্ন হইতেন, কারণ তখন ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণ প্রধান ছিলেন। তখনকার ক্রূরকর্ম্মা শূদ্রে সেই ভক্তি যথাযথ প্রতিফলিত না হউক, উহা তাহাদের হৃদয়ে একটা তামসী ভক্তিরও উদ্ভব করিয়া দিত। কাজেই শূদ্রের এই সেবাবৃত্তির ব্যবস্থা শূদ্রেরও মঙ্গলসাধনকল্পে পরিকল্পিত হইয়াছিল।

সেবক।

কেবল ব্রাহ্মণ নহে, শূদ্র, তিন বর্ণের শুশ্রূষাকারক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তবে তাহাদিগের ব্রাহ্মণসেবাই প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তদভাবে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যসেবাই তাহাদের কর্ত্তব্য। ফলে আদৌ শূদ্রগণ বৈতনিক বা বেতনভুক চাকর ছিলেন। অর্থাৎ এখন যে চাকুরীর জন্য সকলে লালায়িত হইয়াছেন, পূর্ব্বে সেই কাজ শূদ্রেরই একচেটিয়া ছিল। কিন্তু চাকুরী করিয়া যদি শূদ্রের জীবিকা নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে শূদ্র শিল্প ও বাণিজ্য সেবা করিতে পারিবে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা তয়া জীবন্ বণিক ভবেৎ।
শিল্পৈর্ব্বা বিবিধৈ র্জীবেদ্ দ্বিজাতিহিতমাচরন্ ॥

সুতরাং শূদ্রের কেবল চাকুরীই বিহিত হয় নাই, স্বাধীনভাবে শিল্প বাণিজ্যের সেবাও বিহিত হইয়াছে। ফলে শূদ্রের আত্মোন্নতি করিবার পথও প্রশস্ততর করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এবং একথাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের ন্যায় সত্ত্বগুণ প্রধান হয়, তাহা হইলে সে ব্রাহ্মণ তুল্যই সম্মানভাজন হইয়া থাকে। বিদুরের সম্মান অনেক ব্রাহ্মণের সম্মান অপেক্ষা হীন ছিল না।

আজকাল যাঁহারা য়ুরোপে জাতীয় উন্নতিসাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহারা কুকর্ম্মীদিগের বংশলোপের ব্যবস্থা দিতেছেন। কিন্তু তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতেছে না। তাঁহারা পাত্র পাত্রীবিশেষের মধ্যে বিবাহ নিবদ্ধ করিতে চাহেন। কুল ও বংশ দেখিয়া বিবাহ ব্যবস্থা করিতে চাহেন। ফলে য়ুরোপীয় Eugenistরা যে ভাবে ভবিষ্যজাতির উন্নতি বিধান করিতে চাহেন, তাহা অনেকটা বর্ণবিভাগেরই অনুরূপ। সেই জন্য বেলফাষ্ট হইতে জে এ লিণ্ডসে বিলাতের একখানা বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"Caste is a word of somewhat sinister significance, but no cautious observer will pronounce the caste system of the East as wholly evil. Neither is it wholly good, only biology, on which Eugenics rests can draw the line accurately between the evil and the good." জাতি এই শব্দের একটা বেয়াড়া ধ্বনি আছে, কিন্তু যাহারা সতর্কভাবে সকল বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখেন, তাঁহারা উহাকে সম্পূর্ণ মন্দ বলিতে পারেন না। উহাকে সম্পূর্ণ ভালও বলা যায় না, কারণ জাতীয় উন্নতিবিধান শাস্ত্র যে প্রাণিতত্ত্ববিদ্যার নিয়মগুলির উপর নির্ভর করে, সেই প্রাণিতত্ত্ব বিদ্যাই কেবল এই বিষয়ের ভাল ও মন্দের বিচার করিতে পারে।" সুপণ্ডিত লিণ্ডসে যাহা বলিয়াছেন, একজন বিদেশীর নিকট হইতে তাহার অধিক আশা করা যায় না। বর্ত্তমানে জাতিভেদ প্রথা যে আকারে আছে, তাহাতে উপরে উপরে তাহা দেখিয় একজন বিদেশীর পক্ষে ভুল বুঝা বিস্ময়ের বিষয় নহে। সমাজপতিগণের সতর্ক দৃষ্টির অভাবে এবং কুশিক্ষার প্রভাবে প্রত্যেক জাতি হইতে আবর্জ্জনাগুলি বহিষ্কৃত করা হইতেছে না। সংস্কারাভাবে জাতীয় কুসুমকাননে বিস্তর কণ্টকগুল্ম জন্মিয়াছে। বাঙ্গা-লায় যেমন কৌলিন্য প্রথা বিকৃত হইয়া ব্রাহ্মণজাতিকে

অধঃপাতিত করিয়াছে ও করিতেছে, অন্যান্য দেশেও ঐরূপ এক একটা প্রথা বিকৃত হইয়া জাতি ব্যবস্থার সর্ব্বনাশ সাধিত করিতেছে। কাজেই স্থূলভাবে বর্ত্তমান জাতিভেদ দেখিলে একজন বিদেশীর ভ্রম ঘটিবার বিশেষ সম্ভাবনা। জাতিভেদের মৌলিকবিধি প্রকৃতিপ্রণীত সনাতনী ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রভাবে বিভ্রান্ত হইয়া কেহ কেহ (শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে) মনে করেন, বর্ণাশ্রমীদিগের নিম্নবর্ণের সহিত বিশেষতঃ শূদ্রজাতির সহিত ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের ভোজ্যান্নতা নাই, ইহাতে শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের ঘৃণাও অবজ্ঞা সূচিত হয়। এই সংস্কারটি একেবারেই ভুল। এই কথাটা যাঁহারা বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। হিন্দুসমাজের গঠন ও জাতি-বিন্যাস, আধ্যাত্মিকতার বেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য efficiency বা fitness (যোগ্যতা) এর সহিত হিন্দুদিগের এই আধ্যাত্মিক যোগ্যতার ঠিক মিল হয় না। ত্রৈলঙ্গস্বামী, কাটিয়া বাবা, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতির সহিত জগদীশ বসু কেলভিন, লিষ্টার প্রভৃতির যে প্রভেদ হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চাত্য সমাজের সেই জাতীয় প্রভেদ। ইহার একের মহত্ব দেখিয়া অন্যের মহত্বের পরিমাপ করা যায় না। উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। পাশ্চাত্য মনীষীদিগের যে যোগ্যতা তাহা সহভোজনাদিতে সহজে ক্ষুণ্ণ না হইতেও পারে, কিন্তু তথাপি তাঁহারা দুষ্ট প্রকৃতি নীচস্বভাব লোকের সহিত মেশামেশী করেন না। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক যোগ্যতা পরিপক্কতা লাভ না করিলে, উহা নীচ সংসর্গে পরিম্লান হইয়া যায়। এখানে নীচ অর্থে যাহারা আধ্যাত্মিকতার পথে অগ্রসর নহেন। কজেই আহারে বিহারে কুসংসর্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনই শাস্ত্রের বিধান হইয়াছে। এই জন্যই শূদ্রান্ন ভোজন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

যদি ঘৃণা বা অবজ্ঞাই ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রান্নভোজন নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে ব্রাত্য ব্রাহ্মণের অন্নগ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন? কত প্রকার ব্রাহ্মণের অন্নভোজন করিতে নাই, তাহা দেখুন ;—

বর্জ্জয়েৎ পরশয্যাদি ন চান্নীয়াদনাপদি।
কদর্য্য বর্দ্ধৈবরাণাং তথাচানগ্নিকস্য চ

* * * * * * *

ক্রূরোগ্র পতিত ব্রাত্য দাম্ভিকোচ্ছিষ্ট ভোজিনাম।
শাস্ত্রবিক্রয়িণশ্চৈব স্ত্রীজিত গ্রামযাজিনাম্।

গরুড় পুরাণ। পূর্ব্ব ৯৬

পরশয্যায় শয়ন করিবে না ; নিতান্ত বিপদে না পড়িলে কদর্য্য অন্ন, শত্রুর অন্ন ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের অন্ন খাইবে না ; ক্রূর, উগ্র স্বভাব, ব্রাত্য, পতিত, দাম্ভিক, উচ্ছিষ্ট ভোজী, শাস্ত্র বিক্রয়কারী, স্ত্রৈণ এবং গ্রামযাজী ব্রাহ্মণের অন্ন খাইবে না।" অপিচ যে ব্রাহ্মণ বেশ্যাদিগকে দীক্ষা দেয় তাহার অন্নও খাইতে নাই। এমন কি পতিত ব্যক্তি (ব্রাহ্মণও বাদ নহে), কর্ত্তৃক দুষ্ট অন্ন পর্য্যন্ত খাওয়া নিষিদ্ধ। শূদ্রের প্রতি ঘৃণার জন্য যদি ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রান্নভোজন নিষেধের কারণ হইত, তাহা ব্রাহ্মণের পক্ষে পতিত ব্রাহ্মণের অন্নভোজন নিষিদ্ধ হইল কেন? বরং সময় বিশেষ ব্রাহ্মণের পক্ষে সাধু ও শুচি শূদ্রের অন্নভোজন বিহিত হইয়াছিল, যথা ;—

শূদ্রেষু দাসগোপালঃ কুলমিত্রার্দ্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ।

শূদ্রের মধ্যে দাস, গোপ, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, নাপিত এবং যে সকল শূদ্র সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের অন্নভোজন করা যায়।

কলির ধর্ম্মপ্রবক্তা পরাশরও বলিয়াছেন ;

দাসনাপিতগোপাল কুলমিত্রার্দ্ধ সীরিণঃ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥

শূদ্রের মধ্যে দাস, নাপিত, গোপাল, কুলমিত্র এবং অর্দ্ধসীর এই কয়জনের অন্ন ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে পারেন। তবেই বুঝা গেল যে, যে সকল শূদ্রের সহিত কৌলিকমিত্রতা আছে ; এবং যাহারা সর্ব্বথা ব্রাহ্মণের আশ্রিত ও অনুগত তাহাদের অন্ন খাইতে ব্রাহ্মণের বাধা নাই। ইহাতে ইহা বুঝিতে হইবে না, যে অনাচারী ও অশুচি শূদ্র যদি কুলমিত্র বা একান্ত অনুগত হয়, তাহা হইলে তাহার অন্ন খাওয়া যায়। শৌচাচার সম্পন্ন শূদ্রই ব্রাহ্মণের কুলমিত্র বা অনুগত ও আশ্রিত হইয়া থাকে। কাজেই তাহাদের অন্ন ভোজ্য।

কিন্তু কলির প্রারম্ভে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধবিপ্লবের পর, মনীষীরা ব্যবস্থা পূর্ব্বক ঐরূপ শূদ্রান্নভোজন নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৌদ্ধবিপ্লবের সময় যে একাকার হইবার শঙ্কা হইয়াছিল, তাহা পরিহার করিবার জন্য এইরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইয়াছিল। ঐরূপ শূদ্রান্নভোজনে সম্ভবতঃ সমাজে নানাবিধ কুফল ফলিয়াছিল বলিয়া পরবর্ত্তীকালে উহা নিষিদ্ধ হয়। সুতরাং উহা এখন প্রবর্ত্তনা করা সঙ্গত নহে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ শূদ্রের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ বা অবজ্ঞাবশতঃ তাহাদের অন্নভোজন নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিশ্বাস সত্য নহে। ব্রাহ্মণগণ নিজের পরিবারবর্গের সহিতই একত্র ভোজন করেন না। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ব্যাসদেব বলিয়াছেন ;—

অপোক পঙ্‌ক্তৌ নাশ্নীয়াৎ সংবৃতঃ স্বজনৈরপি
কোহি জানাতি কস্যাস্তে প্রচ্ছন্নং পাতকং মহৎ॥

আত্মপরিজনের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করা উচিৎ নহে ; কারণ কাহার শরীরে কিরূপ পাতক প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা কে বলিতে পারে? ইহাতে বুঝা যায় যে, হিন্দুরা সহভোজন সম্বন্ধে কতটা সাবধান ছিলেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত ব্যক্তিরা বলিতে পারেন যে, ইহা প্রাচীন আর্য্যগণের একটা উৎকট কুসংস্কার। আধ্যাত্মিক শক্তি এত ভঙ্গুর নহে যে, অন্য পাতকীর সান্নিধ্যবশতঃ তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। একথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা নিতান্তই নির্ব্বোধ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রকৃতি জীবকে ত্রিগুণে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন। তন্মধ্যে সত্বগুণের দিকে আকর্ষণ অতি অল্প। সাধারণ মানুষের রজস্তমোগুণের দিকেই আকর্ষণ অত্যন্ত অধিক। অধিকাংশ মানুষ যদি বাধা না পায়, তাহা হইলে তাহারা ঘোর বর্ব্বরে পরিণত হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি ঋপু, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বৃত্তি যে কত প্রবল, তাহা সকলেই বুঝেন। পাহাড় অঞ্চলে উন্নত চড়াইতে উঠিতে গোরু বা ঘোড়ার গাড়ীর যেরূপ কষ্ট হয়, এই সকল তামসিক বৃত্তি দমন করিয়া আধ্যাত্মিকতার সমুন্নত শিখরে উঠিতে মানুষের সেইরূপ কষ্ট হয়। কিন্তু একবার উহার শীর্ষদেশে উঠিলে আর পতনের শঙ্কা থাকে না। সেই জন্য সিদ্ধ সাধু সন্ন্যাসীরা যাহার তাহার অন্ন-ভোজন করিয়া থাকেন, কাহারও সঙ্গ করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। কারণ তাঁহাদের সঙ্গফলে পাপীর পাপই ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবার উৎরাইতে যেমন চক্রযুক্ত যানাদি সহজেই নিম্নদিকগামী হয়, অবনতির দিকে মানুষ তেমনই সহজে ধাবিত হয়। তাহাতে কিছুমাত্র প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। সেই জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী ব্যক্তির খুব সাবধানে থাকা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, য়ুরোপীয়গণ ভোজনাদি বিষয়ে অত শুচিবায়ুগ্রস্ত নহেন, কিন্তু সে জন্য তাঁহাদের উন্নতির কোন বাধা জন্মিয়াছে কি? আমার বিশ্বাস, ইহার জন্য য়ুরোপের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অন্যান্যদিকে য়ুরোপ যত উন্নতি করিয়াছে, তাহার অনুপাতে য়ুরোপের কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় নাই। সত্য বটে, য়ুরোপে দুই এক জন আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প; এবং আধ্যাত্মিকতায় তাঁহারা বিশেষ সমুন্নত বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপীয়গণ মধ্যেও শুচি ব্যক্তিরা অশুচি ব্যক্তিদিগের সঙ্গে সহভোজন করেন না, পূতচরিত্র ব্যক্তিরা পাপীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করেন না। তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন,—The carnal mind is enmity against God. নীচমনা বা তামস প্রকৃতির লোক ভগবানের শত্রু। But thou oh man of God flee these things. হে ঈশ্বর পরায়ণ ঐ সকল (কুসঙ্গ প্রলোভন প্রভৃতি) হইতে দূরে থাকিবে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মোপদেশেও পাপীর সঙ্গ পরিহার করিতে বলা হইয়াছে।

অবশ্য শূদ্রের মধ্যেও পরমধার্ম্মিক ও সাত্বিক প্রকৃতির লোক আছেন। তাঁহারা গুণতঃ ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্মণতুল্য। তাঁহাদের সঙ্গ দোষনীয় নহে, তাহাদের প্রদত্ত অন্নও অভোজ্য নহে। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে বকধার্ম্মিক হইতে প্রকৃত ধার্ম্মিক চেনা কঠিন হইয়া পড়ে। সেই জন্য যাঁহারা আধ্যাত্মিক উন্নতিকামী তাহাদের পক্ষে ভোজনাদি ব্যাপারে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ এক জাতীয় দুই জন ব্যক্তির মধ্যে এক জনের সহিত ভোজ্যান্নতা করিয়া অন্য জনের সহিত তাহা না করিলে অনেক সময় অকারণ শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই জন্য গৃহস্থের পক্ষে সামাজিক হিসাবে ঐরূপ অনুষ্ঠান অসুবিধাজনক। তবে বিপদে পড়িলে শূদ্রান্ন ভোজন দুষ্য নহে। পতিত, ব্রাত্য, কুকর্ম্মী ব্রাহ্মণের অন্নও ধার্ম্মিক শূদ্রের পক্ষে প্রশস্ত নহে। য়ুরোপীয়রা অন্নদোষটা স্বীকার করেন না, আমরা করি। তাহার কারণ য়ুরোপীয়রা আধ্যাত্মিক দিকটাতে একেবারেই নজর দেন না বা গণনার মধ্যে আনেন না।

অনেকের বিশ্বাস, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিলাভ করিলে, প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়। ইহা একটা প্রকাণ্ড ভুল। প্রতিভা ও আধ্যাত্মিকতা এক কথা নহে। বুদ্ধির কসরৎ দেখিলেই আধ্যাত্মিকতার পরিচয় দেওয়া হয় না। সাধক তুলসীদাস বলিয়াছেন;—

পোঁথি পড়ি পড়ি জনম গয়ো।
পণ্ডিত না ভয়া কোই॥
এক অক্ষর প্রেম্‌কি পাওয়ে।
পণ্ডিত রহা হায় সোই॥

আসল কথা, ধর্ম্মসাধন হইতেই ঈশ্বরের মহিমা অনুভূত হয়, ঈশ্বরের মহিমার অনুভূতি হইতেই প্রকৃত ভক্তি জন্মে। সাংসারিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট আছে সত্য, যাঁহাদের তাহা আছে, তাঁহারা সম্মানার্হ সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার হিসাবে তাঁহাদের ঐ গুণ একেবারেই নগণ্য। স্যাণ্ডোর বলকে আমরা প্রশংসা করি, লিষ্টারের প্রতিভারও আমরা সম্মান করি; কিন্তু তাই বলিয়া স্যাণ্ডোর বল থাকিলে, যে লিষ্টারের প্রতিভা থাকিতে হইবে, একথা অতি বড় বোকাও বলে না। সেইরূপ মানসিক বল ও আধ্যাত্মিকতা শক্তি এক নহে, এক পর্য্যায়েরও নহে। উভয়ের চক্ষুর জ্যোতিঃ ও বাহ্য চেহারাই স্বতন্ত্র। মানসিক শক্তিশালী ব্যক্তির নয়নের দীপ্তি যেন সদাই প্রোজ্জ্বল। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক শক্তিশালী ব্যক্তির দৃষ্টি সাধারণতঃ অন্তর্মুখী; হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় যেন নেশায় আচ্ছন্ন। কিন্তু সে দৃষ্টি যাহার উপর নিপতিত হয়, সেই যেন কোন্ অজ্ঞাত শক্তিতে মুগ্ধ ও বশীভূত হইয়া পড়ে। মানুষ ত দূরে থাকুক, সাধুর দৃষ্টিতে বন্যপশু পর্য্যন্ত বশ হইয়া থাকে।

জাতি বিভাগ বা বর্ণ বিভাগ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা এই যে, আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন কল্পেই আর্য্য ঋষিরা জাতিভেদ

প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। এই জাতিভেদের সহিত বৃত্তিভেদও বিহিত হইয়াছিল। সমাজে যাহাতে অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ না করে, বৃত্তি লইয়া জাতিতে জাতিতে যাহাতে দ্বন্দ্ব না বাধে, প্রত্যেক জাতি যাহাতে নিজ নিজ বৃত্তিতে স্বস্থ ও সুস্থ থাকিয়া সাংসারিক উন্নতিসাধন করিতে পারে, হিন্দু সামাজিকগণ তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। কাল সহকারে শূদ্রজাতির মধ্যে কেহ উন্নত কেহ বা অবনত হইয়া পড়ে। তদনুসারে শূদ্রও নানাভাগে নানা থাকে, বিভক্ত হয়। সেই জন্য উত্তরকালে সামাজিকগণ বিভিন্ন জাতীয় শূদ্রের ও বিভিন্ন বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। আর সেই বৃত্তির দ্বারা যাহাতে তাহাদের চলে, যাহাতে সমাজে তাহাদের পণ্য কাটে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছে। গ্রহণ, অশৌচ প্রভৃতি উপলক্ষে হাঁড়ি ফেলিলে যেমন গৃহস্থের মঙ্গল হয়, সেইরূপ কুম্ভকারের পণ্যও বিকায়। শ্রাদ্ধে, ষষ্ঠীপূজায় ও অন্যান্য কতকগুলি মাঙ্গলিক কাজে ডোমের সাজেরও প্রয়োজন হয়। আধ্যাত্মিকতার সহিত অর্থনীতির এমন সুবন্দোবস্ত আর কোন জাতিই করিতে পারে নাই। পক্ষপাতশূন্য হইয়া একটু নিবিষ্ট চিত্তে উহা অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই সত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হইবে।

সংসার-চিত্র।

[জনৈক বঙ্গবাসী।]

(২)

সূতিকাগার হইতে যে দিন শিশু বাহির হইল, সেই দিন হইতেই সে সংসারের এক জন। কেবল যে জননী তাহাকে দেহরসে পুষ্ট করেন তাহা নহে, পরন্তু সে সংসারের স্ত্রীপুরুষ সকলেরই স্নেহরসে পুষ্ট হয়। সংসারে অভিজ্ঞতার মত মূল্যবান আর কিছুই নাই—সে অভিজ্ঞতা প্রথম প্রসূতির পক্ষে সুলভ হইতে পারে না। পুঁথিগত বিদ্যার সমাদর কোন দিন এ দেশে ছিল না। এখন পুরুষ সমাজে তাহার কিছু আদর হইয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষণশীলতার শেষ আশ্রয় ও আমাদের গৃহের কেন্দ্র অন্তঃপুরে এখনও কিতাবতি শিক্ষার সমাদর নাই। বাটীর গৃহিণীরা দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় শিশুপালনসম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহা অমূল্য। দুঃখের বিষয় আমরা সেই অমূল্য সম্পদে বঞ্চিত হইতেছি। আমরা ইচ্ছা করিয়া অবহেলায় তাহা হারাইতেছি। সে জ্ঞান পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ফল। যাঁহারা বিলাতী বুদ্ধি লইয়া আমাদের সমাজের ও সামাজিক ব্যবস্থার বিচার করিতে বসেন, তাঁহারা যে পদে পদে ভ্রান্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেন না তাঁহারা আমাদের সমাজের ও সংসারের স্বরূপ বুঝেন না। আমাদের সংসারের শক্তির ও পবিত্রতার উৎস অন্তঃপুর। অথচ তাঁহারা অনায়াসে বলেন, আমরা নারীর মর্য্যাদা বুঝি না। আমরা নারীর মর্য্যাদা যত বুঝি তত আর কোন্ সমাজের লোক বুঝেন, বুঝিতে পারি না। একটা কথা বলিতে পারি—আর কোন জাতির বিধানে স্ত্রীহত্যা পুরুষহত্যার অপেক্ষা অধিক পাপজনক বলিয়া লিখিত হয় নাই। আমাদের দেশেই উক্ত হইয়াছে—ধর্ম্মাচরণ পত্নীকে লইয়া করিতে হয়। রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠানকালে তাঁহাকে সেই স্বর্ণপ্রতিমার স্বর্ণময়ী প্রতিমা গঠিত করিয়া লইতে হইয়াছিল। যিনি যৌবনে হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও হিন্দুসংসারে হিন্দুনারীর শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

আমাদের সংসারে শিশুর লালনপালনভার প্রধানতঃ গৃহিণীদিগের উপর। হিন্দুসংসারে গৃহিণী বালিকা বধূকে বালিকা বয়স হইতে তাঁহার সংসারের উপযোগী শিক্ষায়

শিক্ষিত করিয়া ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত অল্পশ্রমসাধ্য কার্য্যের ভারগ্রহণ করেন—শিশুপালন সে সকলের অন্যতম। সে কার্য্যে তাঁহাদের কত আনন্দ! এই গৃহিণীদিগের মধ্যে আবার পরিবারের বিধবারা থাকেন। হিন্দুবিধবা হিন্দু-গৃহের দেবী। তাঁহারা পরার্থে সর্ব্বস্ব উৎসৃষ্ট করেন। সংসারে দেবসেবা ও পরিজনগণের সেবাই তাঁহাদের জীবনের কার্য্য। তাঁহাদের পবিত্র আদর্শে পরিবারের সকলেই অনুপ্রাণিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা হিন্দুবিধবার জন্য কপট বিলাপ করেন, তাঁহাদের যদি হিন্দুবিধবার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা থাকিত, তবে তাঁহারা বলিতেন—জগতে তেমন আদর্শ আর কোথাও নাই।

শিশু অঙ্কে অঙ্কে আদরে বর্দ্ধিত হয়। পিতামাতার আদর—ভ্রাতাভগিনীর আদর—পিতামহ-পিতামহীর আদর—স্বজনগণের আদর শিশুকে প্লাবিত করিয়া দেয়। মা তাহাকে কত আদর করেন—কত জিনিষ দেখান। কখন বা তাহাকে অঙ্কে রাখিয়া চন্দ্র দেখাইয়া চন্দ্রকে বলেন—"চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।"—

চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিয়ে যা।

মা তাহাকে দোলনায় দোলাইয়া ঘুম পাড়ান। মেয়েকে দোল দিবার সময় বলেন,—

"দোল দোল দোলনী
রাঙা মাথায় চিরুনী
বর আসবে এখুনী
নিয়ে যা'বে তখুনী।"

কবে কন্যা স্বামীর ঘর করিতে যাইবে সেই চিন্তায় মাতৃহৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে—বুঝি নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠে। তখন তিনি আবার আপনাকে আপনি বুঝাইয়া শান্ত করেন,—

"কেন মিছে কেঁদে মর?
আপনি ভাবিয়া দেখ কা'র ঘর কর।"

দোল দোল।

শিশুচর্য্যার নিয়ম আছে। সেই সব নিয়মানুসারে পূর্ব্বে এ দেশে শিশুরা পালিত হইত। তখনও 'ধাত্রীশিক্ষার' ও 'মাতৃশিক্ষার' চলন হয় নাই। তখন গৃহে গৃহিণীরাই মাতৃ-শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। সে শিক্ষা কেতাবে কলমে হইত না—পাঠ মুখস্থ করিয়া হইত না। সে শিক্ষা হইত অভিজ্ঞতায় ও উপদেশে। এখন আর সে শিক্ষার আদর নাই। তাই "রোগবালাই"ও আমাদের বাড়ীতে বাড়ীতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কায়েম-মোকাম হইয়াছে। এখন আমরা শিশুকাল বৃদ্ধদিগেরও চিকিৎসার যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছি তাহাই অস্বাভাবিক। স্বভাবের নিয়ম, ব্যাধি যে স্থানে উৎপন্ন হয় তাহার ঔষধ তাহারই নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু আমরা টোটকা ত পরের কথা দেশীয় ঔষধ-মাত্রই পরিহার করিয়া বিদেশী ঔষধেরই আদর করি। সে ব্যবস্থাটারই পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। সে সব ঔষধ বিদেশের জলবায়ুতে পুষ্ট বিদেশী রোগীর উপর প্রয়োগযোগ্য হইলেই যে এ দেশে প্রয়োগযোগ্য হইবে এই ভ্রান্তধারণাই অনেক সময় আমাদের অনেক শোকের কারণ হয়।

ক্রমে ক্রমে শিশু আপনার হস্তপদে বললাভ করিতে আরম্ভ করে ও ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়া চলে।

হামাগুড়ি।

তখন শিশুকে লইয়া সদা শঙ্কা—সকলেই ব্যস্ত, কখন সে কোথায় যায়—পাছে পড়িয়া যায়। গৃহিণীরা বলেন, একটি শিশুর যত কাজ দুই জন যুবার তত কাজ নহে। কথাটা বড়ই সত্য। কারণ, শিশুকে সর্ব্বদা লক্ষ্য করিতে হয়, তাহাতে দৃষ্টির আড় করা যায় না; করিলে বিপদ ঘটিতে বিলম্ব হয় না। এই যে স্নেহ-সতর্ক দৃষ্টি ইহাই পরে সংসারের সর্ব্বত্র পতিত হইয়া সংসারে শৃঙ্খলার সঞ্চার করে।

শিশু যে হামাগুড়ি দেয়, তখন তাহাকে ঘুরিয়া বেড়াইবার সুযোগ দিতে হয়। কারণ, সে যত ঘুরিতে পায়, ততই বলিষ্ঠ হয়, ততই অঙ্গচালনার ফলে তাহার বলবৃদ্ধি হয়।

এইরূপে শক্তিসঞ্চয় করিয়া শিশু এক একটা অবলম্বন ধরিয়া দাঁড়াইতে শিখে অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে তাহার দাঁড়াইবার ক্ষমতা জন্মে।

তাহার পর সে চলিতে চেষ্টা করে। প্রথম প্রথম তাহার পাদক্ষেপ অনিয়মিত হয়—সে শত বার পড়িয়া যায়। কিন্তু সে শিক্ষার আরম্ভ। তখনকার কথায় বলে "টলি টলি

টলি টলি পা—পা।

পা—পা চলি চলি যায়।" দুই পদ অগ্রসর হইতে পারিলে তাহার কত আনন্দ! সে আনন্দ তাহার হাসিতে ফুটিয়া উঠে। আর তাহার সেই আনন্দের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয় তাহার পিতামাতার, পিতামহপিতামহীর, মাতামহমাতামহীর, পিসীমাদের মুখে। সে সকলেরই স্নেহের দুলাল।

স্বাস্থ্য কথা।

[সারকুলার রোড পর্দ্দাপার্কে পঠিত।]

সমবেত ভগিনীগণ,—

"কুড়ি বছরে বুড়ি"—এ কথাটি বোধ হয় শুধু বাঙ্গলা দেশেই প্রচলিত আছে—কারণ ইংরাজ মহিলারা এই বয়সে কিশোরী। শুধু এই চলিত কথাটি হইতেই আমাদের দেশের মেয়েদের স্বাস্থ্য কেমন, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

আমার স্পষ্টই ধারণা আছে যে, আমাদের দেশে অন্ততঃ বর্ত্তমান সময়ে ছেলেদের রীতিমত মানুষ করা হয় না। আমি এমন বলি না যে, সন্তানের পিতামাতা সন্তানকে খাইতে দেন না, বা পরিতে দেন না, বা বিদ্যালাভের জন্য অর্থব্যয় করেন না; আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, সন্তান মানুষ করিতে হইলে, যে কায়-মনো-বাক্যে সাধনা চাই, যে ঐকান্তিক যত্ন ও পরিশ্রম চাই, আমরা তাহার কিছুই করি না। ধরুণ না কেন, সন্তানকে খাওয়াইতে হয়, অতএব আমরা এলোমেলোভাবে কতকটা দুধের সঙ্গে কতকটা সাগু বা বার্লি মিশাইয়া খাওয়াইয়া থাকি। কিন্তু সে খাওয়ানর ফলে সন্তানের যথেষ্ট পুষ্টি হইতেছে কি না, মধ্যে মধ্যে তৌল করিয়া বা সন্তানের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইয়া কখনও সে সংবাদ লই না। ছেলেদের পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও আমরা ঐরকম করি; কখনও হয়ত গায়ে ৪।৫টা জামা দিই, এবং তাহার সঙ্গে মাথায় উলের টুপি দিই, অথচ পেট ও পা খোলা রাখি; যেন পেট ও পা শিশুর নহে,—অপরের। অথচ, এই পেটে ও গায়ে ঠাণ্ডা লাগার ফলে আমাশয়, উদরাময়, "লিভার" প্রভৃতি কত রোগ জন্মে। আমরা ছেলেকে লেখা পড়া শিখিতে দিই; কিন্তু কত বয়সে ছেলেদের কত ঘণ্টা করিয়া পড়া উচিত—এবং তাহার অতিরিক্ত পাঠে শিশুর কি অনিষ্ট হয়, সে সকলের ধার ধারি না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের দেশে ছেলেরা আপনিই মানুষ হইয়া উঠে, পিতামাতা খুব সামান্য ও সাধারণভাবেই নিজ নিজ ছেলেদের মানুষ করেন।

আমাদের দেশে ভাল করিয়া ছেলেদের মানুষ করা হয় না বলিয়াই, ছেলে বেলা হইতেই আমাদের ছেলেদের স্বাস্থ্য ভাল নহে। কাহারও বা বারোমাসই অসুখ লাগিয়া থাকে; কেহ বা চিরকালই রোগা ও ফ্যাঁসফেঁসে (রক্তশূন্য)। কৃমির দোষ, অরুচি, লিভারের দোষ; সর্দ্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদি একটা না একটা ছেলেদের লাগিয়া আছেই। ইহার উপরে ছেলেদের লেখা পড়ার চাপ আসিয়া জোটে। মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই, ছোট ছোট ভাই ভগ্নীদিগকে সারাদিন কোলে করিয়া বেড়ানর ফলে, তাহাদিগের কোমর পিঠ বাকিয়া যায়। কোমর পিঠের হাড় অত অল্প বয়সে নরম থাকার ফলেই এমন হয়।

তাহার পরে চৌদ্দ বৎসরে পড়িতে না পড়িতেই মেয়েদের বিবাহ হয়। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ও মনের যে কি অবস্থা হয়, তাহা এক কথায় বুঝান বড় কঠিন। শৈশবে দন্তোদগমের কাল যেমন কঠিন ও মারাত্মক, স্ত্রীলোকের পক্ষে ঋতু আরম্ভকাল তেমনি কঠিন কাল। ঐ সময়ে শরীরের সমস্ত বৃদ্ধির চাপ যেন জরায়ুর উপরে যাইয়া পড়ে; যে পুষ্টি সমস্ত শরীরে সমানভাবে ব্যাপ্ত হইয়া দেহের উন্নতি করিতে পারিত, রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতে পারিত—সেটা ষোল আনাই পুত্রের পোষণে ব্যয়িত হয়, জরায়ুর পোষণে সমস্তটা যায়, তাহার ফলে, বালিকা জননীর শরীর ও মন—এই দুইটিই সমানে ক্ষীণ হয়। এই রূপ শরীর ও মন লইয়া বালিকা শ্বশুরের বাড়ীতে যায়। নূতন পরিজনের মধ্যে থাকিয়া, আহারাদি, চলন, ফিরণ প্রভৃতি সর্ব্ব বিষয়ে অষ্টবন্ধনের মধ্যে বালিকাদের যে কি কষ্ট হয়, তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এই সময়ে বালিকার কি কর্ত্তব্য ও তাহাকে কি ভাবে রাখিতে হয় বা তাহার সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা খুব অল্প গৃহিণীরাই জানেন। তাঁহারা দেশাচার ও লোকাচার লইয়াই ব্যস্ত থাকেন। তাহার ফলে বাঙ্গালীর মেয়েরা অল্প বয়স হইতেই বাধক, রক্তভাঙ্গা প্রভৃতি ব্যরাম সংগ্রহ করিয়া বসে।

ইহার পরে পরে রমণীর স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যাহা ঘটে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। উপর্য্যুপরি সন্তান প্রসব ও তাহাদের লালন-পালনের পরিশ্রমে ততোধিক তাহাদিগের ভরণপোষণের দুশ্চিন্তায়—রমণীর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। অজীর্ণ, অম্লরোগ ও অপরাপর রোগে তাঁহারা প্রতিনিয়তই জীর্ণশীর্ণ হইতে থাকেন। এক কথায়, তাঁহারা জীবন্মৃত হইয়া সংসারে থাকেন। একান্ত শয্যাশায়িনী না হইলে অনেক সময়ে তাঁহার স্বামীও জানিতে পারেন না যে, স্ত্রীর ব্যারাম কি ও কোথায়।

এই রূপ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার কারণ কি? নিতান্ত ধনী-দিগের কথা ছাড়িয়া দিলে, বেশ বুঝা যায় যে, দারিদ্র্যই ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ। অর্থের সচ্ছলতা না থাকায়,—পুষ্টিকর খাবারের অভাব, উপযুক্ত দাসদাসীর

অভাব, স্বাস্থ্যকর বাড়ীর অভাব, তাহার উপরে দুশ্চিন্তার যোগ। কাজেই শরীর থাকে কেমন করিয়া? বলা বাহুল্য, অভাব মোচন করা সকলের সামর্থে ও ভাগ্যে কুলায় না; কিন্তু এমন কতকগুলি স্বাস্থ্যবিরুদ্ধ অভ্যাস আছে, যাহা সকলেরই পক্ষে ত্যাগ করা খুব সহজ।

একটা সতেজ গাছকে যদি ঘরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে অল্পদিনের মধ্যেই দুইটা ব্যাপার তাহাতে লক্ষিত হয়,—প্রথমতঃ, গাছের বৃদ্ধি কমিয়া যায় ও তাহার সবুজ পাতাগুলি হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে, এবং দ্বিতীয়তঃ, গাছের পাতা ও ডালগুলি জানালা দিয়া যে দিক হইতে রৌদ্র আসে, সেই দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। গাছের বিষয়েও যাহা খাটে, মানুষের বেলাও সেই নিয়ম খাটে। আমাদের মধ্যে অনেকের বাড়ী স্বভাবতঃই স্যাঁতসেঁতে; তাহার উপরে যদি উহাতে নিত্যই জল ঢালা যায়, তবে সে বাড়ী আরও খারাপ হইয়া উঠে। বাঙ্গালীর ঘরের গৃহস্থমেয়েদিগকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ আট ঘণ্টা নীচের তলায় স্যাঁতসেতে যায়গায় কাটাইতে হয়। একে স্যাঁতসেতে তাহার উপরে ধোঁয়া—এই দুইটিই শরীরকে খুব অল্পসময়ের মধ্যে খারাপ করে। ঘরের মধ্যে গাছ রাখিলেও যাহা হয়, রাতদিন স্যাঁতসেতে যায়গায় থাকিয়া, কয়লার ধোঁয়া খাইলেও ঠিক সেই ফল হয়। অতএব আমাদিগের কর্ত্তব্য এই যে— উনান ধরানর পরে সমস্ত ধোঁয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলে, তবে নিচে নামা উচিত; এবং ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, যখন-তখন, কারণে-অকারণে খানিকটা হুড় হুড় করিয়া জল ঢালা নিবারণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের বাড়ী এমনভাবে তৈয়ারি যে, তাহা হইতে সহজে ধোঁয়া বাহির হয় না, বা সে বাড়ীর স্যাঁতসেঁতে ঘুচান অসম্ভব, তাঁহাদিগের সে বাড়ী বদলাইয়া ফেলা উচিত। যদি তাহা অসম্ভব হয়, তবে তাহাদিগের উচিত খোলা ছাদে বা পার্কে রীতিমত দু'বেলা হাওয়া খাওয়া। পুরুষেরা অষ্টপ্রহর বাহিরে বাহিরে খোলা যায়গায় থাকেন ও রীতিমত দু'বেলা হাওয়া খান, রমণীদের জন্য তাহা যখনই সুবিধা হয় করা উচিত।

দিনের বেলা যে টুকু সময় বাঙ্গালী মেয়েরা অস্বাস্থ্যকর যায়গায় কাটান, তাহার "কাটান" স্বরূপ যদি তাঁহারা দু'বেলা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করেন এবং রাত্রিকালে জানালা দরজা খুলিয়া শোয়া অভ্যাস করেন, তাহা হইলে অনেকটা দোষ নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে অনেকের বদ অভ্যাস হইয়া আছে যে, রাত্রিকালে সমস্ত দরজা জানালা না বন্ধ করিলে, হাওয়া আসিবার সব পথরোধ না করিলে, নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পারি না! অথচ বেশীদূরে যাইবার প্রয়োজন নাই—মেডিকেল কলেজের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাইব, কি শীতে, কি গ্রীষ্মে, বারোমাস দিন রাত দরজা জানালা হু হু করিয়া খোলা থাকে. সেখানে নিউমোনিয়ায় কেহ মারা পড়ে না, পরন্তু যাহারা নিউমোনিয়া লইয়া যায়, তাহারা সারিয়া আসে।

আমাদের মধ্যে অনেকে দিনের মধ্যে দুই তিন বার কাপড় ছাড়েন বা কাচেন, কিন্তু সকল সময়ে পরিষ্কার কাপড় পরেন না। তেমনি, অনেকে প্রত্যহ পায়খানায় যাওয়ার অভ্যাসও রাখেন না, এমন এক এক জন আছেন যাঁহারা সপ্তাহে মাত্র একটি দিন পায়খানায় যান। প্রত্যহ বারম্বার পায়খানা যাওয়া যেমন একটা রোগ, বহুদিন অন্তর পায়খানা যাওয়া তেমনি একটা রোগ। সেটার চিকিৎসা করান অবশ্য কর্ত্তব্য।

আহারাদি সম্বন্ধেও আমাদিগের দোষ বা ত্রুটি অনেক। আমাদিগের মধ্যে একটা সাধারণ ধারণা আছে যে, মেয়েমানুষে—ভাল খাদ্য খাইতে নাই। সকলকে খাওয়াইয়া যাহা পড়িয়া থাকে বা অপেক্ষাকৃত শস্তার ও অপকৃষ্ট খাবার মেয়েদের খাইতে হয়। আমি এমন কথা বলি না যে, সংসারের সকলকে বঞ্চিত করিয়া, মেয়েদেরই দুধ ঘি খাওয়া উচিত, কিন্তু একটা স্পষ্টই বলি যে, যে রমণীর উপরে সমস্ত সংসারের ভার, যাঁহার স্বাস্থ্য—অস্বাস্থ্য বশতঃ সমস্ত সংসারে সুখ বা অসুখ ঘটিয়া থাকে এবং যাঁহার নিজ বুকের রক্ত দিয়া ভাবী বংশধরকে লালন-পালন করিতে হয়, তিনি যদি সংসারেরর ক্ষীর সর না খাইবেন, তবে কে খাইবে? পুষ্টিকর খাদ্যে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা দাবী বেশী। ক্ষমা করিবেন আমাকে ঔদরিক বলিয়া ভাবিবেন না। বেহায়া বলিলে নাচার। সত্যের অপলাপ করিয়া শস্তার বাহাদুরি কিনিতে চাই না।

পূজা আহ্নিক ও সংসার—এই দুইটি লইয়া স্ত্রীলোকদিগের সময়ে আহার করিবার অবকাশ জুটে না; তাহার ফলে—অবেলায় খাওয়ার অভ্যাস দাঁড়ায়। পিত্ত পড়িয়া অবেলায় ভোজন করিলে কখনও শরীর ভাল থাকে না। সেই অবস্থায় শিশুকে স্তনপান করাইলে শিশুর বিশেষ অপকার হয়।

অতিরিক্ত পান খাওয়া, দোক্তা খাওয়া, সুর্ত্তি খাওয়া— বাঙ্গালীর মেয়ের দাঁতের রোগের ও স্বাস্থ্যভঙ্গের অন্যতম কারণ। বেশী আঁটিয়া কাপড় পরাও অজীর্ণের প্রশ্রয় দেয়।

সাধারণতঃ স্ত্রীলোকদিগের "মাসিক" (আর্ত্তব) চারিদিন স্থায়ী হয়। অর্থাৎ যেমন স্পর্শ নিষিদ্ধ, তেমনি কায করাও নিষিদ্ধ; কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা আইনকে চোখ ঠারিয়া, সকল কায কর্ম্মই করিয়া থাকেন, এবং রক্ত যাউক, আর নাই যাউক, চতুর্থ দিনে স্নান করিয়া বসেন; এই অত্যাচারের ফলে বাধক প্রভৃতি রোগ জন্মে।

খুঁটি নাটি ধরিতে গেলে, এই রকমের আরও অনেক খুঁৎ ধরা যায়। এগুলি অতি সামান্য ভুলচুক হইলেও ইহাদের ফল নিতান্ত সামান্য নহে। কোনও লোক

কাহারও নিকটে দোষ করিলে, বরং কখনও সে ব্যক্তি স্বীয় উদারতা গুণে দোষীকে ক্ষমা করিতে পারে, অথবা গুরুপাপে লঘুদণ্ড দিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারে; এবং সকলেই সহস্রদোষে দোষী, শিশু ও রমণীকে ক্ষমা করে; কিন্তু প্রকৃতির পরিশোধ অতি ভয়ানক; একটা মহাযুদ্ধে যত না প্রাণিক্ষয় হয়, একটা মহামারিতে বা সংক্রামক ব্যাধিতে তাহার অধিক—অনেক অধিক লোক অল্প সময়ের মধ্যেই ধ্বংস হইয়া যায়! প্রকৃতির বিরুদ্ধে কায করিলে, তাহার ক্ষমা নাই, তাহার নিষ্কৃতি নাই, তাহার আংশিক মকুফও নাই, সুদ সমেত প্রকৃতি শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন; সুকুমার শিশু ও অবলা রমণী, দুর্ব্বল মানব ও জীর্ণ জীব সকলেরই উপর মমত্বহীন হইয়া প্রকৃতি শাসনদণ্ড হানিয়া থাকেন। তাই বলিতেছিলাম, প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়ম মানিয়া চলা উচিত।

সে নিয়মগুলি কি? ভগবান্ মুক্তহস্তে হাওয়া চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিয়াছেন। জানালা, সার্সি, পর্দ্দা প্রভৃতি অশেষ প্রকারে আমরা সেই হাওয়াকে আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি। তাহা না করিয়া, কি দিনে, কি রাতে সকল ঋতুতে সকল সময়ে যাহাতে আমরা জানালা দরজা খুলিয়া শুইতে পারি, সেরূপ অভ্যাস সকলেরই করা উচিত। অবসর মত, এরূপ পর্দ্দাপার্কে বা অন্যত্র হাওয়া খাইবারও ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। সাহেবেরা যেমনই গরিব হউন বা যেমনই অবস্থাপন্ন হউন, তাঁহারা প্রত্যহই প্রত্যেকে দু'বেলা বেড়ান, ক্লাবে যাওয়া, সাইকেল চড়া প্রভৃতি একটা না একটা করিয়া থাকেন।

অনেকের ধারণা আছে যে, অঙ্গচালনা বা যাহাকে ইংরাজীতে "একসার্‌সাইস" করা বলে, তাহা পুরুষেরই কর্ত্তব্য—অঙ্গচালনা করিলে স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্য ও অঙ্গসৌষ্টব নষ্ট হয়। এ ধারণাটিও অত্যন্ত মারাত্মক ধারণা। প্রকৃতির নিয়ম এই—যে খাইবে, সে খাটিবে—বিনা পরিশ্রমে বসিয়া খাইলে—হয় অম্বলের ব্যারাম, নতুবা কুদৃশ্য স্থূলতা, নতুবা লিভারের দোষ—একটা না একটা হয়ই। যে রমণীরা একটা না একটা ব্যায়াম করেন, তাঁহাদের অঙ্গসৌষ্টবের হানি হওয়া দূরের কথা, তাঁহারাই অতি সুঠাম হইয়া থাকেন। তাঁহাদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়—এ কারণে তাঁহাদের সাহসও বাড়ে। সাধারণ বাঙ্গালীমেয়ের স্থাবর পদার্থের ন্যায়—আত্মরক্ষায় একান্ত অপারক। এই কারণে রেলে যাতায়াত করা বাঙ্গালীমেয়েদের পক্ষে ক্রমশঃই বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। তাই বলিতেছিলাম, অন্যায় লজ্জা ত্যাগ করিয়া, প্রত্যেকরই উচিত অন্ততঃ দশ মিনিট-কাল নিজ নিজ কক্ষে বসিয়া যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তেমনি ভাবে অঙ্গচালনা করুন। অবশ্য সাইকেল চড়া, সাঁতার শিক্ষা করা, এগুলি আমাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত। কিন্তু, পর্দ্দাপার্কে দড়ি টানাটানি করা, (tug-of-war), দৌড়াইয়া দম বাড়ান, বৈঠককরা, পাঞ্জাকরা, এ সকলগুলি অনায়াসেই শনৈঃ শনৈঃ অভ্যাস করিতে আরম্ভ করা উচিত। ইহাতে লজ্জার কোনও কারণ নাই; বরং একটু অঙ্গচালনা করিলে, ভবিষ্যতে রমণীদিগের সন্তান সন্ততিদের বিশেষ উপকার হইবে। জল তোলা, বাটনা বাটা, বড় বড় হাঁড়ি লইয়া রন্ধনাদি করায় যথেষ্ট পরিশ্রম হয় বটে—কিন্তু এখন আমাদের মেয়েরা যে তাহাও করেন না! ক্রমশঃ কি আমরা সমস্ত মাংশপেশী (মাস্‌ল্) গুলিকে হারাইয়া চর্ব্বির ডেলায় পরিণত হইতে চাহি?

আহারাদি সম্বন্ধেও আমাদিগের একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে চাউল খাই, তাহা একেত সিদ্ধ, তাহার উপরে আমরা তাহার ফেন ফেলিয়া দিই। আমরা আলু খাই, তাহার খোসা বাদ দিয়া খাই। আমরা চাউল খাই—তাহাও অনেকটা জলে কয়েকটি ডাইলের দানা ছাড়িয়া দিয়া; আমরা মাছের আঁশ বই মাছ খাইতে পাই না। দুধ, ঘি সকলের না জুটিলেও, জঘন্য দোকানের মিষ্টান্ন প্রায় সকলেরই জোটে! আমাদিগের উচিত—ডালের বেশী ব্যবহার করা; বড়ি, বড়া, ডালভাতে, পাঁপর—এগুলি বেশী বেশী খাইতে অভ্যাস করা ভাল। সুবিধা ও সহমত খিচুড়ী খাওয়া খুব ভাল। ইহাতে ভাতের ফেণ নষ্ট হয় না, ইহার সঙ্গে ডাউল ও বেশী পরিমাণে খাওয়া হয়। সহ্য হইলে, আটা ময়দা অন্ততঃ এক বেলা ব্যবহার করা উচিত। আট নয় বৎসর পূর্ব্বে, কলিকাতায় যে, বেরি-বেরি নামক ভয়ানক ব্যারামের দেখা দিয়াছিল, তাহা এই খাদ্যের দোষে হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানীরা, যাহারা অন্ততঃ একবেলা আটা খায়, তাহাদিগের বেরি বেরি আদৌ হয় নাই; সাহেবেরা দুইবেলা মাংস ও পাঁউরুটি খায় বলিয়া, সাহেবদেরও ঐ ব্যারাম হয় নাই; গরীব দুঃখীরা মোটা চাল খাইত—তাহাদের মধ্যেও ঐ ব্যারাম কম হইয়াছিল; কিন্তু খুব ভাল করিয়া কলে ছাঁটা ও মাজা সরুচাল খাইয়াই বাঙ্গালী ভদ্রলোকরাই ঐ ব্যারামে ভুগিয়াছিলেন। চা'লকে বেশী করিয়া মাজিলে চা'লের অনেক অংশ বাদ পড়ে; সেই চাল খাইয়াই বেরি-বেরি হয়। তাই বলিতেছিলাম, খাবারের দিকে আমাদের খুব দৃষ্টি থাকা উচিত।

আমি আর আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইব না। আপনারা অনেকক্ষণ দয়া করিয়া কথাগুলি শ্রবণ করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি আপনাদের নিকটে কৃতজ্ঞ। মোটামুটি ভাবে দু'চার কথার আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য—আশা করি, আপনারা সকলে একে একে, একটি একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রসঙ্গ লইয়া আমাদিগকে অশেষ প্রকারের শিক্ষা দিবেন।

স্বাস্থ্য, শান্তি, সচ্ছল মানবের সুখ।

কামন্দকীয় নীতিসার। *

[শ্রীযুত গণপতি সরকার, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক লিখিত।]

প্রথম সর্গ।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়ের মধ্যে এক একটি বিষয়ের অনিষ্টকারিণী শক্তি।

প্রথমে শব্দের বিষয় উল্লিখিত হইতেছে। হরিণ পবিত্র ঘাসের অঙ্কুর ভোজন করিয়া থাকে, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ আহার পাইলেই সন্তুষ্ট; এবং সে অতি দূরদেশে বিচরণ করিতে সমর্থ; সুতরাং তাহার প্রাণবধের আশঙ্কাও সামান্য; তথাপি সেই হরিণ ব্যাধের বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে, সেই বাঁশীর বর শুনিবার লোভে আপনি আপনার মৃত্যু খুঁজিয়া লয়। ব্যাধের বাঁশী শুনিয়া হরিণ নিস্পন্দভাবে থাকে, ব্যাধও অবসর বুঝিয়া সুরে মুগ্ধ মৃগকে শরদ্বারা বধ করে। ইহারই নাম শব্দবিষয়ের পরিণাম-ফল ॥৪১॥

স্পর্শ-বিষয়ের কথা।

পর্ব্বতের চূড়ার মত দীর্ঘাকার, অবলীলাক্রমে বৃক্ষসমূহ উৎপাটনকারী হস্তীও (মনুষ্যের শিক্ষিত মোহিনী) হস্তিনীর স্পর্শ-মোহে বন্ধন প্রাপ্ত হয়। ইহা স্পর্শ-বিষয়ের সামর্থ্য ॥৪২॥

রূপ-বিষয়ের কথা।

স্নিগ্ধ দীপ-শিখার আলোক দর্শনে মোহিত হইয়া পতঙ্গ অগ্নিশিখায় নিঃসন্দেহে সহসা পতিত হয়, এবং মরিয়া যায়। ইহা রূপ-বিষয়ের শক্তি ॥৪৩॥

রস-বিষয়ের কথা।

দেখ, মৎস্য যেখানে থাকে, সেখানে কাহারও চক্ষু যায় না; এই মৎস্য অগাধজলে বিচরণ করে; দৃষ্টির অগোচরে থাকিলেও—অতল-স্পর্শ সলিলে সঞ্চরণ করিলেও এই মূঢ়মতি মীন মৃত্যুর জন্য টোপযুক্ত বঁড়শী আস্বাদন করে। ইহারই নাম রস-বিষয়ের সামর্থ্য ॥৪৪॥

গন্ধের বিষয়-নির্দ্দেশ।

মত্ত হাতীর মাতা ও শুড় হইতে যে জল পড়ে, তাহার নাম দান। এই দান-বারিতে মদের মত উৎকট গন্ধ আছে। এই গন্ধে লুব্ধ হইয়া মদজল পান করিবার ইচ্ছায় ভ্রমর সেই স্থানে গমন করে। মত্ত হস্তী দান-জল নিঃসরণকালে কান দুইটি সঞ্চালন করিতে থাকে। কানের সঞ্চালনে ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠে। তখন মধুকর মনে করে যে, সেই স্থানে সুখে সঞ্চরণ করিতে পারা যায়। গন্ধ-লুব্ধ-মধুকর, সুখসঞ্চরণযোগ্য, কর্ণ ঝন্ ঝন্ শব্দের নিকট যাইয়া শেষে কানের ঝাপটে প্রাণত্যাগ করে। ইহাই গন্ধ-বিষয়ের বিষময় পরিণাম ॥৪৫॥

বিষয়-সমূহের পরিণাম।

শব্দ প্রভৃতি এক একটি বিষয় বিষ তুল্য। বিষ তুল্য এক একটি বিষয়, জীবের প্রাণবধ করে। যখন একটি-মাত্র বিষয়সেবীর প্রাণনাশ অনিবার্য্য, তখন ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি এককালে বিষ তুল্য পাঁচটি বিষয়ের সেবা করে, তখন সে লোকের কি করিয়া মঙ্গল হইবে। ফলতঃ পঞ্চ-বিষয়সেবীর মঙ্গললাভ ও প্রাণরক্ষা সুদূর-পরাহত ॥৪৬॥

বিষয়সেবা ও কর্ত্তব্য।

জিতেন্দ্রিয় হইয়া বিষয়াশক্তি পরিত্যাগ করিয়া যথাকালে শব্দ স্পর্শাদি বিষয়-সমূহের সেবা করিতে হইবে। অকালে বিষয়-সেবা করিবে না, বিষয়-সেবার কালেই বিষয়-সেবা করা কর্ত্তব্য। বিষয়-ভোগেরও ফল আছে। বিষয়-সেবার ফলই সুখ। বিষয়ের ফলীভূত সুখের নিরোধ করিলে—বিষয়সেবা না করিয়া সুখের নিরাকরণ করিলে, সমস্ত ঐশ্বর্য্যই বৃথা হয়। রাজার ঐশ্বর্য্য—অসীম ঐশ্বর্য্যের ফল—সুখভোগ—এই সুখভোগও বিষয়সেবার করায়ত্ত। কিন্তু এই সুখফলপ্রসূ বিষয়সেবারও একটা কাল আছে। যখন তখন বিষয়সেবা করিলে সুখ হয় না ॥৪৭॥

বার্দ্ধক্যে বিষয়সেবা নিরর্থক। যৌবন-কালই বিষয়ভোগের উপযুক্ত সময়।

বৃদ্ধগণ বার্দ্ধক্যে নারীমুখ দর্শন করিতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখন আর সেই যৌবন নাই, যৌবনের তেজ নাই, সম্ভোগ করিবার সামর্থ্য নাই; তখন দুঃখে চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া যায়। এখন কেবল যৌবনের স্মৃতি আছে। তখন তাহাদের ঐশ্বর্য্য বিড়ম্বনা-ময়—থাকা না থাকা উভয়ই সমান। এই জন্য যৌবন-কালে বিষয়াভিলাষী হইবে ॥৪৮॥

যুক্তি পূর্ব্বক ত্রিবর্গ-সেবার ফল-নির্দ্দেশ।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম—ইহার নাম ত্রিবর্গ। সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইতে অর্থ, বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ধার্ম্মিক

পুরুষের অর্থলাভ অবশ্যম্ভাবী ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থ হইতেই কাম; অর্থাৎ অর্থশালী পুরুষ অর্থদ্বারা কাম্যবস্তু ভোগ করিতে সমর্থ। কাম হইতে সুখফলের উদয় হয়, লোকের কামনা পূর্ণ হইলে, অন্তঃকরণে সুখের বা আনন্দের আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি যুক্তি সহকারে এই ধর্ম্মার্থ-কামের বা ত্রিবর্গের সেবা করে না, অর্থাৎ বিপরীতভাবে ও অসময়ে ইহাদের সেবা করে, সেই ব্যক্তি ত্রিবর্গ বিনাশ করিয়া শেষে আপনাকেও বিনাশ করে। অসময়ে অবিবেচনা পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ কামের অনুষ্ঠান বা সেবা করা আত্মবিনাশের কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় ॥৪৯॥

নারী-সঙ্গের-দোষ।

"স্ত্রী"—কেবল এই আহ্লাদজনক নামটিও চিত্তকে বিকৃতই করিয়া থাকে। অতএব হাব-ভাব-লাবণ্যাদি যৌবনজ স্বাভাবিক অলঙ্কারদ্বারা, বিলাসবিভ্রমাদি শৃঙ্গার-চেষ্টাদ্বারা যখন রমণীর ভ্রূযুগল কামশরাসনের মত শোভা ধারণ করিয়া থাকে—যখন ভ্রূভঙ্গী পূর্ব্বক সকটাক্ষে নিরীক্ষণ করে, তখন সেই বিলাসিনী কামিনীকে দর্শন করিলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব; যাহার নামে চিত্তবিকার, তাহার দর্শনে যে কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটে, তাহা কল্পনাপথেরও অতীত ॥৫০॥

যে নারী নির্জ্জন স্থানে বিচরণ করিতে অত্যন্ত নিপুণ, যে নারী মৃদুস্বরে গদ্গদবাক্য বলে, এবং যে নারীর নয়ন-প্রান্ত রক্তবর্ণ, এইরূপ নারী কোন্ অনুরক্ত পুরুষকে আনন্দিত না করে? ফলতঃ নির্জ্জন স্থলে মৃদুভাষিণী রমণী সকটাক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, অনুরক্ত পুরুষ মোহিত হইয়া যায় ॥৫১॥

সন্ধ্যা (সন্ধ্যাকাল) যেরূপ চন্দ্রমণ্ডলকে নির্ম্মল এবং দীপ্তিশীল করে, সেইরূপ রমণী, (অন্যের কথা দূরে থাকুক) মুনির মনকেও টলিয়ে দেয় ॥৫২॥

বৃষ্টি-প্রবাহ যেরূপ দৃঢ়কায় পর্ব্বত সমূহের ভেদ সাধন করে, সেইরূপ মনের প্রফুল্লতাকারিণী এবং মত্তকারিণী রমণীও উদারচেতা মহাত্মাদিগকে অত্যন্ত বিদীর্ণ করে অর্থাৎ মনীষিগণের চিত্তও রমণীতে অতিমাত্র আসক্ত হয় ॥৫৩॥

কতিপয় ব্যসনের নিন্দা।

মৃগয়া (পশুবধ ব্যাপার), অক্ষ (পাশা খেলা), এবং পান (মদ্যপান), এই তিনটি রাজাদিগের নিষিদ্ধ। কারণ, মৃগয়াদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে রাজ্যশাসন হয় না, রাজত্বের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়; শেষে রাজ্যধ্বংসও ঘটে। এই মৃগয়া প্রভৃতি ব্যসন হইতে পাণ্ডু, নিষধাধিপতি মহারাজ নল এবং মহীপতি বৃষ্ণির যথেষ্ট বিপদ্ দেখা গিয়াছে ॥৫৪॥

ষড়্বর্গ-পরিত্যাগের উপদেশ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, ঈর্ষা, মান (অভিমান) এবং মদ (গর্ব্ব) এই ছয়টির নাম ষড়্বর্গ। অনিষ্ট কারক এবং ভীষণ শত্রু স্বরূপ, এই ষড়্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই ষড়্বর্গ পরিত্যক্ত হইলে, ভূপতি সুখী হন। অর্থাৎ যতকাল কাম-ক্রোধাদি ষড়্রিপুর অস্তিত্ব থাকিবে, যতকাল না এই সকল রিপুর দমন করা হইবে, ততক্ষণ রাজার সুখের সম্ভাবনা নাই ॥৫৫॥

ষড়্বর্গ সেবনের বিষময় ফল।

রাজা দণ্ডক কাম হেতু, রাজা জনমেজয় ক্রোধ হেতু, রাজর্ষি ঐল লোভ হেতু, বাতাপি নামক অসুর হর্ষ হেতু, পুলস্ত্য মুনির পৌত্র রাক্ষসরাজ রাবণ মান হেতু এবং দম্ভরাজের পুত্র গর্ব্ব হেতু—এইরূপে সকলে শত্রুস্বরূপ ষড়্বর্গ অবলম্বনে নিহত হইয়াছেন ॥৫৬-৫৭॥

ষড়্বর্গত্যাগের শুভফল।

এই প্রবল রিপু—ষড়্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া জিতেন্দ্রিয় জমদগ্নিতনয় পরশু-রাম এবং মহানুভব মহারাজ অম্বরীষ দীর্ঘকাল পৃথিবীপালন করিয়াছিলেন ॥৫৮॥

ধর্ম্ম ও অর্থ এই দুয়ের প্রাধান্য আছে। এইজন্য সজ্জনেরা সাদরে ধর্ম্মার্থের সেবা করেন। মনুষ্য ধর্ম্ম ও অর্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য উত্তমরূপে গুরুসেবা করিবে।

গুরু, শাস্ত্র, বিনয় ও বিদ্যার ফলনির্দ্দেশ।

গুরুসংযোগ শাস্ত্রের নিমিত্ত অর্থাৎ সদ্গুরু না পাইলে শাস্ত্রপাঠ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান হয় না; শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্র-জ্ঞান বিনয়বৃদ্ধির কারণ; তৎপরে মহীপতি বিদ্যাদ্বারা বিনীত হইলে, বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন হইলে, কষ্টে বা বিপদে অবসন্ন হন না। গুরুলাভ, শাস্ত্র-পাঠ, শাস্ত্রজ্ঞান, বিদ্যালাভ ও বিনয়—এইগুলি বিপৎকালে অবসাদ নাশ করে ॥৫৯॥

বৃদ্ধসেবার ফল-প্রদর্শন।

যে ভূপতি বৃদ্ধজনের সেবা করেন, তাঁহাকে সজ্জনেরা সম্মান করে। বৃদ্ধসেবী এবং সাধু-সমাদৃত মহীপতিকে অসচ্চরিত্র ব্যক্তিগণ নানাবিধ অকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইলেও তিনি অকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না ॥৬০॥

কলাবিদ্যা গ্রহণের ফল।

যে রাজা প্রত্যহ যথাবিধি নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি চতুঃষষ্টি প্রকার কলাবিদ্যা গ্রহণ করেন, তিনি শুক্লপক্ষে বিচরণ-শীল চন্দ্রমার ন্যায় প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ কলাবিদ্যার প্রভাবে রাজারও প্রত্যহ শ্রীবৃদ্ধি হয় ॥৬১॥

* এখানে ট্রাভাংকোরের প্রকাশিত নীতিসারে এই শ্লোকটি অতিরিক্ত আছে।

জিতেন্দ্রিয় এবং নীতি-পথানুযায়ী ভূপতির শ্রী এবং যশ।

যে রাজা সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি জয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন এবং নীতিপথের অনুসরণ করেন, তাঁহার সমস্ত সম্পদ্ প্রদীপ্ত বা সমুজ্জ্বল, এবং কীর্ত্তিকলাপ গগনস্পর্শী হইয়া থাকে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়জয় এবং নীতিপথের অনুসরণই মহীপতির অতুল ঐশ্বর্য্য এবং অনন্ত কীর্ত্তিলাভের কারণ ॥৬২॥

ঐশ্বর্য্যলাভের উপায়।

নরপতি বিনয়যুক্ত হইলে, নীতি-বিভূষণে বিভূষিত হইলে, পূর্ব্ববর্ত্তী ভূপালগণ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, সেই পূর্ব্বরাজসেবিত বিষয়ের সেবা করিয়া চলিলে মহারত্নগিরির—অতি উচ্চ সুমেরু পর্ব্বতের অত্যুন্নত শৃঙ্গের ন্যায় রাজলক্ষ্মীর বা রাজ সম্পদের অত্যুন্নত সমুজ্জ্বল পদ (স্থান) আক্রমণ করেন। অর্থাৎ সুন্দর ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন ॥৬৩॥

রাজপদ বিনয়াধীন।

যে পদ সকল লোককে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করে, সেই সর্ব্বাতিশায়ী নৃপপদ স্বভাবতই সমুন্নত। অতএব বলপূর্ব্বক এই সমুন্নত রাজপদ, বিনয়ে নিয়োজিত করিবে। কারণ, নীতির সিদ্ধি বিষয়ে বিনয়ই অগ্রগামী। ফলতঃ সর্ব্বাগ্রে বিনয় না থাকিলে নীতি-সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং বিনয়ান্বিত রাজত্বই চিরস্থায়ী হয় ॥৬৪॥

বিনয়ের উৎকর্ষ-বর্ণন।

যে রাজা বিনীত, সকলেই তাঁহাকে উত্তমরূপে সেবা করে। কারণ, বিনয় ভূপতিগণের অলঙ্কার স্বরূপ। হাতীর দেহ হইতে দান-জল পড়িতে থাকিলে এবং আস্তে আস্তে শুঁড় চালিত হইলে, সেই সময়ে হাতী যেমন শোভা পায়, সেইরূপ ভদ্রভূপতি যখন দান করিতে প্রবৃত্ত হন, এবং দানকালে যখন তাঁহার ধীরভাবে হস্তসঞ্চালন হইতে থাকে; তখন তিনি বিনয়দ্বারা শোভা প্রাপ্ত হন ॥৬৫॥

রাজার ঐশ্বর্য্যের কারণ।

প্রথমে বিদ্যালাভের জন্য গুরুকে সেবা করিতে হয়; গুরুমুখ হইতে শ্রুত বিদ্যা, মহাত্মগণের বুদ্ধির উৎকর্ষসাধন করে; শ্রুতবিদ্যার অনুযায়ী বা শাস্ত্রানুযায়ী মত সকল, প্রজাপতি তুল্য ভূপতিগণের নিঃসন্দেহ পরম সম্পদের কারণ হইয়া থাকে ॥৬৬॥

গুরুসেবার চরম ফল।

সংযতচিত্ত, পবিত্র এবং অনুবৃত্তি পরায়ণ হইয়া সুদক্ষ সদ্‌গুরুর সেবা করিলে, বিনয় বর্দ্ধিত রাজা রাজপদের এবং শান্তিস্থাপনের যোগ্য হন। বিনয়, পবিত্রতা এবং অনুবৃত্তি (আজ্ঞাপালন) এই তিনটি গুরুপদ সেবার অঙ্গ। যে রাজার এই তিনটি গুণ আছে, সেই রাজাই সিংহাসনের উপযুক্ত এবং সেই রাজাই রাজত্বের মধ্যে শান্তিসংস্থাপন করিয়া থাকেন ॥৬৭॥

বিনয় ও অবিনয়ের তারতম্য-প্রদর্শন।

যে রাজা কখনও কাহারও বশীভূত হন নাই, সেই ভূপতি যদি অবিনয়ের বশবর্ত্তী হইয়া অকার্য্যে রত হন, তাহা হইলে বিপক্ষ ভূপালগণ, অবজ্ঞা করিয়া সেই অবিনীত ও অবশীভূত ভূপতিকে সহজেই বশীভূত করেন। পক্ষান্তরে, যে রাজা শাস্ত্র ও বিনয়ের বিধান মানিয়া চলেন, সেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিনীত নৃপতি ক্ষুদ্র হইলেও—সৈন্য সামন্ত ও ঐশ্বর্য্য না থাকিলেও কখনও পরাভব প্রাপ্ত হন না ॥

ইতি—কামন্দকীয় নীতিসারে ইন্দ্রিয়বিজয়, বিদ্যাযোগ, বৃদ্ধযোগ নামক প্রথম সর্গ ॥০॥

পঞ্জিকা—পঞ্চাঙ্গশোধন।

[কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের জ্যোতিষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতি ব্যাকরণ জ্যোতিষতীর্থ কর্ত্তৃক লিখিত।]

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।]

৫। পঞ্চম আপত্তি,—য়ুরোপীয় গণনা স্থূল নহে, ইহা অতি সূক্ষ্ম গণনা; কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে স্থূল গণনাই গ্রাহ্য, সূক্ষ্ম গণনা গ্রাহ্য নহে। হেমাদ্রি বলিয়াছেন—"স্থূলমার্গ-সিদ্ধৈস্তৈব তিথিনক্ষত্রাদের্গ্রহণাৎ।"

উত্তর—হেমাদ্রি যে স্থূল নক্ষত্র লইতে বলিয়াছেন, ইহার অর্থ এরূপ নহে যে, ভুল নক্ষত্রাদিই হেমাদ্রির অভিপ্রেত। হেমাদ্রি জয়ন্তীব্রতে লিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলে যে জয়ন্তীব্রত হইবে, এ কোন্ প্রকারের গণনার রোহিণী? নক্ষত্রের গণনা দুই প্রকারে হইয়া থাকে। রাশিচক্রকে সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৩ অংশ ২০ কলা প্রতি নক্ষত্র ধরিয়া যে অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্র গণনা হয়, সেই গণনার রোহিণী, কি অসমান ২৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া অভিজিৎসহ ২৮ নক্ষত্রের গণনা হয়, সেই গণনার রোহিণী, ইহার কোন্ রোহিণীর সহিত অষ্টমীর যোগ হইলে জয়ন্তীব্রত হইবে? এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—"স্থূলমার্গ-সিদ্ধৈস্তৈব তিথিনক্ষত্রাদের্গ্রহণাৎ।" সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্রের গণনা হয়, তাহার নাম স্থূলমার্গ-গণনা। অসমান ২৮ ভাগে বিভক্ত করিয়া যে অভিজিৎসহ ২৮ নক্ষত্রের গণনাপ্রণালী, তাহার নাম সূক্ষ্মমার্গ। এই মার্গের গণনাপ্রণালী কোন কোন ঋষিগ্রন্থে উল্লিখিত থাকিলেও তাহার ব্যবহার নাই, সকল দেশের সকল পঞ্জিকাকারই সমান ২৭ ভাগে বিভক্ত করিয়া ২৭ নক্ষত্রের গণনা করেন এবং অভিজিতের আবশ্যকস্থলে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রের শেষপাদ ও শ্রবণা নক্ষত্রের প্রথম চারি দণ্ডকে পারিভাষিক অভিজিৎ নক্ষত্র নামে ব্যবহার করেন; সুতরাং স্থূলমার্গ নক্ষত্রগণনাই সর্ব্বত্র প্রচলিত, সূক্ষ্মমার্গের নক্ষত্রগণনা প্রচলিত নহে। হেমাদ্রিও তাহাই বলিয়াছেন যে, স্থূলমার্গের নক্ষত্রই লইতে হইবে। হেমাদ্রি এই সন্দর্ভে ভাস্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি হইতে সূক্ষ্মনক্ষত্রের স্বরূপ উঠাইয়াছেন। ভাস্করাচার্য্যের বচন এই—

> "স্থূলং কৃতং ভানয়নং যদেতদ্-
> জ্যোতির্ব্বিদাং সংব্যবহার-হেতোঃ।
> সূক্ষ্মং প্রবক্ষ্যেঽথ মুনিপ্রণীতং
> বিবাহ-যাত্রাদি-ফল-প্রসিদ্ধ্যৈ॥
> অধ্যর্দ্ধভোগানি ষড়ত্র তজ্জ্ঞাঃ
> প্রোচুর্বিশাখাদিতি ভ-ধ্রুবাণি।
> ষড়র্দ্ধভোগানি চ ভোগি-রুদ্র-
> বাতান্তকেন্দ্রাধিপ-বারুণানি॥
> শেষাণ্যতঃ পঞ্চদশৈকভোগা-
> ন্যুক্তো ভ-ভোগঃ শশিমধ্য-ভুক্তিঃ।
> সর্ব্বর্ক্ষভোগোনিত চক্রলিপ্তা
> বৈশ্বাগ্রতঃ স্বাদভিজিদ্ ভ-ভোগঃ॥

অশ্বিনী—৭৯০ কলা ৩৫ বিকলা।
ভরণী—৩৯৫।১৭।
কৃত্তিকা—৭৯০।৩৫।
রোহিণী—১১৮৫।৫২।

ইত্যাদি অসমানভাগে অভিজিৎসহ ২৮ ভাগ করা সূক্ষ্ম নক্ষত্রানয়ন। ইহার প্রচলন ভারতবর্ষে কোন প্রদেশেই নাই। তাহাই হেমাদ্রি বলিয়াছেন—স্থূলমার্গ-সিদ্ধ অর্থাৎ সমান ২৭ ভাগের নক্ষত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে হেমাদ্রি এরূপ বলেন নাই যে, নক্ষত্রগণনায় স্থূল অর্থাৎ ৩।৪ ঘণ্টা ভুল করিতে হইবে। চন্দ্র-সূর্য্যের অন্তরের প্রতি দ্বাদশভাগে এক এক তিথি হয়, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ও সিদ্ধান্তকারগণ বলিয়াছেন। ইহার গণনার নিয়ম এক প্রকারই। ইহাতে আর স্থূল-সূক্ষ্ম নাই। সকল পঞ্জিকাকারই ১২ অংশে এক তিথি গণনা করিয়া থাকেন। পঞ্জিকা-সংস্কারকারীরাও ১২ অংশে তিথি গণনা করিতেছেন। বোধ হয়, "স্থূলমার্গ-সিদ্ধৈস্তৈব নক্ষত্রস্য গ্রহণাৎ" হেমাদ্রির এইরূপ পাঠ ছিল. বঙ্গদেশে পঞ্জিকার আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে হেমাদ্রি মুদ্রিত হওয়ার সময়ে পঞ্জিকা-সংস্কারের বিরোধী পণ্ডিত মহাশয় তিথি-শব্দও ইহার সহিত যোগ করিয়া দিয়াছেন অথবা যদি হেমাদ্রিতে পূর্ব্ব হইতেই এই পাঠ থাকে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বোধ হয়, গ্রহণের জন্য যে সম্বন সংস্কৃত তিথিতে মধ্যগ্রহণ ধরা হয়, তাহাই হেমাদ্রি সূক্ষ্ম তিথিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা গ্রহণ ব্যতীত অন্যত্র আবশ্যক হয় না। ধর্ম্মশাস্ত্রোপযোগী তিথিগণনায় সর্ব্বত্র ১২ অংশে এক তিথি—যাহা জ্যোতিষশাস্ত্রে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, দৃক্তুল্যগণনাকারীরাও তাহাই লইতেছেন; সুতরাং ধর্ম্মকার্য্যে সূক্ষ্মগণনার আবশ্যক নাই, ইহা বলা

অসঙ্গত। বিশেষতঃ এক পল দশমী থাকিলেও সে দিবস একাদশী হইতে পারে না, এরূপ অবস্থায় সূক্ষ্মগণনা বিশেষ আবশ্যক। সংস্কারপ্রার্থিগণ বলেন—আমরা ঠিক ১২ অংশে তিথি ও রাশিচক্রের ঠিক ২৭ ভাগে নক্ষত্রগণনা করিব, ইহাতে গণনার ভুল লইব না। ভুল লইলে ধর্ম্ম অধিক হইবে বা শুদ্ধ করিলে পাপ হইবে, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে নাই। স্থূল ও সূক্ষ্মসম্বন্ধে ৺পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় 'পঞ্চাঙ্গ-প্রভাকর' নামক পুস্তকে একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন। তাহা এই—

"আমরা সাধারণ ব্যবহারে দেখিতে পাই, যদি কোন ব্যক্তি এক সের পটোল কিনিতে যায়, তাহা হইলে পটোল-বিক্রেতা তাহার দাঁড়িপাল্লায় এক সের বাট্‌খারা চড়াইয়া পটোল ওজন করিয়া দেয়, ক্রেতাও এক সের হইয়াছে বলিয়া লইয়া আইসে; কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি এক সের পাকা সোনা খরিদ করিতে যায়, তাহা হইলে সুবর্ণবণিক্ অতি উৎকৃষ্ট নিখুতিতে নূতন চক্‌চকে ৮০টি টাকা চড়াইয়া, বেশ করিয়া কাঁটার গতি দেখিয়া, এক রতিও এধার ওধার না হয়, এরূপে সোনা ওজন করিয়া দেয়। সোনার দাঁড়িতেও পটোল বিক্রয় হয়, না পটোলের দাঁড়িতেও সোনা বিক্রয় হয় না। কিন্তু যদি ঐ এক সের পটোল সোনা-বিক্রয়ের নিখুঁতিতে ওজন করিতে ৩।৪টা পটোল কম বেশী হয়, তাহা হইলে পটোলক্রেতা মহা বিবাদ উপস্থিত করিয়া যে ৩।৪টা পটোল কমী দিয়াছিল. তাহা পটোলবিক্রেতার নিকট লইয়া তবে ছাড়ে এবং পটোলবিক্রেতাকে দাঁড়ি শুদ্ধ রাখিতে বলে। ইহা দ্বারা পঞ্জিকা-বিবাদের সর্ব্বত্র ব্যাখ্যাত হইল। যাঁহারা শুদ্ধতা চাহিতেছেন, তাঁহারা তিথির সোনার ন্যায় ওজন চাহিতেছেন। ৩।৪ ঘণ্টা তিথি কম বেশী পাওয়াতে মহা বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহারা ঐ ৩।৪ ঘণ্টা কম বেশী না হয়, এরূপে শুদ্ধ পরিমাণ করিবার উপায় না করিয়া ছাড়িবেন না। পটোলের দাঁড়ি স্থূল ও সোনার দাঁড়ি সূক্ষ্ম। স্থূল দাঁড়িপাল্লায় পটোলের খরিদ—বিক্রয় হয়, ইহা বলিলে পটোল-ক্রেতা শুনিবে না। সে বলিতেছে—আমি সোনার ওজনের নিখুতি চাই না, কিন্তু ৩।৪টা পটোলের ন্যায় ৩।৪ ঘণ্টা তিথির কম বেশী লইতে রাজী নহি। অনেকে এই দাঁড়িতে এই বাট্‌খারায় পটোল লইতেছে, আমি অনেক দিন এই দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করিতেছি, এ কথা বলিলেও বিচারে ৩।৪টা কমী পটোল, পটোল ক্রেতা অবশ্যই পাইবে।......আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে ১ পল তিথিভেদে যখন ব্যবস্থার ভেদ হয়, যেমন ১ পল দশমী থাকিয়া পরে একদশী ৫৯।৩০ থাকিলেও সে দিন কখনই একাদশী হয় না, পরদিন দ্বাদশীতে হইয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র তিথির স্থূল-গণনা চান অর্থাৎ ৩।৪ ঘণ্টা ভুল হইলেও কোন দোষ নাই, এ কথা যাঁহার ইচ্ছা বলুন, এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলুন, কিন্তু যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি কখনই স্বীকার করিবেন না। তিনি বলিবেন—ঠাকুর! ১ পল তিথির জন্ম তোমার এক দিনের কর্ম্ম আর একদিন চলিয়া যায়, তখন তুমি কিনা বলিতে চাও যে, ৩।৪ ঘণ্টা তিথির ভুল গণনা কর। ফল কথা ৩।৪ ঘণ্টা ভুল কর, এ কথা কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই বলে না, ধর্ম্মশাস্ত্র সূক্ষ্মগণনা চায়।

প্রচলিত পঞ্জিকায় ১৪ দণ্ড পর্য্যন্ত তিথিতে ভুল হইতেছে দেখিয়াই উড়িষ্যার মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সামন্ত 'সিদ্ধান্তদর্পণ' নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই গ্রন্থানুসারেই জগন্নাথ-মন্দিরের পঞ্জিকা গণিত হইতেছে। তিনি লিখিয়াছেন—

"তিথাবুড়ৌ দ্বিত্রিপলপ্রভেদো
বেদ্যঃ স্বয়ং বিশ্বসৃজা ন চান্যৈঃ।
শ্রেয়ান্ স তৎশক্রঘটীপ্রভেদাৎ
সমুদ্ধরেৎ সারমসারতো হি॥" ইত্যাদি।

অতএব ধর্ম্মকার্য্যোপযোগী তিথি সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধভাবে গণনা করা কর্ত্তব্য।

৬। ষষ্ঠ আপত্তি,—কমলাকর দৈবজ্ঞ বলিয়াছেন, গ্রহণাদি দৃষ্টবিষয়ে গ্রহণ দেখিয়া স্নানদানাদি কর, তিথি-নক্ষত্রাদি অদৃষ্টবিষয়গণনায় সূর্য্য যাহা বলিয়াছেন, তদনুসারেই গণনা কর—

"অদৃষ্টফলসিদ্ধার্থং যথার্কাদ্যুক্তিতঃ কুরু।
গণিতং যদ্বি দৃষ্টার্থং তদ্দৃষ্ট্যুদ্ভবতঃ সদা॥"

উত্তর—চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহণসময়ে লোকে পুরশ্চরণাদি করিয়া থাকে, এবং গ্রহণে চূড়ামণিযোগে বহুলোক কাশীধাম বা অন্য তীর্থস্থানে গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাহা পূর্ব্বে গণনাদ্বারা জানা না গেলে এ সময় ধর্ম্মকার্য্য চলিতে পারে না। বিশেষতঃ গণিতাগত গ্রহণকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে যদি গ্রহণ না দেখা যায়, তথাপিও স্নানদানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। চন্দ্রগ্রহণের পূর্ব্বে ৩ প্রহর ও সূর্য্যগ্রহণের পূর্ব্বে ৪ প্রহর ভোজন করিতে নাই, ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের মত। গ্রহণ কেবল চাক্ষুষ-দর্শনদ্বারা জানিতে হইলে এই সকল ধর্ম্ম-শাস্ত্র-ব্যবস্থা চলিতে পারে না; সুতরাং দৃক্‌তুল্য গণনা আবশ্যক। কিন্তু মুসলমান আমলের ১৫৩৮ শকের কমলাকর দৈবজ্ঞ নলিকাযন্ত্রদ্বারা গ্রহবেধ করিবার ব্যবহার জানিতেন না, এই জন্যই তিনি লিখিয়াছেন—শুদ্ধ গণিত করা যাইতেছে না, নলিকাযন্ত্রদ্বারাও গ্রহবেধ করিয়া কত তফাৎ হইতেছে জানা যায় বটে কিন্তু গননার উপকরাণ কাহাতে কত অন্তর হইতেছে, বুঝা যায় না। সুতরাং গ্রহণাদি যাহা দেখা যায় তাহা দেখিয়াই কর, যাহা দেখা যায় না, তাহা সূর্য্যসিদ্ধান্তে যাহা বলিয়াছে, তদনুসারে গ্রহণ কর। তিনি যে গ্রহবেধ করিতে পারিতেন না, তাহা তিনি স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই—

"কল্পান্তরং কুত্র চ তৎ প্রদেয়ং
ন জ্ঞায়তে তন্নলিকোক্তিতোঽপি।
অস্মাদৃশাং তদজ্ঞানান্নলিকামাত্রতঃ কচিৎ॥"

যাহা লোকে শুধু চক্ষেই দেখিতে পারে, তাহা দেখিয়া কয়, যাহা শুধু চোখে দেখা যায় না, তাহার গণনায় ভুল হইলেও তাহাই লও। ইহা বলা কমলাকরের বেধবিষয়ে অপটুত্বের পরিচায়ক; তিনিও তাহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় এই সকল আপত্তি বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। সাহিত্যাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বতন গ্রন্থে বীজসংস্কার যাহা আছে, তাহাদ্বারা গ্রহ দৃক্‌তুল্য হয় না। তিনি (কমলাকর) নিজেও নলিকাযন্ত্রদ্বারা গ্রহবেধ করিয়া যে তফাৎ দেখেন, তাহার অপনয়ন করিবার কোন উপায় স্থির করিতে পারেন নাই। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য গণকদিগের পুস্তক হইতে লোকে সমকালান্তরে তিনবার মাত্র নলিকাযন্ত্রে গ্রহবেধ করিয়া চল-গণিতের সাহায্যে গ্রহের সর্ব্বস্ব কিরূপে জানা যায়, তাহা শিখিয়াছেন; কিন্তু কমলাকর দৈবজ্ঞের তাহা স্বপ্নেও মনে উদয় হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই। তাই তিনি লিখিয়াছেন—"কল্পান্তরং কুত্র চ তৎ প্রদেয়ং, ন জ্ঞায়তে তন্নলিকোক্তিতোঽপি।" অর্থ—গ্রহসাধন করিবার যেগুলি উপাদান আছে, তাহার মধ্যে কাহার কি প্রভেদ হইয়াছে, কোন্ উপাদানে কত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে যথার্থ উপাদান পাওয়া যায়, তাহা নলিকোক্তি অর্থাৎ বেধ-প্রকারদ্বারা জানিতে পারিতেছি না। জানিতে পারিলে যে বীজসংস্কারদ্বারা শুদ্ধ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল, তাহা বলা যায় না। সেই জন্য তিনি লিখিয়াছেন—

"অস্মাদৃশাং তদজ্ঞানান্নলিকামাত্রতঃ কচিৎ॥ ৩২৫॥
অদৃষ্টফলসিদ্ধ্যর্থং যথার্কাদ্যুক্তিতঃ কুরু।
গণিতং তদ্ধি দৃষ্টার্থং তথা প্রত্যক্ষতঃ কুরু॥" ইত্যাদি।

বর্ত্তমান সময়ে কেহ কেহ বলেন, গ্রহণাদির কাল পূর্ব্বে জানা না থাকিলে গ্রহণসময়ে স্নান দান পুরশ্চরণাদির অসুবিধা হয় জন্য গ্রহণ য়ুরোপীয়দিগের মত অনুসারে গণনা করা হউক, তিথি প্রভৃতি যাহা চলিতেছে, সেইরূপই থাকুক। বর্ত্তমান সময়েও এইরূপেই গুপ্তপ্রেশ, বাগচী প্রভৃতির পঞ্জিকা গণিত হইতেছে, তাহাতে নাবিক-পঞ্জিকা অনুসারে গ্রহণ গণনা করিয়া স্ফুটচন্দ্রিকামতে গণিত বলিয়া পঞ্জিকায় সন্নিবিষ্ট হয়। আর তিথি-নক্ষত্র প্রভৃতি দিনচন্দ্রিকা বা দিনকৌমুদীমতে গণিত হয়, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। শাস্ত্রের অভিপ্রায় যে, যে গ্রন্থানুসারে গণনা করিলে গ্রহণাদি প্রত্যক্ষ হয়, সেই গ্রন্থানুসারেই তিথি, নক্ষত্র, গ্রহস্ফুটাদি গণনা করিবে। ইহার প্রমাণাদি পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

হরীতকী।

[কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভিষগাচার্য্য, কাব্যতীর্থ, কবিরত্ন, শাস্ত্রী লিখিত।]
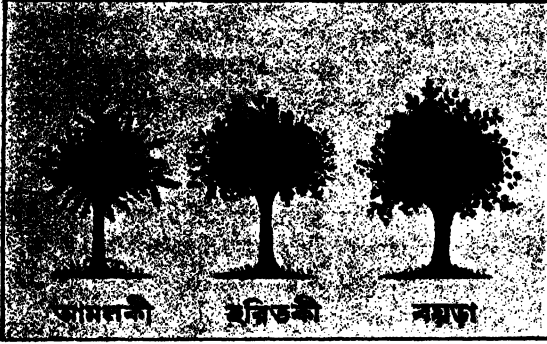
আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি ;—

"হরীতকী মনুষ্যণাং মাতেব হিতকারিণী।
কদাচিৎ কুপ্যতি মাতা নোদরস্থা হরীতকী॥"

হরীতকী মনুষ্যদিগের মাতার ন্যায় মঙ্গলকারিণী, মাতা কখনও কুপিতা হইতে পারেন, কিন্তু উদরস্থ হরীতকা কখনও কুপিতা হয় না। অর্থাৎ হরীতকী সেবনে কোনও প্রকার বিপদ্ আসিতে পারে না।

আজ আমরা সেই হরীতকী সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"দক্ষং প্রজাপতিং স্বস্থমশ্বিনৌ বাক্যমূচতুঃ।
কুতো হরীতকী জাতা তস্যাস্ত কতি জাতয়ঃ॥
রসাঃ কতি সমাখ্যাতাঃ কতি চোপরসাঃ স্মৃতাঃ।
নামানি কতি চোক্তানি কিঞ্চ তাসাঞ্চ লক্ষণম্॥
কে চ বর্ণা গুণাঃ কে চ কা চ কুত্র প্রযুজ্যতে।
কেন দ্রব্যেণ সংযুক্তা কাংশ্চ রোগান্ ব্যপোহতি॥
পৃচ্ছামেতৎ যথাপৃষ্টং ভগবন্ বক্তুমর্হসি।
অশ্বিনো র্বচনং শ্রুত্বা দক্ষো বচনমব্রবীৎ॥
পপাত বিন্দুর্মেদিন্যাং শক্রস্য পিবতোঽমৃতম্।
ততো দিব্যাৎ সমুৎপন্না সপ্তজাতি র্হরীতকী॥"

এক সময়ে সুখাসীন দক্ষ প্রজাপতিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! কিরূপে হরীতকার উৎপত্তি হইল, ইহা জাতিভেদে কয়প্রকার, ইহাতে কয়টি রস ও উপরস আছে, ইহার নাম কতগুলি এবং তাহাদের লক্ষণই বা কি, ইহার বর্ণ কিরূপ ও গুণ কি কি, কোন্ জাতি কোথায় প্রয়োগ করিতে হয়, এবং কোন দ্রব্যের সংযোগে কি কি ব্যাধিবিনাশ করে, ইহা জানিবার জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ; অতএব যথাযথ উত্তর-প্রদানে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া দক্ষ বলিলেন—যখন দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতপান করিতেছিলেন, সেই সময় স্বর্গ হইতে ভূমিতে যে অমৃতবিন্দু পতিত হইয়াছিল সেই স্বর্গচ্যুত অমৃতবিন্দু হইতে হরীতকীর উৎপত্তি হয়। ইহা জাতিভেদে সাত প্রকার।

"হরস্য ভবনে জাতা হরিতা চ স্বভাবতঃ।
হরেত্তু সর্ব্বরোগাংশ্চ তেন প্রোক্তা হরীতকী॥"

মহাদেবের ভবনে জাত, স্বভাবতঃ হরিদ্বর্ণ এবং সর্ব্বরোগবিনাশিনী বলিয়াই ইহার নাম হরীতকী।

ইহাকে হিন্দীতে—হরড়, হর্ ও হড় ; দাক্ষিণাত্যে—কল্‌রা ; মহারাষ্ট্রে—হর্ত্তকা ও বালহরড়ী ; গুজরাটে—হরড়ে ও হিমজ ; কর্ণাটে—অনিলেয়প্রশসে ; তৈলঙ্গে—করকচেট্টু ; উৎকলে—হরিড়া ও করেড়া ; তামিলে—কড়ৈক ; ফারসীতে—হলৈলেকলাংজীরেজবী অসফর ও হলৈলে জর্দ্দ ; আরবীতে—এহলীলজ, কাবলী, অহলীজ অসফর ও অহলীজ অস্‌বদ ; ইংরাজীতে—Myrobalan ও Black Myronalan ; ল্যাটীনে—Terminalia Chebula ; এবং সংস্কৃতে—হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা প্রভৃতি বলে।

"হরীতক্যভয়া পথ্যা কায়স্থা পূতনামৃতা।
হৈমবত্যব্যথা চাপি চেতকী, শ্রেয়সী শিবা।
বয়ঃস্থা বিজয়া চাপি জীবন্তী রোহিণীতি চ॥"

হরীতকী, অভয়া, পথ্যা, কায়স্থা, পূতনা, অমৃতা, হৈমবতী, অব্যথা, চেতকী, শ্রেয়সী, শিবা, বয়ঃস্থা, বিজয়া, জীবন্তী ও রোহিণী এইগুলি হরীতকীর সংস্কৃত নাম।

"হরীতক্যমৃতোৎপন্না সপ্তভেদৈরুদীরিতা।
তস্যা নামানি বর্ণাংশ্চ বক্ষ্যাম্যথ যথাক্রমম্॥"

এই অমৃতোৎপন্ন হরীতকীর সাতপ্রকার ভেদ কথিত আছে ; তাহাদের নাম ও বর্ণ যথাক্রমে বর্ণন করিতেছি।

"বিজয়া রোহিণী চৈব পূতনা চামৃতাভয়া।
জীবন্তী চেতকী চেতি নাম্না সপ্তবিধা স্মৃতা॥"

বিজয়া, রোহিণী, পূতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী—এই সাতপ্রকার হরীতকীর জাতিভেদ আছে

১। বিজয়া।—"অলাবুবৃত্তা বিজয়া" বিজয়া অলাবুসদৃশ (লাউয়ের ন্যায়) আকৃতি বিশিষ্ট।

২। রোহিণী।—"সুবৃত্তা রোহিণী মতা" রোহিণী সম্পূর্ণ গোলাকার।

৩। পূতনা।—"পূতনাস্থিমতী সূক্ষ্মা" পূতনার আকৃতি সূক্ষ্ম ও ইহার বীজ বড় অর্থাৎ ইহার সারাংশ অতি কম।

৪। অমৃতা।—"কথিতা মাংসলামৃতা" অমৃতা মাংসল অর্থাৎ শস্যবহুল ও বীজ অত্যন্ত ছোট।

৫। অভয়া।—"পঞ্চাস্রাচাভয়া জ্ঞেয়া" অভয়া পাঁচটি রেখাযুক্ত।

৬। জীবন্তী।—"জীবন্তী স্বর্ণবর্ণিনী" জীবন্তীর বর্ণ সুবর্ণসদৃশ।

৭। চেতকী।—"ত্র্যস্রা তু চেতকী বিদ্যাৎ" চেতকী তিনটি রেখাযুক্ত।

আবার স্থানভেদে জাতিবিশেষের উৎপত্তি হইয়া থাকে। বিজয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতে, চেতকী হিমালয়ে, পূতনা সিন্ধুদেশে, রোহিণী সর্ব্বত্র, অমৃতা ও অভয়া চম্পাদেশে ও জীবন্তী সৌরাষ্ট্রদেশে জন্মে। ইহার মধ্যে রোহিণী ও বিজয়া জাতীয় হরীতকী সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই হরীতকীর অশেষগুণ ও বহুবিধ রোগে প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার এই সাতপ্রকার হরীতকীর প্রত্যেকের স্বতন্ত্র গুণ ও কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে। প্রথমতঃ আমরা ইহার সাধারণ গুণের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি।

"হরীতকী পঞ্চরসহলবণা তুবরা পরম্।
রুক্ষোষ্ণা দীপনী মেধ্যা স্বাদুপাকা রসায়নী॥
চক্ষুষ্যা লঘুরায়ুষ্যা বৃংহনী চানুলোমনী।
শ্বাসকাস প্রমেহার্শঃকুষ্ঠশোথোদরক্রিমীন্॥
বৈস্বর্য্যগ্রহণীরোগবিবন্ধবিষমজ্বরান্।
গুল্মাধ্মানতৃষাচ্ছর্দ্দিহিক্কা কণ্ডুহৃদাময়ান্॥
কামলাং শূলমানাহং প্লীহানঞ্চ যকৃত্তথা।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং বিনাশয়েৎ॥"
(ভা. পূ. খ.)

সাধারণতঃ হরীতকী লবণভিন্ন পাঁচটি রসযুক্ত, বিশেষতঃ ইহাতে কষায়রসেরই প্রাচুর্য্য বিদ্যমান। ইহা রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক, মেধাজনক, মধুরবিপাক, রসায়ন, চক্ষুর হিতকর, লঘু, আয়ুর্বর্দ্ধক, বৃংহণ ও অনুলোমক; এবং ইহাতে শ্বাস, কাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কুষ্ঠ, শোথ, উদর, ক্রিমি, স্বরবিকৃতি, গ্রহণী, মলবদ্ধতা, বিষমজ্বর, গুল্ম, উদরাধ্মান, তৃষ্ণা, বমি, হিক্কা, কণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, শূল, আনাহ, প্লীহা, যকৃত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রঘাত রোগ বিনষ্ট হয়।

"কষায়া মধুরা পাকে রুক্ষা বিলবণা লঘুঃ।
দীপনী পাচনী মেধ্যা বয়সঃ স্থাপনী পরা।
উষ্ণবীর্য্যা সরায়ুষ্যা বুদ্ধীন্দ্রিয়বলপ্রদা॥
কুষ্ঠবৈবর্ণ্যবৈস্বর্য্য পুরাণবিষমজ্বরান্।
শিরোঽক্ষিপাণ্ডুহৃদ্রোগকামলাগ্রহণীগদান্॥
সশোষশোফাতীসারমেদোমোহবমিক্রিমীন্।
শ্বাসকাস প্রসেকার্শঃ প্লীহানাহগরোদরম্।
বিবন্ধং স্রোতসাং গুল্মমূরুস্তম্ভমরোচকম্।
হরীতকী জয়েদ্ব্যাধীংস্তাংস্তাংশ্চ কফবাতজান॥"
অষ্টাঙ্গ সং সূ. ৬ষ্ঠ অঃ।

হরীতকী কষায়বহুল পঞ্চরসবিশিষ্ট ও লবণরসবর্জ্জিত। ইহা মধুরবিপাক, রুক্ষ, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, মেধাজনক, বয়ঃস্থাপক, উষ্ণবীর্য্য অনুলোমক, আয়ুষ্কর এবং বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের বলবর্দ্ধক। ইহাতে কুষ্ঠ, বিবর্ণতা, স্বরবিকৃতি, পুরাতন ও বিষমজ্বর, শিরোরোগ, নেত্ররোগ, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, কামলা, গ্রহণী, ক্ষয়, শোথ, অতিসার, মেদোরোগ, মূর্চ্ছা, বমি, ক্রিমি, শ্বাস, কাস, প্রসেক, অর্শঃ, প্লীহা, আনাহ, বিষদোষ, উদররোগ, স্রোতোবিবন্ধ, গুল্ম, উরুস্তম্ভ ও অরুচি বিনষ্ট হয়।

"বচামুস্তাতিবিষাভয়া……………।
এতৌ বচাহরিদ্রাদী গণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতীসারশমনৌ বিশেষাদ্দোষপাচনৌ॥"
সু. সূ. ৩৮ অঃ।

"মুস্তাহরিদ্রাদারুহরিদ্রাহরীতকী……………।
এষ মুস্তাদিকো নাম্না গণঃ শ্লেষ্মনিসূদনঃ।
যোনিদোষহরঃ স্তন্যশোধনঃ পাচনস্তথা॥"
সু. সূ. ৩৮ অঃ।

মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী প্রভৃতি মুস্তাদিগণোক্ত দ্রব্য শ্লেষ্মানাশক, যোনিদোষনিবারক, স্তন্যশোধক ও পাচক।

"হরীতক্যামলকী……………।
ত্রিফলা কফপিত্তঘ্নী মেহকুষ্ঠবিনাশনী।
চক্ষুষ্যা দীপনী চৈব বিষমজ্বরনাশনী॥"
সু. সূ. ৩৮ অঃ।

হীরতকী, আমলকী ও বহেড়া ত্রিফলা; এই ত্রিফলা কফ, পিত্ত, মেহ ও কুষ্ঠনাশক এবং ইহা চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক ও বিষমজ্বরনাশক।

"আমলকী হরীতকী……………।
আমলক্যাদিরিত্যেষ গণঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
চক্ষুষ্যো দীপনো বৃষ্যঃ কফারোচকনাশনঃ॥"
সু. সূ. ৩৮ অঃ।

আমলকী, হরীতকী প্রভৃতি আমলক্যাদি গণ নামে অভিহিত। এই আমলক্যাদি সর্ব্ববিধজ্বরনাশক, চক্ষুর হিতকর, অগ্নিবর্দ্ধক, বৃষ্য এবং কফ ও অরুচিনাশক॥

"কুটজচিত্রকবিল্বনাগরাতিবিষাভয়া……………
দশেমানি অর্শোঘ্নানি ভবন্তি।"
চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

কুড়্চী, চিতা, বেলশুঁঠ, শুঁঠ, আতইস্ ও হরীতকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য অর্শোনাশক।

"খদিরাভয়ামলকহরিদ্রা.........................দশেমানি কুষ্ঠঘ্নানি ভবন্তি।"

চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

খদির হরীতকী, আমলকী ও হরিদ্রা প্রভৃতি দশটি দ্রব্য কুষ্ঠনাশক।

"দ্রাক্ষাকাশ্মর্য্যপরুষকাভয়া.....................দশেমানি বিরেচনোপগানি ভবন্তি।"

চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

দ্রাক্ষা, কাশ্মরীফল, ফল্সা ও হরীতকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য বিরেচনক্রিয়ার সাহায্যকারী।

"শটীপুষ্করমূলবদরবীজকণ্টকারিকা বৃহতী বৃক্ষরুহা-ভয়া...............দশেমানি হিক্কানিগ্রহাণি ভবন্তি।"

চ সূ. ৪র্থ অঃ।

শটী, পুষ্করমূল, কুলেরবীজ, কণ্টকারী, বৃহতী, গুড়ূচী ও হরীতকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য হিক্কানিবারক।

"দ্রাক্ষাভয়ামলক.....................দশেমানি কাসহরাণি ভবন্তি।"

চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

দ্রাক্ষা, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য কাস-নাশক।

"শারিবাশকরাপাঠামঞ্জিষ্ঠাদ্রাক্ষাপীলুপরুষকাভয়া...........................দশেমানি জ্বরহরাণি ভবন্তি।"

চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

অনন্তমূল, শর্করা আকনাদি, মঞ্জিষ্ঠা, দ্রাক্ষা, পীলু, ফল্সা ও হরীতকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য জ্বরনাশক।

"অমৃতাভয়াধাত্রী...............দশেমানি বয়ঃস্থাপনানি ভবন্তি।"

চ. সূ. ৪র্থ অঃ।

গুড়ূচী, হরীতকী, আমলকী প্রভৃতি দশটি দ্রব্য বয়ঃ-স্থাপক।

"হরীতকী পঞ্চরসা চ রেচনী কোষ্ঠাময়ঘ্নী
লবণেন বর্জ্জিতা।
রসায়নী নেত্ররুজাপহারিণী ত্বগাময়ঘ্নী
কিল যোগবাহিনী॥"

(রা. নি.)

হরীতকী লবণ ভিন্ন পঞ্চরসযুক্ত, রেচক, কোষ্ঠগতরোগ-নাশক, রসায়ন, অক্ষি ও চর্ম্মগত রোগনাশক এবং যোগবাহী।

"পথ্যা পঞ্চরসায়ুষ্যা চক্ষুষ্যাঽলবণা সরা।
মেধ্যোক্তা দীপনী দোষশোথকুষ্ঠজ্বরাপহা॥"

(চক্রপাণিঃ)

হরিতকী লবণবর্জ্জিত পঞ্চরসযুক্ত, আয়ুষ্য, চক্ষুর হিতকর, অনুলোমক, মেধ্য, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিবর্দ্ধক এবং ত্রিদোষ, শোথ, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক।

এতদূর আলোচনা করিয়া যে সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া গেল, সাধারণতঃ হরীতকীমাত্রেই সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান। জাতিবিশেষে যে সকল গুণ ও প্রয়োগবৈশেষ্য আছে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে।

পূর্ব্ববর্ণিত সপ্তজাতির মধ্যে বিজয়া ও জীবন্তী জাতীয় হরীতকী সর্ব্বব্যাধিবিনাশক; রোহিণী ব্রণরোপক, পূতনা প্রলেপে প্রশস্ত অর্থাৎ প্রলেপার্থ হরীতকী প্রয়োগ করিতে হইলে পূতনাই শ্রেষ্ঠ, শোধনকার্য্যে (বিরেচনাদিতে) অমৃতা হিতকর, চক্ষুরোগে অভয়া উৎকৃষ্ট এবং চূর্ণার্থে চেতকীই প্রয়োজ্য।

"বিজয়া সর্ব্বরোগেষু রোহিণী ব্রণরোহিণী।
প্রলেপে পূতনা যোজ্যা শোধনার্থেঽমৃতা হিতা॥
অক্ষিরোগেঽভয়া শস্তা জীবন্তী সর্ব্বরোগহৃৎ।
চূর্ণার্থং চেতকী শস্তা যথাযুক্তং প্রযোজয়েৎ॥"

এই সাতপ্রকার হরিতকীর মধ্যে চেতকী দুইপ্রকার শ্বেত ও কৃষ্ণ। তন্মধ্যে শ্বেত চেতকী ছয় আঙ্গুল পরিমিত ও কৃষ্ণ চেতকী এক অঙ্গুলি পরিমিত। আবার এই চেতকীর এমন আশ্চর্য্য প্রভাব যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে কেহ চেতকী বৃক্ষের ছায়ায় গমন করে, তৎক্ষণাৎ তাহার বিরেচন হয় এবং এই চেতকী হাতে করিলে, উহা যতক্ষণ হাতে থাকে, ততক্ষণ প্রবলবেগে মলভেদ হইতে থাকে। রাজা, সুকুমার, শিশু, কৃশ ও ঔষধদ্বেষী প্রভৃতি যাহারা কটুতিক্ত কষায়াদিরসযুক্ত ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক তাহাদের বিরেচনার্থ এই চেতকীই উৎকৃষ্ট; যে হেতু ইহা খাইতে হয় না, কেবল হাতে রাখিলেই উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

এই সমস্ত জাতির মধ্যে বিজয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, যেহেতু ইহা সর্ব্বত্র সুলভ ও ইহার প্রয়োগও অনায়াসসাধ্য এবং সর্ব্বব্যাধিনাশক।

হরীতকীর মজ্জা (বীজের শাঁস), মধুর, মাংস অম্ল ও কষায়, ত্বক্ (খোসা) কটু, বীজ তিক্তরস।

নূতন, স্নিগ্ধ, ঘন (মাসবহুল), বৃত্ত (পরিপুষ্ট) গুরু (ওজনে ভারি) এবং জলে দিলে ডুবিয়া যায়, এইরূপ হরীতকীই সমধিকগুণযুক্ত। যে হরীতকীতে লক্ষণগুলি সমস্তই আছে এবং যাহার প্রত্যেকটীর ওজন দুইকর্ষ সেই হরীতকীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

হরীতকী চর্ব্বণ করিয়া সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, বাঁটিয়া সেবনে কোষ্ঠপরিষ্কার, সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে মলের গাঢ়ত্বসম্পাদন ও ভাজিয়া সেবন করিলে ত্রিদোষ নষ্ট হয়। ভোজনের সহিত সেবন করিলে বল, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়-সমূহের উন্মীলন, বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিনাশ এবং মল, মূত্র ও শারীর দোষসমূহের বিস্রংসন হয়। ভোজনের পর

হরীতকী সেবনে অন্নপানজনিত বাত, পিত্ত ও কফজাত দোষ সকল নষ্ট হয়; বোধ হয় এই জন্যই প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ব্রহ্মচর্য্যে ভোজনান্তে হরীতকীদ্বারা মুখশোধন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বর্ষাকালে সৈন্ধবলবণ, শরৎকালে চিনি, হেমন্তকালে শুঁঠ, শীতকালে পিপুল, বসন্তে মধু ও গ্রীষ্মকালে গুড়সহ হরীতকী সেবন করিলে রসায়ন (শরীরস্থ রসাদি সপ্তধাতুর পোষণ) ক্রিয়া সাধিত হয়। ইহারই নাম ঋতুহরীতকী।

প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রায় সমস্ত রোগেই হরীতকীপ্রয়োগের ব্যবস্থা আছে, বিশেষতঃ অক্ষিরোগে ইহার বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ ভূরি ভূরি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে সে সকল উল্লেখ করা হইল না।

এই হরীতকী অশেষগুণবিশিষ্ট হইলেও পথশ্রান্ত, দুর্ব্বল, রুক্ষ, কৃশ, উপবাসকৃশ, পিত্তপ্রকৃতি, গর্ভবতী স্ত্রী ও যাহার রক্তমোক্ষণ করা হইয়াছে এরূপ ব্যক্তি, ইহা সেবন করিবে না।

"অধ্বাতিখিন্নো বলবর্জ্জিত, রুক্ষঃ
কৃশো লঙ্ঘনকর্ষিতশ্চ।
পিত্তাধিকো গর্ভবতী চ নারী বিমুক্তরক্তস্ত্ব-
ভয়াং ন খাদেৎ॥"

মুষ্টিযোগ।

১। প্রবাহিকা (আমাশয়) রোগে ঘন ঘন বাহ্যে বেগ, সামান্য মল নির্গম হওয়া ও পেটে বেদনা থাকিলে।০ একসিকি হরীতকী ও ৵০ দুই আনা পিপুল একত্র বাঁটিয়া উষ্ণজলসহ সেবনে অতিসত্বর বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

২। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে।০ হইতে॥০ আধতোলা (বয়স ও কোষ্ঠানুসারে) হরীতকী সামান্য একটু লবণসহ জলে বাঁটিয়া উষ্ণজলসহ সেবন করিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। অথবা ৫।৬টি হরীতকী ভাঙ্গিয়া বীজবাদ দিয়া রাত্রিতে ৵৹ অর্দ্ধপোয়া আন্দাজ জলে ভিজাইয়া পরদিন সেই জল পান করিলেও বেশ কোষ্ঠশুদ্ধি হইয়া থাকে।

৩। সর্ব্বদা হরীতকী মুখে রাখিলে দন্তমূল দৃঢ় হয় ও দাঁতের গোড়ার ফোলা নিবৃত্তি হয়।

৪। দাঁতের গোড়ায় ক্ষত হইলে হরীতকী চূর্ণ লাগাইলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

৫। চক্ষুতে বেদনা হইলে ও ফুলিলে হরীতকী ঘৃতে ভাজিয়া জলে বাঁটিয়া ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুর (বাহিরে) চারিদিকে প্রলেপ দিলে সত্বরই বেদনাও স্ফীতি কমিয়া যায়। এই যোগটি মুখ্যতঃ চরকোক্ত॥

৬। একটি পুষ্ট হরীতকী বেশ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে, পরে উহা ভাঙ্গিয়া একটি টুকরা লইয়া উৎকৃষ্ট মধুর সহিত শিলায় চন্দনের ন্যায় ঘসিয়া উহা একটি পরিষ্কার পালক বা তুলিরদ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে চক্ষুর জলপড়া নিবৃত্তি হইয়া দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

৭। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ঐ চূর্ণ।০ চারি আনা পরিমাণে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে উষ্ণজলসহ সেবন করিলে বৃদ্ধিরোগে সমধিক ফল পাওয়া যায়।

৮। গুরুভোজনের পর মুহুর্মুহু পিপাসা হইলে, এক টুকরা হরীতকী মুখে রাখিয়া মধ্যে মধ্যে চুষিলে অতি সত্বর পিপাসাশান্তি হয়।

৯। হরীতকী চূর্ণ ৴০ এক আনা, শুঁঠ চূর্ণ ৴০ এক আনা ও পরিষ্কার চিনি বা মিশ্রির গুঁড়া ৵০ আনা একত্র মিশাইয়া প্রত্যহ আহারান্তে জলসহ সেবন করিলে গলা ও বুকজ্বালার সদ্যঃ উপশম হয়।

১০। হরীতকী গুড়ের সহিত সেবনে অর্শোরোগে বিশেষ উপকার হয়।

১১। সর্ব্বদা হরীতকী মুখে রাখিলে স্বপ্নদোষ রোগে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

কাগজের কারবার।

[সম্পাদক।]

আজকাল এই যুদ্ধের জন্য বাণিজ্যের যে গোল ঘটিয়াছে, তাহাতে এদেশে কাগজের বড়ই অভাব হইয়াছে। যেরূপ ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সাহিত্য-প্রচার প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে এবং মানপসার বজায় রাখিবার জন্য এখনও সাময়িক পত্র প্রচারিত করিতেছেন; কিন্তু লেখায় ও কাগজে অনেক কাগজই আপনাদের হীনতার পরিচয় দিতেছে। আজকাল চিঠীর কাগজ এক খানা প্রায় এক পয়সা বিকায়, কাজেই পুস্তক মুদ্রণের হার অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কাগজের জন্য অনেক সংবাদপত্রের অবস্থা সঙ্কটসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। এই যুদ্ধ যদি এইরূপ ভাবে চলে, তাহা হইলে সাহিত্য-প্রচার একেবারে বন্ধ না হউক বিশেষ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। এই কাগজের কাজ যুদ্ধে পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, এ দেশে কত কাগজ জন্মিত, বিদেশ হইতে কত কাগজ আমদানি হইত, তাহার একটা হিসাব দেখা কর্ত্তব্য। সেই জন্য অদ্য আমরা কাগজ সম্বন্ধে তথ্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ভারতে অনেকগুলি কাগজের কল আছে। বাঙ্গালায় টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, ও রাণীগঞ্জে কাগজের কল সুপ্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌ সহরে অপার ইণ্ডিয়া কুপার মিল্স্ ও বোম্বাই পুণা সহরের রীয়া মিল্স্ বিশেষ বিখ্যাত। এই সমস্ত কাগজের কল বিদেশীয় মূলধনে এবং বিদেশীয় তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইহার লভ্যাংশও বিদেশে চলিয়া যায়, ভারতবাসী এই সকল কলে কুলী মজুরের কাজ করে। কেহ গতর খাটায়, কেহ কলম পেশে। তবে কথা হইতেছে যে, এই কলের মালেকরা আমাদের সাম্রাজ্যের, এই বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যের, মধ্যস্থিত লোক, সুতরাং ইঁহারা আমাদের একেবারে পর নহেন। ইহা ভিন্ন বোম্বাইয়ে ও সুরাটে দুইটি ছোট ছোট কাগজের কল আছে, তাহাতে দেশী কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া আরও দুই একটা কল আছে, দুই একটা বন্ধও হইয়া গিয়াছে। বালিতে একটা কাগজের কল ছিল, তাহা ইইতে বালির কাগজ নাম হইয়াছে। সে কল এখন আর নাই। ঐ বড় বড় পাঁচটি কাগজের কলে নানাপ্রকার কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিদেশ হইতে আমদানি কাগজ অপেক্ষা সে কাগজ হীন নহে। সরকার ঐ সকল কাগজের কল হইতে অনেক কাগজ কিনিয়া থাকেন। সরকারের নিকট কাগজ বিক্রয় করিবার সুবিধা না পাইলে এই সব কাগজে কল বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিত না। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৈদেশিক প্রতিযোগিতার ফলে এ দেশে জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় কলের কাগজের কাট্‌তি তেমন অধিক হয় নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে সুলভ মূল্যের প্রচুর কাগজ প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন বিদেশী আমদানী কাগজের সহিত প্রতিযোগিতায় আর তাহা তিষ্ঠিতে পারিতেছে না। এখন কল না হইলে কাগজের কারবার টিকান বড় কঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে।

ইংলণ্ড হইতেই এ দেশে অধিক কাগজ আমদানি হইয়া থাকে, যুদ্ধের পূর্ব্বেও ইংলণ্ড হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাগজ আমদানি হইত। তৎপরে জার্ম্মাণী, অষ্ট্রো-হাঙ্গেরী ও অন্যান্য দেশ হইতেও প্রচুর কাগজ এদেশে আসিত। এদেশে কত কাগজ প্রস্তুত হইত এবং বিদেশ হইতে কত কাগজ এদেশে আমদানি হইত, তাহা ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিসাবে প্রদত্ত হইল। এই হিসাব পাউণ্ড নামক স্বর্ণ মুদ্রা অনুসারেই প্রদত্ত হইল। এক পাউণ্ড পনর টাকা। পাঠক উহার পনর গুণ করিয়া লইলে উহা টাকার হিসাবে বুঝিতে পারিবেন।

খৃষ্টাব্দ	ভারতে প্রস্তুত কাগজের মূল্য পাউণ্ড	বিদেশ হইতে আমদানি পাউণ্ড
১৯০৮	৫০৪,৮১৮	৬২৮,৩০৫
১৯০৯	৫২৭,৪৩৬	৬৬৬,৮৩৫
১৯১০	৫৪৩,৪৩৬	৭৩৩,৭২২
১৯১১	৫৩৩,৬৩২	৭৭৪,১২৮
১৯১২	৫১৩,৭৩০	৯০৫,৫৬০

পাঠক দেখুন, এই যুদ্ধের পূর্ব্বেই বিদেশী কাগজের আমদানি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের চরম সময় অর্থাৎ ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কলজাত কাগজের কাট্‌তি বেশী হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর হইতেই উহার কাট্‌তি কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিদেশ হইতে আমদানি কাগজের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিদেশ হইতে ৯ লক্ষ ৫ হাজার ৫ শত ৬০ পাউণ্ড মূল্যের (উপরের তালিকা দেখুন) অর্থাৎ ১ কোটী ৩৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৪ শত টাকার কাগজ বিদেশ হইতে এদেশে আমদানী হইয়াছে।

কোন দেশ হইতে কত পাউণ্ড মূল্যের কাগজ ও পেষ্ট-বোর্ড (পুস্তকাদির মলাট প্রভৃতি দিবার কঠিন কাগজ) কত আমদানী হইয়াছে, নিম্নে তাহার দুই বৎসরের হিসাব দেওয়া হইল।

দেশের নাম	১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে	১৯১৪ অব্দের ৩১ মার্চ্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে।
ইংলণ্ড	৫৫৯,৯৮৪	৫৯৫,১২৯
জার্ম্মাণী	১৫৪,৪২৭	১৮২,৮৭৭
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরী	৭৬,৪৭৯	৮৮.২১৪
নরওয়ে	৩৪,৮৯৩	৫৩,৯১৯
বেলজিয়াম	৩৮,২২৮	৩৬,২০৫
সুইডেন	৩১,৭৫৬	৩০৯১৫
হলণ্ড	২২,১২৭	২৬,৮৮৮
অন্যান্য দেশ	৩৬,০৭৩	৪১৩০৪
মোট	৯৬৩,৯৬৭	১,০৫৮,৪৫৪

পাঠক দেখুন, ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসরের শেষ হইয়াছে, সেই বৎসরে বিদেশ হইতে ভারতে ১০ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪ শত ৫৪ পাউণ্ড অর্থাৎ ১ কোটী ৫৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮ শত ১০ টাকার কাগজ নানা দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছে।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত কাগজের কাট্‌তি বিশেষ বৃদ্ধি না পাইলেও বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিদেশ হইতে আমদানী কাগজের সুলভত্বই তাহার কারণ ছিল। এ দেশে সুলভ সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্রের প্রচার হেতু উহার স্বত্বাধিকারীরা শস্তা কাগজ খরিদ করিয়া থাকেন। জার্ম্মাণীর মস্‌ণ (glazed) ছাপার কাগজ ছয় পয়সা পাউণ্ডও বিকাইতেছে। অষ্ট্রীয়া হইতে আমদানী ছাপিবার কাগজ সাড়ে তের আনা, চৌদ্দ আনা রীম বিকাইয়াছে। কাজেই সুলভ মূল্যের কাগজে শস্তা দামের পুস্তক ও পত্রিকায় দেশ প্লাবিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে কি ধরণের কত কাগজ কোন দেশ হইতে কি পরিমাণ আমদানী হইতেছিল, তাহার একটা হিসাব দেখা আবশ্যক। এ হিসাব যুদ্ধের পূর্ব্বকার। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে সেই হিসাব বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কাগজগুলিতে মোটা-মুটি পাঁচভাগে বিভক্ত করা হইল এবং জার্ম্মাণী, অষ্ট্রীয়া এবং ইংলণ্ড হইতে যত মূল্যের কাগজ আমদানী হইয়াছে, তাহার মূল্য পাউণ্ডে প্রদত্ত হইল।

কাগজের নাম	জার্ম্মাণী হইতে আমদানী
১ প্যাকিং কাগজ	১৭,৫৫০ পাউণ্ড মূল্যের
২ ছাপার কাগজ	৬৫,৪৬৩ " "
৩ লিখিবার কাগজ	২৫,৩৭৯ " "
৪ অন্যান্য রকম	৫৯,৭০৬ " "
৫ পেষ্ট বোর্ড কার্ড বোর্ড প্রভৃতি	১৪,৭৭৪ " "

ইহার পর অষ্ট্রীয়া ও ইংলণ্ড হইতে আমদানী কাগজের মূল্য (পাউণ্ডে) নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহার প্রথম স্তম্ভে পাঁচ প্রকার কাগজের কেবল নম্বর দেওয়া হইল। পাঠক উপরের বিবরণ হইতে নম্বর দেখিয়া কাগজের নাম মিলাইয়া লইবেন।

কাগজের নাম	অষ্ট্রীয়া	যুক্তরাজ্য (বিলাত)
১	৪,৩৫৬ পাউণ্ড	২৪,৭৫৭ পাউণ্ড
২	২৮,৬১৫ "	১১[illegible],৫১৪
৩	৩৮,৪৪০ "	১৬৪,৫৮৩
৪	১৬,৬০৩ "	২১৫,৫৭৯
৫	২০১ "	১৭,৭২৭

পাঠক দেখুন যুক্তরাজ্য (বিলাত) হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ লিখিবার ও ছাপিবার কাগজের আমদানী হইয়াছে। বিলাত হইতে ছাপিবার কাগজ আসিয়াছে, ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৫ শত ১৪ পাউণ্ড মূল্যের (উপরের তালিকা দেখুন) অর্থাৎ ২৫ কোটী ২৭ লক্ষ ৭ শত ১০ টাকা মূল্যের কাগজ ভারতে আসিয়াছে। ইহার কারণ ভাল ভাল পুস্তক ও সাময়িক পত্র সমস্তই বিলাত হইতে আমদানী কাগজে ছাপা হইয়া থাকে। লেখার কাগজও বিলাত হইতে অধিক আসিত। পাঠক উপরের তালিকায় তাহা দেখিতে পাইবেন। উহা পাউণ্ডে প্রদত্ত হইয়াছে, উহার পনরগুণ করিলে কত টাকার লেখার কাগজ এ দেশে আসিত, তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ভিন্ন নরওয়ে এবং সুইডেন হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাগজ আমদানী হইত। সংবাদপত্রগুলির অধিকাংশই তাহাতে ছাপা হইত। সে কাগজ নিতান্ত মন্দ নহে। এ কাগজও সুলভ ছিল। ভারতীয় কলে যে সমস্ত কাগজ প্রস্তুত হয়, তাহা বিলাতী কাগজ অপেক্ষা সুলভ সত্য, কিন্তু অন্যান্য দেশ হইতে আমদানী কাগজ অপেক্ষা মহার্ঘ্য। দেশীয় মিলের কাগজ নিতান্ত মন্দ নহে। বিদেশ হইতে আমদানী অনেক কাগজ অপেক্ষা উহা ভাল। জার্ম্মাণী হইতে আমদানী রঙ্গীণ কাগজের কাট্‌তি এ দেশে অনেক অধিক ছিল। তাহার কারণ ঐ কাগজের রং খুব ভাল।

যাহা হউক, যুদ্ধের পর কাগজের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পরই বিলাতে কাগজের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তাহার কারণ কাগজ প্রস্তুতের উপাদানেরও মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। নরওয়ে, সুইডেন, রুসিয়া দক্ষিণ জার্ম্মাণী, কানাডা ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠমণ্ড (wood pulp) আমদানী হইয়া থাকে; আলজিয়ার্স, স্পেন এবং টিউনিস হইতে ইস্পার্টো ঘাস ও অন্যান্য অংশুযুক্ত উদ্ভিদের আমদানী এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং জার্ম্মাণী হইতে কার্পাস, ন্যাকড়া, কানি প্রভৃতি আমদানী হইত। উহা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। যুদ্ধারম্ভের পর হইতে ঐ সমস্ত উপকরণের

মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সুতরাং কাগজ প্রস্তুতের খরচা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতের যুদ্ধের ফলে কাষ্ঠ-মণ্ডের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় কাগজের কলে এই কাষ্ঠমণ্ডই প্রভূত পরিমাণে কাগজের উপাদান-রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অষ্ট্রীয় এবং সুইডিস কাষ্ঠমণ্ডের মূল্য প্রতিটন সওয়া শত টাকা হইতে দেড় শত টাকা হইয়াছে। ইহা অবশ্য যুদ্ধের পূর্ব্বকার দর। যুদ্ধের পর উহার মূল্য দ্বিগুণ হইয়াছে। বিলাত হইতে এদেশে কাপড়ের উপাদান অনেক আইসে। ১৯১৩ ১৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে কাষ্ঠমণ্ড এবং কাগজ প্রস্তুতের অন্যান্য উপকরণ যাহা আমদানী হইয়াছিল তাহার মূল্য ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ১ শত ২৫ টাকা। তন্মধ্যে যুক্তরাজ্য (বিলাত) হইতে ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার ৪ শত ৯৫ টাকার মাল আসিয়াছে। সুইডেন হইতে ৩ লক্ষ ৯ হাজার ৫ শত ৪০ টাকার, অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী হইতে ৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫ শত ১৫ টাকার এবং জার্ম্মাণী হইতে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৭ শত ৫ টাকার কাগজের উপাদানের আমদানী হইয়াছে। ইহা ভিন্ন ভারতীয় কাগজের কলওয়ালারা সোডা মিশ্রণ, পরিষ্কারক চূর্ণ, চীনা মাটি প্রভৃতি বিবিধ রাসায়ণিক দ্রব্য ইংলণ্ড হইতে আমাদানী করে। ভারতে যদি রাসায়ণিক কার্য্যের উন্নতি হয়, তাহা হইলে অনেক সুবিধা হইতে পারে।

যুদ্ধের সময় এখন অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী ও জার্ম্মাণী হইতে মালের আমদানী হইতেছে না। জার্ম্মাণী এবং ইংরেজ সুইডেনের কাষ্ঠমণ্ড আমদানী করিত। এখন যুদ্ধের সময় জাহাজাদির অসুবিধায় বিদেশ হইতে ঐ সকল মাল আম-দানীর সুবিধা নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য, এদেশে কাগজের উপাদান প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে কি না? পরীক্ষারদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বাঁশ হইতে অতি উত্তম কাষ্ঠমণ্ড প্রস্তুত হইতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞের পরীক্ষায় সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বংশমণ্ড কাগজের সুন্দর উপাদান। রাইব ঘাস এবং সরাই ঘাস হইতেও কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। রাইব ঘাস কতকটা এসপার্টো ঘাসেরই মত। উহাতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। অন্যান্য ঘাসও পরীক্ষাসাপেক্ষ। আসল কথা, আমরা নিজে অকর্ম্মণ্য বলিয়া কোন কাজ করিতে পারিতেছি না। পরে যদি অন্নের পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া আমাদের মুখে তুলিয়া দেয়, তাহা হইলে আমরা তাহা খাইতে খুবই মজবুত। কিন্তু আমরা নিজে কোন কাজই করিতে চাহি না, কেহ কোন কাজ করিতে গেলেও তাহাতে সহায়তা করি না। বরং তাহার নানারূপ দোষ দেখাইয়া তাহাকে জনসাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ করিতে চেষ্টা পাই। আমাদের এই দোষেই আমরা জাহান্নমে যাইতে বসিয়াছি।

ছোট বড়।

[শ্রীকালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।]

অতি প্রাচীনকালে বিদগ্ধপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ড গ্রাম ছিল। গ্রামটি ব্রাহ্মণপ্রধান্য। বহু কৃতবিদ্য পণ্ডিতের বাস। গ্রামে টোল চতুষ্পাঠীও অনেক। কিন্তু সকল টোল অপেক্ষা বাচস্পতি মহাশয়ের টোলের খুব বাহার ও পশার ছিল। টোলের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ বাচস্পতি এক জন সদাশয় মিষ্টভাষী, সদালাপী, প্রাচীন ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ধর্ম্মবুদ্ধি এবং সাংসারিক বিচক্ষণতাও সর্ব্বজন স্বীকৃত ছিল। বাচস্পতি মহাশয় যে সভায় যাইতেন, সেই সভা উজ্জ্বল হইত, তিনি যে পরামর্শ দিতেন, সেই পরামর্শ মত কার্য্য করিলে লোক জয়যুক্ত হইত। বিচারে তিনি সর্ব্বদাই জয়ী হইতেন, মধ্যস্থতায় তিনি সর্ব্বথা ন্যায়ের মর্য্যাদাই রক্ষা করিতেন। গ্রামের মধ্যে বাচস্পতি মহাশয়ের সম্মান অপ্রতিহত ছিল, দেশ মধ্যে তাহার যশ সর্ব্বত্র বিকীর্ণ ছিল।

বাচস্পতি মহাশয়ের ব্রাহ্মণী সর্ব্বগুণেই গুণবতী ছিলেন, তবে দোষের মধ্যে তাহার বুদ্ধিটা কিছু মোটা ছিল। সংসারের সাধারণ কার্য্যে তাহার সেই বুদ্ধির স্থূলতা সহজে ধরা পড়িত না। তবে তাঁহার মাথায় একটা ধারণা প্রবেশ করিলে, সে ধারণা তিনি সহজে পরিত্যাগ করিতেন না। তিনি বাচস্পতি মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। অনেকে অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শও লইতেন। সাধারণ সাংসারিক হিসাবে তিনি যে পরামর্শ দিতেন, তাহা ভালই হইত। তবে তীক্ষ্ণদর্শী গৃহিণী মহলে তাঁহার বুদ্ধির স্থূলত্ব বিশেষ বিদিত ছিল, কাজেই কেহ কোন জটিল বিষয়ে তাহার পরামর্শ লইত না।

বাচস্পতিভামিনীর কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এক জন অসাধারণ বুদ্ধিমতী মহিলা। সুতরাং তাঁহার মনে যদি কখনও কোন ভ্রান্ত ধারণা একবার প্রবেশলাভ করিত, তাহা হইতে বাচস্পতি মহাশয়ও শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মন হইতে সেই ধারণা দূর করিয়া দিতে পারিতেন না। সেই জন্য শেষ বয়সে বাচস্পতি ঠাকুর আর গৃহিণীকে যুক্তি তর্কের দ্বারা কোন কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন না, জলজীয়ন্ত উদাহরণ দ্বারা তাহার ধারণা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

সে কালে টোলের ছেলেরা অধ্যাপকের সাংসারিক অনেক কার্য্যের সহায়তা করিত। বাচস্পতি মহাশয় টোলের প্রথম শিক্ষার্থী ছাত্রদিগের উপরই সাংসারিক সামান্য কার্য্যের ভার দিতেন। তাহার কারণ, তিনি বলিতেন, ছোট বেলা যাহা অভ্যাস হয় তাহা অতি সহজেই করা যায়। ছেলেদের প্রায় সকলেরই সংসারের কাজকর্ম্ম করিতে হইবে, সুতরাং বাল্যে সংসারের কাজ করিতে শেখাই ভাল।

কিন্তু যাহারা টোলের বড় বড় ছেলে, যাহাদের অধ্যয়ন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহাদিগকে তিনি পাঠের চর্চ্চায় নিযুক্ত রাখিতেন। কেবল নিতান্ত জটিল সাংসারিক কার্য্যে এবং শ্রমসাধ্য কার্য্যে ক্বচিৎ কখনও তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতেন। বাচস্পতির গৃহিণীও ছোট ছোট ছেলেদিগকে বড় ভাল বাসিতেন, কিন্তু বড় বড় ছাত্রদিগকে দেখিতে পারিতেন না। বাচস্পতির সম্মুখে অনেক সময় তিনি শেষোক্ত ছাত্রদিগের প্রতি বিদ্বেষ বিশেষভাবে ব্যক্ত করিতেন। বাচস্পতি বুঝিলেন যে, গৃহিণীর ঐ ধারণাটি নষ্ট করা আবশ্যক। যুক্তি তর্ক দ্বারা উহা বুঝাইতে গেলে ফল ভাল হইবে না, বরং বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। কাজেই তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

একদিন প্রাতে বাচস্পতি মহাশয় শয্যা হইতে আর উঠিলেন না। টোলে সংবাদ পাঠাইলেন যে, তাঁহাকে জলজন্তুতে দারুণ দংশন করিয়াছে, সুতরাং তিনি আর শয্যা হইতে উঠিতে পারিতেছেন না। টোলে ঐ সংবাদ উপস্থিত হইবামাত্র ছোট ছোট ছেলের দল হৈ হৈ করিয়া খেলা করিতে বাহির হইল. অধ্যাপক মহাশয়ের যে কি হইয়াছে, তাহার বার্ত্তা লইবার জন্যও তাহারা অপেক্ষা করিলনা। কিন্তু যে সকল ছাত্র অধিক বয়স্ক, তাহারা ব্যাপার শুনিয়া বিস্ময় মানিল। অধ্যাপক মহাশয় বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, অকস্মাৎ তাঁহাকে জলজন্তুতে দংশন করিল কি প্রকারে? কল্য সন্ধ্যার সময় গাত্র ধৌত করিবার সময় কিছুতে দংশন করিল নাকি? আচ্ছা তাহা হইলে তাহারাই বা সে কথা সন্ধ্যার পর শুনে নাই কেন? যাহা হউক তাহারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মনে, অধ্যাপকের নিকট আগমন করিল এবং তাহাকে প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা জিজ্ঞাসা করিল। জলজন্তুই বা কি ভাবে তাঁহাকে দংশন করিয়াছে, তাহাও তাহারা জানিতে চাহিল।

বাচস্পতি মহাশয় তখন শয্যা হইতে হাসিতে হাসিতে উঠিলেন এবং কহিলেন যে, তাঁহার কিছুই হয় নাই, তিনি একটা পরীক্ষা দেখিবার জন্য এই কার্য্য করিয়াছেন। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে টোলে যাইতে অনুমতি করিলেন, এবং পরে গৃহিণীকে ডাকিয়া "ব্যাপারখানা দেখিলে ত?

আমি জলজন্তু কর্তৃক দষ্ট হইয়াছি, শুনিয়া ছেলেরা ব্যাপার কি তাহা জানিতে চেষ্টা করিল না, আমার জন্য কোনরূপ উদ্বেগ প্রকাশ করিল না, কেবল খেলা করিবার আগ্রহাতিশয্যে হৈ চৈ করিয়া বাহির হইয়া গেল। উহাতে উহাদের কোন দোষ নাই। উহারা তরল প্রকৃতির, খেলাটাই বেশী ভালবাসে। উহারা কোন কাজের লোকই না। উহারা অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু টোলের যাহারা বড় বড় ছেলে তাহাদের আমাদের প্রতি ভক্তি অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে। আমাদের কোন প্রকার অমঙ্গল হইলেই তাহারা বিচলিত হইয়া পড়ে। আর সকল বিষয়ের সম্ভবত্ব অসম্ভবত্বও তাহারা বেশ করিয়া বিচার করিয়া দেখে। আমি রাত্রিতে শয্যায় শুইয়াছিলাম, আমাকে কোন প্রকার জলজন্তুতে দংশন করিতে পারে, এরূপ অসম্ভব কথা উহারা বিশ্বাস করিতে পারে নাই। অথচ উহারা আমার কথাও বেদবাক্যবৎ মানে। কাজেই উহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছে, কল্য সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন আমি গাত্র ধৌত করিবার জন্য ঘাটে গিয়াছিলাম, তখন আমাকে কোন জলজন্তুতে দংশন করিয়াছে। যাহা হউক, ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাহারা সকলেই তাড়াতাড়ি আমার কাছে আসিয়াছে। উহারা বাস্তবিকই আমাদের হিতকাঙ্ক্ষী। সুতরাং উহাদের উপর অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত নহে।

আমাদের দেশের ধনী লোকেরা ঐরূপ বালকের ন্যায় তাঁহারা কোন বিষয়ের কোনরূপ সন্ধান লয়েন না, একটা ব্যাপার হইলে তাহারা প্রথমে একটু হৈ চৈ করিয়া উঠেন, শেষে তাঁহারা গার্ডেন পার্টি প্রভৃতি ব্যসনেই রত থাকেন। দেশের কি হইতেছে, কিসে দেশের অবনতি ঘটিতেছে, কি করিলে উহার উন্নতি হইতে পারে, এ সব বিষয়ের তাঁহারা সন্ধান লইবার চেষ্টা করেন না।

কিন্তু বাস্তবিক যাহারা দেশের জন্য চিন্তা করে, দেশের প্রকৃত ব্যাধি কোথায় তাহার সন্ধান লয়, তাহারাই দেশের প্রকৃত সন্তান। দুর্ভাগ্যক্রমে ইদানীং এইরূপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িতেছে। বালকের ন্যায় তরলমতি লোকের সংখ্যাই বৃদ্ধি পাইতেছে। আজকাল আমাদের দেশে যে ভেজালের বাহুল্য লক্ষিত হইতেছে, ইহার মূল কারণ এদেশের ধনী সম্প্রদায়। ইহারা নিজে কিছুই চোখে দেখেন না, পরের মুখে বার্ত্তা পাইলেই কেবল হুল্লোড় করিতে থাকেন। দুধ, ঘী, তেল প্রভৃতি যদি ভেজাল না বিকায়, তাহা হইলে কোন ব্যবসায়ী বা দোকানদার উহা রাখে না। কিন্তু আমরা তাহা করি না। যাহা বিকায় দোকানদারেরা তাহাই রাখে সুতরাং এ সব বিষয়ে দোষ কাহার? এদেশে এই ব্যাধি বাহুল্যের কারণ কি, তাহা অনুসন্ধান করা উচিত এবং তাহার প্রতিকারের উপায় করা কর্ত্তব্য। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা যদি জ্ঞানশূন্য হইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেশের লোকের কষ্ট হইয়াই থাকে।